দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী

প্রতিভা, ১৩১৯

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার, এম, এ, এফ্ সি, এস্, পি, আর, এস্,

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি, এল্,

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ,

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকুলচন্দ্র দে

শ্রীগণপতি রায়

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীযশোদালাল বণিক্ বি, এল

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, আর, হিষ্ট্ এস্

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত

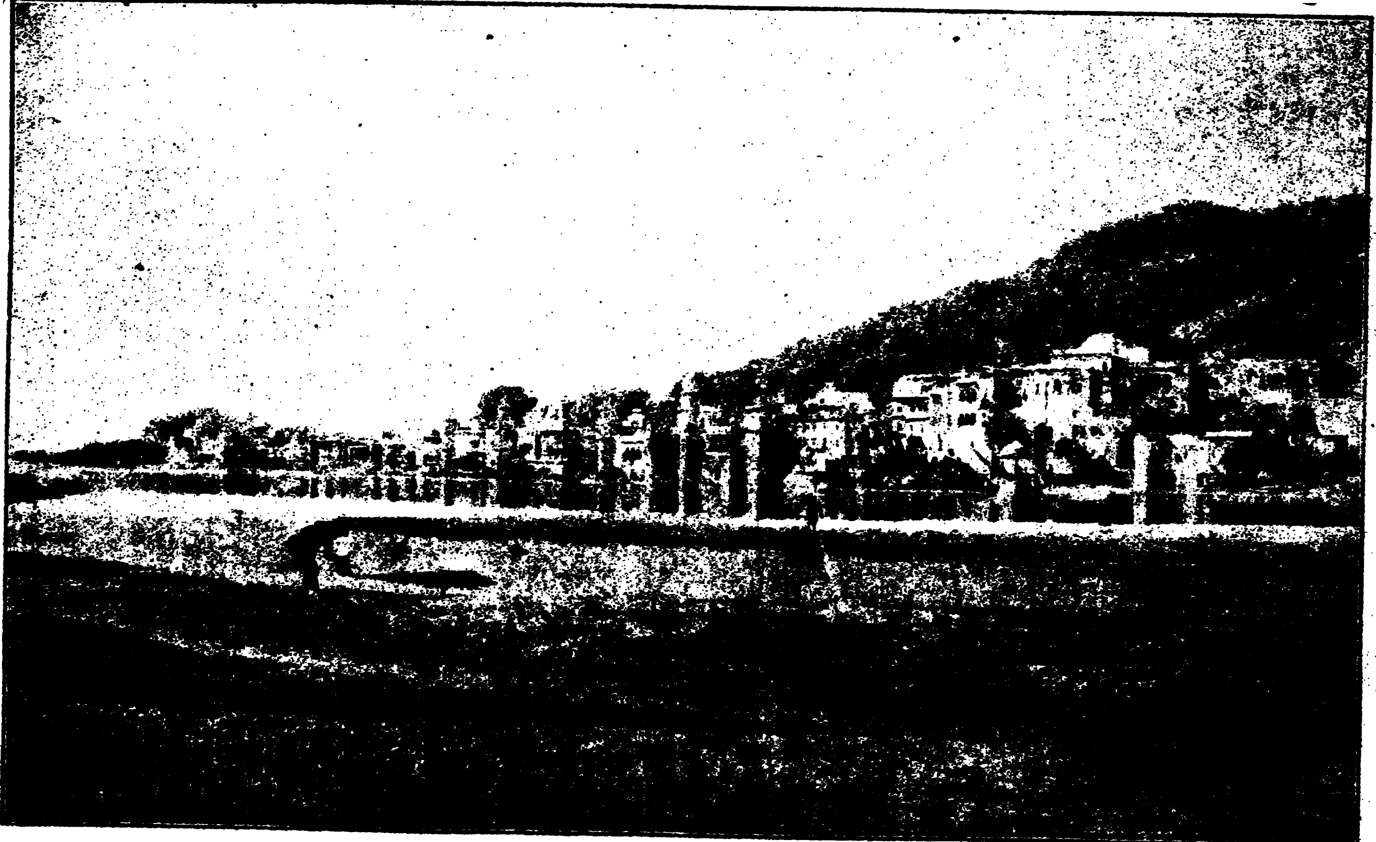
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল্

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ



E. B. P. & P. House Dacca.

হরিদ্বার।

প্রতিভা

২য় বর্ষ বৈশাখ ১৩১৯ ১ম সংখ্যা।

রাজতরঙ্গিণী।

পঞ্চম তরঙ্গ।

মঙ্গলাচরণ—

দেহার্দ্ধঘটিত হরপার্ব্বতী অভিনব শরীরে প্রকাশমান, অর্দ্ধাংশ পার্ব্বতী ও অর্দ্ধাংশ মহেশ্বর। উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে জিহ্বা একভাবে স্পন্দিত হইয়া একটি বাক্যই উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিভিন্ন প্রকার। মহাদেব বলিতেছেন, "পার্ব্বতী! তোমার কেশকলাপে ফণীর স্থায় কুটিলতা ও কৃষ্ণকান্তি; কোকিলকণ্ঠ উচ্চারিত বচনাবলী চক্ষুঃশ্রবা ফণীর চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতেছে।" পার্ব্বতী বলিতেছেন, "হে মহেশ্বর, তোমার জটাজাল ফণিমণ্ডিত, ও কণ্ঠতটে কোকিলকালিমা চক্ষুঃশ্রবা ফণিকুলের নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছে।" হরপার্ব্বতীর এই উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রোতৃ-মণ্ডলের রক্ষা বিধান করুন।

মহারাজ অবন্তিবর্ম্মা ঃ—

শক্রকুলারাতি অবন্তিবর্ম্মার রাজ্যলাভে সজ্জনেরা আনন্দিত হইলেন। রাজমন্ত্রী যেমন সদ্‌গুণ বিভূষিত ছিলেন, রাজাও তদনুরূপ। ইঁহারা উভয়েই ক্ষমাশীল, নিরহঙ্কার, ও পরস্পর অনুরক্ত ছিলেন। বিবেকী অবন্তিবর্ম্মা রাজ্যলাভ করিয়া রাজসম্পদে বীতস্পৃহ হন, রাজশ্রীর চাঞ্চল্যের বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যথিত অন্তঃকরণে পূর্ব্ব রাজগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত রৌপ্য স্বুবর্ণ প্রভৃতি ধনরাশি ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করেন। রাজা এরূপ ভাবে স্বীয় ধনরাশি বিতরণ করিয়াছিলেন যে, রাজচিহ্নস্বরূপ তাঁহার ছত্র ও চামর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইনি রাজ্যলাভ করিয়া প্রথমতঃ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই কারণ সুসমৃদ্ধ জ্ঞাতিবর্গ ইঁহার প্রতিকূলতা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া ইনি শেষে রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ইনি অতিশয় বাৎসল্যসম্পন্ন ছিলেন। বন্ধু ও ভৃত্যগণকে সম্পদের অংশভাগী করিয়াছিলেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধীমান শূরবর্ম্মাকে যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যুবরাজ খাধূয়া ও হস্তীকর্ণ নামক দুইটী স্থান অগ্রহার প্রদান করেন, শূরবর্ম্মস্বামী নামে বিষ্ণুর মন্দির ও একটি গোকুল নির্ম্মাণ করেন, "মর্ত্ত্য মাহাত্ম মন্দির" নামক মঠ স্থাপন করেন। রাজভ্রাতা 'সমর' চতুর্ব্যূহসমন্বিত বিষ্ণু স্থাপন করেন। শূরবর্ম্মার অপর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ('৭' শূরাবরজৌ শ্লোক ২৬) ধীর ও বিম্রপ কর্ত্তৃক স্ব স্ব নামে দুইটী দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজদৌবারিক মহোদয় মহোদয়স্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির স্থাপয়িতা। বৈয়াকরণ রামজোপাধ্যায় ব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মন্ত্রী প্রভাকরবর্ম্মা "প্রভাকর স্বামী" নামক বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন করেন। মন্ত্রীর একটী শুক পক্ষী ছিল। ঐ পক্ষী মুক্তা সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীকে প্রদান করিত।

প্রভাকর শুকের স্মরণার্থ 'শুকাবলী' রচনা করেন।

এই সময়ে কাশ্মীরে বিদ্যাচর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মন্ত্রী শূর নানা স্থান হইতে পণ্ডিতগণকে আনয়ন করেন ও রাজযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করেন। অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকালে মুক্তাকণ, শিবস্বামী, আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর এই চারি জন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শূরবর্ম্মা বহুসংখ্যক দেবালয় ও মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অবন্তিবর্ম্মা নির্ম্মৎসর ছিলেন। তিনি সহোদরদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, শূরবর্ম্মা ও তাহার পুত্রগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। রাজা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শূরবর্ম্মা শৈব ছিলেন। অবন্তিবর্ম্মা অবন্তিপুর নামক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে অবন্তিস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

শূরবর্ম্মা রাজার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি তিনি রাজার প্রীতির জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

অবন্তি বর্ম্মার রাজত্বকালে "ভট্টকল্লট" প্রভৃতি সিদ্ধগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম হ্রদের জল নদীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এ দেশ জলপ্লাবিত করিত; সেই জন্য অতি অল্প পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত; ললিতাদিত্যের চেষ্টার জলপ্লাবনের গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্তু জয়াপীড়ের পরবর্ত্তী রাজগণ হীনবীর্য্য হওয়াতে দেশ পুনর্ব্বার জলপ্লাবিত হইলে প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে অসাধারণকর্ম্মা 'সুয্য' অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে রাজ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশে জলপ্লাবন নিবৃত্ত করেন। তাহার ফলে দেশে প্রচুর শস্য হইয়াছিল। তিনি কোথাও প্রস্তরসেতু কোথাও বা বহুসংখ্যক খাল কাটিয়া প্লাবনের গতি মন্দীভূত করেন ও নদীমুখ পরিষ্কৃত করিয়া জলনির্গমের সুবন্দোবস্ত করেন। সুর্য্য এইরূপে বহু জলমগ্ন স্থানের উদ্ধার সাধন করেন। নদীমাতৃক স্থানসমূহ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ নদীজল গমনের ব্যবস্থা করেন। নানা স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া যতখানি সময়ে যে ভূমিতে যে পরিমাণ জল শোষিত হইতে পারে, তথায় সেই পরিমাণ জল সেকের ব্যবস্থা করেন। চানুলা* প্রভৃতি নদীর জল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়া সর্ব্বত্র শস্যোৎপত্তির সুব্যবস্থা করেন।

সুয্য বিতস্তা নদীতীরে স্বনামাখ্যাত এক সুসমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন ও মহাপদ্ম সরোবরে মৎস্য ও পক্ষীকুলের হিংসানিবারক মর্য্যাদা নিরূপণ করেন। জলপ্লাবন হইতে দেশ উদ্ধার হইলে অবন্তিবর্ম্মা কর্ত্তৃক জয়স্থল প্রভৃতি বহু গ্রাম স্থাপিত হয়। যখন রাজা রোগগ্রস্ত হইয়া আপনার আয়ুঃশেষ বুঝিতে পারিলেন তখন ত্রিপুরেশ পর্ব্বতস্থিত জ্যেষ্ঠেশ্বর ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক ভগবদ্গীতা শ্রবণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অবন্তিবর্ম্মা ৫৯ বৎসর বয়সে আষাঢ় শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহারাজ শঙ্কর বর্ম্মা ঃ—

মহারাজ অবন্তিবর্ম্মার পুত্র শঙ্করবর্ম্মা রাজ্য গ্রহণ করেন। বিন্নপামাত্য কর্ণক কর্ত্তক শূরবর্ম্মার পুত্র সুখবর্ম্মা যুবরাজপদে অভিষিক্ত হন। যুবরাজের সহিত রাজার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; পরিশেষে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে বহু কষ্টে সুখবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া শঙ্করবর্ম্মা বিজয়ী হন। অনন্তর শঙ্করবর্ম্মা দিগ্বিজয় অভিলাষী হইয়া নয় লক্ষ সৈন্যের সহিত কাশ্মীর হইতে যাত্রা করেন। অনভিজ্ঞ সৈন্যগণকে স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে সুশিক্ষিত করিয়া লন। অন্যান্য নৃপতিগণের সাহায্য পাইয়া শঙ্করবর্ম্মার সৈন্যসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দার্ব্বাভিসার-রাজ শঙ্করবর্ম্মার আগমনে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার অশ্ব সমূহ শঙ্করবর্ম্মার হস্তগত হইল। এই সময়ে শঙ্করবর্ম্মার সৈন্য-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়া নয় লক্ষ পদাতি, তিন শত হস্তী, ও একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত হইল।

* অন্য মতে নামটি আনুলা; 'চকার চানুলাস্তভিঃ' ইত্যাদি, শ্লোক ১১২]

ত্রিগর্ত্তরাজ ভীত হইয়া পলায়ন করেন, গুর্জ্জররাজ অলখান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শঙ্করবর্ম্মাকে টকদেশ প্রদান করেন।

ভোজরাজ কর্ত্তৃক হৃত থক্কিয়ক রাজ্য গ্রহণ করিয়া থক্কিয়বংশীয় নৃপতিগণকে প্রদান করেন। প্রবল প্রতাপান্বিত লল্লীয়শাহি শঙ্করবর্ম্মাকে বিতাড়িত করিতে গিয়া পরাজিত হন।

এইরূপে দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া শঙ্করবর্ম্মা কাশ্মীরে প্রত্যাগত হইলেন ও নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন।

অনন্তর রাজা অত্যন্ত লোভ-পরবশ হইয়া প্রজাপীড়নে উদ্‌যুক্ত হন। নৃপতি ব্যসনাসক্ত হওয়াতে রাজকোষ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন তিনি দেবত্রাদি অপহরণ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন। রাজা মাত্র ৬৪টী দেবালয়ের তত্ত্বাবধান-ভার স্বীয় হস্তে করিয়া অন্য দেবালয়সমূহ পরিত্যাগ করিলেন, কর্ম্মচারিগণের বেতন কমাইয়া দিলেন ও প্রজাপুঞ্জের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবার সুবিধা করিলেন।

প্রজাপুঞ্জের অসাধারণ ক্লেশ প্রত্যক্ষ করিয়া রাজপুত্র গোপালবর্ম্মা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন ও প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পিতার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

রাজা দুর্ব্বৃত্ত হইলেও ভল্লট প্রভৃতি কবিবৃন্দ রাজভয়ে ভীত হইয়া রাজ-সংস্রব পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা অতিশয় ব্যসনাসক্ত ছিলেন। দ্রোহ আশঙ্কা করিয়া দার্ব্বাভিসার-রাজ নরবাহনকে অনুচরগণের সহিত নিহত করিয়াছিলেন। উত্তরাপথে সিন্ধুতীরস্থ নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথে উরশা নামক স্থানে রাজসৈন্যগণের সহিত উরশাবাসিগণের কলহ উপস্থিত হয়। এই সময় একজন ব্যাধ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করে। ঐ তীর রাজার গলদেশে বিদ্ধ হওয়ায় শঙ্করবর্ম্মা মুমূর্ষু হন বিশ্বস্ত সেনাপতির হাতে সৈন্য রক্ষার ভার প্রদান করিয়া কর্ণীরথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হন। আসন্নমৃত্যু রাজা রাজ্ঞী সুগন্ধার প্রতি স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র গোপালবর্ম্মার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন ও পথিমধ্যেই ৭৭ বৎসরে ফাল্গুনের কৃষ্ণা সপ্তমীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুখরাজ প্রভৃতি সেনাপতিগণ সৈন্য লইয়া গমন করিতে লাগিলেন ; পররাজ্যে বাস করিতেছিলেন বলিয়া রাজার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিলেন না। রাজার মৃত্যুর ছয় দিন পরে স্বীয় অধিকারে উপস্থিত হইলে বোল্লাসক নামক স্থানে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সুরেন্দ্রবতী প্রভৃতি তিনজন রাজ্ঞী রাজার অনুগমন করিলেন। জয়সিংহ লাড় ও ব্রজসার নামক ভৃত্যত্রয়ও রাজার অনুগমন করিলেন।

মহারাজ গোপালবর্ম্মা ঃ—

গোপালবর্ম্মা মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে বাস করিয়াও কুসংস্কারাপন্ন হন নাই। রাজমাতা সুগন্ধা মন্ত্রী প্রভাকরের প্রতি আসক্ত হইলেন। মন্ত্রী প্রভাকর নির্ভয়ে কোষাগার লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ভাণ্ডাপুরের (? ২৩১ শ্লোক) শাহি আজ্ঞাতিক্রম করাতে প্রভাকর সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া শাহিকে রাজ্যচ্যুত করিলেন ও তত্রত্য লল্লিয়পুত্র তোমরাণকে কমলক নাম প্রদান করিয়া তাহার হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। গোপালবর্ম্মা সমস্ত অবগত হইয়া কোষগণনায় উদ্যত হইলে প্রভাকর "যুদ্ধে সমস্ত ব্যয়িত হইয়াছে" বলিয়া রাজাকে নিরস্ত করিলেন ও স্বীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অভিচারবিৎ রামদেব দ্বারা অভিচার করাইয়া রাজাকে নিহত করিলেন। ইঁহার রাজ্যকাল মাত্র দুই বৎসর।

মহারাজ শঙ্কট ঃ—

গোপাল বর্ম্মার ভ্রাতা। ইনি দশ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাসু হন।

রাজ্ঞী সুগন্ধা ঃ—

প্রজাবৃন্দের প্রার্থনানুসারে রাজ্ঞী সুগন্ধা স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। ইনি গোপালপুর, গোপালমঠ ও গোপালকেশব স্থাপন করেন। স্বীয় নামে একটী নগরীও প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপালবর্ম্মার পত্নী নন্দা মঠ ও বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। গোপালবর্ম্মার মৃত্যুকালে তদীয় অপর পত্নী জয়লক্ষ্মী অন্তর্বত্নী ছিলেন। কালক্রমে তিনি একটী পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজ্ঞী সুগন্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বংশীয় অন্য এক ব্যক্তিকে রাজ্যপ্রদান করিতে উদ্যত হন। এই সময় কাশ্মীরে তন্ত্রী ও একাঙ্গ নামে দুই সম্প্রদায় অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা রাজার প্রতিও অনুগ্রহনিগ্রহ করিতে সমর্থ ছিল। ইহাদের অনুগ্রহে রাজ্ঞী সুগন্ধা দুই বৎসর রাজত্ব করেন। [২০৭-৮]

রাজ্ঞী শূরবর্ম্মার পৌত্র সুখবর্ম্মার পুত্র নির্জ্জিত-বর্ম্মাকে রাজ্যপ্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু নির্জ্জিতবর্ম্মা অকর্ম্মণ্য বলিয়া তন্ত্রী ও একাঙ্গ সম্প্রদায় অসম্মতি প্রকাশ করেন। অনন্তর তন্ত্রী সম্প্রদায় মিলিত হইয়া নির্জ্জিত বর্ম্মার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র পার্থকে রাজ্য প্রদান করিলেন।

মহারাজ পার্থ ঃ—

তন্ত্রী সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে নির্জ্জিতবর্ম্মার পুত্র পার্থ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজ্ঞী সুগন্ধা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। একাঙ্গী সৈনিক-বৃন্দ মিলিত হইয়া '৮৯ লৌকিক অব্দে হুষ্কপুর হইতে সু-গন্ধাকে আনয়ন করিল। ইহাতে তন্ত্রী দলের সহিত একাঙ্গ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। একাঙ্গ সৈনিকগণ পরাজিত হইল। রাজ্ঞী তন্ত্রীদিগের হস্তে বন্দিনী হইয়া এক নির্জ্জন বিহারে নীতা হইলেন এবং সেই বিহারেই রুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া গতায়ু হইলেন। নির্জ্জিতবর্ম্মা পুত্র পার্থবর্ম্মার রক্ষকরূপে থাকিয়া দুষ্ট অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্ত্রীদিগকে হুণ্ডিকাপ্রদানই পরা-ক্রান্ত সামন্ত নৃপতিগণের জীবিকা হইয়াছিল। মেরু-বর্দ্ধনের পুত্রগণ রাজ্যলাভেচ্ছু হইয়া প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে লাগিল। কাশ্মীরের এই দুরবস্থার সময় জলপ্লাবনে শরৎকালীন শালিধান্য বিনষ্ট হইয়া ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বহুলোক ক্ষয় হয়। এই সময় তন্ত্রীগণের চক্রান্তে কখন পার্থকে পরাজিত করিয়া পিতা নির্জ্জিতবর্ম্মা রাজ্য গ্রহণ করিতেন, কখনও বা নির্জ্জিতবর্ম্মাকে রাজচ্যুত করিয়া পার্থ রাজ্য গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ নির্জ্জিতবর্ম্মা (পঙ্গু) ঃ—

তন্ত্রিগণের সাহায্যে নির্জ্জিত বর্ম্মা পার্থকে রাজ্যচ্যুত করিয়া '৯৭ অব্দে পৌষ মাসে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পঙ্গুর পত্নীগণ অতিশয় দুশ্চরিত্রা ছিলেন। রাজ্ঞী বপ্পট দেবী ও মৃগাবতী মন্ত্রী সুগন্ধাদিত্যের সহিত অবৈধ প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া স্বীয়পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মন্ত্রী সুগন্ধাদিত্যকে বহু অর্থ প্রদান করেন। '৯৮ অব্দে মাঘ মাসে স্বীয় পুত্র শিশু চক্রবর্ম্মাকে রাজ্য প্রদান করিয়া রাজা পরলোকগত হন।

মহারাজ চক্রবর্ম্মা ঃ—

ইহার পিতার নাম নির্জ্জিতবর্ম্মা, মাতার নাম বপ্পট দেবী। পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর চক্রবর্ম্মা মাতা ও মাতামহী কিল্লিকদেবীর তত্ত্বাবধানে অবস্থান করেন। পিতৃরাজ্যলাভেচ্ছু পার্থের অনুচর তন্ত্রিগণের সহিত একাঙ্গ সম্প্রদায়ের যুদ্ধ হয়। ৯ম (লৌকিক ৪০০৯) অব্দে মন্ত্রিবৃন্দ চক্রবর্ম্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্ঞী মৃগাবতীর গর্ভজাত নির্জ্জিতবর্ম্মার অপর পুত্র শূরবর্ম্মাকে অভিষিক্ত করেন।

মহারাজ শূরবর্ম্মা ঃ—

নির্জ্জিতবর্ম্মার পুত্র, মৃগাবতীর গর্ভজাত। রাজমাতা মৃগাবতী মন্ত্রী মেরুবর্দ্ধনের দুহিতা ছিলেন। মেরুবর্দ্ধনের পুত্রগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বীয় ভগিনীকে পঙ্গু নির্জ্জিতবর্ম্মার

সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিল। মাতুলগণের স্বেচ্ছা-চারিতায় তন্ত্রী সম্প্রদায় উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্ত না হইয়া শূরবর্ম্মাকে সিংহাসনচ্যুত করিল ও বহুঅর্থপ্রদ পার্থকে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রদান করিল।

মহারাজ পার্থ (২য় বার) ঃ—

মহারাজ পার্থ তন্ত্রীগণের সাহায্যে পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করিয়া সাম্ববতী নাম্নী এক বেশ্যার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েন। এই বেশ্যা তন্ত্রীগণের সমস্ত চক্রান্ত অবগত ছিল। তজ্জন্য তন্ত্রী সম্প্রদায় পার্থের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এই অবসরে চক্রবর্ম্মা তন্ত্রীদিগকে বহুল অর্থ প্রদানে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যে, ১১ অব্দে আষাঢ় মাসে সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহারাজ চক্রবর্ম্মা (২য় বার) ঃ—

চক্রবর্ম্মা রাজ্য লাভ করিয়া মেরুবর্দ্ধনের পুত্রগণকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। শঙ্করবর্দ্ধন অক্ষপটলাধীশ হইলেন, শম্ভুবর্ম্মা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। চক্রবর্ম্মা রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরেই তন্ত্রীগণের কথিত হুণ্ডিকা প্রদানে অসমর্থ হন ও রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া মড়ব রাজ্যে গমন করেন।

মহারাজ শম্ভুবর্দ্ধন ঃ—

মহারাজ চক্রবর্ম্মার পলায়ণের পর শঙ্করবর্দ্ধন রাজ্যার্থী হইয়া তন্ত্রীদিগের নিকট শম্ভুবর্দ্ধনকে দূতরূপে প্রেরণ করেন ; শম্ভুবর্দ্ধন তন্ত্রীদিগকে অধিক উৎকোচ প্রদানে সম্মত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন।.

মহারাজ চক্রবর্ম্মার রাজ্যপ্রাপ্তি ঃ—

একদা রাজ্যভ্রষ্ট চক্রবর্ম্মা চক্রবাসী ডামরাধিপতি সংগ্রামের গৃহে গমন করিয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডামরাধিপতির সহিত রাজার বহু কথোপকথনের পর ডামরপতি সংগ্রাম রাজার সাহায্য করিতে সম্মত হন। অনন্তর অসংখ্য ডামর সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া চক্রবর্ম্মা রাজধানী অভিমুখে গমন করেন। শঙ্করবর্দ্ধন তন্ত্রীদিগের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হন। চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে পদ্মপুরের বহির্ভাগে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শঙ্করবর্দ্ধন মহারাজ চক্রবর্দ্ধনের হস্তে নিহত হয়েন। তন্ত্রীসৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে ৫।৬ সহস্র তন্ত্রী সৈন্য নিহত হয়। এদিকে মন্ত্রীবর্গ ও একাঙ্গ সম্প্রদায় চক্র-বর্ম্মার সহিত মিলিত হইল। শম্ভুবর্দ্ধন হতাবশিষ্ট তন্ত্রী সৈন্যগণের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ চক্রবর্ম্মা মহা সমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন। রাজার সিংহাসারোহণের পর ভূভট কর্ত্তৃক শম্ভুবর্দ্ধন ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইয়া চণ্ডাল কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। চক্রবর্ম্মা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় রঙ্গ নামক একজন বৈদেশিক প্রসিদ্ধ গায়ক রাজধানীতে আগমন করে। এই গায়ক জাতিতে ডোম। এই গায়কের হংসী ও নাগলতা নাম্নী অসাধারণ রূপবতী দুইটী কন্যা ছিল। রাজা কন্যাদ্বয়ের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন। রাজা অনুরাগান্ধ হইয়া হংসীকে পট্টমহিষী করেন। ডোমগণ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অত্যধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। রাজা চক্রবর্ম্মা বহু অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নৃপাসন কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইয়া নিরপরাধ ডামরগণকে গোপনে নিহত করিতে লাগিলেন। ডামর-গণও অবসর ক্রমে একদা শৌচগৃহে একাকী দেখিতে পাইয়া '১৩ অব্দে জৈষ্ঠ শুক্লাষ্টমী রাত্রিতে তাহাকে নিহত করিল।

মহারাজ উন্মত্তাবন্তি ঃ—

শর্ব্বট প্রভৃতি মন্ত্রীগণ পার্থের দুরাশয় পুত্র উন্মত্তাবন্তীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। ইনি চক্রবর্ম্মা হইতেও পাপিষ্ঠ ছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃ-পুরুষের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। পর্ব্বগুপ্ত নামক এক ধূর্ত্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিবার মানসে শর্ব্বট, ছোজ, কুমুদ, ও অমৃতাকার এই পাঁচ জন মন্ত্রীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে

আবদ্ধ হয় ও রাজাকে কুপরামর্শ প্রদান করিয়া কুলক্ষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। উন্মত্তাবন্তি স্বীয় পিতা পার্থের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া লইলে পার্থ নিরুপায় হইয়া পত্নীর সহিত শ্রীজয়েন্দ্র বিহারে আশ্রয় লইয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে থাকেন। একদা উন্মত্তাবন্তি সামন্ত ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়েন্দ্র-বিহার আক্রমণ করেন ও শঙ্করবর্ম্মা প্রভৃতি শিশু সন্তানগণের সহিত পার্থ ও পার্থপত্নীকে বীভৎস ভাবে নিহত করেন। এই সময় ডামর ও কায়স্থগণ দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। উন্মত্তাবন্তি যুবতীগণের স্তনচ্ছেদ, গর্ভবতীর উদরবিদারণ প্রভৃতি অতি নৃশংস ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেন। এই রাজার চৌদ্দ জন পত্নী ছিল। উন্মত্তাবন্তি বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুকালে পরিচারিকাগণ কোথা হইতে এক শিশুকে আনিয়া রাজপুত্র বলিয়া মিথ্যা প্রকাশ করে। উন্মত্তাবন্তি এই শিশুকে শূরবর্ম্মা নামে অভিহিত করিয়া সিংহাসন প্রদান করেন ও অমাত্য একাঙ্গ ও তন্ত্রীদিগের হস্তে রক্ষার ভার প্রদান করিয়া '১৫ অব্দে আষাঢ় মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কম্পনাধিপতি (সেনাপতি) কমলবর্দ্ধনের সহিত উন্মত্তাবন্তির শত্রুতা ছিল। কমলবর্দ্ধন মড়ব রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

মহারাজ শূরবর্ম্মা :—

পিতৃঘাতীর পুত্র শিশুরাজা শূরবর্ম্মা আষাঢ় শুক্ল সপ্তমীতে "জয়স্বামী বিরোচন" দর্শন করিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে চরমুখে কমলবর্দ্ধনের সসৈন্যে নগরাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একাঙ্গ তন্ত্রী ও অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। পথিমধ্যে কমলবর্দ্ধনের সহিত রাজসৈন্যের যুদ্ধ হয়। কমলবর্দ্ধন বিজয়ী হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। শিশু রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সৈন্যগণ পলায়ন করিল। রাজমাতা শিশুরাজাকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিলেন।

কমলবর্দ্ধন বৃত্তান্ত :—

মূঢ় কমলবর্দ্ধন রাজ্য লাভ করিয়াও সিংহাসনারোহণ করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, "আপনারা স্বদেশজাত কোনও সমর্থ ব্যক্তিকে রাজ-সিংহাসন প্রদান করুন।" কমলবর্দ্ধনের ধারণা ছিল, ব্রাহ্মণেরা তাহাকেই মনোনীত করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের পরস্পর মতের অনৈক্য হওয়াতে তাঁহারা কাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেন না। এ দিকে পিতৃঘাতীর পত্নী শিশু শূরবর্ম্মার রাজ্য প্রাপ্তির জন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট রাজকর্ম্মচারিগণকে প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারিবৃন্দ যশস্কর নামক এক বাগ্মী ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ যশস্করকে দেখিতে পাইবামাত্রই তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত হইলেন ও তাঁহারা সত্বর হইয়া বিদ্বান যশস্করকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

যশস্করের পরিচয়—পিশাচকপুরে বীরদেব নামক এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার কামদেব নামক এক পুত্র ছিলেন। কামদেব শিক্ষিত সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি মন্ত্রী মেরুবর্দ্ধনের গৃহে বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। ক্রমে ইনি শঙ্করবর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ হন। কামদেবের পুত্র প্রভাকর। ইনি মূর্খ ছিলেন। রাজ্ঞী সুগন্ধার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া প্রচুর অর্থশালী হন। দেশ বিপ্লবে সমস্ত ধনরাশি বিনষ্ট হয়। প্রভাকরের পুত্র যশস্কর। ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। ফল্গুনক নামক এক বন্ধুর সহিত দেশান্তরে গমন করেন। একদা স্বপ্ন দর্শন করিয়া যশস্কর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম তরঙ্গের নৃপতিগণের নাম।

১। মহারাজ অবন্তিবর্ম্মা।
২। মহারাজ শঙ্করবর্ম্মা।
৩। গোপাল বর্ম্মা।
৪। মহারাজ শঙ্কট।
৫। রাজ্ঞী সুগন্ধা।

৬। মহারাজ পার্থ।
৭। মহারাজ নির্জ্জিতবর্ম্মা।
৮। মহারাজ চক্রবর্ম্মা।
৯। মহারাজ শূরবর্ম্মা।
১০। মহারাজ পার্থ ২য় বার।
১১। মহারাজ চক্রবর্ম্মা ২য় বার।
১২। মহারাজ শম্ভুবর্ম্মা।
১৩। মহারাজ উন্মত্তাবন্তী।
১৪। ২য় মহারাজ শূরবর্ম্মা।
১৫। মহারাজ যশস্কর।

কবি।

(একটি জাপানী কবিতার ইংরাজি হইতে)

আঁধার অতল হ'তে সে এসেছে
উজল মুকুতা মুঠায় ভরি',
বেকত-গোপন সত্য-সপন
নব জাগরণে জাগিল, মরি!
নিশ্বাসে তার ফুল-সৌরভ
বিহরিছে নিতি দিবস নিশা,
পথহারা যত গগনের তারা
তার ইঙ্গিতে পায় গো দিশা!
সম্মুখে তার দখিন পবন,
পশ্চাতে তার আলোক-ছটা,
স্বপন আবেশে ফিরে দেশে দেশে
নিরবলম্ব নীরদ-ঘটা!
হৃদয় তাহার নৃত্য করিছে
দুঃখ সুখের অনাদি তালে,
সে বেঁধেছে নীড় সূর্য্য-কিরণে
সকলের আগে আদিম কালে।
কণ্ঠ তাহার মধুর হয়েছে
নিশীথ শশীর অমৃত পিয়ে
তার কটাক্ষে চিতার ভস্ম
নবীন জীবনে উঠে গো জীয়ে!

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত

পুরী।

স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর দেশে তীর্থযাত্রীর অভাব কথনো হয় নাই। যখন রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না; পথ যখন দুর্গম বিপদ সঙ্কুল ছিল; যখন তীর্থে যাওয়া আর প্রাণ হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া এক কথা ছিল, তখনো কত সহস্র, লক্ষ পুরুষ ও রমণী তীর্থে গিয়াছে। ক্লান্ত চরণ যখন আর চলিতে চাহে নাই, শ্রান্ত অবসন্ন দেহ যখন ভূমিতে লুটাইতে চাহিয়াছে, তখনো তাহারা ভগ্নমনোরথ হয় নাই। আত্মীয় কুটুম্ব বা প্রিয়জন রোগে কাতর হইয়াছে, তাহাকে পান্থনিবাসে রাখিয়া যাত্রীর দল ছুটিয়া চলিয়াছে; কত লোক, যে পথে গিয়াছে সে পথে আর ফিরে নাই, তাদের দেহাস্থি তীর্থপথের ধূলির সহিত মিশিয়াছে! তার পর যেদিন দীর্ঘ পথের অবসানে রৌদ্রদগ্ধ ধূলিধূসরিত যাত্রীদের চোখের সামনে মন্দিরের চূড়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তখন তাদের অন্তর হইতে যে পুলকিত জয়ধ্বনি উত্থিত হইত, তাহা যে জগন্নাথের কর্ণে পৌঁছিত তাহাতে সন্দেহ কি!

পুরী হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থ—বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, ইহাই হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। কারণ জগন্নাথের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র চামারে ভেদ নাই—এখানে সব এক। ভারতবর্ষের অন্যত্র তথাকথিত উচ্চ জাতীয়েরা যে সব লোকের স্পর্শিত জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, এখানে তাঁহারাই সেই সব লোকের দ্বারা বিক্রীত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণেও দ্বিধা করেন না! বিশ্বেশ্বরের নিকট তাঁর সকল সন্তানই সমান; সঙ্কীর্ণ চিত্ত মানব তাঁহাকে অবমাননা করিয়া পরস্পরের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়াছে, গণ্ডী দিয়াছে। যেদিন আমরা বুঝিব জগন্নাথ

কেবল পুরীতে বিরাজিত নহেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বিরাজিত, সেদিন আর আমাদের একতা প্রমাণিত করিবার জন্য কংগ্রেস্-কন্‌ফারেন্স আহ্বানের প্রয়োজন হইবে না, এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান লজ্জাকর ব্যর্থতায় শেষ হইবে না। কিন্তু আমরা বাড়ী ফিরিয়া আবার 'পুনর্মূষিক' হই, তাই আমাদের আহ্বান কারো কানে পৌঁছায় না, তাই আমাদের 'একতা' আলেয়ার মতো কেবল দূরেই সরিয়া যায়, কোনো ক্রমে ধরা দেয় না।

আজকাল পথ সুগম হইয়াছে সপ্তাহ মধ্যে দূর তীর্থে গিয়া ফিরা যায়, আর সেই জন্যই যাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু আজকাল যাঁরা পুরী যান তাদের মধ্যে সকলে তীর্থদর্শনে যান না। কেহ যান ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে, কেহ যান স্বাস্থ্যের জন্য, আর কেহ যান বেড়াইতে। রেল, ষ্টীমার স্থাপিত হওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সঙ্গে হিন্দুর কষ্টসহিষ্ণুতা, ও দীর্ঘপথ পদব্রজে যাইবার সময় বিধাতার মুক্ত আকাশ ও বাতাস ও প্রকৃতির নিত্য নূতন অভিনব সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচয়ের সুবিধা যে অনেকাংশে লোপ হইয়াছে সে কথা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু যেখানেই সুবিধা সেখানেই কতক অসুবিধা, সকল সুবিধা এক সঙ্গে হয় না।

জগন্নাথ মন্দিরের

চারিটি প্রবেশপথ আছে। পূর্ব্বে সিংহদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার।

বাহিরের প্রাচীর ২৪ ফীট বা ১৬ হাত উঁচু। উত্তর হইতে দক্ষিণের দৈর্ঘ্য ৬৭৬ ফীট, ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৬৮৭ ফীট। বাহিরের প্রাচীরে পশ্চিম দিকে যে ফটক তাহার সামনাসামনি ভিতরের প্রাচীরেও একটা ফটক। এই ফটকের মধ্য দিয়া যে প্রাঙ্গণে প্রধান মন্দির সেখানে প্রবেশ লাভ করা যায়।

পশ্চিমের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণে ফুলের বাগান। বেল, মল্লিকা, যুঁই, গোলাপ প্রভৃতির গাছ। তুলসী গাছও বিদ্যমান; উদ্যানটির একেবারেই যত্ন করা হয় না। উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে ফুল গাছে জল দিবার জন্য সম্প্রতি একটি কূপ খনিত হইয়াছিল ও ম্যানেজার একটি 'পম্প্' বসাইয়া জল তুলিবার সুবিধা করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু পাণ্ডারা 'পম্প' বসাইতে একান্ত নারাজ। কারণ ওটি বিলাতী জিনিষ। অথচ পূজার জন্য বিলাতী কাপড় গ্রহণে বাধা নাই!

ভিতরকার প্রাচীরের অংশ ঠিক বিমলা-মন্দিরের পশ্চাতে, সেই অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণদিকের ভিতরকার প্রাচীরের ঠিক পশ্চাতে, ১২ হাত চওড়া ও ২৪ হাত লম্বা একটি চাতাল। চাতালটি দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উপর জগন্নাথের প্রসাদ, ভাত শুকানো হয়। এবং পরে এই ভাত যাত্রীদের জন্য আনন্দ বাজার ও অন্যান্য বাজারে বিক্রীত হয়।

পশ্চিমের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া বামদিকে বাহিরের প্রাচীর ও ভিতরের প্রাচীরের মাঝে (১) একটি নবনির্ম্মিত কাঠের দোতালা গোলা বাড়ী, আন্দাজ ৭৫ ফীট লম্বা ও ২০ ফীট চওড়া। গোলাবাড়ীটি কয়েকটি ঘরে বিভক্ত। দরজাগুলি কাঠের, খুব মজবুত ও তালাবদ্ধ।

(২) একটি অপরিচ্ছন্ন চালাঘর। এটি ঢেঁকিশাল। গোলাবাড়ীর ধান 'কুটিয়া' এখানে চাউল প্রস্তুত করা হয়। এ ঘরটিরও কাঠের দরজা।

(৩) একটি মাঝারি আকারের পাকা চাতাল। ইহার উপর ধান শুকান হয়।

পুরী হইতে ১২-১৪ ক্রোশ দূরে গনেশ ভারতী নামক এক সাধু বাস করিতেন। তাঁহার একটি মঠ ছিল ও ধানী জমিও অনেক ছিল। প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুকালে তিনি সম্পত্তি জগন্নাথকে দিয়া যান। সেই ধান রাখিবার ও কুটিবার জন্য মন্দিরের ম্যানেজার গোলাবাড়ী ও ঢেঁকিঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন।

উত্তরের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের ফটকের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণে দেখিবেন একটি পাকা দেয়ালের গায়ে তালাবন্ধ একটি ছোট কাঠের দরজা, একটি কপাটের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, এবং সেই ছিদ্র দিয়া লোকেরা উঁকি দিয়া দেখিতেছে। এই ছিদ্র দিয়া দেখিলে দেখিবেন একটি কূপ। কূপের মুখ কয়েকখানা পুরাণো তক্তা দিয়া ঢাকা ; কূপের পশ্চাতে উচ্চভূমি।

এই কূপের জলে স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথ, তাঁর ভগ্নী সুভদ্রা, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম স্নান করেন। বৎসরে কেবলমাত্র সেই এক দিন দরজা খোলা হয়, কূপের মুখ-হইতে তক্তাগুলি সরান হয় ; দৈত্যপতি পাণ্ডারা তিন ঘড়া জল তুলে ও স্নানমণ্ডপে—যেখানে বিগ্রহ কটিকে আনা হইয়াছে—লইয়া যায়। জলতোলা হইলেই তক্তা-গুলি স্বস্থানে স্থাপিত হয়, ও আর এক বৎসরের জন্য দ্বার বন্ধ করা হয়।

স্নানযাত্রার পর নিয়মিতরূপে জগন্নাথ ও তাঁর ভ্রাতা-ভগ্নীর চতুর্দ্দশ দিবস ব্যাপী জ্বর হয়।

এই কূপের বদ্ধ, দূষিত জলে স্নান করিয়াই যে এরূপ হয় তাহাতে সন্দেহ কি !

উত্তরে দুই প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানটি খুব উচ্চভূমি। এই অংশের বিস্তৃতি প্রায় ২০০ ফীট। এই উচ্চভূমিতে উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই একটি দোতালা বাড়ী। বাড়ীর যে অংশটি ভিতরের প্রাচীরের দিকে এবং পূর্ব্ব-মুখো তাহা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই হেতু নূতন দালান ও বারান্দা নির্ম্মিত হইতেছে। এই বাড়ীটিই বৈকুণ্ঠধাম, যেখানে বিগ্রহেরা কলেবর ত্যাগ করিলে নীচেকার ঘরে তাহাদিগকে সমাহিত করা হয়। স্থানটি সেই হেতু পবিত্র।

যাত্রীরা স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে পাণ্ডার হাতে অর্থ দিয়া যায়। সেই অর্থের আয় হইতে প্রত্যহ জগন্নাথের ভোগ দিয়া, সেই ভোগে এক জন দুই জন বা ততোধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে বলে। বৈকুণ্ঠধামেই টাকা দেওয়ার নিয়ম, ইহার নাম 'আটকে বাঁধা'। বলা বাহুল্য, টাকাগুলো পাণ্ডা ও তাহার পরিবারবর্গের উদরপোষণে ব্যয়িত হয়। পাণ্ডারা বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া টাকা লইতে নারাজ, কারণ তাহা হইলে সেখানকার পাণ্ডাদিগকে ভাগ দিতে হয়। নিরক্ষর যাত্রীদিগের নিকট টাকা লইয়া পাণ্ডারা প্রতিজ্ঞা করে "এই অর্থে অমুক পাণ্ডা ভোজন করিবে!" বৈকুণ্ঠ-ধামের পর ঠিক পশ্চিম দিকে শিয়াললতার বন। পাণ্ডারা বলে, সগর রাজা এই লতাদ্বারা একটি ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করেন ও সেই ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণে শ্রীকৃষ্ণ বা জগবন্ধুর মৃত্যু হয়। সেই হেতু জগবন্ধুর শেষ বিশ্রামের স্থান বৈকুণ্ঠধামের সন্নিকটেই শিয়াললতার বন।

এই লতাবনের পশ্চিমের ভূমিটি ভাঙা খোলায় পরি-পূর্ণ, একান্ত অযত্নে পড়িয়া আছে। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের রন্ধনশালাটি এই উত্তরের ভিতরকার প্রাচীরের উপর। রন্ধনশালার পশ্চাতের দেওয়ালে ধূম নির্গমের জন্য কয়েকটি ছিদ্র আছে।

উত্তরের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া বাম দিকে যাইলে উচ্চভূমি। আনন্দবাজার,—যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রধান পথের ডান দিকে, স্নানমণ্ডপের দক্ষিণে ছিল—এই ভূমির উপর অবস্থিত।

উত্তর দিকের বাহিরের প্রাচীরের সহিত লম্বালম্বিভাবে একটি লম্বা ঘর, কয়েকটি ছোট ঘরে বিভক্ত। প্রত্যেক ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দরজা। ছাতটি ঢালু, রাণীগঞ্জ টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার নিকট আর একটি চার চালা-বিশিষ্ট বাড়ী। পাকা ভিত, চারিদিক খোলা, দেওয়াল নাই। এই বাড়ীটি পূর্ব্বমুখো, উত্তরের বাহির ও ভিতরের প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

এই দুটি বাড়ী আনন্দবাজার। এ বাজারে যারা খাদ্য ক্রয় করে তাদের জন্য নিকটেই একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। এই সব ঘরের সামনে অনেকটা খালি জমি। এখানে বহু লোক ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে।

আনন্দবাজার বোধ হয় সর্ব্ববৃহৎ হিন্দু হোটেল, যেখানে হিন্দুরা যার তার হস্ত হইতে পাক করা খাদ্য ক্রয় করে। হিন্দু বিধবা এখানে অন্ন ক্রয় করিয়া আহার

করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, এমন কি পুরীতে তাঁহাকে একাদশীর উপবাস করিতে হয় না! একাদশী দেবী মন্দিরের পশ্চাতে বাঁধা আছেন।

ইহাই ত সত্যকার বিশ্বেশ্বরের মন্দির, যেখানে আসিলে হিন্দুকে আর পাঁজি-পুঁথি দেখিয়া চলিতে হয় না, নির্ম্মম জাতিবিচার ও অর্থহীন সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না।

প্রত্যুষ হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এ স্থানটি বালক, যুবা, বৃদ্ধ, 'ব্রাহ্মণে' পরিপূর্ণ থাকে। তারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে এক পয়সার প্রসাদ ভিক্ষা করে। পুরীর আসেপাশে তিন ক্রোশের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র এরূপ ব্রাহ্মণের বাস, যারা পুরুষানুক্রমে পরদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিয়া আছে। কোনো যাত্রী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ইচ্ছুক হইলে পাণ্ডাকে বলে কয় জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পাণ্ডাও তত জন লোকের উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি (প্রসাদ) কিনিয়া সেই সঙ্গে উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেয়। যাত্রীর বাড়ীতে খাদ্য ও খাদক একই সময়ে উপস্থিত হয়।

একদিন নৃপতি যে ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া ধন্য হইতেন, সে ব্রাহ্মণের কি শোচনীয় অধঃপতন!

পূর্ব্ব প্রাচীরের সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া, আঠারোটি পাথরের সিঁড়ি উঠিয়া ডানদিকের একটি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। তারপর আগে যেখানে আনন্দবাজার ছিল সেই উচ্চ সমতল ভুমি অতিক্রম করিয়া উত্তর পূর্ব্ব দিকে কয়েকটি ধাপ উঠিলেই—

স্নানমণ্ডপ।

ইহা একটি সমুচ্চ বেদী, চারিদিক লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। এই বেদী হইতে কয়েকটি ধাপ উঠিলে আর একটি বেদী। এই বেদীর উপর তিনটি গোল বৈঠক, দক্ষিণের বৈঠক বলরামের, মধ্যেরটি সুভদ্রার ও উত্তরেরটি জগন্নাথের।

আষাঢ় পূর্ণিমার দিন স্নানযাত্রা। ঐ দিন প্রাতঃকালে বিগ্রহ তিনটিকে স্নানমণ্ডপে আনিয়া বসান হয় ও সহস্র সহস্র যাত্রীর বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রসম্মুখে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়। তারপর যাত্রীরা বেদী-স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হয়।

তার পর বেদীর উপর পূজা এবং ভোগ। সন্ধ্যারতির পর ঠাকুরেরা ভিতরে যান; কিন্তু রত্নবেদীতে না যাইয়া নাটমন্দিরের চাতালে, বিছানায় শয়ন করেন। এই সময় হইতেই ঠাকুরদের জ্বর আরম্ভ। এ জ্বর পনের দিন থাকে। ঐ সময় মন্দিরের দ্বারগুলি বন্ধ থাকে এবং জগন্নাথের ভৃত্য 'দৈত্যপতি' পাণ্ডা ব্যতীত কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। জ্বরপীড়িত ঠাকুরদের যত্নের ত্রুটি হয় না, বৈদ্যেরা তাঁহাদিগকে নিয়মিতরূপে জোলাপ ও ঔষধাদি দিয়া থাকেন!

পনের দিনের পর মন্দিরের দ্বার খোলা হয় এবং সুস্থ ঠাকুরেরা "নটবর বেশে" সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হন। বলা বাহুল্য এ সময় তাঁরা রত্নবেদীর উপর উপবিষ্ট থাকেন।

তার পর লোকবিশ্রুত

রথযাত্রা।

সর্ব্বসমেত তিনখানি রথ। প্রতিবৎসর নূতন রথ নির্ম্মিত হয়। সিংহদ্বারের সামনে রথযাত্রার দুই মাস বা ততোধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই রথগুলি সহস্র বা ততোধিক কারিগরদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। রথগুলি টানিবার জন্য নূতন রজ্জু ব্যবহৃত হয়।

জগন্নাথের রথ গরুড়ধ্বজ, বলরামের তালধ্বজ, ও সুভদ্রার পদ্মধ্বজ।

সর্ব্বপ্রথম বলরামের রথ, তারপর ভগ্নী সুভদ্রার রথ, ও সর্ব্বশেষে জগন্নাথদেবের রথ। জগন্নাথদেব যে বেশ বিনয়ী, ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করেন, ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়!

রথগুলি পতাকা ও সালু কাপড় দিয়া সজ্জিত করা হয়। যাত্রীরা জগন্নাথমন্দির হইতে গুণ্ডিচা বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে হাজারে হাজারে কাতার দিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের জয়ধ্বনির মধ্যে ঠাকুরদিগকে বাহিরে আনিয়া

রথমধ্যে স্থাপন করা হয়, ও সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ রথ ও রথের রজ্জু স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হয়।

রথ টানিবার ঠিক পূর্ব্বেই পুরীর রাজা, জনসাধারণ যাঁহাকে নারায়ণের অবতার জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, পাল্কি চড়িয়া আসেন। তিনি মন্দিরের নিকটেই তাঁর সাধাসিধে বাড়ীতে থাকেন। তিনি আসিয়া রথ স্পর্শ করেন ও রথ টানিবার আজ্ঞা দেন।

লোকে এই রাজাকে "চলন্তি বিষ্ণু" বলে। ভিড়ের মধ্য দিয়া যখন ইঁহার পাল্কী যায়, স্ত্রী পুরুষ পাল্কী স্পর্শ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচল পর্ব্বতের পাদদেশে একটি মন্দির (এখন আর নাই) নির্ম্মাণ করান ও এই তিনটি বিগ্রহ স্থাপনা করেন। তিনি আজ্ঞা প্রচার করেন যে মেথর, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিতে পারিবে না। দেবদর্শনেই মুক্তি, রাজা তাঁর নিষ্ঠুর আজ্ঞা দ্বারা তাদের মুক্তির পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজমহিষী 'গুণ্ডিচার' মাতৃহৃদয় এই অবিচারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিলেন যে, যখন এত লোকের মন্দির প্রবেশের অধিকার রহিল না, তখন নিয়ম করা হৌক যে কোনো এক নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবতা নিজেই বাহিরে আসিবেন, যাহাতে উচ্চ নীচ সকলেই দেবদর্শন লাভ করে ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। উদারহৃদয়া মহিষীর অনুরোধ রাজা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রূপেই রথযাত্রার উৎপত্তি।

ঠাকুরেরা 'গুণ্ডিচা' বাড়ীতে সাত দিন থাকেন ও অষ্টম দিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জগন্নাথের মন্দির হইতে 'গুণ্ডিচা' বাড়ীর ফটক প্রায় দেড় মাইল রাস্তা। 'গুণ্ডিচা' বাড়ীর প্রধান ফটকটি দক্ষিণ দিকে। 'গুণ্ডিচা' বাড়ী জগন্নাথমন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে সাত দিন ধরিয়া নিয়মিতরূপে পূজা, দর্শন, ভোগ প্রভৃতি হইয়া থাকে। যাত্রীরা এ কটা দিন আসেপাশে থাকিয়া দেবদর্শন ও প্রসাদ-ভক্ষণ করে।

লক্ষ্মীর অভিমান।

পূর্ব্বপ্রাচীরের ঠিক উপরে সিংহদ্বারের অল্প দক্ষিণে একটি ঘর, সেটিকে 'চাহনি কোঠা' বলে। এই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলে সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ ভূমিটি সমস্ত দৃষ্টিগোচর হয়। 'গুণ্ডিচা' বাড়ী হইতে রথ ফিরিয়া আসিলে এখানে গবাক্ষে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী জগন্নাথকে দেখেন ও ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্দিরের প্রধান দরজা বন্ধ করিয়া দিতে আজ্ঞা করেন। 'দৈত্যপতি' পাণ্ডারা জগন্নাথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বার খুলিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে, ও মন্দিরের সেবাদাসীরা লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যথাযথ উত্তর প্রদান করে। উভয় পক্ষে প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডার পর লক্ষ্মীর ক্রোধের কিছু উপশম হয় ও দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। এখান হইতে দ্রুত পদে গিয়া লক্ষ্মী মণিকোঠার (যে ঘরে জগন্নাথ থাকেন) দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। আবার বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়; * ও অনেক সাধ্যসাধনার পর জগন্নাথ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। শোনা, রথের সময় পুরাণো উনানগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হয়। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলে লক্ষ্মীঠাকুরুণ রাগ করিয়া উনান ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণের ফটকের ডান দিকে বাহির প্রাচারের বহির্ভাগে মহাবীর হনুমানের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। এই দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটি ভীষণ-দর্শন; পুচ্ছটি পশ্চাদ্ভাগে খাড়া হইয়া উঠিয়া মাথার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে।

---

* নমুনা স্বরূপ নিম্নে লক্ষ্মীর পক্ষ হইতে কথিত একটি শ্লোক উর্দ্ধৃত করা গেল।

ভ্রমাদিহসমাগতো ন তব গুণ্ডিচামণ্ডপঃ
সনাকযুবতীবৃতো বিবিধনৃত্যগীতোৎসবঃ
ইদং বিরহিণী-গৃহং নয়নমীর পূরাঙ্কিতং
ন চন্দনসুবাসিতং সপদি তত্র যাহি প্রভো॥

"এখানে আপনি ভুল করিয়া আসিয়াছেন। এ ত চন্দন গন্ধে আমোদিত যুবতী নর্ত্তকীর নৃত্যগীতমুখরিত গুণ্ডিচামণ্ডপ নয়। এ বিরহিণীর কুঞ্জ, এখানে আছে কেবল নয়নের জল।

রন্ধনশালা।

আরো কিছু পূর্ব্বে, প্রাচীরের ভিতরের রন্ধনশালার মাঝামাঝি একটি পাকা নর্দ্দামা, প্রায় ১৫ হাত লম্বা, ৩—৪ হাত চওড়া ও প্রায় ৭ হাত গভীর। রন্ধনশালা হইতে অন্যান্য নর্দ্দামার মধ্য দিয়া সমস্ত ভাতের ফ্যান এখানে আসিয়া পড়ে। রন্ধনশালায় ৭৫০টি উনান। রন্ধনশালা হইতে ছাত্রভোগ মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত একটি ঢালুছাতবিশিষ্ট গলিপথ। এই খানেই 'কুটনা কোটা' বাট্‌না বাটা' প্রভৃতি কাজ হইয়া থাকে।

গলিপথের পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ কূপ; প্রস্তরে বাঁধানো এই কূপ ও গলিপথের পূর্ব্ব দিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কূপের জলে চাউল ও তরিতরকারি ধোয়া ও রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এক সারি খোড়ো চাল ও ছোট পাকা ঘর ভাণ্ডার ঘররূপে ব্যবহৃত হয়। এ ঘরগুলির মধ্যে চাউল, ডাল হাঁড়ি, কুমড়া, কচু ঘট প্রভৃতি জিনিস রাখা হয়। কতকগুলি ঘরে দৈনিক রাজভোগের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখা হয়।

রন্ধনশালায় লঙ্কা ও সরিষার তৈল লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। ডালের মধ্যে অড়হর, মুগ ও মসুর; 'কণিক' বা ঘী-ভাত, খিচুড়ি, মালপো, খাজা, সর প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হয়।

দক্ষিণের ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়ালের গায়ে "কৃষ্ণের অনন্তশয্যা" অঙ্কিত আছে। ইহার চারি দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি ধ্যানমগ্ন, অপর দিকে ধনুকধারী রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধে চলিয়াছেন। ফটক পার হইয়া নিম্নভূমিতে নামিলে ডানদিকে একটি ছোট পাকা বাড়ীতে ষড়্‌ভুজ চৈতন্যের মূর্ত্তি, ও বাম দিকে আর একটি পাকা বাড়ীতে মহাবীর অঙ্গদ, নল, নীল প্রভৃতির মূর্ত্তি। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ভিতরের ফটক ও প্রাচীর। এ ফটকটি পার হইলেই বাম দিকে ভিতরের প্রাচীরের গায়ে এক সারি ছোট ঘর। প্রত্যেক ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দরজা। পাণ্ডা ও সেবকেরা এই ঘরগুলিতে তাদের জিনিসপত্র রাখে।

মুক্তিমণ্ডপ ও স্নানমণ্ডপ।

মুক্তিমণ্ডপ, পাথরের থামের উপর একটি ছাতবিশিষ্ট চতুর্দ্দিক খোলা ঘর। এই ঘরের মেঝে প্রায় ৪ হাত উঁচু। এই মেঝের উপর ও ধারে ধারে বহু লোক প্রত্যুষ হইতে অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে ও যাত্রীগণকে এই মুক্তি-মণ্ডপ স্পর্শ করিতে বলে ও তাদের নিকট আহার প্রার্থনা করে। নিকটে একটি প্রকাণ্ড বট গাছ। ইহার গুঁড়ির চারিদিক সানবাঁধানো। পাণ্ডারা বলে এটি অক্ষয় বট! অক্ষয়বট যে কোন্ তীর্থে নাই তা জানা দুঃসাধ্য!

মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিম দিকে একটি ছোট চারিদিক-খোলা পাকাছাতবিশিষ্ট স্থান। ইহার মেঝে সমুচ্চ ও মেঝের উপর একটা উঁচু বৈঠক। ইহাই স্নান-মণ্ডপ। কথিত আছে স্নানমণ্ডপে প্রতিনিধি দেবতাগণকে আনিয়া স্নান করান হয়।

অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দনযাত্রা উৎসবের আরম্ভ। প্রতিনিধি দেবতাগণের স্নানের পর, গোপাল, সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতির ছোট ছোট মূর্ত্তি নরেন্দ্রসরোবরের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাকেই চন্দনযাত্রা বলে।

নরেন্দ্রসরোবর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহার পশ্চিমে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি।

ভিতরকার বেষ্টনীর মধ্যে জগন্নাথ ব্যতীত বিমলাদেবীর ও লক্ষ্মীর মন্দির আছে।

ইহা ব্যতীত সূর্য্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ, সত্যভামা, সরস্বতী, শীতলাদেবী, কালী, মাখনচোর, গোপীনাথ, বড় গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, বদরিনারায়ণ, ভুবণ্ডিকাক প্রভৃতির মন্দির আছে।

বারান্দা দিয়া দেবতা দর্শনে যাইবার সময় সকলকে গরুড় স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া যাইতে হয়।

জগন্নাথমন্দিরের পশ্চাতের দেয়ালে কৃষ্ণের "অনন্তশয্যা" খোদিত আছে। বিস্তারিতফণা ভুজঙ্গের উপর কৃষ্ণ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁর মস্তক ও মুখ

কণাগুলির নীচে। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি প্রিয়দর্শন, সর্পটি সুন্দর, সমস্ত কারুকার্য্য অতি চমৎকার।

অরুণস্তম্ভ চারিটি ভিন্ন ভিন্ন আকারের পাদভূমির উপর অবস্থিত। সকলের নীচে চতুষ্কোণ পাদভূমি। এইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উপরের পাদ-ভূমিগুলি ক্রম-সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার। সমস্ত পাদ-ভূমিটি পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরা। যাত্রীদের স্পর্শ হইতে কারু-কার্য্য গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে।

সিংহদ্বারের 'ডোমে'র ডানদিকে বাহির প্রাচীরের ঠিক পশ্চাতে পাকা ঢালুছাদবিশিষ্ট নহবতখানা। নহবত-খানার বসিবার মঞ্চটি প্রাচীরের খাড়াইয়েরও উপরে। স্নানযাত্রার দিন এখানে নহবত বাজে।

কার্ত্তিকমাসে যাত্রীরা রত্নবেদী স্পর্শ করিতে বা মণিকোঠা হইতে ঠাকুর দর্শন করিতে পারে না। অবশ্য নাটমন্দির হইতে দর্শনে বাধা নাই।

পূর্ণিমার দিন মন্দিরপ্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন হয়।

রত্নবেদীর উপর জগন্নাথের ডানদিকে লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, বামদিকে সত্যভামা; নীলমাধব (প্রায় অদৃশ্য) জগন্নাথের পশ্চাতে।

দৈনিক পূজার নির্ঘণ্ট।

প্রত্যূষ ৫ টায়—মঙ্গল আরতি।

তৎপরে,

জগন্নাথের বেশভূষা; দন্তধোয়া প্রভৃতি।

প্রাতে সাড়ে আটটা হইতে দর্শন।

দশটার সময় ছোঁয়া মহাস্নান। বিভিন্ন জাতির লোকেরা মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া স্নানের প্রয়োজন। এ স্নানটি একটু বিচিত্র ধরণের। তিনখানি দর্পণ তিন ঠাকুরের সাম্‌নে ধরা হয় ও সেই দর্পণ তিন-খানি ধুইয়া ফেলা হয়।

তৎপরে রাজবেশ পরিধান।

তৎপরে বল্লভ মুড়্‌কি ভোগ।

১১ টা বা ১২ টার সময় রাজভোগ।

বৈকালে ২ টার সময় ছত্রভোগ।

বৈকালে ৪ টার সময় মধ্যাহ্ন ভোগ।

তারপর পহুড় বা আহারের পর একটু তন্দ্রা।

তন্দ্রাবসানে আবার দর্শন।

সন্ধ্যা ৬ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত মণিকোঠার মধ্যে যাইবার নিয়ম নাই।

সাড়ে ৬ টা বা ৭ টার সময় সন্ধ্যারতি।

রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় সন্ধ্যাধূপ বা সন্ধ্যার আহার।

এই আহারে ডাল, ভাত প্রভৃতি দেওয়া হয়। তারপর মণিকোঠা দর্শন।

রাত্রি ১১ টার সময় মন্ত্রস্নান, অর্থাৎ ঠাকুরকে মন্ত্র দ্বারা স্নান করান হয়। রাত্রিকালে শীতল জলে স্নান করিয়া পাছে ঠাকুরের ঠাণ্ডা লাগে!

রাত্রি ১ টার সময় বড় শিঙার বেশ। তারপর অগুরু চন্দন লেপ; আলট লাগি—ঠাকুরকে বাতাস খাই-বার জন্য পাখা দেওয়া হয় ও চামর ঢুলান হয়। বন্দাপনা—একটি পাত্রে কর্পূর জ্বালাইয়া ঠাকুরের সাম্‌নে ধরা হয় ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। পুষ্পাঞ্জলির পর ডাব ও পান অর্পিত হয়।

তারপর ঠাকুরদের শয়ন। তিন খানি খাট মণি-কোঠায় আনা হয় ও তার উপর সুকোমল রেশমী বিছানা পাতা হয়। মশারি টাঙানো হয় না।

পাণ্ডা।

আজ কাল প্রায় ১৪৭০ পরিবার পাণ্ডা আছে। পাণ্ডা অনেক রকম:—

পূজারি পাণ্ডা, শিঙারী পাণ্ডা, রসুইদার পাণ্ডা, হাজুরি পাণ্ডা, দৈত্যপতি পাণ্ডা, নিকাব পাণ্ডা (ইহাদের হাতে ভাণ্ডারের চাবি ও জগবন্ধুর সোনার হাত, পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি থাকে), খুন্তিয়া পাণ্ডা ও প্রতি-হারী পাণ্ডা (ইহারা মন্দিরের মধ্যে দ্বারের নিকট ছড়ি হস্তে দাঁড়ায় ও যাত্রীদের পিঠের উপর এক এক ঘা প্রহার করে), গোরাবারী পাণ্ডা (ইহারা পূজার সময় পূজারি পাণ্ডাদিগকে জল আনিয়া দেয়), নিজোগ পাণ্ডা।

অবিবাহিত পাণ্ডা পূজারি হইতে পারে না। যে ব্যক্তি জেল খাটিয়াছে সে পাণ্ডা হইতে পারে না। মন্দির সংক্রান্ত কোনো কাজ সে করিতে পারে না।

দৈত্যপতি পাণ্ডা ব্যতীত আর সমস্ত পাণ্ডা ব্রাহ্মণ। পাণ্ডারা মৎস্য ভক্ষণ করে, অনেকে পেঁয়াজ ভক্ষণ করে। ইহারা ইংরাজি পড়ে না, কারণ যে ব্যক্তি ইংরাজী পড়ে তাহার পাণ্ডা হইবার অধিকার নাই।

পুরুষ পাণ্ডারাই মন্দিরের সমস্ত কাজ করে। পূজা করে, ঠাকুর সাজায়, রন্ধন করে, ভোগ বহন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রথা মন্দ নয়, কর্ম্মক্লান্ত ভারত রমণী একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

পাণ্ডা পরিবারের স্ত্রীলোকেরা তিনটি কাজ করে না। (১) কূপ হইতে জলের কলস কাঁকালে আনে না (২) ঢেঁকিতে ধান কুটে না (৩) দিবাভাগে রাস্তা দিয়া যায় না।

ভোগের জন্য শাক সবজির মধ্যে কুমড়া, কচু, থোর, তেঁতুল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত ২০০ পাচক ভোগ রন্ধন করে। দোল, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি দিনে যাত্রীর ভিড় খুব বেশী হয়, তখন সময়ে সময়ে ৭৫০ পাচক নিযুক্ত হয়।

ক্রিষ্টিয়ান, মুসলমান, বাওরি, শবর, পান, হাড়ী, চামার, ডোম, চণ্ডাল, পাকমারা, শুঁড়ি, ধীবর, মুলিয়া, কাণ্ডার, সাধারণ বারবণিতা, রজক, কুম্ভকার প্রভৃতির মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। এ নিয়ম বিদেশী যাত্রীর প্রতি প্রযোজ্য হয় না, কারণ তাদের মধ্যে কে কি তাহা জানিবার উপায় নাই।

মন্দিরে ১২০ জন নর্ত্তকী আছে। তারা ভোগের সময় ও অন্যান্য সময়ে নৃত্য করে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে অনেক বৃহৎকায় কচ্ছপ বাস করে। মুড়কি বা অন্য কোন আহার্য্য দ্রব্য প্রদত্ত হইলে তারা উঠিয়া আসে। নরেন্দ্রসরোবর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী।

পুরীর পূর্ব্ব দিকে লোকালয়ের বাহিরে দুইটি মহাবীর মূর্ত্তি আছে। ইহাদের মধ্যে একটি "সমুদ্রের মহাবীর"—ইনি সমুদ্রে পাহারা দেন। উড়িষ্যার লোকেরা পুরীতে আসিলেই এই স্থানে আসেন। পুরীতে ছোট বড় সর্ব্বসমেত ৭৫২টি মঠ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মঠটির আয় বৎসরে তিন লক্ষ টাকা। এই মঠের নাম এমা মঠ।

স্বর্গ দ্বারে যাইবার পথের পূর্ব্ব দিকে রাধাকান্ত মঠ। এটি কাশী মিশ্রের বাটী। এখানে চৈতন্যদেবের খড়ম ও কমণ্ডলু আছে। কৃষ্ণের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। কাশী মিশ্রের বাগান বাড়ীতে সেই সিদ্ধ বকুল গাছ, যার তলে বসিয়া শ্রী-চৈতন্যের প্রিয়-শিষ্য হরিদাস (যিনি প্রথমে মুসলমান ছিলেন,) পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ধ্যান করিতেন। শঙ্করাচার্য্য-মঠ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখানে শঙ্করাচার্য্যের মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি আছে। সংস্কৃত পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির একটি ছোট লাইব্রেরি আছে।

সমুদ্রতীরে একটি ছোট বাটীতে হরিদাসের সমাধি। সেই বাটীতেই বলরামের শ্বেতপ্রস্তর মূর্ত্তি। তাঁর হাতে বাঁশী।

টোটা গোপীনাথ, প্রস্তরমূর্ত্তি। সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। রঙীন-কাপড়-পরা। কথিত আছে চৈতন্য গোপীনাথের উরুদেশ দিয়া তার প্রস্তরময় দেহে প্রবেশ করেন। সেই হেতু উরুদেশ দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা শাদা! উহা দেখিতে হইলে পাণ্ডাকে এক টাকা চারি আনা দিতে হয়।

দোকানে জিনিস কিনিলে তাহা কাগজে মুড়িয়া সনতরা গাছের সুতা বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেয়। সনতরা গাছ আঙুলের মতো মোটা হয়। ইহা চিরিয়া গিড়া দিয়া বাঁধিয়া লম্বা করা হয়। এই সুতার বাণ্ডিল দোকানে বিক্রীত হয়।

পুরীতে স্ত্রীলোকের কাপড়কে রণপুরী সাড়ী বলে।

প্রমাণ মাপের হইলে ইহা প্রস্থে দুই হাত ও লম্বায় বারো হাত হয়। লাল রঙ্গে কাজ করা খুব চওড়া পাড়, অঞ্চলও প্রায় দুই হাত চওড়া, নক্সা-করা। মূল্য ৭-৮ টাকা।

হাতে খড়ির সময় যে প্রকার খড়ি ব্যবহৃত হয় সেইরূপ (stick) খড়ি পুরীর সর্ব্বত্র বিক্রয় হয়। উহা গর্জ্জাট জঙ্গল মহল হইতে আসে। সেখানে খড়ির ছোট ছোট পাহাড় আছে।

পুরীতে ধান্য, তিসি, সরিষা, তিল ধনে, গম, ইক্ষু তামাক, পেঁয়াজ, অরহর, মুগ ও মাষকলাই উৎপন্ন হয়।

উপসংহার

পুরীতে দেখিবার জিনিস, উপভোগ করিবার জিনিসের মধ্যে সাগর-দৃশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। সকাল সন্ধ্যার আবীর-রাঙ্গা জল-স্থল-আকাশের মাধুরী, সদাচঞ্চল ঢেউয়ের উপর বসিয়া গাঙ্গচীলের দোল খাওয়া, সফেন বারিরাশির অবিশ্রাম গর্জ্জন—এসমস্ত উপভোগ্য, কিন্তু অবর্ণনীয়। বিশ্বেশ্বরের বিরাটত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সাগর দেখা প্রয়োজন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষশেষ

৩১শে চৈত্র, ১৩১৮ সন।

কোন্ দূর তমসার গর্ভ বিদারিয়া
নির্দ্দয়া নিয়তি দেবী হইলা বাহির;
পরে তীব্রগামী কাল স্যন্দনে চড়িয়া
ছুটিলা সৃষ্টির কোন্ অন্ধকার তীর।
চক্রসঞ্চালনে বেগে বহিল সে রথ;—
আজি শেষ তার এক চক্র আবর্ত্তন;
সম্মুখে সৃজনগর্ভে অন্ধকার পথ
উজলি আযাতি পুনঃ ছুটিল স্যন্দন!
এই আবর্ত্তনে নিরাশায়ী কত জন
অদৃষ্টের উচ্চ চূড়ে উঠিল বসিয়া;
উচ্চ হ'তে নিম্নে কত হইল পতন,
নিষ্পেষণে কত গেল বিচূর্ণ হইয়া!
পাসরিল কত আঁখি অশ্রু বরিষণ,—
ছুটিল নির্ঝর কত নয়ন বহিয়া!

নববর্ষ

১লা বৈশাখ, ১৩১৯ সন।

সম্মুখে সৃজন-গর্ভে অন্ধকার পথ—
উজলি আশাভাদীপ্ত ছুটিল স্যন্দন:
সে আলোকে কত দুঃখী ভুলিল ক্রন্দন,
গড়িল নূতন করি কত মনোরথ!
ভুজবলে ফিরাইবে নিয়তির রথ
দর্পে কত জন হেন করিল মনন;
নিষ্পেষিত বক্ষ দিয়া, পুনঃ কত জন
ভাবিল, ঠেলিবে চক্র স্বীয় শক্তিমত!
কত পুষ্পরাশি গেছে বরষে ঝরিয়া,
পাদপ মুকুল-গুচ্ছ ধরিল আবার:
হৃদয়ের কত আশা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
তৃষিতে পরাণে তাই পে'তে শান্তিধার,
কি ঔৎসুক্যে ঊর্দ্ধপানে নমি আরবার,
দাঁড়াইল বিশ্ব খুলে আশার ভাণ্ডার!

শ্রীযশোদালাল বণিক্।

পাপিয়া।*

পাপিয়াকে কোনও কোনও স্থানে 'চোখ্ গেল' আর 'চেষ্টাকর' পক্ষী বলে।

পাপিয়া কোকিলেরই মত বড় হয়। ইহাদের পালখের রং ধূসর; লেজটী কোকিলের লেজের চেয়ে একটু বিস্তৃতাগ্রবিশিষ্ট: লেজের নীচের দিকটায় সাদা রুল-

---

* লেখকের অপ্রকাশিত "গায়ক পাখী" হইতে গৃহীত। প্রঃ সঃ

টানা ; বুকের ও গলার পালখ মোট সাদা ! পাপিয়ার ডানা অত্যন্ত মজবুত নহে, তাহাকে অনেক সময় পর্য্যন্ত শূন্যে রাখিবার পক্ষে ডানা একটু দুর্ব্বল। দেহের তুলনায় ডানা একটু খর্ব্বও বটে।

পাপিয়ার চক্ষু দুটীর চারিদিকে ফিঁকে সাদা বর্ণের অতি পাতলা চর্ম্মের একখানি বেষ্টনী আছে (এই বেষ্টনী সকল পাখীরই আছে)। চক্ষুর্দ্বয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ঠোঁট সরু ও পাতলা—ছাইএর রং। পা দুটি বৌ-কথা ক'র পা'রই মতন।

পাপিয়া কোকিলেরই মত নির্জ্জনতা-প্রিয়! ঘন পাতার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া থাকার অভ্যাস পাপিয়ার নাই, কিন্তু ঐ ঘন পাতার নিকট একটু খোলা জায়গায় বসিয়া পাপিয়া গান গায়। পাপিয়ার গান সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কেহ বলেন পাপিয়া "চোক্ গেল" বলে—কেহ বলেন "চেষ্টা কর্" বলে, আর কেহ বা বলেন পাপিয়া "পি—পি—পিয়—হো—পিয় হো" বলে! মোট কথা পাপিয়া যাহাই বলুক, তাহার স্বর অতি মিষ্ট, চড়া এবং মিহি ; প্রথমে কোমল নিখাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সুর অনেক উচ্চে চড়াইয়া তোলে। আমাদের মনে হয় পাপিয়ার গান কোকিলের গান অপেক্ষাও মনমাতান! বৎসরের উৎকৃষ্ট সময় বসন্ত কালে যখন কবির কল্পনা খুব উধাও হইয়া এক স্বপ্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই সময় কোকিলের গানে প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত কেমন একটা অন্তঃসৌন্দর্য্যের চিত্র ফুটিয়া উঠে ; সেই সময় বাহ্য জগতের বহির্ভূত কবি আপন তুলিকায় কোকিলকে অঙ্কিত করিয়াছেন। কোকিল মহাকবির কাব্যে আশ্রয় পাইয়া রাজ-সম্মান লাভ করিয়াছে,—পাপিয়া পেছনে পড়িয়াছে। মহাকবির আমলেই ইহার সূত্রপাত, নতুবা পাপিয়ার তুলনায় কোকিলকে অত উপরে তুলিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না ! পাপিয়ার স্বর-লহরী যেমন মিষ্ট, তেমন আনন্দদায়ক! সকালে সন্ধ্যায় ও গভীর নিশীথে পাপিয়া যখন স্বরসুধাবৃষ্টি করে, তখন হৃদয়ে অপরিসীম সুখের আস্বাদ লাভ করা যায়! পল্লী-জননীর নীরব স্নিগ্ধ শ্যামল শোভার মধ্য হইতে যখন প্রকৃতি-রাণীর এই সাধা বীণা চারিদিক ছাপাইয়া বাজিয়া উঠে তখন আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়! মধ্য রাত্রিতে যখন চন্দ্রকিরণমালা ধরণীর উপর এক স্নেহাবরণ বিস্তার করিয়া দেয় তখন চারি দিকে পাপিয়ার "পি—পিহো পিওহো" ধ্বনি কর্ণে যেন মদিরা ঢালিয়া হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তির ধারা প্রবাহিত করে। শেষ রাত্রিতে পাপিয়ার সঙ্গীত বড়ই মনোরম। পাপিয়া অন্ধকার রাত্রিতে গান করে না ! অন্ধকারকে বুঝি সৌখিন কেহই ভালবাসে না ! বৃষ্টির সময় পাপিয়া চুপ করিয়া থাকে, বৃষ্টির পরেও আকাশ যতক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ ইহার অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। কিন্তু বর্ষণের পর যখন পশ্চিমাকাশের প্রান্তে রবির স্বর্ণকিরণে বৃক্ষপত্রের শেষ জলকণা ঝরিয়া পড়ে, তখন পাপিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রাগিণী আলাপ করে! যখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণে পৃথিবীর জীবগ্রাম নীরবে ছায়াতলে আশ্রয় লয় —তখনও কদাচিৎ পাপিয়া ভৈরবীতে তান ধরিয়া থাকে! রাগরাগিণীর ধরাবাঁধা নিয়মের অনুসরণ না করিলেও—দুপ্রহরে পাপিয়ার ভৈরবী নিতান্তই অতৃপ্তিকর মনে হয় না।

পাপিয়া বারমাস এদেশে অবস্থান করে না। শীতের অবসানের সময় সে এ দেশে আসে, হেমন্তে প্রস্থান করে। বর্ষারম্ভেই দেশে পাপিয়ার আমদানী খুব কমিয়া যায়! তবে এ কথা ঠিক যে, পাপিয়া ক্রমে এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে! সারা বৎসরই কিন্তু দু চারিটি পাপিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়া থাকে।

আমি বহু অনুসন্ধানেও পাপিয়ার বাসা বাহির করিতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন ইহারাও কোকিলের মত অন্য-পুষ্ট! ইহাদের ছানা যখন উড়িতে শিখে, তখন ছানাগুলির চেহারা প্রায় কোকিলের ছানারই মত দেখা যায়। পাপিয়ার ছানা প্রতিপালনের

আগ্রহ বহু লোকেরই আছে, কিন্তু কাহাকেও ছানা সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইতে দেখি নাই।

পাপিয়া কদাচিৎ লোকচক্ষুর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। গাছের উচ্চ শাখায় বসিয়া গান করাই তাহার প্রধান ব্যবসায়। গান করিবার সময় ইহারা মুখ ঈষৎ ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া লয়। তখন গলার নীচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালখগুলি একটু বিস্তৃত হওয়ায় অতি সুন্দর দেখায়।

পাপিয়া পোকা, পতঙ্গ প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে; কিন্তু খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য তাহাকে ভূতলে পদার্পণ করিতে দেখা যায় না! সে ভ্রমেও কোথায়ও লোকালয়ে আগমন করে না! এই কারণে দেশীয় সাধারণ লোক পাপিয়াকে 'আসল জঙ্গলী পাখী' বলে।

অনেকে বলেন পাপিয়া পাহাড়ে ডিম পাড়ে এবং সেই খানেই উহার ছানা হয়। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে! পাপিয়া ডিম পাড়িবার সময় আমাদের দেশেই অবস্থান করে! তবে অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে ডিম পাড়ে বলিয়াই খোঁজ করা দুষ্কর হইয়া ওঠে! ছানাও একটু সক্ষম না হইলে পাপিয়া তাহাকে গভীর জঙ্গল হইতে বাহির করে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

নৌকাডুবি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্নদা ও চক্রবর্ত্তী খুড়া এই দুইটি প্রবীণের উপন্যাসিক জীবন জুড়িয়া যে তিনটি নবীনা বিরাজ করিতেছেন, এখন তাঁহাদের কথা কিছু বলিব। হেমনলিনী, কমলা ও শৈলবালা বাংলার সমাজ-জীবনের তিনটি নবীনার মূর্ত্তি,—একটি, শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মেয়ে, একটি জটিলজীবনসমস্যাগ্রস্তা উপন্যাসের নায়িকা এবং আদর্শ হিন্দু পত্নী, আর একটি ঘরাণো, দাম্পত্যের ছবি—দ্বিতীয়া নৌকাডুবির সূর্য্যমুখী, তৃতীয়া কমলমণি, প্রথমার কোনো প্রতিরূপ বিষবৃক্ষে নাই।

হেমনলিনী শান্ত, স্নিগ্ধ; তাহার অনুভূতি তীক্ষ্ণ এবং প্রবল; উচ্চ চিন্তায় তাহার অধিকার আছে
হেমনলিনী। অক্ষয়ের শাণিত ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর করিতে সে জানে, কিন্তু তাতে কখনো সে অশোভন কিম্বা প্রগল্ভ নয়। রমেশের মত হৃদয়-বিশিষ্ট প্রাণীকেই ভালবাসা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, বস্ত্রাবিচারকর্ত্তা অক্ষয়কে নয়। তাহার প্রেমে একটা বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। যোগেন্দ্র-অক্ষয় রমেশকে চোখ দিয়া দেখে বলিয়াই তাহারা ভুল দেখে, হেমনলিনী হৃদয় দিয়া দেখে বলিয়াই তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানে। যোগেন্দ্র-অক্ষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও রমেশের নিজের মুখের একটা কথার মূল্য তাহার নিকট বেশী; চারি দিকের সন্দেহ-গুঞ্জনের নিবিড়তার সময়ও রমেশের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিবার সে কোনো দরকার বোধ করে না। উদ্দীপ্ত তেজে সে অবিশ্বাসী অক্ষয়কে "বাইরের লোক" বলিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে কোনো পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাহার প্রবল বিমুখতা জানায়। দুই এক বার বাহিরের প্রবল আঘাতে তাহার এই উদ্দীপ্ততার পরিচয় আমরা পাইয়াছি; কিন্তু সাধারণতঃ তাহার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তার আশ্রয়ের বাহিরে তাহার প্রেমের প্রকাশ বরাবর শান্ত এবং সংযত। হেমনলিনীর সুখের দিনে এই প্রেম স্নিগ্ধ-কৌতুকে এবং আনন্দে, অথবা অবিদ্রোহী অভিমানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং "দুঃখ-দিনের ঝড়েও" যখন সে ব্যক্তিগত চিন্তায় অন্নদার চিন্তা তথা সমাজ-চিন্তাকে হারাইয়া ফেলিতেছিল, তখন তাহার স্বভাবসুলভ সংযম অন্নদার সঙ্গ এবং সেবায় তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবলম্বন যখন ভিতর হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তখন অক্ষয়-যোগেন্দ্ররূপ বহিঃ-সমাজের সহিত তাহার এবং সকলেরই

সহজ সঙ্গতি রক্ষা করা অসম্ভব। এই মানসিক শূন্যতার সময়ই নলিনাক্ষকে হেমনলিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। নিরামিষ আহার, শুচিশুভ্রতা এবং সকল প্রকার বাহ্য কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে তাহার বেদনাতুর নিরবলম্ব চিত্ত একটা বলিষ্ঠ আশ্রয় পাইল,—বেদনার তীব্রতা কমিয়া গেল; এখন তাহার গম্ভীর মুখে স্নিগ্ধ করুণ হাসি ফুটিয়া উঠা এবং অক্ষয়কেও স্বহস্তে চায়ের পেয়ালা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। নলিনাক্ষ তাহার গুরু; নলিনাক্ষের মুখের প্রসন্ন দীপ্তিই তাহার চিত্তের একমাত্র বল। তাই নলিনাক্ষ যখন কাশী চলিয়া গেলেন, তখন হেমনলিনীদেরও কাশী যাত্রা ছাড়া কোন উপায় রহিল না। চক্রবর্ত্তী-অক্ষয় আসিয়া রমেশের বিবাহ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়া গেলেন,—হেমনলিনী রমেশের চিন্তাকে লজ্জাকর বলিয়া নিজের চিত্ত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, পারিল কি? নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব উঠিল। এইরূপ আশ্রয়হীন অবস্থায় আর কত দিন থাকা যায়! তাহার চিত্তের দৃঢ়তার পক্ষে নলিনাক্ষের সঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। না থাকুক তীব্র সুখদুঃখময় প্রেমের উত্তাপ, সে নলিনাক্ষকে সেবা এবং ভক্তি করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে। আর পিতা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার হেমসম্বন্ধীয় নিদারুণ দুঃখ এবং তজ্জনিত রোগ-যন্ত্রণার সময় হেমের গৃহ-প্রতিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে কত মূল্যবান! হেমনলিনী হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যের উপর আবরণ টানিয়া দিয়া দৃঢ়তায় বুক বাঁধিয়া বিবাহে সম্মতি দিল। কিন্তু হঠাৎ রমেশ স্রোতের মত বহিয়া আসিয়া এই দৃঢ়তার বাঁধের উপর আঘাত করিল, হেমনলিনী ক্ষণকালের জন্য আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া মরণাহত সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা দ্বারা সেই স্রোতকে ঠেলিয়া দিল; প্রত্যাগত স্রোত পাশ কাটাইয়া আপনার গতিবেগে অন্য দিকে বাহিয়া গেল। ততক্ষণে দৃঢ়তার বাঁধ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া গিয়াছে। ক্ষেমঙ্করীর উপহৃত বালাজোড়ার ক্ষীণ ভগ্নাবশেষ-টুকুতে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ অপেক্ষা বেশীর ভাগ যুদ্ধ না করিয়াই আত্মসমর্পণের জন্য যখন হেম সমরাঙ্গনে আসিয়া নামিল তখন সেই স্রোত আর নাই! তাহাকে জয় করিয়াও তাহার নিকট সে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইয়া গেল—যদিও নিজের এই পরাজয়ের বেদনাটা রমেশের শেষ চিঠি পাইয়াই হেমের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কমলাকে হেম কমলা অথবা নলিনাক্ষের স্ত্রী বলিয়া জানিল, তাহার নিকট শেষ বিদায় লইল। "আজ হেমনলিনীর জন্য কমলা মনের মধ্যে বড় একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল।" পাঠকের হৃদয়ও বেদনায় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। "হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কি একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল," এবং পাঠকের চোখও অশ্রুহীন ছিল না। "কিন্তু হেম-নলিনীর কেমন একটা দূরত্ব আছে—তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা কি রাখিয়া গেল, যাহা বিলীয়মান গোধূলির মত অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।"

কমলা। মা-বাপ-মরা কমলা বাল্যকালে মামার বাড়ীতে দীনতা এবং স্নেহহীন কঠোরতার মধ্যে পালিত হইয়াছিল। বিবাহ লইয়া গোলমাল, এবং বিবাহ হইলেও পথে নৌকাডুবি, ইত্যাদি কারণে কমলা নিজকে অপয়মন্ত মনে করিত। এক সময়ে তাহার চরিত্রে একটা দীনতার সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু রমেশের আদরে তাহা কাটিয়া গেল। ঘরে রমেশের পিতামাতা নাই, বধূসুলভ সঙ্কোচ শিখাইবার মত আর কেহ ছিলেন কিনা গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। দেখিলাম, প্রথম পরিচয়ের পর কমলা-রমেশে ছাদের উপর দিবা এবং সান্ধ্য সাক্ষাৎ চলে। নৌকাডুবির পর এমন ভাবে, এমন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণের মিলনে, যাহাকে নিকটতম আত্মীয়

করিয়া দিয়াছে, যাহাকে কমলা সর্ব্বান্তঃকরণে আপন স্বামী বলিয়া জানে, তাহার কাছে ধীরে ধীরে সে হৃদয় খুলিয়া দিতে লাগিল—হৃদয়ের ধর্ম্ম এবং হিন্দু-পত্নীর স্বভাবসুলভ সংস্কার বশে। রমেশের কাছে এখন আর তাহার লজ্জা সঙ্কোচ নাই, সহজ-সরল ভাবে কথা কহিতেও তাহার কিছু মাত্র বাধে না। রমেশ তাহার একমাত্র আপন, একমাত্র নির্ভর—রমেশকে ছাড়িয়া বোর্ডিঙে সে একা থাকিবে, এ কথা তাহার মনেই আসে না। ছুটিতেও তাহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইবে না, ইহা জানিয়া কমলার কষ্ট হইল, একটু অভিমান হইল,—বিরহ-বিচ্ছেদের পর বালিকার গোলগাল মূর্ত্তির মধ্যে যুবতীর ম্লান লাবণ্য ফুটাইয়া কমলা রমেশের কাছে আসিল, অভিমানে এবং মাঝ-খানকার বিচ্ছেদের লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল,—দাম্পত্য প্রেমের মুকুল তাহাতে ইতিমধ্যে আরো একটু বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এই খবরটি তখন আর আমাদের নিকট গোপন থাকে না। রমেশ সহজ স্নেহের সুরে এটা ওটা ধরিয়া কথা ফাঁদিয়া বসিল, অভিমান কাটিয়া গেল, কমলা হৃদয় খুলিয়া কথার উত্তর দিতে লাগিল, উৎসাহ সহকারে তাহার নবলব্ধ ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া রমেশকে বিস্মিত করিয়া দিতে চাহিল, রমেশের আপেল কাটা দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল, এবং নিজ হাতে নিপুণভাবে আপেল কাটিয়া রমেশকে খাওয়াইয়া তাহার গৃহিণী-জীবনের সূচনা করিল।

তারপর পশ্চিম যাত্রা। কলিকাতা যাইবার পথে অক্ষয়ের চাদর টানাটানি দেখিয়া আবার কমলার সর্ব্বাঙ্গের এবং সর্ব্বান্তঃকরণের খিল্ খিল্ হাসি,—চিন্তাভারগ্রস্ত সুগম্ভীর রমেশের পাশেই একটি পতিনির্ভরশীলা হিন্দু বালিকাপত্নীর নিশ্চিন্ত সরল হাস্যলীলা—বিরুদ্ধতার একত্র সমাবেশের সুন্দর ছবি। ষ্টীমারে আমরা কমলাকে পরিস্ফুট গৃহিণী রূপে দেখিতে পাই,—কমলা রমেশের সাংসারিক অনভিজ্ঞতায় হাসে, রমেশের মত একটি গম্ভীর লোককে নানা কাজের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ঘরকন্না পাতে এবং রমেশকে থালের পরিবর্ত্তে একটি সরায় তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইয়া রমেশের বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও সেই পরিত্যক্ত সরায় আপনার আহার কার্য্য সমাপন করে। দাম্পত্য জীবনের 'আম ও খাস' হাত ধরাধরি করিয়া চলে। গার্হস্থ্য চিত্রের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকটা যখন পূর্ণতায় প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহারি প্রতিফলিত আলোকে ভিতরের দিক হইতেও কমলা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু দেখিল সে সেখানে সম্পূর্ণ একা, আঁধারের যবনিকা টানিয়া দিয়া তাহা হইতে বিশ্ব-সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং "মাঝের দরজা খোলা" থাকা সত্ত্বেও সেই অবলম্বন-হীন নিঃসঙ্গতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিতেছে না। রজনীর পুঞ্জমেঘ সকালে দুই একটা অভিমানের অভিনয় করিয়া কাটিয়া গেল, দিবসের জীবন সহজ হইয়া আসিল; কিন্তু নিশীথে আবার সেই মর্ম্মান্তঃপুরের নিগূঢ় বেদনা-মন্থন,বাহিরের অবিরাম ধারাপাত এবং প্রলয় রুদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের গুমরি-ক্রন্দন, এবং আকুল বিদ্রোহ! কমলার এ বিদ্রোহ একটা মিথ্যার কুহকজালকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সত্যে উপনীত হইবার জন্য উদ্যম, মায়া-নিগড়রুদ্ধা প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বক্ষোদেশ হইতে উত্থিত আকাঙ্ক্ষারই মত অন্ধ এবং অপরিস্ফুট। এই বিদ্রোহের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ একটু mystic হইয়াছেন, কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম ব্যক্তিগণের জীবনেতিহাসে আসন্ন ভাবী ঘটনার ছায়াপাতের এই রহস্যময়তা পরীক্ষিত বস্তু-সত্য না হইলেও, অস্বাভাবিক কিম্বা মিথ্যা নহে। কমলার এই নিশীথ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দিবসের মর্ম্মের মাঝেও যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিত তাহা নিশ্চিত, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর সহিত ঘরকন্নার কাজ করিয়া এবং উমেশকে স্নেহ করিয়া কমলা একটি দিবস-রাজ্য গড়িয়া তুলিল, যেখান হইতে রমেশ নির্ব্বাসিত এবং যেখানে "লাউ-ডগা" "টক-পালং" ও "সজ্‌নে-খাড়া"র ভিতর দিয়া রমেশের চিন্তা কখনো উঁকি মারিয়াছে বলিয়া আমাদের মনেই হয় না। সব বিষয়ে রমেশের

অনুগতা রূপেই কমলাকে এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন দেখি রমেশের উপর নির্ভর সে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কাটাইয়া উঠিয়াছে, এবং রমেশের ইচ্ছা বিরুদ্ধে উমেশকে সঙ্গে নিতে এবং চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে গাজিপুরে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করায় তাহার বিদ্রোহের সংযত প্রকাশে আমরা তাহার চিত্তে একটা স্বাধীনতার বিকাশ উপলব্ধি করি।

ষ্টীমারে গৃহিণী কমলারই প্রাধান্য। গাজিপুরে চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে কমলাকে ঘরকন্নার কোনো কাজ করিতে হইত না, এখানে আমরা প্রেমিকা কমলাকেই পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই। ষ্টীমারে নিশীথের বুকে যে মুকুলটি পালিত হইয়াছিল, গাজিপুরের দিবসে তাহা পূর্ণ বিকশিত গোলাপ হইয়া দেখা দিয়াছে—এ গোলাপের প্রত্যেকটি পাপড়ি গন্ধে এবং কোমলতায় মনোহর, বেদনায় "শোণিত-রাঙা।"

কমলার এই চিত্তবিকাশে তিনটি জিনিষ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল,—গার্হস্থ্য অবলম্বনের অভাব, রমেশের বহির্বাটিতে অবস্থান-জনিত তাহার সহিত কমলার পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, এবং সর্ব্বোপরি শৈলর প্রভাব। শৈলর পরিস্ফুট আত্মনিবিড় দাম্পত্য-প্রেমের অভিনয়টা তাহার চোখের সামনে যখন নিয়তই অভিনীত হইতে লাগিল, তখন কমলা তাহাতেও একটা ক্রিয়াচঞ্চল প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিল। শৈলর উজ্জ্বল দাম্পত্য-চিত্র হইতে একটা প্রতিফলিত আলোক-উত্তাপে কমলা অন্তরে অন্তরে এক মুহূর্ত্তে বিকশিত হইয়া উঠিয়া তাহার নব-জাগ্রত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষারাজির নিকট হইতে খবর পাইল যে, তাহাদের দাম্পত্য জীবন কেমন দীন এবং অসংলগ্ন, রমেশের সহিত তাহার অন্তরতম পরিচয়ের পথে কেমন একটা বাধা আছে, রমেশের প্রেম-ব্যবহারে কেমন একটা বিশেষ সীমা আছে, যাহা সে কিছুতেই ছাড়াইয়া আসিতেছে না। গাজিপুরের এই কয়টা দিন কমলার রুদ্ধ অভিমান এবং অশ্রুগর্ভ বেদনার ইতিহাস। এই রুদ্ধ অভিমান-বেদনাকে আমরা এক দিন রমেশের প্রত্যাখ্যানে উদ্দীপ্ত বিদ্রোহে এবং পর ক্ষণেই বাধা-নির্ম্মুক্ত অশ্রুবেগে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম। রমেশের সহিত সহজ মিলনের কোনো উপায় না থাকায় এ অবস্থাটা কমলাতে অনেক দিন ব্যাপিয়া ছিল। এই অবস্থায়ই কমলা তাহার মা নাই, বাপ নাই, তাহার শ্বশুর শাশুড়ী নাই, এই কথা মনে করিয়া মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিল। রমেশকে আত্ম-পরীক্ষা হইতে কিছু অবসর দিবার জন্য যেমনই হউক, কমলাকে পৃথক করিয়া ফুটাইয়া তাহাতে অভিমান জাগাইয়া তুলিবার জন্যই চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে রমেশকে কমলা হইতে অবচ্ছিন্ন রাখার দরকার ছিল। রমেশ যখন সংযমের দৃঢ়তাকে একটু শিথিল করিয়া ভিতর বাটীতে কমলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন কমলার পক্ষ হইতে এই অভিমানাঘাতের খুব প্রয়োজন ছিল। ষ্টীমারে প্রেমিকা কমলা যখন রমেশকে আহ্বান করিয়াছিল তখন রমেশ তাহাকে আপন স্ত্রী নয় জানিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আজ রমেশ যখন দ্বার-প্রান্তে অতিথি তখন কমলা তাহাকে স্বামী জানিয়া অভিমান ছাড়া আর কিছু দ্বারা ফিরাইয়া দিতে পারে না;—অভিমানের প্রয়োজন, কারণ ফিরানো চাই-ই। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় এই দুটি চরিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়াও এমন পাপস্পর্শ-শূন্য রাখার নিপুণতায় আমাদিগকে মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রেমিকা কমলা প্রেমিক রমেশের নিকট হইতে ফিরিয়া আসে, প্রেমিকা কমলা প্রেমিক রমেশকে ফিরাইয়া দেয়,—এক দিকে রমেশের মহত্বের বাধা, আর এক দিকে তাহার নিজের অভিমানের বাধা—প্রেমের ক্ষেত্রে তাহাদের মিলনের উপর বিধাতা এবং সমাজ বজ্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন, এখানে তাহাদের মিলন নাই। গৃহিণী কমলার সহিত গৃহস্বামী রমেশের মিলন সহজ এবং বাধামুক্ত, এখানে এক দিকে অভিমানের আঘাত এবং অন্য দিকে মহত্বের পরীক্ষা নাই;—তাই তাহাদের জন্য নূতন গৃহরচনায় প্রবৃত্ত কমলার সহিত রমেশের স্নিগ্ধ-সরস কথোপকথন চলে; এই ক্ষেত্রে

তাহাদের পরস্পর আদর-যত্ন এবং স্নেহজ্ঞাপন, এই খানেই তাহাদের মিলন। এই মিলনে প্রেম নাই তাহা বলা যায় না, তবে প্রেম এখানে গৃহকে অবলম্বন করিয়া একটা সঙ্কোচহীন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে,—এই ভিন্নতাকে "গৃহিণী" কথার মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করা গেল।

গাজিপুরে বাংলায় গৃহরচনায় কমলা আবার গৃহিণী-রূপে ফুটিয়া উঠিল, কর্ম্মের আনন্দের ভিতর দিয়া তাহার প্রেম প্রকাশের কোনো প্রতিবন্ধক রহিল না। রমেশও গৃহকর্ম্মের মধ্যে কমলার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ হইল এবং প্র্যাক্‌টিসের সমস্ত আয়োজনের জন্য এলাহাবাদ গিয়া কমলাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়াই গাজিপুরে অবস্থান করিবে স্থির করিয়া কমলাকে চিঠি লিখিল। সব দিক দিয়া সব বাধা সরিয়া গিয়াছে—গৃহ এবং প্রেম-জীবনের জন্য পরিপূর্ণ আয়োজন, এমন সময় কমলার নিকট চিঠির একটি ছিন্ন অংশ তাহার জীবনের সমস্ত রহস্যকে ফাঁশ করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে তাহার অতীত জীবন একটা তীব্র আঘাতে আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্তে ছাদের উপরের সন্ধ্যালাপ হইতে এই নূতন গৃহসজ্জা পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল পরমাণুসমষ্টির মত সমস্ত এলোমেলো ঘটনাবলী যেন একটা বাজীকরের মায়াস্পর্শে আপন আপন স্থানে সজ্জিত হইয়া রহস্যহীন প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ পাইয়া উঠিল—সে প্রত্যক্ষতা কি বীভৎস! কি লজ্জাকর! সেখানে বরাবর একটা অনধিকারী পরপুরুষের কাছে সে প্রেম নিবেদন করিয়া আসিয়াছে, আর সেই ব্যক্তি তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শুধু মৌখিক আদরে তাহার প্রতিদান করিয়াছে! এ লজ্জা, এ অপমান সে কি করিয়া ধুইয়া—মুছিয়া ফেলিবে! রমেশ-সম্পর্কিত তাহার সমস্ত অতীত জীবনটা এক মুহূর্ত্তে একটা ভিত্তিহীন মায়ার প্রাসাদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল, জীবনের সেই অতীত অংশ একটা আগন্তুকের মত তাহার অস্তিত্ব হইতে খসিয়া পড়িল। কমলা চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, পর দিন বাংলাগৃহে গেল না। শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ঘর সাজানো শেষ হইয়া গিয়াছে?" কমলা উত্তর করিল "হাঁ, ভাই, শেষ হইয়া গিয়াছে।" 'প্রিয়তমা' সম্বোধন এবং প্রেম-জ্ঞাপনা লইয়া রমেশের চিঠি আসিয়া কমলার হাতে পৌঁছিলে কমলা তাহা পড়িয়া বিষের মত দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্ত্তী বাড়ীতে নাই, যাহাকে তাহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছে সে তাহার স্বামী নয় শৈলকে এ কথা সে কিছুতেই খুলিয়া বলিতে পারিল না; এদিকে আবার পর দিন সকালেই রমেশ দাম্পত্য গৃহবাসের বিভীষিকা লইয়া উপস্থিত হইবে। কমলা শৈলর মেয়ে উমিকে আদর করিয়া ব্রেসলেট দিল, উমেশকে টাকা-কাপড় উপহার দিল, শৈলকে প্রণাম করিল এবং বলিল "তোমাদের নিকট বড় সুখে ছিলাম"—তারপর বাংলাগৃহ-যাত্রার ছলে যে গঙ্গা হইতে তাহার জীবনে মিথ্যার জাল জড়াইয়া গিয়াছিল সেই গঙ্গাতেই রমেশের উপহারদত্ত হারের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ-সম্পর্কিত মিথ্যা জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিল, এবং নৌকা-ডুবির পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের সূত্র ধরিয়া সেখানকার অস্পষ্ট স্পর্শ-পরিচয়ের অভাবে শুধু একটু নাম ও ঠিকানাকে পাথেয় করিয়া সত্যের অভিযানে বাহির হইয়া পড়িল।

কমলার গৃহত্যাগকে তাহার বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আদর্শ হিন্দু পত্নীর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক বলা যায় না, বরং উল্টা এই গৃহত্যাগই তাহার আদর্শ হিন্দু পত্নীর দাবীকেই সপ্রমাণ করিয়া দেয়। কমলার গৃহত্যাগ পাঠকসাধারণের মনের অগ্নি-পরীক্ষা পার হইয়া আসিতে পারিলেও কমলার হঠাৎ রমেশ হইতে মন তুলিয়া লওয়ার ব্যাপারটা তাহা পারে না। কেহ কেহ ইহা হইতেই সমস্ত বইটাকেই অস্বাভাবিক আখ্যা দিয়া থাকেন, কেহ বা এই ব্যাপারটাকে একটা মস্ত মনো-বৈজ্ঞানিক সমস্যা ঠাওরাইয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে বসেন,—কিন্তু খট্‌কা খট্‌কাই থাকিয়া যায়। আসল কথা, খট্‌কা লাগিলেই তাহা ঘুচানো মুস্কিল। কিন্তু খট্‌কা লাগিবেই বা কেন? হিন্দু রমণী স্বামীকে স্বামী বলিয়াই

ভালবাসে, কমলাও রমেশকে সেই ভাবে ভালবাসিয়াছিল। হিন্দু-পত্নীর স্বভাব-সংস্কার কেমন দৃঢ় এবং মজ্জাগত, সেই সংস্কারে আঘাত পড়িলে তাহার অস্তিত্বের মূলদেশেই কেমন নাড়া পড়িয়া যায়, তাহা আমরা বেশ জানি। রমেশের স্বামিত্বের ভিত্তির উপরই কমলার ভালবাসা দাঁড়াইয়া ছিল। সেই ভিত্তিই যখন শূন্যে মিলাইয়া গেল, তখন হঠাৎ তাহার ভালবাসাকে কমলার ফিরাইয়া আনিতে হইল। হিন্দু পত্নীর পক্ষে এত বড় একটা দ্বিতীয় মানসিক বিপ্লব অসম্ভব। রমেশকে কমলা স্বামীর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—এই অজ্ঞানাশ্রিত অবস্থার সুগভীর লজ্জায় এবং রমেশ তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল না বাসিয়া তাহার নিরাশ্রয় দুঃস্থ অবস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া এত দিন শুধু মৌখিক আদর দেখাইয়া আসিয়াছে,কমলার এইরূপ মনে করায় তাহার রমেশ-প্রত্যাখ্যানের নিকটতম কারণ নিহিত আছে। হিন্দু রমণীর পত্নীজীবনে এই বৃহৎ ঘটনার আকস্মিকতায় তাহার চিত্তবেগ যে প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পাইয়া উঠিবে তাহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কমলাও যে রমেশ হইতে শুধু তাহার প্রেম ফিরাইয়া নিয়াছিল তাহা নহে, সে প্রথমে যে রমেশকে একটু বিরুদ্ধভাবে দেখিয়াছিল, একথাও ঠিক।

কিন্তু এ বিরুদ্ধতা তাহার গৃহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কারণ তখনও তাহার রমেশ সম্পর্কিত জীবনের জের টুকু ফুরাইয়া যায় নাই। গৃহত্যাগের পর যে জীবন সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা হইয়া গেল, তাহার প্রতি বিরুদ্ধতার ভাবটাই তখন টিঁকিবে কি করিয়া? মিথ্যার বর্ণচ্ছটা গাজিপুরের সন্ধ্যায় এদিকে বিলীন হইয়া গেল, ওদিকে কাশীর নিশীথে নবীনকালীর গৃহে কমলার সত্য জীবনের দুঃখস্পর্শ অন্ধকারের মত তাহার চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। পথে গৃহে তখন অন্ধকার, চোখেও অন্ধকার জড়াইয়া আসিয়াছে—তবুও কমলা তাহার অন্তরের নিভৃত কোণে যে নামের প্রদীপটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই আলোক বাহিরের একরাশ অন্ধকারকে একেবারে অসহ হইতে দেয় নাই। নবীন-কালীদের বাড়ীতে এক দিন নলিনাক্ষ কমলার নিকটে অরুণের আভাস লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—কমলার হাতের লণ্ঠন কাঁপিয়া উঠিল, তাহার অন্তরের দীপটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিবিয়া গেল—অরুণের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন দীপের আর কোনো প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু বাধা তখনও রহিয়া গিয়াছে, অন্ধকার তখনও কাটে নাই। ধীরে ধীরে উমেশ, চক্রবর্ত্তী, শৈল প্রভৃতি ভোরের পাখীরা পক্ষতাড়নায় বাকী অন্ধকারটুকু তাড়াইয়া দিয়া কলকণ্ঠে আকাশকে মুখর করিয়া তুলিয়া অরুণকে আবাহন করিয়া লইল,—"নলিনী" তখন "আঁখি খুলিয়া" দেখে তাহারি "রবি" তাহারই দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেম-সরস আয়তোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া আছে। আমাদের জগৎপুরলক্ষ্মী কমলাটির সহিত পদ্মপলাশলোচন নলিনাক্ষের মিলন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

স্বামী কমলার ঈপ্সিত। এই ঈপ্সিতলাভের পথে নবীনকালীর গৃহে আমরা কমলার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং শত নির্য্যাতনের মধ্যেও তাহার অবিদ্রোহীভাব দেখিতে পাই; দেখিতে পাই, সেই বাড়ীর ভৃত্যেরাও কর্ত্তা-গৃহিণীর বিরুদ্ধে গিয়া এই বামুনঠাকুরুণ কমলার কেমন বশ। নিরুদ্দিষ্ট অপরিচিত স্বামীর প্রতি হিন্দু পত্নী কমলার পূর্ব্বেই 'ভক্তিপ্রেম' ছিল, তবে নবীনকালীদের বাড়ীতে নলিনাক্ষের মত এমন "সৌম্যসুন্দর দেবতার মত" স্বামীকে দেখিয়াই কমলার প্রথম 'অনুরাগ' হইয়াছিল এ কথা ঠিক। হরিদাসীরূপে নলিনাক্ষদের বাড়ীতে আসিয়াই কমলা তাহার লক্ষ্মীর মত মুখ ও লক্ষ্মীর মত সেবা ও গিন্নিপনা দ্বারা নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমঙ্করীকে বশ করিয়া লইল। বশ করিবার মন্ত্র তাহার বেশ জানা আছে, তাহার সংস্পর্শে যে আসে সেই তাহার পরিচয় না পাইয়া যায় না; খুড়ো চক্রবর্ত্তী পাইয়াছিলেন ও উমেশ পাইয়াছিল, গাজিপুরে সখী এবং দিদি শৈলজা ও উমি পাইয়াছিল, হেমনলিনীর মত এত বড় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর স্মৃতির কবচ আঁটিয়াও

রমেশ সেই মন্ত্রবাণ হইতে রক্ষা পায় নাই; এই মন্ত্রে শিক্ষিতা হেমনলিনী তাহার চিত্তকে কমলার স্নেহে ধরিয়া দিয়াছিল, আর স্বয়ং ওঝা স্বামী নলিনাক্ষের সাত্ত্বিকতা ভেদ করিয়া তাঁহার ভিতরেও এ মন্ত্র কেমন কাজ করিয়াছিল, তাহা আমরা নলিনাক্ষের চরিত্র-বিশ্লেষণে দেখিতে পাইব। কমলার এত বড় শক্তি, সে ইচ্ছা করিয়া কখনো শক্তি খাটায় না। তাহার আজন্ম দুঃখকষ্টের গুণে সে তাহার আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করিতে শিখিয়াছে, মিলনের প্রধান সহায় দীনতা তাহার অন্তরের চির অলঙ্কার: বহুদিনব্যাপী দুর্ভিক্ষের পর আসন্ন ভোজের কাছেও তাহার সংযম অসাধারণ, নলিনাক্ষকে শুধু দেখা এবং সেবার অধিকারেই তাহার সন্তোষ অপরিমিত। দুঃখের ভিতর দিয়া কমলা আসিয়াছে, অন্যের দুঃখকে আপনার বলিয়া অনুভব করিতে সে জানে,—বিদায়ের বেলা হেমনলিনীর বিষণ্ণ-মলিনতার জন্য তাহার প্রতি কমলার তীব্র সহানুভূতির ভিতর দিয়াই আমরা বেদনা অনুভব করি। রমেশের সহিত কমলার শেষ-বিদায়ে রমেশের জন্য কমলার কোনো দুঃখপ্রকাশ আমরা দেখি না। কিন্তু নলিনাক্ষের সহিত কমলার মিলনের অন্তরায় রমেশ যখন সীমাহীনতায় নিঃশেষে হারাইয়া গিয়াছে, নলিনাক্ষ ও কমলার মিলন যখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন কমলার দাম্পত্য জীবনের সেই গোপন অধ্যায়ের মর্ম্মদেশে হেমনলিনীর সহিত এই পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয়া যুবকটিরও সকরুণ স্মৃতি, ভক্তি ও স্নেহ-অশ্রুর সজলতায় চিরদিন অভিসিঞ্চিত আছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা অনুভব করিতে পারি।

হেমনলিনী ও কমলা।

হেমনলিনী আচারে, ব্যবহারে এবং কথায় কতকটা প্রচ্ছন্ন। রমণী সমাজের সহিত যথেষ্ট মেলামেশার অভাব, তাহার উন্নত দৃঢ় হৃদয়, এবং উচ্চ শিক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। কমলার মধ্যে যে একটু প্রচ্ছন্নতা নাই তাহা নহে, এই প্রচ্ছন্নতা তাহার জটিল জীবন-সমস্যা হইতে উদ্ভূত। তবে মূলে কমলা-চরিত্র সরল এবং প্রকাশধর্ম্মী; তাহার অশিক্ষিত সারল্য দোষের নহে বরং সুন্দর এবং মধুর। শিক্ষিতা হেমের সহিত অল্প পরিচয়েই তাহাকে আমরা দৃঢ়চিত্তা বলিয়া অনুভব করিতে পারি; অশিক্ষিতা কমলার দৃঢ়চিত্ততা বাহিরে সচরাচর প্রকাশ পায় না, কিন্তু বড় প্রয়োজনের ডাকে দেখা দেয়। হেমের হাস্যালাপ এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আমরা উপভোগ করি, কমলার হাসি এবং সরল প্রয়োজনের আলাপও কিছুমাত্র কম উপভোগ করি না। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত স্বাধীন প্রেম এবং হিন্দু সমাজের নির্ভরশীল দাম্পত্য প্রেম, ব্রাহ্ম হেমনলিনী ও হিন্দু কমলা স্ব স্ব স্থানে উভয়ই প্রধান, বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে মণ্ডিত। তবু সব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কমলাকেই আমরা বেশী পরিণত বলিতে বাধ্য। কমলা-চরিত্রের বিচিত্রতা হেমে নাই। কমলার হৃদয় হীরকখণ্ডের মত তার বিভিন্ন দিক দিয়া সরল ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। হেমনলিনী অনেক দিক দিয়া প্রচ্ছন্ন, ফুটিয়াছে শুধু কন্যা এবং প্রেমিকা রূপে। কমলা কন্যারূপে ফুটিয়াছে চক্রবর্ত্তী এবং ক্ষেমঙ্করীর কাছে। হেমের পূর্ব্বরাগ কমলাতেও আছে, কমলার দাম্পত্য চিত্র হেমে নাই অথবা অঙ্কিত হইবার অবকাশ ঘটে নাই। চা বিতরণে হেমের সেবা-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ক্লুহিত-মুড়োর সেবাপরায়ণতার কাছে তাহা টিঁকিতে পারে না। হেম সংসারের ভারের কথা ভাবিলে ভয় পায়, কমলা পাকা গৃহিণী। উমেশ এবং উমিতে মিলিয়া কমলার মাতৃত্বের দিক বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, চাকরদের সঙ্গে তাহার ব্যবহারে অনুগতবাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়; হেমে এসব দিক আদৌ নাই। হেম সজ্ঞানে উচ্চ চিন্তা করে, অনেকটা শিক্ষার ভিতর দিয়াই জীবনের অভিজ্ঞতা আদায় করিয়া লয়; কমলা অজ্ঞান ভাবেই সমস্ত হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে। হেমনলিনী বাহিরের শিক্ষার ভিতর দিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই তাহাকে ধীরে ধীরে পথ কাটিয়া লইতে হয়, এবং প্রেমিকারূপেই এই পুস্তকে অথবা এই জীবনে তাহাকে থামিতে হইয়াছে;

আর কমলা আপন অন্তরের ধ্রুবতায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এক মুহূর্ত্তে প্রেমিকা, পত্নী, এবং মাতারূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছে। তবে কমলাকে কমলার এবং হেমনলিনীকে হেমনলিনীর পথ দিয়াই আসিতে হইবে।

হিন্দু পত্নীর আদর্শ চিত্রণে এবং তাহাদের গৃহত্যাগে সূর্য্যমুখী ও কমলার সাদৃশ্য আছে। তবে কমলাতে

সূর্য্যমুখী ও কমলা।

অভিনব জীবন-সমস্যা এবং নিপুণ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া হিন্দু দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শটা এমনই সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সূর্য্যমুখীতে কিম্বা অন্য কোনো চরিত্রে তাহা হয় নাই, হইবার সুযোগ ঘটে নাই, অথবা ঘটানো হয় নাই। অসামান্য সরলতা ও উন্নত সহজ জ্ঞান, হিন্দু বালিকাপত্নীর স্বভাব-দুর্ব্বলতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা, ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বালিকার প্রথম প্রেমস্ফুরণ ও বয়স্থা গৃহিনীর সেবাপরায়ণতা, কন্যার ভক্তিস্নেহ, এবং মাতার মাতৃত্ব, ইত্যাদি বিরুদ্ধ এবং বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে কমলা-চরিত্র যেমন মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী, সূর্য্যমুখী সেরূপ নহে। আদর্শ হিসাবে সূর্য্যমুখী কমলা-চরিত্রের সমকক্ষ হইলেও প্রাত্যহিক জীবনচিত্রণে সূর্য্যমুখী অনেক খাটো। কমলা-চরিত্রে প্রতিদিন এবং চিরদিন, সংসার এবং আদর্শ এ দু'টা দিকই এমন সুন্দর ভাবে মিশিয়াছে যে, তাহা আমাদের বেশী সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কমলাতে বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আদর্শের এককে পাই বলিয়াই আমাদিগকে বেশী মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রথম জীবনে আশা ও কমলার পিতৃমাতৃহীন পর-গৃহবাস, সারল্য, স্নিগ্ধতা এবং সতীমাহাত্ম্যে তাহাদের

আশা ও কমলা।

সাদৃশ্য আছে। তবে কমলায় আশার পরিণতি। আশা অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া গৃহিণীরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, কমলাতে জন্মিয়া তাই প্রথমেই সে গৃহিণী-রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব জন্মে তাহার মুখে কথা নাই, পরজন্মে বেশ ফুটিয়াছে পূর্ব্বজন্মে ঘোমটায় মুখ ঢাকা, পরজন্মে ঘোমটা মাথায় উঠিয়াছে, লজ্জা সঙ্কোচও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে ; পূর্ব্ব জন্মে সে সংকীর্ণতায় সরল, পর জন্মে বিরুদ্ধতা ও বিচিত্রতার সম্মিলনে সরল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

সন্ধ্যামালতী

শৈশবে ঘুরিত যবে হে শঙ্খ, তোমার তীরে তীরে
বাতুল বালক এক মনাবেগে অজানা খুঁজিয়া,
ঘুরিতে বনানী-পথে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সমীরে
গহনের দেশ হতে গন্ধ এক আসিত বহিয়া!

অজানা ফুলের গন্ধ, অজানা নিকুঞ্জতল হ'তে!
কত খুঁজি কত ঘুরি পাইত না যাহার সন্ধান!
ভুলে' ভুলে' ভাবিত সে, আসে গন্ধ তব বক্ষ হ'তে—
'আছে' শুধু এই মাত্র প্রাণে যার আভাসে প্রমাণ।

কোথায় নিকুঞ্জ-বক্ষে ক্ষুদ্র ফুল আঁধার আগারে
বিন্দু হতে তুলিয়াছে পরিব্যাপ্ত গন্ধের ফোয়ারা—
খুঁজিত আকুল হয়ে তন্ন তন্ন গোধুলি আঁধারে—
প্রাণেরে জাগা'তে চাহে, ব্যক্তরূপে নাহি দিত ধরা।

খুঁজিত বৃক্ষের ব্যূহে—জাগে যারা নিদ্রার মাঝারে ;
নির্ব্বাক নিশ্চল, তবু অন্তঃপুরে আছে যার প্রাণ!
খুঁজিত পল্লব-কুঞ্জে—চিরকাল নিযুক্ত যেন রে
দীর্ঘ নিশ্বাসিতে যারা, জন্মেনি করিতে কভু গান!

খুঁজিত শিখরে, শৈলে, পাষাণের স্তূপে সমুচ্চয়ে,
অচৈতন্য মাঝে তবু দেয় যারা চিত্ত-পরিচয়,
অচল বাড়িতে থাকে—কত মধু শিশুর বিস্ময়ে!
কি মিষ্ট সে ঘোরাঘুরি পুরী যার নিত্য দূরে রয়।

আজি এই এত দূরে যৌবনের মধ্যাহ্ণ-প্রকাশে
হিয়া শুধু দহে যাহে, বিন্দুমাত্র করে না উজ্জ্বল!
কোথা হ'তে আসে ভাসি—বাতাসে,কি ভাবের আবেশে!
পুরাণ সে পরিচিত মনোমথ গুপ্ত পরিমল।

মনে হয়, শঙ্খ-তীরে সে শৈশবে মজিতাম যাতে
বস্তু সে ছিল না কভু—স্বপনের অমৃত-আভাস!
মনে হয়, ওতপ্রোত মিশে গেছে শৈশবের সাথে!
শৈশবেরি গন্ধ তাহা. আত্মা-পুরে উৎসব উচ্ছ্বাস!

সে সন্ধ্যামালতী মম, নিবাসিনী সন্ধ্যার অন্তরে!
ছায়া আর আলো যবে পরস্পরে মজি' একাকার!
দুরাশার দাব-দগ্ধ এ জীবন-মরুর প্রান্তরে
সন্ধ্যামালতীরে মম পাব কোথা—পাইব কি আর!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

শৈব ধর্ম্মের ইতিহাস

বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগারম্ভ-কাল ধরা হয়, কিন্তু এই উভয় যুগের মধ্যে বিভাগ-সূচক রেখাপাতের সম্ভাবনা নাই। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ধীরপদবিক্ষেপে পৌরাণিক শিশুর আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং ক্রমে বৰ্দ্ধিত ও পৌরাণিক মূর্ত্তিতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে শিব-পূজা ও শৈবগণের আবির্ভাব এই প্রকার বৈদিক যুগাবসানের পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে। প্রথমে যে ভাবে শিব মানব-হৃদয় অধিকার করেন, পরবর্ত্তী কালে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

বৈদিক যুগে শৈব প্রভাব।

পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত বৈদিকগণ শিব-দেবতাকে প্রথমে রুদ্ররূপে এবং মরুদ্‌গণের পিতা বলিয়া স্থির করেন। ক্রমে কালী, করালী, দুর্গা নামক অগ্নিশিখাগুলি রুদ্রপত্নী বা শিব-ভার্য্যার পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে রামায়ণী যুগের আবির্ভাব-কাল উপস্থিত হইলে শিব মূর্ত্তিমান্ সংসারী মানবের ন্যায় কল্পিত হন। মধু ও লবণ দৈত্য হইলেও পরম শৈব। লঙ্কেশ্বর রাবণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং শক্তির উপাসনা করিতেন। 'রামেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক শক্তি-আরাধনা যদি সত্য হয়, তবে শৈব ধর্ম্ম যে কত পুরাতন তাহা উপলব্ধি হইবে। *

রামায়ণে শৈবধর্ম্মের প্রভাব।

শৈব-ধর্ম্মের ও শিব-শক্তির প্রসঙ্গ রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে অধিক। কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি রাজন্যগণ বৈদিকাচারী হইলেও শৈব ছিলেন। পাণ্ডব-শিবির-রক্ষা এবং কিরাত-বেশধারী শিবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও পাশুপাতাস্ত্রলাভ শৈব ধর্ম্মের পরিচায়ক।

মহাভারতে শৈব প্রভাব।

মিলিন্দের (Menander) প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুষ্পমিত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ইহার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

শুঙ্গবংশ ও শৈব ধর্ম্ম। (১৮৪ খৃঃ পূঃ)

সেই সময়ে শৈব ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। ২৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কাণ্ব বংশের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল।

কাণ্ববংশ ও শৈব প্রভাব। ১২ খৃঃ পূঃ

কদপীস্ শিবপূজা প্রচারার্থে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শিবপূজা করিতেন। তাহার মুদ্রায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল।

কদপীস (Kadphises). ১০ খৃঃ।

শিব শ্রী (মৎস্য পুরাণ) ১৩০ খৃষ্টাব্দে এবং শিবস্কন্দ শতকর্ণা (মৎস্য) ১১৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহারা শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

শিবশ্রী, শিবস্কন্দ ও শৈব প্রভাব। ১১০ খৃঃ।

* রামায়ণে রামের শক্তি-আরাধনার প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পুরাণাদিতে শক্তি-পূজার প্রসঙ্গ আছে।

শক রাজগণ পরম মাহেশ্বর বলিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে। সেই সময়ে শৈব ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজগণ পরম মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সাতিশয় হীনভাব ধারণ করে। চন্দ্রগুপ্ত (২য়) বিক্রমাদিত্যের সময়ে শৈব ধর্ম্মের প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। স্কন্দগুপ্তের সময় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি সৌর ও শৈব ধর্ম্মেও অনুরাগী ছিলেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে শৈব ও বিষ্ণুপূজকগণের একতা সম্পাদিত হয়। হরিহর মূর্ত্তির পূজা সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুণ্ড্র দেশে স্কন্দ-গোবিন্দের পূজার প্রচলন এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে।

গুপ্তরাজগণও শৈব প্রভাব।
৪৫৫-৬০১ খৃ।

হরিহর সম্মিলন।

"স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্তরাজবংশধর মাতৃকা বা শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে শক্তি ভিন্ন কেহ শিব পূজা করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়। গুপ্তরাজগণের সময়ে কণোজাধিপতি পরম মাহেশ্বর হর্ষদেবের যত্নে মথুরা মণ্ডলে বহুতর শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।" *

গৌড়মণ্ডলে গুপ্তরাজ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ।

বর্ত্তমান মালদহের পাণ্ডুয়া নামক প্রাচীন স্থানে গুপ্তরাজগণের বহু নিদর্শন ও হরগৌরী (বাভ্রবীকায়া) মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে মালদহের প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত বনভূমে যে সমুদায় দেবদেবীর মূর্ত্তি (বিষ্ণু, ভবানী, কালী) বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার উপরিস্থ "শ্রীমুখ" চিহ্ন দর্শনে কোনগুলি গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহা অবগত হওয়া যায়।

'তোরামন' মহারাজের সহিত বঙ্গের বিশেষ কোন সম্বন্ধ বর্ত্তমান না থাকিলেও তিনি শৈবধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান ছিলেন বলিয়া এ স্থলে তাহার নামোল্লেখ করা হইল।

তোরামন রাজ ও শৈব ধর্ম্ম। (৫০০ খৃঃ)।

শ্রীহর্ষদেবের সময় শৈব প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ-উৎসবের সহিত উৎসব আমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষবর্দ্ধন ও শৈব প্রভাব
৬০৬-৬৪৮ খৃঃ।

গৌড়ের দক্ষিণস্থ উত্তর রাঢ়ে শশাঙ্কনরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক জন শৈবধর্ম্মাবলম্বী নরপতি ছিলেন। সেই সময়ে গৌড়ের কিয়দংশ ও রাঢ় মণ্ডলে শৈব প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শশাঙ্ক গয়াস্থ বোধি-তরু কর্ত্তন এবং তথায় শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নম্বরি গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের প্রদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। *

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব।
শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্ত
(৬৬৬ খৃঃ)।

শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য কেবল যে শৈব ধর্ম্ম পুনঃ প্রচার ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আমূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠে বোধ হয় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনাশ করিতে হইলে কেবল শৈব ধর্ম্ম প্রচার করিলে চলিবে না। তৎকালে ভারতে বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতার আরাধনাও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মোপাসকগণের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব দূরীকরণাভিপ্রায়ে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তিনি শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থ আজ্ঞা প্রদান করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশার্থ শঙ্করাচার্য্যের কৌশল।

* ব্রজ পরিক্রমা—ব্রজের পুরাবৃত্ত ১/০ পৃষ্ঠা।

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—২য় সংখ্যা, সন ১৩১৫—শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

মাধবাচার্য্যের শঙ্কর-দিগ্বিজয় অনুসারে, শঙ্করাচার্য্য অঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড়দেশীয় নাস্তিক (বৌদ্ধ) মণ্ডলীকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং গৌড় নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গৌড় দেশে শৈব ধর্ম্ম প্রবল হয়। শঙ্করাচার্য্য বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন, এবং বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলনের উদ্দেশে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস বাসনায় শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোষি মঠ সংস্থাপন করেন। যেখানে বৌদ্ধ মতের প্রাদুর্ভাব এবং প্রচার-কেন্দ্র ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নব মতের প্রচলন করেন। তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির উপাসনা প্রচারে উদ্যত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া ও তত্রত্য পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেব-দেবীর উপাসনা প্রচার করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য 'পরমত কালানল' অশেষরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈব মতাবলম্বী করিতে থাকেন। ত্রিপুরকুমার দ্বারা শাক্ত মত ও বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী পীঠে অধিষ্ঠিত হন। শঙ্কর তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ-প্রধান স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মঠ প্রতিষ্ঠা।

ত্রিপুরকুমার শাক্ত মত ও বটুকনাথ ভৈরব উপাসনা প্রচার করেন।

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্কর-শিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত। বেদান্তানুমত তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন শঙ্কর-শিষ্যগণের মূল ধর্ম্ম হইলেও ইহারা তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শৈব মতানুবর্ত্তী বহু শাখা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীরা (দিগম্বর) বড়ই ভীষণ। তাহারা গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোদ্ধা। ইহারা বিভূতিরাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়া রাখে এবং গিরিমৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে। ‡

শৈবপন্থী নাগা।

পুণ্ড্র, গৌড় বঙ্গাদি দেশে শৈব ধর্ম্ম অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন শিবলিঙ্গ, বিবিধ শিবশক্তির পাষাণ ও ধাতুময় মূর্ত্তিসমূহ তাহার প্রমাণ প্রদানার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গৌড়ে শৈব ধর্ম্ম অতীব প্রবল ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। +

ধর্ম্মাদিত্য ও শৈব প্রভাব।

ব্রহ্মপুরাণানুসারে বর্ত্তমান ভুবনেশ্বর তীর্থের নাম একাম্র কানন। উৎকলরাজ ললিত কেশরী ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড় ও উৎকলে তখন শৈব প্রভাব বিদ্যমান ছিল। *

৬৫৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে শৈব প্রভাব।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়ে আগমন করেন, তখন পুণ্ড্র রাজধানীতে কার্ত্তিকেয় নিকেতন দেখিয়া

৭৫৪ ৭৬৮ খৃঃ শৈব প্রভাব—রাজতরঙ্গিণী।

‡ হরিদ্বারে এই নাগা সন্ন্যাসীগণ বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণবধ করে।—ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়, শৈবধর্ম্ম।

+ ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসন দেখিয়া বুঝা যায় এই সময়ে (খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে) গৌড়ে শৈব ধর্ম্মের সবিশেষ বিস্তার ছিল। Indian Antiquary, Vol. XXI, P. 43.

* Account of Orissa proper, or Cuttack.

ছিলেন। স্কন্দগোবিন্দ ইত্যাদি শৈব প্রভাবের পরিণতি মাত্র।

শূরবংশীয় নৃপতিগণের সময় পৌণ্ড্র-গৌড়ে পৌরাণিক মতবাদের সহিত বৈদিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কণৌজাগত ব্রাহ্মণগণ গৌড়-ভূমে বাস করিতেন, এবং পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচার করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে-পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণ করিয়া নাম মাত্র বৌদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু শৈবাদি ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

নামি-কো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'ফার্ণ' সংগ্রহ

ইকাও হইতে মিজুসাওয়া যাইবার পথ দীর্ঘে প্রায় তিন মাইল হইবে। তৃণগুল্মহীন পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া রাস্তাটি সাপের মত আঁকিয়া বাকিয়া গিয়াছে: কেবল এক স্থানে উহা একটা উপত্যকার মধ্যে ডুব দিয়াছে. অন্য স্থানে একটা কন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হইয়াছে। নিম্নে ও পশ্চাতে যোমোর সমতল ভূমি প্রসারিত। পথের দক্ষিণে ও বামে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। যখন বিগত বৎসরের পোড়া ঘাস ও আগাছার ভস্মে কৃষ্ণবর্ণ ভূমির উপর বসন্তসমাগমে কচি ঘাস ও বিচিত্রবর্ণ পত্রপুষ্প মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়. মনে হয় যেন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত একখানা গালিচা বিছান রহিয়াছে। প্রকৃতি-প্রেমিকের নিকট এমন স্থানে দীর্ঘ বসন্তের দিনও নিতান্ত ছোট বলিয়া বোধ হয়।

রৌদ্রালোকিত বৈকাল বেলায় এক দিন তাকেও ও নামি ইকু ও অন্য একটি পরিচারিকা সমভিব্যাহারে কচি 'ফার্ণ' সংগ্রহ মানসে এখানে আসিয়াছিল। কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য তাহারা একটি সুন্দর স্থান নির্ব্বাচিত করিল। পরিচারিকা সেখানে একখানি কম্বল বিছাইলে তাকেও ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। নামি কিন্তু খড়ের চটি খুলিয়া রাখিয়া গোলাপী রঙের রুমাল দিয়া 'কিমোনো' আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে বসিল ও কহিল, "কেমন নরম! এমন শয্যা রাজার উপযুক্ত।'

"কুমারী—মাপ করুন—গিন্নী, তোমায় আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক দিন তোমায় এমন গান গাইতে শুনি নি।" এই কথা বলিয়া পুলকোজ্জ্বল চোখে ইকু তাহার মুখ পানে চাহিল।

"আজ অনেক গান গেয়েচি, বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।" পরিচারিকা কহিল. "চা আনা হয় নি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে।" একটি পুঁটুলি খুলিয়া সে কমলা লেবু, কেক্. 'সুষি' প্রভৃতি বাহির করিল।

"কমলা লেবুতেই হবে।" এই বলিয়া একটি লেবু ছাড়াইয়া তাকেও কহিল. "নামি-সান্.* তুমি এমন ছাড়াতে পার না, পার কি?"

"পারি না ত কি? নিশ্চয়ই পারি।"

পরিচারিকা কহিল. "কর্ত্তা আপনি যা 'ফার্ণ' তুলেচেন তা'তে যে অনেক আগাছা।"

"সাবধান! অন্যের দোষ দেখিয়ে নিজের দোষ ঢাক্বার চেষ্টা করচো," তাকেও কহিল। "কি সুন্দর দিন! ভারি আনন্দ হচ্ছে।"

"বাস্তবিকই বড় সুন্দর আকাশ! যেন মেয়েদের পোষাকের জন্য সুন্দর একখানা কাপড় রয়েছে" নামি কহিল. "হয়ত নাবিকের কোর্ত্তা তার চেয়েও ভাল হয়, কেমন?"

---

* 'সান্', 'সামা'. 'কুন্' একই অর্থবাচক। ইহাদের অর্থ 'মহাশয়' 'মহাশয়া' 'কুমারী' ইত্যাদি। 'কুন্' কেবল মাত্র সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। ভৃত্য প্রভুকে সম্বোধন করিবার সময় 'সামা' বলে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শিষ্ট সম্বোধন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সম্বোধন করিবার সময় অনেক সময় 'সান্' ব্যবহার করেন।

"সমস্ত জিনিসে কেমন সুন্দর গন্ধ! ঐ শোন, ভরত পাখী ডাক্‌চে।"

"আমার খুব খাওয়া হয়েচে। আবার কাজ আরম্ভ করা যাক্‌, কি বল মাৎসু?" বৃদ্ধা ধাত্রী পরিচারিকাকে বলিল। তার পর উভয়ে আরও 'ফার্ণ' সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

"কতকগুলো 'ফার্ণ' রেখে দাও, ভুলো না। নামি-সান্ তার বয়সের পক্ষে খুব চঞ্চল, না?"

"ঠিক কথা।"

"নামি-সান্, ক্লান্তিবোধ কর্‌চ না?"

"না আজকে একেবারেই না। আমার মনে হচ্ছে এত আনন্দ কখন পাই নি।"

"সমুদ্রে সুন্দর দৃশ্য অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু উঁচু পাহাড় থেকে এই যে ভূতল-দৃশ্য এ বড় সুন্দর। বেশ তোমার আরাম হচ্ছে, না? নীচে বাঁ দিকে শাদা উজ্জ্বল একটা দেওয়াল দেখ্‌তে পাচ্ছ? ঐটে খিবুকাওয়া, ওঠ্‌বার সময় যেখানে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলুম। আর এই দিকে নীল ফিতের মত একটা কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? ওটা হচ্ছে তোনে নদী। দেখ্‌তে পাচ্ছ, কেমন? তার পর আকাগি পাহাড়ের ঢালু পার্শ্বদেশের ওধারে দেখ, ঐ যেখানে ধোঁয়া উঠ্‌চে—নীচে কারা যেন বসবাস কর্‌চে বলে বোধ হচ্ছে। ঐটি হচ্ছে মায়েবাসী নগর। ঐ দূরে রূপার সুতার মত ওটা কি? ওটিও তোনে নদী। আরো দূরে তুমি দেখতে পাচ্ছ না: ভারী ধোঁয়াটে। আমাদের একটা দুরবীন্ আনা উচিত ছিল, কি বল নামি-সান্? হয়ত ঐ অস্পষ্ট ধোঁয়াটে পিছনের দৃশ্যটাই বেশী সুন্দর।"

তাকেওর হাঁটুর উপর হস্ত স্থাপন করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নামি কহিল, "তোমার সঙ্গে যদি এখানে চিরকাল থাক্‌তে পারতুম!"

দুইটা সোনালী প্রজাপতি দেখা দিল; তারা নামির কম্পিত অঞ্চল স্পর্শ করিয়া উড়িয়া গেল। সেই ক্ষণে ঘাসের উপরে পদশব্দের মত একটা খস্ খস্ শব্দ শুনা গেল এবং হঠাৎ প্রেমিক যুগলের সম্মুখে বক্রভাবে একটা ছায়া পড়িল।

"তাকেও-সান্!"

"এই যে চিজিওয়া-কুন্! এখানে আমাদের খুঁজে পেলে কেমন করে?"

নবাগতের বয়স প্রায় ছাব্বিশ হইবে, লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাকে সজ্জিত। যুবকের আকৃতি অতি সুদর্শন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার মুখ রৌদ্রদগ্ধ নয়। কিন্তু যুবকের মুখে এমন একটা কিছু ছিল যাহাতে তাহার মুখ শ্রীভ্রষ্ট বোধ হইতেছিল। তাহার মুখে একটা কেমন-ধারা বিদ্রূপের ভাব, আর গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষুর একটা অপ্রীতিকর চাহনি। যুবকের নাম য়াসুহিকো চিজিওয়া, সম্পর্কে তাকেওর ভ্রাতা; এবং তাহার অপেক্ষা নিম্নপদস্থ হইলেও সে সদরের এক জন যোগ্যতম কর্ম্মচারী।

"তুমি এখানে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ, কেমন? তাকাশাকিতে একটু কাজ ছিল। সেখানেই কাল রাত কাটিয়েছি। আজ সকালে খিবুকাওয়া গিয়েছিলুম সেখানে শুনলুম ইকাও বেশী দূর নয়। তাই এই পথে এসে হোটেলে খোঁজ করে জানলুম তোমরা ফার্ণ সংগ্রহে বেড়িয়েছ। এই প্রকারে এখানে এসে হাজির হয়েছি। কালকেই কিন্তু আমার ফিরতে হবে। তোমাদের বিরক্ত করচি না ত?"

"না, না কিছু না। মার সঙ্গে দেখা করেছিলে না কি?"

"হ্যাঁ, কাল সকালে করেছিলুম। তাঁকে বেশ ভালোই দেখ্‌লুম। কিন্তু তোমার ফেরার জন্য তিনি খুব ভাবচেন্ বলে বোধ হল।" নামির মুখের উপর গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষুর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিজিওয়া কহিল, "আকাশাকায় তোমাদের বাড়ীর সকলেও ভাল আছেন।"

কিছুক্ষণ হইতে নামির মুখ রক্তিম হইতেছিল, এবার তাহার মুখ আরো রক্তিম হইয়া উঠিল; সে মুখ নত করিল।

তাকেও কহিল, "দেখ, এই বার আমার বলবৃদ্ধি হয়েচে, আর আমায় হারায় কে? নৌ-সেনা আর স্থল-সেনার সংযোগ। হাজার বীর রমণী এলেও আমাদের এখন হারাতে পারবে না।" সেইক্ষণে প্রত্যাগত ধাত্রী ও পরিচারিকাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই এরা, আমি যখন একলা ছিলুম, আমায় দোষ দিচ্ছিল : বলছিল আমি ওদের মত অধিক পরিমাণ 'ফার্ণ' সংগ্রহ করতে পারি নি, আমি ফার্ণের বদলে আগাছা সংগ্রহ কর্চ্ছিলুম।"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "চিজিওয়া-সামা, তুমি এখানে? কি আশ্চর্য্য?"

"কিছুক্ষণ আগে নূতন সৈন্যের জন্য ওঁর কাছে তার পাঠিয়েছিলুম", তাকেও কহিল।

"আপনি ঠাট্টা কর্‌চেন" ইকু কহিল। "সত্যি পাঠিয়েছিলেন না কি? আপনি তা হলে কাল ফিরচেন?

"হ্যাঁ, ফেরবার কথায় মনে পড়ে গেল, খাবারের জোগাড় করবার জন্য আমাদের আপনাদের আগেই ফিরতে হবে।"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তাই কর। চিজিওয়া-কুন্ আমাদের সঙ্গে রাত্রে আহার করবেন, ভালো কিছু তৈরি করে রাখবে। দেখতে পাবে আমাদের নেকড়ে বাঘের মত ক্ষিদে পেয়েছে। কি, তুমিও যাচ্ছ নাকি নামিসান্? তুমি আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার দলবলের সঙ্গে যাবার চেষ্টা নাকি? চিন্তা নেই। আমরা তোমাকে বিরক্ত করব না।"

নামি 'না' বলিতে পারিল না। ইকু ও পরিচারিকা সব জিনিসপত্রগুলি একটা পুঁটলিতে বাঁধিয়া রওয়ানা হইল।

তিন জনে আবার 'ফার্ণ' সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। তখনো বেলা ছিল, তাই তাহারা পাহাড় হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে মিজুখাওয়া পর্য্যন্ত গেল।

মোনোকিকি পাহাড়ের ধার সন্ধ্যা-সূর্য্য-দীপ্ত উজ্জল কিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। পথের বামে দক্ষিণে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি সেই সোনার কিরণ বুকে ধরিয়া একখানা আগুনের চাদরের মত জ্বলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সঙ্গীহীন দেবদারু তার দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। দূরে, বহু দূরে পাহাড়গুলি আলোক-বন্যায় ভাসিতেছিল; তাহাদের পাদদেশস্থিত গ্রামের বহু উনান হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল। গরুগুলি মন্থরগামী চালকের তাড়নে ডাকিতেছে; তাহাদের হাম্বারবে শব্দহীন সন্ধ্যা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

কথোপকথন করিতে করিতে তাকেও ও চিজিওয়া আগে আগে চলিয়াছে, নামি তাহাদের পশ্চাতে যাইতেছে। তিন জনে ধীর পদ-বিক্ষেপে চলিয়া নিম্ন ভূমি অতিক্রম করিয়া, সূর্য্যালোকিত উর্দ্ধগামী পথের নিকটবর্ত্তী হইল।

হঠাৎ তাকেও থামিল।

"যাঃ চ'লে! ছড়িগাছা ফেলে এসেচি। ফেরবার সময় যেখানে খানিক ক্ষণ জিরিয়েছিলুম, সেখানে। একটু দাঁড়াও, নিয়ে আস্‌চি।"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব," নামি কহিল।

"না তুমি দাঁড়াও। বেশী দূর নয়, দৌড়ে যাচ্ছি।"

তাকেওর কথায় নামি থাকিতে বাধ্য হইল বলিলেই হয়; ফার্ণের গোছা ভূমিতে ফেলিয়া তাকেও দ্রুতপদে নিম্ন ভূমিতে নামিয়া গেল।

তাকেও চলিয়া গেলে নামি চিজিওয়ার নিকট হইতে কয়েক পদ দূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিম্নভূমির পর পারে পাহাড়ের উপর তাকেওর চেহারা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, মোড় ফিরিলে তাহাও অবিলম্বে অদৃশ্য হইল।

"নামিকো-সান্!"

নামি মুখ ফিরাইয়া ছিল, এরূপ পরিচিতভাবে আহূত হইয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

নিকটে আসিয়া চিজিওয়া পুনরায় ডাকিল, "নামিকো-সান্!"

নামি দু' এক পদ পিছাইয়া গেল; কিন্তু বাধ্য হইয়া মুখ তুলিয়া সেই গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষু দ্বয়ের একদৃষ্টে চাহনি দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইল।

"আমি তোমায় অভিনন্দন কর্‌চি!"

সে নীরব রহিল; তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

"আমি তোমায় অভিনন্দন কর্‌চি! তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী।" "কিন্তু." ঘৃণার স্বরে সে কহিল. "তুমি জান. এক জন সুখী নয়।"

ভূমির উপর চক্ষু ন্যস্ত করিয়া নামি দাঁড়াইয়া রহিল. ও ছাতার অগ্রভাগ দিয়া ঘাস খোঁচাইতে লাগিল।

"নামিকো-সান্‌ ।"

বিষধরের অবিচলিত পশ্চাদ্ধাবনে ত্রস্ত কাঠ্‌বিড়ালীর মত নামি এই বার শত্রুর সম্মুখীন হইল।

"কি ?"

"ব্যারণের পদ আর টাকা—এ মন্দ নয়, কি ব ? আমি তোমায় অভিনন্দন কর্‌চি।"

"কি তুমি বলছ ?"

"মূর্খ হলেও ধনী সম্ভ্রান্তবংশীয়কে বে' করা এবং যে ভালবাসে. সে অর্থহীন হলে তাকে ঘৃণা করা—আজ-কালকার উঁচু ঘরের মেয়ের এই হল নিয়ম—অবশ্য. তুমি বাদ।"

ধীরপ্রকৃতি হইলেও নামি বিষম কুপিত হইয়া উঠিল. চিজিওয়ার পানে সে অতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

"কি বলছ তুমি? কাপুরুষ! তাকেওর সাম্‌নে ঐ কথা বোলো। আমার বাবাকে মানুষের মত জিজ্ঞাসা না করে আমাকে ঐ রকম চিঠি পাঠান! আমি আর এ সহ্য করব না।"

"কি ?"

চিজিওয়ার মূর্ত্তি ভীষণ দেখাইতেছিল। দন্তে অধরোষ্ঠ চাপিয়া সে নামির নিকটবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিল।

হঠাৎ নিম্নে অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনা গেল, অশ্বপৃষ্ঠে এক বৃদ্ধ কৃষকের মস্তক পাহাড়ের উপরে প্রকাশিত হইল। সায়ংকালীন নমস্কারার্থে অশ্বারোহী টুপি উঠাইয়া তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; অগ্রে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া সে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল ও যুবকযুবতী কে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

চিজিওয়া নড়িল না; তাহার মুখের কঠিনভাব কথঞ্চিৎ অপগত হইল বটে, কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত ওষ্ঠাধরে একটা বিদ্রূপের ভাব প্রকট হইয়া উঠিল।

"হুঁ. ওখানা রাখতে ইচ্ছা না হয় আমাকে ফেরত পাঠিও।"

"কি ফেরত পাঠাব ?"

"যার কথা এখুনি বল্‌লে। যা তুমি ঘৃণা কর!"

"সেখানা আমার কাছে নেই।"

"কোথায় তবে ?"

"আগুনে ফেলে দিয়েচি।"

"নিশ্চয় ? কেউ দেখে নি ত ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"ঠিক ত ?"

"কথা কোয়ো না আমার সঙ্গে।"

নামির কুপিত দৃষ্টি চিজিওয়ার কৃষ্ণ চক্ষুর ভয়ানক অপ্রীতিকর চাহনি দ্বারা প্রতিহত হইল। সে চাহনি তাহার শরীরের মধ্যে একটা শীতার্ত্ত কম্পন জাগাইয়া তুলিল ও তাহাকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য করিল। ঠিক সেই সময়ে নিম্ন ভূমির পর পারে পাহাড়ের মাথায় তাকেও আবির্ভূত হইল। তাহার মুখ সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণানুরঞ্জিত চেরী ফুলের মত রক্তিম দেখাইতেছিল।

নামি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

"নামিকো-সান্‌!"

চিজিওয়া পুনঃ পুনঃ নামির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নামির চক্ষু তাহার দৃষ্টি এড়াইল। অবশেষে সে কহিল. "নামিকো-সান্‌. তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার আগে একটা কথা বলি। ভেবে চিন্তে কাজ কোরো। যেমন করে পারো. এ বিষয় তাকেও-সান্‌ ও তোমার মাতাপিতার কাছে গোপন

রেখো। যদি না রাখ ত অনুতাপ করতে হবে, নিশ্চয়।”

ভীতিপ্রদ একটা চাহনির দ্বারা কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া চিজিওয়া সরিয়া গেল, ও কয়েকটা বন্য ফুল তুলিবার জন্য নত হইল।

দ্রুতপদবিক্ষেপে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাকেও পাহাড়ে উঠিয়া আসিল, কহিল, “আমি কি তোমাদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেচি? দম বেরিয়ে গেছে; সমস্ত রাস্তাটা ছুটেচি। ছড়িটা ঠিক পেয়েচি। কি, নামি-সান্ কি হয়েচে? তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে না ত।”

সেইমাত্র যে ভায়োলেট্‌গুলো তুলিয়াছিল, সে গুলো গুচ্ছ বাঁধিয়া বুকে আটকাইয়া চিজিওয়া কহিল, “তোমার ফির্‌তে এত দেরী হয়েচে যে, তুমি পথ ভুলে গেছ মনে করে উনি চিন্তিত হয়ে উঠেচেন।” এই কথা বলিয়া সে হাস্য করিল।

উত্তরে তাকেও হাসিল। “তাই নাকি? এইবার এস, বাড়ী যাওয়া যাক্।”

ভূমির উপর দিয়া পাশাপাশি তিনটি ছায়া ইকাও অভিমুখে চলিল।

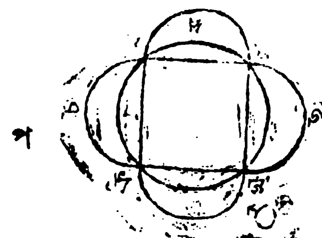
শ্রীহেমনলিনী রায়।

তাপ *

২

তাপ শক্তিরই একটা রূপ; কিন্তু রূপটা কি রকম তাহা এখন ঠিক বুঝিতে হইবে তাপের প্রকৃত রূপ লইয়া পণ্ডিত সমাজে আজিও বিতণ্ডা চলিতেছে। হোমরা-চোমরাদের মত কতকটা এই রকমের।

শক্তির প্রধান মূর্ত্তি দুইটী, প্রচ্ছন্ন শক্তি ও গতি শক্তি। তাপ এই গতি-শক্তিরই একটা বিশিষ্ট আকৃতি। গতি নানা রকমের হইতে পারে। কামানের গোলার গতির মত সরল রেখায় হইতে পারে, লাটিমের গতির মত ঘূর্ণন গতি হইতে পারে, পেণ্ডুলামের আন্দোলনের ন্যায় আন্দোলন বা কম্পন-গতি হইতে পারে। গতিশীল পদার্থ মাত্রই শক্তিসম্পন্ন, সে গতি সরল গতিই হউক ঘূর্ণন-গতিই হউক, কিংবা কম্পন-গতিই হউক। এই কম্পন গতিই তাপের মূর্ত্তি। কেবল কম্পন বলিলে চলিবে না, কম্পনের মধ্যে আবার একটা বিশিষ্ট রকমের কম্পনই তাপের প্রকৃত মূর্ত্তি। জড় পদার্থের অণুসমূহ স্থিতিস্থাপক। আঘাত পাইলে ইহাদের আকৃতি বদলাইয়া যায়, চেপ্টা হইয়া যায়; পুনরায় ইহারা পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করে বটে, কিন্তু একবারেই পারে না। খানিকক্ষণ ধরিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে আকৃতি দ্রুত আন্দোলিত হইতে থাকে।



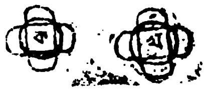
১ম চিত্র।

ক খ গ ঘ একটা জড়ের অণু, একটা স্থিতিস্থাপক গোলাকার পদার্থ (১ম চিত্র,)। বাঁ দিক হইতে আর একটা পদার্থ ‘প’, আর একটা অণুই হউক বা বাহিরের কোনও পদার্থই হৌক, উহাকে একটা ধাক্কা দিল। তাহার ফলে ইহা ডান দিকে ছুটিয়া চলিবে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে; এই স্থিতিস্থাপক গোলকটার আকৃতিও পুনঃ পুনঃ বদলাইতে থাকিবে। ধাক্কার ফলে গোলকটা চেপ্টা হইয়া চ ছ আকার ধারণ করিবে। স্থিতিস্থাপকত্বগুণবশতঃই উহা পুনরায় চেপ্টা হইয়া জ ঝ আকার ধারণ করিবে। এইরূপে গোলকের আকৃতি চ ছ হইতে জ ঝ, ও জ ঝ হইতে চ ছ তে অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। এই আন্দোলন-গতিই তাপের প্রকৃত মূর্ত্তি। এই আন্দোলন-গতিবিশিষ্ট গোলক স্পর্শ করিলে বা উহার নিকটে হাত রাখিলে হাতে বেদনা বোধ হইবে, গরমের অনুভূতি হইবে। ধাক্কা দিবার পূর্ব্বে শক্তি ছিল ‘প’তে। উহা তখন ছিল

---

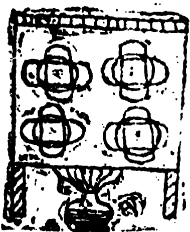
* মাঘ মাসের প্রতিভায় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

দৃশ্য জড়ের দৃশ্য আকৃতিতে; ধাক্কার পরে শক্তি আসিল ক খ গ ঘ গোলকে উহা তখন ধারণ করিল অদৃশ্য অণুর অদৃশ্য আন্দোলনের আকার। দৃশ্য গতিশক্তি অদৃশ্য তাপশক্তিতে পরিণত হইল। অণুটার গোলাকৃতি ব্যাস যতখানি, চ ছ বা জ ঝ আকৃতিতে এক দিককার ব্যাস তাহা অপেক্ষা বড়। এই ব্যাসের পার্থক্যের নাম আন্দোলনের দৈর্ঘ্য। আন্দোলনের দৈর্ঘ্য যতই বাড়িয়া যাবে অণুগুলি ততই গরম বোধ হইবে।



২য় চিত্র।

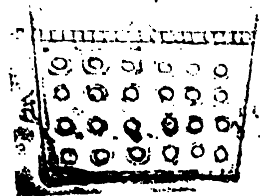
যদি 'ক' অণুর আন্দোলন 'খ' অণুর আন্দোলন অপেক্ষা দীর্ঘ হয় তবে 'ক' কে 'খ' অপেক্ষা উষ্ণতর বোধ হইবে (২য় চিত্র)। 'ক' 'খ' কাছাকাছি থাকিলে আন্দোলনশক্তি একটা হইতে অন্যটায় যাইবে। কিন্তু 'ক' দিবে বেশী, পাইবে কম, খ পাইবে বেশী দিবে কম। মোটের উপর 'ক' এর হিসাবে খরচের ঘরে অঙ্ক বসিবে, 'খ' এর হিসাবে অঙ্ক বসিবে জমার ঘরে; অর্থাৎ তাপ মোটের উপর গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবে। ফলে 'ক' ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে, উহার আন্দোলন কমিতে থাকিবে, 'খ' গরম হইতে থাকিবে, উহার আন্দোলন বাড়িতে থাকিবে। শেষে উভয়ের আন্দোলন-গতি সমান হইবে—দুইটা সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হইবে। তখন 'ক' যত দিবে ততই নিবে, এবং 'খ' যত নিবে তত দিবে। আদানপ্রদান চলিবে বটে কিন্তু উভয় হিসাবেই মোটের উপর জমার ঘরে শূন্য, ও খরচের ঘরে শূন্য বসিবে।*



৩য় চিত্র।

একটা পাত্রে যদি খানিকটা বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, আর যদি ঐ পাত্রের নীচে একটা ল্যাম্প রাখা যায় তাহা হইলে ল্যাম্প হইতে খানিকটা তাপ পাত্রের ভিতর দিয়া বায়ুতে প্রবেশ করিবে (৩য় চিত্র)। বায়ুর অণুগুলির আন্দোলন ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অধিক হইতে অধিকতর বেগে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। ল্যাম্প হইতে যে শক্তি পাত্রের ভিতর ঢুকিল, তাহা দুই ভাগ হইয়া গেল। খানিকটা শক্তি অণুর আন্দোলনের আকার ধারণ করিল, আর খানিকটা ধারণ করিল ছুটাছুটির আকার। এই আন্দোলনের আকারই তাপের আকার। এই আন্দোলনের বৃদ্ধিতেই বায়ু ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছে, আর এই ছুটাছুটি করিয়া অণুগুলি আধার-পাত্রের গায়ে যে ধাক্কা দিতেছে, এই ধাক্কা হইল এই বায়ুর চাপ।

আন্দোলন বাড়িবার সঙ্গে ছুটিবার বেগও বাড়িয়া যায়। ফলে, গরম হইলে বায়ুর চাপ বাড়িয়া যায়। যে অনুপাতে গরম হইতে থাকে সেই অনুপাতে উহার চাপও বাড়িতে থাকে। এই নিয়ম 'গে লুসাক' পরীক্ষা দ্বারা প্রথম সাব্যস্ত করেন। চার্লস্ সাহেব নিয়মটা বিধিবদ্ধ করেন। নিয়মটা চার্লস সাহেবের নিয়ম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যদি পাত্রের ঢাকনিটা উপরে উঠিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত করা যায়, তবে ধাক্কার ফলে উহা উপরে উঠিতে থাকিবে, অর্থাৎ গরম হইলে আয়তন বাড়িয়া যাইবে। এখন কিন্তু চাপ আর পূর্ব্বের ন্যায় বাড়িতে পারিবে না, কেন না, পাত্রের গায়ে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় পূর্ব্বে যতগুলি অণু ধাক্কা দিতেছিল, আয়তন বাড়িবার ফলে এখন তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক অণু ধাক্কা দিতে পারিবে।



৪র্থ চিত্র।

মুখঢাকা পাত্রে খানিকটা বায়ু থাকিলে উহা পাত্রের প্রান্ত অংশে চাপ প্রয়োগ করিবে (৪র্থ চিত্র)। ঢাকনিটা যদি ঠেলিয়া নামান যায়, তবে ঢাকনির উপরে যে চাপ পড়িতেছে তাহার বিরুদ্ধে খানিকটা কার্য্য

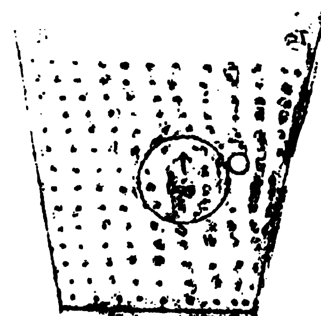
করিতে হয়—খানিকটা শক্তি ব্যয় করিতে হয়। এখানে শক্তি যোগাইবার জন্য ল্যাম্প নাই, কিন্তু ঢাকনি যে ঠেলিয়া নামাইতেছে সে শক্তি যোগাইতেছে। ফল একই হইবে। বায়ুটা গরম হইতে থাকিবে ও তাহার চাপও বাড়িতে থাকিবে। বায়ুকে সঙ্কুচিত করিলে উহা গরম হইয়া উঠিবে ও উহার চাপ বাড়িয়া যাইবে।

যে শক্তি ব্যয় করা যায় উহা পাত্র হইতে বাহির করিয়া লইলে বায়ু আর গরম হইতে পারিবে না; কিন্তু সঙ্কুচিত অবস্থায় উহার চাপ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে। আয়তন যে অনুতাপে কমিবে, চাপ সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। যদি ঢাকনিটা ক খ স্থান হইতে পাত্রটার মধ্যখানে অর্থাৎ গ ঘ স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আয়তন অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। কিন্তু পাত্রের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এখন দ্বিগুণ সংখ্যক অণুরাশি চাপ দিবে, অর্থাৎ বায়ুর চাপ দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। শক্তি জমিতে না দেওয়ায় অণুগুলির আন্দোলনগতি বাড়িতে পারিল না, গরম হইতে পারিল না। উহাদের ছুটিবার বেগ বাড়িতে পারিল না, কিন্তু অল্প জায়গার মধ্যে ঢুকিবার ফলে পাত্রের গায়ে উহাদের সমবেত ধাক্কার পরিমাণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ বায়ুকে যদি সঙ্কুচিত করা যায়, কিন্তু গরম হইতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহার চাপ বাড়িয়া যায়। যে অনুপাতে আয়তন কমে সেই অনুপাতে চাপ বাড়ে। ইহাকে বয়েল সাহেবের নিয়ম বলে। এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইংলণ্ডের রবার্ট বয়েল খ্যাতনামা হইয়াছেন।

বায়ুর আয়তন কমাইতে গেলেই উহার চাপ বাড়িয়া যায়, কিন্তু ব্যয়িত শক্তিটা ভিতরে আবদ্ধ থাকিলে যতখানি বাড়িবে, বাহির করিয়া লইলে ততখানি বাড়িতে পারিবে না; অর্থাৎ তাপ আটকাইয়া রাখিয়া বায়ুকে গরম হইতে দিলে উহা যতখানি স্থিতিস্থাপক হইবে, তাপ বাহিরে যাইতে দিয়া বায়ুটাকে গরম না হইতে দিলে উহা তদপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক হইবে।

ঢাকনিটা 'ক খ' স্থানে ধরিয়া রাখিয়া পাত্রের নীচে একটা ল্যাম্প জ্বালাইলে বায়ুতে তাপ প্রবেশ করিবে, উহা গরম হইতে থাকিবে। যখন এক ডিগ্রি পরিমাণে গরম হইল তখন ঢাকনিটা ছাড়িয়া দিলে, বায়ুর চাপে উহাকে উপরে ঠেলিয়া তুলিবে, উহা চ ছ স্থানে যাইবে। ভারী ঢাকনিটা ঠেলিয়া তুলিতে বায়ুকে খানিকটা কাজ করিতে হইবে, উহার অনেকটা শক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইবে। ফলে, উহা একটু ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। খানিকটা কার্য্য পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু খানিকটা তাপের লোপ হইবে। অতএব বায়ুটা আর এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম থাকিবে না। আরও খানিকটা তাপ ল্যাম্প হইতে আসিলে তবে উহা এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম হইবে। আয়তন বাড়িতে না দিয়া এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম করিতে হইলে বায়ুতে যতখানি তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে, আয়তন বাড়িতে দিয়া উহাদ্বারা কাজ করাইয়া লইলে ঐ এক ডিগ্রি পরিমাণ গরম করিতে উহাতে তার চেয়ে বেশী তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যতখানি শক্তি মোটের উপর লাভ হইবে, তাপও ঠিক সেই পরিমাণে বেশী খরচ করিতে হইবে।

কেবল বায়বীয় পদার্থের নহে তরল পদার্থের অণুগুলিও আন্দোলিত হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, পার্থক্য এই যে, বায়বীয় পদার্থের অণুসমূহের পরস্পর আকর্ষণ অতি সামান্য, এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। তরল পদার্থের অণুসমূহের অল্পবিস্তর আকর্ষণ আছে। এই আণবিক আকর্ষণের বিশেষত্ব এই যে, যদি অণু খুব কাছাকাছি থাকে তবেই তাহাদের আকর্ষণ দুইটা কিঞ্চিৎ প্রবল থাকে, একটু দূরে দূরে সরাইলেই আকর্ষণ এক প্রকার শূন্য হয়।

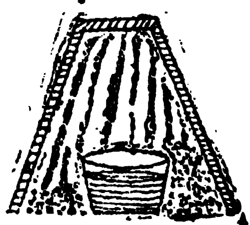


৫ম চিত্র

একটা পাত্রের ভিতর জল আছে। জলের অণুগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। 'ক' একটা অণু। ছুটিয়া উপরে

যাইতেছে। "ক"কে কেন্দ্র করিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র গোলক আঁকা গেল (চ)। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগেরও কম। এই গোলকের ভিতর যতগুলি অণু আছে তাহারাই কেবল 'ক'কে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। 'চ' গোলকের বাহিরের কোটি কোটি অণুর 'ক' এর উপর কোনও ক্রিয়া নাই। 'ক' এর উপর আকর্ষণ মোটের উপর শূন্য। কারণ চারিদিক হইতে সমান টান পড়ায় 'ক' কোনও টানেরই বশীভূত নহে। 'ক' অক্লেশে উপরে ছুটিয়া চলিতেছে। 'ক' ত থ রেখা পর্য্যন্ত উঠিল, অর্থাৎ জলের পৃষ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন উপর হইতে 'ক' এর উপর টান দিবার মত অণু নাই, কিন্তু নীচ দিকে টান দিবার মত অণু আছে। মোটের উপর 'ক' এর উপর টান পড়িল নীচ দিকে। একটু আগে হইতেই নীচ দিকে টান পড়িতেছিল, ক্রমে উহার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। 'ক' এর বেগ খুব বেশী হইলে উহা মন্দীভূত হইয়াও জলভাগের পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে। সবগুলি অণুর বেগ সমান নয়, কোনটার বেশী, কোনটার কম। ধীরগতি অণুগুলি পলাইতে পারিবে না, জলের পৃষ্ঠে আসিতেই আটকা পড়িয়া যাইবে বেগবান্ অণুগুলি জল ছাড়িয়া পলাইবে। ইহার নাম জলের বাষ্পে পরিণতি।

পাত্রটা গভীর ও মুখটা সরু হইলে এই পরিণতি আস্তে হইবে, অগভীর ও ছড়ান হইলে পরিণতি দ্রুততর হইবে।



৬ষ্ঠ চিত্র।

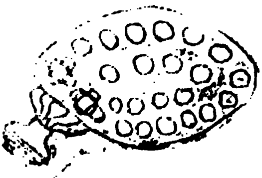
বেগবান অণুগুলি পলাইবার ফলে জলটা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। জল বাষ্পে পরিণত হইবার কালে জল ঠাণ্ডা হয়।

জলের পাত্রটা আর একটা পাত্রে ঢাকা দিলে (৬ষ্ঠ চিত্র) বাষ্পের অণুগুলি ঢাকিবার পাত্রের মধ্যে মধ্যে আটকা পড়িবে, পলাইতে পারিবে না। এই বদ্ধাবস্থায় উপরে বাষ্পের অণু নীচে জলের অণু ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। কতগুলি জলের অণু বাষ্পের ভিতর প্রবেশ করিবে, আবার কতগুলি বাষ্পের অণু জলের পৃষ্ঠে আসিয়া নীচের অণুগুলির আকর্ষণে জলের ভিতর ঢুকিবে। যতই বাষ্পের অণু বাড়িয়া যাইবে, ততই উহার অধিকসংখ্যক অণু জলের ভিতর ঢুকিতে থাকিবে। শেষে উঠা নামার সংখ্যা সমান হইয়া যাইবে। তখন হইতে জলের পরিমাণ ঠিক রহিয়া যাইবে, বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রহিয়া যাইবে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাষ্পের চাপ বাড়িতেছিল, এখন হইতে আর বাড়িবে না। বাষ্পের এই চাপটি ঐ পরিমাণের গরম জলের পক্ষে বৃহত্তম চাপ। ইহার নাম দেওয়া হউক 'চ'। উপরের ঢাকনিটা যদি বড় হইতে থাকে তবে বাষ্পের আয়তনও বাড়িয়া যাইবে, আরও বাষ্প উঠিবে। ফলে চাপের পরিমাণ দাঁড়াইবে 'চ'। ঢাকনিটা যদি ছোট হইতে থাকে, তবে বাষ্পের আয়তন কমিয়া যাইবে; কিন্তু উহার চাপ বাড়িতে পারিবে না। আয়তন যতখানি কমিবে, ততখানি স্থানে যে পরিমাণ বাষ্প ছিল, তাহা জলে পরিণত হইয়া যাইবে; চাপ থাকিয়া যাইবে 'চ'।

জলের নীচে ল্যাম্প রাখিয়া জলটা যদি গরম করা যায়, তাহা হইলে জলের অণুর বেগ বাড়িয়া যাইবে, বাষ্পীভবন দ্রুততর হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের চাপও বাড়িয়া যাইবে। জল এক ডিগ্রি গরম অবস্থায় বাষ্পের বৃহত্তম চাপের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে 'চ'। দুই ডিগ্রি গরম অবস্থায় বাষ্পের বৃহত্তম চাপের আর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে, 'ছ'—'চ' হইতে বেশী। শেষে জলটা এত গরম হইবে যে, উহার বাষ্পের চাপ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান হইবে। যতটা গরম হইলে চাপটা এত বড় হয়—তাহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১০০ ডিগ্রী। এই অবস্থায় ঢাকনিটা তুলিয়া লইলে বাষ্পটা অতি দ্রুত পলাইয়া যাইবে, অতি দ্রুত পুনরায় বাষ্প উৎপন্ন হইবে। জলটার উপর আর অন্য পাত্র ঢাকা না দিলে অতি

দ্রুত পলায়ন ও অতি দ্রুত পশ্চাদ্ধরন সমানে চলিতে থাকিবে। ইহার নাম স্ফুটন। স্ফুটন কালে জল গরম হইবে ১০০ ডিগ্রী পরিমাণ। তাহার পর আর গরম হইবে না। অণুগুলির আন্দোলন গতি ১০০ ডিগ্রী অনুযায়ী গতি বেশী হইবার আগেই উহারা বায়ুর বাধা অতিক্রম করিয়া জল ছাড়িয়া পলাইবে। ল্যাম্প হইতে যে তাপ আসিতেছিল স্ফুটনের পূর্ব্বে তাহার কতকটা জল গরম করিতে ব্যয়িত হইয়াছিল, আর কতকটা ব্যয় হইতেছিল অণুগুলিকে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে ঠেলিয়া নিতে। অর্থাৎ এই তাপকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই ভাগটা তাপমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির অপর নাম বাষ্পীভবনের প্রচ্ছন্ন তাপ। এই প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপ নহে। স্ফুটন আরম্ভ হইবার পরে ল্যাম্প হইতে যে তাপ জলে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার সবটাই প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির অপর নাম স্ফুটনের প্রচ্ছন্ন তাপ।

কঠিন পদার্থের অণুসমূহেও স্পন্দন চলিতেছে। তাই তাহারা গরমের অনুভূতি জন্মাইতে পারে। কিন্তু বায়বীয় বা তরল পদার্থের অণুসমূহের ন্যায় উহারা অতি দ্রুত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে না। জলে দাগ বসে না কিন্তু কাচের গায়ে আঁচর দিলে তাহা অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এ পাড়ার অণু গুলি এ পাড়ায় ওপাড়ার অণুগুলি ওপাড়ায়ই রহিয়া যায়। কিন্তু চালচলন যে এক স্থানেই সীমাবদ্ধ, সকল কঠিন পদার্থের পক্ষে বোধ হয় এ কথা খাটে না। কর্পূর কঠিন, আইওডিন কঠিন, কিন্তু ইহারা বাষ্পাকারে উঠিয়া যায়।



৭ম চিত্র।

একটা পদার্থের একপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ প্রান্তের অণুগুলি আন্দোলিত হইতে থাকিবে। ঐ প্রান্ত গরম হইয়া উঠিবে। এই আন্দোলন-গতি অণু হইতে অণুতে প্রবেশ করিয়া ক্রমে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার নাম তাপ পরিচালন। অণু-সমূহ কি প্রকৃতির, তাহারা কিরূপে বিন্যস্ত ইহার উপর এই পরিচালন-ক্রিয়া নির্ভর করিবে। যে অংশটা অপেক্ষাকৃত গরম উহা অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা হইবে। পদার্থটা তরল কি বায়বীয় পদার্থ হইলে, যে স্থানে তাপ প্রয়োগ করা যায় সেই স্থানের অণুগুলি উপরে উঠিয়া যাইবে। উঠিবার কালে তাহারা আসেপাশে আন্দোলন গতি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। এই প্রক্রিয়াকে তাপের পরিবাহন বলে। গরম তরল অংশ উঠিয়া যায় ঠাণ্ডা ভারী অংশ নামিয়া আসে। যেটা গরম ছিল সেটা ঠাণ্ডা হয়, যেটা ঠাণ্ডা ছিল সেটা গরম হয়। পরিচালন ক্রিয়ার তাপ অণু হইতে অণুতে ছড়াইয়া পড়ে, পরিবাহনক্রিয়া ছড়াইবার পক্ষে সহায়তা করে। তরল ও বায়বীয় পদার্থে প্রধানতঃ এই পরিবাহন দ্বারাই তাপের আদানপ্রদান হইতে থাকে। ইহারই ফলে Gulf Stream, Tornado, Trade winds, Land-breeze ও Sea-breeze.

কিন্তু পদার্থ কঠিন হউক, তরল হউক বা বায়বীয় হউক, আন্দোলনগতি এই জড়পদার্থেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কেন না পদার্থমাত্রই ঈথরে ঘেরা। প্রকাণ্ড ঈথর-সাগরের এক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ অধিকার করিয়া এক একটি জড় তাহার অণুগুলি লইয়া ঘর করিতেছে। ঈথর-সাগরের ক্ষুদ্র এক প্রদেশে যে আন্দোলন উৎপন্ন করা যায় তরঙ্গের আকারে তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যে বেগে ছড়াইয়া পড়ে তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে—বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। পরিচালন ও পরিবাহন ক্রিয়া এ বেগের নিকট ঠাঁই পায় না। এই প্রক্রিয়ায় তাপ প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই প্রক্রিয়ার নাম বিকীরণ। গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, এক নক্ষত্র জগৎ হইতে অন্য নক্ষত্র জগতে তাপ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষ দেখিল না, বুঝিল না, নিবারণের চেষ্টা করিল না।

জড় প্রভৃতি অট্টহাসে বলিতেছে, "হাঃ হাঃ দিন আসিতেছে।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মুছে ফেল

মুছে ফেল হৃদয়ের শোণিতের দাগ,
ভুলে যাও শোক যাহা আছে,
অতীতের স্মৃতি টুকু থাক্ পিছে প'ড়ে,
তারে আর ডাকিও না কাছে।

বিদায়ের শেষ বাণী প্রকাশিয়া ধীরে
অতীত বরষ অই যায়,
তারি সনে যাক্ চলি বিষাদ বেদনা,
মুছে যাক্ স্বপ্ন-ঘোর-ছায়!

পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ সকলেরে আজি
পূর্ণ প্রাণে দেও গো বিদায়,
ধর্ম্মের পবিত্র আলো থাক্ হৃদি ভরি,
উঠুক মঙ্গল-গীতি তায়।

যাক্ দুরে ধনী-দীনে যে প্রভেদ আছে,
সাম্য ভাব উঠুক জাগিয়া,
হৃদয়ের তন্ত্রী মাঝে সুমহান্ স্বরে
নব তান উঠুক বাজিয়া।

নব গানে নব তানে পূরিয়া অন্তর
কর্ম্ম-ভুমে হও অগ্রসর,
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা করি পরিহার
বিশ্বপ্রেমে মাতাও অন্তর।

এ জগতে যাহা কিছু মহান্, উদার,
তাহারেই লও সাথী ক'রে;
যাহা কিছু পবিত্রতা মাখানো হেথায়,
লও তারে তুলি নিজ ক্রোড়ে।

ভাবিও না অতীতের সহস্র আঘাত,
যাহে হৃদি হয়েছিল ক্ষত;
মুছে ফেল সেই স্মৃতি, ভুলে যাও ধীরে
কি বিষাদে হিয়া অবনত।

এ জীবন নহে শুধু বিষাদ লাগিয়া,
এ জীবনে কত কাজ আছে,
বিষাদ ত কার্য্য-পথ রহে আগুলিয়া,
তাই তারে ফেলা চাই পাছে।

কর্ম্মের গম্ভীর মন্দ্রে আকাশ-অবনী
উচ্ছ্বসিত হতেছে যখন,
তারি মাঝে আপনারে ডুবায়ে রাখিতে
করা চাই সহস্র যতন।

তাই বলি, মুছে ফেল হৃদয় হইতে
পাপ-তাপ অন্ধকার রাশি,
সহস্র সঙ্গীত-রব মহতী সাধনা
উঠিবেক হৃদয়ে প্রকাশি।

তখন সে নব বর্ষে হৃদয় মাঝারে
উঠিবে সে সঙ্গীতের রব;
তাহাতে প্লাবিয়া যাবে এ বিশ্ব সংসার,
হেথায় নূতন হবে সব।

নয়নের, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা রাশি
নিমিষেতে যাইবে টুটিয়া,—
কি আপন কিবা পর এক হয়ে যাবে
সম ভাব উঠিবে জাগিয়া।

সৈয়দ এমদাদ আলী।

কাছাড়ী জাতি *

কাছাড় আসাম প্রদেশের একটা জেলা। পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্নিহিত স্থানকে ত্রিপুরার অনেকাংশে 'কাছাড়' বলে। বোধ হয়, কাছাড় জেলা পার্ব্বত্য আসাম প্রদেশের প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া লোকে পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানকেও 'কাছাড' নাম দিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে ভারতের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে বসতি স্থাপন করে এমন কয়েকটা পার্ব্বত্য জাতির নাম কাছাড়ী।

অবস্থান।

কাছাড়ী জাতির উৎপত্তি-বিবরণের কোনও বিশ্বাস্য ইতিহাস অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা অনুমান ও সিদ্ধান্তের আশ্রয় লইতে হয়। এই জাতির সহিত মঙ্গোলীয় বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অতএব এই হিসাবে তিব্বৎ ও চীন এই জাতির আদিম বাসভূমি বলা যাইতে পারে। গারো জাতিকেও নেপালীর ন্যায় কাছাড়ীর জ্ঞাতি বলা যায়, এবং গারো জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে একটা সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে।

উৎপত্তি।

ঐতিহাসিক যুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীর নয়টি পুত্র ও একটি তিব্বতীয় রমণী হিমালয় হইতে কোচবিহারে আসে। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া যোগীযোপায় উপস্থিত হয় তৎপর ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া ডালগোমা হইয়া গারো পর্ব্বতে প্রবেশ করে। ইহারাই গারোজাতির পূর্ব্বপুরুষ। এই সকল জনশ্রুতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, পার্ব্বত্য জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনেকটা প্রবাদমূলক; এবং এই সকল প্রবাদের কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি বা মূল আছে কি না তাহা পাঠকগণেরই বিচার্য্য।

ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বোধ হয় যে, দুইটি প্রবল জাতি উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উর্ব্বর উপকূল ভাগে বসতি বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে এক জাতি তিস্তা, ধরলা, সঙ্কোশ প্রভৃতি নদীর উপকূল বাহিয়া উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গে ও পশ্চিম আসামে প্রবেশ করে, এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। অপর জাতি সুবনসিরি, ডিবং ও ডিহং প্রভৃতি নদীর উপকূল বাহিয়া পূর্ব্ব আসামে প্রবেশ করে। এই প্রদেশই বহু শতাব্দী ধরিয়া চুটিয়া নামক একটা কাছাড়ী উপজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্ব্বভারতের অনেক স্থলে এই চুটিয়া জাতির বিস্তার হইয়াছে। বর্ত্তমান সদিয়ার অনতিদূরে চুটিয়া জাতির রাজধানী ছিল। সেখানে প্রাচীন কীর্ত্তির বহু ধ্বংসাবশেষ ও একটি প্রাচীন মন্দির বা মণ্ডপ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই মণ্ডপের ছাত তাম্রনির্ম্মিত সুতরাং ইহাকে "তাম্র গৃহ" বলা হইয়া থাকে। ধ্বংসাবশেষগুলিও তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আদরের সমগ্রী। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যে জাতি আমাদের নিকট কাছাড়ী বলিয়া পরিচিত প্রাচীন কালে সেই জাতিই আসামে প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল। ইহাদের কথিত ভাষার চিহ্ন অদ্যাপি আসামের অনেক নৈসর্গিক পদার্থের নামকরণে বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রধান প্রধান নদীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল নামের প্রথমাংশটি জলবাচক কাছাড়ী শব্দ—যথা, ডি-ক্রু, ডি-হং, ডি-বং প্রভৃতি। 'ডি' বা 'ডৈ' কাছাড়ী শব্দ জল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমস্তই সদিয়ার নিকটবর্ত্তী, এবং সদিয়া প্রাচীন কালে চুটিয়া বা কাছাড়ীর প্রভাব ও সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কাছাড়ীর অপর নাম বড়ো এবং তাহারা এই নামে পরিচিত হইতেই ভালবাসে।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত "কাছাড় ও কাছাড়ী" প্রবন্ধের এক অংশ।

বিস্তৃতি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কাছাড়ী বা চুটিয়া জাতি ভারতের পূর্ব্বাংশে বেশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বড়া জাতির বহুল বিস্তার হয় নাই বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। এখন কিন্তু এই ভ্রম দূর হইয়াছে। উত্তরপূর্ব বঙ্গে, কোচবিহারে এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায়ও অনেক বড়া জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থান আসামের বাহিরে ইহা সকলেই জানেন। একমাত্র আসামেই ইহাদের সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তা ছাড়া সম্প্রতি বহু কাছাড়ী হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুর আচার ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, এবং এমন কি আপন মাতৃভাষা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে! এই বড়া জাতিকে কাছাড়ী তত্ত্ববিদেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তদনুসারে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী কাছাড়ীদিগকে "উত্তর কাছাড়ী" ও দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী কাছাড়ীদিগকে "দক্ষিণ কাছাড়ী" বলা হয়। সুতরাং বড়া (কাছাড়ী), রাভা, মেচ, টিমল, কোচ, সোলানিমিয়া প্রভৃতি শাখা উত্তর কাছাড়ীর অন্তর্ভুক্ত, এবং ডিমাসা, হোজাই, লালুঙ, গারো, হৈজং, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতি প্রভৃতি দক্ষিণ কাছাড়ীর অন্তর্গত। উত্তর কাছাড়ী বড়া জাতি দরাং, দুয়ার ও উত্তর কামরূপে, রাভা ও মেচেরা গোয়ালপাড়ায়, টিমলেরা উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গে, কোচেরা জলপাইগুড়ি ও উত্তরপশ্চিম দারাঙ্গের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ও সোলানিমিয়ারা মঙ্গলদই মহকুমায় বাস করিতেছে। দক্ষিণ কাছাড়ী ডিমাসাগণ উত্তর কাছাড় পর্ব্বতে, হোজাইগণ উত্তর কাছাড় পর্ব্বতে ও নওগাঙ্গে, লালুঙেরা দক্ষিণপশ্চিম নওগাঙ্গে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে, গারোরা গারো পর্ব্বতের অধিত্যকায় এবং উপত্যকাতায়, হৈজঙ্গেরা গারো পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সমতল প্রদেশে, এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতি পার্ব্বত্য ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই সকল জাতি ব্যতীত আসাম উপত্যকাবাসী মোরান এবং চুটিয়াগণও কাছাড়ী বংশের শাখা। কিন্তু এই দুই জাতি ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে।

দেহ ও গঠন বিশেষত্ব।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমান ও কাছাড়ী আসামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে একত্র বাস করে। কিন্তু শারীরিক গঠনে এবং পারিবারিক ও নৈতিক ব্যাপারে কাছাড়ী তাহাদের হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবর্গ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাছাড়ী গৌরকান্তি বা দীর্ঘাকার নহে, বরং অনেকটা উত্তর ভারতীয় তাহাদের নেপালী জাতিবর্গের ন্যায় খর্ব্বাকার ও বলিষ্ঠ। কিন্তু যাঁহারা এই উভয় জাতিকে জানেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন কাছাড়ী নেপালী অপেক্ষা সমধিক শ্রমপরায়ণ এবং কষ্টও শীতাতপসহিষ্ণু। শারীরিক গঠন লইয়া বিচার করিলে কাছাড়ীকে মঙ্গোলীয় জাতীয় না বলিয়া উপায় নাই। ইহাদের মুখ চেপ্টা, নাসিকা অসূক্ষাগ্র ও স্থূল, চক্ষু দুটি বাদামের মত, গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত, মুখে শ্মশ্রু বিরল, বা একেবারেই নাই এবং বর্ণটা অনেকটা তামার মত। কারখানা বা মাঠের যে সকল কাজে শুধু শারীরিক সামর্থ্য ব্যতীত অন্য কোনও কৌশল বা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, কাছাড়ী ব্যতীত অন্য কোনও জাতিই সেই সকল কাজ করিতে এতটা পারিয়া উঠে না।

মানসিক শক্তি।

কাছাড়ীরা হিন্দুর তুলনায় জড়-মস্তিষ্ক; তাহাদের স্মৃতি বা কোনও বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি আদবেই তীক্ষ্ণ নয়। ইহারা বুদ্ধিচালনায় একেবারে অক্ষম, এবং ইহাদের উদ্ভাবনা শক্তিরও একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও বিষয় অধিগত হইলে ইহা তাহাদের মজ্জাগত হইয়া যায়। আবার দুটি গুণ কাছাড়ীর প্রায় প্রকৃতিগত বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ কাছাড়ীরা মনে করে ব্যক্তি এবং ইহারা যে সমাজ বা সম্প্রদায়ভুক্ত এই দুই অভিন্ন ও এক। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার গ্রাম্য সমিতির সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ব্যক্তি বিশেষের অর্থদণ্ড

হইলে অনেক সময় সমস্ত গ্রাম তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। কারখানার কাজে কোনও কাছাড়ী যদি তাহার সহকর্ম্মিগণের মনে এমন একটা ধারণা জন্মাইতে পারে যে, ইহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ একটা অন্যায় করিয়াছেন তাহা হইলে কারখানার সমস্ত কাছাড়ী কুলি মাসাধিকের বেতন পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। অভিযোগের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধেও কোনও বিচার করে না।

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সঙ্কল্প অটল। এই গুণকে কেহ কেহ একগুয়েমি বলিয়া নিন্দা আবার কেহ কেহ মানসিক দৃঢ়তা বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। এই জাতি একবার কোনও কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে যুক্তি বা তর্কদ্বারা তাহাদিগকে সেই সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করা অসম্ভব। তবে বল প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে কিঞ্চিৎ ফল-লাভ হইয়া থাকে।

চরিত্র।

মোটের উপর কাছাড়ীর নৈতিক চরিত্র নিন্দনীয় নহে। হিমালয়ের প্রান্তদেশ-বাসী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় এই জাতিরও পান-প্রিয়তা দেখা যায়। এটাকে আমরা মনে করিলে জাতীয় দোষ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। মদ বা 'জু' কাছাড়ীর জাতীয় পানীয়দ্রব্য। 'জু'র প্রস্তুতপ্রণালী বড় অদ্ভুত। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউলের সহিত কাঠাল পাতা এবং 'ভেটাই' নামক এক প্রকার আগাছার পাতা মিশাইয়া সুন্দররূপে গুঁড়া করা হয়। এই গুঁড়া এক চিকণ চালুনের সাহায্যে চালিয়া যে চূর্ণ পাওয়া যায় সেই চূর্ণের সহিত জল মিশ্রিত করিলে এক প্রকার পিঠালীর মত পদার্থ প্রস্তুত হয়। এই পদার্থে মধ্যভাগ পুরু এবং ধারের দিকে ক্রমে পাতলা এরূপ চক্রাকার পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহাদিগকে 'বাখর' বা 'এমো' বলে। তিন কি চার সের শুকনা ভাতের সহিত গুটি দুই বাখর মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক কলসী পূর্ণ করা হয়, এবং এই কলসী চার পাঁচ দিন মন্দ আগুনের জালের তিন চার হাত উপরে বসাইয়া রাখিতে হয় তৎপর নামাইয়া এবং জল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া খড়নির্ম্মিত অতি অকর্ম্মণ্য এক প্রকার ছাকুনির সাহায্যে ছাকিয়া লইলেই 'জু' প্রস্তুত হইল।

শ্রাদ্ধে, বিহুতে ও নবান্ন (নূতন ভাত খাওয়া) পর্ব্বাদিতে এই মদ্যের অপরিমিত ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং কাছাড়ী গ্রামের স্ত্রী পুরুষ "জু" সেবন করিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্ভ্রম প্রভৃতি জলাঞ্জলি দেয়। 'ফটিক' নামক এক প্রকার মদ্যও কাছাড়ীরা ব্যবহার করে। 'জু' চুয়াইয়া ফটিক পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা অপরিষ্কৃত অবস্থার হুইস্কির মত একটা তীব্র স্পিরিট। কিন্তু পান-দোষ কাছাড়ীর চরিত্রগত নহে, এবং এই হিসাবে প্রতীচ্য দেশীয় শ্রমজীবী অপেক্ষা কাছাড়ী হীন নহে। পরন্তু ইহারা সরল, সত্যবাদী, অকপট ও বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ক্ষেত্রে স্বীয় দোষ স্বয়ং স্বীকার না করিলে অবাধে অব্যাহতি পাইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সরলস্বভাব কাছাড়ী স্বেচ্ছায় স্ব-কৃত হত্যাপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করিয়া দণ্ডিত হয়।

বিবাহের পূর্ব্বে কাছাড়ী যুবতীর চরিত্র কলঙ্কিত হয় না, এবং বিবাহের পরেও বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। যে সকল কাছাড়ী আজিও সভ্যতার আলোকের পথবর্ত্তী হয় নাই, এবং আদিম অবস্থায় সাদাসিধা ভাবে গ্রামে বাস করিতেছে এই প্রশংসার অনেকটা তাহাদেরই প্রাপ্য। এইরূপ পবিত্রতা তাহাদের বহুদর্শিতার অভাবজনিত অজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে, কারণ অনেক কাছাড়ী এখনও সভ্যতার গণ্ডীতে আসিয়া প্রলোভনের প্রভাবের অধীন হয় নাই। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জাতি যতই সভ্যতার সংস্পর্শে আসিতেছে ততই চ্যুতির পথে স্খলিত হইয়া চরিত্রগত পবিত্রতা ও সারল্যাদি হারাইতেছে। ইহা পরিতাপের বিষয় কি না বিচার্য্য।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

বাণী-পন্থাঃ (১০)

সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি — ভারতীয় সমাজে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন উঠিয়াছে, সাহিত্যের বিচার করিতে যাইয়া তন্মধ্যে সমাজ-গতি-নির্ণয়ের আবশ্যক কি? সাহিত্য মনুষ্য-মনের সৃষ্টি; উহাকে অন্য-নিরপেক্ষভাবে, কেবল মনুষ্য-মনের স্বতন্ত্র ক্রিয়াফল রূপে দৃষ্টি করিলেই ত চুকিয়া যায়! এই প্রশ্নের উত্তরে, সংপ্রতি এইমাত্র বলিয়া বিরত হইব যে, সাহিত্য সামাজিক সৃষ্টি—সমাজবদ্ধ মনুষ্য-মনের সৃষ্টি; সুতরাং মনুষ্য-সমাজের বা সমাজবিশেষের সমস্ত দোষগুণের লক্ষণ উহার মধ্যে সংক্রামিত না হইয়া পারে না; এই কারণে সমাজ-সঙ্গত বিচার প্রণালীই সাহিত্য-বিচারের আধুনিক প্রণালী। পরন্তু জাতি-বিশেষের সাহিত্য, জাতি-বিশেষের ধর্ম্ম এবং সমাজের যাবতীয় দোষে ও গুণে যুগপৎ প্রসারিত এবং সীমাবদ্ধ না হইয়া পারে না। জাতীয় হৃদয়ের (তাহার সমাজ-সভ্যতা এবং ধর্ম্মের) পরমদর্পণরূপী এই সাহিত্য! তাহার ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের নিয়ামক! কোন প্রাচীন সাহিত্যই তাহার সমাজ-সভ্যতার ভূমিটাকে সবিশেষ অতিক্রম করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। সমস্তই ন্যূনাধিক দেশকালের, বিশেষতঃ ধর্ম্মের আদর্শ-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল! এই কালে উহাদের বিচার করিতে হইলে, কিম্বা উহাদের রস ভোগ করিতে হইলে প্রত্যেকটাকে বিশেষভাবে নিজ নিজ অবস্থার সঙ্গতি-সামঞ্জস্যে আনয়ন পূর্ব্বক বিচার না করিলেই অবিচার হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মানব-সভ্যতা, মানবত্ব বা মানব-ধর্ম্ম বলিয়া একটা পরিব্যাপক, আদর্শ-সংজ্ঞা কোন দেশেই সবিতর্কভাবে জন্ম লাভ করে নাই। "বিশ্ব-সাহিত্য" বলিয়া একটা সংজ্ঞাদর্শও সাহিত্যিকগণের মনকে পরিচালিত করিতে পারে নাই। তৎপূর্ব্বে "বিশ্ব"-আদর্শ-সঙ্গত কোন সাহিত্য গ্রন্থ যে রচিত হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক অতর্কিতভাবে। প্রকৃত কবিমাত্রেই জগতের মূলপ্রকৃতিস্থ হইয়াই রচনা করেন; এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসারিত 'বিশ্ব'-আদর্শের 'ঝাঁঝ' সকল সাহিত্যেই কিছু-না-কিছু আসিয়া গিয়াছে। বাল্মীকি বা ব্যাস, হোমর বা সফোক্লিস, এই কালে এত দূরান্তরিত হইয়াও আমাদের হৃদয়ের এত নিকটবর্ত্তী হইয়া আছেন।/ তথাপি, তাঁহাদের গ্রন্থে দেশকালের বিশেষ লক্ষণগুলিই বিশেষভাবে মুদ্রিত; এবং ওই বিশেষ গুণগুলিকে তত্তৎভাবে গ্রহণ করিতে না জানিলেই তাঁহাদের প্রতি অবিচার হইতে থাকিবে। সুতরাং এই পরিবেশ-সঙ্গত বিচার-প্রণালীই আধুনিক সমালোচনার একটা বিশেষ প্রণালী, এবং উহা সকল দিকে ঐতিহাসিক প্রণালীর অন্তর্গত। প্রাচীন সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্য-মাত্রের উহাই প্রধান দাবী। ওই দাবী চুকাইতে না পারিলে আলোচনামাত্রেই বিড়ম্বনা বই নহে। আগে জাতীয় সাহিত্য, এবং তাহার পরেই বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ; উভয়েই ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীর সঙ্গে অপরিহার্য্যভাবে সম্বদ্ধ।* এই প্রাচীন সাহিত্য-আদর্শ কিরূপে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান সাহিত্য-সংজ্ঞার সৃষ্টি করিতেছে—মনুষ্যের মনঃ-সমক্ষে সবিতর্কভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাই সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি শীর্ষক এই বৃহৎ অধ্যায় মধ্যে আমাদের বিচার্য্য। এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতে পারিলেই আমরা বিশ্ব-সাহিত্য-সংজ্ঞার নির্দ্দেশ

> সমাজের সহিত প্রাচীন সাহিত্যের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ।

---

* ভারতীয় সমাজের ইতিবৃত্ত-বুদ্ধি (Historical Sense) চিরকাল দুর্ব্বল, অথচ এই ইতিহাস (এবং সমাজ-শাস্ত্র) মনুষ্য-সভ্যতার প্রধান শাস্ত্র। এই দুইটি মনুষ্যমাত্রের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, বলিলে কথাটা অত্যুক্তি হইবে না। আমরা দেখিব ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি মধ্যে এই দোষ অপরিহার্য্য ছিল। —লেখক।

করিতে চেষ্টা করিব ; এবং উহার পরেই বিভিন্ন কলা-সাহিত্যের আদর্শ এবং ফল চিন্তা করিতে পারিব। †

আমরা প্রাচীন আর্য্য-হৃদয়ের স্বভাবজাত মহাকাব্য-দ্বয় চিন্তা করিয়া আসিয়াছি। উভয়ের মধ্যেই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার যাবতীয় সুস্থ সবল বলিষ্ঠ ভাবের অকৃত্রিম ছবি মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দোষ গুণ বা সংকীর্ণতার সীমাটাও আভাসিত করিয়াছি।

প্রাচীন আর্য্য-মাহাত্ম্য হইতে ক্রমাগত স্খলন।

এখন দেখিবেন সবল এবং প্রকৃতিস্থ আর্য্য জাতি মাত্রেরই এই লক্ষণ। যাঁহারা স্বল্প-পরিমিত হইয়াও পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, পৃথিবী-মধ্যে উন্নত সভ্যতা-সমাচার প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং এখনও যেই জাতি পৃথিবী মধ্যে প্রধান হইয়া আছেন, ওই দুই গ্রন্থে সেই মহা-জাতিরই হৃদয় মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু, এই অবস্থা চিরদিন থাকিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, পরিবর্ত্তিত দেশ এবং পরিবর্ত্তনশীল কালের হস্তে পড়িয়া বিজিত অনার্য্য বা দ্রাবিড় জাতির সংস্রবে নিপীড়িত হইয়া, এই জাতি আর্য্য-রক্তের মাহাত্ম্য সকল দিকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

আর্য্য-রক্তের প্রবল অভিমান এবং অনন্ত অনার্য্য-বিদ্বেষ সত্ত্বেও নানা দিকে আপনার জালে পড়িয়া আপনিই জর্জ্জরিত হইয়া এবং ম্রিয়মাণ হইয়া আসিয়াছে। উহার পর হইতেই, তাহার সমাজ-সভ্যতার যাহা ইতিহাস, তাহা ওই আদিম বলিষ্ঠতা হইতে ক্রম-স্খলনের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহার পরেই ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার 'কলিযুগের' আরম্ভ ইহা স্বীকার করিতে হয়। জগতের অপর আর্য্য-শাখা-সমূহ, বহু পরবর্ত্তী কালে নিজের লুপ্ত মাহাত্ম্যে জাগরিত হইয়া থাকিলেও, তাহারা এখন যাবৎ বিশ্ব-সভ্যতা-মধ্যে ওই মাহাত্ম্যকে নানা দিকে নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া এবং উন্নতি প্রদর্শন করিয়াই চলিতেছে। কিন্তু মধ্য এসিয়ার আর্য্য-সমূহ নিজের অনুপম মাহাত্ম্য হইতে স্খলিত হইয়া, এখন যাবৎ ব্যাপকভাবে নিদ্রিতই রহিয়াছেন; ইহাদের পুনর্জ্জাগরণের অধ্যায় এখনও আরম্ভ হইয়াছে কি না, বিধাতাই জানেন।

আমরা অতঃপর, ভারতীয় জাতির এই ক্রম-গতি অনুসরণ করিব। বেদের নাম শ্রুতি। আর্য্য জাতি যে এই শ্রুতির অনেক অংশ সঙ্গে লইয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তাহা পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতেছেন। ভারতীয় আর্য্য জাতি পরম জ্যোতিষী ছিলেন; কেবল জ্যোতিষী নহে, তাঁহারা মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। এই মাহাত্ম্যের কি করিয়া অবকাশ হইল, তাহা চিন্তা করিলেই, ভারতীয় আর্য্য-সমাজ-গতির একটা বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। উহাও প্রাচীন গোত্র কুল এবং সম্প্রদায় প্রথারই ফল।

প্রাচীন সমাজে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ও অপরিহার্য্যতা।

এই জাতির মধ্যে একমাত্র বিদ্যা ছিল—উহা, ওই কুল-ক্রমাগত শ্রুতি বা অপৌরুষেয়-স্মৃতির বেদ। কালক্রমে এই বেদের ভাষা এবং অর্থ ই অপ্রচলিত হইয়া এবং দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছিল; এবং উহার সন্ততি-রক্ষাকল্পে আর্য্য-মন সহজেই চেষ্টিত হইতেছিল। উহার গতিকেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি-"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষ-" মিতি। এই ষড়ঙ্গের প্রত্যেকটাই শ্রুতিবিদ্যার রক্ষা-কল্পে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। উহার দরুণই একান্ত ভাবে বেদ-শ্রমী, বেদ-পাঠব্যবসায়ী এবং যজনশীল 'ব্রাহ্মণের', বৈয়াকরণ এবং জ্যোতিষীর অপরিহার্য্যতা সিদ্ধ হয়; সুতরাং পৌরোহিত্যের মাহাত্ম্যও সর্ব্ব-সম্মতি

† আমরা বঙ্গদেশীয় সাহিত্যসেবীগণ নিজ নিজ কার্য্যাধিকারে প্রতিনিয়ত এতই ভুল করিতেছি যে, উহা চিন্তা করিলে হতাশ হইতে হয়। সাহিত্যের দেশকাল-সঙ্গত পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং উহার কলাবিভাগের বিভিন্ন স্বরূপ, অধিকন্তু আপনাদের শক্তি এবং কর্ত্তব্যের অধিকার বিষয়ে "গোড়ায় ভুল" বলিয়াই আমরা প্রতিপদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি। আত্মজ্ঞানলাভের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে আশা করিয়াই, সুকুমার সাহিত্যের দর্শন মধ্যে এই নীরস অধ্যায়টির অবতারণা, এবং এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ।

লাভ করে; অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, এবং দান-প্রতিগ্রহশীল ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য আর্য্য-সম্প্রদায় মধ্যে স্থির প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে থাকে। প্রাচীন গোত্র, কুল এবং সম্প্রদায় প্রথার মধ্য স্থলে পূর্ব্বপুরুষীয় বিদ্যা এবং পৌরোহিত্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা অতি সহজে জন্মগত হইয়া যায়; সুতরাং আর্য্যমাত্রেই (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) ব্রাহ্মণ থাকিলেও, কথিতরূপ বিশেষ কার্য্যের দরুণ বিশেষ জীবন ('ভট্ট' পণ্ডিত এবং বিপ্রের জীবন) অপরিহার্য্য হইয়া যায়। এই অবস্থা হইতেই যেমন এক দিকে ব্রাহ্মণ-শাখার উৎপত্তি হইতে থাকে, তেমন অন্য দিকে (ন্যূনাধিক বেদাচার-বিরোধী) উপনিষদ্‌ এবং আরণ্যক সমূহের রচনাও আরম্ভ হয়।

এই সমস্ত কথা ন্যূনাধিক ইতিহাসগত, এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বিচার্য্য নহে।

ব্রাহ্মণ্য হইতে পুরাণের উৎপত্তি।

কিন্তু এই বিপ্রত্ব এবং পৌরোহিত্যের বিশেষ জীবন এবং অধিকার হইতেই, পরকালে ভারতীয় সমাজে আর একটা মহাবিস্তারিত অথচ সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সমাজের বিদ্বদ্‌গণের মস্তিষ্ক বহু শত বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টায় নিরত থাকিয়া বিপুল স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন গৃহ্যসূত্রাদির আদর্শে বর্ত্তমানের উনবিংশতি 'ধর্ম্ম'-সংহিতাও এই সূত্রেই গ্রথিত হইয়াছিল; এবং একটা বদ্ধ-পরিকর মতবাদ এবং সীমাবদ্ধ 'ধর্ম্মকার্য্যের' আদর্শে পর্ব্বতাকার গ্রন্থ সমূহ বিরচিত এবং সমস্ত প্রাচীনতর গ্রন্থাবলীও নানা দিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই বিস্তারিত সাহিত্য-চেষ্টার নাম 'পুরাণ'। এই সংজ্ঞার মধ্যে সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক পুরাণ, এবং আগম, নিগম, তন্ত্রাদিকেও ভুক্ত করিতেছি।

বুদ্ধাবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে, পরবর্ত্তী সার্দ্ধ সহস্র বৎসর লইয়াই পুরাণ-রচনা চলিয়াছিল। পুরাণ-সমূহের আভ্যন্তরীণ সাহিত্য-আত্মা-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আভাস দিয়াছি; সুতরাং এই ক্ষেত্রে উহাদের সামাজিক লক্ষণটাই চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইব।

হিন্দু সমাজ-গঠনে পুরাণের কার্য্য।

পুরাণগুলিও পরবর্ত্তী ভারতীয় আর্য্য-সমাজের মজ্জা-জনিত সৃষ্টি। পরিবার এবং গ্রাম সমূহের আদিম অকৃত্রিমতা এবং বলিষ্ঠতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া পৌরোহিত্য এবং বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িকতাকে মূল-উদ্দীপনা রূপে সম্মুখে রাখিয়াই পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্নতার প্রধান কারণই কেবল ভারতীয় আর্য্য-সমূহের আদি এবং অশেষ সাম্প্রদায়িকতা *। বেদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শাখাসমূহের সূত্র-সঙ্গতি-বশেই এই শৈব, শাক্ত, এবং বৈষ্ণবতন্ত্রীয় পুরাণাদির উদ্ভব। ভারতীয় আর্য্য-মন যত আঘাত পাইয়াছে, তাহার প্রাচীন শ্রুতি-বিদ্যার বিরুদ্ধবাদিগণ হইতে, অথবা বিধর্ম্মী 'অনার্য্য'গণ হইতে যত বিরোধ বা প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বত্র প্রতিঘাতস্বরূপে সমাজের এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষাকল্পে বিপুল সাহিত্য-চেষ্টা করিয়া তত স্থিতিবান্‌ হইবার চেষ্টা করিয়াছে: সাহিত্য বা সারস্বত যন্ত্রটাকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াছে! সরস্বতী-মাতার নীরক্ত প্রণালীই ভারতীয় ব্রাহ্মণমস্তিষ্ককর্ত্তৃক চিরকাল অনুসৃত! পরিবার এবং গোত্র প্রথাকে অখণ্ড রাখিয়া, অন্য দিকে গ্রাম-সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া, এবং সকলের উপর 'ব্রাহ্মণ্যের' মাহাত্ম্য-মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া, এই পুরাণগুলিই ভারতীয় নরসমাজে 'ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম'-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। উহাদের সাহায্যেই 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম' কুত্রাপি 'প্রচারক-ধর্ম্ম' না হইয়াও ফলে আত্ম-প্রচার এবং আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল; প্রকৃত সম্মিলনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া ফলতঃ অনন্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘটনা করিয়াও, পৌরাণিক আদর্শ এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পরম্পরাশ্রয়ী ক্রিয়া-যোগ এবং স্বার্থের সাম্য আনয়ন করিয়াছিল;

* বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌। মহাভারত।

সুতরাং পুরাণসমূহ নানা দিকে ব্রাহ্মণ-মনের এক অপরূপ প্রচারাদর্শই খ্যাপিত করিতেছে। উহাদের সাহায্যেই প্রাচীন পুরোহিতগণ, বেদাচারের সহিত কোন মতে সঙ্গতি এবং সন্ততি রক্ষা করিয়া, বিপুল ভারতবর্ষের বিভিন্ন নর-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনন্ত জাতিভেদ বলবান্ রাখিয়াও, সমস্তকেই নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং পুরাণের মধ্যে সাহিত্য-লক্ষণ বা সাহিত্য চেষ্টা মুখ্য নহে। ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসীগণের পূজা-পদ্ধতিকে নিজের ছায়ায় আনয়ন পূর্ব্বক বিস্তারিত ভাবে আর্য্য আদর্শের দ্বারা অধিকার : ব্রাহ্মণ্যের রক্ষা এবং পরিপোষণ. এবং ও-উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ্যের মাহাত্ম্য-প্রচার; বেদের বহু দেবীয় যজ্ঞকাণ্ডকে বহু-পূজা এবং নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রত-নিয়ম ও পূজা পার্ব্বণের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া সমগ্র ভারত জাতিটাকে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবে আনয়ন পূর্ব্বক 'হিন্দু সমাজের' সৃষ্টি; আর্য্য এবং অনার্য্য আদর্শের অশেষ ভেদ-বাদের মধ্যে একটা স্বার্থ-সাম্যের প্রচলন; এই সমস্তই পুরাণ-চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য, ছিল। সুতরাং ওই লক্ষ্য যে কেবল ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত তাহা নহে; সমগ্র আর্য্য জাতির, হিন্দু-আদর্শের, এবং হিন্দু সমাজের স্বার্থ উহার মধ্যে বিজড়িত ছিল। এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-চেষ্টার সাহায্যেই ভারত-ভূমে হিন্দু-আদর্শ বিস্তৃত হইয়া তাহার হিন্দু-স্থান নাম সার্থক করে; আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই হিন্দু-সংজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, এবং আপনাকে অনন্ত পার্থক্য-বিশিষ্ট জাতি-নামে বিভক্ত করিয়া, ওই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত সামাজিকতার অন্তর্বর্ত্তী বিশেষ লক্ষণটাই কেবল উহার অশেষ সাম্প্রদায়িকতা। উহার দরুণ যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্য আদর্শ নির্ম্মল ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই, তেমন, ইংলণ্ড কিংবা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় জাতীয় ন্যায়, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি মধ্যে নির্ব্বিশেষ সম্মিলন ঘটনা করিয়া রাষ্ট্র বা 'নেশনে'র আদর্শ বিকাশিত করিতে পারে নাই।

পুরাণের মধ্যে হিন্দু সমাজের স্বার্থ।

এই সমাজ-ধর্ম্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার গতিকেই পৌরাণিক ভারতের সমাজে বা সাহিত্যে, কোথাও ব্যক্তির বিশেষত্ব সুপ্রকট হইতে পারে নাই। পুরাণেও নানা দিকে কেবল পরিবার এবং গ্রাম-সমাজের স্বার্থ-আদর্শই পরিস্ফুট; সর্ব্বোপরি উহার ব্রাহ্মণ্য। সময় সময় হয়ত পরিবারের উপরেও ব্যক্তির আদর্শ বলবান্ হইয়াছে—যেমন ধ্রুবপ্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তে। কিন্তু উহার সংখ্যা সামান্য: এবং এই সমস্ত ব্যক্তি-ত্বও কেবল বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা কল্পেই পরিকল্পিত। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের চরিত্রাদর্শও নানা দিকে ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, দাতা কর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি এইরূপে কেবল দান-ধর্ম্মের (ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দানের) আদর্শই বহন করিতেছে। একটা অতি স্বচ্ছ পর্দ্দার অভ্যন্তরে বিপ্রতন্ত্রীয় পূজা-পদ্ধতি এবং পূজা-প্রচারের জন্য ব্যাকুলতাই সরল ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। গ্রাম-সমাজ অথবা পরিবার অথবা ব্রাহ্মণ্যের স্বার্থসম্পর্কহীন নিখুঁত মনুষ্যত্বের আদর্শ পুরাণাদিতে কদাচিৎ মিলিবে। প্রাচীন রামায়ণ এবং মহাভারত গ্রন্থও যে পৌরাণিক যুগে ওইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আদর্শে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছিল, রামযুধিষ্ঠিরাদির বিপ্রপ্রিয়তা এবং 'ধার্ম্মিকতার' লক্ষণাদি তাহাই খ্যাপিত করিতেছে। সুতরাং পুরাণে ব্যক্তি-চিত্র মাত্রই ন্যূনাধিক অলীকতা লাভ করিয়াছিল। ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রকে উপাখ্যান-বিষয়-রূপে গ্রহণ করা হইলেও উহাকে একটা বিশেষ ভাবের 'সাজের' মধ্যে ফেলিয়া কেবল অনুরূপ বিশেষ লক্ষণগুলিই পরিস্ফুট করা হইত। প্রাকৃত 'মানব-চরিত্র' বা 'মানবতা'র আদর্শ পুরাণের ছিলনা। বিশেষ ভাব হইতেই পৌরাণিক ব্যক্তি-চরিত্রের সৃষ্টি; সুতরাং সাহিত্যের হিসাবে ভাবুকতাই পুরাণের প্রধান লক্ষণ। আমরা দেখিব, এই 'ভাবুকতাই

পুরাণে ব্যক্তিত্বের অভাব।

পরবর্ত্তী ভারতীয় সাহিত্যের, প্রাচ্য সাহিত্যের, য়ুরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যমাত্রের প্রধান ধর্ম্ম। পৌরাণিকতা হইতেই উহার সূত্রপাত। পৌরাণিক ভাবুকতা যেমন হিন্দু সমাজকে, তেমন হিন্দু সাহিত্যকেও চিরকালের জন্য বর্ণিত করিয়া গিয়াছে। এত কাল পরেও, উহা বরং অত্যন্ত-ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় সমাজ বা সাহিত্য শত চেষ্টা সত্বেও উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না।

এইরূপে পুরাণাদিতে সাম্প্রদায়িক লক্ষণাদি যেই পরিমাণে মুখ্যতা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই উহা নির্ম্মল সাহিত্যাদর্শ হইতে অত্যাচারী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পৌরাণিক আদর্শ ভারতবর্ষে যেমন সংস্কৃত ভাষাটাকে দেশের প্রাকৃত জীবন হইতে দূরে আনয়ন করিয়া পরিপোষণ এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সেইরূপ, প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও ইংরাজের প্রভাব কাল পর্য্যন্তই প্রবল ছিল। * এখনও যে উহার প্রভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সাহিত্য-রসিক পাঠক পুরাণ-গুলিকে এই সাম্প্রদায়িকতার ছায়া হইতে নিষ্কাশিত করিয়া পরিদর্শন করিতে না জানিলেই, উহারা নানা অনর্থের উপস্থাপন পূর্ব্বক নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াই আত্ম-পরিচয় করিতে থাকিবে। বিশেষ ভাবের সহানুভূতি এবং অধিকার লাভ না করিয়া পুরাণারণ্যে প্রবেশ করাই বিড়ম্বনা বই নহে।

এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা এবং ভাবুকতার পতিকেই পৌরাণিক ভারতের সাহিত্যে বা শিল্পে যেমন ব্যক্তি-চরিত্র কুত্রাপি পরিস্ফুট নহে, তেমন অন্যদিকে উহাদের মধ্যে ব্যক্তি-কর্ত্তৃত্ব বা ব্যক্তি-দায়িত্বও পরিস্ফুট নহে।

পুরাণে ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বের অভাব।

আমরা দেখিব, এই সমস্ত ব্যক্তি-লক্ষণের উপরেই আধুনিক সভ্যতা এবং সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর করিতেছে। পৌরাণিক সমাজে ব্যক্তির কোথাও আধিপত্য নাই। তাহার ধর্ম্ম যেমন খ্রীষ্ট কিংবা মহম্মদের ন্যায় কোন বিশেষ উপদেষ্টা বা প্রবর্ত্তকের নামে প্রচলিত নহে; তাহার সাহিত্যও তেমনি অকর্ত্তৃত্ব বা সমূহ-কর্ত্তৃত্বেই প্রচারিত হইয়াছে;—পুরাণ-কর্ত্তা ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি সমূহার্থক (generic) নাম মাত্র। লেখকগণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে গ্রন্থ রচনা করিয়া, নিজের নাম-মুদ্রা এবং "সারস্বত" যশোলাভের লোভটাকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া, ব্যাসাদির নাম-কর্ত্তৃত্বেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।† আপাত-দর্শনে এই নিস্পৃহ ভাব পরম গৌরবাবহ বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে; কিন্তু উহাদের মধ্যে রচয়িতার কোনরূপ সাহিত্য-স্বার্থ নাই, সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান।

কেবল সাহিত্য কেন, এই যুগের শিল্পাদিও যেন কেমন অকর্ত্তৃত্বের অথবা সমূহ-স্বার্থের আদর্শই বিজ্ঞাপিত করিতেছে!

পৌরাণিক শিল্পাদিতেও ব্যক্তিত্ব বা কর্ত্তৃত্বের অভাব।

যেই শিল্পী ভুবনেশ্বর অথবা কণারকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিংবা অজন্তা গুহা খোদিত করিয়াছিল, যেই হিন্দু ভারত-সমুদ্রের দ্বীপ বক্ষে ব্রহ্মদেশে বা শ্যামদেশে হিন্দু-সভ্যতার বিজয়পতাকা পরিচালিত করিয়াছে, যব-দ্বীপের মন্দির-গাত্রে যেই ভারতবাসী অনুপম স্থাপত্য-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদের নাম কিংবা মাহাত্ম্য স্মরণ রাখা আবশ্যক মনে

* বাঙ্গালার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসা কাব্য, চণ্ডী কাব্য, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি পৌরাণিক আদর্শেই বিরচিত। নবীনচন্দ্রের প্রভাস, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম প্রভৃতি নানা দিকে এই পৌরাণিক আদর্শের ভাবুকতা-প্রভাবই বহন করিতেছে।

† বঙ্গভাষার মধ্যেও চণ্ডীকাব্য প্রভৃতির 'স্বপ্নাদেশ' বা দেবতার আদেশ প্রভৃতি এইরূপ পৌরাণিক আদর্শের পরিচয় দিতেছে। অনেক আধুনিক লেখক ওই আদর্শ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

করে নাই। অন্ততঃ যাঁহাদের হস্তে লেখনীর ব্যবসায় ছিল, তাঁহারা উহার দরকার অনুভব করেন নাই। এই সকল শক্তিধর ব্যক্তি প্রাচীন-সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে দৈব ঘটনা বা বিশেষ ঘটনা বই নহেন। তাঁহারা সামাজিক সমতল-নিষ্ঠার মধ্যে এক একটা ঔদ্ধত্যের দৃষ্টান্ত! প্রাচীন সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে ওইরূপ দৃষ্টান্ত-স্থান নাই। এই জাতীয় দিগ্‌বিজয়িগণের পদতলে সমাজ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অগত্যা নতশির হইত! কিন্তু দিগ্‌বিজয় তাহার হৃদয়ঙ্গম আদর্শ নহে। গ্রাম-সমাজের চক্ষে গ্রাম-সীমার বাহিরে কোথাও স্পর্শ-যোগ্য পবিত্র-স্থান নাই। ওইরূপ আদর্শের গতিকেই প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নাই; রাজা কিংবা রাজত্বের ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতার বা ধর্ম্মগতির ইতিবৃত্ত কিংবা ব্যক্তিগত জীবনী গ্রন্থও নাই—থাকিতেই পারিত না! ব্যক্তি-গত উন্নতিমাত্রকে এই সমাজ ন্যূনাধিক ঔদ্ধত্য বলিয়া (abnormal বলিয়া) গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল! তাহার চক্ষে স্বাস্থ্য লক্ষণ মাত্রেই একটা নেমি-বৃত্তি বা দশানুক্রমীয় লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের কোন মহাপুরুষ 'হংস' হইলেই বা কি? তিনি বক-সমাজে পরম অনিষ্ট পদার্থ! প্রাচীন সমাজ ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্যটাকে কেবল এক দিকে মাত্র সহ্য করিতে পারিয়াছিল—উহা ওই আধ্যাত্মিকতার দিক। এই ক্ষেত্রেও, ভাল হউক বা মন্দ হউক সমাজ কোন কালে অভিনবতা পছন্দ করে নাই, বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। * (ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

* বলা বাহুল্য সকল প্রাচীন সমাজের এবং সামাজিক সংঘ-মাত্রের বেশী কম ইহাই রীতি। সংঘ মাত্রেই ন্যূনাধিক স্থিতিশীল না হইয়া পারে না। পরিবর্ত্তনমাত্রকেই সে 'বাধ্য হইয়াই' গ্রহণ করে, অপরিহার্য্য বস্তুটাকেই স্বীকার করিতে চায়। মনুষ্য-সভ্যতার স্বাস্থ্য ও স্থিতি নানা দিকে এই পরাচীনতার উপরেই নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যগতিকে ভারতীয় সমাজে, সংসারে ও অধ্যাত্মজগতে উহার অনুপাতটাই অত্যধিক হইয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমানে আমাদের দুর্দ্দশা। লেখক

নূতন ও পুরাতন

মরণ-রথের নিশান উড়ায়ে, দাঁড়ায়ে বিদায়-সাজে
গত বরষের জীবন আমার, মরীচিকা সম রাজে!
কিবা সকরুণ বেশ!
ফুল-কাননের প্রান্ত উজলি সোনালি হাসির শেষ!

সাঁঝের ছায়ায় ডুবায়ে কামনা, সাধনা ডুবায়ে জলে
কণ্টক-মুখে হিয়ার শোণিত মাখিয়া যাবে কি চ'লে—
পল্লবে দলিয়া পায়?
হের ছল ছল করে কত আঁখি, কি যে মায়া উথলায়!

আশার মুকুল ঝরে পদ-তলে 'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি,
সারা বরষের মমতা চরণে রেখেছে অমিয়া ঢালি!
যৌবনের ফুল ঝুরে,—
কোকিলা নীরব শুষ্ক তরু-শাখে, পাপিয়া গিয়াছে উড়ে!

বনের হরিণী সঁপে তব পায়, দুখভরা অকুরাণ
আয়ত আঁখির জলভরা দিঠি,—দিবার মতন দান!
ফিরিলে তুমি তখনি!
পূরবের তটে উঠিল ফুটিয়া নব আলোকের খনি!

নবীন মঞ্জরী ফোটে গো পাষাণে, পুলক নিঝর-বুকে,
অরুণ-রাঙ্গায় বন মন-লোভা কিবা নব অনুরাগে!
চাহিলে যেমনি হেসে,
পুরাণ ঢাকিল মুখ কিশলয়ে সুমধুর ছদ্মবেশে!

মুকুলের মুখে নীহারের জাল তাহে অরুণিত আশা,
তরুণ তারার মুকুতা-সেঁচনি, সে তো গো তোমারি নেশা,
নূতনের সমাচার!
ফুল ঝরে তাই, কুঁড়ি উঠে হাসি, ভাঙ্গা-গড়া অনিবার!

তাই পুরাতনে লাগ পাই আজ হিয়ায় নবীন বেশে;
তাই না শুকাতে চোখের সলিল, আর চোখ উঠে হেসে,

সুখ দুখ একাকার।
যে রাত পোহায়, আসে যে নূতন, জীবন নদীর পার!

দেখা তাহে পাই, মরণ-দেবতা গলে নব ফুল-হার!
পুরাতন মম, হে চিরনবীন, লহ মোর নমস্কার!
মরণ লুটায় পায়,
চির জীবনের ফুল ফুটি উঠে, ঘ্রাণে প্রাণ মুরছায়!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

—•—

চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলন

অতি প্রত্যুষে গোয়ালন্দ মেলে নৈহাটি আসিয়া পৌঁছিলাম। প্লাটফরমে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের দর্শন প্রত্যাশায় মুখ বাড়াইতেই, একটি মুসলমান যুবক সম্মিলনে যাইব শুনিয়া সঙ্গীদের ডাকিলেন ও নিজেরাই আমার জিনিসপত্র নামাইয়া কুলীর মাথায় তুলিয়া দিলেন। নিকটে গঙ্গার ঘাট, সেখানে নৌকায় পার হইতে হইবে।

প্লাটফরমে আরও কয় জন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রভাতের গঙ্গাবারি-বিধৌত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে স্বল্প পথ আরামে অতিবাহিত হইল। পথিপার্শ্বস্থ দোকান-সমূহে দিবসের কার্য্য-কোলাহল তখনও জাগিয়া উঠে নাই। নৈহাটির সেই পরিচিত গঙ্গার ঘাটে আমাদিগকে একখানি নৌকায় তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ ষ্টেসনে ফিরিয়া গেলেন। এত আদরের পর তাঁহারা আমাদিগকে গঙ্গাবক্ষে নির্ভরহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিবেন এরূপ প্রত্যাশা করি নাই বলিয়া, একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল; সঙ্গীরা কেহ কেহ এই ব্যবস্থার একটু নিষ্করুণ সমালোচনাও করিলেন। পরে বুঝিয়াছিলাম যে, কোন কারণবশতঃ সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবকগণের সংখ্যার অল্পতা ঘটাতে এরূপ হইয়াছিল।

মৃদুপবন-সঞ্চালিত গঙ্গাবক্ষে চারিদিকের উন্মুক্ততা অনুভবে সকলেরই মনে একটু আনন্দ উপস্থিত হইল। পরপারের দৃশ্যপট নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। ভাগীরথীর শীতল জলে হাত মুখ ধুইয়া লইলাম। সঙ্গে এক অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পত্রিকা-সম্পাদক। অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক স্বয়ং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিশেষ নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবেন। বোধ হইল ইনি স্থানের নামগত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় আমোদ অনুভব করেন। নদী পার হইতে হইতে 'চুঁচুড়া' ও 'চিন্‌সুরা' এই নাম দুটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মৌলিকত্বের প্রকট পরিচয় দিলেন। পরে দেখিয়াছিলাম, প্রবন্ধরচনায়ও ইহার চিন্তা-প্রবাহ গগনবিহারী।

প্রাতর্ভ্রমণার্থ নদীতীরে সমাগত জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে ষাঁড়েশ্বর তলায় ট্রেনীং একাডেমিতে উপস্থিত হইলাম। যে সকল ব্যক্তি নৈহাটি হইতে আসিবেন তাঁহাদের জন্য ট্রেনীং একাডেমি, ও যাঁহারা হাওড়া হইতে আসিবেন তাঁহাদের জন্য 'ডাচ্ ভিলা' বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এ স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পূর্ব্বে বড় বেশী প্রতিনিধি আসেন নাই। কেবল সশিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় পূর্ব্বদিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি শিষ্য সঙ্গে স্কুলগণ্ডীর মধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অক্ষয় বাবুর পুত্র অজর বাবু ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই সম্মিলনের সহকারী সম্পাদক। ট্রেনীং একাডেমির অধ্যক্ষ হেমশশী বাবু পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সময়োচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক ইঁহারা অভ্যাগতগণের নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পবয়স্ক বালকেরা চা ও মিঠাই আনিয়া প্রাতরাশের যোগাড় করিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে পরিচিত অপরিচিত বহু সাহিত্যানু-

রাগী পৌঁছিতে লাগিলেন। স্কুল ঘরের প্রশস্ত কক্ষগুলিতে আমাদের বিছানা বিস্তৃত হইল। দস্তুর মত একটা সাহিত্যিক সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এই রাজ্যের সভাপতি স্বরূপ প্রফুল্লচন্দ্র ও শশধর রায় মহাশয়ের স্থান একটু দূরে একাডেমীর প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ দোতালায় নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে একটু সুব্যবস্থা মনে করিলাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গল্পগুজবে এমন আসর জমাইয়া দিলেন যে তাঁহাকে ছাড়া হইল না।

স্নানাহার সারিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ, বহু দিন পরে ভাগীরথীবক্ষে অবগাহন করিতে পাইয়া সেই পূত-স্নিগ্ধ সলিলরাশি ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমাদের বিলম্ব দেখিয়া অজর বাবু আমাদিগকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আসিলেন। সকলে একসঙ্গে অভিযান করিয়া প্রায় এক মাইল দূরস্থিত মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সভার কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে।

সভায় লোকসংখ্যা প্রথম অধিক ছিল না। মধ্যযোগে কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক সেই মাত্র আসিয়া লোকসংখ্যার বৃদ্ধি করিলেন। আবার সভার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইঁহারা চলিয়া গেলেন। কলিকাতার এরূপ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে বোধ হয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কারণ এইরূপ অভ্যাগতগণ অনেকেই নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থানে উপস্থিত হন নাই; সম্মিলনে আসিবেন কি না, বা কখন আসিবেন এরূপ সংবাদও বোধ হয় দেন নাই। কলিকাতা হইতে নৈহাটি ও চুঁচুড়ায় দিনে বহুসংখ্যক গাড়ী আসে। এরূপ অবস্থায় অভ্যাগতগণ স্বস্ব সুবিধামতে রোজ যাতায়াত করিলে অভ্যর্থনার সুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কার্য্যের প্রারম্ভে প্রেরিত কবিতা পাঠের পৌর্ব্বাপর্য্য লইয়া একটু গোলমাল সভাপতির অমায়িকতায় উপক্রমেই নিরাকৃত হয়। অক্ষয় বাবুর মিঠে-কড়া রকমের অভিভাষণ ও সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইবার পর, সভায় উপস্থিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় সম্মিলন-কার্য্য সম্বন্ধে একটি সুবোধ্য হিন্দী বক্তৃতা দেন।

অতঃপর যথাবিহিত প্রবন্ধাদি পাঠের পর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হইল। কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় সভাস্থ সকল প্রতিনিধিই ঐ সমিতির সভ্য গণ্য হইলেন এবং স্থির হইল যে, ইঁহাদের মধ্যে কয়জন রাত্রে সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের বাস ভবনে সমবেত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সভায় আরও স্থির হইল যে, সাধারণ সভার কার্য্যে ক্রটী না হয় এরূপ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের আলোচনা-যোগ্য প্রবন্ধগুলি অন্য সময়ে স্বতন্ত্র সভায় পঠিত ও আলোচিত হইবে।

বাসায় ফিরিয়া জলযোগ সমাধা করিয়া কয়েক জন প্রতিনিধি মহারাজের বাসস্থানে গমন করিলেন। রাস্তায় গাড়ীতে পথিপার্শ্বস্থ বালক নিক্ষিপ্ত এক মুষ্টি ধূলি গায়ে পড়িয়া, দোলপূর্ণিমায় পথচারীর বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া সাবধান করিয়া দিল। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে যথেষ্ট কালক্ষয় করিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন মাত্র করা হইল। পঠিতব্য, পঠিত বলিয়া গৃহীত, একেবারে নিগৃহীত এই রূপ তিন শ্রেণীতে প্রবন্ধগুলি বিভক্ত হইল; আর বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র সভার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই নির্ব্বাচণে কোন বিশেষ নিয়ম বোধ হয় অনুসৃত হয় নাই, পরন্তু সভাস্থলে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছিল।

সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবীগণের আসিবার কথা। এস্থানে প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটু সতর্কতার প্রয়োজন। কেবল দূরাগত অথবা নবীন লেখক বলিয়া প্রবন্ধকারকে উৎসাহ প্রদান জন্য প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইলে সমস্ত ব্যাপারটিকে লঘু করিয়া দেওয়া হয়।

পরদিন প্রাতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক অধিবেশন হইল। সাধারণের বোধগম্য কয়েকটি সুলিখিত ও সুপঠিত প্রবন্ধ শুনিয়া সকলে তৃপ্ত হইলেন। পরিভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞগণ

কর্তৃক পঠিত ও আলোচিত হইল। প্রাগুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ যদি মূল সভায় পঠিত হইত তবে আরও বহু লোক উপভোগ করিতেন, এবং সর্ব্বসাধারণ সম্মিলনের প্রবন্ধ-সম্পদ এত হীন জ্ঞান করিতেন না। নির্ব্বাচন-সময়ে পঠিত না হইয়া শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছিল।

আমাদের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যদি যশাকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব গবেষণার বিষয় য়ুরোপীয় পত্রিকা ছাড়িয়া বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত করেন তবে তাঁহাদের মহত্বের পরিচয় পাইব, ও বঙ্গ ভাষার উপকার হইবে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত দ্রব্যজাতের ঐতিহাসিক বিবরণও যদি সম্মিলনের বিশেষ বৈজ্ঞানিক অধিবেশনেরই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে যাঁহারা বিজ্ঞান-সম্পদে মাতৃভাষার উপকার করিতে চাহেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য আত্মঘাতী হইবে। বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা-মূলক আলোচনার সময় পাইবেন না, আর সাহিত্য-সেবক বিজ্ঞানকে সাহিত্য হইতে দূর জ্ঞান করিবেন।

এই দিন দ্বিপ্রহরের অধিবেশনে লোকসংখ্যা পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও কম হয়। মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে সকলেই সভা-মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকের চালার নীচে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই আকস্মিক দৈব ঘটনা জমিদার ও সামান্য দর্শককে এক ছত্রের তলে আনিয়া একত্র করিয়া দিল। ঝড়ের অবসান হইলে সভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল। প্রবন্ধের পরে প্রবন্ধ কবন্ধ রূপে পঠিত হইতে লাগিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই ঘটিল যে, পূর্ব্বদিনের বৈঠকে যে একটি প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের অবমাননা সূচক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ হইল। এই প্রতিবাদের পালা এই খানেই শেষ হয় নাই।

সভা ভঙ্গ হইলে সম্মিলনের সম্পাদক রায় বাহাদুরের নিমন্ত্রণে তাঁহার সুদৃশ্য ভবনে অভ্যাগতগণ সান্ধ্য সম্মিলনে যোগদান করেন। সময়াভাবে রায় বাহাদুরের আয়োজনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইল না, কারণ তারপরেই সভামণ্ডপে আলোক-চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

এই চিত্র প্রদর্শন বড়ই মনোরম হইয়াছিল। কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত ভারতীয় প্রস্তর-শিল্পের নিদর্শন, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যফললব্ধ ঐতিহাসিক নিদর্শন, পাথর কয়লার প্রকার-ভেদ ও ভূগর্ভে সংস্থান-পর্য্যায়, বিহারে আধুনিক নীলকুঠির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি সুন্দর চিত্র দর্শনে সকলে সম্মিলনের বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, শেষোক্ত বিষয়ের প্রদর্শক স্বয়ং উপস্থিত না থাকায় চিত্রগুলি বুঝাইয়া দেওয়ার সুব্যবস্থা হয় নাই। সম্মিলনের এই অতি প্রয়োজনীয় অংশটি অতি অল্প সময়ে শেষ করিবার জন্য অনাবশ্যক ত্বরা করিতে হইয়াছিল কারণ, তাহা না হইলে কলিকাতায় ফিরিবার গাড়ীর সময় চলিয়া যাইত।

রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া দেখি জলখাবার ও অতি গুরুতর নৈশ আহারের আয়োজন হইয়াছে। সদ্ব্যবহারের ক্রটি হইল না, তারপর রাত জাগিয়া ক্ষীরোদ প্রসাদের গল্পের আসর বসিল।

কিছু পরে তিনজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা 'ডাচ ভিলার' অনেকের মত লইয়া আসিয়াছেন, আজ যে ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইয়াছে উহাতে প্রবন্ধপাঠক ও—বাবুর প্রতি আক্রোশ আছে, তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। এই প্রতিবাদ প্রসঙ্গে ঘোর তর্ক দেখিয়া শয়ন করিব বলিয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। কিন্তু অনেক ক্ষণ নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, আগন্তুক তিনটি চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ৩৷৹ ঘটিকার সময় আবার শয্যাগ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম যে, বারান্দায় টেবিলে অভ্যাগতগণের যে তালিকা ছিল, তাহা পাওয়া যাইতেছে না। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কয়েক জন চুঁচুড়ায় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইলেন, আমরা কয়েক জন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীতে তাহার সঙ্গে নিকট পরিচয় করিতে গেলাম।

কয়েক জন সাহিত্যিক সেখানেই অতিথি ছিলেন। পরস্পর আলাপ ও নানা বিষয়ে গল্পের পর ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহারান্তে আবার সভামণ্ডপে গেলাম।

প্রবন্ধাদি পাঠের পর নানা বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বহু বিতর্কের পর আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইল. সম্মিলন পরিচালন সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। বোধ হয় ক্ষেত্রান্তরে অনুসৃত নীতির অনুকরণেই এক জন মুসলমান ও এক জন হিন্দু এই সমিতির সম্পাদকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

অতঃপর ধন্যবাদের পালায় পাল্‌টা বক্তৃতা চলিল। এই পরস্পর প্রশংসা ব্যাপারের মধ্যেও একটি হৃদ্যতার ভাব স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। প্রথমে সম্মিলনের পক্ষপাতী না থাকিয়াও মাতার স্বপ্নাদেশে শেষে কি প্রকারে সম্পাদক পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়াইলেন মহেন্দ্র বাবুর মুখে সেই মর্ম্মোত্থিত সরল স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে সম্মিলন ব্যাপারে অতিমানবীয় মঙ্গল প্রভাব স্বীকার করিলেন।

তারপর বাসায় ফিরিয়া সদ্যঃ প্রস্তুত আহার্য্যে উদর পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। বিদায় গ্রহণ সর্ব্বত্রই নিরানন্দময়। বিশেষতঃ এই কয়দিন বহু দূরবাসী সকলে এক সঙ্গে বিশেষ আমোদেই ছিলাম। অধ্যক্ষ হেমশশী বাবুও তাহার সহকারী স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রগণসহ এ কয় দিনে আমাদের বড় আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহারা কেহই আমরা শয়ন না করিলে আহারাদি করিতে বাড়ী যাইতেন না, ও আবার আমাদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই হাজির হইতেন। ইঁহাদের ও দ্বাদশ বর্ষের অনধিক বয়সের বালকগণের এই সহৃদয় পরিচর্য্যা এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। যাত্রার কালে তাড়াতাড়িতে কুলী জুটিল না দেখিয়া ইহারা নিজেরাই আমাদের জিনিস পত্র বহিয়া আনিয়া গঙ্গাবক্ষে দুইখানা নৌকায় তুলিয়া দিয়া স্নেহ-করুণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর কৌমুদী প্লাবিত গঙ্গাবক্ষের শান্ত সুষমা উপভোগ করিতে করিতে নৈহাটির তীরে পৌঁছিয়া গাড়ীর জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

উপসংহারে দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শুনিলাম এ বারে সম্মিলনকে প্রকৃত সাহিত্যিকের সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমস্ত সভ্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সাহিত্যিক না হইলেও সাহিত্য-প্রেমিক বটে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষের সমস্ত সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার ভীতি উৎপাদন করিবে না ত?

শুনিলাম, চুঁচুড়া সম্মিলনে আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল। বঙ্গ ভাষার যাবতীয় পত্রিকার লেখকগণকে ও গ্রন্থকারগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অবশ্য উদ্যোগ কালীন অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিতে হয় ত বহু লেখকের এই সৌভাগ্য ঘটে নাই. কিন্তু এই রীতি পরিগৃহীত হইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিলে অতিশয় আনন্দের কথা হইবে সন্দেহ নাই।

যে সম্মিলন সম্পর্কে এক জন মহিলার সভাপতিত্বের কথা উঠিয়াছিল, যে স্থান কলিকাতার এত নিকটবর্ত্তী সে স্থানে সভা-স্থলে মহিলা দর্শকের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ প্রতীতি হওয়া বিচিত্র নহে যে, মহিলাগণ ইচ্ছা করিয়াই সম্মিলনে যোগদান পরিহার করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের পরিচালন-সমিতি থাকা সত্ত্বেও কার্য্য-সম্পাদনে শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের ঘোরতর অভাবে অভ্যাগতের বিরাগ জন্মে।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে উপযুক্ত সময় প্রদত্ত হয় না বলিয়া অনেক নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ সভার অনুপযুক্ত হয়।

কেবল বৈজ্ঞানিক নূতন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্তই স্বতন্ত্র বৈঠকের বন্দোবস্ত করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া সকল প্রবন্ধই যথা সম্ভব বিষয়ভেদে পর পর পাঠের ব্যবস্থা করিলে অনেক সুবিধা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রসূত ফলের বিচার সাধারণ সম্মিলনে না করিয়া তজ্জন্ত বৈজ্ঞানিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত কি না ইহা সাধারণের বিবেচ্য।

সম্মিলনের অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদৃচ্ছাক্রমে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত না হইয়া পারে না, এবং ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধার অনুরোধে সাধারণের বিরক্তিকর বা অসুবিধা জনক ব্যবস্থা করা পরিতাপের বিষয় হয়।

কর্ম্মচারিগণের অভাব না থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হইয়া বিষম অসুবিধা ঘটাইয়াছে। অনেক প্রবন্ধলেখক সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি না, বা কত সময়ের মধ্যে পড়িতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিতেই পারেন নাই।

সম্মিলন-পরিচালনার দ্বৈত শাসন-প্রণালী বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। সম্মিলন-সমিতি ও স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির মধ্যে কার্য্য বিভাগ রেখাঙ্কিত না থাকাতে কে কোন কার্য্য করিবেন স্থির হয় না। সম্মিলনের অধিবেশনের সমস্ত ব্যবস্থা স্থানীয় সমিতির হস্তে না থাকিলে সুবন্দোবস্তের অভাবের জন্য দায়িত্ব কাহার তাহা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সাধারণে অবশ্য প্রত্যক্ষতঃ যাহার দায়িত্ব, তাহাকেই দোষী করিবে। যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হয় তত্রত্য অধিবেশন-কার্য্যের ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহারা সম্মিলন আহ্বান করিয়া থাকেন। পরিচালন-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ সাহায্য করিতে গেলেও সাধারণের নেত্রপথে তাহাদের অত্যন্ত উপস্থিতি ও অগ্রণীপদগ্রহণ সামান্য সতর্কতার অভাবেই কেবল অতিথি-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হয় তাহা নহে, অভ্যাগতগণ এক বার অগ্রসর হইলেই স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তাগণ আতিথেয়তা ও সৌজন্য ক্ষুণ্ণ হইবে ভয়ে ক্রমেই অগ্রভূমি হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ফলে কোন রূপ ত্রুটি ঘটিলে সহৃদয় সাহায্যকারীগণ কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অযথা অপ্রীতিকর সমালোচনা প্রাপ্ত হন, এবং লোকলোচনসমক্ষে তাহাদের অস্তিত্ব প্রবল না থাকায় সকলেই স্থানীয় কর্ম্মীগণের আন্তরিকতা ও কর্ম্ম-কুশলতা সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করেন। স্থানীয় শক্তিকে দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিবার অবসর দেওয়া হইলে সার্থকতা বৃদ্ধি পাইবে।

সম্মিলনের দিন কয়েকটি এরূপ ব্যাপারবহুল হয় যে, সমাগত সাহিত্যসেবীগণের পরস্পরের পরিচয়ের সুযোগ ও অবসর একেবারেই থাকে না। এমন কি আরামের সহিত স্নানাহার করিবার সময়েরই অপ্রতুল ঘটিয়া থাকে। শৃঙ্খলার সহিত বিধান করিলে এ বিষয়ে অনেক সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সম্মিলনের দৈনিক অধিবেশনের সময় স্থির নিয়মিত করিয়া দিলে অবশিষ্ট কালে আগন্তুগণ নিজেরা পরিচয়াদির ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। নিমন্ত্রিতগণের নিবাসস্থান দূরে দূরে অবস্থিত হইলে এ বিষয়ে আরও অসুবিধা হয়। সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি পরস্পর পরিচয়ে প্রকৃত সম্মিলনের সুযোগ না ঘটে তাহা হইলে দূরস্থ বহু সাহিত্যিক ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবেন, সম্মিলনে সশরীরে যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

ভ্রাতা ও ভগিনী

১

চারিদিকে পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল নদীতে বেষ্টিত একটি দ্বীপের প্রধান সহরে তারানাথ এক জন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। অতি স্পষ্টবক্তা লোক, কাহারও সহিত তর্ক বাধিলে মুখে যা আসে তাই বলিত। তবু সহরের ইতর ভদ্র সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

গোপীনাথ নন্দী সেখানকার শ্রেষ্ঠ মোক্তার। কৃপণ বলিয়া তাহার বেশ খ্যাতি ছিল,এবং তাহার প্রসঙ্গ উঠিলে কেহ মন খুলিয়া কথা বলিত না। মানহানির মোকর্দ্দমায় এক ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ্য আদালতে ক্ষমাপ্রার্থন

করাইয়া সে নিজের মান বজায় রাখিয়াছিল। সহরবাসী গোপীনাথকে সেজন্য সকলে ভয় করিত ও সন্দেহের চোখে দেখিত।

তারানাথের পুত্র বীরেন গোপীনাথের একমাত্র পুত্র বিপিনকে খেলিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছে।

অল্প পরিসর খালে ভাটার জল তর্ তর্ করিয়া চলিতেছে। অনুচ্চ ছোট কাঠের পুলের উপর বসিয়া বীরেন ও বিপিন গাছের পাতায় নৌকা তৈয়ার করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। বিপিনের নৌকা বারে বারেই আগে যাইতে লাগিল। বীরেন চটিয়া বলিল, "জায়গার দোষ।"

দুজনে পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নৌকা ছাড়িল। এবার বীরেনের নৌকা খালের বাঁকে পাড়ের ভূমিখণ্ডে আট্‌কাইয়া গেল।

একটি গৌরবর্ণা ছয় বৎসরের মেয়ে বীরেনকে ডাকিয়া বলিল "দাদা" এই দেখ, সন্দেশ আনিয়াছি।" বালিকার পরিধানে একখানি নীলাম্বরী সাড়ী, ঘনকৃষ্ণ অলকদাম তাহার মাথার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে বিপিনকে দেখিয়া "আর একটা নিয়া আসি" বলিয়া চঞ্চলা বালিকা দৌড়িয়া গেল; ফিরিয়া আসিয়া ছোটটি নিজে রাখিয়া বড় দুটি বীরেন ও বিপিনকে দিল।

বিপিন বলিল, "দেখ্, দুলি," বীরেন নিজে সাধিয়া আমার সঙ্গে খেলিতে আসিয়া হারিয়া গেল।"

বীরেন বলিল, "এখনই কি? শেষ হইলে কে জিতিবে দেখিব।"

আরও দুই চারি বার নৌকা ছাড়া হইল। বীরেনের দুর্ভাগ্য, তার সব কখানি পাড়ে লাগিয়া রহিল। বিপিনের নৌকা বাতাসে অল্প হেলিয়া দুলিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এ উপহাস বীরেনের আর সহ্য হয় না। সে বিপিনের নৌকা লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িল। ঢিল নৌকা ছাড়াইয়া পড়িল, পাতা ছিঁড়িল না। কতক জল ছিটিয়া উঠিয়া বিপিন ও দুলালীর হাসির সঙ্গে সঙ্গে বীরেনের গায়ে পড়িল। রাগে ক্ষেপিয়া বীরেন আর একটা ঢিল ছুড়িল। বীরেনের নৌকা জলের আন্দোলনে বন্ধনমুক্ত হইয়া বিপিনের নৌকার সমকক্ষ হইয়াছিল, এই ঢিলে উভয়ের নৌকাই ছিঁড়িয়া গেল।

বিপিন বলিল, "আমি আর খেলিব না।"

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। বালকবালিকারা বাড়ীতে চলিয়া গেল।

পথিপার্শ্বস্থ ঝাউগাছগুলি পূর্ব্বের মত সোঁ সোঁ করিতে লাগিল।

২

তিন চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। তারানাথের ব্যবসায় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গোপীনাথের পসার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে।

হঠাৎ এক দিন গোপীনাথ আসিয়া তারানাথের কন্যার সহিত বিপিনের বিবাহ প্রস্তাব উথাপন করিল। তারানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বলেন কি, মহাশয়! আমার দুলালী অপূর্ব্ব রূপসী।"

গোপীনাথ বলিল, "বিপিন আমার একমাত্র পুত্র। আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইবে।"

"সম্পত্তিই ত সংসারে সমস্ত নয়।"

"সরকার মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনার বৃদ্ধ বয়স, তা'তে ব্যবসায়ে তেমন হইতেছে না। কোথায় পাত্র খুঁজিবেন। এমন ভাল বর পাইবেন না।"

"নন্দী মহাশয়, আপনি ছেলের বাপ, বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন, মেয়ের বাপ তাহা প্রত্যাখান করিয়াছে। ইহা যদি যথেষ্ট মনে না করেন, তা' হলে বলিতে হয় যে, আমার বৈষয়িক বা পারিবারিক বন্দোবস্তে আপনার পরামর্শ চাই না। আপনি যাহাদের মোক্তার তাহাদিগকে পরামর্শ দিলে বরং কিছু লাভ হইতে পারে।"

"লাভ কিছু আপনারই হইত। সকলের দৃষ্টি ভুলাইলেও আমার কাছে আপনার কারবারের লোকসানের কথা অজানা নাই। ভাবিয়াছিলাম, পালেদের যে ডিক্রীটা কিনিয়াছি, আমার পুত্রবধূ হইলে আপনার মেয়েকে সেই খানা দিয়া মুখ দেখিব—"

"মহাশয়, আগে সেখানাই আবার বেচিয়া ছেলের

পিঠের কুঁজটি মেরামত করাইয়া লইবেন। আমার মেয়ে অঙ্গহীনা নয়।"

গোপীনাথ আর কথা বলিল না, তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল।

৩

ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তারানাথের বাড়ীতে ডিক্রিজারি করাইতে গোপীনাথ স্বয়ং আসিয়াছিলেন। ক্ষোভে ও অপমানে জর্জ্জর হইয়া তারানাথ এক লাঠিতে তাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে।

সকলে তাহার চিকিৎসায় ব্যতিব্যস্ত। থানা পুলিস হয় নাই।

পিতা একটু সারিয়া উঠিলে, বিপিন শুনিল, কয়েক দিনের প্রবল জ্বরে তারানাথের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে।

আজ তারানাথের অবস্থা একটু ভাল, জ্বরের প্রকোপ কমিয়াছে, মানসিক অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। সকলকে ঘর হইতে সরাইয়া দিয়া কেবল বীরেনকে কাছে ডাকিয়া তারানাথ বলিল, "বীরেন, আমার অবস্থা আজ কিরূপ দেখিতেছ?"

"বাবা, তুমি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবে।"

"না, বাবা এই আমার নির্ব্বাণের পূর্ব্বের সজীব অবস্থা। শীঘ্রই তুমি পিতৃহীন হইবে। তোমার বয়স এখন সতেরো কিন্তু আমার জ্ঞানে তুমি সাবালক। তোমার পিতার শেষ কথা রাখিও। যে কর্ত্তব্য পালন করিতে আমার প্রাণ গেল সে কর্ত্তব্য এখন হইতে তোমার হাতে দিয়া গেলাম।"

কতক্ষণ গৃহে নীরবতা ব্যাপিয়া রহিল। বীরেনের নেত্রদ্বয় অতি কষ্টে অশ্রুরাশি পল্লবের অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তারানাথ বলিতে লাগিল, "কয়েক মাস পূর্ব্বে গোপী মোক্তার আমার পিতৃস্নেহ কিনিতে আসিয়াছিল। আমি স্বীকার করিলে তা'র মাথা ফাটিত না, আমার এ অবস্থা হইত না, তোমাকে আর ক' দিন পরে ভিটা ছাড়া হইতে হইত না। কিন্তু দুলালী তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য লইয়া গোপীনাথের মর্কট পুত্র বিপিনের পত্নী হইত। আমি তাহাতে রাজি হই নাই—ফল এই!"

বীরেনের অশ্রুজল আর বাহিরে আসিল না, চোখের মধ্যেই শুকাইয়া গেল। এক হাতে পালঙ্কের মশারি খাটাইবার কাষ্ঠখণ্ড দৃঢ় রূপে ধরিয়া সে নিশ্চল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। দুই গণ্ডের মাংস কঠিন হইয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধ মনের আবেগ দৈহিক লক্ষণে কথঞ্চিৎ ফুটিয়া বাহির হইল।

তারানাথ বলিতে লাগিল, "আমার নিজের হাতে করা বাড়ী ঘর, ব্যবসায়, নিলাম হইয়া যাইবে, আর ধূর্ত্ত গোপীনাথ তাহার মালিক হইয়া আমার অপমানে উল্লাস করিবে, ইহার পূর্ব্বে আমার মরণই বর। দুঃখ এই যে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও ভিটা ছাড়া হইতে হইল। কিন্তু পুত্র, ধনসম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। দেখিও যেন সুখের প্রলোভনে আমার দুলালীকে সেই কুরূপের অবতারের হাতে দিও না। আর পার ত আমাদের পৈতৃক বাড়ীখানি আবার উদ্ধার করিও।"

মানসিক উত্তেজনায় শ্রান্ত হইয়া তারানাথ নিরস্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে বীরেন দেখিল, পিতার তন্দ্রার আবেশ হইয়াছে; নিঃশ্বসিত দীর্ঘ বায়ু প্রবাহে এক'বার তাহার বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল, আবার শৈশবাত্যন্ত সুখভোগের স্মৃতিগুলি অন্তরের মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া সেই বায়ুরাশি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হইল না। ধীর পদে বীরেন পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিল।

নিশাশেষে তারানাথের অন্তিম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। রোরুদ্যমানা পত্নী ও কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া তারানাথ বলিল, "বীরেন আমার উপযুক্ত পুত্র রহিল। আজ হইতে সে-ই সংসারের কর্ত্তা। সে থাকিতে তোমাদের কোন চিন্তা নাই।"

৪

তারানাথের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছে। তাহার বাড়ী ও ব্যবসায়ের স্থান সমস্ত নীলাম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গোপীনাথের মৃত্যু হওয়াতে নীলাম খরিদ করিয়াছে, প্রতিবাসী উমাচরণ। বিপিন আর প্রায় বাহিরের কোন কাজের মধ্যে থাকে না।

তিন ক্রোশ দূরে রূপগঞ্জে পিসামহাশয় নবীনচন্দ্রের তামাকের ব্যবসায়ে বীরেন সামান্য বেতনে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। দিনান্তে আসিয়া মা ও ভগ্নীসহ ক্ষুদ্র কুটীরে নিশা যাপন করিত।

এক দিন দীর্ঘ দিবসের শ্রমে ক্লান্ত বীরেন বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে, বাহিরে বিপিনের ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "বাবু বাড়ীর ভিতরে আছেন।"

বীরেনের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। যে দুর্দিনে তারানাথের লাঠিতে গোপীনাথ আহত হয়, তাহার পরে আর এই দুই বাল্যসঙ্গীর পরস্পর সাক্ষাৎ ছিল না।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বীরেন দেখিল, বিপিন বারান্দায় বসিয়া মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছে, দুলালী ঘরের দ্বারে বসিয়া আছে।

"বিপিন, তোমার ও আমার পিতার মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে তোমার এখানে আসা আমরা প্রত্যাশা করি না।"

"না হয় অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসিয়াছি। তা বলিয়া আমাকে কি তাড়াইয়া দিতে চাও।"

"তুমি নিজেই যদি আসা ক্ষান্ত কর, তবে আর সেরূপ করার প্রয়োজন হইবে না।"

বিপিনের রক্তহীন মুখে একটু চমক লাগিল। মা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। দুলালী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দাদা, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিজের বাড়ীতে অপমান করা ভদ্রতা নয়।"

বীরেন ক্রোধরুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার নিকট আমি ভদ্রতা শিখিব না। ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের দুরবস্থায় কৃপা দেখাইতে আসিয়াছেন!

"বিপিন, তুমি আর এখানে আসিও না, আর এখানে থাকিও না। আমি আর আমাকে থামাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। আবার তোমাকে এখানে দেখিলে তোমার দেহের বিকলতাও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

বীরেনের মা আস্তে আস্তে বিপিনকে টানিয়া লইয়া বাড়ীর দ্বারে দিয়া আসিলেন।

বিপিন চলিয়া গেলে ভাইভগ্নীতে বিষম ঝগড়া হইয়া গেল। দুলালী রাগ করিয়া বলিল, "তোমার আশ্রয়ে থাকা হইতে মরাও ভাল।"

বীরেন বলিল "বেশ, কাল হইতে আমি পিসির বাড়ীতে তোমাকে রাখিয়া দিব।"

পরে বীরেন মাকে বুঝাইয়া দিল যে, বিপিনের সঙ্গে দুলালীর বিবাহ হইতেই পারে না। পিতার শেষ আদেশের কথা বলিল। বীরেনের ভাব দেখিয়া মা কন্যার জন্য বিপিনের অতুল ঐশ্বর্য্যের আশা আর রাখিলেন না।

(৫)

বড় নদীর ওপারে চরে একটা হাট বসিত। পিসিমার অজ্ঞাতে পিসামহাশয়ের কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া বীরেন নিজের সঞ্চিত ধনে সেখানে সামান্য কারবার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে বেশ লাভ হইতেছে শুনিয়া পিসিমা দুলালী ও তাহার মাতাকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যহ কথায় কথায় শুনাইয়া দিতে লাগিলেন, তিনি বহু পূর্ব্বেই জানিতেন যে এরূপ হইবে।

অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুর ক্রোড়ে জননীর দুঃখ-যন্ত্রণার শান্তি হইল; কিন্তু দুলালীর জীবন বড়ই দুঃখকর হইয়া উঠিল।

পিসিমা ও পিসা মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বনিত না। পরিবারের মধ্যে পিতাই তাহার পক্ষে ছিল; অথচ সেই পিতার অবর্ত্তমানে তাহার একমাত্র সম্বল

দাদার সঙ্গে তাহার সদ্ভাব ছিল না, বহু দিন হইতে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল। তাহার এই সহানুভূতিহীন গোড়া অগ্রজের ব্যবহার তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল।

দাদা আশৈশব তাহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে সেগুলির স্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল।

দুলালীর উপরে তাহার টিয়া পাখীটিকে খাওয়াইবার ভার দিয়া বীরেন এক বার দুই মাসের জন্য মামার বাড়ী গিয়াছিল। কেমন করিয়া তাহার ভুলক্রমে অনাহারে পাখীটির প্রাণ যায়। বাপ মার কাছে প্রাপ্ত পরবীর সমস্ত পয়সা দিয়া আর একটি টিয়া পাখী কিনিয়া দিয়া দুলালী তাহার অনুতাপ ও অনুশোচনা লাঘব করিতে চাহিয়াছিল। বীরেন ঘৃণা-দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং দুলালীর জন্য যে মাছ ধরিবার ছিপটি তৈয়ার করিয়াছিল, সেটি মাসতুত বোনকে দিল। তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া শৈলকেই মাছ ধরিবার সাথী করিয়া দুলালীর প্রতি সে ভ্রাতৃস্নেহহীনতার যে তীব্র অরোপ করিয়াছিল, দুলালী তাহার বিরুদ্ধে কোন গ্রাহ্য প্রতিবাদ প্রকাশ্য ভাবে দাখিল করিতে পারে নাই।

দুলালী বাহিরের কোন কাজে দেখাইতে পারে নাই যে, স্নেহে তাহার হৃদয় পূর্ণ। বরং এই নির্ম্মমতার প্রতিশোধ ল'তে নিরপরাধিনী শৈলকে খালে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার পরিধেয় কর্দ্দমলিপ্ত করিবার ফলে বাড়ীর সকলের কাছে দুলালী একরাশি গঞ্জনা লাভ করিয়াছিল।

এইরূপ দাদার শৈশবের ব্যবহারের এক দিক আজ রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, দাদা তাহার মন কখনও বুঝিবেন না। দুলালী স্নেহের বশে যাহা করিয়াছে, তাহাই দৃষ্টতঃ স্নেহের অভাব সূচনা করিয়া দিয়া তাহাকে লাঞ্ছনা-ভাজন করিয়াছে।

এই দৃঢ়প্রকৃতি দাদাকে সে চিরকাল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিয়া আসিয়াছে। সে জানিত তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়, প্রবৃত্তি অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার মনের ভাবের সঙ্গে দুলালীর মন কখনও খাপ খায় নাই। কিন্তু রক্তের টান ত ভুলিবার নহে! সে ত তাহার সম্পর্ক ভুলিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র ঘটনায় তাহার নিকট হইতে স্নেহের পরিবর্ত্তে অটল কর্কশ ব্যবহার পাইয়াছে। কিন্তু তবু সে যে সহোদর!

৬

ভোগেচ্ছাগুলি সম্যক্ দমন করিয়া দূর নদী-তীরে রাত্রি দিন সঙ্গীহীন বীরেন ব্যবসা দেখিতেছে। সমবয়স্ক যুবকদলের আমোদপ্রমোদ তাহাকে কর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারে নাই। এই কর্ম্মপ্রিয়তা তাহার শৈশব-চাপল্যের স্বাভাবিক পরিণতি নহে। কিন্তু একটা ঘটনার নিষ্পেষণে বাল্যের প্রবৃত্তিগুলি আমূল বদলাইয়া গিয়াছে! দীর্ঘ কর্ম্মক্লান্ত দিবসের অবসানে নির্জ্জন কক্ষে সে যখন সম্মুখের বেড়াখানির দিকে চাহিয়া থাকিত তখন তাহার তরুণ বদনমণ্ডলে চিন্তার বার্দ্ধক্যরেখাগুলি অপরিচিত সহৃদয় জনকেও সহানুভূতি-কাতর করিয়া দিত।

কিন্তু আজ বীরেনের মুখের অস্বাভাবিক কঠোরতার মধ্যে হর্ষ-চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আপ্রাণ চেষ্টায় সঞ্চিত ধনে সে তাহার পৈতৃক বাসস্থান ফিরিয়া পাইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে যে আকাঙ্ক্ষা অশেষ সংসার-ক্লেশ, বিপদ আপদ ও অভাবের মধ্যে তাহাকে অবিচলিত রাখিয়াছে আজ তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে। তাহার পিসা মহাশয়ের প্রেরিত লোক ক্রয়পত্রখানি আজ তাহার হস্তে আনিয়া দিয়াছে। এই সফলতার দিনে একটি অন্তিম দৃশ্যের স্মৃতি তাহার মনে আসিয়া এক বিন্দু অশ্রুজলের সহিত নয়নে প্রতিফলিত হইল।

রাত্রিতে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আগন্তুককে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া সে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নানা কথার পরে লোকটি বলিল যে, এখন বীরেন বাবুর একটি কাজ বাকী, ভগ্নীকে বিপিনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া লোকের মুখ বন্ধ করা।

কিছুক্ষণ থামিয়া বীরেন প্রশ্ন করিয়া জানিল যে, এক দিন দুলালী বিপিনের বাড়ী গিয়াছিল। কি হইয়াছিল লোকটি জানে না। তবে সকলেই বলে যে, বিপিন যদি রাজি থাকে, তবে বীরেনের উচিত যে—

বীরেন বলিল, "হরনাথ, তুমি শোও, আমি কালী বণিকের নিকট একটা কথা বলিয়া আসি, দেরী করিলে সে হয় ত ঘুমাইয়া পড়িবে।"

৭

"ভাবিয়াছিলাম তোমাকে কোনও পত্র আমার লিখিতে হইবে না। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বোধ না থাকিতে পারে, আমার ইচ্ছা তোমার কাছে কিছুই না হইতে পারে, কিন্তু তুমি না বাবাকে বড়ই ভাল বাসিতে! তুমি জান, বিপিনের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইতে পারে না। এখন তুমি ছোট নও। আমাদেরও তাহাদের দুই পরিবারের মধ্যে কি ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে তাহা তুমি বুঝিতে পার। তথাপি তুমি আমার কথা অমান্য করিয়া পিতৃ-স্মৃতির অমর্য্যাদা করিতে কুণ্ঠিত হও নাই।

যে আমার পিতাকে অবমাননা করে তাহার সহিত আমি সম্পর্ক রাখিব না,—আমার এ কর্ত্তব্য কঠোর হইলেও আমি পালন করিব। তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব দুর করিব, কিন্তু তোমাকে আমা হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

"আর মনে রাখিও যে, পিতার যে অভিপ্রায় রক্ষা করিতে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি আমি অকাতরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, আমার প্রাণ থাকিতে তাহা লজ্জিত হইতে দিব না। গোপীনাথের প্রেতাত্মা নরকে বসিয়াও আমার পিতার স্বর্গস্থ আত্মাকে উপহাস করিবে, এ আমি সহ্য করিব না—খুন করিতে হইলেও না।

যদি হীন ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে মৃত্যু বরং বাঞ্ছনীয়"—

দাদার চিঠি দুলালীর হৃদয়ে বজ্রের মত বাজিল। সে কি করিয়াছে যে, তাহাকে এইরূপ লজ্জাকর অভিযোগ সহ্য করিতে হইবে?

বীরেনের নিষেধের পরে বিপিনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল এক বার বিপিনের যখন ঘোরতর জ্বরবিকার হয় তখন পাড়ার সকলের সঙ্গে দুলালীও তাহাকে দেখিতে যাইত। সংজ্ঞা থাকিলে বিপিন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিত, কাহারও ঔষধ খাইত না, কিন্তু দুলালী ঔষধ দিলে আপত্তি করিত না। সংসারের সহৃদয়তায় অনভিজ্ঞা দুলালী জানিত না যে, লোকমুখে পীড়িতের সেবা কতদূর পল্লবিত হইয়াছে!

দুলালী ভাবিতে লাগিল, পীড়িতের সেবা করিয়া সে ত কোন অপরাধ করে নাই। বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী বিপিনের মরণাপন্ন অবস্থায় তাহার যন্ত্রণার লাঘব করা কি কর্ত্তব্য নয়? বিপিনকে ত সে অন্য চোখে দেখে নাই।

তাহার দেহের বিকলতায় সকলের করুণা-দৃষ্টি স্মরণ করিয়া বিপিন যখন দীন সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিত, তখন বালিকার হৃদয়ের দয়া শত ধারায় তাহার নীরব বেদনার জ্বালা উপশম করিত বটে, কিন্তু সে ত মানবের প্রতি মানবের কর্ত্তব্য!

এই সুন্দর পৃথিবীতে যে কেবল প্রয়োজনের অধীন হইয়া সর্ব্বদা আত্মপরপ্রভেদের স্পষ্ট ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা দুলালী বুঝিতে পারে নাই। দুঃখতাপদগ্ধ মানবমাত্রকে সে তাহার রমণী-হৃদয়ের দয়ার উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা মাত্র দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু লোকে অন্যরূপ বুঝিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে।

দুলালীর অত্যন্ত ক্ষোভ এই হইল যে, পৃথিবীতে সকল কার্য্যে গঞ্জনাই তার লাভ হইল। সমস্ত আত্মীয় বন্ধুকে সে আকুল উৎসাহে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাল বাসাজনিত ত্রুটিটুকুও কেহ মার্জ্জনা করে নাই। দুলালীর নিজের প্রাণ পরিচিত বন্ধু সকলের ভালবাসা ভিক্ষা করিত। কাহাকেও ক্ষুব্ধ বা বিপন্ন দেখিলে তাহার হৃদয়ের করুণা তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া ছুটিত। তাই

বিকলাঙ্গ বিপিনের প্রতি সে স্নেহ-করুণ ব্যবহার করিত।

বীরেন আরও লিখিয়াছিল যে, আগামী ভাদ্র মাসে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-তিথিতে সে পুনরায় পৈতৃক আবাসে প্রবেশ করিবে। সেখানে দুলালী উপস্থিত থাকিলে তাহার পিতৃকৃত্য পণ্ড হইবে। সে যেন বুঝিয়া কায করে।

পিতার স্মৃতি যে তাহার কাছে কি দেবত্বমণ্ডিত তাহা সে বাহিরে কি করিয়া দেখাইবে! আশ্রয়বিহীন বালিকার যে প্রধান আশ্রয় সে-ই তাহাকে এরূপ নির্ম্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। তবে এখন সকল জ্বালার অবসান মৃত্যু ব্যতীত তাহার আশ্রয় কোথায়!

কিন্তু তাহার বান্ধবকুল আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার দুঃখিনার মত প্রতিবাসীর অযাচিত করুণার পথে দাঁড়াইতে হইবে না। এমন দিনটি সে ত না দেখিয়া যাইতে পারিবে না!—দুলালী স্থির করিল যে, সে দূরে থাকিয়া তাহাদের পৈতৃক ভিটায় আবার তাহাদের বংশের প্রবেশ দেখিবে, তারপর মৃত্যুর পরপারে আশ্রয়ের জন্য অনুসন্ধান করিবে।

৮

কয় মাস কাটিয়া গেল। আজ বীরেন আসিয়া পৈতৃক আবাসে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেছে। অসম্ভাবিত কৃচ্ছ্র সাধনার বলে বীরেন যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে বাস্তবিকই সে অতি মহৎ। দৃঢ় অবিচলিত প্রতিষ্ঠায় পৈতৃক ভদ্রাসন পুনরুদ্ধার করিয়া সে আজ পিতার মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, আজ সে দুলালীর নিশ্চেষ্টতার ঘৃণা করিতে পারে। তাই আজ বীরেনের বিগত নিষ্ঠুর ব্যবহারগুলির সুতীব্র স্মৃতি দুলালীর হৃদয়ে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি বিরূপতা কমিয়া গিয়াছে।

তথাপি দুলালীর এক অভিমান পূর্ণ জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে মানসিক শান্তি দিতেছে না। অদূরে তাহার পৈতৃক বাসস্থানে শ্রাদ্ধ বাসরে কত লোক যাতায়াত করিতেছে। আজ নিতান্ত যে পর সেও তাহার পৈতৃক বাড়ীতে গিয়া তারানাথের উপযুক্ত পুত্রের সফলতায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু সে সেই তারানাথের কন্যা, বীরেনের সহোদরা, তাহাকে কেহ স্নেহের আহ্বানে সে গৃহে ডাকিতেছে না, অদূরে পিতৃভৃত্য আনন্দের বাটীতে থাকিয়া আজ সে এই ব্যাপারের দর্শক মাত্র! তাই আকাশের ধূম্রবর্ণ মেঘগুলির মত নৈরাশ্য ও বান্ধবহীনতার ভরে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বিকাল বেলায় দিঙ্মণ্ডল আরও মেঘাচ্ছন্ন হইল। মাঝে এক একটা বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পরক্ষণে নিস্তব্ধতার মধ্যে বৃক্ষশ্রেণীর উপরে পক্ষীকুল উড়িতেছিল।

দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। জীব জন্তু যে যাহার আশ্রয় স্থানে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি এক দুর্দ্দমনীয় মনাবেগ দুলালীকে এই অবসরে তাহার পৈতৃক আবাসের দিকে লইয়া চলিল।

মাত্র দুই খানা খড়ের ঘর তোলা হইয়াছে, তাহারও এক খানিতে বেড়া দেওয়া হয় নাই।

বাড়ীর দরজায় বকুল গাছের তলায় দাড়াইয়া দুলালী দেখিল যে, অপর গৃহের বারান্দায় বাঁশের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বীরেন কি চিন্তা করিতেছে। আকাশের অবস্থা দেখিয়া চাকরেরা সব স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর দ্বারদেশে ভগ্নী, নিকটে গৃহমধ্যে ভ্রাতা। প্রকৃতির এই দুর্য্যোগে জন প্রাণীর আর সাড়া নাই, কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পতন, আর মধ্যে মধ্যে বাতাসের শব্দ। কিন্তু এই দুটি নিকটাত্মীয় মানবসন্তানের মধ্যে মানবসমাজ যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার দুই প্রান্তে ভ্রাতা ও ভগিনী—শত শৈশব স্মৃতি দুলালীর মনে পড়িতে লাগিল।

মনে পড়িল, তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি লইয়া সকলে কত উপহাস করিত, মনে পড়িল, বাড়ীর সকলে তাহাকে বোকা বলিলেও তাহার বাপ তাহার

চালাক মেয়েটির পক্ষ লইতেন ; আরও মনে পড়িল যে, এক দিন দাদা বীরেন তাহার পূজার মেলা হইতে দুলালীর জন্য একটা পুতুল কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটা লইয়া বিপিনের জন্য ভ্রাতা ভগিনীতে কি ঝগড়া হইয়াছিল। তারপর সুখ-স্মৃতি মুছিয়া গিয়া আবার সে বর্ত্তমান অবস্থার বিষাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দুলালী এক বার ভাবিল সে গিয়া দাদার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া বলিবে। হঠাৎ দেখিল যে, তাহার পায়ের কাছে গাছের তলায় জল আসিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বৃষ্টির ধারাগুলি আরও ঘন হইয়া পড়িতেছে। ঈষৎ চমকিত হইয়া বিদ্যুতালোকে দুলালী দেখিল মাঠের মাঝ বৃষ্টির জলে ভরিয়া গিয়াছে। এই জল পার হইয়া রাস্তা দিয়া আনন্দের বাড়ী যাইতে তাহার ভরসা হইল না।

বাতাস এখন আর দমকা হাওয়ায় আসিতেছিল না, রীতিমত ঝড় বেগে শোঁ শোঁ শব্দে একটানা বহিতেছিল, ঘন ঘন মেঘগর্জ্জনের সহিত বিদ্যুৎ চমকিতে ছিল।

দুলালীর পদতল জলে ডুবিয়া গেল।

দুলালী ভয়ে ভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণ জলে পরিপূর্ণ। যে ঘরখানিতে বেড়া নাই সে উঠিয়া সেই ঘরে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ুর বেগ বৃদ্ধি পাইল, বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের প্রবল ঝাপটা ঘরখানিকে কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। জলরাশি চক্ষুর পলকে বৃদ্ধি পাইয়া ঘরের অনতিউচ্চ ভিটার উপরে উঠিল।

অপর গৃহে বীরেন কি করে দেখা যাইতেছিল না। দুলালী ভীত চিত্তে ভাবিল, বৃষ্টির এত জল! বাহিরের দিকে তাকাইলে অবিশ্রান্ত বিদ্যুতালোকে বোধ হইল প্রাঙ্গণ, দ্বারদেশস্থ রাস্তা, পুকুর, মাঠ, বড় রাস্তা সমস্তই জলে ভাসিয়া গিয়াছে। দুলালী ভাবিল, এ বৃষ্টির জল, না বানের জল? তখনই বৃষ্টি-বাতাসের শব্দে মিলিত বিপন্ন জীব-সংঘের আর্ত্ত কলরোল তাহার সন্দেহ ঘুচাইয়া দিল।

৯

একটা মেঘগর্জ্জন গুরু গম্ভীর উঠিয়া যেন ভীষণ শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল। দুলালী আপনার অজ্ঞাতসারে ডাকিয়া উঠিল, "দাদা!" সহসা প্রাঙ্গণে জলমধ্য হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "ভয়নাই দুলালী।" দুলালী দেখিল দাদা। সেই প্রকৃতির সংহার-লীলার অভিনয়ের মধ্যে ভাই বোন হাত ধরা ধরি করিয়া পুনবায় দক্ষিণের গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঘরের মেজেতে জল। "তক্তপোষের উপর বস" বলিয়া বীরেন ঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া দরজা আটিতে লাগিল। দুলালী বলিল, "দাদা, এ তক্তপোষও ডুবিয়া গেল।"

বীরেন দেখিল, দরজা বন্ধ করা বৃথা। দুই জনে ধরিয়া গৃহস্থ অপর তক্তপোষখানি এ খানির উপরে রাখিল। উঠিয়া বসিতে বসিতে সে খানিও ডুবিয়া যায়! দুলালী বলিল "চাল কাটিয়া না ফেলিলে যে দাদা জলে বদ্ধ হইয়া মরিব।"

বীরেন বলিল, "আমি থাকিতে কিছু ভয় নাই।" বীরেন চালের বাঁশ ধরিয়া উঠিয়া যেখানে তিনখানি চালা একত্র হয় সেখানকার বন্ধন ছিঁড়িতে চেষ্টা করিল। ঝড়ের বেগে ঘরখানি ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। বীরেন পড়িয়া গেল, দুলালী কাঁদিয়া উঠিল। "ভয় নাই দুলালী কিছুক্ষণ বাঁশ ধরিয়া ভাসিয়া থাক," বলিয়া বীরেন আবার উঠিয়া কেমন করিয়া দুই তিনটা বাঁধ ছিঁড়িল। তারপর ছোট চালখানিতে উঠিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। প্রচণ্ড বেগে ঝঞ্ঝা বহিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল ভাই ভগ্নী ধরাধরি করিয়া একখানি চালার উপর বসিয়া আছে, চালা জলস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

উপরে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি, ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে বাহিত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুগুলি বড় বড় শিলাখণ্ডের ন্যায় পৃষ্ঠে পড়িতেছে, চারিদিকে বিপন্ন জীবের মৃত্যু-আর্ত্তনাদ। প্রকৃতির রুদ্র শক্তিগুলির এই প্রচণ্ড আহবের সম্মুখে ভাইভগিনীর পরস্পর বিরূপতা অতলে লুক্কায়িত হইল। সংসার ও সমাজের অস্তিত্ব ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়ম-

বন্ধনছিন্ন প্রকৃতির প্রলয়ক্ষেত্রে ভ্রাতাভগিনী পরস্পরকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল তাহার নিশ্চয় নাই, কোথায় যাইতেছে বা চারিদিকে কি হইতেছে তাহা ভাবিবার অবসর নাই, ভ্রাতা ভগিনীকে লইয়া চালাখানি বারিবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "এ-এ-এই চালের উপরের মানুষ, কোন গাছের ডাল ধর—নদী সামনে।"

বীরেন চারিদিকের অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হঠাৎ পাতার মত একটা কি পিঠে লাগিল। বীরেন হাতে সাঁপটিয়া ধরিল, কিন্তু একখানি নারিকেলের শুষ্ক শাখা হাতে আসিল, আশ্রয় মিলিল না। গতিবেগ হইতে বীরেন বুঝিল, তাহারা নদীস্রোতে নামিয়াছে, শীঘ্র কিছুতে না বাধিলে আর নিস্তার নাই,—একেবারে সাগরমুখে যাইয়া পড়িতে হইবে।

সহসা সম্মুখে পুঞ্জীভূত একরাশি অন্ধকার দেখা গেল। বীরেন ভাবিল, ইহাতে আবদ্ধ হইলে তাহারা রক্ষা পাইবে; আর চালাখানি ঠিক ওদিকেই যাইতেছে। দুলালী কিন্তু এই অন্ধকারে ভয় পাইয়াছিল। দুই জনে একই সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই বারে রক্ষা"—"এই বারে মৃত্যু!"

আকাশে তীব্র বিদ্যুৎ খেলিল। দেখা গেল, জন পরিপূর্ণ একখানি নৌকা দাঁড় বাহিয়া আসিতেছে। দুলালী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "নিশ্চয় বিপিনের নৌকা, আমাদিগকে নিতে আসিয়াছে; দাদা, ডাক।" বীরেন বজ্র-মুষ্টিতে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "প্রাণ থাকিতে নয়।"

ভীষণ শব্দে মেঘগর্জ্জনের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, নৌকারোহীগণ সম্মুখস্থ চালাখানা দেখিল, কিন্তু তখন সময় নাই! আরোহীরা চেঁচাইল, "সামাল, সামাল." দুলালী চেঁচাইল, "মারা গেলাম, মারা গেলাম।" চালাখানি নৌকার তলে পড়িয়া গেল, সকলে হা হা করিয়া উঠিল এবং সকলে মিলিয়া এক জন খর্ব্বাকৃতি লোককে ধরিয়া রাখিল,ও অন্ধকারে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। চালাখানি ভাঙ্গিয়া গিয়া পশ্চাৎ দিকে আবার ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তখন তাহার উপরে কেহ নাই!

(১০)

নিশাপগমে জলরাশি কমিয়া গেল। দিবসাগমে পথ ঘাট শুষ্ক হইল। মৃতাবশিষ্ট জনগণ দেখিল, লোক পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশান হইয়া গিয়াছে! পশু, পক্ষী ও মানবের মৃতদেহ ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। চালায় চড়িয়া অনেকে বাঁচিয়াছে। কতগুলি চালা জল কমি-বার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ শাখার উপর আশ্চর্য্য ভাবে আবদ্ধ আছে। দুলালী ও বীরেনের মৃতদেহ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া তাহাদের পৈতৃক বাড়ীর দ্বারদেশস্থ বৃক্ষের শাখায় আটকাইয়া রহিয়াছে।

মানবের কার্য্য-কৌশল ও সহৃদয়তা আসিয়া স্বাস্থ্য-বিধান ও নবপল্লীসংগঠন করিতে লাগিল। প্রকৃতির সৃজন-শক্তি আবার হৃত-শ্রীর পুনর্গঠনে নিয়োজিত হইল। কিন্তু ভাবুকের চক্ষে অনেক পুরাতন জিনিস আর ঠিক পূর্ব্বের মত হইল না।

ভীষণ জলপ্লাবনের পরে সহর পূর্ব্বের মত বড় রহিল না। কিন্তু সেই জনপদে গেলে আজিও দেখা যাইবে যে, কুব্জ-দেহ করুণ মুখচ্ছবিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ সায়াহ্নের পূর্ব্বে কি খুঁজিতে খুঁজিতে এক ছায়াশীতল বকুল তলে দুইটি মঠের পাদ-দেশে আসিয়া যেন বিশ্রাম লাভ করে।

শ্রীশিবশশী সান্ন্যাল।

গ্রন্থ সমালোচনা।

"তর্কবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্রসিংহ ন্যায়বাগীশ বি, এ, প্রণীত। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গ ভাষায় তর্ক-বিজ্ঞানের প্রকাশ এই প্রথম। আমরা সেই জন্য গ্রন্থখানি প্রায় আদ্যোপান্ত যত্ন সহকারে পাঠ করিলাম।

আমাদের মনে হয় যে, গ্রন্থকার যদি ইংরাজি চিন্তা ও পদ্ধতির এরূপ অনুবাদ না করিয়া ইংরাজি চিন্তা আমাদের দেশী ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিতেন এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিন্তার আরও সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইতে পারিত।

গ্রন্থে Induction (ব্যাপ্তিগ্রহ) এর আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রয়োজনানুসারে তর্ক-গ্রন্থে আজ কাল induction এরই সমধিক আদর।

আমরা আরও লক্ষ্য করিতেছি, এই প্রকরণটি প্রায়শঃ 'মিলের' (Mill) সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি সুন্দর অনুবাদ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী জার্ম্মান ও ইংরাজ নৈয়ায়িকগণের মত-সাহায্যে বিষয়টি আরও বিস্তৃত ও স্বাভাবিক ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা না করিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের ঐক্য না থাকিলেও আমরা তাঁহার উদ্যমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। মোটের উপর তাহার পরিভাষা সংগ্রহ ও গঠন উত্তম হইয়াছে।

'তর্কবিজ্ঞান' নামটির প্রথমাংশ আধুনিক পাঠকের মনে বিষয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারে। 'তর্ক' শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাপ্তিগ্রহ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাতে বর্ত্তমান বঙ্গভাষাভ্যস্থ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানালোচনার প্রণালী সম্পর্কে ন্যায়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা এই গ্রন্থে যথোচিত স্বীকৃত হয় নাই।

গ্রন্থকারের Deduction অর্থে 'অনুমান' শব্দের ব্যবহার সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

Uniformity of Nature এর পরিভাষা "প্রকৃতির একরূপতা" আমাদের নিকট ভাল বোধ হইল না। Uniformity of Nature বলিলে আমরা বুঝি যে, অবস্থার সমষ্টি একরূপ থাকিলে প্রকৃতি একই ভাবে কার্য্য করিবে। প্রকৃতির একরূপতার অর্থও কি এই? "একরূপতা" বলিলে আমরা Identity, sameness বুঝি।

গ্রন্থের প্রথমাংশে সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থপাঠের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা সাধারণতঃ সহজবোধ্য ও সুলিখিত। তবে স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ততা নিবন্ধন প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টবোধ্য হইবে।

গ্রন্থখানি আধুনিক ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের উপযোগী করিতে হইলে 'তর্ক' 'অনুমান' 'সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দব্যবহারে বঙ্গভাষার প্রচলিত শব্দার্থের সহিত আরও মিল রাখিতে হইবে।

'Syllogism' এর পরিচ্ছেদ পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। এ বিষয়ে যা কিছু বলিবার আছে গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পুস্তকখানি পড়িয়া মোটের উপর আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। পুস্তকখানি যে আমাদের ছাত্র দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই; আশাকরি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার যথোচিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবেন।

২। কুলবোধিনী—প্রথম ভাগ, শ্রীকামিনী কুমার ঘটক কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, মূল্য ।৶০ ছয় আনা। আকারে ৬৬ পৃষ্ঠা মাত্র। কাগজ ভাল; ছাপা কদর্য্য। পুস্তকখানির মূল্য অনেক বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে।

কামিনী বাবু ঘটকের সম্মান বিলুপ্তির নিমিত্ত সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার

এই "সওয়াল জবাব" আইন সঙ্গত মনে করি না। ফলতঃ ঘটকগণ এখন প্রায়শই অঘটন-ঘটন পটীয়সী, নিত্যনবোন্মেষিণী বুদ্ধির অনন্তমুখী প্রতিভার পরিচয়প্রদান, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে অমনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের প্রচলিত ব্যবসায়েরও আজি এতাদৃশী অবনতি সংঘটিত হইতেছে! যাহা হউক কুলজ্ঞবর্গের অবজ্ঞাদর্শনে ব্যথিত হইয়া বংশাবলীর ধারাবাহিক তালিকা (Geneological table) সংরক্ষণের এই প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রথম ভাগে কেবল ঘটকবংশের বিবরণী প্রকাশে সংগ্রাহকের পক্ষে কিঞ্চিৎ স্বার্থপরতা লক্ষিত হয় না কি? ভরসা করি, কামিনী বাবু অধিকতর উদ্যম সহকারে অতি সত্বর কুলীন ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বংশাবলী প্রকাশিত করিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। সদানন্দ।

৩। **রাণী দুর্গাবতী,** কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত, কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৮০ আনা, বাঁধান সুন্দর, কাগজ ভাল, মুদ্রণ উত্তম।

মাইকেল প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণ সহজ নহে। গ্রন্থকার এই অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। বাক্য-বিন্যাস, ভাষা-মাধুর্য্য ও অলঙ্কার-সন্নিবেশ কোন কোন স্থলে পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলের রচনা পদ্ধতি সেকেলে। উদারের সহিত অনুদারের একত্র সমাবেশ কোনও কোনও স্থলে কাব্যের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। "কবিত্বের" পাশে "ফোয়ারা" উঠিতেছে, "জুয়ারের ঢল ঢলায়" "বিজলী চমক" পড়িয়াছে, সংসারে 'সং' দেখা দিয়াছে। কাব্যে চলিত কথার সমাবেশ বড় সাবধানে করিতে হয়। "একচ্ছত্রী" "হিংমুক" "নীরোগী" "প্রফুল্লিত" "স্রোতঃবেগ" রজনীর বিশেষণ রূপে "জ্যোৎস্না" শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ দুষ্ট। মুদ্রাকর প্রমাদও যথেষ্ট রহিয়াছে। দুই একটি স্থলের ভাব সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার প্রাচীন কবিগণের শরণ লইয়াছেন:—

(১) "কাটিয়া খনির মাটি কে কোথায় তবে
রত্ন ত্যজি চলি যায় মাটি মাখি গায়?"

(২) "ধরাতলে অকলঙ্ক রাণী-মুখচন্দ্র,
আর নহে চাঁদ চির কলঙ্কী জগতে;
তাই সে বদন চন্দ্র হেরি সৌধ তলে
ক্ষণেক লুকায় চাঁদ মেঘের আড়ালে।"

"করয়" "নিবেদয়" প্রভৃতি অপ্রচলিত প্রয়োগের ছড়াছড়ি কেন? গ্রন্থকারের ছন্দ-জ্ঞান নাই বলিলেই হয়।

৪। **শাক্য সিংহ,** শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত, ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত; আকার ডবল ক্রাউন, অষ্টাংশিত, ১৪০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কাগজ উত্তম, সোনার রঙ্গের রেশমী মলাট ও সোনার জলে নাম লেখা—এক কথায় গঠন পারিপাট্য চমৎকার। গ্রীণ কালির ছাপা, লাল রঙ্গের বর্ডার, কিন্তু শেষার্দ্ধের ছাপা প্রথমার্দ্ধের ন্যায় সুন্দর হয় নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভূমিকায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে সর্ব্বসাকল্যে এগারটি চিত্র ও কপিলাবস্তুর একখান প্রাচীন মানচিত্র সংযোজিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন রঙ্গের ছবি চারিটি। প্রায়গুলিই বেশ মনোরম। দুই একখানা ছবির পরিকল্পনায় শিল্প-সৌষ্ঠবের অভাব পরিলক্ষিত হইল।

এখানি গ্রন্থকারের রচিত ভক্তি গ্রন্থাবলীর অন্যতম। পুস্তকের ভাষা সরল। ধর্ম্মগ্রন্থ হইলেও ইহার একটা ঐতিহাসিক বিশেষত্ব আছে। সুতরাং উপহারের জন্য এইরূপ পুস্তকের উপযোগিতা সম্বন্ধে মত-দ্বৈধ নাই।

ভগবান বুদ্ধের জীবন-কাহিনী নিরন্তি ও অহিংসার পুণ্যস্পর্শ প্রতি হিন্দুগৃহকে কল্যাণময় করিবে।

গ্রন্থকার আমাদের বালকবর্গের সম্মুখে জীবনগঠনের যে সুন্দর আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সফল হউক। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদিগকে বলি,—"সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।" এইরূপ গ্রন্থের প্রসার হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

৫। **বন তুলসী**, শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, বি, এ, প্রণীত, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার রয়েল ষোড়শাংশিত, ৪৭ পৃষ্ঠা; মূল্য।৴০ আনা। কাগজ উত্তম, ছাপা পরিপাটি। সুন্দর রঙ্গিন মোটা কাগজের মলাট, লাল "রিলিফে" নাম লেখা।

এখানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। বনতুলসী পত্রে পত্রে পবিত্রতার দিব্য গন্ধ লইয়া দেব-ভোগের যোগ্য হইয়াছে।

শান্তিময়।

স্মৃতি

তোমারি ও-স্মৃতি মনে পড়ে যবে
ভ'রে উঠে যেন প্রাণ।
তোমার আমার মাঝে কত দূর
তবু নহে ব্যবধান।

মনে পড়ে ক্ষণে সুখের সে দিন,
পলকের মাঝে বরষ বিলীন
আ(া) সময় আজি রে সময় পাইয়া—
হয় না যে অবসান!

হৃদয়েরি মাঝে যবে দেখা পাই,
মনে হয় না ত তুমি কাছে নাই,
কভু দাও ধরা প্রেমের বাঁধনে
কভু কর অভিমান।

আকুল রোদন কাঁপায়ে সুদূর
ফিরে আসে যবে আমারি সে সুর—
মনে ভাবি সুধু চির মিলনের
তোমারি এ প্রতিদান।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

দীর্ঘ জীবনের রহস্য

আহারের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি ইহাই আমরা ধ্রুব সত্য বলিয়া এ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি ফরাসি বৈজ্ঞানিক মেক্লিকফ প্রচার করিয়াছেন যে, এই আহারেই আমাদের জীবন নাশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার মতে অন্ত্রে আহার্য্যের পচন ক্রিয়া হইতে এক প্রকার কীটাণুর উদ্ভব হয়, এই কীটাণু হইতে আবার এক প্রকার বিষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বিষের দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়াই আমাদের অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। ইহা যথার্থ হইলে রাবণের মৃত্যু-বাণ যেমন তাঁহার নিজেরই ঘরে ছিল তদ্রূপ আমাদের মৃত্যুর কারণও আমাদের নিজ দেহমাত্রেই বর্ত্তমান আছে বলিতে হইবে। খাদ্য দ্রব্য অন্ত্রে যত বেশী কাল বদ্ধ থাকে ততই তাহা অধিক পচিয়া যায়, এবং ততই তাহা হইতে অধিক কীটাণু জন্মিয়া বিষ উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহাতে নানা প্রকারের ব্যাধি জন্মিবার যেমন আশঙ্কা অকাল বার্দ্ধক্যের আক্রমণেরও তেমনই আশঙ্কা। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ত্র যত দীর্ঘ হইবে মলও তত দীর্ঘ

কাল তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। অতএব ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, অন্ত্র যতই সংক্ষিপ্ত হইবে বার্দ্ধক্য-চিহ্নও ততই কম হইবে।

যদি আমরা একটি বৃদ্ধ স্তন্যপায়ী জীবকে একটি বৃদ্ধ পাখীর সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তবে আমরা ইহাদের বাহ্য আকৃতির পার্থক্য দেখিয়া বিস্মিত হইব। কুৎসিৎ-আকৃতি, অলসগতি, ক্ষয় প্রাপ্তদন্ত, শরীরের স্থলবিশেষের পলিত অনুজ্জ্বল রোম প্রভৃতি দ্বারা আমরা একটি কুকুরকে অনায়াসেই বৃদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটী ১২ কি ১৫ বৎসরের কুকুরে অতি সুস্পষ্টভাবে পূর্ব্বোক্ত জরা-লক্ষণ সকল দেখা দেয়। কিন্তু পক্ষীসকল স্তন্যপায়ী দিগের অপেক্ষা ভালরূপে ও বহু কাল আপনাদের বয়স রক্ষা করিয়া থাকে। একটি হাঁস বিশ বছরের হইলেও উহার গতি দ্রুত থাকে এবং বাহ্যতঃ ইহার বার্দ্ধক্যের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তোতা ও টিয়া পাখী বহু কাল যৌবন রক্ষা করিয়া থাকে।

অধ্যাপক মেক্নিকফ একটি টিয়া পাখী পুষিতেছেন; বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ইহার ৭০ কি ৭৫ বৎসর বয়স হইবে। কিন্তু ইহার অকৃত এরূপই স্বাভাবিক, ও ইহার গতি এরূপই অনায়াসসাধ্য যে, ইহাকে এরূপ বর্ষীয়ান বলিয়া মনে করা সম্ভবপর নহে। যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল তাহাতে এই সাধারণ নিয়মেরই সমর্থন হয় যে, পক্ষীসকল অধিকাংশ স্তন্যপায়ী অপেক্ষাই অত্যধিক দীর্ঘজীবী, কারণ পক্ষী দিগের অন্ত্রে স্তন্যপায়ী দিগের অন্ত্র অপেক্ষা অনেক কম কীটাণু জন্মিয়া থাকে।

স্তন্যপায়ীদিগের বৃহৎ অন্ত্রে মল সঞ্চারের প্রশস্ত আধার থাকায় তাহাতে সর্ব্বপ্রকার কীটাণু প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পক্ষীদিগের তাদৃশ বৃহৎ অন্ত্র না থাকায় এরূপ কীটাণু জন্মিবারও কারণ নাই। অতএব ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এরূপ অবস্থায় অন্ত্র হইতে যে বিষ সঞ্জাত হয় তাহা ইন্দুর বা অপর প্রাণী অপেক্ষা পক্ষী জাতিতে কম হইবে। তাহাতেই আমরা দেখি যে, ইন্দুর যে স্থলে কয়েক বৎসর পরেই বৃদ্ধ হইয়া পরে এবং ঊর্দ্ধ পক্ষে কদাচিৎ পাঁচ বৎসর বাঁচিয়া থাকে, কেনেরী (canary) পক্ষী এতদপেক্ষায় অনেক অধিক কাল সবল থাকে, এবং ১৫।২০ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু পাইয়া থাকে।

অনুষ্ণাপশীল মেরুদণ্ডী জন্তু সকল—যেমন কচ্ছপ কুম্ভীর প্রভৃতি—কোন বিশিষ্ট বার্দ্ধক্য-লক্ষণ প্রকাশ না করিয়াও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের অতিরিক্ত মাত্রায় দৈহিক তাপ সংরক্ষণ প্রয়োজন নহে বলিয়া ইহারা অল্প মাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করে, সুতরাং তাহা সংগ্রহ করিতেও ইহাদের অধিক শক্তি ব্যয় করিতে হয় না। যদিও কচ্ছপ কুম্ভীর প্রভৃতির জীবন এবং পক্ষী জীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান তথাপি ইহাদের মধ্যে এই বিষয়টি সাধারণ যে, ইহাদের মধ্যে বৃহৎ অন্ত্র অতি সামান্য মাত্র বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের অন্ত্রস্থ কীটাণুও স্বল্প পরিমাণ।

জরা ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মেক্নিকফ ঘোলের বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে এই সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলনই চলিতেছে অধ্যাপক মেক্নিকফ জরা-ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও তাহার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা এই কয়েকটি কথাই বিশেষরূপে লক্ষণীয় মনে করি। প্রথমতঃ পাকাশয়ে অধিক ক্ষণ মল বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহা হইতে ব্যাধিকীট জন্মিয়া শরীর আক্রমণ করে। দ্বিতীয়তঃ পক্ষী প্রভৃতির অন্ত্র ক্ষুদ্র বলিয়া মল বদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকাতে উহারা বৃহৎ অন্ত্রবিশিষ্ট জন্তু হইতে অধিক দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ যাহাদের আহারের পরিমাণ কম তজ্জন্য তাহাদের চেষ্টাও কম করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে শক্তি হ্রাস কম হয় বলিয়া এবং অল্পাহার হেতু কীটাণুর উৎপত্তিও কম হয় বলিয়া ইহাদেরও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ অন্ত্রস্থ কীটাণুই জরা ব্যাধির বীজ বলিয়া এই কীটাণুর ধ্বংসেই জরা ব্যাধি সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মূল হইতে পারে। তক্র বা ঘোলই সেই কীটাণু-বিধ্বংসী মহৌষধ।

এই পাশ্চাত্য দীর্ঘ জীবন-রহস্য যে হিন্দুদিগের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহা আমাদের নিকট বোধ হয় না। প্রথমতঃ বদ্ধ মল হইতে রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একটি পরীক্ষার উক্তিই প্রচলিত দেখিতে পাই, যথা "জায়ন্তে বিবিধা রোগঃ প্রায়শঃ মলসঞ্চয়াৎ"। দ্বিতীয়তঃ পক্ষীজাতি দীর্ঘজীবী বলিয়া যে হিন্দুগণ প্রমাণ পাইয়াছিলেন কাকের চিরজীবী নামেই যেন আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যোগেতে নিরাহারে থাকিবার যে নিয়ম খাদ্য-বর্জ্জন দ্বারা পাকাশয়ের বিষ সঞ্চারের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যোগিগণ যে এই উপায়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে পারিবেন তাহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ তক্র বা ঘোলের সমস্ত গুণ আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। তাহাতে ইহাকে যেমন বিবিধ রোগসংহারক বলিয়া জানা যায় তেমনই ক্রিমিঘ্ন বলিয়াও জানা যায়, যথা "তক্রং হন্তি গরচ্ছর্দ্দিপ্রসেক বিষমজ্বরান্। পাণ্ডুমেদো গ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহভগন্দরান্। মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ। শ্বিত্র কোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাক্রমান্॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমে কীট ক্রিমিজাতি বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঘোলকে ক্রিমিঘ্ন বলাতে তাহা যে কীটাণুরও নাশক তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিশেষতঃ ঘোলের রোগনাশক শক্তিপ্রসঙ্গে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাকে বিশেষ রূপেই সপ্রমাণ করে—যথা, "ন তক্র-সেবী ব্যথতে কদা চন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগা। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ। 'তক্রসেবী কখনও কষ্ট পায় না, এবং রোগ সকল তদ্দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া প্রবল হইতে পারে না।' এখানে রোগবীজাণু সকল তক্রদ্বারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতেই যে রোগের আক্রমণ হইতে পারে না, তাহাই কি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না? আয়ুর্ব্বেদ তক্রের মহিমা এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এরূপই সঞ্জীবনী শক্তি দেখিতে পাইয়াছে যে, ইহাকে অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রভৃতি পাকাশয় সম্বন্ধীয় রোগে অমৃতকল্প বলিয়া বর্ণিত করিয়াছে—যথা "শীতকালে হগ্নিমান্দ্যে তথাবাতাময়েষুচ। অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপম" মিতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ।

এই প্রকারে তক্রকে সর্ব্বরোগের ধ্বংসের মূলীভূত জানিয়া হিন্দুর চিকিৎসা বিজ্ঞান ইহাকে মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীতে মনুষ্যের "অমৃত" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে যথা—"সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবিতক্রমাহুঃ॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বীজাণুনাশের পরীক্ষাদ্বারাই যেমন ঘোল দীর্ঘ জীবনের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তদ্রূপ হিন্দু বিজ্ঞানেও ক্রিমিনাশের পরীক্ষা দ্বারাই ইহা জীবনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নহে। হিন্দুগণ জীবন-রক্ষার পক্ষে যেমন ঘোলের উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তেমনই ইহার সার-ঘৃতেরও উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের 'আয়ুর্ঘৃতম্' এই প্রসিদ্ধ বাক্যে ঘৃত জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা যেমন বিশেষ ভাবে ঘোল ও ঘৃতের আয়ুস্কর গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমনই সাধারণ ভাবে সমস্ত গব্যকেই আয়ুষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতেই যে খাদ্যে এই সমস্ত উপকরণের অভাব তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। যথা—"গব্যহীনং কুভোজনম্॥" ইহা হইতে ঘোলে রোগ কিটাণুনাশক শক্তি আছে অপর সমস্ত গব্যেরও ন্যূনাধিক মাত্রায় তদ্রূপ শক্তি আছে ইহা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, এবং তাহাতেই "হবিষ্য আহার" বিশেষরূপে সাত্ত্বিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ইহা বলাও অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—— ——

প্রতিভা

২য় বর্ষ   জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯   ২য় সংখ্যা।

সন্ন্যাসী।

১

আমার, সংসারেতে নাই আসক্তি,
প্রাণে কেবল সেবা ভক্তি,
জীবনে আর নাই বাসনা
কেবল, চরণ সেবার অভিলাষী,
আমি সন্ন্যাসী!

২

আমার, আছে বটে পুত্র দারা,
আমি তাদের মায়া ছাড়া,
থাকুক শত ভাই ভগিনী
থাকুক মা মাসী!
আমি একজন কর্ণ দাতা,
কেটে দেই যে ছেলের মাথা,
আশায় এসে নিরাশ হয় না,
কেহ আমার বাড়ী আসি!
আমি সন্ন্যাসী!

৩

আমার বাড়ীর অতিথখানা,
বিশ্ব ব্যক্ত—জগৎ জানা,
করে, নিত্য নিত্য আনাগোনা,
কত দেশের অধিবাসী,
তাদেরে, দিয়ে আমার গৃহ অন্ন,
জীবন করি সফল-ধন্য,
গাছ তলাতে রাত্ পোহাই, আর
হরিবাসর করি' হাসি,
আমি সন্ন্যাসী!

৪

আমার, নাই প্রয়োজন সিংহাসনে,
নাই প্রয়োজন রাজ্য ধনে,
জটা বাকল সার করেছি,
অঙ্গে মাখি ভস্মরাশি,
আমার, কৃষি শিল্পে নাই যে মতি,
অপ্রীতি বানিজ্যের প্রতি,
কর্ম্মহীন ধর্ম্ম আমার,
চিৎ আনন্দে সদাভাসি!
আমি সন্ন্যাসী!

এই পাশ্চাত্য দীর্ঘ জীবন-রহস্য যে হিন্দুদিগের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহা আমাদের নিকট বোধ হয় না। প্রথমতঃ বদ্ধ মল হইতে রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একটি পরীক্ষার উক্তিই প্রচলিত দেখিতে পাই, যথা "জায়ন্তে বিবিধা রোগাঃ প্রায়শঃ মলসঞ্চয়াৎ"। দ্বিতীয়তঃ পক্ষীজাতি দীর্ঘজীবী বলিয়া যে হিন্দুগণ প্রমাণ পাইয়াছিলেন কাকের চিরজীবী নামেই যেন আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যোগেতে নিরাহারে থাকিবার যে নিয়ম খাদ্য-বর্জ্জন দ্বারা পাকাশয়ের বিষ সঞ্চারের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যোগিগণ যে এই উপায়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে পারিবেন তাহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ তক্র বা ঘোলের সমস্ত গুণ আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। তাহাতে ইহাকে যেমন বিবিধ রোগসংহারক বলিয়া জানা যায় তেমনই কৃমিঘ্ন বলিয়াও জানা যায়, যথা "তত্তুহন্তি গরছর্দ্দিপ্রসেক বিষমজ্বরান্। পাণ্ডুমেদো গ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহভগন্দরান্। মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ। শ্বিত্র কোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাকৃমীন্॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ॥ শব্দ কল্পদ্রুমে কীট কৃমিজাতি বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ঘোলকে কৃমিঘ্ন বলাতে তাহা যে কীটাণুরও নাশক তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিশেষতঃ ঘোলের রোগনাশক শক্তিপ্রসঙ্গে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাকে বিশেষ রূপেই সপ্রমাণ করে—যথা, "ন তক্র-সেবী ব্যথতে কদা চন্নতক্রদগ্ধাঃ প্রভবান্তি রোগাঃ। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ। 'তক্রসেবী কখনও কষ্ট পায় না, এবং রোগ সকল তদ্দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া প্রবল হইতে পারে না।' এখানে রোগবীজাণু সকল তক্রদ্বারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতেই যে রোগের আক্রমণ হইতে পারে না, তাহাই কি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না? আয়ুর্ব্বেদ তক্রের মহিমা এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এরূপই সঞ্জীবনী শক্তি দেখিতে পাইয়াছে যে, ইহাকে অগ্নিমান্দ্য অরুচি প্রভৃতি পাকাশয় সম্বন্ধীয় রোগে অমৃতকল্প বলিয়া বর্ণিত করিয়াছে—যথা "শীতকালে হগ্নিমান্দ্যে তথাবাতাময়েষুচ। অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপম" মিতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ।

এই প্রকারে তক্রকে সর্ব্বরোগের ধ্বংসের মূলীভূত জানিয়া হিন্দুর চিকিৎসা বিজ্ঞান ইহাকে মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীতে মনুষ্যের "অমৃত" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে যথা—"সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবিতক্রমাহুঃ॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতো ভাবপ্রকাশঃ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বীজাণুনাশের পরীক্ষাদ্বারাই যেমন ঘোল দীর্ঘ জীবনের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তদ্রূপ হিন্দু বিজ্ঞানেও কৃমিনাশের পরীক্ষা দ্বারাই ইহা জীবনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নহে। হিন্দুগণ জীবন-রক্ষার পক্ষে যেমন ঘোলের উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তেমনই ইহার সার ঘৃতেরও উপযোগিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের 'আয়ুর্ঘৃতম্' এই প্রসিদ্ধ বাক্যে ঘৃত জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা যেমন বিশেষ ভাবে ঘোল ও ঘৃতের আয়ুষ্কর গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমনই সাধারণ ভাবে সমস্ত গব্যকেই আয়ুষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতেই যে খাদ্যে এই সমস্ত উপকরণের অভাব তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। যথা—"গব্যহীনং কুভোজনম্॥" ইহা হইতে ঘোলে রোগ কিটাণুনাশক শক্তি আছে অপর সমস্ত গব্যেরও নূন্যাধিক মাত্রায় তদ্রূপ শক্তি আছে ইহা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, এবং তাহাতেই "হবিষ্য আহার" বিশেষরূপে সাত্ত্বিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ইহা বলাও অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রতিভা

২য় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ২য় সংখ্যা।

সন্ন্যাসী।

১

আমার, সংসারেতে নাই আসক্তি,
প্রাণে কেবল সেবা ভক্তি,
জীবনে আর নাই বাসনা
কেবল, চরণ সেবার অভিলাষী,
আমি সন্ন্যাসী!

২

আমার, আছে বটে পুত্র দারা,
আমি তাদের মায়া ছাড়া,
থাকুক শত ভাই ভগিনী
থাকুক মা মাসী!
আমি একজন কর্ণ দাতা,
কেটে দেই যে ছেলের মাথা,
আশায় এসে নিরাশ হয় না,
কেহ আমার বাড়ী আসি!
আমি সন্ন্যাসী!

৩

আমার বাড়ীর অতিথশালা,
বিশ্ব ব্যক্ত—জগৎ জানা,
করে, নিত্য নিত্য আনাগোনা,
কত দেশের অধিবাসী,
তাদেরে, দিয়ে আমার গৃহ অন্ন,
জীবন করি সফল-ধন্য,
গাছ তলাতে রাত্ পোহাই, আর
হরিবাসর করি' হাসি,
আমি সন্ন্যাসী!

৪

আমার, নাই প্রয়োজন সিংহাসনে,
নাই প্রয়োজন রাজ্য ধনে,
জটা বাকল সার করেছি,
অঙ্গে মাখি ভস্মরাশি,
আমার, কৃষি শিল্পে নাই যে মতি,
অপ্রীতি বানিজ্যের প্রতি,
কর্ম্মহীন ধর্ম্ম আমার,
চিৎ আনন্দে সদাভাসি!
আমি সন্ন্যাসী!

যে আমারে মার্কে জুতা,
মার্কে মোরে ঠেঙ্গা গুতা,
এম্নি আমার সহিষ্ণুতা,
তারেই আমি ভালবাসি,
এম্নি আমার শম দম,
ক্ষমা ধৈর্য্য এম্নি মম,
এক গালে মারিলে চাপড়
আরেক গাল ফিরায়ে হাসি !
আমি সন্ন্যাসী !

৬

আমি, বিষ্ণুচরণ ধরি মাথে,
রসাতলে যাই নিপাতে,
গদাধরের পদ্মপাদে
লভি, সদ্য মোক্ষ অবিনাশী,
আমি, গয়ের মত চিরভক্ত,
তিন পুরুষের অনুরক্ত,
চরণ তলে শরণ নিছি
চরণ ছাড়্‌লে মরণ বাসি !
আমি সন্ন্যাসী !

৭

নাইক আমার হিংসা, ক্রোধ,
নাইক ঘৃণা লজ্জা বোধ,
আমি, সেবাব্রত বিশ্বভৃত্য
আমার, বংশে জন্মে দাস দাসী,
শালগেরাম যে,
হাত পা শূন্য গোলগমুণ্ডা,
তারে করি সেবা পূজা,
জগতের, মুছ্‌ব জুতা ঝাড়্‌ব মুণ্ডা
কেবল, চরণ সেবার অভিলাষী,
আমি সন্ন্যাসী !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা। *

লঙ্কায় রাবণের অশোক কাননে সীতাকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিয়া মহাবীর হনুমান একদিন ভাবিয়াছিলেন,

"অহং হ্যতিতনু শৈচব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং যোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্।
যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা॥"

বাল্মীকীয় রামায়ণের এই তিনটি শ্লোকের অভ্যন্তরে দুইটি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে;—সেই দুইটি তত্ত্ব জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব। যদি কেহ রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহ কবিকল্পনাসম্ভূত অলীক ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ এই অনুরোধটা করিতে পারি যে, আদি কবি বাল্মীকির অভিপ্রায়টা একবার বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয়। হনুমান কোন্ জাতির অন্তর্গত ছিলেন, আর্য্য না অনার্য্য, অথবা ইরাণীয় বা তুরাণীয়, কিংবা হামাইত্ বা শামাইত্, আজিকার সভায় আমার তাহা আলোচ্য নহে। আমি বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ সংক্ষেপে নির্ণীত করিতে চেষ্টা করিব।

হনুমানের উপরি-উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সীতার ও হনুমানের এবং রাক্ষসগণের ভাষা এক নহে। তাহাদের পরস্পরের ভাষা ভিন্ন, আচার বিভিন্ন। হনুমানের তিনটী ভাষাতেই অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনার্য্যকুলসম্ভূত হইয়াও আর্য্যকুলললনা সীতাকে সীতারই ভাষায় স্বীয় মনোভাব জানাইয়াছি-

* গতবর্ষে ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। পাঠের দিবস হইতে নানা কারণে এতদিন ইহা লেখকের করতলগত না হওয়াতে প্রকাশে বিলম্ব হইল।

লেন। হনুমান অনার্য্য, সুতরাং তাঁহার ভাষা ও অনার্য্য। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কপি কুলের সেই অনার্য্য ভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এস্থলে তাঁহাদের সেই মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই দ্রাবিড় ভাষা কতদিনের আজিও তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণাংশ হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক সময়ে মোটামুটি দ্রাবিড় দেশ বলিয়া বর্ণিত হইত। রামায়ণ বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের কিয়দংশ এবং জনস্থান ও পঞ্চবটী এই দেশের অন্তর্গত ছিল। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণস্থ প্রদেশ সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদয়ে দক্ষিণারণ্য বা দক্ষিণাপথ কিংবা দাক্ষিণাত্য দেশ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সমগ্র দক্ষিণাপথই যে দ্রাবিড় দেশ তাহা কিছুতেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। চিল্লপত্তিকরণ, মণি মেকলাই, পুরণান্নুরু, মেন তামিল প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থে দ্রাবিড় দেশ তামিলক নামে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মান্দ্রাজের ১০০ মাইল উত্তরস্থিত ব্যাঙ্কট গিরিকে উক্ত গ্রন্থ সমূহের লেখকগণ তামিলক ভূমির উত্তর সীমা এবং কুমারিকা দক্ষিণসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সীমা অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কারণ ব্যাঙ্কট গিরিকে দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বোত্তর সীমা রূপে স্বীকার করিলে তৈলঙ্গ দেশ তাহার বাহিরে যাইয়া পড়ে। কিন্তু বোধ হয় সকলেই জানেন তৈলঙ্গ অর্থাৎ তেলুগু ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার একটী প্রধান শাখা। সে যাহা হউক, ভৌগলিক সীমা লইয়া অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

উত্তর ভারতের কয়েকজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ ভারতবর্ষের অপভাষাগুলিকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা পঞ্চ গৌড়ী ও পঞ্চ দ্রাবিড়ী। কিন্তু তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ও গুর্জ্জরী ভাষাকে পঞ্চ দ্রাবিড়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া এক বিষম গোলযোগের সূচনা করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত মরাঠি ও গুজরাতী ভাষার যে তিল মাত্র সম্পর্ক নাই, তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অবিদিত নহে। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, তামিল, তেলুগু, মলয়ালম্, কর্ণাটী ও টুলু এই পাঁচটীই প্রধান পঞ্চ দ্রাবিড়ী ভাষারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ টুড়া, কোটা, গণ্ড ও কু এই চারিটী ভাষাকেও পঞ্চ দ্রাবিড়ে সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বসমেত নয়টী দ্রাবিড়ী ভাষার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষে মতভেদ দেখা যায়। এক সময়ে দ্রাবিড়ী ভাষা উত্তর ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দারুণ অবজ্ঞারবিষয় বলিয়া উপেক্ষিত হইত। ইহাতে ট-বর্গের বাহুল্য দর্শনে দংষ্ট্রা বিঘট্টিত করিয়া তাঁহারা ইহাকে টাম্বা, ডাম্বা,—টাম্বা ড় টাম্বা, অসম্বাম্বা বলিয়া কতই অশান্ত ভাবে শিষ্টাচারের প্রক্রান্ত সীমা অতিক্রম করিতেন। তাঁহাদের সেই অন্যায় উপেক্ষা ও অবহেলার কারণ কি তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যে অনার্য্য-বিদ্বেষ আর্য্য ঋষি ও কবিগণের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত ছিল; বৈদিক কাল হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া দস্যু, দানব, রাক্ষস, ও যাতুধান দিগের দূর ছায়া দর্শনেও যাহা দ্বিগুণ করিয়া উঠিত, দ্রবিড়বংশে দৈত্যের কায়া ও মায়া নিগূহিত ভাবিয়া তাহা আর কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই। যেন সেই হারণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দন্তবক্র ও শিশুপাল, কংস ও জরাসন্ধের প্রেতাত্মা কালের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া আবার শত সহস্র রক্তবীজরূপে দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। তাই তাহাদের ভাষা ও ভাববিভবে এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ!

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, দ্রাবিড়ী ভাষা কতদিনের?—উত্তরে বলা যাইতে পারে, দ্রবিড় জাতি যত দিনের। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে দ্রবিড় জাতির উল্লেখ আছে; ভগবান মনু যে জাতিকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া দৈত্যদানবের নাক্কারজনক নিম্ন নিখাত হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন; মহাবীর মগধের কঠোর শাসন যাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত টিন-হুন দরাদ পারদদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল:—

ওয়ালেস, হিকেল, স্লেটার র্যাঞ্জেন ওলড্হেম প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাসাগর গ্রস্ত লেমুরিয়ার ধূমময়ী মূর্ত্তি জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আজিকার ছিন্নভিন্ন শতং যোজন দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত, দক্ষিণ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মদগস্কর, সিংহল, বোর্ণিয়ো, সুন্দ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ সমূহকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দ্রবিড়, দ্রমিল, দ্রুইড় (দ্রুমিল,) প্রভৃতির জীর্ণ চিত্র ইতিহাসের কীটদষ্ট পত্রে প্রকাশ করিতেছেন; সে জাতি কত দিনের তাহা কে বলিতে পারে? চিলপ্পতিকরণ, মণিমেকলাই প্রভৃতি প্রাচীন তামিল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাবণ স্বয়ং তামিল ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রৈলঙ্গ বা তেলুগু ভাষার প্রথম ব্যাকরণকর্ত্তা মহর্ষি কণ্ব বলেন, "ভগবান্ অন্ধ্র বিষ্ণু নিশুম্ভ দৈত্যের বধসাধন করিয়া আমাকে ত্রৈলঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণুরই আদেশে আমি এই অন্ধ্র ব্যাকরণ রচনা করিয়াছি।" আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রকটিত করা অনাবশ্যক। উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দ্রাবিড়ী ভাষা অতি প্রাচীন।

দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে তাহা প্রদর্শন করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কতকগুলি কথা দ্রাবিড়ী ও বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়; নিম্নে তন্মধ্য হইতে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল:—

(ক) দাড়ি, দোপাট্টী, পড়ন (পতন) প্রভৃতি।

(খ) কতকগুলি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা শব্দের সহিত অতি সামান্য পার্থক্য দেখা যায়; নিম্নে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে:—

বাঙ্গালা।	দ্রাবিড়ী।
আম্র	মাম্বরম্
কষ্ট	কষ্টম্
কুমারী	কুমারিট্টি
ত্রি	তিরি
দিন	দিনম্
দূর	দূরম্
নষ্ট	নষ্টম্
নিন্দা	নিন্দৈ
নিশ্চয়	নিচ্চয়ম্
পেটিকা } পেটরা }	পেটি
পুত্রী	পুট্টিরী
মঞ্জরী	মঞ্জরী
মৎস্য	মচ ছম্
মীন	মীনম্
মলয়	মলয়
মহিমা	মহিমৈ
মাংস	মাংস, মাঙ্গিষম্
মান	মানম্
মাস	মাস
মিত্র	মিট্টিরু
মুখ	মুখম্
মূঢ়	মূড়ম্
মূর্চ্ছা	মূর্চ্ছৈ
মৃগ (জীব)	মিরুগম্
মেঘ	মেগম্
যথার্থ	যতার্থম্
যুগ	যুগম্
মৌন	মৌনম্
যাচক }	যাচগম্
ভিক্ষা }	পিচ্চৈ
শৌর্য্য	শৌরীয়ম্

ঐরূপ আরও অনেকগুলি কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহা নিষ্প্রয়োজন। শব্দের সাহায্য ব্যতীত কোন কোন ক্রিয়ার সহিতও সামান্য মিল দেখা যায়; যথা:—

বাঙ্গালা	তামিল
পড়িব	পড়িপ্পেন
পড়িয়াছি	পড়িত্তেন
পড়িতে	পড়িক্ক
পড়িয়া	পড়িক্কম
(তুই) পড়্	পাড়
(তুমি) পড়	পড়িয়ুঙ্গল্
(আপনি) পড়ুন	পড়িয়ুম

(গ) পার্শি ও উর্দ্দু হইতে অনেকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ও তামিল উভয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে তন্মধ্য হইতে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে :—

বাঙ্গালা	তামিল
আসল	অসল
আগে	আগে
আর্জি	আর্জি
ইলফা	ইলফা
ইনাম	ইনাম
ইজারা	ইজারা
ইস্তাহার	ইস্তিয়ার
হুকুম	উকুম
একুন	এগুন
কবুল	কবুল
কাছারি	কাচ্চেরী
কড়ার	কড়ার
কিল্লা	কিল্লি
কিস্তি	কিস্তি
খাজনা	কজানা
জমা	জমা
জমি	জমিন
জরিমানা	জল্মানা
জরুর	জরুর
জারি	জারি
জেলা	জিলা

বাঙ্গালা	তামিল
জোর	জোর
তকরার (প্রতিবাদ ও তর্ক)	তকরার
তহ্শিলদার	তাসিলদার
তালুক	তালুক
নকল	নকল
নমুনা	নমুনা
পেশ্কার	পেশ্কার
মাশুল	মাশুল
মকুপ	মাপ্পু
বেস্ (উত্তম)	বেস্
মোহর	মোহর
রাজি	রাজি
রুজু	রুজু
সহর	সহর

উপরি-উদ্ধৃত শব্দগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গে ও দ্রাবিড়দেশে মুসলমান শাসনকালে বৈষয়িক ব্যাপার সংসাধনের নিমিত্ত পার্শি ও উর্দ্দু হইতে ঐ গুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। অধুনা সেইরূপ desk, box, court, Judge, school, college প্রভৃতি শব্দ ইংরেজী হইতে ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচলিত হইয়াছে। জাতি নিবহের পরস্পরের সংঘর্ষে বা সম্মিলনে ভাবের ও ভাষার ঐরূপ আদান প্রদান জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে ভাষা শব্দ-সম্পদে অধিক সমৃদ্ধ, সেই ভাষাই অধিকতর গৌরবান্বিত।

প্রাচীন ভাষা সমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা গরীয়সী। তথাপি কেহ কেহ বলেন, দেবভাষা সংস্কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও ইহা রোমীয় ভাষা হইতে দিনার * এবং তামিল ভাষা হইতে নীর, শর, মলয়, লঙ্কা প্রভৃতি শব্দ পরিগ্রহ

* The Origin of the Tamil Velalas, pp. 18-24.

করিয়াছে। † তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি কতদূর সমীচীন, এস্থলে তাহার আলোচনা হইতে পারে না। দ্রাবিড় ভাষা যে পাঁচটী প্রধান শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে তামিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ; অপর চারিটী ভাষার অপেক্ষা ইহাতে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক কম দেখা যায়। ইহার কারণ তামিল ভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধনে দাক্ষিণাত্য আর্য্যগণের অধিক কৃতিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্ববিষয়ে অযথাভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং স্থলবিশেষে নিরুপায় হইয়াই সংস্কৃত শব্দ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ও তামিল সদৃশ শব্দসমুদয়ের তুলনায় সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; দাড়ি, দোপাট্টা, ফোটা, কুটীর, পড়ন প্রভৃতি শব্দ তামিল হইতে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বিন্যস্ত হইল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা আবশ্যক। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটী কারণ দেখাইয়া থাকেন:—

(১) কনকসভৈ পিলে প্রমুখ কতকগুলি তামিল পণ্ডিত বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন চলিত বাঙ্গালায় তাম্রলিপ্তি, তামলিপ্তি এবং পালি ভাষায় তামলিট্টি নামে বিদিত ছিল। ‡ তামিল শব্দ উক্ত তামলিট্টি শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে তামিলেরা যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাড়ী, নাড়ী, হাঁড়ী, ভুঁড়ি প্রভৃতি তৎসমুদয়ের অবশেষ।

(২) সিংহপুর রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা মহারাজ সিংহরাজের পুত্র বিজয়সিংহ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিলে কৃষ্ণা নদীর তীরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তত্রত্য বিজয়বাটীকা নগর তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। বিজয়বাটীকা এক্ষণে বেজোয়াড়া নামে পরিচিত। ইহা ইষ্টকোষ্ট রেলওয়ে লাইনের একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। তথায় বিস্তর বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিজয় সিংহ দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা তত্তদ্দেশে বহুদিন অখণ্ড শরীরে সজীব ছিল। ক্রমে তাহার বিস্তর রূপান্তর হইয়াছে।

(৩) অন্ধ্রভৃত্যগণের বঙ্গবিজয় একটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। উক্ত ব্যাপারে জেতা ও বিজিতের মধ্যে ভাব ও ভাষা সম্পর্কে বিস্তর আদান প্রদান হইয়াছিল তদ্ব্যতীত যোড় ও বল্লালগণের প্রাচীন প্রভাব বঙ্গে বেলুড়, বেলুন প্রভৃতি গ্রামনামে আজিও দেখা যাইতেছে। *

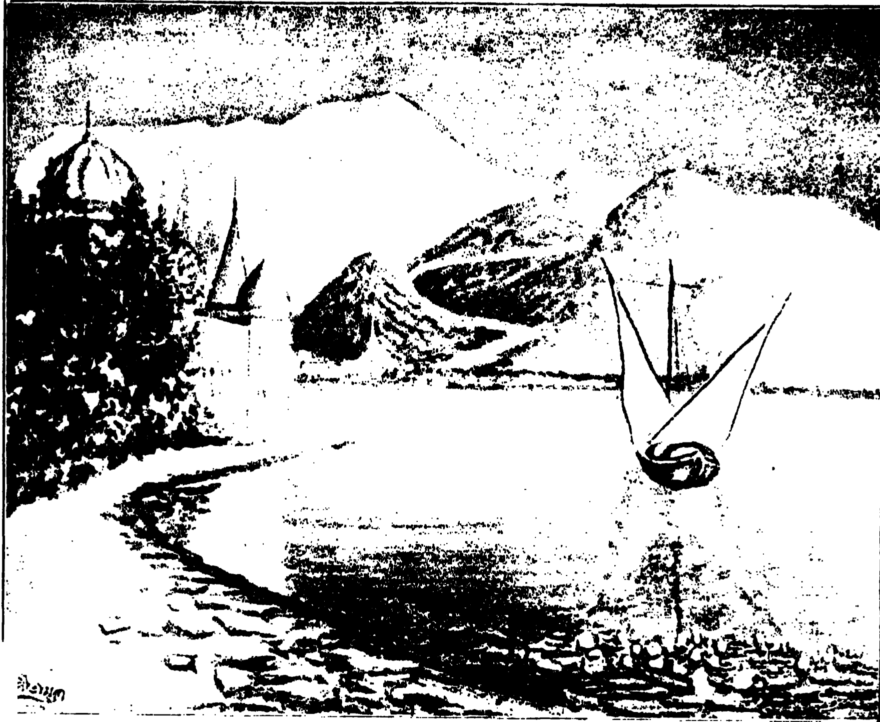
উপরি-উদ্ধৃত কারণত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটীতে তামিলক দেশে প্রাচীন বঙ্গীয় ভাষার, এবং তৃতীয়টীতে বঙ্গে তামিল ভাষার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যদি তামিল জাতি যথার্থই প্রাচীন তাম্রলিপ্তগণের বংশে উদ্ভূত এবং তাম্রলিপ্ত হইতে দক্ষিণ সাগরতীরে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তামিল ভাষার উপর প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট স্বত্ব ও স্বামিত্ব অবাধে সাব্যস্ত হইতে পারে। অতীত জাতি গৌরবের ছায়াময়ী চিন্তায় স্পর্দ্ধিত না হইয়া বাঙ্গালী মাত্রের পণ্ডিত কনকসভৈ পিলের উক্ত মতের নিরপেক্ষ আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তথ্যনিরূপণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

† Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian Languages, pp 439-447.

‡ Tamils Eighteen Hundred years Ago. pp 46, 532

* Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 245-249.



নাগেশ্বরে ঝাঁপা নদী পূর্ণ নিরন্তর,
গুণ টেনে কত নেয়ে যায় ধারে তরী বেয়ে
রেশমের পালে চলে যেন খগেশ্বর।

প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

পরী রাণী।

কাব্য গল্প।
(রাজকবি টেনিসনের "লেডি অব্ সেলট্"
কাব্যের অনুকরণে)।

দু'ধারে শরিষা-ক্ষেত, নদী ব'য়ে যায়।
পাড়ে পাহাড়ের সারি
উঠেছে আকাশ ছাড়ি'
কোথা যেন মিশে গেছে! আঁখি হেঙ্গে যায়—
দু'ধারে শরিষা-ক্ষেত, নদী ব'য়ে যায়।

ঢালু পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া
কন্দরে প্রবেশ করি
উপত্যকা ভেদ করি
দূরে চলে গেছে পথ পর্ব্বত বাহিয়া,
ঢালু পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া।

অনন্ত অকূল সিন্ধু ক্ষুদ্র দ্বীপ তায়,
সুন্দর সোণার ঘরে
পরীরাণী বাস করে
তর তর নদী-জল পুলকিয়া যায়,
অনন্ত অকূল সিন্ধু ক্ষুদ্র দ্বীপ তায়।

নাগেশ্বরে ঝাঁপা নদী পূর্ণ নিরন্তর,
গুণ টেনে কত নেয়ে
যায় ধীরে তরী বেয়ে;—
রেশমের পালে চলে যেন খগেশ্বর!
নাগেশ্বরে ঝাঁপা নদী পূর্ণ নিরন্তর।

নিঝুম সন্ধ্যায় নদী করি জাগরিত
মদির ঝঙ্কার ল'য়ে
যেত বায়ু-ভরে ব'য়ে
মধুর কণ্ঠ শুনি চিত নাচিয়া উঠিত!
নিঝুম সন্ধ্যায় নদী করি জাগরিত।

লক্ষ্মী হেমাঞ্চলাশ্রিত শ্রান্ত কৃষীবল
পুলকিত কলেবর
শুনি সে সঙ্গীত স্বর
তরঙ্গিত ক্ষেত্রে হ'ত বিস্ময় বিহ্বল;
লক্ষ্মী হেমাঞ্চলাশ্রিত শ্রান্ত কৃষীবল।

ঊষার আলোক ছায়ে, গোধূলি সন্ধ্যায়,
রবি-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে,
কিংবা রাত্রে চন্দ্রকরে,
ব্যক্ত রূপে কেহ কভু দেখিত না তায়।—
ঊষার আলোক-ছায়ে গোধূলি সন্ধ্যায়।

যাদু সূচী-শিল্প রত থাকি অনুক্ষণ
পূর্ব্ব জনমের পাপ
ভোগিত সে অভিশাপ--
"প্রত্যক্ষ দেখিলে কিছু ঘটিবে মরণ!"
যাদু সূচী-শিল্প রত থাকি অনুক্ষণ।

পরোক্ষে হেরিত কক্ষে বিশাল দর্পণে—
মায়াময় সে দর্পণ,—
প্রতিবিম্ব অগণন
পৃথিবী দেখার সাধ জাগাইত মনে;
পরোক্ষে হেরিত কক্ষে বিশাল দর্পণে।

ছিল তার প্রাণভরা গুপ্ত পরিমল;
অঙ্গরূপে ঢল্ ঢল্
যেন নব শতদল;
শূন্য মন শূন্য প্রাণ যন্ত্রণা কেবল!
ছিল তার প্রাণ ভরা গুপ্ত পরিমল।

আত্মার অন্তরে লয়ে উৎসব-উচ্ছ্বাস
কত যুবরাজ এল
কত রাজা ফিরে গেল

সাথী হল, স্বপনের অমৃত আভাস !
আত্মার অন্তরে লয়ে উৎসব উচ্ছ্বাস !

কন্দর্প-সুন্দর যুবা সদা দলে দলে
অশ্বপৃষ্ঠে বীর সাজে
রণবেশে প্রাতে সাঁঝে
নদী তীর-পথে যেত রাণী-আঁখি-তলে,
কন্দর্প-সুন্দর যুবা সদা দলে দলে।

মায়া মুকুরের' পরে প্রতিবিম্ব পড়ি
রাণীর হৃদয় তার
কাঁপাইত বার বার,
চঞ্চল হইত মন পুলকে শিহরি
মায়া মুকুরের' পরে প্রতিবিম্ব পড়ি।

বিবাহিত বর-কণে ফুল সাজ গায়ে—
আকাশে চাঁদের কর,
ঝরে ধারা ঝর ঝর,
মুগ্ধ হ'ত পরীরাণী হেরি প্রেম ছায়ে।
বিবাহিত বরকণে ফুল সাজ গায়ে।

এইরূপ ছায়া হেরি অতৃপ্ত অন্তর,
একদিন মনে মনে
ভাবে রাণী সঙ্গোপনে
"ধরার আনন্দ-স্বাদ করিব সত্বর।"
হেরি সংসারের ছায়া অতৃপ্ত অন্তর।

সোনালি শরিষা-ক্ষেতে নদী তীর দিয়া
মাণিক-হীরার সাজ
পরি এক যুবরাজ
একদিন যেতে ছিল ঘোড়ায় চড়িয়া।
সোণালি শরিষা-ক্ষেতে নদীতীর দিয়া।

তরুণ অরুণ-কর পড়ে ঝিক্ মিক্,
গায়ে, পায়ে, পাদুকায়
বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়,
"ঢালে" চিত্র মনোরম জলে চিক্‌মিক্।
তরুণ অরুণ-কর পড়ে ঝিক্‌মিক্।

সুন্দর সে "ঢালে" চিত্র নয়ন-রঞ্জন—
অপূর্ব্ব রূপসী নারী
নতশির পদে তারি
বীর এক রণ-বেশ, প্রিয় দরশন!
সুন্দর সে "ঢালে" চিত্র নয়ন-রঞ্জন।

শরতে সুন্দর শুভ্র দূর ছায়া-পথে
হীরকের খণ্ড প্রায়
কত মণি শোভা পায় !
অশ্বের রশ্মিটি ঢাকা পান্না-মরকতে।
শরতে সুন্দর শুভ্র দূর ছায়া-পথে।

রুণু ঝুণু রুণু বাজে রশ্মিতে নূপুর,—
কটিবন্ধ হ'তে ঝুলি
রূপার শিঙ্গার "খুলি",
ঝন ঝন বাজে ঘন সশব্দ মধুর
রুণু ঝুণু কণু বাজে রশ্মিতে নূপুর।

মেঘ শূন্য নীলবর্ণ আকাশের তলে
"জিন" জ্বলে—ঝক্ ঝক্ ;
হীরা-গায়ে—চক্‌চক্,
কত শত মণি তায় কিরণে উছলে !
মেঘ শূণ্য নীলবর্ণ আকাশের তলে।

মুকুটে পালখ চূড়া শোভে উল্কা প্রায়,
যেন আলোকের রেখা
নীলাকাশে যায় দেখা,
রাজার দুলাল অশ্বে তীর বেগে যায়।
মুকুটে পালখ-চূড়া শোভে উল্কা প্রায়।

নদী-নীরে ছায়া পড়ে মুকুরের' পর—
প্রতিবিম্ব মনোহর,
কেশরাশি স্কন্ধোপর



সোনা[illegible] বসা [illegible] [illegible]
মানিক [illegible] সাজ পরি কে যুবরাজ
কে [illegible] যেতেছিল ঘোড়ায় চড়িয়া

প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

রাজপুত্র অশ্বারূঢ় মূরতি সুন্দর।
নদী-নীরে ছায়া পড়ে মুকুরের' পর।

যাদু সূচী-শিল্প ছাড়ি মুগ্ধ পরীরাণী
দুই তিন পদ যেয়ে
গবাক্ষের পথে চেয়ে
অনঙ্গের অঙ্গ সম দেখে মূর্ত্তিখানি।
যাদু সূচী-শিল্প ছাড়ি মুগ্ধ পরীরাণী।

দেখা মাত্র তন্তুগুলো হ'লো এলো মেলো
উড়ে গেল নদী-পাড়;
ভেঙ্গে গেল চুরমার
সুন্দর মুকুর খানি, হায়! সব গেল!
দেখা মাত্র তন্তুগুলো হ'লো এলো মেলো।

"অভিশাপ এই এল আমার উপর"
পরীরাণী মৃদুস্বরে
বলি অতি দুঃখ-ভরে
নদী-তীরে ছুটে গেল দ্রুত, দ্রুততর।
"অভিশাপ এই এল আমার উপর।"

শরৎ সমীর বহি পীত পত্র কত
তরু হতে ফেলে ছিঁড়ে
নদী কাঁদে তীরে তীরে;
ধরা চুমি ঘন মেঘ ঢালে জল যত।
শরৎ সমীর বহি পীত পত্র কত।

নদীতীরে এসে রাণী নাগেশ্বর তলে
ক্ষুদ্র এক বাঁধা তরী
ক্ষিপ্রপদে গেল চড়ি,
গলু'য়ে লিখিল নাম পরীরাণী ব'লে।
নদীতীরে এসে রাণী নাগেশ্বর তলে।

নদীর ভাটীর দিকে অতৃপ্ত পরাণে
সুন্দর মলিন আঁখি
রাজধানী পানে রাখি
ভাসাইয়া দিল তরী শেষ দিন মানে।
নদীর ভাটীর দিকে অতৃপ্ত পরাণে।

শরিষার ক্ষেতে ক্ষেতে নাগেশ্বর-বনে,
নিশায় তরণী যায়
পাতা ঝ'ড়ে পড়ে গায়
মুকুতার পরিচ্ছদ উড়ায় পবনে।
শরিষার ক্ষেতে ক্ষেতে নাগেশ্বর-বনে।

নিশার আলস ভাঙ্গি ভাঙ্গি নীরবতা
রাণীর অন্তিম গান,
করুণ কোমল তান,
ছেয়ে গেল ক্ষেত বন.— শুধু মধুরতা।
নিশার আলস ভাঙ্গি ভাঙ্গি নীরবতা।

এরূপে সঙ্গীত-সুধা ঢালি পূণ্যময়
পদ্ম সম দুটি আঁখি
মুদিল, মানসে আঁকি
প্রাণের দেবতা সেই মূর্ত্তি প্রেমময়।
এরূপে সঙ্গীত-সুধু ঢালি পূণ্যময়।

প্রাসাদের পাশে কভু, অলিন্দের তলে,
প্রাচীরের গায় গায়
তরীখানি ভেসে যায়,
শান্ত নীরবতা ভাঙ্গি বায়ু নাহি চলে।
প্রাসাদের পাশে কভু অলিন্দের তলে।

ভাসিতে ভাসিতে তরী এল রাজপুরে,
রজনীর মহোৎসব
হঠাৎ থামিল সব
লোক জন এসে ভয়ে পলাইল দূরে।
ভাসিতে ভাসিতে তরী এল রাজপুরে।

তরীতে রাণীর দেহ মরণে' সুন্দর
আঁখি-পাতে স্নেহ ঝরে,
সুধামাখা সে অধরে,

কি সাধ্য ভুলিবে দেখি অপ্সর অমর।
তরীতে রাণীর দেহ মরণে' সুন্দর।

তরুণ যৌবন রূপে রতি-পতি প্রায়
কুমারের সমবীর
নির্ভয় হৃদয় স্থির
রাজার কুমার এসে তরীপানে চায়।
তরুণ যৌবন রূপে রতি-পতি প্রায়।

"মিশিলে সরিৎ সিন্ধু না ছিঁড়ে বন্ধন,
মরণে দেহের নাশ,
না কাটে প্রেমের পাশ,
প্রেম নাহি ডরে কভু যমের শাসন,
নহে হেথা হবে সেথা
মোদের মিলন।"

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

প্রেম।

যদি এ কঠোর সংসারে রসময়, সুখকর, তৃপ্তিকর, কোন কিছু থাকে তবে তাহা প্রেম। প্রেম কথাটি পর্য্যন্ত সরস। এই প্রেমের জন্য, এই ভালবাসার জন্য, কত শত মানবের জীবন-গতি বিভিন্ন পথাবলম্বী হইয়া থাকে। প্রেম সুধাময়—যখন নিজ হৃদয় প্রেম-পূর্ণ হইয়া যায়, যখন ঈপ্সিতের, বাঞ্ছিতের পদে আপন হতে কায়মন সমর্পিত হইয়া যায়, তখন সে প্রেমের স্পর্শে জগৎ সুধাময় হইয়া উঠে। যখন পাত্র বিশেষে প্রেম লক্ষীকৃত হয়, অমৃতধারা ভাণ্ড বিশেষ পরিপূর্ণ করে, ভাণ্ড যখন ভরপুর হইয়া যায়, সে প্রেমস্রোত তখন জগৎ সংসার প্লাবিত করে। পবিত্র প্রেম অনন্তের অংশ, সামান্য বিষয়ে তাহা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা। ভালবাসাই ভালবাসার চরম উদ্দেশ্য, অন্যতর কোন লক্ষ্য তাহার নাই। স্বকীয় পরিতৃপ্তি, আপনার বাসনার চরিতার্থতা ভালবাসার উদ্দেশ্য নহে। ভালবাসাই ভালবাসার মুখ্য উদ্দেশ্য, গৌণ নহে।

যে ভালবাসায় নিজের অর্থাৎ স্বার্থের জ্ঞান আছে তাহা অতীব হেয়। শারদ নিশায় চন্দ্রিকা শোভা পায়, বসন্তে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, ইহাদের কি কোন স্বার্থ আছে? পয়োদসংঘাতে সুনির্ম্মল বারিধারা আছে তাহার কি নিজের কোন প্রয়োজন আছে? অনেকে বলিয়া থাকেন নিঃস্বার্থ প্রেম পৃথিবীতে নাই; উহা ফাঁকা কথা—আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক। এ কথা সত্য নয়। ক্রোড়স্থিত সরল শিশুর মুখপানে তাকাইয়া জননীর হৃদয়ে যে সরল ভাবের উদয় হয়, যাহাতে স্বার্থের সংস্পর্শ নাই, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই—তাহা কি এই পৃথিবীরই বিষয় নহে? মাতৃহৃদয়ে কি তখন সন্তান কর্ত্তৃক প্রতি-দানের কথা মনে হয়? শিশুকে ভাল বাসিয়াই মায়ের সুখ। এইরূপ অন্যত্রও। ইহাই পবিত্র প্রেম। যে ভাল-বাসিয়াছে সে নিজ হৃদয় সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত করাই একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যে প্রেমিক "অবসর মত" ভালবাসিতে বলে এবং প্রিয়তমের ভাল-বাসা চাহে সে কখনও নিঃস্বার্থ প্রেমিক নহে। তাহার ভালবাসা বর্ষার জলের ন্যায় আবেগবহুল হইতে পারে কিন্তু নির্ম্মল বা ঠিক পবিত্র নহে। আকাঙ্ক্ষা কলু-ষিত বটে। আমার আমিত্ব না ভুলিলে এই স্বার্থের নিরাশন করা অসাধ্য। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু তাঁহার বিষবৃক্ষে ভালবাসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃই প্রস্তুত তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।" ইহাই ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ। বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষালের পত্র খানা উল্লেখ যোগ্য। সীতার প্রেম, দময়ন্তীর প্রেম পর্য্যালোচনার বিষয়। প্রেম অনন্তের অংশ, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা তাহাতে স্থান পায় না।

প্রকৃত ভালবাসা অন্তরের বস্তু। বাহিরের উপকরণ তাহাতে কেন? আর বাহিরের উপকরণ ত ক্ষণস্থায়ী। যদি প্রেম অবিনশ্বর হয় তবে এ সংসারের বাহিরে, এ

মরজীবনের অপর পারে তাহার স্থিতি। তবে কেন অন্তর ছাড়িয়া বাহিরের বস্তু, বাহ্যিক উপকরণে, মানসিক ছাড়িয়া স্থূল ভৌতিক বিষয়ে স্পৃহা! বাহিরের স্থূল বিষয়ে যাহা লক্ষীকৃত, সীমাবদ্ধ, তাহা স্বতঃই নশ্বর। যে রূপ, যে স্পর্শ, যে আঘ্রাণ ভাবিয়া মানব উন্মত্ত হয়, যে চক্ষু, যে ভ্রূ, যে কম কান্তি, যে মুখচ্ছবির আকর্ষণে মানব মুগ্ধ হয়, যাহার সংযোগ ভাবিয়া ভাবিয়া সুখ অনুভব করে, তাহা কি ক্ষণভঙ্গুর নহে? কিন্তু প্রেম কি উহারই সহিত শেষ হয়? চিতাভস্মের সহিত কি প্রেম নষ্ট হইতে পারে? রূপজ মোহ ও প্রকৃত প্রেমে এই প্রভেদ।

কবি বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে প্রীতি-বন্ধনে যে আবদ্ধ করে সে আভ্যন্তরীণ কোনও কারণ। বাহিরের কারণ অবলম্বন করিয়া কখনও প্রীতি (বা প্রেম) জন্মে না। প্রখর সূর্য্যের কিরণে কমল বিকশিত হয়, কমনীয় চন্দ্রমা উদিত হইলে কঠিন প্রস্তর চন্দ্রকান্ত দ্রব হইয়া যায়, ইহার মধ্যে কোনও গূঢ় (আন্তরিক) কারণ আছে। এত দূরে সূর্য্য, এত দূরে চন্দ্র, তথাপি পুণ্ডরীক প্রস্ফুটিত হয়, চন্দ্রকান্ত গলিয়া যায়। হৃদয়ের সংযোগে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহা অতি কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। সীতা হইতে রাম অভিন্নহৃদয়; রাম সীতাকে জানিতেন, সীতাও রামকে জানিতেন। "হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরং" ইহাই প্রেমের প্রকৃত অভিব্যক্তি। দুটি দেহে এক আত্মা, একের সেবায় অন্যের স্বেচ্ছাকৃত আত্মবলিদান, অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই কামনা নাই। এ পবিত্র সংযোগে অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, বিচার নাই, দোষানুসন্ধিৎসা নাই, আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নাই, কঠোরতা নাই, শুধু কোমলতা, শুধু শান্তি, শুধু ত্যাগ, শুধু প্রীতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন।

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈল নৌকাডুবির কমলমণি। সূর্য্যমুখী অথবা কমলার আদর্শের দাবী সে করিতে পারে না।

শৈলজা।

শৈলতেও উজ্জ্বল দাম্পত্য প্রেমের চিত্র আছে। সূর্য্যমুখী ও কমলার দাম্পত্য প্রেম "স্বভাবানুকারী অথচ স্বভবাতিরিক্ত", জীবন ও আদর্শ মিলাইয়া গঠিত করা হইয়াছে.—সূর্য্যমুখী ও কমলা সৃষ্টি। শৈল ও কমলমণির দাম্পত্য প্রেম নিছক ঘরাণো জিনিষ: এদের ভিতর হইতে কল্পনায় নিঙড়াইয়া আদর্শকে ফুটাইয়া তুলা হয় নাই.—এই চরিত্র দুইটি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফল।

কমলমণি ও শৈল, এই দুই জনের দাম্পত্য প্রেমেও যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য ও মধুরতা আছে। তবে কমলমণির দাম্পত্য চিত্র বেশী পরিস্ফুট এবং খোলাখোলা—শ্রীশ-কমলের আলাপে আমরা তাহার পরিচয় পাই। শৈল-চরিত্রের দাম্পত্য চিত্র লুকোচুরির ভিতর দিয়া আভাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শৈল-বিপিনের দেখাশোনা আমাদের সাক্ষাতে কখনো হয় নাই। "শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোট, মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত মুখ দেখিলেই স্থির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।"

শৈল শরীরে ও মনে সব দিক দিয়াই একটি ছোট সংস্করণের মেয়ে,—কিন্তু ছোট পরিধির মধ্যেও তাহার দাম্পত্য প্রেমের চির-নবীনতা আছে। কর্ম্ম-প্রত্যাগত বিপিনের পায়ের শব্দ [illegible] চিনে, তরঙ্গিত বুক নিয়া শত প্রয়োজন ফেলিয়াও [illegible]খানে সে ছুটিয়া যায় এবং এমনকি নবপরি[illegible]দার সঙ্গত্যাগের অভদ্রতা পর্য্যন্ত তাহাকে সেই আহ্বান হইতে ফিরাইতে পারে না। স্বামী তাহার গর্ব্ব। সে বেচারীর উপর শৈল একটু মধুর শাসন চালাইতে পর্য্যন্ত ছাড়ে না। স্বামীই তাহার একমাত্র গল্পের বিষয়; দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্য যখন তাহার হৃদয়ে ভরিয়া

উঠিয়াছে, সেই সম্বন্ধে গল্প করিবার এত উপকরণ যখন তাহাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন সখী কমলাকে পাইয়া সে এক মুহূর্ত্তে তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল। ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্বামীর কথায় ভরিয়া আসিয়া প্রবাস-প্রত্যাগত সখীতে সখীতে যখন মিলন হয়, তখন প্রথমটা ওষ্ঠ চাপিয়া দুই একটা কুশল প্রশ্ন হওয়া সম্ভবপর হইলেও, পরমুহূর্ত্তেই পেটের কথাটি বাহির হইয়া পড়ে। নূতন সখী করিবার বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না,—শৈলর ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সে আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যে তাহার স্বামীর কথা ফাঁদিয়া বসিল,—তাহাদের মধ্যে দিবা-সাক্ষাতের জন্য কেমন লুকোচুরি চলে, বিদেশে কর্ম্মের জন্য গিয়া বিপিন কেমন দুদিনও শৈলকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রূপে দুই সখীতে, দুই বোনে মিলন পাকিয়া উঠিল। তারপর কমলার সর্ব্বপ্রয়োজনে তাহার মঙ্গল এবং স্নেহ হস্ত, কমলার পলায়নে তাহার গভীর দুঃখ আমরা দেখিতে পাই। শেষে কমলাকে খুঁজিবার জন্য জীবনে এই প্রথম বিপিনকে এত দিনের জন্য ছাড়িয়া কাশী থাকায় এবং শেষ পর্য্যন্ত কমলার স্থিতি দেখিয়া যাইবার জন্য তাহার নানাবিধ চেষ্টায় তাহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়টির পূর্ণ পরিচয় পাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ হইতে হয়।

শৈলর মেয়ে উমিকে আমরা ভুলিতে পারি না।

উমি। কমলার স্নেহের ভিতর দিয়া তাহার বেশ একটা মূল্য আছে। সে তাহার "মাসী-প-প গেছে", কলম দিয়া আঁচর কাটা এবং নানাবিধ অস্ফুট বাকচেষ্টা লইয়া আমাদের সহিত বেশ একটু মধুর সম্বন্ধ পাতিয়া বসে।

নৌকাডুবির দুইটি শিশু; একটি অস্ফুটবাক, আর

উমেশ। একটির কথা ফুটিলেও কমলার স্নেহের সামনে তাহার শব্দহীন "আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটিই" তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাকসম্পত্তি। উমেশের বয়স কত তাহার ঠিক ধারণা করা যায় না। কোনো কোনো কথায় তাহাকে কিছু ইঁচড়ে পাকা বলিয়াই মনে হয়,—অর্থাৎ যে বয়সে ভদ্র এবং শিক্ষিত পরিবারের ছেলেদের সাংসারিক জ্ঞান মোটেই হয় না সেই বয়সে তাহার তাহা অনেকটা হইয়াছিল। সে বাজারের পয়সা হইতে চুরি করিতে শিখিয়াছে, রান্নার আয়োজনের বুদ্ধি এবং তদনুরূপ কর্ম্ম সে জোগায়, ষ্টেশনে টিকিট কিনিয়া কমলাকে মেয়েগাড়ীতে বসাইয়া নিজে "পাশের গাড়ীতে" বসিবার অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। ভোজনের আনন্দ তাহার খুব আছে, খাইতে খাইতে সে কমলার চচ্চড়ির পাত্র নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে। তাহাকে আমরা বড় একটা দেখি না এবং দেখিতে চাইও না। সে তাহার স্নেহসর্ব্বস্ব প্রাণে তাহার "মা" কমলার প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা লইয়াই আমাদের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার এক আত্মীয়ার নিকট যাইতেছিল, পথে ষ্টীমারে কমলাকে দেখিয়া তাহার নিকট ভক্তি এবং ভালবাসায় চিত্ত নিবেদন করিয়া দিল এবং এক মুহূর্ত্তে তাহার সহিত অকাট্য চিরন্তন গ্রন্থি বন্ধন হইয়া গেল। সে কমলাকে খুসি করিবার জন্য শাক চুরি করিয়া আনে এবং বোধ হয় অন্যবিধ দুষ্কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত নয়,—এর জন্য ষ্টীমার একরূপ 'ফেল্' করিয়াও তার জন্য তাহার কোনো পশ্চাত্তাপ হয় না। অনাদরক্লিষ্ট বিনিদ্র কমলাকে দেখিয়া সে হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিয়া কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে পূর্ব্ব দিনে যে বাজারের টাকাটি হইতে কিছুই বাঁচে নাই বলিয়াছিল আজ খাপছাড়া ভাবে সেই সম্বন্ধে বলিয়া বসে—"মা কালকের টাকা হইতে সাত আনা বাঁচিয়াছে।" কমলা দুঃখের মধ্যেও স্নেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া তাহাকে ঘুমাইতে বলে, উমেশ এই স্নেহের হাসিটি মনে লইয়া ঘুমাইতে যায়।

গম্ভীর রমেশের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল হয় নাই। কমলার স্নেহে ভাগ বসাইতে আসিয়াছেন মনে করিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়ার প্রতি প্রথমে তাহার ঈর্ষ্যা হইয়াছিল

তবে ভাত খাইতে বেশী দেরী হয় নাই। যুবতীর প্রেম লইয়া বালকে বৃদ্ধে ঈর্ষ্যা বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না তবে অবশ্য তাহার সমবয়স্ক কোনো বালক হইলে উমেশ; তাহাকে কখনই রেহাই দিত না। গাজিপুরে কমলার পলায়নের দিন কমলার নিকট হইতে পাঁচটি টাকা এবং কাপড় উপহার পাইয়া তাহার কত আনন্দ! অবশ্য এগুলির প্রতি যে তাহার আন্তরিক লোভ ছিল না তাহা নহে, তবে "মা দিয়াছে" এই মনে করিয়াই তাহার আনন্দ। পরদিন সকালে যখন কমলার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না এবং সমস্ত সঙ্কেতই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল, তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না—"মা, মাগো"—বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জল সেখানে বেশী ছিল না—উমেশ বারংবার পাগলের মত ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল—জল ঘোলা করিয়া তুলিল।" তারপর কিছুদিন পর মোগলসরাইয়ে উমেশ কমলাকে দেখিতে পাইল এবং কোনো রকম অভিমান, দুঃখ কিম্বা কমলার ব্যবহারের জন্য কোনো কিছু প্রশ্ন না করিয়া তাহার পরিচিত কণ্ঠে ডাকিল "মা" এবং কমলাকে প্রণাম করিয়া তাহার হৃদয়ের পরিপূর্ণতা এবং অপার সন্তোষ এবং উল্লাসের চিহ্নস্বরূপ তাহার আকর্ণ-প্রসারিত হাসিটি বিকশিত করিয়া দিল। কমলার সহিত তাহার গ্রন্থি কিছু দিনের জন্য ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন হইতে আবার চিরদিনের জন্য তাহা দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই গৃহশূন্য "লক্ষ্মীছাড়া" ছোড়াটার অভাবে নলিনাক্ষের সহিত কমলার মিলন সম্পূর্ণ হইত না, আর উমেশ সারাজীবন কমলাকে পূজা করিয়া এবং ভালবাসিয়া না কাটাইয়া দিলে তাহার জীবনের কোনো সার্থকতাই থাকিত না।

নৌকাডুবিতে তিনটি বয়স্থা গৃহিনী আছেন—বাঙ্গালী গৃহিনীর তিনটি উজ্জল ছবি! নিজের সন্তানাদি লইয়া গর্ব্বকরা, শুধু বাঙ্গালী গৃহিনীর কেন, বোধ হয় পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত গৃহিনীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। হরি-

হরিভাবিনী, নবীনকালী ও ক্ষেমঙ্করী

ভাবিনী তাঁহার অনুপস্থিত কন্যা বিধুর রূপ কমলার নিকট যাহাতে খাটো হইয়া না যায় এইজন্য কমলার সহিত তাহার মুখাবয়বের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া বসেন। নবীনকালী তাঁহার অনুপস্থিত হাকিম-পুত্রের রাজসম্মানের কথা উল্লেখ করেন। ক্ষেমঙ্করীও তাঁহার নলিনাক্ষটিকে লইয়া গর্ব্ব অনুভব করেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেও ছাড়েন না। তবে হরিভাবিনী-নবীনকালীর তাঁহাদের সন্তানদের সম্বন্ধেও লোক-দেখানোর প্রবৃত্তিটাই বেশী, আর ক্ষেমঙ্করীর গর্ব্বের প্রধান হেতুই হইয়াছে তাঁহার স্নেহ। এই লোক-দেখানোর প্রবৃত্তিতেই হরিভাবিনী-নবীনকালী মিথ্যার আশ্রয় নিয়া থাকেন, আর এই প্রবৃত্তির অভাবে এবং তাঁহার নলিনাক্ষটি গর্ব্ব করিবার জিনিষও বটে এর জন্যও ক্ষেমঙ্করীর তাহা করিতে হয় না। এই প্রবৃত্তির জন্যই হরিভাবিনী-নবীনকালী যার-তার-কাছে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাদের 'বড়লোক' সন্তানদের গল্প ফাঁদিয়া বসেন, আর ইহার অভাবেই ক্ষেমঙ্করী আপন এবং নিতান্ত পরিচিত লোকের নিকট ভিন্ন তাঁহার নলিনাক্ষের উল্লেখ করেন না। তাঁহাদের গর্ব্বের বিষয় তাঁহাদের কন্যার বহুমূল্য গহনা, জামাতা ও পুত্রের চাকুরী ও রাজ সম্মান, তাঁহার গর্ব্বের বিষয় তাঁহার পুত্রের পূত নির্ম্মল চরিত্র মাহাত্ম্য। হরিভাবিনী-নবীনকালীর এই 'বড়লোকি' দেখানোর প্রবৃত্তি যে শুধু তাঁহাদের সন্তানদিগকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পায় তাহা নহে, "নূতন বাড়ী মেরামত," "চৌদ্দ টাকা বেতনের বামুন," "মখমল্ কিংখাবের গৃহ আস্বাব," "সোণারূপার ভোজন পাত্র" ইত্যাদি অস্তিত্বহীন জিনিষের মিথ্যা গর্ব্বেও ফুটিয়া উঠে। এই গর্ব্বটাও পুরাতন বাঙ্গালী গৃহিনীদের একটা বড় বিশেষত্ব। ক্ষেমঙ্করীর এই 'বড়লোকি' হীনতা আদৌ নাই।

এই লোক-দেখানোর প্রবৃত্তিতে দুইজনের সাদৃশ্য থাকিলেও মূলে হরিভাবিনী নবীনকালীতে তফাৎ অনেক। হরিভাবিনীর আত্মগর্ব্ব ব্যাখ্যানে আমরা একটু আমোদ অনুভব করি এবং মনে মনে হাসি; তাঁহার লোক

হরিভাবিনী ও নবীনকালী

দেখানো কাহাকেও আঘাত করে না, কারণ তাঁহার হৃদয়টি সরল এবং স্নেহপরায়ণ, কমলার আদর তিনি করিতে জানেন। আর নবনকালীই যে করিতে জানেন না তাহা নহে, তবে নবীনকালীর আদর বিনা বেতনে বামুনঠাকুরুণ পাইবার স্বার্থে হরিভাবিনীর আত্মগর্ব্বে যথেষ্ট স্নেহ এবং সত্যের সংস্পর্শ আছে. নবীনকালীর আত্মগর্ব্বে স্নেহের অংশ খুব কম এবং সত্য নাই বলিলেই চলে, কাজেই আমাদিগকে তাহা আঘাত করে এবং আমোদের সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধের সঞ্চার করে। অবশ্য এই ক্রোধের হেতু কমলার প্রতি তাঁহার নির্য্যাতনের পূর্ব্বাভাসেই অনেকটা নিহিত। কমলার প্রতি তাঁহার অত্যাচারে এবং চুরি অপরাধ ও অন্যবিধ অপমানে আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ করুণা. ক্রোধ এবং হাস্যের উদ্রেক করে। নবীনকালী নিজে যাহাকে হয়ত আদর্শ গিন্নিপনা মনে করেন তাহা তাঁহার সংকীর্ণ চিত্ততা বৈ আর কিছুই নহে। নবীনকালীর হৃদয় আছে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয় থাকিলেও তাহা তাঁহার কর্কশ রসনা এবং বিরুদ্ধ বাহিরের নীচে এতই চাপা পড়িয়াছে যে কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারে না।

বাহিরের একটা বড় রকমের আঘাত পাইলে এই সুপ্ত হৃদয় তাহার গোপন আগার হইতে সাড়া দিয়া উঠিত কি না ঠিক বলিতে পারি না. কারণ সে আঘাত উপস্থিত হয় নাই। মোগলসরাইয়ে যখন তাঁহার নিষ্ঠুর কবল হতে কমলা মুক্তি পাইল তখন বামুনঠাকরুন কমলার জন্য স্বার্থের দুঃখ ছাড়া আর কোনো রকম দুঃখ তাঁহার হইয়াছিল কি না সেই খবর লইতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কমলার চারিদিকে যে আর একটি জাল জড়াইয়া উঠিতেছিল দৈব তাহা এমন করিয়া কাটিয়া দিলে তাহারি আনন্দে আমরা কমলার জীবন অনুসরণ করিয়া চলি, সেই জীবনেতিহাসের দুই দিনের আগন্তুকের কথা আর আমাদের মনেই থাকে না।

ক্ষেমঙ্করী নৌকাডুবির একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি সকলের শেষে এই উপন্যাস গগনে আসিয়া উদিত হইয়াছেন,—তবু এই অল্প পরিসর এবং ততোধিক অল্প সময়ের মধ্যে এই ছবিটি আশ্চর্য্য অম্লান ঔজ্জ্বল্যের সহিত পরিস্ফুট রেখাসীমার ধ্রুবতায় আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষের মাতা, তাঁহার প্রতি কাজে এবং কথায় প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে পার্থিব ব্যাপারে এবং জিনিষে প্রকাশিত-প্রতিফলিত-অথবা-সুপ্ত সূর্য্যকিরণের মত নলিনাক্ষের প্রতি তাঁহার স্নেহের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়া থাকি। মাতা ক্ষেমঙ্করী রূপে যদিও তিনি উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছেন, তবুও শুধু মাতৃত্বেই এই চরিত্র নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। তাঁহার মনোবৃত্তি সজাগ এবং সজ্ঞান, তাঁহার হৃদয়ের অধ্যাত্মবৃত্তির উন্মুখতার পরিচয় ও আমরা পাইয়া থাকি। চোখের বালির মাতা রাজলক্ষ্মী এবং সাত্ত্বিকা অন্নপূর্ণা নৌকাডুবির ক্ষেমঙ্করীতে আসিয়া মিলিয়া গিয়াছেন. তবে এই রাসায়নিক সংযোগক্রিয়ায় এই মানবীটিতে রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বাভিমান লয় পাইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্নপূর্ণার সাত্ত্বিকতা ছাড়াও কতকগুলি নূতন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছে।

ক্ষেমঙ্করীতে মাতৃত্বাভিমান নাই, তাহার কারণ মাতৃস্বর্গবিচ্যুত মহেন্দ্রের মত সন্তান-নলিনাক্ষ এই অভিমানের কোনো সুযোগই দেয় না, সন্তান হিসাবে নলিনাক্ষ এত খাঁটি এবং পরিণত; তাহা না হইলে ক্ষেমঙ্করীতেও এই অভিমানের আমরা সাক্ষাৎ পাইতাম. কারণ অভিমানের মূল হেতু যে সূক্ষ্মানুভব অথবা অল্পেই আঘাত পাইবার ক্ষমতা, তাহা অনেক দিক দিয়া ক্ষেমঙ্করীতে যে আরো সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত; স্নেহহীন সেবা তিনি সহ্য করিতে পারেন না, এজন্য কোনো মাহিনাকরা দাসী চাকর তিনি রাখেন না। নলিনাক্ষের গুণে মুগ্ধ হইয়া নয়, শুধু অনুরোধে পড়িয়া হেমনলিনী তাহাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, হেমনলিনীর মুখে এই অনুৎসাহের কাষ্ঠভাবটা ক্ষেমঙ্করীর

চক্ষু এড়াইতে পারে না এবং শুধু এই নীরব সূক্ষ্ম ভাব পরিচয়ের জোরেই প্রস্তাবিত বিবাহকে ভাঙ্গিয়া দিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন।

মানস বৃত্তিতে অন্নপূর্ণা ও ক্ষেমঙ্করীর সাদৃশ্য আছে,—দু'জনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মানবচরিত্রাভিজ্ঞা, তবে বাংলা মাসিকের রচনা পাঠ শুনিতে আনন্দ এবং সেগুলি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাঁহার আলোচনা করার ক্ষমতায় ক্ষেমঙ্করীর মানসশক্তিকে আমরা কিছু বেশী উজ্জ্বল এবং প্রস্ফুট বলিয়া দেখিতে পাই। দু'জনই সত্ত্বগুণসম্পন্না, তবে অন্নপূর্ণার সাত্ত্বিকতা সরল এবং একমুখী, আর ক্ষেমঙ্করীর সাত্ত্বিকতা বিরুদ্ধ এবং বিচিত্র উপকরণের সমাবেশে একটু জটিল। অন্নপূর্ণায় আচার নিষ্ঠার প্রকাশ নাই; কিন্তু অসুখ লইয়া প্রাতঃস্নান, আহার ইত্যাদি লইয়া অন্যবিধ কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রাহ্ম হেমনলিনী এবং এমন কি ব্রাহ্ম স্বামীপুত্রের নিকট হইতে কলুষ-স্পর্শশূন্য থাকিবার চেষ্টায় ক্ষেমঙ্করীতে এই আচারনিষ্ঠার প্রকাশ খুব বেশী; অথচ এই অতি-আচারের অত্যাচারেও হিন্দুবিধবার সংকীর্ণচিত্ততার ভাগটা তাঁহাতে আদৌ নাই। তাঁহার পর-সহিষ্ণুতা (toleration) অসামান্য, তিনি যে অন্যকে লইয়া "ছুঁই ছুঁই করেন" ইহা তাঁহার 'ঘৃণা' নহে, শুধু একটা 'অভ্যাস,' ইহা তাঁহার পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর নিকট হইতে পাইয়াছেন, এই অবলম্বনকে তিনি ছাড়িতে পারেন না; তবে যে ভাবে যে পালিত সেই ভাবেই তাহার সত্যোপলব্ধির পথে কোনো বাধা নাই ইহাই তাঁহার মত। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব। স্পর্শ বাঁচাইয়া চলা, অথচ মেম রাখিয়া সেলাই কার্য্য শিক্ষা; নিজসম্বন্ধে যথাসম্ভব কৃচ্ছ্রতাসাধন, অথচ অন্যকে মনের মত করিয়া সাজাইবার ইচ্ছা, অন্যে অলঙ্কার ভূষণ এবং সুসজ্জা, ফুল এবং সুন্দর মুখ ভালবাসা; নিষ্ঠা কঠোর আচারপরায়ণতা, অথচ অসাধারণ পরসহিষ্ণুতা; পুস্তকের শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, অথচ স্বাধীনভাবে মানসশক্তি পরিচালনার ক্ষমতা, ইত্যাদি বিরুদ্ধতার সম্মিলনে ক্ষেমঙ্করী-চরিত্র অপূর্ব্ব। অন্নপূর্ণা তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় সরলতা এবং একমুখিতার ফলে বেশী গাঢ় এবং একাগ্রচিত্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষেমঙ্করীর ভগবৎপরায়ণতা কিছু তরল হইলেও বিচিত্র তার মাধুর্য্যে এই চরিত্রসৃষ্টি অভিনব এবং নিপুণতর ইহা নিশ্চিত।

নারীভক্ত কবির "সর্ব্বশেষের গানটি" "কল্যাণী"র জন্যই, এই চরিত্র-পূজকের সর্ব্বশেষ চরিতালোচনাটি ও কল্যাণময় নলিনাক্ষকে লইয়াই।

নলিনাক্ষ

নলিনাক্ষ * এই গ্রন্থের একজন নায়ক। রমেশের প্রভাব যদিও সারা গ্রন্থ জুড়িয়াই বর্ত্তমান, আর নলিনাক্ষ যদিও গ্রন্থের মাঝামাঝি জায়গায় আসিয়া উদিত হইয়াছেন, তবুও নলিনাক্ষই গ্রন্থের শেষ অংশের রাজা,—সেখানে রমেশের প্রভাবও কতকটা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

---

* রবীন্দ্রনাথের নামকরণের বিরুদ্ধে আমরা এখানে একটি নালিস রুজু করিয়া রাখিতেছি। বিনোদিনী এবং পরেশ এই দুইটি নাম তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য দুই দুই জনের দুই উপন্যাসে আছে, একটু সতর্ক হইলে এই দুটি নাম তিনি নিজের উপন্যাসে না ঢুকাইয়াও পারিতেন। এটা তত দোষের না হইলেও, নিজের রচনাতেই নামের পুনরুক্তিটা নিশ্চয়ই দোষাবহ। "চিরকুমার সভা"য় অক্ষয়ের সাক্ষাৎ পাইয়া আসিয়া "চোখের বালি"তে অক্ষয়নামধারী আর কাহাকেও আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি নাই। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার লিখিত "ভগ্নহৃদয়ে"র নলিনীকে আমরা তাঁহার "নলিনী"-নাম্নী ক্ষুদ্র নাটিকাতেও দেখিয়াছিলাম। সেই নলিনী বহুদিন পরে "নৌকাডুবি"তে আসিয়া হেম-জন্ম লাভ করিয়াছেন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তিনি যে "গোড়ায় গলদ" এবং "নৌকাডুবি" দুই পুস্তকেই দুইটি পুরুষের 'আক্ষ'তে আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছেন তাহা অসহ্য। "গোড়ায় গলদে"র নলিনাক্ষটি 'নলিনাক্ষ'র মত হইলেও, এই নারী-ধাম্মিতায়ই তাঁহার একটা চারিত্র ব্যক্তিত্ব আছে; আর আমাদের এই নলিনাক্ষটির ত কথাই নাই। এক নামে দুটি ব্যক্তিত্বের নামকরণ করা অন্যায়।

কিন্তু রাজা হইলেও সিংহাসন, রাজপরিচ্ছদ কিম্বা রাজদণ্ড তাঁহার কিছুই নাই,—তিনি নিতান্তই প্রজাতন্ত্রের রাজা, দশের কর্ম্মকোলাহলে তিনি আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। বাহিরের কোনো পরিচায়ক চিহ্নের অভাবে এই দর্পচোরা রাজাটিকে আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে তিনি ধরা পড়িয়াছেন,—তখন দেখিয়াছি দশের কর্ম্ম তাঁহারই কর্ম্ম, দশের শক্তি সৌন্দর্য্য তাঁহারই শক্তি সৌন্দর্য্য। গ্রন্থশেষের জীবন-কল্লোলের তিনিই গোপন উৎস।

নলিনাক্ষ প্রথম জীবনে কেন্দ্রহীন ছিলেন এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মের কথায় মার মূর্ত্তি ধরিতেন, মাতা ক্ষেমঙ্করীর নিকট হইতে আমরা এই খবর শুনিয়াছি, কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই নাই। ব্রাহ্ম পিতা মারা গেলে হিন্দু আচারপরায়ণা মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্রাহ্ম নলিনাক্ষ প্রথম আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অন্তরের উড়ে-চলা ভক্তিপ্রাণতা এতদিন অবলম্বনের অভাবে বাহিরে এবং নিজের কাছেও প্রকাশিত হইতে পারে নাই,—আচার অনুষ্ঠানের সূত্র ধরিয়া যখন হৃদয়ের পরিপূর্ণতাকে আধ্যাত্মিক দানাবাঁধা পাইলেন তখনই যথার্থভাবে তিনি আপন হৃদয়ের পরিচয়টি লাভ করিলেন, তখন নিয়ম-সংযমের আর কোনো শুষ্কতা রহিল না, অন্তরের রসে তাহাও মধুর হইয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ ছাত্রদের অনুরোধে মাঝে মাঝে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সোনা যেমন বানানো যায় না, বড় বড় আধ্যাত্মিক কথাগুলিও তেমনি কাহারো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে ছাড়া সৃষ্ট হইতে পারে না। অধ্যাত্মজীবন ভিত্তিহীন মুখের ফাঁকা কথাগুলি হাওয়ায় মিলাইয়া যায়, যাহার হৃদয়তরী হৃদয়দেবের দুটি "সোনা-করা চরণপাশে" সোনা হইয়া যায় নাই, তাহার প্রকাশকে গায়ে সোনার রং মাখিয়া আসিলেও, নকল অনুকরণ এবং গিল্টিকরা বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। নলিনাক্ষের বক্তৃতা তেমন নয়, সেই বক্তৃতা হইতেই তাঁহাকে আমরা প্রকৃত আধ্যাত্মিক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।

সভায় নলিনাক্ষ বক্তৃতা করেন, দশজনে নলিনাক্ষকে লইয়া টানাটানি করে—এর জন্যই নলিনাক্ষ সভার এবং দশ জনের মানুষ নহেন। তিনি দশ জনের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু অন্তরেও ডুবিতে পারেন, এবং অন্তরে ডুবার একতায়ই নলিনাক্ষ চরিত্রের বিশেষত্ব। এমন কি তিনি যখন দশজনের সহিত মিশেন তখনও যেন তিনি তাঁহার নিষ্ঠা-নিয়মের পবিত্রতা গায় মাখিয়া আসেন, তখনো একটি ধ্যানপরায়ণ গম্ভীরতার জ্যোতির্গোলকে তাঁহাকে দশজন হইতে পৃথক করিয়া রাখে।

অন্নদা, হেমের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে আমরা বেশ আলাপী এবং রসিক বলিয়াই দেখি। কিন্তু বেশী কথা কহাটা তাঁহার মোটেই প্রকৃতিগত নহে, প্রথম জানাশোনার সময় তাঁহার অন্তরতম গভীরতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ইহা শুধু কৃত্রিম বাক্‌জাল। এই প্রথম সাক্ষাতের পর তাঁহাকে আর আমরা বড় বাক্যব্যয় করিতে দেখি নাই। ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহাকে আচার পরায়ণতার জন্য নিন্দা করেন, মাতা ক্ষেমঙ্করী তাঁহার এই যৌবন তপশ্চর্য্যাকে ছাড়িতে অনুরোধ করেন, যোগেন্দ্র তাহার মানব চরিত্রানভিজ্ঞ স্থূলতা দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করে, কিন্তু নলিনাক্ষ শুধু নীরবে হাসেন—কোনো প্রতিবাদ নাই, তর্ক নাই, কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিবার লেশমাত্র প্রয়াস নাই। বাহিরের কোনো বিরুদ্ধতা তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, বিরোধ-বিক্ষেপ তাঁহার গা হইতে যেন পিছলাইয়া যায়।

মুখে কথা নাই, হাতে কাজ নাই, নায়কতার সাধারণ কোনো লক্ষণই নাই,—অথচ তিনি গ্রন্থের শেষাংশের নায়ক, তাঁহার নায়কত্বের দাবী শুধু তাঁহার নীরব প্রশান্তি এবং স্নিগ্ধ হাসিটির মধ্যেই আছে। প্রত্যক্ষ ঘটনা দিয়া বিচার করিতে গেলে কমলার স্বামীত্ব ছাড়া নলিনাক্ষের আর কোনো মূল্যই থাকে না, কিন্তু সেই

ভাবে বিচার করা সব চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক বিচার নয়। অপ্রকাশমান নলিনাক্ষ-সূর্য্যের আলোক সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য অন্য চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত আলোকের দিকেই আমাদিগকে তাকাইতে হইবে—অন্য চরিত্রের উপর নলিনাক্ষের প্রভাবের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে নলিনাক্ষকে বুঝিতে হইবে। সেই ভাবে বিচার করিলে দেখি নৌকাডুবির শেষাংশ নলিনাক্ষ দিয়াই নিয়ন্ত্রিত,—তাঁহার প্রভাবে শোক-ম্রিয়মাণ হেমনলিনী বাহিরের নিষ্ঠার মধ্যে দৃঢ়তার অবলম্বন লাভ করিয়াছে এবং বিরুদ্ধতার আঘাতে মুহ্যমান হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রশান্ত ভাবে হাসিতে শিখিয়াছে, তাঁহারি চরিত্রপ্রভাব অন্নদার মনে আনন্দ ঘণাইয়া তুলে এবং তাঁহাকে জামাতৃপদে পাইবার আশায় অন্নদা নিজকে যার পর নাই সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন, মাতা ক্ষেমঙ্করী তাঁহারই চরিত্র মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যায় আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলেন- এবং কমলা এই সৌম্যসুন্দর দেবতার মত স্বামীটির উদ্দেশেই দূর হইতে আপন জীবনযাত্রা চালায় এবং নিকটে আসিয়া সেবাকর্ম্মে পূজার ফুলটুকুর মত তাঁহারি চরণে পাণে আপনাকে নিবেদন করিয়া দেয়। নলিনাক্ষ হেমের গুরু, অন্নদার ভক্তির পাত্র, ক্ষেমঙ্করীর 'বাপ' এবং কমলার স্বামী,—চারিটি ভক্তের দেবতা এই নলিনাক্ষ;—সেও আবার কেমন ভক্ত,—একটি শিক্ষা সংযমে অতুল, একটি প্রশান্ত স্নেহে পরিণত, একটি মানসতা ও সাত্ত্বিকতায় পূজনীয়া এবং অন্যটি সরল পাতিব্রত্যের আদর্শ।

কিন্তু যিনি প্রকৃত দেবতা তিনি আবার তাঁর ভক্তগণের ভক্ত না হইয়া ছাড়েন না। নলিনাক্ষ হেমনলিনীকে সম্মান করেন, অন্নদাকে ভক্তি করেন, তাঁহার নিত্য-জাগ্রৎ অবিচলিত সেবাহস্ত মাতা ক্ষেমঙ্করীর ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনে খাটান, কমলার হৃদয়নিহিত সতী-মাহাত্ম্যকে দ্বিধাবর্জ্জিত হৃদয়ে পূজা করেন।

কমলা-ঘটিত ব্যাপারে নলিনাক্ষ চরিত্রের সুন্দর প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা-বাপ-মরা দুস্থা কমলাকে তিনি না দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। নৌকাডুবিতে কমলা হারাইয়া গেলে তিনি বহুকাল পর্য্যন্তও কমলার আশাকে ছাড়েন নাই এবং দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে ক্ষেমঙ্করীর বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও কমলার মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় নহেন বলিয়া তিনি শুধু সময় লইয়াছেন। কমলাকে হরিদাসীরূপে দেখিয়া একটা-কি অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য তাঁহার মনের চেষ্টা দেখিতে পাই, রমেশের চিঠি পড়িয়া হরিদাসীই যে কমলা এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ থাকে নাই, রমেশের চিঠি যে কথার সাক্ষ্য দিল, নলিনাক্ষের নিজের অন্তরদর্শী দৃষ্টির কাছেও কমলা-হৃদয়ের সেই সতীতীর্থতার খবরটি গোপন রহিল না। রমেশের সহিত এতদিন বাস করিয়া-আসা সত্ত্বেও কমলাকে কোনো প্রশ্ন না করিয়াই এমন দ্বিধাবিহীন ভাবে গ্রহণ করায় নলিনাক্ষের খুব মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু মহৎ নলিনাক্ষের চেয়েও আধ্যাত্মিক নলিনাক্ষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিতে বাধ্য। এই আধ্যাত্মিকতায়ও আবার নলিনাক্ষের একটু বেশ বিশেষত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে একমাত্র নলিনাক্ষই যুবক—নবীন তপস্বী তিনি আর সৃষ্টি করেন নাই। নলিনাক্ষের এ নবীনতা যে সুধু বয়সে তাহা নহে, তাঁহার চিত্তের যুবভাবেও বটে। আমরা এতদিন শুধু নলিনাক্ষের ধ্যান-অধ্যয়নের গম্ভীরতাই দেখিয়া আসিয়াছি, আজ সহসা সেই শান্ত শুভ্রতার মধ্যে রবির রক্তিম আলো তাঁহার রোমকূপ ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে রাঙাইয়া দিল এবং কমলার কৃপায় সেখানে নানাসুরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। এই পবিত্র প্রেমে নলিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বাড়িয়াছে। পরিণতিকে শুধু যে "Passionless perfection" হইতে হইবে তাহার কোনো মানে নাই "The low Sun that makes the colour" এই কথা মনে করিয়া নলিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতাকে খাটো করা

যাইবে না, কারণ নলিনাক্ষ এই প্রেমকে আধ্যাত্মিকতার সূত্রে বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছেন, কমলাকে লইয়া তাঁহার উপাসনায় আমরা তার পরিচয় পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

সার্থক মিলন।

প্রকৃতি সজনী মোর! বসন্তের প্রথম উষায়
পূরাতে ভক্তের সাধ—জানাইতে ভালবাসা তায়—
আজ তুমি দেখা দিলে আত্ম-হারা উন্মাদিনী-সাজে
বহিল অমৃত-বন্যা পিপাসিত অন্তরের মাঝে!

সংসার-অতীতা অয়ি! কত শঙ্কা জাগে মনে মনে
পড়ে পাছে দেবী-মূর্ত্তি সংসারের সন্তপ্ত নয়নে!
উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল আঁখি—লজ্জা-নম্র সুচারু আনন
করেছিল তোমা সখী, আরো যেন সুন্দর শোভন!

গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধি, শুধাইনু তৃষিত হিয়ায়
জন্মান্তরে পাব তোমা? সুখী হবে লভিয়ে আমায়?
আশাতীত প্রেমময়ী! সুধাভরা একটি চুম্বন
সকল উত্তর মোরে দিয়ে গেল নিঃশব্দে কেমন!

বিশ্বের তরুণ আলো, পিক-কণ্ঠ, মৃদুল মলয়
জানাইল দেবাশীষে এ মিলন সার্থক নিশ্চয়!

১লা ফাল্গুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত।

গিলগিট্ দিগের বিবাহোৎসব।

গতচৈত্রসংখ্যা "ভারতীতে" আমার লিখিত 'গিলগিট' দিগের আমোদ প্রমোদ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠক পাঠিকাগণ পাঠ করিয়াছেন, গতবারে আমি গিলগিটদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রধান "গিনোবাজনো" উৎসবের বিবরণ প্রদান করিয়াছি। অদ্য তাহাদের বিবাহ উৎসবের একখানি চিত্র "প্রতিভার" পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমাংশে ২২৮ মাইল দূরে "গিলগিট" অবস্থিত। স্থানটী 'কাশ্মীর মহারাজের' অধীনে হইলেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের একজন রাজনৈতিক কর্ম্মচারী তথায় অবস্থান করিতেছেন। *

'গিলগিট' দিগের বিবাহ প্রণালী অত্যন্ত আমোদজনক এবং তাহাতে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে, বালকগণ ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষে পদার্পন করিলে পিতা মাতারা পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কোন পাত্রীর সন্ধান পাইলে গ্রামের প্রধান গণকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং পাণ্ডাদিগকে ভোজ্য দ্রব্যে পরিতুষ্ট করাইয়া কন্যার পিতামাতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করে, প্রধান মহাশয়েরা এই প্রীতিকর সংবাদ লইয়া কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হয়। কন্যার পিতা তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক ২।৩দিন ভোজন করান এবং স্বীয় গ্রামের প্রধানগণ ও আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করিয়া একটি মজলিসে এই বিষয় মীমাংসা করে। কন্যার পিতার সম্মতি পাইলে উভয় পক্ষ তাহাদের রীতি অনুসারে একখানি প্রার্থনা পত্র পাঠ করে এবং এইরূপে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। এই নূতন আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ বরের পিতা কন্যার পিতাকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উপঢৌকন প্রদান করে...

ধুতি—৫ গজ
সূচি (Needle) ১টী
ছুরি—১খানা
দড়ি—১গাছি

তৎপর বিবাহ উৎসবের দিন স্থির হইলে বরের পিতা গৃহে ফিরিয়া আইসে। বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবসের এক পক্ষ পূর্ব্বে বরের পিতা বা অভিভাবক ৩ তুলু (১ তুলু ৮মাসার সমান) স্বর্ণ লইয়া পাত্রীপক্ষের বাটীতে উপস্থিত হয়। এই স্বর্ণ কন্যার পিতাকে দেওয়া হয় এবং শোভাযাত্রায় কত জন লোক সঙ্গে করিয়া, কোন্ দিন আসিয়া

---

* গতচৈত্রের ভারতীতে আমার "গিলগিট" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আইসে। বাড়ী আসিয়া বরের পিতা আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া চারি সের পরিমিত ঘৃত পাঠাইয়া দেয়। 'ঘি'কে "তাওয়াই=ঘৃত" বলে। (তাওয়া—pan) এই ঘৃত না পৌঁছা পর্য্যন্ত বিবাহের এক অঙ্গ "তাও" উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে না ; এবং বিলম্বে পৌঁছিলে বরপক্ষকে ১তুলু স্বর্ণ দণ্ড স্বরূপ দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস রজনীতে সমস্ত গ্রামবাসী গণের সম্মুখে ৮টার সময় এই উৎসব সম্পন্ন হয়। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ লৌহ কটাহ স্থাপন করিয়া "কাছারী" কিম্বা "বাবুসী" বংশীয় কোন ব্যক্তি ঘৃত, আটা, এবং চিনি, বৃক্ষের বীজ ও পাতা লইয়া ছুটীয়া আইসে এবং দ্রব্য গুলি কটাহে রাখিয়া অল্প অগ্নিদ্বারা উত্তাপ দিতে থাকে, কটাহস্থ দ্রব্যগুলি হইতে ধূম নির্গত হইলে পর, লোকটী উভয় হস্তে কটাহের হাতনি ধরিয়া কটাহটি মস্তকোপরি উত্তোলন করে, এই সময় তাহাদের বাদ্যও অদ্ভুত রবে বাজিয়া উঠে এবং বাজনার তালে তালে নৃত্য করিয়া কটাহধারী ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়। নৃত্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোক সকল করতালি দিয়া সমস্বরে নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে থাকে—

(ক) ইহা 'বইর গুলের' 'তাও'
দিবনা রাখিতে মাটিতে কাউকে
নিজেই রাখিব 'তাও' (pan)।
(খ) ইহা 'মালীক' প্রধানের 'তাও'
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(গ) ইহা রাজোপযুক্ত তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(ঘ) ইহা সংসার উপযোগী তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(ঙ) ইহা 'শামীর' প্রাধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(চ) ইহা 'ম্যাকপান' প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(ছ) ইহা মাঘলট প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(জ) ইহা 'খানা' রাজার তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(ঝ) ইহা ধার্ম্মি 'গীরখির' তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(ঞ) ইহা 'মারিও' প্রধানের তাও
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।
(ট) যদিও 'নীল' তাওয়ের কর্ত্তা
দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি।

পুরুষগণ যখন এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে মত্ত থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোকগণ নিম্ন লিখিত গানটী গাহিয়া থাকে।—

(ক) এই 'রক্ত প্রবাল' 'বইর গুলের'
দিবনা গাথিতে অন্য কাউকে
নিজেই গাথিব আমি।
(খ) এই 'প্রবাল-ভাণ্ডার' 'মালিক' প্রধানের
দিবনা গাথিতে অন্য কাউকে
নিজেই গাথিব আমি।
(গ-ট) কেবল মাত্র উপরের নামগুলি
উল্লেখ করিয়া এই কথা বার বার
গাহিতে থাকে।

এই গানটী শেষ হইলে 'কাছাড়া' একমুহূর্ত্তের জন্য কটাহ খানি চুল্লির উপর স্থাপন করে, এবং পুনরায় তাহা দুই হস্তে মাথার উপর উচু করিয়া তুলিয়া নৃত্য গীতে মত্ত

(ক) (খ) Bairgul of Malik—Chief of Kashmir.
(ঙ) Sha Mir—The Chief of Kashmir.
(চ) Maqpun—The Chief of Skardu.
(ছ) Mughlot—The Chief of Nagir.
(জ) Khana—The Raja of Yasin.
(ঝ) Girkhit—The Ruler of Hunza.
(ঞ) Maryo—The Son of Machat
(a celebrated person of 'Rono' Family.)

হয়। তৎপর স্ত্রীলোক দিগের মধ্যহইতে একজন কুমারীকে বাহির করিয়া আনিয়া, সেই কটাহটীর ভার অর্পন করিয়া, অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত ৫ খানি পিষ্টক ভাজিতে অনুরোধ করা হয়। পাঁচ খানি পিষ্টক প্রস্তুত হইলে, কুমারী অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের উপর সমবেত লোকগণের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার ভার অর্পন করে; এবং তাহারাও আহ্লাদের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। স্ত্রীলোকগণ রন্ধনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে পর, তাহারা অন্য একটি গৃহে গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্য, গীত ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে। এই রাত্রিকে "তারওয়াই রাত" অর্থাৎ 'তাওয়ার রজনী' বলে।

যদি বরকে কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে কন্যার বাড়ী যাইতে হয়, তাহা হইলে শোভা যাত্রার দিবস প্রত্যুষে বর স্নান করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদের ভাল পোষাক পরিধান করে এবং নিম্নলিখিত গীতটী বর একবার উচ্চারণ করিলে পর, তাহার অনুচরগণ সমস্বরে সেই পংক্তিটী পুনরাবৃত্তি করে—

"প্রনমিব আগে মায়ের চরণে
স্তন্য দিয়াছেন যিনি"

তৎপর বর তাহার মাতার চরণে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলে, বরযাত্রীগণ নিম্ন লিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করে—

'ওরে পাথর তুই ভারী হ,
অতি শুভ দিন আজ এসেছে;
ওরে পাথর তুই ভারী হ
সোনার সঙ্গে তোর ওজন হবে,

সন্ধ্যার সময় যখন বরযাত্রীগণ তাহাদের গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার অভিলাষে, অতি বিকট স্বরে উল্লাস ধ্বনি করিয়া থাকে, কন্যাপক্ষও সেই রাসভ-বিনিন্দিত আনন্দ ধ্বনীর একটী অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া, বর পক্ষকে সম্ভাষণ করিবার মানসে, বাহির হইয়া আইসে; উভয় পক্ষ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সেই সকল গানে, কেবল মাত্র তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের এবং গ্রামের প্রধান গণের মহত্ব ও বীর্য্য কাহিনী থাকে; এবং অতি গর্ব্বের সহিত একে অন্যকে পরাজিত করিবার অভিলাষে, কন্যা কর্ত্তার বাড়ী খানি মুখরিত করিয়া তোলে; তৎপর আহারাদি সম্পন্ন হইলে নৃত্যগীতাদিতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটায়। একজন মল্ল শোভাযাত্রার সময় বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, পরদিন প্রাতঃকালে সেই মল্ল বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে। কন্যার পিতা সেই সময় কন্যার জন্য গহনা, কাপড় চোপর এবং থালা বাসন ইত্যাদি লইয়া আইসে। কন্যার পিতা সঙ্গতিপন্ন হইলে কন্যাকে এই সকল বস্তু প্রদান করিবার জন্য বরের নিকট হইতে মূল্য আদায় করে না। কিন্তু মূল্য না লইলে স্বামীর আর স্বীয় সম্পত্তির উপর কোন প্রকার দাবী থাকে না, তখন স্বামীর সম্পত্তি স্ত্রীর বলিয়া গণ্য হয়; এবং স্বামীর মৃত্যুর পর, স্ত্রী ইচ্ছানুসারে পর পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে।

কন্যার পিতা দরিদ্র হইলে বিবাহের উপকরণাদি অর্থাৎ থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি কন্যার সহিত প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, বরের পিতা কন্যাপক্ষের নির্দ্দেশ মত, সেই মূল্যের কোন জিনিষ, কন্যার পিতাকে দান করে; এবং এই দানের জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর, স্ত্রী স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সম্মতিভিন্ন পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রথাকে "কালক মালক" বলে।

উৎসব সমাপনান্তে বরযাত্রীগণ গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পাত্রীকে বরের ঘরে যাইতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী সকলে গাহিয়া থাকে—

ওগো মায়ের হৃদয় নন্দা
বাহির হয়ে এসগো,
ওগো জলের অধিশ্বরী
কেন দেরী করগো,

এস ওগো স্বর্ণ কুণ্ডলা
কেন দেরী করগো,
মুক্ত-দণ্ড-নিভাননী
কেন দেরী করগো !

গান শেষ হইলে কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে, এবং কন্যা তাহার পরিজন বর্গের বিরহে উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন সকলে মিলিয়া পুনরায় নিম্ন লিখিত গানটী কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিতে থাকে,

কেঁদোনা কেঁদোনা
ফুল কুমারী,
গায়ের বরণ মলিন হবে ;
পাহাড়ের উপর
যাইবে তুমি
গায়ের বরণ মলিন হবে !
কাঁদিলে তোমার
পুড়িবে হৃদয়
গায়ের বরণ মলিন হবে।

গিলগিটে 'সিনাকি' নামক স্থানে 'কাত্ত' প্রথা প্রচলিত আছে। কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পরিলে, যদি যুবকের পিতা মাতা সেই যুবতীর সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হয়, তবে যুবক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগংকে ডাকিয়া বলে "যদি আমার সহিত অমুক বালিকার বিবাহ দেওয়া না হয়, তবে আমি 'কাত্ত' করিব।" সকলকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার অভিলাষে সে গ্রামের বাহিরে গিয়া, একটী বন্দুকের আওয়াজ করে; তৎপর সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে, পুনরায় সেই "কাত্ত" করিবার কথা বলে, কিম্বা সুযোগ পাইলে কয়েক জন লোকের সম্মুখে, সেই কন্যাটীকে ধরিয়া তাহার জামার বা কাপড়ের একটু অংশ ছিঁড়িয়া দিয়া বলে—"তুমি আমার।"

এই "কাত্ত" করিতে পারিলে যুবকের পিতা মাতা বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এস্থলে কন্যার পিতা বরের অবস্থানুসারে ইচ্ছানুরূপ অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে। এই "কাত্ত" হইয়া গেলে পর যদি সেই কন্যার কাহারও সহিত বিবাহ হয় তবে যুবক সেই বালিকার ও তাহার স্বামীর প্রাণ বধ করিতে সতত চেষ্টিত থাকে এবং অনেক সময়েই কৃতকার্য্য হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

রাজ তরঙ্গিণী

৬ষ্ঠ তরঙ্গ।

মঙ্গলাচরণ—পার্ব্বতী স্তুতি :—

সুরবধূগণ বলিতেছেন—"দেবী অপর্ণা প্রেম মাহাত্ম্যেই চরাচরগুরু মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছেন, বৃক্ষপত্র অথবা বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন সেই তপস্যার প্রভাব ইহার কারণ নহে।"

সুরবধূগণের মুখে এই শ্রুতিসুখাবহ স্তুতি শ্রবণ করিয়া হর্ষান্বিতা পার্ব্বতী শ্রোতৃবৃন্দের রক্ষা বিধান করুন।

মহারাজ যশস্কর (৯৩৯-৪৮ খ্রীঃ)—

মহারাজ যশস্কর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যে নানাবিধ সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইঁহার সুশাসনে চোরের উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছিল। রাত্রিকালে পন্থশালার দ্বার রুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইত না। পথিকগণ নিরুপদ্রবে গমনাগমন করিতে পারিত। ইনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষন করিতেন। সর্ব্বস্বাপহারি পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিবৃন্দ সামান্য কৃষিকার্য্যের অধ্যক্ষতা ব্যতীত অন্য কার্য্য পাইত না। গ্রাম্য প্রজাবৃন্দ কৃষিকার্য্যে রত থাকিত সুতরাং রাজধানী তাহাদের নেত্র পথে পতিত হইত না। ব্রাহ্মণগণ স্বধ্যায় নিরত ছিলেন, অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন না, বিপ্র গুরুগণ সাম গান করিতেন কখনও মদ্য পান করিতেন না, তাপসগণ তপস্যা নিরত ছিলেন—পুত্রদার ভরনার্থ পশু ধান্য সংগ্রহ করিতেন না। রমণীগণ বিনীত ছিলেন।

দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, সভ্য, গুরু, মন্ত্রী, পুরোহিত, দূত, বিচারপতি বা লেখক কেহই অপণ্ডিত ছিলেন না।

মহারাজ যশস্কর তীক্ষবুদ্ধি ও সুবিচারক ছিলেন। একদা এক ব্যক্তি প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। রাজা তাহার নিকট প্রায়োপবেশনের কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রার্থনা অনুসারে স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও অতি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার সুমীমাংসা করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

ইঁহার বুদ্ধিমত্তাগুণে দেশে সুশৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইনি এইরূপ সদ্গুন সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় দুর্নীতি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইনি চারিজন অনুগত নগরপাল দ্বারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন. এবং কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক পদাতিগণকে নিহত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর ইনি অধিকতর দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ইনি বেল্লাবিত্ত নামক এক ব্যক্তিকে মণ্ডলেশ্বর করিয়াছিলেন এবং রাজমহিষীগণ বেলাসিত্তের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন জানিতে পারিয়াও কোন প্রতিবিধান করেন নাই। লল্লা নাম্নী এক বেশ্যার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া ইনি তাহাকে প্রধানা মহিষী করিয়াছিলেন। "পূর্ব্ব জন্মের সৎকার্য্যের ফলে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি, ইহ জন্মে সৎকার্য্য করিলে পর জন্মেও রাজত্ব লাভ করিতে পারিব" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ সম্পৎ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। পৈতৃক ভূমিতে আর্য্যদেশাগত বিদ্যার্থিগণের জন্য ইনি মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন ও মঠাধিপতিকে রাজ চিহ্ন ছত্র চামর প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিতস্তা নদীতীরে ব্রাহ্মণগণকে ৫৫টী অগ্রহার প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি উদর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া ছিলেন কিন্তু স্বীয়পুত্র সংগ্রাম দেবকে রাজ্য প্রদান না করিয়া পিতৃব্য (Paternal Grand-uncle) রামদেব পুত্র বর্ণটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বর্ণট রাজ্য লাভ করিয়া পীড়িত যশস্করের কিছুমাত্র তত্ত্বাবধান না করায় মন্ত্রিগণের পরামর্শে বর্ণটকে একরাত্রি অষ্টস্তম্ভ মণ্ডপে বন্দী রাখিয়া পর দিন নির্ব্বাসিত করিয়া স্বীয়পুত্র সংগ্রামদেবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। পীড়া ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় ইনি মৃত্যুর জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ২৫০০ শত স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়া নিজ মঠে গমন করেন। কিন্তু পর্ব্বগুপ্ত প্রভৃতি মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া ঐ মুদ্রা আত্মসাৎ করায় মহারাজ যশস্কর ঐ মঠের অন্ধকারময় কুটীর মধ্যে ব্যাধির যন্ত্রনায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রধান অনুগ্রহভাজন বেল্লাবিত্তগণ তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া বিষপ্রয়োগে প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। সাধ্বী রাজ্ঞী ত্রৈলোক্য দেবী পতির অনুগমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ যশস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ জন শ্রুতিও আছে যে মহারাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তত্ত্বাবধানার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া চক্রভানু নামক এক ব্রাহ্মণ তাপসের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার অন্যায় আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে অপমানিত করায় চক্রভানুর মাতুল ইন্দ্রজালবিদ্যাবিষারদ বীরনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

মহারাজ যশস্কর ৯ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২৪ অব্দে কৃষ্ণা তৃতীয়াতে মহারাজ যশস্কর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ সংগ্রামদেব (৯৪৮—৪৯ খ্রীঃ):—

মহারাজ সংগ্রামদেব মহারাজ যশস্করের পুত্র ছিলেন। যশস্কর ইঁহাকে শৈশব সময়েই সিংহাসন প্রদান করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। শিশুর পিতামহী শিশুর অভিভাবিকা স্বরূপ হইয়াছিলেন। পর্ব্বগুপ্ত, ভূভট প্রভৃতি পাঁচজন মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে পর্ব্বগুপ্ত পিতামহীর সহিত অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের বিনাশ সাধন করিয়া স্বয়ং সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া ছিলেন। পর্ব্বগুপ্ত শিশু রাজা সংগ্রামদেবকে স্বহস্তে আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া নিজের দ্রোহশূন্যতা প্রকাশ করিতেন এবং একাঙ্গ সামন্তগণের ভয়ে রাজাকে প্রকাশ্য ভাবে বিনাশ করিতে না পারিয়া অভিচার ক্রিয়া দ্বারা সংগ্রামদেবকে বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হন কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ

হইয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এমন সময় একদিন অত্যধিক তুষার পাত হইয়া জন সঞ্চার রুদ্ধ প্রায় হইয়াছিল এই সুযোগে পর্ব্বগুপ্ত বহু সৈন্যসহ রাজধানী অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাঁহাতে প্রভুভক্ত মন্ত্রী রামবর্দ্ধন পুত্র বুদ্ধের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। বক্রাঙ্ঘ্রি সংগ্রামদেবও পর্ব্বগুপ্ত কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বিতস্তা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ পর্ব্বগুপ্ত (৯৪৯—৫০ খ্রীঃ)।—

২৪ অব্দে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাদশমী তিথিতে পাপাত্মা পর্ব্বগুপ্ত সিংহাসনারোহন করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল সংগ্রাম গুপ্ত। বিশোকের সমীপবর্ত্তী অভিনব নামক শিবিরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা পূর্ব্বে পর্ব্বগুপ্তের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও পর্ব্বগুপ্তের ভয়ে নিবৃত্ত হইয়া ছিলেন।

সূর্য্যবংশীয় জনৈক একাঙ্গী মদনাদিত্য পর্ব্বগুপ্তের নিকট অপমানিত হইয়া নির্ব্বিন্ন মনে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ত্রিপুরেশ্বরে তাঁহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

পর্ব্ব গুপ্ত প্রজাপীড়ন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। ইনি পর্ব্বগুপ্তেশ্বর শিব স্থাপন করেন।

মহারাজ যশস্করের পরম সাধ্বী এক মহিষীর প্রতি ইনি আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। রাজ্ঞী, কৌশলক্রমে ইঁহার দ্বারা স্বামীর অর্দ্ধ সমাপ্ত যশস্কর স্বামিমন্দিরের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লইয়া সেই মন্দিরে যজ্ঞার্থ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে সেই যজ্ঞকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পর্ব্বগুপ্ত রাজ্ঞীর অসম্ভব সাহসের বিষয় চিন্তা করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং আষাঢ়ের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে সুরেশ্বরী তীর্থে (dropsy রোগে) মানব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ক্ষেমগুপ্ত (৯৫০—৫৮ খ্রীঃ)।—

ইনি মহারাজ পর্ব্বগুপ্তের পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি পৈতৃক সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। ক্ষেমগুপ্ত অতিশয় মদ্যপায়ী, যৌবন-গর্ব্বিত ও ব্যসনী ছিলেন। ফল্গুন প্রভৃতি চাটুকারগণ ইঁহার দুষ্কার্য্যে সহায়তা করিত। ইনি পরাঙ্গনালোলুপ ছিলেন সুতরাং ধূর্ত্তগণ ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা রাজ-ধন লুণ্ঠন করিত। এই সময় রাজ সভা মনীষিগণের অগম্য হইয়াছিল। ধূর্ত্ত ভিক্ষুপুত্রগণ ক্ষেমগুপ্তকে কঙ্কণবর্ষনামে অভিহিত করিয়া তাহাদ্বারা বহুবার কঙ্কণ বর্ষন করাইয়া ছিলেন। পাপিষ্ঠ লালিতক (মোসাহেব, গণ রাজার উপভোগার্থ স্বীয় পত্নী প্রদান করিতে ও কুণ্ঠিত হয় নাই। মহারাজ যশস্করের মন্ত্রী ভট্টফল্গুনও ক্ষেমগুপ্তের অনুজীবী হইয়াছিলেন। ফল্গুন ভট্ট ফল্গুন স্বামী প্রভৃতি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

একদা কম্পনেশ রক্ত ডামর (পতি) সংগ্রামের বিনাশার্থ রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। নির্দ্দয় রাজা জয়েন্দ্র বিহারের সহিত বৃদ্ধ রক্তকে ভস্মীভূত করেন ও জয়েন্দ্র বিহারের সুগতের প্রতিমা দগ্ধ করিয়া ঐ প্রতিমার পিত্তল রাশি ও অন্যান্য পুরাতন দেবালয় সমূহ হইতে প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা রাজধানীতে স্বীয় যশপ্রতিষ্ঠার্থ ক্ষেমগৌরীশ্বর নামক শিব স্থাপন করিয়া ছিলেন।

ক্ষেমগুপ্ত দগ্ধ বিহারান্তর্গত ৩৬টী গ্রাম অধিকার করিয়া খস নৃপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। লোহরাদি দুর্গের অধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি সিংহরাজ স্বীয় তনয়া দিদ্দাকে ক্ষেমগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজ্ঞী দিদ্দা শাহির দৌহিত্রী ছিলেন। রাজা দিদ্দার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া অপমান সূচক "দিদ্দাক্ষেম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। মহারাজ ক্ষেমগুপ্ত শাহি রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভীমকেশব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি দ্বারপতি ফল্গুনদুহিতা চন্দ্রলেখাকে বিবাহ করায় ফল্গুনের সহিত রাজ্ঞী দিদ্দার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ক্ষেমগুপ্ত গুরূপদেশ ও অংবিদ্যা লাভ করিয়াও তাহার কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইনি শৃগাল শীকার করিতে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাধি

ও কুকুর সমূহে পরিবৃত হইয়া দামোদরারণ্য, ললাণ, শিমিকা প্রভৃতি স্থানে শৃগাল শীকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এক শৃগালীর মুখ হইতে বহ্নি শিখা নির্গত হইতে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ও ঘার যুক্ত লুতা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য বরাহ ক্ষেত্রে গমন করেন। এইস্থানে শ্রীকণ্ঠ ও ক্ষেম নামক দুইটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইস্থান হুষ্কপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল। মহারাজ ক্ষেমগুপ্ত বরাহ ক্ষেত্রে ৩৪ অব্দে পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের নবম দিনে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ অভিমন্যু (৯৫৮—৭২খ্রীঃ)

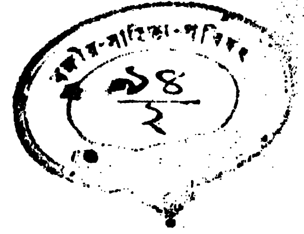
মহারাজ অভিমন্যু মহারাজ ক্ষেমগুপ্তের পুত্রছিলেন। ইহার মাতার নাম ছিল দিদ্দা। অভিমন্যু পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তখনও শিশু বলিয়া তাঁহার মাতা দিদ্দার কর্ত্তৃত্বাধীনেই চলিতেন। রাজ্ঞী দিদ্দা অতিশয় দুশ্চরিত্রা ছিলেন এবং অল্প কালের মধ্যেই প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

অভিমন্যুর রাজত্ব সময়ে ভুঙ্গেশ্বরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া মহাগৃহ সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল। রাজ্ঞী দিদ্দা ন্যায় অন্যায় বিচারে অসমর্থা ও চপলমনী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ফল্গুনের প্রতি দিদ্দা প্রথম হইতেই বিরক্তা ছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর সপত্নীগণকে অনুমৃতা হইতে দেখিয়া দিদ্দাও দম্ভ প্রকাশ পূর্ব্বক অনুমৃতা হইতে ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী ফল্গুনও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, পরে দিদ্দা চিতা সমীপে উপস্থিত হইয়া ভীত চিত্তে রোদন করিতেছিলেন দেখিয়া কৃপালু মন্ত্রী নরবাহন অনুমৃতা হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অতঃপর পিশুন স্বভাব রক্ক বিরক্তচিত্তা দিদ্দাকে ফল্গুন হইতে রাজ্যহরণের আশঙ্কা আছে এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন। ফল্গুনও রাজ্ঞীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য ফল্গুনের পুত্র কর্দমরাজ গঙ্গাতীরে গমন করিলে মন্ত্রী শঙ্কিত চিত্তে বহু সৈন্য লইয়া স্বীয় তনয়ের আগমন পর্য্যন্ত পর্ণোৎসে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ফল্গুন সসৈন্যে নগর হইতে কাষ্ঠবাট পর্য্যন্ত গমন করিলে দিদ্দা ধ্বজদণ্ডধারী পুরুষদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্রী এই নূতন অপমানে খিন্ন হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বরাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রভুর জন্য বহু বিলাপ করত ভগবান বরাহ দেবের পদপ্রান্তে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজমাতা দিদ্দাও ফল্গুনের অস্ত্র পরিত্যাগের বিষয় অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ফল্গুন সসৈন্যে পর্ণোৎসে গমন করিলে অন্য মন্ত্রিবর্গ নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে দিদ্দাও রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্তির জন্য পর্ব্বগুপ্ত ছোজ ও ভুভট নামক মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বীয় তনয়াদ্বয়কে তাঁহাদের সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ দুই তনয়ার গর্ত্তজাত মহিমন্ ও পাটল নামক দুইটী পুত্র রাজগৃহে পালিত হইতেছিল। ক্রমে উহারা রাজ্যপ্রার্থী হইয়া উদ্দাম প্রকৃতি হিম্মক প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলে দিদ্দা উভয় মন্ত্রীকেই রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় হিম্মক প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়াছে অবগত হইয়া দিদ্দা মহিমের নির্ব্বাসনার্থ ধ্বজদণ্ডধারী পুরুষ নিযুক্ত করিলে মহিম স্বীয় শ্বশুর শক্তি সেনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে হিম্মক, মুকুল, এরমন্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মহিমের সহিত মিলিত হইয়া কাশ্মীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। এই বিপৎসঙ্কুল সময়ে একমাত্র প্রভুভক্ত মন্ত্রী নরবাহন দিদ্দার পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। শত্রুপক্ষ সজ্জিত হ পদ্মস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে দিদ্দা বহু উৎকোচ প্রদান করিয়া শত্রুগণের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে যে সন্ধি হয় তাহাতে নির্ণীত হইয়াছিল যে দিদ্দা যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও

প্রতিভা

সচিত্র

মাসিক পত্রিকা



শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার সেন

প্রকাশিত

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩১৯

ঢাকা

প্রতিভা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সম্পাদক

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল

দ্বিতীয় বর্ষের সূচী

প্রতিভা, ১৩১৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী

——•*•——

অপমানিত করেন তবে আবার বিরোধ উপস্থিত হইবে। এই বিপৎসময়ে রাজ মাতা দিদ্দা অসাম শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ও যশোধর প্রভৃতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কম্পনপতি (সেনাপতি) পদ প্রদান করিয়াছিলেন। একদা শাহিরাজ ঠক্কনের সহিত সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে সেনাপতি জয় লাভ করিয়া ঠক্কনকে বন্দী করিয়াছিলেন। এ দিকে কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে দিদ্দা সেনাপতির প্রতি সন্দিহান হইয়া প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার নির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারে হিম্মক প্রভৃতিরা সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, দিদ্দা পুত্রকে ভট্টারক মঠে প্রেরণ করিয়া রাজ-ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রু পক্ষীয়েরাও রাজ-পুত্র রাজধানীতে উপস্থিত নাই জানিয়া দিদ্দার কোন অনিষ্ট করে নাই।

পর দিবসেই রাজ্ঞীর সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। শত্রু পক্ষীয়েরা জয়ভট্টারিকা হইতে শূর মঠ পর্য্যন্ত স্থান সমূহে অবস্থান করিতেছিল; ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া রাজসৈন্য রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় রণকুশল একাঙ্গ সৈনিক দল রাজ-সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিল। মিলিত রাজসৈন্য উৎসাহের সহিত শত্রুসৈন্য আক্রমণ করায় শত্রুসৈন্য কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। এমন সময় রাজকুলভট্ট স্বসৈন্যে রাজসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। ভীমপরাক্রম হিম্মক রাজকুলভট্টের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে শত্রু-সৈন্য হতোদ্যম হইয়া পড়িল। এই যুদ্ধে মহাবল হিম্মক নিহত ও যশোধর বন্দী হইয়াছিলেন। এরমন্তক কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তরবারি ভগ্ন ও অশ্ব হইতে পতিত হওয়ায় রাজ সৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। উদয়গুপ্ত পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী দিদ্দা ক্রোধে অন্ধ হইয়া শত্রুপক্ষীয় যশোধর, ভুভধর ও মুকুলকে সবান্ধবে নিহত করিয়া ছিলেন; মহাবীর এরমন্তকের গলায় শিলাবদ্ধ করিয়া বিতস্তাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এরমন্তক কাশ্মীরীয়দিগকে গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন।

এই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর দল ৭৭ অব্দে গোপালবর্ম্মা নৃপতির সময় হইতে মহারাজ অভিমন্যু পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরে ১৬ জন নৃপতির সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। রাজ্ঞী দিদ্দা ইহাদিগকে সবান্ধবে নিহত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজ্ঞী রক্ক প্রভৃতিকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রূপে নির্ভরযোগ্য মন্ত্রী নরবাহন দিদ্দার একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নরবাহন রাজনক আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। নরবাহনের শারীরিক মানসিক সমস্ত বিষয়েই রাজ্ঞী দিদ্দার লক্ষ্য ছিল।

কুয্যনামক এক গাড়োয়ানের সিন্ধু নামীয় এক পুত্র দিদ্দার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিল। এই দুরাশয়ের কুমন্ত্রণায় রাজ্ঞী নরবাহনের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। ক্রমে কুমন্ত্রণাকারিগণের পরামর্শে নরবাহনের প্রতি সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মন্ত্রী নরবাহন রাজ্ঞী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর মৃত্যুতে রাজ্য শ্রীহীন হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্ঞী ডামর সম্প্রদায়ভুক্ত সংগ্রামের পরাক্রান্ত পুত্রগণকে নিহত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারাও রাজ্ঞীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উত্তর দেশস্থ ঘোষে (উত্তর ঘোষে) অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রাজপক্ষীয় কয্যক প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজ্ঞী ভীতা হইয়া স্বীয় ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

ডামরগণ রাজ্ঞীর সহিত মিলিত হইয়া অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে রক্কও মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনন্যোপায় হইয়া দিদ্দা পূর্ব্ব মন্ত্রী ফল্গুনকে আনয়ন করেন। ফল্গুন পূর্ব্বে অন্ত্র

পরিত্যাগ করিলেও পুনরায় রাজকার্য্যের ভার এবং অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অভিমন্যু রাজ-কর্ম্মচারিগণের দৌরাত্ম্যে ও মাতার দুঃশীলতায় ক্ষয়-রোগগ্রস্ত হইয়া ৪৮ অব্দে কার্ত্তিকের শুক্লা তৃতীয়াতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অভিমন্যু স্বয়ং সুপণ্ডিত, সুশ্রী ও নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন।

মহারাজ নন্দিগুপ্ত (৯৭২-৭৩ খ্রীঃ):—

ইনি মহারাজ অভিমন্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং শৈশবেই পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিদ্দা পুত্র-শোকে অত্যধিক ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছিল। সিন্ধুর অপর ভ্রাতা ভুজ্য রাজ্ঞীর ধর্ম্ম প্রাপ্তির সহায় হইয়াছিলেন। মৃত পুত্র অভিমন্যুর কল্যাণার্থ দিদ্দা অভিমন্যুস্বামী ও অভিমন্যুপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বীয় নামে দিদ্দাপুর ও দিদ্দাস্বামী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, মধ্যদেশ, লাট ও শৌড়োত্র (?) হইতে আগত জনগণের নিবাসার্থ মঠ স্থাপন ও স্বামীর পুণ্যবৃদ্ধির জন্য কঙ্কণপুর স্থাপন করিয়াছিলেন; শ্বেত প্রস্তর দ্বারা দিদ্দা-স্বামী নামক বিষ্ণু মূর্ত্তি ও কাশ্মীরীয় এবং বিদেশীয়গণের নিবাসার্থ চতুঃশালা সমন্বিত এক অত্যুচ্চ বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতার কল্যাণার্থ ও দেশীয় ব্রাহ্মণগণের নিবাসার্থ সিংহস্বামী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, মঠপ্রতিষ্ঠা ও বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিতস্তা-সিন্ধু সঙ্গম অধিকতর পবিত্র করিয়াছিলেন, নানা স্থানে ৬৪টী দেবালয় স্থাপন ও পুরাতন দেবালয় সমূহের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। পঙ্গু রাজ্ঞীর বল্লানাম্নী এক বৈবধিকা বল্লামঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজ্ঞীর ভোগ-বাসনা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় অভিচার করাইয়া ৪৯ অব্দে অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শিশু নপ্তা নন্দিগুপ্তের জীবন সংহার করিয়াছিলেন।

মহারাজ ত্রিভুবন (৯৭৩-৭৫ খৃঃ):—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর অভিমন্যুর দ্বিতীয় পুত্র ত্রিভুবনগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও দিদ্দা অভিচার দ্বারা ৫১ অব্দে অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নিহত করিয়াছিলেন।

মহারাজ ভীমগুপ্ত (৯৭৫-৮০।১ খ্রী):—

ইনি মহারাজ অভিমন্যুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মন্ত্রী ফল্গুন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ক্রমে দিদ্দারও দুষ্কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দিদ্দা এত নীচ স্বভাবা ছিলেন যে, একদা তুঙ্গনামক এক যুবক মহিষপালকের প্রণয় প্রার্থনা করেন এবং তুঙ্গের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অসৎ প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট ভুজ্যকে বিষ প্রদানে নিহত করিয়াছিলেন। রক্ক-পুত্র দেবকলস ভুজ্যের পদে বেলাবিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্দ্দমরাজ প্রভৃতি বীরবৃন্দও দিদ্দার বিরোধী হইয়া উঠেন। এদিকে শিশু ভীমগুপ্তও ৪।৫ বৎসর রাজগৃহে বাস করিয়া কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার মাতার নিকট দিদ্দার দুঃশীলতা ও রাজ্যের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া প্রতীকারপরায়ণ হইলেন। দিদ্দা শঙ্কিতা হইয়া দেবকলসের পরামর্শে ভীমগুপ্তকে বন্দী করিয়া বহু যাতনা দিয়া নিহত করিলেন।

রাজ্ঞী দিদ্দা:—

ইনি মহারাজ ক্ষেমগুপ্তের পত্নী ও মহারাজ অভিমন্যুর মাতা ছিলেন। ভীমগুপ্তের মৃত্যুর পর ৫৬ অব্দে দিদ্দা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর প্রণয়পাত্র তুঙ্গ ক্রমে সমস্ত বিষয়ে ঐকাধিপত্য লাভ করায় মন্ত্রিবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া ক্রূরকর্ম্মা দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র নৃপতি বিগ্রহরাজকে কাশ্মীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিগ্রহরাজ কাশ্মীরে আসিয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তুঙ্গকে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। দিদ্দা তুঙ্গকে গুপ্ত গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া কিছু দিন শঙ্কিত-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ও সুমনোমন্তক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বহু স্বর্ণ উৎকোচ প্রদান করিয়া

স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিগ্রহরাজ বিফল-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর তুঙ্গ প্রভৃতি মন্ত্রিবৃন্দ কর্দ্দমরাজ প্রমুখ প্রধান বীরগণকে নিহত করিল, ও রক্ক প্রভৃতি নির্ব্বাসিত মন্ত্রিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিল। মন্ত্রী ফল্গুনের মৃত্যুতে রাজপুরীরাজ পৃথ্বীপাল গর্ব্বিত হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তুঙ্গ সহোদরগণের সহিত মিলিত হইয়া বহু কষ্টে ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছিল ও শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিল; এবং ডামর সমূহকে নির্ম্মূল করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিল। দিদ্দা স্বীয় ভ্রাতা উদয়রাজের পুত্র সংগ্রামরাজকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন। সংগ্রামরাজ সুচতুর ছিলেন। ৭৯ অব্দে ভাদ্রের শুক্লা অষ্টমীতে রাজ্ঞী দিদ্দা পরলোকগমন করেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার ও
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ

নামি-কো

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

য়্যামাকির বাড়ী।

বৈকাল তিনটার সময় তাকাশাকি হইতে যে গাড়ী ছাড়ে তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে বেঞ্চির উপর পা ছড়াইয়া দিয়া কেবল মাত্র এক জন আরোহী বসিয়াছিল। সিগ্রেট্ টানিতে টানিতে সে এক খানা কাগজ পড়িতেছিল। লোকটি আর কেহ নয়, য়্যাসুহিকো চিজিওয়া।

"দূর হোক!" বলিয়া কাগজ খানা সে পার্শ্বে নিক্ষেপ করিল। কথাটা বলিবার সময় মুখ হইতে সিগ্রেট্টা পড়িয়া গিয়াছিল। রাগত ভাবে সেটাকে পা দিয়া গুঁড়া করিয়া, জানালার বাহিরে থু থু ফেলিল; তারপর একটু ইতস্তত করিল। তারপর অনিশ্চিত ভাবে কামরার সমস্তটা এক বার পায়চারি করিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিল। দুই হাত বদ্ধ করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল; কালো ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া খুব কাছাকাছি হইয়া আসিল।

য়্যাসুহিকো চিজিওয়া পিতৃমাতৃহীন। তাহার পিতা কাগোষিমা-গণান্তর্গত এক জন সামুরাই ছিলেন। 'রেষ্টো-রেসনের' যুদ্ধে তিনি নিহত হন। যখন সে মাত্র ছয় বৎসরের বালক তখন তাহার মাতা মহামারীর দ্বারা অক্রান্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। তাহার মাসী, তাকেওকাওয়াষিমার মাতা, তাহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। মাসী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কিন্তু মেসোর ব্যবহারে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। উৎসবাদির সময় তাকেও রেশম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উচ্চ আসনে বসিত; চিজিওয়ার প্রতি অন্য ব্যবস্থা,—সূতির পোশাক ও নিম্ন আসন। এইরূপে শৈশবেই সে নিজের অবস্থা বুঝিয়াছিল; তাকেওর মাতা পিতা, পদমর্য্যাদা, অর্থ, সবই আছে। তাহাকে স্বীয় হস্ত ও মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া নিজের পথ করিয়া লইতে হইবে। স্বভাবতই সে তাকেওকে দেখিতে পারিত না; মেসোকে সে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিল।

সে দেখিল জীবনে কৃতকার্য্য হইবার দুই পন্থা বিদ্যমান—একটি প্রশস্ত, অপরটি তাহার বিপরীত। যা থাকে কপালে, সহজ পথটাই অবলম্বন করিবে ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। তাই মিলিটারি ইস্কুলে পাঠের সময়—মেসো তাহাকে সেখানে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন—যখন তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা ও নম্বর লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকিত, চিজিওয়া তখন স্বপ্রদেশস্থ ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিত। সাবধানতার সহিত এমন সব লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেছিল, যাহারা ভবিষ্যতে তাহার সাহায্যে আসিবে। ইস্কুল হইতে বাহির হইবার পর তাহার তৎপরতার প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অন্যান্য সকলে যখন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিবার আনন্দে আত্মহারা, সে তখন

মিলিটারি হেড্ কোয়ার্টারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহার সহপাঠীরা যখন হেথায় হোথায় পদাতিক সৈন্য-দলে প্রেরিত হইতেছিল, যখন তাহারা অফুরন্ত 'ড্রিল্' ও 'মার্চ'এর তাড়নে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চিজিওয়া তখন সেই বাহুনীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ধূমপানের আড্ডায় অনেক গুরুতর সামরিক গুপ্ত তত্ত্বের কথা কর্ণ-গোচর হওয়া অসম্ভব নয়।

অতঃপর প্রয়োজনীয় বিষয় হইল বিবাহ। সে বুঝিত জীবনে কৃতকার্য্য হওয়া কেবল মাত্র ভাল রকম বৈবাহিক সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে। সে বিবাহের ক্ষেত্রটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল অমুক মার্কুইসের কন্যার সহিত অমুক ব্যারণের বিবাহ হইবে; কাউণ্টের কন্যার সহিত অমুক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বিবাহ হইবে; এই ক্রোড়পতির কন্যার সহিত অমুক মার্কুইসের বিবাহ হইবে। অবশেষে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জেনারল্ কাতাওকার পরিবারের উপর নিপতিত হইল। রক্ষিত সৈন্যদলভুক্ত হইলেও জেনারল্ কাতাওকা সুবিখ্যাত ও রাজদরবারে বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। প্রচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার প্রবল প্রতিপত্তির কথা বুঝিতে চিজিওয়ার বিলম্ব হইল না। সে ছল করিয়া ধীরে ধীরে জেনারল্ এর প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার পরিবারে পরিচিত হইবার জন্য কৌশলে চাল চালিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা নামির উপরেই তাহার দৃষ্টি ছিল। এরূপ করার কারণ, সে দেখিয়াছিল নামি জেনারল্ এর প্রিয়পাত্রী, এবং তাহার বিমাতা তাহাকে দেখিতে পারিত না ও প্রথম সুযোগেই তাহার একটা বিবাহ দিয়া দিবার চেষ্টায় ছিল।

নামির শান্ত, ভদ্র ব্যবহারও যে তাহার নির্ব্বাচনের অন্য কারণ নয় তা বলা যায় না। সে সুযোগের অপে-ক্ষায় রহিল। জেনারল্ মনের ভাব কখনো প্রকাশিত হইতে দিতেন না, তাই নিজ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি চিজিওয়া তাহা সহজে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে যে কাতাওকা-গৃহিণীর প্রিয়পাত্র হইয়াছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া দ্বিতীয়া কন্যা প্রগল্ভা কোমাও-তাহার বিশেষ বন্ধু ছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত আরো দুইটি সন্তান ছিল; কিন্তু ইহাদের সহিত তাহার কোন ঘনিষ্টতা ছিল না। নামির মাতার সময়ের ইকুনাম্নী এক বৃদ্ধা ধাত্রী ছিল। বর্ত্তমান গৃহিণীর আগমন কালে যখন আর সব ভৃত্যেরা জবাব পাইল তখন কেবল ইকুই জেনা-রল্ এর বিশেষ অনুরোধে বিতাড়িত হয় নাই। এই ধাত্রিটি সর্ব্বদাই নামির সঙ্গে থাকিত ও চিজিওয়ার প্রতি কিছু সম্মান প্রদর্শন করিত না। এই হেতু সে একটু চিন্তিত ছিল; কিন্তু সে নিজেই নামির চিত্ত জয় করিবে সংকল্প করিয়াছিল, তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই। সুযোগের জন্য সে এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া রহিল। অবশেষে অধীর হইয়া প্রেম-লিপি পুরু খামের মধ্যে ভরিয়া মেয়েলি হাতে ঠিকানা লিখিয়া ডাকযোগে নামির নিকট পাঠাইল।

সেই দিন হঠাৎ সে অন্যত্র যাইতে আদিষ্ট হইল। তিন মাস পরে যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল যে, তাহার অনুপস্থিতিতে লর্ডস্ মহা-সভার সভ্য ভায়কাউণ্ট্ কাতোর ঘটকতায় তাহারি মাসতুতো ভাই তাকেও—কাওয়াষিমার সহিত নামির বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় কুপিত হইয়া চিজিওয়া নামিকে উপহার দিবার জন্য কিওতো হইতে আনীত 'ক্রেপ' খানা টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। হায়, সে আশা করিয়াছিল, ইহার উজ্জ্বল বর্ণ তাহার সফলতার কারণ হইবে!

কিন্তু চিজিওয়া ব্যর্থতায় একেবারে দমিবার লোক নয়; শীঘ্রই আশা-ভঙ্গের বেদনা তাহার মন হইতে তিরোহিত হইল।

তাহার কিন্তু আশঙ্কা হইত যে, যদি নামি তাহার পিতা বা স্বামীকে সেই প্রেম-পত্রের কথা বলে ত তাহার আর একটি ক্ষতি হইবে, সে এক জন প্রতিপত্তিশালী মুরুব্বি হারাইবে। সাবধান হইলেও তাহার প্রতি নামির মনের ভাব কি তাহা সে জানিত না; তাই তাকাশাকি

-ইকাওতে সে নব দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ করিল ও সতর্কতার সহিত খোঁজখবর করিল। তাকেওর প্রতি ঘৃণাটাই তাহার মনে এখন প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিল।

কে এক জন "তাকেও তাকেও" বলিয়া ডাকিতেছে ভাবিয়া চিজিওয়া হঠাৎ তার দিবা-স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে দেখিতে পাইল গাড়ীখানা সেই মাত্র একটা ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছে ও কুলি হাঁকিতেছে, "আগেও, আগেও।"

"আ, মোলো!"

নিজের উপর বিরক্ত হইয়া চিজিওয়া দাঁড়াইল, কামরাটা এক বার ঘুরিয়া আসিল। বিরক্তিকর কিছু যেন ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য স্কন্ধোত্তোলন করিয়া সে পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। তাহার চোখে মুখে ঘৃণার চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল।

গাড়ী 'আগেও' ছাড়িয়া বায়ু বেগে কয়েকটা ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া 'ওজি' পৌঁছিল। পাঁচ ছয় জন আরোহী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের কাঁকরে শব্দ করিতে করিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। তাদের মধ্যে একটি পুরুষ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, ঘোর লাল মুখ, বাম চোখের নিম্নে মটরের মত একটি লাল আঁচিল দ্বিগুণিত ইচিরাকু রেশমের মূল্যবান পরিচ্ছদ ও জড়, ক্রেপের কোমর বন্ধে মোটা সোনার চেন জড়ান ও ডান হাতের আঙুলে ভারি সোনার আংটি।

বসিবার সময় হঠাৎ তাহার দৃষ্টি চিজিওয়ার উপর পড়িল।

"ও, চিজিওয়া-সান্!"

"এই যে, ভাল ত?"

"কোথা গিয়েছিলে?" এই কথা বলিতে বলিতে লাল আঁচিল বিশিষ্ট লোকটি চিজিওয়ার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

"তাকাশাকি।"

"তাকাশাকি?" কিছু ক্ষণ চিজিওয়ার মুখের দিকে চাহিয়া নিম্ন স্বরে লোকটি বলিল, "তুমি কি ব্যস্ত আছ? না থাক ত সান্ধ্য ভোজনটা একসঙ্গে করা যাবে।"

চিজিওয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

হাষিবার খেয়াঘাটের নিকট, জলের খুব কাছে এক খানি বাড়ী। বাড়ীর উপর "হ্যোজো য়্যামাকির ভিলা" লেখা না থাকিলে ইহা একটা বাবু-লোকেদের আড্ডা বলিয়া বোধ হইত। দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে, —যাহার কাগজের দেয়ালের উপর চিত্তহারী সঙ্গীতের সুরের মাঝে সৌখীন মিমাদারের * ছায়া-পাত অসঙ্গত হইত না; কিংবা যাহার ঈষৎ সবুজ মাদুরের উপর রক্ত বর্ণ আস্তরণ বিছাইয়া তাসের মজলিস্ বসিতে পারিত, নেহাৎ সাধারণ বৈদ্যুতিক আলোকের পরিবর্ত্তে আবরিত দীপে আলোকিত এমন একটি প্রকোষ্ঠে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত গেলাশ ও প্লেটের মাঝে, চিজিওয়া ও "লাল-আঁচিল" দিব্য আরামে বসিয়াছিল। এই লাল-আঁচিল আর কেহ নয়, এই বাটীর মালিক "হ্যোজো য়্যামাকি।"

সেখানে যে তাহাদের আদেশের অপেক্ষায় কোনো পরিচারিকা ছিল না, এটা তাহাদের ইচ্ছানুসারেই হইয়াছিল। "লাল আঁচিলের" সম্মুখে এক খানা খোলা নোট বই, তার উপর একটা পেন্সিল্। ইহার মধ্যে অনেকের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিত ছিল। নামগুলি নানারূপে চিহ্নিত; বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ ত্রিভুজ, ১, ২, ক, খ প্রভৃতি নানা প্রকারের চিহ্ন। কতকগুলি চিহ্ন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি বা পুনর্লিখিত হইয়াছে।

"যাক্ চিজিওয়া-সান্, তবে তাই ঠিক; কেমন? কিন্তু এ যেই ঠিক হয়ে যাবে তখনি আমায় জানানো চাই। ঠিক পারবে ত?"

"নিশ্চয়ই। এরি মধ্যে এ মন্ত্রীর হাতে গিয়ে পৌঁছেচে। কিন্তু অপর পক্ষও খুব জবরদস্ত, তোমার

* এক প্রকার জাপানী খোঁপা। জাপানী গেইষা বা নর্ত্তকী (এখানে তাহাই বুঝাইতেছে) ও অবিবাহিতা যুবতীরা এরূপ খোঁপা বাঁধেন।

বিশেষ মুক্ত-হস্ত হতে হবে।” খাতায় লিখিত নামগুলো দেখাইয়া “এ লোকটা পাকা বদ্‌মাইস্‌-একে বেশ করে দমিয়ে রাখ্‌তে হবে।”

“এ কেমন?”

“ও সুবিধে নয়। আমি ওকে ভালো রকম জানি না, কিন্তু শোনা যায় লোকটা ভেজায় ধার্ম্মিক। ওর কাছে যেতে হ’লে খোলাখুলি নম্র ভাবে যেতে হবে। আর অকৃতকার্য্য হও ত বিশেষ গোলযোগ।”

“সৈন্যদলে সমঝ্‌দার লোক আছে অনেক, কিন্তু ঠিক তার উল্টো লোকও আছে ততই। তুমি ত জানই, গেল বছর যখন আমরা একটা সৈন্যদলে পোষাক যোগাবার ‘কণ্ট্র্যাক্ট’ পাই—সবই কেমন ভালো রকম উতরে গেল। কিন্তু একটা ক্যাপ্‌টেন ছিল—নামটা তার কি?—ওই যে যার লাল গোঁফ। সে বেটা আমাদের জিনিষের দোষ দেখিয়ে ভারী জ্বালাতন করেছিল। যখন আমাদের ম্যানেজার দস্তুর মাফিক তাকে এক বাক্স ‘কেক্‌’ পাঠালে সে বল্‌লে সে ঘুষ নেবে না; আর বল্‌লে যে, সৈনিকের পক্ষে উপহারের দ্বারা চালিত হওয়া বিশেষ লজ্জার কথা। ভেবে দেখ, শেষে বাক্সটা সে মেঝের উপর ছুড়ে ফেলে দিলে। বাক্সটা টাকায় ভর্ত্তি ছিল ওপরে কেবল পাতলা এক থাক ‘কেক’! কি বিপদ! শরতের বৃক্ষপত্ররূপ কেকগুলো মেঝের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রৌপ্যময় তুষারকণার সহিত মিলিত হইতেছে। এই না দেখে লোকটা আরো রেগে গেল, বল্‌লে [illegible] কথা সে কখনো শোনে নি। আমাদের কথা সমাজে প্রকাশ করে দেবে বল্‌লে। তাকে কি থামান যায়। এই রকম লোকেদের জন্যই আমরা এত কষ্ট ভোগ করেচি। কষ্ট ভোগ করার কথায় মনে পড়ে গেল তাকেও সান্‌ ও সেই ধরণের লোক। সে দিন—”

“তাকেও বাপের এত সম্পত্তি পেয়েছে যে, সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে—খোঁচার মত সরল ও শক্ত হতে পারে। আমার কথা তুমি ত জানই, একলা——”

“ও ভুলে গেস্‌লুম।” “লাল-আঁচিল” চিজিওয়ার মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পাঁচ টাকার দশ খানা নোট বাহির করিল। “এই হচ্ছে তোমার গাড়ী ভাড়া। আসলটা পরে পাবে।”

“ধন্যবাদ, আমি এ নিলুম,” সে গুলি সে ভিতরের পকেটে শীঘ্র পূরিয়া ফেলিল। “কিন্তু য়্যামাকি-সান্‌!”

“কি?”

“একথা সকলেই জানে যে, না বুন্‌লে শস্য কাটা যায় না।”

য়্যামাকি কাষ্ঠহাসি হাসিল। চিজিওয়ার পিঠ থাবড়াইয়া বলিল, “তুমি ভারী চালাক লোক। কি দুঃখের কথা তুমি খুব কম করেও ‘কমিশারিয়েটের’ প্রধান হওনি।” চিজিওয়া হাসিল। “কিন্তু য়্যামাকি, বীর কিয়োমাসার ছোট তলোয়ার শিশুর হাতের ‘তিন ফিট তিন ইঞ্চ’ * তলোয়ারের চেয়েও বেশী কাজ করে।”

“বাঃ! কিন্তু বন্ধু তোমায় এই ‘স্পেকুলেশনের’ কাজে সাবধান করে দিচ্ছি। বাইরের লোক প্রায়ই কৃতকার্য্য হয় না।”

“আচ্ছা, বেশ। এটা কেবল অতিরিক্ত টাকা। এই বার যেতে হবে। এ বিষয়টা জানতে পার্‌লেই দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে এসে দেখা করব। ধন্যবাদ, দরকার নেই, রাস্তা থেকে একখানা ‘কুরুমা’ ডেকে নেব।”

“আচ্ছা, তা হলে। আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌লেন না। তাঁকে আমার মেয়ের সঙ্গে থাকতে হয়।”

“ও ওতোয়া-সান্‌ নাকি? তার অসুখ করেচে না কি?”

“হ্যাঁ, প্রায় মাসখানেক হল। সেই জন্যই আমার গিন্নী তাকে এখানে এনেচেন। চিজিওয়া-সান্‌ না ভেবে চিন্তে কখনো বিবাহ করো না, বা ছেলেপুলের জন্ম দিও

* বড় তরবারির নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য।

না। টাকা যদি কর্ত্তে হয় ত অবিবাহিত থাকার মত আর কিছু নয়।"

চিজিওয়া য়্যামাকির 'ভিলা' হইতে চলিয়া গেল। প্রভু ও পরিচারিকা তাহাকে ফটক পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল।

অভ্যাগতকে বিদায় দিয়া য়্যামাকি ঘরে ফিরিল। নিঃশব্দে হড়কানিয়া দরজা খুলিয়া এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল ও তাহার পার্শ্বে বসিল। সে গৌরবর্ণা মাথায় পাতলা চুল ও সামনের দুটি দন্ত সুপ্রকাশিত।

"চিজিওয়া-সান্ গেছে?"

"হ্যাঁ, এই মাত্র গেল। ওতোয়ো কেমন আছে? দাঁত-উঁচু স্ত্রীলোকটি মুখখান গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি ত আর ওর সঙ্গে পরি না, কানে।" পরিচারিকাকে কহিল, "তুমি একটু সরে যাও।" "এই আজ সে একটা বাটি আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করেচে, কাপড় ছিঁড়েচে; সামান্য কারণে আরো কত কি করেচে। আর তার বয়স হোলো আঠারো।"

"যাই হোক্ আমরা তাকে সুগুামোর গারদে পাঠাব, কি বল? আহা বেচারী।"

"এ ঠাট্টার সময় নয়। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি তার জন্যে আমার দুঃখ হয়। সে আজ বল্‌ছিল, 'অকৃতজ্ঞ তাকেও-সান্! কি নিষ্ঠুর সে! গত বৎসর নব বর্ষের সময় আমি তাকে নিজের হাতে বোনা মোজা, রুমাল, দস্তানা আরো কত কি পাঠালুম। এই নব বর্ষে একটা লাল জামা তাকে উপহার দিলুম—সমস্ত নিজের পয়সায়। কিন্তু কাণ্ডটা দেখ এক বার, আমাকে কিছু না জানিয়ে সে কি না সেই কদাকার দেমাকে নামিকো-সান্‌কে বে কর্‌লে। কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! আমি য়্যামাকির মেয়ে, নামিকো-সান্ আমার উপর টেক্কা দেবে? কী নিষ্ঠুর!' সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। ওগো, ওর কি একটা উপায় করা যায়? সে ওকে বড় ভালবাসে।"

"দূর্। কথায় আছে 'যেমন মা তেমনি মেয়ে;' তুমি ঐ দুষ্ট মেয়েটার উপযুক্ত মা। তুমি জান কাওয়াষিমা এক জন নূতন নোবল্, অর্থও তার যথেষ্ট; আর সে যে নির্ব্বোধ এমন কোথাও কিছুতেই বলা যায় না। ওতোয়োর সঙ্গে তার বিবাহ দেবার জন্যে আমার যথাসাধ্য করেচি, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। বিবাহ হয়ে গেছে। নামি সানের মরণ না হলে কিংবা তাকেও তাকে পরিত্যাগ না করলে আর ত আশা নাই। তাই এ সব আজগুবি খেয়াল ছেড়ে আর কোন ভালো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দাও। তুমি বাহাদুর মেয়ে, নও।"

"ও-সব বোকামি। আমি তোমার মত ভাবতে পারি না, তোমার মত আমি চতুর নই—যে লোক কি না পঞ্চাশ বছর বয়সেও মেয়েদের কাছে ঘোল খায়।"

"তোমার সঙ্গে আমি ত কথায় পারব না, কিন্তু তুমি একটি মূর্খ—তার মানে তুমি সহজেই রেগে যাও। ওতোয়োকে আমিও তোমারই মত ভালবাসি। সে আমাদের মেয়ে। তাই অসম্ভব কথার স্বপ্ন না দেখে তার জন্যে এমন এক জায়গার সন্ধানে আছি যেখানে সে সারা জীবন সুখে থাকবে। এস ওসুমিতার সঙ্গে গিয়ে একটু কথা কওয়া যাক্।" তাহারা একত্র বারান্দা দিয়া তোয়োর ঘরে গমন করিল।

হোজো য়্যামাকি হীনাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে "ভদ্র ব্যবসায়ীর" মধ্যে পরিগণিত। ব্যবসায় আরম্ভের সময় তাকেওর স্বর্গীয় পিতার নিকট সে অনেক সাহায্য পাইয়াছিল, এবং এখনো কাওয়াষিমা পরিবারের প্রতি সে সেই হেতু অনুরক্ত। ইহার কারণ, কেহ কেহ বলিত কাওয়াষিমা-পরিবার নূতন অভিজাতগণের মধ্যে বিশেষ অর্থশালী বলিয়া; কিন্তু এরূপ সমালোচনা বড় বেশী কঠিন। যিবায় তাহার বাটী ছিল, এবং হাষিবা খেয়াঘাটের নিকট এক খানি 'ভিলা' ছিল। ইতিপূর্ব্বে সে সুদখোর ছিল, কিন্তু এখন তাহার প্রধান কার্য্য হইতেছে সৈন্যদলে ও গবর্ণমেণ্টের আন্যান্য বিভাগে জিনিস যোগান। তাহার পুত্র এখন বাণিজ্য-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করিতেছে; কন্যা ওতোয়ো এই সে দিন পর্য্যন্ত 'পীয়ারেস' ইস্কুলে অধ্যয়ন

করিয়াছে। তাহার পত্নী—কেমন করিয়া এবং কোথায় তাহার সহিত বিবাহ হইল, এ কথা কেহ জানিত না—কিওতোর লোক এই মাত্র জানা ছিল। সে সাদাসিদে স্ত্রীলোক; য়্যামাকি কিরূপে তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে এ কথা ভাবিয়া অনেকে অবাক হইত। কিন্তু সত্য কথা হইতেছে যে, তাহার অনেকগুলি প্রেমপাত্র ছিল, যাহাদের প্রতি 'সুন্দর', 'কান্ত' ও অন্যান্য ঐ জাতীয় বিশেষণ গুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ইহারা সদাই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এ কথা তাহার স্ত্রী ভালো রকমই জানিত।

প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ 'কুঞ্জে' একটি বীণা, একটি 'ম্যাণ্ডোলিন্' ও কাচের বাক্সে একটি বড় পুতুল। এক কোণে একটি সুন্দর লিখিবার টেবিল, অন্য কোণে এক খানি প্রকাণ্ড আর্শি। এ সুন্দর ঘরে কোন্ ওমরাহ-নন্দিনী বাস করেন ইহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া ঘরের মাঝে রেশমী বিছানার দিকে চাহিবার লোভ হয়। ইহার উপর প্রায় সপ্তদশ বর্ষীয়া এক তরুণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; বৃহৎ ষিমাদা-খোঁপা বাঁধা চুল নির্ম্মমভাবে মর্দ্দিত হইতেছে। গাত্রের বর্ণ গোলাপী, গোল গাল ভরাট কপোল। ইহা দেখিয়া তাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার চেহারাটা একটু বেশী রকম গোলাকার। তাহার ওষ্ঠাধর বিযুক্ত, যেন সেগুলি বন্ধ করিবার শক্তি নাই; কোমল ভ্রূর নিম্নে চোখ দুটি অতিরিক্ত মাংসে পরিবেষ্টিত; বসন্তের কুয়াসায় আচ্ছাদিত সবে মাত্র সুপ্তোত্থিতের মত দেখাইতেছিল। তাহার আদেশ শ্রবণে মনে মনে হাসিতে হাসিতে সেই মাত্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত পরিচারিকার উদ্দেশে "বোকা" এই কথা বলিয়া তরুণী অসহিষ্ণু ভাবে গায়ের কাপড় ফেলিয়া, ও শয্যা হইতে উঠিয়া 'কুঞ্জ' হইতে একই প্রকার 'হাকামা'-পরিহিত এক দল ইস্কুলের মেয়েদের একখানি বড় ছবি তুলিয়া লইল। সূতার মত সরু চোখে সে ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিল। ছবির মধ্যে একটি চেহারার মুখের সামনে তুড়ি দিল। অবজ্ঞাটা আরো স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য সে নখ দিয়া ছবিখানা আচড়াইতে লাগিল।

হড়কানিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল।

"কে? তাকে নাকি?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে,—টেকো তাকে," এই বলিয়া তাহার পিতা য়্যামাকি ও মাতা হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন, ও শয্যার নিকট উপবেশন করিলেন। তরুণী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবিখানি লুকাইবার চেষ্টা করিল।

"কেমন আছ ওতোয়ো? ভাল? এইমাত্র লুকুলে কি? দেখি, দেখি। ওটা কি আমাকে দেখাও। এ ত নামিকো-সানের মুখ, তাই নয় কি? ওঃ! এটা কি বিশ্রী ভাবে নষ্ট করেচ! এমন অন্যায় কাজ করার চেয়ে দুপুর রাতে কোনো মন্দিরে গিয়ে অকল্যাণ কামনা করা শতগুণে ভাল।"

মুখ-বিকৃতি করিয়া তাহার পত্নী বলিল, "কথার ছিরি দেখ!"

"ওতোয়ো' তুমি হোজো য়্যামাকির মেয়ে, কেমন? সাহস করে আবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখো। তোমার ভালবাসা যে প্রত্যাখ্যান করে, এমন একটা সামান্য লোকের প্রতি অনুরক্ত না থেকে মিৎসুই বা মিৎসুবুষির মত ক্রোড়পতির ছেলে পাকড়াও; কিংবা কোনো মার্ষ্যাল্ বা প্রধান মন্ত্রীর ছেলে; বা সব চেয়ে যা ভাল, কোনো বিদেশী রাজপুত্র। তুমি অত দমে গেলে কেন?"

মাতার সম্মুখে যতই খিট্ খিট্ করুক আর ক্রন্দন করুক না কেন পিতার সম্মুখে ওতোয়ো একেবারে নিরুপায়।

সে বিষণ্ণ মুখে রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

"উত্তর দিচ্চ না যে? তুমি তাকেও সান্কে ভুলতে পারচ না? ও তুমি এখনো তাকে ভালবাস কেমন? দেখ ওতোয়ো, কিওতো বেড়াতে যাবে? ভারী আমোদে

যাবে। দেখবার মত অনেক ভাল ভাল জায়গা আছে, আর তা ছাড়া তুমি নিবিজিমে *গিয়ে একটি সুন্দর 'ওবি' বা একছত্র পোশাক আনতে পার। কেমন? তুমি কখনো এমন সুযোগ ছাড়তে পার না।" পত্নীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ও-সুমি, তুমিও ত বহু দিন ওখানে যাওনি। তুমি বরং ওতোয়োর সঙ্গে যাও।"

"তুমি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে যাবে?" পত্নী জিজ্ঞাসা করিল।

'আমি? পাগল। আমি কত ব্যস্ত আছি তা জান!"

"তা হলে আমিও যাব না।"

"কি রকম? তুমি আমার আদেশ অমান্য করবে?"

"হা, হা।"

"কি?"

"হা, হা, হা।"

"তোমার ও রকম হাসি আমার ভালো লাগে না।" কেন যাবে না তা আমাকে বল।"

"আমি তোমায় চোখের আড়াল করতে পারি না," পত্নী কহিল।

"দুর! ওতোয়োর সামনে এমন কথা কেমন করে বল? ওতোয়ো, তোমার মা যা বলছেন ও মিছে কথা। ওকথায় কর্ণ পাত কোরো না।"

"আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না," ওসুমি কহিল।

"থাম, থাম। ওতোয়ো ভেবো না। ধৈর্য্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

* বস্ত্রবুনেনের জন্য বিখ্যাত।

শ্রী হেমনলিনী রায়।

বাণী-পন্থাঃ (১১)

সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি ভারতীয় সমাজে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা পৌরাণিক যুগে শিল্পাদিতে ব্যক্তিত্ব বা কর্ত্তৃত্বের অভাব লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে এই স্থলে আর কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; কেন না, আমরা দেখিব, উহা হইতেই প্রকৃত সাহিত্যের উৎপত্তি। ভারতীয় মনুষ্যাত্মার গতি যে প্রথম হইতেই সামাজিক ও সাংসারিক ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি; তাহার পরিবার, গোত্র এবং গ্রাম-সমাজ তাহার ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্বোপরি অনন্ত জাতিভেদবাদের আদর্শ এই বন্ধন কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়াছে। চতুরাশ্রম বা চাতুর্ব্বর্ণ্য পৌরাণিক সমাজে আদর্শ তাহার অনন্ত ভেদবাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। মধ্যে যে 'থাই' পায় নাই তাহাও দেখিয়াছি। এই সমস্ত সত্ত্বেও এই সমাজ যে মনুষ্য-মনকে তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মের দিকে প্রবল স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিতেছি। তৎসত্ত্বেও তাহার সাহিত্য যে এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হইতে সবিশেষ উপকৃত হইতে পারে নাই তাহার কারণ কি? আমরা জানি, এই সমাজ প্রাচীন ঋষির বর্ণাশ্রম-আদর্শকে বাস্তবিক মান্য না করিয়া থাকিলেও, উহাকে অতিক্রমও করে নাই। কোনরূপ সীমা-গণ্ডী অতিক্রম করাই ভারতীয় মনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। জগতে সঙ্কীর্ণ হইতে পারিলে, ছোট থাকিয়া কোন মতে বাঁচিতে পারিলেই, সে যেন এক পদ অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত নহে। তাহার ধর্ম্মাদর্শও ক্রমে কেবল আত্মরক্ষা এবং প্রাচীন সমাজ-আদর্শের রক্ষামাত্রকেই উদ্দেশ্য করিয়া, ইহলোকীয় কল্যাণ এবং মঙ্গল মাত্রকে যেন পদ-দলিত করিয়া নিঃসঙ্কোচে এবং অহরহমুখে এই উদ্দেশ্য খ্যাপন

*বস্ত্রবুনেনের জন্য বিখ্যাত।

করিয়াছে। * ভারতীয় সমাজের মনোমধ্যে এই পৌরাণিক আদর্শই কার্য্য করিয়া, তাহার সংসার-জীবনটাকে সকল দিকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছে। এই সমস্ত সত্ত্বেও তাহার অন্তরাত্মা যে নিজকে কোথাও আহত মনে করিতেছে না, কিংবা আধুনিক সভ্যতার আদর্শ দ্বারা নানা দিকে পরাজিত এবং প্রপীড়িত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে জাগিয়া উঠিতেছে না তাহার রহস্য কোথায়? চিন্তা করিলেই দেখিবেন, উহার রহস্য তাহার অন্ততন কালের প্রবল ধর্ম্মাদর্শের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক যুগ-সমস্যার সমক্ষে, এখন এই 'ধর্ম্ম'শব্দই তাহার প্রধান 'ধুয়া'! এই কথাটাই সরল বা বক্রভাবে সকল সংশয়-প্রশ্নের নিকাশ করিয়া দিতেছে। এখন তপোবন নাই; বেদ উপনিষদের ঋষি কিংবা পুরাণ, তন্ত্র সংহিতাদির ধর্ম্ম-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণগণও নাই; রামায়ণ-মহাভারতের সরল বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মশীল আর্য্য-আদর্শ অন্তর্হিত; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লেশমাত্রও বর্ত্তমান সমাজে প্রবল নহে।

পৌরাণিক বৈরাগ্য আদর্শ ও তদ্দ্বারা সমস্ত সাহিত্যের স্বার্থ হানি।

বলিতে কি, আরণ্যক সম্প্রদায়ের এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের সময় হইতে এই সমাজ স্পষ্টভাবে চতুরাশ্রমাদর্শ পরিহার করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে একান্ত সন্ন্যাসের এবং 'বৈরাগ্যে'র আদর্শকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার ধর্ম্ম এবং আচারের আদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে বহু সাম্প্রদায়িকতার সংযোগ-সমষ্টি হইলেও, আরণ্যকগণের এই একটা অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক আদর্শই এখন প্রবলতম হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের অধ্যাত্মীয় আদর্শকে প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রিত

---

* যাঁহারা এইরূপ ইহলোকের জীবন-সংগ্রাম-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রতিপদে মনুষ্যের জীবনটাকে শাস্ত্র-বচনের দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া সংহিতা বা পুরাণাদি রচনা করিতেছিলেন, জীবন সংগ্রামটার সঙ্গে তাঁহাদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিলনা। দেশ রক্ষা গৃহ-রক্ষা, জীবিকা কিংবা বিত্তার্জ্জন অন্য লোকের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহারা (হয়ত সম্পূর্ণ সংসারী থাকিয়াও) কেবল অধ্যাপনাদি হইতে প্রতিগ্রহ পর্য্যন্ত এই ষট্-কর্ম্ম লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ যে তাঁহাদের কথা সকল দিকে মানিয়া চলিতেন, তাহাও নহে। শাস্ত্রপ্রবচনের প্রত্যেক শিষ্ট বিধির দ্বারাই বরং তদ্বিপরীত ভাবের প্রাবল্য থাকাই প্রতীয়মান হয়। অন্য দিকে, পুরাণাদির প্রধান সংগ্রাম আদিম ভারতবাসীর পূজাধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই চলিয়াছিল। এই উভয় ধর্ম্মই ভারতীয় মৃত্তিকা হইতে এবং প্রাচীন জাতির সমাজ-সভ্যতা হইতেই উদ্ভূত ছিল; সুতরাং উহাদের সঙ্গে যাহা বিরোধ তাহা কেবল প্রণালী-বিষয়ে; উহাদিগকে আত্মস্থ করিতেও কোন বিজাতীয় কিংবা মারাত্মক বিপদ-সমস্যার সম্মুখীন আদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। শক, হুন বা গ্রীক জাতি যেই সমাজ-ধর্ম্মাদর্শ লইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন তাহাও কোন দিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে অধিক মাহাত্ম্য দেখাইতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালে পরম সংসারধর্ম্মা এবং দিগ্‌বিজয়ী মুসলমানের সংঘর্ষে আসিয়াই শেষ যুগের পুরাণ এবং তন্ত্রাদির মধ্যে এক অতি প্রবল সমস্যার সূত্রপাত হয়। আধুনিক শাক্ত তন্ত্র এবং শাক্ত ধর্ম্ম উহারই প্রভাবে সমুদ্দীপ্ত। ঐ সময়ের ভারতীয় মহাপুরুষ নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে মুসলমানের ওই সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব এবং সাম্য (Communal brotherhood) একেশ্বরনিষ্ঠা এবং সাংসারিক ক্ষেমনিষ্ঠার আদর্শই নানা দিকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য গতিকে মুসলমান প্রভাবের মধ্য ভাগেই হিন্দু সমাজের মস্তিষ্ক যেন বিকল হইয়া যায়, এবং অকালে তান্ত্রিক সংস্কার-যুগের অবসান হয়।

লেখক।

করিতেছে! প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের কিংবা (অধিকাংশ) পুরাণ,তন্ত্র, সংহিতার অথবা ব্রাহ্মণ্যের প্রবল বিদ্রোহী এবং বিরুদ্ধভাবী হইয়াও এই সন্ন্যাসাদর্শই বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জগতে জয়ী হইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজের মনুষ্যমাত্রেই যেন অতর্কিতে সাধু গৃহস্থ অপেক্ষা বরং ভিক্ষা-দৈন্য-ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী অবধূতকেই অধিকতর সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন; এবং নিজেরা যে কেবল 'অবিদ্যার' বশ্যতা গতিকেই সমাজের জাল ছিন্ন করিয়া উধাও হইতে পারিতেছেন না, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্রতা অনুভব করেন। বৈরাগ্য এবং অসামাজিকতাকেই ধর্ম্মসাধনার শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিয়া একটা অসংশয়িত স্বীকার বাক্য প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সংসার এবং ধর্ম্ম, এই দুইটাকে পরস্পর বিরুদ্ধগতিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, সংসার হইতে বৈরাগ্য-পলায়নই শ্রেষ্ঠ 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করিতে পারিলে, তম্মুহূর্ত্তে মনুষ্য-জীবনের সমস্ত সঙ্কট সমস্যার নিকাশ হইয়া যায়, জীবন-যুদ্ধের বিষয়ে নিদারুণভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; এই ক্ষেত্রে অযোগ্যতা এবং ভীরুতামাত্রই পরম মাহাত্ম্য বলিয়া প্রতীত হইয়া আত্ম বঞ্চনা সম্পাদন করিতে থাকে! এই প্রকারে মনুষ্য-জীবনের প্রধান সমস্যা-গ্রন্থিটাকেই সেকেন্দর সাহের ন্যায় এক আঘাতে ছেদন করিয়া ভারতীয় সমাজ ক্রমে সংসার বিষয়ে নিশ্চিন্ত এবং উদাসীন থাকিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছে! তাই আজ ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ অবধূত! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোমধ্যে এই বৈরাগ্য আদর্শই প্রণতি লাভ করিতেছে! চিন্তা করিবেন, এই লক্ষলক্ষের মধ্যে সকলেই কি অযোগ্য বা সংসারভীরু? ভণ্ডগণের কথা ছাড়িয়া দিবেন, কিংবা যাহারা সন্ন্যাসীর ভেকটাকে জীবনোপায়রূপে, অথবা লোকের চক্ষে মাহাত্ম্য কিংবা যশোলাভের জন্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কথাও ধরিবেন না। সন্ন্যাসীর জীবনটাকে উন্নত ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে অপরিহার্য্য জানিয়া, গুরূপদেশে বা সরলবিশ্বাসে একমাত্র সত্য পন্থা বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া, যতী-ব্রত গ্রহণ করেন এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নহে। অনেকেই সরল বিশ্বাসে অশেষ দুঃখ-দৈন্য এবং তপঃখেদকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন, এবং দিবানিশি অতন্দ্রিতভাবে অন্তরাত্মাকে নানা দিকে পরম বীরত্বে পীড়ন করিয়াই চলিতেছেন। এই সমস্ত শক্তিধর পুরুষকে 'অযোগ্য' বলিলে নিতান্ত অবিচার হইবে। ইহাঁরা ভারতবর্ষের হৃদয়-গত বর্ত্তমান ধর্ম্মাদর্শের ফল। ভারতীয় সমাজ এখন নিজের সমস্ত মতিগতি ও কার্য্যে তাহার ব্যক্তি-সমূহের মধ্যে প্রবল বৈরাগ্য উদ্রিক্ত করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে; গৃহজীবনে এবং সামাজিক জীবন-পথে সর্ব্বত্র যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক কাঁটা পুতিয়া রাখিয়াছে! ব্যক্তি-মাত্রের স্বাতন্ত্র্য যাহাতে প্রতিনিয়ত সমাজের মধ্যে ছুঁচা বিছা এবং আরশুলার উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তাহার বিধান ত আছেই; সর্ব্বোপরি, এই বৈরাগ্যের আদর্শ! এই অবস্থায় আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ-কামী, সরল-বিশ্বাসী এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব-শক্তিমান্ অনেকানেক ব্যক্তিই যে তাহার সমাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কৌপীন আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, কোনরূপ ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য বা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলেই অনেক স্থলে ভারতীয় সমাজ-গৃহ পরিত্যাগ করা ভিন্ন, একান্তভাবে চতুর্থাশ্রম বা বর্ত্তমানের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা ভিন্ন, যেন অন্য উপায় নাই! সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্রই ভারতীয় মনুষ্যের জীবন হইতে পরিবার, সমাজ কিংবা সংসারের, হিন্দু ধর্ম্ম কিংবা শাস্ত্র-সংহিতার যাবতীয় বিধি-নিষেধ যেন সর্প-নির্ম্মোকের ন্যায় স্খলিত হইয়া পড়ে! * কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ে কেন, কোন দিকেই অসামান্যতা বা অত্যুন্নতি সাধনা করিতে হইলে, এই দেশে একান্ত অসহায় হওয়া ভিন্ন যেন অন্য উপায়

* বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচার শাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?
শঙ্করাচার্য্য শুকাষ্টকম্।

নাই! তাহার সমাজতন্ত্রে ওইরূপ অসঙ্গতার বা এককতার জন্য বর্ত্তমানে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। আমাদের সমাজ কেবল সন্ন্যাসীর নিকটেই কোন দাবী-দাওয়া করে না; উহার বিধি-বিধান বা বাধ্য-বাধকতা কেবল সন্ন্যাসীকেই স্পর্শ করে না। সুতরাং এই সমাজেও পরম স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধি করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু সন্ন্যাস-অবলম্বন ভিন্ন নহে। এই কারণে প্রতিবৎসর এই সমাজের অনেক তেজীয়ান্ ব্যক্তি স্বাধীন অধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সত্য কিন্তু উহার শুষ্ক-সঙ্কীর্ণ আদর্শ এবং মায়াবাদের ফেরে পড়িয়া মনুষ্য-সমাজ-বিষয়ে সকল দিকে শূন্য হইয়া যান! তাঁহারা নিজের ইপ্সিত পরমার্থ লাভ করেন কি না, তাঁহারাই জানেন; দৃষ্টতঃ, সমাজ-বন্ধনের এবং সপরিশ্রম জীবিকার্জ্জনের সমস্ত জাতিত্ব এবং ফেসাদ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই সমাজ পূর্ব্বকাল হইতে, স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ-সমন্বয়ের পর হইতে, নিজের মধ্যে তাঁহাদের জীবিকা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু গৃহী মাত্রেই যথাসাধ্য সন্ন্যাসীর খোরাক যোগাইতে বাধ্য। কোন প্রত্যাশা না করিয়া, বরং উহাদের সংসর্গে প্রতিপদে নিজের বিশ্বাস-ধর্ম্মকে বিপদাপন্ন করিয়া, হিন্দু সমাজ এই সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং দেখিবেন, এই সমাজে যেই টুকু স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধির পন্থা অবারিত আছে তাহার প্রকৃতি এবং কার্য্যকারিতা এই রূপ! এই সিদ্ধি হইতে ভারতীয় সমাজ বা সাহিত্য কিছুমাত্র লাভবান হয় না। বলিতে কি, বৌদ্ধ-সমন্বয়ের পর হইতে এই সমাজের গ্রহণ এবং উপার্জ্জনের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং এখন দৈনন্দিন কেবল খরচের অঙ্কই বাড়িয়া চলিয়াছে।

সাহিত্য ও সন্ন্যাস।

সুতরাং, পরম সুযোগ সুবিধা সত্বেও, এই অত্যন্ততা-যুক্ত ত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতে ভারতীয় সাহিত্য বা সমাজ কিছুমাত্র উপকার উদ্ধৃত করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের বাণী-মন্দির সংসারের মধ্য-ক্ষেত্র হইতে, সামাজিকতার বক্ষঃস্থল হইতেই ঊর্দ্ধ লোক লক্ষ্য করিয়া চূড়াগ্রভাগ উত্তোলন করিয়াছে! এই কথা সত্য যে, এই মন্দিরের সাধক মাত্রকেই সর্ব্বপ্রকার মাহাত্ম্য-সাধককেই প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হইতে হয়, কিন্তু এই সন্ন্যাস ঐকান্তিকতার নামান্তর। সাহিত্য-সাধকও সন্ন্যাসী হইবেন; কিন্তু গীতা-তন্ত্রের, অনুরাগ তন্ত্রের সন্ন্যাসী। ভগবদ্বুদ্ধিষ্ট নিষ্কাম জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাব-যোগের অকুণ্ঠিত সাধনা-রসিক সন্ন্যাসী।

বলা বাহুল্য, এইরূপ একান্ত সন্ন্যাসের আদর্শও পৌরাণিকতার বৌদ্ধ সমন্বয়োদ্দেশ্য পুরাণ-তন্ত্র এবং দর্শনাদির ব্যাখ্যা এবং টীকা টিপ্পনীর সম্পত্তি। বর্ত্তমান কালে উহাই ব্রাহ্মণের অন্য সমস্ত ধর্ম্ম উপদেশ হইতে বলিষ্ঠ হইয়া, তাহার অধিকারকেও উতরাইয়া গিয়াছে! এই সমাজ নিজের জালে জড়িত হইয়া গিয়াছে। এখন সংহিতা-শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ এবং এই সন্ন্যাসী উভয়েই হিন্দু সমাজ-তন্ত্রের বিধাতা!

হিন্দু-সমাজের দ্বৈত প্রভুত্ব।

অপরূপ দৈধ দ্বন্দ্বে পড়িয়া, অপিচ, প্রত্যেকের তরফেই শত শত সাংপ্রদায়িক মত ভেদের মধ্যে পড়িয়া, জিজ্ঞাসুমাত্রের নয়ন সমক্ষে অরাজকতাই প্রতীয়মান হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ যেমন প্রাচীন কালের আদর্শে চরমপন্থিতার বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে প্রতিনিয়ত আত্ম-সঙ্কোচ করিতে উপদেশ করিতেছেন, সন্ন্যাসিগণ তেমনি কার্য্যে এবং কথায় সকলকে সমাজ-ধর্ম্ম এবং সমাজের সীমা হইতে দূরে পলায়ন করিতেই প্ররোচিত করিতেছেন। হিন্দুর সাহিত্যে, সমাজে এবং অধ্যাত্ম-রাজ্যে ইহার ফল নানা দিকে বিভক্ত না হইয়া পারে না।

যা'হোক রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান লক্ষণ যদি বলিষ্ঠ, সরল এবং উন্নত আর্য্য-জীবন হয়, বলিতে হইবে এই পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রধান সাহিত্য-

পুরাণের সাহিত্য-লক্ষণ ভাবুকতা।

লক্ষণ, উহাদের অন্তরঙ্গীয় ভাব প্রবণতা বা ভাবুকতা। যেমন জীবন-ক্ষেত্রে তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সর্ব্বপ্রকার বস্তু-গতি বা বস্তু ভিত্তিটাকে নানা দিকে

অতিক্রম করিয়া এবং উপেক্ষা করিয়াই, উহাদের বাণী-প্রকোষ্ঠে, এই ভাবুকতাই সর্ব্বত্র প্রবল হইয়াছে। উহাদিগকে কাব্যসাহিত্যের শ্রেণীস্থ করিয়া নামকরণ করিতে হইলে বলিতে হয়, উহারা ভাবগত কাব্য। সকল দিকে ভারতীয় পরিবার এবং গ্রাম্য-সমূহ, জাতিভেদ এবং সাংপ্রদায়িকতার গৌণ অথবা মুখ্য স্বার্থের সহিত সম্পর্কিত, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণ্যের প্রাবল্য-লক্ষণযুক্ত এই ভাবুকতা। স্বয়ং সন্ন্যাসাদর্শটাও প্রবল ভাবুকতা হইতেই উৎপন্ন; সুতরাং গ্রীক কিংবা হীব্রু সাহিত্যের 'ক্লাসিক' লক্ষণযুক্ত দৃঢ়তা বস্তু-ভিত্তি এবং মানবিক চরিত্র-ভিত্তির দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, এই পুরাণ সমূহের মত এমন বিশেষত্বজীবী প্রাচীন সাহিত্য আর নাই। বৈদিক সাহিত্যের কথাটা এই স্থলে গণনা করিতেছি না; উহাও নানা দিকে 'ক্লাসিক' লক্ষণাক্রান্ত। ভারতীয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ পৃথিবীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাবুক। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যজাতি সমাজতন্ত্রে বিশেষ বিশেষ গুণ-দোষ এবং ঘটনার সম্পর্কে উদ্ভাবিত হইয়া, এই ভাবুকতা শিল্পের তরফে যেই অপরূপ সাহিত্য-লক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আভাষ ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি (১)। এই ক্ষেত্রে উহার সামাজিক ফল মাত্র সঙ্কলিত হইতেছে। ভৃগুপ্রোক্ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মের যেই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহার অন্য নাম 'ভাব' বা ভাব-প্রাণতা ভিন্ন আর কিছুই নহে (২)। ভাবই জগতের ধর্ম্ম : চরাচরের, জীবত্বের, মনুষ্যত্বের গতি ধর্ম্মমুখী—ভাবমুখী—ঊর্দ্ধমুখী—নিরোধমুখী। মনুষ্যের সমক্ষে এই নিরোধাত্মক ভাব সাধনাই ধর্ম্ম-সাধনারূপে প্রকটিত হইয়া, দেশ, কাল এবং পরিবেশের মধ্য দিয়া, নানা প্রকারে এবং নানা পথে তাহাকে পরম-তত্ত্ব, অনন্তের ভাবতত্ত্ব এবং ভূমার অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে! ভারতবর্ষের বিশেষ হিন্দু-সমাজতন্ত্রে পরিবেশের মধ্যে পতিত হইয়া, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ এই ভাবুকতাকেই বিপুল ভাবুকতা।

(১) প্রতিভা—১ম বর্ষ, ৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ধৃতি ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥
মনুসংহিতা।

পুরাণ-সাহিত্যে অনুসরণ করিয়াছেন। পুরাণাদির ব্রহ্মজ্ঞান যপ, তপ, ব্রত-নিয়ম এবং পূজা পদ্ধতি এবং বিপ্র-প্রিয়তার ধ্রুবপদ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবাদর্শে নিয়ন্ত্রিত। তাহার দাম্পত্য ধর্ম্ম পতিপূজা এবং সতীর আদর্শ, সতীধর্ম্ম এবং সহমরণের আদর্শ, তাহার পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, অপত্যকামনা এবং অপত্য-বাৎসল্য, সমস্তই তাহার পারিবারিক ক্ষেমতন্ত্রীর ভাবুকতার ফল! তাহার বিবাহ-পদ্ধতির কন্যাদান-আদর্শ, স্ত্রীজাতির অধীনতা ও নির্ভরতা, তাহাদের 'সেবা-ধর্ম্ম', বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বৈধব্য, বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের নিষেধ, গোহত্যা-নিষেধ, অশেষ সাংপ্রদায়িকতা এবং অনন্ত জাতিভেদ, ব্যবসায়-ভেদ, স্পর্শাস্পর্শ এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার, তাহার ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি এবং নিষেধ সমস্তই তাহার বিশেষ তন্ত্রীয় পরিবার এবং সমাজের অখণ্ডতা কল্পেই পরিকল্পিত। সমস্তই পরম ভাবুকতার লক্ষণযুক্ত ও কেবল সঙ্কোচাত্মক এবং আত্ম-রক্ষামাত্র-প্রয়াসী কবচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান কালে দূর দূরান্তর হইতে প্রত্যাগত বিভিন্ন পরিবার, সমাজ এবং ধর্ম্মাদর্শের পরন্তপ সভ্যতা সমক্ষে, সর্ব্বোপরি সম্মিলিত এবং সর্ব্ব-সঙ্কলন-শীল বিশ্ব সভ্যতার আদর্শ সমক্ষে উহার উজ্জ্বলতা ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহার মাহাত্ম্য বা অপরিহার্য্যতা বিষয়ে কোনরূপ সংশয় প্রশ্নের অবকাশও ঘটে নাই! এই সমস্ত আদর্শের আতিশয্যটুকু উহাদের জেদটুকু সর্ব্বপ্রযত্নে অনার্য্য, দ্রাবিড় এবং বৌদ্ধ আদর্শের বিরুদ্ধে এবং কিছুকাল মুসলমানীর বিরুদ্ধেই চলিয়াছিল। এই জেদ হইতে পরকালে সমাজ মধ্যে যে কত অভাবনীয় অনিষ্ট সঙ্গম ঘটিতে পারে তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি পরিচালিত হইতে পারে নাই। যাহোক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ কত মতে কত পন্থায় এই ভাবুকতার অনুসরণ করিয়াছেন! সাহিত্যের হিসাবে পুরাণ সমূহের মধ্যে স্বাভাবিকতা অথবা বস্তু-ভিত্তি অপেক্ষা উহার ভাব লক্ষণই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখন, অপরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভাবুকতাই জীবনা-

দর্শে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কবিত্ব এবং কল্পনাই ভারতীয় সমাজের জীবন ক্ষেত্রে আসিয়া বস্তু-পরিণতি লাভ করিয়াছিল। চিন্তা করিবেন, পুরাণের এই ভাবুকতা সকল দিকেই প্রাক্‌টিকেল (Practical), পৌরাণিকের মনসুখে অথবা জীবনে কোন পার্থক্য ছিল না ; পার্থক্য ছিলনা বলিয়াই হৃদয় তাঁহার প্রতি পরম ভক্তি প্রীতি অনুভব করে! ভারতীয় ব্রাহ্মণ যেমন পরের বিষয়ে, তেমন নিজের বিষয়েও চিরকাল কঠোর এবং অ-ক্ষমাশীল! তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই সমাজের অসঙ্গ প্রতিবেশের মধ্যে, জীবন পথে তাঁহাদের চক্ষে যাহা 'সনাতন' বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাঁহারা জীবনের অন্য সমস্ত বিবেচনা বিচার তুচ্ছ করিয়া উহারই সাধনায় অম্লান মুখে প্রাণ পাত করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের পক্ষে বিশ্বাসানুগত জীবনের ন্যায় এমন সম্মানের জিনিষ আর কি হইতে পারে? এই ভাবুকতার সকল জেদ বা প্রতীয়মান দোষ সত্ত্বেও উহা হৃদয় মধ্যে পরম ভক্তি-পদবী অধিকার করিয়া বসে! এই ভাবুকতার আদর্শে ভারত বর্ষের কোটী কোটী নর-নারী আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছে! তাহার রমণী জাতি অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও নারীত্বের অন্য সকল স্বত্ব-স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া কেবল অপত্য-পালন এবং সেবা-ধর্ম্মকেই সার করিয়া গিয়াছে ; গঙ্গাসাগরে প্রাণ সম পুত্রের বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ বালবিধবা আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় দেহ ভস্ম করিয়াছে। স্বামী-দেবতার জ্বলন্ত চিতা-বক্ষে অম্লান মুখে চড়িয়া বসিয়াছে! এই সকল কার্য্যের উপদেষ্টা বা প্ররোচকগণের যাহাই বিচার হউক না কেন অনুষ্ঠাতৃ-গণের অলৌকিক মহাত্মা কে অস্বীকার করিবে! কোটী কোটী সরল বিশ্বাসী মনুষ্য আমরণ ডোর-কৌপীন সার করিয়া পরম কায় ক্লেশের কণ্টক-চক্রে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে ; কোটী কোটী পিতাপুত্র মাতা এবং ভ্রাতা ভগ্নী এই একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং গ্রাম-সমাজ-তন্ত্রীর ভাবুকতার সাধনাযজ্ঞে নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বার্থ অথবা মাহাত্ম্যের স্পৃহা আহুতি দিয়া জীবনরূপ স্বপ্নটাকে অতিবাহিত করিয়া যাইতেছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

প্রতীক্ষা

নিঝুম নিশীথ, করে ছম ছম,
আঁধার ভিতরে, বাহিরে।
নয়নের পুটে আজিকে আমার,
নাহিক নিদ্রা নাহি রে।

সুতগুলি কোলে নয়ন নামায়ে,
ঐ যে প্রকৃতি পড়েছে ঘুমায়ে,
তুমি বুঝি আজ—ভূতলে নামিবে
ছায়া-পথে তরী বাহি রে।

মিটি মিটি জ্বলে তৃতীয়ার চাঁদ
পিটি পিটি জ্বলে তারা,—
ক্ষীণ আলোগুলি রাখিয়াছ জ্বালি'
পাছে হও পথ হারা।

চুপি চুপি তুমি, নামিবে সহসা
টিপি টিপি পায়ে ধরিব ভরসা।'
গোপনে আড়ালে গগনের পানে
তাই আছি আজি চাহি' রে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সন্তান-পালন

প্রকৃতির বিধান এইরূপ যে, পুরুষ রোজগার করিবে, আর স্ত্রী গৃহ-কর্ম্ম ও সন্তান পালন করিবে। এই ব্যবস্থাটিকে দোষ দেওয়া যায় না। যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষ সন্তোষ সহকারে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন সেখানে চিরসুখ, চিরানন্দ বিরাজ করে। আর যেখানে স্ত্রী পুরুষের দায়িত্বের বিচার নাই, সেখানে সর্ব্ব বিষয়েই বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অপূর্ণতা থাকিতে দেখা যায়। সেকালের তুলনায়, আজ কালকার জননীরা সন্তান পালন বিষয়ে যেন কিছু বেশী মাত্রায় পরমুখাপেক্ষিনী হইয়া পড়িয়াছেন। ধনীর ঘরের ত কথাই নাই, অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সংসারেও দাস দাসীর হস্তে শিশু পালনের ভার ন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। কালক্রমে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; ইহাও সেই পরিবর্ত্তনের ফল মনে করিতে হইবে। অবশ্য আমরা এমন বলিতেছিনা যে, আজ কালকার মাতারা সন্তানের কিসে ভাল মন্দ হয়, তাহা মোটে চিন্তা করেন না। অনেক স্থলেই মাতা দিবা রাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সুধু মঙ্গল কামনা করিলে ত হয় না—কি করিলে সত্যি সত্যি তাহা হইতে পারে, তাহাও জানা আবশ্যক। এবিষয়ে এদেশের মেয়েদের যে বিশেষ জ্ঞান আছে, আমাদের তাহা মনে হয় না। সে জ্ঞান যদি থাকিত তাহা হইলে বৎসর বৎসর এতগুলি করিয়া শিশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইত না। শিশুর মৃত্যু সংখ্যা তাহা হইলে, অন্ততঃ বার আনা যে কমিয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

সব মা-ই মনে করেন, তাঁহার ছেলেটি সর্ব্ববিষয়ে যেন আদর্শ পুরুষ হয়। আদর্শ পুরুষ হওয়া যদি চ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি উচ্চ আদর্শ সাম্‌নে রাখিয়াই সন্তান পালন করিতে হয়। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক, শিশুর অশন, বসন, নিদ্রা, স্নান, শারীরিকও মানসিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে, তবেইত সে বড় হইয়া আদর্শানুযায়ী হইতে পারিবে; নচেৎ নহে। ছেলে মানুষ করিতে হইলে, মাতার পক্ষে, বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা, শ্রম স্বীকার, আত্মত্যাগ, ধীরতা, ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতির আবশ্যক। এ সকল যাঁহার আছে তিনিই কেবল কর্ণেলিয়ার (Cornelia) মত আপনার ছেলেদের দেখাইয়া গর্ব্ব ভরে কহিতে পারেন—"ইহারাই আমার রত্নালঙ্কার—ইহারাই আমার মণি মুক্তা--সর্ব্বস্ব ধন।"

মানুষের শৈশবটাকে এক তাল কাদার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা হইতে দেবতা গড়ান যায়, আবার বাঁদর না হয় এমন নয়। দক্ষ শিল্পী মনে করিলে ইহা হইতে অনায়াসেই দেবতা গড়াইতে পারে; আর যাহার দক্ষতার অভাব—যে কি করিয়া ঠাকুর গড়াইতে হয় তাহা ঠিক জানে না—সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহার হস্তে দেবতা না হইয়া অপর কিছু হইয়া পড়ে। ছেলেটিকে মানুষ করিব, সুধু এই ইচ্ছা থাকিলে হয় না—মানুষ হয় কি করিয়া, তাহাও জানা আবশ্যক। আমাদের জননীগণ তাহা জানেন না বলিয়াই, আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা।

লালনপালন ও শিক্ষার দোষেই ত আমাদের মধ্যে অনেকেই শিশুকাল হইতে স্বাস্থ্য-সুখ হইতে বঞ্চিত। ঐ যে বনের ধারে, অপরিণত দেহ, বিকৃতগঠন, বক্রপদ ব্যক্তি পথিকের কৃপা ভিক্ষা করিতেছে,—উহার এদশা কি করিয়া হইল? ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, উহার কোনরূপই দৈহিক বিকৃতি ছিল না। শিশুর উপযোগী খাদ্য হইতে বঞ্চিত হওয়াতেই ত দেড় বৎসর বয়স হইতে, উহার হাড়গুলির এইরূপ বিকৃতি আরম্ভ। শৈশবের পালনের দোষেই ত আজ আমরা এরূপ খর্ব্বা-কার, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছি।

মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে রোগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে

সমর্থ হয়। শৈশবে পালনের দোষে, এ শক্তিটি ভালরূপ পরিস্ফুট হইতে পায় না। মাতার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আমাদের দৈহিক উন্নতি যেমন নির্ভর করে—আমাদের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নতিও সেইরূপ তাঁহার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করে। মাতা যদি সাহসী না হন, সন্তানের পক্ষে সাহসী হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিতে হইবে। শিশু ক মাস বয়স হইতে শিখিতে থাকে, তাহা ঠিক বলা যায় না, তথাপি মাতৃক্রোড়েই যে উহার শিক্ষা আরম্ভ একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় যেরূপ সহায়তা করে এমন অন্য কোন ইন্দ্রিয় নহে। শিশু আপনার মাকে যাহা বলিতে শুনে অথবা করিতে দেখে, তাহাই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। মাতা যদি বিরসবদনা ও কর্কশ-ভাষিণী হন সন্তানের চরিত্রে রূঢ়তা ও অপ্রসন্নতা নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। আর তিনি যদি স্মিতবদনা, মিষ্টভাষিণী হন, প্রফুল্লতা ও মিষ্টবাদিতা সন্তানের পক্ষে যেন স্বভাবজাত হইয়া পড়ে। আমরা এমন অনেক ঘটনা জানি, যে সকল স্থলে, কেবল ধাত্রীর পরিবর্ত্তন দ্বারা শিশুর স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে। মানুষের কোন গুণই পুরা পুরি বংশগত বা দৈবলব্ধ নহে। সকল গুণই অনুশীলন দ্বারা পরিণতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শৈশব ও বাল্যই অনুশীলনের উপযুক্ত সময়। এ সময় উপেক্ষা করিলে পরে আর ফল পাইতে দেখা যায় না। ছেলেটির কেমন শিক্ষা হইতেছে ইহা যেমন তাহার রোগের সময় টের পাওয়া যায় এমন সুস্থ অবস্থায় নহে। এমন অনেক ছেলে মেয়ে থাকে, যাহারা ব্যারামের সময় কটু তিক্ত ঔষধ এবং রোগোচিত পথ্য কোন মতেই খাইতে চাহে না। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে বাধ্যতা কাহাকে বলে,—ইহাদের পিতা মাতা এক দিনও ইহাদের তাহা শিখান নাই। ইহারা যখন যাহা চাহিয়াছে অবাধে তাহা পূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় যে, স্ত্রী শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। সন্তান-পালন-বিদ্যা-শিক্ষাও ততোধিক আবশ্যক। কি প্রকারে রাখিলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব—রোগ কালেই বা কি কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত এ সকল বিষয়ে যতই আলোচনা হয় আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল বলিতে হইবে।

আমরা ধারাবাহিক রূপে সন্তান পালন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি প্রকাশ করিতে থাকিব। আশা করি বঙ্গ জননীগণ ইহা পাঠ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রয়াসী হইবেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্চি, এল, এম, এস।

প্রত্যাখ্যাতা

যাত্রা

উত্তরে যত দূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে রূপার রেখার মত ইরাবতী ভামোর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আবার পূর্ব্ব দিক হইতে দুটি ক্ষুদ্র নদী প্রস্তর শৈলের প্রেক্ষাগ্র বহিয়া ইরাবতীতে ঢালিয়া দিতেছে। সঙ্গম স্থলে ভামো। সুন্দর ক্ষুদ্র সহর; চতুর্দ্দিকে ধূম্র পাহাড়ের বেষ্টন স্থলে স্থলে ঢালু হইয়া নদী গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। ঢালু স্থানগুলি ঘন সবুজ দুর্ব্বাদলে ঢাকা—যেন যত্ন করিয়া কেহ গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। পাহাড়গুলি ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উত্তরে ও পূবে হটিয়া গিয়া শেষে মেঘে ঠেকিয়াছে। সকালে চূড়ায় চূড়ায় তীরের মত কিরণের আঘাতে উড়িয়া গিয়া রাশি রাশি সোনার কণা নদীর জলে, পথে, ঘাটে, লতায়, পাতায় ছড়াইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মদেশের সুবর্ণভূমি নাম সার্থক করিয়া দেয়।

নদীর দিকে সদর দরজা এমন একটি দোতালা সুন্দর কাঠের বাংলা ঘর। সম্মুখ দিয়া ঘাসে ঢাকা সদর রাস্তা নদীর তীরে তীরে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার অপর পাশে বাংলোটির দুই দিকে মাঝে মাঝে অনেকগুলি কাঠের সীঁড়ি জল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এক একটি সীঁড়ির আট দশটি ধাপ এবং এক একটি ধাপ প্রায় দশ

হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া। রেশমী-লুঙ্গি-পরা, জ্যাকেটের মত লম্বা আস্তিনের ঢল্ ঢলে রেশমী-জামা-গায়ে-দেওয়া, মাথায় রেশমী-রুমাল-বাঁধা এবং ডসনের বুট-পায়ে-দেওয়া ব্রহ্মদেশীয় বহু যুবক চুরুট মুখে দিয়া রাস্তার ধারে ও সীঁড়ির উপরে বসিয়া থাকে এবং সন্ধ্যা কালে ইরাবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। আকাশ হইতে ইরাবতীর জলে আবির ছাইয়া পড়ে এবং লাল জলে বাংলা খানির ছায়া পড়িয়া একটি সুরম্য ভূচিত্রের মত ফুটিয়া উঠে।

এক দিন বৈকাল বেলায় অস্তগামী সূর্য্যের কিরণগুলি উজ্জ্বল মেঘের মাঝে মাঝে যাই যাই করিয়াও যাইতে ছিল না। প্রাসাদের মত সেই দূরের স্বর্ণ মেঘ সমূহের মধ্য দিয়া ও বৃক্ষ-শ্রেণীর ফাঁক দিয়া যেন স্বর্গ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। তখন বাংলাটির নিম্ন তলের চন্দন কাষ্ঠের স্তম্ভগুলিতে কারু কৌশলের বিচিত্র প্রমাণ স্বরূপ খোদিত লতা ও বিহঙ্গরাজি মাণিক হীরার ঔজ্জ্বল্য লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় অন্ধকারের আবছায়ায় একটি ব্রহ্মদেশীয়া যুবতী দোতালার গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়া ইরাবতীর উদ্দাম সলিলোচ্ছ্বাসের চঞ্চল সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। আজানু লম্বিত ঘোর কৃষ্ণ এক রাশি কেশ তাহার মাথায় জাপানী ধরণে চূড়া কবরীর আকারে বাঁধা ছিল, পরণে পীত বর্ণের বসন "কিমনোর" মত জাপানী ধরণে আঁটা ছিল, প্রশস্ত কটিবন্ধ তাহার মধ্য দেশকে জোর করিয়া ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং পরিচ্ছদে গন্ধদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রাচুর্য্য বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছিল। যুবতীর ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ তখন 'রুজ'-রঞ্জিত হওয়ায় মুখখানি পূর্ণ বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর দেখাইতেছিল এবং তাহার ফুটফুটে গৌর কান্তি সর্ব্বাঙ্গে ঠিক জ্যোৎস্নার প্রলেপের মত এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কাল ও মোটা ভ্রূ-লতার নিম্ন দেশে পদ্মের মত তাহার বড় বড় চক্ষু দুটির দৃষ্টি হইতে সর্ব্বদাই স্নেহ গলিয়া পড়িত; কিন্তু তার গণ্ডের অস্থি দুটি একটু উন্নত, চিবুকটি একটু খাট এবং ঠোঁট দুটি একটু পুরু ছিল। ব্রহ্মদেশে এমন সুন্দরীর অভাব না থাকিলেও অল্পতা আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিত।

সন্ধ্যা কালের এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া কিন্তু যুবতী তৃপ্তি লাভ করিল না। একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "তিন বৎসর ধরিয়া আশায় দিন কাটাইতেছি, শুধু আশার পথ চাহিয়া আর কত কাল বসিয়া থকিব?" এই বলিয়া মা-ইউনী একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল। সে আশায় ছিল কা-উজানের সহিত তাহার বিবাহ হইতে আর দেরী হইবে না।

দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের কাল ছায়া বিরাট দৈত্যের মত ঘন হইয়া আসিয়া ভামো নগরটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল—কেবল গন্ধভরা বাতাস অন্ধকার দৈত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কা-উজান এণ্ডার্সন সাহেবের কারখানায় খাজাঞ্চীর কার্য্য করিত। আয় অতি সামান্য ছিল বলিয়া এত দিন সে ইউনীকে বিবাহ করিতে পারে নাই। বৎসরান্তে যখন এক এক বার বেতন বৃদ্ধি হইত তখন মনে করিত সে ইউনীর প্রেম-রাজ্যের সীমার দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে ভবিষ্যৎ সুখের আলোক-পাতে তাহার হৃদয় নূতন আশায় ও নূতন উৎসাহে ভরিয়া উঠিত। দীর্ঘ দশ বৎসর এইরূপ ভাবে কাটিয়া গিয়াছে—সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সেই স্বপ্নের রাজ্য আলেয়ার মত হঠাৎ পিছাইয়া গেল।

তাহার আশা ছিল মৃত্যু কালে এণ্ডার্সন পরিশ্রমের ও সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ এমন একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন, যাহাতে তাহার আর নিরাশার তাড়নায় ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। কিন্তু সেই আশার বাঁধও ভাঙ্গিয়া গেল।

"আপনি উইলের মর্ম্ম বেশ বুঝেছেন তো?"

"হাঁ, মর্ম্ম বুঝেছি; কিন্তু এই সর্ত্তের উদ্দেশ্য বা রহস্যটা বুঝিতে পারি নাই।"

"আরও দশ দিন সময় আছে, এখনও চিন্তা করিবার অবসর যথেষ্ট আছে।"

"আপনি কি কিছুই জানেন না?"

"জানিলেও, যাহা বলিয়াছি তার বেশী আর কিছু বলিতে পারিব না। মক্কেলের নিকট আইন ঘটিত বিষয় ছাড়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করার বা শোনার উকীলের অবকাশ নাই।"

এই বলিয়া এডভোকেট কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কা-উজান শন্য মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। উইল-রহস্য ভেদ করিবার জন্য এই ভাবনার ভিতর দিয়া তাহার মনে পড়িল সেই সুন্দর মুখখানি তৃষিত ও আকুল, কিন্তু মিলনের আশায় উজ্জ্বল। যখন শৈশবে সংসারটা কেবল আনন্দময় ছিল তখন হইতেই ইউনী কা-উজানকে ও কা-উজান ইউনীকে ভাল বাসিয়া আসিতেছে।

সে দশ বৎসরের কথা। তখন ইউনীর বয়স ছিল আট বৎসর, এখন সে আঠারতে পড়িয়াছে।

চাকুরীর উমেদার হইয়া প্রথমে যখন সে এণ্ডার্সনের কাছে উপস্থিত হয় তখন এই গৃহেই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। কা-উজানের করুণ কাহিনী শুনিয়া সে সময়ে এণ্ডার্সনের মন গলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর পারিবারিক কোন বিষয় লইয়া এণ্ডার্সনের সহিত কোন দিন তাহার আর কোন আলাপ হয় নাই। তবে এই অনুরোধের কারণ কি? এই জটিল সমস্যা কিনারা করিতে গিয়া কা-উজান হস্তাস্থিত উইলের প্রতি আবার দৃষ্টি করিল, এবং হঠাৎ একটা স্থান পড়িয়া ক্ষোভের মধ্যেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

পরে আবার একটা বিরুদ্ধভাবে তাহার হৃদয় একটু সজাগ এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া সে মাকড়সার মত কেবল কল্পনার জালে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। তখন আর ভাবিতে পারিল না এবং স্থির করিল ইউনীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে এবং দুজনে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। কিন্তু যদি এই কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকাই স্থির হয় তবে এণ্ডার্সনের কারখানায় তার আর স্থান হইবে না।

আবার চিন্তার তরঙ্গ বহিল। উইলের শেষ কথাটা কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে আসিতে লাগিল। "প্রভু-ভক্ত, বিশ্বাসী ও সদ্বংশজাত কা-উজান তাহার মৃত প্রভুর আদেশ পালন করিয়া স্বকীয় মহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবে।" —এই একটি কথার চিন্তা তাহাকে হাত ধরিয়া ভাবনার আবর্ত্ত হইতে সান্ত্বনার রাজ্যে লইয়া আসিল। সেখানে সে দেখিল স্বার্থ-নিঃস্বার্থ, করুণা-কাঠিন্য, প্রেম ও ঘৃণা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রভুর প্রতি ভক্তি শতধারে আবার তাহার হৃদয় ভরিয়া দিল, সে অক্ষুব্ধ চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

শ্রাবণের মধ্যাহ্নে বর্ষাসিক্ত গাছ-পালাগুলির উপর রৌদ্রের কিরণ রুগ্ন মুখের ম্লান হাস্যের মত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দিকে দিকে মেঘের ভারে আকাশ যেন নুইয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে চাতকের আর্ত্ত চীৎকার বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে। ইরাবতী কূল-প্লাবী প্রবাহ লইয়া গম্ভীর অথচ ক্ষিপ্র বেগে ছুটিয়া যাইতেছে।

যাত্রীর সংখ্যা অল্প, কারণ শ্রাবণে পারত পক্ষে কেহই সমুদ্র যাত্রা করে না। রেঙ্গুনের ঘাট হইতে টার্নার মরিসন কোম্পানীর "সাহাজাদা" নদী ছাড়াইয়া নীল সমুদ্রে আসিয়া পড়িল, এবং লাঙ্গলের খাতের মত সমুদ্র বক্ষ অঙ্কিত করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অধিক যাত্রী না থাকাতে কা-উজানের বেশ সুবিধা হইল। একটি গোটা ক্যাবিন সে দখল করিয়া বসিল, এবং দ্বিতীয় সেলুনের প্রায় সমগ্র ড্যাকটির উপরও দখলের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইল। ফল কথা এমন অসঙ্কীর্ণ ও উন্মুক্ত স্থান না হইলে তাহার চিন্তা প্রসার লাভ করিতে পারিত না।

জাহাজে আরোহণ করিয়াই কা-উজান এডভোকেটের দেওয়া সিল মোহর করা চিঠিটা পড়িল। বুঝিল প্রথম

সাক্ষাতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এণ্ডার্সন তাহাকে এই গুরুতর কার্য্য সাধনের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

দেখিল দু'এক স্থানে বৃদ্ধের মনে ত্রিশ বৎসরের গুপ্ত যন্ত্রণার আভাষও রহিয়াছে।

"প্রেমিকার নিকট নিঃশেষে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া দিয়া কা-উঙ্গান দীর্ঘ দশ বৎসর কাটাইয়াছে—শুধু মিলনের আশায় ও শুভ যোগের প্রতীক্ষায়। যে প্রণয়িণীর এত নির্ভরযোগ্য সে-ই আমার কার্য্য সাধনের একমাত্র যোগ্য। স্বর্গ হইতেও আমার আশীর্ব্বাদ তাহার জীবনকে কল্যাণময় করিবে।" প্রথম পৃষ্ঠায় এই কয়টি কথা লিখিত ছিল এবং স্থলে স্থলে আইনের নীরস ভাষার অন্তরাল হইতে সহৃদয়তার ভাব সমগ্র চিঠিটাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিল।

এণ্ডার্সনের চিঠি।

"সে ত্রিশ বৎসরের কথা। তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পিতা ভারত যাত্রা করিয়াছিলেন। আমরা তিন ভাই, আমি ছিলাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। ঘুরিতে ঘুরিতে লক্ষ্মীর লীলা-ভূমি ব্রহ্মদেশে আসিয়া তিনি কাঠের কারবার খুলিলেন। অল্প দিনেই কারবারের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইল। আমার জ্যেষ্ঠগণ কারবারে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশাল ভারত সাম্রাজ্য সর্ব্বাংশে উত্তেজনা লইয়া আমাকে সাগ্রহ প্রার্থনায় আহ্বান করিতেছিল। পূর্ব্বে অনাস্বাদিত স্বাধীনতার সঙ্গ লালসা আমাকে পিতার শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। এক দিন শীত মধ্যাহ্নে ব্রহ্ম হইতে কলিকাতার জাহাজে চড়িয়া পিতার শাসন গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

বলিয়া আসিয়াছিলাম কলিকাতাতেই থাকিব। কিন্তু পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় এক বার শাসনের বেড়ার বাহিরে আসা মাত্র মুক্ত আকাশ সহস্র স্নেহের বাহু দিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পশ্চিম ভারতে এক দেশীয় রাজার গৃহচিকিৎসকের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। আয়র্লণ্ড দেশীয় হইলেও তিনি ভারতীয় শিক্ষা সংস্কার-পুষ্ট অধিকন্তু দেশীয় অতি উচ্চ এক রাজ কর্ম্মচারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতীয় রীতি নীতিরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন—এই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে মর্ম্ম দেশের গোপন-অধ্যায়ে এত দিন একটা আত্মগ্লানির ঘনান্ধকার সযত্নে রক্ষা করিতে হইয়াছে—এই আতিথ্যই আমার জীবনকে তিক্ত রহস্যে কলঙ্কিত করিয়া অতঃপর আমার উপর প্রতিহিংসা সাধন করিয়াছে এবং আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুনাম অপরের হিংসার উদ্রেক করিলেও ইহা আমার চক্ষে একটা অসার বিভীষিকার মরুভূমি হইয়াছে।

একমাত্র যুবতী কন্যা ছাড়া ডাক্তারের আর কেহ ছিল না। নবীন মেঘের মত তাহার স্বচ্ছ সুনীল চক্ষু দুটি, পদ্মের মত আরক্ত কান্তি লম্বা ছাঁদের হাসামাখা সরল মুখখানি প্রথম দর্শনেই স্বর্গের পুণ্য আলোকে আমার হৃদয়ে ফটোগ্রাফের ছবির মত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আজিও মুছিয়া যায় নাই।

তিন মাস কাটিয়া গেল, আমার অর্থসম্বলও ফুরাইয়া আসিল। ডাক্তার স্বীয় কন্যার ও আমার উপর গৃহ রক্ষার ভার দিয়া শিকারে গিয়াছিলেন। এই সুযোগ আশ্রয় করিয়া আমরা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। নগরের উপকণ্ঠে দুই জন পাদ্রি থাকিতেন; তাঁহারাই একমাত্র ধর্ম্ম সমক্ষে বিধিমতে আমাদের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। দিল্লিতে প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। সুতরাং বিধি, ন্যায়, ধর্ম্ম ও আইন মত আমাদের বিবাহ পাকা হইয়া গেল।

আমার উপদেশ মত কলিকাতার ঠিকানায় আমার নামে লিখিত চিঠি স্থানীয় ডাকঘরে জমা হইয়াছিল। বাবা শেষ চিঠিতে শত্র পাওয়া মাত্র ভামোতে ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছেন। বসন্ত রোগে আমার দুই সহোদরেরই মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে ফিরিয়া না গেলে কারবারের বিস্তর ক্ষতি হইবে।

কি করি, সঙ্গিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম দীল্লিতে প্রকাশ্য বিবাহের আর সময় নাই। পিতার নিকট গিয়াই তাহাকে লইয়া যাইব। এবং আমার পিতা পরম আহ্লাদে তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবেন। সঙ্গে লওয়ার জন্য প্রথমতঃ সে একটু পিড়াপিড়ি করিয়াছিল কিন্তু অতি অল্পেই তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সঙ্গে গেলে কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা ঘটিতে পারে কিন্তু শেষে গেলে সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে।

পরে বিদায়ের সময় আসিল। ফাল্গুনের প্রভাতে অরুণের কিরণচ্ছটা প্রাচীন কীর্ত্তির কঙ্কালময় দিল্লীতে তখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই। ডাক বাংলার তোরণদ্বারে একরাশি পুষ্পিত সুবর্ণলতা বসন্তের মৃদু সমীরণে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বিদায়ের চুম্বনের চিরস্মরণীয় মুহূর্ত্তে একটি ফুল তাহার উপর ঝরিয়া পড়িলে অমনি সে ফুলটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমার ওষ্ঠে একটু হাসির ছটাও খেলিয়া গেল। সেই হাসি শান্ত-মধুর, সন্তান স্নেহোচ্ছ্বসিত মায়ের হাসি। আমি তখন এই হাসির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ভাগ্যলব্ধ যে দিব্য কুসুম আমার জীবন চিরকাল সুখ-সুরভিতে নিমজ্জিত রাখিতে পারিত ঐশ্বর্য্যের কুহকে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম—এই অনুতাপ আমার জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া রহিয়াছে।

ভামোতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি দুঃখ-দলনে পিতার হৃদয় নিষ্পেশিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার উদ্দেশ্যের আভাষ পাইয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—'আমাদের বংশে বাঁচিয়া আছি আমরা দুই জন—তুমি ও আমি। আমি ইচ্ছামত আমার সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারি।' আমি দেখিলাম কুমারের চাকের কোমল মৃত্তিকার মত পিতা আমার ভাগ্য গঠন করিতে পারেন।

আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ কাল আমি কাপুরুষতায় কাটাইয়াছি। আমার ফিরিয়া আসার পর মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে কয়েক খানি চিঠি লিখিয়াছি—আমার সঙ্কটের বর্ণনা করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে কত কাতর অনুনয় করিয়াছি, কিন্তু সে ক্ষমা করিয়াছে কি না জানিতে পারি নাই, কারণ তাহার নিকট হইতে একখানা পত্রেরও উত্তর পাই নাই।

কয়েক মাস পর তীব্র কটু বাক্যে পূর্ণ ডাক্তারের এক পত্রের সঙ্গে সমস্ত পত্র ফিরিয়া আসিল। পত্রে লেখা ছিল আমি যাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম সে পুণ্যবতী একটি কন্যা প্রসব করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছে! সেই স্মৃতি-চিহ্ন এখন এক দিকে আমার নিকট প্রভাতের মুক্তা-বিন্দু, অপর দিকে সায়াহ্নের অশ্রুকণা। সময়ে সময়ে এই অপরিচিত বালিকার স্মৃতি অতীতের অন্ধকারের ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্ন শোকে মলিন অথচ আন্তরিক প্রেমে ক্ষমাশীল একটি নির্ম্মল মুখচ্ছবি আমার মনে অনুতাপের তীব্র জ্বালা লইয়া জাগিয়া উঠে।

হঠাৎ এক দিন খবরের কাগজে ডাক্তারের মৃত্যু-সংবাদ পত্রস্থ হইয়াছে দেখিলাম। পরিচয় প্রসঙ্গে তাহার একমাত্র কন্যা জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এই গুপ্ত কাহিনীরও আভাষ ছিল।

এই ডাক্তার পরিবার তাহার মৃত্যুর পর ভারতীয় সমাজের আচার-পদ্ধতি ও সংস্কার-সভ্যতা প্রকাশ্য ভাবে পালন করিতে লাগিল, এবং পিতা-পরিত্যক্তা ও মাতৃহীনা বালিকা ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়া বিলাত প্রত্যাগত এক ব্যারিষ্টারের অঙ্কলক্ষ্মী হইল।"

পত্রের শেষ ভাগে বৃদ্ধের করুণ, হৃদয়ভাঙ্গা আর্ত্ত অনুরোধ এইরূপে লিপিবদ্ধ ছিল—

"তোমার সাহায্য ভিন্ন আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তুমি অবশ্যই এই ব্যারিষ্টারের

পত্নীকে খুঁজিয়া লইতে পারিবে। আমি তোমাকে এক বৎসরের সময় দিলাম। সে আমার কন্যা, আমি তাহার পিতা, আমার সমস্ত অর্থ তাহার; কিন্তু আমার মনে সংশয় হয় অর্থ দান করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইব না। যাহার সহিত আমি ধর্ম্মবন্ধনে জীবনে মরণে বদ্ধ হইয়াছিলাম তাহার পবিত্র হাসি এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে নিষ্করুণতার অভিশাপ প্রকাশ করিতেছে! তাহার কন্যার ক্ষমা লাভ করিলেও আমি এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব। তুমি এই সঙ্গে শিলমোহর করা যে পত্রখানা পাইবে সেখানা তাহাকে পড়িতে দিও এবং পড়া হইলে ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলিও। ভাগ্যক্রমে যদি মাতৃহীনার সহিত তোমার দেখা হয় তবে ফিরিয়া আসিলে আমার এডভোকেট তোমাকে আরও কতকগুলি কাগজপত্র দিবেন। আমার এক জন নিরুদ্দেশ আত্মীয়ের অনুসন্ধানের জন্য তোমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হইবে ইহা ভিন্ন তিনি আর কোনও কথাই জানেন না; এবং তুমিও ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট এতদতিরিক্ত অন্য কোনও রহস্য প্রকাশ করিতে পারিবে না।

যদি তুমি মাতৃহীনার সন্ধান না পাও তাহা হইলে আমার সম্যক্ অর্থ দান-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। তোমাকে আবার বলিতেছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান তোমার সাহায্য ছাড়া হওয়ার উপায় নাই।"

সমস্ত পত্রটা কা-উজান শ্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে করিতে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গেল।

সাক্ষাৎ।

আধুনিক রীতিতে সুশিক্ষিত বর্ত্তমান রাজার সৌজন্যে ও আন্তরিক যত্নে দুই মাসের মধ্যেই কলিকাতার উপকণ্ঠে এক সুন্দর ভবনে এণ্ডার্সন-কন্যার সহিত কা-উজানের সাক্ষাৎ হইল।

অল্প দিন হইল রমণীর স্বামি-বিয়োগ ঘটিয়াছে, সুতরাং ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাহার উপর বার্দ্ধক্য ছায়া বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

তখন অপরাহ্ণ। গৃহপ্রাঙ্গন-সীমায় একটা প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের শাখায় লোহার শিকলে বাঁধা একটা পোষা হনুমান এক জন অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে চঞ্চল হইয়া নানাপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেকগুলি অস্পষ্ট ভাব স্বপ্নের ন্যায় কা-উজানের মনে আসিয়া আবার বিলীন হইয়া গেল।

রমণী ধীর ও গম্ভীর ভাবে পত্রটি পাঠ করিয়া আগন্তুককে গৃহ-প্রবেশের অনুমতি দিতে ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন। কা-উজান গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীর পশ্চাতে দাঁড়াইল, এবং বধির ভৃত্যটি দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

"তোমার মত স্থির-প্রণয়ীর উপর এণ্ডার্সন সাহেব এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়"—বলিয়া রমণী অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে একটু কঠোর ভাবে দ্রুত বলিতে লাগিলেন, "মা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আমি তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিব না। এই অর্থ লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না! এই ঐশ্বর্য্য জননীর দুঃখ-স্মৃতির কণ্টক হইয়া আমাকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করিবে। এই অর্থে আমার চিত্তে অশান্তি আসিবে। অতএব আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তুমি প্রচার করিবে যে, এণ্ডার্সনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ নাই।"

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, স্বর আরও কঠোর হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই রমণীসুলভ কোমলতা ও উদারতা ও মহত্ত্ব আবার তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নিকট এণ্ডার্সনের মৃতাত্মার শান্তি কামনা করিলেন এবং সমস্ত মাতৃস্নেহ দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন —

"যাহার প্রেম কামনা করিয়া তুমি দীর্ঘ দশ বৎসর স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছ সেই প্রেমিকা তোমার

মত যোগ্য স্বামীর উপযুক্ত হউক ; আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান অবশ্যই তোমাদিগকে সুখী করিবেন।”

কা উঙ্গান আত্মহারা হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তখন তাহার সম্মুখ হইতে কুহক কুজ্ঝটিকা ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। অতীত জীবনটা তাহার নিকট আবার প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ পাইল. আবার দীননয়না ইউনীর মুখখানি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

উপসংহার।

কা-উঙ্গান ভামোতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এড-ভোকেটের সহিত কথা হইতেছিল। অনেক কথা হইলে তিনি বলিলেন—

“যখন এত চেষ্টা করিয়াও উত্তরাধিকারী আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন সিলমোহর করা কাগজগুলি না খুলিয়াই পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তিন পুরুষ থেকে আমরা ওদের কাজ করি কোনও আত্মীয় থাকিলে অবশ্যই জানিতে পারিতাম। একটা কথা আপনাকে এত দিন বলি নাই। এণ্ডার্সন সাহেব আপনাকে রেঙ্গুন সহরের তাঁহার “মার্ব্বেল-প্রাসাদ” এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট জমিদারী দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকা। আপনার সৌভাগ্যে আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করিবেন।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প

ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীনত্বে জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। চীনের মৃণ্ময় বাসন এবং দামাস্কাসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য জগতে অন্য কোন শিল্পই ঢাকার বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে বাবেলোনিয়া এবং এসিরিয়া প্রদেশ যে সময়ে সভ্যতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল সেই সময়েও ঢাকার মসলিন জগতের নিকট সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিল ; একথা মিঃ বার্ডউড প্রমুখ মনস্বিগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা যে সকল বাইবেল যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা টীকা, টিপ্পনি সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাইবেলের কোনও স্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিনের ন্যায় এক প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে উহা যে ভারতীয় মসলিন হইতে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই (১)।

প্রাচীনত্ব

তৎকালে শত শত বাণিজ্য তরণী বঙ্গদেশ হইতে পেলেসটাইন বন্দরে উপনীত হইয়া পণ্য সম্ভারে বৈদেশিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। প্লিনি বলেন, “রোম-বণিকগণের ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্য লক্ষ্মীও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। রোমের মহিলাকুল সেই সমস্ত সূচিকণ মসলিনের অন্তরাল হইতে আপনাদিগের অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতেন” (২)

---

(১) Ezekiel. ch. xvi, 10 13, and Isiah. ch. iii. 23 : see Haris's Natural History of Bible and also interpretation given by Bishop Louth, Dr. Stock, and Mr. Dodson.

(২) "Pliny when speaking of muslin, terms it a dress, under whose slight veil our women continue to shew their shapes to the publico Muslin of Dacca constituted *Seriae restes* which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury and refinement"——Cotton manufacture of Great Britain by Dr. Ure.

প্রফেসার উইলসন লিখিয়াছেন, "তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বস্ত্রশিল্পে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।" (৩)। মিঃ ইয়েটস বলেন, "খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিশতাব্দীতে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র গ্রীস দেশে বিক্রীত হইত (৪)।

গ্রীক দার্শনিক এবং ব্যঙ্গ কাব্য লেখকগণ নানা বর্ণে রঞ্জিত চারুচিকণ বসন-সজ্জিত বিলাস ব্যসনামোদী গ্রীক যুবকগণের সমালোচনার তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, ঢাকার অতি সূক্ষ্ম ঝুনা মলমলই যে তাঁহাদিগের তীব্র সমালোচনার বিষয় তাহা তাহাদিগের লেখা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। Juvenal এই ক্ষুদ্র বস্ত্রকে "multitia" নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)।

প্রাচীন কালে ঢাকায় এরূপ সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত হইত যে, বিংশতি হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখানা বস্ত্র পক্ষি—পালথের ন্যায় ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া চলিত (২)।

এরয়েণ তদীয় Periplus of the Erythren sea" নামক নৌ সম্বন্ধীয় পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

সংস্কৃত কার্পাস শব্দে তুলা বুঝায়। হিব্রু কার্পাস পারসী কারবাস, এবং হিন্দি কাপাস একই অর্থ ব্যঞ্জক। কাপাস শব্দ Esther গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (৩)। কার্পাস হইতেই প্লিনির সময়ে Carpassum or Carpassian শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শব্দদ্বারা তৎকালে সমুদয় বস্ত্রই সূচিত হইত। ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়া নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, কার্পাস শব্দ এই কাপাসিয়া হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে (৪)।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লিখিত মোসলমান ভ্রমণকারীদ্বয়ের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতীয় মসলিন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ডাক্তার টেইলার বলেন যে, "উক্ত ভ্রমণকারীদ্বয় ঢাকার মসলিন সম্বন্ধে এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন (৫)।"

১৫১১ খ্রীঃ অব্দে Barbosa, ডুড়িয়া ও শাদা মসলিনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ১৫৬০ খ্রীঃ অব্দে "মোহিত" নামক গ্রন্থে মসলিন নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, ওড়না, এবং বহু মূল্য মলমল সাহির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মলমল সাহী ও মলমল খাস অভিন্ন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্ফ ফিচ লিখিয়াছেন, "সোনারগাঁ পরগণাতে ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়।"

সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ঢাকার মসলিনের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। দীল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তদীয় প্রিয়তমা মহিষীর মনোরঞ্জনার্থ ঢাকাই মসলিনের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। সম্রাট সাজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের সময়ে দাল্লীর বেগম মহলে ঢাকার মসলিন একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। যাহাতে এই মসলিন ভারতের বাহিরে না যাইতে পারে তজ্জন্য ইহারা রাজাদেশ প্রচার করিতে ও কুণ্ঠিত হন নাই।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, 'পারস্যের রাজদূত মহম্মদ আলিবেগ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে পারস্যের শাহকে উপহার দিবার নিমিত্ত ৬০ হাত দীর্ঘ্য একখানা মসলিন অতি ক্ষুদ্র একটি নারিকেলের মালার

(৩) See Introduction to the Rig-Veda Sanhita.

(৪) Testrenum autiguorum, l. c. page 341.

(১) Juvenal sat ii. 65.

(২) History of Cotton manufacture.

(৩) Book of Esther ch. iv. 5.

(৪) Dr Taylor's Topography of Dacca. page 163.

(৫) Account of India and China by two Mohomedan travellers.

মধ্যে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হস্ত প্রস্থ একখানা মসলিন অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র মধ্যদিয়া এক দিক হইতে অপর দিকে টানিয়া নেওয়া যাইত (১)।

১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত লম্বা একখানা মলমলের ওজন ৪ তোলা মাত্র হইত। এই প্রকার মলমল দীল্লীর বাদসাহদিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ও এই মলমল ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসর সোনারগাঁয়ে ১৭৫ হাত লম্বা একখানা মলমল প্রস্তুত হয়, উহার ওজন হইয়াছিল মাত্র ৪ তোলা। পূর্ব্বে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

মসলিনের সূতা "ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস" প্রণেতা অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে এক পাউণ্ড ওজনের এক দেটী সূতা তাহারা সমক্ষে পরিমাণ করা হইলে উহা ২৫০ মাইল লম্বা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কলের সূতা অপেক্ষা এই সূতা নরম, কিন্তু কলের প্রস্তুত মসলিন অপেক্ষা হস্ত নির্ম্মিত মসলিন শক্ত। এক জন তন্তুবায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে চরকায় সূতা কাটিয়া এক মাস সময় মধ্যে মাত্র অর্দ্ধ তোলা সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইত। এই প্রকার ১ তোলা সূতার মূল্য ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে ৮৲ মাত্র ছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে লিখিত Trigonometrical Survey গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ও মেঘনা এই নদ নদী ত্রয়ের সঙ্গম স্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপী প্রায় সমস্ত স্থানেই মসলিন প্রস্তুত হইত (২)।

(১) Taylor's Topography of Dacca. Page 163.

(২) *Vide* Trigonometrical Survey of India printed by order of the House of Commons, 15th April, 1851.

ঢাকা, সোণারগাঁও, ডোমরা ও তিতবর্দ্দি নাম স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইত। মুড়াপাড়া, বালিয়াপাড়া, এবং লক্ষ্যা নদীর তীরস্থ নানা গ্রামেও নানাপ্রকার মসলিন সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইত। আবদুল্লাপুরের রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্র তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল। কলাকোপা প্রভৃতি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। হলদীয়ার ছিট ও লুঙ্গি ঢাকা জেলায় সুপরিচিত ছিল। —ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

বাবুই *

বাবুই অনেকাংশে আদী চড়ুইর মত ছোট পাখী; গড়নও তাহারই অনুরূপ। চড়ুই এখন আমাদের ঘরের চালে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে; বাবুইও অনেক সময় আঙ্গিনার পার্শ্বে তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছে বাসা করিয়া থাকে।

বাবুইর ডানা বেশ শক্ত এবং হালকা। অন্যান্য পাখীর মত পা দুইটি পেটের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়। উড়িবার সময় কখন কখন ডানা গুটাইয়া বায়ুরাশির মধ্যে আপনাকে খুব জোরে ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া বাবুইর অভ্যাস। ইহাতে সে সহজেই বহু দূর যাইতে পারে।

বাবুইর পায় সম্মুখদিকে তিনটি ও পশ্চাদ্দিকে একটি অঙ্গুলি আছে। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে চারিটি পর্ব্ব। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ নখ আছে। চড়ুই পাখীর ঠোঁটের মত হইলেও বাবুইর ঠোঁট আর একটু সরু এবং ধারাল।

বাবুইর শরীরের বর্ণ সম্বন্ধে একটু গোলে পড়িয়াছি। আমাদের দেশে "কার্ত্তিকেয়ের ব্রত" উপলক্ষে মেয়েরা যে গান করেন তাহাতে বাবুইর বর্ণনা এইরূপ—

* গায়ক পাখী হইতে উদ্ধৃত।

"এক বাবুই কালীয়া
এক বাবুই ধলীয়া (ধবল)
এক বাবুইর কপালে তিলক।" †

আমরা কালো বাবুই দেখি নাই ; খাঁটি সাদা বাবুইও দেখি নাই। আমরা সাধারণতঃ যে বাবুই দেখিয়া থাকি তাহার শরীরের বর্ণ মেটে সাদা, ডানার বর্ণ মেটে সাদার উপর ধূম্র আভাযুক্ত, তাহাতে স্থানে স্থানে ধূমল রেখাগুলি একটু স্পষ্ট। মাদী চড়ুইর দেহের বর্ণের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ চড়ুই আর বাবুই এক বংশের সন্তান। বাবুইর কপালে হলদা রঙ্গের একটা তিলক আছে। পাখীর মধ্যে বাবুই বৈষ্ণব কি না ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাহাকে আমরা আমিষ ভক্ষণ করিতে কখনও দেখি নাই। বাবুইর সঙ্গে বৈষ্ণবের একটু সাদৃশ্য যে না আছে তা নয়। ইহারা বাসায় ছুটিয়া আসিয়া সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে মহোল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া উঠে।

যে গাছের পাতার অগ্রভাগ সরু এবং একটু আলগা, সেই পাতায় বাবুই তাহার বাসা ঝুলাইয়া দেয়। এজন্যই তাল, নারিকেল, সুপারি কখন বা বাঁশের পাতায় বাবুই বাসা ঝুলায়। ইহারা একাকী বাস করিতে ভালবাসে না, দলবলে বাস করাই ইহাদের স্বভাব।

বাসা তৈয়ার করিতে বাবুইর যথেষ্ট ওস্তাদী আছে ; খুব ভাল দরজীও ইহার শিক্ষা নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। ধানের কাঁচা পাতা, সুপারির পাতা, কখন বা কলার পাতা ঠোঁটে কাটিয়া তাহা দ্বারা বাসা তৈয়ার করে। যখন তাল বা নারিকেলের পাতায় বাসা বুনিতে আরম্ভ করে তখন সেই সবুজ বর্ণের বাসাটি বড় সুন্দর দেখায়। অতি দ্রুত কাজ করিয়া শীঘ্রই বাবুই তাহার বাসার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলে। ঠোঁটের সাহায্যে এমন তাড়াতাড়ি বাসা বুনিতে পারে যে, তাহা দেখিলে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের জীব সৃষ্টির বৈচিত্র্য ভাবিয়া আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

† লেখক এই সমুদয় গীত সংগ্রহ করিয়া "মায়ের গান" নামে প্রকাশ করিতেছেন। প্রঃ সং।

দেশে প্রবাদ আছে একগাছি কুটা ও না ছিঁড়িয়া যে বাবুইর বাসাটা খুলিতে পারিবে সে ঐ বাসার মধ্যে একটা "সোনার সূঁচ পাইবে।" প্রবাদটা বড় অলীক নয়। বাবুই সোনার সূঁচ সংগ্রহ করিয়া রাখুক আর নাই রাখুক তাহার সুগ্রথিত বাসা খুলিবার মত ধৈর্য্য যাহার আছে, সে এক দিন সোনার সূঁচের অধিকারী হয় বৈ কি? ছেলে বেলায় অনেক বাবুইর বাসা খুলিতে কত জনে চেষ্টা করিয়াছে দুর্ভাগ্য ক্রমে কেহই সোনার সূঁচের অধিকারী হইল না।

বাবুই দুই রকম বাসা নির্ম্মাণ করে। একটা ডিম পাড়িবার জন্য আর একটা বৈঠকখানা। প্রথমে বৈঠকখানাটা তৈয়ার করিয়া বাবুই আপনার স্বত্ব পাকা করিয়া লয়। চৈত্র মাসের শেষ ভাগে যখন বঙ্গভূমির মাঠগুলি ধানের শ্যামলতায় অপূর্ব্ব শোভার আধার হইয়া উঠে, তখন বাবুইর শুভাগমন হয় এবং বাসা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণী ফসল (ধান) উঠিলেই ইহারা বিদায় গ্রহণ করে। শীত কালে বাবুইর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বাসা নির্ম্মাণ করিয়া উহার ভিতরের দিকটা ঠিক খিলান করা মন্দিরের মত করিয়া তোলে। নিম্নে ঐ ঘাস পাতা দিয়া একটা দাঁড় তৈয়ার করিয়া উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই বাবুইর বৈঠকখানা। প্রবল ঝড়েও সহসা ইহাদের বাসা খসিয়া পড়ে না। বর্ষার শেষে বাবুই ডিম পাড়ে। তাহার পূর্ব্বেই তদুপযোগী বাসা নির্ম্মাণ করে। সেই বাসাগুলির এক ধারে ডিম রাখিবার এবং একটি পাখী সেখানে বসিয়া ডিমে তা দিবার উপযোগী স্থান করে ; ঐ স্থানটি কোমল এবং বেশ গরম। অপর পার্শ্বে দ্বার পথ। দ্বার পথ নীচের দিকে এবং উহা অত্যন্ত লম্বা—প্রায় হাতীর শুঁড়ের মত করিয়া নির্ম্মিত। যাহাতে অন্য পক্ষী সহজে ছানার অনিষ্ট করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যও আছে, এবং যাহাতে বৃষ্টি বাতাসে শাবকের গায়ে ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে এই উদ্দেশ্যও আছে। এই শ্রেণীর কোনও বাসার পার্শ্বদেশেও দরজা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। নীচের দিকে বাসার মুখ

রাখাই নিরাপদজনক। ইহারা এক সময়ে ৩।৪টি ডিম পাড়ে। কেহ কেহ বলেন বাবুই ফাল্গুনের প্রথম ভাগে তাহার নিজ দেশে ডিম পাড়ে, সেই ছানা উড়িতে শিখিলে তাহাদিগকে লইয়া এদেশে নিমন্ত্রণ খাইতে আইসে। কোনও কোনও পক্ষী বৎসর দুই বার ডিম পাড়ে তবে বাবুইর সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

বাবুই ধানের সর্ব্বনাশ করে। আশু ধান্যের যত অনিষ্ট না করুক আমন প্রভৃতি হৈমন্তিক ধান্যের সময় বাবুইর অত্যাচারে গৃহস্থকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। শত শত বাবুই ঝাঁকে ঝাঁকে ধান-ক্ষেতে পড়ে এবং ধানের ছড়া কাটিয়া কতক ক্ষেতে ফেলিয়া দেয়, কতক মুখে করিয়া লইয়া গিয়া শাবকদিগকে খাওয়ায়। বাবুইর অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য ক্ষেতে একটা বাঁশ পুতিয়া একখানি টিন টাঙ্গাইয়া রাখে; ঐ টিনের সঙ্গে দুই খানি বংশদণ্ড লম্বিত থাকে। টিনের সঙ্গে একগাছি লম্বা দড়ী বাঁধিয়া কৃষক বহু দূরে ছায়ায় কিম্বা আপন কুটীরে বসিয়া থাকে; বাবুইর ঝাঁক ক্ষেতে পড়িলে ঐ দড়িতে টান দেয়—টিনের শব্দে ভয় পাইয়া বাবুই পলাইয়া যায়।

বাবুইর অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া কার্ত্তিক পূজার রাত্রিতে মহিলাগণ গান করেন—

"মরি রে—
ও আরে বাবুই রে,
তুই মোর পাক্‌না ধান খাইলি!"

এর পরেই আবার গায়িতেছেন—

"এক্‌লা পুতের বৌ সাত ক্ষেত রাখে"

ইহাতেই বেশ বুঝা যায় একটু ভয় পাইলেই বাবুই পলায়ন করে।

বাবুইর পরিত্যক্ত শুষ্ক বাসাগুলি "পাপোষ" রূপে ব্যবহৃত হইত। শিক্ষা সভ্যতার হুজুগে এখন সহর হইতে পয়সায় কেনা পাপোষ পল্লীবাসিনীদিগের ব্যবহারে আসিতেছে। হাতীর গদী নির্ম্মাণেও বাবুইর বাসা অতি উপযোগী।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান বাবুই ধরিয়া খায়। ডিম পাড়িলেই একটা বাবুই বাসায় থাকিয়া ডিমে তা দেয়, অপর বাবুই তাহার আহার যোগায়। শিকারিগণ লম্বা একটি বাঁশের মাথায় একখানি জাল দিয়া ঐ জাল বাবুইর বাসার মুখে ধীরে ধীরে রাখিয়া দেয়। যাতায়াত কালে ঐ জালে আটকাইয়া বাবুই সটান ভূপতিত হয় এবং শিকারীর রন্ধনশালায় যাইয়া সদগতি লাভ করে।

বাবুইর গান একটু চড়া! বাসা নির্ম্মাণ কালে এবং বাসায় প্রবেশ কালে ইহারা সম্মিলিত কণ্ঠে যে গান গায় তাহা অতি সুমধুর। গানের শেষে ইহারা যে লম্বা রাগিণীতে 'মান' দেয় তাহা অতি চমৎকার!

এই বন-বিহঙ্গ আহার্য্য বা বাসা নির্ম্মাণের উপকরণ লইয়া যখন কুটীরে আসিয়া আনন্দ সঙ্গীত আরম্ভ করে তখন মনে হয় আপন ভগ্ন কুটীরখানি কত শান্তির আলয়, কত সুখের স্থান! ইতর প্রাণীরাও তাহা অনুভব করিতে পারে!

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিত রামায়ণ--সুন্দরাকাণ্ড।

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।)

ভণিতাকার—কালিকাপ্রসাদ দাস।

প্রতিলিপিকার—গৌরমোহন নাথ।

প্রতিলিপির সময়—১৭০১ শক (১১৮৬ সাল), ২৬শে কার্ত্তিক বুধবার। পুঁথিখানি ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর মহকুমায় গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত। তুলট কাগজের ৮২ পত্রে বা ১৬৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

শ্লোক সংখ্যা ১৯৪৪।

[কালের অবিরাম স্রোতে পড়িয়া দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি হইতেছে সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতি যে উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে বোধ হয় সুধীগণের মতদ্বৈধ নাই। অতীত বঙ্গের তুলনায় বর্ত্তমান বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালীজাতি উন্নত কি অবনত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই বলিলেই হয়; কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গেলেই অন্ধকার দেখিতে হয়। এই অবস্থায় পুরাতন পুঁথি, শিলালিপি ও তাম্রফলকলিপির সাহায্য ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। পুরাতত্ত্ব আলোচনায় লাভ অনেক। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় জীবনের উন্মেষের যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা অন্যতম। যে দেশ, যে জাতি, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করে না, প্রাচীনের সম্মান জানে না, প্রাচীনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, সে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত, সে জাতির অভ্যুদয় অনন্ত তিমিরগর্ভে নিহিত।

আমরা যে সমুদয় গ্রন্থ পাইয়াছি তন্মধ্যে আজ এক খানির বিষয় আলোচনা করিব।]

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু বর্ত্তমান সনের সাহিত্য পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারগণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, কবি অদ্ভুতাচার্য্যের নিবাস পাবনা জিলায় সোণাবাজু পরগণান্বিত সাঁতোল গ্রামের নিকটবর্ত্তী বরবরিয়া গ্রামে। ইহাতে আরও জানা যায় যে, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ রংপুর সাহিত্যপারিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে এবং কবি প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। মিঃ বুকানন হামিলটন তদীয় রংপুর বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, উত্তরবঙ্গে এই রামায়ণের বহুল প্রচার ছিল; ঐ প্রদেশের লোকে এই রাময়ণ ব্যতীত অন্য রামায়ণের নাম খুব কম জানিত।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ১৩১৩ সনে প্রকাশিত ১ম সংখ্যা পাঠে জানা যায় যে, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের অযোধ্যা, অরণ্য ও উত্তরকাণ্ড মাত্র উক্ত পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে। "সুন্দরাকাণ্ড" আমার হস্তগত হইয়াছে; ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

"অথ সুন্দরাকাণ্ড লিখ্যতে" এই অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে এই বাঙ্গালা ঐতিহাসিক কাব্যখানা আরব্ধ হইয়াছে। 'সুন্দরা' পদটি ব্যাকরণ সম্মত নয়; কবি কৃত্তিবাস এই পদটি প্রথমে ব্যবহার করিয়াছেন। এই পদের প্রয়োগে কবি অদ্ভুতাচার্য্য বঙ্গীয় প্রাচীন কবি কৃত্তিবাসের অসঙ্গত অনুকরণ করিয়াছেন। বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী কিষ্কিন্ধ্যা ও পরবর্ত্তী লঙ্কাকাণ্ডের সহিত উচ্চারণগত সামঞ্জস্য রাখিতে এই শব্দটিতে আকার সংযোজিত হইয়া থাকিবে।

কাণ্ডের নানা স্থানে "অদ্‌ভূত আচার্য্যের কবিত্য মধুর ভারতি।" "অদ্ভুত আচার্য্যের মুখে বোলে রামচন্দ্র।" এবং কাণ্ডের শেষভাগে "অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিতং রামাবতারে সেতুবন্ধ প্রকরণং সমাপ্তঃ।" ইত্যাদি দৃষ্টে নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই কাণ্ড অদ্ভুতাচার্য্য বিরচিত। কাণ্ডের নানা স্থানে "নাচাড়ি," "গুঞ্জুরী," "পাঠমঞ্জরী" প্রভৃতির প্রয়োগে বোধ হয় যে, এই কাণ্ড গীত হইত; যে ছন্দে গীত হইত তাহাকে "নাচাড়ি" বলা যাইত, এবং গুঞ্জরী, পাঠমঞ্জরী প্রভৃতি রাগে এই "সুন্দরাকাণ্ড" পালা গীত হইত। কাল ক্রমে কালিকাপ্রসাদ দাস এই পালাটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অনন্তর এই গ্রন্থ প্রতিলিপিকার গৌরমোহন নাথের হস্তগত হয়; তিনি ইহা ১৭০১ শকে ২৬শে কার্ত্তিক নকল করেন। এই কাণ্ড পাঠে বোধ হয় যে, ভণিতাকার কালিকাপ্রসাদের সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য ছিল। প্রতিলিপিকার গৌরমোহনের ভাষা-জ্ঞান ততোধিক। তিনি নিজের নামটিও শুদ্ধরূপে লিখিতে পারেন নাই। শকাব্দের অঙ্কটি দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাঁহার গণিতে জ্ঞানও তত্তুল্য। বহু প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে; অনেক পুস্তকেই দেখিতে পাই যে, এক

শতের পরে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা বসাইতে যাইয়া প্রতিলিপিকারগণ দুই শূন্য না দিয়া ছাড়েন নাই !

প্রতিলিপিকার গৌরমোহন ১৭০১ শকে বা ১১৮৬ সালে অর্থাৎ ১৩২ বৎসর পূর্ব্বে এই কাণ্ড নকল করিয়াছেন। ভণিতাকার কালিকাপ্রসাদ ইহার বহু পূর্ব্বে "সুন্দরাকাণ্ড" গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব অনুমান হয় যে, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কবি অদ্ভুতাচার্য্য "সুন্দরাকাণ্ড" রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তদীয় বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে (২য় সংস্করণ) ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, নিত্যানন্দ নামক ব্রাহ্মণই অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনিও অনুমান করেন যে, আদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কবি অদ্ভুতাচর্য্য ও ভণিতাকার কালিকাপ্রসাদ বঙ্গের কোন জিলার লোক এবং তাঁহারা কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা এই কাব্য পাঠে জানা যায় না। অদ্ভুতাচার্য্য যে সময়ে "সুন্দরাকাণ্ড" রচনা করেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই; বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের শুভ দিন সূচনা করিয়া তখনও ইংরেজ পাদ্রি ক্যারি সাহেব শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন নাই। এখনকার ন্যায় তখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে এত অল্প সময়ে সংবাদ বা গ্রন্থ প্রচারিত হইত না। সুতরাং অদ্ভুতাচার্য্যের 'সুন্দরাকাণ্ড' প্রতিলিপিকার গৌরমোহনের হস্তগত হইতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ কাল লাগিয়া থাকিবে।

গ্রন্থারম্ভের পরেই রামায়ণের কোন কাণ্ডে কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে কবি তাহা লিখিতেছেনঃ—

"আগ্য কাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতাদেবির বিহা।
অজ্যধ্যা ত্যাগিলা রাম ভরতেক রাজ্য দিয়া॥
অরণ্য কাণ্ডে প্রভু রাম হারাইলা প্রাণেশ্বরি।
কিস্কিন্ধাতে বালিবধ সুগ্রিব মিতালি॥
সুন্দরাতে সেতুবন্ধ রাম হইল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন বধ সিতা উর্দ্ধার॥
উত্তরাকাণ্ডেত রাম অজ্যধ্যার অধিপতি।
অদ্‌ভুত আচার্য্যের কবিত্য মধুর ভারতি॥"

উদ্ধৃত কবিতাতে ভরতকে অর্থে "ভরতেক" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপে কাব্যের অন্যান্য স্থলে আমাকে অর্থে "আমাক" অধমকে অর্থে "অধমেক" সীতাকে অর্থে "সীতাক" ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আবার রাক্ষসীকে বা রাক্ষসীরে অর্থে "রাক্ষসির", মুখেতে অর্থে "মুখেত" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যুবরাজ, ডেওয়াইলাম, কর্ণ, হৃদয়, শুনিয়া, নিকট, ইত্যাদি শব্দের বানান নিতান্ত কৌতুকাবহ।

আসামী ভাষার বর্ণমালায় 'ব' ও 'র' এর যেরূপ আকার এই গ্রন্থে লিখিত উক্ত দুই বর্ণের আকারও ঠিক তদ্রূপ। ইহাতে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে বঙ্গীয় ও আসামী বর্ণমালা একরূপ ছিল, পরবর্ত্তী কালে বঙ্গীয় বর্ণমালায় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কিন্তু আসামী বর্ণমালা পূর্ব্ববৎ রহিয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতের 'উন্দুর' বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'ইন্দুর' হইয়াছে কিন্তু এই কবির সময় ইহা 'এন্দুর' ছিল। আমরা 'ভালবাসি' ব্যবহার করি; বরিশাল জিলায় 'মন্দবাসি'র ও প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই কাব্যে ভয়বাসি পদেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দেখিলাম অর্থে 'দেখিলু' পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কবির সময়ে উ বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত মিলিত হইবার কালে 'ব' এর আকার ধারণ করিত। এই 'দেখিলু' হইতে পশ্চিম বঙ্গবাসিগণ ক্রিয়াপদটিকে 'দেখিনু' করিয়া লইয়াছেন, বোধ হয়। এই কাব্যে ভবিষ্যদর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের প্রয়োগে একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। মরিবে অর্থে 'মরিব' পাইবে অর্থে 'পাইব' ত্যজিবে অর্থে 'ত্যজিব' আসিবে অর্থে 'আসিব' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়। আর এতাদৃশ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঠক বর্গের ধৈর্য্য আক্রান্ত করিব না। এখন এই কাব্যের বর্ণিত ঘটনা

সমূহের সমালোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই কাণ্ডের প্রারম্ভেই অঙ্গদ ও সম্পাতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই ঘটনাটি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত।

তৎপর সম্পাতির মুখে রাবণের আবাসস্থান অবগত হইয়া বানরগণ সমুদ্র তীরে গমন করিল, কিন্তু অপার সাগর ও উহার উত্তালতরঙ্গমালা দেখিয়া তাহারা ভীত হইল। তাহারা সমুদ্র পার হইবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং স্ব স্ব পরাক্রম ও গতিশক্তি বর্ণন করিতে লাগিল। আর্ষ রামায়ণেও এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

মন্ত্রী জাম্ববান, হনুমানের জন্মাবধি অমরত্ব লাভ পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা বর্ণন করিলে স্থির হইল যে, হনুমানই সীতাদেবীর অন্বেষণে একাকী লঙ্কায় প্রবেশ করিবেন। হনুমান রামচন্দ্রের নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গুরীয়ক লইয়া সমুদ্র পার হইবার জন্য শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

"শরীর বাড়াইল বীর শতেক প্রহর।"

কবি সময়ের পরিমাণ দ্বারা পাঠকদিগকে শরীরের আয়তন নির্ণয় করিয়া লইতে বলিতেছেন। কৃত্তিবাস কিন্তু পাঠকদিগকে এত গোলে ফেলেন নাই; তদীয় রামায়ণে হনুমানের বর্দ্ধিত শরীর দৈর্ঘ্যে ২০ ও প্রস্থে ১০ যোজন।

সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কবিগণ বর্ণনার অতিরঞ্জনে সুখ লাভ করেন; বর্ত্তমান কবির বর্ণনায়ও এ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। হনুমান লম্ফ দিয়া সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পর্ব্বতে উঠিলেন: পর্ব্বত কম্পিত হইল, অধিস্থিত পশু, পক্ষী তির্য্যক প্রভৃতি ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। আর্ষ রামায়ণে এপর্য্যন্ত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত।

হনুমান লম্ফ দিয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াই তিনি উগ্রচণ্ডাদেবীর সম্মুখে পড়েন। উগ্রচণ্ডা রাবণের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। এই দেবীর সহিত হনুমানের ছোট খাট একটি যুদ্ধ হয়; যুদ্ধান্তে উভয়ের পরিচয় হয় এবং পরিচয়ের পরে দেবী শাপ মুক্ত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসে গমন করেন। এই সমুদয় ঘটনার সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার ঐক্য আছে কিন্তু আর্ষ রামায়ণে উগ্রচণ্ডার নাম দৃষ্ট হয় না। তথায় রাক্ষসরূপধারিণী লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্য উভয়ের গ্রন্থেই অনেক নূতন ঘটনা সংযোজিত হইয়াছে।

উগ্রচণ্ডার প্রস্থানের পর হনুমান গবাক্ষ-পথে রাবণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় মন্দোদরীকে দেখিয়া হনুমানের সীতা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। কৃত্তিবাসী ও আর্ষ রামায়ণেও হনুমানের এতাদৃশ ভ্রমের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

রাবণের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি অবশেষে বিভীষণের পুরীতে প্রবেশ করেন। বিভীষণের পত্নী সরমাকে নিদ্রিত দেখিয়া হনুমান তাঁহার কর্ণে গিয়া এক স্বপ্ন দেখান। সরমা স্বপ্ন বিবরণ বিভীষণকে জানাইলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কৃত্তিবাসী বা আর্ষ রামায়ণে দৃষ্ট হয় না; ইহা কবির নূতন সৃষ্টি।

সরমা স্বপ্ন দেখিয়া বিভীষণকে জানাইলেন।
"সরমা রোলয়ে স্বপ্ন অতি ভয়ঙ্কর।
সিতাকে চাহিতে এথা আইল বানর॥
হনুমান নাম তার পবন কোঙর।
রামের কিঙ্কর সেহি সুগ্রিবের চর॥ ইত্যাদি

হনুমান, বিভীষণ ও সরমার কথোপকথনেও সীতার অবস্থান সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তিতমনে বিভীষণের পুরী ত্যাগ করিয়া রাজ পথে নামিলেন।

সীতান্বেষণে হনুমান নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি দুই প্রহর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর অদূরে অশোক বন দেখিয়া তিনি তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

এখানে তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি সীতাদেবীকে দেখিতে পাইলেন। এখানে কবি অশোকবণের বর্ণনা করিয়াছেন; বর্ণনাটি সুন্দর হইলেও একটুক অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে। কবি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হনুমান অর্দ্ধ রাত্রে অশোকবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কবি বর্ণনা করিতেছেন,—পুষ্প লোভে অলিগণ নানা কেলি করিতেছে, তরুগণ ফলিত ও পুষ্পিত রহিয়াছে, কোকিল কলরব করিতেছে এবং ভ্রমরেরা মধু পান করিতেছে। অর্দ্ধরাত্রে বৃক্ষগণ ফলিত থাকে থাকুক, এবং তাহারা না হয় পুষ্পিত থাকুক, তাহাতে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু অলিগণ কেলি করিতেছে, কোকিল কলরব করিতেছে এবং ভ্রমর মধু পান করিতেছে, এরূপ বর্ণনায় আমাদের আপত্তি আছে।

হনুমান সীতার শোক-মলিন দেহ-যষ্টিতেও অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। এমন সময় সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রাবণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া শোক-বিশীর্ণদেহা আলুলায়িতকুন্তলা সীতা ভয়ে অচেতনপ্রায় হইলেন। রাবণ নানা প্রকার মধুর বচনে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে কবি রাবণের দশ মুখের বর্ণন করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণের যে যে স্থানে রাবণের দেহের বর্ণনা আছে তত্তৎস্থলে তাঁহার মানুষের ন্যায় এক মস্তক ও দুই হস্তেরই বর্ণনা দেখা যায়। সত্য বটে কোন কোন স্থলে "দশস্কন্ধ" পদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা বলবত্তা সূচক মনে হয়।

সিংহিকা প্রভৃতি চেড়ীগণ সীতাকে ভয় দেখাইতে লাগিল কিন্তু তিনি ভীত না হইয়া সময়োচিত প্রত্যুত্তর দান করিলেন। সীতা নিরুপায় হইয়া ক্রোধে ও অভিমানে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ত্রিজটা-নাম্নী রাক্ষসী উপস্থিত হইয়া চেড়াদিগকে নিবৃত্ত করিল। ত্রিজটা এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চেড়ী দিগকে বলিল। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া চেড়ীরা ভীত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া সীতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। ত্রিজটার স্বপ্ন কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্ন বৃত্তান্ত অন্যরূপ।

হনুমান বৃক্ষশাখায় বসিয়া ত্রিজটা-কথিত স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিলেন। সীতার দৃষ্টি হঠাৎ সেই বৃক্ষশাখায় পতিত হইল। হনুমান লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং রাম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সীতা প্রথমে মনে করিলেন এ রাক্ষসের মায়া, বানর নহে; কিন্তু হনুমানের মুখে অতীত ঘটনা শ্রবণে এবং তাঁহার হস্তে রামের অঙ্গুরীয়ক দর্শনে সীতার প্রত্যয় জন্মিল। উভয়ে অনেক ক্ষণ বিশ্রম্ভালাপ হইল। সীতার নিকট বিদায় লইয়া হনুমান মধুবন নামক রাবণের প্রমোদ উদ্যান ভগ্ন করেন। ইহাতে রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ হয়। মকরাক্ষের পুত্র অজয় হনুমানের হস্তে নিহত হইলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এখানে অজয়ের যুদ্ধ বা মৃত্যু বর্ণিত হয় নাই।

অজয়ের মৃত্যুর পর রাবণ-নন্দন অক্ষয়কুমার হনুমানের হস্তে নিহত হন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের এই পুত্রের নাম "অক্ষ", অক্ষয়কুমার নহে।

অবশেষে হনুমান রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিতের হস্তে বন্দী হইয়া রাজ সভায় নীত হন। রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা হনুমানের লাঙ্গুলে বস্ত্র জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। লেজের আগুনে হনুমান লঙ্কা পোড়াইয়া ছারখার করিলেন, এবং লঙ্কা দগ্ধ করিয়া সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। লঙ্কার ঘর দরজাই কেবল পোড়ে নাই, রাবণের মুখ, গোঁফ, দাড়িও পুড়িয়াছিল; তিনি কুড়ি হাতে পোড়া মুখ মুছিতে মুছিতে দৌড়িয়াছিলেন। এখানে লেজ অর্থে "লেঙ্গ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতিলিপিকারের নিবাস ময়মনসিংহ জিলায় জামালপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে; এই গ্রাম হইতেই এই গ্রন্থখানা সংগৃহীত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জিলার লেঙ্গ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রতিলিপিকার গৌরমোহন নকল করিতে যাইয়া এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না নির্ণয় করা কঠিন। হনুমানের লেজের আগুনে রাবণের নিতান্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। বর্ণনাটি যতই কৌতুকাবহ হউক না কেন, কাব্যের প্রতি নায়কের চরিত্রের হীনতা সাধন করা কবির পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

বানরগণের লেজের বর্ণনা যে কেবল অদ্ভুতাচার্য্যই করিয়াছেন তাহা নহে, কবি কৃত্তিবাস এবং মহর্ষি বাল্মীকি ও স্ব স্ব রামায়ণে বানরদিগকে লাঙ্গুল বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে বানরগণের আবাস গৃহ ও তাহাদের আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদিগকে সুসভ্য মানব বলিয়াই মনে হয়।

হনুমান সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন; সীতা তাঁহার হস্তে নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান পূর্ব্ববৎ লম্ফ প্রদানে সমুদ্র পার হইয়া বানর সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং অঙ্গদাদি সেনাপতি দিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি সীতা দর্শনাদি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে বানর সৈন্য-গণ আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হনুমানাদি বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিষ্কিন্ধ্যাতেও একটি সুন্দর মধুবন আছে; ইহা বানর রাজ সুগ্রীবের প্রমোদ উদ্যান। অঙ্গদ বানরদিগকে মধুবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দে মধু পান করিতে আদেশ দিলেন। অচিরেই রাম, লক্ষ্মণও সুগ্রীবের সহিত হনুমানাদির সাক্ষাৎ হইল। হনুমান সীতাপ্রদত্ত চূড়ামণি রামের হস্তে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অনন্তর লঙ্কা আক্রমণের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দেবতারা চিন্তিত হইলেন, যে হেতু তাঁহারা জানিতেন পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে লঙ্কা জয় করা অসম্ভব হইবে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাম পার্ব্বতীর পূজা করিতে সম্মত হইলেন; ব্রহ্মা পূজাবিধি বলিয়া দিলেন, তাঁহার আদেশে দেব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন। হনুমানাহৃত ফলপুষ্পে শ্রীরাম পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করিলেন। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী লঙ্কাত্যাগে সম্মত হইলেন এবং রাবণ বধে সম্মতি দিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। আর্ষ রামায়ণে পার্ব্বতী পূজাদি ব্যাপার দৃষ্ট হয় না; কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই কাণ্ডে পার্ব্বতীর পূজা বর্ণিত হয় নাই, শিবপূজার বর্ণনা আছে। কিন্তু কৃত্তিবাস ও পার্ব্বতীর পূজা বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু সুন্দরা কাণ্ডে নহে, লঙ্কাকাণ্ডে— রাবণ বধের প্রক্কালে। কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্য উভয়ের রামায়ণেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনন্তর বানরসৈন্য লইয়া রাম সুগ্রীবাদি সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন। আর্ষ রামায়ণে এখানেই সুন্দরকাণ্ড শেষ হইয়াছে। এদিকে লঙ্কায় আর একটি ঘটনা ঘটিল। হনুমান প্রদত্ত অগ্নিতে ১৮ দিন পর্য্যন্ত লঙ্কা পুড়িয়া ছারখার হইল। রাবণ-জননী নিকষা সীতাকে ফিরাইয়া দিতে পুত্রকে অনুরোধ করিলেন; নিকষার নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ জননীর নাম কৈকসী নিকষা নহে। বিভীষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। বিভীষণ অবমানিত হইয়া ৪জন সহচর সহ লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসে পার্ব্বতী সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৪জন সহচরসহ বিভীষণের বহির্গমন ও কৈলাসে উপস্থিতির বিবরণ আর্ষ রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঘটনাটি এইরূপই বটে কিন্তু "অনুচর" শব্দ স্থলে "মন্ত্রী" শব্দ দেখা যায়। পার্ব্বতী বলিলেন যে, "যদি লঙ্কার রাজা হইতে চাও তবে রামের আশ্রয় লও, এখানে থাকিয়া তোমার কোন ফল হইবে না। পার্ব্বতীর পরামর্শে বিভীষণ রামের স্মরণ লইলেন। শ্রীরাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের আদেশে বানর গণের আহৃত প্রস্তর-পর্ব্বতে সমুদ্রের উপর সেতু

নির্ম্মিত হইল এবং বানরসৈন্য সহ রাম সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। এখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই কাণ্ডের কোন স্থলেই পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বাঙ্গালা ছন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যামৌনীর ব্রত।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত কি না, জানি না, যশোহর জেলার অনেক বালিকা বৈশাখ মাসে, সযত্নে এই ব্রত পালন করিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে, দিবাকর অস্তমিত হইলে, তারা সুন্দরীগণের লজ্জাহীনা দুই একটি স্ব স্ব অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে হাজির হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবোঢ়া বালিকা এক ঘটী জল ও এক খানা থালায় কিছু আতপ চাউল, দূর্ব্বা, সিন্দুর ও একটা অম্র হাতে লইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। প্রাঙ্গণের সেই অংশটুকু পূর্ব্বেই যথারীতি পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে জলপাত্রটি স্থাপন করিয়া তাহার গাত্রে ২টা ও তাহার সম্মুখে মৃত্তিকায় ৩টা, মনুষ্য প্রতিকৃতি সিন্দুর দ্বারা অঙ্কিত করে। তৎপরে উক্ত ছবিগুলির উপর চাউল দূর্ব্বা দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি মনে মনে পাঠ করে। মুখ ফুটিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবার যো নাই! পাঠকগণ মন্ত্রটি পাঠ করিলেই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। ব্রতিনীদের সকল ব্রতের লক্ষ্যই প্রায় একরূপ,—মন্ত্র যথা,—

পূর্ব্ব থেকে উঠ্‌লো মুণি পশ্চিমে যায়,
দেখ দেখ রাক্ষস, কে আসে, কে যায়,
সন্ধ্যামৌনী করে যে, সে আসে, সে যায়,
সন্ধ্যামৌনী করে কে ? সাত ভায়ের বোন সে।
কি চায়, কি পায় ? কোদাল কাটা ধন চায়।
আড়ি মাপা সিন্দুর চায়, ডোলপূর্ণ কৌটা চায়।
রাজচ্ছত্র ভাই চায়, কুলচ্ছত্র বাপ চায়।
দশের ভাজন পুত চায়, সভা উজল জামাই চায়।
কুলবতী বৌ চায়।

মন্ত্র-পাঠ শেষ হইল। অম্রটি হাতে লইয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল, ও জল পাত্রটি বেড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। ইত্যবসরে গগনের গায়ে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। তাহার অন্ততঃ ৭টা দেখা চাই। দেখিতে পাইলেই, ঘটের নিকট আসিয়া পুনরায় মনে মনে মন্ত্রটি পাঠ করে। হাতের আমটি এইবার পশ্চাদিকে মস্তকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়।

বলা বাহুল্য এপর্য্যন্ত ব্রতধারিণীকে মৌনী থাকিতে হয়। কথা কহিলেই ব্রত-ভঙ্গ হয়। অতঃপর ঘটী লইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নিজেকে বেষ্টন করিয়া ৭টি জলরেখা দেয়। তার পর যতক্ষণ না অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ জল-গণ্ডীর উপর অঙ্গুলী দ্বারা পথ আঁকিয়া দেয়, ততক্ষণ ব্রতিনীকে সেই বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধা থাকিতে হয়। কথা কহিবারও অধিকার হয় না।

১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ ও শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে ব্রত পালন করিতে হয়। ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি কারণে দৈবাৎ বিঘ্ন ঘটিলে ব্রত পণ্ড হয় না। পরদিন তাহার পূরণ চলে। দ্বিগুণ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার কোন কারণে নিজে রক্ষা করিতে না পারিলে, প্রতি-নিধির দ্বারাও উহা সম্পাদিত হইতে পারে। দৈবাৎ কোন দিন ঐ সময় আকাশে মেঘ সঞ্চার হইলে, যদি নক্ষত্র-দর্শনে বিঘ্ন ঘটে, তাহারও বিকল্প বিধি আছে। গৃহ মধ্য হইতে কেহ একটি প্রদীপ লইয়া ৭ বার দেখাইবেন, তাহাতেই নক্ষত্র-দর্শন হইবে।

চারি বর্ষ কাল এইরূপে ব্রত পালন করিতে হয়। যত দিন না ভ্রাতার বিবাহ হয়, তত দিন উহার প্রতিষ্ঠা বা শেষোদ্যাপন হইবার উপায় নাই। ভ্রাতৃ-বধূ ঘরে আসিলে, সাতটি স্বর্ণ তারকা তাহার ললাটে দিয়া মুখ দেখিয়া প্রথম কথা কহিতে হয়। ইহা হইলেই ব্রত সাঙ্গ হইল।

এই ত ব্রত! আধুনিক কোন কোন শিক্ষাভি- মানিনী-গণ এতাদৃশ অর্থহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শুনিয়া নিঃসন্দেহ

নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু ইহা ততদূর নিরর্থক নহে। অবশ্য এই সব ব্রতের বিধান কোন তন্ত্র পুরাণাদিতে নাই। কত কাল বঙ্গের বালিকা মহলে ইহা আসন পাইয়া আসিতেছে তাহাও স্থির করা যায় না। তবে ভাষা ও ভাব দৃষ্টে ইহা প্রাচীন সমাজের চিত্র বলিয়াই অনুমিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুসমাজের মহিলা-মহলে ব্রতাদির এতই প্রভাব ছিল যে, তাহাদের জীবন যেন ব্রতেরই সমষ্টি; আবাল্য এইরূপ ছাঁচেই প্রাচীন কালের লজ্জামাখা, স্নেহ-মাখা প্রতিমাগুলি গঠিত হইত, ফলত "কটু বাক্য কহিও না", "চুরি করা বড় দোষ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শিশু-হৃদয়ে ধারণা জন্মাইবার যদি আশা করা যায়, তবে বালিকাদের সুকোমল চিত্ত-ক্ষেত্রে এবম্বিধ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা যে বীজ উপ্ত হয়, তাহার ভাবফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।

সর্ব্ববিধ সুখের কামনা থাকিলেও ভ্রাতৃ-বধূকে সন্তুষ্ট করাই এই ব্রতটার প্রধান অঙ্গ। আশৈশব যদি ঐরূপ ধারণা চিত্তে বদ্ধমূল হয়, তবে বঙ্গ দেশীয়া শ্বাশুড়ী-ননদের কলঙ্ক অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হইতে পারে, এরূপ আশা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এইরূপ আড়ম্বরশূন্য সরল ছাঁচে গঠিত হইয়া তখন তাঁহারা যেরূপ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সুগৃহিণী হইতে পারিতেন আধুনিক বিলাসিনী গণের সেরূপ হওয়ার প্রত্যাশা বিড়ম্বনা কি না তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। পাঠিকাগণ হয়ত মনে মনে আমাকে গালি দিতেছেন কিন্তু স্থির চিত্তে স্ব স্ব মাতা, মাতামহী, পিতৃস্বসা প্রভৃতি প্রাচীনাগণের সরলতা, স্নেহ, মমতা, গৃহিণীপনা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর সমালোচনা করিলেই তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদের শিক্ষার বিরোধী নহি, তবে ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ-ভূষিতা, পতিব্রতা রমণীকে যদি সংসারের শান্তিবিধায়িনী মনে করিতে হয়, তবে প্রাচীনাগণের আসন নবীনাগণের উপরে দিতে হয়।

ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য সংযম শিক্ষা। নানারূপ ব্রতের দ্বারা সে শিক্ষা বঙ্গ-ললনাগণ বাল্যাবধি পাইত। এ প্রকার ব্রতের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে উল, মোজা প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এখনও কতক কতক সংগ্রহ চলে। কিছু কাল পরে নামও শুনা যাইবে না।

বাচালতা স্ত্রী-চরিত্রের একটা প্রধান কলঙ্ক। স্বামী-গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে যে ভাবে অবরোধবাসিনী হইতে হয়, তাহাতে মৌনী থাকার অভ্যাস বিশেষ অনুকূল। শুধু পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সংসার চলে না। এদেশে আজও সাধারণ অন্নশালায় সকলের অন্ন প্রস্তুত হয় না, বা ধাত্রী-স্তন্যে সন্তান লালন-পালনের প্রথা নাই। রমণী লইয়াই সংসার। দয়া, বিনয়, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা তাহাদের গুণ হওয়া আবশ্যক। গৃহিণীপনায় অনিপুণা, শুধু বিলাসিনী প্রমোদিনী লইয়া সংসার-যাপনের দিন দরিদ্র বঙ্গবাসীর হয় নাই। দয়া ও সতীত্বের আদর্শ-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ সেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা চায় না। অগ্রে গৃহিণী হইয়া কেহ বিদুষী হইতে পারেন, নতমুখে তাহার গুণ কীর্ত্তন করিব। আমরা রমণীগণের বিদ্যা-শিক্ষার অণুমাত্রও প্রতিকূল নহি, বা আধুনিক মহিলাগণের নিন্দা করিতেছি না। তাঁহারা তাঁহাদের চির-পূত আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী হউন, সর্ব্ব-প্রকারে বাঙ্গালীর গৃহিণী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। তাঁহাদের গৌরবই আমাদের চিরকাল সম্বল।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

গ্রন্থ সমালোচনা

৬। **চন্দ্রধর,** শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত, কলিকাতা, ৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর বিশ্বকোষ-প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ এক টাকা, আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত। এখানি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ। স্থানে স্থানে কল্পনা ও কবিত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং মাইকেল-প্রবর্ত্তিত ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ সফল হইয়াছে। আলোচ্য কাব্যের রচনায় গ্রন্থকার বিপুলা-লক্ষীন্দরের চির-প্রচলিত উপাখ্যানের অনুসরণ করেন নাই। শৈব চন্দ্রধর প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তথাপি তিনি মায়ার পূজা করিবেন না—

——"ধরিতে কি কালকূট কণ্ঠে অবশেষে
মন্থিনু চরণ-সিন্ধু নীলকণ্ঠ তব!
তুষ্ট যদি আশুতোষ মনসারে তুমি,
প্রচার অর্চ্চনা তার, এ প্রাণ থাকিতে
নমিবে না ও-চরণে তোমার সেবক।"

চন্দ্রধর অলীকের লোভে নিত্য বস্তুর প্রতি অবহেলা করিতে পারেন না, তিনি মায়ার পাশে বদ্ধ হইতে চাহেন না;—ইহাই হিন্দুর চরম লক্ষ্য। চন্দ্রধরের চরিত্রে এই লক্ষ্যের আলোক কবি উজ্জ্বল ভাবে পাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

"না পূজি মনসা যদি, ধন পুত্র সব
যাবে ফিরে—সে আদেশ; বল দেখি সতি
পূজিলে কি চিরদিন রহিবে সকলি?
তবে প্রিয়ে, এ অনিত্য অলীক স্বপনে
কেন মুগ্ধ হব আজি ত্যজি নিত্য পদ?"

কবি বিপুলার সতীত্ব-পরীক্ষারও উল্লেখ করেন নাই—

"——অধোমুখে সতী
বন্দিয়া রাণীর পদ উঠিলে তরীতে
মুহূর্ত্তে সমস্ত তরী হ'ল আদর্শন!"

বিপুলা মনসার বরে পুনর্জীবিত পতি ও ভাসুরগণ সঙ্গে পুনরায় দেবলোকে ফিরিয়া আসিলেন; রাণী সনকা প্রিয়তমা সতী বধূ ও প্রাণ-প্রিয় পুত্রগণের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া—

"বসিলা সৈকতে——
হেরি বিশ্বময় পুত্র বিশ্বময় বধূ
অন্তিম শয়নে মুগ্ধা মুদিলা নয়ন!"

কিন্তু এই সকল দুর্ব্বিপাকেও চন্দ্রধরের হৃদয় টলিল না—"ধ্যানমগ্ন চন্দ্রধর বাহ্য জ্ঞানহীন।" পরিশেষে—

"হিরণ্ময় জ্যোতিঃখণ্ড দিগন্ত উজলি
স্নিগ্ধ ক'রে, বহি গন্ধ নামিয়া চকিতে
শূন্য-পথে অন্তর্ধান হইল নিমেষে
মিশায়ে চাঁদের অণু কণায় কণায়।"

কবির মতে "মনুষ্যত্বের উপর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা।" সুতরাং এই আদর্শ লইয়া তিনি কবিগণের ক্ষুণ্ণ পন্থায় না চলিয়া চন্দ্রধরের চরিত্রকে মাহাত্ম্য-গৌরবে অঙ্গহীন হইতে দেন নাই। বিপুলার চরিত্র চিত্রটি আত্ম-নিষ্ঠায়, কোমলতায়, দেব-ভক্তিতে ও পতি-সেবায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার "প্রেম মৃত্যুঞ্জয়" মহামন্ত্রের বলে ভোলানাথও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজের উন্নতি বাঞ্ছনীয়। কাগজ ও গঠনের উন্নতি না হইলে গ্রন্থকারের এইরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব-সম্পদ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে; কারণ আজ কাল সোনার পাতে মোড়া ভস্মস্তূপের আদর হয়, অথচ গঠনের পারিপাট্য ও আবরণের চাক্‌চক্য না থাকিলে খাঁটি জিনিষও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

শান্তিময়।

৭। **গীতালহরী**—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাল-লয় সংযুক্ত বাঙ্গলা সঙ্গীতানুবাদ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত; কলিকাতা, ৪৪।১ নং মলঙ্গা লেন হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ বার আনা। আকার ডবলক্রাউন, ষোড়শাংশিত,

১৬১ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা ভাল।

গীতা আমাদের শাস্ত্ররত্ন। "জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তত্তত্ত্বমিতি কথ্যতে।" সুতরাং আমরা যোগেন্দ্র বাবুর "গীতালহরীর" প্রকাশে প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করিতেছি। সংস্কৃত গীতা সকলের সহজবোধ্য নহে। অনুবাদে মূলের সম্যক্ অভিব্যক্তি না হইলেও উহা পাঠে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে অনেকটা জ্ঞান জন্মে, সন্দেহ নাই।

গান বড়ই চিত্তাকর্ষক, সুতরাং সহজাধিগম্য। "গানাৎ পরতরং নহি।" গানে যেমন প্রকৃত জ্ঞানের কঠোর তত্ত্ব গুলিও অল্পায়াসে অন্তরের অন্তস্তলে অলক্ষিতে প্রবেশ লাভ করে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তাই সাধন-মার্গে গানকে প্রধানতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে যোগেন্দ্র বাবু তাল-লয় সংযোগে সঙ্গীতের ভাষায় শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। মূল গীতার শ্লোকাবলীর সহিত অনুবাদের প্রত্যেকটি শ্লোক মিলাইয়া পাঠ করা যাইতে পারে। অনুবাদের প্রাঞ্জলতা প্রদর্শনার্থ নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো. ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২২০॥

না হয় তাহার জনম মরণ
পুনর্জ্জন্ম, আর না হয় বর্দ্ধন,
আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ
• না হয় বিনাশ দেহের পতনে॥ ২।২০

গ্রন্থের স্থানে স্থানে দু চারিটি শব্দের পুনঃপ্রয়োগ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, সঙ্গীতের ভাষায় উহা দূষণীয় নহে। আমরা আশা করি, অচিরেই গীতালহরীর বহুল প্রচারে বঙ্গের প্রতি গৃহ গীতাতত্ত্বের পবিত্র সঙ্গীতে পুণ্যময় হইয়া উঠিবে।

সদানন্দ।

৮। মঞ্জরী, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম,এ, বি, এল প্রণীত, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে সিটি বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, আর্ট প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য আট আনা; আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত, ১০৮ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে অতি পরিষ্কার ছাপা, নূতন ধরণের এইরূপ বাঁধা বেশ রুচি সঙ্গত ও সম্পূর্ণ আধুনিক।

এখানি একখানা গল্পের বই; অনেকগুলি গল্পই প্রতিভা, ভারতী ও মৃণ্ময়ীতে প্রকাশিত হইয়াছে-সুতরাং এ সম্বন্ধে সবিশেষ অলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে আমরা জানি যে, প্রতিভার অনেক গ্রাহক সাগ্রহে গিরীন্দ্র বাবুর গল্পের প্রতীক্ষা করিতেন। এই পুস্তকের একটা বিশেষত্ব এই যে, কয়েকটি গল্পে "পতিতা পুণ্য পথ ভ্রষ্টার চিত্র" অঙ্কিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপ চিত্রাঙ্কনে আপত্তি করেন তাহাদের তুষ্টির জন্য স্বয়ং গ্রন্থকারই পূর্ব্ব ভাবে বলিয়াছেন—

সংসারে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে ইহাদিগকে আমি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি না। সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহূর্ত্তের উত্তেজনা বা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই হয়ত তাহার জন্য দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে, এবং এমন যদি কেহ উদারহৃদয় মহানুভব থাকেন যাঁহারা তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার হয়ত তাহাদিগকে আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে বা প্রেমময়ী নারীরূপে ফিরিয়া পাইতে পারে। পাপ দৃঢ় সংস্কার-বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পতনের প্রারম্ভেই যদি ক্ষমা তাহাকে উদ্ধার করে, তাহা হইলে সে উদ্ধার ব্যর্থ হয় না, কৃতজ্ঞতায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায় তাহা পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গলময় হইয়া উঠে।"—ইহার উপর এসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। সাহিত্য শুধু বিদ্যালয়ের বালকের জন্য নহে, যিনি সাহিত্যের সব দিকটাই চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সমাজকে দেখাইতে পারেন,

সংস্কার, উন্নতি ও পরিণতির পন্থার আভাষ দিতে পারেন তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোক-হিত সাধন করেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থের ভাষা সরল, এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িলে সেগুলি যেন আমাদের চক্ষুর উপর ঘটিতেছে বলিয়া ধারণা হয়। ভাষার অন্তরে একটা বেশ তেজ ও জোর আছে। সমাজ ও পরিবার চিত্রের অঙ্কনগুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার গল্পগুলির অন্তরে করুণ রসের একটা গুপ্ত স্রোত পাঠকের হৃদয়কে তাহার অজ্ঞাতে সমবেদনায় সিক্ত করিয়া তুলে। সাহিত্য ভাণ্ডারে "মঞ্জরী" একটা নূতন শ্রীর সূচনা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

শান্তিময়।

৯। **শ্রীগৌরাঙ্গ**—শ্রীবিধূভূষণ সরকার বি এ, প্রণীত; আকার ডবলক্রাউন, অষ্টাংশিত, সিল্কের সুন্দর নয়নরঞ্জন বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা—ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য বার আনা —ছাপা পরিষ্কার কাগজ ভাল। এখানি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী। মহাপুরুষের জীবনচরিত যতই প্রকাশিত হয়, ততই সমাজের, জাতির ও দেশের মঙ্গল। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইতেছি।

নিমাই চৈতন্য মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পুস্তক খানিতে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও অনতিকাল পরবর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের রচিত পুস্তকাদি হইতে এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন—কিন্তু তিনি নিজের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাই অপরকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন।

সাতখানি হাফ্‌টোন্ ছবি দিয়া পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করা হইয়াছে—কিন্তু কোন কোন চিত্রে আর্টের অভাব দেখা গেল। "সংকীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর" (২৮ পৃ) ছবিখানি যতদূর স্মরণ হয় কোনও আর্টষ্টুডিওর ছবির প্রতিলিপি! চৈতন্যদেব স্বয়ং তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার ভক্তের দল সহসা মস্তক মুণ্ডন করিল কেন? "কণ্টকনগরে নিমাই চাঁদ" (৩৬ পৃ) কোনও একখানি ওলিওগ্রাফ ছবির ব্যর্থ অনুকরণ! "কাঙ্গালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া" চিত্রে (৬০ পৃ) কোনটি বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

সরস ও সহজ ভাষায় লিখিত মহাপুরুষের এই জীবনচরিতখানি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বড় উপযোগী হইয়াছে। হিন্দু ভক্তের গৃহে এই পুস্তকের আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅঃ—

১০। **শেরশাহ**—শ্রীরসিক চন্দ্র বসু প্রণীত, ঢাকা, কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আকার—রয়েল, চতুর্ব্বিংশাংশিত, ৮১পৃষ্ঠা, সিল্কের চক্‌চকে বাঁধাই, মূল্য ॥০ আনা; কাগজে বাঁধাই ।৶০ আনা, নীল কালির সুন্দর ছাপা, কাগজ মন্দ নহে।

এখানি ঐতিহাসিক চিত্র। যাঁহারা ইতিহাসে উপন্যাসের রস পাইতে চান গ্রন্থকার তাঁহাদের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষা আগা গোড়া সরল, আমাদের বালকবালিকারা পড়িয়া আমোদ পাইবে। আজ কাল পুস্তকে ছবি না দিলে নয় তাই গ্রন্থকার পাঁচ খানি ছবি দিয়াছেন—কিন্তু ছবিগুলি সমস্তই চিত্র-কলার কলঙ্ক।

শান্তিময়।

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ।

প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী।

ভগবানের অনুকম্পায় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ বর্দ্ধিত উৎসাহ ও কলেবর লইয়া নূতন বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

ইতিহাস ঃ—

বিগত বৎসরের প্রথম ভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ, ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, প্রমুখ কতিপয় সাহিত্যসেবীর উৎসাহে এই পরিষদের প্রথম অনুষ্ঠান হয়: সম্যক্ প্রচারাভাবে স্থানীয় শিক্ষিত জনমণ্ডলী এই শুভ অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত না হওয়ায় মাত্র একত্রিশ জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভ্য সংখ্যার স্বল্পতা প্রযুক্ত সভার অধিবেশন ও প্রবন্ধ পাঠ প্রথম কতক মাস হইয়া উঠে নাই; "প্রতিভা" নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদন ও প্রচার এবং নিজেদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায়ই সভার কর্ম্ম তখন পর্য্যবসিত হইত।

পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে, অন্য উনত্রিশ জন ঢাকাবাসী সাহিত্যসেবক পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করায়, আবশ্যকীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন, কর্ম্মে শৃঙ্খলাস্থাপন এবং কর্ম্মচারীনির্ব্বাচন সুসম্পন্ন হইয়া, সভার সমুদয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। ঢাকার বহু তন্দ্রালস্যপ্রপীড়িত শিক্ষিত ব্যক্তিগণমধ্যে তদবধি এক সাহিত্যিক জাগরণের সূচনা পরিলক্ষিত হইয়াছে; অযাচিত ভাবে দলেদলে সাহিত্যসেবক আসিয়া সাহিত্য জননীর পূজামণ্ডপে সম্মিলিত হইতেছেন।

এই পরিষদের প্রতি অধিবেশনে গড়ে আঠার জন করিয়া সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে।

সভ্য সংখ্যা ঃ—

বিগত পৌষ মাসের প্রারম্ভে মাত্র ৬০ জন সভ্য লইয়া ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়; চৈত্রশেষে সভ্যসংখ্যা ১৪৯ হইয়াছিল। নূতন বৎসরে সভার কার্য্যে যোগদান অথবা দেয় চাঁদা প্রদানে পরাঙ্মুখ হওয়ায় ৮ জন সভ্যের নাম তালিকা হইতে অপসৃত হইয়াছে; কিন্তু এই অধিবেশনে, তদ্পরিবর্ত্তে, ৪০ জনেরও অধিক উৎসাহী নূতন সভ্যের নাম প্রস্তাবিত হইতেছে। বর্ত্তমান সভ্যের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রসভ্য। ঢাকাবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃভাষার সেবার জন্য এই পরিষদের সভ্য হওয়ার যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক। তথাপিও সকল সভ্যেরই কর্ত্তব্য সভার উদ্দেশ্য ও অভাব জানাইয়া পরিচিত শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই আমাদের মাতৃপূজার মণ্ডপে আহ্বান করিয়া আনা।

পরিষদের অধিবেশন ঃ—

বিগত বৎসরে এই সভার যে সকল অধিবেশন হয় তাহার তারিখ ও বিশেষ কর্ম্মের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—

তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

বিষয়—

(ক) ২৯ জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

(খ) নিয়মাবলী প্রণয়ন।

(গ) কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক নির্ব্বাচন।

(ঘ) পত্রিকা পরিচালন সমিতি গঠন ও এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন।

(ঙ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়ার জন্য আবেদন।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—

তারিখ ২০শে মাঘ,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

বিষয়—

(ক) প্রসিদ্ধ কবি মনোমোহন বসু ও বঙ্গের অদ্বিতীয় নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

(খ) তেরজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

(গ) নাটোরের মহারাজা শ্রীযুত জগদীন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুত গিরিজানাথ রায় এবং সন্তোষের জমিদার সুকবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়দিগকে পরিষদের পরিপোষক নির্ব্বাচন।

(ঘ) অর্থদান-প্রতিশ্রুতি-প্রদাতা ও পুস্তকোপহার দাতৃগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

(ঙ) জয়দেবীমঙ্গল, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, ইন্দ্রজিৎযুদ্ধ, অম্বরিষ-দুর্ব্বাসা সংবাদ, বীরবাহুযুদ্ধ ও শতস্কন্ধবধ নামে ছয়খানি পুরাতন পুঁথির আলোচনা।

(চ) কয়েকটি পুরাতন মুদ্রা এবং ঢাকা জীবনবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ প্রদর্শন।

৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ৩০শে অগ্রহায়ণ,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

বিষয়—

(ক) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি-এ কর্ত্তৃক "সেনরাজবংশ" নামক ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ।

(খ) বারজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

৪। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ৭ই মাঘ,

বঙ্গাব্দ ১৩০৮।

বিষয়—

(ক) শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্ত্তৃক "হরিপরমেশ্বরের ব্রতকথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

(খ) পাঁচজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

৫। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ১৩ই ফাল্গুন,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

(ক) দশজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত কর্ত্তৃক গৌড়ের ইষ্টক ও লালবাগ কেল্লায় প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত গোলা প্রদর্শন ও এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি-এ কর্ত্তৃক ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির অনুলিপি প্রদর্শন ও এ সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ।

(ঘ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত "নদীর প্রাচীন প্রবাহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

(ঙ) এগারসিন্ধু দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটি পুরাতন মস্‌জিদে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপির প্রতিচ্ছায়া প্রদর্শন।

(চ) পুস্তকোপহারদাতৃ দুইজনকে ধন্যবাদ প্রদান।

৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—

তারিখ ১১ই চৈত্র,

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

বিষয়—

(ক) উনিশজন সাধারণ ও চব্বিশজন ছাত্র সভ্য নির্ব্বাচন।

(খ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অদ্ভুতাচার্য্য প্রণীত সুন্দরাকাণ্ড নামক পুরাতন পুঁথি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্ত্তৃক "কাছাড় ও কাছাড়ী" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

কার্য্যালয় ও পাঠগৃহ :—

অর্থাভাবে আমাদের পরিষদের অধিবেশনোপযোগী নিজ গৃহ ও আসন সংগ্রহ না হওয়ায় বিগত বৎসরে পরিষদের সকল অধিবেশনই ইম্পিরিয়াল সেমিনারী হলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিধামাত্র না করিয়া হলটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার বি এ মহাশয় সভ্যগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

পরিষদের কার্য্যালয় ও পাঠগৃহের উপযুক্ত স্থান অভাবে এতদিন আমাদের কর্ম্মের বহু অসুবিধা ঘটিয়াছে। এই বৎসরের আরম্ভ হইতেই আমরা বসিবার একটু স্থান পাইয়াছি; এখন অধিবেশন ব্যতীতও

সভ্যগণ সমবেত হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা ও ভাব-বিনিময়ের সুবিধা পাইলেন এই একটা আনন্দের বিষয়। সভ্যগণ, অতঃপর, নিজ ব্যবসায়ের বিরাম-সময়ে এই পাঠগৃহের সদ্ব্যবহার করুণ এই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

পুরাতন পুঁথি :—

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ অল্পদিন যাবৎ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও ইঁহার পুরাতন পুঁথিসম্পদ্ কম হয় নাই,—এই অত্যল্পকাল মধ্যেই বিভিন্ন জেলা হইতে অনুমান দেড়শত পুরাতন পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পরিষদের শ্রদ্ধেয় সদস্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নেই ইহার অধিকাংশ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে; এবং, আশা করা যায়, তাঁহার ও অন্যান্যের চেষ্টার ফলে এই বৎসরের মধ্যে আমাদের পুরাতন পুঁথির সংখ্যা গত বৎসরের দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া যাইবে। পাঠগৃহের অভাবহেতু গত বৎসর এই সকল পুঁথি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়দের নিকট রাখা হইয়াছিল; এবং তাঁহারাই নিজেদের অবসরসময়ে এই পুঁথিগুলির মধ্যে নয় খানির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। পরিষদের পাঠগৃহে স্থাপিত হইলে আরও অনেক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি এই সকল গ্রন্থের উপর নিপতিত হইবে; এবং সাধারণ সভ্যমণ্ডলী নিঃসন্দেহ তাঁহাদেরও গবেষণার ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

পুস্তকালয় :—

পরিষদের পুস্তকালয়ে এপর্য্যন্ত "প্রতিভার" বিনিময়ে প্রাপ্ত মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনার্থ প্রাপ্ত গ্রন্থ ব্যতীত মাত্র চারিখানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। ঢাকায় পরিষৎ সাহিত্যের যথোচিত অনুশীলন ও বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেক গ্রন্থকার স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থের এক এক খণ্ড মাত্র পরিষৎকে উপহার প্রদান করিলে, দেশের সাহিত্যসেবীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা সংস্থাপন :—

আমাদের পরিষৎ প্রথম অধিবেশনেই বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তদনুযায়ী পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতার পরিষদের সহিত আমাদের পত্রের বিনিময় চলিয়াছে। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে সুবিধা অসুবিধার তুলনায় প্রথমটির প্রাধান্য সুষ্ঠুরূপে প্রতিভাত না হওয়ায় এপর্য্যন্ত প্রস্তাবটি কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে নাই। আশাকরি, বর্ত্তমান বর্ষে আপনারা একটা মিমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন।

প্রতিভা পত্রিকা :—

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের আর একটি প্রধান কর্ম্ম—"প্রতিভা" পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন বিগত বৎসরে—সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের মতন মফঃস্বলে অধিক সংখ্যক শিক্ষাপ্রদ সাময়িক পত্রিকা নাই; মফঃস্বলবাসী লেখকেরাও স্থানীয় পত্র না থাকিলে লিখিবার বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়েন না। বিশেষতঃ, এই অঞ্চলে এখনও একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া চিরবিরাজিত হইয়া উঠে নাই। অতএবই, আমরা "প্রতিভার" মতন একখানি মাসিক পত্রিকার পরিচালন সাহিত্যচর্চ্চার একটি প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি; এখনও এই পত্রিকার বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি। কিন্তু, গতবৎসরের পরিচালন সমিতি বর্ত্তমান বৎসরে এই কর্ম্মের ভার নিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ অর্থাভাব।

বাঙ্গালাদেশে মাসিক পত্রিকা লাভবান্ হইতে কচিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; হইলেও মূলধন ব্যতীত কাজ চালান অসম্ভব। গতবারের পরিচালকেরা—ভবিষ্যতে পরিষৎ হইতে ফেরৎ পাইবার ভরসায়—বিগত বৎসরে যাহা ব্যয় করিয়াছেন তদুপরি বর্ত্তমান বৎসরের জন্য

আবশ্যক তিনচারিশত টাকা মূলধন নিজেদের তহবিল হইতে ব্যয় করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।

এদিকে পরিষদের পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশী; পরিষদের দরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরে তিন টাকার মধ্যে "প্রতিভার" আয়তনের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রতি সভ্যকে প্রদান করা কতদূর কষ্টসাধ্য কোনও কোনও সভ্য চাঁদা আদায়কারীকে বহুবার রিক্তহস্তে বিদায় দেওয়ার সময় তাহা ভাবিয়া দেখেননা। অতএব, পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদকের এই গুরু ভার স্কন্ধে লওয়া একেবারেই অসম্ভব। নানা দিক বিবেচনা করিয়া পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি উহার গত অধিবেশনে নবপ্রতিষ্ঠিত এক প্রচার সমিতির (Publishing Company) প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়কে প্রতিভার লাভলোকসানের জন্য দায়ী করিয়া উঁহারই হস্তে পত্রিকার প্রকাশ ও পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়াছেন। পত্রিকা প্রকাশে অনুচিত ও ক্ষতিজনক বিলম্ব না হয় এই জন্য বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই এই বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সকল সভ্যগণ মিলিত হইয়া তিনচারিশত টাকা উঠাইয়া এখনও শীঘ্র একটা পত্রিকাফাণ্ড সংস্থাপন করিতে পারিলে, সত্যেন্দ্রবাবু, নিশ্চয়ই, সাহিত্য-পরিষৎকে তাঁহার গচ্ছিত ভার প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হইবেন।

আপনারা একাজটি করিতে সক্ষম হইবেন কিনা আলোচনা করিয়া সুস্থির করিতে পারেন।

উপসংহার :—

নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সভ্যসংখ্যাই ধরুন আর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারই ধরুন উভয়দিকেই আমরা আশাতীত সাফল্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু এখনও অর্থাভাব নিরাকরণের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে নাই; অথচ অর্থ ভিন্ন শত ইচ্ছাসত্বেও আমাদের সদুদ্দেশ্য সাধনের ভরসা নাই।

এইজন্য আমরা পত্রদ্বারা বহু দেশপ্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং আরও করিব; পরে, আমরা সহরের সকল গণ্য, মান্য, সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইব,—সঙ্কল্প করিয়াছি।

উপস্থিত সকলের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে এবিষয়ে তাঁহারা যেন আমাদিগকে সাধ্যানুযায়ী আনুকূল্য প্রদানে পরাঙ্মুখ না হয়েন।

জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন জাতীয়জীবন গঠনের প্রধান সহায়; অতএব, ভরসা করি, দেশবাসীমাত্রেই আমাদের এই আহ্বানে অগ্রসর হইতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

অবশেষে, সর্ব্বমঙ্গলাকর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই মহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদনে সহায় হউন।

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের বন্ধু-বান্ধব, সভ্য ও কর্ম্মচারিবর্গের একপ্রাণতা ও নানারূপ সাহায্য ভিন্ন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সাহিত্য-সাধনায় আমরা বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিতামনা; তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমি পরিষদের প্রথম বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী সভাসমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়, বঙ্গাব্দ ১৩১৯, তাং ১৫ই বৈশাখ। } শ্রীভূপালকুমার দত্ত, সম্পাদক

প্রথম বিশেষ অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, তারিখ ২৪শে অগ্রহায়ণ। স্থান—ইম্পিরিয়্যাল সেমিনারী ভবন। সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, মহাশয় যথানিয়মে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতির নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত কর্ত্তৃক একটি সঙ্গীত হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রথমে পরিষদের অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের লিখিত বক্তব্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, সভা-সমক্ষে পাঠ করিলেন ; পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

সভাপতির বক্তৃতা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

সভায় পরিগৃহীত প্রস্তাব সমূহ।—

১ম প্রস্তাব। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভ্য হইলেন।

সভ্যগণের নাম—

শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ।
'' যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।
শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ।
" বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল।
" শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।
" যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল।
" বিভুচরণ গুহ ঠাকুরতা বি, এল।
" অতুলচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল।
" কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।
" মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।
" করুণাকান্ত সেন বি, এল।
" শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল।
" তরণীকান্ত পাইন বি, এল।
" আনন্দচন্দ্র নন্দী বি, এল।
" সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত-গুপ্ত বি, এল।
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।
" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল।
" পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
" হীরালাল দাস-গুপ্ত।
" অবনীনাথ দাস-গুপ্ত এল, এম, এস্।
" উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি, এল।
" নেপালচন্দ্র রায় এল, এম, এস্।
" যতীন্দ্রমোহন দাস-গুপ্ত বি, এল।
" দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক বি, এল।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এল।
" দেবেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ।
" ভূপতিনাথ দাস বি, এস্, সি (লণ্ডন)।
" শশীকুমার কর।
" যতীন্দ্রচন্দ্র সেন এম, এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ।
সমর্থক— " সত্যেন্দ্রকুমার সেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—আগামী পৌষমাস হইতে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ নিম্নোক্ত নিয়মাবলীর অধীনে পরিচালিত হউক।

নিয়মাবলী :—গত ফাল্গুন সংখ্যার নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ।
সমর্থক— " অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ।

তৃতীয় প্রস্তাব—পরিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের বাকী কয় মাসের জন্য উক্ত পরিষদের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহকরূপে নির্ব্বাচিত হউন।

কর্ম্মচারিগণের নাম :—

সভাপতি—শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ।

সহকারী সভাপতি—

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এল।

,, ভূপতিনাথ দাস বি. এস্, সি।

,, দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম. এ।

সম্পাদক— ,, ভূপালকুমার দত্ত এম, এ।

সহকারী সম্পাদক— ,, যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি. এ।

,, ধনপতি দাস এম. এ।

পত্রিকা পরিচালন

সমিতির সম্পাদক— ,, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ,

ধনরক্ষক ,, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম. এ, বি, এল।

ছাত্র-সভ্য পরিদর্শক—,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক— ,, শ্যামাশঙ্কর দাস-গুপ্ত বি, এল।

,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির

সভ্যগণ— ,, শশীকুমার কর।

,, যতীন্দ্রচন্দ্র সেন এম. এ।

,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম. এ, বি, এল।

,, যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি,এল।

,, পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

,, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম. এ।

,, সত্যেন্দ্রকুমার সেন।

,, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এল।

সমর্থক— ,, অনুকূলচন্দ্র সরকার এম.এ.পি, আর. এস্।

পরবর্ত্তী তিনটি প্রস্তাবে "প্রতিভা" পত্রিকা পরিচালনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল এবং কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল।

সপ্তম প্রস্তাব—অদ্যকার অধিবেশনে প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়া আমাদের সভা উক্ত পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়ার আবেদন করা যাউক। উক্ত পরিষদের উত্তর পাইলে উহা আলোচনার জন্য এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হইবে এবং সেই অধিবেশনে মতানুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমর্থক— ,, যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ৩০শে অগ্রহায়ণ।

সময়—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম. এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহন করার পর শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি, এ. "সেনরাজবংশ" নামক একটি ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম. এ. বি, এল ও সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ প্রদানের পর শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম. এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম.এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম ঃ—

শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত বি, এল।

,, অমরনাথ রায় বি, এ।

,, নলিনীকান্ত দাস-গুপ্ত বিদ্যাভূষণ, কবিরত্ন।

,, যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এ।

,, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

,, নীরোদচন্দ্র সেন।

,, পূর্ণচন্দ্র রায় বি, এল।

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

,, সতীশচন্দ্র সেন বি, এল।

,, মোহিনীমোহন দাস।

,, কেশবচন্দ্র দাস।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ৭ই মাঘ।

সময়—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয় "হরিপরমেশ্বরের ব্রতকথা" নামক একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি, এ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। তৎপর শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম:—

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন, কবিরাজ।
,, নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ।
,, শচীন্দ্রচন্দ্র দাস-গুপ্ত এম, এ।
,, হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক, ট্রেইনিংস্কুল।

সর্ব্বশেষে সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করা হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ২০শে মাঘ।

সময়—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গীয় মনোমোহন বসু ও বঙ্গের অদ্বিতীয় নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের পরলোকগমনে সভা হইতে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করার প্রস্তাব করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই:—"অদ্যকার সভার আরম্ভের পূর্ব্বে আমরা অতি শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসুর এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছি। ইঁহাদের পরলোক গমনে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে কাহারও হাত নাই।

আমাদের প্রার্থনা এই যে, ভগবানের অনুকম্পায় তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত পরিবার শান্তিলাভ করুণ এবং তাঁহাদের মৃত্যুতে বঙ্গভাষার যে অভাব হইল তাহা তিনি পূরণ করুণ।"

উল্লিখিত প্রস্তাব সভাকর্ত্তৃক এক বাক্যে সমর্থিত হইয়া যথানিয়মে পরিগৃহীত হইল।

পরে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নূতনসভ্যগণের নাম:—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক বি, এল।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বি, এল।
,, মহেন্দ্রলাল রায় বি, এল।
,, অনুকূলচন্দ্র ঘোষ, উকিল।
,, সৈয়দ ইমদাদ আলী।
,, শরৎশশী দত্ত।
,, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।
,, সুধীরচন্দ্র সেন।
,, সুরেশচন্দ্র দাস-গুপ্ত বি, এ।
,, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এল।
,, অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
,, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।
,, প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত (ছাত্রসভ্য)।

তৎপর শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত বিভূচরণ গুহ ঠাকুরতার সমর্থনে এবং উপস্থিত

সভ্যগণের সম্মতিক্রমে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় এবং সন্তোষের জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী পরিষদের পরিপোষক নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং ইঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ও শ্রীযুত শ্যামাশঙ্কর দাস-গুপ্ত কর্ত্তৃক সমর্থিত পরবর্ত্তী প্রস্তাবে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহোদয়কে, ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতির জন্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থ চরিতাভিধানের একখণ্ড প্রদানের জন্য, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তাল পত্রে লিখিত একখানি চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীযুত কেশবচন্দ্র দাস ও মোহিনীমোহন দাস মহাশয় দিগকে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি প্রদানের জন্য সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল এবং ইঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সুস্থির হইল।

অতঃপর শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উল্লিখিত পুরাতন পুঁথির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানির কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন; এবং সভাপতি মহোদয়, শ্রীযুত ভূপতিনাথ দাস, শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুত শ্যামাশঙ্কর দাসগুপ্ত, শ্রীযুত বিভূচরণ গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি কতিপয় সভ্য বিষয়টির আলোচনা করিলেন। আলোচিত পুঁথি কয় খানির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

১। জয়দেবীমঙ্গল অথবা দেবীমঙ্গল—এখানি সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তালপত্রে লিখিত একখানি পয়ার বঙ্গানুবাদ,—রচয়িতার নাম হরিশ্চন্দ্র দাস অথবা বসু।

২। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব—এই পুঁথিখানিতে শিব ও পার্ব্বতীর পয়ারে কথোপকথন উপলক্ষে শিব রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য দেবের জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন।

৩। ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ—দ্বিজ দুর্গারাম কর্ত্তৃক রামায়ণের একঘটনার বর্ণনা,—বাঙ্গালা পয়ারে লিখিত।

৪। অম্বরিষদুর্ব্বাসা সংবাদ—ভাগবতের নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ।

৫। বীরবাহু যুদ্ধ—পুঁথিখানি ১২২৪ বঙ্গাব্দে হস্তে লিখিত; পুঁথির মধ্যে কৃত্তিবাসকে রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। শতস্কন্ধ বধ—এই পুঁথিখানির রচয়িতা কৃত্তিবাস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল আলোচনার পর শাহ আলমের নামাঙ্কিত কয়েকটি পুরাতন মুদ্রা এবং ঢাকা ভালবাজার জীবন বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুরাতন ভাস্কর বিদ্যার নিদর্শন কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইল। অবশেষে, শাখা স্থাপন সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রাপ্ত পত্র ও নিয়মাবলীর বিষদ আলোচনার পর উত্তরের পাণ্ডুলিপি সুস্থির হইল।

পরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের পর সভ্যগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ১৩ই ফাল্গুন।

সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

স্থান—ইম্পিরিয়াল সেমিনারি ভবন।

পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নূতন সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম্, এ।
,, কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ।
,, অক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত, এম্. এ।

,, সতীশচন্দ্র সরকার এম্, এ।
,, উপেন্দ্রকুমার চন্দ বি, এ।
,, শরচন্দ্র দত্ত।
,, ডাক্তার প্রবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
,, গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
,, লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার, বি, এ।
,, মোহিনীমোহন সরখেল্ বি, এ।

অতঃপর ৩য় প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে বর্ত্তমান বৎসরের চুঁচুড়া সম্মিলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ।
,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী বি, এ,।
,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
,, সুধীরচন্দ্র সেন।
,, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
,, গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম, এ।
,, অনুকূলচন্দ্র সরকার এম, এ, পি, আর, এস্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম্, এ।
সমর্থক— ,, যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় গৌড়ের ২ খানি ইষ্টক ও ঢাকা লালবাগের কেল্লায় প্রাপ্ত ৬।৭টা প্রস্তর নির্ম্মিত কামানের গোলা প্রদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বি, এ, মহাশয় ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির অনুলিপি প্রদর্শন করিয়া তাহার কতকগুলি পাঠ বৈষম্যের উল্লেখ করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির বিবরণ পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের লিখিত "নদীর প্রাচীন প্রবাহ" নামক প্রবন্ধ লেখক নিজে উপস্থিত না থাকায় সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং পাঠ করেন।

অতঃপর ময়মনসিংহের এগারসিন্ধুদুর্গের নিকটস্থ একটী পুরাতন মসজিদে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপির প্রতিচ্ছায়া প্রদর্শন করা হয়।

৪র্থ প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, বি, এল্ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্ন লিখিত গ্রন্থকার মহাশয়গণকে গ্রন্থ উপহারের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

গ্রন্থকারের নাম।
শ্রীযুত অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, অতুলচন্দ্র বাক্‌চা।

গ্রন্থের নাম।
১। কেদার রায়।
২। অভিষেক সঙ্গীত।
৩। পুষ্করিণীতে মৎস্য চাষ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮, ১১ই চৈত্র।
সময়—অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।
স্থান—ইম্পিরিয়াল সোমনারি ভবন।

পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন :—

নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার, বি, এ।
,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম-এ।
,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।
,, জিতেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী।
,, চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ।

,, ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ এল, এম, এস।
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল।
শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ।
,, নৃপতিরঞ্জন রায়।
,, বিরাজমোহন দে।
,, প্রাণেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, বি, এল।
,, অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।
,, দীনেশচরণ রায়, এম, এ, বি, এল।
,, বিনয়কুমার সরকার, এম, এ।
,, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম, এ।
,, হরিদাস সাহা, এম, এ।
,, হৃষিকেশ রায়।
,, শশীকুমার দাস, বি, এল।

নূতন ছাত্রসভ্যের নাম।

শ্রীযুত সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, যোগেশ চন্দ্র অধিকারী।
,, নিশিকান্ত কর্ম্মকার।
,, সুরেশচন্দ্র সিংহ।
,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ।
,, মধুসূদন সূত্রধর।
,, আব্দুল হাসেম মোল্লা।
,, মহম্মদ আবদুল হাকিম।
,, মনিরুদ্দিন আহাম্মদ।
,, মহম্মদ ইয়াছিন।
,, সেক মহম্মদ হোসেন।
,, নবি মহম্মদ।
,, মুন্সী রহেম আলী মিঞা।
,, আব্দুলরব দর্জ্জি।
,, মুন্সী আব্দুল কাদের।
,, রোছমত আলী মিঞা।
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
,, বনমালী ঘোষাল।
,, যোগেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী।
,, অশ্বিনীকুমার কর।
,, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী।
,, মধুসূদন দাস।

প্রতিভা

২য় বর্ষ　　আষাঢ় ১৩১৯　　৩য় সংখ্যা।

জড় জগতের অন্তিম উপাদান
ও
রাসায়নিক পদার্থ নিচয়ের উৎপত্তি

(চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত)

মানব হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক যখন প্রথম প্রবেশ লাভ করে তখন হইতেই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিক-কার যাবতীয় সৃষ্টি তাহার সম্মুখে এক নূতন বিস্ময়-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। প্রত্যেক মানব শিশুটি জ্ঞানের সোপানে প্রথম পদার্পণ করিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য পদার্থের নাম, কারণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে। ইহাই মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সমস্ত জীবন ব্যাপী তাহার এই সত্যের অনুসন্ধান চলিতে থাকে। মানুষ যখনই এই বিরাট সত্যের কোন নূতন অংশের আভাষ পায় তখন বাকী অংশ সমূহের সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। এই প্রকারে সে নিত্য নূতন সত্যের পশ্চাতে অন্ধ বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। সত্যকে পাইবার জন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া সমগ্র মানব-সমাজের অবিরত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহাই মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যিনি আঁধারের পরপারে যাইয়া এই বিরাট সত্যের কণামাত্র অংশ উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করেন।

জড় পদার্থের সৃষ্টি সম্পর্কে কোন কাল্পনিক তত্ত্বের দ্বারা দৃশ্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিবরণ প্রদর্শন ও কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা মানব মাত্রেরই মনে স্বতঃ জাগিয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আবহমান কাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

এই সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ও পুরাতন ও বর্ত্তমান তত্ত্ব সমূহের বর্ণনা করা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের এক-মাত্র উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ও নবীন মত—প্রথমতঃ পুরাতন ও বর্ত্তমান কালের বিভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মতের অধিকাংশই তৎকালীন দার্শনিকগণের কল্পনা ও চিন্তাপ্রসূত; পরন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পরিদর্শন অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত নয়।

বর্ত্তমান কালের মত সমূহের একমাত্র লক্ষ্য সরলতা, এবং এগুলি অত্যধিক কল্পনা দোষে দুষ্ট নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও প্রমাণ আশ্রয় পূর্ব্বক বর্ত্তমান মত সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান মত সকলের সম্যক প্রকৃতি অধ্যাপক Pyonting এর বক্তৃতায় সুন্দররূপে নির্ণীত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"বিবিধ সূত্রের ঐক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক উহাদের সংখ্যার অল্পতা সাধন ও পরস্পরের ঐক্য নিবন্ধন বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যায়ের সংখ্যার হ্রাস সম্পাদন—বর্ত্তমান মতসমূহের একতম উদ্দেশ্য।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"কাল্পনিক তত্ত্ব সমূহ বাস্তবিকই সাময়িক।"

সর্ব্বপ্রথম আমরা পুরাতন তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিব। সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মত। এই মতে আমরা শুধু দার্শনিক কল্পনার পরিচয় পাই না —ইহা যে বিজ্ঞানের চিরন্তন সূত্রের ন্যায় শক্তির (Energy) রক্ষণ (Conservation) পরিবর্ত্তন (transmission) ও বিকীরণের (dissipation) মত আশ্রয় পূর্ব্বক গঠিত, ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই মতে এই দৃশ্য জগৎ অদৃশ্য, অসীম, অবিনাশী অদম্য ও অলিঙ্গ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। ইহা এক দিকে যেমন জড় জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতেছে তেমনি জীব জগতের সৃষ্টিতত্ত্বও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতেছে।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য প্রকৃতি কি ও কিরূপ।

প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) নাম প্রকৃতি। এই গুণত্রয় প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

পুনঃ—এই গুণত্রয় কি ?

সত্ত্ব—উপাদান বীজ বা জ্ঞানাঙ্কুর (Essence or Intelligence Stuff)

রজঃ—শক্তি (Energy)

তম—গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থ (matter characterised by mass or inertia); সুতরাং এই বিশ্ব জগতের আদি কারণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি বা এই গুণত্রয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই গুণত্রয়ের সমন্বয় হেতু এক সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি বিরাজিত ছিল। পুরুষ (Absolute) তাহার বিশেষ প্রভাবে প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া সৃষ্টির রীতি প্রবর্ত্তিত করে। এই তিন গুণের পরস্পরের সমন্বয়ের মধ্যে যখন বৈষম্যাবস্থা উৎপন্ন হয় তখনই সৃষ্টির অঙ্কুর বিকাশ হইতে আরম্ভ করে; কেন না শুধু তখনই গুণত্রয়ের মধ্যে কাহারও আধিক্য দৃষ্ট হয়; এবং গুণত্রয়ের এই ন্যূনাধিক্য হইতে কর্ম্ম সংযোগের শক্তি উৎপন্ন হয়।

সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন সোপান এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা সাংখ্যযোগে আমরা পাই,—

প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারঃ
তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ
পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥

প্রকৃতি—গূঢ়মব্যক্তমলিঙ্গম্।
|
মহৎ—লিঙ্গম্।
|
অহঙ্কার (Empirical Ego) — পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্র)
|
জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন — পঞ্চভূত (ক্ষিত্যপতেজো মরুৎ ব্যোম)
|
দ্রব্য (Substance).

মহৎ হইতে সৃষ্টির সোপান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—এক ভাগ অহঙ্কারের মধ্য দিয়া জীবের সৃষ্টিতে উপস্থিত হইয়াছে; অন্য ভাগ জড়ের সৃষ্টিতে পৌঁছিয়াছে।

প্রকৃতিকে অবিনাশী বলাতে শক্তির (energy) ও বিষয়ের (matter) রক্ষণশীলতা বুঝাইতেছে।

এক কথায় বলিতে গেলে এই পঞ্চ তন্মাত্র "ভূতাদি" বা প্রকৃতির একতম গুণ "তম" হইতে উৎপন্ন। এই পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, যথা—"পাতঞ্জল, পরাশর ও বিষ্ণুপুরাণে" দ্রষ্টব্য।

এক কথায় তাহারা "ভূতাদি" (Rudiment of matter) বা "তম" হইতে বিভিন্ন শক্তির বা রজোগুণের (Energy) সংযোগে উৎপন্ন। এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে "ভূতাদি" বা "তম" সংযোগে পঞ্চভূত বা পঞ্চমৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে।

এই পঞ্চভূত হইতে পরস্পরের সংযোগ বিয়োগে নানাবিধ দ্রব্য নিচয়ের সৃষ্টি হইয়া এ দৃশ্য জগৎ গঠিত করিয়াছে।

পুনশ্চ, এই পঞ্চভূতাদি ও দ্রব্যসমূহ অনুক্ষণ কোন না কোন বিশেষ শক্তি বিকীরণ করিতেছে, এবং এই গুণত্রয়ের বৈষম্যজাত সংযোগে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের আপাত সাম্যাবস্থা (unstable equilibrium) কোন না কোন প্রকারে ভঙ্গ করিয়া প্রকৃতির চিরন্তন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অভিমুখী হইতেছে। এই সদৃশ পরিণাম বা অনুলোম সর্গ (disintegration) পূর্ব্বোক্ত বিসদৃশ পরিণাম বা বিলোম সর্গের (creation) সহিত বরাবর এক সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এক দিকে যেমন পদার্থ নিচয়ের গঠন প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে, অন্য দিকে তেমন তাহাদের বিশ্লেষণও (Disintegration) অবিরত সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং দৃশ্য জগতের এই আপাত সাম্যাবস্থা একটি গতিশীল সাম্যাবস্থা (Dynamic Equilibrium). এই গতিশীল সাম্যাবস্থা যে বিশ্বজগতে যুগ যুগান্তব্যাপী প্রবর্ত্তিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেন না, উদ্ভূত শক্তি (Kinetic Energy) গূঢ় শক্তিতে (Potential Energy) এবং গূঢ় শক্তি উদ্ভূত শক্তিতে অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি কখনও সমস্ত উদ্ভূত শক্তি গূঢ় শক্তিতে পরিণত হইয়া যায়, বা সদৃশ পরিণাম বিসদৃশ পরিণামের উপর আধিপত্য লাভ করে, তখন এই সৃষ্ট জগৎ প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় পুনঃ লয় প্রাপ্ত হইবে।

আমরা যখন (Radium) রেডিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন এই বিষয় পুনরুত্থাপিত হইবে।

খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে কণাদও তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে এই পঞ্চ তন্মাত্রকে পঞ্চভূতাদি মৌলিক পদার্থের পরমাণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই অতি প্রাচীন কাল হইতে এক অন্তিম উপাদানের (Primordial matter) অনুভূতি চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা "ভূতাদি" বা "তমকে" অন্তিম উপাদান (Rudiment of matter) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কণাদের পরবর্ত্তী বুদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণও এই মতের সমর্থন করিতেন।

গ্রীস দেশীয় প্রাচীন তত্ত্ব—আমরা দেখিতে পাই গ্রীসেতেও খৃঃ পূঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে থেইলস্ (Thales), এনাক্সিমেণ্ডার (Anaximander) ও এনাক্সিমিনিস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক অন্তিম উপাদানের তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই দৃশ্য জগতে ঐ অন্তিম উপাদান হইতে ইহার আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অন্তিম উপাদানকে তাঁহারা জীবনীশক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, সেই হেতু তাঁহাদের প্রচারিত তত্ত্ব "হাইলোজোইজম (Hylozoism) নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রীস ভাষায় "জো" (zoe) শব্দে জীবন বুঝায়।

পিথাগোরাসের মত--পিথাগোরাস অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যার সাদৃশ্যে যাবতীয় মৌলিক পদার্থের সাদৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যার অন্ত নাই, এবং এক মৌলিক পদার্থ অন্য মৌলিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ঈলিয়াটিকের অনুবর্ত্তী দার্শনিকগণ দৃশ্য পদার্থের ঐক্যকে প্রথম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সনাতন অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

হিরাক্লিটাসের মতে পরিবর্ত্তনই সৃষ্ট পদার্থের এক মাত্র নিয়ম, এবং তেজ এই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন স্বরূপ। হিরাক্লিটাসের মত সম্বন্ধে এরিষ্টোটেল বলিয়াছেন,

"হিরাক্লিটাস ও তাঁহার শিষ্যগণের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ এক বিরাট পরিবর্ত্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোন সম্যক জ্ঞান লাভ অসম্ভব।"

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এমপিডোক্লিসও এরিষ্টোটেলের মতন ৪টি মাত্র মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। এই পদার্থ চতুষ্টয় সনাতন, অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয়, এবং ইহাদের সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

এনাক্সাগোরাসের মতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অনেক এবং ইহাদের সূক্ষ্মতম অংশ সমূহকে "হোমিও মেরাই" (Homeomeriae.) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার মতে এই সব মৌলিক পদার্থ বিশ্বজগতে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ইহাদের সংযোগে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি ও তাহাদের বিয়োগে বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ ঘটিতেছে। "হোমিওমেরাই" সমূহ অবিনাশী, সনাতন ও সমস্ত বিশ্বব্যাপী। জগতের গতি শক্তি (Energy) কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীতে লিউকিপাস্, ডেমোক্রিটাস্ ও এপিকিউরাস এই তিন গ্রীস দেশীয় দার্শনিক পরমাণু তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মতে—

১। সমস্ত পদার্থই ইহাদের অণু হইতে উৎপন্ন।

২। অণুসমূহ এত ক্ষুদ্র যে, ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

৩। ইহারা পদার্থ সকলের ন্যায় অবিনাশী।

৪। ইহারা অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিভাজ্য।

৫। শুধু একমাত্র অন্তিম উপাদান হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের ও আকারের অণুসমূহ উৎপন্ন হইয়া পরস্পর সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে।

৬। পদার্থের গুণাবলী ইহার আভ্যন্তরীণ অণুসমূহের গুণাবলী ও শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে।

৭। গতিশীলতা বা স্পন্দন (movement) অণু সমূহের বিশেষত্ব।

৮। ইহারা পরস্পর হইতে আবরণাভাব দেশের (Vacuum.) দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

প্লেটোর মত—খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে প্লেটো তাঁহার মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ ও ঘটনাসমূহ অসত্য—ইহাদের গুণাত্মক ভাবই (abstract idea.) একমাত্র সত্য। তিনিও ৪টি মাত্র মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, যথা ক্ষিতি অপ, তেজ ও মরুৎ। তাঁহার মতে পদার্থ সমূহ অবিনাশী ও সনাতন এবং ইহারা ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য অণু হইতে উৎপন্ন। এক মৌলিক পদার্থ অন্য মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং দেখিতে পাই প্লেটোও এক অন্তিম উপাদানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।

এরিষ্টোটেলের মতে (১) একমাত্র অন্তিম পদার্থ নানা গুণ সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই ৪টি মৌলিক পদার্থ ঐ অন্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন, ইহারা পরস্পর পরিবর্ত্তনীয়।

(৩) পদার্থ সমূহ সীমাহীন অংশে বিভাজ্য।

(৪) মৌলিক পদার্থ সমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত।

গেবারের মত—আরব দেশীয় রাসায়নিক গেবার এরিষ্টোটেলের চতুর্বিধ মৌলিক পদার্থের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধাতু সমূহের পরস্পর পরিবর্ত্তনের মতের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইহার পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত আর কোন বিশেষ মতের প্রচার হয় নাই। এক অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাসায়নিকগণ সহজ প্রাপ্য ধাতু হইতে দুর্ম্মূল্য স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিতে মনোযোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু জাতির মধ্যে নাগার্জ্জুনাদি এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সাময়িক অন্যান্য রাসায়নিকগণের নাম উল্লেখযোগ্য হইতে পারে। এই সময় হইতে প্রাচীনেরা

তাঁহাদের মত সপ্রমাণ করিবার জন্য বিজ্ঞানাগার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়ছিলেন।

বেকনের মত—তৎপর বেকন (১৫৬১—১৬২৬ খৃঃ) তাঁহার মত প্রচার করেন। তিনিই প্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ ও পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিক মত প্রচারের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে মৌলিক পদার্থ সমূহ স্বয়ম্ভু হইতে পারে না; উহারা এক অন্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন।

তিনি বলিতেন—"যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার সৃষ্টি করিবার বা বিনষ্ট হইবার শক্তি নাই।"

পদার্থ সমূহের গুরুত্ব (mass) সনাতনও অবিনাশী। প্রত্যেক পদার্থ ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু হইতে উৎপন্ন।

ফরাসীদেশীয় বিজ্ঞানবিদ্ ডেসকার্টিস্ বেকনের মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বইলের মত—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে স্যার রবার্ট বইল তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা এই রূপ—ইহারা অমিশ্র এবং ইহাদের সংযোগে বিভিন্ন মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হয়; ইহারা এক অন্তিম উপাদান হইতে উৎপন্ন; ইহাদের বাহ্যিক গুণের বিভিন্নতা এই অন্তিম উপাদানের বিভিন্ন অবয়বের ও আকারের অণু হইতে উৎপন্ন।

নিউটনের মত—নিউটন পরমাণুবাদের পক্ষবাদী ছিলেন। তিনি কোন অন্তিম উপাদানে বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। "Optick's" হইতে তাঁহার মতের কিয়দংশ এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"ইহা এক প্রকার সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কঠিন, গুরুভার, অচ্ছেদ্য ও স্পন্দনশীল বিভিন্নাবয়বের ও গুণের অণু সমূহ হইতে পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এবং এই অণু সমূহ এতই কঠিন যে, ইহাদের বিনাশ বা বিভাগ হইবার সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান যাহা গড়িয়াছেন তাহাকে ভাঙ্গিবার ক্ষমতা সাধারণ শক্তির অতীত। এই অবিভাজ্য অণু হইতে একই রকমের ও গুণের পদার্থ সমূহ আবহমান কাল সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। যদি অণুসমূহের বিনাশ বা বিভাগ হইত তবে পদার্থ সমূহের গুণাবলীও কালে পরিবর্ত্তিত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিউটনের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই এই বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর অস্তিত্ব তত্ত্ব এক প্রকার নিঃসন্দেহরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। নিম্নে ভল্‌টেয়ার হইতে উদ্ধৃত বাক্যে ইহাই প্রমাণিত হয়—

"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের অনন্ত বিস্তৃতি এখন অলস ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত খেয়াল বলিয়া গণ্য হইয়াছে; আবরণাভাব দেশের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; যে সব পদার্থ অতিশয় কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়, ইহারা এখন চালুনির ন্যায় শত ছিদ্র পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাই সত্য। অণু সমূহ অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছে; এবং ইহার উপরই বিভিন্ন জীবের ও পদার্থের সনাতন অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই জল সকল কালেই জল; তেজ (অগ্নি) সকল কালেই অগ্নি, এবং মাটী সকল কালেই মাটী রূপে অনুভূত হইতেছে। এবং যে সব অতীন্দ্রিয় বীজাণু হইতে মানুষের সৃষ্টি হয় ইহা হইতে বিহঙ্গের সৃষ্টি অসম্ভব।

ডল্টনের পরমাণুবাদ—ইহার পর ডল্টন যখন তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পরমাণুতত্ত্ব প্রচার করেন তখন এই অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব একেবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া স্বীকৃত হয়; এবং এই ঐক্য তত্ত্বের আলোচনা কিছু কালের জন্য বিলুপ্ত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ডল্টনের পরমাণুতত্ত্ব কিছুই নূতন নয়। এনাক্সাগোরাস, লিউকিপাস্ ও ডেমোক্রিটাস এবংবিধ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন।

এই সময়ে আরও দেখা গেল যে, সাধারণ ধাতু

সমূহকে মূল্যবান্ স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল হইল।

ডল্টনের মতে প্রত্যেক পদার্থ উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু হইতে সৃষ্ট। এক মৌলিক পদর্থের পরমাণু অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু হইতে বিভিন্ন। ইহাদের ওজন বা গুরুত্ব বিভিন্ন, গুণ বিভিন্ন। কিন্তু এক পদার্থের পরমাণু সকল একই প্রকারের; ইহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। ডল্টনের তত্ত্ব প্রচারের পর তৎকালীন সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন জলজান (Hydrogen) বায়ুর পরমাণুর গুরুত্বের আপেক্ষিক পরিমাপে ধার্য্য করা হয়।

প্রাউটের তত্ত্ব—বিভিন্ন পরমাণুর ওজন তালিকা নির্ণীত হইবার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডবাসী প্রাউট তাঁহার বিখ্যাত তত্ত্ব প্রচার করেন; ইহা বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহারই নিজ নামে অভিহিত।

এই পরমাণু গুরুত্বের তালিকা হইতে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলজানের পরমাণুর গুরুত্বের দ্বি, ত্রি, চতুর বা তাহার অধিক এইরূপ পূর্ণ সংখ্যক গুণ; পরন্তু ইহার কোন ভগ্নাংশের গুণ নহে, সুতরাং তাঁহার মতে বিভিন্ন পদার্থ এক জলজানের অণু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু পরবর্ত্তী রাসায়নিকগণ (বারজিলিয়াস, পেনি মরচাঁদ, মেরিগনাক, ডুমা এবং বিশেষতঃ ষ্টাস্) অতি সাবধানতার সহিত পরীক্ষাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, প্রাউটের তত্ত্ব গোড়াতেই ভিত্তিহীন; কেন না অনেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব জলজানের গুরুত্বের কেবল ভগ্নাংশরূপেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। যদিও প্রাউটের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এক প্রকার ভিত্তিহীন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তথাপি তৎকালীন পণ্ডিতগণের মনে অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল থাকিয়া যায়। নিম্নে মেরিগনাক ও লোথার মেয়ারের উদ্ধৃত বাক্যে ইহাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়।

মেরিগ্নাক প্রাউটের তত্ত্বের অসত্যতা প্রমাণিত করিয়া বলিয়াছিলেন—যেই অজ্ঞেয় কারণ একমাত্র অন্তিম উপাদানের অণুসমষ্টি হইতে বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ সমূহের পরমাণুর সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই আবার কোন বিশেষ প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাধ্যাকর্ষণশক্তির বশবর্ত্তিতা পথে ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে; যাহাতে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব ইহার আভ্যন্তরীণ অন্তিম উপাদানের অণু সমূহের ওজন সমষ্টি হইতে বিভিন্ন বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে লোথার মেয়ারও বলিয়াছেন—

"ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, যাবতীয় মৌলিক পদার্থের অণুসমূহ এক অন্তিম উপাদানের (সম্ভবতঃ জলজানের) অণুসমষ্টি হইতে উৎপন্ন; এবং এই অণুসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে জলজানের গুরুত্বের পূর্ণ সংখ্যক গুণের সমান নহে তাহার কারণ—সৃষ্টিকালে ন্যূনাধিক আলোকবাহী ব্যোম বা ঈথার অণুর সহিত ঐ অন্তিম উপাদানের অণুসমষ্টির সংযোগ হইয়াছে, এবং এই বিশ্বব্যাপী ঈথার অণুসমূহ একেবারেই গুরুত্বহীন বলিয়া বলা যায় না।

ডল্টনের পরমাণুর জটিলতা ও যৌগিকত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ—

স্বভাবতঃই মানুষের মন সারল্যপ্রবণ: কোন জটিল সমস্যাকে সহজে সে তাহার মনে স্থান দিতে চায় না। এই ক্ষুদ্র সত্যটি ডল্টনের পরমাণু তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যখনই বিজ্ঞান এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত করিল যাহা ডল্টনের পরমাণুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখনই আবার অন্তিম উপাদানের অস্তিত্বের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক জগতে জাগিয়া উঠিল। গত কয়েক বৎসর হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ন এমন প্রমাণ সকল উপস্থিত করিয়াছে যে তাহাতে ডল্টনের পরমাণু সমূহ এখন যৌগিক ও জটিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; এবং উহারা যে এক অন্তিম উপাদান হইতে সৃষ্ট সেই বিষয় একরূপ নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে।

ক্রুকের পরীক্ষা—স্যার উলিয়ম ক্রুক, যিনি বহুকাল হইতে অন্তিম উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন, প্রথমে ইট্রিয়ম্ ধাতুর (yttrium) ত্রিকোণ কাচে ভগ্ন ক্ষিপ্ত আলোক (Phosphorescent spetra) পরীক্ষা করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এই ধাতু বহু কাল হইতে মৌলিক বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু ক্রুক এই ইট্রিয়ম ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত আলোক পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখিলেন যে, বিভিন্ন অংশের আলোক বিভিন্ন প্রকারের। অন্য পক্ষে এই বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক গুণাবলী একই প্রকারের। তিনি ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করেন যে ইট্রিয়ম ধাতুর পরমাণু সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা বর্ত্তমান আছে; সুতরাং ডল্টনের তথা কথিত একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু সমূহ পরস্পর বিভিন্ন রকমের অর্থাৎ যৌগিক ও জটিল।

ক্রুকের অন্তিম উপাদান তত্ত্ব—এই অন্তিম উপাদানকে ক্রুক প্রোটাইল (Protyle) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে প্রোটাইল হইতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি ক্রুক্ তাঁহার দোদুল্যমান দোলক (Pendulum oscillation) তত্ত্বে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, উত্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গুরুভার মৌলিক পদার্থ সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঝিমান পরিণাম—(Zeeman Effect) ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ঝিমান পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখিলেন যে, ত্রিকোণ কাচে ভগ্ন আলোক পংক্তি শক্তিশালী চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্বি, ত্রি ও চতুর্ গুণ হইয়া যায়, ইহা হইতেও পরমাণুর জটিলতা ও যৌগিকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

লকিয়ারের পরীক্ষা—১৯০০ খৃঃ অব্দে স্যার নরমেন লকিয়ার বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত একই জিনিষের ত্রিকোণ কাচে ভগ্ন আলোক বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা করিয়া ও বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষত্রালোক একই নিয়মে পরীক্ষা পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তথা কথিত মৌলিক পরমাণু সমূহ উত্তাপের আধিক্যে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মতম অংশে পরিণত হয়; ইহাতে পরমাণু সকলের যৌগিকত্ব প্রমাণ পায়।

জড় জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে লকিয়ারের মত।

লকিয়ারের মত-উত্তরোত্তর উত্তাপের বৃদ্ধিতে পদার্থ সকল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইয়া পরিণামে অন্তিম উপাদানের অবস্থায় পরিণত হয়। বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষত্রালোকের পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, অত্যধিক তাপে তপ্ত নক্ষত্র রাজ্যে মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব অতি বিরল। যতই আমরা অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে শীতলতর নক্ষত্রালোক পরীক্ষা করি ততই তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক দেখিতে পাই। যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব অত্যন্ত অল্প ইহারা অত্যুত্তপ্ত নক্ষত্রালোকে বর্ত্তমান; এবং যাহাদের পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী ইহারা তাহাদের গুরুত্বের পরিমাণানুসারে শীতল হইতে শীতলতর নক্ষত্র রাজ্যে দৃষ্ট হয়; সুতরাং দেখিতে পাই উত্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মতম পরমাণু সকল হইতে গুরুতম পরমাণু সকলের ক্রমিক সৃষ্টি হইতেছে।

টমসনের পরীক্ষা—সাধারণতঃ বায়বীয় (gas) পদার্থের মধ্য দিয়া তাড়িত স্রোত প্রবাহিত করা যায় না; কিন্তু যখন এই বায়বীয় পদার্থের ভিতর রন্জেনের (Rontgen) আলোক রশ্মি, লেনার্ডের আলোক রশ্মি বা বেকারেলের আলোক রশ্মি নিক্ষিপ্ত হয় তখন এই বায়বীয় পদার্থ অনায়াসেই তাড়িতবাহী হইয়া উঠে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত রূপে উত্তেজিত বায়বীয় পদার্থের মধ্যে তাড়িত যুক্ত অণু সমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যখন কোন উচ্চ ক্রমের শক্তিশালী তাড়িত স্রোত দুই ধাতব আশ্রয়পাতের (Electrodes of plates) মধ্যে প্রবাহিত করা যায় তখন বিয়োগসংজ্ঞক আশ্রয়-

পাত হইতে সূক্ষ্মতম তাড়িতাণু সকল সরল ভাবে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ইহারা বাস্তবিকই বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (Corpusclesor Electrons).

অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলজানের পরমাণুর গুরুত্বের ১৮০০ সহস্রাংশের একাংশের সমান। তাঁহার মতে পদার্থ সমূহের পরমাণু বিষম স্পন্দনশীল তাড়িতাণু(Electron)হইতে উৎপন্ন। এই তাড়িতাণু সমূহ ইহাদের চারি দিকে এক তাড়িতচুম্বকশক্তির ক্ষেত্র (Electro-magnetic field of force) রচনা করিয়া তমোভাবাপন্ন হয় (possesses mass or inertia). এই অবস্থায় তাড়িৎ জড়পদার্থের সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন করিবে, সুতরাং এই তাড়িতাণু যে ডল্টনের পরমাণুর উপাদান এ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক।

রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর পরিবর্ত্তনশীলতা ও পরমাণু সমূহের সদৃশ পরিণাম বা অনুলোম সর্গ

(Disintegration).

বিজ্ঞানবিদ্ সডি (Soddy) বলিয়াছেন,—রসায়ন শাস্ত্রে বিবৃত অণুসমূহ এখন আর অবিভাজ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; ইহাদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই এখন বৈজ্ঞানিকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বেকারেল প্রথম হইতে ইউরেনিয়াম্ ধাতুতে এই চিরন্তন কার্য্যকর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তৎপর মুসেঁ। কুরী ও মাদাম কুরী রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়া এই ধাতুতে উক্ত শক্তির প্রখর কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছেন।

রেডিয়ম ধাতু হইতে অবিরত বিয়োগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (L. Rays) যোগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (R. Rays) এবং দেশভেদী রশ্মি (Rays) চতুর্দ্দিকে নির্গত হইতেছে; ইহা ব্যতীত অনেক প্রকারের বায়বীয় ও কঠিন পদার্থ সমূহ এই ধাতুর ক্রমিক অবনতিতে সৃষ্ট হইতেছে। নিম্নের চিত্রে ইহাই দ্রষ্টব্য—

রেডিয়ম •———• নির্গত বায়বীয় পদার্থ ———• রেডিয়ম A ——— ক্রমশঃ

যোগসংজ্ঞক তাড়িতাণু (D. Rays)　　যোগসংজ্ঞক তাড়িতাণু

সম্প্রতি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, রেডিয়ম পরমাণুর সদৃশ পরিণামের ফল "সৌর" বা হিলিয়ম বাষ্প। ইহা দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুসমূহের উপাদানের ঐক্য প্রমাণিত হইতেছে। একই প্রকারের রেডিয়ম পরমাণু ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদার্থসমূহের পরমাণুর সৃষ্টি হইতেছে।

রেডিয়ম ধাতুর কার্য্যকরী শক্তির পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, পরমাণু সকলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্পন্দনশীলতা ও বৈষম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং এই স্পন্দনশক্তির বিকীরণ হেতু তাহাদের কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তির বিকীরণের সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়ম ধাতুর বিনাশ ঘটিতেছে ও নূন গুরুত্বের অন্যান্য পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইতেছে।

তবে সকল প্রকার গুরুত্বের মৌলিক পদার্থ সমূহ জগতে দৃষ্ট হয় না কেন? তাহার উত্তর এই—জড় জগতে দৃষ্ট যাবতীয় মৌলিক পদার্থ রূপ অপেক্ষাকৃত সাম্যাবস্থার মধ্যবর্ত্তী পথে শক্তি সঞ্চয় এতই দ্রুত যে, কোন মধ্যবর্ত্তী জড় পদার্থের উৎপত্তির পরিমাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এই একই রীতি জড় জগতের পদার্থসমূহের বিনাশ কালেও প্রযুজ্য।

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া সডি বলিতেছেন,—

রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু স্বরূপ আপাত সাম্যাবস্থায় মধ্যবর্ত্তী পথে তমোগুণের সঞ্চয় এতই দ্রুত যে, মধ্যবর্ত্তী পদার্থ সমূহের উৎপত্তির পরিমাণ সদৃশ পরিমাণাধীন পরিবর্ত্তনশীল মধ্যবর্ত্তী পদার্থ সমূহের উৎপত্তির পরিমাণের ন্যায় অতীব অল্প সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে।

অসওয়াল্ডের মত—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত জর্ম্মান রসায়নবিদ্ অস্ওয়াল্ড ইংলণ্ডে কেমিস্টের

স্মৃতিসভায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অভিনব তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। তাঁহার মতে পদার্থসমূহ এক শক্তি (Energy) সমন্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

তিনি বলেন —"বক্ষ্যমাণ পদার্থসমূহ শক্তির জটিল সমষ্টি হইতে উৎপন্ন। এই শক্তি বিশ্বব্যাপী অথবা আবরণাভাব দেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শেষোক্ত মতে এই শক্তিতত্ত্ব ডল্টনের পরমাণুতত্ত্বের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু শক্তির বিশ্বব্যাপকতা দ্বারা অনেক রাসায়নিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ যে সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণে সহায়তা করিতেছে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

মধুবাসরে

(১)

কুলু কুলু কুলু উলু দিয়ে নাচে
ভিংরাজী মধু বাসরে ;
শ্যামা ফুঁকে বাঁশী ; খঞ্জনী তালে
কোয়েলা মত্ত কুহরে ;
সিন্ধু বাজিছে জগত ঝম্পে
অধীরে গভীরে বিপুল কম্পে ;
ভৃঙ্গী ধরেছে সেতারে ;
তুলি পরার্দ্ধ বিটপি-হস্তে
বনানী ঝাঁঝরে চাঁচরে—
নীলিমার মত জানালা খুলিয়া
তারকারা উঁকি মারিছে ;
অষ্টমী চাঁদ চড়িয়া আকাশে
মুখ ফুটে চেয়ে হাসিছে ;
ধরণী কি আজি বধূ-বেশে ওই
বসেছে বিবাহ আসরে ;
কুলু কুলু কুলু উলু দিয়ে তাই
ভিংরাজী গাহে বাসরে !

(২)

মহাকাল বুঝি কন্যা-কর্ত্তা
পড়িতে দানের মন্ত্র !
দ্যুলোকে অলোক-মৌন-পুলকে
ধ্রুবগণে ধরে তন্ত্র !
যামিনী আপনি নাচে নটী হয়ে—
নাচে আকাশের আসরে !
ঝমকে চমকে রঙ্গে ঝালরে
হীরা চুনি পানা ; জলদ চামরে
মলয়া বরষে আতরে !
"দেখ্‌লো দেখ্‌লো দেখ্ আঁখি খুলি !"
আনত নেত্রে পরি' শ্যাম-চেলি
বধূ কি ঢাকিয়া বদনে !
সেয়ানা হাসিয়া কৌতুকে ঠারে
"কেমন গো সই, কোথায় সে ওরে !
কই সে, আমি ত দেখিনে !
হরষে হৃদয় কাহার পরশে,
বসেছে মনে কি বাহিরে ?
কুলু কুলু কুলু উলু দিয়ে তাই
ভিংরাজী হাসে বাসরে !

(৩)

কোয়েলার কুহু যেন মুহু মুহু
'উহু' হয়ে পশে মরমে ;
কোতুকীর বুলি 'ওকি ওকি' কহি
উকারে-স্কুকারে সরমে !
বুল-বুলি জল ভরিয়া শংখে
বাজায় বিটপি-শিখরে টংকে !
আকাশে ভূতলে চরাচর-কুলে
মতি-মাতোয়ারা মাতিয়া—

'দেখ্‌লো দেখ্‌লো দেখ্‌ আঁখি মেলি'
উথলে ভুবন ভরিয়া!
বউ কথা কহ গভীর বর্ণে,
আকুলে ডাকিয়া কহিছে কর্ণে
'বউ কথা কও, কহ গো'
সাজের লাজের আড়ালে বসিয়া
বধূ কি কহিছে ন্যাকামি ধরিয়া,
'কই সে কোথায়, কোথা গো?'
"ঘরে নাহি শুধু দেখিলি চিনিলি
বধু তুই এই আসরে!'
নাচে কুলু-কুলু উলু-কৌতুকে
ভিংরাজী আজি বাসরে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

সারনাথ

ভগবান্ বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনা-তীরে বোধিদ্রুম-মূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন, এ নূতন ধর্ম্মে কাহাকে প্রথম উপদেশ দিব। প্রব্রজ্যার প্রথম অবস্থায় যে সকল মহাত্মার নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের ভিখারী হইয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেন।

"——হইল স্মরণ
রামপুত্র রুদ্রকেরে। কোথায় এখন
রামপুত্র? বুদ্ধদেব বসিলেন ধ্যানে।
দেখিলেন সপ্ত দিন হইলে অতীত
রামপুত্র কালগত।"

অতএব তাঁহাকে এ নূতন লব্ধ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নহে।

"—— আবাড় কালাম
তখন পড়িল মনে কোথায় সে এবে?
আবার বসিয়া ধ্যানে দেখিলা সুগত
তাহার জীবন লীলা হইয়াছে শেষ তিন দিন।'

তবে এই ধর্ম্মে কাহাকে উপদেশ দিবেন?

"তখন পড়িল মনে শিষ্য পঞ্চজনে।"

অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য-প্রমুখ এই পঞ্চজন শিষ্য উরুবিল্ব নগরে ভগবান বুদ্ধদেবকে নিষ্ফল যোগ ও দর্শন ত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি হারাইয়াছিল ও অন্যত্র ধর্ম্মতত্ত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছিল। এখন ভগবান্ বুদ্ধদেব ভাবিলেন,

'কোথায় তাহারা? ধ্যানে দেখিলেন দেব
আছে তারা মৃগদাবে বারাণসী ধামে।
যাইবেন বারাণসী করিলেন স্থির
শিষ্য পঞ্চে নব ধর্ম্মে করিতে দীক্ষিত।

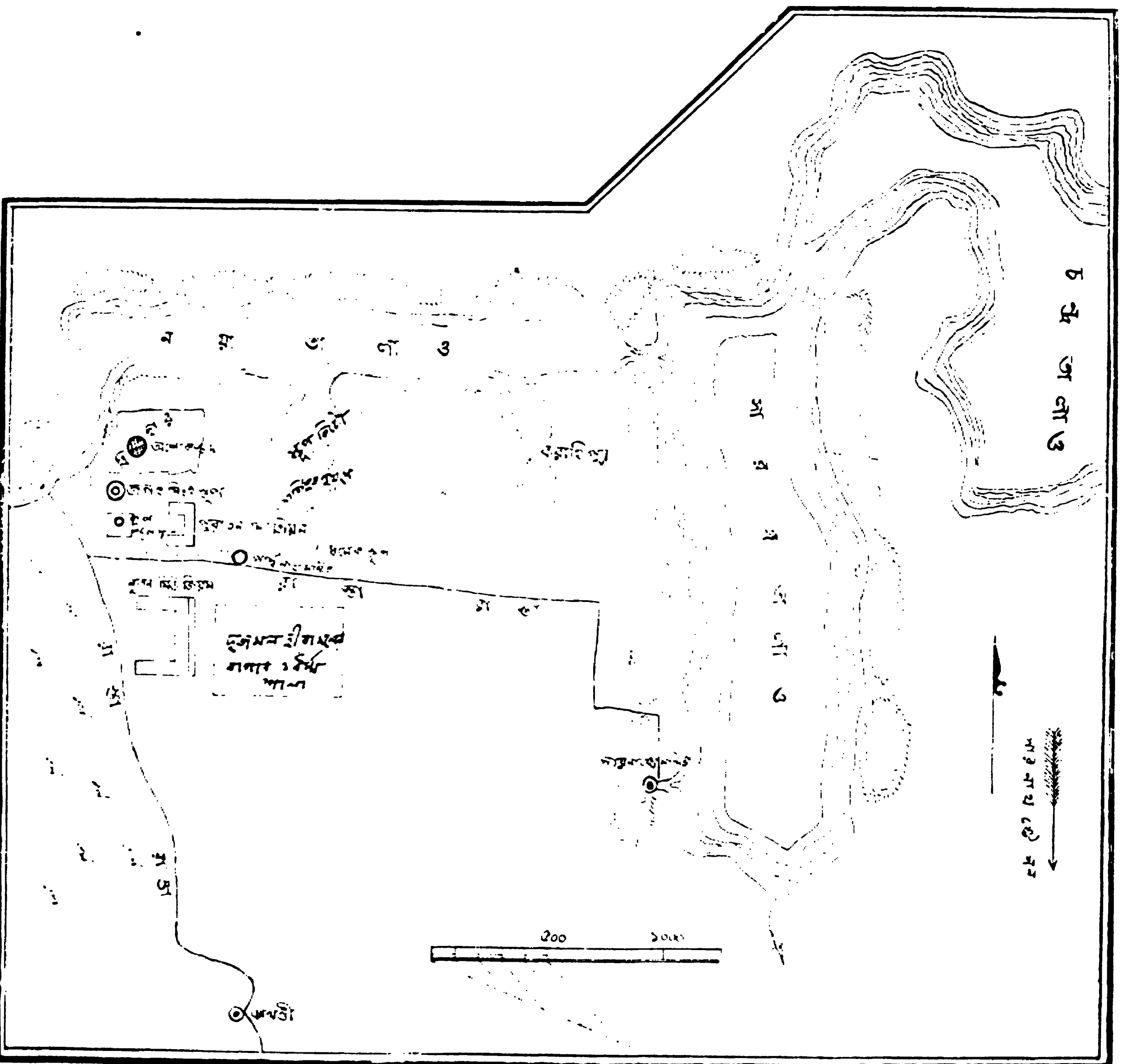
এই পুণ্য ধর্ম্মের দীক্ষাস্থল সেই মৃগদাবই বর্ত্তমান কালের সারনাথ।

সারনাথ আধুনিক নাম। বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা "ঋষিপত্তন মৃগদাব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নামটী ইংরাজিতে "Deer park of the Rishi," বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানে জনৈক প্রত্যেক-বুদ্ধের বাসস্থান ছিল বলিয়া এই নামের পূর্ব্বাংশ ঋষিপত্তন হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই প্রত্যেক-বুদ্ধ যখন শুনিলেন যে, "শুদ্ধোদনের পুত্র" বুদ্ধত্ব লাভ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তখন তিনি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

স্থানটির নামের দ্বিতীয় অংশ (অর্থাৎ মৃগদাব) বিষয়ে একটি সুন্দর "জাতক" কথা বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে মৃগদিগের রাজা রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং স্থানটি মৃগদাব অর্থাৎ মৃগদিগের বন বলিয়া কথিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বৌদ্ধগ্রন্থে "মৃগদাব" শব্দটীর "মৃগদায়" এইরূপ রূপান্তরও দেখা যায়। 'মৃগদায়' শব্দের অর্থ—যাহা (যে বন) মৃগদিগকে দান করা হইয়াছে।

জাতক কথাটি এই:—পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ বুদ্ধদেব


চন্দ্র তালাও
৫০০
১০০০

ও দেবদত্ত * দুই মৃগদলের অধিপতি ছিলেন। তৎ-কালীন কাশীর রাজার আখেট-উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত মৃগদিগের সহিত রাজার এই 'সময়' হয় যে, রাজার নিমিত্ত পালা ক্রমে প্রত্যেক মৃগদল হইতে এক একটি মৃগ প্রতিদিন রাজবাটীতে প্রদত্ত হইবে। কালক্রমে দেবদত্তের অধীনস্থ কোন গর্ভিণী মৃগীর পালা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে স্বকীয় রাজার নিকট গিয়া বলিল "আমার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণবধ করিবার অধিকার কাহারও নাই, অতএব প্রসব পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন।" দেবদত্ত ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে অস্বীকার করিলে মৃগী দ্বিতীয় দলের রাজা বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। বোধিসত্ব তাহার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া মৃগীর পরিবর্ত্তে নিজ শরীর দান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ও কাশীর রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা সকল শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি এইক্ষণে সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিকই আমি নররূপী পশু, ও তুমি পশু হইয়াও মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ।" রাজা অতঃপর মৃগদিগকে তাহাদিগের কঠিন সত্য হইতে মুক্ত করিলেন ও ঐ বন-প্রদেশ মৃগ-দিগকে 'দায়' অর্থাৎ দান করিলেন।

কনিংহাম (Cunningham) সাহেব ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে লিখিয়াছেন যে, তখনও তথায় একটি "রমণা" অর্থাৎ মৃগ রাখিবার স্থান বর্ত্তমান ছিল। শিকারের জন্য মৃগবন রক্ষিত হওয়ার প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে ঐ স্থানটি যে মৃগসঙ্কুল ছিল তাহা কানিংহাম সাহেবের কথা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। এখন ঐ প্রদেশ একবারে ফাঁকা, প্রায় বৃক্ষাদি পরিশূন্য। কিন্তু কানিং-হামের সময়ে স্থানটি বনপ্রদেশ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"The মৃগদাব is represented by a wood which still covers an area of about half a mile and extends from the great tower Dhamek to Chowkhandy." এই দুই স্থান সংলগ্ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট এখন একটি বিস্তীর্ণ পাকা রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। বন আর নাই।

বৌদ্ধপ্রভাবের সঙ্গে এই ঋষিপত্তন মৃগদাবও লুপ্ত হইয়াছিল। বিগত কীর্ত্তির চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শুষ্ক হ্রদ-বেষ্টিত ভূভাগে মিশরের মরুভূমিস্থ বিখ্যাত স্ফিংক্সের (Sphinx.) মত একাকী দণ্ডায়মান প্রসিদ্ধ 'ধামেক' স্তূপমাত্র অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ধামেক হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে 'চৌখণ্ডী' নামে অন্য একটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ অতীতের দ্বিতীয় সাক্ষী। অতীতের সাক্ষীই বা বলি কি প্রকারে? ইহারা এত কাল অতীত স্মরণ করাইয়া দিত, বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইবে, তবে ঐ স্থানের নামান্তর ঘটিত না। বর্ত্তমান নাম 'সারনাথ' সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষের দক্ষিণে একটি টিলার উপরস্থিত সারনাথ নামক শিবমন্দির হইতে লব্ধ। এই হিন্দু মন্দিরটি খুব পুরাতন নহে। সম্ভবতঃ যেরূপ অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধস্তূপের উপর হিন্দু মন্দিরাদি কীর্ত্তিচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও তাহার এক নিদর্শন। জরাসন্ধ নির্ম্মিত মুঙ্গের দুর্গের প্রস্তর সমূহে বৌদ্ধ-চিহ্ন দেখিয়াছি। শুনিয়াছি পরে ইহাই শাহসুজা দুর্গরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরও বোধ হয় এই শ্রেণীর। জৈনেরাও অবসর পাইয়া ধামেক স্তূপের নিকট পার্শ্ব-নাথের এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সারনাথ নামের সম্ভবতঃ এই প্রকারেই উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কানিংহাম সাহেব একটি কষ্ট কল্পনা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি বলেন "সারনাথ" শব্দটি 'সারঙ্গনাথ' এই শব্দের অপভ্রংশ। 'সারঙ্গ' মৃগের একটি নাম। অতএব উপরি লিখিত জাতক কথাটিই এই নামে সূচিত

* বৌদ্ধশাস্ত্রে 'দেবদত্ত' শাক্যসিংহের ভ্রাতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

হইতেছে। বর্ত্তমান সারনাথ মন্দিরের সম্মুখের শুষ্ক হ্রদটির নাম এখনও "সারঙ্গতালাও।" "তালাও" শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র হ্রদ।

বুদ্ধদেবের সময় এই সারনাথ ধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। নতুবা তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে এখানে আসিতেন না, বা তাঁহার পঞ্চ শিষ্যও এই স্থানে আসিয় ধর্ম্ম জীবন লাভের চেষ্টা দেখিতেন না। স্থানটি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ধার্ম্মিক লোকের স্থান ছিল বলিয়াই উহার ঋষিপত্তন নাম হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের সময় স্থানটির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু. বুদ্ধদেবের পদরজে পবিত্রীকৃত হওয়ার পর স্থানটি বৌদ্ধ ধর্ম্মের পীঠস্থান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর কালে এই বিস্তৃত ভূভাগ সংঘারাম, মঠ, স্তূপ, স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির ও বিহার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সুদুর বিদেশ হইতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করিত। এই সমৃদ্ধির চিত্র এখন কল্পনাবলে মানসপটে আঁকিয়া সান্ত্বনা লাভ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

সারনাথে ১৯০৫ সন হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন ক্রিয়া রীতিমত আরব্ধ হইয়াছে। খনন কার্য্যের দ্বারা বৌদ্ধ কীর্ত্তিকাহিনী অনেক উদ্ঘাটিত হইয়াছে কিন্তু সেই গত কালের সুস্পষ্ট চিত্র এখনও ভাল করিয়া আঁকিবার উপকরণ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চেৎসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ বারাণসী ধামে তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধ জগৎগঞ্জ মহল্লা নির্ম্মাণ করিবার জন্য সারনাথের একটি বৌদ্ধ স্তূপ খনন করিয়া ইষ্টক ও প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলেন; লোকে সারনাথের ভগ্নাবশেষকে আর তীর্থভূমি বলিয়া মনে করিত না। শ্রদ্ধাশূন্য না হইলে এক জন হিন্দু রাজ-মন্ত্রী এইরূপে ধর্ম্ম মন্দিরের চিহ্ন লুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন না। পরে যে খ্রীষ্টান ইংরাজ আসিয়া এই সকল ভগ্নাবশেষ হইতে কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর ও দেবমূর্ত্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বরুণার সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য মালমসলারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, জগৎসিংহের অপকীর্ত্তির পর তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার আর কোনই কারণ নাই। এরূপ বর্ব্বরতার উদাহরণ ইতিহাসে অনেক আছে; ভারতবর্ষেও থাকিবে, বিচিত্র কি?

জগৎসিংহের খনন-কার্য্যে প্রথমতঃ কর্ত্তৃপক্ষের এই স্থানে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা হয়। তৎকালীন বেনারসের এজেন্ট Jonathan Duncan সাহেব এই স্থানে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন. কিন্তু তিনি শীঘ্রই বদলী হইয়া যাওয়ায় আর কিছু করা হয় নাই। যাহা হউক, সারনাথে যে বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রোথিত আছে, তাহাতে সভ্য জগতের বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা এক জন ইংরেজ রমণীকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। এই রমণী Miss Emma Roberts; ইনি ১৮৩৪ সালে এই স্থান পরিদর্শন করিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে General Cunningham গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই স্থানে কিছু খনন-কার্য্য করেন ও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে যথাক্রমে Major Kittoe (Benares Queen's College নির্ম্মাণ ভার প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার) E. Thomas (বেনারসের জজ) Dr. F. Hall (Queen's Collegeর অধ্যাপক) মাঝে মাঝে খনন করিয়া খনিত প্রদেশ হইতে লব্ধ প্রস্তরাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। প্রাপ্ত মূর্ত্তি ইত্যাদি কতক কলিকাতা মিউজিয়মে, কতক Lucknow Musuem এ, কতক Queen's Collegeএ যেন তেন প্রকারেণ রক্ষিত হয়। এপর্য্যন্ত কোন বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে সারনাথের তথ্যানুসন্ধান হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উপরি উক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেজর কিটোর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তিনি যে সকল তথ্যানুসন্ধান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কাগজ পত্র কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। Major Kittoe Cunningham সাহেবকে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছিলেন।



পুরাতন মিউজিয়ম।



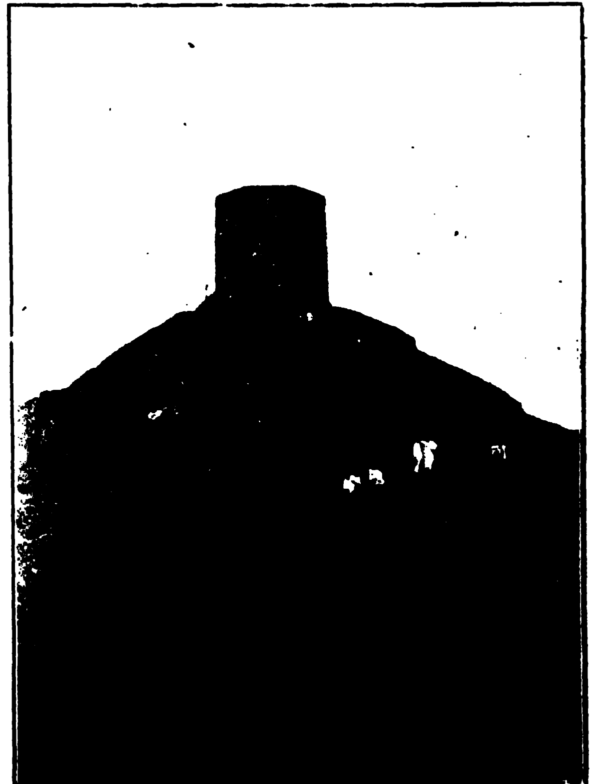
নূতন মিউজিয়ম।



সারনাথ।



ধামেকস্তূপ।



চৌখণ্ডি।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কীর্ত্তি সমূহের সংরক্ষণ ও সংস্কার কল্পে ব্রতী হইয়া সারনাথের রীতিমত খনন-কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৪ হইতে এই কার্য্য রীতিমত Director General of Archaeologyর আপন তত্ত্বাবধানে চলিয়াছে। লর্ড কর্জ্জনের অনুমত্যনুসারে একটি ছোট মিউজিয়ম তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহাতে ইতস্ততঃ রক্ষিত সমস্ত কীর্ত্তিচিহ্ন-গুলি একত্রিত করা হইয়াছিল। এক্ষণে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে, খনিত স্থানের সন্নিকটেই, একটি বৃহৎ মিউজিয়ম নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে রক্ষিত সারনাথের প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি এখন এইখানে সুযোগ্য কর্ম্মচারীর সাহায্যে বিধিমত রক্ষিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখনও মিউজিয়মে এই কার্য্য চলিতেছে। আশা করা যায় ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য শীঘ্রই এই মিউজিয়ম একটি কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।

সারনাথের প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু বিখ্যাত ধামেক স্তূপ। B. N. W. Ry, হইয়া কাশী গমন কালীন সারনাথ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলে, দূর হইতে মনে হয় যেন মুণ্ডিতমস্তক একটি বিশাল জীব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্তূপের উপরি ভাগ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টকগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নিম্নতলের চারি দিকের পরিধি ২৯২ ফিট, উচ্চতা ১১০ ফিট, ব্যাস পরিমাণ ৯৩ ফুট। ৪৩ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত চুনার প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। প্রস্তরগুলি আবার লৌহ কড়া দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। উপরি ভাগ ইষ্টক নির্ম্মিত, সম্ভবতঃ কোনরূপ পলস্তর করা ছিল। সম্ভবতঃ শিখর-দেশ প্রস্তরের ছত্রের দ্বারা শোভিত ছিল। ভূমি হইতে ২৪ ফিট উচ্চে স্তূপের চারিদিকে ৫½ ফিট চওড়া কারুকার্য্যময় ৮টি ফলক বর্ত্তমান রহিয়াছে। দক্ষিণদিকের কতক প্রস্তর-গ্রন্থি আর নাই। এখনও প্রস্তরে খোদিত চিত্রগুলি অবধান করিয়া দেখিলে, পুরাকালের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই ফলক তিন ভাগে বিভক্ত। উপর দিকের প্রথম অংশে নানারূপ জ্যামিতিক চিত্রাদি আছে, মধ্যস্থলে মৃণালসমূহ, তন্নিম্নে নানা প্রকার ফুলের ছবি। দক্ষিণ দিকের ছবির মধ্যে একটি চক্রবাক মিথুন খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। উত্তর পশ্চিম কোণে সছিদ্র দুইটি ধাপের বন্দোবস্ত দেখিয়া বোধ হয় যে, পতাকা দিয়াও এই স্তূপের শোভা বর্দ্ধন করা হইত। প্রত্যেক ফলকের অধোদেশে একটি কুলুঙ্গী বর্ত্তমান আছে। কাণিংহাম্ সাহেব ৮টি ফলক, এবং ৮টি কুলুঙ্গীই দেখিয়াছিলেন। এখন দক্ষিণ দিকের খানিকটা প্রস্তর গ্রন্থি বর্ত্তমান না থাকায় পাঁচটি মাত্র কুলুঙ্গী দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই কুলুঙ্গীগুলিতে বৌদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত হইত। উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশের প্রস্তর গ্রন্থিগুলি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক মেরামত হইয়াছে। জগৎসিংহ এই ধামেক স্তূপের নিম্নাংশেও কিছু স্থান ভগ্ন করিয়াছিলেন।

কানিংহাম সাহেব এই ধামেক স্তূপের অভ্যন্তরে কোনরূপ ভস্মাধার প্রোথিত আছে কি না দেখিবার জন্য উপরি ভাগ হইতে ইহা খনন করান। উপর হইতে ১০½ ফুট খনন করিয়া, তিনি একটি খোদিত-লিপি বিশিষ্ট প্রস্তরফলক ছাড়া আর কিছু পান নাই। ঐ প্রস্তর ফলকে "যে ধর্ম্মহেতু প্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ শ্লোকটি খোদিত ছিল। ইহা হইতে ঐতিহাসিক কোন তথ্য জানা যায় নাই।

এই ধামেক স্তূপের নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সাধারণ মত এই যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, গুপ্ত রাজাদিগের প্রাধান্য সময়ে গঠিত হইয়াছিল। হাণ্টার সাহেব ধামেক সম্বন্ধে বলেন যে, এই স্তূপটি অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ ভুল। তিনি আরও বলেন যে, বুদ্ধদেব যে স্থানে বসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রথম শিক্ষা দেন, ইহারই স্মৃতিচিহ্ন এই ধামেক স্তূপ। ইহারও কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়ংসিয়াং ভারত ভ্রমণে আসিয়া সারনাথ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অন্যান্য স্থানের বিবরণ মধ্যে

সারনাথেরও বিশেষ বিবরণ আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র কাশীতে ৩০টি বিহার ও ৩০০০ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। মৃগদাবের বিহারগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। তন্মধ্যে ১৫০০ শ্রমণ বাস করিত। তিনি বলেন, এই মৃগদাবের বিহার সমূহের মধ্যে শত শত স্মৃতিস্তম্ভ ও স্তূপ, বর্ত্তমান ছিল। তন্মধ্যে তিনি কয়েকটির বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ২টি বৃহৎ অশোক স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম অশোক স্তূপটি ১০০ ফুট উচ্চ। ইহার সম্মুখেই সবুজ রংএর প্রস্তর নির্ম্মিত কাচের মত স্বচ্ছগাত্র একটি স্তম্ভও বর্ত্তমান ছিল। হিয়ংসিয়াংএরং বর্ণনা হইতে ঠিক বুঝা যায় না যে, মৃগদাবেই এই স্তূপ ও স্তম্ভ অবস্থিত ছিল; বরং মনে হয় কাশীর অন্য কোনও স্থানে এগুলি বর্ত্তমান ছিল। ধামেক স্তূপটিই যে হিয়ংসিয়া কথিত স্তূপ তাহা প্রমাণ হয় না। ধামেকের নিকট কোন স্থানে এখনও উপরি লিখিত বর্ণনানুযায়ী কোন স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় নাই।

হিয়ংসিয়াং আর একটি স্তূপ ও স্তম্ভের কথা বলিয়াছেন। তিনি এই স্তূপটিকে জীর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তখন ভগ্নাবস্থাতেও ইহা ১০০ ফিট উচ্চ ছিল (অভগ্নাবস্থায় ৩০০ ফিট উচ্চ হইতে পারে এইরূপ তিনি অনুমান করিয়াছেন)। ইহারও নিকটে ৭০ ফিট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ বর্ত্তমান ছিল। ধামেকের অতি সন্নিকটে কোন স্তম্ভ নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধামেক স্তূপ হইতে অনেক পশ্চিমে প্রায় ৬০০।৭০০ ফিট অন্তরে একটি অশোকস্তম্ভ বাহির হইয়াছে। ইহার বিষয় পরে লিখিতেছি। হিয়ংসিয়াং এতগুলি স্তূপের কথা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার স্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। ধামেক স্তূপ কোন্ বিষয়ের স্মৃতিচিহ্ন তাহা জানিবার উপায় নাই। যে প্রস্তর ফলকের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে কিছুই জানা যায় না।

'ধামেক' নামটির অর্থ কি? অবশ্য অজ্ঞলোকে এই নামটি প্রদান করিয়াছে। এই স্তূপের বিষয় অনেক আজগুবি গল্পও প্রচলিত আছে। কানিংহাম সাহেব নামটির আদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মোপদেশক" এই শব্দ, অপভ্রষ্ট হইয়া 'ধমেক' এই সহজ কথায় পরিণত হইয়াছে। (ধর্ম্মোপদেশক—ধর্ম্মদেশক—ধমদেক—ধমেক।)

অশোক স্তম্ভটি সারনাথ ভগ্নাবশেষের সমস্ত দ্রষ্টব্যের মধ্যে প্রধান দর্শনীয় বস্তু। কারণ কালের গতিও ইহার মসৃণ স্বচ্ছ গাত্র কোনরূপে মলিন করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এই সুন্দর স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়া কয়েক খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এক অংশ এখনও যথাস্থানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত রহিয়াছে। ভগ্ন খণ্ডগুলি পার্শ্বেই স্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু স্তম্ভের শিরে যে অংশে চারিটী সিংহ ছিল, তাহা এখন নূতন বৃহৎ মিউজিয়মে প্রস্তর বেদিকার উপর স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দেখিবার সামগ্রী। শ্বেতাভ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত চারিটি সিংহ একটি বেদিকার উপর চারি দিকে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। বেদিকার চারি গাত্রে বৃষ, অশ্ব, সিংহ ও গজ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, ও এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প প্রত্যেক মূর্ত্তিকে পৃথক করিয়া উহাদের সম্যক্ শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। হিয়ংসিয়াং বলেন, এই স্তম্ভের নিকটেই অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্যাদি পঞ্চ শিষ্য তপস্যায় বসিয়াছিলেন। এই স্তম্ভের কাল নির্ণয় অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়াছে; কারণ ইহার উপর অশোকের খোদিত লিপি রহিয়াছে; সুতরাং ইহার নির্ম্মাণ সময় খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইবে।

অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ হইতে ২৩২ সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। খ্রীঃ পূঃ ২৪০ হইতে ২৩২ সনের মধ্যে কোন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে তিনি পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি বৃহতী সভা আহ্বান করেন। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থায়িত্ব কল্পে অনেক নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়। ধর্ম্ম-সংঘের একত্ব যাহাতে রক্ষিত হয় তজ্জন্য রাজা অশোক স্বয়ং একটি ঘোষণা প্রচার করেন। সারনাথের অশোক স্তম্ভে এইরূপ একটি ঘোষণাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। লিপিটির ভাবার্থ এই যে "যদি কোন শ্রমণ বা শ্রমণী ধর্ম্মসংঘের

'মধ্যে বিবাদ বা কোনরূপ দলাদলি উপস্থিত করে, তবে তাহাকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইয়া (অর্থাৎ তাহার সন্ন্যাস বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) আশ্রমবহির্ভূত করিয়া দেওয়া হইবে। রাজার এই আজ্ঞা তাঁহার রাজ্যস্থ সমস্ত কর্ম্মচারিবর্গের নিকট প্রেরিত হইল, রাজ্যস্থ সকল স্থানে এই আজ্ঞা ঘোষিত হইবার বন্দোবস্ত তাহারা করিবেন। *

এই অশোকস্তম্ভ যে স্থানে বিদ্যমান, তাহার নিকটেই বৌদ্ধ বিহারটির ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। খনন কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পর এই বিহারের আয়তন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইবে। এখনও খনন ক্রিয়া চলিতেছে ও প্রত্যেক বৎসরই নূতন কিছু বাহির হইতেছে।

হিয়ংসিয়াং লিখিয়াছেন যে, সারনাথে প্রাচীর বেষ্টনের ভিতরে আট ভাগে বিভক্ত বিহার বর্ত্তমান ছিল, এবং তথায় ২০০ ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ছিল। উপরে ১০০ টি কুলুঙ্গী বর্ত্তমান ছিল। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। কল্পনা করুন যে মধ্য স্থলে প্রকাণ্ড এক চত্বরভূমি, চতুঃপার্শ্বে শ্রমণদিগের বাসোপযোগী ছোট ছোট কামরা। উত্তর দিকে উচ্চ মন্দির দণ্ডায়মান। চত্বরের এক প্রান্তে একটি কূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ধামেকের পশ্চিমে অতি সন্নিকটেই কতকগুলি গৃহাবশেষ বাহির হইয়াছে। মনে হয় যেন পূর্ব্বোক্ত মন্দির হইতে ধমেক পর্য্যন্ত গৃহশ্রেণী বিস্তৃত ছিল। এই স্থানটিতে যে বৃহৎ একটি বিহার ছিল, খনিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। ভবিষ্যতে খননকার্য্য আরও অগ্রসর হইলে স্থানটির পূর্ণ চিত্র উদ্ধার করা যাইতে পারে এরূপ আশা করা যায়।

উপরি লিখিত ভগ্নাবশেষের আরও একটু উত্তরে শুষ্ক হ্রদের পার্শ্বে Major Kittoe একটি স্তূপের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপরেই বলিয়াছি Major Kittoe র অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আমরা পাই নাই।

হিয়ংসিয়াং এই হ্রদগুলির পার্শ্বে অনেক স্তূপ ও স্মৃতিচিহ্নের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই সকলের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে, আশা করা যায়। অশোক স্তম্ভের দক্ষিণে ধামেক হইতে ৫২৬ ফিট পশ্চিমে, আধুনিক ফোয়ারার নীচে নির্ম্মিত চৌবাচ্চার মত একটি বৃহৎ বৃত্তাকার গর্ত্ত দেখা যায়। ইহার উপর যে একটি স্তূপ বর্ত্তমান ছিল তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই স্তূপটিই জগৎসিংহ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়াছিল।

কানিংহাম সাহেব এই স্তূপের ভগ্নাবশেষের ভিতরও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি ইহার মধ্য হ'তে একটি প্রস্তর পেটিকা ভিন্ন আর কিছুই পান নাই। এই পেটিকার ভিতর মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতীয় আর একটি পেটিকা ছিল। তন্মধ্যে ৪০।৪৫টি মুক্তা, ১০টি চুনী, ৮টি রৌপ্যের ও ৯টি স্বর্ণের কুণ্ডল ও তিন খণ্ড বাহু প্রদেশের অস্থি পাওয়া গিয়াছিল। জগৎসিংহ দ্বারা খনিত হইবার সময় একটি বুদ্ধ মূর্ত্তিও অন্যান্য প্রস্তর সহ জগৎগঞ্জে নীত হইয়া ছল।

মেজর Kittoe পরে বহু আয়াসে ইহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটিতে একটি খোদিত লিপি ছিল, ও এই খোদিত লিপি হইতে একটি ঐতিহাসিক সময় নিরূপণের সহায়তা হইয়াছে।

লিপিটির মর্ম্মার্থ এই যে, "গৌড়ের রাজা মহীপাল ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণ কমল পূজা করিয়া বারাণসীতে শত শত ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীস্থিরপাল এবং তাহার অনুজ শ্রীবসন্তপাল ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন করিয়া এই স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন।" তারিখ দেওয়া আছে ১০৮৩ সংবৎ। অতএব ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মহীপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়াছিল।

কাণিংহাম সাহেব এই স্থানের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন

* সাঁচি ও এলাহাবাদস্থ অশোক স্তম্ভেও এই ঘোষণা লিপি মুদ্রিত রহিয়াছে।

যে স্থিরপাল ও বসন্তপাল নূতন কোন স্তূপ স্থাপন করেন নাই, বরং পুরাতন জীর্ণ স্তূপের সংস্কার সাধন করিয়া নিজের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ধমেক স্তূপের দক্ষিণ দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে "চৌখণ্ডী" বর্ত্তমান। এই চৌখণ্ডী একটি অষ্ট কোণাকৃতি স্মৃতিগৃহ। ইহা আকবর কর্ত্তৃক ১৫৮৮ খ্রীঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহগাত্র খোদিত আরবী লিপি হইতে ইহা জানা গিয়াছে। হুমায়ুন কোন সময়ে এখানে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র আকবর তাহারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই স্মৃতি-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। অষ্টকোণ সমন্বিত হইয়াও ইহা অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক চৌখণ্ডী অর্থাৎ চতুষ্কোণ গৃহ নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই স্মৃতিগৃহটিই চৌখণ্ডীর প্রধান আকর্ষণ নহে। আমাদের নিকট ইহার বিশেষত্ব এই যে এই স্মৃতিগৃহ একটি বৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত। রাশীকৃত জীর্ণ ইষ্টকের একটি ক্ষুদ্র পাহাড় কল্পনা করুন। উচ্চতা ৭৪ ফুট; তদুপরি আকবর নির্ম্মিত গৃহটি উচ্চতা আরও ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া দিয়াছে। কানিংহাম সাহেব এই ভগ্নাবশেষের ভিতরও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই পান নাই।

এই স্তূপটি ধামেক হইতেও বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। একবার সারনাথতীর্থবাসী জনৈক সিংহলী শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনিও এই কথা বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ হিয়ংসিয়াং অশোক নির্ম্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ যে বৃহৎ স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই। Sherring সাহেবেরও এই মত।

এই চৌখণ্ডী স্তূপের আর একটি নামান্তর তৎপ্রদেশে প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে "লোরি কা কুদান" বলে। লোরি নামে একজন আহীর ছিল। এই আহীর পুঙ্গব চৌখণ্ডিতে বাস করিতেন ও আকাশপথে ধামেক পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেন, ইত্যাদি। "কুদান" শব্দের অর্থ লম্ফ।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন সারনাথের ধ্বংস সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সারনাথে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। উপরে বলা হইয়াছে, একাদশ শতাব্দীতে মহীপালের সময়ে সারনাথের কোন স্তূপ সংস্কৃত হইয়াছিল। তখনও ইহা বৌদ্ধদিগের কেন্দ্রস্থল ছিল। হিয়ংসিয়াংর বর্ণনা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন এই স্থান অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। ফাহিয়ান সারনাথ দর্শন করিয়া যে, বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও এই তীর্থস্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই বহুজনসঙ্কুল বহু মঠমন্দিরসম্বলিত পুণ্যভূমির আর আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। একবারে যেন পৃথিবী হইতে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই পুণ্যভূমির অকাললোপসাধন সম্ভবতঃ অত্যন্ত বর্ব্বরতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে সব বস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় অহঙ্কারস্ফীত বিধর্ম্মী প্রবল বেগে অতর্কিত ভাবে ইহার উপর পতিত হইয়া অগ্নি ও তরবারি সহযোগে ইহার বিনাশ সাধন করিয়াছিল।

কানিংহাম সাহেব বলেন, শত শত প্রস্তর মূর্ত্তি, পলায়নপর শ্রমণদিগের দ্বারা এক স্থানে প্রোথিত দেখা যায়। স্থানে স্থানে রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। Major Kittoe বলেন, কি শ্রমণ, কি মন্দির, কি দেবদেবীর মূর্ত্তি সব চূর্ণিত, বিধ্বস্ত ও দগ্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দগ্ধ অস্থি, লৌহ, কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। আবিষ্কৃত বিহারের কোন কোন কক্ষগুলিতে দগ্ধ রুটি ও ডাল, দ্রবীভূত ধাতুপাত্র, প্রাত্যহিক জীবনোপযোগী মৃৎপাত্র ও অন্যান্য বস্তু এক সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন মঠবাসী কেবল অন্ন পাক আরম্ভ করিয়াছে, এমত সময়ে শত্রু আগমনে প্রাণভয়ে পলাইতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পলায়নও সহজসাধ্য হয় না। কারণ আবিষ্কৃত দগ্ধ অস্থিখণ্ডসকল পলায়নের বিফল চেষ্টার

প্রমাণ দিতেছে। অগ্নিসংযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইষ্টকের মধ্যবর্ত্তী সিমেন্ট দগ্ধ হইয়া ইষ্টকের সমান কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ সলৌহ কড়ি বরগার অংশও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইষ্টক,প্রস্তর,কাষ্ঠ লৌহ-শলাকা, পাত্রাদি বহুবিধ বস্তু সম্বলিত রাশীকৃত মৃত্তিকার আবর্জ্জনা ঘরের মেজে হইতে ৬ ফিট পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পড়িয়া ছিল। মোট কথা, এই সকল দেখিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ধর্ম্মদ্বেষী বৈরী ভিন্ন এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে ধর্ম্ম মন্দির নষ্ট করা আর কাহার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উপরিলিখিত দগ্ধ জিনিষের কিছু ২ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এখন ঐ সকল কক্ষ অবশ্য পরিস্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে ঐ সকল যথাযথ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন তাঁহাদেরই উক্তি উপরে লিখিত হইল।

কোন সময়ে এই বর্ব্বরতাজ্ঞাপক ধ্বংসকার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সঠিক অবধারিত হয় নাই। তবে ১৯০৯ সনের Benares Gazetteer এ যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপাততঃ প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গেজেটের সম্পাদকের মতে, দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ বিহার অতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১১৯৪ খ্রীঃ অব্দে সহাবুদ্দীন ঘোরি প্রেরিত কুতুবুদ্দিন ও তাঁহার সেনাপতিদিগের বিজয় অভিযানের ফলে সারনাথ এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।

এই অনুমান ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে পারে। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে বিহার নামক স্থানে অবস্থিত পাল রাজাদিগের একটি দুর্গ ধ্বংস করেন। ঐ স্থানে বৌদ্ধ মন্দিরাদি চূর্ণিত হয়, ও সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু নির্দ্দয় রূপে হত হয়। ধ্বংস ব্যাপার এরূপ ভীষণ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সেনাপতি মন্দিরগুলিতে প্রবেশ করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ দেখিয়া, সে সকল গ্রন্থ কিসের তাহা জানিবার জন্য একটি লোকও খুঁজিয়া পাইলেন না। এই ধ্বংসনিপুণ সেনাপতি বৌদ্ধদিগের নিপাতসাধনের জন্য এতই বদ্ধপরিকর ছিলেন যে বৌদ্ধভূমি মগধের অন্যান্য স্থানেও তিনি এইরূপ করিয়া বেহার হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ করিয়াছিলেন। যে দুই একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিল তাহারা নেপাল বা দক্ষিণ ভারতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এই কুতুবুদ্দীন বাহিনীই পর বৎসরে বঙ্গ জয় করে।

বঙ্গ বিজয়ের বৎসরেই অর্থাৎ ১১৯৪ অব্দে কুতুবুদ্দীনের সৈন্যদল কাণ্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভূত করে। তৎকালে বারাণসী এই জয়চন্দ্রের অধীন ছিল—তথায় তাঁহার দুর্গও ছিল। ইহাও শত্রুর হস্তগত হইয়াছিল। Meadows Taylor বলেন বারাণসী জয় করিতে স্বয়ং সাহাবুদ্দীন ঘোরীও উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহার আদেশে তথাকার মন্দিরাদির ধ্বংসও এই সময়েই সংসাধিত হইয়াছিল।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

ভাটিয়াল গান। *

ভাটিয়াল গানগুলি পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব জিনিস। গ্রাম্য কবিরা এই ভাটিয়াল সুর অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রাণের সরল কবিত্ব মাখা ভাবগুলি অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের পথে প্রান্তরে, পল্লীতে পল্লীতে, খাল বিলে, নদী নালায় কৃষক ও নাবিকের কণ্ঠে কণ্ঠে এই গানগুলি বিচিত্র ভাবে দিবানিশি গীত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার আগমনে প্রকৃতি দেবী যখন তিমিরাবগুণ্ঠনে মুখকমল আবরিত করেন, এবং নৌকার মাঝিরা মন্থর ভাবে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে মানব হৃদয়ের বিবিধ সুখদুঃখ মাখা এই গানগুলি সুমিষ্ট ভাটিয়াল সুরে গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া যায়, তখন নদীর উভয় কূলে সুধাধারা বর্ষিত হইতে থাকে এবং

* (ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত)

শ্রোতার মন কেমন এক রকম উদাস ভাবে ডুবিয়া যায়।

এই বিশেষ সুরের আবিষ্কর্ত্তা কে তাহা জানা যায় না। তবে সাধারণতঃ নৌকা যখন ভাটি চলিতে থাকে তখনই এই সকল গান গাওয়া হয় বলিয়া হয়ত এই সুরের "ভাটিয়াল রাগিণী" নাম হইয়াছে। ভাটি ছাড়িয়া দিলে নৌকা পরিচালনে মাঝিদিগের অখণ্ড মনোযোগ ও বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকে না। তখন তাহারা এই ক্লান্তিহরা রাগিণীতে মনের আনন্দে গান গাহিয়া থাকে। ভাটি অঞ্চলে—বরিশাল প্রভৃতি জেলায়—এই সুর আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রকার নাম করণ হইয়াছে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

"বেহাগ," "ভৈরবী" বা "বাগেশ্রী" বলিলে যেমন উক্ত নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন রাগিণীর বোধ হয়, "ভাটিয়াল রাগিণী" বলিলেও তদ্রূপ অন্য আর একটি রাগিণী বুঝায়। তবে আধুনিক বলিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নাম নাই।

কোন নির্দ্দিষ্ট রাগিণীর সকল গানগুলিই যে শুনিতে অবিকল এক রকম হইবে এমন কোন কথা নাই। সা, রি, গা, মা প্রভৃতি স্বরমালাযুক্ত রাগিণীর বিভিন্ন অংশসমূহের বিন্যাস ও ঐ সকল সুরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সকল কৌশল প্রয়োগ করার রীতি আছে যে, মূল রাগিণীটি বজায় রাখিয়াও উহার আকৃতিতে বহু বিভিন্নতা সম্পাদন করা যায়। এ যেন ঠিক কোন একজন লোকের শোয়া, বসা, দাঁড়ান বা অন্য কোনও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন 'ফটো'। পরিচিত ব্যক্তিরা, অঙ্গ-বিন্যাসের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও উহার প্রত্যেকটি ফটো দেখিবামাত্রই যেমন লোকটিকে অনায়াসে চিনিতে পারেন, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণও সেইরূপ শ্রুতমাত্রই কোন একটি বিশেষ রাগিণীর বিভিন্ন আকারের গানগুলিকে সেই রাগিণীর বলিয়া বুঝিতে পারেন :

সুতরাং "ভাটিয়াল রাগিণীর" যাবতীয় গানই যে ঠিক এক নির্দ্দিষ্ট আকারের হয় তাহা নহে। এই রাগিণীর সুরবিন্যাসে যে একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা হইতেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গানটি শুনিলেই ইহার বর্ণ নির্ণয় করিতে পারেন।

কিন্তু "বেহাগ" "ভৈরবী" "বাগেশ্রী" প্রভৃতি, রাগিণীর যেরূপ আভিজাত্যের পারিপাট্য—উহারা যাহাতে বর্ণসঙ্কর দোষে দুষ্টা না হয় সেদিকে কলাবৎ-দিগের যেমন কঠোর দৃষ্টি—"ভাটিয়াল" সম্বন্ধে তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কলাবৎ-কুল ইহাকে আদর করেন না। ইহা হতাদরে সুদূর পল্লীর মাঠে প্রান্তরেই পড়িয়া আছে। তবে আজকাল গ্রামোফোন প্রসাদাৎ নগরেও ইহার করুণ কাকলী শুনা যায় বটে। ভাটিয়াল রাগিণীতে হয় ত অন্য রাগিণীর সুর বেমালুম মিশিয়া আছে। এরূপ মিশ্রণ সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে নিন্দনীয়। যদিও "বেহাগ-খাম্বাজ, "সিন্ধুভৈরবী," "ইমন-কল্যাণ" প্রভৃতি মিশ্র রাগিণীর বহু গান বিদ্যমান তবুও ইহা দ্রষ্টব্য যে ঐ সকল স্থলে রাগিনীগুলি যেন পরস্পর কোলাকুলি, গলাগলি করিয়া আছে ; কোথাও উহাদের মধ্যে "রাসায়নিক" সংযোগ হইয়া আত্মবিলোপ ঘটে নাই।

যেমন "কীর্ত্তন" বলিলে এক শ্রেণীর অনেক রকমের গান বুঝায়, "বাউল সুরের গান" বলিলে আর এক শ্রেণীর বহু প্রকারের গান বুঝায়, সেইরূপ "ভাটিয়াল গান" বলিলেও অন্য আর একজাতীয় বিবিধ আকারের গান বুঝা যায়। কিন্তু "ভাটিয়ালে"র রাগিণী-স্বাতন্ত্র্যটুকু "কীর্ত্তন" ও "বাউল" সুর অপেক্ষা বহুগুণে স্পষ্ট। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই রাগিণীর প্রধান গুণ, অতি সহজে লোকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া তোলা। এই বিশেষ গুণের জন্যই এই রাগিণীটি এদেশে এত জনপ্রিয়।

ভাটিয়াল সুরের অসংখ্য গান আছে। সংগ্রহ করিলে বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। অন্য বিভিন্ন ভাবের ছয়টি মাত্র গানের উল্লেখ করা হইল।

প্রথম গান

বাধনায় লইয়া যায় বৈদেশী বন্ধুয়ায় নায়।

আরে কইও কইও কইও গো খপর খশুরের আগে,—
আমারে যেন্ তালাস করে গাঙ্গের কূলে কূলেরে।

আরে কইও কইও কইও গো খপর শাশরীর আগে,
কোলের ছাওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে।

আরে কইও কইও কইও গো খপর ননদীর আগে,—
অখন যেমুন কাইজা করে জলের কলসীর লগে রে।

আরে কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে,
পালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে রে।

এই গানের নায়িকাটিকে কোন ব্রাহ্মণকুমার অবৈধ ভাবে লইয়া যাইতেছিলেন। প্রণয়ীর সঙ্গে পতিপুত্র, গৃহ স্বজন ছাড়িয়া ওরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে নায়িকাটিরও যে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না, তাহা "বৈদেশী বন্ধুয়া" পদটিতে প্রকাশ। তবে সে নিতান্ত পাষাণীও ছিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে মমতার একটি অতি ক্ষীণ ধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল; তাই হয় ত প্রথমটা তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইবার একটু ইচ্ছাও হইয়া থাকিবে। তাই সে "শ্বশুরের আগে খপর" পাঠাইতেছিল যে তাহাকে যেন "গাঙ্গের কূলে কূলে তালাস" করা হয়। গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হওয়ার প্রধান কারণ, ঐ "কোলের ছাওয়াল।" বুঝি মাতৃস্নেহে, আশু বঞ্চিত শিশুর করুণ মুখখানি থাকিয়া থাকিয়া হতভাগিনীর মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাই যখন সে দেখিল গৃহে ফিরিবার তাহার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে "শাশরীকে" সেই অসহায় শিশুটির তত্ত্বাবধান করিতে সংবাদ পাঠাইবার চেষ্টা করিল। ইহার পরবর্ত্তী পদটি শুনিলে পল্লীগৃহের একটি সর্ব্বজনবিদিত অপ্রীতিকর চিত্র মনে পড়ে। সেটি ননদভাজের কলহ। এখানে ননদটির উদ্দেশে একটু ঠাট্টার ভাবও যেন লুকায়িত আছে। ননদিনী তাহার এই ভ্রাতৃবধূটিকে বোধ হয় বড় বেশী জ্বালাইত; তাই তাহার উদ্দেশে বলা হইল যে "এখন যেন কাইজা করে জলের কলসীর লগে রে।" সর্ব্বশেষে হতভাগ্য স্বামী বেচারাকে একটি অমূল্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বামিগৃহের অবস্থাও বোধ হয় স্বচ্ছল ছিল না,—না হইলে "পালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে" এ উপদেশ কেন? তা' আশা করা যায় স্বামীটি উক্ত উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অন্যথা করে নাই।

এই অতিক্ষুদ্র সহজ সরল গানটিতে অপ্রথিতনামা কবি একটি বিপথগামিনী রমণীর মনের বিবিধ বিরুদ্ধ ভাবের উত্থানপতনের সুন্দর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন করুণ উদাস ভাটীয়াল সুরে যখন এই গানটি গীত হয় তখন চক্ষের সম্মুখে আমরা যেন গানে বর্ণিত আরোহী দুইটিকে একখানি ডিঙ্গি নৌকায় নদীর কূলে কূলে দ্রুত বেগে চলিয়া যাইতে দেখি।

এই গানের কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত। যথা:—

বিদেশী	স্থলে	বৈদেশী।
খবর	"	খপর।
যেন	"	যেন্
নদী	"	গাঙ্গ
শাশুরী	"	শাশরী।
ছেলে	"	ছাওয়াল।
মশারি	"	মশৈর।
ঝগড়া	"	কাইজা।
সঙ্গে	"	লগে।

দ্বিতীয় গান

জান তরে মৈষে মার্বো!
মৈষাণ মৈষাণ বলি রে আমি—
মৈষাণ কাচা সোনা,
বন্দের থনে আইলা মইষ,
বাড়ীত্ বাইন্ধা থুইও রে।

আরে আমার বাড়ী যাইওরে মৈষাণ,
বস্‌তে দিমু রে পীড়ি,
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈষাণ,
শাইল ধানের মুড়ি রে।

শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈষাণ,
বিন্নি ধানের রে খই,—
আরে পেট্‌ মোটা সবরি কলা রে মৈষাণ.
গামছা বান্দা দইও রে

ইহা একটি প্রণয় সঙ্গীত। কোন গ্রাম্য তরুণী কোনও তরুণ মহিষপালকের দর্শনে মোহিত হইয়া তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিল। প্রণয়িণীর প্রণয়পূর্ণ হৃদয়ে সদাই আশঙ্কা—কখন জানি তাহার প্রণয়ীকে মহিষে মারিয়া ফেলে! তাই সে প্রথমেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে। কিন্তু ভালবাসার এমনই স্বভাব যে দয়িতকে একবার মাত্র সম্বোধন করিয়া তরুণী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। সে বার বার "মৈষাণ, মৈষাণ" বলিয়া প্রণয়ীকে সম্বোধন করিতেছে; অহো "মৈষাণ" যুবক যে তাহার প্রেম পূর্ণ নয়নে "কাঁচা সোনা"রই মত কান্ত কোমল! সে কি মাঠে মাঠে মহিষ চরাইবার যোগ্য! অতএব সে তাহাকে মহিষগুলি মাঠ হইতে গৃহে আনিয়া বান্ধিয়া রাখিবার উপদেশ দিল।

তার পর প্রণয়ীটিকে সে তাহার নিজ বাড়ীতে আহ্বান করিল, এবং কেমন করিয়া আদর যত্ন করিবে তাহা জানাইতে লাগিল। তাহার "মৈষাণ" কে সে যে সকল সামগ্রী সহযোগে অভ্যর্থনা করিবে ও ভোজন করাইবে তাহারই উল্লেখ করিল। গ্রামে যে সকল আড়ম্বরহীন সুন্দর খাদ্য কৃষকেরা তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করে, উহা সেই সকল জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা শালি ধান্যের মুড়ি, বিন্নি ধানের খই, সুপক কদলি ও উৎকৃষ্ট দধি। বসিবার আসনটিতেও কোন আড়ম্বর নাই, একখানা সামান্য পীঁড়ি মাত্র।

এ গানটিতে বালিকা হৃদয়ের প্রেমের স্বাভাবিক ভাবটি কেমন স্নিগ্ধ সরল ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

এ গানটিতেও নিম্নলিখিত শব্দ কয়টির বিশেষত্ব আছে—

প্রাণ	স্থলে	জান
তোরে	,,	তরে।
মহিষ	,,	মৈষ।
মহিষ পালক	,,	মৈষাণ।
কাঁচা	,,	কাচা।
মাঠের	,,	বন্দের।
বান্ধিয়া	,,	বাইন্দা।
রাখিও	,,	থুইও
দিব	,,	দিমু।
শালিধান্য	,,	শাইল ধান।

"বিন্নিধান" এক প্রকার ক্ষুদ্র ধান্য।

"গামছাবান্দা দই" অর্থাৎ অতরল শক্ত উৎকৃষ্ট দধি—গামছা দিয়া যাহা বান্ধিয়া রাখা যায়।

"শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈষাণ" পদটিতে "না" শব্দটি বোধ হয় নিশ্চয়ার্থ প্রকাশক। বহু ভাটিয়াল গানে এইরূপ "না"র প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু সব স্থলেই ইহার এক অর্থ নহে। ইহার পরবর্ত্তী গানটিতেও এরূপ "না"র ব্যবহার আছে। আধুনিক কবিরাও এরূপ প্রয়োগ করেন। স্বনামধন্য মাননীয় কবি শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের "আমার দেশ" নামক বিখ্যাত সঙ্গীতটিতে "না"র এরূপ প্রয়োগ আছে। যথাঃ—

"তুই ত না মাগো তা'দের জননী,
"তুই ত না মাগো তা'দের দেশ।"

তৃতীয় গান

একদা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বসিয়া আছি। চারিদিক নিস্তব্ধ প্রায়। ক্ষণে ক্ষণে ঘুঘু, দয়েল প্রভৃতি নানা পাখীর

বিচিত্র কূজনে নয়নপল্লবে নিদ্রার আবেশ হইতেছে। এমন সময়ে রাখালকণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটি শুনিতে পাইলাম :—

"হারে কোন্ না জাউলার মাছ রে খাইয়া
না দিছিলাম রে কড়ি—
হায় রে তার জন্যে হইলাম বুঝি
অল্প বইসা রাড়ী রে।"

পদ শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। আমি সমস্ত গানটি শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলাম। সে গাহতে লাগিল :—

আমায় পাগল কইরা গেলা—
আমায় অনাথ কইরা গেলা রে প্রাণনাথ
আমায় পাগল কইরা গেলা।

আরে কোন্ না জাউলার মাছ রে খাইয়া
না দিছিলাম রে কড়ি,—
হায় রে তার জন্যে হইলাম বুঝি
অল্প বইসা রাড়ী রে।

"আরে কা'র জানি ভরা রে ক্ষেতে
দিয়াছিলাম রে হাত,—
হা'রে তাইতে বুঝি আমার মাথায়—
এমন বজ্রাঘাত রে।

আরে কোন আয়তীর সিথীর রে সিন্দুর
আমি ফেইলাছি মুইছা,
হায় রে তার শাপে দারুণ রে বিধি
তোমায় গেল লইয়া রে।"

বালক ধীরে ধীরে গানটি শেষ করিল। কিন্তু আমার হৃদয়পটে যে একটি বিষাদমাখা প্রতিমা অঙ্কিত হইয়া রহিল, তাহা কেমন করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিব? আমার বোধ হইল যেন গ্রীষ্মের সেই অপরাহ্নে কোনও গৃহস্থের নিভৃত গৃহে কোন শোকবিহ্বলা বালবিধবা তাহার পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে এই মর্ম্মবেদনা মাখা কথাগুলি অশ্রুসিক্ত করিয়া নিবেদন করিতেছে। আর তাহার সেই বুকফাটা গানে মধ্যাহ্ন প্রকৃতিও যেন চলিতে চলিতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রাম্য কবি কেমন তীব্র অনুভূতির সহিত একটি শোকাহতা বালবিধবার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছেন! নিরক্ষরা, জ্ঞানহীনা তরুণীর হৃদয়ে এই সঙ্গীতোক্ত আত্মকৃত কর্ম্মসমূহই তাহার এই দারুণ বৈধব্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হওয়া অতি স্বাভাবিক।

সে এই ভোগলালসাময় যৌবনে বঙ্গের প্রধান খাদ্য মৎস্য হইতে বঞ্চিতা হওয়ায় সহজেই মনে করিল, হয় ত সে কোন মৎস্যব্যবসায়ীর মৎস্য কিনিয়া মূল্য দেয় নাই, তাই তাহার এই দুর্দ্দশা!

তাহার স্বামীর সঙ্গে সে সুখের সংসারটি পাতিয়াছিল মাত্র; কিন্তু হায়! কবে যেন সে কাহার "ভরা ক্ষেতে" হাত দিয়াছিল, তাই বুঝি তাহার সে সুখের সংসার ছার খার হইয়া গেল—সংসারের সারধন স্বামীরত্ন সে হারাইল!

হায়! এই সকল অপরাধগুলির কথা উল্লেখ করিয়াও তাহার মন প্রবোধ মানিল না। সে নিশ্চয়ই আরও কোন ভয়ানক পাপ করিয়াছে! কবে যেন সে কোন "আয়তীর"—সধবার চিহ্ন সিঁথীর সিন্দুর মুছিয়া ফেলিয়াছে, তাই "দারুণ বিধি" তাহার ও সিঁথীর সিন্দুর উঠায়াছেন,—তাহার শিরে এই "বজ্রাঘাত" করিয়াছেন। আর তাই আজ তাহার বুক ফাটিয়া বিলাপগাথা বাহির হইয়াছে "আমায় পাগল কইরা গেলা রে প্রাণনাথ।"

চতুর্থ গান

এখন যে গানটির বিষয় উল্লেখ করা হইবে উহা সেই চিরপুরাতন কিন্তু চিরনবীন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর একটি সরস সুন্দর চিত্র অবলম্বনে রচিত।

বৃন্দাবনের সেই নটচূড়ামণির সঙ্গে প্রথম মিলনের পূর্ব্বক্ষণে শ্রীরাধিকা একদিন রূপবিহ্বলা গোপললনা-

দিগের সহিত কানন-পথ কলহাস্তে মুখরিত ও মঞ্জীররাবে অনুরণিত করিয়া কলসী কক্ষে ধীরে ধীরে যমুনাকূলে গমন করিতেছিলেন।

এদিকে নিখিল-মনোমোহন শ্যামসুন্দর, সুবল সখার সঙ্গে অদূরে অবস্থিত। লোকললামভূতা রমণীরত্নকে সখী সঙ্গে তদবস্থায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাহাকে রাধা বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে চিনিতে পারেন নাই। তাই সুবল সখাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"প্রাণের সুবল রে
আরে কার কামিনী জলে যায়।
"সোনার নূপুর রাঙা পায়
রুণু ঝুনু বাজ্য শুনা যায়;
হাউল্‌কা (হাল্‌কা) মাজা পবনে হেলায়।

"উল্টা খোপায় বান্ধা চুল,
খোপায় শোভে নানান জাতি ফুল,
ওরে মধুর লোভে ভ্রমর আসে যায়।

"দুই সখী জলেরে যায়,
আরেক সখী হেইলা পড়ে গায়;—
ওরে অনুভবে বুঝি রাধা যায়।"

এ গানে "মাজা" শব্দে কটিদেশকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কথিত ভাষায় এই অর্থে 'মাজা' শব্দের যথেষ্ট প্রচলন দৃষ্ট হয়।

"খোপা" কবরী অর্থে ব্যবহৃত।
"জলেরে যায়"—জল আহরণার্থ যায়।

এই অর্থে ঢাকা জেলায় "জলে" যায় বা "জল" যায় এরূপ প্রয়োগ আছে। "জলে যায়" ত আলোচ্য গানেই আছে। শুনিয়াছি বাঁকুড়া অঞ্চলে "জলকে চল্‌" বলে। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য "মানসী"তেও পাঠ করিয়াছি :—

"বেলা যে প'ড়ে এলো
জলকে চল।"

পঞ্চম গান।

এ গানটি জীবনের অসারতা সম্বন্ধে। আজীবন সংসারমোহে মুগ্ধ হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ স্থায়ী জানে সারাটা জীবন কাটাইয়া দিলাম—বারেকের তরেও ভগবানের কথা ভাবিলাম না! এখন জীবন-সন্ধ্যায় সুপ্তোত্থিতবৎ দেখিতেছি হায়! বৃথা এ জীবন কাটাইয়াছি—আর সংশোধনের সময় নাই—এ সংসারে কেবল আসিলাম আর গেলাম! দিবসের অবসানে শ্রান্ত দেহে যখন কৃষক-বৃন্দগণ উক্ত রূপ মনোভাব করুণ কণ্ঠে গাহিতে থাকে—

"জীবনের নাই রে আশা,
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।"

তখন যেন সমগ্র পল্লীটিও সন্ধ্যার তিমিরাবরণে আবৃত হইয়া ধীরে ধীরে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়! তাহারা গাহিতে থাকে—

"দেহের গুমান কর মিছে,
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে'?
কাঁদি শমনে জাল পেতেছে,—
ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।

"ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
সকল পথের পরিচিত।
যখন প্রাণ তোর হ'বে হত
কেউনা রে করবে জিজ্ঞাসা।

"আপন আপন বল যারে
কেউত সঙ্গে যাবে না রে!
গুরু ভজন হইল না রে
কেবল ভবে যাওয়া আসা।

"কুমারের হাড়ি দড়ি,
আর অষ্ট কড়া কড়ি,
চাইর জনাতে কান্ধে করি'
গাঙের কূলে দিবে বাসা।"

এ গানটিতে "গুমান" শব্দটি মাত্র লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহা অহঙ্কার অর্থে প্রযুক্ত।

ষষ্ঠ গান

এ গানটি গুরু মীননাথের উদ্দেশে তদীয় শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গীত।

নিম্নে গুরু মীননাথের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে "গোরক্ষ সম্প্রদায়ী" নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। গুরু মীননাথের শিষ্য মহাত্মা গোরক্ষনাথের নাম হইতেই এই সম্প্রদায়ের উক্ত নাম হইয়াছে।

প্রবাদ যে গুরু মীননাথ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কিন্তু কর্ম্মফল ভোগ শেষ না হওয়াতে একদা তিনি ও তাহার প্রিয়তম শিষ্য গোরক্ষনাথ কোনও রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। সে স্থানে পরম তৃপ্তির সহিত রাজদত্ত বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য আহার করিয়া গুরু মীননাথ এত প্রলুব্ধ হ'ন যে ৩।৪ দিন অতীত হইয়া গেলেও তিনি তথা হইতে প্রস্থানের নাম করেন না। এদিকে তদীয় সংসারবিরাগী শিষ্য বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং ধ্যানবলে জানিতে পারেন যে গুরুজীকে তাঁহার কর্ম্মফলানুযায়ী কিছু দিন সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসার ভোগ করিতে হইবে। তখন তিনি গুরুর অনুমতি লইয়া অন্যত্র চলিয়া যান, এবং গুরুজীও বিনা বাক্যব্যয়ে শিষ্যকে বিদায় দিয়া পরম সুখে রাজভোগে পরিতৃপ্ত হইতে থাকেন।

এ দিকে রাজা গুরু মীননাথের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজবেশে সুসজ্জিত করিয়া স্বীয় পরমরূপবতী দুহিতারত্নকে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর নিয়তিপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া রাজ-জামাতা রূপে সংসারের যাবতীয় তথাকথিত সুখরাজি সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিন পরে মহারাজা স্বীয় বার্দ্ধক্যনিবন্ধন পুত্রাভাবে জামাতাকেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। পরে কিছু দিন পরে তাঁহার স্বর্গলাভ হইল। গুরু মীননাথ রাজা হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বহু দিন চলিয়া গেল, কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র লীলা যে ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল না। রূপবতী ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও বিপুল রাজ্য লইয়া তিনি তখন মহা সংসারী।

এ দিকে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে যদিও আমি শিষ্য তথাপি গুরুদেবের উদ্ধার সাধন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি উক্ত রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই রাজপুরীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ বৃদ্ধ রাজা জীবিত থাকিতেই আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজভবনে যেন কোন সময়ে কোন সাধু, সন্ন্যাসী, বা ভিক্ষুক প্রবেশ করিতে না পারে। তদীয় মৃত্যুর পরেও এই আদেশানুযায়ী কার্য্য হইত। ভয়, পাছে বা কোন উদাসীনকে দেখিয়া মীননাথের পূর্ব্বকথা স্মরণ হয় এবং তিনি রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান।

গোরক্ষনাথ কি করেন। তিনি রাজপুরীর বাহিরে প্রতিদিন "চেৎ মীননাথ! গোর্খা আয়া!"—মীননাথ, চৈতন্য লাভ কর—গোরক্ষনাথ আসিয়াছে—বলিয়া—চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদা হঠাৎ মীননাথ উহা শুনিয়া গোরক্ষনাথকে ডাকাইয়া নিভৃতে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং কথঞ্চিৎ চৈতন্যলাভ হওয়ায় নিশীথে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ মায়া তাঁহার কাটে নাই। তাই পুঁটুলি করিয়া কিছু মণিমুক্তা লইলেন। না হইলে পথে খাইবেন কি? গোরক্ষনাথকে বার বার সাবধান করিয়া দিলেন, ওগুলি না হারায়।

দুই জনে অন্ধকারময় বনপথে চলিতেছেন, আগে গুরুদেব পশ্চাতে শিষ্য। গোরক্ষনাথ গুরুর অলক্ষ্যে একটি একটি করিয়া মণিগুলি ছুড়িয়া ফেলিতেছেন ও অগ্রসর হইতেছেন। যখন ভোর হইয়াছে, তখন মীননাথ

পেছন ফিরিয়া দেখেন, গোরক্ষনাথের হাতে উক্ত পুঁট্‌লিটি নাই। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং ঐ মণিমুক্তাগুলির জন্যে শোক করিতে লাগিলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ নানা উপদেশে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফল না হওয়াতে অবশেষে তিনি নিকটবর্ত্তী একটি শিলাখণ্ডের উপর মূত্রত্যাগ করিয়া উহাকে একটি বহুমূল্য মণিখণ্ডে পরিণত করিলেন, এবং মীননাথকে দেখাইয়া বলিলেন "গুরুদেব, আপনারই উপদেশানুযায়ী তপস্যা করিয়া আমি এই শক্তি লাভ করিয়াছি এবং আপনারই উপদেশে জানিয়াছি যে এ শক্তিও হেয়; একমাত্র আত্মোপলব্ধিই পরম পদার্থ। আর আপনি কি না এই তুচ্ছ পুরীষমূত্রবৎ ধনের শোকে মুহ্যমান হইতেছেন? মায়ামোহ ত্যাগ করুন; আত্মায় ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি করুন। আমি আপনাকে কি আর বেশী বলিব?"

তখন হঠাৎ মীননাথের মোহ দূর হইল। উষাগমে ভানুদয়বৎ আত্মার নির্ম্মল বিভা হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। গুরু শিষ্য দুইজনে পরমানন্দে আত্মস্থ হইলেন।

আমাদের সংগৃহীত গানটি গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক রাজরূপী মীননাথকে আহ্বান। এ আহ্বান অতি বিচিত্র। উহা এই:—

শোন্ গুরু সেবকের বোল
ছাড় রে কামিনীর কোল।
তুমি দিনে দিনে ঘাটে ভরা বোরাইলা রে
—গুরু মীননাথ রে।

১

ও গুরু হে কভু নি দেইখাছ গুরু
ইহা নি শুইনাছ রে
তাল গাছে লাল বাঘের ছাও!
—গুরু মীননাথ রে।
খঞ্জন পক্ষী হইয়া সে আধার যোগাইল রে,
আধারে ধইরা খাইল ছাও!
—গুরু মীননাথ রে।

২

"ও গুরু হে কভু নি দেইখাছ গুরু,
ইহা নি শুইনাছ রে
দামুরা ছিড়া পাগায় লড় দেয়
—গুরু মীননাথ রে
সাতালি পর্ব্বতে গুরু সে ঘোড়া দৌড়াইল রে
আসমানে ওড়ে মরা গোরু!
—গুরু মীননাথ রে।

৩

ও গুরু হে বাঘে মৈষে জুইড়া হাল
বান্দার কৃষাণ, পাণির কুমইরে উরা বাছে!
—গুরু মীননাথ রে।
পাণির কুমইর হইয়া সে উরা বাছিল রে,
ইন্দুরে বুইনা গেল ধান!
—গুরু মীননাথ রে।

৪

ও গুরু হে উজানি নগরে গুরু
সে মচ্ছ উজাইল রে
চরজীরা পল লইয়া যায়!
—গুরু মীননাথ রে।
শৈল শৈল বইলা গুরু সেই না চাব দিল রে
আরে ডাইন্ কাইলায় পল ভাইঙ্গা যায়।
—গুরু মীননাথ রে।

৫

"ও গুরু হে আটু হইল নরবির শরীল হইল কিম্বর
কেশ হইল বাগুরার পাখী!
—গুরু মীননাথ রে

৬

ও গুরু হে অমাবস্যা মঙ্গলবার
দ্বিতীয়া পালিও রে,
ডাইন অঙ্গে না ছোয়াইও নারী!
—গুরু মীননাথ রে।

৭

ও গুরু হে উপ্তা লাচারীর গীত
শোন ওহে পণ্ডিত,
রাজা হইয়া না করলা বিচার!
—গুরু মীননাথ রে।

এই গানটি বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। ইহার ভাষাও নিতান্ত গ্রাম্য। ইহার বহু শব্দই নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। *

এই গানের প্রত্যেক পদেই অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম আর কিছুই নহে—জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী মীননাথও যদি সংসারাসক্ত হইয়া কামিনীকাঞ্চন উপভোগে প্রবৃত্ত হন তবে গানে বর্ণিত সমস্ত ব্যাপারগুলিও সম্ভব হইতে পারে।

প্রথমেই গোরক্ষনাথ গুরুকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"গুরুদেব, সেবকের কথা শোন—তুমি রমণী-সঙ্গ পরিত্যাগ কর। হায়! দিনে দিনে তুমি ঘাটেই ভরা ডুবাইতেছ।—কি করিয়া এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হইবে?

গুরু এ কথা কি কথনও শুনিয়াছ যে তাল বৃক্ষের উপরে ব্যাঘ্র শাবক রহিয়াছে, আর খঞ্জন পক্ষী তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সেই খাদ্যই সজীব হইয়া সেই ব্যাঘ্রশাবককে ধরিয়া ভক্ষণ করিল?

ইহাও যেমন অসম্ভব, হে গুরু মীননাথ তোমার সংসারাশক্তিও তেমনই অসম্ভব!

গুরু, এ কথা কি কখন শুনিয়াছ যে গোবৎসকে ছিন্ন করিয়া তাহার বন্ধনরজ্জু দৌড়াইয়া পালায়? পুনশ্চ "সাতালি" পর্ব্বতে গিয়া সে অশ্বারোহণে দ্রুত চলিয়া যায় এবং মৃত গোরু আকাশে উড়িয়া বেড়ায়?

গুরু, এ কথা কি কখন শুনিয়াছ যে ব্যাঘ্র ও মহিষকে একত্র করিয়া কৃষক তাহাদের সাহায্যে হল চালায়, আর অগাধজলসঞ্চারী কুম্ভীর আসিয়া কৃষকের ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা বাছিয়া দেয়, এবং ইন্দুরকুল অনুকূল হইয়া তাহার ক্ষেত্রে ধান বুনিয়া দেয়?

গুরু, এ কথাও কি শুনিয়াছে যে উজানি নগরে মাছ উজাইয়া উঠিল, এবং চরঙ্গী নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য "পল" লইয়া উহা ধরিতে গেল; এবং "শৌল" "শৌল" বলিয়া সে "পল" দ্বারা উহা ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু "ডাইন কাইনা" নামক অন্য এক অতি ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য সেই "পল" ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল?

গুরু, হাঁটুই নরবর রূপে পরিণত হইল এবং সমস্ত শরীর তার কিঙ্কর হইল; মুক্ত গগনবিহারী পক্ষী বাগুরার জালে রূপান্তরিত হইল! (এই ৫ম পদটির অর্থ ভাল করিয়া বোঝা গেল না।)

গুরু, এ সব অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? কখনই নহে! অতএব হে গুরুদেব, তোমার এ সংসারাসক্তিও অসম্ভব, সুতরাং তুমি নিম্নলিখিত উপদেশ মত কার্য্য করিয়া পুনরায় মুক্ত হও।

তুমি অমাবস্যা মঙ্গলবার এবং দ্বিতীয়া তিথি পালন করিও এব[illegible]মায় দক্ষিণ অঙ্গে রমণী স্পর্শ করিও না।

এই "উপ্তালাচারী"—বিপরীত ভাবের বাক্য পূর্ণ গানটি হে পণ্ডিত, তুমি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। রাজা হইয়া কেন তুমি সদসৎবিচারশূন্য হইলে?

---

* যে বৃদ্ধ কৃষকটির নিকট হইতে এই গানটী সংগৃহীত হইয়াছে সে গুরু মীননাথের ইতিহাসটি অতি সংক্ষেপে দু'কথায় বলিয়াছিল। ঐ সংগ্রহের কয়েক বৎসর পরেই ১৩০৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "নব্য ভারতে" "চেৎ মীননাথ" নামক প্রবন্ধে উক্ত মহাপুরুষের বিবরণ বাহির হয়। ঐ প্রবন্ধটী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন অথবা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের লেখা। উহা হইতেই মীননাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (নব্য ভারতের উক্ত প্রবন্ধটির পাদদেশে চন্দ্রশেখর বাবুর নাম কিন্তু বর্ষশেষের সূচীতে মনোরঞ্জন বাবুর নাম।) ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসের সাহিত্যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যোগি-মতের প্রাচীন গ্রন্থ নামক প্রবন্ধে মহানুভব শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "গোর্থবিজয়" নামক এক বহু পুরাতন গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের বিষয় একটু অন্য রকম। প্রবন্ধটি সাহিত্যের উক্ত সংখ্যায় শেষ হয় নাই; পরবর্ত্তী প্রবন্ধ আমার নয়ন গোচর হয় নাই। —লেখক

এই গানের "সাতালি পর্ব্বত" ও "উজানী নগর" কোথায় এবং ইহাদের কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না জানি না।

সঙ্গীতোক্ত নিম্নলিখিত শব্দগুলি প্রণিধান যোগ্য :—

বোল—কথা।

ভরা—পণ্যপূর্ণ নৌকা।

বোরাইলা—ডুবাইলা।

ছাও—বাচ্চা ; ছানা।

আ'ধার—সাধারণতঃ পক্ষী ও মৎস্য জাতির খাদ্য।

দাম্‌রা—ষাঁড় বাছুর।

পাগা—গোরু বাঁধা দড়ি।

লড়—দৌড়।

আশমান—আকাশ।

জুইড়া—জুড়িয়া।

বান্দার—(অর্থ বুঝা গেল না)

কুমইরে—কুম্ভীরে।

উরা—ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা।

বুইনা—বুনিয়া ; বপন করিয়া।

মচ্ছ—মৎস্য।

উজাইল—বর্ষার প্রারম্ভে খাল, বিল বা পুষ্করের মৎস্য ভাসিয়া ওঠে, কোন কোন মাছ ডাঙ্গা পর্য্যন্তও যায়, ইহাকে মাছ উজান বলে।

চরঙ্গী—ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ।

পল—বংসশলাকা দ্বারা নির্ম্মিত এক প্রকার মৎস্য ধরিবার যন্ত্র। ইহা দ্বারা গৃহ দ্রব্যাদিও ঢাকিয়া রাখা হয়।

শৈল্—শৌল মৎস্য।

চাব দিল—পল দ্বারা ঢাকিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

ডাইন কাইনা—ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ।

আটু—হাঁটু।

উপ্তা—উল্টা।

নাচারী—গান।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

স্বপ্ন

(সংকলিত)

বাগানে একটা বহু দিনকার পুরাণো প্রকাণ্ড দেবদারু গাছ ছিল। গ্রীষ্মের অলস দিনে তার তলে বসিয়া আকিনোসুকে হাওয়া খাইত।

বৈকালে সে দিন বড় গুমট পড়িয়াছে, তাই আকিনোসুকে তার দুই বন্ধু ও 'সাকে'র পেয়ালা লইয়া গাছের তলায় বসিয়া গিয়াছে। দু' এক পেয়ালা নিঃশেষিত হইতে না হইতেই হঠাৎ আকিনোসুকের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। বন্ধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে একটু ঘুমাইয়া লইবার আশায় সেইখানে শুইয়া পড়িল।

তন্দ্রার ঘোরে সে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল—সে যেন তার উদ্যানে শুইয়া আছে। এমন সময় দেখিল নিকটবর্ত্তী এক পাহাড় হইতে এক মিছিল নামিতেছে—ঠিক যেন কোনো সম্ভ্রান্ত দাইম্যোর মিছিল। মিছিলটি দেখিবার জন্য সে উঠিয়া বসিল। চমৎকার বিরাট মিছিল! এমন মিছিল সে জন্মে কখনও দেখে নাই! আবার একি! মিছিলটা যে তার-ই বাড়ীর দিকে আসিতেছে! মিছিলের পশ্চাতে দেখিল সুন্দর-পোষাক-পরা এক দল যুবাপুরুষ একখানা রাজ-শকট টানিয়া আনিতেছে। গাড়ীখানা মস্ত, গাড়ীর জানালা ও দরজায় হরিদ্বর্ণের উজ্জ্বল রেসমী পর্দ্দা। গাড়ীর গা হইতে ল্যাকার-বার্ণিসের দীপ্তি চারি দিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। বাড়ীর নিকট আসিয়া মিছিল থামিল; জাঁকালো-পোষাক-পরিহিত এক ব্যক্তি—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁতে সন্দেহ নাই—অগ্রসর হইয়া আকিনোসুকেকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল :—

"মহাশয়, আমি স্বর্গরাজের ভৃত্য। আমার প্রভু আপনাকে নমস্কার জানাইয়াছেন ও আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি রাজ-বাটীতে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন ও আপনাকে

বহন করিয়া লইবার জন্য এই রাজ-শকট পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া গাড়ীতে উঠুন।"

কথাগুলো শুনিয়া একটা উপযুক্ত উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আকিনোসুকে বিস্ময়ে হৃতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, আর ঠিক সেই সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তিও লোপ পাইল; তাই চুপ্‌চাপ্ রাজভৃত্যের কথামত সে গাড়ীতে উঠিল; ভৃত্য তার পাশে বসিয়া চলিবার আদেশ দিল। যুবকেরা রেশমের দড়ি ধরিয়া গাড়ীখানা দক্ষিণ দিকে ঘুরাইল—যাত্রা সুরু হইল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, আকিনোসুকে সবিস্ময়ে দেখিল, গাড়ীখানা একটা প্রকাণ্ড দোতালা ফটকের সামনে আসিয়াছে। ভৃত্য "আপনার পৌঁছান সংবাদ দিয়া আসি" বলিয়া অদৃশ্য হইল। কিছুক্ষণ পরে দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। বেগুনে রঙের পোষাক্ ও মাথায় উঁচু টুপি তাদের উচ্চ পদের পরিচয় দিতেছিল। তারা আকিনোসুকেকে অভিবাদন করিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল, ও পথ দেখাইয়া চলিল। সেই প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটা বিরাট উদ্যান পার হইয়া তারা রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-পথে উপস্থিত হইল। সে প্রবেশ-পথটি পূর্বে পশ্চিমে কত ক্রোশই না বিস্তৃত হইবে! তার পর তারা যে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল সেটি যেমন প্রকাণ্ড তেমন সুসজ্জিত। আকিনোসুকেকে সম্মানের আসনে বসাইয়া পথ প্রদর্শক দু'জন সম্ভ্রমের সহিত দূরে সরিয়া বসিল। সুসজ্জিতা পরিচারিকারা জলখাবার লইয়া আসিল। জলযোগ শেষ হইলে সেই বেগুনে-পোষাক-পরিহিত লোকেরা অবনত হইয়া অভিবাদন করিল, ও রাজসভার প্রথামত একের পর অন্যে এইরূপে কহিতে লাগিল।

"এখন আমাদের কর্তব্য আপনাকে বলা......... কেন আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে......আমাদের প্রভু মহামহিম রাজার ইচ্ছা যে, আপনি তাঁর জামাতা হন......এবং তাঁর ইচ্ছা এবং আজ্ঞা যে, অদ্যই আপনি বিবাহ করেন......মহামান্য রাজকুমারী তাঁর কন্যাকে ......আমরা অবিলম্বে আপনাকে রাজসন্নিধানে লইয়া যাইব......যেখানে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহিমার্ণব নৃপতি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন......কিন্তু প্রথমেই আপনাকে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইতে হইবে।"

বক্তৃতার পর তারা উভয়ে উঠিল, এবং স্বর্ণ ল্যাকারের একটি বৃহৎ দেরাজ খুলিল। দেরাজ হইতে নানা প্রকারের মূল্যবান পরিচ্ছদ ও একটি রাজ-টুপি লইয়া আকিনোসুকেকে রাজ-জামাতার উপযুক্ত সাজে সজ্জিত করিয়া রাজ-সভায় লইয়া গেল। হরিদ্রা বর্ণের রেশমী পোষাক্-পরা মাথায় উঁচু কৃষ্ণবর্ণ টুপি; দাইজো বা মহা-আসনের উপর রাজা বসিয়া আছেন। তাঁর বামে ও দক্ষিণে আমীর-ওমরাহের দল সার বাঁধিয়া মন্দির মধ্যস্থ বিগ্রহমূর্ত্তির মতো স্থির নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তাঁদের মাঝ দিয়া অগ্রসর হইয়া আকিনোসুকে প্রথমতঃ তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। তাহাকে সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিয়া রাজা কহিলেন—

আমরা কেন তোমাকে আহ্বান করিয়াছি তা' তুমি শুনিয়াছ। আমরা স্থির করিয়াছি, তুমি আমাদের গৃহ-জামাতা হইবে। এইবার বিবাহ হইবে।"

রাজার কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। একখানা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে রূপসী রমণীর দল আকিনোসুকেকে রাজকন্যার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল।

সুবৃহৎ ঘরটি আগন্তুকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেখানে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। রাজকন্যার সামনে নির্দ্দিষ্ট আসনে যখন আকিনোসুকে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তখন উপস্থিত সকলে তাহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিল। স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরার মতো সে রাজকন্যা! তার অঙ্গে যে বসন তা' গ্রীষ্মাকাশের মতো অপরূপ সুন্দর!

বিবাহের পর প্রাসাদের অন্য দিকে তাদের জন্য যে ঘরগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেখানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিয়া নবদম্পতিকে অভিবাদন করিয়া গেল।

তারা উপহার যে কত পাইল তার সংখ্যা করা যায় না।

কিছু দিন পরে আবার রাজার নিকট হইতে আহ্বান আসিল। এবার রাজা অধিকতর স্নেহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন—

"আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রাইযু নামক দ্বীপ। আমরা তোমাকে সেখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। লোকেরা সেখানে বেশ রাজভক্ত ও শান্ত স্বভাব; কিন্তু তাদের রীতিনীতি ও শাসন-পদ্ধতি এখনো নিয়মিত হয় নাই। তাহাদিগকে করুণা ও বুদ্ধির সহিত শাসন করিবে ও তাদের সামাজিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে। যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে।"

আকিনোসুকে স্ত্রী-সমভিব্যাহারে রাজদত্ত জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করিল। অনুকূল বাতাস অবিলম্বে তাহাদিগকে দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিল।

কমলার বর দ্বীপটিকে ফল-পুষ্প-শস্যে ভরপুর করিয়াছে। শান্তিপ্রিয় লোকগুলি স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। বুদ্ধিমান মন্ত্রীবর্গের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিয়া তাদের উৎসবাদিতে যোগ দিয়া আপনার জনের মতো তাদের সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়া আকিনোসুকে সকলেরই শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হইল। দীর্ঘ ত্রয়োবিংশতি বর্ষের মধ্যে তার জীবনে শোকের রেখা একটিও পড়ে নাই। কিন্তু পর বৎসর তার মাথায় বজ্রপাত হইল। পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার মাতা, তার সুন্দরী স্ত্রী ইহসংসার ছাড়িয়া গেলেন। হান্‌য়োকো নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর তাঁহাকে মহা আড়ম্বরের সহিত সমাহিত করা হইল।

শোকার্ত্ত আকিনোসুকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল। কিছুদিন গত হইলে এক দিন রাজদূত আসিয়া উপস্থিত। রাজা তাঁর বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও বলিয়া পাঠাইয়াছেন,"তোমাকে স্বদেশে ফেরত পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। তোমার পুত্রকন্যাগণের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা হইবে, তাদের জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। রাজার পৌত্র-পৌত্রীর মতো তারা লালিত পালিত হইবে।"

রাজাজ্ঞা শুনিয়া বিনীত ভাবে সে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ ও কর্ম্মচারিবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজার প্রেরিত জাহাজে আরোহণ করিল। নীল আকাশ তলে, নীল জলের উপর দিয়া জাহাজ চলিল। রাইযু দ্বীপটাও যেন নীল দেখাইতেছিল! তারপর সেটা ক্রমশঃ ধূসর হইয়া আসিল, অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। আকিনোসুকে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল তার—বাগানের মধ্যে সেই দেবদারু গাছের তলায়!

কয়েক মুহূর্ত্ত সে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিল, তার দুই বন্ধু পেয়ালায় চুমুক দিতেছে ও গল্প করিতেছে। তাদের দিকে হতভম্বের মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

"কী আশ্চর্য্য!"

তাদের মধ্যে এক জন হাসিয়া কহিল,"আকিনোসুকে দিনের বেলা স্বপ্ন দেখ্‌ছিল! আশ্চর্য্য কি দেখ্‌লে হে?"

আকিনোসুকে তার স্বপ্ন বিবৃত করিল। তাহা শুনিয়া তার বন্ধুদ্বয় ও বিস্মিত হইল। সে ত কয়েক মিনিট মাত্র ঘুমাইয়াছে!

তাদের মধ্যে এক জন কহিল—

"আশ্চর্য বটে! তুমি যখন ঘুমুচ্ছিলে, আমরাও কিছু আশ্চর্য্য দেখেছি। ছোট একটি হলদে প্রজাপতি তোমার মুখের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার পর তোমার পাশে গাছের কাছে বস্‌লো। যেমনি বসা, মস্ত এক পিঁপড়ে বেরিয়ে তাকে ধর্‌লে ও গর্ত্তের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। তোমার ওঠবার একটু আগেই সেই প্রজাপতি গর্ত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে তোমার মুখের উপর উড়্‌তে লাগলো। তার পর হঠাৎ কোথায় যে চলে গেল কিছুই বোঝা গেল না।"

অপর বন্ধু কহিল, "হয়ত সেটি আকিনোসুকের

আত্মা। আমি যেন দেখ্লুম সে আকিনোসুকের মুখে ঢুকে গেল। কিন্তু প্রজাপতি যদি আকিনোসুকের আত্মাই হয়, তা হলেও ত সপ্নের কোনো মীমাংসা হয় না।"

প্রথম বন্ধু কহিল, "পিঁপড়েগুলো বোধ হয় কিছু সন্ধান দিতে পারে। অদ্ভুত জানোয়ার এরা—ভূত যে নয় তা-ই বা কে বল্‌তে পারে!"...যাই হোক্ এই গাছ তলায় পিঁপড়ের এক মস্ত বাসা আছে!"

আকিনোসুকে উত্তেজিত স্বরে কহিল, "এস, এস দেখা যাক!"

দেবদারু গাছের তলায়, গুঁড়ির চারি দিকে হাজার হাজার পিপীলিকা খড় কুটা ও কাদা দিয়া ছোট ছোট 'নগর' তৈয়ারি করিয়াছে। একটা বড় গোছের 'নগরের' চতুর্দ্দিকে গাদা গাদা পিপীলিকা জমা হইয়াছে। তাদের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড পিপীলিকা—তার ডানা হলুদ বর্ণ ও মস্তক কৃষ্ণবর্ণ।

আকিনোসুকে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই ত আমার স্বপ্নের রাজা! আর ঐ ত তোকোয়ো রাজ প্রাসাদ! কা আশ্চর্য্য!...তা হলে রাইষু অবশ্য এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হবে...ঐ মোটা শিকড়টার বামদিকে হ্যাঁ, এই যে! ভারী আশ্চর্য্য! এইবার বোধ হয় হান্‌ব্যোকো পাহাড় ও আমার প্রিয়ার সমাধি পাওয়া যাবে"।

পিপীলিকার বাসা খুঁড়িয়া ফেলিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটি ছোট্ট ঢিপি দেখা গেল। তার উপর একটি মসৃণ ছোট্ট পাথরের নুড়ি—বৌদ্ধ সমাধির উপর যেরূপ স্মরণ-প্রস্তর রক্ষিত হয় অনেকটা সেইরূপ। আর সেই নুড়ির তলদেশে কাদার মধ্যে একটি স্ত্রী-পিপীলিকার মৃতদেহ!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

নৌকাডুবি

আমরা যে ইচ্ছা করিয়া নলিনাক্ষকে লইয়াই এই গ্রন্থের চরিত্রালোচনা শেষ করিলাম তাহা নহে, বরং আমরা এই অবসানে রূপ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ রবীন্দ্রনাথ কলাদোষ নলিনাক্ষকে দিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন নলিনাক্ষ মানব হিসাবে রমেশের চেয়ে উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু রমেশই প্রথম হইতে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন—এজন্য রমেশ ও হেমনলিনীর শেষ বিদায়ের পর কমলা-নলিনাক্ষের একটু দীর্ঘ মিলন ব্যাপার দিয়া সেই শেষ বিদায়ের কারুণ্যোৎপত্তির উপর আবরণ টানিয়া দেওয়ায় নৌকাডুবি গ্রন্থের একটা কলাগত দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ করার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, রমেশ ও হেম নলিনীর বিদায়ের বুক ভরা আঘাত দিয়া নিরুপায় পাঠকের নিকট তিনি বিদায় লইতে চাহেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, নলিনাক্ষকে দিয়া গ্রন্থ শেষ করাতে সমস্ত জগৎ ব্যাপারের সে "সর্ব্ব শেষের গান" অবসানের সেই আধ্যাত্মিক সুরটি দিয়াই গ্রন্থের একটি কল্যাণময় পরিসমাপ্তি তিনি করিতে পারিয়াছেন।

নলিনাক্ষ শ্রেষ্ঠতর মানব, কিন্তু রমেশ শ্রেষ্ঠতর নায়ক—এই হিসাবে গ্রন্থের একটু কলাসম্মত দোষকে অস্বীকার করা যায় না। আর নলিনাক্ষকে শ্রেষ্ঠতর নায়ক বলিয়া মানিয়া নিতেও পাঠকের হৃদয় হইতে যথেষ্ট বাধা আছে। গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধে তাহার প্রকাশ আদৌ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলেই গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধে আর কয়েকটা পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিয়া নলিনাক্ষকে নায়ক হিসাবে আরো কিছু প্রস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিতেন, এবং নলিনাক্ষ-ক্ষেমঙ্করীর প্রথম প্রকাশে তাঁহাদের গত জীবনের ঘটনা-বিবৃতিতে (narration এ) ইহার স্পৃহনীয় অবসরও রবীন্দ্রনাথের ছিল; কারণ নলিনাক্ষ-ক্ষেম-

ক্ষরীর আকস্মিকতাকে তিনি গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধে বর্তমানের কর্ম্মস্ফুটতার (action এর) ভিতর দিয়া নাটকীয়ভাবে এবং তাঁহারি উপযুক্ত ভাবে নিরাকরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহাতে ঘটনাবিবৃতির যা দোষ তাহা ত হইয়াছেই, নলিনাক্ষকে নায়ক করিয়া দাঁড় করিতে না পারায় গ্রন্থের এই কলাদোষকেও সমর্থন করা যায় না। কিন্তু রমেশ-নলিনাক্ষের দিক দিয়া যাহা হয় না, কমলার দিক দিয়া চাহিলে সবই সহজ হইয়া আসে। কমলাই এই গ্রন্থের কেন্দ্র। রমেশের সহিত বিদায়ের পর আমরা কমলারই জীবন অনুসরণ করিয়া চলি, এবং নলিনাক্ষের সহিত যে মিলন-ব্যাপার তাহা কমলারই মিলন-ব্যাপার। আমাদের দৃষ্টি-দূরবীনের সমস্ত আলোক কমলাতেই সংহত করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সেই ভাবে দেখিলে গ্রন্থাবসানের কোনো কলাদোষই থাকে না,—তবু গ্রন্থের নাম "কমলা" নয় এবং রমেশ কমলারও আগে আমাদের চিত্ত হরণ করিয়াছিল—সেই কথা আমরা ভুলিতে পারি না।

চোখের বালির বিরুদ্ধে যেমন অশ্লীলতার অভিযোগ নৌকাডুবির বিরুদ্ধে তেমনি অস্বাভাবিকতার অভিযোগ এখানে সেখানে শোনা যায়। কমলার হঠাৎ রমেশ হইতে মন তুলিয়া-লওয়া ব্যাপারে সাধারণ পাঠকের হয়ত সব চেয়ে বেশী খট্‌কা লাগা সম্ভব। কমলার চরিত্র-বিশ্লেষণে তাহা নিরাকৃত করার চেষ্টা করা গিয়াছে। অনেকে রমেশ-কমলার দীর্ঘ একত্র বাসকে অস্বাভাবিক আখ্যা দিয়া থাকেন,—কেহ কেহ বলেন রমেশের পাপস্পর্শশূন্য থাকাটাই অস্বাভাবিক, আর কেহবা কমলার নিকট হইতে রমেশের গোপনতাটাকেই অস্বাভাবিক এবং অনুচিত বলিয়া বসেন এ দুইটি আপত্তিই অর্থহীন, এত অর্থহীন যে, এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই প্রবৃত্তি হয় না,—তবু দেখা যাক্। প্রথমতঃ, রমেশের পাপস্পর্শহীন থাকিতে পারার দুই কারণ,—রমেশের মহত্ব এবং হেমনলিনীর প্রতি তাহার ভালবাসা। দ্বিতীয়তঃ, কমলা হইতে রমেশের গোপনতার কারণ রমেশের সূক্ষ্মানুভূতি, কমলাকে আঘাত দিবার ভয়। রমেশের চেয়ে উন্নততর মানব নলিনাক্ষ এই অবস্থায় পড়িলে তিনি হয়ত তাঁহার আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা কিছু সহজ মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন, অথবা রমেশের চেয়ে স্থুলবোধ মানব যোগেন্দ্র এই অবস্থায় পড়িলে হয়ত তাহার সবল-নির্ব্বোধ স্পষ্টতায় কমলাকে হৃদয়হীন ভাবে আঘাত দিতে পারিত, অথবা রমেশের চেয়ে হীন মানব অক্ষয় কিম্বা আর কেহ হইলে হয়ত কমলাকে নির্বিচারে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়া ফেলিত,—কিন্তু এই তিন অবস্থাতেই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সৃষ্ট অসম্ভব হইয়া উঠিত। অনুভাব-সূক্ষ্মতার এবং বিপরীত চিত্তবৃত্তির যে অন্তর্যুদ্ধ তাহা আধ্যাত্মিক নলিনাক্ষে নাই অথবা কমিয়া গিয়াছে, এবং অক্ষয়-যোগেন্দ্রেও তার নিতান্ত অভাব,—কিন্তু রমেশের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই জন্য রমেশেই এই অবস্থার প্রয়োজন, নলিনাক্ষ কিম্বা অক্ষয়-যোগেন্দ্রে নয়,—কারণ অন্তর্যুদ্ধের কলা-সৌন্দর্য্য ফুটানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। মহত্ত্বে দৌর্ব্বল্য, আবার দুর্ব্বলতাতেও মহত্ব; কমলাকে সমস্ত খুলিয়া বলিবার নিয়ত সচেষ্টতা অথচ আঘাত দিবার ভয়; হেমনলিনীর ধ্যান, অথচ কমলাকেও স্নেহ না করিয়া থাকিবার অপারগতা; কমলার নিরুপায় নির্ভরতার জন্য সুগভীর বেদনানুভূতি, অথচ সেই বেদনা দূরীকরণে সম্প্রতির বাধা,—রমেশের ব্যবহারে এই বাস্তব বিরোধের জটিল এবং উপভোগ্য কলানৈপুণ্যে অস্বাভাবিকতা আরোপ করিবার কোনো অবসরই নাই। আবার হয়ত নলিনাক্ষের কমলা-গ্রহণকেই কেহ অস্বাভাবিক বলিয়া বসিবেন;—আমার পক্ষে যাহা অস্বাভাবিক নলিনাক্ষের পক্ষে যে তাহা খুবই স্বাভাবিক, এই কথা তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়া বৃথা। সূক্ষ্ম-সুকুমার পেলব-শ্যামল সাহিত্য-শষ্যকে জনসনৃ-সুলভ স্ফীতপদে মাড়াইয়া যাওয়াই যাঁহাদের স্বভাব তাঁহাদের সম্বন্ধে

"অঙ্গার শত ধৌতেনঃ" শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াই নীরব হইতে চাহি।

অস্বাভাবিকতা নাই; তবে নৌকাডুবিতে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা অনবধানা এবং অনিপুণ লোকের হাতে অস্বাভাবিকতায় গড়াইয়া যাইতে পারিত—তাহা 'রোমান্টিসিজম্'। রোমান্সের একটা লক্ষণ প্লটের গাঁথুনিতে অতিরিক্ততা এবং জীবনব্যাপারে কবিত্বের অভিসিঞ্চন। স্কট এবং বঙ্কিমের কথা গ্রন্থে তাহা আছে। জীবন চিত্রে সাধারণতঃ এই অতিরিক্ততা থাকে না। কবিত্ব থাকে না, কিম্বা থাকিতে পারে না—এ কথা বলা যায় না;—তবে রোমান্সের কবিত্ব সরল একমুখী (synthetic) কল্পনায়, আর জীবনচিত্রের কবিত্ব সূক্ষ্ম-জটিল বিশ্লেষক (analytic) কল্পনায়, রোমান্সের এই অতিরিক্ততা এবং প্রথমোক্ত কবি-কল্পনা (উভয়কে অনেক সময় পরস্পর অভিন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে) বৌঠাকুরাণীর হাটে আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষক প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায় নাই; এই অতিরিক্ততা ও কবি-কল্পনা নৌকাডুবিতে আছে এবং খাপ খাইয়াছে। রমেশ ও কমলার মিলন-দৃশ্যের মত এমন কল্পনা-সৌন্দর্য্যে রবীন্দ্রনাথ আর কোন উপন্যাসের ভিত্তি গাঁথেন নাই। নৌকাডুবির এই ভিত্তিমূলেই রোমান্সের অতিরিক্ততা আছে, আর কমলার গৃহত্যাগে এবং গ্রন্থ শেষে সকলের কাশীতে মিলনেই যে কিছুমাত্র নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই স্বভাবাতিরিক্ততা অস্বাভাবিকতা নহে, এই অতিরিক্ততা নৌকাডুবির বাস্তবতার কিছু মাত্র হানি করে নাই, বরং গায় গায় মিলিয়া গিয়াছে। উপন্যাস-রচনার দ্বিবিধ প্রণালীর এই সমন্বয় নৌকা-ডুবির একটি শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। এই জন্য বিচক্ষণ পাঠকগণকে পীড়া না দিয়াও নৌকাডুবির সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইয়াছে আশা করা যায়, প্রকৃত পক্ষে হইয়াছে কি না যদিও তাহা ঠিক বলা যায় না।

নৌকাডুবির 'রোমান্টিসিজম্'

নৌকাডুবির আর একটি প্রধান বিশেষত্ব যাহা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে না পড়িয়া যায় না—ইহার অভিনব অবস্থা-পরিকল্পনা (Situation) পর-স্ত্রী এবং পর-স্বামীর একত্র বাস এবং পর-স্বামীকে পর-স্ত্রীর আপন স্বামী মনে করা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নবোন্মেষিণী কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থা-পরিকল্পনা আমাদের সাহিত্যে আর নাই, অন্য কোথাও আছে কি না খবর রাখি না,—থাকিলেও হিন্দু দাম্পত্য জীবনের আদর্শ হইতে ইহা এমন একটা বলিষ্ঠ emphasis পাইয়াছে যে, বিদেশে তাহার সুযোগই নাই। কাজের ভাল আরম্ভটাই অর্দ্ধেক কাজের সমান, এই পরিকল্পনাটাই সাহিত্যশিল্প হিসাবে একটা মস্ত লাভ। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ হৃদয়বিশ্লেষণের একটা বিশিষ্ট অবসর দেওয়াতে ইহার কল্পনা-সৌন্দর্য্য এবং ক্রিয়া-নৈপুণ্য আরো বাড়িয়া গিয়াছে। পাঠকের হৃদয়কে সহানুভূতিতে এবং বেদনায় মথিত করিয়া দিবার পক্ষে এমন অনুকূল পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ আর করেন নাই। এই জন্যই নৌকাডুবি তাহার উপন্যাসের মধ্যে করুণ রসে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

নৌকাডুবির অবস্থা পরিকল্পনা

এই বড়টির ছায়ায় ছোটখাটো আরো কতগুলি অবস্থা পরিকল্পনা আছে,—কথায় অভিব্যক্ত সে গুলি খুব কমই, পরন্তু চাপা রহস্যের ভারে এবং পরিপূর্ণতায় মৌনমূক; কানের কাছে দুটা একটা অবান্তর শব্দে মুখর হইয়া উঠিলেও হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নীরব হাহাকারে মরিয়া যায়! কমলা-হেমনলিনীর এবং কমলা-রমেশের বিদায় দৃশ্য দুইটি পাঠককে স্মরণে আনিতে অনুরোধ করি। এসম্বন্ধে আর কিছু না বলাই সব চেয়ে বেশী-বলার উপায়।

চোখের বালি ও নৌকাডুবি

যুবক যুবতীকে লইয়া সংসারের কর্ম্ম, প্রবীণ প্রবীণারা শুধু দর্শক এবং নিয়ামক মাত্র; উপন্যাস জীবনের ছবি, উপন্যাসে ও যুবকযুবতীদের প্রধান্ত থাকিতেই বাধ্য

চোখের বালির কর্ম্মবস্তু দুইটি যুবক যুবতী লইয়াই উচ্ছ্বসিত, নৌকাডুবিতেও তাই। চোখের বালির মহেন্দ্রের মহত্ব নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু সে যে দুর্ব্বল চরিত্র এই কথাটাই আমরা বিশেষ করিয়া জানি। নৌকাডুবির রমেশের দুর্ব্বলতা নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের মহত্ব এবং সৌকুমার্য্যের (Refinement) পরিচয়টাই আমরা বিশেষ করিয়া পাই ;—মহেন্দ্রের দুর্ব্বলতায় একটা চরমতা আছে,রমেশে তাহা নাই। চোখের বালির বিনোদিনীতে শিক্ষিত বুদ্ধির একটা তীক্ষ্ণতা আছে, তাহা অসম্পূর্ণ প্রথম শিক্ষার ফল,—এইরূপ শিক্ষায় দশজনকে আঘাত করে, না মিলাইয়া ঠেলিয়া দেয়, না গড়িয়া ভাঙ্গে। নৌকাডুবির হেমনলিনীতে শিক্ষিত বুদ্ধি ও চরিত্রের মার্জ্জিত সংযতভাব আছে, তাহা প্রকৃত শিক্ষার ফল ; এইরূপ শিক্ষা দশজনের প্রতি স্নেহে প্রেমে মধুর হইয়া উঠে। চোখের বালিতে বিলাসাকর্ষণ ও পতনের উগ্রতা, নৌকাডুবিতে প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া মহতের বেদনামন্থনক্ষুব্ধ হইলেও পূত-সংযত অন্তর্যুদ্ধের সকরুণ স্নিগ্ধতা। চোখের বালিতে শিক্ষিতা বিধবা বিনোদিনীর যে পারিপার্শ্বিক এবং কাজ, নৌকাডুবিতে শিক্ষিতা ব্রাহ্ম হেমনলিনীর সেই পারিপার্শ্বিক এবং কাজ। চোখের বালিতে বিহারী বিনোদিনীর অসামাজিক বিবাহ হয় নাই। শিক্ষায় ব্রাহ্মভাবাপন্না হইলেও বিনোদিনী হিন্দু সমাজের, নৌকাডুবিতে ব্রাহ্ম উপকরণ নূতন। ব্রাহ্ম চরিত্র যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত অঙ্কিত হইলেও নৌকাডুবিতে হিন্দু সমাজেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে বলিতে হইবে—রমেশ হেমনলিনীর অসামাজিক বিবাহ নিষ্ফলতা দ্বারা পীড়িত, দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কীর্ত্তনই নৌকাডুবির প্রাণ, কমলা নলিনাক্ষের মিলনে সেই আদর্শেরই জয়, নলিনাক্ষ ব্রাহ্ম হইয়াও হিন্দু আচারপরায়ণ, নলিনাক্ষ ও ক্ষেমঙ্করীতে হিন্দু-আচারেরই সমর্থন নলিনাক্ষ ঘটিত ব্যাপারে হিন্দু আচার মাত্র বিদ্বেষী ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিই একটু তীব্র শ্লেষ। নৌকাডুবির যুগ রবীন্দ্রনাথের হিন্দুসমাজ-সমর্থনেরই যুগ, দেশের প্রাণের মাঝে তখন তিনি আনন্দ-নিকেতন খুঁজেন, স্বদেশের তুচ্ছতাকেও তখন তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন। সেই সময়কার প্রবন্ধাবলীর রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের উপন্যাস নৌকাডুবিতেও বর্ত্তমান।

চোখে বালির মাতা রাজলক্ষ্মীকে আমরা নৌকাডুবিতে আসিয়া মাতা ক্ষেমঙ্করীতে পাইয়াছি, চোখের বালির সাত্বিকা অন্নপূর্ণাকেও ক্ষেমঙ্করী চরিত্রের অন্য দিকে লাভ করিয়াছি ; তথাপি মাতৃত্ব এবং সাত্বিকতায় ক্ষেমঙ্করীর সহিত রাজলক্ষ্মী এবং অন্নপূর্ণার কোন জায়গায় প্রার্থক্য তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। চোখের বালির পুত্র মহেন্দ্র, আর নৌকাডুবির পুত্র নলিনাক্ষ। মহেন্দ্র বিহারীর বন্ধুত্বকে আমরা যোগেন্দ্র রমেশে লাভ করিয়াছি। তবে নৌকাডুবিতে পিতা অন্নদা ও কন্যা হেমনলিনী নূতন।

চোখের বালির মহেন্দ্র বিহারী বিনোদিনীরা হাস্য এবং ব্যঙ্গবাক্যে বিশারদ সন্দেহ নাই, রাজলক্ষ্মীর অভিমানে পাঠকের ওষ্ঠ-প্রান্তে কৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু চোখের বালিতে নির্জ্জলা কৌতুক চরিত্র একটিও নাই। নৌকাডুবিতে নির্জ্জলা কৌতুক চরিত্র অনেক আছে,—অন্নদা বাবু (একদিকে) চক্রবর্ত্তী খুড়া, যোগেন্দ্র, অক্ষয় ও নবীনকালী। 'পিল' ইত্যাদি সম্পর্কে অন্নদা বাবু না জানিয়া পাঠককে হাসান, আর চক্রবর্ত্তী খুড়া নিজে হাসিয়া পাঠককে হাসান, দু'টি চরিত্রই স্নিগ্ধ হাস্য-কৌতুকের ভাণ্ডার। অক্ষয় ও নবীনকালী-চরিত্রের হাসিটা অল্পবিস্তর ব্যঙ্গ মিশ্রিত, তবে অক্ষয় তাহার কথায় রসিকতা মাখিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গটাকে একটু তরল করিয়া দেয়, আর নবীনকালীর রসহীন সঙ্কীর্ণ আন্তরিকতায় তাঁহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গটা তীব্রই থাকিয়া যায়, মূলে দু'জনই হীন। হীনতাকে নিয়া যে কৌতুক তাহাই ব্যঙ্গ। যোগেন্দ্রের মোটাবুদ্ধি এবং স্থূল প্রকৃতিকে নিয়া যে কিছুমাত্র ব্যঙ্গ নাই তাহা নহে, তবে তাহার সরল সহাস্য সরলতায় আমরা স্নিগ্ধ হাসির কৌতুকটাই বেশী অনুভব করিয়া থাকি। প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায়

নৌকাডুবির চরিত্রবৈচিত্র্য এবং চরিত্র-সংখ্যা চোখের বালি হইতে বেশী। চোখের বালিতে মহেন্দ্র-আশা-বিহারী-বিনোদিনীই প্রধান চরিত্র, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা তাহাদের সুখ দুঃখের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত বলিয়াই উপন্যাসে তাঁহাদের স্থান। এ ছয়টি ছাড়া চোখের বালিতে আর কোনো চরিত্র-সৃষ্টি নাই। নৌকাডুবিতে রমেশ-হেমনলিনী-কমলা-নলিনাক্ষই প্রধান, অন্নদা ক্ষেমঙ্করীর স্থান এদের কাহারো সহিত নিগূঢ় স্নেহ-যোগেই। নৌকাডুবির অন্য চরিত্রগুলি ঘটনার সহিত তাহাদের নানা রকম যোগ থাকা সত্ত্বেও কম বেশী আগন্তুক চরিত্র। এই আগন্তুক চরিত্রের সংখ্যা নৌকাডুবিতে কম নহে, এবং ইহাতে নৌকাডুবির কলেবরও চোখের বালি হইতে বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ হইবার একটা গূঢ় কারণ বর্ত্তমান, নিম্নে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। হৃদয়-বিশ্লেষণ এবং মনস্তত্ব প্রকাশ দুই জিনিষ। পাত্রপাত্রীর হৃদয় বিশ্লেষণ করা হইলেও সব সময়ই যে তাহাতে মানসব্যাপারের বিশেষ কোনো একটা তত্ব ফুটিয়া উঠিবে তাহা না-ও হইতে পারে, অথবা কোনো বিশেষ পাত্রের হৃদয় বিশ্লেষণে ছোটখাটো মনস্তত্ব প্রকাশ থাকিলেও সেই পাত্রের সমস্ত চারিত্র-ব্যাপারে একটা বড় মানস সত্য ফুটিয়া না উঠা অসম্ভব নহে। চোখের বালি মনস্তত্বমূলক উপন্যাস। ইহাতে হৃদয়বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও একটা মানসতা সমস্ত পুস্তককে আগা গোড়া বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। নৌকাডুবির হৃদয় বিশ্লেষণে যেখানে সেখানে কোনো মানসতা নাই, তাহা নহে। হেমনলিনী ও কমলা দুজনকেই রমেশের ভালবাসায়, রমেশের প্রতি কমলার হঠাৎ বিমুখতায় এবং অন্যান্য নানা সূত্রে আমরা এই মানসতার স্পর্শ পাইয়া থাকি। কিন্তু নৌকাডুবির সমস্তটা জুড়িয়া মনোবৃত্তিমূলক কোনো বিশেষ সত্য তেমনভাবে প্রকাশ পাইয়া উঠে না। চোখের বালি আগা গোড়া metaphysical, ইহার ঘটনাবলী হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিলেও, ইহার সমস্ত ব্যাপারকেই আমরা গ্রন্থকারের মনের ভিতর দিয়াই দেখি, ইহাতে যেন গ্রন্থকার নিজকেই ভাঙিয়া চুরিয়া আনিয়া বাহিরে আঁকিয়াছেন। নৌকাডুবিতে এই স্বাঙ্কন(self-painting) নাই তাহা নহে, তবে ইহাতে প্রত্যক্ষ বহির্জগতের ছবিও বিস্তর আছে। একনিষ্ঠ মানসতায় (Intellectuality) চোখের বালি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, হৃদয়বত্তায় নৌকাডুবি শ্রেষ্ঠ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে জীবনচিত্রাঙ্কনেও নৌকাডুবির শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাইলাম। বহির্জীবন বিচিত্রতার লীলাভূমি, সেখানকার ছবিকে যে এলবামে পুরা যাইবে তাহাকেও বাধ্য হইয়াই বিচিত্র হইতে হইবে।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এই আলোচনা শেষ করিব,—সেটি অবসানেরই কথা, কারণ সেটি আধ্যাত্মিকতার কথা। চোখের বালিতে আধ্যাত্মিক চরিত্র মাত্র একটি, অন্নপূর্ণা। নৌকাডুবিতে আসিয়া তাঁহার সংহত আধ্যাত্মিকতা নলিনাক্ষে, ক্ষেমঙ্করীতে, এবং এমনকি নলিনাক্ষের জীবন এবং কথার সত্যতা মনের সহিত উপলব্ধি করিবার ক্ষমতায় কতকটা অন্নদাতেও, ছড়াইয়া গিয়াছে। এই 'ছড়াইয়া যাওয়া' কথা নলিনাক্ষ সম্বন্ধে ঠিক খাটে না, কারণ নলিনাক্ষের আধ্যাত্মিকতায় গাঢ়তা কিছুমাত্র কম ছিল না। আর নলিনাক্ষের (ক্ষেমঙ্করীরও বটে), কাজেই নৌকাডুবির, আধ্যাত্মিকতার একটা বিশেষত্ব আছে। চোখের বালির অন্নপূর্ণা উপন্যাস চিত্রিত পাত্রপাত্রীর 'ministering angel,' বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তাঁহার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই; তিনি মহেন্দ্র-বিহারীকে পরিচালনা করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজে কিছুই করেন না, সংসারের সহিত বন্ধন কাটাইয়া সংসারকে ত্যাগ করাই তাঁহার লক্ষ্য। কিন্তু নৌকাডুবির নলিনাক্ষ উপন্যাস-সংসারের একটি অন্তরঙ্গ চরিত্র, তিনি সংসারের তুচ্ছতার বন্ধনে থাকিয়া সেখানে আধ্যাত্মিকতার চিরমুক্ত মঙ্গল দ্যুতি বিভাসিত করিয়া তুলেন, এবং এমন কি বর্ণগন্ধময়

পার্থিব পত্নীপ্রেমের মর্ম্মকোষটির মাঝেও তাঁহার সেই আধ্যাত্মিকতার শুভ্রোজ্জল অমর আসন চির বিরাজমান।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

সন্ধান

হে সুন্দর, হেরি' তব রূপের আভাস
বিকশিত পুষ্পদলে, উষার কিরণে,
সন্ধ্যার সুবর্ণ মেঘ রঞ্জিত গগনে,
শারদ কৌমুদীজালে মিটে নাই আশ।
দেখিব মূরতি তব দুটি আঁখি ভরে'
তাই নিশিদিন কত করেছি আহ্বান—
কোথা তুমি! কোথা তুমি!—ব্যাকুল পরাণ
তোমারে খুঁজেছে শুধু বিশ্ব চরাচরে।

শ্রান্ত জীবনের বেলা ক্রমে অবসান;
এত দিনে—এত শত ব্যর্থ চেষ্টা পরে—
মনে হয় পাইয়াছি তোমার সন্ধান;
তুমি যে রয়েছ সদা আমারি অন্তরে।
আমি শুধু গন্ধমত্ত মৃগের মতন
ফিরিয়াছি খুঁজি তোমা সারাটি ভুবন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রত্নতত্ত্বের এক পৃষ্ঠা

(বিক্রমপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মীমূর্ত্তির প্রচ্ছন্ন ইতিহাস)

পাত্র পাত্রীগণ

মিঃ বামাপদ বসু ... ইতালী হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত দরিদ্র যুবক ভাস্কর, বিজলীর প্রণয়প্রার্থী
আশুতোষ মিত্র ... ... মিঃ বসুর বাল্য বন্ধু
বিজলী ... শিক্ষিতা যুবতী, মিঃ বসুর প্রণয়িনী
বিজলীর পিতা ... ...
স্থান ... ... কলিকাতা
কাল ... স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বিজলীর কক্ষ—মিঃ বসু ও বিজলী)

বিজলী। বামাপদ, প্রিয়তম, বাস্তবিকই আমি তোমাকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি!

বামাপদ। তা জানি প্রিয়তমে, কিন্তু তোমার পিতা অত কঠিন কেন?

বি। তাঁর উদ্দেশ্য কিছু মন্দ নয় মিঃ বসু; শিল্প বিদ্যা তাঁর কাছে ছেলে মানুষী মাত্র, তিনি কেবল তাঁর নিজের ব্যবসায়ই ভাল বোঝেন! তাঁর বিশ্বাস আমাকে বিবাহ করে তুমি আমাকে ভরণ পোষণ করতে পারবে না।

বা। আমার মাথা আর মুণ্ডু! হায় যদি দারিদ্র্য-দোষসম্পন্ন, অনাহার-ক্লিষ্ট কলা-কুশল ভাস্কর না হয়ে এক জন অর্থলিপ্সু চতুর ব্যবসায়ী হতেম, তা হলে বেশ হত না, বিজলী? হায়! তোমার আশায় আমি নিজে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে গিয়েছিলাম, আর আজ যখন ফিরে এলাম তখন—

বি। হতাশ হয়োনা তুমি; বিশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারলেই আমাদের বিবাহে বাবার আর কোনও আপত্তি থাকবে না!

বা। বিশ হাজার! সে যে অনেক টাকা বিজলী! সময় পেয়ে তুমিও পরিহাস করছো! জান কি বিজলী আজ তিন মাস হল হোটেলের দেনা শোধ করতে পারি নি!

বি। এই যে বাবা আসছেন, আমি যাই। (প্রস্থান)

(বিজলীর পিতার প্রবেশ)

বা। নমস্কার। দেখুন, আপনি বলে ছিলেন আমি বিলাত থেকে ফিরে এলে আমার সহিত বিজলীর বিবাহ দেবেন; আমি সেই আশাতেই নিজের যা কিছু ছিল

সমস্ত বিক্রয় করে সায়ন্টিফিক এসোসিয়েসনের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে ইউরোপে গেলাম। তারপর, সেখানে ৩।৪ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর আজ যখন আমি ভাস্কর বিদ্যায় নিপুণ হয়ে এখানে ফিরে এলাম তখন আপনি—

বিঃ পিতা। থাক্। তোমার বৃথা বক্তৃতায় কোন লাভ নেই, বাপু। অবশ্য তোমার বিরুদ্ধে বলবার আমার কিছু নেই; কিন্তু আমি ত আমার মেয়েকে কেবল মাত্র বাক্য-সর্ব্বস্ব প্রেম, শিল্প-বিদ্যা অনাহার ও দারিদ্র্যের হাতে তুলে দিতে পারি না! কি বল, এ ছাড়া আমার মেয়েকে দেবার মত তোমার আর কিছু আছে কি?

বা। মহাশয়, স্বীকার করি আজ আমি দরিদ্র, কিন্তু মানুষের যশ ও সুখ্যাতি কি কিছুই নয়? লাট সভার মেম্বর অনারেবল নরেন্দ্র নাথ মিত্র বলেন যে, আমার সম্প্রতি খোদিত "ভারত মাতার" কৃষ্ণ-প্রস্তর মূর্ত্তিটি ভাস্কর শিল্পের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস কালে আমার নাম দেশ বিখ্যাত হবেই হবে।

বিঃ পিতা। ও সব বাজে কথা। তিনি লাট সভার সভ্য হতে পারেন, কিন্তু শিল্পবিদ্যার তিনি কি জানেন? বাপু, যশ ও সুখ্যাতি নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তোমার সেই প্রস্তর মূর্ত্তির বাজার দর কত সেইটাই ভাববার বিষয়। ছ'মাস পরিশ্রম করে তুমি সেটা তৈয়ারী করেছ কিন্তু তার দাম বড় জোড় এক শ টাকা হবে, এই ত! না বাপু; যদি ২০০০০৲ টাকার কখন সংস্থান করতে পার তবেই আমার মেয়েকে পাবে; তা না হলে, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবো। টাকা সংগ্রহের জন্য ছ'মাস তোমায় সময় দিলাম। এখন এসো, নমস্কার। (প্রস্থান)

বা। হায় অদৃষ্ট! এত চেষ্টা, এত উদ্যম, এত আশা, তার শেষ পরিণাম এই! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শ্রীগোপাল মল্লিক লেনস্থ একটি মেসের নিম্নতলস্থ অন্ধকার গৃহ)

বামাপদ ও আশু।

বা। আশু, তুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করছি না; আমার মত অসুখী বোধ হয় পৃথিবীতে কার কেহ নেই! আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল?

আ। তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ!

বা। এক এই প্রস্তর মূর্ত্তিটি ছাড়া আমার ভাল বাসবার আর কেউ নেই! আজ তারও তুষার-শীতল পাষাণ মুখে আমার এই দুঃখের সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র নেই যেমনি সুন্দরী, তেমনি হৃদয়হীনা!

আ। তুমি একটি আদৎ বেকুব!

বা। হায়, আশু, তুমি যদি বুঝতে—

আ। তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন? এই মাত্র না তুমি বল্লে যে, টাকা সংগ্রহের জন্য ছ'মাস সময় পেয়েছ?

ক। আমার এ দুঃখের সময় তুমি পরিহাস করো না; ছ'মাস কেন, ছ'শতাব্দী হলেও আমার কোনও লাভ নেই আশু, আমার মত অর্থহীন, বন্ধুবান্ধবহীন, যশহীন, পথের কাঙ্গালের আর তাতে লাভ কি?

আ। মূর্খ! ভীরু! কচি খোকা! ছ'মাস তোমার সময় রয়েছে, পাঁচ মাসই যথেষ্ট!

বা। তুমিও কি পাগল হলে, আশু?

আ। ওগো বাপু! ছ'মাস যথেষ্ট সময়! তুমি আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমার টাকা সংগ্রহ করে দেবো।

বা। তুমি কি বলছ? এতগুলো টাকা তুমি সংগ্রহ করবে কি করে, আশু; তাও আবার আমার জন্য!

আ। বলি, সেটা আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি? বল আমায় কোন বাধা দেবে না, আমি যা করবো তাতে কথাটি কবে না; সব সহ্য করবে; কেমন প্রতিজ্ঞা করছ ত?

বা। আমার মাথা ঘুরছে; আমি কিছু বুঝতে পারছি না; তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

[কক্ষতল হইতে একটা হাতুড়ি তুলিয়া আশু অদূর স্থিত 'ভারত মাতার' প্রস্তর মূর্ত্তির নাসিকায় আঘাত করিল। নাসিকার অগ্রভাগ পড়িয়া গেল; আর এক আঘাতে হাতের দুটো অঙ্গুলি খসিয়া গেল। এইরূপে আঘাতের পর আঘাতে ক্রমে ক্রমে প্রস্তর মূর্ত্তির পায়ের অঙ্গুলি, বাম কর্ণ ও দক্ষিণ পদের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া মাটিতে গড়া গড়ি দিতে লাগিল।

আশু বাহির হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে একটা গাড়ী ডাকিয়া ভগ্ন মূর্ত্তিটাকে তুলিয়া লইয়া দিব্য প্রশান্ত ভাবে শিষ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

বামাপদ নিবাত নিষ্কম্প ভাবে আশুর এই ধ্বংসলীলা দেখিতে লাগিল, পরে সে চলিয়া গেলে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।]

(পট ক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

[পূর্ব্ববর্ত্তী কক্ষ, বামাপদ একাকী বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট]

বা। আজ ছ'মাস পূর্ণ হবে! ওঃ! সমস্ত জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল; হায়! হায়! এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল! কাল রাত্রে খাওয়া হয় নি, আজ সকালেও পেটে কিছু পড়ে নি, কোনও হোটেলে প্রবেশ করতে সাহস হয় না! পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে! আমার জুতাওয়ালা আমাকে রাস্তাঘাটে অপমান করছে, সে দাম পায় নি; দরজী, সে ত দু তিনটা সুটের দাম পাবে, আদালতে নালিস করবার ভয় দেখাচ্ছে; বাড়ীওয়ালার বাড়ী ভাড়া বাকী, সেও রোজ তাগিদ দিচ্ছে! আর আমি পারি না। এদিকে সে দিনের পর থেকে আশুর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। আর বিজলী! সেদিনে দৈবাৎ তাহার সহিত ইডেন গার্ডেনে দেখা হলে একটু করুণ হাসি হেসে আমার দিকে তাকালে, কিন্তু পরক্ষণেই তার পাষাণ বাপের তাড়নায় মুখ ফিরিয়ে নিলে! (বাহিরে দরজায় করাঘাত)। ওকি দরজায় ঘা দেয় কে! এ নিশ্চয়ই সেই জুতাওয়ালা। এস, ভিত'র এস! (জুতাওয়ালার প্রবেশ।)

জুঃওঃ। বড় সুখের বিষয় বাবু, বড় সুখের বিষয়। ভগবান আপনার আরো ভাল করুন।

বা। কিন্তু তোমার বাকী দামটা—

জুঃওঃ। না না, দামের কথা তুলবেন না, তার জন্য আমার কোনও তাড়াতাড়ি নেই, যখন সুবিধা হয় দেবেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আপনার অর্ডারগুলি পাই! আজ তবে আসি; নমস্কার। (প্রস্থান)

বা। একি! নিজে জুতাজোড়া নিয়ে এল, দাম পর্য্যন্ত নিলে না; যাবার সময় রাজার মত খাতির করে নমস্কার করে বিদায় নিলে! আবার তার ওপর ভবিষ্যতে তাকে কাজ কর্ম্মের অর্ডার দেবার জন্য অনুরোধ করলে! পৃথিবীতে কি প্রলয় আসন্ন হয়েছে! (বাহিরে দরজায় করাঘাত) এস, ভিতরে এস! (দরজীর প্রবেশ)

দরজী। মহাশয় ভগবান আপনার আরো 'বাড় বাড়ন্ত' করুন। কিছু মনে করবেন না; আমি আপনার সেই সুটটা। (বাহিরে দরজায় করাঘাত)

বা। এস, ভিতরে এস!!

(বাড়ী ওয়ালার প্রবেশ)

বাঃওঃ। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম কিছু মনে করবেন না। আপনার ব্যবহারের জন্য উপরের দক্ষিণ দিকের দুটো ঘর ঠিক করে রেখেছি; আপনার এ অবস্থায় আর এই অন্ধকার ঘরটায় কাজ করা শোভা পায় না। কালকেই আপনি—(বাহিরে দরজায় করাঘাত)

ডাঃওঃ। বাবু, একঠো চিঠি। (পত্র প্রদান)

বা। দেখি। (পত্র খুলিয়া) একি! টমাস কুক্ কোম্পানীর ম্যানেজার লিখছেন, "আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে অর্থাদির 'লেন

'দেন' লইয়া যে গোলমাল চলিতেছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এখন হইতে আপনি আবার আমাদের সহিত পূর্ব্ব মত কারবার করিলে কর্ত্তৃপক্ষেরা আপনাদিগকে অনুগৃহীত বোধ করিবেন।" এর মানে কি? আমি ত কিছুই বুঝতে—(বাহিরে দরজায় করাঘাত) এস, ভিতরে এস!!!! (বিজলীর পিতার প্রবেশ)

বিঃ পিঃ। এই যে বসে! বিজলী তোমারি, সে এখনই এখানে আসছে! আমি এগিয়ে তোমাকে সংবাদ দিতে এলাম। তাকে বিবাহ করে সুখে দীর্ঘ জীবন যাপন কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ। ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন। বিজলীর আমার—(বাহিরে দরজায় আঘাত)

বা। এস, ভিতরে এস!!!!!(বেগে বিজলীর প্রবেশ—বামাপদর গলায় পড়িয়া)

বি। বামাপদ, প্রিয়তম, আজ আমাদের কি সুখের দিন!

বা। (বিজলীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া) বিজলী, হৃদয় সর্ব্বস্ব, আজ আমাদের সুখের দিনই বটে! কিন্তু কি করে যে এমন সুখের দিন হ'ল, তা'ত আমি বুঝতে পারছি না; সবই যেন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে! একি সত্য!

(পট ক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[হ্যারিসন রোডের মোড়—চায়ের দোকান। কয়েক জন নব্য যুবক চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে—এক জন সংবাদ পত্র পাঠে রত]

১ম যুবক। ওটা কি কাগজ হে?

২য় যুবক। আজকের দৈনিক—সংবাদ প্রবেশিকা।

১ম যুবক। কোনও কৌতুহল জনক সংবাদ আছে নাকি?

২য় যুবক। আছে; খুব আশ্চর্য্য ঘটনা।—শোন।

[সকলে স্ব স্ব চেয়ার টানিয়া দ্বিতীয় যুবকের চারি দিকে ঘেরিয়া বসিলে যুবক পড়িতে লাগিল]

অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার।—আজ প্রায় ছ'মাস হইল শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র নামক বিক্রমপুর নিবাসী একটি ভদ্রলোক বিক্রমপুরের অন্তর্গত খাঁড়গুলি গ্রামে প্রায় ২০০.৩০০ বিঘা জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমী ক্রয় করেন। কয়েক দিন পরে আশু বাবু জেলার রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়া এই ভূখণ্ড নিজকৃত কোনও ক্ষতির পূরণ হিসাবে বামাপদ বসু নামক (যিনি সম্প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষা সভার ব্যয়ে ইতালী হইতে ভাস্করবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন) তাঁহার এক বাল্য বন্ধুর নামে লিখিয়া দেন এবং নিজের ব্যয়ে সে জমীর ব্যবহারোপযোগী সংস্কার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। আজ প্রায় এক মাস হইল ভুমিতে আবশ্যকীয় খননাদি করিতে করিতে আশু বাবু একটি অপূর্ব্ব পুরাতন প্রস্তর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূর্ত্তিটি একটি অনিন্দ্য সুন্দর রমণীর। যদিও বহু কাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় মূর্ত্তিটি এখন জ্যোতিহীন তথাপি এখনও ইহাকে দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মূর্ত্তিটির নাসিকার অগ্রভাগ, হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি, বাম কর্ণ এবং দক্ষিণ পদের কিয়দংশ নাই; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোথাও কিছু হয় নাই।

আশু বাবু এই আবিষ্কার বার্ত্তা গোপন রাখিয়া মূর্ত্তিটি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির একটি বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শন করেন। উপস্থিত সকলে মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, এবং অনেক গবেষণার পর সকলেরই মতে ইহা অবিসংবাদিত সত্যরূপে গৃহীত হয় যে, এই মূর্ত্তিটি ভারতীয় ভাস্কর শিল্পের একটি অত্যুজ্জল নিদর্শন। শুধু তাহাই নহে এই মূর্ত্তির সহিত উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কণারকের খোদিত প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির সহিত এত সৌসাদৃশ্য আছে যে, ইহা যে একই শিল্পীর রচিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না, এবং যখন এই

মূর্ত্তিটি বাংলা দেশের ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে তখন উড়িষ্যার মন্দিরাদি বাঙ্গালীর রচিত নহে বলিয়া যাহারা সন্দেহ করিতেন আশা করি তাহাদের সে ভ্রান্ত ধারণা এত দিনে দূর হইবে। সভার মতে মূর্ত্তিটি পদ্মালয়া লক্ষ্মীর। সভ্যেরা মূর্ত্তিটি ক্রয় করিয়া সোসাইটির সংগ্রহ ভবনে রাখিতে চাহিলে তাহার মূল্য নিরূপণের জন্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যানসেলার, সরকারী আর্ট স্কুলের ভাইস্ প্রিন্সিপাল, গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর, বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

এত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটি গোপন রাখা হইয়াছিল; গত পল্য তাঁহাদের শেষ অধিবেশনে তাঁহারা স্থির করেন যে, এইরূপ একটি অতীত কালের শিল্পের নিদর্শনের মূল্য ন্যূন কল্পে ২০০০০ মুদ্রা হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ শেঠবংশীয় কুমার বাহাদুর এই মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়া ২৫০০০৲ টাকা মূল্যে উহা স্বীয় পুরাতন শিল্প সংগ্রহের জন্য ক্রয় করিবার অভিলাষী হন। এ দিকে আমাদের দেশের গৌরব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ধনঞ্জয় বাবুর প্রস্তাবে ও উদ্যোগে এবং পরিষদের পৃষ্ঠপোষক মহারাজদ্বয়ের আনুকূল্যে ৩০০০০৲ হাজার টাকা প্রদান করিয়া উক্ত মূর্ত্তিটি ক্রয় করিয়া লইতে চাহেন।

বলা বাহুল্য সাহিত্য পরিষদের মূল্য সর্ব্বোচ্চ হওয়ায় আশু বাবু মূর্ত্তিটি পরিষদকে উহা বিক্রয় করিয়াছেন; মূর্ত্তিটি অদ্য প্রাতে পরিষৎ গৃহে নীত হইবে।

যে ভূমি খণ্ডে উক্ত মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে তাহা আইন অনুসারে বামাপদ বাবুর বলিয়া আশু বাবু উক্ত ৩০০০০ সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা বামাপদ বাবুর এই অসাধারণ সৌভাগ্যোদয়ে আন্তরিক সুখী।

১ম, ৩য়, ৪র্থ যুবক। (সমস্বরে) কপাল! কপাল! তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৫ম যুবক। বঙ্গের বিভিন্ন জেলা সমূহে এইরূপ স্থানের অভাব নাই। বহু পূর্ব্বে যে স্থানে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগর ছিল, সে সকল স্থান এখন পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ। আসুন আমরা জন কয়েক নব্য যুবক মিলে একটি যৌথ কারবার খুলে এই সকল পতিত জমী ক্রয় করে খনন কার্য্য আরম্ভ করি; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই স্বদেশী যুগে সকলে ঐকান্তিক চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এইরূপ নানাবিধ মহারত্নের আবিষ্কার করে নিজেরাও লাভবান হব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হব। যথার্থ ই বলেছেন—

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই—
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

সকলে সমস্বরে। অতি সাধু প্রস্তাব। আমরা সকলে সম্মত। বলুন বন্দে মাতরম্।

(পট ক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

(৫ বৎসর পরে)

প্রথম দৃশ্য

[বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প প্রদর্শনী]

(জন সমাগম—পুত্র সহ মিঃ বসু ও বিজলা, পরিষদের এক জন কর্ম্মচারী সকলকে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি বুঝাইয়া দিতেছেন)

কর্ম্মচারী। ই দেখুন, এ মূর্ত্তিটি পদ্মালয়া লক্ষ্মীর। যাহারা উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কণারকের কারু কার্য্য দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন সেখানকার মূর্ত্তিগুলির সহিত এটির সৌসাদৃশ্য কত। অথচ এটি আমরা বিক্রমপুরে মাটির তলায় পেয়েছি। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, উড়িষ্যার শিল্প কল্পনা আমাদেরই

এক জন বাঙ্গালীর। এসম্বন্ধে যৎটুকু সন্দেহ ছিল সে সব এই মূর্ত্তিটির আবিষ্কারে দূর হয়ে গিয়েছে। মূর্ত্তিটি বহু কাল মাটির নীচে থাকায় মাঝে মাঝে দাগ হয়ে গিয়েছে, নাক কান, হাত পা'র স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গিয়েছে। পরিষৎ বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধুরন্ধর মহাশয়ের দ্বারা ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে সে সকল মেরামত করিয়েছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের চিরহিতৈষী বদান্য মহারাজ বাহাদুরের আনুকূল্যে পরিষদ এই মূর্ত্তিটি ৩০০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেছেন।

বামাপদ। (জনান্তিকে) বিজলী, এই সেই বিখ্যাত "পদ্মালয়া লক্ষ্মী"! যে যে স্থান ভাঙ্গা ছিল সব মেরামত করান হয়েছে, এবং শুদ্ধ এই মেরামত করেছেন বলেই হয় ত তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে! অথচ আজ যে সাহিত্য পরিষৎ এই মূর্ত্তিটির গৌরব করছেন তার জন্য আমি কতটা দায়ী! আজ, এত দিন পরেও যেন আমার সব স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

বিজলী। এই সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি! এরি দাম ৩০০০০৲ হাজার টাকা?,

বা। হ্যাঁ! এখন এর দাম তাই বটে!

বি। বামাপদ, প্রিয়তম, সত্য সত্যই কি সুন্দর এই মূর্ত্তি; আমি যেন ইহার মুখে এখনও স্বর্গীয় আভা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

বা। হঁ্যা, তা বটে! কিন্তু আশু যে দিন তার হাত, পা, নাক, কান গুঁড়িয়ে দেয় সে দিন সে আরও সুন্দর ছিল। আশু, উদার, সরল, পরোপকারী বন্ধু আমার! সেই আমার সকল উন্নতির মূল।

কৈ, খোকা কোথা গেল? দেখ দেখি তাকে কোথায় এই ভিরে ছেড়ে ছিলে? না তুমি এখনও ছেলেপুলেকে সাবধান করতে শিখলে না। চল দেখে আসি।

যবনিকা পতন।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

কাছাড়ী জাতির প্রাচীন ইতিহাস *

যেই জাতি অধুনা উত্তর পূর্ব্ব ভারতের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করিয়াছে সেই জাতির যে শাখা কামরূপে উপনিবেশ স্থাপন করে মাত্র সেই শাখারই বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। এই শাখাভুক্ত কাছাড়ীকে পশ্চিম বিভাগীয় কাছাড়ী এবং যাহারা প্রথমতঃ সদিয়ার নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদিগকে পূর্ব্ব বিভাগীয় কাছাড়ী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। কামরূপ বা কোচ এক সময়ে পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। কোচবিহার, বিজ্‌নি, মঙ্গলদই এবং বেলতলা প্রভৃতি স্থানের রাজবংশের আদিপুরুষ সেই কামরূপের রাজবংশ; সুতরাং পশ্চিম বিভাগীয় কাছাড়ীর ইতিহাসের কোনও গোল নাই। আমি এ স্থলে পূর্ব্ব বিভাগীয় কাছাড়ী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্ব বিভাগীয় কাছাড়ী

এই বংশ অতি প্রাচীনকালে চুটিয়া নাম ধারণ পূর্ব্বক আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে সদিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের স্থিতিকাল নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইয়াছে যে, এই জাতি আহমগণের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী এক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আহমেরা বিখ্যাত 'সান' বা 'টাই' বংশের শাখা। ইহারা ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হইতে পাতকৈ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া এই সকল শৈল শ্রেণীর উত্তর পার্শ্বস্থ ভূভাগের অধিবাসী মোরান, বোরাহী প্রভৃতি কাছাড়ী জাতিকে পরাভূত করে। কিন্তু চুটিয়াগণ প্রায় দুই শতাব্দী কাল ইহাদের সহিত সমান ভাবে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নাগা পর্ব্বতের পাদমূলে ধানসিড়ি নদীর তীরস্থ ডিমাপুরে

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ। প্রথমাংশ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, এবং এই প্রদেশে কিছু কাল শান্তি ভোগ করিয়া বেশ সভ্য হইয়া উঠে। কয়েকটি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ এই জাতির লুপ্ত সভ্যতার কঙ্কালরূপে অদ্যাপি আসামের এই সুদূর প্রান্তে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের প্রাচীন শত্রুগণ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আবার উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ডিমাপুর অধিকার ও লুণ্ঠন করে। কাছাড়ী বা চুটিয়া রাজা তৎপরে মইবঙ্গে পলায়ন করেন, এবং দুই শতাব্দী কাল তদীয় বংশধরেরা তথায় আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হয়। এবার জৈন্তিয়ার রাজা চুটিয়ারাজকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাভূত করিয়া কাছাড় প্রদেশের খাসপুর নামক স্থানে তাড়াইয়া দেন। এই স্থানে চুটিয়া রাজবংশ ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে থাকেন, এবং ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন চুটিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র প্রকাশ্যে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করেন।

হিন্দু হওয়ার জন্য ইঁহাদিগকে এক অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতা তাম্র নির্ম্মিত একটা প্রকাণ্ড গাভীর উদরে কয়েক দণ্ড অবস্থান করেন। পরিশেষে বহির্গত হইলে ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বীররাজ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া প্রকাশ করেন। এই কারণে দরাঙ্গের কাছাড়ীরা অদ্যাপি আপনাদিগকে ভীম-নি-সা বা ভীমের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব কালে ব্রহ্ম দেশীয়েরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে এবং হতভাগ্য রাজা নানা স্থানে আশ্রয় লইয়া অবশেষে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি সৌভাগ্য ক্রমে বৃটিশ সৈন্যের সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে শত্রু করে নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য বৃটিশ অধিকার ভুক্ত হইয়া যায়। মহানুভব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি তুলারামকে বর্ত্তমান উত্তর কাছাড় প্রদেশের কতিপয় অংশের শাসনভার প্রদান করেন। আসামের প্রাচীন মানচিত্রে এই প্রদেশ তুলারাম সেনাপতির রাজ্য বলিয়া চিহ্নিত রহিয়াছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তুলারামের স্বর্গারোহণের পর এই রাজ্য-খণ্ড ব্রিটিশ শাসনাধীন হইয়া নওগাঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জৈন্তিয়ারাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে চুটিয়ারাজ প্রথমতঃ মইবঙ্গে ও তৎপরে খাসপুরে পলায়ন করেন কিন্তু এই পলায়ন ব্যাপারের সহিত সমগ্র চুটিয়া জাতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই জাতীয় বহুসংখ্যক লোক তখনও পার্ব্বত্য প্রদেশে থাকিয়া যায়, মাত্র রাজা, রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ, এবং রাজানুগৃহীত কতিপয় লোক মাইবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত যে সকল চুটিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল! এবং আহম জাতির সহিত সংঘর্ষের পরেও বহুসংখ্যক চুটিয়া বিজেতৃগণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া আদিম চুটিয়া উপনিবেশে অবস্থান করিতে থাকে, এবং তাহাদের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া সেক্সন, ওলন্দাজ ও নরমেনগণ হেষ্টিংশের যুদ্ধের পর যে রূপে পরস্পর মিলিত হইয়া এক অভিনব জাতি গঠন করিয়াছিল তদ্রূপ ইহারাও এক মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, চুটিয়া জাতিই আসামের আদিম অধিবাসী, এবং ইহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়াও বহু কাল যাবৎ জাতীয় আচার পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। অদ্যাপি "কাছাড়ী গাও" নামক অনেক গ্রাম আছে, অথচ সেই সকল গ্রামে এক জন চুটিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। আহমের অধিকার ভুক্ত হইলেও এই সকল গ্রামে কাছাড়ী রীতি নীতি কিরূপে

বহু কাল অব্যাহত রহিল ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়; ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার সুন্দর সমাধান রহিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা অবগত আছেন যে, রোমক জাতি ব্রিটন দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে দলে দলে দিনেমার, সেক্সন, এঙ্গল্স প্রভৃতি জাতি বল্টিক সাগর সন্নিহিত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান ইংলণ্ডের উর্ব্বর সমতল প্রদেশ-গুলিতে ছাইয়া পড়িয়াছিল! যে সকল আদিম অধিবাসী শত্রু হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহারা ওয়েলসের পর্ব্বতময় উষর প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল। সে সকল স্থান অনুর্ব্বর এবং সুখ-বাসের অযোগ্য বলিয়া শত্রুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল না, এবং ব্রিটনেরাও নির্ব্বিবাদে সেই সকল স্থানে রহিয়া গেল। ওয়েলসের অনেক লোক আজিও চলিত কথায় তাহাদের আদিম মাতৃ ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপে বহু কাছাড়ীও আহমগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তেরাই নামক ভুটান পর্ব্বতের পাদ দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তেরাই বা দুয়ার প্রদেশের জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ইহা বলাই বাহুল্য। গারো পর্ব্বত এবং উত্তর কাছাড়ও এই রূপেই কাছাড়ী জাতির আবাস ভূমি হইয়া পড়িয়াছিল।

কাছাড়ী জাতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় সর্ব্বদা অবিভক্ত ভাবে বাস করিতে ভালবাসে ইহার আভাসও পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখন কথা হইতে পারে কিরূপে এই সমাজ গত বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়ী জাতি উত্তর ও দক্ষিণ কাছাড়ী নামক দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু "বড়া" সম্প্রদায় বা "উত্তর কাছাড়ী," এবং "দিমাসা সম্প্রদায়" বা "দক্ষিণ কাছাড়ী" বর্ত্তমান সময়ে একে অন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে ইহা সত্য। ইহাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বিভিন্ন এবং ভাষা বিভিন্ন; কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাতে আবার এরূপ অনেক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহারা সকলেই পূর্ব্বে একই ভাষায় কথা কহিত। ভাষা ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে বিবাহের জন্য কন্যার আদান প্রদান হয় না। এই দুই সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদের মূলে একটা প্রবাদ বা জনশ্রুতি চলিত আছে। ইহা এই—

অতি প্রাচীন কালে চুটিয়া জাতির সহিত আর এক পরাক্রান্ত জাতির যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে চুটিয়ারাজ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করেন, এবং চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপনীত হন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, নদী উত্তীর্ণ হওয়ার কোনও উপায় নাই; আবার পশ্চাতে শত্রু অনুসরণ করিতেছে; এই অবস্থায় কোনরূপে রাত্রি কাটাইতে পারিলে পরদিন শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করাই স্থির হইল। রাত্রে নিদ্রাঘোরে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন এক দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বৎস, ভয় নাই, আমি তোমার সহায়। রজনী প্রভাতে নদী-তীরে যে স্থলে একটি বক দেখিতে পাইবে সে স্থলে সসৈন্যে সাহসে ভর করিয়া নদী প্রবেশ করিও, অক্লেশে নদী উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু সাবধান! নদী অতিক্রম কালে কেহই পশ্চাৎ দিকে তাকাইও না।" পরদিন রাজা দেবীর আদেশ মত কার্য্য করিলেন। তিনি অগ্রে নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং অনেক সৈন্য পরপারে উপনীত হইল: কিন্তু তখনও বহু সৈন্য নদী-গর্ভে, এবং অনেকে নদী-তীরে রহিয়া গেল। এই সময়ে দুর্ভাগ্য ক্রমে নদী-গর্ভস্থ জনৈক সৈনিক তাহার পুত্র নদী পার হইতেছে কি না ফিরিয়া দেখিল। দেবীর বাক্য অব্যর্থ—তখনই নদী অগাধ হইয়া গেল এবং যে যেরূপে পারে প্রাণ বাঁচাইল। যাহারা কূলের সন্নিহিত হইয়াছিল তাহারা কেহ কেহ নদী-তীরান্তজাত নল ও খাগড়া আশ্রয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কেহ কেহ স্রোতে ভাসিয়া নানা স্থান দিয়া তীরে উঠিল, এবং কেহ কেহ জলমগ্ন হইল। এই রূপে যাহারা নলের সাহায্যে জীবন রক্ষা করিল তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি নলবাড়িয়া এবং যাহারা খাগড়া আশ্রয় করিয়া প্রাণ বাঁচাইল

তাহাদের বংশধরগণ খাগড়াবাড়িয়া নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বেই নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণ 'ডিমাসা' বলিয়া পরিচিত হইল। "ডি" শব্দের অর্থ জল, ডিমাসা শব্দের অর্থ হইতে পারে 'বরুণ-পুত্র' বা 'বরুণ জাতি', সুতরাং 'ডিমাসা' শব্দ অন্বর্থ সন্দেহ নাই।

প্রাচী দেশের রূপক প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত; কিন্তু এই সকল আপাত অসম্ভাব্য ব্যাপারে অনেক সময় গূঢ় তথ্য প্রচ্ছন্ন থাকে; এবং একটু অনুধাবন করিলে এই প্রবাদ হইতেও কতকটা ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে জাতির সহিত চুটিয়া গণের যুদ্ধ ঘটে তাহারা আহম হইতে পারে, এবং যে নদীর উল্লেখ আছে সেই নদী ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই বোধ হয়। নল, খাগড়াগুলি ভেলার উপকরণ মাত্র। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নল-খাগড়ায় ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া কিংবা কোনও প্রকারে গোটা গাছ খুদিয়া ইহাদেরই সাহায্যে চুটিয়া সৈন্য নদী অতিক্রম করিয়াছিল। অনেকেই দীল্লীশ্বর আউরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লার সহিত আহমগণের সংঘর্ষের কথা অবগত আছেন। কথিত আছে তিনি যখন আসাম অধিকারের চেষ্টা করেন তখন ব্রহ্মপুত্রে হঠাৎ জোয়ার আসিয়া বারুদ গোলা বোঝাই তাঁহার অনেকগুলি নৌকা জলমগ্ন করে। সেইরূপ ব্রহ্মপুত্র হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া চুটিয়াগণকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ইহা অসম্ভব নহে। যে সকল চুটিয়া শত্রু হস্তে পতিত হয় তাহারা বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তেরাই প্রদেশে বা গারো পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। চুটিয়া জাতি এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। যাহারা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই তাহারা "বড়া" বা "কাছাড়ী" বলিয়া পরিচিত, আর যাহারা নদী অতিক্রম করে তাহারা ডি-মা-সা বলিয়া খ্যাত। যাহাতে এই দুই সম্প্রদায় পুনর্মিলিত হইয়া প্রবল না হয় আহমেরা সেই চেষ্টা করিতেও বোধ হয় অবহেলা করে নাই, সুতরাং তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আর মিলিত হইতে পারে নাই।

দরাঙ্গ জেলায় কাছাড়ীরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের ন্যায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। পর্ব্বত জাত "মুলি" নামক এক প্রকার বাঁশ থেতলাইয়া কিংবা ইকড় দ্বারা ঘরের বেড়া বা দেওয়াল প্রস্তুত করিয়া লয়। ইকড়ের উপর মাটির সুন্দর আস্তরণ দেয়। ইচ্ছা করিলে এই আস্তরণের উপর চুণ কাম করা যাইতে পারে। ইহারা বেত দিয়া চাল বাঁধে ও খড়ের ছাউনি দেয়।

বাসগৃহ

সাধারণতঃ প্রত্যেক গৃহ দুই ভাগে বিভক্ত, মধ্যে একটা বাঁশের বা ইকড়ের বেড়া থাকে মাত্র। এক অংশ খাওয়ার ও অপর অংশ শোয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবকেরা "ডেকা-চাঙ্গ" বা মাচায় গৃহস্থগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রাত্রি যাপন করে। কিন্তু এই প্রথা আজ কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

কাছাড়ী গ্রামের গায়ে গায়ে লাগা ঘরগুলি সাড়ি সাড়ি নির্ম্মিত হয়। এইরূপ দুই তিন সারি ঘর লইয়া একটি গ্রাম হয়। গ্রামে গাছ পালা বড় থাকে না, এবং ঘরের সাড়ির মাঝে কখনও কখনও একটা সোজা প্রশস্ত রাস্থা দেখা যায়। প্রত্যেক বাস গৃহে এবং গোলার চতুর্দ্দিকে প্রায় এক গজ গভীর এক একটি অপ্রশস্ত পরিখা আছে। এই পরিখার মাটী দিয়া কাছাড়ীরা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের মত একটা বেষ্টন প্রস্তুত করে, এবং এই বেষ্টনের উপর পরিখার দিকে হেলাইয়া ফাড়া বাঁশ বা ইকড় দিয়া এরূপ ভাবে বেড়া দেয় যেন মাটীর উপর এক বা দেড় গজ উচ্চ থাকে। এই বেড়াকে সাধারণ কথায় বুক বেড়া বলে। এই পরিখা ও বেড়া দুই উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, বাহিরের লোক সদর দরজা ছাড়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, গৃহপালিত পশুপক্ষী রাত্রিকালে বাড়ীর বাহির

কাছাড়ী গ্রাম

হইয়া শস্যাদির ক্ষতি করিতে সুবিধা পায় না। কাছাড়ী-দের বাড়ীতে হাঁস, মোরগ, ছাগল ও শূকরের ছড়াছড়ি, বিশেষতঃ শূকরগুলি বাড়ীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায় বলিয়া বাড়ীগুলি ভয়ানক নোংরা হইয়া থাকে।

কাছাড়ীরা খাদ্য দ্রব্যের বাছ বিচার করে না। গো-মাংস ব্যতীত ইহাদের কোন খাদ্যই নিষিদ্ধ নহে। বরাহ-মাংস কাছাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য, এবং এ কারণেই শাবক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্ববয়সের শূকরে কাছাড়ীর গৃহ সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। মেলায় এবং হাটে বিক্রয়ার্থ অসংখ্য শূকরের আমদানী হয়। দুগ্ধ কাছাড়ী জাতির অস্পৃশ্য। গারো এবং মঙ্গোলীয় অন্যান্য অনেক জাতি দুগ্ধ ব্যবহার করে না। কিন্তু দুগ্ধের প্রতি ইহাদের বিতৃষ্ণার কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে বাছুরকে ইহার এক-মাত্র খাদ্য হইতে বঞ্চিত করা নিষ্ঠুরতা। এই ঘৃণার ভাব ধীরে ধীরে দূর হইতেছে এবং সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা দুগ্ধের উপাদেয়তা বুঝিতে পারিতেছে।

খাদ্য

না-গ্রাণ অর্থাৎ শুকটি বা শুকনা মাছ কাছাড়ীর আর একটা উপাদেয় খাদ্য। ব্রহ্মপুত্রের উপকূল ভাগ হইতে জোয়ারের জল সরিয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক মৎস্য কর্দ্দমের গায়ে লাগিয়া থাকে। এই সকল মৎস্য সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রের তাপে শুষ্ক করা হয়, এবং দুয়ার প্রদেশের কাছাড়ীরা ধান ও এঁড়ি দিয়া এই সকল মৎস্য বদ্‌লাইয়া লইয়াথাকে। ইহাদের দুর্গন্ধ অতি তীব্র এবং আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পক্ষে এই গন্ধটা যতদূর অপ্রীতি-কর কাছাড়ীর রসনেন্দ্রিয়ের পক্ষে এটা তদপেক্ষা শতগুণ প্রীতিকর। পরন্তু এই দুর্গন্ধ মৎস্য ইহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিন্দুমাত্রও অনুপযোগী নহে।

না-গ্রাণ

কাছাড়ীরা জাল পাতিয়া বন্য হরিণ, বন্য শূকর প্রভৃতি জন্তু ধরিয়া থাকে। প্রথমতঃ ঘাস আছে এমন অনেকটা স্থান জুড়িয়া একটা জাল পাতে, পরে ঘেরা স্থানে বন্য জন্তু আসিয়াছে বুঝিতে পারিলে জাল গুটাইতে থাকে, এবং শিকার কোনও বলিষ্ঠ কাছা-ড়ীর হাতের কাছে আসিলে লাঠি ও দায়ের আঘাতে ইহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। মৎস্য শিকারটা বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরই কার্য্য। পূর্ব্ব হইতেই মৎস্য ধরার একটা দিন স্থির হয়, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইয়া এক বা একাধিক স্বল্পজলা নদীতে মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। শীত কালই মৎস্য শিকারের প্রশস্ত সময়। সে সময়ে পার্ব্বত্য নদীতে দেড় হাতের বেশী জল থাকে না, সুতরাং মৎস্য শিকারের জন্য জালের পরিবর্ত্তে অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাথৈ বা 'হোচা' এবং 'পলো' কাছাড়ীর নিত্য ব্যবহার্য্য মৎস্য শিকারের অস্ত্র।

পশু ও মৎস্য শিকার

মৎস্য-শিকার-যাত্রা কাছাড়ীদের একটা জাতীয় পর্ব্বের মত। যাত্রার দিন বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া জাথৈ লইয়া কোনও নদীতে যায়। এক এক দলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এরূপ থাকে যে, পাশাপাশি ভাবে জাথৈ ফেলিলে এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত নদীতে কোনও ফাঁকা স্থান থাকে না। যেখানে এক দল জলে নামিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে সেখান হইতে দেড় শত কি দুই শত হাত দূরে আর এক দল জলে নামিয়া একটা সারি বাঁধিয়া মাছ ধরিতে প্রবৃত্ত হয়। এক দল আর এক দলের যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে নদীর মাছগুলিও প্রাণের ভয়ে নিরাশ চেষ্টায় তত লাফালাফি করিয়া সরলা কাছাড়ী নারীর আমোদের মাত্রাটা ঘনাইয়া তুলে।

কাছাড়ীরা এঁড়ি নামক এক প্রকার গুটি পোকা পোষণ করিয়া তাহা হইতে এঁড়ির গুটি জন্মায়। গুটিগুলি হইতে স্ত্রীলোকেরা এঁড়ি সূতা পাকাইয়া

শিল্প

লয় এবং সেই সূতা দ্বারা হাতে তাঁত চালাইয়া উৎকৃষ্ট ও প্রায় রেশমের ন্যায় মূল্যবান এবং শীত নিবারক এঁড়ি নামক বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। এড়ণ্ড বা এঁড়ি বৃক্ষ এই সকল পোকার প্রধান খাদ্য বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের নাম এঁড়ি. এবং এই এঁড়ি পোকা হইতে সূতা ও সেই সূতা হইতে কাপড়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই উভয়ের নামও এঁড়ি। কিন্তু আসামজাত গামাড়ি বৃক্ষের পাতাও এঁড়ি পোকার খাদ্য।

তাঁতগুলি কাছাড়ীরা নিজ হাতেই প্রস্তুত করে। ইহাদের নির্ম্মাণ প্রণালী অতি সরল এবং তাঁতের উপকরণাদি স্থানীয় বাজারেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। একটি তাঁত প্রস্তুত করিয়া খাটাইয়া লইতে পাঁচ টাকার বেশী খরচ পড়ে না।

গৃহিণী বা যুবতী কন্যারাই ঘরের কোণে তাঁত চালাইতে চালাইতে মনের আনন্দে ও পরম শান্তিতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করে। কিছু কম এক শতাব্দী পূর্ব্বে কাছাড়ীরা এত শান্তিতে তাঁত চালাইতে পারিত না। তখন কাছাড়ী দুয়ার ব্রিটিশ শাসনে আসে নাই। কাছাড়ীরা তাহাদের পূর্ব্বপ্রভু ভূটান রাজগণের অধীনে ব্রিটিশ শাসনের শান্তি সুখ উপভোগ করিতে পারিত না।

বাড়ীর কর্ত্তা পরিবারের কার্য্যক্ষম পুরুষদিগকে লইয়া অতি প্রত্যুষে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে ক্ষেতে চলিয়া যায়। এদিকে বাড়ীর মেয়েরা বেলা ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত তাঁত চালাইতে থাকে। সেই সময়ে গৃহিণী কলাপাতে করিয়া এবং কলাপাতে উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাহারা মাঠে কাজ করিতে গিয়াছে তাহাদের খাদ্য লইয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া আবার তাঁতে বসে, এবং যতক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়া দৃষ্টিশক্তি রোধ না করে ততক্ষণ অক্লান্তভাবে কার্য্য করিতে থাকে। কাজে বিশেষ বাধা না ঘটিলে এক জন কাছাড়ী রমণী দৈনিক এক হাত এঁড়ি প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপ এঁড়ি সাধারণতঃ দুই গজ চওড়া হইয়া থাকে, এবং প্রতি গজের মূল্য খুব সস্তা হইলেও ২৲ দুই টাকার কম হয় না; সুতরাং প্রতি স্ত্রীলোক কর্ত্তব্য গৃহ কার্য্যে অবহেলা না করিয়া মাসে ৩০৲ অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

কাছাড়ী স্ত্রীলোক অবরোধ প্রথার অধীন নহে। পথিপার্শ্বে অপরিচিত পথিকের মুখ পানে তাকাইয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে কাছাড়ী রমণী দ্বিধা বোধ করে না। অথচ যাহা রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য-সম্পদ—যাহা রমণীর গৌরব, কাছাড়ী স্ত্রীলোকের তাহার অভাব নাই। তাহাদের মুখে সলজ্জ ভাবটি প্রফুল্ল পুষ্পের উপর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ছটার ন্যায় সর্ব্বদা লাগিয়া আছে। কাছাড়ী পত্নী স্বামীর নিকট একটা আত্মহীন শুধু বিলাস বা ভোগের সামগ্রী নহে। স্বামী পত্নীকে দস্তুর মত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং পত্নী স্বামীর সমকক্ষ, সঙ্গী ও বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হয়। রমণী যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে অথচ সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইতে বড় একটা দেখা যায় না। কোনও আগন্তুক বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পরস্পর আভাষণের পর গৃহস্বামী স্বীয় পত্নীকে কাছাড়ী ভাষায় "এই আমার বুড়ী" বলিয়া আগন্তুকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেয়। এই সম্বোধনে ব্যঙ্গ বা হীন জনের প্রতি মিনতি-করুণ কাকুতির উত্তরে কারুণ্যপূর্ণ অনুগ্রহের ইঙ্গিত নাই—আছে প্রেমপূর্ণ প্রীতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা।

কাছাড়ী জননীর সন্তান বাৎসল্য

কাছাড়ী রমণীগণ সাধারণতঃ বহু সন্তানের প্রসূতি হইয়া থাকে। অতএব অনেক গুলি শিশু সন্তান যখন তাঁতের সম্মুখে খেলা করিয়া অশান্তি ঘটায় তখনও জননী সন্তানকে মমতাহীন শাসন করে না। যদি বা কোনও সময়ে শাস্তি বিধান করিতে বাধ্য হয় তখন জননীর মুখে ক্রোধ অপেক্ষা কোমলতা মিশ্রিত দুঃখের ভাবটাই বিকশিত হইয়া উঠে।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

জ্ঞানী ও অজ্ঞান

(তেলেগু ভাষা হইতে)

বিদ্যা, বুদ্ধি নাহি যাঁর অমূল্য রতন,
সেই জন করে শুধু মুখে আস্ফালন।
বিদ্যার প্রভাবে যাঁর হৃদয় গম্ভীর
বাক্য তা'র ঢালে সুধা জুড়ায় শরীর।
আঘাত পাইলে স্বর্ণ সে রহে নীরব
পিতল জানায়ে দেয় আপন বিভব।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহিন্তা।

পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতি

১৯০৬ খৃঃ জুন মাসের "ঊনবিংশ শতাব্দী ও তৎপর" (Nineteenth Century and After) নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত "ফর্ব্‌স্ ফিলিপ্‌স্" (Forbes Phillips) যে "পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতি" আখ্যা দিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

আমাদের জীবনে কোন সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, আমরা জীবনে যেখানে কখনও যাই নাই বা যাহা দেখি নাই এরূপ নূতন স্থানে উপস্থিত হইলেও তাহা যেন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত, সে সমস্ত দৃশ্যই যেন আমাদের পূর্ব্ব দৃষ্ট এবং তৎস্থানের কোন বিশেষ ঘটনার সহিত যেন আমাদের সংস্রব ছিল এই প্রকারের ভাব আমাদের মনে হঠাৎ উদিত হয়। এই ব্যাপার ইতিহাসের প্রথম আলোকের সহিতই মনুষ্যের মন অধিকার করিয়া ব্যাখ্যার জন্য তাহার চিন্তাকে ব্যাপৃত করিয়াছে! ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের দর্শনে প্রথম ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যায় জন্মান্তরীণ সংস্কারই পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে মূল রহস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের উন্নত নীতি বিজ্ঞানে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে, এবং ঈজিপ্তেও তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। গ্রীক্ দার্শনিক প্রবর প্লেটোর দ্বারাও তাহাই অবলম্বিত হইয়াছে। য়িহুদি ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার অনুবর্ত্তন দেখা যায়। জার্ম্মেন্ ও ইংরাজ দার্শনিকদিগের মতও ইহারই দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাতে কতকটা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়, ধর্ম্ম ও দিব্য জ্ঞানের দোহাই দিতে হয়। সুতরাং এটিকে অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় না। এই কারণে ফিলিপ্‌স্ (Phillips) ইহার স্থলে একটি নূতন ব্যাখ্যার প্রস্তাব করিয়াছেন। "পূর্ব্ব পুরুষীয় স্মৃতি" স্বীকার করিলে ইহাই শেষ তত্ত্ব দাঁড়ায়। আমাদিগকে ইহার জন্য অনুমান বা অন্য কোন মতের আর অপেক্ষা করিতে হয় না।

শিশু যে সাধারণতঃ পিতামাতার আকৃতিবিশেষ ও পিতামহের ভাবভঙ্গী প্রাপ্ত হয় তাহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, শিশুতে পূর্ব্ব পুরুষীয় স্মৃতিই অংশতঃ বিদ্যমান আছে? তাহাদের রক্তে যে পূর্ব্ব পুরুষের সংস্কার নিবদ্ধ রহিয়াছে সময় ও সুযোগ মতে তাহাই কি উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রকটিত হয় না? যদি তাহাই হয় তবে প্রাচ্য ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকেই কি আমরা পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতিতেই জীবনের বহু সমস্যার ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারি না?

মনুষ্যের মনে সর্ব্বদা সংস্কার সকল প্রবেশ লাভ করিতেছে। সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের সংস্কার এরূপ গভীর ভাবে আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহা ইচ্ছাকৃত ছিল এক্ষণে তাহা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যের কোন অভ্যাস গঠিত হওয়ার কথা আমরা বলিয়া থাকি কিন্তু আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি না যে, বহু স্থলেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অতীত কাল হইতেই তাহা তাহার জন্য গঠিত হইয়া আসিয়াছে।

নির্জ্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়া চলিবার সময় আমাদের কর্ণ চকিত হইয়া থাকে, আমরা দক্ষিণে, বামে দৃষ্টি পাত করিতে থাকি, এবং আমাদের স্কন্ধের উপর দিয়া

পশ্চাদ্দিকে চাহিতে যাই। এই অভ্যাস আমরা কোথা হইতে শিক্ষা করিলাম? এরূপ কি হইতে পারে না যে, এখানে আমাদের বহু পূর্ব্বকালে মুদ্রিত স্মৃতি ফলক তাহার লিপিকে প্রকটিত করিতেছে? আমাদের অসভ্য পূর্ব্ব পুরুষ বহু কালের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে নির্জ্জন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে সচকিত থাকিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহা কি তাহারই ফল বলিয়া মনে করা যইতে পারে না?

যখন আমাদের কোপের ভাব পূর্ণরূপে উদ্রিক্ত হয় তখন আমাদের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসে, আমরা ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকি; আমাদের দাঁত বাহির হইয়া পড়ে; আমাদের সমস্ত দেহ-ভঙ্গীতে আমরা যেন লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহারই আভাস পাওয়া যায়। এখানে আমরা আদিম মনুষ্যের প্রকৃতির পরিচয়ই পাইতেছি বলিয়া মনে করিতে পারি।

সেই মনুষ্য শত্রুকে দন্ত ও নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিবার জন্য এরূপ ভাবেই আপনাকে আপনাতে সংহত করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর পতিত হইত। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে "ন্যক্কার জনক" এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ যে অতীব "ন্যক্কার জনক" পচা মাংসের অসহ্য দুর্গন্ধ হইতে নাক ফিরাইয়া লইতেন আমাদের কল্পনা যেন তাহার দ্বারাই এখনও অধিকৃত রহিয়াছে।

আমরা যখন রোমহর্ষণ দৃশ্যের বর্ণনা করি তখন প্রায়ই তন্মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু বুজিয়া থাকি, অথবা মাথা নাড়িতে থাকি, যেন আমরা সেই অপ্রীতিপ্রদ বস্তুটিকে দূর করিয়া দিতে বা না দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। সেই অভ্যাসটি অবশ্যই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা জনিত সংস্কার হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে।

ফিলিপ্‌সের দৃষ্টান্তের সমর্থনে এখানে আমরা পাশ্চাত্য তত্ত্ববিৎ বিড্‌নেলের অতীব কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

"আমরা কেন লাল, সবুজ ও নীল এই তিন বর্ণকে মূল বর্ণ বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছি?" তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথম মনুষ্যের বর্ণ জ্ঞান এই তিনটি বর্ণেরই সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের ঈদৃশ প্রাধান্য হইয়াছে। তাঁহার উপরে নীল আকাশ-মণ্ডল বিরাজিত; চতুর্দ্দিকে সবুজ উদ্ভিদে জগৎ শোভমান, দেহা-ভ্যন্তরে লাল রক্ত প্রবাহিত। এইরূপে ইহাদের সহিত নিকট সম্পর্ক হইতে ইহাদের সম্বন্ধে সংস্কারই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেহ-শোণিত হইতেই যে লাল বর্ণের নাম হইয়াছে তাহা দেহশোণিতের রক্ত ও রুধির এই নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। যখন শত্রুকর্ত্তৃক আহত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দেহ হইতে রক্ত পাত হইত ও তাহাতে কষ্ট হইত তখন রক্তপাতের সহিত ক্ষত জনিত কষ্টের স্বভাবতঃই একটা যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কালে ক্ষত শুকাইয়া গেলেও রক্তের লাল বর্ণের সহিত যন্ত্রণার সংযোগ রহিয়া গিয়াছিল। আরণ্য মহিষ রক্ত দেখিলে উন্মত্ত হইয়া উঠে। লাল কাপড়ের টুকরা দেখিলে বৃষ কিরূপ ক্ষেপিয়া উঠে তাহা সকলেই জানেন। রক্ত-পাত কেবল যে অসভ্য লোকদিগের মধ্যেই লুক্কায়িত হিংসা ভাবের উত্তেজক হয় তাহা নহে, কিন্তু পরিমার্জ্জিত প্রকৃত সভ্য লোক দিগের মধ্যেও ঐ ভাবেরই উত্তেজক হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে পূর্ব্বপুরুষীয় সংস্কারই যে প্রবল তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

স্বপ্নে যে আমাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন হয় তাহার জন্যে ফিলিপস্ পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতির পরিবর্ত্তে জাতীয় স্মৃতি বা পুরাতন আত্মা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আমাদের জীবনের সাধারণ বিষয় এবং বহির্জ্জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়যোগে সাধারণ জ্ঞানের নিয়মে অনুভূত হইয়া থাকে বটে কিন্তু প্রাগুক্ত বিশেষ ব্যাপারে আমাদের পুরাতন আত্মা অর্থাৎ জাতীয় স্মৃতি যোগেই সঙ্ঘটিত হইয়া

থাকে। ঐ সমস্ত ব্যাপারে যেরূপ বোধ, যেরূপ দর্শন হইয়া থাকে তাহা চিরাগত জ্ঞান ধারার অন্তর্ভুক্ত তাহা সাধারণ বোধ ও দর্শনের ন্যায় ব্যক্তি বিশেষে, বাসস্থান বিশেষে আবদ্ধ নহে। বিভিন্ন বংশ ক্রমাগত সংস্কারের সার সংস্কার সকল দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত পুরাতন আত্মা বা জাতীয় স্মৃতি গঠিত হয়। সুতরাং ইহার কার্য্য যে পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতির কার্য্য অপেক্ষা বিশিষ্টতর ও উচ্চতর হইবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। যখন আমরা সাধারণ জ্ঞান-জগৎ হইতে এই জাতীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-জগতে প্রবিষ্ট হই, তখনই আমরা ভূমানন্দ, দিব্য জ্ঞান, ভবিষ্যদ্বাণী অতীন্দ্রিয় দর্শন প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সকল নিষ্পাদন করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকি। এই প্রকারে ফিলিপ্‌স্ পূর্ব্বপুরুষীয় ও ভারতীয় স্মৃতি দ্বারা আমাদের জীবনের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমবিকাশ বাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

এখানে ফিলিপ্‌সের মত সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করি। ফিলিপ্‌স্ বহু স্বীকার্য্যের দোষ দিয়া হিন্দু মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি নিজেও তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি এক বার পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতি স্বীকার করিয়া লইয়া যখন তাহার দ্বারা সমস্ত ব্যাখ্যাত হয় না দেখিলেন তখন আবার আত্মা ও জাতীয় স্মৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি "পূর্ব্বপুরুষীয় স্মৃতি" কোন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় না। ইহা যদি কেবল মাত্র মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষকেই বুঝায় তবে ইহা বিশেষ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে সুতরাং ইহারদ্বারা সমস্ত জীব বিকাশের ব্যাখ্যা না হইয়া এক বিশেষ জাতীয় জীবের বিকাশই মাত্র ব্যাখ্যাত হয়।

ফিলিপ্‌স্ হিন্দু মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার নিজের মত যে হিন্দু মতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিয়াছে আমাদের নিকট এরূপ বোধ হয় না। জন্মান্তরবাদ যোনিভ্রমণবাদ ও কর্ম্মবাদ এই কয়টির দ্বারাই হিন্দুগণ জীবের ক্রম বিকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জন্মান্তরবাদ দ্বারা একই জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন জন্মের দ্বারা আমাদের কিরূপ উন্নতি হয় আমরা তাহা বুঝিতে পারি। যোনিভ্রমণবাদের দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে উন্নত জাতিতে পরিণত হইতে পারি তাহা বুঝিতে পারি। কর্ম্মবাদের দ্বারা আমাদের উন্নত বিকাশের মূল রহস্য যে কর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারি। হিন্দুর ক্রমবিকাশবাদের পূর্ব্বোক্ত মূল সূত্রদ্বারা ফিলিপসের মতের ব্যাখ্যা হইতে পারে কি না এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

ফিলিপ্‌স্ যেখানে "পূর্ব্বপুরুষ" বলিয়াছেন হিন্দু মত সে খানে "পূর্ব্বজন্ম" বলিয়াছেন। এই "পূর্ব্বজন্ম" কথাটি যেরূপ ব্যাপক "পূর্ব্বপুরুষ" সেরূপ ব্যাপক নহে। পূর্ব্বজন্মের মধ্যে যেমন পূর্ব্বপুরুষ অন্তর্ভূত হইতে পারে তদ্রূপ নিজেও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। পূর্ব্বপুরুষ মরিয়া পুনর্ব্বার কখন কখন নিজ পরিবারে বা বংশে জন্ম গ্রহণ করে ইহা হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস। পিতা নিজেই যে পত্নীতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তাহা স্পষ্টই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভ্ভূত্বেহ মাতরং।
জায়ায়া স্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

পতি গর্ভ রূপে মাতৃরূপিণী পত্নীতে প্রবেশ করেন, পুনর্ব্বার তাহাতে (ভার্য্যাতে) জাত হয় বলিয়া তাহার "জায়া" নাম হইয়াছে। শেষোক্ত মতটিতে আমরা ফিলিপ্‌সের মতেরই স্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ইহাই সম্প্রসারিত হইয়া যে 'বাদের' উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, হিন্দুর জন্মান্তর বাদে যেমন পূর্ব্বপুরুষবাদ অন্তর্নিবিষ্ট তেমনই পূর্ব্বজন্মবাদও অন্তর্নিবিষ্ট।

যোনিভ্রমণবাদে আমরা এক শ্রেণীর জীব অন্য

শ্রেণীর জীবে পরিণত হয় তাহারই ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই। হিন্দুর চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা সকলেই অবগত আছেন। জন্মান্তরকে আমরা এক শ্রেণীর জীবের উচ্চ নীচ বিকাশ বলিয়া ধরিতে পারি এবং যোনি ভ্রমণকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিকাশ মনে করিতে পারি। মনুসংহিতাতে এই বিকাশ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিপতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥
——— ১২ শ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

সেই আত্মার শরীর (লিঙ্গ শরীর) হইতে অসংখ্য শরীরী উৎপন্ন হইয়া সতত উচ্চ নীচ জীবদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

আত্মার অসংখ্য বিকাশ রূপেই উচ্চ নীচ জীবসকল সর্ব্বদা দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। সুতরাং হিন্দুর জীববিকাশ যে চৌরাশি লক্ষের উপর অর্থাৎ অসংখ্য তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। হিন্দু একই আত্মার সহিত সমস্ত জীব বিকাশকে সংযুক্ত করিয়া বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে কিরূপ বিশাল ও সমগ্র ভাবে এই বিকাশকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ফিলিপ্ সের জাতীয় আত্মার পরিবর্ত্তে বিশ্ব আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিরা ক্রমবিকাশের কিরূপ চরম সীমা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা এখানে দেখিতে পাইলাম।

উপরে আমরা জন্মান্তরবাদ ও যোনিভ্রমণবাদ, কেবল ক্রমবিকাশের প্রকার, ক্ষেত্র ও মাত্রার বিষয় জানিতে পারিয়াছি। কর্ম্মবাদে আমরা ইহার প্রক্রিয়া বা কার্য্য প্রণালীর বিষয় জানিতে পারিব। একটি প্রচলিত শাস্ত্র-বাক্য আছে "কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিঃ।" কর্ম্মের অনুরূপই বুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের কর্ম্মের যতই উৎকৃষ্টতা হইবে, আমাদের বুদ্ধিরও ততই উৎকর্ষ হইবে এবং বুদ্ধিবৃত্তির যতই উৎকর্ষ হইবে আমরাও ততই উন্নত হইব। এইরূপে বুদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ দ্বারাই, মনুষ্য জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের পদে অধিরূঢ় হইয়াছে। মনু লিখিয়াছেন :—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥—মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৯৬।

জগতে আমাদের দুই প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এক বাহ্য বিষয় ও অপর অন্তরের বিষয়। বাহ্য বিষয় মনের দ্বারা গ্রাহ্য এবং অন্তরের বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইয়াই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত এই যোগ হইতেই মন অন্তঃকরণ (অন্তরিন্দ্রিয়) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা অধিষ্ঠিত। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে॥" ৩।৪০

মনের দ্বারা স্থূল বিষয়ের পরিচয় হয়, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের পরিচয় হয়, মনের দ্বারা স্থূলভূত বিষয়ক চিন্তা হয়। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান হয় ; মনের দ্বারা পার্থিব বিষয়ের ধারণা হয়, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ধারণা হয় ; সুতরাং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। শ্রীমতি এনিবেসেণ্ট তাঁহার গীতার অনুবাদের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন —

"Manah (মনঃ) is the mind both in the lower mental process in wich it is swayed by the senses, and emotions, and in the higher processes of reasoning ; Buddhi is the faculty above the ratiocinating mind, and is the pure Reason exercising the discriminative faculty of intuition of spiritual discernment."—Introduction. The Bhagabad Gita or the Lord's song.

এই বুদ্ধির উৎকর্ষ ও উজ্জ্বলতা হইতেই আত্মা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই খানেই বিকাশের পরাকাষ্ঠা। গীতায় এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥"
৪২, ৩য় অধ্যায়।

আত্মার বিকাশে মনুষ্য ঐশ্বরিক মহিমা লাভ করিয়া থাকে সুতরাং তখন তাঁহার পক্ষে ফিলিপ্সের উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় দর্শন প্রভৃতি কিছুই অসম্ভবনীয় থাকিতে পারে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয়, সাঙ্গ করিয়ে সকল কর্ম্ম তোর।
বিছায়ে দে মোর শিথিল শরীর—শ্লথ আঁচলের মত,
খোলা বাতায়নে অর্দ্ধ শয়নে চেয়ে থাক অবিরত।

দুপ'র বেলার রৌপ্য রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
তুই, অম্‌নি গান কি গন্ধের মত ঘুরে বেড়া মোর কাছে।

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিল্লী-রবের মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি কে হাপড়ে ফুঁ দিতেছে অবিরত!
দিকে,দিকে,দিকে জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে তালে
কোন্ রূপসীর স্বপ্নমেখলা গড়িছে বিশ্বশালে!

কাল দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে, নির্জ্জন ঘাটে, জাগিছে এ কার মায়া!
মরীচিকা চাহি শ্রান্ত পথিক ফুকারে 'ফটিক জল'।
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে ছাড়ে না অশথ-তল।

আজি রে বিশ্ব কি মধু মধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর ;
বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে,
কল্পনা তার গুণ্ গুণ্ করে অলি-গুঞ্জনে রটে।

দূর অতীত নিকটে এসেছে কি গোপন সেতু বাহি!
অঙ্গে আলস দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখ পানে চাহি।
এসেছে তাহারা দিগন্তহারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুর বীথি-পথে!

কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু—দীপ্ত অগ্নি ঢালা—
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা।
সরসী-সোপানে কে বসি গোপনে চন্দন মাখি গায়,
মোর, নয়ন-পাতায় শয়ন বিছায় পল্লব ঘন ছায়!

আখি মুদে একা পড়ে আছি এই সুখস্বপ্ন তিমেরা নীড়ে
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলন মধুর ভিড়ে।
বেলা প'ড়ে আসে বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া অঞ্চল।
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘ-নিশীথ ঘোর
ওরে মন, আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয়, সকল কর্ম্ম-ডোর।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

বস্ত্র শিল্প

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(ঢাকার ইতিহাসের জন্য লিখিত)

বয়ন—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসেই মসলীন প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। একখানা ডুরিয়া বা চার খানা মসলীন প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মলমল খাস অথবা সরকার আলী অর্দ্ধ থান বয়ন করিতে ৫।৬ মাস কাল লাগিত। উহার মূল্য ৭০৲ ৮০৲ টাকা অবধারিত ছিল।

বিভিন্ন প্রকারের মলমল এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ঝুনা—হিন্দি ঝিনা (সূক্ষ্ম) হইতে ঝুনা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক মাকড়সার জালের ন্যায়। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থে ১ গজ, ওজন ৮।৹ আউন্স।

বিলাসী ধনীবর্গের পুরাঙ্গনাগণ এবং নর্ত্তকী ও গায়িকাবর্গই সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিত। "কুলতা" নামক একখানি প্রাচীন তির্ব্বতীয় গ্রন্থে ঝুনা মসলীনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ নাকি এই বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। কলিঙ্গরাজ একদা এক খানি ঝুনা মসলীন কোশলরাজকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। "Gt sing Dgha mo" নাম্নী স্খলিত-চরিত্রা জনৈক ধর্ম্মযাজিকা কোন প্রকারে উহা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। তিনি একদা এই বস্ত্রখানা পরিধান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত হইলে, "নগ্ন দেহে" লোক-লোচনের গোচরীভূত হইবার জন্য তাহাকে অবমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইতে হইয়াছিল। অতঃপর ধর্ম্মযাজিকা-গণকে কেহই এবম্বিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র উপহার প্রদান করিতে পারিবেন না এবং তাহারাও উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল (১)।

ঝুনা—ইহা প্রায় ঝুনা মসলীনের ন্যায়ই সূক্ষ্ম। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন প্রায় ৮ আউন্স ৪ ড্রাম।

সরকার আলি—ইহার সূত্রগুলি নিবিড় সন্নিবিষ্ট হইলেও ইহা অত্যন্ত কোমল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়। বঙ্গের নবাবগণের জন্যই ইহা প্রস্তুত হইত। সরকার আলি নামে এক প্রকার বাদসাহী জায়গীরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দিল্লীশ্বরের জন্য যে সকল মলমল ঢাকাতে প্রস্তুত হইত তাহার ব্যয় সঙ্কুলন জন্যই এই জায়গীরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

নবাব ও সুবাদারগণ প্রতিবৎসর দিল্লীশ্বর সন্নি-ধানে যে সকল দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন তন্মধ্যে সরকার আলি অন্যতম। জায়গীর লব্ধ রাজস্ব ইহার প্রস্তুত জন্য ব্যয়িত হইত বলিয়া ইহা সরকার আলি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্যে ১০ গজ, প্রস্থে ১ গজ, ওজন ৪ আউন্স কিংবা ৪॥ আউন্স।

খাসা—পারসী "খাসা" (উৎকৃষ্ট, সুবৃত্ত) শব্দ হইতে খাসা মলমলের নামকরণ হইয়াছে। ইহার সূত্রগুলিও ঘন সন্নিবিষ্ট। আবুল ফজল তদীয় আইন-ই-আকবরি নামক গ্রন্থে এই মলমলকে কসাক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সোনারগাঁও অঞ্চল উৎকৃষ্ট খাসা মলমল প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (১)। সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাসা মলমল "জঙ্গল খাসা" নামে অভিহিত ছিল। দৈর্ঘ্যে ২০গজ, প্রস্থ ১গজহইতে ১॥ গজ,ওজনে ২১আউন্স।

সবনম্—এই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রূপকচ্ছলে পারসী ভাষায় সান্ধ্য শিশির (Evening dew) বলিয়া অভিহিত হইত। শ্যামল তৃণ শষ্পোপরি ইহা আস্তীর্ণ করা গেলে শিশির নিষিক্ত দুর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম জন্মিত। একদা পরীক্ষাচ্ছলে আলিবর্দ্দি খাঁ একখানা সবনম্ মলমল ঘাসের উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, একটি গরু ঘাস খাইতে খাইতে বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল (২)। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ১০ হইতে ১৩ আউন্স।

আবরোয়ান—আব=জল, রোয়ান=প্রবাহিত হওয়া। নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় ইহা অতিশয় স্বচ্ছ; এজন্যই ইহার নাম আবরোয়ান। জলের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া থাকে যে, জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া অনুমান হয় না (৩)। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ৯ হইতে ১১½ আউন্স।

(১) Analysis of the Dulva by A Csomekorosi in Res. Asiatic Society of Calcutta, vol. xx pt 1 page 5.

(1) Sarcar Sunargaon. In this Sarcar is fabricated cloth called 'Cosoch"-Gladwin's translation of Ain-i-Akbari-Page 305.

(2) History of the cotton manufacture of Dacca District.

(3) See Bolt's Consideration on the affairs of India. Page 206

আলাবাল্লা—তন্তুবায়কুল আলাবাল্লা শব্দের অর্থ করেন "অতি উৎকৃষ্ট"। ইহার সূত্রগুলি নিবিড় সমাচ্ছন্ন। "Sequel to the periplus of the Erythrean sea" নামক পুস্তিকার ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট এই বস্ত্রকে "abollai" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন এই গ্রীক শব্দটি লাটিন abolla শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। লাটিন abolla শব্দে সৈনিকের কুর্ত্তা বুঝায়।

এরিয়েন ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কেই সম্ভবতঃ এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় আলাবাল্লাসংজ্ঞক মলমলকেই তিনি "abollai" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তঞ্জেব—পারসী "তন" = শরীর এবং জেব = অলঙ্কার। ইংলণ্ডে ইহা তাঞ্জেব নামে সুপরিচিত। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ১০ হইতে ১৮ আউন্স।

তরন্দাম—তন্তুবায়গণ এই শব্দের অর্থ আঙ্গারাখা বলিয়া থাকেন। আরবী তুরা = রকম, এবং পারসী উদাম = শরীর, এই উভয় শব্দের একত্র সংযোগে তরান্দাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে তেরেন্দাম নামে ইহা ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ১৫ হইতে ২৭ আউন্স।

নয়নসুক—ইহা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ইহা "তুনসুক" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজল ইহার মূল্য ৪৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থে ১॥ গজ।

বদন্‌খাস—নয়নসুকের ন্যায় ইহার সূত্রগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। দৈর্ঘ্যে ১০ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১॥ গজ ওজন ১২ আউন্স।

সুরবন্দী।—সুর = মস্তক, ও বন্দন = বন্ধ করা, এই শব্দ দুইটির সমবায়ে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা শিরস্ত্রাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্দ্ধ গজ হইতে ১ গজ, ওজন ১২ আউন্স।

সরবতি—সরবতি শব্দের অর্থ মোচড়ান অথবা কুণ্ডলীকৃত ভাবে জড়াইয়া রাখা। ইহাও শিরস্ত্রাণ রূপে ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সরবতির অনুরূপ।

কুমীস—আরবী কুমীস্ (সার্ট) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বস্ত্র দ্বারা মোসলমানগণ কুর্ত্তা প্রস্তুত করিতেন। দৈর্ঘ্যে ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ১০ আউন্স।

ডুরিয়া—ডুরিয়া প্রস্তুত প্রণালী একটু স্বতন্ত্র রকমের। দুইটি সূত্র একত্র পাকাইয়া ইহার তানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং বয়ন করিলে উহা ডুরিয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বেঙ্গা ও সোরাজ জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের তুলা হইতে সূতা কাটিয়া ইহার বয়ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ১০ হইতে ২০ গজ, প্রস্থ ১ হইতে ১॥ গজ পর্য্যন্ত।

চারখানা—এই মলমল বিভিন্ন বর্ণের সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ডুরিয়ারই অনুরূপ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ডুরিয়ার ন্যায়। ডুরিয়া ও চারখানার "ডোরা" গুলির আয়তন সমান নহে। "Periplus of the Erythrean sea" গ্রন্থে ইহা Dia Krossia নামে ভারতীয় বস্ত্র সমূহ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। Apllonius, Dia Krossia শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ডুরিদার।"

জামদানি—যে সমুদয় বস্ত্রের কারুকার্য্য তাঁত হইতেই কলে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে পারসী ভাষায় তাহাকে জামদানী বলে। পূর্ব্বে ইহার বয়ন কার্য্যে ২০০ শত হইতে ২৫০ নম্বরের সূত্র ব্যবহৃত হইত। জামদানী বস্ত্র প্রস্তুতের খরচ অত্যন্ত বেশী। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তিনি ইহার এক একখানা ২৫০৲ টাকা দিয়া গ্রহণ করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ইহার এক এক খানা বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ৪৫০৲ টাকা প্রদান করিতেন। "Periplus of the Erythrean sea" গ্রন্থে ইহা Skotulats বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

জামদানী বস্ত্র নানাবিধ,যথা :– তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলিজাল, ছাওয়ান প্রভৃতি।

জামদানী বস্ত্রের নির্ম্মাণ কার্য্য মোগল গবর্ণমেণ্টের হস্তে একচেটিয়া ছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামদানী বস্ত্র মুরশিদাবাদের নবাবগণের জন্যই প্রস্তুত হইত। ঢাকা আড়ংএর তন্তুবায়গণই সাধারণতঃ ইহা প্রস্তুত করিত। এজন্য ঢাকার সদর মলমল খাস কুঠীর দারোগা তন্তুবায় দিগকে দাদন দিয়া রাখিতেন। কিন্তু সদর মলমল খাস কুঠীতে দারোগার কর্ত্তৃত্বাধীনে অতি অল্প পরিমাণ জামদানী বস্ত্রই প্রস্তুত হইত। অধিকাংশ বস্ত্রই তন্তুবায়গণ স্বীয় গৃহে নির্ম্মাণ করিতেন। কিন্তু তাহারাও গিনির অধিক মূল্যের বস্ত্র অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে পারিত না। এজন্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় বণিকগণ বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য দালালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন (১)।

তন্তুবায়িগণকে "ছাপা জামদানী" নামে এক প্রকার কর প্রদান করিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে জামদানী বস্ত্র বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্তির জন্যই তন্তুবায় কুল এই প্রকার কর প্রদান করিতেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই কর রহিত হয় (২)।

এখনও ২০০৲ টাকা মূল্যের অত্যল্প সংখ্যক কয়েকখানা জামদানী মসলীন ত্রিপুরার মহারাজ এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪০০৲ টাকা মূল্যের জামদানী মসলীনও মধ্যে মধ্যে প্রস্তুত করিতে দেখা যায় (৩)

ঢাকা সহর ব্যতীত, নাপ্তি, ডেমড়া, ধামরাই,কাচাপুর, সিদ্ধিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও জামদানী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

(১) History of the Cotton manufacture of Dacca District

(২) Ibid.

(৩) A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908 by Mr. G. N. Gupta, M. A. I. C. S.

মলমল খাস—দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহারার্থে ইহা প্রস্তুত হইত। এই মসলীন এরূপ সূক্ষ্ম যে, একটি অঙ্গুরীয়কের মধ্য দিয়া সমুদয় বস্ত্রখানা এক দিক হইতে অপরদিকে টানিয়া নেওয়া যায়। দৈর্ঘ্যে ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজনে ৮।৵০ আট তোলা, ছয় আনা ; মূল্য সাধারণতঃ ১০০৲।

মলমল খাস প্রস্তুত করিবার জন্য সুবাদারগণের নিয়োজিত স্বতন্ত্র লোক ঢাকা ও সোণারগাঁয়ে অবস্থান করিত। উহা "মলমল খাস কুঠী" নামে অভিহিত হইত। তন্তুবায়গণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য এক জন দারোগা মলমলখাস কুঠীতে অধ্যক্ষ স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিত। তাঁতের কার্য্যে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাদিগকেই মলমলখাস কুঠীর কার্য্যে নিয়োজিত করা হইত। এই সমস্ত তন্তুবায়গণের নামের একখানা রেজেষ্টরী বহি কুঠীতে রাখা হইত। প্রত্যেক কার্য্যকারক প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছে কি না তদ্‌বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দারোগার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল (১)।

প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন হইল কি না তাহার পরীক্ষা দারোগা স্বয়ং করিতেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে দারোগার কর্ম্মচারী সূতাগুলি ভালরূপ পরীক্ষা করিত। আদর্শ মলমল খাসের সূতার সহিত তুলনায় উহা সমশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইলে কার্য্যারম্ভ করিতে দেওয়া হইত। এরূপ কঠিন বিধি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল বলিয়াই মলমলখাস প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিত (২)।

কর্ম্মচারীগণের উৎপীড়নঃ—এই সুযোগে নবাবী কর্ম্মচারীগণ তন্তুবায়দিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে মলমলখাস কুঠীর কর্ম্মচারীগণ তন্তুবায়দিগের প্রাপ্য টাকার অংশ হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা হারে কর্ত্তন করিয়া রাখিত বলিয়া ঢাকার রেসিডেণ্ট লিখিয়াছেন।

---

(১) History of the cotton manufacture of Dacca District.

(২) Ibid.

Abbe Raynel ঢাকার তন্তুবায়দিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন "ইহারা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অল্প সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পরিসমাপ্ত করিলে নবাবের কর্ম্মচারীগণ উহাদের দ্বারা বেশী কাজ করাইয়া লইয়া তদ্বাবদে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে সর্ব্বদাই কার্পণ্য করিতেন ; এবং কার্য্য করিবার সময় উহারা এক প্রকার বন্দী অবস্থায়ই কাল যাপন করিত।" (৩)

বঙ্গের সুবাদারগণ মলমলখাস প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতিবৎসর যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা দিল্লীশ্বরের প্রাপ্য বার্ষিক নজরানা স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বাঙ্গালার রাজস্ব হইতেই ব্যয়িত হইত এবং সরকার আলী জায়গীরের হিসাবে খরচ লেখা হইত।

বিভিন্ন সময়ে মলমল খাস বস্ত্রের মূল্য যত ছিল নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে।

প্রস্তুতের সময়	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,	তানার সূতার পরিমাণ	ওজন	মূল্য
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসন সময়ে	১০ গজ ৩৫″ × ১ গজ ৩½।	১৮০০।	১০ তোলা	১০০ আর্কট মুদ্রা
১৭৯০।১৮০০	,, ,,	,,	১২॥ ,,	৮০ ,,
১৮৫০	১০ গজ × ১ গজ	,,	৪॥ ,,	১০০ ,,

নবাব জাফর আলি খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সন্নিধানে প্রতি বৎসর ৫০০ খানা মলমল খাস বস্ত্র নজরানা স্বরূপ প্রেরণ করিতেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকার নায়েব নাজিম নসরৎ জঙ্গ বাহাদুর প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে নবাব জাফর আলীর প্রদত্ত উপঢৌকনাদির যে একটি তালিকা কমার্সিয়েল রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। মলমলখাস ব্যতীত সুবর্ণ ও রৌপ্যের বাদলা, পাখা, শ্রীহট্টের ঢাল, নাগকেশর আতর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ঢাকা হইতে প্রেরিত হইত বলিয়া জানা যায়। সমুদয়ে মোটে ১২৭৮৭১১৮০ ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়া তালিকাতে লিখিত আছে।

ঢাকা আড়ং।

১০০ খানা জামদানী ধুতী ২৫০৲ হিসাবে	২৫০০০৲
৫০ ,, ,, ,, রেশমী বুটাদার ২০০ হিসাবে	১০০০০৲
৬০ খানা রেজ অর্থাৎ রৌপ্য সূত্রের কারুকার্য্য খচিত মসলীন ১০০৲ হিসাবে	৬০০০৲
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ	১৪৮০৲
	৪২৪৮০৲

সোনার গাঁও আড়ং

১০০ খানা সাদা মসলীন ২০০৲ হিসাবে	২০০০০৲
২০ ,, সাদা সরবন্দ ৮০৲ ,,	১৬০০৲
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ	২৯৫০।০
	২৪৫৫০।০

(৩) Reynel's History of the Settlement and Trade of the Europeans in the East and West India vol. II Page 157.

নাগ কেশরের আতর	২৬০৲
৫০ খানা শ্রীহট্টের ঢাল ১৬৲ হিসাবে	৮০০৲
ঢালের কারুকার্য্য বাবদ	২৬৮০৲
	৩৪৮০৲
১০০ খানা সুবর্ণ সূত্রের জড়াও করা লাঠি এবং ২০০ খানা তালপত্রের পাখা	২০০৲
উহার কারুকার্য্য খরচ	৪০০০৲
	৪২০০৲
সোনার বাদলা	৫০০০৲
রৌপ্য বাদলা	১১০০০৲
	১৬০০০৲

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

সাধ

(Rogersএর wish কবিতার মর্ম্মানুবাদ)

১

সাধ হয় রবে মোর একটি কুটীর,
বহিবে তটিনী যার চুমিয়া চরণ,
হাসিবে মল্লিকা যেথা হইয়া অধীর ;
পরশি সাঁঝের বেলা ধীর সমীরণ।

২

উষা না ফুটিতে পিক গাবে তরু'পরে,
ভ্রমর গুঞ্জরি যাবে প্রভাতী রাগিণী,
নাচিবে শিখিনী আসি আমার দুয়ারে ;
দূরে ফেলি লাজ-বাস হাসিবে নলিনী।

৩

নিদাঘের দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত পান্থ আসি,
হবে গো অতিথি মোর দরিদ্র কুটীরে,
যতনে তুষিব তারে সাদরে সম্ভাষি ;
সুমধুর বন-ফলে সুশীতল নীরে।

৪

চাঁদিনী মাধবী রাতে বন ফুল-হার,
গাঁথিয়া প্রিয়ের গলে দিব পরাইয়া,
সোহাগে চুমিবে প্রিয় অধরে আমার ;
পুলকে এ ক্ষুদ্র হৃদি উঠিবে ভরিয়া।

৫

কৌমুদী প্লাবিত স্নিগ্ধ তটিনী-পুলিনে,
সে ধীরে বাজাবে বীণা, আমি গাব গান,
পাপিয়ার মধুগীতি মিশিবে সে তানে ;
বন-নদী বহে যাবে তুলি কল তান।

৬

আধভাষী এতটুকু সোনার পুতলী,
'চুমা দে' বলিয়া কোলে পড়িবে ঝাঁপিয়া,
আদরে চুমিয়া তারে বুকে লব তুলি,
জননী-হৃদয় স্নেহে যাবে গো গলিয়া।

৭

চাহিব না স্বর্গ-সুধা—নন্দনের মধু,
হেরিব কুটীরে নিত্য স্বরগের ছবি,
শুধু প্রীতি, শুধু স্নেহ, ভালবাসা শুধু
তার মাঝে নিশি দিন রহিব গো ডুবি।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ঘন ঘোর বরিষায়"

সে দিনো এমনি বুঝি নিবিড় বরষা
সুদীর্ঘ বিরহ-ম্লান রামগিরি-শিরে
জাগায়ে তুলিয়াছিল আকুল পিয়াসা
অলকার মোহমুগ্ধ যক্ষের অন্তরে!
আজো তাই গুরু গুরু মেঘ গরজনে
বিশ্বের বিরহ-ব্যথা উঠিছে জাগিয়া;
শ্রাবণ-গগন-পথে নিষিক্ত পবনে
অতৃপ্ত আকাঙ্খা যেন দেছে কে ঢালিয়া!
কূলে কূলে ভরা গাঙ্, অধীর আকুল,
ছুটিয়াছে লুটাইতে অকূলের বুকে;
বরষা-আসার-স্নাত তরু, লতা, ফুল
ঈপ্সিতেরে প্রতীক্ষিছে প্রীতি-ফুল্ল মুখে!
ঝুপ্ ঝাপ্ বরিষণ, শূন্য বাতায়নে
প্রবাসীর ক্ষুণ্ণ দৃষ্টি আকাশের পানে!

শ্রী যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী।

পহেলা আষাঢ়

বিরহের জন্ম তিথি

সখে!
আজ্‌কে মাসের পহেলা!
বেহাগের সুরে, আজি সুরপুরে
বিরহে বাজিছে বেহেলা!
ছাপিয়া গিয়াছে পাপিয়া-"পিউ"
কুঞ্জে না রোয়ে কোয়েলা!
পিউ,
"আর্দ্র-বিরহে" রহে-বা-না-রহে
কাঁদে "পোড়াদহে" দোয়েলা!
সখে!
আজ্‌কে মাসের পহেলা!
ডাহুক্-ডাহুকী চক্র-চাতকী
শালিখী-শীখি-চন্দনা
আকুলি-ব্যাকুলি কাকলী করিয়া
গাহিছে বিরহ বন্দনা!
রুদ্দুর-বাদলে বাদল পাইয়া
দর্দ্দুর ডাকে ভৈরবে!
কলাপী একা আলাপে কেকা;
বাপী-জলে খেলে কৈরবে!
ঈপ্সিত লাগি নিশীথ জাগি
দীপ জ্বালিছে জোনাকী,
ভ্রমর-ভরে নীপ শিহরে!
কম্প্রবক্ষ কেতকী!
প্রেমবিকারে ঝিল্লী ফুকারে
আম্র কুঞ্জে পশিয়া
পূবের বাতাস করে হা-হুতাশ
সর্জ্জ-কাননে শ্বসিয়া!
আজ
কাঁদিছে কান্তাকাতর যক্ষ
প্রিয়া পরশ লাগিয়া
"মন্দাক্রান্তা" ছন্দঃ গাহিছে
বর্ষা যামিনী জাগিয়া!
আষাঢ় আকাশে নীরদ ভাসে,
স্নিগ্ধ সুনীল কায়
জীমূতে কত সে কাকুতি করিয়া
প্রেরিলা অলকায়!
"কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনী" বিনা
মনটা কেমন করে!
"তন্বী শ্যামা শিখর দশনা"—
আশায় বছর ধরে'!
বিনে সে "অর্দ্ধ" বাঁচে কি মর্দ্দ?
তোয়াজে কে রাখে তাজা?
কেঁদে কবি কয় "খাও এ সময়
রোজ রোজ চানা ভাজা"

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

যমুনা

প্রেমের প্রবাহে বহে যমুনার ধারা,
কোন্ উচ্চ তুঙ্গ হতে হ'য়ে নিজ হারা
পাগলিনী এসেছিল সন্ধানে কাহার
পীঠ স্থান বৃন্দাবন বেলাভূমে তার।
মিলিয়াছে হারানিধি তাই সে গৌরবে
পুণ্যময় করিয়াছে প্রেমের সৌরভে।
অঙ্কিত আজিও সেই অক্ষয় কাহিনী
উঠেছিল এক দিন প্রেমের রাগিণী
যে মহাপ্রাণের মাঝে। এই যমুনার
তীরে, নীরে লীলা খেলা, যে সুখ সম্ভার
রেখে গেছে রাধা শ্যাম, কালের স্মরণে
অনন্ত রয়েছে তাহা প্রেম তীর্থ স্থানে।
যমুনা প্রবাহে হেরি প্রেমের বারতা
ভক্তির উচ্ছ্বাসে আজো নুয়ে পড়ে মাথা।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

নামি-কো

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বগৃহে জেনারেল্

একদা শনিবার অপরাহ্ণ সময়ে ভাইকাউণ্ট্ লেফ্-টেন্যাণ্ট্-জেনারল্ কাতাওকা পাঠাগারের চেয়ারে আরামে বসিয়াছিলেন। তখন জুন মাসের মধ্য ভাগ; তাঁর বাটীর নিকটস্থ চেস্‌নট্ গাছগুলি পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর বয়স পঞ্চাশের অধিক উর্দ্ধে না উঠিলেও কপালের উপরিভাগে কতকটা টাক পরিয়াছে ও চুলগুলি শাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁর বিশাল বপুখানির ওজন প্রায় সার্দ্ধ দুই মণ হইবে; তাঁর ভারে আরব ঘোড়ারও গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়া বিচিত্র নয়। স্থূল গ্রীবা প্রশস্ত স্কন্ধের মধ্যে লুপ্তপ্রায়, ও 'দোতালা' থুতনী যেন বক্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। তাঁর ভুঁড়িটি বৃহৎ ও উরুদেশ ষণ্ডের উরুর মত স্থূল। বাদামি মুখ, বড় নাক, পুরু ঠোঁট, দাড়ী যৎ-সামান্য ও চোখের ভ্রূ পাতলা। তাঁর চক্ষুদ্বয়ও দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত যেন মিল রাখিবার জন্য, হাতীর চোখের মত সরু ও দেখিতে শান্ত। মুখের উপর সদাই একটু মৃদু হাস্য লাগিয়া থাকাতে তাঁহাকে বেশ একটু রসিক গোছ দেখাইত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, শরৎ কালে, জেনারল্ এক পাহাড়ে জায়গায় শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁর সাধারণ পোশাকেই সজ্জিত ছিলেন; এক ক্ষুদ্র কুটীরে একাকিনী এক বৃদ্ধা বাস করিত; তার নিকট তিনি চা প্রার্থনা করাতে বৃদ্ধা খুব মনোযোগের সহিত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, ও তারিফ্ করিয়া বলিল—"তুমি ত খুব জোয়ান্! কিছু শীকার করেছ বোধ হয়?"

জেনারল্ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"না কিছু না।"

"শীকার করে কি কখন পেট চালান যায়। তোমার মস্ত শরীর নিয়ে দিন-মজুরের কাজ কর, নিশ্চয় তুমি পঞ্চাশ 'ইয়েন্' উপায় কর্‌বে।"

"মাসে?"

"না, না। এক বছরে অবিশ্যি। কাজ আরম্ভ কর, তখন বল্‌বে আমি তোমাকে একটা কাজ দেব।"

"ধন্যবাদ। আর এক দিন এসে তোমার পরামর্শ নেব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই করবে। এমন প্রকাণ্ড শরীরটা শীকার করে বেড়িয়ে নষ্ট কোরো না।"

এই হাস্যকর ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি বন্ধুবান্ধব-দের চিত্তবিনোদন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁর সহিত যার পরিচয় নাই সে হয়ত তাঁর সম্বন্ধে এই বৃদ্ধারই মত মত প্রকাশ করিত। কিন্তু তাঁহাকে যে ভালো রকম জানিত, সে বুঝিত, বিপদের সময় এই আত্ম-নির্ভর যোদ্ধা একটি সজীব লৌহ-প্রাচীরের মত। তাঁর ক্ষুদ্র পাহাড়ের

মত প্রকাণ্ড শরীর ও দেবতাদের মত অবিক্ষুব্ধ চিত্ত আসন্ন বিপদের সম্মুখে কম্পমান সৈন্যদলের মন নির্ভয় করিতে সমর্থ ছিল।

নিকটস্থ টেবিলে একটি নীল বর্ণ আধারে এক ঝাড় সরল "বামন" বংশ। দেয়ালের উপর দিকে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর ছবি টাঙানো; তন্নিম্নে অপর দিকে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ পীঠিকা; উহার উপর নানৃয়্-লিখিত দুইটি অক্ষর; উহাদের অর্থ—"দয়ালু হও।" বইয়ের সেল্‌ফে কয়েক থাক পুস্তক; আগুনের চুল্লির উপরকার তাকে ও ঘরের কোণে স্থিত তেপায়ার উপর জাপানী ও বিদেশী প্রায় অর্দ্ধ ডজন ছবি; তাদের মধ্যে কেহ কেহ সৈনিকের সাজে সজ্জিত।

সবুজ পরদাগুলি একধারে সরাইয়া দিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ছয়টি জানালাই সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। পূর্ব্বদিকে তানিমাচির জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া পত্রাচ্ছাদিত রৈইনাল্ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়; উহার উপরে আতাঙো বুরুজের চূড়া ঈষৎ মাথা তুলিয়াছে। একটা চীল ইহার উপরে ঘুর পাক্ খাইতেছিল। দক্ষিণে পুষ্পিত চেস্‌নট-বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন একটি উদ্যান; গাছগুলির মধ্যেকার ফাঁক দিয়া হিকাওয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সবুজ বর্ষার মত একটি ঝাউ গাছ দেখা যাইতেছিল।

জানালার মধ্য দিয়া নবীন গ্রীষ্মের আকাশ নীলবর্ণ সাটিনের মত দেখাইতেছিল। তরুণ পত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে স্তবকে স্তবকে ফিকা জর্দা রঙের প্রচুর চেস্‌নট্ ফুল ফুটিয়া আকাশের নীলিমার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে। একটি শাখা জানালার নিকট উদ্গত হইয়া রহিয়াছে। দেখিতে অশোভন হইলেও ইহার উপর সৈনিকের পোষাকের থোবার মত ফুলের বোঝা; এবং সংহত সূর্য্যালোক ইহার পত্রাবলির মধ্য দিয়া মরকত, নীলোৎপল ও তৃণমণির দীপ্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল। বাতাসের ঈষৎ স্পন্দন অজ্ঞাতসারে কক্ষ মধ্যে সৌরভ বহন করিয়া আনিতেছিল, ও জানালা হইতে নীলাভ পাণ্ডুর বর্ণ ছায়াগুলো জেনারল্‌এর বাম হস্ত ধৃত "সাইবিরীয় রেল পথের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক পুস্তিকার পাতার উপর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অপ্রশস্ত চক্ষুদুটি মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ করিয়া তিনি নিশ্বাস টানিলেন; তার পর ধীরে ধীরে চাহিয়া পুস্তিকার উপর দৃষ্টি ফিরাইলেন।

বাহিরে কোথায় বল গড়ানোর মত কূপের কপি কলের শব্দ হইল। শীঘ্রই সে শব্দ থামিয়া গেল। অপরাহ্নের নিস্তব্ধতা এক্ষণে বাটীতে বিরাজ করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল দুইটি শিশু গোপনে বাটী প্রবেশের সুবিধা খুঁজিতেছে।

ঈষদুন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া তারা গোপনে মস্তক প্রবিষ্ট করাইয়া আবার বাহির করিয়া লইল। তারপর বাহিরে চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল। তাদের মধ্যে একটি অষ্টমবর্ষীয় বালক, নাবিকের পোশাকে সজ্জিত; অপরটি বালিকা, তার চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট হইবে; মস্তকের কেশ ভ্রূর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে; তার পরিধানে বেগুনে রঙের আঁজিকাটা পোষাক ও লাল কোমরবন্ধ।

দুই জনে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তার পর যেন আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া কক্ষ মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; রাশীকৃত কাগজের দুর্গ সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া তারা একেবারে জেনারল্‌এর চেয়ার আক্রমণ করিল, ও দক্ষিণ দিক হইতে 'নাবিক' ও বাম দিক হইতে বালিকা বিপুলকায় যোদ্ধার হাঁটু দুটি দখল করিয়া বসিল।

"বাবা!"

"ইস্কুলের ছুটি?" জেনারল্ সহাস্যে বলিলেন; সে স্বর বুকের গভীরতম প্রদেশ হইতে নির্গত হইল। ভারী হস্ত দিয়া তিনি 'নাবিকের' পিঠ ও কন্যার চূর্ণ কুন্তল থাবাড়াইতে লাগিলেন।

"পরীক্ষা কেমন হল? ভাল?"

"বাবা, আমি অঙ্কে A পেয়েছি।"

"বাবা, মাষ্টার মশায় বলুলেন আমার সেলাই ভালো হয়েছে।"

"চূর্ণ কুন্তল" কিণ্ডার গার্টেনের কাজ বাহির করিয়া পিতার হাটুর উপর রাখিল।

"বাঃ, বেশ হয়েছে!"

"আর পড়াতে আর লেখাতে B পেয়েছি, বাদ বাকী সব C। শেষে আমি মিনাকামির কাছে হেরে গেলুম। ভারী কষ্ট হচ্ছে।"

"আচ্ছা, লেগে থাক। আজ কি গল্প পড়া হল?"

'নাবিক' হৃষ্টচিত্তে বলিল, "মাসাৎসুরার গল্প, বাবা! আমার মাসাৎসুরাকে খুব ভাল লাগে। আচ্ছা বাবা মাসাৎসুরা বড়, না নেপোলিয়ন বড়।"

"দুজনেই বড়।"

"বাবা আমি মাসাৎসুরাকে ভালবাসি, কিন্তু নৌবিভাগ আরো ভালবাসি। বাবা তুমি হলে স্থল সৈন্যের মধ্যে, আর আমি হব নৌ-সেনা।"

জেনারল্ হাস্য করিলেন। "তাকেও-সানের অধীনস্থ নাবিক হবে?"

"সে, সে ত 'এন্‌সাইন্'। আমি চাই 'লেফ্‌টেন্যান্ট্ জেনারল্' হতে।"

"নৌ-বিভাগে তা বলে না; 'রীর আড্‌মিরাল্' বলে। তুমি আড্‌মিরাল্ হতে চাও না?"

"কিন্তু তুমি বাবা 'লেফ্‌টেন্যান্ট্ জেনারল্'। আচ্ছা বাবা 'লেফ্‌টেন্যান্ট্ জেনারল্' 'এন্‌সাইনের' চেয়ে বড়, কেমন?"

"এন্‌সাইন্' ই হোক্ আর 'জেনারল্' ই হোক্, যে বেশী লেখাপড়া করে সে-ই সব চেয়ে বড়।"

"বাবা, বাবা ও বাবা," 'চূর্ণ-কুন্তল' পিতার হাঁটুর উপর লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "মাষ্টার মশায় আমাদের এমন সুন্দর গল্প বলেছেন—খরগোস আর কচ্ছপের গল্প। গল্পটা তোমায় বলব? এক সময়ে একটা খরগোস ও একটা কচ্ছপ ছেলো—এই যে মা আসচে।"

ঘড়িতে যেই দুইটা বাজিল, অমনি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক ঢেঙ্গা স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল। তার বিদেশী ধরণে চুল বাঁধা; সামনের চুল কুঞ্চিত এবং উঁচু কপালের উপর সিঁথি কাটা। ট্যারা বৃহৎ চক্ষু দুটি তার রুক্ষ মেজাজের পরিচয় দিতেছিল। তার ঈষৎ কৃষ্ণাভ মুখ সামান্য রঞ্জিত এবং দাঁতগুলি, (কখন কখন দেখা যাইতেছিল,) যতদূর সম্ভব মার্জ্জিত। তার জাঁকালো ক্রেপের পোষাক, কালো সাটিনের কোমরবন্ধ ও হস্তে মূল্যবান অঙ্গুরীয়।

"তোমরা আবার তোমাদের বাবাকে বিরক্ত করচ।"

"তা কেন হবে, আমি ওদের ইস্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। আচ্ছা, এইবার বাবা পড়বে। তোমরা খেলা কর গে। এর পরে আমরা সকলে মিলে বেড়াতে যাব।"

"কি মজা!" 'চূর্ণ-কুন্তল' বলিল।

'নাবিক' চীৎকার করিল—"বান্‌জাই!"

বালকবালিকা হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল; দূরে "বান্‌জাই," "কি চান্ আমায় দাও" প্রভৃতি চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

"তুমি যা-ই বল, তুমি তোমার ছেলেদের বড় আদর দাও।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া জেনারল্ বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়। কিন্তু ছেলেপুলেদের ভালবাসলে তাদের উন্নতি হয় ভালো।"

"কিন্তু তুমি ত জানই যে 'কঠোর পিতা' ও 'দয়াবতী মাতা'—সাধারণ লোকেও এই ধারণার বশবর্ত্তী। কিন্তু তুমি তাদের যে রকম আদর দাও, সেই জন্যে কথাটা উল্টে গেছে। আমাকেই সব সময়ে তাদের শাসন কর্ত্তে হয়। আমি-ই কেবল বদনামের ভাগী হয়েছি।"

"থাক্ আমাকে ভর্ৎসনা করবার দরকার নেই। আর তুমিও একটু ঠাণ্ডা হও। মাষ্টার মশায়, দয়া করে বসুন।" হাস্য করিতে করিতে টেবিল হইতে জেনারল্ একখানি পুরাণো 'রয়েল থার্ড্ রীডার' তুলিয়া লইলেন ও ধীরে ধীরে সাৎসুমার উচ্চারণে তাঁর কিম্ভূত ইংরাজি পাঠ করিতে লাগিলেম।

রমণী মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে ভুল সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল।

ইহাই জেনারলের প্রাত্যহিক পাঠ। ১৮৬৮ সালের 'রেষ্টোরেসনে' যোদ্ধারূপে উন্নীত হইয়া তিনি এমন গুরুতর কার্য্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন যে, বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার আর অবকাশ রহিল না। এই গত বৎসর কেবল তাঁহাকে রক্ষিত সৈন্যদলভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে যে কয়েক ঘণ্টা অবকাশ পাইলেন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজি পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। শিক্ষকের জন্য ভাবিতে হয় নাই, যিওে ঠাকুরাণী হাতের কাছেই ছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত 'চোযু-সামুরাই'এর কন্যা: ও এত দিন লণ্ডনে বাস করিয়াছিলেন যে, তাঁর মত ইংরাজি ভাষায় পণ্ডিত জাপানে পাওয়া দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য ভাবে তিনি এত দূর অনুপ্রাণিত ছিলেন যে, সেই সুদূর দেশে যেমন দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি স্বীয় সংসার চালাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁর চেষ্টা সফল হয় নাই; ভৃত্যেরা তাঁর অনভিজ্ঞতা দর্শনে গোপনে হাসা হাসি করিত, এবং ছেলে মেয়েরা কেবল তাহাদের সদাশয় পিতার পাছে পাছেই ঘুরিত। এই সব ভুল, এবং তাঁর স্বামীর প্রাচ্য জনোচিত ঔদার্য্য —তিনি ছোট খাটো বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না—সদাই বেচারীর মেজাজ বিষম বিগড়াইয়া দিত।

অবশেষে জেনারল্ অনেক কষ্টে এক পাতা পড়া শেষ করিলেন, এবং উহা অনুবাদ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বার খুলিল ও একটি ফুট ফুটে পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা প্রবেশ করিল। তার চুলগুলি লাল ফিতা দিয়া বাঁধা। প্রকাণ্ড হাতে একখানি ছোট বই ধরিয়া পিতাকে ছাত্রের মত নিরীহ ভাবে পাঠ করিতে দেখিয়া সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিল ও কহিল, 'মা, কাতো মাসীমা বৈঠকখানায় বসে আছেন।"

"তাই নাকি?" প্রায় অপ্রত্যক্ষভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি জেনারলের কথার অপেক্ষায় রহিলেন।

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া জেনারল্ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পার্শ্বে একখানা চেয়ার টানিয়া লইলেন, ও বলিলেন, "তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বর্ষীয়া এক সুশ্রী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া "শুভ অপরাহ্ণ" জ্ঞাপন করিলেন। তাঁর চোখে নীল চশমা: কারণ বোধ হয় দৃষ্টি শক্তির অপ্রাচুর্য্য। তাঁহাকে দেখিতে কতকটা নামি-সানের মত। ইহার কারণও ছিল। তিনি জেনারল্ কাতাওকার প্রথমা স্ত্রীর ভগ্নী। লর্ডস মহাসভার সভ্য ভায়কাউণ্ট্ কাতোর সহিত তাঁর বিবাহ হইয়াছিল। এবং তিনিই স্বামীর সহিত তাকেও ও নামির বিবাহে ঘটকতা করিয়াছিলেন।

জেনারল্ সহাস্যে তাঁহাকে একখানি চেয়ার দিলেন ও সামনের জানালার ছোট পর্দাখানি টানিয়া দিয়া কহিলেন; "বসুন, বহু দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। আপনার স্বামী খুব ব্যস্ত বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি ঠিক মালির মত, সব সময়ে কাস্তে হাতে ঘুরচেন। 'আইরিস' যদিও এখনো ফোটে নি কিন্তু তাঁর আদরের ডালিম গাছে খুব ফুল ফুটেছে; আর গোলাপও ফুটছে। দেখ্‌তে আস্‌বেন।" (কাতাওকা গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া) "তিনি বিশেষ করে আপনাকে আস্‌তে বল্‌তে বলেছেন। কি-চান্ আর মি-চান্‌কেও সঙ্গে আনবেন।"

ঠিক কথা বলিতে কি ভায়কাউণ্টেস্ কাতো-গৃহিণীকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না। শিক্ষা ও প্রকৃতির পার্থক্য হেতু তাঁদের মধ্যে প্রীতি ত এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তদুপরি তিনি যে প্রথমা পত্নীর ভগ্নী এচিন্তা ভায়কাউণ্টেসের মনে উদিত হইয়া বিষম অস্বস্তি সৃজন করিত। তিনি জেনারলের হৃদয়ের উপর এক চেটিয়া অধিকার স্থাপনে ও সংসারে সম্রাজ্ঞীর মত শাসনদণ্ড পরিচালনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এই যে পূর্ব্বপত্নীর ভগ্নীটি,—ইনি কেবল যে জেনারলের সম্মুখে যে গিয়াছে তার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে প্রকাশিত হইতেন তা নয়: কিন্তু গোপনে নামি ও ধাত্রী ইকুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে

অতীত দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন, এবং নানা প্রকারে মৃতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া প্রাধান্যের জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইতেন। ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এক্ষণে নামি ও ইকু যাওয়াতে পূর্ব্বাধিকার স্বত্ব অপসারিত হইয়াছে, তিনি খুব তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন : কিন্তু যত বারই তিনি কাতো-গৃহিণীর মুখ সন্দর্শন করিতেন, তখনি মনে হইত যেন মৃত তার কবর ছাড়িয়া স্বামীর জন্য, গৃহিণীপনার জন্য, এবং তিনি বহু যত্নে সংসার পরিচালনের যে সব উপায় স্থির করিয়াছেন সে সবার জন্য, তাঁর সহিত বিবাদ করিতে আসিয়াছে।

কাতো-গৃহিণী রেসমের থলি হইতে কিছু মিষ্টান্ন বাহির করিলেন।

"কি-চান্ ও মি-চান্‌কে আমার ভালবাসা জানাবেন। এখনো ইস্কুলের ছুটি হয় নি না কি ? তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ও ভালো কথা মনে পড়েচে ;—(চা লইয়া আগত লাল-ফিতা-পরা মেয়েটিকে একটি কৃত্রিম খোঁপার ফুল দিয়া) "কোমা-সানকে ভালবাসার সহিত দিলুম।"

"ওদের সকলের জন্য ধন্যবাদ। ওরা ভারী খুসী হবে।" এই কথা বলিয়া কাতাওকা-গৃহিণী মিষ্টান্নগুলি টেবিলের উপর রাখিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "রেড ক্রশ্ সোসাইটী"র লোক আসিয়াছে, কর্ত্রীর সহিত দেখা করিতে চায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে গিয়া মেয়েটিকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া তার কানে কি বলিলেন। রমণী বারান্দা দিয়া বৈঠকখানা অভিমুখে চলিয়া গেল ; মেয়েটি চুপে চুপে আসিয়া যেখান হইতে শুনা যায় এমন স্থানে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইল।

লাল-ফিতা-বাঁধা কোমা প্রথমা পত্নীর কন্যা। নামিকে ভাল না বাসিলেও ভায়কাউণ্টেস্ ইহাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি শান্ত তুষ্ণীম্ভাবাপন্না নামিকে একগুঁয়ে বলিয়াই জানিতেন ; কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তার উদ্ধত স্বভাব তাঁর স্বভাবের সহিত বেশ মিল খাইত। নামির প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার জন্য, ও বিমাতা কি করিতে পারে তাহা জগৎ সমক্ষে প্রচারিত করিবার জন্য, স্বামী যেমন নামিকে আদর করিতেন তিনিও তেমনি কোমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। একগুঁয়ে লোকের স্বভাব কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করা ; কিন্তু তার ছিদ্রান্বেষী না হওয়া সম্ভব। পরে তাহাকে ভাল বলুক ইহা সে সর্ব্বদা ইচ্ছা করে এবং যাহাতে নিজের লাভ এমন কাজ করিতে তার বিরাম থাকে না। তার মত খোসামোদ-প্রিয় আর কেহ নয়। কাতাওকা-গৃহিণী মার্জ্জিতরুচি তেজস্বিনী রমণী ; যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ স্বামীর সহিত তর্কে সর্ব্বদা তাঁর জয় হইত ; কিন্তু স্বামী যেখানে যাইতেন সেখানেই বন্ধু লাভ করিতেন, আর তাঁহাকে সকলেই বর্জ্জন করিত। সেই হেতু যারা তাঁর পাশে পাশে ঘুরিত তাদের তিনি স্নেহ করিতেন। সরল সাধাসিধে প্রকৃতির ভৃত্যেরা একে একে বিতাড়িত হইল, তাদের স্থান অধিকার করিল সভ্য, মুখমিষ্ট লোকেরা। কোমাসানের ভগ্নীকে ভাল না বাসিবার কোনো কারণ ছিল না ; কিন্তু যখন সে বুঝিল বিমাতা তার মুখে নামির নিন্দা শুনিতে ভালবাসেন, তখন সে মিথ্যা অভিযোগ করা—এই মন্দ অভ্যাসটি অর্জ্জন করিল। এই হেতু কখনো কখনো সে ইকুর বিরক্তিভাজন হইত। কোমার এই স্বভাব ভায়কাউণ্টেসের কাজে আসিয়াছিল ; নামির বিবাহের পরও তিনি বর্ত্তমান ঘটনার মত ছোট ছোট কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিতেন।

পূর্ব্বদিককার বারান্দার দ্বিতীয় জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া কোমা এক বার পিতার ভাঙ্গা গলায় হাসি ও এক বার মাসীমার মধুর হাসি শুনিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিল, কথাগুলো অস্পষ্ট হইয়া গেল। যতই 'খাশুড়ী', 'নামি-সান্' প্রভৃতি কথাগুলো জানালা দিয়া অস্পষ্টভাবে শ্রুত হইতে লাগিল, লাল-ফিতা-পরা মেয়েটি ততই মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল।

"মহাদেশ হ'তে আসে ঐ আসে
লক্ষ অরাতি সৈন্য,
নির্ভয় তবু কামাকুরাবাসী
বীরের অগ্রগণ্য।"

এই গানটি গাহিতে গাহিতে আগত ক্ষুদ্র 'নাবিকের' দৃষ্টি বারান্দায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা 'লাল-ফিতা'র প্রতি আকৃষ্ট হইল। মুখ ঢাকিয়া মাথা নাড়িয়া তার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, তাহাকে বুঝাইবার নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সে 'কোমা-চান' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া অগ্রসর হইল, এবং সে কি করিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সে তখনো তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বহু সংখ্যক 'কি ?' দ্বারা বিরক্ত হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ উচ্চকণ্ঠে 'দূর' বলিয়া ফেলিল; পরক্ষণে এই অকাল দুর্ঘটনায় ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে সে স্থান হইতে দ্রুতপদে চম্পট দিল।

'আ, কাপুরুষ কোথাকার!'

এই কথা বলিয়া 'নাবিক' পিতার পাঠাগারে গমন করিল। মাসীমাকে দেখিয়া সহাস্যে অভিবাদন করিয়া একেবারে পিতার হাঁটুর কাছে গিয়া হাজির হইল।

'বাবা কি-চান্ যে। তুমি গত বারে যা দেখেছিলুম তার চেয়ে ঢেঙা হয়েছ দেখ্‌চি। রোজ স্কুলে যাচ্ছ? ইস্কুলে গেস্‌লে? অঙ্কে A পেয়েছ? বেশ। বাবা আর মার সঙ্গে মাসী মার বাড়ী এসো।

'মিচি কোথায়? এই দেখ মাসীমার উপহার। এ তুমি ভালবাস, কেমন?'

কেকখানি তাহাকে দিয়া জেনারল্ বলিলেন, 'তোমার মা কোথায় জান? এখনো বৈঠকখানায়? তাঁকে বল মাসীমা যাচ্ছেন।'

শিশুটি যাইতেছে দেখিয়া আগন্তুকের প্রতি চিন্তান্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া জেনারল্ কহিলেন, 'তা হলে ইকুর বিয়টা নিশ্চয় স্থির করবেন। এই রকমই যে ঘটবে এ আমি প্রথমেই ভেবেছিলুম। আমি তাকে পাঠাতুম না, কিন্তু নামি আর তাঁরও ইচ্ছানুসারেই পাঠিয়েছিলুম। হ্যাঁ, ঠিক। আমার কথাটা এখন বুঝতে পেরেছেন?'

কাতাওকা গৃহিণীর আগমনে কথোপকথনে বাধা পড়িল। তিনি কাতোঠাকুরাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এখুনি চল্লেন? একটি লোক আসাতে উঠে যেতে হয়েছিল। না, এইমাত্র তিনি গেলেন! আবার সেই 'চ্যারিটি বাজারের' কথা। এতে কিছু হবে বলে ত বিশ্বাস হয় না। একাণ্ডই যাবেন? চিজুকো-সান্‌কে আমার ভালবাসা দেবেন। নামি গিয়ে পর্য্যন্ত ভারী তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'তার শরীর ভাল নেই। অনেক দিন দেখা করতে আসে নি। নমস্কার।'

'নমস্কার'

'খানিকটা আপনার সঙ্গে যাব,' জেনারল্ কহিলেন। —"এই একটুখানি। কী, মী—তোমরা এস, এইবার বেড়িয়ে আসা যাক্।'

বৈঠকখানার একখানা আরাম কেদারায় কাতাওকা গৃহিণী বসিলেন ও 'চ্যারিটি-বাজারের' অনুষ্ঠান পত্র উল্টাইতে উল্টাইতে কোমার প্রতি মাথা নাড়িলেন।

'কোমা-সান্ কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল?'

'ভালো করে শুন্‌তে পেলুম না, মা। কিন্তু ইকুর সম্বন্ধে কিছু।'

'ইকু?'

'হ্যাঁ, এই রকম। তাকেও-সানের বুড়ো মার বাত হয়েচে ও তিনি খুব খিট্‌খিটে হয়েছেন। ইকু এক দিন নামি-সানের সঙ্গে তার ঘরের ভিতর কথা কইছিল। সে বল্লে 'বুড়ি এত খিট্‌খিটে হয়েছে কেন? ঠাকরুণ আমি তোমার জন্যে দুঃখিত; কিন্তু বুড়ীর বয়েস হয়েচে, আর মরতে দেরী নেই।' ইকুর এমন কথা বলা আহাম্মকি নয় মা?"

"কুঁদুলে বুড়ীটা সদাই গোল বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে!"
"আর ঠিক সেই সময়ে বুড়ী ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইকুর কথা সব শুন্‌লে। শুনে খুব রেগে উঠলো।"

"দেখ! আড়ি পেতে শোন্‌বার ফল।'

"সে এত রেগেছিল যে নামি-সান্‌ কি করবে ভেবে না পেয়ে কাতো মাসীমার কাছে গেছ্‌লো।"

"মাসীমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে?"

"নামী-সান্‌ সব কথাতেই মাসীমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যায়।"

রমণী শুষ্ক হাসি হাসিলেন।

"আর কি?"

"তার পর বাবা বল্‌লেন ইকুকে 'ভিজা' তদ্বির কর্‌তে পাঠাবেন।"

"তাই নাকি?" রমণী উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন। "আর কিছু নয়?"

"আমি আরো শুন্‌তুম কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কি-চান্‌ এসে পড়্‌লো, আর—।"

শ্রীহেমনলিনী রায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

১১। বার ভুঞা।—শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাম রাম বসু মহাশয় ভারতবর্ষে নবাগত সাহেবদের পাঠ্য পুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রতাপাদিত্য চরিত লিখিয়াছিলেন। বহিখানা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন যুগের উষা-তারা। দেশের গৌরবময় অতীতের বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সেই প্রথম, এবং সহজ সরল বাঙ্গালায় গুরু বিষয়ের রচনা-প্রয়াসও উহাই প্রথম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, বঙ্গদেশে পাঠান শাসন যখন শিথিলমূল তখন উদ্ধত মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের যে জাতীয় জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার নেতাদিগকে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ডাকাতরূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন বা একেবারেই উল্লেখ করেন নাই; এবং বঙ্গের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই সকল বঙ্গবীরের ইতিহাসের উদ্ধারে এত কমই মনোযোগ দিয়াছেন যে, রাম রাম বসু প্রতাপাদিত্যের বিষয় যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন আজ দীর্ঘ এক শতাব্দীর পরেও আমরা প্রতাপাদিত্যের বিষয়ে তাহার চেয়ে বড় বেশী জানি না! একজন বিদেশী—ডাক্তার ওয়াইজ—প্রথম বার ভূঞার ইতিহাস উদ্ধারে মনোযোগী হন। তাহার পরে যাঁহারা এই দুর্গমপথ সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও সমালোচ্য পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের প্রায় সারা জীবনের শ্রমের ফল এই বার ভূঞার ইতিহাস আমরা সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইতেছি। পুস্তকখানিকে বার ভূঞার ইতিহাস না বলিয়া বার ভূঞার বিবরণ বলিলেই ঠিক হয়। আনন্দ বাবু বার ভূঞার বিষয়ে যেখানে যাহা পাইয়াছেন, কঠোর পরিশ্রমের সহিত সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে স্তূপীকৃত করিয়াছেন। শৃঙ্খলা এবং ঐতিহাসিক বিচারের অভাবে পুস্তকখানা ঠিক ইতিহাস হইয়া উঠে নাই। ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন ভবিষ্যতে তাঁহারাও এই বিপুল সংগ্রহকে উপেক্ষা করিতে পরিবেন না। আনন্দ বাবুর স্থাপিত এই ভিত্তির উপরই তাহাদিগকে প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পুস্তকে ঈশাখাঁর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইল। শুধু ইলিয়ট (Elliot's History of India by its own Historians) অবলম্বনেও এই বিবরণকে বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করা যাইত। ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী খিলগাও গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে ঈশাখাঁর পিতা কালিদাস গজদানীর বসত বাটি ছিল। সেই বসত বাটির চিহ্ন এবং কালিদাস গজদানী প্রতিষ্ঠিত বার তীর্থের জল সমন্বিত পুকুর ইত্যাদি এখনও আছে। কোন ঐতিহাসিকই ইহার উল্লেখ করেন নাই। আনন্দ বাবুর পুস্তকেও ইহার উল্লেখ পাইলাম না। বার ভূঞাদের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট চারিটি দেবী মূর্ত্তির—(জয়পুরের

শিলাদেবী, যশোহরের যশোরেশ্বরী, ভুলুয়ার বরাহী দেবী, এবং নদীয়া লাখড়িয়ার ভুবনেশ্বরী)—ফটোগ্রাফ পুস্তকে যুক্ত হইলে পুস্তকের উপাদেয়তা অনেক বর্দ্ধিত হইত। যাহা হউক প্রথম চেষ্টায় দোষ ক্রটী থাকা অনিবার্য্য। লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে যাঁহারা ব্রতী আছেন তাঁহারাই জানেন, কাজটি কিরূপ আরামের। আনন্দ বাবু যাহা করিতে পারেন নাই তাহা সামান্য, কিন্তু যাহা করিয়াছেন তাহা এই আলস্য শয্যায় সুখ শায়িত বাঙ্গালাদেশে সুলভ নহে আমরা তাহারই জন্য আনন্দ বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। বাঙ্গালাদেশের প্রতি ঘরে ও লাই-ব্রেরীতে এই পুস্তকখানা থাকা আবশ্যক। শ্রীন—

১২। ধ্রুব—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ধ্রুব-চরিত্র ভারতের নিতান্ত আপনার সামগ্রী—অন্য দেশে ইহা অসম্ভব। সেই অতুলনীয় দেব-চরিত্র আমাদের দেশে শিশু সন্তানের জন্য সহজ, সুখ বোধ্য ভাষায় লিপি-বদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পুস্তকখানি আগাগোড়া দুই রঙে সুন্দর করিয়া পরি-ষ্কার কাগজে ছাপা। একখানি তিন রঙে, দুইখানি দুরঙে, ও দুই খানি এক রঙে ছাপা হাফ্‌টোন ছবিতে সুশোভিত। ছবিগুলি পরিষ্কার সুন্দর—সাধারণ পুস্তকে দুর্লভ। দুই একটা মুদ্রাকর প্রমাদও লক্ষিত হইল। পুস্তকের বাঁধাই সুন্দর—সিল্কের কাপড়ে ঝক্‌ ঝকে সোনার জলে নাম লেখা। পুস্তকের জন্য ছেলের দলে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পুস্তকখানি ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথা সম্ভব সুলভ—মাত্র ।৶০ ছয় আনা।

শ্রীঅঃ—

১৩। অর্ঘ্য—কবিতাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। ৭০টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি,—২০০ শত পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ মন্দ নহে, কিন্তু প্রথমেই বর্জ্জাইস অক্ষরে লম্বা শুদ্ধি পত্র দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। লেখকের কবিহৃদয়ের পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কবি প্রতিভা কোন কবিতায়ই বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। লেখক সর্ব্বত্রই ভাবোচ্ছ্বাসে লিখিয়াছেন, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে ভাব উচ্ছ্বসিত করিতে পারিয়াছেন অতি অল্প কয়েকটি কবিতার অল্প কয়েকটি স্থানে। চন্দ্রধরের তুলনায় লেখকের ভাষার এবং ছন্দের দৈন্য এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীন—

১৪। সতীধর্ম্ম—স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ, স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সতীধর্ম্মের উপদেশ। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত এবং ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নীল রঙ্গে বড় অক্ষরে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ॥০ ও ৸০ আনা।

পুস্তকখানা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং আরও নিরাশ হইয়াছি ঢাকার প্রকাশকদের সাহিত্য রস-জ্ঞানহীনতা দেখিয়া। তাঁহারা এই সমস্ত ছাই ভস্ম ছাপাইয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিতে সাহসী হইতেছেন দেখিয়া মনে হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি বিধানে তাঁহাদেরও যে একটা কর্ত্তব্য আছে, এই জ্ঞান তাঁহাদের আছে। তাঁহারা মনে করেন যে, কোন একটা লেখা খুব জাকজমক করিয়া ছাপাইয়া বাঁধাইয়া বিজ্ঞাপনের জোরে কোন রকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল।

বর্ত্তমান লেখকের রচনা ভঙ্গী এমন হাস্য জনক, লেখা এত কাঁচা, রুচি এমন বালকোচিত, উপদেশগুলি এত প্রাণহীন ও নীরস যে, এমন অদ্ভুত পুস্তক পড়িয়া উপদেশ লাভ করিতে হইলে মেয়েদের মনে যে, স্বাভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধি আছে তাহাও লুপ্ত যইয়া যাইবে। লেখক নানা সদুপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য পুস্তক রচনা করিতেছেন, সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাহাই করিতে থাকুন,—তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ সাফল্যের সম্ভাবনা আছে:—নিজের রিক্ত কল্পনার উপর নির্ভর করিতে গিয়া পুনরায় হাস্যাস্পদ না হন ইহাই আমাদের অভিলাষ।

সমালোচ্য গ্রন্থের ৩৮-৪৬ পৃষ্ঠার উপাখ্যানটি বাদ না দিলে ভদ্র পরিবারে এই পুস্তকের প্রবেশ নিষেধ হওয়া উচিত।

এরূপ বিসদৃশ ও বীভৎস আখ্যান সদুপদেশমূলক হইলেও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। না হইলে রোগ অপেক্ষা ঔষধ ভয়ঙ্কর হইবে।

শ্রীন—

১৫। ধ্রুব—"বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত—উদ্ধৃতাংশটুকু আমাদের নহে, এটি গ্রন্থকারের নিজস্ব। পুস্তকখানি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত মূল্য ।৵০ —৬০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। লালও সবুজ কালির ছাপা, জাকাল বর্ডার, কাগজ ভাল; মাঝে মাঝে দুই একটি বর্ণাশুদ্ধি আছে। আজ কাল ছাপার এরূপ চাকচিক্য বিরল নহে।

গ্রন্থকার সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বালকদিগের চরিত্র গঠনে বিশেষ উপকারী, সুতরাং যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তকখানিতে চারখানা রঙ্গিন ছবি আছে। শান্তিময়।

বর্ষা-আবাহন

এস, ওগো এস, অয়ি বরষা !
নিখিল-যৌবন-রসে উথলি'—
বঙ্গ-বন-ছায়া-তল প্লাবিয়া
তাপ-দগ্ধ-বায়ু-ভার শীতলি'।

এস চির বিশ্বেরি মানসী,
এস চির ঢল ঢল মূরতি,
কল কল সঙ্গীত পূর্ণ
স্বচ্ছ হে দ্রবময়ী ভারতী।

নেচে নেচে এস চির নবীনা—
তরণী-মরাল-কোটি-শোভিতা,
ধু'য়ে ফেল নীরসতা-কালিমা
দ্রবময়ী অখণ্ড কবিতা।

নদ-নদী-জলাশয় ভাসায়ে
এস মহাপারাবার দলিয়া ;
মন্দাকিনী, খসে পড় ভূতলে—
পল্লী শিরে শিরে পড় গলিয়া।

উথলিয়া উঠ নারী-অঙ্গে
পুরুষের আঁখি প্রেমে উজলি'—
ধরা কর যৌবন-সজলা,
আকাশেতে ফুটাইয়া বিজলি।

এস তুমি গগনের আভানে
জলদের করপুট ভরিয়া,—
ধরণীর রসনাতে এস গো
পিয়াসার আকুলতা হরিয়া।

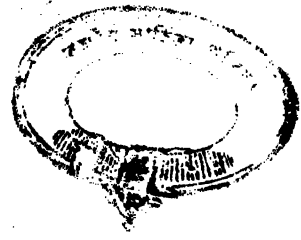
সুশীতলে, যেও তুমি গোপনে
বিরহীর হৃদি-চিতা পরশি'
নব প্রাণ দিও মৃত ভুবনে
দিশি দিশি সঞ্জীবনী বরষি।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।



কবি রজনীকান্ত। (রুগ্নাবস্থা।)

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্, ঢাকা।



প্রতিভা

২য় বর্ষ | শ্রাবণ,—১৩১৯ | ৪র্থ সংখ্যা।

কবি-স্মৃতি

সে আজ ১৫ বৎসরের কথা, যখন কবি রজনীকান্তের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমরা মির্জাপুর ষ্ট্রীটের ২৭।২ নং বাড়ীতে থাকিতাম। এই বাড়ীতে আমাদের সহিত বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীমতী সরলাবালা সরকার মহাশয়ার পরলোকগত স্বামী শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ও থাকিতেন। এক দিন সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া দেখি যে, একজন অপরিচিত ভদ্রলোক খুব সঙ্গীতের ফোয়ারা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ইনি শরৎ বাবুর একজন বন্ধু ও ইঁহার নাম শ্রীরজনীকান্ত সেন। রজনী বাবুর পরিবারের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ আত্মীয়তা আছে, এবং সেই হেতু রজনী বাবুর নাম ও পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই আমার জানা ছিল। এই পরিচয়ের পূর্ব্বেই আমি আমার কোন অতি বৃদ্ধা আত্মীয়ার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, রজনী বাবুর গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এবং পাঠাবস্থায় যখন তিনি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতেন, তখন পরিবার ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর বৃদ্ধাদের নিকট ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনী অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করিতেন।

সেই রাত্রিতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি ২।১ টি গান গাহিয়া স্বীয় আবাস স্থলে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে আর কয়েকটি গান গাহিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে তিনি তৎপর দিন আমাদের বাসায় আসিয়া রাত্রি যাপন করিবেন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। কথামত পরের দিন সন্ধ্যার সময় তিনি যথা সময়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত সমান বেগে গান চলিতে লাগিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের নিজের ব্যুৎপত্তি বা অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম, সুতরাং সেই সময়ে তিনি কোন কোন গান গাহিয়াছিলেন তাহা আমাদের কিছুই মনে নাই। আমার বোধ হয় সে সময় তিনি নিজে সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন নাই। আহারের পর তাঁহাকে পুনরায় গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি নিজেই প্রস্তাব করিলেন যে, গান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি গল্প বলিবেন। আমরা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, এবং তিনি রাত্রি প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত তাঁহার আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলেন।

রজনীকান্তের স্মরণ শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। অনেক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, গদ্য ও পদ্য তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। এই রাত্রিতে আমাদের নিকট যে গল্পটি বলিয়াছিলেন, তাহা একটি Detective story. এই গল্প তিনি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও এরূপ ভঙ্গীসহকারে বলিয়াছিলেন যে, সেই গল্পের কোন কোন অংশ এখনও আমার বেশ মনে আছে।

এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পর কবির সহিত আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। সে সময়ে আমি Eden Hindu Hostel এ থাকিতাম। কবির জেঠ্তুত ভাই Cancer রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করেন ও অবশেষে এই রোগের করালগ্রাসে পতিত হন। সে সময়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই।

ইহার প্রায় ৭ বৎসর পর কবির সহিত আমার তৃতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। এইবার তিনি তাঁহার নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ সেনের চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। আমরা তখন ৬৫।৩ হ্যারিসন রোডে থাকিতাম। পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক দিন কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল এবং তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকিতেন। ইহার পূর্ব্বেই সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা প্রথম ২।৪ দিন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহার এরূপ অমায়িক ও সরলতা পূর্ণ ছিল যে, আমরা এবং আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠ যাঁহারা আমাদের সহিত থাকিতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সমবয়স্কভাবে তাঁহার সহিত বিনাসঙ্কোচে মিশিতেন। রজনী বাবুর যে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত বাঙ্গালার প্রতিগৃহে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের ২।১টি এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তিনি সুগায়ক ও সুরসিক ছিলেন। তাঁহার সুরসিকতার পরিচয় তাঁহার রচিত গানে বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সাধারণ আলাপাদিতে তিনি যেরূপ রসিকতার পরিচয় দিতেন, তাহাতে বোধ হয় যে, রসিকতা তাঁহার চরিত্রের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। সামান্য সামান্য কথাতে তিনি এরূপ হাস্য রসের উদ্রেক করিতে পারিতেন যে, তাহা প্রায় অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিতা। আমাদের সমবয়স্ক যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব ভাল গান করিতে পারিতেন, কি কোন বাজনা বাজাইতে পারিতেন তাহাদিগকে তিনি সমাদর করিতেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও গলার সুর তাঁহার নিজের সুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মিষ্ট হইলে যে ভাবে তাহাদের সেই মিষ্টতা স্বীকার করিতেন, তাহা আমাদের দেশের অনেক বড় লোকের-পক্ষে শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার অনেক প্রকার আলাপাদি হইত। তাহাতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আইন, সঙ্গীত ও রসিকতা চর্চ্চা ব্যতিরেকে জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল; এবং এই প্রসঙ্গে তিনি রামেন্দ্র বাবুর "জিজ্ঞাসা" নামক গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ সুন্দর পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কখনও পাঠ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, আমাদের এই সময়ের দৈনিক জীবনের এক চতুর্থাংশ তাঁহার সঙ্গীত, রসিকতা প্রভৃতি উপভোগে কাটিয়া যাইত।

এই ঘটনার প্রায় ৮।১০ মাস পরে রজনী বাবুর সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে আমি তখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে এক প্রবাদ আছে যে, রজনী বাবুর কোন পূর্ব্বপুরুষ দস্যুতা পূর্ব্বক প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিন কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রবাদ সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের নামের সহিত এই দস্যুতাপবাদ জড়িত আছে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অপবাদের মূলে কোন ভিত্তি নাই। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য বাল্যে অতি কষ্টে দরিদ্রতার মধ্যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক সময় উপাধানের অভাবে ইষ্টকখণ্ড মাথায় দিয়া তাঁহাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইত।

এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের দস্যুতালব্ধ প্রচুর অর্থ থাকিলে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যকে কখনই বাল্যে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত

না। এই সময়ে ৫।৬ দিন আমি তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। তাঁহাদের বাড়ী হইতে স্নান করিবার ঘাট কিছু দূরে; তিনি যখন স্নান করিতে যাইতেন, তখন আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। সেই কয়েক দিনের স্নান এখন ঠিক স্বপ্নের মত মনে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা করিয়া আমরা স্নান করিতাম, এবং সেই সময় অতি ছোট ছোট রসাল গল্প বলিয়া মৃত কবি যেরূপ ভাবে স্নান ক্ষেত্রকে হাস্য ক্ষেত্রে পরিণত করিতেন তাহা অপরকে বুঝান অসম্ভব।

এই ঘটনার পর ৬।৭ মাস মধ্যে রজনী বাবুর সহিত আমার পুনরায় দেখা হয়। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে তাঁহার শ্যালীপুত্র আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কটকে অবস্থান করিতেন। রজনী বাবু সেই সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন জন্য রাজসাহী হইতে কটকে যান, এবং কটক যাওয়ার রাস্তায় কলিকাতায় সপরিবারে আমাদের বাসায় আসিয়া উঠেন। এই অল্প সময় মধ্যেই তাঁহার শরীরের যেরূপ অবনতি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা সকলেই তাঁহার জন্য অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম।

কটক হইতে স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসেন। আমি গ্রীষ্মাবকাশে সে'বার বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম; ফিরিয়া আসিয়া দেখি তিনি সপরিবারে স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীর কিছু ভাল হইয়াছিল বটে কিন্তু শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবার পুর্ব্বেই সেই যাত্রায় তাঁহাকে আবার রাজসাহী ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহার পর রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় দেখা হয়। বলা বাহুল্য সম্মিলনের উপলক্ষে যে দুই দিন আমি রাজসাহীতে ছিলাম, সেই দুই দিন তাঁহার বাড়ীতেই আমাকে থাকিতে হইয়াছিল। রাজসাহী সম্মিলনে তিনি যে ভাবে বালকপুত্র ও বালিকা কন্যা-সাহায্যে উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীর সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ের উল্লেখনিষ্প্রয়োজন।

ইহার পর ৬।৭ মাস পরে এক দিন সংবাদ পাইলাম যে, রজনী বাবু অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় সুরেশ বাবুর বাসায় সপরিবারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া শুনিলাম যে, ডাক্তারেরা তাঁহার cancer হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। আমার বোধ হয় তিনি পীড়ার প্রথম সূচনায় আসন্ন মৃত্যুকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, অন্ততঃ তাঁহার কথা বার্ত্তাতে এইরূপ প্রকাশ পাইত। cancer এ অস্ত্র চিকিৎসার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। কলিকাতায় এইরূপে কিছু দিন ভুগিয়া এবং পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া তিনি চিকিৎসার্থ কাশীধাম চলিয়া যান। এই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ হয়, এবং কাশিম বাজারের মহারাজা বাহাদুর, দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার শ্রদ্ধাস্পদ সারদা বাবু প্রভৃতি সেই সময় হইতে তাঁহার ও তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য কল্পে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। কাশীতে গিয়া কিছু দিন এক সন্ন্যাসীর চিকিৎসাধীন থাকেন, কিন্তু এ চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল না হওয়ায় তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া সুরেশ বাবুর বাসায় অবস্থান করেন। এই সময় হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ অতি দ্রুতবেগে খারাপ হইতে আরম্ভ হয়। এক দিন হঠাৎ দম্ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর উপক্রম হয়; সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে আমাদের বন্ধু যতীন্দ্রমোহন দাস আমার নিজ বাড়ী হইতে একটি রোগী দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সুরেশ বাবুর বাড়ীতে যান, এবং তাঁহার এই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহাকে Medical Collegeএ লইয়া যান ও অস্ত্র প্রয়োগে তাঁহার জীবন রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর হইতেই তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত Medical Collegeএর Cottageএ অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

শচীন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহোপলক্ষে দেশ হইতে আত্মীয় স্বজন কলিকাতায় আগমন করেন। সেই সময়ে বৌবাজারে একটি বাসা ভাড়া করা হইয়াছিল, এবং তিনি সেই বাসাতে বিবাহোপলক্ষে কয়েক দিন ছিলেন। Medical Collegeএর Cottageএ অবস্থান কালীন (আমার যত দুর জানা আছে) এক দিন তিনি নিজের কোন আত্মীয়ের বিবাহে (গত মে মাসের প্রথম ভাগে কিম্বা এপ্রিলের শেষে) শ্যামবাজারে যাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত যখন তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিত তখন তিনি Cottageএর সম্মুখস্থ রাস্তাতে (Eden Hospital Roadএ) মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য বাহির হইতেন। এই Cottageএ অবস্থান কালীন তিনি হার্মোনিয়ম্ বাজাইয়া আগন্তুক ভদ্র মণ্ডলীর সংবর্দ্ধনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। সুতরাং ইহাদের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল মাত্র দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

তাঁহার অসুস্থতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট আসিতেন। এক দিন এই বিষয়ের উল্লেখ করাতে তিনি হাসিয়া আমাদিগকে লিখিয়া বলিলেন যে "লোকের যতই বৃদ্ধি হয় মাথায় ততই দোল দেখা যায়।" রসিকতা তাঁহার নিজের অস্থি মজ্জার সহিত কি ভাবে জড়িত ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আর কোন দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রজনী বাবুর সাহায্যের জন্য Minerva রঙ্গমঞ্চে যে একটি অভিনয় হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ অভিনয়লব্ধ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি না তদ্বিষয়ে তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। এই সম্বন্ধে তাঁহার শেষ মত জানিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। আমি পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি অতি ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনিলেন; এবং কিছু ক্ষণ বিবেচনা করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ সারদা বাবুর কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যখন এত বড় লোক এই অভিনয়ের অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেছেন তখন এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন দ্বিধা নাই। আমরা স্বচ্ছন্দে অভিনয়ের উদ্যোগ করিতে পারি।

এই ঘটনার পর আর তাঁহার সহিত কোন বিষয় লইয়া কোন প্রকার কথা বার্ত্তা হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

গোময়ের ব্যবহার *

আমাদের দেশে গোময় সাধারণতঃ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত কার্য্যের জন্য গোময়ের সহিত অল্প পরিমাণ জল এবং দাহিকাশক্তির বৃদ্ধির জন্য কখনও কখনও তুষ বা খড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মিশ্রিত করিয়া চাপটি বা গুলি প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। কখনওবা সরু বংশখণ্ডের গাত্রে সংলগ্ন করিয়া বিশোষণ কার্য্য সংসাধিত হয়। প্রাদেশিক ভাষায় এতদঞ্চলে উহাকে "ঘষি", 'ঘুটে' বা গইঠা বলে। শুষ্ক "গইঠা" অতি সহজেই প্রজ্জ্বলিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভূমির সাররূপেও অনেক সময় গোময় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাররূপে গোময়ের ব্যবহার কৃষকদিগের মধ্যে এখনও সম্যক্‌রূপে প্রচলিত হয় নাই। চেষ্টা করিলে অতি সহজেই যথেচ্ছ পরিমাণ গোময় সংগ্রহ করা যায়। যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি কাষ্ঠ বিনামূল্যে

* ১৯০৮ সনের আগষ্ট মাসের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জারনেল (Indian Trade Jouranl) এ প্রকাশিত ঢাকা কলেজের অধ্যাপক Watson সাহেবের প্রবন্ধের সূত্রাবলম্বনে লিখিত।

বা স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় সেরূপ স্থানে সাধারণতঃ গোময় আবর্জ্জনারূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে গোময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ব্যবহার কি ?

উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবেঃ—

১। দাহন কালে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ইন্ধনের সহিত তুলনায় গোময়ের তাপদায়িনী শক্তির আপেক্ষিকতা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সমস্ত দাহ্য বস্তুরই উত্তাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা সমান। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এক সের ওজনের সাধারণ জ্বালানি কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে যতটুকু জল বাষ্পে পরিণত করা যায় উক্ত ওজনের কয়লা সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে তাহার প্রায় দ্বিগুণ জল বাষ্পে পরিণত হইবে। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কয়লাতে পাক ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পাদিত হইয়া থাকে।

২। যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের দেশে ভূমির সাররূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে সার-প্রদায়িনী শক্তির তুলনায় গোময়ের স্থান।

৩। যে সমস্ত দ্রব্য ইন্ধন অথবা ভূমির সাররূপে এদেশে ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের মূল্যের সহিত গোময়ের মূল্যের তুলনা।

অধ্যাপক ওয়াট্‌সন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গোময় এবং তত্তদ্দেশীয় বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দাহন কালে তাহাদের প্রত্যেকটির মোট উত্তাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পুষা কৃষিগবেষণালয় হইতে Mr. B. Coventery গোময়ের সারপ্রদায়িনী ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য বিভাগের নিউলপেটেন সাহেব (Mr Neolpaton, Director General of Commercial Intelligence) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গোময় ও অন্যান্য প্রকার ইন্ধনের মূল্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই সংগৃহীত বিবরণী হইতে গোময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত-ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। অধ্যাপক ওয়াট্‌সন শিবপুর, কটক, মাদ্রাজ, পাটনা, মৈনপুরী (উত্তরপশ্চিমাঞ্চল), আলিগড় এবং সুরাট হইতে গোময় প্রস্তুত "গইঠা" এবং জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চারিপ্রকার বিভিন্ন চিহ্ন বিশিষ্ট কেরোসিন তৈল এবং বহু দেশীয় কয়লা ও কোক্ লইয়া কেলরিমিটার (calorimeter) বা তাপ পরিমাপক যন্ত্রদ্বারা দাহনকালে তাহাদের প্রত্যেকটির মোট উত্তাপ প্রদান করিবার ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কেলরিমিটার যন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, উহার সাহায্যে কোনও বস্তুর দাহন কালে প্রদত্ত মোট তাপ সূক্ষ্ম ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত "গইঠা বা ঘুটে", বিভিন্নপ্রকার জ্বালানি কাষ্ঠ, বিভিন্ন মার্কা বিশিষ্ট কেরোকিন তৈল, কয়লা ও কোক্ প্রভৃতির দাহন কালে প্রদত্ত মোট তাপ পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কপাত সাধারণ পাঠকের নিকট তেমন রুচিকর হইবে না, এই ভয়ে এই স্থলে তাহা উল্লেখ করা গেল না; কেবল পূর্ব্বপ্রকার অঙ্কপাতগুলির একটা গড় করিয়া দেওয়া গেলঃ—

ইন্ধনের নাম	দাহনকালে প্রদত্ত মোটতাপের পরিমাণ
১। গইঠা বা ঘুটে	৪৩৩০ ভাগ (B. T. unit)
২। জ্বালানি কাষ্ঠ	৭২১০ ভাগ ,,
৩। কেরোসিন	১৯৬১১ ভাগ ,,
৪। কয়লা	——
(ক) উৎকৃষ্ট	১২১৪১ ভাগ ,,
(খ) নিকৃষ্ট	১১৫১১ ভাগ ,,

যতটুকু উত্তাপ এক ভাগ জলকে ১ ডিগ্রী ফাঃ (one degree Fernheit) উত্তপ্ত করিতে পারে ততটুকু তাপকে ১ ভাগ তাপ (B. T. unit) ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ একভাগ ইন্ধন প্রদত্ত মোট তাপ দ্বারা যত ভাগ জলকে ১ ডিগ্রী ফাঃ উত্তপ্ত করিতে পারে, উক্ত সংখ্যা ঐ ইন্ধনের মোট তাপদান পরিমাণ। ধরুন বলা

হইয়াছে গইঠার গড়পড়তা মোট তাপদান পরিমাণ ৪৩৩০ ভাগ; ইহার অর্থ এই যে, এক সের গইঠা সম্পূর্ণ-রূপে দাহন করিলে ৪৩৩০ ভাগ জল ১ ডিগ্রী ফাঃ উত্তপ্ত হইবে। পূর্ব্বে জলের উষ্ণতা ৫৪ ডিগ্রী থাকিলে উত্তাপের পর ৫৫ ডিগ্রী হইবে।

পূর্ব্বোক্ত অঙ্ক সমূহ হইতে দেখা যায় যে, উত্তাপ দান করিবার ক্ষমতা তুলনা করিলে কেরোসিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং "গইঠা" নিকৃষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বসংখ্যা সমূহ হইতে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না; কারণ রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য যে প্রকার মৃণ্ময় বা লৌহ নির্ম্মিত চুল্লী ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাতে ইন্ধন প্রদত্ত অধিকাংশ ভাগ তাপই প্রকৃত পক্ষে কোনও উপকারে না আসিয়া চুল্লীর পার্শ্ব দিয়া উত্তপ্ত অনিল পদার্থরূপে (as hot gas) বায়ুতে লীন হইয়া যায়। সাধারণ চুল্লীর আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অত্যাধিক পরিমাণ ধূম নির্গত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, দাহ্য বস্তু সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইতে না পারিয়া ধূমরূপে বহির্গত হইয়া যায়। কাজেই কেবলমাত্র আংশিক তাপই কাজে লাগিয়া থাকে। কোনও বিশেষ অবস্থায় কোনও বস্তুকে দগ্ধ করিলে মোট যতটুকু তাপ প্রকৃত পক্ষে কাজে লাগে তাহাকে ঐ অবস্থায় উক্ত বস্তুর মোট কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা (total available heating power) বলা যাইতে পারে।

'গইঠা' এবং কাষ্ঠ সাধারণতঃ মৃণ্ময় চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়। কয়লা বা কোক্ ব্যবহৃত করিতে হইলে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত চুল্লীর প্রয়োজন, এবং কেরোসিন কেবল-মাত্র ষ্টোভে (stove) ই ব্যবহার করা চলে।

বিভিন্ন ইন্ধনের তালিকায় গোময়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যে যে অবস্থায় তাহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সেই অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকটির ও "গোময়ের কার্য্যকরী তাপদানের ক্ষমতার" তুলনা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত উপায়ে কোন ইন্ধনের কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

কোনও বস্তুকে ১ ডিগ্রী সিঃ (one degree centigrade) উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন উহাকে উক্ত বস্তুর "আপেক্ষিক তাপ" (Specipic heat) বলা হয়। জলের আপেক্ষিক তাপ ১ ধরিয়া অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নির্ণীত হয়। মৃণ্ময় পাত্রের আপেক্ষিক তাপ জলের আপেক্ষিক তাপের ½ অংশ অথবা ২। জলীয় বাষ্পের প্রচ্ছন্ন তাপ (latent heat) ৫৪০ ভাগ। অর্থাৎ এক ভাগ ফুটন্ত জলকে (boilnig water) বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে ৫৪০ ভাগ তাপের প্রয়োজন। উক্ত তাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং তাপমান যন্ত্রদ্বারা (Thermometer) নির্দ্ধারণ করা যায় না। জলের বাষ্পীয় অবস্থা সংরক্ষণের জন্য ঐ তাপ অনিবার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

একটি নির্দ্দিষ্ট ওজনের মৃণ্ময় পাত্রে নির্দ্দিষ্ট ওজনের জল লইয়া নির্দ্দিষ্ট ওজনের পরীক্ষাধীন ইন্ধন সম্পূর্ণ দাহন করিয়া উত্তপ্ত করিলে প্রথমতঃ মৃণ্ময় পাত্র এবং তন্মধ্যস্থ জল জলের স্ফুটন তাপ (" boiling temperature of water ") পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইবে। পরে ঐ জল বাষ্পে পরিণত হইতে আরম্ভ করিবে। সমস্তটুকু ইন্ধন নিঃশেষিত হইয়া গেলে পর ঐ পাত্র এবং তন্মধ্যস্থ জল ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তখন জল সহ পাত্রটিকে পুনরায় ওজন করিয়া পূর্ব্ব ওজন হইতে বাদ দিলে কতটা জল বাষ্পে পরিণত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। এইরূপে নির্দ্ধারিত জলের ওজনকে ৫৪০ দ্বারা গুণ করিলে, বাষ্পীকরণ কার্য্যে কতটুকু তাপ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নির্ণীত হইবে।

পূর্ব্বে আপেক্ষিক তাপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে মৃণ্ময় পাত্র ও তন্মধ্যস্থ জলকে স্বাভাবিক উষ্ণতা হইতে স্ফুটনতাপ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে কতটুকু তাপ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যাইবে। এই দুই প্রকারে ব্যয়িত তাপের পরিমাণ একত্র করিলে পরীক্ষাধীন ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত মোট কার্য্যকরী তাপের

পরিমাণ পাওয়া যাইবে। কারণ ইন্ধন প্রদত্ত তাপ উক্ত দুই প্রকার কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই। অবশিষ্টাংশ বায়ুতে লীন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব বর্ণিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, "গইঠার" কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা ৮৮০ ভাগ। সাধারণ জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্যকরী তাপ দান ক্ষমতা ১৩৫৫ ভাগ। $\frac{\text{কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা}}{\text{মোট তাপদান ক্ষমতা}}$ কে কার্য্যকরী উপযোগিতা ধরিলে দেখা যায় যে, গইঠার কার্য্যকারিণী উপযোগিতা (cooking efficiency) $= \frac{৮৮০}{৪৩৩০} =$ ২১%। জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্যকরী উপযোগিতা $\frac{২৪৫}{১৩৫৫}$ $=$ ১৮%। (এ স্থলে মোট কার্য্যকরী ক্ষমতাকে ১০০ ধরা হইয়াছে), অর্থাৎ "গইঠা" সম্পূর্ণরূপে দাহ করিলে প্রকৃত পক্ষে যতটুকু মোট তাপ পাওয়া যায়, আমরা যেই প্রকারে গইঠা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে তাহার এক শত ভাগের মাত্র ২১ ভাগ তাপ কাজে আসে। অবশিষ্ট তাপ বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যে প্রকার মৃণ্ময় চুল্লী রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। ইন্ধনের মহার্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য কেরাসিন কেবল মাত্র ষ্টোভেই ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত তিন প্রকার ষ্টোভ লইয়া স্বচ্ছ উৎকৃষ্ট কেরোসিনের যে কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা এবং কার্য্যকরী উপযোগিতা (cooking efficiency) নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

পরীক্ষণীয় কেরোসিনের—

ষ্টোভের বিবরণ।	মোট তাপদান ক্ষমতা। (B. T. units)	কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা (B. T. units)	কার্য্যকরী উপযোগিতা।
বিট্রিস্ ষ্টোভ্ (Beatrice)	১৯৩৩২	৬০৫০	৩১ %
সানরাইজ্ ষ্টোভ্ (Sun rise)	১৯৩৩২	৬১৯২	৩২ %
জারম্যান মেক্ (German Make)	১৯৩৩২	৭৪৫৬	৩৮ %

উক্ত অঙ্কপাত সমূহ হইতে দেখা যায় যে, জারম্যান-মেক্ (German-make) ষ্টোভ্ কার্য্যকরী উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রচলিত অন্য দুই প্রকার ষ্টোভ্ হইতে উৎকৃষ্ট। ইহার দাম ও অপেক্ষাকৃত কম।

কয়লা এবং কোক্ লৌহ নির্ম্মিত উঙ্গাটী এবং পাকা চুল্লীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উঙ্গাটীতে জ্বালাইলে কয়লার কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১৩৩২ ভাগ এবং কার্য্যকরী উপযোগিতা ১১%; পাকা চুল্লীতে জ্বালাইলে কয়লার কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১২১৫ ভাগ এবং কার্য্যকরী উপযোগিতা ১০%; কোকের কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা ১৯১৭ ভাগ। পাকা চুল্লীতে কম তাপ পাইবার কারণ এই যে, প্রয়োজনাধিক বায়ুর প্রবেশ হেতু অনেকটা তাপ উত্তপ্ত বায়ুর সঙ্গে চলিয়া যায় এবং প্রকৃত কাজে আসে না।

পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা এবং কার্য্যকরী উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন অঙ্কপাত করা হইয়াছে তাহার একটা গড় হিসাব নিম্নে সন্নিবেশিত হইল —

ইন্ধনের নাম	মোট তাপদান ক্ষমতা Absolute heating power in B. T. units	কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা Available heating power in B. T. units	কার্য্যকরী উপযোগিতা Cooking efficiency
১। ঘঁইঠা	৪৩৩০	৯০০	২১ %
২। জ্বালানি কাষ্ঠ	৭২১০	১১৫২ (গড়ে)	১৬ %
৩। কেরোসিন	১৯৬১১ (গড়ে)	৭৪৫৬	৩৮ %
৪। কয়লা	১১৮০০ (গড়ে)	১৩৩২	১১ %
৫। কোক্	———	১৯১৫	———

কাজেই দেখা যায় যে, কার্য্যকরী উপযোগিতা ধরিতে গেলে কেরোসিন শ্রেষ্ঠ। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের কেরোসিন হইতে যতটুকু তাপ পাওয়া যায় উক্ত ওজনের অন্য কোন প্রকার ইন্ধন হইতে ততটা তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার ইন্ধন শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের মূল্যের তুলনা করিতে হইবে। অবশ্য কল প্রভৃতি চালাইবার জন্য যে প্রকার ইন্ধন উৎকৃষ্ট, রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য তাহা সম্পূর্ণ রূপে অনুপযোগী হইতে পারে, কারণ পূর্ব্বোক্ত স্থলে ইন্ধন সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয় আমরা তাহারই আলোচনা করিয়াছি।

ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধন সমূহের মূল্যের তুলনা করা সহজ নহে। কারণ প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ওজন প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ পাইকারীদরে কিনিতে গেলে খুচরা দাম অপেক্ষা অনেক কম মূল্য পড়ে। সাধারণ লোকেরা ইন্ধন খুচরা হিসাবে ক্রয় করিয়া লয়। কাজেই আমরা খুচরা মূল্যের বিষয়ই আলোচনা করিব। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের পাইকারী মূল্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু খুচরা মূল্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। তাহার কারণ এই যে, একই প্রদেশে, এমন কি একই জেলায় এবং অনেক স্থলে একই সহরের বিভিন্ন অংশে, একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দামে খুচরা বিক্রীত হইয়া থাকে। ঢাকা জেলায় অনেক স্থানে কয়লার মূল্য কলিকাতার কয়লার মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ, কোথাও বা তাহারও অধিক। মাল সরবরাহকরার অসুবিধাই উক্তরূপ মূল্যাধিক্যের কারণ। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহে কেরোসিনের মূল্য অপেক্ষা সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী নগর সমূহে কেরোসিনের মূল্য অনেক অধিক। অবশ্য ঘঁইঠা প্রভৃতি ইন্ধন পাইকারী দরে কখনও বিক্রীত হয় না। মিঃ নিউলপেটন (Neol paton) যত দূর পারিয়াছেন, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের যে খুচরা মূল্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঘঁইঠার মূল্য (১৯০৮ সালে সংগৃহীত) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—(১) আলিগড় — প্রতিমণ ।০ হইতে ।১০ পর্য্যন্ত।

(২) মইনপুরী—৫০০ ঘঁইঠার মূল্য এক টাকা। প্রতিমণ ৴১০ আনা।

(৩) অযোধ্যা (প্রতাপ গড়) ১০০ ঘঁইঠার মূল্য এক আনা হইতে দশ পয়সা পর্য্যন্ত। (প্রত্যেকখানা ঘঁইঠার ওজন দুই হইতে ৮ ছটাকের মধ্যে)। প্রতিমণ ৶০ আনা হইতে ৴১০ আনা পর্য্যন্ত।

বোম্বাই প্রদেশ—(১) বোম্বাই সহর—প্রতি মণ ।৶০ আনা; ৫ সের ১৫ পয়সা।

১ পয়সায় চারি খানা গইঠা। (৩০ খানা গইঠার ওজন /৪৷৷০ সের)।

(২) সুরাট—১০০ গইঠা /৫ পয়সা; প্রতি মণ ।১০ আনা।

বঙ্গদেশ—(১) কলিকাতা—প্রতি মণ ৶০ আনা।

(২) পাটনা—প্রতি মণ ৶০ আনা।

(৩) কটক—উৎকৃষ্ট গইঠা প্রতি মণ ৷৷০ আনা। নিকৃষ্ট গইঠা প্রতি মণ ৶১০ আনা।

মধ্য প্রদেশ—১০০ গইঠার মূল্য ।/১০ আনা; প্রতি মণ ।৶১০ আনা।

মান্দ্রাজ প্রদেশ—(১) মান্দ্রাজ সহর—১০০ গইঠা /০ আনা। (২৫ হইতে ৩০ খানা গইঠার ওজন /৫ সের)। প্রতি মণ ৶০ আনা।

(২) আতুর—১০০ গইঠা ।৶০ আনা প্রতিমণ ৷৷১০ আনা।

(৩) কোয়াম্বাটুর—প্রতি মণ ৶০ আন প্রতি সের এক পাই।

অবশ্য পূর্ব্বে যে মূল্য তালিকা দেওয়া গেল উহা সহরের মূল্য। নগর হইতে দূরে অবস্থিত গ্রাম সমূহে গইঠার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম। পূর্ব্ব তালিকা হইতে দেখা যায় যে, গইঠার দাম ভারতে সর্ব্বত্রই প্রতি মণ ৶০ আনা হইতে ৷৷০ পর্য্যন্ত। গড় পড়তা হিসাব করিতে গেলে প্রতি মণের মূল্য ।১০ আনা নিঃসঙ্কোচে ধরা যাইতে পারে।

বিভিন্ন প্রদেশে যে যে স্থানের গইঠার মূল্য পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে ঠিক ঐ সকল স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠ, ও কেরোসিনের মূল্যও সংগৃহীত হইয়াছিল। সাধারণ পাঠকের নিকট ঐ সকল অঙ্কপাত তেমন রুচিকর হইবে না ভয়ে বিভিন্ন প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত ইন্ধন সমূহের মূল্যের কেবল মাত্র একটা গড় করিয়া দেওয়া গেল।

জ্বালানি কাষ্ঠের মূল্য

(১৯০৪ সালে সংগৃহীত)।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ এবং বঙ্গদেশ সর্ব্বত্রই গড়ে প্রতি মণের মূল্য ৷৷০। মান্দ্রাজ প্রদেশে গড়ে প্রতি মণের মূল্য ৶১০ আনা।

কেরোসিন তৈলের মূল্য

(১৯০৮সালে সংগৃহীত)

বিভিন্ন মার্কা বিশিষ্ট কেরোসিন তৈলের মূল্য বিভিন্ন। প্রচলিত কয়েক প্রকার মার্কাবিশিষ্ট কেরোসিনের মূল্যের গড় করিয়া মোটামুটি মূল্য ঠিক করা হইয়াছে। প্রতি টিনে কেরোসিনের মূল্য হইতে টিনটির দাম ।০ আনা বাদ দিলে পূর্ব্বের হিসাবে প্রতি মণ কেরোসিনের দাম গড়ে বঙ্গদেশে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশ ৩৷৷৶৫ আনা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৪।৶১০ হয়।

কয়লা ও কোকের মূল্য।

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার খুচরা মূল্য সংগ্রহ করিতে না পারায় আসানসোলকে (Asansoal) কয়লার জন্মস্থান বা কেন্দ্রস্থল ধরিয়া উক্ত স্থানে কয়লার ও কোকের মূল্যের সহিত কয়লার জন্য নির্দ্ধারিত রেল বা জাহাজ ভাড়া যোগ দিয়া ভারতের যে কোন প্রদেশের কয়লা এবং কোকের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—

স্থানের নাম	কয়লার মূল্য প্রতিমণ (খুচরা)	কোকের মূল্য প্রতিমণ (খুচরা)
কলিকাতা	।৶০	৷৷৶০
মান্দ্রাজ	৷৷৫	৸৫
পাটনা	।৶১৫	৷৷৶১৫
মইনপুরী (উত্তরপশ্চিমাঞ্চল)	৷৷১৫	৸১৫
সুরাট	৷৷৫	৸১৫

পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রকার ইন্ধনের কার্য্যকরী উপযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের গড়পড়তা মূল্যের বিষয় সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। কাজেই মূল্য

এবং কার্য্যকরী উপযোগিতা একত্র হিসাব করিলে কোন প্রকার ইন্ধন সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ কোন প্রকার ইন্ধন হইতে অল্প, ব্যয়ে অধিক পরিমাণ কার্য্যকরী তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্তরূপ হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল।

ইন্ধনের নাম	প্রতিমণের মূল্য	প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)	প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)
১। গইঠা	।১০	১৮০০	২৫৬০০০
২। জ্বালানি কাষ্ঠ ...	॥ ০	২৩০৪	১৮৪৩০০
৩। কেরোসিন	৪।৶১০	১৪৯১২	১৩৩৫০০
৪। কয়লা	॥ ১৫	২৬৬৪	১৯৩৭০০
৫। কোক্	৸ ১৫	৩৮৩০	১৯১৫০০

বোম্বাই প্রদেশ।

ইন্ধনের নাম	প্রতিমণের মূল্য	প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)	প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পমিমাণ (B, T. units)
১। গইঠা	।১০	১৮০০	২৫৬০০০
২। জ্বালানি কাষ্ঠ ...	॥ ০	২৩০৪	১৮৪৩০০
৩। কেরোসিন	৩॥৵৫	১৪৯১২	১৬৪০০০
৪। কয়লা	॥৫	২৬৬৪	২০৫৪০০
৫। কোক্	৸৫	৩৮৩০	১৯৯২০০

বঙ্গদেশ।

ইন্ধনের নাম	প্রতিমণের মূল্য	প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)	প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)
১। গইঠা	।১০	১৮০০	২৫৬০০০
২। জ্বালানি কাষ্ঠ ...	॥ ০	২৩০৪	১৮৪৩০০
৩। কেরোসিন	৩॥৵ ৫	১৪৯:২	১৬৪০০০
৪। কয়লা	।৵১৫	২৬৬৪	২৫০৭০০
৫। কোক্	॥৵১৫	৩৮৩০	২২৭০০০

মধ্য প্রদেশ।

ইন্ধনের নাম	প্রতিমণের মূল্য	প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)	প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. units)
১। গইঠা	।১০	১৮০০	২৫৬০০০
২। জ্বালানি কাঠ ...	॥০	২৩০৪	১৮৪৩০০
৩। কেরোসিন... ...	৪।৶১০	১৪৯১২	১৩৩৫০০
৪। কয়লা	॥১৫	২৬৬৪	১৯৩৭০০
৫। কোক্	৸১৫	৩৮৩০	১৯১৫০০

মান্দ্রাজ প্রদেশ।

ইন্ধনের নাম	প্রতিমণের মূল্য	প্রতিসের ইন্ধন হইতে প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T units)	প্রতি টাকায় প্রাপ্ত কার্য্যকরী তাপের পরিমাণ (B. T. nnits)
১। গইঠা	।১০	১৮০০	২৫৬০০০
২। জ্বালানি কাঠ ...	৶১৫	২৩০৪	৩৯৩২০০
৩। কেরোসিন... ...	৩।৵৫	১৪৯১২	১৬৪০০০
৪। কয়লা...	॥৫	২৬৬৪	২০৫৪০০
৫। কোক্...	৸৫	৩৮৩০	১৯৯২০০

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, মান্দ্রাজ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই এক টাকার গইঠা হইতে যতটা কার্য্যকরী তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্য কোন প্রকার ইন্ধন হইতে ঐ খরচে ততটা তাপ পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজ অঞ্চলে জ্বালানি কাষ্ঠের মূল্যের স্বল্পতা নিবন্ধন গইঠা ততটা উপযোগী নহে। বঙ্গদেশে কয়লার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এক টাকার গইঠা হইতে যতটা কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায় এক টাকার কয়লা হইতেও প্রায় ততটা তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কয়লার যে মূল্য ধরা হইয়াছে তাহা কলিকাতা ও পশ্চিমাঞ্চলের বড় বড় সহর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে কয়লার মূল্য কলিকাতার কয়লার মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ। কাজেই গড়ে হিসাব ধরিলে বঙ্গদেশেও কয়লা ইন্ধনরূপে গইঠার সমকক্ষ হইতে পারে না। মান্দ্রাজ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই কার্য্যকরী তাপদান ক্ষমতা এবং মূল্যের বিষয় একত্র বিবেচনা করিতে হইলে গইঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন এবং কেরোসিন নিকৃষ্টতম ইন্ধন।

ইন্ধন ব্যতীত গোময়ের যদি অন্য কোন প্রকার ব্যবহার না থাকিত তাহা হইলে গোময়ের ইন্ধনরূপ ব্যবহারই প্রশস্ত হইত এবং অন্যান্য ইন্ধনের তুলনায় গোময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু গোময় ভূমির সাররূপেও ব্যবহৃত হয়, কাজেই গোময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমতঃ বিভিন্ন সারের তালিকায় গোময়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন দ্রব্যের সারের গুণের বিষয় আলোচনা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ কোন সার-দ্রব্য হইতে বৃক্ষাদির

পোষণ এবং বৃদ্ধির জন্য খাদ্যরূপে ব্যবহারের উপযোগী যবক্ষার যান (Nitrogen), প্রস্ফুরকাম্ল (phosphoric acid) ও ক্ষার (potah) কি পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—কোন সার ব্যবহার নিবন্ধন ভূমিতে কত অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত বিষয়টি এখনও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কাজেই প্রথমোক্ত ভাবেই গোময়ের সার-গুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন সার হইতে বৃক্ষাদির যতটা খাদ্য (plant food) আহৃত হইতে পারে ঐ হিসাবেই উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। যথা,—সোরাতে—(Potassium nitrate) শতকরা ১৩ ভাগ যবক্ষার যান ও শতকরা ৪০ ভাগ পটাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ১ সের যবক্ষার যানের বাজার দর ১।০ টাকা ও ১ সের পটাশের বাজার দর ৵০ আনা। এই হিসাবে অর্থাৎ সাররূপে ব্যবহৃত হইলে ১০০ সের সাধারণ সোরার দাম ২১।০ টাকা (১৩×১।০+৪০×৵০) এবং ঐ মূল্যেই বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৩ ভাগ যবক্ষার যানের সহিত ৪০ ভাগ পটাশ বৃক্ষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাজেই অব্যবহার্য্য অবস্থায় অনেক পটাশ নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাররূপে সোরা ব্যবহার করিলে উহার মূল্য বাদে যতটা খরচ পড়ে তদনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু গোময়ের যবক্ষার যান, পটাশ ও প্রস্ফুরকাম্ল যে তুল্য পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতে উহাদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই বৃক্ষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অব্যবহার্য্য অবস্থায় উক্ত উপাদান সমূহের কোন অংশই নষ্ট হয় না। যে প্রকারে গোময় জ্বালানি-কষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাতে শতকরা ১ ভাগ যবক্ষার যান, ১ ভাগ প্রস্ফুরকাম্ল ও ১॥ ভাগ পটাশ আছে ইহা মোটামুটী ধরা যাইতে পারে। ১ সের যবক্ষার যানের মূল্য ১।০ টাকা, ১ সের প্রস্ফুরকাম্লের মূল্য ।৵০ আনা ও ১ সের পটাসের মূল্য ৵০ আনা। কাজেই সাররূপে গোময় ব্যবহার করিলে ১০০ সের গোময় হইতে (১।০ টাকা+।৵০ আনা+৵০ আনা)=১৸৵০ আনা মূল্যের সার-দ্রব্য পাওয়া যায়; অথবা প্রতিমণ গোময় হইতে ॥৶১০ আনা মূল্যের সার-দ্রব্য পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভূমির সার দ্রব্যের তালিকায় গোময়ের মূল্য প্রতিমণ ॥৶১০ আনা হইতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যদিও গোময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন তথাপি ইন্ধনরূপে গোময়ের ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। ।১০ আনা ব্যয়ে ১ মণ গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ॥৶১০ আনা মূল্যের অন্য সার ব্যবহারের ফল পাওয়া যাইবে। অথবা ১৲ টাকার গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ২॥০ টাকায় অন্য সারের ফল পাওয়া যাইবে। এস্থলে গোময়ের কার্য্যকরী তাপ প্রদায়িনী ক্ষমতার পুনরাবৃত্তি করা যাউক। মন্দ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে ১৲ টাকার গোময় জ্বালাইলে ২৫৬০০০ ভাগ কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায়, এবং ১৲ টাকার জ্বালানি কাষ্ঠ জ্বালাইলে ১৮৪০০০ ভাগ কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায়। অথবা ১৲ টাকার গইঠা জ্বালাইলে ১।৵০ আনা মূল্যে জ্বালানি কাষ্ঠের তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, ১৲ টাকার গোময় সাররূপে ব্যবহার করিলে ২॥০ টাকা মূল্যের অন্য সারের কার্য্য পাওয়া যায়। কাজেই গোময়ের সাররূপে ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক এবং ইন্ধনরূপে ব্যবহার না করিয়া ভূমির সাররূপে ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

বিক্রমপুরে বর্ষা

পাটের ক্ষেতে পাঁচ হাত পানি, পদ্মা এলো ঘাটে,
ঝাঁক্‌জমকে বর্ষারাণী আস্‌লো ঠমক্ ঠাঁটে।
কদম-রেণু মাখা তনু, খোঁপায় চাঁপা ফুল,
কণ্ঠভরা কুলু কুলু, ঝুম্‌কা কাণের দুল!
রূপার জালায় নদী-নালায় দিচ্ছে সলিল ঢেলে,
বনের ঝোঁপে, থোপে থোপে, জোনাক্ দিলে জ্বেলে!
এস এস বর্ষারাণী—"ভাদ্র"—ঘরের মেয়ে
আর্দ্র বেশে মুক্ত কেশে নূতন ডিঙি বেয়ে!

মাঠের মাঝে পুকুর রাজে—চার ধারে তার ধান,
মখ্‌মলেতে ছাওয়া যেন, শুভ্র মুকুর খান!
পাড়া-পড়্‌সী বড়্‌শী ফেলে সরসীর সে জলে,
ভেলায় চাপি' ভোলা "পুতি" "চাঁই" পাতিতে চলে!
গাবের গাছে বাঁধা আছে, হাট বাজারের তরী,
"পাছ-দুয়ারে" "কাইপ্‌লা"-মান্দার আছে আঁধার করি!
"পিট্‌খিরা" আর "ছিটুকি"-ঘেরা "ছিটাল" আশে পাশে
নৌকা, "চাড়ি" সারি সারি বাড়ীর কোণে ভাসে!

"পিড়ায়" বসে বিড়াল কাঁদে, "সরাল" ডাকে জলে,
বাড়ীর আব্রু আম্র-"বড়ৈ"-হিজল গলা জলে!
ঠন্‌ঠনে সে উঠান্ খানির খানিক জলে জাগে,
"নাথের" বাড়ীর ভাতের হাঁড়ী ভাসে "সোতের" রাগে,
বদ্ধ ঘরে সদ্যঃ নদী— মেঝের বাঁশের মাঁচা
নিমাই মুদী ঝিমায় 'বসে'—মানুষ পাখীর খাঁচা!
"বৌন্না" গাছের নোয়া ডালে, "বেথাইক্" বনের পাশে
বাঁশের সিঁড়ির সেতখানাটি আধেক জলে ভাসে!

"ছিদাম পাইনের" ভাঙ্গা নাও, গাবের গুণে "ন'য়া",
সৃষ্টিছাড়া "কিস্তি" খানি—ইষ্টিমারের "বয়া",
হোগ্‌লা পাতার "বাদাম" তুলে,' ঝিলের 'হাতাইল' দিয়া
ছিদাম্ মাঝি যাচ্ছে অই—ঝি-"নাইওরি" নিয়া!
ধানের ক্ষেতে, ধীরে ধীরে যাচ্ছে "ধুরি" বেয়ে,
"বঁধু যদি হাপন্ হৈত"—মধুর সুরে গেয়ে!
মাঝে মাঝে মেঘ আওয়াজে, গর্জ্জে ছিদাম্ পাইন—
"শোন্‌ছনি রে মিঞা ভাই—যার যার—ডাইন্"

গোহাল ঘরে গোরুগুলি গোবর গায়ে খাড়া,
গাম্‌লা-মাঝে মুখটি গুঁজে, "গুজ" দিতেছে নাড়া;
বেড়ার কাছে বাঁধা আছে, পাট-পেকাটির আটি,
বর্ষাকালের ভর্সা সে যে—ভিজে আধার মাটি!
ঘরের কোণে ডালিম গাছ, টুক্‌টুকে ফুল ডালে—
হিঁদুর বাড়ীর কনে বউ, সিদুর টুকু ভালে!
সন্ধ্যা হ'লে ঝিঙ্গে-লতা হলুদে ফুলে সাজে,
চুল বেঁধে সে কুল বধূ—ঘোম্‌টা টানে লাজে!

"পোলাপানে" খোলা প্রাণে, ডাক্‌ছে গলা বেঁধে—
"পানি কাউর!" আমার লাইগা এউক্কা ডুব্ দে!
শ্যাম সাগরে—ঢেউ উঠেছে, আউস ধানের ক্ষেতে,
"দলপিপি" আর বক বসেছে, "দামের" আসন পেতে!
কাতর প্রাণের কতই কথা—চাতক পাখীর ডাকে—
আঁখির পাতা আপনি ভেজে—মনে পড়্‌ছে কা'কে!
মুহু-মুহু ডাক্‌ছে ঘুঘু—হুহু করে প্রাণ,—
ক্ষণে ক্ষণে পল্লী-বনে—ঝিল্লী ধরে তান্!

সহরের সে ঘণ্টা ঘড়ির "খপর" কেবা রাখে!
"কোড়াল"-কণ্ঠে 'প্রহর' বাজে, প্রভাত জানায় কাকে!
"বলাস" আছে পলাশ গাছে, রাত্রে বাজায় হোরা,
দণ্ডপলের গণ্ডগোলের ভয় কি রাখি মোরা!
ভোরের আগে মোরগ "বাগে" শিয়াল সন্ধ্যা হ'লে—
বিনা দামের গ্রামের ঘড়ি!—"অয়েল" নৈলেও চলে!

৮

কি-যেন এক মন্ত্র-বলে জাগ্‌লো সারা বিল্,
হাজার মাণিক উঠ্‌লো জলে' ঝিল্ মিলিয়ে ঝিল্!
পানার দলে পান্না প্রচুর, মুক্তা কচুর পাতে,
ভোরের বেলা হেমের মেলা, রূপার খেলা রাতে!
কল্‌মী, কমল, শৈবাল শ্যামল, "শাপ্‌লা" শাদা শাদা,
চকাচকি—ডাউক্ ডাহুকী, একই সুরে বাঁধা!
তরল জলে মরাল-দলে নাচ্‌ছে ঘুরি ঘুরি,
নীরে পশি' তারা শশী খেল্‌ছে লুকোচুরি!
সৌম্য সাঁঝে বিলের মাঝে, কে তুমি গো কবি?
কালো জলে, আলো জ্বেলে ফুটাও সোনার ছবি!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

প্রতি শোধ

(১)

মনোমত সম্পন্ন কৈবর্ত্ত যুবক। পিতার মৃত্যুতে সে আজ পাঁচখানি জেলে ডিঙ্গির অধিকারী হইয়াছে। জুলিয়ার উপর সত্য সত্যই তাহার নজর পড়িয়াছে দেখিয়া লোকে নানা গুজব রটাইতে লাগিল। পারুল-পুরে যাহারা মনোমতকে চিনিত তাহাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে জুলিয়ার জীবনের যবনিকাটা সরিয়া গেল, কারণ মনোমত ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞ লোক ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। কেহ কেহ কিন্তু বলিত জুলিয়া সাগরকেই ভালবাসে। সাগর ধরিয়া লইয়াছিল আলস্যই প্রেমিকের বিলাস-বিভব, এবং কর্ম্মে অপ্রীতি প্রেম প্রার্থনায় সিদ্ধি লাভের অব্যর্থ উপায়। তাই সে উদ্দেশ্যহীনের মত বিনা কাজেই সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতা এক মাত্র অকর্ম্মা পুত্রকে লইয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিত। সুতরাং মনোমতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার জয়ের আশা একান্ত দুরাশা বলিয়াই সকলে বুঝিয়া লইয়াছিল।

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি। তিতাস নদীর মোহানার কাছে মাছের 'জো' হইয়াছে তাই পারুলপুরের সমস্ত কৈবর্ত্ত জেলে ডিঙ্গিতে দশ দিনের উপযোগী খাদ্যাদি লইয়া ভাটী বাহিয়া চলিল। ডিঙ্গিগুলি একদল রাজহাঁসের মত পাখা ছড়াইয়া নদী-বক্ষ ছাইয়া ফেলিল।

এক একখানা ডিঙ্গি পঞ্চাশ হইতে সত্তর হাত লম্বা। পেছনের গলুইগুলি জলের প্রায় পাঁচ হাত উপরে, এক জন লোক গলুইর গোড়ায় বসিয়া ঝুলান পায়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সুদীর্ঘ হালটি চালাইতেছে, আর সম্মুখের গলুইগুলি সলিল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। নৌকার গর্ত্তগুলি আধল করা বাঁশের পাটাতনে ঢাকা। মাঝখানে সাড়ে তিন কি চার হাত যায়গা জুড়িয়া একটি একটি বাঁশের চটের ছই।

সরঞ্জামের মধ্যে জগৎবেড় জাল প্রকাণ্ড অজগর সর্পের মত লম্বালম্বি নৌকার এক ধারে পড়িয়া আছে। দুইটি কম্বিয়া জীর্ণ মলিন কাঁথা; রোলারের মত শক্ত দুটি দুটি কুমিল্লার চারখানার বালিশ। তেলে তেলে গায়ের ময়লায় উপরটাতেও একটা বেশ পুরু আস্তরণ পড়িয়াছে—নখ দিয়া আঁচড়াইলে খড়ি ওঠে।

আঠার ইঞ্চি লম্বা একটি 'বন' বাঁশের চোঙ্গ—মাঝ-খানে একটা গাঁট, উপরের দিকটা খোলা, ভিতরে তামাক থাকে, এবং সেই খোলা মুখটা কাল নেকড়ার সিপিতে আঁটা। গাঁটের নীচে একটি ত্রিকোণ ছিদ্র—ভিতরে 'গুল' বা 'টিকা'। ছিদ্রটি এরূপ কৌশলে কাটা যেন ঢালিলে একটির বেশী 'টিকা' বাহির হইয়া না আসে। উপরের খোলা মুখটার একটু নীচে একটি ছোট ছিদ্র, এক প্রান্তে গিড়ো দেওয়া একটি সরু দড়ি সেই ছিদ্রটিতে আটকান, অপর প্রান্তে সূক্ষ্মাগ্র একটি বাঁশের কাঠি বাঁধা। জেলেরা এই কাঠি ছইএর বাখাড়িতে

গুঁজিয়া রাখে ও চোঙটি ঝুলিয়া থাকে। তা ছাড়া প্রত্যেক নৌকায়ই আছে গুটিদুই এনামেলের বাসন, একটি ঘটি ও একটি বাটি, একটি হাঁড়ি-ভাঙ্গা চুলা ও কিছু পাটখড়ি।

মনোমত সাধারণ জেলে ডিঙ্গিতে গেল না—একখানা লাল ডিঙ্গি সাজাইয়া চলিল; আর জুলিয়া তীরে দাঁড়াইয়া চন্দ্রধরের মত অনুচর বেষ্টিত মনোমতের নদী-যাত্রা একটু যেন বিশেষ উৎসাহের সহিত দেখিয়া লইল।

সকলেই কানাকানি করিতে লাগিল মনোমত ফিরিয়া আসিলেই জুলিয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

(২)

সাগরের বুদ্ধি আদৌ তীক্ষ্ণ ছিল না, এবং সে অন্যের ব্যাপার লইয়া আন্দোলনও করিত না। বিশেষতঃ জুলিয়াকে লইয়া যে কানাঘুষা হইতেছিল ইহাতে মনোমতের সংস্রব আছে বলিয়া সে এক্ষেত্রে কোনও কথাই বলিত না, শুধু সাবধানে সকল কথা শুনিয়া যাইত। কেবল মনোমত এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না এই একটা আকুল উৎকণ্ঠায় তাহার চিত্ত বেদনাময় হইয়া উঠিতে লাগিল।

পারুলপুরের ঘাটটি বড় সুন্দর। প্রায় তিন হাত যায়গা তীরে তীরে ঢালু হইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে রোজ সকালে জেলেদের ডিঙ্গি লাগে, মেয়েরা স্নান করে, কাপড় কাচে, কলসী কাকে করিয়া জল তুলিয়া নেয়। ঢালু স্থানে বিস্তর হাঁড়ি ভাঙ্গা পড়িয়া আছে—খালি পায়ে চলিলে বেশ লাগে। দুই একটা নৌকা ডাঙ্গায় তোলা, দুই একটা তীরের নিকট অগভীর জলে অর্দ্ধমগ্ন। পরিষ্কার জায়গায় জেলেরা চূড়ায় একটা বাঁশ বাঁধিয়া ও আড়াআড়ি ভাবে একটা বাঁশের দুই প্রান্ত আটকাইয়া রৌদ্রে "কনুই জাল" শুকাইতে দেয়—আবার কখনও নদীর কূলে বহু দূর ব্যাপিয়া বেড়জালগুলি বাঁধা বাঁশের উপর কাপড়ের মত ছড়াইয়া দিয়া থাকে। দরিদ্র জেলের ছোট ছোট চালা ঘরে তীরভূমি আকীর্ণ। শীত কালে চটের উপর রৌদ্রে ছড়ান নানাবিধ শুঁকটি মাছের পচা গন্ধ বহু দূরে ছড়াইয়া পড়ে। মাঠের ওপারে তরুশ্রেণীগুলি ঘন কালির রেখার মত দেখা যায়।

অদূরে একটি ধনীর প্রাসাদ বহু উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া চালা ঘরগুলিকে যেন উপহাস করিতেছে। পাকা অঙ্গন হইতে পঞ্চাশ হাত লম্বা প্রায় পঞ্চাশটা সিঁড়ি নদীতে নামিয়া আসিয়াছে! বহু দূর পর্য্যন্ত নদীর তীর পাকা, যেন ভাঙ্গিতে না পারে। দোতালা বাড়ীখানার দক্ষিণদিকেই নদী ও সদর দরজা; পশ্চিমদিকে দোতালার উপরে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটি বেশ বড় খোলা বৈঠকখানা বড় বড় থামের উপর বড় সুন্দর দেখায়। বর্ষা কালে সিঁড়িগুলি সমস্ত জলে ডুবিয়া যায় এবং পশ্চিম দিকেও থামের গোড়ায় জল আসে। ধপ্ ধপে সাদা প্রকাণ্ড বাড়ী বহু দূর হইতে নদীযাত্রীগণের চক্ষুগোচর হইয়া তাহাদের প্রাণে অজ্ঞাতসারে একটা আকুল হাহাকার জাগাইয়া দেয়।

অনুরাগময় অরুণোদয়ে, খর মধ্যাহ্নে ও শান্ত সন্ধ্যায় সাগর প্রতিদিন এই ঘাটে ব্যাকুলচিত্তে বসিয়া থাকিত। চিত্রিত গলুই নৌকাগুলি পাখা ছড়াইয়া কি জানি কখন ফিরিয়া আসে! বসিয়া বসিয়া অনেক সময় সাগরের চক্ষু ভাঙ্গিয়া যাইত—দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিত।

এক দিন অপরাহ্নে সূর্য্যের কিরণ মন্দ হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে সে প্রথমে দূর নদীতে একখানি নৌকার পাল দেখিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে নৌকাঘাটে অনেক স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হইল। কিন্তু সেখানে সাগর জুলিয়াকে দেখিতে পাইল না; মনে মনে ভারি খুসি হইল। তখনই উৎসাহের একটা উজ্জ্বল আভা তাহার নয়ন কোণে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

মনোমত বুকভরা আশা লইয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু কি একটা আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী খুঁজিয়া

না পাইয়া তাহার মনটা বড় দমিয়া গেল। সাগরের সম্মুখীন হওয়া মাত্র সে বলিল,

"কেমন, বেশ মাছ মারা গেল ?"

"মন্দ নয়।"

"আমার সঙ্গে তোমার একটা কথা আছে। তোমার কাছে আমার একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা আছে।"

"অনুগ্রহ দেখাবার সুযোগ ত চলিয়া গিয়াছে, এখন তুমি কি অনুগ্রহ চাও ?"

এই তীব্র বিদ্রূপটা সাগরের মনে বড় লাগিল।

"অনুগ্রহ আমি চাই না। জুলিয়াকে তোমার ক্ষমা করিতে হইবে।"

জুলিয়ার নামে মনোমত আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,

"জুলিয়া! কেন, সে কি করিয়াছে ?"

"তবে শোন ; আমি কিছুই গোপন করিব না ; আমি তাকে ভালবাসি, সুতরাং তার অনিষ্টের আশঙ্কায় আমার ভয় হইতেছে। বিশেষ না ভাবিয়া তার অনিষ্ট করিয়া পাছে অনুতাপ কর, তাই তোমাকে সব কথা বলিতে যাইতেছি। ফিরোজপুরের তুলারাম দাস জুলিয়ার দূর সম্পর্কিত মামা। সে আজ সাত দিন সেই তুলারামের বাড়ীতে। সেখানে শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে।"

সাগর এই বলিয়া সরিয়া গেল। মনোমত কলা-গাছের মত নিশ্চল ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, পরে দ্রুতপদে জনতা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

নদী-তীর হইতে বরাবর জুলিয়ার কুটীরদ্বারে আসিয়া মনোমত দেখিল এক বৃদ্ধা শয্যায় পড়িয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতেছে, এবং এক প্রতিবেশিনী রন্ধন করিতেছে, জুলিয়া গৃহে নাই।

সেখান হইতে সে বাড়ীতে গেল। তাহার বাড়ী গ্রামের অপর প্রান্তে। তাহার একটা দো-নালা বন্দুক ছিল। দুই পুরুষ যাবৎ সরকার বাহাদুর দয়া করিয়া এই বন্দুকের পাশ দিয়া আসিতেছেন ; শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই প্রাচীরের গায়ে লম্বিত সেই ভরা বন্দুকটা নামাইয়া লইয়া আবার মুক্ত বায়ুতে বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রামের বাহিরে ক্ষুদ্র প্রান্তর পার হইয়া নিবিড় অন্ধকারে মনোমত ফিরোজপুর অভিমুখে চলিয়াছে। তাহার চিন্তাপীড়িত মলিন বদনে পুঞ্জীভূত নক্ষত্রের জ্যোতিঃ পড়িয়া যেন ম্লান হইয়া যাইতেছে। শুধু রক্ত-পাত ও হত্যার চিন্তা এক হইয়া তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল প্রতিদ্বন্দ্বীর রক্তেই তাহার প্রেম-যজ্ঞের আহুতি হইবে। প্রতি-হিংসাই এখন তাহার সাধন মন্ত্র। হঠাৎ আকাশ হইতে মেঘের আবরণ সরিয়া গেল। পট অপ-সারিত হইলে রঙ্গমঞ্চ যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, চাঁদের আলোকে সমস্ত ভূভাগটা হঠাৎ তাহার সম্মুখে তেমনই আলোকদীপ্ত হইয়া গেল। সে তখন তুলারামের বাগান বাড়ীর সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পশ্চাতে গম্ভীর অন্ধকারে গ্রামের প্রান্তভাগ শান্তিতে ঘুমাইতে ছিল।

বাগানের দেয়াল কম পক্ষে সাড়ে চার হাত উঁচু। দেয়ালের লাগা একটা গাছ বাহিয়া অতি কষ্টে দেয়ালের মাথায় প্রথমে বন্দুকটি রাখিয়া পরে সে প্রাচীরে উঠিল, এবং অতি সন্তর্পণে একটা ডাল ধরিয়া বাগানে নামিয়া পড়িল।

বাগান বাড়ীর এই পাশে কোনও খিড়কির পথেই একটি দীপের ক্ষীণ রেখাও দেখা যাইতে ছিল না। কিন্তু অতি সাবধানে চাহিলে দেখা যায় নিম্নতলের খিড়কির একটি খড়খড়ি খোলা আছে। সেই আলোক রেখা লক্ষ্য করিয়া সে নিঃশব্দে সেই খড়খড়ির নীচে আসিল এবং কোনও প্রকারে হাটু গাড়িয়া বসিল। পরে অতি

সাবধানে মাথা উঠাইতে লাগিল এবং উঁকি মারিয়া প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরটা এক বার দেখিয়া লইল। দেখিল দুইটি মনুষ্য মূর্ত্তি নীরবে বসিয়া আছে। দেখিয়া নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, চমকিত হইয়া ঘাসের উপর আবার বসিয়া পড়িল। তাহার হস্ত তখন শিথিল। বন্দুকটি তুলিয়া লওয়ার সামর্থ্যও যেন তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রতিহিংসা-বৃত্তির দৃঢ়তা তাহার হৃদয়কে বলীয়ান করিয়া তুলিল। তখন সে দৃঢ় মুষ্টিতে বন্দুকটি ধরিয়া স্থির ও সংযত চিত্তে বন্দুকের ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে টানিয়া ধরিল। পরে ঘোড়াটার দিকে এক বার স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল এবং ধীরে ধীরে বন্দুকটি খড়খড়ির পথের দিকে তুলিয়া ধরিয়া আর এক বার উঁকি মারিয়া প্রকোষ্ঠের ভিতরটা দেখিয়া লইল।

এক প্রান্তে দুটি মনুষ্য মূর্ত্তি—পশ্চাতে তরল অন্ধকার কিন্তু ক্ষীণ দীপালোকে তাহাদের মুখ দুটি পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। হাস্যময় দুটি মুখই ফোটা ফুলের মত সুন্দর। ইহাদের মধ্যে এক জন পুরুষ অপরটি যুবতী এবং মনোমত দেখিল সেই যুবতী তাহার প্রেম-স্বপ্নের কুহকিনী—জুলিয়া!

তখন একটু একটু জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। জানালার পাশে প্রথমতঃ একটা খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল, অস্পষ্ঠ জ্যোৎস্নায় বন্দুকের নল চক্‌মক্ করিয়া উঠিল এবং তৎপরেই একটা গুরুম্ গুরুম্ শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মনুষ্যের কৃষ্ণ ছায়াও তীর বেগে ঘাসে ঢাকা একখণ্ড জমির উপর দিয়া নিঃশব্দে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মনোমত রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল এবং প্রতি পদ-ক্ষেপেই যেন সে কোনও অনুসরণকারীর পদ শব্দ শুনিতেছিল। চতুর্দ্দিক নীরব। তুলারামের বাড়ীর সম্মুখীন হইয়া অবসন্ন মনে সদর রাস্তার পার্শ্বে সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গ শিথিল; পা দুটি শক্তিহীন; কিন্তু হত্যাপরাধের অভ্রান্ত নিদর্শন বন্দুকটি তখনও তাহার হস্তে।

মনোমত এখন হত্যাপরাধী! কিন্তু এই ভাবনায়ও সে এখন শান্তি পাইতেছে। সে প্রতিশোধ লইয়াছে। যদি জুলিয়াই অবিশ্বাসিনী হইল তবে তাহার জীবন ধারণে আর ফল কি?

(৪)

সম্মুখে কতগুলি ঘন-পল্লব বকুল গাছ। বকুল গাছের তলে পথ। পথে জ্যোৎস্নার আলো ও পাতার ছায়ার মিলন স্থানে দৃষ্টি পাত করিয়া মনোমত যন্ত্রপুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহ যষ্টিবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ। সম্মুখে একটি রমণী-মূর্ত্তি ধীর পদবিক্ষেপে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে!

সে ক্ষীণ অন্ধকারে একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে তাকাইতে লাগিল এবং সেই ছায়ামূর্ত্তিটাও ক্রমশঃ জুলিয়ার সত্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। পরিশেষে নিশার নীরবতা ভেদ করিয়া একটা সুস্পষ্ট স্বরলহরী মনোমতের কর্ণে প্রবেশ করিল—"মনোমত, তুমি এখানে?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সে শিহরিয়া উঠিল এবং বন্দুকটা হস্তভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তখনই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"তুমি কি স্বপ্ন, না সত্য জুলিয়া!"

"হাঁ, আমি সত্যই জুলিয়া। কেন, তুমি কি আমার গলার স্বরও চিনিতে পার না? তুমি এমন সময় এখানে কেন?"

জুলিয়ার স্বর স্নিগ্ধ, আবেগ-রহিত, কোমল ও প্রেম-পরিপূর্ণ ছিল।

সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এক হাতে স্বীয় স্পন্দিত গণ্ড স্পর্শ করিয়া ও অপর হাত জুলিয়ার দিকে বাড়াইয়া মনোমত বলিতে লাগিল—

"শুনিলাম আজ সাত দিন তুমি তুলারামের বাড়ীতে আছ, এবং তোমার বিবাহ। যে আমার সুখের প্রেম-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে

উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, তুমি এক জন যুবকের সম্মুখে এক রাশি জোছনার হাসি লইয়া বসিয়া আছ। দেখিয়া আমার চিত্ত ক্রোধ ও ঈর্ষ্যার বিষে ছাইয়া গেল। একে একে তোমাদের দুই জনের উপরই গুলি চালাইলাম। তোমরা অন্ধকারে মিশিয়া গেলে; আমিও পলাইলাম—কিন্তু প্রাণপণে ছুটিয়াও আর দূরে যাইতে পারি নাই। তারপর তোমার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি—এখনও বিশ্বাস হইতেছে না, তুমি সত্য—কি মায়া।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

"তোমার দুষ্কর্ম্মের ফলে এক সপ্তাহের পরিশ্রম মাটী হইল।"

"তুমি কি বলিতেছ?—কার পরিশ্রম—কিসের পরিশ্রম!"

মনোমতের স্বর ক্রমশঃই কর্কশ হইয়া উঠিতেছিল।

"ঈর্ষ্যায় পাগল হইয়া তুমি একেবারে অন্ধ হইয়াছ! তুলারাম মামার শালা মাটীর মূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার একটি মূর্ত্তি গড়িতে চান—মামা তাই আমাকে তাহার বাড়ীতে আনাইয়াছেন। কাল সন্ধ্যায় এই মূর্ত্তিটা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন—আগে এই গত পূজার সময় তিনি আর একটা পুরুষ মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইটা সুন্দর মূর্ত্তিই তুমি নাশ করিয়াছ!"

মনোমত হাঁফ ছাড়িয়া যেন একটা গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে বাঁচিল—তার হৃদয়টা হালকা হইল। সে স্থির দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—"জুলিয়া, আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য সাগরই সম্পূর্ণ দায়ী, কারণ সে-ই তোমার সম্বন্ধে আমার মনে একটা মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।"

কথা শুনিয়া জুলিয়ার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মনোমত ফিরিয়া দেখিল অদূরে সাগর দাঁড়াইয়া আছে। অমনি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত তাহাকে আক্রমণ করিল। সাগর যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিয়া বলিল—"মনোমত, আমার দুরভিসন্ধি নাই। আমি তোমাকে সব কথা সত্য ভাবিয়াই বলিয়াছি—উদ্দেশ্য জুলিয়ার প্রাণ রক্ষা। তোমার হাতের বন্দুকটা এক বার বেশ করিয়াদেখ দেখি?"

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা কানে না তুলিয়া সে পুনরায় আক্রমণের প্রয়াস করিতে লাগিল। সাগর ক্রমশঃই ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছিল—এখন শ্বাস কষ্টে রুদ্ধবাক হইয়া করুণ দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমিই বন্দুকটা তুলিয়া মনোমতকে টোটাগুলির অবস্থা দেখাও, জুলিয়া।"

"এই কথা শুনিয়া মনোমত সাগরকে ছাড়িয়া দিল এবং বন্দুকটা তুলিয়া লইল। টোটাগুলিও খুলিয়া লইয়া দেখিল। সে দু'টাই ত ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছে! তখন সে এক বার সাগরের দিকে চাহিল। জুলিয়াও উভয়কেই বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল।"

এই দৃষ্টিতে যেন কত কালের তাহার কি একটা প্রচ্ছন্ন কাহিনী আর এক বার সজীব ও সজাগ হইয়া মুহূর্ত্তেই পুনরায় বিস্মৃতির স্তরে আবৃত হইয়া গেল।

এই ঘটনার পরে পারুলপুরে সাগরকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ধামরাই গ্রামস্থ যশোমাধবের

ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

আজকাল ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে চারিদিকেই অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যতদূর উদ্যম ও চেষ্টা চলিতেছে, উত্তরাংশে ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য তাহার শতাংশের একাংশ চেষ্টাও করা হয় নাই। এরূপ না হইবার কতকগুলি কারণ আছে; প্রথমতঃ, ভাওয়াল প্রভৃতি অরণ্যসমাকুল স্থানে যে ঐতিহাসিকের অনুসন্ধেয় অনেক বিষয় আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, বিক্রমপুরের তুলনায় ঢাকা জেলার উত্তরাংশ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—এইজন্য এই সমস্ত কার্য্যে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত লোকের তথায় সম্পূর্ণ অভাব। তৃতীয়তঃ, ভাওয়াল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দুর্গম হওয়ায় তথায় অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে পর্য্যটন অত্যন্ত দুরূহ। আমি এই প্রবন্ধে ভাওয়ালের অন্তঃ ও প্রান্তবর্ত্তী কতকগুলি ঐতিহাসিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। যদি অতঃপর কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়, তবেই নিজের সামান্য উদ্যম সার্থক বিবেচনা করিব।

ভাওয়ালের অন্তঃস্থ ও প্রান্তস্থ স্থান সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই ভৌগোলিক ও ভূতত্ব সম্বন্ধীয় অবস্থার পরিচয় দিতে হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে ভাওয়াল মধুপুর জঙ্গলের দক্ষিণাংশ মাত্র। ইহার সীমা দক্ষিণে প্রায় ঢাকানগরী, উত্তরে মধুপুরের গড় এবং পূর্ব্বে লক্ষানদী। পশ্চিমে ধলেশ্বরীর বালুকাময় অববাহিকা (Basin)। ভাওয়ালের অধিকাংশ স্থলই পূর্ব্বে শাল ও গজারী বৃক্ষে সমাকীর্ণ ছিল—এক্ষণে প্রায় অধিকাংশ স্থল পরিষ্কৃত হইয়া আবাস যোগ্য হইতেছে। ঢাকা জেলার অন্যান্য অংশের মৃত্তিকা দো আঁশলা (Alluvial), কিন্তু ভাওয়ালের মৃত্তিকা ঘোর রক্তবর্ণ, বাধা এঁটেল। ঢাকা জেলার অন্যান্য অংশের তুলনায় ভাওয়াল বেশ উচ্চ, বর্ষার জলে ইহার কোন অংশ প্লাবিত হয় না।

আমি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিষয়ের পরিচয় দিতেছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল।

(১) বরইবাড়ীর যশঃপাল বা যশোবন্ত পাল রাজার প্রাচীন বাটীর ভগ্নাবশেষ।

(২) সাভারের হরিশ্চন্দ্র পাল রাজার বাটীর ভগ্নাবশেষ। সাভার ভাওয়ালের পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত।

(৩) ধামরাইএর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ যশোমাধবের বিবরণ।

ধামরাই গ্রাম বা নগর খাঁটি ভাওয়ালের প্রান্তদেশ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। কিন্তু যশোমাধব বিগ্রহ যে স্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ, সে স্থান (মাধবচালা) ভাওয়ালের অন্তর্গত।

(৪) আরও কতকগুলি প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করা যাইবে। এ ধ্বংসাবশেষ আমি নিজে পর্য্যবেক্ষণ করি নাই বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিতে পরিলাম না।

বরইবাড়ী যশোবন্ত পাল রাজার বাটীর ভগ্নাবশেষ। এই স্থান সাভার থানার অন্তঃপাতী এবং সাভার হইতে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমারেখায় অবস্থিত। এই স্থানের নিম্নে তুরাগ নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপর ইহা অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে অর্দ্ধমাইল এরূপ উন্নত ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া এই ধ্বংস অবস্থিত। অল্পদিন হইল

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কয়েক ঘর মুসলমান আসিয়া এইস্থান আবাদ করতঃ বাস করিতেছে।

এস্থানে চারিটি ছোট বড় পুষ্করিণী আছে। একটি পুষ্করিণী এক বৃহৎ গর্ত্ত বিশেষ। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় এক শত হাত, এবং গভীরতাও প্রায় ১৫ হাত হইবে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই স্থানে রাজার হস্তীকে স্নান করান হইত।

আর দুইটী পুষ্করিণী অত্যন্ত বৃহদাকার। প্রথমটির নাম ঢোলসমুদ্র, দ্বিতীয়টির নাম কোটামণি। ঢোল সমুদ্র দৈর্ঘ্যে অনুমান ৫০০।৬০০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ৩০০ হাত হইবে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঢোলসমুদ্র অত্যন্ত গভীর। স্থানীয় অধিবাসিগণ বলে যে চৈত্র মাসের প্রথম রৌদ্রেও দীর্ঘ বাঁশ দিয়াও উহার তলা পাওয়া যায় না। ঢোল সমুদ্র নাম সম্বন্ধেও বেশ প্রবাদ আছে। ঢোলসমুদ্র দীঘি যখন খনন করা হয় তখন রাজা উহার গভীরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ঢুলীদিগকে তলে নামাইয়া দেন। তাহারা খুব জোরে ঢোল বাজাইতে থাকে—কিন্তু দীঘি এত গভীর হইয়াছিল যে উপরের লোকে ঢোলের শব্দ একেবারেই শুনিতে পায় না। এই জন্য রাজার আজ্ঞানুসারে পুষ্করিণীর নাম হইল ঢোলসমুদ্র। পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্ব আজকাল জঙ্গলময় এবং বক্ষোদেশ নানা আগাছায় পরিপূর্ণ। জল অপেয়।

দ্বিতীয় পুষ্করিণীর নাম কোটামণি। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বে রাজবাটীর বৃহৎ ভগ্নাবশেষ। এই পুষ্করিণীটি ঢোলসমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পশ্চিমদিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে কূপ খনন করিয়াছে। তাহারা বলে যে, এই কূপ খনন করিতে তাহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। কারণ ভূমিপৃষ্ঠ হইতে নীচে প্রায় ৭।৮ হস্ত পরিমিত স্থান কেবল ইষ্টকময়। কূপের চারিপার্শ্বে কেবল ইষ্টকে সমাকীর্ণ।

এই পুষ্করিণীর পশ্চিমপার্শ্বে অনেকটা স্থান ইষ্টকে সমাকীর্ণ। লোকে বলে এইস্থানে রাজার বাটী ছিল। কিন্তু ইষ্টক রাশি ছাড়া রাজবাটীর সংস্থান সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার আর কিছুই নাই। মধ্যস্থলে একটী ভগ্নস্তূপ আছে। উহার ব্যাস প্রায় ১০।১২ হাত হইবে।

ইষ্টকগুলি অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকার। মধ্যে মধ্যে বর্গক্ষেত্রাকার (square) ইষ্টকও পাওয়া যায়। কতকগুলি ইষ্টকের কোণগুলি অস্ত্রপ্রয়োগে গোল করান হইয়াছে।

এই স্থানের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, এস্থানে যে দুই চারি ঘর লোক আছে, তাহারা এই ভগ্ন বাটী হইতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা এবং ধনরত্ন ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য? তাহা অস্বীকার করে। কিন্তু তাহারা বলে যে, ইষ্টকরাশির মধ্য হইতে অনেক সময় খোদিত ইষ্টক ও মূর্ত্তি পাওয়া যায়। আমি চেষ্টা করিয়া একখণ্ড ভগ্ন-ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদে প্রেরণ করিয়াছি। সম্ভবতঃ এই স্থান খনন করিলে আরও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি সংগৃহীত হইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জমিদার এই স্থান হইতে অনেক ইট নিজবাড়ীতে লইয়া যান। এ ঘটনার পরেই তাঁহার বিষম পীড়া উপস্থিত হয়। প্রবাদ তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হন্ যে ঐ স্থানের ইষ্টক নেওয়াতেই দেবতার কোপে তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎপর তিনি সেই সমস্ত ইষ্টক পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসেন। এই প্রবাদ সত্য কি না তাহা বলিতে পারি না।

বাটীর অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। লোকের বিশ্বাস উহা অন্দরবাটীর পুষ্করিণী।

এই ভগ্ন বাড়ীটির অবস্থান দেখিলে মনে হয় যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য কোনও রাজা কর্ত্তৃক এই নিভৃত প্রদেশে এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। জনপ্রবাদ অনুসারে এই স্থানে যশোবন্ত

পাল নামে কোনও হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। ধামরাই নগরীর সুপ্রসিদ্ধ মাধব বিগ্রহ তাঁহারই গৃহ দেবতা ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বলা যাইতেছে।

ধামরাই গ্রাম ঢাকা নগরী হইতে প্রায় বিশ মাইল উত্তরে বংশী নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। এই নদীর পূর্ব্বপার হইতে ভাওয়ালের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। ধামরাইকে গ্রাম না বলিয়া নগর বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়, কারণ অনেক সহর হইতেও ইহার লোক সংখ্যা অধিক। এই নগরে অনুসন্ধেয় অনেক জিনিষ আছে—কিন্তু যশোমাধব বিগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। মূর্ত্তিটি দারুময়, নিমকাষ্ঠে নির্ম্মিত। প্রতি বৎসর রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, মাঘীপূর্ণিমা, উত্থানৈকাদশী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে ঢাকা জেলার প্রায় সমস্ত স্থান হইতে ধামরাইতে বহুলোকের সমাগম হয়। পুনর্যাত্রা উপলক্ষে এখানে এক বৃহৎ মেলা হয়, এবং তদুপলক্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ৪০।৫০ সহস্র লোকের সমাগম হয়। রথযাত্রার দিন মাধবকে বৃহৎ কাষ্ঠময় রথে আরোহণ করাইয়া গুণ্ডিচা বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং পুনর্যাত্রার দিন আবার গুণ্ডিচা বাড়ী হইতে রথারোহণে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করান হয়। মাধবের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য অনেক কাল্পনিক গল্প রচিত হইয়াছে—এতৎসঙ্গে প্রদত্ত মাধবেরর বিবরণ পাঠে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইবে। এই সমস্ত গল্পের স্থুল তাৎপর্য্য এই যে পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট থাকে, তাহা দিয়া বিশ্বকর্ম্মা মাধবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে মাধব পুরীতে ছিলেন, পরে কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যের সময় পালাইয়া আসিয়া ধামরাইএর নিকটে মাধবচালা নামক স্থানে ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকেন। এই সময়ে রাজা যশোবন্ত পাল বা যশঃপাল রাজা ঢাকার উত্তর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। একদা তিনি শিকারোপলক্ষে মাধবচালার উপর দিয়া যাইতেছিলেন (অবশ্য তখন মাধবচালা জঙ্গলময় ছিল)। কিন্তু হঠাৎ এক টেকের সম্মুখে আসিয়া হস্তী থমকিয়া দাড়াইল। মাহুত শত আঘাত করিয়াও হস্তীকে এক পদ অগ্রসর করাইতে পারিল না। হস্তী বারম্বার শুণ্ড দিয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া কপালে স্পর্শ করাইতে লাগিল। হস্তীর অদ্ভুত ব্যবহারে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজা ঐ স্থান খনন করাইতে আদেশ দিলেন। খনন করিবার পর ঐ স্থান হইতে এক মন্দির বাহির হইয়া পড়িল। রাজা দেখিলেন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। শত চেষ্টা করিয়াও দ্বার খুলিতে পারিলেন না। অবশেষে মন্দিরের সম্মুখে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে স্বপ্নে আদেশ হইল—"তুই যদি আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাস্, তবে তোর পার্থিব সম্পদ্ কিছুই থাকিবে না। ধন, জন, রাজ্য, বংশ সবই বিনষ্ট হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমি পার্থিব সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নহি, পারলৌকিক সম্পদ্‌ই আমার অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তখন রাজার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া মাধব সে স্থান হইতে আপনাকে উত্তোলন করিবার আদেশ দেন্। তখন রাজা মাধব বিগ্রহ নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিছুকাল পরে রাজা ধন জন সহ সবংশে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশালপুরী ধ্বংস হইতে লাগিল। মাধবের সেবক পুরোহিত বংশ মাত্র মাধবের পূজার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিল। কিন্তু মাধব রাজা যশোবন্ত পালের অচলা ভক্তিতে প্রীত হইয়া ইহলোকে তাহার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য যশঃপালের আরাধ্য মাধব বা যশোমাধব উপাধি গ্রহণ করিলেন।

যাহা হউক মাধবকে শূন্য পুরীতে আর বেশী দিন অবস্থান করিতে হইল না। ধামরাইর পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চাশ নামক পল্লীতে রামজীবন রায় মৌলিক নামক এক জন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মাধবকে উঠাইয়া নিয়া নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি মাধব যশোমাধব নামে ধামরাইতে বাস করিতেছেন।

এই গেল মাধবের প্রচলিত বিবরণ। শ্রীযুক্ত

বীরেশ্বর ভৌমিক নামক আমাদের অঞ্চলের এক জন ভদ্রলোক মাধবের প্রাচীন কথা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া একখানা ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত কথা বিবৃত হইল। তাঁহার মতে মাধব বঙ্গ বা বিহারের পালবংশের কোনও বিশিষ্ট শাখার গৃহবিগ্রহ ছিল। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পালরাজ্য বিনষ্ট হইলে এই বংশের কোনও রাজকুমার পলায়ন করতঃ গৃহ দেবতা মাধবসহ ভাওয়ালের জঙ্গলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য করিতে থাকেন। পরে যশোবন্ত পালের সময় তাঁহার বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যায়। মাধব সেই জঙ্গলে বহু দিন অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। পরে স্থানীয় জনৈক জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ রায় জঙ্গল মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। সেই ব্রাহ্মণ পর্ব্বোপলক্ষে মাধবকে নিকটস্থ বংশী নদীতে স্নান করাইতেন—সেই জন্য উক্ত স্থানের নাম হইয়াছে তীর্থঘাটা। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা রামজীবন মৌলিককে যৌতুকস্বরূপ উক্ত মূর্ত্তি দান করেন। তদবধি উক্ত মূর্ত্তি মৌলিক বংশেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মৌলিক মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ১০৭৯ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৬৭৩) মাধব মূর্ত্তি তাঁহাদের হস্তগত হয়। †

এই দুইটি বিবরণের প্রথমটিতে যুক্তি অপেক্ষা ভক্তিরসাত্মক অলৌকিকত্বের, এবং দ্বিতীয়টিতে ঐতিহাসিক কাব্য রসের প্রভাব লক্ষিত হইবে। যাহাই হউক, মাধব-মূর্ত্তি যে অত্যন্ত পুরাতন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন যে, মাধব-মূর্ত্তি কেশব, নারায়ণ প্রভৃতি পুরাণোক্ত চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তির তৃতীয় মূর্ত্তি। মাধব মূর্ত্তিও এক প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি। পুরাণোক্ত বিষ্ণু মূর্ত্তির অঙ্গসংস্থানের সহিত মাধবের অঙ্গসংস্থান মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

যশোমাধবের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকটা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এক বার শুনিয়াছিলাম মাধবের পাদদেশস্থ এক খণ্ড প্রস্তরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে শ্রীশ্রী ৺ যশোমাধব নাম উৎকীর্ণ আছে—কিন্তু সামাজিক রীতিবশতঃ নিজে মন্দিরে যাইতে না পারিয়া অন্য লোক দিয়া এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাই নাই। রায়মৌলিক মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে হয়তঃ মাধবের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু তাহারা যে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া মাধবের মাহাত্ম্যসূচক গল্পটির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবেন এমত বোধ হয় না।

মাধবরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা একসময়ে ঢাকার উত্তরাংশে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমি অনুসন্ধান করিয়া লোকমুখে আরও ছয়খানা মাধব মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি। জয়দেবপুরের জমিদারগণের কোনও পূর্ব্বপুরুষ পুষ্করিণী খনন কালে এক মাধব-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহার নাম "নীলমাধব"। উহা এক্ষণে জয়দেবপুরের রাজবাটীতে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী সাকাসর নামক গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে এক প্রস্তরময় মাধব পাওয়া গিয়াছিল। উহার নাম হরিমাধব কি জটামাধব এইরূপ কিছু একটা হইবে। জনৈক ধর্ম্মান্ধ মোল্লা উহার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে। এইরূপে ভাওয়ালের নানা স্থানে মাণিকমাধব, জটামাধব, বেণীমাধব ইত্যাদি ছয়খানা মাধবমূর্ত্তি আছে বলিয়া অনেক অভিজ্ঞ বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি। মাধবের উপ-নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে জনপ্রবাদ একেবারে নিরুত্তর।

যশোমাধবের প্রকৃত ইতিহাস এখনও অনেকটা অনুমানের জিনিষ। মাধবের প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে হইলে প্রথমতঃ যশঃপাল রাজার ঐতিহাসিকত্ব আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। পূর্ব্ব অবচ্ছেদে (Para-

† এই প্রদত্ত অব্দটি অবধান যোগ্য। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহ আউরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন।

graph) দেখান গিয়াছে যে, মাধবরূপী বিষ্ণুপূজা এক সময় ঢাকার উত্তরাঞ্চলে বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু যশোবন্ত পালের সহিত ইতিহাস বিখ্যাত পালবংশীয় রাজগণের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহাই এক্ষণে প্রধানতঃ বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে ঢাকার উত্তরাঞ্চলের আর একটি ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। যাঁহারা কখনও সাভার গমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাভারের উত্তরাংশে নদী-তীরে লাল-মাটির এক উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া থাকিবেম। সাধারণ লোকে উহাকে হরিশ্চন্দ্র বা হবচন্দ্র রাজার 'কোটবাড়ী' বলিয়া থাকে। এই হরিশ্চন্দ্র রাজাও পালবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। হরিশ্চন্দ্র রাজার ভগ্নবাটীর বিবরণ নিজের ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ হইতে দেওয়া যাইতেছে।

'কোটবাড়ী' চতুষ্কোণ মৃণ্ময় প্রাচীর বেষ্টিত ভূমিখণ্ড মাত্র। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনুমান ৮০০×৫০০ হাত। প্রাচীর জমি হইতে ৮।১০ হাত উচ্চ এবং ৫।৬ হাত চওড়া। মধ্যস্থলে কতকগুলি তালগাছ ব্যতীত কিছুই নাই। এই মৃত্তিকাময় প্রাচীর দ্বারা রাজার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইত বলা দুষ্কর।

সাভার গ্রামের উত্তর ও পূর্ব্ব দিক পূর্ব্বে জঙ্গলময় ছিল। এই জঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালের বাটীর ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। আজকাল জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে আবাদযোগ্য হইতেছে। লোকের বিশ্বাস এই জঙ্গল মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ সাড়েবারগণ্ডা বা পঞ্চাশটি দীঘি আছে। 'কোটবাড়ী' হইতে পূর্ব্বদিকে গেলে অনেকগুলি দীঘি দৃষ্ট হয়ঃ—

১। সহু পলোয়ানের দীঘি।

২। গজারিয়ার দীঘি।

৩। নিরামিষ দীঘি—প্রবাদ হরিশ্চন্দ্র রাজার বৃদ্ধা মাতা অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী ও নিরামিষাশী ছিলেন। যে পুকুরের জলে মাছ আছে সে জল অশুদ্ধ ও অপেয় মনে করিয়া শুদ্ধ জলের জন্য নিরামিষ দীঘি খনন করান। সাধারণের বিশ্বাস—এখনও এ পুকুরে মাছ জন্মে না। দীঘিটি বেশ বড়, কিন্তু এখন প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে।

৪। কোদাল ধোয়া দীঘি বা কোদালিয়ার দীঘি।

'কোদাল ধোয়া' নামধেয় দীঘিগুলি সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত কিম্বদন্তী সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত—বনপুকুর, মরাপুকুর, সাতপুকুরিয়া, ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ দীঘি আছে।

এই সমস্ত পুকুরগুলি অতিক্রম করিয়া গেলে সমতল জমির উপর একটি কৃত্রিম লালমাটির ঢিপি দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে বুরুজ বলে। সাধারণতঃ সৈন্যদিগকে লক্ষ্যবেধ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেরূপ ঢিপি নির্ম্মিত হয় ইহাও সেই ধরণের। তবে নানাবিধ বন্য-বৃক্ষ জন্মিয়া উহার পার্শ্বদেশ দুরারোহ করিয়া তুলিয়াছে। এই বুরুজের উপর একটি লুপ্ত কূপ আছে। উহার মুখ ইষ্টকে বাঁধান।

উক্ত ঢিপি হইতে আরও কিছু পূর্ব্বে অগ্রসর হইলে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায়। রাস্তাটি মৃত্তিকা হইতে ২।৩ হাত উচ্চ এবং ৭।৮ হাত চওড়া। আদ্যোপান্ত ঘোর লালমাটীতে তৈয়ারী, সুরকিও বোধ হয় এত লাল হয় না। এই রাস্তাটি উত্তরে কতদূর গিয়াছে জানি না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এস্থানে ঘোর জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়ায় কয়েক বৎসর হইল এই অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অপরাংশ এখনও জঙ্গলে আবৃত।

এই রাস্তা দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রায় এক মাইল আসিলে একটি ক্ষুদ্র পল্লীপাওয়া যায়। পল্লীর নামটি অবধান যোগ্য—নাম 'রাজাসন'। রাস্তার পূর্ব্বদিক দিয়া ধারে ধারে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ চলিয়া গিয়াছে স্থানীয় লোকে উহাকে শুখা নদী বলে। 'রাজাসন' পল্লীতে রাস্তাটি এক সমকোণে আবর্ত্তন করিয়া ঠিক পশ্চিমদিকে সাভার অভিমুখে কতদূর চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার কিছু

দক্ষিণে একটি বৃহৎ দীঘি আছে নাম সাগরদীঘি। দীঘিটিতে ঘাটের চিহ্নাদি কিছুই লক্ষিত হয় না।

এই দীঘির পশ্চিম তীরে অনেকটা জায়গা ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ। এই স্থানেই রাজার প্রাসাদ ছিল। আজকাল বন্য আগাছা জন্মিয়া ইষ্টকস্তূপকে অত্যন্ত দুরারোহ করিয়া ফেলিয়াছে। খনিত না হইলে এখানে কি আছে বলা দুষ্কর।

প্রাচীন লোকদের মুখে শুনিয়াছি যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজবাটীর কতকাংশ দণ্ডায়মান ছিল এবং ইষ্টক স্তূপ আরও বহুদূর ব্যাপী ছিল। পরে সাভার গ্রামস্থ কতকগুলি লোক জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত ভগ্নবাটীর সন্ধান পাইয়া ইষ্টক স্তূপ খুঁড়িয়া বহু ধনরত্ন আত্মসাৎ করে। সাভারের অনেক ধনীগৃহে এখনও ঐ বাটিতে প্রাপ্ত মুদ্রাদি আছে। পরে ইষ্টকাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার অধিকাংশই স্থানীয় মুসলমানগণ সাগরদীঘি ও সুখানদী দিয়া ঢাকাতে চালান দিয়াছে। এখন মৃত্তিকা মধ্যে লুক্কায়িত দ্রব্যাদি ব্যতীত ধ্বংসাবশেষের অল্পাংশই অবশিষ্ট আছে।

সুখা নদীর পরপারে রাজবাটীর আরও কতকগুলি চিহ্ন আছে। সময়াভাব বশতঃ সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। গতবৎসর স্থানীয় কয়েকজন কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অনেকগুলি পুতুল ও ইষ্টক প্রাপ্ত হয়। সে গুলির কি গতি হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই।

এতদ্ব্যতীত ভাওয়াল অঞ্চলে আরও অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। নিজে দেখি নাই বলিয়া এসম্বন্ধে কোন বিবরণ দিতে পারিলাম না—কেবল নাম উল্লেখ মাত্র করিলাম—

(১) হাট ফুলবেড়িয়ার উত্তরে **কালিদাসের বাড়ী** ও দীঘি (ময়মনসিংহ জেলায়)।—এই কালিদাস কে স্পষ্ট জানা যায় না। অনুমান ইনি প্রসিদ্ধ ইশাখাঁর পিতা 'কালিদাস গজদানী' হইবেন।

(২) রাজেন্দ্র পুরের **চাঁড়াল রাজার** বাটী (আমি ইতিহাসের অনুরোধে স্থানীয় প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতেছি—আশা করি ইহাতে জাতিবিশেষ মনে করিয়া কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না।)

—এই 'রাজার' সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে—কতকটা সুন্দ-উপসুন্দ উপাখ্যানের মত। প্রবাদ আছে—ইহারা দুই ভ্রাতা একত্র রাজ্য করিতেন। নীচ বংশের মনে করিয়া ব্রাহ্মণাদি কেহই তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে তাঁহারা একদিন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে জোর করিয়া স্পৃষ্ট জল পান করাইতে প্রতিজ্ঞা করিল। তখন ব্রাহ্মণগণ এক কৌশল উদ্ভাবন করিল। তাঁহারা বলিলেন আপনাদের স্পৃষ্ট জল পান করিতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু আমরা প্রথমে যাঁহার হাতের জল পান করিব, তাঁহার বংশেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তখন দুই ভ্রাতাই প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে জল দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। এবং পরস্পর বিবাদ করিয়া নিহত হইল। ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইলেন।

ভাওয়ালের প্রাচীন ইতিহাস ও ধ্বংসাদি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই সমস্ত প্রবাদ ও ধ্বংসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই কয়েকটি অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

(১) বঙ্গের বা মগধের পালরাজ্য বিনষ্ট হইলে পালবংশের কোনও রাজকুমার ভাওয়ালের জঙ্গলে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক বরইবাড়ী ও সাভারের প্রাসাদগুলি নির্ম্মিত হয়। সম্ভবতঃ মাধবরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহাদেরই উপাস্য ছিল। সাভার ধামরাই প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীগুলি তাঁহাদেরই নির্ম্মিত। এখনও স্থানীয় প্রাচীন লোকগণ সাভারকে সম্ভার নগরী ও ধামরাইকে ধর্ম্মারণ্য বা ধর্ম্মরজ বলিয়া জানেন।

(২) এই পালবংশীয় রাজগণ পাঠানদের অধি-

কারের সময় ভাওয়ালের জঙ্গলে নির্ব্বিবাদে আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভাওয়ালে তখনও হিন্দুদের বসতি হয় নাই। আদিম অধিবাসীগণ, এবং কোচ,বংশী প্রভৃতি নবাগত অসভ্যগণই তাঁহাদের প্রজা ছিল।

(৩) সম্ভবতঃ পাঠানাধিকারের অবসানে, মোগল-রাজত্বের প্রারম্ভে পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ (বার) ভূঁইয়া ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক এই সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন যে, মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে ঈশা খাঁ পূর্ব্ববঙ্গে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট্ আক্বর তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে বহু স্থান জায়গীর স্বরূপ দান করেন। প্রত্যাগমন কালে ঈশাখাঁ বাইশ জন গাজীকে আপনার সঙ্গে আনয়ন করতঃ আপন সুবিস্তৃত জায়গীর হইতে তাহাদিগকে জায়গীর দান করেন। এই সমস্ত গাজীদের নামানুসারেই ভাওয়ালের সমীপস্থ সমস্ত পরগণার নামকরণ হইয়াছে—এইরূপে তালেপ গাজী হইতে তালেপাবাদ, কাশিম গাজি হইতে কাশিমপুর, চাঁদগাজী হইতে চাঁদপ্রতাপ (আধুনিক নাম রোয়াইল), এবং সুলতান গাজী হইতে সুলতানপুর, পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ভাওয়াল পরগণা এক কালে বাঁর ভূঁয়ার অন্যতম দুর্দ্দান্ত ফজল গাজীর অধিকৃত ছিল †। পরে কোনও কারণে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ভাওয়াল তাঁহার বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়া জয়দেবপুরের জমিদারগণের হস্তগত হইয়াছে।

(৪) যশোবন্ত পালের রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হইলে তাঁহার পুরোহিতগণ সম্ভবতঃ বহু দিন ভগ্ন বাটীতে যশোমাধব সহ বাস করিতে থাকে। পরে বাদসাহ আউরঙ্গজেবের সময় হিন্দুদেবমূর্ত্তির উপর অত্যাচার আরব্ধ হইলে বোধ হয় মাধবের সেবাইতগণ ধামরাইর তদানীন্তন তালুকদার রামজীবন রায়ের আবাসে মাধবকে লুকাইয়া রাখেন।

(৫) যশোমাধব রায়মৌলিকদের হস্তগত হইলে তাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্যবর্দ্ধনের জন্য ধামরাই গ্রাম, রথ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন। পরে নানা কাল্পনিক উপাখ্যান দ্বারা মাধবকে জগন্নাথদেবের সহ যুক্ত করান হইয়াছে।

এই স্থলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করা গেল। অতঃপর এদিকে ঢাকা সাহিত্যপরিষদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে নিজের সামান্য উদ্যম সার্থক মনে করিব।

শ্রীমেঘনাদ সাহা।

মধুকর *

মধুকর ফুলের মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে। মধুকর কত প্রকার আছে অদ্যাপি তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। এ পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকার মধুকর দেখিতে পাইয়াছি। ইহাদের প্রকৃতি, বাসা নির্ম্মাণ, চালচলন একরূপ হইলেও কণ্ঠস্বরে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়।

(১) এক শ্রেণীর মধুকর গাঢ় নীলের আভাযুক্ত কাল রঙের। টুন্‌টুনী পাখীর চেয়ে একটু বড়। চঞ্চু দুটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। চারি পাশে ফিকে কাল রঙের একখানি পাতলা বেষ্টনী আছে। পা দুটি কাল এবং অত্যন্ত সরু। মধুকরের ঠোঁট তাহাদের দেহের তুলনায় অত্যধিক লম্বা—এক ইঞ্চিরও বেশী। ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকানো। লেজ খাট, ডানা দুটি অত্যন্ত হাল্‌কা, কিন্তু বেশ মজবুত। ইহারা ফুলের উপর বসিয়া লম্বা ঠোঁট ফুলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া মধু চুষিয়া লয়।

† ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহার বার ভুঁইয়ার তালিকায় ভুয়ালের ফজলগাজীর নাম করিয়াছেন। ইংরেজীর পাঠান্তরে তিনি *Bhowal* কে ভুয়াল করিয়াছেন।

* অপ্রকাশিত "গায়ক পাখী" হইতে উদ্ধৃত।

ইহারা গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করে। ছেলেরা ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গান গায়।

"বিন্ বিন্ বিন্ বীণা বাজায়।
দেখ্‌তে দাঁড়কাকের মত মধু চুষে খায়।"

দাঁড়কাকের কৃষ্ণ বর্ণের উপরেও ইহাদের দেহে নীলাভার চাকচিক্য অনেক বেশী প্রকাশিত। চীনা-করবী, দলকমল, প্রভৃতি ফুলে এই শ্রেণীর মধুকর মধু পান করিয়া থাকে। শিমূল ফুলের মধুও ইহাদের প্রিয়। ইহারা মধু পান করিয়া ডালে ডালে নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়।

বাসা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে পাঁচ শ্রেণীর মধুকরেরই প্রায় একরূপ রীতি দেখা যায়। পরিত্যক্ত ঘরের কানাচে অথবা জঙ্গলে অত্যন্ত নিরালায় মধুকর বাসা নির্ম্মাণ করে। তুলা, শণ, পাট, লোম, কলার আঁশ প্রভৃতি ইহা-দের বাসা নির্ম্মাণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা বাসা ঝুলাইয়া রাখে। বাসাগুলি অতি কোমল এবং অভ্যন্তর ভাগ যথাসম্ভব মসৃণ হয়। কখন কখন ইহারা গাছের পাতা পরস্পর সংযোজিত করিয়া তাহার ভিতরে বাসা করিয়া লয়। সেই বাসায়ও ইহারা বিলাসিতার উপকরণরূপে তুলা ইত্যাদি বিছাইতে ত্রুটি করে না। ফাল্গুন হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত মধুকর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অতঃপর ইহাদিগকে প্রায় দেখা যায় না।

এই জাতীয় মধুকরের ডিম আকাশের মত নীল বর্ণের। খেলিবার ছোট মার্ব্বেলের মত বড় হয়। ইহারা এককালে ৩।৪টি ডিম পাড়ে। অনধিক তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত তা দিলে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ডিমের অভ্যন্তর ভাগ নীলের আভাযুক্ত ঈষৎ শাদা। প্রথমাবস্থার ছানাগুলি ইঁদুর ছানার মতই বড় হয় এবং মাথা ও উদর ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি পা ও দুখানি ডানার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়। তখন ইহাদের গায়ের উপর অতি পাতলা হরিদ্রাভ পালখ বর্ত্তমান থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবয়ব পরিপুষ্ট হয় এবং পালখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

মধুকর দ্রুত উড়িয়া পলাইতে সুদক্ষ। একটু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই ইহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হয়। ইহাদের ডিমে তা দিতে একটি পাখীকে অহর্নিশ ডিমের উপর থাকিতে হয় না। ডিমগুলির উপর এভাবে তুলা, পালখ ইত্যাদি সাজান থাকে যে, পাখী চলিয়া গেলে ঐগুলি চতুর্দ্দিক হইতে ডিমের উষ্ণতা রক্ষার সাহায্য করিতে তদুপরি ঝুলিয়া পড়ে। এজন্য মাদী মধুকর আপন আহার্য্য সংগ্রহের জন্য সময় সময় ছুটী লইতে সক্ষম হয়।

(২) এই শ্রেণীর মধুকরের দৈহিক গড়ন এবং বর্ণ প্রথম শ্রেণীর মধুকরের মতই বটে; কিন্তু বুকের মাঝা-মাঝি হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিম্নদেশ মেটে সাদা রঙ্গের। অন্যান্য বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই।

(৩) ইহাদের বর্ণ জবাকুসুমের মত গাঢ় লাল, সর্ব্বাঙ্গ মসূরী প্রমাণ কৃষ্ণচিহ্ন যুক্ত। চক্ষুর্দ্বয়ের চতুর্দ্দিক পীতাভ বেষ্টনীতে আবৃত। পদদ্বয় মেটে রঙ্গের। ঠোঁট সকল শ্রেণীর মধুকরেরই এক প্রকার। ইহারা রক্তজবা, বকফুল, রক্তকাঞ্চন প্রভৃতির মধু পান করে। বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী প্রথম শ্রেণীর মধুকরের অনুরূপ। ইহাদের ডিম দেখি নাই। শাবকগুলির প্রথমাবস্থায় পালক হরিদ্রার আভাযুক্ত সাদা হয়।

(৪) ইহারা প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর মধুকরেরই মত। ইহাদের গলদেশ ময়ূরের গলদেশের বর্ণের পালখে আবৃত। দুই ডানাতেই গাঢ় সবুজ বর্ণের দুইখানি পালখ আছে।

(৫) ইহাদের দৈহিক গঠন উপরি লিখিত মধুকর চতুষ্টয় অপেক্ষা ঈষৎ বড়। লেজের মধ্যভাগে দুই তিনটি পালক একটু লম্বা। বুকের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ও উপরের সমুদয় অংশ রক্তবর্ণ। পেটের পালখ পরিষ্কার সাদা। ডানার দুই ধারে গাঢ় সবুজ দুইটি পালখ আছে। এই শ্রেণীর মধুকর তারাকাঞ্চন, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের মধু পান করে। ডিমগুলি নীলাভ ও তাহাতে কাল ডোরা আছে। বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী একরূপ।

ফুলের মধুকোষ হইতে মধু আহরণের জন্যই এই সকল ক্ষুদ্রকায় পক্ষীর ঠোঁট বেশী লম্বা এবং অগ্রভাগ বাঁকান।

প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর মধুকর দুই তিনটিকে একত্র বিচরণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য মধুকর প্রায়শঃই একাকী মধু পান করে এবং মিঠে গলায় মিহি সুরে গান করিয়া থাকে। ইহারাও শিষ্ দিয়া গান করে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কল্পনা *

সজনী লো! গভীর নিশায়
আয় আজ একবার আয়!
লুকান মনের দু'টি কথা
গোপন বুকের আকুলতা—
চুপে চুপে ক'ব দু'জনায়!
সজনী লো! একবার আয়!

নীরব নিথর চরাচর
এই ত পরম অবসর!
তারা-নাথ তারারাজি সনে
জাগে সুখে গগন-ভবনে—
মধু বায়ু বহে মৃদুতর!
এই ত পরম অবসর!

আয় সখি, এক বার আয়
মিলাইবি হিয়ায় হিয়ায়!
কেটে গেছে সারা দিনমান
হেরি নাই ও বিধু বয়ান—
সারা প্রাণ আজি তোরে চায়!
আয় সখি, এক বার আয়!

ভুলাইলি নিখিল ভুবন
তুই মোর সাধনার ধন!
তোর পাশে কি ছার সংসার
যেথা শুধু দুঃখ হাহাকার!
পলে পলে মরম-দহন!
তুই মোর সাধনার ধন

তোরে করি দোসর আমার
এ মরুভূ হ'য়ে যাব পার!
তুই মোরে দেখাইবি পথ
আলোময় শোভন মহৎ;
মায়া-ঘেরা ছায়া-সুকুমার!
তোর সনে হব মরু পার!

ফুল ফুটে পুনঃ ঝরে যায়
এ জীবন তেমতি যে হায়!
দু' দিনের হাসি খেলা গান
দু' দিনেতে হয় অবসান—
সাধ আশা ধূলায় লুটায়!
এ জীবন দু' দিনের হায়!

ভুলে শুধু ভরা চারি ধার
কে পারে বুঝিতে মন কার!
অকারণ যশ-অপযশ
করে সবে আকুল বিবশ—
কোথা শেষ মরীচি লীলার
কে পারে বুঝিতে মন কার!

আজ মোরে দেবতার মত
পূজা করে কেহ অবিরত!
কোন জন গরবে ঘৃণায়
দূর হতে দূরে সরে যায়—
আমি হাসি নীরবে সতত!
দু' জনার ভুল একমত।

* এই কবিতাটি লেখকের অপ্রকাশিত কাব্য "প্রেমলোক" হইতে গৃহীত।

আশৈশব হৃদয়ের রাণী
আমি সখি, তোরে শুধু জানি!
তুই মোরে শিখালি যে গান
জগতে তা' দিনু আজি দান—
শুনাইনু স্বপনের বাণী!
আমি সখি, তোরে শুধু জানি!

খেলা মোর ফুরাবে যখন
স্মৃতি রূপে দিবি দরশন!
আমার গানের সুরে সুরে
আমি রব এ মরত-পুরে—
তুই র'বি সবাতে গোপন!
স্মৃতি রূপে দিবি দরশন!

সবাকার সব ভুল হায়,
ঘুচাইয়ে দিস্ ইসারায়!
নব ভাবে জগৎ তখন
মোরে যেন করে আলিঙ্গন
বহ্নি' লয়ে সকল হিয়ায়!
ঘুচাইয়ে দিস্ ভুল হায়!

আদরিণি, কি কহিব আর
সফল মিলন দোঁহাকার!
জনমে জনমে যেন তোরে
এই মত লভি ভুজ-ডোরে—
তুই যে আশিষ্ দেবতার!
সফল মিলন দোঁহাকার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দ্বিজ মুকুন্দ ও তদীয় গ্রন্থচতুষ্টয়

জগন্নাথমাহাত্ম্য ও ব্রহ্মপুরাণ।*

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দুইখানি জগন্নাথ মাহাত্ম্য ও দুইখানি ব্রহ্মপুরাণ। চারিখানি গ্রন্থই বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত এবং উহাদের বিষয় এক; অর্থাৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মার উপদেশে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরের নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং জগন্নাথ-মাহাত্ম্য বর্ণন। চারিখানি গ্রন্থই দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। দ্বিজ মুকুন্দের বাড়ী কোথায় এবং গ্রন্থগুলি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তদীয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় দ্বিজ মুকুন্দ কৃত ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম ও শ্লোক সমষ্টির দিকে দৃষ্টি করিলে, ইহা যে আলোচ্য গ্রন্থগুলি হইতে ভিন্ন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। আলোচ্য গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। জগন্নাথ মাহাত্ম্য—দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। অনুলিপিকার গয়ানাথ শর্ম্মা, সাং গোবিন্দপুর, পরগণে জাফরসাহি, সরকার ঘোড়াঘাট। সপ্তদশ অধ্যায়ে, তুলট কাগজের ৪৮ ½ পত্রে বা ৯৭ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোক সংখ্যা ১০৬৯। অনুলিপির সময় ১২৩৮ সন।

২। জগন্নাথ মাহাত্ম্য—দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। তুলট কাগজের ২২ পত্রে বা ৪৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তি না পাওয়াতে অনুলিপিকারের নাম ও অনুলিপির সন তারিখ পাওয়া গেল না।

৩। ব্রহ্মপুরাণ—দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত। পাঁচালীকার সুবুদ্ধি দাস। অনুলিপির সময়—১২২০ সন। তুলট কাগজের ২১ পত্র বা ৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

৪। ব্রহ্মাপুরাণ—দ্বিজমুকুন্দ বিরচিত। তুলট কাগজের ২০ পত্রে বা ৪০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তি না পাওয়াতে অনুলিপির সন তারিখ জানা গেল না।

প্রথম গ্রন্থখানি (জগন্নাথ মাহাত্ম্য) সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব, এবং অপর তিন খানি সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যাইব।

শ্রীক্ষেত্রপ্রত্যাগত যুবক বৃদ্ধ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবানের কাষ্ঠ মূর্ত্তি কেন? পরিহাস-রসিক বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "ভগবান্, স্ত্রীপুত্র ও নিজের দুর্দ্দশা চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠ মূর্ত্তি হইয়াছেন।"

"একা ভার্য্যা প্রকৃতি-মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ;
শেষঃ শয্যা, বসতি জলধৌ, বাহনং পন্নগারিঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহ-চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।"

এই কাষ্ঠমূর্ত্তি জগন্নাথ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। ভক্তেরা জগন্নাথের মূর্ত্তি যত সুন্দরই দেখুন না কেন, কিন্তু লোকে বলে "বিশ্বকর্ম্মার কারিগরি জগন্নাথেই প্রকাশ।" বস্তুতঃ দেবশিল্পীর রচিত কাষ্ঠমূর্ত্তি নিতান্তই কৌতুকাবহ।

গ্রন্থের প্রথমেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে কিছুই ছিল না; জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু, কিছুই ছিল না; এই ত্রিভুবন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ছিল না। একদা নারায়ণের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট হইল—ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, বিষ্ণু পালন করিবেন এবং শিব সংহার করিবেন।

"জল স্থল না ছিল কিছু আনল পবন।
সর্গ মর্ত্ত পাতাল না ছিল ত্রিভুবন॥
প্রথমে স্রিজিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।
সৃষ্টাইতে তিন দেব করিলা সৃজন॥
ব্রহ্মায়ে সৃজয়ে বিষ্ণু পালয়ে সংসার।
প্রলয়ের হেতু হর করয়ে সংহার॥"

এই তিন দেবতাকে নমস্কার করিয়া দ্বিজ মুকুন্দ মূল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সংস্কৃত পুরাণের প্রারম্ভেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; পুরাণের ইহা একটি লক্ষণ; দ্বিজ মুকুন্দ বাঙ্গালায় পুরাণ লিখিতে যাইয়া সংস্কৃত পুরাণের রীতি অনুসরণে বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন। সংস্কৃত পুরাণে জল, স্থল, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ক্রমানুসারে বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিজ মুকুন্দের পুথিতে তাহার কিছুই দেখা যায় না। এই পুথিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তির পরেই হঠাৎ উড়িষ্যাভূমে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের আবির্ভাব।

সংস্কৃত পুরাণে দেখা যায় ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তি দেশের (মালবের) রাজা ছিলেন, তিনি সদল বলে উড়িষ্যায় আগমন পূর্ব্বক পুরী অধিকার করেন এবং এখানেই রাজত্ব করেন; কিন্তু দ্বিজ মুকুন্দের গ্রন্থে অবন্তিদেশের উল্লেখ মাত্র নাই। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এক চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য এক স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং এই মূর্ত্তি পাইবার জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া সন্ধ্যা করিতে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্তে রাজার ৬০ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল। ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিলে রাজা পুনরায় তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা রাজাকে স্বীয় রাজ্যের অবস্থা অবগত হইয়া পুনরায় আসিতে বলিলেন। রাজা স্বীয় রাজ্যে প্রর্ত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন তাঁহার রাজ্যের কোন চিহ্ন নাই—রাজপুরী নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, রাজপরিবারের কেহই নাই, সব অরণ্যময়। রাজা দেখিয়া অবাক্। এসব কি হইল? কোথায় গেল? ৬০ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি রাজার শরীরে বার্দ্ধক্য-লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই! কবির কল্পনা-মাহাত্ম্যে ভৌতিক শরীর স্বীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে। রাজা ক্রমে অক্ষয় বট, পেচক ও কূর্ম্মের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনি দেবতা জ্ঞানে ইহাদের স্তুতি করিলেন।

অক্ষয় বট—"তরুবর দেখিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন মহামতি।
ভূমিতে পড়িয়া করে অষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥
তুমী দেব নারায়ণ দেব সোনাতন।
অনন্ত তোমার নাম জানে ত্রিভুবন ॥"
ইত্যাদি।

পেচক—"তোমার চরণে মোর অশেষ প্রণতি।
মোর নিবেদন কিছু কর অবগতি ॥"
ইত্যাদি।

কূর্ম্ম—"অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কূর্ম্ম দরশনে।
করপুটে স্তুতি করে বিবিধ বিধানে ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
পতিত পাবন তুমি পরম ঈশ্বর ॥" ইত্যাদি।

সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানবগণ উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর পূজা করিত। আধুনিক সময়েও উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর পূজা নানা দেশে ও নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া সভ্যতার বিভিন্ন স্তর সূচিত করিতেছে।

রাজা কূর্ম্মের পরামর্শে পুনরায় রাজ্য স্থাপন করিলেন। তিনি মৃত্তিকায় প্রোথিত ধনাগার উদ্ধার করিয়া, অর্থবলে রাজবাটী, সৈন্য সামন্ত, হাতী, ঘোড়া, সব পাইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য হইতে লোক আনাইয়া প্রজা পত্তন করিলেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যে ব্রাহ্মণ থাকিতে পাত্রীর অভাব হইবে কেন? এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্থলোভে বর্ষীয়ান্ বরে স্বীয় যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা চিরপ্রসিদ্ধ। যথাশাস্ত্র বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহ দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইল; স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিলেন। এ সমুদয় বিবরণ পাঠ করিলে আমাদের ঠাকুরমার রূপকথা মনে পড়ে!

রাজা ও রাণী এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; যজ্ঞের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণে ও লোকপ্রবাদে যজ্ঞটির নাম অশ্বমেধ। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলেন। রাজা বর চাহিলেন, "এক মূর্ত্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কলেবর।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি দারুব্রহ্ম পাইবে।" তিনি আরও বলিলেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে জরা নামক ব্যাধের বাণে আহত হইয়া যোগমগ্ন হইবেন এবং সেই যোগাগ্নিতে তদীয় দেহ ও আশ্রয়তরু নিম্ববৃক্ষ দগ্ধীভূত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্জরাস্থি সহ দগ্ধ নিমগাছটি সমুদ্রে পতিত হইবে এবং উহা ভাসিতে ভাসিতে উড়িষ্যা-তটে আসিবে। এই নিম গাছে জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।"

কবি যোগাগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণের কলেবর ও নিম গাছ উভয়ই দগ্ধ করাইয়াছেন। তিনি কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে বহু উর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ভৌতিক মানব-দেহ ও পার্থিব বৃক্ষ, অপার্থিব আধ্যাত্মিক পদার্থ যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবার নয়।

সমাজে দুই দলের লোক আছে। এক দল তার্কিক আর এক দল ভক্ত। তার্কিকেরা কথায় কথায় প্রমাণ চাহেন; ভক্তেরা আপ্তবাক্যেই সন্তুষ্ট; তাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির বাক্যে কিছু মাত্র সন্দেহ করেন না। পুরীতে জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপন ও তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে এই দুই দলের মত আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি—অবশ্য ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং আমি নিজের ব্যক্তিগত মতও প্রকাশ করিতেছি না।

তার্কিকেরা বলেন দ্বারকা ও পুরীর ভৌগোলিক অবস্থান ও ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তী সামুদ্রিক স্রোতের বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, নিম্ববৃক্ষটি এঞ্জিন যুক্ত না হইলে, কিম্বা ঐ বৃক্ষস্থিত শ্রীকৃষ্ণাস্থিপঞ্জরের অতিমানুষিক বা দৈবশক্তি না থাকিলে, উহা প্রভাস হইতে পুরীতে আসিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, এরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, নিম গাছটির পুরীতে আসিতে বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর লাগিলেও এবং জলবায়ুর অবিরাম স্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেলেও, দগ্ধ বৃক্ষটি প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল। তাঁহারা বলেন, যে ভগবানের ইচ্ছায়

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতে পারে, তাঁহার ইচ্ছায় কি একটা গাছ অবিকৃত থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু বহু পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্থিপঞ্জর একটা কথার কথা মাত্র। উহা প্রকৃত নহে; উহা বৌদ্ধ স্তূপে রক্ষিত বুদ্ধের অস্থি, দন্ত ও কেশাদির অনুকরণ মাত্র। তাঁহারা আরও বলেন যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে থাকিলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। এই অভ্যুত্থানে হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মটিকে স্বীয় ধর্ম্মের সহিত যথা সম্ভব সমন্বয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন; বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি স্থলে—বুদ্ধ, ধর্ম্ম (১) ও সঙ্ঘের স্থলে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি কল্পিত হইল; জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণে বৌদ্ধধর্ম্মভাব, জাতিভেদরাহিত্য, হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়া পুরীতে প্রচলিত হইল। সাধারণতঃ হিন্দু দেবমন্দির সকল দক্ষিণদ্বারী হইলেও বৌদ্ধ মঠের অনুকরণে জগন্নাথের মন্দির পূর্ব্বদ্বারী করিয়া নির্ম্মিত হইল, ইত্যাদি।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের শেষোক্ত মতটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দু শাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বচন আছে—পূজক প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া পূজায় বসিবেন; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, প্রতিমা পশ্চিম বা দক্ষিণমুখী হইবে, অর্থাৎ দেবমন্দিরের পশ্চিম বা দক্ষিণদ্বারী হওয়া আবশ্যক—

আদ্রায়াং বোধযেদ্দেবীং মূলায়াঞ্চ প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরস্যাং সংপূজ্য শ্রবণায়াং বিসর্জ্জয়েৎ॥”
বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ।

দেবীপুরাণেও এই মতের সমর্থক বচন আছে।

পুরাণে আরও একটি শ্লোক আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকের প্রয়োজনানুসারে দেবমূর্ত্তিকে যে মুখী ইচ্ছা সে মুখী করা যাইতে পারে। এই ঢাকা সহরেই দেবমন্দিরগুলির দ্বার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেখা যায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অপর মতগুলি সম্বন্ধে আমি ভক্তিমার্গাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে এবং জ্ঞানমার্গাবলম্বী দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদিগকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করিয়া মহাপ্রসাদ ও তৎসম্পর্কীয় জাতি বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বিজ মুকুন্দ বিরচিত ব্রহ্মপুরাণের প্রারম্ভে পাঁচালীরচক সুবুদ্ধি দাস জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভক্ষণের ফল বর্ণন করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্রহ্মপুরাণ নারদপুরাণাদিতে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলেও ঐ সকল গ্রন্থে মহাপ্রসাদের উল্লেখ মাত্র নাই। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত উৎকলখণ্ডে মহাপ্রসাদ ভক্ষণের ফল বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু অনেকে বলেন উহা নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ এবং উহা শ্রীচৈতন্তের পুরীতে গমনের পরে রচিত হইয়া স্কন্দপুরাণের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রথমে মহাপ্রসাদে অনাস্থাবান্ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন না; পরে শ্রীচৈতন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উহা ভক্ষণ করেন। যাঁহার স্মৃতির শাসনে বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ চলিতেছে সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই। শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবগণই মহাপ্রসাদে অধিকতর আদর দেখাইয়া থাকেন। জনসাধারণের বিশ্বাস জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্যেই শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার রহিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে দুই একখানা আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনেক পরিমাণে জাতিবিচার পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও স্থানবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বৈষ্ণবদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনেও জাতিবিচারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার রহিত হইল কেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। তন্ত্রশাস্ত্রে

(১) বৌদ্ধগণ ধর্ম্মের শ্রীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন।

ইহার একটা কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্ত্রে আছে—

"প্রাপ্তে তু বিমলা-ক্ষেত্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।"

অর্থাৎ; বিমলাক্ষেত্রে গমন করিলে সকল বর্ণ ই জাতি-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। সকলেই যেখানে ব্রাহ্মণ সেখানে জাতিবিচারের স্থান কোথায়? হিন্দু-মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীক্ষেত্রেই বিমলা-ক্ষেত্র। বিষ্ণু চক্রে বিচ্ছিন্ন সতীদেহ হইতে নাভি-পদ্ম এখানেই নিপতিত হইয়াছিল, এজন্য ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ স্থান। সুতরাং তন্ত্রোক্ত বচন মানিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব নিবন্ধন শ্রীক্ষেত্রে জাতি বিচার রহিত হয় নাই, উহা বিমলা-ক্ষেত্র বলিয়া জগন্নাথ দেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই সেখানে জাতিবর্ণের বিচার বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজিও দেখা যায় জগন্নাথের প্রসাদ যখন মন্দির হইতে বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনা হয়, তখন উহা বিমলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গন দিয়া আনীত হইয়া থাকে; এ পথ ব্যতীত অন্য পথে মহাপ্রসাদ বাহিরে পাঠাইবার কাহারও অধিকার নাই। এরূপ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ যদি বিমলা ক্ষেত্রের প্রভাবে না হইত, তবে ভোগমন্দিরে যে পথ দিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি আনীত হইয়া থাকে, উৎসর্গের পরও ঐ সহজ পথেই অনায়াসেই উহা বাজারে প্রেরিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহা না হইয়া বক্র পথে বিমলা মন্দিরের সম্মুখ দিয়া যখন মহাপ্রসাদ বাজারে নেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন জাতিবিচাররাহিত্য যে বিমলা ক্ষেত্রেরই প্রভাবের পরিচায়ক তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

এই পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিমলা এবং ভৈরব স্বয়ং জগন্নাথদেব। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, পুরীর অদূরবর্ত্তী ভুবনেশ্বরই এই পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী বিমলা দেবীর ভৈরব ছিলেন। প্রবাদ এই যে, কলির প্রারম্ভে যখন ভগবান্ বিষ্ণু জগন্নাথ রূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি এই পীঠস্থানের আদ্যাশক্তির ভৈরব হইবার জন্য বর লাভ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে এই পীঠস্থানে বিমলা ভৈরবী এবং জগন্নাথ ভৈরব রূপে বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়ের কথা বলা হইয়াছে। এখানেও আবার বিমলা ভৈরবী ও জগন্নাথ ভৈরব রূপে বর্ত্ত-মান থাকিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয় সূচিত করিতেছেন।

তারপর মহামন্দির নির্ম্মাণের কথা। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ চতুষ্টয়ে লিখিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি—জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম মূর্ত্তি—স্থাপন করেন। প্রচলিত লোক-প্রবাদে ও পাণ্ডাদের মুখে ইহাই সমর্থিত হয়।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তি দেশের (মালবের) রাজা ছিলেন। পরে তিনি দল বল লইয়া উৎকলে উপস্থিত হন ও তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। দেবর্ষি নারদও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া-ছিলেন। যে মহাবেদীর উপর এখন দারুব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, উহার উপরে বসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। উৎকল বা ওড্র অতি প্রাচীন রাজ্য; ইহার নাম রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ও মহাভারতে দ্রোণ পর্ব্বে দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রদ্যুম্নও অতি প্রাচীন রাজা; ইঁহার নাম রামায়ণ বা মহাভারতে পাওয়া না গেলেও, ইঁনি যে প্রাচীন রাজা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইনি ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এ মত যুক্তিসহ কি না বিচার্য্য। ইনি যে জগন্নাথের মন্দির প্রথমে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতেও বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান মহামন্দির ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত মন্দির কি না তৎসম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। মহা-বেদীর পশ্চাতে যে শ্লোকটি আছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই মন্দির রাজা অনঙ্গ ভীম কর্ত্তৃক ১১১৯ শকে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশু রূপ নক্ষত্র নায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

(রন্ধ্র — ৯ ; শুভ্রাংশু — ১ ; রূপ — ১ ; নক্ষত্রনায়ক — ১)

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় কন্যা সত্যবতীকে দারুমূর্ত্তি জগন্নাথের সহিত বিবাহিত করিলেন। মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল; দেবতারা বিবাহ দেখিতে আসিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু দেব-মন্দিরে দেবদাসীগণ বর্ত্তমান থাকিয়া দেবমন্দিরের পবিত্রতা ও পবিত্র ধর্ম্ম ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতেছে। আমার বোধ হয় এই দেবদাসীগণ একটি চিরাগত প্রথার তৃতীয় সংস্করণ। ইহার এক সংস্করণ আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রিতা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বুদ্ধ-পত্নী গোপাতে; এবং অপর সংস্করণ দেখিতে পাই জগন্নাথের সহিত বিবাহিতা ইন্দ্রদ্যুম্ন-কন্যা সত্যবতীতে। দাক্ষিণাত্যের দেবদাসী প্রথা এখন কুৎসিত আচারে পরিণত হইয়াছে। আশা করি এই প্রথার চতুর্থ সংস্করণ আমাদিগকে দেখিতে হইবে না।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ৭ম ভাগে অর্থাৎ ১৩০৭ সনের খণ্ডে বিখ্যাত সাহিত্যাচার্য্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বিজ মুকুন্দ রচিত "জগন্নাথ বিজয়" সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "জগন্নাথ বিজয়" ব্যতীত দ্বিজ মুকুন্দের অপর কোন গ্রন্থ তিনি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি এই গ্রন্থ ময়মনসিংহ জিলায় টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে, দ্বিজ মুকুন্দ টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী। তিনি এই গ্রন্থ হইতে "আছিল", "থুইয়া", "অখন" প্রভৃতি ১৫টি পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যেহেতু এই পদগুলি টাঙ্গাইল মহকুমা ব্যতীত অন্যত্র সমধিক প্রচলিত নহে, অতএব দ্বিজ মুকুন্দ টাঙ্গাইলের অধিবাসী। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি দ্বিজ মুকুন্দের চারিখানি গ্রন্থ তিন জিলা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি—দুইখানি ত্রিপুরা জিলা, একখানি নোয়াখালী জিলা এবং অপরখানি ময়মনসিংহ জিলা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং গ্রন্থের প্রাপ্তি স্থান নির্ণয় করা কঠিন। তারপর বসু মহাশয় যে ১৫টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের ১০টি ই বিক্রমপুরে সমধিক প্রচলিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক বিক্রমপুরবাসী সুতরাং এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে বসু মহাশয় তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন। ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে "আছিল ও থুইয়া" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা—

সে দোষ থুইয়া দূরে আনাইনু তিন পুরে
জাহ্নবী বলিয়া তোর নামে।"
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

(অন্নদামঙ্গল)।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বীয় কাব্যে "আছিল" পদের ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—

"কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী!"

(মেঘনাদবধ-কাব্য—১ম সর্গ)

ভারতচন্দ্র ও মাইকেল দত্ত টাঙ্গাইল বা বিক্রমপুরের লোক নহেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বসু মহাশয়ের যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি কৃত্তি-বাসের ভাষার সহিত জগন্নাথ বিজয়ের ভাষা তুলনা করিয়া দ্বিজ মুকুন্দকে অধিকতর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং দ্বিজ মুকুন্দের প্রাদুর্ভাব কাল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ বলিতেছেন।

উক্ত বসু মহাশয় "জগন্নাথ বিজয়ের" সমালোচনায় বলিতেছেন যে, কৃত্তিবাসের ভাষা দ্বিজ মুকুন্দের ভাষা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মার্জ্জিত। কিন্তু আমি নোয়া-খালী জিলা হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে উত্তরাকাণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাষা মার্জ্জিত নহে; ইহা পড়িয়া কৃত্তিবাসকে অতি প্রাচীন কবি বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার ভাষা মার্জ্জিত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মনে হয় অনুলিপিকারগণের হস্তে পড়িয়া ইহার ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া আসিয়া থাকিবে। আমার হাতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে তাহার পাঠে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠে অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রামায়ণ

পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড় হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন॥ ইত্যাদি

মৎ সংগৃহীত রামায়ণ

এতেক শুনিয়া লক্ষণ চলিল সত্তর।
সকল কহিল গিয়া শ্রীরাম গোচর॥
সত্তরে যাইল রাম সে বার্ত্তা পাইয়া।
কালপুরুষ বসিলেক পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
মধুর বচনে রাম জিজ্ঞাসে কথন।
কি কারণে তোম্মার এখানে আগমন॥ ইত্যাদি

ইহার কোন্‌টি খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ নির্ণয় করা কঠিন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" বলিয়াছেন যে, খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ দুর্লভ। সুতরাং বর্ত্তমান কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা দ্বারা কৃত্তিবাসের প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করা কঠিন এবং ইনি দ্বিজ মুকুন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কৃত্তিবাসের জন্ম শক ১২৫৭; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে কৃত্তিবাস ১৩৩৫ শকের লোক; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কৃত্তিবাসের জন্ম শক ১৩৬২। আমার বোধ হয় কৃত্তিবাস দ্বিজ মুকুন্দ অপেক্ষা প্রাচীন কবি।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাদর্শ

(১)

ভারতে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আমাদের রাজপুরুষদিগের নিকট এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য আদর্শের অনুবর্ত্তন দ্বারাই ইহার সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত প্রাচ্য আদর্শকে সংযুক্ত করিতে পারিলেই ইহার প্রকৃত সমাধান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রাচ্য শিক্ষাদর্শটি যে উপেক্ষার বিষয় নহে পরন্তু পাশ্চাত্য উন্নত বৈজ্ঞানিক আদর্শের পার্শ্বেই স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য আমাদের আলোচনা দ্বারা তাহাই পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমার ভরসা করি।

ভারত চিরকালই সবিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ। ভারতের সমস্ত বিষয় ধর্ম্মেরই সহিত বিশেষরূপে অনুস্যূত। সুতরাং ভারতে শিক্ষার মূলে আমরা ধর্ম্মকেই প্রথম দেখিতে পাই। ভারতের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। এই বেদের সাধারণ এক নাম "ব্রহ্ম" যথা "বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম"—অমরকোষ। এই বেদাধ্যয়ন ও বেদাচরণে শিক্ষার প্রকৃত আরম্ভ হইত বলিয়াই শিক্ষার্থীর নাম "ব্রহ্মচারী" হইয়াছে।

শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকিয়া তাঁহার নিকটে বাস করিতে হইত বলিয়াই তাহার এক নাম "অন্তেবাসী" এবং গুরুর সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া তাহাকে চলিতে হইত বলিয়া তাহার অপর এক নাম "শিষ্য"।

শিক্ষার্থী গুরু গৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন, বেদাচরণ করিত এই জন্য শিক্ষাজীবন "ব্রহ্মচর্য্য" ও "গুরু কুলে বাস" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

গুরু গৃহে বাস করিলেও শিষ্যের শিক্ষা গৃহে হইত না, অনাবৃত স্থানে, মুক্ত বায়ুতেই তাহার শিক্ষা হইত। সায়ং প্রাতঃ মেঘ গর্জ্জন, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতিতে অধ্যয়নের যে সাধারণ নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেই ইহার একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইতে

পারে। গৃহাদিতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত সামান্য প্রাকৃতিক অসুবিধায় তাহার ব্যাঘাত হওয়ার কোন কারণ ঘটিত না।

হস্তী, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু গুরু ও শিষ্যের মধ্যদিয়া চলিয়া গেলে যে অনধ্যায় শাস্ত্রে বিধি বদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে অরণ্য মধ্যেই যে শিক্ষার স্থান ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। এখানে আমরা একটি অনধ্যায় বিধান শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"গজগগুসারসসিংহব্যাঘ্রমহাপাপি কৃতয়াদাবন্তমনধ্যায়ঃ॥"

ইতি নির্ণয় সিন্ধুধৃত স্মৃত্যর্থসারঃ।

মুনি-ঋষিগণ ধর্ম্মে, জ্ঞানে, চরিত্রে সকলের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহারাই সকলের গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইঁহারা অরণ্যবাসী ছিলেন, অরণ্যেই তাঁহারা শিক্ষা দান করিতেন। বৃহস্পতি যেমন আর্য্যদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ তেমনই তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তদীয় অনন্যসাধারণ গুরু নামেই তাহার জলন্ত নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৃহস্পতির বিদ্যালয়ের বর্ণনায় আমরা অরণ্যেরই দৃশ্য দেখিতে পাই, যথা—

"কনকশিলোচ্চয় বিবরজ তরুকুসুমাসঙ্গি মধুকরাসুরুতে।
বহুবিহগ-কলহ সুর-যুবতি-গীত মন্দ্রস্বনোপবনে।১
সুরনিলয়শিখরিশিখরে বৃহস্পতির্নারদায় যানাহ॥২

বৃহৎসংহিতা, ২৪শ অধ্যায়।

সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গজাত বৃক্ষগণের পুষ্পোপরি আসক্ত ষট্‌পদ পংক্তির গুঞ্জন শব্দে নানাবিধ বিহগকুলের কলনাদে এবং সুর-যুবতিগণের মৃদু গম্ভীর গীত-স্বরে পরিপূর্ণ পর্ব্বত-চূড়াস্থিত সুরনিলয় উপবনে বৃহস্পতি নারদকে যে রোহিণী যুগ বলিয়াছিলেন।"

বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

উপনিষদ্ আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বিশেষ ভাবে অরণ্যে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উপনিষদ্ শব্দের এক অর্থ নির্জ্জন, আরণ্যক শব্দের অর্থ অরণ্যে রচিত, সুতরাং ইহাদের নাম হইতেই আমরা অরণ্যে শিক্ষার প্রমাণ পাইতেছি।

ঋষিগণ যেমন বাচনিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিতেন তেমনই গ্রন্থ পাঠের দ্বারাও শিক্ষা প্রদান করিতেন। বেদ সকল যে আদিতে শুনিয়াই শিক্ষা হইত বেদবাচক শ্রুতি শব্দই তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদের বিভিন্ন অংশ সকলের নাম প্রপাঠক। ইহা হইতে ইহাকে শিষ্যের নিকট পঠিত হইত তাহাই আমরা বুঝিতে পারি।

পাণিনি ব্যাকরণে "তেন প্রোক্তং অধীয়তে" এই সূত্রের প্রসঙ্গে আমরা বেদ শাস্ত্রের বহু উপদেষ্টার নাম প্রাপ্ত হই। ইহাদের মধ্যে কাশুপ, বরতন্তু, বৈশম্পায়ন, শৌনক, কঠ প্রভৃতি নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা বক্তৃতা দ্বারা শাস্ত্রোপদেশে বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বলিয়াই শাস্ত্রবক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

বেদোপদেষ্টা শিক্ষকগণ প্রধানতঃ আচার্য্য নামেই অভিহিত হইতেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুই বৈদিক ঋষি অশেষ জ্ঞানের দ্বারা আচার্য্য পদকে এরূপই গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন যে, "আচার্য্য" শব্দ তাঁহাদের নামের সঙ্গে চির সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাতেই বৃহস্পতি "সুরাচার্য্য" এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য নামে পরিচিত রহিয়াছেন।

উপরি উক্ত আচার্য্য, বক্তা, প্রপাঠক প্রভৃতি শিক্ষকদিগকে আমরা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের (Professor, Lecturer, Readers প্রভৃতিরই) অনুরূপ বলিয়া মনে করিতে পারি।

অপর এক প্রকারের অধ্যাপক আমরা ঋষিদিগের মধ্যে দেখিতে পাই যাঁহাদিগের নাম ছিল "কুলপতি।" এই কুলপতির শিষ্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তিনি সকল শিষ্যের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার বহন করিতেন। কুলপতি পদটি এরূপই বহুল প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহা একটি পারিভাষিক শব্দে পরিণত হইয়া-

ছিল। তাহাতেই কুলপতির এইরূপ পরিভাষা আমরা দেখিতে পাই—

"মুনীনাং দশ সাহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

কুল, গুরুকুল বা শিক্ষা-স্থানকেই বুঝাইয়া থাকে বলিয়া "কুলপতি" শব্দের অর্থ কুল বা শিক্ষাস্থানের পতি অর্থাৎ অধ্যক্ষই হয়। ইহা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের Principal বা অধ্যক্ষেরই অনুরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।১টি ব্যতীত কোন বিদ্যালয়ে দশ হাজার ছাত্রের অধ্যাপনা হওয়ার ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরা জানি না। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিদ্যালয় মিশরের আজহরের ছাত্র সংখ্যাও ইহার অপেক্ষা বেশী হইবে না। সুতরাং কুলপতি পরিচালিত বিদ্যালয় যে কিরূপ প্রকাণ্ড ছিল তাহা আমরা ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারি।

বশিষ্ঠকে আমরা কালিদাসের রঘুবংশে কুলপতি নামে অভিহিত দেখি। বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের কুলগুরু ছিলেন। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বোধ হয় তাঁহার প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ের ব্যয় ভার নির্ব্বাহিত হইত। এক জনের পক্ষে দশ হাজার ছাত্রের অধ্যাপনা অসম্ভব। সুতরাং বশিষ্ঠের অধীন শিক্ষকবর্গ দ্বারা অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদিত হইত ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বশিষ্ঠের বিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ন্যায় বিদ্যালয়-বিশেষ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

মহর্ষি দুর্ব্বাসাও একজন "কুলপতি" ছিলেন; তাঁহার ছাত্র সংখ্যাও দশ হাজার ছিল। অধিকন্তু ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের ছাত্র লইয়া স্থান ভ্রমণ (Tour) করার ন্যায় তিনিও ছাত্র লইয়া সময় সময় পর্য্যটনে যাইতেন; তাহাতেই কখন কখন শিষ্য সহ তাঁহার অতিথি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।

আমরা "পরিষৎ" নামে যে এক প্রকার বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাই তাহা প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের এক বিংশতিসংখ্যক অধ্যাপক দ্বারা অধ্যাপনা কার্য্যের পরিচালনা হইত, যথা—

"একবিংশতিসংখ্যকৈর্মীমাংসান্যায়পারগৈঃ।
বেদাঙ্গ কুশলৈশ্চৈব পরিষত্বং প্রকল্পয়েৎ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তদীয় Civilisation of Indian (ভারতীয় সভ্যতা) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বেদ ও সাধারণ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার পর বিচক্ষণ ও বিখ্যাত ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিষদে ভর্ত্তি হইত। *

উত্তর ভারতের তক্ষশিলাতে অতি প্রাচীন কালেই একটি অতি উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় থাকার বিবরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহর্ষি অত্রি ইহার প্রধানতম অধ্যাপক ছিলেন। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব, বৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনি ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি ইঁহার ছাত্র ছিলেন। বহু কাল পর্য্যন্ত ইহা সমগ্র ভারতেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাস্থানরূপে পরিগণিত ছিল; তাহাতেই নানাদিগ্দেশ হইতে ছাত্রের সমাগমের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এখানে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ হইতে ইহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও পালিভাষায় বিরচিত পুস্তক সমূহ পাঠে জানিতে পারি প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ভাগে তক্ষশিলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল শাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ অধ্যাপক ছিলেন। দুঃখের বিষয় সকলের বিবরণ অবগত হওয়া যায় না, কেবল মহর্ষি অত্রি ও অন্যান্য দুই একটি ঋষির নাম মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* "They left their parents at an early age, lived with teachers for years and learnt the Vedas and Sciences known to the age, and after studying with such teachers, clever and distinguished boys went up to *Parishads*, answering to the Universities of Europe." Civilisation of India (Temple Primers Series) P. 21.

কিন্তু যাঁহারা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও বৃত্তান্ত স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত জাতক নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় জীবকনামা এক জন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহার জন্মভূমি মগধ। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। মহর্ষি আত্রেয় ইহার অধ্যাপক ছিলেন। যে শাক্য মুনি স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ও উজ্জ্বল আলোকে জগৎ আলোকিত করিয়াছেন তিনিও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি স্বধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন। তখন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ অভ্যুদয়। সর্ব্ব প্রধান বৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনিও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি অন্যূন ২২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গান্ধার প্রদেশের শালাতুর গ্রামে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বংশে গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পাণিনি পুষ্পপুরে আগমনের পূর্ব্বে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তেবাসী ছিলেন। আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি জন্মভূমি ইলাবৃতবর্ষ হইতে প্রয়াগে আগমন কালে ঐ স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন।”

ইউরোপে যেমন আমরা বিদ্বজ্জন সম্মিলনের বহু সভা সমিতি দেখিতে পাই ভারতেও প্রাচীন কালে তদ্রূপ সভা সমিতি বর্ত্তমান ছিল। নৈমিষারণ্য বিদ্যালোচনার এইরূপ একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। তথায় ব্যাস রচিত পুরাণ শাস্ত্র সকল প্রচারিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির ইতিহাসেও হিমালয়ে একটি বিরাট আলোচনা সভা আহূত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। চরক সংহিতায় সেই বিবরণটি এই প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে—

বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতায়ুষাম্॥ ৫
তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥ ৬
অঙ্গিরা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোভৃগুঃ।
আত্রেয়ো গৌতমঃ সাঙ্খ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোঽসিতঃ॥ ৭
অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়াশ্বলায়নৌ।
পারিক্ষিভিক্ষুরাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কপিঞ্জলঃ॥ ৮
বিশ্বামিত্রাশ্বরথ্যৌচ ভার্গবশ্চ্যবনোঽভিজিৎ।
গার্গ্যঃ শাণ্ডিল্য কৌণ্ডিল্যৌ বার্ক্ষির্দেবলগালবৌ॥ ৯
সাংকৃত্যো বৈজবাপিশ্চ কুশিকো বাদরায়ণঃ।
বড়িশঃ সরলোমাচ কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ॥ ১০
কঙ্কায়নঃ ককশেয়ো ধৌম্যো মারীচিকাশ্যপৌ।
শর্করাক্ষো হিরণ্যাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেবচ॥ ১১
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়োদমস্য নিয়মস্যচ।
তপসস্তেজসাদীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ॥ ১২
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্॥ ১৪

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পাহাড়ে মেয়ে

(সঙ্কলিত)

শীত কাল। চারি দিক তুষারে ঢাকা পড়িয়াছে। পথ, ঘাট, মাঠ সাদা হইয়া গিয়াছে। পথ চিনিয়া চলা দুঃসাধ্য।

পাহাড়ে দেশ। লোকের বসতি নাই বলিলেই হয়। দু একখানা কুটীর কেবল মনুষ্য জীবনের পরিচয় দিতেছে।

সেই জনহীন দুর্গম পথে অশ্বারোহণে সে কত ঘন্টাই চলিয়াছে! যে স্থানে রাত্রি কাটাইবে স্থির করিয়াছিল সে স্থান এখনো অনেক দূর। শীতের ভীষণ রাত্রি আসিতে আর বিলম্ব নাই, তার উপর এইমাত্র আবার বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বাতাস উঠিয়াছে। বরফের কণাগুলো তার নাকে মুখে চোখে আঘাত করিতেছে; শ্রান্ত ঘোড়াটা আর চলিতে চাহে না। শীতে তার হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, লাগাম ধরিয়া রাখা যায় না। সে কোথায় যাইবে! কি করিবে! আশ্রয় একটু কোথায় মেলে।

ঐ না! ঐ যে ঐ পাহাড়ের মাথায় একখানি কুটীর দেখা যাইতেছে! আঃ কি আনন্দ! মরু-প্রান্তরে জল দেখিয়া বুঝি তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের এত আনন্দ হয় না!

অনেক কষ্টে ঘোড়াটাকে লইয়া সে কুটীরের ধারে উপনীত হইল। কুটীরের আসে পাশে দীর্ঘ তুষারাচ্ছাদিত দেবদারু গাছগুলো ঝড়ের বেগে নুইয়া পড়িতেছে। কুটীরের মোটা কাঠের কপাট বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে সে সজোরে আঘাত করিল।

এক বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিল। সেই সুদর্শন পথিকের দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, "আহা! ভদ্রলোক কত কষ্টই পেয়েচে! আসুন, আসুন, প্রবেশ করুন।"

তোমোতাদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। কুটীরের পশ্চাতে একটা ছাউনির তলায় অশ্বটিকে বাঁধিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। দেখিল টুকরা বাঁশ ও চ্যাঁচাড়ির আগুনে এক বৃদ্ধ ও এক নবীনা হাত গরম করিতেছে। তাহারা সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে আগুনের ধারে আহ্বান করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আগন্তুককে তার ভ্রমণ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে করিতে আগুনের উপর 'সাকে' গরম করিতে লাগিল। আহার্য্যও প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তরুণী পর্দ্দার অন্তরালে উঠিয়া গেল; তার পরণে ছিন্ন মলিন বসন। মাথায় চিরুণী পড়ে নাই, আলুলায়িত কুন্তল এলোমেলো ভাবে পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ সমস্তের মধ্য হইতে তার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। এই জনহীন পার্ব্বত্যপ্রদেশে এ রত্ন কেমন করিয়া আসিল! কেন, তিমিরগর্ভ কদর্য্য খনিতে কি হীরক থাকে না?

বাহিরে বাতাসে কপাট নড়িতে লাগিল, কুটীর কাঁপাইতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিল, "গ্রাম এখান হইতে অনেক দূরে; বাহিরে অবিরাম তুষার পাত হইতেছে। পথ চিনিয়া ত আপনি যাইতে পারিবেন না। আমাদের কুটীর অতি কদর্য্য, আপনার অসুবিধাও অনেক হইবে। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন ত আজ রাত্রের মত দরিদ্রের কুটীরে থাকিয়া যান। আপনার ঘোড়ার কোনো অযত্ন হইবে না।"

এ বিনীত অনুরোধ তোমোতাদা এড়াইবার চেষ্টা করিল না। বরং তরুণীকে দেখিবার সুবিধা হইল ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিল।

এই বার আহার আসিল। সাধারণ রকমের হইলেও পরিমাণে প্রচুর। তরুণী পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিল। এবার সে একটি পরিষ্কার পোষাক পরিয়াছে, মুক্ত কেশ আঁচড়াইয়া মসৃণ করিয়াছে। সে যখন নত হইয়া তোমাতাদার 'সাকে'র পাত্র পূর্ণ করিতেছে তখন সে বুঝিল তার জীবনে এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী আর দেখে নাই। তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীর মাধুর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কিন্তু বলিল, "আমাদের মেয়েটি এই পাহাড়ে দেশে একলা মানুষ হয়েচে তাই সে ভদ্রলোককে কি ভাবে পরিচর্য্যা করতে হয় তা জানে না। ওর অক্ষমতা দয়া করে মার্জ্জনা করবেন।"

তোমোতাদা সুন্দরীকে দেখিবে, না আহার করিবে! সে অনিমেষ লোচনে তরুণীর মুখ পানে চাহিয়াছিল। তরুণীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কি করিবে! সে তার মুখের উপর হইতে চোখ সরাইতে পারিতেছিল না। আহার্য্য অস্পৃষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিল, "মহাশয়, দয়া করে কিছু পানাহার করুন।

খাবার বড়ই কদর্য্য, কিন্তু মহাশয় শীতে বড় কষ্ট পেয়েচেন, আপনার কিছু আহার করা আবশ্যক।"

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সন্তোষ সাধনের জন্ত তোমোতোদা সাধ্যমত পানাহার করিল। ইতিমধ্যে সেই লজ্জানম্রা তরুণী তার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে তার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিল, তার বাণী তার মুখের মতোই মধুর! পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকালয়ের বাহিরে লালিত হইলেও, তোমোতাদার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, বালিকার মাতাপিতা নিশ্চয়ই সম্রান্ত বংশে সম্ভূত; নচেৎ তার এরূপ মার্জ্জিত ভাব ও ভঙ্গী হইতে পারে না। তোমোতাদা মনের আনন্দ আর গোপন করিতে না পারিয়া হঠাৎ তরুণীকে কবিতায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল—

কাজে চলেছিনু আপনার মনে
সহসা পথের ধারে,
যা' দেখিনু চোখে ফুল ব'লে হায়
ভুল হ'য়ে গেল তারে—
কাজে যাওয়া আর হ'ল না আজিকে
হেথা-ই কাটিল বেলা,
বুঝিতে না পারি অকালে কেন এ
প্রভাতী রঙের মেলা। *

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তরুণী উত্তর দিল—

অঞ্চলে আমি আলোর আভাস
আড়াল করিয়া রাখিগো যদি
তবে বুঝি মম প্রভু প্রিয়তম
রহিবেন হেথা বেলা অবধি। *

তোমোতাদার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তার অনুরাগ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তরুণী যে কবিতা দ্বারা স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিল তা তোমোতাদার অন্তর কি এক নামহীন পুলকে পূর্ণ করিয়া দিল। তার কবিতা-রচনার শক্তিও তাহাকে বিস্মিত করিল। এমন স্ত্রী, এত সুন্দর, এমন বুদ্ধিমতী, সারা বিশ্ব খুঁজিলেও মিলিবে না! তার অন্তরের মধ্যে কে যেন চুপে চুপে বলিতে লাগিল, এমন রত্ন হেলায় হারাইও না!

তোমোতাদা মুগ্ধ, মোহিত হইয়া গিয়াছিল, তাই কোনো ভূমিকা না করিয়া স্বীয় নাম, ধাম ও বংশের পরিচয় দিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিকট কন্তার পাণি প্রার্থনা করিল। তারা এ কথা শুনিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বিস্ময়ের সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মহাশয় আপনি সম্রান্ত বংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। এ আপনার মহৎ অনুগ্রহ। আমরা যে কত দূর কৃতজ্ঞ তা কথায় বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের কন্তা নিতান্ত নির্ব্বোধ, তার কোনো রকম শিক্ষাই হয় নি; মহাশয়ের ন্তায় সম্রান্ত সামুরাই'এর গৃহিণী হওয়া তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু আপনি দেখচি তাকে পছন্দ করেচেন, আর তার গ্রাম্য চালচলন ও অভদ্রতা কৃপা করে মার্জ্জনা করেচেন। সেই জন্ত আমরা উহাকে আপনার হাতে দাসীরূপে সমর্পণ করলুম।"

প্রভাতের পূর্ব্বেই ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। নির্ম্মেঘ পূর্ব্বাকাশে রাঙা সূর্য্যের উদয় হইল। তুষারের উপর তরুণ কিরণ পড়িয়া দিকে দিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল। সেই প্রভাত সূর্য্যের কিরণের ন্তায় লজ্জিত মুখের গোলাপী আভা অঞ্চল দিয়া তার প্রেমিকের চক্ষু হইতে ঢাকিলেও তোমোতাদার আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই! কিন্তু তরুণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও অসম্ভব; তাই যখন যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন সে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কহিল, "আমি যা পেয়েছি তারও অধিক কিছু প্রার্থনা করা অনুচিত, কিন্তু আমি আবার আপনার কন্তার পাণি প্রার্থনা কর্‌চি। তার বিচ্ছেদ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আপনার কন্তাও আমার সহিত যাইতে অসম্মত নয়। তাহাকে আমার হাতে অর্পণ করুন; আমি চিরকাল আপনাদিগকে মাতাপিতার ন্তায় ভক্তি কর্‌ব। গত রাত্রের সদয় পরিচার্য্যার বিনিময়ে এই যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করুন।"

*শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।

বৃদ্ধ কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলিটি আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া কহিল "আপনি অতি দয়াবান্। মুদ্রাগুলি আপনি রাখুন। শীতের দিনে দীর্ঘ পথ যাবার সময় ওগুলি আপনার কাজে আসবে। আমাদের অল্পতেই সংসার চলে, স্বর্ণমুদ্রায় আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা ত আমাদের কন্যাকে আপনার হাতে সমর্পণ করেচি; তারও ইচ্ছা আপনার অনুগমন করে। আমরা কবে আছি কবে নেই, আমাদের মেয়েটির যে একটা গতি হ'ল এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনি তাকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন।"

শুভস্য শীঘ্রং! তোমোতাদা সুন্দরীকে নিজের পার্শ্বে ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইল। তার পিতামাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আনন্দিত চিত্তে যাত্রা করিল।

(২)

তখনকার দিনে সামুরাই নিজ প্রভুর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিতে পারিত না, এবং যে কার্য্যে তোমোতাদা প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন না করিয়া অনুমতি গ্রহণ করা যায় কেমন করিয়া! সেই হেতু কিয়োতো পৌঁছিয়া তোমোতাদা সুন্দরীকে সযত্নে লুকায়িত করিয়া রাখিল; পাছে তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া হোসোকাওয়া-রাজ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন। তিনি সুন্দর মুখের বিশেষ ভক্ত!

কিন্তু কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সুন্দরীকে হঠাৎ এক দিন হোসোকাওয়া-রাজের এক অনুচর দেখিয়া ফেলিল, ও যাঁর তরুণ প্রভুকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। অবিলম্বে সুন্দরীকে বিনা বাক্য ব্যয়ে তোমোতাদার নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল!

তোমোতাদার দুঃখ বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। দাইম্যোর তুলনায় সে সামান্য এক জন কর্ম্মচারী, দাইম্যোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কি করিতে পারে! আর সে ত যোদ্ধার নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, প্রভুর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই গোপনে বিবাহ করিয়াছে। কেমন করিয়া সে প্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিবে? উত্তরে এ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু পলাইবে কেমন করিয়া? পত্র লিখিবে? দাইম্যোর অন্তঃপুরে প্রেম-পত্র পাঠানো, তা-ও ত একটা বিষম ব্যাপার! যদি ধরা পড়ে?

নানা চিন্তার পর পত্রের পরিবর্ত্তে সে একটি চীনা কবিতা রচনা করিল। তার গভীর প্রেম ও অসীম বিরহ-বেদনা কবিতা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়া সন্নিধানে চলিল—

হায়, মণি-লাবণিয়া তরুণীর চোখে
অবিরল জলধার,
আজি, কাছে কাছে রহে' রাজার কুমার
পাছে পাছে ফিরে তার।
ওগো, বড়র প্রীতিরীতি সাগরের রীতি,
উচ্ছ্বাসে সুগভীর;
হায়, আমি দুর্ভাগা ফিরি আজ একা
প্রান্তে এ পৃথিবীর।*

কবিতাটি প্রেরিত হইবার পরদিন সন্ধ্যাকালে দাইম্যোর নিকট তোমোতাদার তলব পড়িল। তোমোতাদা ভাবিল এই বার দফা রফা! কিন্তু এ জীবন লইয়াই বা লাভ কি? এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সে আর সহ করিতে পারে না! তার মরণই ভাল!

হোসোকাওয়া-রাজ সভায় সামুরাই পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তোমোতাদা যখন অভিবাদন করিতে অগ্রসর হইল, তখন সভায় যে নিস্তব্ধতা তা ঝটিকার পূর্ব্বের নিস্তব্ধতার মতো ভয়াবহ। কি এক অজানিত বিপদাশঙ্কায় তোমোতাদার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

অভিবাদনের পর এক অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। হোসোকাওয়া-রাজ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া তোমোতাদার হস্ত ধারণ করিলেন। মুখ তুলিয়া তোমোতাদা দেখিল তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তিনি কহিলেন:—"তোমার কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি।

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

তোমাদের মধ্যে যে গভীর প্রেম সে প্রেমে বাদ সাধিতে পারিব না। অভিন্ন হৃদয় তোমাদের দু'জনকে আমি ঠাঁই ঠাঁই করিব না। আজ এই সভায় সকলের সম্মুখে তোমাদের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইবে।" অচিরাৎ সভা গৃহের পার্শ্বদেশের পর্দা সরিয়া গেল, ও লজ্জারক্তিম মুখে বধূবেশে তরুণী স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

(৩)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শীতের সন্ধ্যায় আগুনের ধারে পতিপত্নী বসিয়া রহিয়াছে। বাহিরে ধূসরবর্ণ চন্দ্রতারকাহীন আকাশ হইতে অবিরাম তুষার-পাত হইতেছে। বায়ু হাহা রবে কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

তোমোতাদার মনে পড়িল আর এক রাত্রে বায়ু এমনি ভাবে বহিতেছিল, তুষার-পাতেরও বিরাম ছিল না। সেই রাত্রে প্রিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

হঠাৎ কাতর চীৎকারে তোমোতাদা চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখে তার স্ত্রীর মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে। শশব্যস্তে সে তাহাকে দুই হাতে ধরিল। স্ত্রী ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "হঠাৎ চীৎকার করে উঠে ছিলুম, আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু বেদনাটা এমনি হঠাৎ এসেছিল! আমাদের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এ জন্মে আমাদের মিলন হয়েছিল, আবার পরজন্মেও হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। তুমি অবিশ্বাস কর্‌চো? কিন্তু সত্যই আমি মর্‌চি। তোমাকে এত দিন বলি নি যে আমি মানবী নই। একটা গাছের আত্মা হচ্ছে আমার আত্মা; গাছের অন্তঃকরণ আমার অন্তঃকরণ। দেবদারু গাছের যে রস তা-ই আমার প্রাণ। এই মুহূর্ত্তে কে আমার গাছটি কাট্‌চে তাই আমি মর্‌চি—বিদায় প্রিয়তম!"

আবার যন্ত্রণা কাতর চীৎকার! প্রতি মুহূর্ত্তে তার শরীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, শেষে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। তোমোতাদা তুলিতে গিয়া দেখে কেবল একরাশ রেশমী পোশাক, তার অভ্যন্তরে দেহের চিহ্নমাত্রও নাই।

* * * *

তোমোতাদা মস্তক মুণ্ডন করিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিধান করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইল। প্রিয়ার স্মৃতি বুকে ধরিয়া, তীর্থে তীর্থে, কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই পাহাড়ে দেশে আসিল। দেখিল সে কুটীর ধূলির সহিত মিশিয়াছে। আছে কেবল তিনটি ছিন্ন-কাণ্ড দেবদারু গাছের মূল। গাছগুলি দেখা গেল সে আসিবার বহু পূর্ব্বে কর্ত্তিত হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান ও অপমান

কে বলে গৌরবে বাড়ে প্রাণের গরব?
কিরীট-কুসুম-ভারে পড়ে চূড়া নুয়ে,
দিগন্ত নোয়ায় মেঘে, সলিল বিভব,
সম্মান ভারের মত শিরে টানে ভুঁয়ে।
দিলে যা সম্মান ভার গুণীর মাথায়,
কেমনে বহিবে তাহা এই দ্বিধা ভয়ে,
গুণী যে রহিল নত জগতের পায়,
সবার সঞ্চিত ধন নিজ শিরে ব'য়ে!

কে বলেছে অপমানে দণ্ডী বিদ্রোহীর
নুয়েছে উদ্ধত শীর্ষ পথের ধূলায়?
ফলের গৌরব গেলে শাখী দৃপ্তশির,
পদাঘাতে, দর্পে ফণী গরজে ফণায়।
অপমানে সবি যদি লহ তার হরে,
হতাশ বিদ্রোহী সে যে সকলি হারায়ে!
উৎপতিত ধনু, গুণ ছিন্ন হ'লে পরে,
সবেগে বিঁধিয়া বক্ষ উঠিবে দাঁড়ায়ে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কাছাড়ী বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ *

বিবাহ—প্রাচীন কালে কাছাড়ীদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে, এবং অনেকটা গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। আধুনিক বিবাহ প্রথা চার প্রকার—

(১) গন্ধর্ব্ব প্রথা :—পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হয়। এই প্রথা সমাজে অনুমোদিত না হইলেও এবং নিন্দনীয় হইলেও অসিদ্ধ নহে। এইরূপে বিবাহ হইলে কন্যার পিতা-মাতা বর হইতে দণ্ডস্বরূপ নগদ পাঁচ টাকা এবং কন্যার জন্য প্রচলিত দেয় পণ অপেক্ষা কয়েকটি মুদ্রা বেশী আদায় করিয়া লয়। এই বিষয়ের মীমাংসা হইলেই বিবাহের সকল গোল মিটিয়া যায়।

(২) সাধারণতঃ যে ভাবে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা এইরূপ। পুত্র পনর বৎসর অতিক্রম করিলেই পিতা মনোমত পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান হইলে গ্রামের কয়েক জন মাতব্বর ও পাত্রের পিতা চাউল, মদ, সুপারি প্রভৃতি উপঢৌকন সহ পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এই সকল উপঢৌকন গ্রহণ করিলে পাত্রীর স্বজনগণ প্রস্তাবিত বিবাহে অনুমোদন করিল বুঝা যায়। বিবাহে উভয় পক্ষের অভিমত হইলে তৎক্ষণাৎ কন্যার জন্য দেয় পণ বা “গা-ধনের” পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। পণের পরিমাণ ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা, কিন্তু কামরূপ বা গোয়ালপাড়াতে পণের পরিমাণ ১০০৲ টাকার কিঞ্চিৎ বেশী। বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হওয়ার অনেক দিন পরে বিবাহ হইয়া থাকে, এবং পণের টাকা বিবাহের সময়ই প্রদত্ত হয়। বালিকা যৌবন সীমায় পদার্পণ না করিলে বিবাহ হয় না, সুতরাং বিবাহের কথা স্থির হইলেও অনেক স্থলে কিছুদিন উভয় পক্ষকেই অপেক্ষা করিতে হয়।

(৩) যদি বরপক্ষ গা-ধনের টাকা দিতে না পারে তবে বর তৎপরিবর্ত্তে শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়া খাটিয়া দিতে পারে, এবং উভয় পক্ষ পরামর্শ করিয়া সময়ের পরিমাণ স্থির করিয়া লয়। তবে বরকে ৩ বৎসরের কম ও ১৫ বৎসরের বেশী খাটিতে হয় না। এক বৎসর কি দেড় বৎসর খাটিলেই কন্যা স্বামি-সংসর্গ করিতে পারে। এবং খাটিবার নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইলে স্বামী-স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা যাইয়া বাস করিতে পারে। এই প্রথার নাম ওলাও খর জিয়া।

(৪) ‘ঘরজামাইয়া’ বিবাহ প্রথাও কাছাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঘরজামাইয়া কাছাড়ীকে স্বীয় পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হয়, এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর সে তদীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

কাছাড়ী বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম ক্রিয়া নহে। ইহা একটা সামাজিক মিলনোৎসব ও প্রীতি ভোজন মাত্র। পাত্রী বাড়ী আনার নামই বিবাহ।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ৩০।৪০ জন পুরুষ ও ৪।৫ জন রমণী কতগুলি খাদ্য দ্রব্য লইয়া পাত্রীর বাড়ীর দিকে যাত্রা করে। দুই জন লোক একটা শূকর বহিয়া লইয়া যায়, আর দুই জনে একটা মদের জালা ভাড়াইয়া নেয়। তা' ছাড়া চার জন চার বোঝা পান মাথায় করিয়া লয় আর এক জন রাখাল বালকদের জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাত্রা করে। পাছে রাখালেরা পাত্রীর বাড়ীতে প্রবেশের পথে কোনও বাধা জন্মায় এই ভয়ে তাহাদের তুষ্টি-সাধনের জন্যই খাদ্য দ্রব্যাদি লওয়া হইয়া থাকে। সময় সময় বর স্বয়ংও ইহাদের সঙ্গে যায়। বরযাত্র কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের উপর কাদুপানী নামক এক প্রকার আলাকর তরল পদার্থ ছিটাইয়া দেয়, এবং বরযাত্রগণও নীরবে এই

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয়াংশ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিবাদন গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক সময় কাছু-প্যান্সী শরীরে লাগিয়া কোস্কা পড়িতেও দেখা গিয়াছে। তৎপর আনীত দ্রব্য সম্ভার কন্যাপক্ষীয়গণের তত্ত্বাবধানে আইসে এবং অবিলম্বে বিবাহ-ভোজের আয়োজন হইতে থাকে।

ভোজের সময় গ্রামের মাতব্বরেরা পংক্তিবদ্ধ হইয়া সম্মুখভাগে এবং বালকেরা ইহাদের পশ্চাৎভাগে বসিয়া যায়। প্রত্যেকের সম্মুখে এক এক খণ্ড কলাপাত বা এক একটা পিতলের থালা স্থাপিত হয়। এইরূপে সকলে উপবেশন করিলে পাত্রী, স্বয়ং প্রত্যেক পত্রে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করে। পরিবেশন সমাপ্ত হইলে কন্যা ঈষৎ অবনত মস্তকে সকলকে অভিবাদন করিয়া এবং কখনও কখনও জানু পাতিয়া তাহাদের সম্মুখে উপবেশন করিয়া, প্রস্তাবিত বিবাহ কার্য্যে তাহাদের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া থাকে। বর উপস্থিত থাকিলে সেও কন্যার সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এইরূপে প্রার্থনা-কার্য্য সমাপ্ত হইলে জনৈক মাতব্বর সংক্ষেপে পরিণয়ার্থী যুবক যুবতীর মঙ্গল কামনা করে, এবং তাহার বক্তব্য শেষ হইলে সকলে "ইরইনা জাচাং" অর্থাৎ তথাস্তু বলিয়া তাহার আশীর্ব্বাদের সাফল্য কামনা করিয়া থাকে। অবশিষ্ট দিন পান-ভোজন ও আমোদ-উৎসবে কাটিয়া যায়। সন্ধ্যা কালে পাত্র পাত্রী লইয়া যাত্রা করে। যদি পথে কোনও নদী বা আলি পার হইতে হয় তবে প্রতি বার পাত্রীকে ৯টি সুপারী ও ৯টি পান দেওয়া হইয়া থাকে। এক একটা নদী বা আলি বরের বাড়ী যাওয়ার পথে বধূর স্বামি-গৃহে গমনের অনিচ্ছার চিহ্ন ধরিয়া পান ও সুপারী দ্বারা তাহার এই অনিচ্ছা দূর করা হইয়া থাকে। ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক বরযাত্রীই এক জালা গুড় ও এক জালা মদ পাইয়া থাকে, এবং রাত্রে তাহাদের ভোজনের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে বধূ-বর পান সুপারী বদল করে। একটি মোরগ ও একটি মুরগী দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়, এবং উৎকৃষ্ট মুরগীর মাংস রন্ধন করিয়া বধূ-বর একত্র ভোজন করিয়া থাকে; কিন্তু পাঁচ দিন অতীত না হইলে এই বিবাহ সিদ্ধ বা পাকা হয় না। এইরূপ বিবাহ ব্যাপারে অন্যূন ২০০৲ দুই শত টাকা খরচ হয়, এবং এই সম্পূর্ণ খরচ পাত্র পক্ষই বহন করিয়া থাকে। এই প্রথা মেচ নামক কাছাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

প্রাচীন যুগে কাছাড়ীদের বিবাহ আপন আপন সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় যদিও একত্র আহার-বিহার করিত তথাপি পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। আজ কাল এই নিষেধ বিধি উঠিয়া যাইতেছে। এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না হইলেও, প্রশস্ত নহে, এবং এইরূপ বিবাহ হইলে বরকে কিঞ্চিৎ অর্থ-ব্যয় করিয়া গ্রাম্য লোককে বিশেষ ভোজ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয়। এই ব্যাপারটা আমাদের পাক-স্পর্শের ভোজের মত।

শোণিত-সম্পর্কে বা অন্যরূপে ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সহিত বিবাহের কোন রূপ বিধান বা নিষেধ নাই। বিপত্নীক তাহার পূর্ব্ব পত্নীর কনিষ্ঠা সহোদরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে, জ্যেষ্ঠাকে পারে না। পত্নীর জ্যেষ্ঠা সহোদরা মাতৃ-তুল্যা। অপর পক্ষে বিধবা রমণী তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইতে পারে, জ্যেষ্ঠকে পারে না।

কাছাড়ীরা বহুবিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নহে। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দুই বিবাহে দোষ নাই। মৌজাদার, মণ্ডল প্রভৃতি ধনী ও উচ্চপদস্থ কাছাড়ীরা কদাচিৎ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। কাছাড়ী স্ত্রী কখনও একাধিক স্বামী গ্রহণ করে না। কিন্তু ভুটান ও তিব্বতে এই প্রথার প্রচলন আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

কাছারী রমণীর সতীত্বের আদর্শ হীন নহে। যৌবনে ইহাদের চরিত্র কলঙ্কিত হইতে প্রায়ই দেখা

যায় না। বিবাহিত ভ্রষ্টা রমণীর দৃষ্টান্ত বিরল এই কথা বলিলেও কাছাড়ী রমণীর চরিত্রের প্রতি একটু কটাক্ষ হইয়া থাকে। যদি দৈব-বশে অবিবাহিতা কাছাড়ী যুবতীর গর্ভসঞ্চার হয় তবে দোষী ব্যক্তির নাম অবগত হওয়ার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে—

প্রাঙ্গণস্থ 'সিজ' বৃক্ষের মূলদেশে সন্ধ্যাগমে কিছু চাউল গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখা হয়। রাত্রি প্রভাতে পরিবারস্থ সকল লোক বৃক্ষ-তলে সমবেত হয় এবং সেই চাউল তুলিয়া বয়স্থা বালিকাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। অপরাধিনী ভয় হেতু ভাল করিয়া চাউল চিবাইতে পারে না। এইরূপে পরীক্ষায় যে অপরাধিনী সাব্যস্থ হয় তাহার নিকট হইতে অপরাধীর নাম পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে প্রচলিত 'পা-ধন' অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ দণ্ড দিতে হয়, এবং তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, এই গর্হিতাচরণ দ্বারা সে যাবতীয় গ্রামকে কলঙ্কিত এবং স্বীয় চরিত্রকে দূষিত করিয়াছে।

বিবাহচ্ছেদ বা তালাক।

কারণ থাকিলে স্বামী পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু পত্নী স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিবাহ বন্ধন সাধারণতঃ উভয়ের মতানুসারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

বিবাহচ্ছেদের কারণ উপস্থিত হইলে, পতি-পত্নী গ্রাম্য মাতব্বরগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং মাতব্বরেরা উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিলে বিবাহচ্ছেদ অনুমোদিত হইয়া থাকে।

বিবাহচ্ছেদের আদেশ হইলে একটা পান দুই ভাগ করিয়া চিরিয়া দেওয়া হয়—উদ্দেশ্য, এই চিরা পান যেমন আর মিলিতে পারে না তদ্রূপ বিবাহবন্ধনচ্ছেদার্থী পতি পত্নীরও আর মিলন হইতে পারে না। এই অনুষ্ঠানের নাম পান্দ চিরা। এই পান চিরার পর হইতেই তাহারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যায়।

স্বামীর পক্ষে বিবাহচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ থাকিলে, অর্থাৎ রমণী ব্যভিচারিণী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে স্বামী তাহার বিবাহে যে পরিমাণ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল তাহা দাবী করিতে পারে, এবং যে ব্যক্তি এই ব্যভিচারিণীকে পুনরায় পত্নীরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার নিকট হইতে এই রমণীর পূর্ব্ব স্বামী সেই খরচের পরিমিত, অর্থাৎ, অন্যূন ১৫০৲ ও অনূর্দ্ধ ২০০৲ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। এই টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন রমণীই দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না।

মণিপুরে বিবাহিত রমণী প্রলোভনে পড়িয়া পর পুরুষের সহিত পলায়ন করিলে, রমণীর স্বামী তাহার দাম্পত্য স্বত্ব ভঙ্গের জন্য অপরাধীর নিকট দণ্ড স্বরূপ ৬০৲ টাকা দাবী করিতে পারে, এবং এই ৬০৲ টাকা প্রদান করিলেই অপরাধী ব্যক্তি রমণীটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে, অন্যথা রাজদ্বারে তাহার কারাবাসের ব্যবস্থা হয়। এই অপরাধে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মণিপুরে এক ব্যক্তির ৬ মাসের কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ফতেজঙ্গপুর

আর এস, এন কোম্পানীর বরিশাল তারপাশা লাইনের জবসা ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে এক মাইল দূরে একটি পুরাতন স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার উত্তরাংশের নাম "নগর" ও দক্ষিণাংশের নাম "ফতেজঙ্গপুর"। স্থানটি দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। এই নগর ও ফতেজঙ্গপুর সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বীরকাহিনীশীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত ফতেজঙ্গপুর গ্রাম-

কেই বঙ্গের শেষবীর কেদার রায়েরপরাজয়-স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা—শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক ফতেজঙ্গপুরই পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ-স্থল কিনা এ প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ তাহা লইয়াই আলোচনা করিব।

ইলিয়ট সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের শাসন সময়ে শ্রীনগর নামক স্থানে ফৌজ থাকিত, এবং ঐ স্থানেই কেদার রায়ের সহিত বাদশাহী সৈন্যের শেষ যুদ্ধ সংসাধিত হয়। আমরা বর্ত্তমান 'নগর' গ্রামকেই শ্রীনগর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

"ফতেজঙ্গপুর" শব্দটি পার্শী ভাষা হইতে গৃহীত; অর্থ যুদ্ধ-জয়-স্থান। শব্দটী পার্শী; কাজেই মুসলমান কর্ত্তৃক স্থানটির নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় নয়। কাজেই যে যুদ্ধই এখানে সংঘটিত হইয়া থাক না কেন, বোধ হয় উহাতে মুসলমানই জয় লাভ করিয়াছিল।

এদিকে, যেইরূপে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পাণ্ডুয়ায়, লক্ষ্মণাবতী লাক্ষ্মৌতিতে এবং পাটলীপুত্র পাটনায় পরিণত হইয়াছে, সেইরূপে "শ্রীনগর" "নগরে" পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই ইহা হইতেই প্রায় নগরকে শ্রীনগর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ প্রথমতঃ সমস্ত জায়গাটির নামই শ্রীনগর ছিল; পরে সহরের দক্ষিণাংশে জয় লাভ করিয়া মুসলমানেরা ঐ অংশটিকে ফতেজঙ্গপুর নাম প্রদান করেন।

ইহা ছাড়া স্থানটির অবস্থান ও পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের সহায়তা করিতেছে। দেখা যায় যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় নির্ম্মিত শ্রীপুর হইতে যে বিখ্যাত "কাচকীর দরজা" লেদামের নদী পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক সোজাসুজি না গিয়া বাঁকাইয়া নগর ফতেজঙ্গপুরের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। অপর, বিখ্যাত কালীগঙ্গা নামক নদী সে সময় শ্রীপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত এবং ইহার একটি প্রধান শাখার তীরেই নগর ও ফতেজঙ্গপুর অবস্থিত ছিল। ঐ নদী এখন "কালীগঙ্গা" বা "ফতেজঙ্গপুরের বাঁদ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে সে সময় স্থানটি যে শ্রীপুরের সহিত বিশেষভাবে সংযোজিত ছিল ইহা হইতে তাহা নিরূপিত হয়। এই সমস্ত অবস্থা পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসেরই সহায়তা করিতেছে।

এইস্থানে পূর্ব্বে যে নবাব সৈন্য থাকিত, প্রবাদ ও তাহার সাক্ষী প্রদান করিতেছে। "দীগম্বরী" প্রণেতা শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঘটক মহাশয় পুরাতন কাগজপত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ফতেজঙ্গপুর হইতে দামাদ সাহেব নামক জনৈক মুসলমান সেনানায়ক রূপ-লাবণ্য বিভূষিতা দীগম্বরী নাম্নী হিন্দু বালিকাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করেন। পার্শী দামাদ শব্দে জামাই বুঝায়। কাজেই এই দামাদ শব্দে হয়ত কোনও নবাবের জামাতা কিলমককেই বুঝাক বা অন্য যাহাকেই বুঝাক সে সময় ফতেজঙ্গপুরে যে সৈন্য থাকিত ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই ঘটনা চাঁদকেদারের শাসন সময়ের প্রথম অংশেই ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ পূর্ব্বোক্ত আক্রমণের সময় কেদার রায়ের গুরু গোসাঞী ভট্টাচার্য্যের পিতা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

স্থানীয় কেহ কেহ বলেন রাজা রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র গোপাল বাবু ও কার্ত্তিকপুরের জমিদারদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা এই স্থানে ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থানটির নাম ফতেজঙ্গপুর হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। কারণ ঐ যুদ্ধ যে ঘড়িসারে ঘটিয়াছিল প্রথমতঃ প্রবাদ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সেই যুদ্ধের যেই সমস্ত চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই ঘড়িসারের চতুঃপার্শ্বে। ফতেজঙ্গপুরে প্রাপ্ত পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, রাজা রাজ-

রাজত্বের সময়ও স্থানটি ফতেজঙ্গপুর নামেই অভিহিত হইত। কাজেই গোপাল বাবুর যুদ্ধ হইতে স্থানটির নামকরণ হওয়া অসম্ভব। রাজনগরের ইতিহাস প্রণেতা ঐ যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন; যুদ্ধ ষড়িসারে ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই গোপাল বাবু ও কার্ত্তিকপুরের জমিদারদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা যে এখানে ঘটে নাই এবং তাহা হইতে যে স্থানটির নামকরণ হয় নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

অবশ্য, রাজনগর, নড়াকুল প্রভৃতি স্থান পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল বলিয়া কেহ কেহ স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন; কিন্তু সেইরূপ সন্দেহের মূলে কোন ভিত্তিই বর্ত্তমান নাই। কারণ এইরূপ অনেক মহানগরীর অস্তিত্বের কথা শুনা যায় যাহা সে কালীন রাজা মহারাজের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়া সমগ্র জগতে আপন প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু কালকবলে পতিত হইয়া এখন বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। আজ কয়েক দিন হয় উক্ত 'নগর' গ্রামে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্ম্মিত পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তিও স্থানটির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। মূর্ত্তিটি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ্ গৃহে রক্ষিত আছে। পক্ষান্তরে উত্তর বিক্রমপুরের শ্রীনগর যে অতি অল্প দিন যাবৎ উক্ত নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে, প্রবাদ হইতেই তাহা নিরূপিত হয়। অনধিক ১৫০ শত বৎসর যাবৎ পুরাতন রাইবর গ্রাম শ্রীনগর নামে অভিহিত হইতেছে। কাজেই বর্ত্তমান নগর ফতেজঙ্গপুরই যে পুরাতন শ্রীনগর তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, বিপ্লব মহামারী, বা অন্য কোনও কারণে পরবর্ত্তী সময়ে স্থানটি জনশূন্য হইয়া থাকিবে।

দেখা যায়, মুসলমান রাজত্বের সময় যখনই যেখানে কোন হিন্দু জমিদার বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে জমিদারের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে মুসলমান-প্রধান স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাদশাহগণ সতর্কতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয়সমূহ হইতে নগর-ফতেজঙ্গপুরকেও শ্রীপুরের রায় রাজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত মুসলমান প্রধান স্থান বলিয়াই বোধ হয়। এখনও উক্ত স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অসংখ্য মুসলমানের বাস। চাঁদাকেদারের অসীম ক্ষমতানিবন্ধন বাদশাহ এই স্থানে এক জন উচ্চ কর্ম্মচারীর অধিনায়কতায় অধিক সংখ্যক সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহারা সহরের দক্ষিণাংশে নদীতীরে বাস করিত।

শ্রীনগরের ইতিহাস এই, রাজা কেদার রায় শ্রীনগরে রক্ষিত বাদশাহী সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমককে আক্রমণ করিলে তিনি কিছু কাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। পরে রাজা মানসিংহ মগরাজাকে (নেঙরাম মেঙ্—Ngyaung Ram Meng) পরাজিত করিয়া পাঁচশত রণপোত সংগ্রহকারী কেদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং কিলমকের সাহায্যার্থ কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সমস্ত সৈন্যের সহিত কেদার রায়ের এক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সংঘটন হয়। পরিশেষে কেদার রায় পরাজিত হইয়া বন্দী হন। কিন্তু রাজসন্নিধানে নীত হইবার অত্যল্প কাল পরেই যুদ্ধে প্রাপ্ত ভীষণ ক্ষত হইতে তাহার মৃত্যু ঘটে। (১)

শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

---

1. Raja Mansingh after defeating the Magh Raja turned his attention towards Kaid Rai of Bengal who had collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the Imperial commander in Srinagar. Kilmak held out till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after he was brought before the Raja. (Elliot's History of India Vol VI. Takmili Akbarnama. P III).

মিনির ঘটকালী

ভাল করিয়া গোঁপের রেখা দিতে না দিতেই ২১ বৎসর বয়সে যখন প্রকাশচন্দ্র এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া বসিল, তখন তাহার সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরাই বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল যে, এই ছেলের দশা হ'বে কি? এর কাছে এখন মক্কেলই বা আস্‌বে কেন, জজই বা কথা মান্‌বে কেন? পয়সার বিশেষ অভাব না থাকিলেও প্রকাশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল "গাজীপুরে গিয়া এখনই 'প্র্যাকটিস্' আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।" বাড়ীর লোকে বলিল 'অত দূরে কেন?' প্রকাশ বলিল পশ্চিমে, শরীরটা থাক্‌বে ভাল। প্রকাশচন্দ্র গাজীপুর রওনা হইল;—তখন দুই তিন স্থান হইতে তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে।

গাজীপুরে গঙ্গার ধারে প্রকাশ একখানি বাংলায় বাসা লইল। ব্রাহ্মণ ও চাকর যোগাড় করিতেও বিশেষ কষ্ট পাইল না।

হায়রে পশ্চিম! শরীর ভাল ত বোধ হয় প্রত্যহ 'পঞ্চতিক্ত পাচন' বা অনুরূপ অন্যান্য কৃচ্ছ্র সাধন করিলেও থাকে। সাধের পশ্চিমের দারুণ গ্রীষ্মে প্রকাশচন্দ্রের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। সম্মুখেই শীর্ণকায়া গঙ্গা, শীতল বাংলা দেশের দিকে প্রাণপণে ঢেউ টানিয়া চলিয়াছে। অবশিষ্ট তিনদিকে অনলবাসী প্রান্তরের মাঝে দুএকটি বাংলো রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। দূরে দূরে কৃষকেরা 'পাইকোটা' করিয়া মরুক্ষেত্র জলসিক্ত করিবার বৃথাই চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে আর্দ্রতার নাম নাই; কেবল ধূলার গন্ধ, নাক জলিয়া যায়। কোনদিকে শ্যামলতার চিহ্ন নাই; কেবল পাংশুবর্ণ কঙ্কর, চোখ ঝলসিয়া যায়। শরীরে একবিন্দু ঘাম হয় না, যে বাতাস খাইয়া স্নিগ্ধ হইবে।

প্রকাশচন্দ্র সেই গরমেও একটু কবিত্ব করিয়া ভাবে—'মার স্নেহ ছাড়িয়া এ কোন বিমাতার নির্যাতনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম! কোর্টে দুচার দিন গিয়া 'প্র্যাক্‌টিস্' করিয়া আসিয়াছে। এখন দুপর বেলা ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবে, এত শীঘ্র বাড়ী ফিরি কোন্ লজ্জায়! কিন্তু যে লজ্জাতেই হউক বাড়ী যে ফিরিতে হইবে, সেটা ক্রমেই ঠিক হইয়া আসিল। চিঠি দিল 'এখানে আমার শরীর ভাল থাকিতেছে না, শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি।'

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। প্রকাশচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া 'গেটের' কাছে একটা নিমগাছের তলায় চেয়ার লইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় একটি ৯।১০ বৎসরের বালিকা আসিয়া তাহাকে বলিল "তোমাদের বাড়ীর মধ্যে আমার মিনি গিয়েছে, নিয়ে আস্‌ব?" ফুট্‌ফুটে রঙ্। উজ্জ্বল নির্ভীক চক্ষু। বালিকা বোধ হয় ছুটাছুটি করিতেছিল—সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে। গুচ্ছগুচ্ছ কোঁকড়া চুলে ঢাকা মুখখানি শিশিরসিক্ত ঈষচ্ছিন্ন গোলাপ কলিকার মত বড়ই রমণীয় দেখাইতেছিল। প্রকাশ বুঝিল, মেয়েটি পাশের বাংলোর ডাক্তার বাবুর মেয়ে। যা হ'ক একটা কথা কহিবার লোক পাইয়া বলিল "তোমার মিনি আমার দুধ খেয়ে ফেলে—আমি যদি না ছেড়ে দিই?"

বালিকা ঘাড় কাঁপাইয়া বলিল "বাঃ' তা দেবে না কেন? মিনি ত মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীরও দুধ খেয়ে ফেলে। দুধ ভাল কোরে ঢেকে রাখ্‌লেই পার।" প্রকাশ হাসিয়া বলিল "তা, আজ নিয়ে যাও, কিন্তু আর যেন এ বাড়ীতে না আসে।"

বালিকা বলিল "সে কথা আমি কি কোরে বলব? বেড়ালের কি বুদ্ধি আছে যে, আমি বল্‌লেই আর আস্‌বে না!"

প্রকাশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া উঠিল। বালিকা ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া মিনির ঘাড় ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে বাহির করিয়া আনিল। যখন গেট্ পার হইয়া যায় তখন প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি?"

বালিকা বলিল "আমার ডাক নাম পানু, ভাল নাম মৃণালবালা।" বালিকা চলিয়া যায় ; প্রকাশ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, "আমার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে না!"

পানু প্রকাশের মুখের উপর একটুখানি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" প্রকাশ বলিল, "আমার নাম 'সেদো'।"

বালিকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মিছে কথা, তা হতেই পারে না।" প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হ'তে পারে না?"

পানু বলিল "তা কেমন কোরে হবে!" বলিয়া আবার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তখন প্রকাশ বলিল, "আমার নাম প্রকাশচন্দ্র।"

হাসি থামাইয়া বালিকা গম্ভীর ভাবে প্রকাশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল 'তা হ'তে পারে।"

এমন সময় মিনি হঠাৎ হাত ছাড়াইয়া মাটিতে পড়িয়াই দৌড় দিল। বালিকাও তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল। সে দিন এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। আজকাল করিয়া প্রকাশের বাড়ী যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না। দুপরের ট্রেণে—যে গরম! রাত্রির ট্রেণে—তাইত! মিনিও প্রকাশের দুগ্ধপূর্ণ কটাহের স্থান নিরূপণ করিয়া লইয়াছে।

"মা, আমি নিচ্চয় বলছি, নিচ্চয়!"

মা বলিল " কি নিশ্চয়!"

"দেখ্‌ছো না, মিনি মুখ আঁচ্‌ড়াচ্ছে।"

"তা কি হোয়েছে!"

"যাই আমি দেখে আসি" বলিয়া পানি খাবার ফেলিয়া উঠিল। মা বলিল "কোথা যাস্? খেয়ে যা।"

"না মা, মিনি নিশ্চয় আবার প্রকাশ বাবুর দুধ খেয়ে এসেছে।"

পানি সেই দুপর রৌদ্রে ছুটিয়া প্রকাশের বাসায় আসিল। দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বালিকা দেখিল, প্রকাশ চৌকির উপর গভীর নিদ্রা মগ্ন, আর ঘরের কোণে ষ্টোভের উপর হইতে দুধ শুদ্ধ কড়াই উল্‌টিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মেঝেয় দুধ গড়াইয়া যাইতেছে।

"ওমা, আমার কি হবে?"

প্রকাশ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল বালিকা গ্রীবা বাঁকাইয়া কপোলে তর্জ্জনী টিপিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্রে ছুটিয়া আসায় মুখখানি ঠিক গোলাপ ফুলের মতই রাঙ্গা হইয়াছে। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে পানু!"

"কি হয়েছে? উঠে দেখ। এমন ঘুমও তোমার!"

প্রকাশ দেখিল, সব দুধ পড়িয়া গিয়াছে। বামুন আসে নাই, নিজেই ষ্টোভে দুধ জাল দিয়া অপরাহ্নের যোগাড় হইল ভাবিয়া প্রকাশ ঘুমাইতেছিল। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিল—"এ তোমার মিনির কাজ, নিশ্চয়ই!" বালিকা বড় অপ্রতিভ হইল। ৩।৪ দিন মিনি এই রকম দুধ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অনুতপ্ত হইয়া বলিল "দুধ ভাল কোরে রাখনি কেন! তোমার বামুন কোথায়?"

"বামুন আজ আসেনি, বোধ হয় আসবেও না।"

"তবে তুমি কি খাবে!"

প্রকাশ বলিল "সে যা হয় হবে। তুমি এই রৌদ্রে ছুটিয়া আসিয়াছ কেন?" "তুমি আজ খাবে কি?—আচ্ছা প্রকাশ বাবু, তুমি একলা থাকো কেন? তোমার মা কোথায়?" বালিকার স্বর করুণার্দ্র।

"আমার মা বাপ সকলেই বাড়ীতে আছেন, আমি এখানে কাছাড়ীতে কাজ করি।"

"আজ রাত্রিতে আমাদের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ।"

"আমরা কুলীন বামুন, তোমাদের বাড়ী যাবো কেন?"

"ইস! আমাদের চেয়ে? আমরা খুব বড় কুলীন!" কৌলিণ্যাভিমানে বালিকার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত ও বঙ্কিম গ্রীবা ঋজু হইয়া উঠিল।

প্রকাশচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তুমি নিমন্ত্রণ কর্‌লে ত

আমি যেতে পারি না, তোমার বাবা ত নিমন্ত্রণ করেন নাই।”

“আমার নিমন্ত্রণ নেবে না? বেশ!” চোখের উপর হইতে চুলের গুচ্ছ সবেগে সরাইতে সরাইতে বালিকা ঘরের বাহির হইয়া গেল। প্রকাশ উঠিয়া ধরিতে আসিলে ছুটিয়া পলাইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজমোহন বাবু আসিয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রকাশকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যার পর পুনরায় নিজে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। দুই জনে খাইতে বসিয়া রাজমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“পাড়ে” পানু খেয়েছে?”

পাড়ে বলিল “না, মা ঠাকরুণ কিছুতেই খাওয়াতে পারলেম না।”

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, কি হয়েছে?”

রাজমোহন বাবু বলিলেন, “কি জানি, দুপর বেলা থেকে কি রাগ হয়েছে। মেয়ের কিসে রাগ হয় কিসে না হয় কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।” প্রকাশ কিন্তু বুঝিতে পারিল, কিছু বলিতে পারিল না।

পানুর বৌদিদি পানুকে অনেকটা চিনিত। সে বলিল—“কি লা! না খাবি নাই খাবি, প্রকাশবাবু ত তোর বর নয়, সাম্‌নে বেরুতে লজ্জা কি?”

সহসা পানু উঠিয়া যেখানে পিতা ও প্রকাশ বাবু আহার করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বলিল, “পাঁড়ে, আমার এইখানে খাবার দিয়ে যাও।”

পানুর মার আপত্তি সত্ত্বেও শেষে সেইখানেই তাহাকে খাবার দিতে হইল। প্রকাশবাবুদের আহারের পূর্ব্বেই আহার সমাপ্ত করিয়া বালিকা চলিয়া গেল। প্রকাশ যে তাহার বর নয় সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

“মর মর, তুমি শীগ্‌গীর মর, তোমার দুধ খাওয়া ঘুচে যাক্‌!” পানুর মা বলিল, “ওকি লা, বেড়ালটাকে বেঁধে আবার অমন করে ঠ্যাঙাচ্ছিস কেন?”

“দেখ দেখি মা; হতভাগা মিনি আবার প্রকাশ বাবুর সব দুধ খেয়ে ফেলেছে।”

“তা বল্‌ছি ত মা, ও হতভাগা বেড়ালটাকে বিদেয় কোরে দে। ভদ্রলোককে আধেকদিন খেতে দেয় না।”

“তা বেড়ালের দোষ কি? আমি শিকে পর্য্যন্ত টাঙিয়ে দিলাম, বাবু সেখানে দুধ রাখ্‌তে পারেন না।” বলিতে বলিতে পানু একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। পানুর মা এবং বৌদিদি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

হতভাগা বেড়াল, ভদ্রলোককে আধেক দিন খেতে দেয় না! বৈকালবেলা রামশরণকে সঙ্গে লইয়া পানু মিনিকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে চলিল। ওপারে নৌকা পৌঁছিলে রামশরণ মিনিকে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়াই নৌকা ঠেলিয়া দিল। মিনি জলের ধারে আসিয়া নিরুপায় সকরুণ স্বরে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। পানি সে দিকে চাহিল না;—মনে মনে বলিতে লাগিল ‘হতভাগা বেড়াল, ভদ্রলোককে অধেকদিন খেতে দেয় না।”

সকলেই জানিল, পানি তার মিনিকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া আসিয়াছে। ইহাতে পানির পিতা মাতা একটু দুঃখিত হইলেন। এই বাঙ্গালীবর্জ্জিতপ্রায় দূর পশ্চিম দেশে মিনিই মেয়েটির একমাত্র সঙ্গী ছিল। প্রকাশও শুনিল। তাহার কাব্যরসসিক্ত হৃদয় মুহূর্ত্তেই সজাগ হইয়া উঠিল, বলিল ‘একি! এ যে সর্ব্বস্ব লইয়া কথা’।

মিনি নাই, সুতরাং পানুর আর প্রকাশের বাসায় যাইবার কোন আবশ্যক হয় না। কিন্তু পানুকে দেখিবার জন্য প্রকাশের বাসনা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে আর বেশ সহজভাবে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিল না। অথচ তাহাকে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে চিঠির উপর চিঠি আসিতেছে, ‘শরীর অসুস্থ লিখিয়াছ, বাড়ী আসিতেছ না কেন? শীঘ্র চলিয়া আসিবে।’

এক দিন সন্ধ্যার পর রাজমোহন বাবু নানা কথার মধ্যে প্রকাশের কাছে পান্নুর কথাই বেশী করিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন। শিশুকাল হইতে তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অনন্যসুলভ গৃহকর্ম্মদক্ষতা এবং সর্ব্বশেষে বিড়াল নির্ব্বাচনের কথাও বলিলেন। সহজেই অনুমিত হইতে পারে, ভদ্রলোকের একটা গুরুতর অভিসন্ধি আছে। প্রকাশের পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহাকে এক পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর পাইয়াছেন যে, এ সম্বন্ধ উভয় পক্ষেই আনন্দজনক হইত, কিন্তু কন্যাটি নিতান্ত বালিকা, এবং প্রকাশের পিতা অন্যসূত্রে অবগত আছেন যে, প্রকাশের বালিকাবিবাহে আদৌ মত নাই। সুতরাং পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি এ কার্য্য করিতে পারেন না।

অবশেষে রাজমোহন বাবু তাঁহাদের পত্র লেখালিখির কথাটি গোপন রাখিয়া প্রকাশের নিকট স্পষ্টভাবেই প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। প্রকাশ ঘাড় নীচু করিয়া উত্তর দিল, "সে সম্বন্ধে বাবাকে লিখুন, তাঁর উপর আমার মতামত কি?" রাজমোহন বাবু বুঝিতে পারিলেন, খুসী হইয়া অন্য কথা তুলিলেন। প্রকাশকে সেই রাত্রির ট্রেনেই বাড়ী রওনা হইতে হইল। যে পিতার মতামতের উপর তাহার কোনই আপত্তি থাকিবে না সেই পিতার মতামতের অপেক্ষায় ত এত দূরে নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকা যায় না।

পান্নু যখন শুনিল প্রকাশ চলিয়া গিয়াছে, তখন প্রকাশের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক রাগ হইল। পূর্ব্বে একথা বলিলেই পারিত যে আমি থাকিতে আসি নাই। রামশরণকে হুকুম করিল 'নৌকা লইয়া পারে চল।' রামশরণ অগত্যা নৌকা খুলিল। পান্নু উপরে গিয়া অনেকক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজিয়া রামশরণকে বলিল, "তুই কোথায় ফেলে দিইছিলি?"

"যা, ফেলে ত দিইছিলাম ইখানটায়। কিন্তু সে কতদিন হোলো, এখনও কি ইখানে ব'সে থাক্‌বে?"

অকারণ রামশরণকে গালি দিতে দিতে বালিকা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন পরে পান্নু শুনিল যে সেই প্রকাশ বাবুর সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে যতই অশান্ত মুখরা হউক বিবাহের কথায় কখনই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। পান্নু মনে মনে বলিতে লাগিল, "হে মা কালী, এ সম্বন্ধ যেন ভেঙ্গে যায়। আর যার সঙ্গে হয় হউক, প্রকাশ বাবুর সঙ্গে যেন আমার বিয়ে না হয়, হে মা কালী।"

কিন্তু মা কালী বালিকা নহেন, বালিকার মাতা। সুতরাং তিনি এই ছেলেমানুষের কথায় প্রকাশের ন্যায় সৎপাত্র হাত ছাড়া করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সমস্ত দেবতাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া হোমাগ্নির অন্তরাল হইতে নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা দেবতা-বৃন্দ বা বর কন্যা উভয় পক্ষীয় যাত্রীবৃন্দের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করে নাই। কেবল মন্ত্র পড়িতে পড়িতেও বর এবং কন্যা উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিল যে একটি পরিচিত মার্জ্জার অদূরে সিঁড়ির পাশে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে লোকসমাগম নিরীক্ষণ করিতেছে। শুভদৃষ্টির সময় প্রকাশের মনে হইল যেন পান্নুর মুখ তখনও একখানি পাতলা মেঘে ঢাকা, পান্নু একবার ঈষৎ হাসিতেই অস্তোন্মুখ অভিমানসূর্য্যের শেষ রক্তচ্ছটায় সে খানি সিঁদুর হইয়া উঠিল।

ছয় সাত বৎসর পরে এক দিন প্রকাশ কাছাড়ী হইতে আসিয়া দেখিল খোকা এমন দুষ্টামী করিতেছে যে, খোকার মা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ আসিতেই পান্নু ক্রন্দনস্বরে বলিল "আমি আর পারিনে; ঐ দেখ খোকা কি করেছে, আঁস্তাকুড় থেকে একটা লাঠি তুলে আমায় ছুঁয়ে দেবার জন্য বেড়াচ্ছে।" প্রকাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "তা আমি কি করবো?

ষষ্ঠীর্ বেড়ালকে বিনা দোষে নির্ব্বাসিত কোরেছিলে, ষষ্ঠী ত শাস্তি দেবেনই।”

পানু রাগিয়া বলিল, “যাও, তোমার এতও মনে থাকে!”

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

শুভদৃষ্টি

পুরাঙ্গনে উঠ্‌ল হুলুধ্বনি
শতেক হাতে কাঁকণ ওঠে বাজি;
বধূরা সব বাজায় ঘন শাঁখ,
ঢেকে গেল আলিপনার আঁক:
পুর দ্বারে উথলে ডাক হাঁক'
দেউল ঘিরে সোণার টোপে সাজি,
কেশর খাড়া ক'রে রাজার ঘোড়া—
চারিদিকে জ্বলে আতস বাজি।
গান্ধার-রাজ দিচ্ছেন আজ মেয়ে
কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের হাতে;
বাদ্য যত উঠ্‌ল বেজে জোরে,
বর কন্যা মুখোমুখী ক'রে
বল্লে সবাই “চেয়ে দেখ বরে
শুভ ক্ষণে আজ্‌কের এই রাতে”।
শুনে রাণীর চোখে এল জল,
দুঃখ-সুখের পুলক-বেদনাতে,
রৌপ্যাধারে হাজার রত্ন-দীপ
উঠ্‌ল জ্বলে দীপ্ত শিখা মেলি,—
বরের অন্ধ চক্ষু ওঠে নেচে
ক্ষণিক তরে চকিত মুক্তি যেচে;
আকুল হিয়া কেঁপে ওঠে মিছে
চির রুদ্ধ কপাটখানি ঠেলি;
একটি বার—শুধু একটি বার—
দেবতারা যদি বা দেয় খুলি!
নিমেষ-হারা নলিন নয়ন দুটি—
গান্ধারী চায় প্রিয়ের মুখ পানে—
চক্ষে তাহার ভরে এল জল;
নিমেষ তরে সকল কোলাহল
মিলিয়ে গেল, আঁধার শৃঙ্খল
ছেয়ে এল অসীম নিশা সনে;
দুঃখ ভরে মাতা ফেলেন শ্বাস
বরণ ডালা লয়ে পুরাঙ্গনে!
মন্ত্র পড়া হয়ে গেল শেষ,
বর কন্যা গেল অন্তঃপুরে;
বধূবেশী দুহিতারে টানি
বুকের মাঝে সোহাগ ভরে রাণী
কর্ণে তাহার কহেন ধীরে বাণী
স্নেহ ধারা বিগলিত স্বরে,
“আর্য্যাবর্ত্তে হ'বি বৎসে রাণী”
আনন্দাশ্রু বক্ষে পড়ে ঝরে!
অলক্ত চারু-ললাট খানি
স্নেহে মাতা চুমেন বার বার,
দেখেন কন্যা নেতের আঁচল ছিঁড়ি
নয়ন নিজ রেখেছে আবরি;
দেখে রাণী শঙ্কাতে শিহরি,
মনে জাগে অমঙ্গল ভার
শুধান “আজ্‌কে নয়ন কেন বাঁধা?”
কণ্ঠে বাণী নাহি সরে আর!
চোখের উপর রক্ত নেতের আঁচল
উঠ্‌ল ঈষৎ ভিজে সঙ্গোপনে
গান্ধারী কয়, “চোখের আলোয় যাঁহার
চন্দ্র সূর্য্য চির কিরণ-আধার
দৃষ্টিহারা অন্ধ সে যে আমার?
অন্ধ আমি হয়েছি তাঁর সনে।”
কাঁদি মাতা কহেন, “অভাগিনী
কহিলি নি তা আগে কি কারণে!”

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

গ্রন্থসমালোচনা

১৬। পঞ্চবটি তত্ত্ব—স্বর্গগত ("স্বর্গীয়" শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করাই ভাল) মুন্সী কাশীনাথ দাশ গুপ্ত প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। নোয়াখালী হইতে উকিল শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵ ছয় আনা। আকার ডিমাই দ্বাদশাংশিত প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা ভাল নহে। সুতরাং মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রারম্ভে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে জানিলাম, মুন্সী মহাশয় গ্রাম্য ডাক সংস্থাপন, কন্যাপণ প্রথা নিবারণ, বিক্রমপুরে পথ নির্ম্মাণ, এবং ধর্ম্ম সমাজ ও নীতি বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনার্থ নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমালোচ্য পুস্তকের ভাষা প্রাচীন ধরণের; গ্রন্থ পাঠেই গ্রন্থকারে একাগ্র চর্চ্চার পরিচয় পাইয়াছি।

অলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ পঞ্চবটীর মাহাত্ম্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রীয় নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও বিবৃত হইলেও "মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ" "আত্মার অবিনশ্বরত্ব," "পুনর্জ্জন্ম" এবং "ভক্তি ও বিশ্বাস" শীর্ষক চারিটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। "পঞ্চবটী তত্ত্ব" শুনিয়াই কেহও পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করাইবেন কি না, সে বিষয়ে আমরাও বিশেষ সন্দিহান।

"সদানন্দ।"

১৭। মা আমার কাল' কেন?—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক শ্রীনীতিশচন্দ্র আঢ্য, হাওড়া। মূল্য ৵০ তিন আনা। ডাকমাশুল ৴১০ পয়সা। আকার ডবল ফুল্‌স্কেপ্ ষোড়শাংশিত, ৩৮ পৃষ্ঠা; কাগজ ও ছাপা ভাল। কিন্তু ছাপার ভুল যথেষ্ট।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের আণবিক তরঙ্গ বাদের Corpuscular Vibration theory) বিশ্লেষণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক যোগ-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন। বাহ্য জগতের তরঙ্গবাদের সিদ্ধান্তরূপে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "সূর্য্যের শুভ্র আলোকও সমস্ত বর্ণের সমষ্টি; অন্ধকারও সমষ্টি হইতে পারে। প্রভেদ এই, সূর্য্যালোকে বর্ণ তরঙ্গ সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং অন্ধকারে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে।" আর অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—যাঁহারা মনোময় ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান্ তাঁহারা দেখিতে পা'ন প্রত্যেক মনুষ্যের মনোময় দেহ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। আমাদের মনোময় দেহ বহুরূপী। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চিন্তা তরঙ্গের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বর্ণের উপর নানা বর্ণের রঞ্জনা উঠিতেছে।" যোগ সাধন বা বাহ্যজগৎ হইতে মতকে প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক একাগ্রতাসহকারে রজতগিরিনিভ মহেশ্বর মূর্ত্তির ধ্যান করিলে মনের ভিতরকার তরঙ্গগুলিও ঐ শুভ্রবর্ণে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত তরঙ্গকে শোষণ বা গ্রাস করিয়া লয়। সেই মহাশক্তি রূপিণী কৃষ্ণবর্ণা মা আমাদিগকে তখন জগদ্ ভ্রান্তিরূপ অনুভূতির কবল হইতে পরিত্রাণ করিয়া নিস্তরঙ্গ শান্তির দিকে লইয়া যান। তাই আমিত্বের যাথার্থ্যপ্রদর্শিকা বিশাল মায়া সংহারিণী চিন্ময়ী জননী কৃষ্ণারূপে মূর্ত্তিমতী।

বিষয়টি আধ্যাত্মিক রহস্যের এক অতি জটিল তত্ত্ব। গ্রন্থকার বাহ্যজগতের বর্ণবিচার সম্পর্কে যেরূপ বিজ্ঞবোধ্য বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্তর্জগতের আলোচনায় তাদৃশ বিশদতা অবলম্বন করেন নাই। বিশেষ চিন্তা ও অনুধাবন না করিলে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব গুলির ভাবগ্রহণ সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, সমালোচ্য তত্ত্বপ্রচারে গ্রন্থকারের যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। পুস্তিকা পাঠে আমাদের ধারণা হইয়াছে গ্রন্থকার এক জন ভক্ত সাধক। সরল বঙ্গ ভাষায় ঈদৃশ গ্রন্থের বহুল প্রচার স্বধর্ম্মনিরত হিন্দু মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়।

"সদানন্দ।"

১৮। সর্ব্বমঙ্গলা—ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ১২৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, শ্রীপীতাম্বর নাথ প্রণীত, ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, কাগজে বাঁধাই মূল্য ॥০ আনা। তিন রঙের ছবিযুক্ত সুন্দর মলাট। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ নির্দ্দোষ উপন্যাস বড় দেখা যায় না। পিতা ও কন্যা অথবা ভ্রাতা ও ভগিনী একত্র পাঠ করিতে পারেন। এ যুগে সর্ব্বমঙ্গলার মত উপদেশপূর্ণ উপন্যাস পাঠে বালকবালিকাগণের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। গ্রন্থকার সরল ভাষায় গল্পটি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার জোর বড় কম, আর মাঝে মাঝে সাধু ও প্রাদেশিক ভাষার মিশ্রণে সাহিত্য সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ সকল ক্রটি সংশোধন করিলে গ্রন্থকার সাফল্য লাভ করিবেন। আর এই শ্রেণীর গল্প ছোট হইলেই ভালরূপ ফুটিয়া উঠে। সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন গ্রন্থকারের পক্ষে নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নাই। সর্ব্বমঙ্গলার সরল ভক্তি হিন্দু বালিকার যথার্থ আদর্শ। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অঙ্কিত সাত খানি হাফ্‌টোন ছবি আছে। ১০৮ পৃষ্ঠায় "সর্ব্বমঙ্গল নৈবেদ্য খাইতেছেন" ছবিখানি মন্দ হয় নাই।

শান্তিময়

নামি-কো

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্বাশুড়ী

তাকেওর মাতার নাম কেই; তাঁর বয়স তিপ্পান্ন। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল, প্রায়ই বাতে কষ্ট পান—এই যা। কথিত আছে, বাটী হইতে তাঁর স্বামীর সমাধিভূমি—প্রায় দশ মাইল পথ, তিনি অনায়াসে পদব্রজে যাইতেন। ওজনে তিনি প্রায় দুই মণ ছিলেন; এ বিষয়ে খুব অল্প মহিলাই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

তাঁর স্বর্গীয় পতি কাগোসিমা গণান্তর্গত এক সামান্য 'সামুরাই' ছিলেন। বিবাহের সময় অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল; কিন্তু 'রেষ্টোরেশনের' যুদ্ধে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন, ও ওকুবো-মন্ত্রীসভার অধীনে দীর্ঘকাল স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁর অতিরিক্ত একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য, ভায়কাউন্ট্ কাতোও আর কয়েকজন ব্যতীত সকল সহকারীরই সহিত মনান্তর ঘটিয়াছিল। ওকুবোর পতনের পর তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা পান নাই। লোকে বলিত—তাঁহাকে 'ব্যারণ' করিবার কারণ,—যে তিনি সৌভাগ্যক্রমে কাগোষিমায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুক্ষমেজাজ, একগুঁয়ে মিচিতাকে মদ্যপানে তাঁর বদ্ধমূল অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন; প্রায় পাঁচ পাত্র 'সাকে' 'পার' করিয়া, যখন তিনি বুক ফুলাইয়া দৈত্যের মত লাল মুখ লইয়া স্থানীয় সভার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না।

এমন অসুখী পরিবার সর্ব্বদা দেখা যাইত না। সমস্ত বাড়ীটি যথেচ্ছাচারে শাসিত হইত; পরিবারটি যেন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রের মাঝে এক দীর্ঘ তরুতলে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কেবল তাকেওই, বাল্যকালে, পিতার জানুই নৃত্যের উপযুক্ত স্থানও তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলার সাথী বলিয়া জানিয়াছিল; তা ছাড়া সকলেই,—তাঁর স্ত্রী, ভৃত্যগণ, এমন কি বৈঠকখানার থামগুলো পর্য্যন্ত প্রভুর হস্তে বেদনার সহিত পরিচিত ছিল। য়্যামাকী, যে এখন "ভদ্র ব্যবসায়ী" রূপে সুপরিচিত, সেও এ দান হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিল না; কিন্তু সে কখনো কাওয়াসিমা পরিবারে যাতায়াত বন্ধ করে নাই। তাঁর সন্তোষ বা অসন্তোষে তার লাভের তুলনায় এ মাশুলটা নিতান্ত শস্তা বলিয়াই বোধ হইত।

যখন গুজব উঠিত কর্ত্তা চটিয়াছেন, তখন রান্নাঘরের ইঁদুরটাও তার 'কুর্, কুর্' শব্দ থামাইত; বাটীর অভ্যন্তর হইতে অতর্কিত অশনি-পাতের মত যখন তাঁর

ক্রোধকম্পিত স্বর শুনা যাইত, যখন নির্জ্জীব ভৃত্যের হস্ত হইতে ছুরি খসিয়া পড়িত। শুনিতে পাওয়া যায়, অধীন কর্ম্মচারীরা যখন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তখন তারা ভৃত্যদের নিকট হইতে বাতাস কোন দিকে বহিতেছে, সে কথা পূর্ব্বাহ্নেই জানিয়া লইত।

কেই-ঠাকুরাণী, যিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কতটা সহ্য করিতে হইয়াছে তা একবার ভাবুন! পতির পিতামাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁদের স্বভাবের তুলনায় পতির স্বভাব বিশেষ অসাধারণ বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু পরে যখন তাঁদের দুজনেরই মৃত্যু হইল, তখন পতির নিজমূর্ত্তি সুপ্রকাশিত হইয়া উঠিল, ও তাঁর ধৈর্য্যগুণের পরীক্ষার আর অন্ত রহিল না। প্রথম প্রথম তিনি বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলেন তাহাতে কোন ফল নাই। অতঃপর আর তিনি সাহস দেখাইতেন না; হয় বুদ্ধিমানের মত ঝড়ের বেগে নত বেণুদণ্ডের মত সব সহিয়া যাইতেন, নয় নিরাপদ হইবার যা শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাই করিতেন—চম্পট্ দিতেন।

ইতিমধ্যে স্রোত ফিরাইবার উপায় তিনি কতকটা শিখিয়াছিলেন, এবং তিন বারে এক বার প্রায় কৃতকার্য্য হইতেন; কিন্তু তাঁর স্বামীর স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। বিশেষত জীবনের শেষ তিন চার বৎসর তিনি মত্ত পানোদ্দীপ্ত এমন একটা ক্রোধের আতিশয্যের মধ্যে বাস করিতেন, যে, তাঁর বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও স্বীয় দুর্ভাগ্য জীবনের দারুণ দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। প্রিয় পুত্র তাকেও ও স্বীয় শুভ্র কেশের কথা ভুলিয়া সর্ব্বদাই তিনি ভাবিতেন, যে, ব্যারনেস্ ও শাসনকর্ত্তার গৃহিণী হওয়ার চেয়ে দরিদ্র মন্দির-রক্ষকের গৃহিণীর শান্তিময় জীবন কত ভাল! কিন্তু সময় তীরের মত দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল, এবং যখন তিনি দেখিলেন, তাঁর হৃদয়হীন স্বামী আকাশের দিকে মুখ করিয়া কঠিন হইয়া বাক্সের মধ্যে শুইয়া আছে, তখন ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন—কিন্তু তবু, তাঁর গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল।

তিনি কাঁদিলেন, কিন্তু এবার তাঁর ভাবনা দূর হইয়াছে; স্বাধীনভাবে নিশ্বাসগ্রহণের সঙ্গে কতকটা শক্তিও তিনি পাইলেন। স্বামীর জীবিতাবস্থায়, সেই বিপুলকায় উচ্চকণ্ঠ লোকটির পাশে তাঁর অস্তিত্ব এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু এখন, যেই তিনি কোণ হইতে বাহিরে আসিলেন অমনি কাঁপিয়া উঠিলেন। স্বামীর পার্শ্বে যারা তাঁর ভীরুতা লক্ষ্য করিয়াছিল, তারা বলিল, পরিবর্ত্তনটা অদ্ভুত হইয়াছে। জনৈক পণ্ডিতের কিন্তু মত, যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রী আকৃতি ও প্রকৃতিতে ক্রমশ এক হইয়া দাঁড়ায়। সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, তাঁর সম্বন্ধে বাস্তবিকই এ কথা খাটিত। তাঁর চেহারা, ব্যবহার, অভদ্রতা সর্ব্বোপরি তাঁর রুক্ষ স্বভাব, মৃত স্বামীর হুবহু নকল।

কথায় বলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।" এ কথাটায় প্রকৃতির এক অদ্ভুত ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়ম ব্যক্ত হয়। গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষীয় পার্ল্যামেণ্টের এক সভ্য গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা বেশ ভালই হইল, কিন্তু কয় জন বোঝে যে তাঁর তেজের অর্দ্ধেক, গত রাত্রে যে সুদ-খোর তাঁহাকে চাপাচাপি করিয়াছিল তার-ই উদ্দেশে বাহির হইয়াছে। আবার ধরুন, দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বায়বীয় চাপ জাপানের মধ্য ভাগে বন্যার সৃষ্টি করিল; জোয়ারের ঢেউ তীরভূমি ভাসাইয়া দিল। প্রকৃতি কেবল তাহার প্রাপ্য খুঁজিতেছে। মানবীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তির মতে, এবং এই প্রাপ্য আদায় করিতে, কৃপণ যেমন ধার শোধ করিতে এক দিন বিলম্ব হইলেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে ও কড়া তাগিদ দেয়, হীনচিত্ত ব্যক্তিও ঠিক সেই মত কার্য্য করে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তি সমস্ত হিসাব ভগবানের জিম্মায় রাখিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁর নিজের কাজ সমাধা করেন।

ধাঁর সহিষ্ণুতা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল যারপর নাই ভার-গ্রস্থ হইয়া আসিয়াছিল, সেই কাওয়াষিমা গৃহিণী ভাবিলেন, এখন তাঁর দিন আসিয়াছে। তাঁর স্বামীর মৃতদেহ বাক্সে যেই বন্ধ হইল অমনি তিনি সহিষ্ণুতার বন্ধন, যা কত ভার সহ্য করিয়াছে, একেবারে খুলিয়া দিলেন। যাহাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিতেন, সে ত চলিয়া গিয়াছে; আর তার ঘৃণ্য হস্ত তাঁহাকে আঘাত করিবে না। বোধ হইল যেন তিনি দেখাইতে চান, যে, এতাবৎকাল তিনি যে চুপ করিয়াছিলেন, স্বীয় অসহায় অবস্থা তার কারণ নয়। বহু পূর্ব্বে যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল এবং বহুদিনের শৈথিল্যে যাহাদের সুদের পরিমাণ, অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেই সব লোকের নিকট,—তিনি আপনাকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়াই জানেন,—এ কথা নিশ্চিতরূপে বুঝাইয়া দিয়া—টাকার জন্য অতিমাত্রায় তাগিদ পাঠাইতে লাগিলেন। স্বামীস্ত্রীর রোষ-প্রবণতার মধ্যে প্রভেদ অনেক ছিল। মৃত ব্যারণ বীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং বিরক্তিজনক হইলেও, তাঁর ক্রোধের মধ্যে এমন একটা বেগ ছিল যা দেখিয়া সুখ হয়; কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্বার্থপর, সন্দিগ্ধ, সঙ্কীর্ণমনা, আর পুরুষের নির্ভীকতা ত তাঁর একেবারেই ছিল না। তাঁর মেজাজ একেবারেই অসহ্য; ভৃত্যদের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল।

ইনিই নামির খাশুড়ী।

নূতন গৃহিণীদের অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার দরুণ বিবাহের ঠিক পরেই প্রত্যেক নববধূর একটা পরীক্ষার সময় আছে। মারুমাগে,* যেটা বিবাহিত জীবনের আদব কায়দা অনুসারেই প্রয়োজন, সেটা বর্জ্জন করিয়া অন্য কোনো ফ্যাশানে চুল বাঁধা যাইতে পারে। কিন্তু কুরুমাওয়ালা† হয়ত তাহাকে 'কুমারী' বলিয়া সম্বোধন করিবে, এবং যে রমণীর এ ভুলটা সংশোধন করিবার সাহস নাই, সে তখন মহা ফাঁপরে পড়ে। বাড়ীতে আবার ভৃত্যগুলো তাহাকে 'কর্ত্রী ঠাকুরাণী' বলিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিবে। এ সম্বোধন সে এখনো বরদাস্ত করিতে পারে না। কিন্তু শীঘ্রই সে তার নূতন অবস্থা বুঝিয়া লয়, এবং এতদিন যাহা লজ্জার অস্পষ্ট আবরণের মধ্য হইতে সামান্য মাত্র বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল, এখন সেই সব চারিদিককার ব্যাপারের আসল মূর্ত্তিটা দেখিতে পায়। এখন নামি তার জীবনের এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল।

প্রত্যেক পরিবারের চালচলন ধরণধারণ বিভিন্ন প্রকারের। সেই হেতু পুরাতন বাড়ীর আদর্শের সহিত নূতনের তুলনা না করা, এবং এখন হইতে, নামি-কাতাওকা চলিয়া গিয়াছে, এ কথা না ভোলা; এবং তাহাকে এক নূতন নামি-কাওয়াষিমা হইতে হইবে—এই কথাগুলি, সে যখন বধূসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে ও গাড়ী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন তার পিতা আন্তরিক স্নেহের সহিত তাহাকে বলিয়াছিলেন। উপদেশটি তার ভালরূপই মনে ছিল; নূতন গৃহে পৌঁছিয়া সে দেখিল পার্থক্যটা বিস্ময়কর। কাওয়াষিমা পরিবারের সম্পত্তি তার পিতার সম্পত্তি অপেক্ষা হয়ত অধিক ছিল। নূতন অভিজাতবর্গের মধ্যে যারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ পরিবার তাদেরই অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত; কারণ তাকেওর পিতা শাসনকর্ত্তারূপে কার্য্যকালে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সে কিন্তু দেখিতে পাইল তার পিতার খ্যাতির জন্য কাতাওকা পরিবার কত জনপ্রিয়, ও সেখানে সবই সূর্য্যোদয়ের মত উজ্জ্বল; কিন্তু এখানে সবই ডোবার মত বদ্ধ, নিশ্চল। কুটুম্ব ছিল না, পরিচিতের সংখ্যাও বেশী নয়, এমন কি যাহারা তাকেওর পিতা বর্ত্তমানে আসিত তারাও তাঁর মৃত্যুর পর আসা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর বিধবা একেবারেই মিশুক ছিলেন না। বাটীর কর্ত্তা, যে বাটীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবে, তার বয়স অল্প, সে নিম্নপদের কর্ম্মচারী এবং অধিকাংশ সময়ই বাটীতে থাকে না। নামির বিমাতা নূতন উজ্জ্বল সামগ্রী পছন্দ

* এক প্রকার খোঁপা।
† কুরুমা অর্থাৎ রিক্স বা মানুষ টানা গাড়ী

করিতেন; তিনি গৃহিণীপনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত উপায়ে ব্যয় সঙ্কুলান দেখিয়া কখনো কখনো ভৃত্যরাও নিন্দা করিত—প্রাত্যহিক ব্যাপারে তাদের কাণ্ডজ্ঞান পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু যে যা বলুক, সৈনিকের সংশ্রবে যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, মোটের উপর সেখানে সবই সেরূপ জমকালো ও মূল্যবান। কিন্তু এ নূতন গৃহে কি পার্থক্য! পুরাণো প্রথা ও অসভ্য গ্রাম্য রীতিগুলিকে ইহারা আঁকড়িয়া রহিয়াছে, যেন জগতে এ গুলোই একমাত্র রীতি। বিধবার গৃহিণীপনার প্রণালী, ত্রিশ বৎসর আগে সে যখন এক দরিদ্র 'সামুরাইয়ের' গৃহিণী, তখন যেমন এখনো তেমনি ছিল। সবই নিজে বন্দোবস্ত করা, যা আগে আগে অনিবার্য্য কারণে করিতে হইত—এই অভ্যাসটা এখন স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাজাকি নামক এক সাধাসিধে ভাল মানুষ সামান্য ভৃত্যকে ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজেই জ্বালানি কাঠ, কয়লা, প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিসের মাসিক ব্যয়ের হিসাব করিতেন। এইরূপ অবস্থায়, এমন সময় ইকু পরিচারিকারূপে নামির সহিত আসিল। বিধবা সবিস্ময়ে বলিল; "এই নামজাদা পরিবারগুলোর কি চাল!" আসল কথা বলিতে কি, ইকুর অসম্ভ্রমসূচক মন্তব্যে বিধবার ক্রোধ যে তার বহিষ্কৃত হওয়ার একমাত্র কারণ, কি না বলা কঠিন।

বুদ্ধিমতী হইলেও বধূ অল্পবয়স্কা; সেহেতু সে যে হঠাৎ নূতন গৃহের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের চালচলনের সহিত মিলাইয়া চলিতে অক্ষম হইল, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু নামি পিতার উপদেশের গুরুত্ব ভালরকমই বুঝিত, সে নূতন অবস্থার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। তার সংকল্প পরীক্ষা করিবার একটা সুযোগও নিকটেই ছিল। ইকাও হইতে ফিরিবার অনতিকাল পরেই তাকেওর প্রতি সমুদ্র ভ্রমণের আদেশ হইল। নাবিকের সহিত তার বিবাহ হইয়াছে, সে হেতু নামি মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মিলনের পর এত শীঘ্রই বিচ্ছেদ, ইহাতে তার হৃদয় প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল, কিছুকাল সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

নামির সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে নামির পিতার সহিত তাকেওর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পিতা তাহাকে খুব পছন্দ করিয়াছিলেন, সে পিতার কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিবাহ করিল। ফলে সে যে ঠিক কাজ করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল। সে দেখিল তাকেও উচ্চমনা নির্ভীক পুরুষ, সরলতা তার মজ্জাগত এবং হৃদয় স্নেহপ্রবণ; তার মধ্যে নীচতার কণামাত্রও নাই সে তার প্রিয় পিতার যেন ক্ষুদ্র ছবি। এমন কি তার দীর্ঘ পদক্ষেপে খোলা চালে চলিবার ধরণ ও শিশুর মত হাসি তার পিতারই অনুরূপ। এমন স্বামীর সহিত থাকিতে কত সুখ! সে সমস্ত হৃদয় দিয়া স্বামীকে ভালবাসিত। তাকেওরও এই প্রেমময়ী পত্নীর প্রতি গভীর ভালবাসা জন্মিল। সে পিতামাতার একমাত্র সন্তান! তার মনে হইল সে একই সঙ্গে স্ত্রী ও ভগ্নী দু-ই পাইয়াছে। সে সোহাগ করিয়া পত্নীকে তার নিজের প্রিয় "নামি-সান্" বলিয়া ডাকিত। বিবাহের পর এখনো তিন মাস অতীত হয় নাই, কিন্তু তারা উভয়ে উভয়কে এত ভালবাসিত যেন তারা পূর্ব্বজন্ম হইতে পরিচিত; তাই অল্পকালের জন্য হইলেও, বিচ্ছেদের দুঃখ উভয়েরই অসহপ্রায় হইয়াছিল।

নামি কিন্তু দুঃখে বেশী দিন কাঁদিতে পারে নাই। তাকেও চলিয়া যাইবার পরই তার খাশুড়ী কঠিন বাত রোগে আক্রান্ত হইলেন ও তাঁর স্বাভাবিক ক্রোধ খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পরে ইকু যখন চলিয়া গেল, তখন বেচারা নামি বিশেষ কষ্টে পড়িল।

নূতন 'ক্যাডেট্'কে পুরাতনেরা কিছুকাল জ্বালাতন করে, কিন্তু বৎসর খানেক অতীত হইলেই, সে-ই নিজে আবার নবাগতদিগকে বিরক্ত করিয়া যত আনন্দ পায়, তত আর কিছুতে পায় না। নূতন যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, তখনকার কষ্ট খাশুড়ী খুব ভালরকমই জানে;

বধূর সহিত অন্যায় ব্যবহার করা তার কখনো উচিত নয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনি দুর্ব্বল যে, যৌবনের ফুল শুকাইয়া গেলে যখন সে আপনাকে শাশুড়ীর অবস্থায় স্থানান্তরিত দেখিতে পায়, তখন তার অত্যাচারী স্বভাব মাথা তুলে এবং যে শাশুড়ীকে সে এত ঘৃণা করিত সে নিজে ঠিক সেই শাশুড়ী হইয়া দাঁড়ায়।

"এই দেখ চওড়ায় ভুল করেছ। এটা চার ইঞ্চি করে এই রকম করে ঘোরাও। আঃ কি বিপদ!" সে বধূকে বলে, "অমন করে নয়। দাও দাও আমাকে দাও। অবাক করলে, তুমি এ বিশ বচ্ছর ঘুমে ছিলে না কি? হুঁ, তুমি আমার গিন্নী হতে চাও!" এই অবস্থায় যদি বিগত সময়ের একটা বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী মনে পড়ে যাহা একদা তার নিকট তেমনি বাস্তব ছিল যেমন এই বধূটির নিকট, যে তাহারি সামনে বসিয়া আছে, তবে হয়ত তার দুঃখ হইতে পারে এবং এমন কি গোপনে হয়ত সে নিজ ব্যবহার সংশোধন করিবার চেষ্টাও করিতে পারে,—এমন স্ত্রীলোক অসাধারণ। অনেকেই "নাকের বদলে নাক" এই নীতির অনুসরণ করে, এবং 'বুদো'র শাশুড়ী যে ক্ষতি করিয়াছে 'উদো'র স্ত্রীর উপর সে অত্যাচারে প্রতিশোধ লয়। এইরূপে তারা অজ্ঞাতসারে নিজেদের জীবনে প্রতিশোধ দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। নামির শাশুড়ী এই ধরণের লোক। সাহেবি-ধরণের বিমাতার অধীনে থাকিয়া আবার সেকেলে-ধরণের শাশুড়ীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়া—এমনি বেচারা নামির অদৃষ্ট। অনেক সময়ে নামি রোগ শয্যায় শায়িত বৃদ্ধা বিধবার দুঃখে যথার্থই দুঃখিত হইয়া তাহাকে সেবা করিতে যাইত। কিন্তু এ কার্য্যে সে অনভ্যস্ত ছিল, তাই তার সমুদয় চেষ্টা রোগিনীর কখনো মনঃপূত হইত না। নামিকে বিধবা একবার ধন্যবাদ দিয়া পরক্ষণেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিচারিকাকে এমন উচ্চ বিকট স্বরে ভর্ৎসনা করিতেন যে দশ বৎসর ধরিয়া বিমাতার ব্যাজোক্তি শুনিতে অভ্যস্ত নামিরও ভয় করিত। প্রথম কয়েক সপ্তাহ এইরূপ চলিয়াছিল; তারপর আক্রমনটা সোজাসোজি নামির উপরই হইত। বাটীর মধ্যে একমাত্র সদয় ব্যক্তি ইকুও যখন বিদায় হইল, তখন কখন কখন নামির মনে হইত সে যেন তার অতীত দিবসের নিরানন্দ কোণে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন সে ঘরের মধ্যে গিয়া টেবিলের উপর রূপার ফ্রেমে বাঁধানো বলিষ্ঠ সৈনিকের নির্ব্বাক ছবিখানি দেখিত, তখন তার সমস্ত ভাবনা দূর হইয়া যাইত। ছবিখানি হাতে করিয়া তুলিতে তুলিতে তার হৃদয় স্নেহে কোমলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। প্রাণ ভরিয়া সে ছবিখানি দেখিত, চুম্বন করিত, বুকে চাপিয়া ধরিত এবং ছবিখানি যেন শুনিতে পাইতেছে, এমনি ভাবে চুপে চুপে বলিত— "ফিরে এস, শীগ্‌গির ফিরে এস, প্রিয়তম!" প্রিয়তমের জন্য সে হৃষ্টচিত্তে সকল কষ্ট সহ্য করিবে, ও আপনা ভুলিয়া শাশুড়ীর সেবা করিবে।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

নিবেদন।

যখনি আপনাভুলি চিন্তি তোমা ক্ষণতরে,
অন্তরের মলিনতা চলে যায় কত দূরে।
পবিত্র সুন্দর ভাবে হয় হৃদি ভরপূর,
হৃদয় বীণার তারে উঠে কি নূতন সুর।
বিশ্বময় সবি দেখি পুণ্য পবিত্রতা মাখা,
স্বর্গীয় প্রভায় যেন ধরিত্রী প্রকৃতি ঢাকা।
আবার যখনি হই আপনাতে নিমগন,
সে সুন্দর ভাবরাশি কোথা করে পলায়ন।
ভুলে যাই প্রভু তোমা, অনন্ত করুণাময়ে,
ভাবিশুধু আপনারে, স্বার্থে নিমজ্জিত হয়ে।
প্রার্থনা তোমার পদে হে বিভু জগতস্বামি,
বড় ক্ষুদ্র হীনমতি দুহিতা তোমার আমি।

দাও মোর চিত্তে আনি হেন শক্তি দয়াময়,
যাতে সে স্বর্গীয়ভাব হৃদে চিরস্থায়ী হয়।
কভু নাহি ভুলি তোমা, হৃদয়মন্দিরে রাখি,
মানস কুসুমে পূজি প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা মাখি।

শ্রীচারুবালা গুপ্তা।

অর্দ্ধকালী

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার অধীন সুপ্রসিদ্ধ মিতরা গ্রাম বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট পরম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভগবতী যোগমায়া অর্দ্ধকালী মূর্ত্তিতে এই গ্রামে আবির্ভূত হন। আজিও সেই দেবীর লোকাতীত মহিমা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্র ভিখারীর কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং প্রত্যহ মধুর প্রভাতে অর্দ্ধকালীর পুণ্য নাম আবালবৃদ্ধের মুখশ্রীতে ভক্তি-মিশ্রিত আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিতেছে।

পতিগৃহ গমনকালে আমরা দেবীর মুখে যে দর্শনমূলক উপদেশ শুনিতে পাই উহা উজ্জ্বল তারকার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সাধকশ্রেষ্ঠ দ্বিজদেবের প্রশান্ত হৃদয়ে পরিপূর্ণ শক্তিরূপে প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে তিনি নিজ জীবনকে মহৎ আদর্শে গঠিত করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার অতি নিকট বর্ত্তী পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে সাধক দ্বিজদেব বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে দেবী যোগমায়ার আরাধনা করিয়া প্রেম ও সত্যকে জীবনের সঙ্গী করিয়াছিলেন। তাই সত্যের পুণ্যালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, চিন্ময়ী দেবীর বিচিত্র মূর্ত্তি জড়রূপে সৃষ্টি করিতে না পারিলে আত্মা হইতে পাপ-মলিনতা সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বুঝিলেন দেবী সম্মুখে আবির্ভূতা না হইলে জীবাত্মায় ভগবতী যোগমায়ার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। প্রার্থনা, বিশ্বাস, সত্য ও ধৈর্য্য এই চারিটি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক দ্বিজদেব নিজ অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন। মাতৃরূপিণী ভগবতী সন্তান বাৎসল্যে মুগ্ধা, তিনিই সাধক শিশুর জীবনের শক্তি ও মুক্তি। তিনি দেখিলেন তাঁহার ভক্ত সন্তান ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে কন্যারূপে লাভ করিতে উদ্যত। পরীক্ষা না করিয়া ভাগবতী শক্তি কখনও জীবাত্মার নিকট জড় দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হন না—তিনি ভালবাসা মাখিয়া ভক্তের প্রাণের ভক্তি-তন্ত্রী স্পর্শ করিলেন। মা যেই বুঝিলেন এই হৃদয় খাঁটি, অমনি তিনি আপন ক্রোড়ে ভক্তের মাথাটি রাখিয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন। দ্বিজদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকেই সুন্দর বস্তু দেখিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—

"বাবা, তুমি আমার প্রিয় শিশু। আমি আছি, এই দেখ তোমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছি, তোমার কোন ভয় নাই।"

সাধক বলিলেন,—

"মা, আমি প্রকৃত শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। মাগো, তুমি আমার মনশ্চক্ষুর নিকট হইতে আর তিরোহিত হইও না। কোন্ শুভ দিনে তোমাকে নিজ গৃহে কন্যারূপে পাইয়া এই তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে?"

মানবের ধর্ম্ম জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই
—'দেবীভক্ত্যানুগত্যেহ জগতি ন করোতি কিং?'

ভক্তের প্রার্থনানুসারে ভগবতী যোগমায়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক জয়দুর্গা নামে খ্যাত হইয়া পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

সাধু দ্বিজদেব সত্যের ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন—জয়দুর্গাকে কন্যারূপে লাভ করিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে চতুর্গুণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি রিপুজয়ী—জ্ঞানালোকে তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ, সংসারে থাকিয়াও

তিনি মুক্ত। ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে বসাইয়া সাধকশ্রেষ্ঠ সান্ত্বনার গীতি গাহিয়া আত্মতৃপ্ত।

একদা শিবরূপী ভগবান্ রাঘবরাম দ্বিজদেবের টোলে শাস্ত্রাধ্যায়ন ছলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'রাঘব খাতে' মৎস্ত ধরা ইহাঁর যোগজীবনের প্রধান ও প্রথম ঘটনা। যোগ-পরায়ণ রাঘবরাম মায়াপ্রভাবে অন্যান্য সমপাঠিদের মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন।

দ্বিজদেব শিষ্যদের মুখে এই অলৌকিক ঘটনার প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া রাঘবরামকে নিজ কন্যা জয়দুর্গার শিবসুন্দরের মত উপযুক্ত বর বলিয়া স্থির করিলেন।

শুভ দিনে অমৃতময়—তেজোময় মহাপুরুষ রাঘবরাম জয়দুর্গারূপিণী মহাশক্তির সহিত মিলিত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব শুভসম্মিলন নিজ চক্ষে দেখিয়া বিষয়াসক্ত নর-নারী ধন্য ও কৃতার্থ হইল।

হর-গৌরীর মিলন অন্তরে ও বাহিরে অনুভব করিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির অন্য পথ হিন্দু জানে না। সমস্ত জগৎ এই আদর্শ দম্পতীর প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুনীল আকাশে শুভ্র নীরদখণ্ডোপরি সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত; প্রকৃতি সুন্দরী উজ্জ্বল মরকত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শ্যামল কনকাঞ্চল প্রসারিত করিয়া রূপের ছটায় চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সংসার সেই লীলাময়ী মহামায়ার খেলাঘর,—তিনি প্রতিনিয়ত এই খেলাঘরে কত ভাঙ্গাগড়ার খেলা খেলিতেছেন।

যোগমায়া শিবসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া শ্বশুরালয় মিতরায় চলিয়াছেন। প্রকৃতি রাণী শত শত কুসুমের গন্ধভার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া তাপদগ্ধ সংসারিককে যেন উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে বলিতেছে,—

"জীবন-সংগ্রামের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের জড়মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ কর। এই যুগলমূর্ত্তিই ধর্ম্ম-জীবনের পূর্ণ বিকাশ।"

রমিতা গ্রামে অর্দ্ধকালী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। মিতরায় কেন দেবীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে 'রাঘবদীপিকা'-লেখক বলেন,—

"মিতরা শব্দের বৈয়াকরণ বা যৌগিক অর্থ এই—ডুমিঞ ক্ষপে—মি ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্ত করিয়া মিত শব্দ নিষ্পন্ন। তৎপরে রা শব্দে ধন বুঝায় কিন্তু ধন বলিলে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে মহাত্মাগণ তাহা বুঝেন না। তাঁহারা ধন বলিলে কেবল শমাদি সম্পত্তি বুঝিয়া থাকেন। তাহা হইলে পদদ্বয় মিলিত হইয়া এই বুঝায়-"মিতাঃ ক্ষিপ্তা রাঃ শমাদি সম্পদো যত্র" যে স্থানে শমাদি সম্পত্তি নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ, যে সম্পত্তি না থাকিলে মনুষ্যগণ মনুষ্যচর্ম্মাবৃত পশু, যাহা প্রাপ্ত হইলে সার্ব্বভৌম পদও তৃণবৎ তুচ্ছ অনুমিত হয়, যাহার সংরক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ গহনে বিরাজ করিতেন, যাহার পরিস্ফুরণ হইলে মন সমস্ত বিষয় ভুলিয়া নিরন্তর পরমানন্দ-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষীয় মহাত্মাগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিত, যাহার গুরুত্ব ও মধুরতা, নিরোধশক্তি-পরায়ণ অন্তঃসারবান মহাত্মাগণ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না, সেই নিরোধ-সম্ভূত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্ষমা, দয়া, আর্জ্জব, শৌচ, সন্তোষ, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, আত্মানুভূতি ও পরমাত্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পত্তিগুলি যে স্থানে স্থিত হইয়া বিশেষ যত্নপুরঃসর নিবিষ্ট হইলে, স্থানীয় প্রকৃত বল হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হয় সেই স্থানই মিতরা।"

দেবী অর্দ্ধকালীর গৌরনীল ও চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইবার নিগূঢ় কারণ কি? সাধকের অচলা ভক্তির প্রবল আকর্ষণে ভগবান্ বা ভগবতী জড়দেহ ধারণ করিয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভক্ত যে যে রূপে আরাধ্য দেবতাকে দেখিতে চায়, তিনি তাহাকে সেই রূপেই দর্শন দিয়া থাকেন। এখানেও তাই যেন হইয়াছিল। যিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, সেই ভগবতী মহামায়া অপরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

অমৃত ময় স্বরে উপস্থিত জন মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন। দেবী কহিলেন,—

"বৎসগণ, তোমরা উৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্পন্ন হইয়া সংসারে অধিষ্ঠান কর। আইস, আমার কাছে আইস। আমার কাছে আইস। আহা তোমরা আমার জন্ম কত না ক্লেশ পাইয়াছ, কত না যাতনা সহিয়াছ। তোমরা আমার হৃদয়ের ধন। তোমাদের অনন্ত দুঃখের অবসান হউক, মায়ামুক্ত হইয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।"

সকলে 'জয় অর্দ্ধকালীর জয়' নাদে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দময় 'মা—মা' ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

বাংলার গৃহে গৃহে সর্ব্বমঙ্গলার আবাহন গীতি ধ্বনিত হইতেছে। মঙ্গল শঙ্খ ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল। আজ দেবী-পূজা। অশুদ্ধ চণ্ডী পাঠ করিয়া রাঘবরামের বিশাল নয়নদ্বয় ক্রোধে ও ক্ষোভে জ্বলিতেছে। ক্ষুদ্র বালক রামেশ্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতির উচ্চারণে পিতার ভুল ধরিয়াছেন। দীর্ঘে হ্রস্বের কীর্ত্তন, হ্রস্বে দীর্ঘের কীর্ত্তন, বিন্দু, বিসর্গের লোপ ও বর্ণের বিপর্য্যয়ে আজিকার চণ্ডীপাঠ বিফল হইয়াছে। অপমানের তীব্র হলাহলে শিবসুন্দরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে পুত্রকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—

"আমার অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠের বিষময় ফল যেন তোমাতেই পর্য্যাপ্ত হয়। আমি আরও বলি আমার বংশে কেহই যেন চণ্ডী পাঠ করে না।'

আজিও ৺অর্দ্ধকালী বংশে দুর্গাপূজার সময় চণ্ডী পাঠ হয় না।

গৌরনীলনিভাংদেবীং কলৌ কুল বিলাসিনীং।
যোগমায়াং মহাকায়াং নমামি রাঘবাঙ্গনাং॥

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ঢাকায় খাঞ্জালির মস্‌জিদ।*

খাঞ্জালি সাহেব পাঠানযুগের একজন অদ্ভুতকর্ম্মা কৃতী পুরুষ। ষাটগম্বুজ ও খাঞ্জালির রোজা নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ অট্টালিকাদ্বয় এবং ঠাকুরদীঘি, পচাদীঘি ও ঘোড়াদীঘি প্রভৃতি বিশাল সরবরসমূহ বাগেরহাটের উপকণ্ঠে বিদ্যমান থাকিয়া এখনও তাহার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বাগেরহাটের কীর্ত্তি ব্যতীত খুলনা জেলার আমাদীতেও মস্‌জিদকুড় এবং যশোহর সহরে খাঞ্জালি সাহেব ও তাহার সহচরগণের মস্‌জিদ ও দরগা প্রভৃতি বর্ত্তমান। যশোহর হইতে বাগেরহাট এবং তথা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুইটী সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম ও খাঞ্জালি সাহেবের কৃত বলিয়া বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত তাহার আর কোনও কীর্ত্তির কথা আমরা অবগত নহি।

কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব নিজ ঢাকা সহরের চুড়ীহাটা মহলের মস্‌জিদটী খাঞ্জালি সাহেবের নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন *। উক্ত মস্‌জিদগাত্রের শীলালিপি পাঠে জানা যায় যে নাসির-উদ্দীন আবুল মোজাফর মহম্মদ শার রাজত্বকালে হিজিরা ৮৬৩ সালের ২০ শে শাবন (১৪৫৯ খৃঃ ১৩ই জুন) তারিখে খাজেজাহান উপাধিধারী জনৈক খাঁ কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বাগেরহাটের খাঞ্জালি সাহেবের সমাধি মন্দিরগাত্রেও লিখিত আছে যে হিজিরা ৮৬৩ সালের ২৬ শে জিলহিজ্জা (১৪৫৯ খৃঃ ২৬ শে অক্টোবর) বুধবার রাত্রিতে পুণ্যশ্লোক খাঞ্জালি সাহেব নশ্বরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

উভয় স্থলের শীলাফলক লিখিত সময়ের তুলনা এবং নামের সাদৃশ্য দৃষ্টে মিঃ ব্লক্‌ম্যানের এই অনুমান অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। ঢাকার ন্যায় মুসলমান

* Mr. Blochman's notes on Arabic and Persian inscription in J. A. S. B, Part I, 1872 pp 109 and 108.

প্রধান প্রাচীন সহরের স্বধর্ম্মীয় অধিবাসিবর্গের জন্য খাঞ্জালি সাহেবের ন্যায় সম্পদশালী ভগবদ্ভক্ত পুরুষের একটী মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া খুব অসম্ভব নহে—তবে ইহা অনুমান মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে ঢাকার মস্জিদ নির্ম্মাণকারী 'খাজে জাহান' এবং বাগেরহাটের 'খাঁ জাহান আলি' অভিন্ন কি না, উভয়ে অভিন্ন হইলে খাঞ্জালি সাহেব কি সূত্রে ঢাকার মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঢাকায় তাহার অন্য কোনও কীর্ত্তিচিহ্ন আছে কি না এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ঢাকার কোনও উদ্যমশীল সাহিত্যসেবীকে আমরা এই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

খুলনার খাঞ্জয়ালী মসজিদ।*

পুরাকালে খুলনা জেলা প্রাচীন বঙ্গ অথবা সমতট সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। তদনন্তর তাহা রাজা বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের বাগ্ড়ী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিম্বদন্তী এই যে, খাঞ্জয়ালী নামে জনৈক মুসলমানের সময়ে উহা প্রখ্যাত হইয়া উঠে। খাঞ্জয়ালী সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে খুলনা জেলায় আগমন করেন। তিনি যে কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। তবে কেহ কেহ বলেন, তিনি লোদী বংশের রাজত্বকালে দীল্লি হইতে কোন কার্য্যানুরোধে এইস্থানে প্রেরিত হয়েন। ইঁনি অত্যন্ত সুচতুর লোক ছিলেন। ইঁনি গৌড়রাজের নিকট হইতে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দরবন জঙ্গলাবৃত দেখিয়া তাহার বহুস্থান পরিষ্কার করতঃ কৃষিকার্য্যে কৃষাণ নিযুক্ত করেন। এই প্রকারে তিনি আজীবন এই সকল ভূখণ্ড লইয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় প্রজাপালন ও শাসন করিয়া আসিতে ছিলেন। অবশেষে তাঁহার ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি এই প্রদেশ মসজিদও কবরে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অধুনা বাগের হাট ও মসজিদকুড়ে পরিদৃষ্ট হয়।

আমরা আজ পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য উক্ত স্থানের কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। আধুনা আমরা খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটি পুরাতন মসজিদ সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বর্ণনা করিব। এই স্থানের একটি মসজিদ গাত্রে পারস্য ভাষায় কতিপয় ছত্র লিখিত আছে। তাহার অর্থ আমরা এইস্থলে প্রদান করিলাম উক্ত পারস্য লিপির অর্থ এই,—"যদ্যপি কেহ অর্থলিপ্সু হইয়া থাক তাহা হইলে সে এই মসজিদ সমূহের চতুর্দ্দিকে ৩/, ৪/ বিঘা ভূমী খনন করিলে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইবে।" এই প্রকার লিখিবার বা কৌশল অবলম্বন করিবার হেতুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। জমি গভীররূপে খনন করিলে তাহার উর্ব্বরাশক্তি অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া কৃষি-কার্য্যোপলক্ষে এবম্প্রকারে সুচারুরূপে খনন করিয়া শস্য রোপন করিতে পারে না। অপিচ, অর্থলিপ্সু হইয়া যদ্যপি কেহ ভূমি খনন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহার কার্য্যই সমধিক সন্তোষ জনক হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া খাঞ্জয়ালী ৩/, ৪/ বিঘা জমির মধ্যে অর্থ লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থ-গৃধ্নু ব্যক্তিগণ ধনলোভে প্রাগুক্ত মসজিদের চতুঃপার্শ্বে বহুশত বিঘা জমি সুগভীররূপে খনন করিয়া ফেলিয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে বহু লোকে উহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই বহু অর্থ লাভ করিয়া দৈন্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার কৌশল কোন প্রকারেই অপ্রশংসার যোগ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত মসজিদের চতুঃপার্শ্বের বহুবিঘা

---

* আমার Indian Antiquary তে প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ। লেখক।

জমি শস্যশালিনী হইয়া স্বর্ণ প্রসব করিতেছে। ইহাও খনন কার্য্যের বিশেষ ফল বলিতে হইবে। পরন্তু যে পরিমাণ অর্থ ভূমধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যয় করিলেই জমির উর্ব্বরাশক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইত তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তদীয় হস্তে প্রচুর অর্থ ছিল বলিয়া তিনি ঐ প্রকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে বহু কৃষক ঐ স্থানের জমি খনন করিয়া ধনী হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

ষাট-ঘোমট।

মসজিদের কারুকার্য্য অত্যল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বভাগে একটি সুবিশাল "হল" দৃষ্ট হয়। তাহার সহিত মসজিদের কোন সম্বন্ধ নাই দুটিই স্বতন্ত্র অট্টালিকা। বর্ত্তমান আলোচ্য 'হল'টি সুদৃঢ়রূপে গঠিত। উহা ষষ্টিতম দ্বারবিশিষ্ট। ইহাকেই ষাট-ঘোমট বলে। 'ঘোমট' অর্থে দ্বার বুঝায়। অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার চতুঃসীমা প্রদত্ত হইল :—ষাট-ঘোমটের উত্তরে বাগের হাট রাস্তা। তাহার উত্তরে মগরা ও চিত্তারখোল গ্রামদ্বয় এবং হাওলী পরগণা। হাওলী পরগণার ঠিক উত্তরে ভৈরব নদী। দক্ষিণে মধুদিয়া পরগণা, খোস্তাকাটা চক ও চৌমোহনা নদী। পূর্ব্বদিকে কাড়াপাড়া গ্রাম ও হাওলী পরগণা। পশ্চিমে বারাকপুর ও রাজদিয়া পরগণা। এই পরগণার সীমা ভৈরব নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দীঘির বিবরণ।

রাজদিয়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত বারাকপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। তাহাকে লোকে "ঘোড়াদীঘি" বলিয়া থাকে। উহা দৈর্ঘ্যে এক মাইলের অধিক হইবে। উক্ত দীঘি অত্যন্ত গভীর ও জল অতিশয় পরিষ্কার। "ঘোড়াদীঘি" প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্যে পরিপূর্ণ। উহা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। প্রাগুক্ত সুবিশাল হল "ষাট-ঘোমটের" ঠিক পূর্ব্বদিকে "ঠাকুর-দীঘি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহার অপর নাম "দেব-দীঘি" উহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল হইবে। এই জলাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর বলিয়া তত্রস্থলের লোকে কহিয়া থাকে। এই ঠাকুর দীঘির ঠিক মধ্যস্থলে একটি দেবালয় আছে। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ঐ মন্দিরের শিরোভাগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট মাসে উহা জলমগ্ন থাকে। এই স্থানে আরও আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। সেই দীঘির মধ্যে সুবৃহৎ কুম্ভীরদ্বয় বিরাজ করিতেছে। আমরা অধুনা তাহার বিষয়ই বলিতে যাইব। লোকে তাহাদের "ধলা পাহাড়" ও "কালা পাহাড়" বলিয়া থাকে। নামানুযায়ী তাহাদের বর্ণও সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ তন্মধ্যে একটি শ্বেত ও অপরটি কাল। পূর্ব্ববঙ্গে শ্বেত বা শাদাকে "ধলা" বলিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় "ধলা" ধবল শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ধবল সংস্কৃতজ শব্দ সুতরাং "ধলা" কথাটি নির্ভুল বলিতে হইবে। উক্ত জন্তুদ্বয় বিলক্ষণ শান্ত, শিষ্ট এবং প্রতিহিংসাবিরত। তাহারা কদাচ লোকক্ষতিকর ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয় না। যদ্যপি কেহ তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকে তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘাটের দিকে ছুটিয়া যায়। তাহাদের আশা, তথায় যাইলে আহারোপযোগী খাদ্য যথেষ্ট মিলিবে। লোকে আদর করিয়া তাহাদের জন্য পায়রা, মুরগী প্রভৃতি প্রদান করে। কখন কখনও কেহ কেহ সন্দেশ, চিনি, ইত্যাদি মিষ্ট সামগ্রীও দিয়া থাকে। তাহারাও স্বেচ্ছায় মুখ হাঁ করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে আমাদের বর্ণিত ঠাকুর দীঘির ঠিক পূর্ব্ব ভাগে "পচা দীঘি" তিনপোয়া মাইল জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। "পচা দীঘি" দীঘির মধ্যে এক্ষণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অত্র বর্ণিত দীর্ঘিকাদ্বয় কাড়াপাড়া গ্রামের অন্তর্গত।

খুলনা পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটার ক্রীড়া বিলক্ষণ পরিস্ফুট হয় সুতরাং নদ্যাদির জল জোয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়া লবণাক্ত হইয়া পড়ে। জলে অত্যধিক পরিমাণে

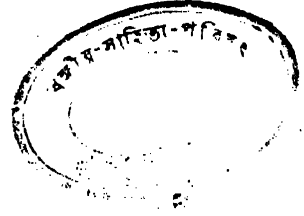
লবণের বিদ্যমানতা হেতু উক্ত বারি পানোপযোগী নহে। এবম্বিধ কারণ নিবন্ধন খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় পুষ্করিণী দীঘি, কূপ ইত্যাদি হইতে পানীয় জলের আহরণ হয়। এই স্থানের দীর্ঘিকা ও কূপাদির প্রাচুর্য্য বোধ হয় প্রাগুক্ত কারণেই হইয়া থাকিবে। চৌমোহানা-নদী ঠাকুর দীঘির একটি বিপর্য্যয় সংসাধিত করিয়াছে। উহা উক্ত দীঘির সহিত মিলিত হইয়া উহার জল লবনাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং উহা পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় দীর্ঘিকার জল এত স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ যে বাগেরহাট মহকুমার পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য এই দীর্ঘিকাদ্বয়েরসহিত পাইপ বা নলের সংযোগ করিয়া জল লইয়া গেলে কি প্রকার হইতে পারে, বহুদূর হইতে পাইপ দ্বারা জল সরবরাহ সুবিধা জনক কিনা ইত্যাদির প্রস্তাব চলিতেছে। বহু বিজ্ঞ ডাক্তার এই স্থানের জল পরীক্ষা করিয়া শারীরিক অবনতিবিধায়ক কোন বিষাক্ত জীবাণু (Microbe, bacilli) প্রাপ্তহয়েন নাই। কলিকাতার স্থায় কলের জলের ব্যবস্থা করিতে হইলে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কার্য্য সংসাধন করিতে হয়। কলিকাতার জলের কলের ব্যবস্থা এইরূপ। কলিকাতার বহির্ভাগ হইতে পাইপ সাহায্যে জল লইয়া অসা হায়। তাহা রিজার্ভ চৌবাচ্চায় রাখিয়াদিলে উহার কর্দ্দমাদি থিতাইয়া নিম্নে পতিত হয় উহাকে "তলানী" বলে। পরে ঐ জল তথা হইতে নীত হইয়া পরিষ্কৃত ও গরম করা হয়। সর্ব্বশেষে তাহা সংপেষণ-যন্ত্রের সাহায্যে গৃহেগৃহে সংযুক্ত পাইপ দ্বারা কলিকাতার প্রতি গৃহে প্রেরণ করা হয়। যে জল পরিষ্কার করিতে বহু আয়াস আবশ্যক হয় যদ্যপি তাহা স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে আর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কে তাহার অবহেলা করিতে প্রয়াসী হয়! বাগেরহাটের অধিবাসীগণ পাইপ সংযোগে কাড়াপাড়া ও বারাকপুর হইতে এমন পরিষ্কার জল প্রাপ্ত হইলে কম সুবিধা হইবে না।

এক্ষণে আমরা খাঞ্জালী সাহেবের মসজিদি প্রস্তুত বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমারে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কিম্বদন্তী এইরূপ যে তিনি বাগেরহাট ও মসজিদকুড়ে তাঁহার কীর্ত্তি সংরক্ষণ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া অট্টালিকাদির সরঞ্জাম আনয়ন করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম হইতে নৌকাসংযোগে দ্রব্যাদি আনয়ন বিশেষ সুবিধাজনক স্থির করিয়া তথা হইতেই সমগ্র উপকরণাদি লইয়া আসিবার মনন করিলেন। খুলনা হইতে ভৈরব নদী হইয়া সুন্দরবনের মধ্যদিয়া চট্টগ্রামে সহজেই পৌঁছাইতে পারা যায়। এমত সুবিধা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া খাঞ্জালী সাহেব চট্টগ্রামের একটি ক্ষমতাশালী ফকিরের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। সেই ক্ষমতাশালী ফকির কিঞ্চিৎ উদ্ধত প্রকৃতির ছিল। সে তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়া পাঠাইল:— "একরত্তি বাড়াণী তার চাটগাঁয়ে বরাৎ।" ইহার অর্থ এই—খাঞ্জালি, তুমি একখণ্ড ক্ষুদ্র জমির অধিকারী হইয়া আমার ন্যায় ফকিরের নিকট হুকুম-নামা প্রেরণ করিতে লজ্জা বোধ কর নাই। ইহা তোমার কম বেয়াদবী নহে। আমি তোমাকে বাড়াণী * বা চাউল প্রস্তুতকারক বলিয়া মনে করি। তুমি এতাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়া আমার নিকট হুকুম-নামা প্রেরণ করিতে পার না।" এইরূপ প্রত্যুত্তর পাইয়া খাঞ্জালী অতিমাত্র অপমানিত হইয়া অপর স্থান হইতে প্রস্তর ও অন্যান্য আসবাব আনয়ণ করিয়া মসজিদাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই ফকির তাঁহাকে একজন বড় জায়গীরদার বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং পরিশেষে যে যে দ্রব্যের

* বাড়াণী,—যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, ধান ভানিয়া যৎসামান্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বারা দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন করে তাহাদিগকে "বাড়াণী" বলে। একরত্তি—যৎসামান্য। চাটগাঁয়ে—চট্টগ্রামে। বরাৎ—আদায়।

আবশুক হইত তাহা সে প্রেরণ করিত। দীর্ঘিকার ঘাট এখনও সুন্দর ভাবে বিদ্যমান। মসজিদ ও অপরাপর ইমারতাদি খিলানে প্রস্তুত তাহাতে কড়ি ও বরগার আবশুক হয় নাই। এই প্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারতাদি কড়ি ও বরগার সাহায্য না লইয়া কিপ্রকার যে দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয় বটে। সেই খিলানের কার্য্য আবার এমত সুন্দর যে কতিপয় শতাব্দী অতীত হইয়াছে তথাপি ইহার কোন প্রকার বিকৃতি লক্ষিত হয় নাই এবং ভূমিকম্পেও ইহার কোন স্থান ভগ্ন করিতে পারে নাই। ইহার গাঁথুনী বা নির্ম্মাণ পরিপাট্য অতীব সুন্দর।

শ্রীগণপতি রায়।



প্রতিভা

২য় বর্ষ ভাদ্র, ১৩১৯ ৫ম সংখ্যা

ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব (১)

পৌরাণিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বস্তু-ভিত্তি ব্যক্তি-নিষ্ঠা বা ব্যক্তি-কর্ত্তৃত্বের ন্যূনাধিক অসদ্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; উহার প্রবল পারিবারিক আদর্শ, সাম্প্রদায়িক আদর্শ, এবং সাম্প্রদায়িক ভাবুকতাটুকুও লক্ষ্য করিয়াছি। এখন, এই পৌরাণিক লক্ষণ ভারতায় সাহিত্য চিরজীবী-ভাবে প্রবল থাকিতে পারে নাই, উহা প্রবল থাকিলে ভারতবর্ষে প্রকৃত সাহিত্য পদার্থের জন্ম হইত কিনা সন্দেহ; কিন্তু, উহা ঘটিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ, বুদ্ধ-আত্মার আবির্ভাব। বুদ্ধদেব উপনিষদ্ যুগের শেষে এবং পৌরাণিক যুগের প্রথম ভাগেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। অনার্য্য এবং দ্রাবিড়গণকে ব্যাপকভাবে আর্য্য-আদর্শের অধিকারভুক্ত করিবার জন্য, সমস্ত ভারতবর্ষকে আর্য্য-হিন্দু নামের দীক্ষা দান করিবার জন্য, আর্য্যসমাজে যেই চেষ্টা হইতেছিল; আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার নামই পুরাণ। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবও নানাদিকে ভারতীয় জাতীয় হৃদয়ের এই অধ্যাত্ম-চেষ্টার ফল বই নহে। বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নহে; উহা নৈসর্গিক ধর্ম্ম, এবং কেবল আচার-মূলক ধর্ম্ম বলিয়াই উহার উপাধি 'সনাতন ধর্ম্ম'। বৌদ্ধ ধর্ম্মই পৃথিবীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রচারক। সত্যের সমাচার যে দেশকাল-জাতি নির্ব্বিশেষে প্রচার করিতে হয়; অন্যকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে, দীক্ষাদান করিতে এবং প্ররোচনা করিতে হয়; পৃথিবীর একপ্রান্তে বসিয়া কোন জাগ্রত চক্ষুঃ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট সত্য যে সমগ্র মনুষ্য সমাজের উত্তরাধিকার সম্পত্তি; এই বিষয়ে যে কোনরূপ সীমাসঙ্কীর্ণতার স্থান নাই; এই মহাবার্ত্তা—মনুষ্যত্বের এই পরম স্বত্ব সর্ব্ব প্রথম বুদ্ধদেব কর্ত্তৃকই পরিদৃষ্ট হয়, এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। তাই, বুদ্ধদেবই

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের সভ্যতা মধ্যে উহার বিশেষ ফল।

(১) এই প্রবন্ধ বানীপন্থার মধ্যে 'সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত; পূর্ব্ববর্ত্তীর সঙ্গে পরস্পরাসূত্রে গ্রথিত। সাময়িক পত্রে খণ্ডাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধমাত্রই পাঠকের কিছু-না-কিছু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া থাকে; এই আশঙ্কায় ফুটনোটে সূত্র রক্ষা করিয়া প্রত্যেক বারে প্রকাশিত অংশ স্বতন্ত্র নামে প্রকাশ করা স্থির হইয়াছে।—লেখক

আধুনিক মনুষ্য-সভ্যতার আদি পুরোহিত। সত্যকে দেশকালের নিঃসম্পর্কভাবে দর্শন করিয়া উহার নির্ব্যূঢ় এবং নিষ্কলঙ্ক স্বরূপটুকুই মনুষ্য-সমক্ষে উপস্থাপন, সত্য-কেই পরম ধর্ম্মরূপে স্থাপন, ইহা মনুষ্য-সভ্যতার প্রাপ্তি বলিয়াই মনে করি। উহা মনুষ্য জাতির ইতি-হাসে জ্ঞান-যুগের—প্রকৃত বিজ্ঞান-যুগের প্রথম সুত্রপাত; মনুষ্যাত্মার জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সতর্ক পুরুষকারের আরম্ভ। বুদ্ধদেবের এই প্রকট দেবতা-বিদ্রোহ হইতেই ভারতবর্ষে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্যের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এক নব-যুগের আরম্ভ হইয়াছে ; বুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নামই প্রাগৈতিহাসিক যুগ। তবে, ভিতরে অনুসন্ধান করিলেই দেখিবেন, বুদ্ধদেব স্বয়ং এই সূত্রে বহু পূর্ব্ববর্ত্তীর সমবেত অধ্যাত্ম-ফল ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপনিবেশ স্থাপনের অনতিব্যবহিত যুগে, আর্য্য-অনার্য্যের এবং আর্য্য সমাজের মধ্যস্থিত বহু-সাম্প্রদায়িকতার এবং বর্ণজাতি-ভেদ আদর্শের প্রথম সংঘর্ষের যুগে, সর্ব্বপ্রথম এক অতি-কায় মহাপুরুষের ছায়ামূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। এই ক্ষত্রিয় ঋষি এবং এই বীর-পুরুষই সর্ব্ব প্রথম মনুষ্যত্ব-স্বত্বের খ্যাপন করিয়া মনুষ্যাত্মার বিশ্ব-প্রভুতা এবং অনন্ত শক্তি প্রমাণিত করিয়া যান; সমস্ত কৃত্রিম বর্ণ-ধর্ম্ম এবং আশ্রম-তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া, বর্ত্তমান এবং অনাগত আর্য্যজাতি এবং আর্য্য-আচারী মাত্রকেই একই সমভূমে আনয়ন করেন; নিজের অতুলনীয় সবিতৃমন্ত্রের (গায়ত্রীমন্ত্রের) সাধক ও উপাসক মাত্রকেই দ্বিজত্ব লক্ষণের অধিকারী করিয়া যান। বিশ্বামিত্রকেই প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া মনে করি। বিশ্বামিত্রের বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং ভার্গব প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের বাদ-বিসম্বাদের ঘনফল ভারতীয় সমাজের স্থিতিশীল অধ্যাত্ম লোকে নানা দিকে কার্য্য করিয়াছিল। (২) বিশ্বামিত্রের পর সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রামচন্দ্রের মধ্যেই তাঁহার উদার আদর্শের অনুসরণ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। অহল্যার উদ্ধার, ভার্গবের পরাজয়, এবং গুহক ও সুগ্রীবাদি অনার্য্য সমূহ পতির সঙ্গে মিতালী, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যপ্রভাবের বিস্তার এবং প্রজানুগত রাজশক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত মধ্যে উহারই পরিচয় পাই। নিরাবিল ব্রাহ্মণ্য আদর্শের লেখনী চিত্র হইতেই এই সমস্ত লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। উহার পর, ভারত যুদ্ধের সময়ে, আর্য্য আদর্শীয় দ্বাপর যুগের শেষভাগে, ভারতবর্ষে অপর এক ক্ষত্রিয় মহাপুরু-ষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সমগ্র আর্য্য সমাজের আদর্শ এবং উহার আধ্যাত্মিকতা তাহার দ্বারা নানাদিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল (৩) এই দুই জন ক্ষত্রিয় ঋষিই ভারতবর্ষে প্রাচীন মনুষ্যত্ব আদর্শের অবতার বা 'দেবাংশ' রূপে ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই সম্পূজিত হইয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র এবং জীবনযুদ্ধনিরত এই দুই ক্ষত্রিয় রাজর্ষিই প্রাচীন ভারতে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের) প্রতিষ্ঠাতারূপে মস্তক উন্নমিত করিয়া আছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী এবং তাঁহাদের জীবন আদর্শের যুগোচিত ফল রূপী এই শাক্যসিংহ, 'পশুবলিপ্রদায়ী' 'যজ্ঞশিষ্ট ভোজী' 'সোম-পীথি' এবং মাংসাশী আর্য্য সমাজের মধ্যে একান্ত ভাবে বেদবিরোধী এবং অহিংসাবাদী এই শাক্য সিংহ! গ্রাম সমাজ এবং পরিবার তন্ত্রের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী এবং নির্ব্বাচনমূলক 'সংঘ' আদর্শের প্রতিষ্ঠাপক এই শাক্যসিংহ! একদিকে চতুরাশ্রম আদর্শের বিরুদ্ধে একান্ত ভাবে 'নৈষ্কর্ম্ম'-বাদী, অন্যদিকে প্রবল লোকাদর্শ, লোকায়ত-জীবন, লোকক্ষেম এবং প্রবল "সৎকর্ম্ম' বাদী

(২) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তনয় সুর্ভৌম কর্ত্তৃক পরশুরামের নিধন ও পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃব্রাহ্মণ করার উল্লেখ ব্যাস-পুরাণে আছে।—লেখক।

(৩) গৌরগোবিন্দ রায়, নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক নানাদিকে ঐতিহাসিক প্রণালীতে এই মহাপ্রকাশের প্রধান অধ্যাত্ম লক্ষণগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ে কুতুহলী পাঠক নব্য-ভারত ১৩১৮ সনে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।—লেখক।

এই শাক্যসিংহ! একই হস্তে দ্বি-ফলক অস ধারণ করিয়া উপস্থিত! জন্মগত অধিকার এবং তন্মূলক সমূহ আদর্শের বিরুদ্ধে প্রকট ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের আদর্শ কার্য্য না করিলে, প্রত্যেক মনুষ্যের সম্বন্ধে সবিচারে নিজের জীবন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা এবং অধিকার না ধরিলে, এই 'শ্রমণ' এবং উপাসক আদর্শের পরস্পরবিরুদ্ধ ধারা কোন মতেই সঙ্গতি লাভ করিতে পারিত না! ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের স্বত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যকে একান্ত ভাবে সম্মুখে না রাখিলে এই বিরুদ্ধ বাক্য দাঁড়াইতেই পারিত না! সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়, আর্য্য এবং অনার্য্য নির্ব্বিশেষে, বুদ্ধদেবের এই আদর্শকে দৃষ্টিমাত্র পরম আগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধমত 'লোকায়ত' হইয়া পড়িয়াছিল। স্থিতিশীল সমাজধর্ম্মের মধ্যে পরম স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত করিয়া বুদ্ধদেব প্রাচীন তন্ত্রের সভ্যতাবক্ষে অপরূপ গতিপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধাত্মার এই প্রবল প্রবাহ ভারতবর্ষের হিমাদ্রি প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, সমগ্র এসিয়া ভূমির মনুষ্য সমাজে তরঙ্গের পর তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন স্থিতিনীতি পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল; সমগ্র প্রাচীন মহাদেশের সমাজ সভ্যতায় এবং ধর্ম্মের আদর্শে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমরা অন্যত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে মনুষ্য সভ্যতার মহাজাগরণ যুগ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছি। পূর্ব্বপশ্চিমের চৈন এবং হীব্রুজাতির মধ্যেও ওই সময়ে সর্ব্বত্র এইরূপ আত্মজাগরণের প্রবাহই লক্ষ্য করিতেছি। চীনের কংফুচী এবং হীব্রুজাতির 'প্রফেট'গণ এই নবজাগরিত বিশ্ব-মনুষ্য-আত্মার উদগ্র উদ্দীপ্ত তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তখন বিজ্ঞানাত্মার অতর্কিত ব্রহ্ম-জাগরণ কার্য্য করিতেছিল; জগতের সবিতা পুরুষ ধরণীর-দিকে সদ্যোন্মিষ্ট কল্যাণনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; লোকলোকান্তর হইতে নব-তন্ত্রীয় জীবাত্মা-গণ মৃন্ময়ীর পান্থশালায় পদধূলি দান করিয়া যাইতেছিলেন! বুদ্ধাত্মা ওই নব যুগধর্ম্মের প্রকটিত অধ্যাত্ম-ফল বই নহেন! ভারতবর্ষের ক্ষেত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া, চিরকাল গৌরব করিয়া আসিতেছে। বুদ্ধাত্মার পূর্ব্বে জগতে সর্ব্বত্র সমাজ এবং ধর্ম্মের আদর্শ নির্ব্বিচার ভাবে পরস্পরে ওতপ্রোত হইয়া, নানাদিকে মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ, নিপীড়িত এবং সীমাবদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। বিশ্বজগৎ সর্ব্বত্র দৈবতত্ত্বে পরিপূর্ণ, এই সমুন্নত আদর্শ মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিলেও, এবং ব্যক্তি-বিশেষে উহার সাহায্য ব্যক্তিগত ভাবে মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারিলেও, সম্প্রদায়মধ্যে উহার কোন বিশেষ ফল ফলে নাই। বিশেষবিশেষ ধরণের পূজা-বলি ভিন্ন দেবতাবিশেষের প্রীতি সংসাধিত হয় না বলিয়া একটা সংকীর্ণ আদর্শ জগতের সর্বত্র মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব এবং খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল; প্রসারিত কিংবা আত্মপ্রচার-শীল সংঘের আদর্শও কুত্রাপি বলবান্ হইতে পারে নাই। নীতিই ধর্ম্ম; এবং নীতিই যে বিশ্ব-চক্রকে এবং মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া উহাকে পরমার্থে উপনীত করিতে পারে; বিশেষভাবের দেব-পূজা সাধন না করিয়া, এমন কি পূজা এবং উপাসনা হইতে সম্যক্ বিরত থাকিয়াও যে পরমা গতি লাভ করা যায়, পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজে ইহাই বুদ্ধাত্মার প্রধান সমাচার! উহার পর হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম-আদর্শ (সেশ্বর এবং নিরীশ্বর আদর্শ) বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত এই সুসমাচার-ফলে, এই নীতিমূলক ধর্ম্ম-আদর্শের গৌণ বা মুখ্য ফলেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই বুদ্ধাত্মার সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষের আত্মা তৎকালে, সকল দিকে ধর্ম্ম, সমাজ এবং অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল; মনুষ্যের বুদ্ধি দার্শনিকতার তরফেও কতদূর জাগরিত এবং প্রসারিত হইয়াছিল; এই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, প্রভাব এবং প্রসার চিন্তা করিলেই তাহা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনুষ্যের মন কতদূর স্বাধীন হইতে পারিলে, যুগযুগান্তরবাহী সামাজিক এবং পারিবারিক

বৌদ্ধযুগের ভারতীয় সমাজ।

ভালমন্দভাব-পুঞ্জ এবং আবর্জ্জনাকে কতদিকে ঝাড়িয়া উঠিতে পারিলে পর, বৌদ্ধ আদর্শের এই বিজ্ঞান-স্বপ্নে এবং স্বাধীনতার স্বপ্নে উৎসাহী হইতে পারে! এতকাল পরে, এই সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পরেও, এবং বিংশশতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক-যুগে দাঁড়াইয়াও কয়জন ব্যক্তি এই আদর্শটাকে নিরাবিল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন? বুদ্ধাত্মার উদ্ভব-ক্ষেত্র (ভারতবর্ষীয় উপনিষদ্ যুগের তপোবন এবং গ্রাম-সমাজ) তখন মনকে কতদূর পূর্ব্ব সংস্কার-হীন করিতে এবং কেবলমাত্র প্রতিবিম্ব-গ্রাহী শুভ্র-দর্পণ-রূপে (tabula rasa) পরিণত করিতে পারিয়াছিল, তাহাই চিন্তা করিবেন!

ভারতী সমাজে বুদ্ধাত্মার কার্য্য।

যাহা হউক, প্রাচীন সমাজতন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধাত্মার এই সমাচার যে পরম বিদ্রোহ রূপেই কার্য্য করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দেবতাবাদ এবং যজ্ঞতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মরাজ্যে, সমাজে এবং সাহিত্যে, অভাবনীয় ভাবে কার্য্যকর হইয়াছিল। বিদ্রোহ বলিলাম, কেন না, হিন্দুসমাজের সমস্তই বৌদ্ধ আদর্শের মুখ্য অপেক্ষা গৌণ প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য বিপুল পুরাণ-চেষ্টা করিয়া, সমস্ত প্রাচীন এবং প্রচলিত সাহিত্যের কাব্য ইতিহাস দর্শনের উদ্দেশ্য-বিষয়কে, ব্রহ্মবাদ আত্মার অমরত্ব পুনর্জ্জন্ম এবং পরলোকের আদর্শ প্রভৃতিকে নানাদিকে সংশোধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া, বৌদ্ধ আদর্শের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থাপন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধ-পরবর্ত্তী ভারতের কোন বিষয়ই বৌদ্ধ আদর্শের গৌণ-মুখ্য প্রভাব হইতে নির্ম্মুক্ত নহে। উহাকে সবিশেষে ধারণা করার ইহা স্থান নহে। ভারতবর্ষের সমাজ অথবা ধর্ম্মের পদার্থ-পরিচয়-কামী ব্যক্তি মাত্রের জন্য, সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসুর জন্য এবং বর্ত্তমান কালের সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রার্থীর জন্য, এই জিজ্ঞাসা-অধ্যায় অপরিহার্য্য হইয়া আছে। ভারতবর্ষের সমাজের এবং ধর্ম্মের প্রধান তত্ত্বাধ্যায় এখনও লিখিত হয় নাই। এই ইতিবৃত্ত সম্যক্ না জানাতেই আমরা বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য বিষয়ে নানাদিকে অমার্জ্জনীয় ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছি।

ভারতের ভাষা সমূহে বৌদ্ধ আদর্শের ফল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ-আদর্শের প্রভাব অতুলনীয় এবং অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া আছে। উহার একটা প্রধান কার্য্য, সাধারণ লোকাদর্শের এবং লোকায়ত ভাবের পরিপোষণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয় সন্নিহিত ভাষার পুষ্টি সাধন; এক কথায়, সাধারণের মাহাত্ম্য প্রচার, সংস্কৃত নামক পণ্ডিত ভাষার মাহাত্ম্য অস্বীকার করিয়া, দেশপ্রচলিত এবং ন্যূনাধিক আর্য্য-অনার্য্য-মিশ্র দেশ-ভাষাকেই পরম বীরত্বের সহিত আলিঙ্গন! এই আদর্শে, নানাদিকে অগঠিত এবং দুর্ব্বিনীত পালী-ভাষার মধ্যেই সারস্বত-দুর্গ পরিকল্পনা করত, বুদ্ধদেব গোঁড়া আর্য্যত্বের এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবকে নিগৃহীত করিতে এবং ভারতবর্ষকে বিজয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উহার দ্বারাই, সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে সাধারণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইল! পরকালে উহার দরুণেই হয় ত, বিপক্ষদলের সাপক্ষে এই দুর্গটাকে বিধ্বস্ত করার পক্ষে সুবিধা ঘটিয়াছে; কিন্তু, উহার প্রধান ফল, সংস্কৃতের মাহাত্ম্য অস্বীকার! উহার ফলেই, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রদেশভাষাসমূহ সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া, সাম্প্রদায়িকতা এবং গ্রাম্যসমাজের শত সংকীর্ণতা সত্ত্বেও নানাদিকে নিসর্গ-গতির পরিপোষণ করিয়া, ভারতের দেশে-দেশে বৃহৎ-বৃহৎ জাতি-নামের নিদান হইতে পারিয়াছে; সংস্কৃত ভাষার পরম পবিত্র পুরী-মধ্যেও পৈশাচী ভাষার প্রবেশ ঘটাইতে পারিয়াছে!

ভারতীয় সাহিত্যে উহার কার্য্য।

পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য, উহার কাব্য নাটক কথা এবং উপকথার সমস্তই, এই বুদ্ধদেব দৃষ্ট সাধারণ মনুষ্যত্ব আদর্শের প্রভাবেই নিয়মিত হইয়াছিল; পুরাণ অথবা তন্ত্রমন্ত্র সংহিতার ঐকান্তিকতাকে নিগৃহীত করিয়া ভারতবর্ষে প্রসারিত ভাবে জীবৎ-শক্তি লাভ

করিয়াছিল! একান্নবর্ত্তী পরিবার, অথবা পৌরোহিত্য অধিষ্টিত নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মতন্ত্রতা, কিংবা গ্রামের স্থিতিশীল সমূহ আদর্শের মধ্যে, নির্ম্মল সাহিত্য-রস-ভোগ নামক পদার্থের উদ্গতি কিংবা উদ্বৃত্তি হওয়া সহজ ছিল না। কোন প্রাচীন সমাজতন্ত্রেই উহা সুগম হইতে পারে নাই। জীবিকার্জ্জন অথবা প্রত্যহের এবং প্রতি দণ্ডের দেবপ্রীতিসাধনা ব্যতীত, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ত্রেতা ও দ্বাপর নামক যুগদ্বয়ের আর কোন বিশেষ কার্য্য-নিদর্শন (বেদ ও রামায়ণ মহাভারত ভিন্ন) স্বরস্বতী মাতা রক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন নাই (৪)। অনেক-কিছুর বিনাশ অথবা বিলয় প্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটিয়াছে, সত্য কিন্তু প্রাচীন বৈদিক অথবা পুরাণ-সংহিতার ঐকান্তিক ধর্ম্ম-আদর্শের ব্রাহ্মণ-জ্ঞানী বিদ্বান অথবা ধার্ম্মিকের পক্ষে, প্রাতঃ সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নের অবশ্য-কর্ত্তব্য হোমাদি বা প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্ম্ম-কার্য্য সমাধা করিয়া, আর নিঃশ্বাসফেলিবার অবকাশ কাল যেন কোথাও নির্দ্দেশিত নহে! প্রাচীন তন্ত্রীয় ধর্ম্মের আদর্শ মধ্যে—'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' এই নীতি-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা দেখিয়াছি, এখনও এই ভারতবর্ষে সম্প্রদায় বিশেষ নানাদিকে এইরূপ আদর্শের মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের স্বাধীন মানব-তন্ত্রীয় আদর্শ প্রচারিত হওয়ার পরেই আমরা, সরস্বতীর সাহিত্য প্রকোষ্ঠে শূদ্ররাজার সভামণ্ডপে এবং ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মার মুখে, সর্ব্বপ্রথম উহার আত্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিতে পাইলাম—

সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।(?)
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ-লাভের উপায় গুলির মধ্যে সাহিত্যও একতম বলিয়া স্বীকার এবং সম্বর্দ্ধন লাভ করিল! কেবল অসঙ্গ হওয়া, যতি-ব্রত হওয়া কিংবা সংহিতাশাস্ত্রাদির অনুসারে ধার্ম্মিক হইবার ঐকান্তিক আদর্শটুকু লেখকের নয়ন সমক্ষ হইতে অন্তর্হিত। শেষ কথাটীর অর্থও লক্ষ্য করিবেন! সজ্জনসঙ্গ! এই 'সজ্জন'টাও অবশ্য নিখুঁতভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-আদর্শের সজ্জন নহেন! উহার মধ্যে পরম অসাম্প্রদায়িকতার গন্ধই প্রবল! এই 'সজ্জন' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আধুনিক; লোক-নীতি-নিষ্ঠাই উহার প্রধান সঙ্কেত!

হিতোপদেশ এবং পঞ্চতন্ত্র।

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের মধ্যেই আমরা সর্ব্বপ্রথম নিরবচ্ছিন্ন লোক নীতি-তন্ত্রীয় আদর্শের এবং লৌকিক কর্ত্তৃত্ব আদর্শের সাহিত্যচেষ্টার সম্মুখীন হই। রামায়ণ মহাভারত ব্যতীত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন সাহিত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিনা তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা কঠিন। হয়ত, এই হিত-কথাগ্রন্থও পর কালে সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু চাণক্যই উহার আদি-কর্ত্তা; এই ক্ষেত্রে কিংবদন্তীকেই সত্য বলিয়া মনে করি। যাহা হউক এই দুই গ্রন্থই আর্য্য ভাষার মধ্যে প্রাথমিক বৌদ্ধপ্রভাবের ফল। সংহিতা-পুরাণ এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-আদর্শের লক্ষণটাকে অতিক্রম করিয়া ভারতে এই নবীন এবং সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক সাহিত্য-পদ্ধতির জন্ম হইল! এই পদ্ধতির দর্শন মাত্র সমগ্র এসিয়া খণ্ড তাহাকে চিনিয়া ফেলিল; এবং পরম আগ্রহে বরণ করিয়া লইল। এই গ্রন্থদ্বয় বিপুল উৎসাহ সহযোগে ভাষান্তরিত হইতে লাগিল। সুদূর ইউরোপখণ্ডে পর্য্যন্ত উহার সূত্র বিস্তারিত হইয়া ঈসপ্ এবং পিল্পের গল্পকথাসমূহের জন্মদান করিল (৫)।

(৪) সত্যযুগে আর্য্য-কুল কেবল 'ভ্রমণ' তৎপর ছিলেন অর্থাৎ পৃথিবী বক্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনে তৎপর ছিলেন, ইহার উল্লেখ পুরাণে মিলিতেছে।

(৫) বিদ্পই বা পিল্পইর গল্পসমূহ ভারতবর্ষীয় বিদ্যাপতি নামক রচয়িতার কর্ত্তৃত্বই প্রমাণিত করে; ইহা কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন।

ভারতের বা জগতের প্রাচীন সাহিত্যহৃদয়মধ্যে হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির এত প্রাধান্য ঘটিবার কারণ কি? উহাদের অসাম্প্রদায়িক ভাব, অভিনব সাহিত্য-রীতি, এবং নিরবচ্ছিন্ন লোকনীতি-নিষ্ঠা। মনুষ্য-মন জীবজন্তুর চরিত্রকথার অছিলা ধরিয়া এই একবার পরম মুক্তি লাভ করিয়াছিল! এই সমস্ত গ্রন্থে সর্ব্বত্র জীব-জন্তুকেই,—দীর্ঘগ্রীব, লম্বকর্ণ এবং মন্থর প্রভৃতিকেই হৃদয়ভাব প্রকাশের নায়কস্বরূপে বরণ করা হইয়াছে! উহার কারণটাই লক্ষ্য করিবেন! উহার প্রধান উদ্দেশ্য অতি প্রবল সাম্প্রদায়িক আদর্শ হইতে মুক্তি! কোন সংহিতা-পন্থী ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যের চরিত্রবিষয় অবলম্বনে ওই সমস্ত নীতিকথা নিষ্কাশিত করিতে বসিলেই চাণক্য পণ্ডিত পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। শাস্ত্র-সংহিতার দ্বারা সীমানিবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের সমক্ষে আসিয়া, পদে-পদে এবং প্রত্যেক পলে বিপলে হস্ত-সঙ্কোচ করিতে হইত! হিন্দু-আদর্শের 'গণ্ডী' হইতে বহির্গামী হইয়া কেহই যেমন তেমন করিয়া খাইতে—বসিতে—চলিতে বা কথা কহিতেও পারিত না! পদে পদে সকলকেই সামাজিকতা রক্ষা করিয়া, অথবা গৃহ্য-সূত্র এবং মনুসংহিতার নেমি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই চলিতে হইত! হিতোপদেশ প্রভৃতি কেন, এই যুগের বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থাদির মধ্যেও সর্ব্বত্র এই প্রকার নীতিই লক্ষ্য করিবেন। মনুষ্যাত্মা পরিশেষে, যেন কাল্পনিক অথচ সংপ্রসারিত 'জীবন্ত' আদর্শের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়াই, সকল সম্প্রদায়-আদর্শের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে—যেন হাঁফ ছাড়িয়াই, বাঁচিয়াছে! একেবারে পুনরবির্ত্তন করিয়া জীবজন্তুর সঙ্গ-সঙ্গমের মধ্যে আত্ম-বিলোপ সমাধা করিয়াই, মনুষ্য নিজের স্বহস্তরচিত শাস্ত্র-আদর্শের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছে! সুতরাং, এই সমস্ত গ্রন্থের প্রধান লক্ষণই মনুষ্যের আত্ম-বিলোপ; উহাদের 'চরিত্র' আদর্শও তাই নানাদিকে 'ব্যক্তিত্ব-হীন বা impersonal; উহারা সম্পূর্ণ লোকায়ত-আদর্শের প্রভাবেই বিরচিত। হিন্দুধর্ম্ম-নিষ্ঠ শূদ্র-রাজার সভাস্থলে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া, বৌদ্ধক্ষপণকগণের মস্তক-উদ্দেশে স্থানে স্থানে 'বৃহল্লগুড়ের' ব্যবস্থা করিয়া থাকিলেও, উহাদের হৃদয় মধ্যে বুদ্ধ-পদাঙ্কই মুদ্রিত হইয়া আছে।*

উহাদের সাহিত্য আদর্শ।

বৌদ্ধ আদর্শের প্রত্যক্ষ সংসর্গে থাকিয়া, (প্রকৃত বৌদ্ধমতাবলম্বী কর্ত্তৃক) সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন

* এই যুগের সংস্কৃত, বিশেষতঃ পালি গ্রন্থগুলির এই জীবজন্তু সংক্রান্ত লক্ষণ এবং অবিকশিত গদ্যরীতি চিন্তা করিয়া, অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত, উহাদিগকে একেবারে আদিম গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ওই সমস্ত গ্রন্থের পূর্ব্বে, সংস্কৃত ভাষাতেও একমাত্র বেদ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন গ্রন্থই যে বিরচিত হয় নাই, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছেন। ভারতীয় বর্ত্তমান সংহিতা শাস্ত্র বা পুরাণ দর্শনাদি এমন কি রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত সমস্তই যে বুদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী এইরূপ একটা মত বদ্ধপরিকর হইয়া চালাইয়াছেন। জীব-জন্তু বিষয়ক গল্প বলিয়া, অথবা, পালিভাষায় সাহিত্যরীতির শৈশব সূচিত করিতেছে বলিয়াই, উহারা যে ভারতীয় মনুষ্যগণের শৈশব সূচনা করিবে, আদিম বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার পক্ষে কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই; বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে—যেই ক্ষেত্র বুদ্ধাত্মাকে জন্মদান করিতে পারিয়াছিল, কেবল যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই নিরীশ্বর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল! পালিভাষার অপরিণত বয়োবুদ্ধি আলোচনা করিয়াও অনেকে 'সংস্কৃত' ভাষা-টাকেই উহার পরবর্ত্তী এবং অর্ব্বাচীন বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন প্রাদেশিক বা পৈশাচী ভাষার অপরিণত রীতি-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সংস্কৃত ভাষার বা তাহার পুরাণদর্শনাদির বয়স পরিমাণ করা যাইবে না। পালিভাষার গ্রন্থ সমস্তই ন্যূনাধিক সাধারণজনহৃদয়কে লক্ষ্য করিয়াই বিরচিত। ওই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে মনুষ্যমতির শৈশব সূচিত হয় বলিয়াই, ভারতীয় মনুষ্যমন তখনও শৈশব অবস্থায় ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে; অথচ ঐতিহাসিক-গণকে প্রায়ই এই জাতীয় প্রমাণ পদ্ধতি আশ্রয় করিতে দেখা যায়। আমরা বলিব, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উহার কথিত-ভাষা-প্রকৃতি বা গদ্য আদর্শ, কদাপি তাহার জ্ঞান-বুদ্ধির সহিত বা 'ব্রাহ্মণ' বুদ্ধির সহিত সমতল বা সমান্তরাল ছিলনা। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই

সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। ক্ষেমেন্দ্র রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যও বহু পরবর্ত্তী। ভারতীয় বাণী-পদ্ম উহার গৌণফলেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। পালি ভাষার মধ্যেও হিতোপদেশ প্রভৃতির লক্ষণযুক্ত, বহু বিস্তৃত সারস্বত চেষ্টা ঘটিয়াছে; কিন্তু সমস্তই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত এবং ন্যূনাধিক ধর্ম্মাধিকারের সাহিত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম কোন বিশেষ পূজাবিধিকে একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক নীতি-সাধনাকে পরম লক্ষ্যরূপে বরণ করায়, এই সমস্ত গ্রন্থে পৌরাণিক লক্ষণ প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু, উপদেশের প্রণালীটাই মুখ্যভাবে অনুসৃত বলিয়া, পালি ভাষার 'ত্রিপিটক' ধর্ম্মপদ প্রভৃতি গ্রন্থকে প্রকৃত সাহিত্যসংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করা চলে না। তবে, সাহিত্যের কোঠায়, সাহিত্য আদর্শের প্রদর্শন এবং পরিস্ফোটন বিষয়ে, উহাদের মাহাত্ম্য যে অনন্যসাধারণ তাহা বারম্বার স্বীকার করিতে হইবে। এই আদর্শ যেমন মনুষ্যমনকে সমস্ত সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্ম্ম-গোঁড়ামীর আবর্জ্জনা হইতে নির্ম্মুক্ত করার পক্ষে সহায় হইয়াছে, তেমনি উহার সাহিত্যকেও বিনির্ম্মল আত্মজ্ঞানের মধ্যে, প্রাঞ্জলতা স্বাধীনতা,লোকনিষ্ঠা, এবং মনুষ্যত্ব নিষ্ঠার মধ্যেও জাগরিত করিয়া গিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ অথবা মহৎ ঘটনা আর কি হইতে পারে! আধুনিক সাহিত্য-আত্মা বুদ্ধদেবেরই দীক্ষা-শিষ্য! মনুষ্যত্ব-নিষ্ঠাটুকুই তাহার পরা প্রাপ্তি! এই সিদ্ধির পর হইতেই তাহার মতি-রীতি এবং গতি অবারিত হইয়া নব নব রস-লোকে অধিকারলাভে প্রয়াসী হইতে পারিয়াছে! বহুকাল পরে বাল্মীকি-ব্যাসের অপহৃত আদর্শকে এই মনুষ্যত্বের মধ্যে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় মানবাত্মা আপনার অন্তর্লোক হইতে যেই উচ্ছ্বাস তুলিয়াছিল,তাহার শক্তি মহামহিম-রূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দু-ভারতবর্ষে এক অপরূপ সাহিত্য-সঙ্গীত উৎসারিত করিয়াছিল! উহার নামই সংস্কৃত সাহিত্য;

সংস্কৃত সাহিত্যে উহার গৌণফল।

ভারতে বৈদিক সাহিত্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদর্শ 'ঋষিত্ব' এবং 'বিপ্রত্বের' অবস্থিতি, এইরূপ সিদ্ধান্তের বিপরীত। ভারতবর্ষ বুদ্ধজন্মের বহুপূর্ব্বে সাধারণ লোক-ভূমি হইতে বহুদূরে তপোবন রচনা করিয়া, অতুলনীয় সংস্কৃত মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিয়াছিল। পাণিনির সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পাণিনি ব্যাকরণটাই অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত। আসল কথা, ভাষার বা সাহিত্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য চিরকাল প্রতিভাবান সাহিত্যসেবীর সঙ্গমের উপরেই নির্ভর করে। তদভাবে পূর্ণপরিণত সাহিত্যবুদ্ধিও অপরিণত ভাষাপ্রকৃতির মধ্যে আসিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতেই বাধ্য হয়। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার অবস্থাটাই লক্ষ্য করুন। পরম-গরিষ্ঠ ইংরাজী ভাষা এবং এই বিংশ শতাব্দীর মনোজীবনের সংশ্রবে থাকিয়াও, এমন কি, ইংরাজী ভাষার মহিমান্বিত ভাবে লেখনী চালাইতে জানিয়াও, আমরা অনেক শিক্ষিত ব্যাক্তিই কি বর্ত্তমানের বঙ্গভাষার মধ্যে এবং বঙ্গীয় পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে আসিয়া বালকের ন্যায় পদ-বাক্য ব্যবহার করি না; বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া বালক-সুলভ বাক্যপ্রকৃতির আশ্রয় লই না? এখনও আমাদের মধ্যে কি স্বল্প-পদতাই প্রাঞ্জলতার প্রধান লক্ষণ নহে? অধিকাংশ বঙ্গীয় লেখকের,—ইংরাজীতে অতি-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকের রচনা-রীতিই কি বঙ্গভাষাধিকারে বালকত্বই প্রতিপাদন করে না? উহার দ্বারা আমাদের মনোজীবনের কিংবা ইংরাজীসংক্রান্ত বুদ্ধি-বয়সের পরিমান করিতে গেলে কি সুবিচারের সম্ভবনা আছে? এমন কি ৭৫ বৎসর পূর্ব্বকার রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনার রীতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যদি তাহার মানসিক উন্নতি বিচার করিতে যাই, তা হইলে কি প্রতিপদে ভুল করিতে থাকিব না? যেই জাতির মধ্যে ভাষা-দ্বৈত ঘটিয়া যায়, তাহার কথিত ভাষার পক্ষে সমুন্নত মানবজীবন লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ব্যাপারটি নানামতে বাধিত হইতে থাকে। বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে চিরকাল এই জাতীয় বাধা অতিক্রম করিয়াই ধীরপদে অগ্রসর হইতে হইতেছে। সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে বঙ্গভাষার সর্ব্বতোমুখী শক্তি বা গৌরব মাহাত্ম্য অনায়াস ভাবে সিদ্ধ হইতে, কিংবা এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষার সাধারণ লেখকগণের সমতল লাভ করিতে আরও অন্ততঃ একশত বৎসরের ঐকান্তিক সাহিত্য-জীবনের আবশ্যক হইবে বলিয়াই মনে করি। সাহিত্য বা ভাষার সাধারণ সমতল উন্নীত হওয়া ব্যাপারটি দীর্ঘকাল এবং বহু-সাধকের সংযুক্ত চেষ্টা ভিন্ন কদাপি সম্ভব নহে।—লেখক

উহা সম্পূর্ণ আধুনিক আদর্শের সাহিত্য এবং বিশ্ব-সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত। উহার মস্তিগতি সম্পূর্ণ আধুনিক! যখন পৃথিবীর সরস্বতী সর্ব্বত্র অতিজটিল ধর্ম্ম-ভাবুকতায় জড়সর, যখন মনুষ্য-হৃদয় প্রকৃত মনুষ্যকণ্ঠে কথা-কহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া কেবল পূজাস্তুতি এবং বলি-বিষয় লইয়াই মাতিয়া আছে, তখনই বুদ্ধ-পদাঙ্ক-গর্ব্বী ভারতীয় সমাজ আপনার অশেষ দেবপূজা এবং শৈবশাক্ত এবং বৈষ্ণবীয় আদর্শ-গণ্ডীর মধ্য হইতেও এই নির্ম্মল সাহিত্য-তত্ত্বের মাহাত্ম্য-ফল চয়ন করিয়া গিয়াছে! ঈশ্বর প্রকৃতি এবং মনুষ্যের অপরূপ সম্বন্ধ-তত্ত্বে জাগরিত হইয়া অতুলনীয় ভাব-রসানন্দে বিলাসী হইয়াছে! ভারতীয় হৃদয়ের এই সাহিত্য-উচ্ছ্বাস এখনও পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে নানাদিকে অতুলনীয় এবং অনতিক্রম্য হইয়া আছে! তাহার শূদ্রক কালিদাস এবং ভবভূতি প্রভৃতি আপনাদের স্বাধীনতায় মনুষ্যত্ব-নিষ্ঠায় এবং এক অদ্বিতীয় নিসর্গ-তন্ময় রসানন্দে, বিশ্বসাহিত্য-রসিকের নিকট চিরকালের আনন্দস্থলী হইয়া রহিয়াছেন! তাঁহাদের এই মাহাত্ম্য কখনও ক্ষুণ্ণ হওয়ার নহে! তাঁহাদের সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের দেশে দেশে, সাহিত্যের এই আদর্শটাই প্রবল থাকিয়া কচিৎ-কদাচিৎ সমুন্নত প্রতিভা-সঙ্গমের দৃষ্টান্তও দেখাইয়া গিয়াছে। কালক্রমে হিন্দু-ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে নির্দ্দয় ভাবে কবলিত করিয়াছে, অথবা বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান ভেদনিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-আদর্শের দ্বারা চির-নিপীড়িত এই ভারতভূমির বক্ষেও, বুদ্ধচরণাশ্রিত এই সাহিত্য-সৌভাগ্য একবার সমুদিত হইবার পর আর একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। মনুষ্যের হৃদয় আপনার নির্ম্মল নিগূঢ় পরমাত্মার মধ্যে একবার জাগরিত হইয়াছিল বলিয়াই, আর উহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারে নাই।/ ভারতীয় মনুষ্যের মনোমধ্যে, একদিকে ঘন-জটিলতাময় সম্প্রদায় আদর্শ, অন্যদিকে নিযুক্ত-নির্ম্মল সাহিত্য লোকের এই 'মনুষ্যত্ব' আদর্শ, উভয়েই অপরূপ নির্ব্বিরোধ ভাবে পাশা-পাশি থাকিয়া আসিয়াছে! কালক্রমে এই সম্প্রদায় এবং জাতিভেদ-আদর্শের অশেষ সঙ্কীর্ণতা এবং অনিষ্ট-সঙ্গমে তাহার সংস্কৃত-ভাষাটাই জমাট বাধিয়া এবং অচল হইয়া গিয়াছিল এবং সাহিত্যকেও নির্জ্জীব রাখিয়া গিয়াছে, সত্য; কিন্তু, 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের মৌলিক নিষ্ঠা হইতে কখনও স্খলিত করিতে পারে নাই। মনুষ্য সাহিত্যের মধ্যে একবার নির্ম্মুক্ত ভাবে আত্ম-জ্ঞানী হইতে পারিলে তাহার পর শত সহস্র দৈব-দুর্ঘটনা কিংবা আপদ-বিপদেও তাহাকে মূল নিষ্ঠা হইতে চ্যুত করিতে পারেনা।

সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত সাহিত্য ও তাহার আদর্শ।

হোমর কিংবা খ্রীষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিব যে ভারতীয় সাহিত্যের এই দৃষ্টান্ত অতুলনীয়।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি *

নির্দ্দিষ্ট লিখনপ্রণালীর সাহায্যে কোন ভাষার প্রচলিত শব্দ-বাক্য-পদ সংযোগে নিজের মনোভাব ও অভিমত অপরের জ্ঞান-গম্য করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রবন্ধ বা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ সেই ভাষার সাহিত্য-পদ-বাচ্য। অনেকের মোটামুটি এই ধারণা আছে যে, যে প্রবন্ধে বা বিষয়ে ভাষার লালিত্য ও সৌন্দর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য ও সরসতা, পদ-বিন্যাসের শ্রুতি-মধুরতা ও নিপুণতা প্রকাশের জন্য চেষ্টা ও কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়, কেবল মাত্র সেই সকল প্রবন্ধ বা বিষয়ই সাহিত্য নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি যে, কেবল ব্যাকরণের সমস্ত শব্দার্থাদি অলঙ্কার পরিশোভিত পুস্তক মাত্রই যে সাহিত্য বলিয়া পরিচিত তাহা নহে; যে কোন পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণে কোন বিশেষ বিষয়ের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হয়—লেখকের উদ্দিষ্ট ভাব উপলব্ধি করিতে পারে—পাঠকের কোন বিশেষ জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে, তৎসমস্তই আমরা সাহিত্য-শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া গ্রহণ করি; তাহাতে ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা বা গ্রাম্য-দোষাদি থাকিলেও আমরা তৎসমস্তকেই সাহিত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করি। এই সাহিত্য, সমাজে রক্ষিত হইবার বস্তু। ইহার সাহায্যে বহু-যুগ-যুগান্তরেরও ব্যক্তিবর্গের মনোভাব ও অভিজ্ঞতা তৎপরবর্ত্তী কালের জন-সংঘ উপলব্ধি ও নিজের তুলনায় তাহার দোষগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সাহিত্য, একদেশসন্নিবিষ্ট নহে। ইহাকে ব্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই ব্যাপকতার নিদর্শন আমরা ক্রমে প্রদর্শন করিব।

সাহিত্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, গদ্য ও পদ্য। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কালে সকল দেশে সকল ভাষায় পদ্যের প্রচলনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষাও প্রকৃতির সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা আবার সাহিত্য কোন সময়ে সমাজে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কোন পুথি বা পদাবলী প্রথম কোন্ সময়ে সাধারণ লোকের লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিবার অসম্পূর্ণ চেষ্টা নীরস ভাবে আপনাদের সমক্ষে অদ্য উপস্থাপিত করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিব না; আর তাহার চেষ্টা এখনও সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার অবস্থায় উপস্থিত হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছে। এতাবৎ কাল বহু উদ্যমশীল, সাহিত্যানুশীলনকারী বহু আয়াসে, বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু চেষ্টায়, সময়ে সময়ে তাহার অনেকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে এখন আমাদের ক্রমে বিশ্বাস হইতেছে যে, সে উপকরণ সংগ্রহের সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে বিলম্ব আছে। যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্বানুসারী ব্যক্তিগণের গবেষণার ফলে আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, অন্ততঃ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়া গিয়াছে, সে সময়ের অনেক গুলি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ের অধিকাংশ সাহিত্যই পদ্যময়। কিন্তু তখন যে গদ্য সাহিত্য একবারে ছিল না, তাহা এখন কোন মতেই বলিতে পারা যায় না। কারণ, অনেকগুলি গদ্য পুথিরও আবিষ্কার হইয়াছে। ধ্বংস-প্রবণ কালের তিমিরময় অতীত গর্ভ হইতেও 'শূন্য পুরাণ' 'রাগময়ীকণা' 'আত্ম-জিজ্ঞাসা' 'চন্দ্র-চিন্তামণি' 'ভক্তি রত্নাবলী' 'বৈষ্ণক গ্রন্থ বা পাতড়া' 'দ্বাদশ পাট নির্ণয়' 'আশ্রয় নির্ণয়' প্রভৃতি অনেকগুলি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গ্রন্থ লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; পরে আরও যে উপস্থিত হইতে না পারিবে, তাহারও কারণ দেখি না।

এই ত গেল, তমসাচ্ছন্ন সময়ের কথা। পরে যখন ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন-অভিলাষে বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার-উদ্দেশ্যে, এদেশের জন-

* চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

গণকে নূতন ধর্ম্মালোকে দীপ্তিমান্ করিবার অভিপ্রায়ে, এদেশের প্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান-পর হইলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এদেশের পাদপ-সমাচ্ছাদিত দুর্ভেদ্য ধর্ম্মময় গিরিরাজ্যের গহ্বরাভ্যন্তরে সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধ, সুনির্ম্মল উৎস-বারি, নেপথ্যে মৃদু সুশ্রাব্য কলনাদে মধুর ঝঙ্কার করিতেছে। কোনরূপ চেষ্টায় সেই উৎসকে উৎসারিত করিতে পারিলে সাহিত্যের প্রস্রবণে দেশ সুশীতল ও শ্রী-সম্পন্ন হইবে এবং সেই সাহিত্যের অনুসরণে তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারেরও সহায়তা হইতে পারে। পর-দুঃখকাতর পরহিতৈষী ইংরাজ তখন নিজের সম্পূর্ণ শক্তি, অদম্য উৎসাহ, স্বাভাবিক উদ্যম, উক্ত উৎসকে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বত-গহ্বর হইতে বাহিরে আনিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের সেই শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম-বলে বহু কষ্টের মধ্য হইতেও বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যের অনুকরণে আমরাও ক্রমে ক্রমে সেই গুহান্তরিত সাহিত্য-ধারার অনেকগুলি, অক্ষিসম্মুখীন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য-ইতিহাসের এই ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও অচ্ছেদ্য।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মালোচনাই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজা-প্রচার-উপলক্ষে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ;—(বৌদ্ধ) ধর্ম্ম-ঠাকুর, শিব, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, সুবচনী, কালিকা, ষষ্ঠী, কমলা বা লক্ষ্মী, সারদা বা স্বরস্বতী, গঙ্গা, সূর্য্য প্রভৃতি নানা দেবদেবীর উপাসকগণ সময়ে সময়ে পূজা-মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দেশ্যে বহু সাহিত্যের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, ব্রত কথাদির প্রচলন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সে সময় "ডাক পুরুষের কথা" 'খনার বচন' প্রভৃতি পুস্তকে রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, কৃষি, সমাজনীতি. ইত্যাদি সাধারণ জনগণের শিক্ষিতব্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়া অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছিল।

হিন্দুরাজগণের রাজত্বাবসানে মুসলমান রাজগণের দ্বারাও বাঙ্গালা সাহিত্য নানা বিষয়ে উৎসাহিত ও উপকৃত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে আমরা এক্ষণে কৃত্তিবাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ, রঘুনন্দন গোস্বামী, ফকীর রাম বিদ্যাভূষণ, গোবিন্দ দাস, কবিচন্দ্র প্রভৃতির রামায়ণ, কাশীরাম, বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র, ঘনশ্যাম দাস, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, গোপীনাথ দত্ত, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নিমাই পণ্ডিত, মধুসূদন নাপিত প্রভৃতির সম্পূর্ণ বা আংশিক মহাভারত,—গুণরাজ খানোপাধিক মালাধর বসু ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবত,—ভবানন্দের হরিবংশ এবং সঞ্জয় ও বিদ্যাবাগীশের ভগবদ্-গীতার বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

ইংরাজগণেরও উৎসাহ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া উক্তরূপ আরও অনেক নূতন গ্রন্থ অনুবাদিত ও পুরাতন অনুবাদ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সময় শুদ্ধমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ বেদান্তসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি হইতেই যে অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহা নহে; অনেক ইংরাজী পুস্তকেরও অনুবাদ এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশপস্ ফেবল্, ইলিয়াড, টেম্পেষ্ট এবং কোন কোন ইংরাজী ইতিহাস পুস্তকের অনুবাদ এই সময় দেখা যায়,—পাদরিগণ বাইবল ও ধর্ম্মপুস্তকেরও অনুবাদ এই সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেমিষ্ট্রি, হাইড্রোষ্টাটিক্স্, নিউমেটিক্স অপটিক্স্, এনাটমি, ফিজিওলজি, মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তক-প্রবন্ধাদিও এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এইরূপে—মুদ্রাযন্ত্রের অভাবকালে হস্ত-লিখিত পুস্তক প্রচার যুগ এবং মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে মুদ্রিত পুস্তক প্রচার যুগ—এই উভয় যুগের আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্য নানা শাখায় প্রসার লাভ করিয়াছে। যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, তত্ত্ব-জ্ঞান, নীতিউপদেশ, পুরাণেতিহাস, সেইরূপ চরিতাখ্যান,

বংশাখ্যান, জীবনী, ইতিহাস ও ইতিকথা,—যেমন পারমার্থিক সংগীত, ভজনগীত, বিবিধ উপাস্য দেবতার পালা গান, পদাবলী, সেইরূপ যাত্রার পালা গান, কবি ও পাঁচালীর গান, বাউল ও তর্জ্জার গান;—যেমন জ্যোতিষ গ্রন্থ, সামুদ্রিক গ্রন্থ, কাকের বচন, খনার বচন, সেইরূপ ভূগোল, খগোল, অঙ্কশাস্ত্র, বৈদ্যগ্রন্থ;—যেমন ন্যায় শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বা শারীরস্থান—ঔষধ প্রয়োগ, প্রস্তুত ও ব্যবস্থা তন্ত্র, সেইরূপ পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, রসায়ন;—যেমন আইন ও ব্যবস্থা শাস্ত্র, সেইরূপ কুলপঞ্জী বা জাতীয় ইতিহাস,—যেমন বিজ্ঞান তত্ত্বালোচনা, সেইরূপ সমালোচনা; ইত্যাদি বিবিধ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ শুভ্র অথবা রঞ্জিত রমণীয় মণিবৎ ধারা শ্রেণীদ্বারা সাহিত্য-উৎস সুসজ্জিত হইয়া, অধুনা গিরি-গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে এবং নুতন নুতন ধারা সংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া লোক-লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। উপরি উক্ত বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালার নিজস্ব "কথকতা" "পাদপূরণ" "সমস্যাপুরণ" এবং প্রহেলিকা, প্রবচন প্রভৃতি দ্বারাও সাহিত্য সেই অন্ধ তামস যুগে শোভিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা ভাষায় উন্নতিচিকীর্ষু ইংরাজের বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের পূর্ব্বে সাহিত্যের ভাষাপ্রয়োগ রচনাকারীদিগের স্ব-ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; সুতরাং তখনকার সাহিত্য বিবিধ ও কখন কখন বিসদৃশ রূপে সজ্জিত ও গ্রথিত হইত। এই স্বেচ্ছা চারিতার ভাব ইংরাজ-চেষ্টিত বাঙ্গালা-ভাষা-সংস্কারের প্রথম অংশেও সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংরাজ উহাকে সংযত ও প্রণালী বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাঙ্গালা অভিধান প্রথম প্রস্তুত করেন। তৎপরে সময়ে সময়ে অনেক ইংরাজ এবং বাঙ্গালি কর্ত্তৃকও ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলিত হইয়াছিল। এই সকলের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে নিয়মবদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজী সন ১৮৫৪ সালে মুদ্রিত "শব্দাম্বুধি" নামক অভিধান দেখিলে বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা সেই সময় সুসংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যের শক্তি ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টায় ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহারই ফলে পূর্ব্বোক্ত "শব্দাম্বুধি" অভিধানের সৃষ্টি। যেমন সংস্কৃত শব্দ আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া পড়িল, অমনই সংস্কৃতানুসারী পদ প্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের ব্যবস্থাও কতক পরিমাণে বাঙ্গালা সাহিত্যে লব্ধপ্রবেশ হইল। সেই জন্য মধ্যকালের সাহিত্য জটিল-শব্দ-ময়, সমাসান্বিত দীর্ঘপদ যুক্ত সুতরাং সাধারণের সহজ বোধের অতীত হইয়া পড়িল। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ তখন সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া সাহিত্যের বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা, মনোহারিত্ব ও সহজবোধ্যতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

শিশুদিগের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে "শিশুবোধক" পুস্তক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। এই একখানি পুস্তকের সাহায্যেই সে সময় সাহিত্যের বর্ণশিক্ষা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ সাহিত্য শিক্ষা, অঙ্ক শিক্ষা, নীতি শিক্ষা প্রভৃতি হইত বটে: কিন্তু তাহাতে শিক্ষার ততদুর সুবিধা হয় না নিশ্চয় করিয়া স্বর্গীয় কবি মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় "শিশু শিক্ষা" নামক ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ পুস্তক রচনা করেন। এই তিন ভাগে সোপানক্রমে ক্রমোচ্চ সাহিত্য মাত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই পুস্তকত্রয় এখন তত প্রচলিত নাই; কিন্তু সুকুমারমতি, স্বভাবতঃ ক্রীড়া-শীল শিশুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী পুস্তক। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ কবিত্বের ধারায় পূর্ণ করিয়াছিলেন,—প্রথম ভাগ অতীব সুললিত ও শিশুগণের বিশেষ প্রিয়। ইহার—

"পাখীসব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥"

ইত্যাদি কবিতা কি কবিত্বশালী, সুমধুর, প্রাঞ্জল ও দ্বিত্বশব্দ-বর্জ্জিত! বানান-শিক্ষার প্রতিপদে সেই কবিত্ব জাগরূক,—যথা"কাটা কান, ফাটা শাণ"—"মিঠাই খাইব, কোথায় পাইব?" ইত্যাদি।

যাহা হউক, এখন সাহিত্যের রূপে এক প্রকার নিয়ম-নিবদ্ধ-রূপে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা এখন সমাস-বহুল, অ-নিত্য ব্যবহার্য্য জটিল শব্দ-রাশি-সমাচ্ছন্ন নহে; অথচ ইহা চলিত-কথনীয় ভাষা বা প্রাদেশিক শব্দ সমাকুলও নহে। এখন ইহাতে বিজ্ঞান দর্শন ও অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক শব্দ নূতন রচিত বা সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের জটিলতা বৃদ্ধি হয় নাই। প্রয়োজন বোধে সে সকল অপরিহার্য্য, তাহাতে উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইতে পারে না।

এইরূপে সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি যে হইতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। মুদ্রাযন্ত্রের সৌকর্য্যে সাহিত্য প্রচারের সম্যক সহায়তা হইতেছে বলিয়াই দ্রুত গতিতে ইহার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে সাহিত্য নূতন নূতন শাখা-প্রশাখার নবোদ্গমে কেবল যে শ্রীসম্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা ইহার গাম্ভীর্য্য, শক্তিমত্তা ও পুষ্টির লক্ষণ বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। নানাপ্রকার শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে,—বর্ণ চিত্রণ আলোক-চিত্রণ, ভূতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, রন্ধন-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ ও স্বতন্ত্র পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে। নাটক, নাটিকা, নাট্য-গীতি, প্রহসন, পঞ্চরঙ্গ, নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়া যেন অক্ষয় তূণীরের মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে, আর উপ-ন্যাস, রহোন্যাস, গুপ্ত কথা, ইতিকথা, ক্ষুদ্র গল্প, ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় এক প্রকার সাধ্যাতীত হইয়াছে! গবর্ণ-মেণ্টের অনুগ্রহবলে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়াতে কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষিশিল্প সম্বন্ধে আলোচনাকল্পে সে দিকেও সাহিত্য প্রসার লাভ করিতেছে। সংগীত শিল্পের সহিত সংগীত বিজ্ঞানের অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বিবরণও সাহিত্যের এক দিক পুষ্ট করিতেছে। আবার আজকাল প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহের দিকে শিক্ষিত ধনশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট চেষ্টায় গবেষণায় বাস্তবিক অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সাহিত্যকে নূতন আলোকে আলোকিত করিতেছে।

প্রত্ন-তত্ত্বে আজকাল যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন আরম্ভ হইয়াছে,—কেবল মাত্র সুখ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া অপর ভাষার পুস্তকস্থ প্রত্নতত্ত্ব পাঠ করিয়া তাহারই সার সংকলন না করিয়া নানা দুর্গম স্থানে কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া নিভৃত নিদর্শন বা লোকপরম্পরা শ্রুত কিম্বদন্তী অবলম্বন পুরঃসর এদেশীয়গণ যেরূপ অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন, সেইরূপ কৃতিত্ব সেইরূপ যত্ন, সেইরূপ আয়াস অপরাপর বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ করা এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। নাট্যকলা ও সঙ্গীত কলার সম্বন্ধে কেহ কেহ উদ্যোগী হইতেছেন ইহা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লক্ষিত হয় না। সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া তাহার অনুশীলন না করিলে যেমন সাধারণতঃ তাহার বিস্তার হইবে না, উদার, কর্ম্মঠ জনগণের নিজ নিজ কৃতিত্ব তাহাতে সংযুক্ত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব ও বলবত্তা সাধিত হইবে না। শুদ্ধমাত্র নাট্য ও সংগীত কলা নহে, সর্ব্বপ্রকার কলা সম্বন্ধেই এই কথা প্রতিবর্ণানুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে একটি কথা বলিবার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে। সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ ভাবে এখনকার লোক আদর ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কিছুদিন পরে এমন সাহিত্যিক উন্নতির যুগেও—সঙ্গীতের কোন কোন অঙ্গ একবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। ঢপ সঙ্গীতের অনুশীলন এখন আর সেরূপ দেখা যায় না; এই অংশের সম্বন্ধে শীঘ্র মনোযোগ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়

উপলব্ধি হইতেছে। নতুবা অল্প দিবস পরেই ভবিষ্য-দ্বংশের নিকট ইহা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইবে। অন্ততঃ ইহাকে সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিলেও আংশিক রক্ষা হইতে পারে।

এইরূপে শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্য নানা শাখা সম্বন্ধে ও উক্তরূপ নিজ নিজ কৃতিত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে। এই বিভাগে আমাদের কৃতিত্ব এখনও কিছুই নাই, করিবার প্রবৃত্তিও অতীব অল্প। ভূতত্ত্ব ও রসায়ন সম্বন্ধে অধুনা দুই এক জনকে উক্তরূপে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা একবারে নিতান্ত অল্প। রসায়ন শাস্ত্র একজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও উদ্যম শীলতায় অনুশীলিত হইতেছে। তাহাতে আমাদের অনেকটা আশা আছে। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞান-শাখায় এখনও সেরূপ বড় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই ব্যাপারে মনে হয়, এখন আপাততঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অপর ভাষার পুস্তক প্রবন্ধাদি হইতে অনুবাদ বা বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সারসংগ্রহ করা হউক, এবং এই জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াও বিভিন্ন উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে সেই কার্য্যের ভার অর্পিত হউক। এই সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলন-ক্ষেত্রে এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল. কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য কিছু দেখিতে না পাইয়া আমাকে এই সম্মিলনের সমক্ষে পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে হইতেছে। আলস্য-পরতন্ত্রতা যে আমাদের জাতিগত, স্বভাব-সিদ্ধ দোষ ও নিন্দার কথা, তাহা কি অপসৃত হইতে পারে না? ভগবান্ এই বসন্তাগমে আবীরক্রীড়াচ্ছলে প্রকৃতিগাত্রে রজোনিষেক করিয়া জড়তা দূর পূর্ব্বক চঞ্চলতা, কার্য্যতৎপরতা উৎপাদন করিতেছেন,—জড়জগৎ মুখরিত, মুকুলিত, উদ্যমশীল হইতেছে—এমন সময়ে আমাদের অন্তরের তমোরাশি কি অপসারিত হইবে না? রজোগুণাক্রান্ত হইয়া কর্ম্মঠ প্রকৃতির ন্যায় দ্রুতপদ সঞ্চারে সাহিত্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি কল্পে বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিব না?

কিন্তু আমার আশা হইতেছে—না,—আমি যেন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সাহিত্যিক সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি অচিরাৎ সাধিত হওয়াতে—সুকুমার অথচ গম্ভীর সৌন্দর্য্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া চারিদিকে নিজ শক্তি বিস্তার করিয়া সাহিত্য-কানন সুন্দর নয়নতৃপ্তিকর উপবনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—অপূর্ব্ব প্রতিভা-রশ্মি-বিস্ফারিত-বদন শোভিত, ধীশক্তিশালী বহুতর প্রৌঢ় ও যুবক একান্ত যত্ন ও আগ্রহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাজাতীয় সাহিত্য-বৃক্ষ-লতাগুল্মের সেবা কার্য্যে নিরত রহিয়াছেন; কেহ বা পাদপ-তল পরিষ্কৃত করিতেছেন—কেহ বা আলবালে জল সেচন করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প চয়ন করিয়া মাল্য গ্রথিত করিতেছেন। আবার সুদূর হইতে আগত হইয়া কোন অন্য দেশীয় যুবক এই সাহিত্য উপবনের কোন কোন জাতীয় তরুর ফলাস্বাদনে আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত উদ্যানরক্ষক কোন যুবকের নিকট তত্তত্তরুর সুপক্ক ফলের বীজ নিজ দেশে নিজ সাহিত্য উদ্যানে রোপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিতেছেন—বাস্তবিক আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? যাহা দেখিলাম, তাহা কি মায়ামরীচিকা? না- তাহা হওয়া অসম্ভব;—উহা স্বপ্ন নহে—মরীচিকা নহে। এই জাতীয়তার উন্মেষের দিনে আমাদের শিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ় সম্প্রদায় কি সাহিত্য-উপবনের সেবাকার্য্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে পারেন না? নিযুক্ত হইয়া দেশের—সমাজের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালির মুখরক্ষা করিতে পারেন না? এই সম্মিলনের মধ্যবর্ত্তিতায়—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মধ্যবর্ত্তিতায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা স্বোপার্জ্জিত ধীশক্তি দ্বারা—তাহা সামান্য হইলেও—বহু লোকের সমষ্টীভূত জ্ঞান দ্বারা, কি সাহিত্যিক পরিপুষ্টি সহজে স্বল্প সময়ে সাধিত হইতে পারিবে না? নিশ্চয়ই সাধন করিতে

হইবে;—নতুবা কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রত্যবায় ঘটিবে,—মানবজন্ম-ধারণের সফলতা হইবে না—আমাদের রক্ষক-দেবতার অভিসম্পাত-গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী।

প্রাচীন জাপান

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের যুগ

(খৃঃ ৫৪০—৬৪৪)

এ যুগে রাজসভার বিভিন্ন দলের মধ্যে চক্রান্ত ও কলহের অন্ত ছিল না। সেই হেতু কোরিয়ার উপর জাপানের প্রভাব অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

বাণিজ্যের বিস্তার ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা জাপানকে সাক্ষাৎভাবে চীনের সংস্পর্শে আনিয়াছিল, এবং ফলে দেশী চালচলন রীতিনীতি অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

রোমিন্ বা স্বাধীন বাসিন্দা ও সেন্‌মিন্ বা পরাধীন বাসিন্দার মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ও তাদের মধ্যে বিবাহ কঠোরভাবে নিবারিত হইয়াছিল।

এতাবৎকাল জাপানীরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল। ৫২২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কেইতাই এর রাজত্ব কালে বুদ্ধের বাণী কোরিয়া হইতে জাপানে পৌঁছিল। ৫৫২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কিম্মেই কোরিয়া রাজের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ কয়েকখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ ও বুদ্ধের একটি প্রতিমূর্ত্তি পাইলেন ও স্বয়ং বৌদ্ধ হইলেন। এ ঘটনা তাঁর সভাসদ ও মন্ত্রীগণের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক্ এই সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাপানে দৃঢ় মূল হইতে আরম্ভ করিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ৭০ বৎসর পরে দেশে সর্ব্ব সমেত ৪৬টি বৌদ্ধমন্দির, ৮১৬ জন পুরোহিত ও ৫৬৯ জন ভিক্ষুণী ছিল। রাজধানী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই মন্দিরগুলি অবস্থিত থাকায় গ্রামবাসিগণ তাদের পুরাতন বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই।

অজানা লোককে বা অজানা লোকে যে দ্রব্য বহন করিতেছে তা স্পর্শ করিলে লোক অশুচি হইত! হয়ত কোনো লোক বিদেশে চাকরি করে। স্বদেশেপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় সে হয়ত পীড়িত হইয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। যে গ্রামে সে মরিল তা এই রূপে অশুচি হইল! মৃত ব্যক্তির সহযাত্রীগণকে গ্রামের অমঙ্গল দূর করিবার জন্য নানারূপ পূজা স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করিতে বাধ্য করা হইত! কেহ জলে ডুবিয়া মরিলেও একই প্রকার বিধান। পথিপার্শ্বে কাহাকেও মরিতে যে দেখিয়াছে বা মৃত কাহাকেও দেখিয়াছে তার অর্থব্যয় করিয়া স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে হইত। এই হেতু নিকট আত্মীয়ও কেহ জলে ডুবিয়া বা অন্য কারণে মারা গেলে সহযাত্রী আর আর সকলে মৃতদেহ ফেলিয়া পলাইত!

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও কলার প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পশু, পক্ষী, পুষ্প প্রভৃতি খোদিত স্তম্ভ বরগা সম্বলিত নয়নমোহন মন্দির ও সুদৃশ্য প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর ও ধাতুর উপর খোদাই, ঢালাই, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল। পশুলোম হইতে বস্ত্র নির্ম্মাণ এই যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

স্থানে স্থানে বাজার মেলা প্রভৃতি বসিত। সুদূর পল্লীতে ও পণ্য দ্রব্য লইয়া ফিরিওয়ালা যাইত। জাপানী বন্দরে বিদেশী জাহাজের আগমন হইয়াছিল। ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে তুলাদণ্ডের আবির্ভাবে ও ৬৪০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট ওজনের বাট্‌কারা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সন্তোষজনক ব্যবসায়ের পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়াছিল।

৬৪২ খৃষ্টাব্দে সরকার নির্ম্মিত একটি বাটীর ছাদ টালিদ্বারা আচ্ছাদিত হইল। সম্রাটের প্রাসাদের ছাদও তক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। এতাবৎকাল ছাদের ছাউনি করিতে তৃণ-পর্ণাদি ব্যবহৃত হইত।

৬০৩ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সভাসদ ও ওমরাহদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত বারোটি শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন কাস্মুরি বা টুপি। ফলে এই সময় নূতন ধরণে চুল বাঁধা আরম্ভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহা কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসা হইতে বিরত হইতে শিক্ষা দেয়, ফলে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জেলে তাঁর জাল ছিঁড়িল, ও ব্যাধ ধনু ভাঙিল। অনেক লোকে মৎস্য মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিল।

৫৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবল বারিপাত ও বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল। দরিদ্র লোকের দুঃখের অবধি রহিল না। দৈবজ্ঞেরা কহিল কামো নামক দেবতার ক্রোধবশতঃই এরূপ হইয়াছে। তাঁহার প্রীত্যর্থে সম্রাট কিম্মেই এপ্রিল মাসে একটা বিরাট উৎসবের অয়োজন করিলেন। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, প্রচুর শস্যও উৎপন্ন হইল। সে অবধি প্রতি বৎসর কিওতোয় কামো উৎসব হইয়া থাকে। কামো মন্দিরটি কামো নদীর তীরে অবস্থিত।

নৃত্য ও যন্ত্রবাদনের উন্নতির মূলেও বৌদ্ধধর্ম্ম, কারণ ঐ ধর্ম্মের ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে উভয়েরই প্রয়োজন। পূর্ব্বে জাপানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মৃগয়ার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং রমণীগণও তাহাতে যোগদান করিতে বিরত হইতেন না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম মৃগয়ার পরিবর্ত্তে জাপানীর চিত্তে পুষ্পপ্রিয়তা জাগাইয়া দিল। এই সময়ে জাপানে নিরীহ রকমের এক প্রকার 'ফুট্-বল' খেলা প্রচলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে উষ্ণোৎসের আবিষ্কার হয় এবং উহা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ধনী লোকেরা প্রায়ই এই সব স্থানে যাইতেন।

নারা যুগ

(খৃঃ ৬৪৫—৭৮১)

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে শাসনপ্রণালীতে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। প্রাসাদ ও রাজসভার যাবতীয় উচ্চ পদগুলি এতাবৎকাল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পরিবারে বংশানুক্রমে আবদ্ধ ছিল, যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক। এখন এই পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া রাজসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত শাসন কর্ত্তার অধীনে রাখা হইল। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দাজোকান্ নামে অভিহিত হইত। ইহার অধীনে আটটি বিভাগ ছিল। কর্ম্মচারীদের বারোটি শ্রেণী এখন বর্দ্ধিত হইয়া তেরটি হইল। প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন কাস্মুরি বা টুপি নির্দ্দিষ্ট হইল।

৭০১ খৃষ্টাব্দে শ্রেণীগুলির সংখ্যা ৪৮ হইয়াছিল। এবার টুপির পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন পদবী নির্দ্দিষ্ট হইল পদ অনুসারে কর্ম্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারিত হইল। জমি, কাপড়, চাউল, লবণ বা অন্য কিছু অর্থের পরিবর্ত্তে বেতনস্বরূপ প্রদত্ত হইত। দেশের সমস্ত কর্ষণোপযোগী ভূমি লোকেদের মধ্যে—প্রত্যেক পুরুষ দুই 'তান্' বা অর্দ্ধ 'একার,' ও প্রত্যেক স্ত্রী ১½ 'তান্', এই হিসাবে—ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভূমির স্বতন্ত্র স্বত্ব কেহ ভোগ করিতে পারিত না। বাসিন্দারা দেশজাত পণ্যদ্রব্য, চাউল বা নিজের মেহনতি করস্বরূপ প্রদান করিত।

গুপ্ত বিবাহের ফলে যে সব সন্তান জন্মিত, তারা সেন্মিন্ বা দাসশ্রেণীভুক্ত হইত। দারিদ্র্য বা দেনার দায়ে অনেক স্বাধীন অবস্থায় জাত ব্যক্তি ও দাসশ্রেণীভুক্ত হইত। এতাবৎকাল কেবল দুই শ্রেণীর লোকেরই যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কারে এই নিয়ম রহিত হইয়া গেল। স্থির হইল দেশের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র রাজ্যের অস্ত্রাগারে আনীত হইবে এবং সৈন্যদলভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ অস্ত্র লইয়া ঘুরিতে পাইবে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে (৬৭৬ খৃঃ) সম্রাট্ তেন্মু শিক্ষিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদল গঠন করিলেন। তাঁর পরবর্ত্তী সম্রাজ্ঞী জিতো নিয়ম করিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক চতুর্থাংশ যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইবে। এইরূপে Conscription বা বলপূর্ব্বক সৈন্যদলভুক্ত করণ প্রথার সূচনা হইল। ৭০২

খৃষ্টাব্দের সংস্কারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক তৃতীয়াংশ সর্ব্বদাই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া থাকিবে স্থিরীকৃত হইল। দেশকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হইল। পাঁচ ছয়টি অংশ একত্র করিয়া এক একটি 'এজি' বা Army Division গঠিত হইল। সৈন্যেরা সীমান্ত-রক্ষক ও প্রাসাদ-রক্ষক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সৈন্যদের কার্য্যকাল তিন বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইল। সীমান্তরক্ষকদিগকে প্রতি বৎসর এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বদলি করা হইত। যুদ্ধের সময় বিশেষ সেনাদল গঠন করা হইত। কিন্তু কিছুকাল গত হইলে উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িল ও এ নিয়ম রদ করা হইল। দেশের পরাক্রম ক্রমশঃ সামুরাইদিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল।

বাটীর কর্ত্তা ও তাঁর পরিবারবর্গের সমষ্টিকে 'কো' বলা হইত। পাঁচটি 'কো' মিলিত হইলে একটি 'হো' হইত। এই 'হো' র অন্তর্গত সকলে পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য, এরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত হইল। পাঁচটি বাটীর কর্ত্তাদের মধ্যে এক জন 'হো'র সভাপতি মনোনীত হইতেন, তাঁর উপর সকলের পর্য্যবেক্ষণভার অর্পিত হইত। 'হো'র অন্তর্গত কোনো পরিবার করদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য চম্পট দিলে 'হো'র যাবতীয় সভ্যেরা ইহার জন্য দায়ী হইত। একটি বাটীতে একটি বৃহৎ পরিবার বাস করিত, এবং কর্ত্তার অধীনে, ভাই, খুড়া, খুড়ী, স্ত্রী, রক্ষিতা স্ত্রী, ছেলেপুলে চাকর, চাকরাণী প্রভৃতি প্রায় এক শত লোক বাস করিত। কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তার পুত্রই বাটীর কর্ত্তা হইত। কখন কখন স্ত্রীলোক বাটীর কর্ত্রী হইত। পদমর্য্যাদায় তৃতীয় শ্রেণীর রাজসভাসদ অপেক্ষা যারা উন্নত সেই সব পরিবারে পুত্র না থাকিলে পৌত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র), ও পৌত্র না থাকিলে মধ্যম পুত্র উত্তরাধিকারী হইত। বৈধ পুত্রের বা পৌত্রের অভাব ঘটিলে রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, বা তার পুত্র উত্তরাধিকারী হইত। চতুর্থ শ্রেণীর চেয়েও নিম্ন শ্রেণীর পরিবারে পৌত্র উত্তরাধিকারী হইতে পাইত না।

পুত্র না থাকিলে আত্মীয়ের মধ্য হইতে এক জনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই উত্তরাধিকারী করা হইত।

পুরুষের পঞ্চদশ ও স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হইলে তবে বিবাহ হইত। বিবাহ কিন্তু বর ও কন্যার মাতা পিতা ও ঠাকুর দাদা ঠাকুরমার অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইবার পর (১) তিন মাসের মধ্যে উহা অনুমোদিত না হইলে, (২) ভাবী বর কোথাও চম্পট দিলে এবং এক মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে, (৩) বা বিদেশ গিয়া এক বৎসরের অধিককাল বাস করিলে, (৪) বা কোনো গুরুতর অপরাধ করিলে—বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ হইতে পারিত। বিবাহের পর, (১) স্বামী যদি সন্তান বর্ত্তমানে পাঁচ বৎসর এবং সন্তান অবর্ত্তমানে তিন বৎসর বিদেশে গিয়া থাকিত, (২) যদি সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্তান বর্ত্তমানে তিন বৎসর, বা সন্তান অবর্ত্তমানে দুই বৎসরের জন্য কোথাও পলাইত তবে স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিত।

সন্তানহীনতা, ব্যভিচার, স্বামীর মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, চৌর্য্যাপরাধ, ঈর্ষ্যা, সংক্রামক ব্যাধি ইহার মধ্যে যে কোন কারণে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ কারণ সত্ত্বেও সে তার মাতাপিতা ও ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মার সম্মতি গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল। পুরুষ কেবল মাত্র একজনকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিত। শ্রেণী-বিশেষের সহিত শ্রেণীবিশেষের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীন প্রজা ও দাস জাতীয়ের মধ্যে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেহ না জানিয়া এরূপ বিবাহ করিত তবে সে বিবাহ ন্যায্য, ও তাদের সন্তানেরা স্বাধীন-অবস্থায় জাত বলিয়া বিবেচিত হইত। পরে এরূপ মিশ্রিত বিবাহে আপত্তির অবসান ও মিশ্রিত বিবাহে উৎপন্ন সন্তান স্বাধীন-জাত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা কিরূপে হইবে

ভূস্বামিগণেরও এ সম্বন্ধে উইল বা ইচ্ছাপত্র করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। উইল না রাখিয়া কেহ মৃত হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার পরিবারবর্গের মধ্যে দেশের আইন অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সম্পত্তি সকল সময়েই বিক্রয় করা যাইত। কর্ষিত ভূমি, বসতবাটী এবং ভৃত্যাদির সরকার নামে-মালিক থাকাতে এ গুলি বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইতে হইত। অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যে কোনো সময়ে এক জন সাক্ষীর সম্মুখে বিক্রয় করা যাইতে পারিত। টাকা দুই প্রকারে কর্জ্জ দেওয়া হইত, সুদ গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া। পুরোহিত ও মঠবাসিনী-দিগের সুদ লওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সরকারি কর্ম্মচারীরা তাদের অপেক্ষা নিম্ন কর্ম্মচারীর নিকট কর্জ্জ লইতে পারিত না। সুদের হার ষাট দিনে আসলের আট-ভাগের এক ভাগ হইত, ধারের পরিমাণ যত দিনেরই হউক না কেন সুদের পরিমাণ কখনো আসল অতিক্রম করিবার যো ছিল না। কেহ ধার শোধ করিতে না পারিলে তার সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যাইত, শেষে তার ক্রীতদাসের মত হওয়াও সম্ভব ছিল। কর্জ্জকারী অসুস্থ বা পীড়িত থাকিলে তার পরিবর্ত্তে কর্জ্জ গ্রহণের সময় যে সাক্ষী ছিল তাহাকে গোলাম হইতে হইত।

৭.১ খ্রীষ্টাব্দে বসতবাটী ও জমি জমা বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ধনবানদিগের হস্তে যাহাতে সম্পত্তি জমা হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

এ যুগে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। যব, গম, তুঁত, শণ, নাশপাতি, বাদাম, শালগম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊষা

বিমল হাসিতে ভরি নয়ন অধর
কে তুই রে সুধাময়ী বালা,
নেমে এলি স্বর্গ হতে কিরণ ধারায়
রূপে করি এ ধরণী আলা ?

কি মধুর দৃষ্টিখানি ! করিছে যেন রে
দিকে দিকে সুধা বরিষণ,
ধরায় বিকশি উঠে হরষে পুলকে
যেন নব নব জাগরণ।

এসেছিস্ সুনির্ম্মল পবিত্র সুন্দর
শিশিরেতে সুস্নান করি,
তনু দেহে আলোকের বিশদ বসন
সযতনে পরিধান করি।

এনেছিস কুড়াইয়া কত সযতনে
ভরি তব হৃদয়ের থালি,
হাসি অশ্রু ভরা ওই কুসুমের রাশি
কত শত বকুল শেফালী !

এ বিশ্ব মন্দির মাঝে বিরাজে কোথায়
দেবতার আসন নির্জ্জন,
তুমি কি এসেছ বালা হৃদয়ের ফুলে
পূজিবারে তাঁহার চরণ ?

ক্ষণিক দাঁড়ায়ে হেথা পূজিবার আগে
মন্দিরের প্রবেশ দুয়ারে
তুমি কি ডাকিছ, আহা নয়নের পাতে
বিশ্ববাসী নিদ্রিত সবারে !

আমারে শিখাও বালা তোমার মতন
হইবারে পবিত্র সুন্দর,
তোমার মতন হোক সরল, উজ্জ্বল,
সুধাময়, আমার অন্তর।

প্রাণের কুসুমগুলি করিয়া চয়ন
ভক্তি অশ্রু মাখিয়া যতনে,
শিখাও আমারে বালা নিত্য নিবেদিতে
দেবতার পবিত্র চরণে।

শ্রীপুষ্পকুন্তলা দত্ত।

শুভদৃষ্টি

(১)

শরৎ ও সতীশ মেসে থাকিয়া এম, এ. পড়িত। দুই জনেই অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে; বি, এ, পাশ করিয়া উভয়েই আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইত,—বিশেষ পরীক্ষার তখন তাড়া ছিল না।

নারী ও নারীর প্রেমকে সতীশ চিরদিনই বরেণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে; সাহিত্যে যেখানেই নারীর রূপ ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনার কথা পড়িয়াছে সেখানেই লাল দাগ দিয়া তাহা মুখস্থ করিয়াছে; এবং সম্প্রতি ভাগ্যসিন্ধু মন্থন করিয়া যে নারী-রত্নটি সে লাভ করিয়াছিল তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্যের উপর আরও খানিকটা মাধুর্য্যের লালিমা চড়াইয়া তাহাকে দিবারাত্রি ধ্যান করিত!

শরৎ মাঝে সন্ন্যাসী হইয়াছিল,—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়া ভূত সাধনা করিতে গিয়াছিল। ভূত সাধনা হইয়াছিল কি না সে কথা ইতিহাসে লেখে না, কিন্তু তাহাকে অনতি-বিলম্বেই সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল। তাহার একটা প্রবল কারণ পিতার তাড়না। যাহা হউক সংসারে ফিরিয়া সে সংসারের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ লইল না; গেরুয়া বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ঢাকাই কাপড় এবং ফিনফিনে পাঞ্জাবী শোভা পাইতে লাগিল, এবং চেরী-ব্লসমের গন্ধে দিগ্বিদিক অনন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

শরৎ বলিত সন্ন্যাসের দুইটা পুরাতন অভ্যাস সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই,—প্রথমটা নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা, দ্বিতীয় রুদ্রাক্ষের মালা।

নিন্দুকেরা বলিত প্রথমটা ভান মাত্র এবং দ্বিতীয় অভ্যাসটি প্রাচ্য হিসাবে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি ও ভক্তি-আকর্ষণের উপায় মাত্র।

বাঙ্গালা দেশে যে ছেলে এম্, এ, পড়ে তাহাকে পাইবার জন্য কোন পুত্রীর পিতা না উৎসুক হয়? সুতরাং ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী শরচ্চন্দ্রেরও বিবাহ সম্বন্ধের অভাব হইল না।

সে দিন চাঁদনি রাত, ছাদের উপর বসিয়া শরৎ হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল এবং সতীশ অনতিদূরবর্ত্তী শনিবার-রাত্রের মধুর ছবি আঁকিতেছিল! কানের কাছে যেন চুড়ির সলজ্জ আওয়াজ, চাবির ঝনঝনা বাজিতেছিল, এবং চোখের উপর আনন্দে ও লজ্জায় এক-খানি আগাগোড়া লাল মুখের মধুর সৌন্দর্য্য ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সতীশ কহিল, "শরৎ তোমার বিয়ের কি হ'ল?" শরৎ ইতিপূর্ব্বে তার অনেক বার উত্তর দিয়াছে, বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার গভীর অনাস্থা জানাইয়াছে। কিন্তু আজ এমন সুন্দর রাত্রে বোধ হয় সন্ন্যাসীর মনও টলিয়াছিল—এক কথায় উত্তর না দিয়া কহিল, "আচ্ছা সতীশ, বিয়ে ক'রে তুমি কি সুখী?"

সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সুখী! এত নিঃসন্দেহ সুখ জীবনে আর কখনও আমি পাই নি।"

শরৎ দেখিল সতীশ কবিত্বময় হইয়া উঠিতেছে। কথাটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

"কই, তোমার এমন সুখের আকর বউকে একবারও দেখালে না!"

সতীশ কহিল, "ভাই, এখন সে বাপের বাড়ীতে; দেখাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কৌশলে দেখতে হবে!"

শরৎ চিরদিনই অদ্ভুত রকম বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী! তাহার চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল, সে কহিল, "বেশ, একটা মৎলব ঠাওরেছি—"

সতীশ কহিল, "কি?"

শরৎ কহিল, "তোমার চাকর হ'য়ে এই শনিবার তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার বউ দেখে আসবো।"

সতীশ ইহাতে মহা আপত্তি করিল, বলিল, "তা কি হয়! তুমি আমার চাকর হ'তে যাবে কেন?"

শরৎ কিছুতেই শুনিলনা।

(২)

শরতের বাড়ী বেহারে, সুতরাং চাকর সাজিতে তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। একটা খাটো কুর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া তাহাকে তেলে ও কাদায় ভিজাইয়া ময়লা করিল, একটা ছেঁড়া কাপড় মাল কোচা বাঁধিয়া পরিল, এবং মাথায় দীর্ঘ পাগড়ি বাঁধিল। চাকর দরবানের ভক্তি আকর্ষণের জন্য রুদ্রাক্ষটি গলায় রাখিল; হাতে বাঁশের লাঠি, পায়ে নাগরা জুতা।

এ হেন চাকর সঙ্গে লইয়া সতীশ শনিবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিল। মেস হইতে শ্বশুর বাড়ী আধ ঘণ্টার রাস্তা!

শ্বশুর বাড়ীর ফটকে ভোজপুরী দরবান্ জামাই বাবুকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। শরৎ তাহাকে অভিবাদন করিলে সেও প্রত্যভিবাদন করিল; বুঝিল বাবুর চাকর; কিন্তু গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ দেখিয়া ভক্তি হইল একাসনে বসিতে অনুরোধ করিল।

শরৎ বসিয়া তাহার "আরে" জেলার গল্প পাড়িল। সন্তোষি সিং শরৎদের দরওয়ান, তাহার বাড়ী ভোজপুরে। তাহার কথা বলিতেই দরওয়ান ছটু সিং তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। শরৎ বলিল সে আমার ভারী দোস্ত, এক সঙ্গে কাজ করেছি! তাহাতে শরতের সহিত ছটুর প্রেম গভীর হইয়া উঠিল; সে খৈনী মাড়িয়া তাহাকে খাইতে দিল, এবং গাঁজা সাজিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজা দেখিয়া শরতের ভয় হইল, এইবার বিপদ! তাহার অসম্পূর্ণ সন্ন্যাস ধর্ম্মে সে গাঁজায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই!

এমন সময় ঝি আসিয়া কহিল, "হ্যাগা জামাই বাবুর চাকর কে আছো, জামাই বাবু ডাক্‌ছেন।"

চেহারা দেখিয়া জামাই বাবুর চাকরটিকে বোধ হয় ঝির মন্দ লাগিল না; সে একবারে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, "তুমি! চলো"।

শরৎ উপরে গিয়া দেখিল পরিষ্কার সাজান বৈঠকখানা; তাহাতে সতীশ বসিয়া তামাক খাইতেছে। সম্মুখে পাত্রে জলখাবার।

সতীশ কহিল, "শরৎ এসো, খাবার খাবে!"

শরৎ কহিল, "কি আশ্চর্য্য! আমি যে চাকর!"

সতীশ কহিল, "এ ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগছেনা।"

শরৎ কহিল, "আমার মন্দ লাগছে না, কিন্তু বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারবো না, ধরা পড়বার ভয় হ'চ্ছে। তাড়াতাড়ি দেখবার একটা মৎলব বার কর, আমি চলে যাই।"

সতীশ কহিল, "খাবার দিয়ে গেছে, জল এখনো আনেনি। তুমি এই দরজা দিয়ে গিয়ে জল চাওগে। এইখানেই সকলেই আছেন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। সেখানে গিয়ে সহজেই পরীকে দেখ্‌তে পাবে!"

(৩)

দরজার ভিতর দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া শরৎ দেখিল চক্‌মিলান বাড়ী। একটা বারান্দায় স্ত্রীলোকের ভিড়—সেইখান হইতেই মধুর কলরোল উঠিতেছিল!

এক জন তরুণী চুল বাঁধিতেছিল, আর এক জন যুবতী তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। এক জন প্রৌঢ়া কুটনা কুটিতেছিল; এক জন যুবতী ছেলেকে দুধ খাওয়াইয়া দিতেছিল, আর টিয়ে পাখীর গল্প বলিতেছিল। চার পাঁচ জন স্ত্রীলোক গোল হইয়া বসিয়া জটলা করিতেছিল।

এক দিকে ঘোর রবে তাস খেলা চলিতেছিল। অন্য দিকে দুই তিন জন ছেলে পিলে কান্নাকাটি ও মারামারি করিতেছিল!

এই বিচিত্র দৃশ্য-শালায় শরৎ আসিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। যে অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীর চুল বাঁধা হইতেছিল—শরৎ ভাবিল সে-ই সতীশের স্ত্রী—কি মধুর তাহার সৌন্দর্য্য! শরৎ একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল—চোখ যেন আর ফিরাইতে পারিল না!

তরুণী শরতের পানে চাহিল—চারি চক্ষের মিলন হইল! কিন্তু সেই সুবিরাট পাগড়ি ও মলিন কুর্ত্তির অন্তরালে যে একটি কোমল হৃদয় ছিল তরুণী তাহা বুঝিল না। অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে স্পষ্ট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, ও কে গো!"

তখন সকলেই অস্ফুটে কলরব করিতে লাগিল—"এ আবার কে গো—"কোথা থেকে এলো!"

শরৎ কহিল, "জামাই বাবুকো ওয়াস্তে পানি"—পূর্ব্ব পরিচিতা ঝি আসিয়া কহিল, "ভয় কি! ও যে জামাই বাবুর চাকর, জল চাচ্ছে!" বলিয়া তাহার দিকে আর এক বার কটাক্ষ করিল।—"তাই না?"

জামাই বাবুর চাকরের শুভ্র গৌর বর্ণ, মলিন বেশের ভিতর দিয়াও যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তাহার সমস্ত ছদ্ম-বেশকে যেন মিথ্যা করিয়া তুলিতেছিল!

এক জন প্রৌঢ়া বলিল, "এ যে কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে গা!" আর এক জন কহিল, "ভদ্দর লোকের মতন চেহারা যে!"

শরতের পার্শ্বে শরতের বৌদিদির বড় বোন প্রমদা দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সম্পর্কে সতীশের খুড়শাশুড়ি। তিনি অস্ফুটে বলিলেন, "আমাদের শরতের মতন বোধ হয় না! আবার রুদ্রাক্ষের মালাও আছে যে!"

ততক্ষণে ঝি জল লইয়া আসিয়াছে। ঝির ইচ্ছা ছিল শরতের হাতে জল দিবার অবসরে সে আর এক বার কটাক্ষ হানিবে। কিন্তু শরৎ তখন ঢোঁক গিলিতেছিল—তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস প্রায় ছিনাইয়া লইয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

বাহিরে আসিয়া জলের গ্লাস রাখিতে রাখিতে শরৎ কহিল, "এঃ ধরা পড়ে গেছি—চল্‌লাম ভাই।"

সতীশ কহিল, "ভয় নেই—একটু খাবার খেয়ে যাও।"

শরৎ কহিল, "না, তবে গলাটা বড় কাঠ বোধ হ'চ্ছে—একটু তামাক খাই, দেও।"

ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যেমন শরৎ তামাক খাইতেছিল তখন ঝি জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া তাহা দেখিল!

চোখ দুটা কপালে তুলিয়া ঝি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া কহিল, "ওমা! আবার জামাই বাবুর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে!"

সতীশের বড় শ্যালী নিরুপমা তাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি হবে গো!"

শরৎ তখন প্রস্থান করিয়াছে

(৪)

নিরুপমা সতীশের নিকট আসিয়া কহিল, "হাঁগো জামাই বাবু, সঙ্গে কাকে এনেছিলে?"

সতীশ কহিল, "কেন, চাকর!"

নিরুপমা ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া কহিল, "চালাকি কেন? ভদ্র লোকের ছেলেকে চাকর সাজিয়ে এনেছিলে? কি ঘেন্না!"

সতীশ কহিল, "তা কেন হবে?"

নিরুপমা কহিল, "না ঠাট্টা নয়। খুড়িমা বলছেন উনি ওঁর বোনের দেওর—শরৎ বাবু! ছি—ছি—ওঁকে কেন এমন ক'রে এনেছিলে—পরীকে দেখাতে বুঝি?"

সতীশ কহিল' "ওর ঝোঁক!"

নিরুপমা কহিল, "মা ভারি দুঃখ করছেন। ভদ্র লোকের শিক্ষিত ছেলে—তাকে কি না চাকর ক'রে নিয়ে এলে—বাড়ীতে ঢুকিয়ে অপদস্থ করলে—তারপর

খাটিয়ে খুটিয়ে নিয়ে না খাইয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এক দিন পরীকে দেখালেই হ'ত। মা বলেছেন তাঁকে এক দিন খেতে ব'লো—তিনি কি মনে করেছেন বল দেখি।"

সতীশ কহিল, "তাই" হবে!

* * *

শরৎ যখন শুনিল সে একেবারেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে—তখন সে যথেষ্ট লজ্জা ও অনেকটা আনন্দ অনুভব করিল। বলিল, "এ একটা রীতিমত অভিযান।"

কিন্তু তাহার নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল, বলিল, "তা কিছুতেই হয় না।"

বলিল, "সত্যিই অপরূপ সুন্দরী তোমার স্ত্রী! গালের ওপর তিলটি পর্য্যন্ত কি সুন্দর! সত্যই ভাগ্যবান্ তুমি।"

সতীশ কহিল, "যার রূপে তুমি মুগ্ধ হয়েছ সে আমার ছোট শ্যালী, সুহা! তারই গালে তিল আছে।"

শরৎ চমকিয়া উঠিল, "সত্যি!"

সতীশ, "একটা সংবাদ আছে—সে অবিবাহিতা।"

শরৎ চাহিয়া রহিল।

সতীশ কহিল, "এবং সেই গালে তিল শুদ্ধ অপরূপ সুন্দরী আমার শ্যালিটির দ্বারা ইচ্ছা মাত্রই তুমি ভাগ্যবান হ'তে পারো!

সে দিনও জ্যোৎস্না ছিল—এবং বোধ হয় মলয়ও বহিতেছিল। শরৎ গলা হইতে রুদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া ফেলিয়া সতীশের হাতে দিয়া কহিল, 'এই নাও বদল করিবার মালা।"

সতীশ কহিল, "এ আমার কাছে রইল—আমার এমন শ্যালিকাটিকে যে দিন তুমি হরণ করবে সেই দিন এই মালা আমি পরব! তোমাদের জন্যে ফুলের মালার বন্দোবস্ত।"

(৫)

সতীশ ম্লান-মুখে আসিয়া নিরুপমাকে কহিল, 'শরৎ কিছুতেই এখানে এসে অমন খেতে চায় না।"

নিরুপমা কহিল, "তুমি আমাদের কি লজ্জাতেই ফেললে!"

সতীশ কহিল, "লজ্জা নিবারণের একটি উপায় আছে! তাকে যদি দক্ষিণা দেও তবেই সে খেতে পারে!"

নিরুপমা কহিল, "কি দক্ষিণা!"

সতীশ কহিল, 'সে সবস্ত্রা, সালঙ্কারা তোমার ছোট বোন সুহাসিনী!'

নিরুপমা বিস্মিত হইয়া কহিল, "সত্যি!" সতীশ কহিল, "পরীকে দেখতে এসে সে সে দিন সুহাকে [illegible] ক'রে গেছে! এখন বিয়ে না দিলে ত আর চলে [illegible]

নিরুপমা কহিল, 'কি আমাদের [illegible] মাকে বলিগে।'

দুই পক্ষেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের রাত্রে সতীশ সত্যই রুদ্রাক্ষ পরিয়া [illegible] স্ত্রী আচারের সময় নিরুপমা শরতের কান [illegible] না বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহার ভৃত্যাগিরির [illegible] বলিয়া তাহার কান লাল করিয়া তুলিল।

বাসর ঘরে ঢুকিবার সময় পরী একটা [illegible] ছেঁড়া কাপড় ও পাগড়ি আনিয়া শরৎকে [illegible] 'বেশ পরিবর্ত্তন না করিলে বাসরে ঢুকিতে দিব [illegible]

ঝি আসিয়া এক গ্লাস জল দিয়া বলিল, "[illegible] জল।" সে দিন কিন্তু সে আর কটাক্ষ করিল না।

বাসর ঘরে সুহাকে ডাকিয়া শরৎ কহিল, "[illegible] তোমার সে দিন আমাকে পছন্দ হয়েছিল না?"

সুহা কহিল, "কোন দিন!"

'যে দিন চাকর সেজেছিলাম?"

সুহা তাহার হাত দুটা প্রবল ভাবে সরাইয়া দিয়া কহিল—যাঃ—

"তবে আজ হয়েছে বোধ হয়?"

সুহা স্তব্ধ নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল। শরৎ কহিল, 'কিন্তু সেই দিনই আমাদের সত্যকার শুভ দৃষ্টি হয়েছিল!'

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

— —

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ

(২)

চৈত্ররথ বনে অপর একটি আলোচনা সভায় আয়ুর্বেদের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের বিবরণ পাওয়া যায়। যথা :—

"আত্রেয়ো ভদ্রকাপ্যশ্চ শাকুন্তেয়স্তথৈবচ। পূর্ণাক্ষশ্চৈব মৌদ্গল্যো হিরণ্যাক্ষশ্চ কৌশিকঃ ॥ ২ ॥ যঃ কুমারশিরা নাম ভরদ্বাজঃ স চানঘঃ। শ্রীমন্ বার্য্যোবিদশ্চৈব রাজা মতিমতাং বরঃ। নিমিশ্চ রাজা বৈদেহো বডিশশ্চ মহামতিঃ কাঙ্কায়নশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীক ভিষজাং বরঃ ॥৪॥ এতে শ্রুতবয়োবৃদ্ধা জিতাত্মানো মহর্ষয়ঃ। বনে চৈত্ররথে রম্যে সমীয়ুর্বিজিহীর্ষবঃ ॥ ৫ ॥ তেষাং তত্রোপবিষ্টানামিয়মর্থবতী কথা। বভূবার্থবিদাং সম্যগ্রসাহারবিনিশ্চয়ে ॥ ৬ ॥'

ইতি চরকসংহিতায়াং ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

"একদা আত্রেয়, ভদ্রকাপ্য, শাকুন্তেয়, পূর্ণাক্ষ মৌদ্গল্য, হিরণ্যাক্ষ কৌশিক, কুমারশিরাভরদ্বাজ, রাজর্ষি বার্য্যোবিদ, নিমি, বৈদেহ, বডিশ, কাঙ্কায়ন, বাহ্লীক, ও ভিষকশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক এই সকল শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন, জিতাত্মা ও বয়োবৃদ্ধ মহর্ষিগণ বিহারেচ্ছায় রমণীয় চৈত্ররথ বনে মিলিত হইয়াছিলেন।' তাঁহারা সেই বনে উপনিবিষ্ট হইয়া রসের দ্বারা আহার বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্য অর্থযুক্ত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।"

উজ্জয়িনী একটি অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যে নয় জন পণ্ডিতকর্তৃক এই বিদ্যাকেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা ইতিহাসে "নবরত্ন" খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের "রত্ন" খ্যাতিদ্বারাই ইঁহাদের সমকক্ষ যে তৎকালে কেহ ছিল না তাহা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাতে পাণ্ডিত্য স্বীকৃত না হইলে কেহই পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিতেন না। "বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা" প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর্য্যদিগের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের রূপান্তর দেখিতে পাই। বৌদ্ধদিগের সময়ে শিক্ষাস্থান আর উন্মুক্ত অরণ্য নহে, তাহা সুনির্ম্মিত গৃহ। এই বিদ্যাগৃহের নাম "মঠ।" বৌদ্ধ যুগের অমর কোষাভিধানে তাহাতেই "মঠশ্ছাত্রাদি নিলয়" বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। "মঠ" ছাত্রদিগের নূতন শিক্ষা স্থান হইলেও বৌদ্ধদিগের নির্জ্জন ধর্ম্ম সাধনার স্থান হিসাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাতে আর্য্য শিক্ষাদর্শেরই অনুবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দাতে আর্য্যকুলপতিদিগের ছাত্রসংখ্যার ন্যায়ই বিপুল ছাত্র সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের পরিষদের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইহা সংঘারাম নামে অভিহিত হইত। বৌদ্ধদিগের বিদ্যাশিক্ষায়ও, ছাত্রের আবাস ও আহার বিদ্যালয় হইতে প্রদত্ত হইত। আর্য্যদিগের ব্রহ্মচর্য্যেরই ন্যায় বৌদ্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভিক্ষুক জীবন যাপন করিত। আর্য্যছাত্রদিগের মধ্যে যেমন কেহ কেহ চিরব্রহ্মচারী থাকিত বৌদ্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যেও অনেকে চিরভিক্ষুক থাকিত। এইরূপে আর্য্য আদর্শ বৌদ্ধদিগের প্রধান অবলম্বন হইলেও, তাঁহাদের হস্তে ইহা এরূপ নূতন গঠন ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শও ইহার নিকট নূতন ও সমৃদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। প্রত্যুত কোন কোন বিষয়ে ইহাই উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি তাহা হইতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে—"বিদ্যার্থিগণ বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেন। হুয়েনসাং যখন নালন্দায় আগমন করেন তখন প্রায় দশ সহস্র ভিক্ষু তথায় অধ্যয়ন করিতেন। হুয়েনসাং ৬৭৫ হইতে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নালন্দায় অধ্যয়ন করেন। তিনি ইহার স্থায়ী অধিবাসী ভিক্ষু সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক লিখিয়া গিয়াছেন। তবে বোধ হয় অস্থায়ী ছাত্রসংখ্যাও অনেক ছিল কারণ নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং অন্যান্য শিক্ষাস্থল হইতে যাঁহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই নিরূপিত ছিল। সুতরাং এখানে শিক্ষার মান (Standard) এত উচ্চ ছিল যে, অধিকাংশ বিদ্যার্থীকেই বিফল মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিতে হইত। হুয়েন সাং বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে দ্বার-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে না পারিলে, কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না এইরূপ প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াও যাঁহারা প্রবেশ লাভ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিতেন। হুয়েনসাং বলেন যাঁহারা বিদ্যার্থী হইয়া আগমন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও শতকরা সত্তর জন ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন।

হুয়েনসাং বলেন, "তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ নালন্দায় আসিতেন এবং নিজে প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত তথায় যোগ, ন্যায়ানুসার, অভিধর্ম্ম, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত।"

নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়রূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইত আমরা ইৎসিংএর বিবরণ হইতে তাহার কতক জানিতে পারি। তিনি বলেন, "নালন্দ মঠের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই শতের অধিক জনপদের রাজস্ব উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। হুয়েনসাং নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধক যে কয়জন নরপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন সম্ভবতঃ ইহা তাঁহাদেরই দান।"

হুয়েনসাং বলেন, পর পর পাঁচ জন মগধ সম্রাট এবং এক জন মধ্য ভারতবর্ষের নরপতি ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক মঠ বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মঠ বিহার প্রভৃতিতে ভাস্কর্য্য শিল্পের চরম বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এগুলি দেখিতে প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইৎসিং নালন্দায় আটটি বৃহৎ কক্ষ (Hall) ও তিন শত ক্ষুদ্রতর কক্ষ দেখিতে পান। তিব্বত দেশীয় গ্রন্থে নালন্দের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে প্রকাশ যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অংশে বৃহৎ পুস্তকালয় অবস্থিত ছিল তাহা "ধর্ম্মগঞ্জ" নামে কথিত হইত। এই অংশে 'রত্নসাগর' 'রত্নোদধি' ও [illegible]ক', নামে তিনটি বৃহৎ সৌধ বর্ত্তমান ছিল। "রত্ন সাগরের" বিস্তৃত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা একটি নয় [illegible] বৃহৎ অট্টালিকা ছিল।

আজকাল যেমন অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ প্রভৃতি [illegible] বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরবজনক বলিয়া [illegible] এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ইহারা [illegible] এই গৌরবলাভের জন্য এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] অর্জ্জন করেন, পুরাকালেও নালন্দ সম্বন্ধে এইরূপ [illegible] সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে নালন্দ বি[illegible]লয়ের ছাত্রগণ শীর্ষস্থানীয় বিবেচিত ও [illegible] সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ভারতবর্ষের সমুদয় শি[illegible] এবং চীন তিব্বত, তাতার, ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশ হইতে [illegible] সম্মান অর্জ্জনের জন্য দলে দলে শিক্ষার্থিগণ [illegible] আসিতেন।"

নালন্দের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে [illegible] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী স্বদীয় দক্ষিণাপথ ভ্রমণে লিখিয়াছেন "প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, কুমারলব্ধ, [illegible] ভদ্র, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি বিখ্যাত অসংখ্য মনীষী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়া [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।"

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করিলে ছাত্রঅধ্যাপক[illegible] একত্রাবস্থান-ব্যবস্থা-বিশিষ্ট পাশ্চাত্য (Residential) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত উপকরণই যে প্রাচীন নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমান ছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

Endowment বা সম্পত্তিদানের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের

দেবালয়, বৈশাখ, ১৩১৯ বাং, [illegible] শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ লিখিত।

স্থায়িত্ব বিধান, বিদ্যাচর্চ্চার সৌকর্য্যার্থ বিদ্যালয়ে পুস্তকাগার সংস্থাপন, বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের আবাস ও আহার স্থানের সংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশলাভার্থ প্রবেশিকা পরীক্ষা, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বৈদেশিক ছাত্রের সমাগম প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যালয়েরই ব্যবস্থা অবিকল একই রূপ। কিন্তু ইহা প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ গৌরব বলিতে হইবে যে, তাহাতে বিনা ব্যয়ে সকল ছাত্রেরই আবাস ও আহারের ব্যবস্থা হইত। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন (Fellows) অর্থাৎ জীবনব্যাপী ছাত্র আছে, প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনই চিরভিক্ষুক ছিল। অধ্যাপনার বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম যুক্তিমার্গের ধর্ম্ম বলিয়া বৌদ্ধগণ স্বভাবতঃই যুক্তিশাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাতেই তাহাদের অধীত শাস্ত্র মধ্যে আমরা ন্যায় শাস্ত্রের প্রাধান্য দেখিতে পাই। আমরা আর্য্যদিগের যে চতুর্ব্বিদ্যার উল্লেখ পাই তাহাতে ন্যায় শাস্ত্রেরই স্থান সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,

> "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীবার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতীঃ।
> এতা বিদ্যাশ্চতস্রস্তু লোকসংস্থিতি হেতবঃ॥

ন্যায় দর্শনেরই নামান্তর। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দর্শনপারদর্শিতার প্রতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতেই পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি হইয়াছে Ph. D. (Doctor of Philosophy) অর্থাৎ দর্শন শিরোমণি।

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যাপনার উল্লেখ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তখন বিজ্ঞানের চর্চ্চাও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, হিন্দুর রসায়ন বিজ্ঞান তন্ত্রেই সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে; এবং বৌদ্ধগণ যে রসায়ন শাস্ত্রের সবিশেষ চর্চ্চা করিতেন ও ইহার সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

উপরে আমরা প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল কি না তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার অবসর পাই নাই। এখানে আমরা সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বেদাভিজ্ঞা রমণীদিগের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইহাদের মধ্যে বিশ্ববারা বেদে ঋষি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, এবং গার্গী ও মৈত্রেয়ী শাস্ত্রবিচারে ঋষিদিগের সহিতও সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গার্গী ঋগ্বেদের টীকাও করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা কেবল যে শিক্ষার্থিনী ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী পুরুষদিগের যেমন উপাধ্যায় আচার্য্য প্রভৃতি উপাধি ছিল শিক্ষাকার্য্যপরায়ণা স্ত্রীলোকদিগেরও তদনুরূপ উপাধ্যায়া উপাধ্যায়ী, আচার্য্যা উপাধি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা, অমরকোষে "উপাধ্যায়াপ্যুপাধ্যায়ী স্যাদাচার্য্যাপি চ স্বতঃ।" স্বয়ং অধ্যাপনা করিলে উপাধ্যায়া উপাধ্যায়ী ও আচার্য্যা প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে।

মালতীমাধবে কামন্দকীকে মন্ত্রী ভূরিবসুর সহাধ্যায়িনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্ত্রী পুরুষের একত্র অধ্যয়নের যে বাধা ছিল না তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। কামন্দকী এরূপই বিদুষী হইয়াছিলেন যে, তিনি একখানা প্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদীয় গ্রন্থ "কামন্দকীয় নীতিসার" নামে এখনও তাঁহার অমর কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তৎ সমস্ত "খনার বচনে" চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী বীজগণিতের যে সমস্ত উচ্চ নিয়ম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন তৎ সমস্তই তাঁহার নিজের নামের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া গণিত শাস্ত্রে অমর গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য মেয়ে রেংলারের (Wrangler) নামে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। লীলাবতী কি ইহাদের উপরে আসন পাইবার যোগ্যা নহেন?

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দুটি বিদ্যালঙ্কার নাম্নী

বিদুষীকে আমরা পণ্ডিতের উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই।

কেহ কেহ হয়ত বলিলেন যে, প্রাচীন কালে স্থল বিশেষেই মাত্র স্ত্রীশিক্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ইহা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় নাই। তাঁহাদিগকে আমরা শাস্ত্রের "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এই উদার বাক্যটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষক সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা ছাত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ছাত্র যে ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইত তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই নাম হইতেই ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য এরূপেই সংযম ও নিষ্ঠার সাধারণ সংজ্ঞাতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সংযম ও নিষ্ঠা-ভাব অধ্যয়নের মূলে বর্ত্তমান থাকায় অধ্যয়ন একটি তপস্যাতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাতেই 'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ'—'অধ্যয়ন ছাত্রের পক্ষে তপস্যাবিশেষ' এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

অধ্যয়নের মূলীভূত সংযমাভ্যাসের প্রথম উপায় সর্ব্বপ্রকার বিলাস-বিসর্জ্জন। তাহাতেই মহর্ষি মনু তদীয় ধর্ম্মসংহিতায় লিখিয়াছেন, "ভোগার্থীচেৎ ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী ভোগমুৎসৃজেৎ॥" ভোগাভিলাষী হইলে বিদ্যার আশা ত্যাগ করিবে এবং বিদ্যাভিলাষী হইলে ভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচারীর সংযমার্জ্জন ও বিলাস বর্জ্জন সম্বন্ধে মনু যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনের উপদেশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্‌স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত বাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥

"ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, কর্পূর চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ বা বিলেপন করিবে না, মাল্য ধারণ করিবে না, গুড় প্রভৃতি আহার করিবে না, স্ত্রী সংসর্গ করিবে না; যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণ বশে অথবা অন্য কোনরূপে অম্ল হয় তাহাদিগকে শুক্ত বলে, তাহাও খাইবে না এবং প্রাণিহিংসাও করিবেনা।

যেরূপ তৈল মস্তকে দিলে সর্ব্বাঙ্গে লাগে তাদৃশ তৈল ব্যবহারের নাম অভ্যঙ্গ, তাহা করিবে না; নয়নে অঞ্জন প্রদান করিবে না, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে, এবং নৃত্য, গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ করিবে।

অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোক দিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, এবং পরের অনিষ্টাচরণ পরিত্যাগ করিবে।"

গুরুর প্রতি ভক্তিমান ও তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরু হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন বিষয়ে অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাকিলে সেই বিষয় শিক্ষার কোনও ফল হইতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কেবল পাঠের সময় গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াই যে ছাত্রের কর্ত্তব্যের অবসান হইত, তাহা নহে। সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষকের সন্তোষ ও সুখবিধানই ছাত্রের একমাত্র ধ্যান ছিল। এই জন্যই আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিতে ছাত্র অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না।

গুরুর অনুজ্ঞাপালনে আয়ুধধৌম্য, উদ্দালক ও আরুণি যে অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, গুরু ভক্তির উচ্চ আদর্শরূপে তাহা ভারতীয় ছাত্র জীবনের ইতিহাসকে চির সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

ছাত্রের হৃদয়ের উপর গুরু ভক্তির এরূপই আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল যে, নিজে গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা দূরের কথা, অন্যের নিকট গুরুর নিন্দা শুনিতেও ছাত্র মহা অপরাধ মনে করিত—যথা মনুসংহিতায়,

গুরোর্যত্র পরিবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বাততোঽন্যতঃ॥

"যেখানে গুরুর কুৎসা বা নিন্দা হইয়া থাকে সেখানে কাণে হাত দিয়া থাকিতে হয়, অথবা তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হয়।" *

সংযম, গুরুভক্তি ও গুরূপদেশে শ্রদ্ধা দ্বারা ছাত্র শিক্ষার্থীর প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করে মাত্র, কিন্তু অধীত বিষয়ে শ্রম না করিলে কখনও প্রকৃত বিদ্যার্জ্জন সম্ভবপর নহে। এই জন্য শ্রমকেই বিদ্যার্জ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রেও বিদ্যার্জ্জনে শ্রমের প্রাধান্য স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে যথা—"শ্রমানুসারিণী বিদ্যা।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য কার্লাইল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উপদেশ দিতে যাইয়া ভূমিকাতেই এই শ্রমকেই ছাত্রের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলাধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

Diligent : that includes in it all the virtues that a student can have ; I mean it to include all those qualities of conduct that lead on to the acquirement of real instruction and improvement in such a case. Inaugural Address at the Edinbrugh University, 2 nd April, 1866 by Thomas Carlyle.

পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন আজীবন ছাত্র বা Fellow দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যদিগের গুরুকুলেও তেমনই আজীবন ব্রহ্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। মনু ইঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যদিত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।"
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীর বিমোক্ষণাৎ॥ ২৪৩ ২য় অধ্যায়।

যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েন অর্থাৎ গুরু গৃহে চিরবাস প্রার্থনা করেন, তবে গুরুকুলে বাস করতঃ একান্ত যত্ন সহকারে যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করিবেন। ভরত শিরোমণির অনুবাদ।

উপরে আমরা গুরুশিষ্য সম্বন্ধের যে চিত্র প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে গুরুর প্রতি শিষ্যের ঐকান্তিক ভক্তির যে পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ ভক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য বাধ্যতা বা নিয়মানুবর্ত্তিতার (discipline) প্রতিই অধিক লক্ষ্য, প্রাচ্য বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিনয়ের প্রতিই অধিক লক্ষ্য। এই জন্যই বিনয় বিদ্যার প্রথম ফল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে. যথা—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্॥"

এই বিনয় ভাবের সমুচিত অনুশীলন না হওয়াতেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় ক্রমেই ঔদ্ধত্যভাব ও সমভাবের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

আপনার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিজের প্রথম উপার্জ্জন সাধারণতঃ গুরুর পাদপদ্মে উপহৃত হইত। যাঁহার কৃপায় শিষ্যের উপার্জ্জন ক্ষমতা লাভ হয়, তাঁহাকে উপার্জ্জনের সর্ব্বপ্রথম ভাগ প্রদান অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই বোধ হয়।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে কোন কোন বিদ্যা প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা করিলেই কোন কোন বিদ্যার তখন অধ্যাপনা হইত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। শাস্ত্রে আমরা চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার উল্লেখ প্রাপ্ত হই, যথা—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্ব শ্চেতি তে ত্রয়ঃ
অর্থ শাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

* ছাত্রের প্রচলিত ব্যুৎপত্তিও "গুরুর দোষ আচ্ছাদন করে যে" এই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা গুরু-দোষাচ্ছাদনং ছত্রং তচ্ছীলমস্য ভানুজিদীক্ষিত কৃত অমর-টীকা।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (অভিধান), জ্যোতিষ ও ছন্দঃ এই ছয়টি বেদাঙ্গ। ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ। মীমাংসা, ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই সমস্ত শাস্ত্র মিলিয়া চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং ইহাদের সহিত আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারিটি যোগ করিয়া বিদ্যার সংখ্যা অষ্টাদশ হয়।

এই অষ্টাদশটি শাস্ত্রের দ্বারাই ভারতীয় জ্ঞান রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। মনুষ্যের জ্ঞাতব্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই যে ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত আধুনিক শিক্ষা বিষয় যে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সকলেরই অন্তর্ভূত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জ্যামিতিকে অনেকেই পাশ্চাত্য উদ্ভাবন বলিয়া জানেন, কিন্তু সংস্কৃত বিশারদ মহাপণ্ডিত থিবো সাহেব গবেষণা দ্বারা বৈদিক "সুল্বসূত্রে" জ্যামিতি শাস্ত্রের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত অষ্টাদশ শাস্ত্রে পারদর্শিতাই পাণ্ডিত্যের চরম সীমা বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই অষ্টাদশ শাস্ত্র যথা-রীতি অধ্যয়ন করিয়াই যে পাণ্ডিত্যের সর্ব্বোচ্চ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে হইত, "চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রে পণ্ডিত" এই প্রচলিত কথা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ রমেশবাবু তদীয় Civilisation of India (ভারতীয় সভ্যতা) নামক গ্রন্থে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে কি কি বিদ্যার অনুশীলন হইত তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন —

Closely connected with this vast body of religious literature (Brahmanas, Aranyakas, Upanishads) were other departments of learning, which the pious Hindu considered it his duty to acquire. In one of the old Upanishads we find these departments of learning thus enumerated :—The four Vedas, Chronicles and Cosmogonies, Grammars, Ancestral Worship, Arithmetic, Science of Portents, Divisons of Time, Logic, Ethics, Etymology, Pronunciation and Prosody, Demonology, Science of Arms, Astronomy, and the Science of Serpents and Spirits."—The Civilisation of India (Temple Primers Series) pp. 22—23

অষ্টাদশ বিদ্যার অধিকার আমরা ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষারই আদর্শ বলিয়া মনে করি। ভারতে শিক্ষার যে একটি সাধারণ আদর্শ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাস 'রঘুবংশে' রঘুর শিক্ষায় সেই আদর্শের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ সগুণৈরুদারধীঃ। ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুর্ণবোপমাঃ ততার বিদ্যাঃ॥" এখানে রঘু চারিটি বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মল্লিনাথ টীকায় চারিটি বিদ্যার নাম এইরূপে দিয়াছেন—

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
এতাবিদ্যাশ্চতস্রস্তু লোকসংস্থিতি হেতবঃ॥

"আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ যুক্তিশাস্ত্র, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ, বার্ত্তা অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র,, এবং দণ্ডনীতি অর্থাৎ শাসন নিয়ম এই চারিটিই চতুর্বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্তের দ্বারা পৃথিবীর লোকের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়॥"

এই চারিটি বিদ্যা কার্য্যকরী বিদ্যার মধ্যে গণ্য বলিয়াই লোকশৃঙ্খলার কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানেও তর্কশাস্ত্র (Logic), বার্ত্তা (Political Economy) ও দণ্ডবিধি (Law) প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বেদ ভারতে সকল বিষয়েরই মূল বলিয়া এবং ভারতে বেদ বা ধর্ম্মই সমস্তের নিয়ামক বলিয়া বেদও কার্য্যকরী শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

কালিদাস নিজ গ্রন্থে চারি বিদ্যার উল্লেখ করাতে

বুঝা যায় তাঁহার সময়ে চারি বিদ্যার অধ্যয়ন বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল। এই চারি বিদ্যার অধ্যাপনা হইতেই সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে প্রচলিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নাম চতুষ্পাঠী হইয়াছে।

উপরে আমরা কালিদাসের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাই যে শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্যতার প্রধান সহায় তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। মল্লিনাথ ইঁহার টীকায় শিক্ষার্থীর যে সমস্ত ধীগুণের নাম কামন্দকীয় নীতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির একটি সুন্দর চিত্র আমাদের নিকট উন্মোচিত হয়। আমরা এখানে সেই চিত্রটিকে ভাল রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মল্লিনাথ টীকায় লিখিয়াছেন, "ধীর"ইতি অত্রকামন্দকঃ "শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা। উহাপোহার্থ-বিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ।" উদ্ধৃত শ্লোক হইতে শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহা, আপোহ, অর্থ বিজ্ঞান, ও তত্ত্ববিজ্ঞান এই আটটিকেই মানসিক গুণ বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে।

শিক্ষার্থী এই কয়টি মানসিক গুণের অধিকারী হইতে পারিলে তবেই তাহার শিক্ষা প্রকৃতরূপেই ফলোপধায়ক হইতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে এই সমস্ত মানসিক গুণের অনুশীলন কিরূপে করিতে হইবে তাহাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখিব। প্রথমতঃ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আন্তরিক অনুরাগ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তবেই গুরূপদেশ শুনিবার জন্য তাহার মনে বলবতী আকাঙ্ক্ষা সঞ্জাত হইবে, ইহাই শুশ্রূষা। তৎপর সে অবশ্যই মনোযোগের সহিত গুরূপদেশ শ্রবণ করিবে; ইহাই 'শ্রবণ'। এই প্রকারে মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিলে পর গুরূপদেশ অবশ্যই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই 'গ্রহণ। উপদেশটি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলেই তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে; ইহাই ধারণ। কিন্তু এই ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিবার জন্য আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত ধারণাটিকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ না করিয়া নিজের বিচার শক্তির দ্বারা ইহার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ ইহার সম্বন্ধে মনে সংশয়ভাব ধারণ করিবে ইহাই 'উহা'। তৎপর যুক্তির দ্বারা সেই সংশয়ের নিবারণ করিবে; ইহাই 'আপোহ'। এই প্রকারে সংশয়ের নিবারণ হইলে তবেই জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের উপলব্ধি হইবে। অর্থাৎ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জানাইবে, ইহাই 'অর্থবিজ্ঞান'।

এক্ষণে পাশ্চাত্য মহামনীষী কার্লাইলের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব হইতে একটি মন্তব্য তুলনার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। "Try all things they set before you in order, if able, to understand them, and to follow and to adopt them, in proportion to their fitness for you. Generally see what kind of work you indviually can do; it is the first of all problems for a man to find out what kind of work he is to do in th universe. Choice of books.—"শিক্ষকগণ তোমার নিকট যে সমস্ত বিষয় উপস্থিত করেন, তৎসমস্ত সম্ভবপর হইলে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং তোমার পক্ষে এই সমস্ত যে পরিমাণ উপযোগী হইবে সেই পরিমাণে ইহাদিগকে অনুসরণ ও গ্রহণ করিবে। ক্রমে ক্রমে তুমি নিজে নিজে কিরূপ কার্য্য করিতে পার তাহাই দেখিবে। এই জগতে কাহাকে কোন কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করাই প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে প্রথম সমস্যা।" পূর্ব্বোক্ত-রূপে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হইলেই তৎপর তাহার মূল তত্ত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমার ভ্রমণ

হাবড়ার পোলের উপর দিয়া মানুষ ও শকটের যে স্রোত চলেছে একদিন এই প্রকার স্রোতের মধ্যে সতর্কপদ সঞ্চালনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একখানি 'মিক্স্ট্' ট্রেনে আসিয়া চাপিয়া বসিলাম।

ট্রেন ষ্টেষণের পর ষ্টেষণ অতিক্রম করতে লাগলো, এবং গাড়ী থেকে মায়া কাটিয়ে অনেকে নাব্‌তে লাগলেন, তৎস্থলে বহুসংখ্যক এসে আমাদের মায়া পূর্ণও করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে প্রথম মায়ার দল একেবারে শূন্য হয়ে গেল,—সে পক্ষের কেবলমাত্র আমি অবশিষ্ট, তারপর দ্বিতীয় মায়ার দল একেবারে শূন্য হইতেই তৃতীয় মায়ার দল এসে জুড়ে বস্‌ল। এমন করে বহু দলের নেবে যাবার পর দু'পাঁচজন অতি দূরের যাত্রী ও উঠলো।

আমরা "পাণীপাড়ের" দেশ ছাড়িয়ে "মিশ্রি মহারাজের" দেশও ছাড়াতে চল্লাম। বাংলার স্নিগ্ধ প্রচুর সলিল কণা সেবিত বায়ু, অজস্র বৃক্ষবল্লরী আচ্ছাদিত, নানা সলিলধারাপিনদ্ধ, বাংলার ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ট্রেন ছোটনাগপুরের পর্ব্বতরম্য, শুষ্ক সতেজ বায়ু সেবিত দেশ ছাড়াইয়া বহুল আম্রকুঞ্জপরিবৃত নানা শস্য উৎপাদিনী বিহারের উর্ব্বর ভূমি অতিক্রম করিয়া, কঠিনভূমি-মিশ্রিত মৃত্তিকাময়ী .গঙ্গাযমুনার সঙ্গম উপকূল ছাড়াইয়া যুক্ত প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল, "পাণী পাড়েজী" বিদায় প্রাপ্ত হইয়া "মিশ্রি মহারাজ" রূপে দেখা দিলেন। এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—ওগো কোথায় গেলে, কাহা গেয়েলো হো ভাইয়া—ভেইয়া কিধার গিয়া হো ইত্যাদি বিচিত্র সুর ও বিচিত্র ভাষার লয় ও আবির্ভাব হইল। বেহারের সরল বলিষ্ঠ কপটতা বর্জ্জিত ভীরু ও শঙ্কিত দৃষ্টিপূর্ণ গ্রাম্য লোকগুলি ট্রেনে উঠিতেছিল। তাহাদের আটা সাটা মলিন পরিচ্ছদাদি ভদ্রলোকদের বিরক্তির সঞ্চার করবে বলেই তারা এক পাশে বসে পড়েছিল।

এলাহাবাদের পূর্ব্ব হইতেই দীর্ঘমূর্ত্তি যুক্তপ্রদেশের ভাইয়া গণের সংখ্যা ভর্ত্তি হইতে থাকে। তাহারা শ্রম পরায়ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ বলিয়া মনে হয়, বীরত্বের ভাবও তাহাদের মধ্যে খুব আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কঠোর সংসারচক্রে পিষ্ট মনে হয়। ইহাদের ফিন ফিনে কামিজ, চুড়িদার পাজামা ও পাতলা টুপি, বাদসাহী আমলের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধের পরিচায়ক।

ট্রেন যখন মধ্য প্রদেশ ছাড়াইয়া রাজপুতনায় প্রবেশ করিল তখন "মিশ্রি মহারাজ" বিদায় প্রাপ্ত হইয়া "পাণি-মহারাজের" আবির্ভাব হইল।

এখন ভূমি অত্যধিক বালুকাময় ও অনেক স্থলে কঙ্কর পূর্ণ। পর্ব্বত মালার উলঙ্গ মূর্ত্তি, তৃণলতা বিবর্জ্জিত মাঠ, হরিৎক্ষেত্রও অপ্রচুর। পর্ব্বতের প্রত্যন্তদেশগুলি উর্ব্বর, তথায় ভুট্টা ও আফিঙ্গ দুই-এরই চাষ হয়।

পর্ব্বত অভিসন্ধি বা দুই পর্ব্বতের নিম্নস্থ ক্রোড় দেশ বহুবৃক্ষসমাচ্ছন্ন. দুরারোহ শৈলপ্রাচীরের সানুদেশে স্থানে স্থানে এইরূপ স্থান বড় নয়নরঞ্জন বলিয়া বোধ হয়।

পর্ব্বত মালার মধ্যদেশে আজমীড়ে এসে ট্রেন অনেক ক্ষণ থামে। চারিদিকের আরাবল্লি পর্ব্বতমালা এবং দূর হইতে নগরটি রম্য গিরিগুহার অন্তরালবর্ত্তী মায়াপুরীর মতই মনে হয়। এখানেও পর্ব্বত মালা শ্যাম আচ্ছাদন বিরহিত।

এই আজমীড়ের পরেই আর এক নূতন দৃশ্য—প্রায় ৮ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত মারবারের মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

বিস্তীর্ণ মরুভূমি, এক প্রকার কণ্টকবৃক্ষসমাকুল, শুভ্র বালুকারাশি—মসৃন ও সমতল।

দূরে দূরে পাহাড়গুলি মেঘের মত মনে হয়। কোন কোন পাহাড়ের শীর্ষদেশে রক্তপ্রস্তরের আভা বা অপরাহ্ন-

রবির রক্তিমচ্ছবি করাল বদনা মরুভূমির রক্তিম জিহ্বার মতো মনে হয়।

রাস্তায় কোন কোন স্থানে লাইন রক্ষক ও পরিদর্শকগণের পানীয় জল ট্রেনের বয়লারের জন্য সঞ্চিত জল হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ট্রেন আসিয়া মারোয়ার জংসনে থামিল, চতুর্দ্দিকে মরুভূমির ভীষণচ্ছবি শুষ্ক শীর্ণ প্রান্তর এক প্রকার কণ্টক গুল্মে পূর্ণ। এখানে অনেক লোক নামিল উঠিলও বটে। কতগুলি লোক ট্রেন থেকে নেবে, ক্ষুদ্র ষ্টেশনের দালানটির পিছনের প্রান্তর দিয়ে চলতে লাগলো। দূরে যতদূর দেখা যায়, পল্লি নগর বা বৃক্ষচ্ছায়ার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। এরা যায় কোথায়!

রাজপুতনার রেলযাত্রীর প্রায় সর্ব্বত্রই এমন অবস্থা। কোন স্থলে হয় ত রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নিকটতম পল্লির দূরত্ব ২৫।২৬ মাইল; তদ্ব্যতীত ৫০।৬০ মাইল দূর হইলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। রাজপুতনার যে অতি অত্যল্প অংশ ব্যাপিয়া রেল লাইন গিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুমাত্র নাই।

প্রকৃতি যেখানে বিরূপ, সেখানে লোকও তদ্রূপ সহিষ্ণু। পানীয় জল সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ, জল ব্যবহারের প্রণালী ও তাহাদের এতদূর সংক্ষিপ্ত যে বাংগাদেশের এঁটোজ্ঞান সম্পন্ন লোক তাহাদের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। তারপর অন্যান্য জল ব্যবহার প্রণালী যা' তা' না বলাই ভাল।

বরাবর বেহার থেকে এ পর্য্যন্ত একটা প্রথার সামঞ্জস্য খুব লক্ষ্য করে এসেছি, সেটা "রামরাম" দিবার প্রথা। ট্রেনে কেউকে তুলে দিতে এসে আত্মীয় স্বজনগণ গাড়ীর হাতল ধরে 'ঘণ্টাভর' দাঁড়িয়ে থাকবে, মুখে কথাটি নেই, কিন্তু যেই ট্রেনটি ছেড়ে দিলে আর উপায় নেই—মহা একটা কলরব সুরু হয়ে যায়। তখন উভয় পক্ষ থেকে "রাম রাম" দিবার একটা বিপুল আগ্রহ পড়ে যায়, যতই দূরে ট্রেন যেতে থাকে ততই কণ্ঠ উচ্চ করে বলতে থাকে,—অমুককে আমার "রামরাম" দিও, অমুককে দিও, গণ্ডা বাচ্ছা সকলকে উভয় পক্ষ থেকে "রাম রাম" দিতে দিতে যখন ট্রেন 'ডিস্‌টেন্ট' সিগ্‌নেল ছাড়িয়ে চলে যায়, তখনও হয় ত ষ্টেশনের লোকটি বিকট চীৎকার করে "রাম রাম" প্রদান করতে থাকে।

মারবার ছাড়িয়ে ট্রেন কিছুক্ষণ দুর্গম পর্ব্বত মালার মধ্য দিয়া চলতে থাকে। এ পাহাড়গুলি এমনই কদর্য্য যে ঠিক যেন বিরাট দৈত্য মুখ ব্যাদান করে আছে, শ্যামল বৃক্ষপত্রের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না, দৃশ্য দেখে চক্ষু ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

তার কিছুক্ষণ পরেই দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ যেন দৈত্যপুরী হ'তে সুরপুরে এসে পৌছিতে হয়, এবং উভয়ের মাঝখানে কদর্য্য কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়গুলা সীমানা কেটে রেখেছে। শৈলকাননকুন্তলা এই আবুতে পৌছে প্রাণ মন শীতল হয়ে যায়। পর্ব্বতের অধিত্যকা উপত্যকা ভ'রে পলাশ গাছই অধিক দৃষ্ট হয়। শীতকালের শেষে পর্ব্বত প্রান্তর ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। পাহাড়গুলি শ্যামলবসনভূষিত, তাহার চতুর্দ্দিক হ'তে সহস্র নির্ঝর বঙ্কিম পদবিক্ষেপে সমতল প্রদেশাভিমুখে ছুটে আস্‌ছে। উৎফুল্ল হরিণ-হরিণী প্রস্তর হ'তে প্রস্তরখণ্ডে ছুটে বেড়াচ্ছে। হাজার পাখীর গানের সুর বাতাসের সঙ্গে ভেসে আস্‌ছে। কেকা রবে শ্রবণ চমকিত হলে চতুর্দ্দিকের বনের আশে পাশে ময়ূর ময়ূরীর সহর্ষ বিচরণ দেখা যায়। বর্ষার পর সত্যই আবু নন্দন কাননে পরিণত হয়। ঝরণার কল কল নাদ, ময়ূরের কেকা রব, মনভুলান ভিজামাটীর কোমল গন্ধে নন্দনের স্বপ্ন রাশি বুকে করে বাতাস যেন উড়ে আসে।

ঝোপ ঝাপ ও বন-লতাকুঞ্জের তলে তলে উজ্জ্বল ঝরণা-শিশুর মুখর গীতি নিষ্কলঙ্ক দেবকন্যার সঙ্গীতের মতই সুধাস্রাবী। আবুর পর্ব্বত-নিম্ন সমতলভূমিসমূহ অত্যন্ত উর্ব্বর ও বিবিধ শস্যে পরিপূর্ণ।

আবু পর্ব্বত বা অর্ব্বুদাচল আরাবল্লি পর্ব্বতেরই শেষ সীমা। সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় চারি হাজার ফিট উচ্চ

মহারাও শিরোহিপতির নিকট হইতে এস্থানটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গুজরাত ও রাজপুতনার উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বসবাসের জন্য লইয়াছেন।

আবু ছাড়াইলেই ট্রেন গুজরাতে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে পালনপুর জিলা। পালনপুরে এক জন নবাবও আছেন। এখানকার ভূমি উর্ব্বর কিন্তু কঙ্করপরিপূর্ণ। নিম আম ও বাবলা গাছের খুব বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ট্রেন আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে ভূমি একেবারে কঙ্করশূন্য হইয়া আসে, ভূমি উর্ব্বর ও বাজরী, ভূট্টা, ধান, যব, মটর, কলাই বিবিধ শস্যশালিনী। বিস্তীর্ণ বালু শয্যার প্রান্তবাহিনী শীর্ণকায়া অনেকগুলি নদী গুজরাতের সলিলাসরবতদাত্রী। আবু ছাড়াইলে গাড়ী স্ত্রী পুরুষে ভরে ওঠে! এতক্ষণ গাড়ীতে পুরুষরাই অধিক উঠিত, মহিলা কদাচিৎ, কিন্তু এখন স্ত্রী পুরুষের সমান ভিড়। অশঙ্কিত ও দর্পিতভাবে মহিলারা গাড়ীর কক্ষগুলি অধিকার করিয়া লইতেছেন।

বহু পূর্ব্ব হইতেই "পাণি মহারাজ" বিদায় লইয়া তৎস্থলে 'বালতি' হস্তে "মহারাজ" রূপে দেখা দিয়াছেন।

টুণ্ডালায় গাড়ী বদল করিয়া বান্দিকূট অথবা আজমীড়ে যাইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। টুণ্ডালায় ই, আই, আর্ শেষ, তৎপর আর্, এম্, আর্ আমদাবাদ পর্য্যন্ত,এবং তথা হইতে বম্বে বড়োদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (B. B & C. I.) গাড়ীতে বড়োদা হইয়া পৌঁছিতে হয়। বাঙ্গালীর মুখে ইহা বরদা বা বড়োদা, গুজরাতির মুখে ইহা বরোদ্‌ড়া এবং মহারাষ্ট্র বাসীর মুখে বড়োদে। বড়োদা গুজরাতের মধ্যে হইলেও এখানে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র লোক বাস করে। বড়োদা নগরীতে শতকরা প্রায় ৪০ জন মহারাষ্ট্র লোকের বাস। মহারাষ্ট্রবাসী ও গুজরাতবাসী সম্পূর্ণ প্রতিবাসী; কিন্তু তাহাদের সামাজিক জীবন, রীতিনীতি, পদ্ধতি এমন কি ভাবগত পার্থক্যও বহুল দৃষ্ট হয়। গুজরাতী লোক শান্তশিষ্ট ও নম্র প্রখর বাণিজ্যবুদ্ধিপ্রবণ এবং ইহাদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা সম্পূর্ণ রহিত। মহারাষ্ট্র লোক গর্ব্বিত তেজস্বী ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, এবং ইহাদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা দৃঢ়তর, আমাদের বাংলা দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে খুব মিল আছে।

জৈন ধর্ম্মের নির্জীব করুণভাব, রণছোড় বা দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবাৎসল্যভাব, শঙ্করের বীরবৈরাগ্য অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকারী হওয়ায় গুজরাতী লোকের চরিত্রে কোমলতা ও শান্ত ভাব অধিক স্থান পাইয়াছে।

ত্রিভুবনবিনাশী শিব উন্মত্ত রণরঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন, কঠোর সাধনসংযমরত মহাদেবের বীর ভাব মহারাষ্ট্র লোকের চরিত্রে অধিক কার্য্যকরী হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ গুজরাতী ভাষার প্রথম প্রাচীন কবি নরসিংহ মেহেতা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীতকাব্যে দেশ ভাসাইয়াছেন। শ্রেষ্ঠকবি প্রেমানন্দ প্রেম সঙ্গীতে দ্বিতীয় জয়দেব স্বরূপ, তৎপর বল্লভাচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্যেরা বালগোপাল পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া বাৎসল্য রসের ধারায় সমস্ত গুজরাত প্লাবিত করিয়াছে। মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে তুকারাম ও তুলসীদাস ভক্তির গোড়াপত্তন করিয়াছেন; তৎপর মোরপন্থ জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি বীর রসের ধারা ঢালিয়াছেন, রামদাস প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসীরাও মৃতপ্রায় শক্তিতে পুনরায় ইন্ধন সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

রাজপুতের জীবনচরিত্রে তেমন কিছুই দৃষ্ট হয় না। সমস্ত রাজপুতনা প্রাণবিহীন, এমন কি জাতীয় ভাব ও মর্য্যাদার পর্য্যন্ত উপলব্ধি বিহীন।

ভাট এবং চারণের সঙ্গীত মুখে মুখেই প্রতিধ্বনিত হইত; রাজদরবারে আত্মপ্রশংসার কাহিনীটুকু মাত্র স্থান পাইত; কাজেই চারণের সঙ্গীত নীরব হইতেই সমস্তই নীরব হয়ে গেছে; এমন কি কাহিনী পর্য্যন্ত লোকে বিস্মৃত হয়ে গেছে, কারণ প্রথম অবধিই শস্ত্রবিদ্যা ছাড়া শাস্ত্রবিদ্যার কোন চর্চ্চা ছিল না। মারাঠার সঙ্গে সংঘর্ষে সে শস্ত্রবিদ্যাও খর্ব্ব হওয়াতে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে।

রাজপুতনার স্থানে স্থানে জৈন প্রভাব সামান্য বিস্তৃত

হইয়াছে। তন্মধ্যে মারবার ও মিবারের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। রাণা কুম্ভের সময় চিতোরে জৈন প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মারবার ও মিবারে জৈনদিগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে।

সমস্ত রাজপুতনায় শৈব প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; বৈষ্ণব প্রভাব অতি সামান্য!

মিবারের মধ্যে নাথদ্বার নামক স্থান বৈষ্ণবদের তীর্থ-মহিমায় দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য। সমস্ত রাজপুতনার মধ্যে ইহা একটি শান্তি শতদল।

শৈব বৈষ্ণব উভয়ের পক্ষেই আজমীড়ের সন্নিহিত পুষ্কর তীর্থ পুণ্য স্থান।

চিতোর মহিষী মহাভক্তিময়ী মীরাবাইএর প্রভাব রাজপুতনায় অধিক স্থান পায় নাই! মীরাবাইএর সম্পূর্ণ ভক্তিভাব গুজরাতের নরনারীর অন্তরে কার্য্যকরী হইয়াছে। মীরার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতে গুজরাতী মহিলাদিগকে গরবা গানে আনন্দ উদ্বেলে নাচাইয়া তোলে।

বাংলাদেশ থেকে বড়োদা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ভারতবর্ষীয়া মহিলাদের অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আসা যায়।

বাংলা দেশের মহিলা লজ্জাশীলা ভীরু ও অবগুণ্ঠন-বতী পুরুষের সম্পূর্ণ - সাহচর্য্য ব্যতিরেকে গৃহের বাহিরে সমস্ত কার্য্যে অক্ষম ও সঙ্কুচিতা, কিন্তু অত্যন্ত দয়াশীলা ও জননীস্নেহে ভরা। বিহারে আসিলে মহিলা-দের অবগুণ্ঠন হ্রস্বতা প্রাপ্ত দেখা যায়। মহিলারা স্বাধীন ভাবে চলা ফেরায় অভ্যস্ত, পুরুষের সহকারিতা তাঁহাদের অনেক অল্প আবশ্যক হয়।

যুক্ত প্রদেশে আসিলে মহিলাদিগের আবার পর্দ্দা দেখা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের মত তাঁহারা অত সঙ্কু-চিত ও দুর্ব্বল নহেন, এবং তাহারা সর্ব্বদা পুরুষের সহগামিনী হইয়া চলা ফেরা করেন।

রাজপুতনায় মেয়েদের অবগুণ্ঠন আর একটু দীর্ঘ; কাজেই তাঁহারা গমনাগমনের সময় হস্ত দ্বারা এক চক্ষুর উপরিস্থ আবরণ অর্দ্ধ উন্মুক্ত করিয়া একচক্ষু লোকের মত তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তির ব্যবহার করে। রাজপুতনার মেয়েদের লজ্জার ভাব একান্ত কম, বিশেষতঃ তাঁহাদের অঙ্গাবরণের অবস্থা বড়ই অসাবধান।

তারপর গুজরাতী মেয়েরা স্বাধীন সতেজ। তাঁহাদের অবগুণ্ঠন মাথার উপরিভাগেই অবস্থান করে। পুরুষের সহকারিতা তাহাদের মোটেই আবশ্যক হয় না; নিঃশঙ্কভাবে তাঁহারা সর্ব্বত্র গমনাগমন করে।

মহারাষ্ট্র সধবারা মোটেই অবগুণ্ঠন প্রদান করেন না, সেটা বিধবাদের জন্যই সঞ্চিত থাকে; তাহারাও নির্ভীক কিন্তু পুরুষের সাহায্য তাহারা আত্মমর্য্যাদার অঙ্গাবরণ রূপে সর্ব্বদাই গ্রহণ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

বেদের উষা-কবি

উদয় সুমেরু-শিরে শ্লথ বেশবাসে
ফেলিতে প্রথম পদ ধরেছি উষায়!
লজ্জারুণ গণ্ড তার করেছি চুম্বন;
মুদিয়া দিয়েছি সুখে উজ্জ্বল নয়ন!

ওই উষা আসে!
আমার প্রেমের চিহ্ন, এখনো সে আছে
কপোলে কপালে তার, আকুলিত বাসে,
উচ্ছল আকাশব্যাপী হরষ-উচ্ছ্বাসে!
যে হরষ স্রোতোমুখে ভুবন ভাসায়,
লুটে যারে ফুল-কুল, দিকে দিকে ভাসে,
মেঘেরা হৃদয়ে ধরি নাচিয়া বেড়ায়!

ওই উষা আসে!
ওই সে রঙ্গীন আভা—আমারি প্রাণের
সমগ্র বাসনা-রাগ বিপুল আকুলে
অধরে কপোলে তার দিয়েছিনু ঢেলে!

ওই যায়-যায়!
কিরণ কমল দল কোটে পায় পায়!
দিকে দিকে ধরা জুড়ি ওই উঠে সাড়া—
জেগে উঠে কারা?

কাহারা সহস্র কণ্ঠে উল্লাসিয়া উঠি,
শত রঙ্গে উজলিয়া হৃদয়-ফুলউটি,
সহস্র সঙ্গীত-ছন্দে আবেগ-সম্ভার
আনন্দের সর্জ্জরসে আরতি উদার
নিবেদিছে অর্ঘ্য-ভারে আমারি প্রিয়ারে!
দেশে-দেশে লোকে-লোকে কালে-কালান্তরে!

আমার সে উষা আজি জগতের ধন
যে ছিল প্রথম শুধু আমারি আপন!
সেই উষা সূর্য্যরূপে, অগ্নি বায়ু রূপে
অদিতি বরুণ সোম লক্ষ ঋক্ষ রূপে
আহুতি উক্‌থের রূপে, গায়ত্রীর রূপে.
সুখদুঃখ জ্ঞানকর্ম্ম ভক্তি প্রীতি রূপে
নিখিলের হৃদয়ের আবেগ-আধার,
বিশ্বের কবিতারূপে প্রাণ-বেদনাব,
জীবনের জ্যোতিঃ পন্থী আশা-ভাষাময়ী
ললিত সঙ্গীত চিত্র শিল্প কলাশ্রয়ী,
ওতপ্রোত সুনিবিড় সুধার আভাস
কোটী মুখে কোটী রূপে অসীম-উল্লাস
ভবের ভাবের রাজ্য করেছে প্রকাশ!

যে ছিল আমারি শুধু হৃদয় নন্দিনী,
আজি সে বিশ্বের প্রিয়া—বিশ্ববিকাশিনী!
আজি বিশ্বলোক
পুজিছে তাহারে, রচি আনন্দের শ্লোক!
নবীন বরষা-হৃষ্ট শফরীর সম
উলটি-পালটি' ধরে প্রাণে, অনুপম
প্রসাদ লভিতে তারি—আঁখি তলে তার
উলসিছে আপনার প্রাণের ভাণ্ডার!

আমার সে প্রণয়িনী প্রথমা-প্রাপ্তিরে,
জানি আজি, বিশ্বলোক নিল বেড়ি ঘিরে'
নিয়ে গেল জনে জনে নিজ অন্তঃপুরে।
তবু সে আমার—
প্রথম প্রসূন-চিত্ত অনাদি নিশার,
প্রথম প্রণব-ধ্বনি হিয়া-বেদনার,
প্রথম প্রেমিক আমি চিরদিন তার।
শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

নামি—কো

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কার্য্যে নিযুক্ত

"হংকং, জুলাই—,—

"প্রিয়তমা নামি,

নিরানব্বই ডিগ্রী গরমে গলদঘর্ম্ম অবস্থায় তোমায় এই চিঠি লিখ্‌চি। সাসেবো থেকে যে পত্র দিয়েছিলুম তা বোধ হয় পেয়েছ। সেখান থেকে যাত্রা কল্লে অবধি দিন গুলো এত গরম হয়েছিল যে "অগ্নের দ্বীপের" নাবিক আমরাও একটু মুশ্‌ড়ে পড়েছিলুম। আমাদের কর্ম্মচারী ও নাবিকদের মধ্যে ডজন খানেক লোকের সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়েছিল, আমি কিন্তু ভাল আছি। রোগীদের কামরায় আমার একদিনও থাকতে হয় নি। বিষুবরেখার নিকটে ঝলসান রোদে পুড়ে আমার কালো চেহারার উপর এমন একটি পোঁছ পড়েছে যে আমি নিজেই অবাক হই। আজ জাহাজ থেকে নেমে এক নাপিতের দোকানে গিয়েছিলুম, অন্যমনস্ক ভাবে যেই আর্শির দিকে ফিরেচি, দেখি এক নতুন লোক দাঁড়িয়ে! আমার এক আমুদে বন্ধু আমার এই অবস্থার ছবি একখানা তোমার কাছে পাঠাতে বল ছিল, কিন্তু আমি তা কর্‌চি না। সমস্ত পথটাই ভালোয় ভালোয় কেটেছে, একবার কেবল ঝড় পেয়েছিলুম। গতকল্য আমরা এখানে জয়ধ্বনির মধ্যে নিরাপদে এসে পৌঁছেচি।

"ফাসেবোতে তোমার স্নেহমাখা পত্র পেয়ে বার বার সেখানি পড়েচি। মা'র আবার সে পুরাণো ব্যারাম হয়েচে শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে আছ বলে এ বৎসর আমি খুব নির্ভাবনায় আছি। আমার বদলে তুমি তাঁর পরিচর্য্যা কোরো। ব্যারাম হলে তাঁর মন খুগিয়ে চলা দায়. সেই জন্য তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।

"আশা করি আকাশাকার সকলে ভালো আছেন। কাতো মেসোর খবর কি? এখনো কাঁচি হাতে ব্যস্ত না কি? তা হলে ইকু চলে গেছে। কেন এ রকম হ'ল তা জানি না. কিন্তু এতে আমি বড় দুঃখিত। তাকে চিঠি লেখবার সময় আমার ভালবাসা জানিও, আর বোলো তার জন্যে আমি অনেক উপহার নিয়ে যাব। আমি তাকে ভারি ভালবাসি। সে খুব আমুদে। তুমিও বোধ হয় তার বিচ্ছেদ অনুভব করছ। কাতো মাসী ও চিজুকো-সান্ তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে কখনো কখনো আসেন কি?

"চিজিওয়া সর্ব্বদাই আসে শুনলুম। আমাদের জন কয়েক মাত্র আত্মীয়. তার মধ্যে চিজিওয়া একজন। মা তার উপর ভারি সন্তুষ্ট। তাকে আদর কর্‌লে মা খুসী হবেন। সে বেশ চালাক চতুর লোক, দরকার হয় ত আশা করি সে তোমায় সাহায্য কর্‌বে।

"তোমার বড় স্নেহের

"তাকেও

পুঃ। সঙ্গের চিঠিখানা মাকে পড়িয়ে শুনিও। এখানে দিন কতক থাক্‌ব। এখান থেকে রসদ নিয়ে ম্যানিলা হয়ে সিড্‌নী, তারপর নিউ ক্যালিডোনিয়া, ফিজি হয়ে সন্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, তার পর হাওয়াই হয়ে বাড়ী। শরৎকালে বাড়ী পৌঁছুব আশা করি।

পুঃ। সন্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো (আমেরিকা) জাপানী বাণিজ্য দূতের নিকট,--এই ঠিকানায় চিঠি পাঠিও।

"সিড্‌নী. আগষ্ট—,—

"প্রিয়তমা নামি,

...গত মে মাসে নামিসানের সঙ্গে ইকাওতে 'ফার্ণ' সংগ্রহ কর্চ্ছিলুম; আর এখন আমি দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কত নীচে. সিড্‌নীতে! রাত্রে যখন মুখ তুলে "সাদারম্ ক্রস্" এর দিকে দেখি ও গতদিনের কথা ভাবি, তখন আমাদের জগৎটা কি পরিবর্ত্তনশীল এ কথা না ভেবে পারি না। গত বৎসর যখন সমুদ্র ভ্রমণ করতুম, কখন কখন শরীর খারাপ হত, কিন্তু আশ্চর্য্য, এ বৎসর আমি খুব ভাল আছি। এবার একটা নতুন অননুভূতপূর্ব্ব ভাব আমার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা রয়েছে। 'ব্রিজের' ওপর একলা দাঁড়িয়ে যখন দেখি দক্ষিণ-দেশের অন্ধকার আকাশে অসংখ্য হীরের টুক্‌রো ঝিক্‌মিক্ করে জল্‌চে, তখন এই ভাবটা বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে, তখন যেন আমি চোকের সাম্‌নে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখ্‌তে পাই। আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে হেসো না। বন্ধুদের সঙ্গে যখন থাকি তখন যেন কোনো ভাবনা নেই এমনি ভাণ করে তাদের সঙ্গে গাই "বাড়ীতে অশ্রুবর্ষণ, আমরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করি না, কারণ সাহসের কাজ—ইত্যাদি". কিন্তু (হেসোনা) নামি-সানের ছবি সদাই আমার কোটের ভেতরের পকেটে রয়েছে। এই চিঠী লিখ্‌তে আমি একজনের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে 'পামের' ছায়া-ঢাকা বাড়ীর ছোট ঘরটিতে এই চিঠী পড়্‌বে।

"সিড্‌নী উপসাগরে অনেক পরিবার জল-বিহার করে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবি যে যখন কাজ-কর্ম্ম শেষ করে নামি-সান্ আর আমার দুজনেরই চুল পাক্‌বে তখন আমরাও অন্তত পাঁচ হাজার টনের একখানা বড় বিহার-তরণী তৈরি করাব। আমি হব সে জাহাজের কাপ্তেন, আর আমাদের ছেলেরা আর নাতিরা হবে নাবিক। আমরা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াব। আবার আমরা সিড্‌নীতে আস্‌বো; বহু বৎসর আগে এক তরুণ নাবিক যে সব স্বপ্ন হৃদয়ে পোষণ করত সে স্বপ্নের কথা তখন তোমায় বল্‌ব।

"তোমার বড় স্নেহের,

"তাকেও"

"তোকিও,—,—

"প্রিয়তম তাকেও :

হংকং থেকে ১৫ জুলাই যে স্নেহমাখা চিঠিখানি পাঠিয়েছ তা কতবার পড়েছি! এত গরমেও তুমি ভাল আছ শুনে বড় আহ্লাদিত হলুম। মা ভাল হয়ে উঠ্‌ছেন, তাঁর জন্য ভেবো না।

নিঃসঙ্গ দিনগুলো কোনো রকমে কাটিয়ে দিই। তুমি এখানে নেই সেইজন্যে বিশেষত মাকে সুখী করতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমি বড় মুখ্যু যতটা ইচ্ছে হয় কাজে ততটা করে উঠতে পারি না। তুমি যে দিন নিরাপদে বাড়ী পৌঁছুবে সে দিনের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি।

"আকাশাকার সকলে ভাল আছে। তারা জুষির 'ভিলা'তে গেছে। কাতো-রা ওকিৎসু গেছে, তোকিওতে আমরা ভারি একলা পড়ে গেছি। ইকুও জুষিতে আছে; সে ভাল আছে। তোমার ইচ্ছা তাকে জানিয়েছিলুম. সে তোমার দয়ার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ আমায় দিয়েছে।

"আমি বুঝতে পারচি কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিদ্যা আমার শেখা হয় নি। গৃহস্থালির কাজকর্ম শেখবার জন্যে বাবা আমায় বিশেষ করে বল্‌তেন. তখন শিখিনি সে জন্যে এখন অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। তোমার ইচ্ছামত ইংরাজি পড়্‌ব মনে করেছিলুম. কিন্তু বই নিয়ে বেশীক্ষণ বস্‌লে মা পাছে অসন্তুষ্ট হন সেই ভাবনা হয়। তাই আপাতত গৃহস্থালির কাজকর্ম্মেই সমস্ত সময়টা দিচ্ছি। বিনা কারণে পড়াশুনো কর্‌চি না আশা করি এ কথা ভাব্‌বেনা। লিখ্‌তে লজ্জা করে. কিন্তু সময় সময় যখন খুব দুঃখ হয়. বড় একলা বোধ হয়, তখন তোমায় দেখতে এত ইচ্ছা হয় যে মনে হয় পাখীর মত ডানা থাকলে তখনি তোমার কাছে উড়ে যাই। তোমার আর তোমার জাহাজের ছবিই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা। ইস্কুলে পড়বার সময় সাধারণ ভুগোলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই নি কিন্তু এখন—একখানা কত-কালের জীর্ণ, বিস্মৃত মানচিত্র বার করে তা'তে তোমার জাহাজের গম্যপথটি বার কর্‌তে কত আনন্দ হয়। কখন কখন আমার মনে হয় আমি যদি পুরুষ হতুম, আর নাবিক হতুম তা'হলে সকল সমুদ্রযাত্রাতেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌তুম। প্রিয়তম, আমার দুর্ব্বল চিত্তের প্রতি দয় কোরো; আমার সকল চিন্তা তোমারই জন্যে। খবরের কাগজে এত দিন বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধীয় বিবরণ পড়্‌তুম না, কিন্তু এখন রোজ পড়ি: আমি জানি তোমার জাহাজ যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার বায়ুর অবস্থা এরূপ নয়. কিন্তু তবুও যখনি ঝড়ের সম্ভাবনা দেখি তখন তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়। খুব সাবধানে থেকো।

'তোমার স্নেহের পত্নী

"নামি"

"তোকিও. অক্টোবর——

"প্রিয়তম তাকেও.

প্রতি রাত্রেই স্বপ্ন তোমায় দেখে তোমার দেখবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়েছে। গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি 'ফার্ণ' সংগ্রহ করবার জন্যে জাহাজে চড়ে তোমার সঙ্গে ইকাও গেছি.—সেখানে কে যেন আমাদের মধ্যে এল,—তুমি যেন দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ, ঠিক এমনি সময়ে আমি জলে পড়ে গেলুম। আমি চীৎকার করে ওঠাতে মা আমায় জাগিয়ে দিলেন। যখন বুঝলুম এটা স্বপ্ন. তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু তবুও কিসে যেন আমায় যাতনা দিচ্ছে। তুমি শীগ্‌গির ফিরে এস. তোমার জন্য আমি কত ভাবচি। নিজের মুখে তোমায় সব কথা বল্‌ব মনে করে তুমি যে দিক থেকে আসছ প্রতিদিন সেই পূর্ব্বাকাশের দিকে দেখি। হয়ত রাস্তায় চিঠিখানা তোমার অতিক্রম করে যাবে. কিন্তু আমি এখানা হনোলুলুতে পাঠাচ্ছি।

তোমার স্নেহের পত্নী।

"নামি।"

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীহেমনলিনী রায়।

জিঞ্জিরা

জিঞ্জিরা একটি ক্ষুদ্র জনপদ। বুড়িগঙ্গা নদী ঢাকা ও জিঞ্জিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। জিঞ্জিরার প্রাসাদ শা সুজা নির্ম্মিত, বড় কাটরার বিপরীত দিকে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। জিঞ্জিরা ও ঢাকায় যাতায়াতের জন্য বড় কাটরার নিকটে বুড়িগঙ্গার বক্ষোপরি এক ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু নবাবী আমলে বিদ্যমান ছিল। উহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ঢাকা নগরী হইতে জনসাধারণ যেন নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত জিঞ্জিরা ও অন্যান্যস্থানে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল (১)। বর্ত্তমান সময়ে জিঞ্জিরায় দর্শনীয় তেমন কিছুই নাই বলিলেও চলে। নবাব নির্ম্মিত প্রাসাদের ভগ্নস্তুপ এবং একটি ভগ্ন চূড় অট্টালিকার অংশ মাত্র নয়নপথে পতিত হইয়া অতীতের বিষাদস্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়। ডাক্তার টেইলার তদীয় টপোগ্রাফি অব ঢাকা গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে জিঞ্জিরার প্রাসাদ নির্ম্মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছন (২)।

জিঞ্জিরার রাজপ্রাসাদের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের বিষাদস্মৃতি ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। এক সময়ে এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষ হইতে সরফরাজ-সওকতজঙ্গ-হোসেনকুলি-আলিবর্দ্দি-সিরাজের পুরমহিলা ও বংশধরগণের ব্যথিত হৃদয়ের তপ্তশ্বাস এবং তাহাদিগের ক্রন্দনের অস্ফুট রোল বহির্গত হইত। এই মূক প্রাসাদের প্রাচীর ও প্রতি ইষ্টক খণ্ড উহাদিগের গভীর মর্ম্ম বেদনার চির সহচর রূপে বিরাজমান ছিল। পিতার জীবদ্দশায় যে প্রতিদ্বন্দী ঘেশেটি বেগম ও আমিনা বেগমের গর্ব্বোন্নত গ্রীবার ঈষৎ-আন্দোলনে শত শত অনুচর বর্গ কৃতার্থম্মন্য হইয়া অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালন জন্য ব্যস্ত হইত, অদৃষ্ট নেমীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে তাহাদের উভয়ের ভাগ্যসূত্র একত্র গ্রথিত হইয়া এই প্রাসাদের এক প্রান্তে উভয়েই বিষাদক্লিষ্ট বদনে ক্ষুণ্ণমনে কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মতিঝিলের সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকার নানাবিধ বিলাস ব্যসনামোদের মধ্যে অবস্থান যাহার পক্ষে শোভনীয়, জিঞ্জিরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্দী অবস্থায় কাল যাপন করা তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর অধিক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম আজ পর্য্যন্তও সর্ব্ব সাধারণের নিকটে নানাবিধ প্রবাদবাক্যের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যাহার তর্জ্জনী তাড়নায় এক সময়ে ইংরেজ বনিকদলকেও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাঁহার জননী, প্রিয়তমা মহিষী ও শিশুতনয়া যে সময়ে বুড়িগঙ্গাতীরে তরণী হইতে অবতরণ করিয়া মীরণের বন্দীরূপে জিঞ্জিরার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, সেই সকরুণ দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য বহুলোক নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

প্রতিপালক প্রভুপুত্রের শোণিতপাত দ্বারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আলিবর্দ্দি, কতিপয় দিবসমধ্যে সরফরাজের বেগম ও তদীয় পরিবারস্থ অপরাপর পুরাঙ্গনাগণের সহিত সরফরাজনন্দন হাফেজালি খাঁকে এই প্রাসাদ মধ্যেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরফরাজের বংশধরগণকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে আলিবর্দ্দির পাপলব্ধ সিংহাসন সুদৃঢ় এবং কণ্টকপরিশূন্য হয় এই বিবেচনায়ই দূরদর্শী নবাব উহাদিগকে রাজধানীর নিকটে রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু উঁহারা যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ঢাকার তদানীন্তন নায়েব নাজিমের প্রতি আদেশ প্রদান

(১) Khan Bahadur Syed Aulad Hussein's Antiquities of Dacca & Tarikhi- Dacca.

(২) "On the opposite side of the river there is an old building surrounded by a Moat, which is said to have been built by the Nawab Ibrahim khan". Dr Taylor's Topography of Dacca page 91.

করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। নবাব সিরাজদ্দৌলা বঙ্গের মসনদে আরোহণ করিয়া সওকৎজঙ্গ ও হোসেন কুলিখাঁর পরিবারবর্গকেও এই স্থানেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। পলাসীর রণাভিনয়ের পরে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের হস্তে বন্দী হইয়া সিরাজ প্রসূতি ও সিরাজের শিশুকন্যা এবং বেগম প্রভৃতিও এই স্থানেই আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব পরিবার বর্গের বিষাদ-স্মৃতি বহুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষণ করিয়া আজ জিঞ্জিরা একটী ক্ষুদ্র নগন্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শোকভারাক্রান্ত জিঞ্জিরা নবাব পরিবার বর্গের শ্মশান ভূমি, ঐতিহাসিকের পক্ষে পুণ্যক্ষেত্র ও পীঠস্থানের অন্যতম একটী।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাসীর যুদ্ধের অবসান হইলে ক্লাইব সেনাপতি মীরজাফরকে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলিবর্দ্দির সময় হইতে মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষকাল মধ্যে সরফরাজের পুত্রদ্বয় মধ্যে কোন অশান্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল না। অতি দীন ভাবেই তাহারা জিঞ্জিরার প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি মীরজাফর সুস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে পারিলেন না। মসনদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি সরফরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেজালিকে ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। হাফেজ মুরশিদাবাদে আগমন করিয়া একরূপ বন্দীভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ক্লাইবের নিকটে যে দীনতা ও স্বীয় হীনাবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অতি বিনীত ভাষায় এক সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া মীরজাফর অনেক পরিমাণে সুস্থ হইলেন। কিন্তু সরফরাজের দ্বিতীয় তনয় আমানী খাঁর চরিত্র তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক উপাদানে গঠিত। তিনি স্বভাবতঃই কিছু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী। অথবা দীর্ঘকাল ব্যাপী নৈরাশ্যই তাহাকে শত বিপৎপাতেও নির্ভীক এবং সহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল (১)। যখন দেখিলেন যে এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল মধ্যেও তিনি অদৃষ্টলক্ষ্মীর প্রসাদকণিকা লাভে সমর্থ হইলেন না, বরং উত্তরোত্তর নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি মনে করিলেন, একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাউক, দেখি কি হয়।

এদিকে মীরজাফরের দারুণ অর্থশোষে ঢাকার রাজকোষও একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। এমন কি সাম্রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহই কষ্টকর বিবেচনায় কেবল মাত্র দ্বিশত সংখ্যক সৈন্য ঢাকার লালবাগ দুর্গে রক্ষিত হইল। যাহারা রহিল তাহাদিগকেও অতি সামান্য মাত্র বেতন প্রদান করা হইত, সুতরাং সৈন্যগণের আর উৎসাহ ও উদ্যম রহল না। সুশিক্ষিত এবং কার্য্যদক্ষ প্রধান লোকও ঢাকার সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে রহিল না। এই সমুদয় সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা আমানী খাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর প্ররোচনায় ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি নবাব জেসারৎ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া লালবাগের দুর্গ অধিকার করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। জেসারৎ খাঁকে নিহত করিতে পারিলেই অন্ততঃ ঢাকার নবাবী পদ তাঁহারই প্রাপ্য হইবে আমানী খাঁ এই অমূলক দুরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২২ শে অক্টোবর তারিখে অতি সঙ্গোপনে জিঞ্জিরার বন্দিশালা হইতে বহির্গত হইয়া লালবাগের দুর্গ আক্রমণ করিবেন ইহাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু আমানী খাঁর প্রতি বিধাতা নিশ্চিতই বিরূপ। নির্দ্দিষ্ট দিবসের দুইদিন পূর্ব্বে আমানী খাঁর বিশ্বাসঘাতক জনৈক অনুচর জেসারৎ খাঁর নিকটে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া ফেলে। জেসারৎ খাঁ তৎক্ষণাৎ কতিপয় সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক আমানী খাঁ এবং তদীয় কতিপয় অনুচরকে ধৃত করিয়া, তাহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই সময়ে ঢাকার ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ ৬০ জন সৈনিক পুরুষ দ্বারা নবাব জেসারৎ খাঁর সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকার এই বিদ্রোহ ব্যাপারে

(১) Beveridge's History of India.

মীরজাফরের মনের অশান্তি আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। *

মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাহার নিষ্ঠুর চরিত্র ও অসংখ্য নরহত্যাপরাধের বিষয় উল্লেখ করিলেও সমসাময়িক জনৈক গ্রন্থকার এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন (১)। বস্তুতঃ তিনি যে নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মীরণের যথেচ্ছাচারিতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের উপযুক্ত শাসন না করায়, জনসাধারণ মীরজাফরকেও মীরণের কার্য্যকলাপে সহাকারীই ভাবিত। এমন কি ১৭৬০ খৃঃ অব্দের (২) জুন মাসের এক গভীর নিশীথে ঢাকায় যে নৃশংস হত্যাকার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতেও অনেকে মীরজাফরকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন (৩)। কিন্তু মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন মীরণের আদেশক্রমেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আলিবর্দ্দি-মহিষী ও তদীয় কন্যাদ্বয় (ঘেসেটী বেগম ও আমিনা বেগম); সিরাজ মহিষী সুফিন্নেছা বেগম ও তাহার শিশু কন্যাগণ; লুৎফেন্নেছা বেগম ও তদীয় শিশু কন্যা এবং নওয়াজিসের পালক পুত্র (পাদশা কুলী খাঁর পুত্র) মোরাদদ্দৌলা মীরজাফরের আদেশক্রমে জিঞ্জিরায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন (৪)। উহাদিগকে বধ করিতে পারিলেই সিংহাসন কণ্টক পরিশূন্য হয় ইহা বিবেচনা করিয়া কূটনীতিবিশারদ নিষ্ঠুর মীরণ ঢাকার নায়েব নাজিম জেসারৎ খাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন (৫)।

জেসারৎ খাঁ অতি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন; মীরণের এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। অনন্তর সংবাদবাহককে স্বয়ংই এই কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কারণ, মীরণই তাহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন যে, যদি জেসারৎ খাঁ আদেশ প্রতিপালন করিতে ইতস্ততঃ করেন, তবে যেন সে স্বয়ং এই কার্য্য সম্পন্ন করে। সংবাদবাহক এক গভীর নিশীথে মুরশিদাবাদে লইয়া যাইবার ছল করিয়া নওয়াজিস মহিষী ঘেসেটী বেগম, সিরাজ জননী আমিনা বেগম, নওয়াজিসের ভাবি উত্তরাধিকারী মৃত একরামউদ্দৌলার শিশু পুত্র মুরাদদৌলা, সিরাজবেগম সুফিন্নেছা এবং সিরাজের শিশু কন্যা (সুফিন্নেছার গর্ভজাত) এই প্রাণী পঞ্চককে জিঞ্জিরার প্রাসাদ হইতে নৌকাযোগে খরস্রোতা ধলেশ্বরী বক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক ৭০ জন অনুচরবর্গ সহ জলমগ্ন করিয়া দেয় (৬)। এইরূপে আলিবর্দ্দি, নওয়াজিস ও সিরাজের বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

হোসেন কুলি ও সরফরাজের বংশধরগণ কোম্পানীর হস্তে দেওয়ানীভার অর্পিত হওয়ার পরেও বন্দী ভাবে জিঞ্জিরার প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিলেন (৭)। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্লাইব তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন এবং বার্ষিক মং ৩৪ ৭৫৫৲ টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। টেইলার সাহেব যে সময়ে ঢাকার ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তখনও উহাদের বংশধরগণ ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন (৮)।

---

* See Orme's Industhan Vol II, P. 270—271.

(১) Transactions in India from 1756—83. London 1784 (Debret) Pp. 38—39.

(২) "The last day of Sheval, or the first of Zilcaad, in the year 1173 the Hegira" Translation of the Seir Mutaqherin, Vol II. Pp. 371.

(৩) See Orme's Industhan Vol II. Pp. & Selections from the unpublished Records of Govt; 478. Causes of the Deposition of Mirjaffer.

(৪) Translation of Seir Mutaqherin Vol II. & Long's unpublished Records.

(৫) Seir mutoqherin Vol II. Pp. 368.

(৬) Long's selections from the Records of Govt of India. (৭) Dr. Taylor's Topogr aphy of Dacca. (৮). Ibid.

ঢাকার নিজামত হইতেই উহারা মাসহরা প্রাপ্ত হইতেন। নিম্নে জিঞ্জিরার রাজপ্রাসাদস্থিত বন্দী বর্গের পরিচয় প্রভৃতি প্রদত্ত হইল (১)।

	বন্দীগণের নাম	পরিচয়	কোন সনে বন্দী হয়	কাহা কর্ত্তৃক বন্দী	মাসহারা।
১।	হাফেজউল্লা	সরফরাজ খাঁর তনয়	১৭৪৪	আলিবর্দ্দি খাঁ	১০০৲
২।	...	হাফেজউল্লার জননী	,, ...	,, ...	২০৲
৩।	...	হাফেজউল্লার ভগ্নি	,, ...	,, ...	৫০.
৪।	মুদরেণা বেগম	হাফেজউল্লার তনয়া	,, ...	,, ...	১৫৲
৫।	ভালুবেগম	হাফেজউল্লার মহিষী	,, ...	,, ...	৫০৲
৬।	শুকুরুল্লা খাঁ	সরফরাজের অন্যতম তনয়	,, ...	,, ...	৫৮০৲
৭।	মির্জা মোগল	ঐ ...	,, ...	,, ...	৮০৲
৮।	...	মির্জামোগল জননী	,, ...	,, ...	২০৲
৯।	মীর জুই	সরফরাজের অন্যতম পুত্র	,, ...	,, ...	৮০৲
১০।	...	ঐ মাতা	,, ...	,, ...	২০৲
১১।	মীর্জা বুর হেণ	সরফরাজের অন্যতম পুত্র	, ...	,, ...	৮০৲
১২।	...	ঐ মাতা	,, ...	,, ...	২০৲
১৩।	... ...	ঐ ভগ্নী	,, ...	,, ...	৩০৲
১৪।১৫।	...	আগামীর্জ্জার জননী ও সরফ রাজের জনৈক পুত্র	,, ...	,, ...	২০৲
১৬।	...	আগামীর্জ্জার স্ত্রী	,, ...	,, .	৮০৲
১৭।	মীর আসাদ	সরফরাজের জামাতা	,, ...	,, ...	৮০৲
১৮।	নাজিবুলন্নেছা	মির আসাদের দুহিতা	,, ...	,, ...	২৫৲
১৯।	কারসোমনন্নেছা	ঐ ...	,, ...	,, ...	২৫৲
২০।	মতি বেগম	সরফরাজনন্দিনী ...	,, ...	,, ...	৫০৲
২১।	আসিজ বেগম	ঐ ...	,, ...	,, ...	৫০৲
২২।	মোতিম বেগম	ঐ ...	,, ...	,, ...	৩০৲
২৩।	বিবি উকিয়ৎ	সরফ রাজের স্ত্রী ...	,, ...	,, ...	২০৲
২৪।	...	সরফরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র শুজন্কা হোসেনখাঁর মাতা	,, ...	,, ...	২০৲
২৫।	সাঁললি বেগম	শুজনকা হোসেনখাঁর স্ত্রী	,, ...	,, ...	১৮০৲
২৬।	জেনারৎ দাস	সকৎ জঙ্গের পুত্র	১৭৫৫ ...	সিরাজদ্দৌলা ...	১০০৲
২৭।	সৈয়দ্দীনমহম্মদ খাঁ	,,	,, ...	,, ...	১০০৲
২৮।	মির্জা জুব্বা	,,	,, ...	,, ...	৮০৲

(১) Long's Selections from the unpublished Records no 970. Dacca Expenditure.

বন্দীগণের নাম।	পরিচয়	কোন সনে বন্দী হয়	কাহা কর্ত্তৃক বন্দী	মাসহারা
২৯। মির্জা মেগলু	„	„ ...	„ ...	৮০৲
৩০। মির্জা ভোলা	„	„ ...	„ ...	৮০৲
৩১। বুন্নিবেগম	সকৎজঙ্গ দুহিতা	„ ...	„ ...	৬০৲
৩২। বুন্নিজি	হোসেনকুলিখাঁর স্ত্রী	১৭৫৬ ...	„ ...	১০০৲
৩৩। উজমন্নেছা	ঐ	„ ...	„ ...	৩৬০৲
৩৪। সাহেবজী	সকৎজঙ্গমহিষী	„ ...	„ ...	৯০০৲
৩৫। সীতারাম উকীল	সরাইএর জনৈক খোজার প্রতিভূ	„ ...	„ ...	১৫৲
৩৬। উমুজুলন্নেছা	সিরাজদ্দৌলার কন্যা	১৭৫৭ ...	মিরজাফর ...	৫০০৲
৩৭। লুৎফুলন্নেছা	ঐ	„ ...	„ ...	১০০৲

(লুৎফুলন্নেছা ও লুৎফন্নেছা স্বতন্ত্র দুইজন ছিলেন।)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

———(০)———

শেষ কথা

শেষ কথাটি যাইব লিখে।
মন্ত্র কব কানে কানে
আমার দুঃখিনী এ পৃথিবীকে।
যখন আমার মৃত্যু হবে,
প্রভাত-রবি উঠ্‌বে নভে,
বিহঙ্গেরি শুভ্র রবে
জাগ্‌বে ধরা দিকে দিকে,—
রবির বুকে আমার কথা
ভাঙ্গবে নিশা-নীরবতা,
শুভ্র, নব উজ্জ্বলতা
খুলবে বদ্ধ আকাশটিকে!
নয় সে বেদ নয় পুরাণ,
নয় সে কাব্য প্রাণ জুড়ান,
দেশ বিদেশে নয় কুড়ান,
মনে রাখিনি, তা শিখে শিখে।
কোন্ কথাটি জানি না সে,
আত্মা মাঝে পরকাশে,
নিদ্রা-ঘোরে স্বপ্ন-ভাবে
পাই যেন সে সত্যটিকে!
নবীন উষার দীপ্তালোকে
লিখ্‌ব তাহা অরুণ বুকে,—
উদ্বোধিব নরলোকে
অক্ষরময়ী ভারতীকে।
প্রাণের কথা লিখার আগে
দংশে যদি মৃত্যু-নাগে,
ফিরে, পূজ্‌ব নব অনুরাগে
জন্মভূমি জননীকে।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

মরীচিকা।

(১)

যুথিকার পিতা কলিকাতার এক সওদাগরি আপিসে অল্প বেতনে কেরাণীর কাষ করিতেন। যে গলির মুখে তাদের বাড়ী, ঠিক তার পাশেই হিমাংশুদের বাড়ী।

হিমাংশুর পিতা পুলিশ কোর্টের উকীল। হিমাংশু কলেজে পড়ে। যূথিকা নভেলের নায়িকা হওয়ার উপযুক্ত রূপসী ত নয়ই, মাসিক কাগজের ছোট গল্পের চলন-সই রকমের নায়িকা হওয়ার যোগ্য পাত্রী কি না সে বিষয়েও বিস্তর মতদ্বৈধ ছিল। অতি সংক্ষেপে তার রূপের বর্ণনা শেষ করিয়া দিতে হইলে এইমাত্র বলা যায় যে, তার চেহারার মধ্যে এমন একটা কোমলতা ছিল, যা' দেখিলে খালি মনে হয়,—আহা! আবো এক বার দেখি! সমস্ত শিশুকাল ধরিয়া হিমাংশু ও যূথিকাতে অবাধ দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া আসিতেছে। শৈশবের সঙ্কোচহীন আনন্দ-ধারায় তারা দু'জনে এক সঙ্গে কত দিন কত কাগজের নৌকা ভাসাইয়া খেলা করিয়াছে। হিমাংশু যূথিকার অনধিগম্য পরী-রাজ্য হইতে অনেক উদ্ভট সংবাদ আহরণ করিয়া দিয়াছে, সে সমুদয় খবর স্বয়ং বেরণ রয়টারও জানেন না। যূথিকাও তার কাকা বাবুর টিয়া পাখীটার শেখা-বুলিগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, "তার সর্ব্ব সত্ব রক্ষিত" পেটেন্ট নিগূঢ়তাটা চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া নিজের খাস তহবিল হইতেও হিমাংশুকে আনন্দ বিতরণ করিতে কোন দিনও কসুর করে নাই। অথচ, এই অবাধ মিলা-মিশার মধ্যে কোথাও কোনও দিন গোল বাঁধে নাই। কারণ, যে অশরীরী দেবতা হৃদয়ে হৃদয়ে ফুল-ধনুর সাঁকো বাঁধিয়া, আকাশে, বাতাসে, তারায় চাঁদে অনাসৃষ্টি জুড়িয়া খেলা করিতে ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে তাদের তখনো দেখা হয় নাই।

এক দিন ফাল্গুনের শেষ রাত্রিতে হিমাংশু স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়া একেবারে বিছানায় বসিয়া পড়িল। কেরোসিনের বাতির শিখাটি খুব নীচু করিয়া দেওয়াতে, দেয়ালের নীচের অংশটাতে আলো খুব ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; আর উপরের অংশ অন্ধকার; দীপ-শিখার কম্পনে কম্পনে, চারিদিকের দেয়ালে নিঃশব্দ নূপুরে নৃত্য করিতেছে,। খোলা জানালা দিয়া দক্ষিণের মৃদু বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া হিমাংশুর বালিসের ঝালর চুম্বন করিতেই তার স্বপ্ন মণ্ডিত শয্যার মদির-স্পর্শে যেন একেবারে অবশ হইয়া পড়িতেছিল। জ্যোৎস্না তখন বাল-বিধবার চির-বিরহিত কপোলের মত ম্লান—বাহিরের জগৎটাও যেন কুহেলীমাখা প্লাবন জ্যোৎস্নার মাঝে নূতন কবির অস্ফুট কল্পনার সহিত জড়িত হইয়া গিয়া, খানিকটা সত্য, বাকীটা অসত্য হইয়া উঠিয়াছে।

হিমাংশু উঠিয়া বসিয়া রহিল; বাকী রাতটা তাকে বসিয়াই কাটাইতে হইল। ঘুম-ঘোরে আজ যে মধুর স্বপ্ন তাহাকে দেখা দিয়াছে, জাগিয়াও যেন সে আজ সেই স্বপ্নই দেখিতে লাগিল। তার বারে বারে মনে হইতে লাগিল, যেন আজ তার স্বপ্নের সঙ্গে জ্যোৎস্না কেমন জড়াইয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না যেন ফুল-রেণুতে ভার হইয়া উঠিয়াছে। কোকিলের মত ঝঙ্কার আজ দিগন্ত প্লাবিত করিয়া কোন অকূলের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হিমাংশুর বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতে লাগিল সে যেন কারে ভালবাসে! সে যেন জন্মজন্মান্তরের অনাদি অনন্ত ভালবাসা। যেমন করিয়া ঘুঘুর ক্রন্দন, চাতকের তৃষ্ণা, পাতা ঘেরা ছায়া-শীতল নীড়ের ডিমগুলির মাঝে ঘুমাইয়া থাকে, তার ভালবাসাও যেন এত দিন কি এক রহস্যের নীড়ে লুপ্ত ছিল! আজ এক অদৃশ্য দেবতা ঘুম ঘোরে আসিয়া তার লুপ্ত সঙ্গীকে মুখরিত করিয়া দিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতি যেন আজ তার সেই রাগিণীর সুরে বাঁধা! হিমাংশু হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে অনুভব করিল, সে ভালবাসে! এ স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, সে যেন সত্য সত্যই ভালবাসে! কিন্তু কাহাকে?—তার হৃদয় লক্ষ্মী কে?

সহসা প্রতিধ্বনির নিকট হিমাংশু এ প্রশ্নের কোনও জবাব পাইল না। নিজের নাভিতে মৃগমদ রাখিয়া গন্ধে পাগল হইয়া, তাহারই সন্ধানে কস্তুরী মৃগ যেমন সারা বনভূমিতে ছুটাছুটি করে, হিমাংশুও সেইরূপ "কাহাকে" "কাহাকে" বলিয়া বাকী রাতটা অন্তরের আনন্দ-তরল মত্ততার মাঝে আপন হৃদয় লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া ফিরিল। অবশেষে প্রভাতে যখন নিশীথের মূর্ত্তিহীন ছায়া-জগৎ নূতন আলোকে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিল, তখন হিমাংশু

দেখিল তার হৃদয়ের নায়িকা উষার শিশির-সিক্ত সজল কিরণে পুণ্য-স্নান করিয়া, মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে, সে যূথিকা!

প্রেম-যুদ্ধে—যঃ পলায়তে, স জীবতি। হিমাংশু সে নীতি জানিত না। তাই সে স্বেচ্ছায় আপনার জালে আপনি বন্দী হইল।

মেঘের গর্জ্জনে বৈদূর্য্য মণির রত্ন-শলাকা যেমন ভূমিতল হইতে ফাটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ হিমাংশুর প্রেম-বিহ্বল হৃদয়ের সাড়া পাইয়া যূথিকাও তার সমুদয় হৃদয় খানিকে পুষ্পাঞ্জলির মত তার প্রণয় দেবতার মুখে, চক্ষে, বক্ষে, চরণতলে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। ইহাই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, ইহাই পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। প্রেমে যদি এত মোহ না থাকিত, তবে বুঝি এ পৃথিবী এমন সুন্দর হইত না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সারা আকাশটা সাদা মেঘের একখানি উজ্জ্বল বাষ্প-স্তরে ঢাকা। রৌদ্রের কিরণ লাগিয়া তাহা গালা চাঁদির মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। সহুরে কাক, পাড়ার দুষ্টু ছেলে—এমন কি ফেরিওয়ালার অদম্য উৎসাহ পর্য্যন্ত যেন আজ দুপুরের রোদে তাতিয়া উঠিয়া সর্ব্বশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যূথিকাদের বাড়ীর সকলে কালীঘাটে গিয়াছেন। যূথিকার কালীঘাট যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন তার তীর্থ নিজ অন্তরের মাঝে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে! "বড্ড গা বমি বমি কচ্চে" এই মিছা সাক্ষী দিয়া সে এ যাত্রা কালীঘাটে যাওয়ার দায় হইতে খালাস পাইল। হিমাংশু আজ সারাটা প্রাতঃকাল ধরিয়া একটা মতলব আঁটিয়াছে। আজ দৈব স্বয়ং "লাইন ক্লিয়ার" দিয়া তার মতলবের প্রতিকূল সমুদয় বিঘ্ন একেবারে কালীঘাট নিয়া ফেলিয়াছেন।

এমন সময় ভগবান মীনকেতু তাঁর প্রেমের ধনুকে পঞ্চ ফুলের বাণ আরোপিত করিলেন; তাই হিমাংশু মাথায় তেল মাখিতে মাখিতে তাদের ছাদে আসিয়া উপস্থিত; যূথিকাও ছোট খোকার একটা পেনি শুকাইতে দিবার জন্য তাদের ছাদে আসিয়া হাজির। নেপথ্য হইতে দেবতা ফুল-শর ত্যাগ করিলেন, অমনি চারি চক্ষে মিলন হইল। হিমাংশু মুগ্ধের মত যূথিকাকে হাতের ইসারায় কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল, যূথিকাও তপোবনের মৃগীটির মত মদিরায়ত নয়নে তাদের ছাদের আলিসার কাছে, হিমাংশুর দিকে অগ্রসর হইল। দুজনে মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান সূর্য্যদেব সাক্ষী! আবার চারি চক্ষের মিলন হইল। নীল চুলের ঢেউয়ের মাঝে যূথিকার তখনকার মুখখানি দেখিলে যমুনায় ভেসে-যাওয়া রক্তপদ্মের কথা মনে পড়ে—লজ্জায় যেন দুই গালে দুটি পার্ব্বত্য ডালিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিমাংশু ধীরে ধীরে প্রাণ ভরা গাঢ় স্বরে ডাকিল—"যূথি!" অনন্ত আকাশের উদারতা তখন হিমাংশুর মুগ্ধ নয়নে মাখানো! তার যা কিছু বলিবার, যা কিছু দিবার, যা কিছু চাহিবার সব যেন ঐ ডাকের ভিতরে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যূথিকা চুপ করিয়া রহিল। এমন ডাকের উত্তর কি আছে? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর হিমাংশু কয়েক বার ঢোক গিলিয়া বলিল—"তুমি যদি বল, তবে কথাটা তোমার বাবার কাছে পাড়ি!" কোন কথা, হিমাংশু তাহা ভাঙ্গিয়া বলে নাই। ভাঙ্গিয়া বলার তত আবশ্যকও ছিল না। হিমাংশু আবার বলিল, "আমি কিন্তু সে দিন সত্যি সত্যি স্বপ্নে দেখেচি তোমাতে আমাতে বে' হ'য়ে গেছে।" আপন লজ্জার মাঝে "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় দাঁড়াইয়া যূথিকা কেবল বারে বারে লাল হইতেছিল, এমন সময় দৈব তাহার প্রতি অনুকূল হইলেন। কালীঘাটের ফেরতা গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি যূথিকা বলিয়া উঠিল, "ঐ যা মা বৌ-দিদি সবাই এসে পড়েছে যে, আমি যাই এখন?" এই বলিয়াই প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পীঠের উপর নীল চুলের তরঙ্গ তুলিয়া যূথিকা ছুটিয়া পালাইল।

হিমাংশু ধীরে ধীরে গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে নবীন বিজয়ী সেনাপতির মত নীচে নামিয়া গেল—সে যেন ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

কলিকাতা সহরে যদি ছাদে যাবার সিড়ী না থাকিত তবে না জানি কচি প্রেমের কি দুর্গতিই ঘটিত!

হিমাংশু ঘরে আসিয়া ভাবিল মনসিজের আসল ব্যাপার খানা যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল, তাহাতে প্রজাপতি ঠাকুর যে কোন গোল পাকাইয়া তুলিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও তার মনে উদয় হইল না! সে এবার মেডিকেল কলেজের ফাইনেল পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। আর ছয় সপ্তাহ কাল পরেই পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। এল. এম. এস উপাধির লেজ লাগাইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়া যূথিকার জন্য তাহার পিতার নিকট আবেদন করিলে, তিনি তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিবেন না, এমনি মনে হইল।

হিমাংশুর কাকা বাঁকীপুরের উকীল। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট হইতে বাঁকীপুর যাওয়ার নিমন্ত্রণ আসিল। এক দিন তারকালোকিত সন্ধ্যায় যূথিকার নিকট ছাদে সাত দিনের "কেস্যুয়েল লিভ" লইয়া. হিমাংশু বাঁকীপুর রওনা হইয়া গেল।

অপ্রত্যাশিতের হাত কেহ এড়াইতে পারে না। বাঁকীপুরে পাঁচ দিন যাইতে না যাইতেই হিমাংশুর কাকা জ্বরে পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে ডবল নিউমোনিয়া দেখা দিল। তাঁহাকে আরাম না করিয়া ত আর হিমাংশু চলিয়া আসিতে পারে না, বিশেষতঃ সে নিজে যখন একজন ডাক্তার। তাঁর ভাল করিয়া সারিতে ছয় সপ্তাহ পার হইয়া গেল।

এক দিন বিকাল বেলায় হিমাংশু কাকা বাবুর ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া আশার ফুলে বিনা সূতার হার গাঁথিতে ছিল, স্বপ্ন-লক্ষ্মীর জন্য। এমন সময় ডাকে সে মায়ের চিঠি পাইল। সে ত চিঠি নয়, সে যেন তার মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট! পত্রের শেষ ভাগে মা এক যায়গায় দুই লাইনে লিখিয়াছেন যে, গত পরশু রাত্রিতে যূথিকার সহিত স্থূলকায় এবং ততোধিক স্থূলবুদ্ধি এক জমিদারের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে!

মুহূর্ত্তের ভূমিকম্পে তার বড় সাধের মিণার ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে তারে খবর আসিল হিমাংশু এল, এম এস পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত পাশ হইয়াছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

ইতিহাস-বিজ্ঞান এবং মানব জাতির আশা *

বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম. এ. প্রণীত. লঙ্‌ম্যানস্, গ্রীন কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তিকা খানা ইংরেজী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের অন্যতম পুস্তক 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধে' এই পুস্তিকার এক বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনয় বাবু সকলের নিকটই সুপরিচিত। তাঁহার উদ্যমশীলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি শিক্ষার উন্নতি বিধান কল্পে সারা জীবন ব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তাহার ফলে 'শিক্ষা-বিজ্ঞান' নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের যেরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এক জনের দ্বারা এরূপ বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই উহার দশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আমাদের সমস্ত আশঙ্কাদি দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখানেই তাঁহার উদ্যম শীলতার শেষ হয় নাই। তিনি আবার বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টিবিধানরূপ অপর এক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ঐ কার্য্য সম্পাদন দেশের সকলের সাহায্য সাপেক্ষ। কিন্তু তথাপি তিনি যখন উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন ভরসা হয় ঐ কার্য্যও উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হইবে। আলোচ্য গ্রন্থ ও 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ'

---

* The Science of History and the Hope of Mankind by Benoy kumer Sarkar M. A. Longmans Green & Co.

তাহার উদ্যমশীলতার অন্যতম নিদর্শন। বাঙ্গালীর এরূপ উদ্যমশীলতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

আজকাল ইতিহাস রচনার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতি মধ্যেই মৌলিক গবেষণা পূর্ণ কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত ইতিহাস বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এ অবস্থায় বিনয় বাবুর এই উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল গ্রন্থ যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক শাখা স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা একত্র আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে কতকগুলি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারে তদ্রূপ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা একত্রে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতেও কতকগুলি মূলসূত্র নিষ্কাশিত হইতে পারে, ইহাই ইতিহাসবিজ্ঞানের কার্য্য। ইতিহাসকে সমগ্র ভাবে আলোচনা না করিলে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ইতিহাসবিজ্ঞান রচনা করিতে হইলে ইতিহাসের প্রত্যেক শাখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না করিয়া ইতিহাসকে সমগ্রভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

কিন্তু ইতিহাসকে নানাদিক হইতে সমগ্র ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কর্তৃক দর্শন শাস্ত্রের দিক হইতে ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। বিনয় বাবু প্রাণ-বিজ্ঞানের দিক হইতে ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসবিজ্ঞান উভয়েরই ভিত্তি প্রাণ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসকে প্রাণ-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করিলেই ইতিহাস আলোচনা হইতে আমরা মানবের উন্নতির সহিত সমাজের অভিব্যক্তি এবং সভ্যতার ক্রম বিকাশ সম্পর্কীয় মূলসূত্র গুলি লাভ করিতে পারিব।

এই খানেই গ্রন্থের অভিনবত্ব। এই অভিনব প্রণালীতে ইতিহাস আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ কোন এক জাতির উন্নতি বা অবনতি বা কোন কার্য্য কেবল মাত্র সেই জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে না, উহা জগতের অন্যান্য জাতির সর্ব্ববিধ আন্দোলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ দ্বারা প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপ পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় চরিত্রের সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ, মানব সমাজের বা চরিত্রের এই সমস্ত অভিব্যক্তির আকার ও অন্তর্নিহিত ভাব স্থায়ী নহে, পরিবর্ত্তনশীল। জগতের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত উহাদের পরিবর্ত্তন হয়। পরিশেষে গ্রন্থকার বলেন যে, পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তি সমূহই এবং বিভিন্ন জাতিগুলির পরস্পর সংঘর্ষণই প্রত্যেক জাতির চরিত্র গঠন করিয়া দিলেও জাতীয় জীবন গঠনে পুরুষকারের স্থান আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলিকে স্ব স্ব জাতীয় জীবনের অনুকূল করিয়া জাতীয় জীবনের অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। এইপ্রকার মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় বলিয়াই মানব জাতির নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ার কোন কারণ নাই। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারের আলোচনাপ্রণালী নূতন হইলেও তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই যে একেবারে নূতন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের যেন মনে হয় যে, প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। জাতীয় জীবন গঠনে মহাপুরুষের স্থান সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত প্রাণ-বিজ্ঞানের যে সম্বন্ধ নাই তাহা আলোচ্য গ্রন্থেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কারণ,

নবম অধ্যায়ের প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মানব-সমাজের সহিত ইতর জীবের একটা পার্থক্য আছে। পারিপার্শ্বিক প্রভৃতির প্রভাবে জীব গঠিত ও পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার ও তাহা পরিবর্তন করিয়া লইবার ক্ষমতা একমাত্র মানবেরই আছে, ইতর জীবের নাই। প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত মানব ইতিহাসের পার্থক্য এই স্থানে। কার্লাইল প্রভৃতি মনস্বীগণ ও প্রাণ-বিজ্ঞানের দিক হইতে ইতিহাস আলোচনা না করিয়াও এই সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে বিনয় বাবু মানব সমাজের উন্নতি বা পরিণতি একমাত্র মহাপুরুষের উপরই যে নির্ভর করে তাহা স্বীকার করেন না। মানব সমাজের উপর পারিপার্শ্বিক প্রভৃতিরও একটা প্রভাব আছে। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম অধ্যায়ে গ্রন্থকার তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Guizot সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রতিষ্ঠান (institution) এবং ব্যক্তি, উভয়েরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিনয়বাবু প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ প্রতিষ্ঠানগুলিও যে পারিপার্শ্বিকের ফল। জাতীয় জীবন গঠনে মহাপুরুষদিগের প্রভাব সম্পর্কে মিল বলিয়াছেন, "মহা শক্তিশালী শাসনকর্তাও তাঁহার স্বীয় আদর্শ অনুসারে জগৎ গড়িয়া তুলিতে পারে না। সমাজে (ভাব এবং কর্ম্মের) যে স্বাভাবিক স্রোত বহিয়াছে তাঁহাকে কতকটা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে হয়। সুদক্ষ কর্ণধারও প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে গমন করিতে অক্ষম বটে কিন্তু তথাপি সুদক্ষ কর্ণধার থাকা ও না থাকার মধ্যে প্রভেদ অনেক। শার্লমেন জন্ম গ্রহণ না করিলে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতা কত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত তাহা কে বলিতে পারে?" (J. S. Mill's Disrtation and Discussions VOL II pp 255) বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াও উভয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তবে মিল প্রাণ-বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার করেন নাই; এই যা পার্থক্য।

গ্রন্থকারের অপরাপর সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সিদ্ধান্তগুলি সত্য বটে কিন্তু প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীতও তাহাদিগের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিভিন্ন সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা যে প্রত্যেকেরই পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা ইতিহাস সহজ ভাবে আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। কোন এক জাতির উন্নতি ও অবনতি যে কেবল মাত্র সেই জাতির স্বতন্ত্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে না তাহাও ঠিক। জাপানের অভ্যুত্থান যে কেবল জাপানীগণের চেষ্টা ও বীরত্বের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা কোন ঐতিহাসিকই—তিনি প্রাণ-বিজ্ঞান মানুন আর নাই মানুন—স্বীকার করিবেন না। যদি চীন দুর্ব্বল না হইত, যদি কোরিয়ার শোচনীয় অধঃপতন না হইত, যদি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যার ভাব না থাকিত, তবে জাপানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত। আবার ইহাও ঠিক যে, জাপানের অভ্যুত্থান, ইউরোপ কর্ত্তৃক সমগ্র এশিয়াখণ্ড গ্রাস করিবার চেষ্টার একটি প্রতিক্রিয়া। এইরূপ অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থায় (প্রাণ-বিজ্ঞানের ভাষায়, পারিপার্শ্বিকের) ফলেই জাপানের অভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করিয়াও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়; প্রাণ-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু অপর পক্ষে একথা বলাও আবশ্যক যে, নূতন প্রণালীতে আলোচিত হইলে পুরাতন সিদ্ধান্তও নূতন অর্থসমন্বিত হয়। যেমন কোন পদার্থকে চিরাভ্যস্ত দিক হইতে না দেখিয়া নূতন দিক হইতে দেখিলে তাহা নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহার অনেক অজ্ঞাত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। যাহা পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ছিল, বিনয়বাবুর আলোচনার ফলে

তাহা স্পষ্টীকৃত এবং সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিনয়বাবু যে অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনাই হইয়াছে কম। যতটুকু আলোচিত হইয়াছে তাহাতে যে এই অভিনব প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

এই অভিনব প্রণালীতে ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই এই পুস্তক ইংরেজী ভাষায়ও প্রকাশিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অভিনব ক্ষেত্রে ও অভিনব বিষয়ে প্রধাবিত হইয়াছে দেখিয়া সমস্ত বাঙ্গালীরই আনন্দিত হইবার কথা। বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে, সুখের কথা। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত সাফল্যই তাহার প্রয়োগে। অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানের যদি উপযুক্ত প্রয়োগ না হয় তবে তাহা হরজটানিবদ্ধ গঙ্গার মত জনসমাজের উপকারে আসে না। বঙ্গদেশে পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত প্রয়োগের অভাব অধিক। শ্রীযুক্তবিনয়কুমার সরকার প্রমুখ কতিপয় কৃতবিদ্য মনস্বী লেখক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে আশা হয় যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অচিরেই বিদূরিত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

পল্লী মা

(১)

শস্য-হরিৎ ক্ষেত্র সেথায়,
মুক্ত বায়ুর সঙ্গে,
লক্ষ্মী রাণীর স্বর্ণ আঁচল
চক্ষে নাচায় রঙ্গে!
সিক্ত-সবুজ দূর্ব্বা তাঁহার
চিত্র-পটের দৃশ্য;
বৃক্ষ নিকর পত্র-ছায়ায়
রক্ষে তাঁহার স্নিগ্ধ কায়ায়;
দুঃখে সেথায় শক্তি হারায়
তপ্ত প্রখর গ্রীষ্ম!

(২)

অঙ্গে তাঁহার বর্ণ-মধুর
স্বর্ণ-লতার সজ্জা,
সূর্য্য-কিরণ বর্ষে সেথায়
হর্ষ, সোহাগ, লজ্জা!
যত্ন-বিহীন কুঞ্জে তাঁহার
রম্য বালার কান্তি,
—বর্ণ ভূষণ গন্ধে যাহার
স্বর্গ জাগায় মর্ত্ত্য-মাঝার—
মুগ্ধ, বিভোর দৃষ্টি-আধার,
চিত্তে পুলক, শান্তি!

(৩)

ছন্দ-মুখর ভক্ত বিমান
বন্দে তাঁহায় নিত্য,
রাত্রি-দিবস রাজ্যে তাঁহার
রঙ্গ-রসের নৃত্য!
চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে সেথায়,
স্বপ্ন-মোহের সৃষ্টি!
জ্যোৎস্না রাণীর হাস্য-ধারায়,
চিত্ত সেথায় বিশ্বে হারায়,
তৃপ্তি-ছায়ায় সুপ্তি দাঁড়ায়,
তন্দ্রা-বিবশ দৃষ্টি।

(৪)

ক্ষুদ্র হৃদয় শুষ্ক আমার,
পল্লী মা, তোর বক্ষে,
শান্তি-সুধার পুণ্য ধারায়
শ্রদ্ধা গড়ায় চক্ষে!
লক্ষ-অভাব-দৈন্যে মা তুই,
শক্তি, অজয়-দুর্গ;

তপ্ত হৃদয়, স্পর্শে মা তোর,
শান্ত, শীতল, ভক্তি-বিভোর ;
স্বর্গ কোথায়? মর্ত্ত্যে যে মোর
পল্লী মা তুই স্বর্গ!

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

কাছাড়ীর ধর্ম্ম *

এক কথায় কাছাড়ীর ধর্ম্ম আতঙ্ক বা ভয়ের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম নয়। কাছাড়ী কোনও মূর্ত্তি পূজা করে না, বা পূজার জন্য তাহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট মন্দির নাই। কাছাড়ীর বিশ্বাস ভূ-পৃষ্ঠে, আকাশে, বাতাসে মোদাই নামে অসংখ্য অদৃশ্য শরীরী জীব বিচরণ করে, এবং এই সকল ভূত-যোনি লোকের অনিষ্টাচরণ করিতে সদাই প্রস্তুত। হৃদয়ে ভূত-ভয়ের বদ্ধমূল সংস্কার কাছাড়ীর আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠি। যাহার মনে ভূত-ভয়ের মাত্রা যত দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়াছে সে ধর্ম্ম জগতে তত অগ্রসর হইয়াছে। দরাঙ্গ জেলায় সাঙ্ঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত কোনও কাছাড়ীকে তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিবে যে, তাহাকে মোদাইয়ে ধরেছে। সুতরাং ভূত-ভয়ই কাছাড়ীর ধর্ম্মের প্রাণ। ভূতেরা রোগ সৃষ্টি করে, দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে এবং ভূ-কম্প ঘটাইয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। চাউল, কলা, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি বলি প্রদান করিয়া এই সকল অপদেবতাকে তুষ্ট ও শান্ত না রাখিলে লোকের মঙ্গল হইতে পারে না, এবং বিভিন্ন দেবতা বা ভূতের প্রীতির জন্য বিভিন্ন পূজার অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন বলি হইয়া থাকে।

মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া আপন আপন বংশের মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে কাছাড়ীরা তাহার প্রিয় খাদ্যাদি স্থাপন করে। গ্রামের বয়স্ক লোক এই খাদ্য স্পর্শ করে না, কিন্তু বালক-বালিকারা অবাধে এবং আহ্লাদে ইহা উদরস্থ করিয়া ফেলে।

কোনও কোনও কাছাড়ী সম্প্রদায়ে প্রাকৃতিক শক্তির পূজা প্রচলিত আছে। যেমন 'বিহু' বা চৈত্র সংক্রান্তিতে পারোয়া পূজা। পারোয়া একটা সুদীর্ঘ বংশ দণ্ড ; ইহাতে নেকড়া জড়াইয়া এবং নিশান বাঁধিয়া গ্রামের বাহিরে একটা গাছের পাশে পুঁতিয়া বহুসংখ্যক কাছাড়ী যুবক, যুবতী, বালক, বৃদ্ধ ইহার চতুর্দ্দিকে ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করে ও আমোদে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন এই উপলক্ষে অনেক যুবক কাছাড়ী যুবতীকে লইয়া পলাইয়া যায়। অন্যূন সপ্তাহ কাল নিরুদ্দেশ মিলন-সঙ্গের পরে উভয় পক্ষের অভিভাবক বর্গের অভিমতানুসারে পরিশেষে ইহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জল কাছাড়ীর বড় পবিত্র জিনিস। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কাছাড়ীরা ক্ষুদ্র নদীগুলিকে উপদেবতা এবং ব্রহ্মপুত্রকে ইহাদের জননী বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। উত্তর কাছাড় পর্ব্বতের বড়া জাতি আজিও তাহাদিগকে ডি-মা-সা বা নদীপুত্র নামে পরিচয় দিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কাছাড়ীরা অধুনা প্রত্যক্ষ ভাবে জলের পূজা না করিলেও জলের প্রতি ইহাদের ভক্তির বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। ইহারা স্রোতস্বতীর তীরে শব দাহ করে ও বিশেষ বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আজকাল কাছাড়ীরা অনেক হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক দেবতার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কাছাড়ী জাতির উপাস্য দেবতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—(১) পারিবারিক দেবতা ও (২) গ্রাম্য দেবতা। পারিবারিক দেবতা গৃহাভ্যন্তরে এবং গ্রাম্য দেবতা গ্রামান্তের অদূরে বাঁশ বা বৃক্ষকুঞ্জের সমীপবর্ত্তী স্থানে পূজিত হইয়া থাকে।

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের চতুর্থাংশ। তৃতীয়াংশ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পারিবারিক বা গার্হস্থ্য দেবতার সংখ্যা অনুন উনিশটি এবং গ্রাম্য দেবতার সংখ্যা পঁয়ষট্টিটি। পারিবারিক দেবতার মধ্যে ক্ষমতায় "কাঁটা সিজ" প্রথম ও তাঁহার পত্নী কৃষি দেবী দ্বিতীয়। "কাঁটা সিজ" বৃক্ষরূপে আমাদের চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহার পত্নীর কোনও প্রাকৃতিক স্বরূপ নাই। তিনি শস্য-সম্পদের দেবী বলিয়া কাছাড়ীর অতিশয় ভক্তির পাত্র। ডিম্ব কৃষি-দেবীর বড় প্রিয়। বৎসরে দুই বার ধান কাটার সময় কৃষি দেবীর পূজা হইয়া থাকে সুতরাং তিনি "আউস-দেবী" ও "শালি-দেবী" এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "বুড়া-বাঘ-রাজা" নামে আর একটি পারিবারিক দেবতা আছে। এই দেবতার নামে কাছাড়ী আতঙ্কিত হয়। "বুড়া-বাঘ-রাজা" হিংস্র ব্যাঘ্রের সংজ্ঞা মাত্র। বাঘা বনের রাজা বলিয়া কাছাড়ীরা ইহাকে ভয় ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

কাছাড়ী যে অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছে তহ তাহাদের উপাস্য গ্রাম্য দেবতার নাম হইতেই উপলব্ধি হয়। কাছাড়ী গ্রাম্য দেবতা অনেক স্থলে হিন্দু দেবতার নামান্তর মাত্র, যেমন 'বুড়া মহাদেও', 'বুড়া গোসাই' 'জল কুবের', 'থল কুবের' ইত্যাদি।

দৈহিক বা মানসিক শক্তিতে সাধারণ কাছাড়ী অপেক্ষা উন্নত তাহাদের কোনও কোনও পূর্ব্বপুরুষ মনুষ্য-লীলার অবসানের পর আপন আপন নামে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন 'শিলা রায়।' সুপ্রসিদ্ধ কোচরাজ নর নারায়ণের এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির এই নাম ছিল। তিনিই এখন এই নামে দেবতার তালিকায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাছাড়ীরা বৎসরে তিনটি মাত্র উল্লেখ যোগ্য পূজা করিয়া থাকে। 'আহু' বা 'আশু' ধান্য কাটার পর এক বার, "ফর্ম্মা" ধান্য কাটার পর দ্বিতীয় বার এবং শালি ধান্য কাটার পর তৃতীয় বার পূজা হয়। যে জাতি শুধু কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে সেই জাতির পক্ষে এইরূপ উৎসব বা পর্ব্বই স্বাভাবিক। পূজার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। ইহা একটা জাতীয় মিলনোৎসবের উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে 'জু' সেবনের সুযোগ মাত্র।

কাছাড়ীরা পাঠা, পায়রা, পান প্রভৃতি বলি প্রদান করিয়া কলেরা দানবীর (Cholera Demon) পূজা করিয়া থাকে। এই পূজার বিশেষ নাম **খোরুঙ্গ পুজা।** কখনও কখনও গ্রামের লোকেরা ফুল, ডিম ও চালের গুঁড়া ভেলার উপর সাজাইয়া নদী দেবতা বুলিন-নি-মদাইয়ের উদ্দেশে নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

এই রূপ ভেলা দেখিলেই বুঝা যায় যে, কোনও কাছাড়ী গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে। 'গজি' বা একত্র মিশ্রিত চাউল, ডাইল, পাঠা, মোরগ প্রভৃতি কোনও প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়িতে সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়। পশু পক্ষীগুলির ছিন্ন মস্তক এই সকল বৃক্ষের গুঁড়িতে পড়িয়া থাকে এবং কবন্ধগুলি প্রসাদ রূপে কাছাড়ীরা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কোনও পরিবারের কর্ত্তা রোগ নিবারণের উদ্দেশেই প্রধানতঃ এই সকল বলি প্রদান করিয়া থাকে।

কাছাড়ীদের মধ্যে পুরোহিত বলিয়া কোনও পৃথক সম্প্রদায় নাই। **দেউরি** বা **দেওদাই** নাম-ধারী গ্রাম্য মাতব্বরেরাই আজকাল পূজা পার্ব্বণে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু কাছাড়ীদের মধ্যে ভূত ছাড়াইবার মন্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে দেউরির পুত্র দেউরি হইতে পারে না। কামরূপের প্রথা কিন্তু ভিন্নরূপ। বড়া জাতীয় কোনও বিশিষ্ট সমাজ-স্তরের **ব্রাম্মরাই** (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) নামক এক শাখাই এই জাতির পূজা পার্ব্বণে পৌরোহিত্য করে। **ওঝা** নামে আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারাও কোন কোন ধর্ম্মক্রিয়ায় পুরোহিত হয়। কড়ি ও শামুক সর্ব্বদা ইহারা সঙ্গে রাখে, এবং এইগুলির সাহায্যে

লোকের প্রশ্ন ও ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনা করে ; এবং গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইলে কোন দেবতা বা মোদাইকে কি কি বলি দ্বারা পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়া দেয়।

দেওদানী নামক স্ত্রীলোকেরা ভূতাশ্রিতা হইয়া মহামারীর পূজায় পৌরোহিত্য করে। এই জাতীয় পূজা একটু বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৪০ হাত পরিমিত বর্গক্ষেত্রের আকারে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ইহার উপরিভাগ হইতে ঘাস চাচিয়া ফেলা হয়। এই পরিষ্কৃত স্থলের পশ্চিম প্রান্তে বাঁশের উপর একটা কাপড়ের পরদা বাঁধা থাকে, এবং পূর্ব্ব প্রান্তে ১৮ অঙ্গুলি চওড়া ও ৬ অঙ্গুলি উচ্চ একটা মাটীর আইল বা আল প্রস্তুত হয়, এবং বনজঘাস পাকাইয়া ৭টা কি ৯টা মনুষ্যমূর্ত্তি এই আলিটার উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকটা মূর্ত্তির সম্মুখে কলার খোলের উল্টা পিঠে পাঠা, পায়রা মোরগ প্রভৃতির ছিন্ন মুণ্ড স্থাপিত হয়। ইহাদের সঙ্গে নুন, কলা, আক, 'গজি' প্রভৃতি রক্ত-প্রোক্ষিত অন্যান্য উপকরণও মিশ্রিত থাকে। এই সময়ে মুক্তকুন্তলা, ডাকিনী-মূর্ত্তি দেওদানী ললাটে সিন্দুর লেপিয়া ও একটা আলখেলা পরিয়া ঘাসের মূর্ত্তি গুলির সম্মুখে মন্দিরা এবং ঢাকের তালে তালে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ নৃত্যের উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ইহাদের জ্ঞান লোপ হইয়া আসে। এইরূপ অবস্থা হইলেই বুঝা গেল দেওদানাকে 'মোদাই' বা ভূতে আশ্রয় করিয়াছে। তখন একটা পাঠা আনিয়া "ইস্ফ্রি" নামক খাড়ার এক আঘাতে একটা তৃণমূর্ত্তির সম্মুখে ইহার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়, এব এই পশুর সমস্ত রক্ত "মোদাইর" মূর্ত্তির নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বস্ত্রাদিও এই শোণিতের ছটায় কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই বলির পরেই দেওদানী বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ করে, অর্থাৎ কোন মোদাই অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়াছে এবং কোন বলিতে ইহার তৃপ্তি সাধন হইবে ইত্যাদি বিষয় বলিয়া দেয়। এই উপলক্ষে গ্রামের সমস্ত অধিবাসী অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটা ভোজের আয়োজন করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া কাছাড়ীর আরও কয়েকটা উৎসব আছে। এইগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, গার্হস্থ্য ও সাম্প্রদায়িক। গার্হস্থ্য উৎসবের মধ্যে "নুতন খাওয়া" (নবান্ন) এবং "মশক তাড়ান" উল্লেখ যোগ্য। প্রথমটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ও দ্বিতীয়টি নবেম্বরের শেষাশেষি সম্পন্ন হয়। জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে প্রকাণ্ড পিরামিডাকৃতি টোপর মাথায় পরিয়া এবং শুষ্ক কলাপাতে শরীর ঢাকিয়া কতিপয় অদ্ভুত বেশধারী কাছাড়ী তাণ্ডব নৃত্য ও চীৎকারে গৃহস্থের বাড়ী মুখর করিয়া দেয়। সাধারণতঃ যুবক সম্প্রদায়ই এই উৎসবের পাণ্ডা। এইরূপে মশক তাড়াইয়া ইহারা গ্রামের মাতব্বরগণের নিকট হইতে পুরস্কার বা পারিশ্রমিক স্বরূপ সামান্য অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি আদায় করিয়া লয়।

ধর্ম্মোপাখ্যান—নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কাছাড়ীদের মধ্যে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। এক দিন ভগবান শ্রী বা সৌভাগ্য দেব মৃগয়া করিতে করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া হিমালয়ে একটা সুন্দর সরোবরের তীরে উপনীত হন। ভগবান শ্রী জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সরোবরের মৎস্যগুলি তখন ব্রহ্মপুত্রে লইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল। ভগবান শ্রীও তথাস্তু বলিয়া মৎস্যগুলিকে তাঁহার যষ্টির প্রান্তদেশে বাঁধিয়া পশ্চাতে টানিয়া আনিতে লাগিলেন, এবং দাগে দাগে জলধারা প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইল। এই জলধারাই পরিশেষে নদী হইয়াছিল। ইত্যাদি আরও সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প শোণিতরূপে কাছাড়ীর ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

কাছাড়ী জাতির মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদে উপজাতি আছে। নিম্নে কয়েকটি শ্রেণীর নামোল্লেখ করা গেল।

(১) স্বর্গজাতি—দেউড়ি ওঝা প্রভৃতি। ইহারাই

পৌরোহিত্য করে। এই শ্রেণীর লোকে কখনও ভূমি কর্ষণ করে না।

(২) ভূমিজাতি—কবর ও শ্মশান নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই জাতীয় লোককে ভূমি ক্রয় করিয়া লইতে হয় না।

(৩) ব্যাঘ্রজাতি—ইহাদের বিশ্বাস ব্যাঘ্র ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ। সুতরাং ব্যাঘ্র মরিলে ইহারা শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

(৪) তৃণজাতি—একপ্রকার বন্য তৃণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই জাতির এই নাম হইয়াছে।

(৫) তিল জাতি—প্রাচীন কালে ইহারাই আসামে তিলের চাষ করিত। ইহাদের বংশধরগণ আজিও তিলকে বড় সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

(৬) জোঁকজাতি—ইহারা জোঁককে বড় সম্মান করে এবং সাধারণতঃ জোঁক হত্যা মহাপাপ বলিয়া মনে করে। প্রাচীন কালে কোনও পরিবারে কোনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অশৌচান্তের দিন পরিবারের যাবতীয় লোক এক একটা জোঁক কিছুকালের জন্য শাকের সহিত চিবাইত; কিন্তু এই জোঁক চিবান জীবনে এক বারের বেশী হইত না।

(৭) পাটজাতি—প্রাচীন কালে এই উপজাতীয় লোকেরা কোন পর্ব্বোপলক্ষে পাট চিবাইত।

(৮) নদী জাতি—ইহারাই প্রাচীন কালে মৎস্য শিকার করিত।

(৯) ভিক্ষুকজাতি-এই জাতি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়—ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহ নাই।

(১০) বাদ্যকর জাতি—ইত্যাদি।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যু-কল্পনা

সন্ধ্যা আসিতেছে, দিন চলিয়া যাইতেছে, তাই কবি আজ ডাকিতেছেন—

ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিন শেষের শেষ খেয়ায়?

অতীতের শত স্মৃতিতে আঁখিজলে আকুল হইয়া বলিতেছেন—

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝ খানে
সন্ধ্যা বেলা কে ডেকে নেয় তারে!
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফল্‌লনা
চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়;
দিনের আলো যারফুরোল সাঁঝের আলো জ্বল্‌ল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

আর হতাশ ভাবে ডাকিতেছেন—

ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়!

তিনি এ জীবনে যত গান গাহিয়াছেন তাহারা যেন কলকণ্ঠ চঞ্চল শিশুমণ্ডলীর মত তাহার বৃদ্ধ বয়সের স্তব্ধ ধ্যানাসনের চারিধারে গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইতেছে,—তাঁহাকে শান্তি দিতেছেনা। তাই তিনি আজ, ডাকিতেছেন,—

এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে.—
তার হৃদয় বাঁশী আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।
নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে
বাঁশীতে তান দাওহে পূরে
যে তান দিয়ে অবাক কর
গ্রহ শশীরে।

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবনে মরণে।
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।
বহু দিনের বাক্য রাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি
একলা বসে শুনব বাণী
অকূল তিমিরে।

কিন্তু যখন মধুর কৈশোরে জীবনে প্রথম বসন্তের বাতাস বহিয়াছিল, শত আশা অভিলাষ আশঙ্কা লইয়া হৃদয় ধীরে ধীরে পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, যখন "কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি" জীবনের বাসন্ময় প্রথম সোপানে বসিয়া শত নবীন আশায় ঝঙ্কার দিয়া, "বাজায়ে বীণা রচিত রাগিনী,"—তখন ও দূরনির্ঝরিণীর মধুর নিক্বণের মত প্রেমময় মৃত্যুর নূপুর ধ্বনি যেন স্বপ্নঘোরে আসিয়া তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিত;—আর তিনি উচ্ছ্বসিয়া গাহিয়া উঠিতেন,—

মরণরে, তুহু মম শ্যাম সমান।

মানবের শেষ শান্তি মরণের উদার চোকে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া একান্ত অসহায় ভাবে বলিতেন—"হে মরণ, হে মম প্রিয়তম, হে মম শ্যামসমান, পৃথিবীতে যাহা কিছুকে আমি আপন বলিয়া আকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছি, যে কিছু সাফল্যের আশায় মত্ত আবেগে প্রাণপণে ঘুরিয়া মরিতেছি, যাহা কিছু "আপনার মন ভুলাতে" ঘরে লইয়া যাইতেছি, সে সমস্তই এক দিন হঠাৎ আমাকে বিমুখ হইতে পারে, ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, ধূলি হইয়া ধূলায় মিশিয়া যাইতে পারে, কিন্তু হে মোর শরণ, মোর চিরস্নেহময় সুহৃদ, তুমি কখনও আমাকে বিস্মৃত হইবে না,—"তুহু ন ভইবি মোরে বাম"!

প্রথম যে দিন প্রিয়তম মৃত্যুর দূত ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কবির তরুণহৃদয়রূপিনী অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাটি চঞ্চল হইয়া উঠিল: সে জানে যে এ প্রিয়তমের দূত, কিন্তু এর বেশী সে আর কিছুই জানেনা। এ প্রিয়তম কে, তাহার আবাস কোথায়, কিরূপ তাহার আকৃতি প্রকৃতি, এ সব সে কিছুই জানে না; তাই নবোঢ়া হিন্দু বালিকা যেমন স্বামী গৃহে যাইতে ভয় পায় অথচ জানে তাহার যাইতেই হইবে, কবির হৃদয় বালিকাও সেইরূপ "ভয়ভারাতুর" হইয়া পড়িল। কিন্তু তবু সে দীপহাতে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল, ব্যাকুল ভীতি আবেগ বক্ষে চাপিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং নয়ন জলে পূজা করিয়া পরাণের ধন তাহার চরণ তলে সঁপিয়া দিল!

এখন হইতে আর এই স্বামীগৃহ কবির অপরিচিত নহে। তথায় যে কি অনন্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে তাহার আভাস তিনি পাইয়াছেন। তাই যখন তিনি দেখেন যে পিতৃগৃহের খেলা ধূলা সাঙ্গ করিয়া একটি হৃদয় মরণস্বামীর গৃহে চলিয়াছে, আর তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে ঘিরিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে; তখন তিনি নির্ব্বাক ভাবে একধারে দাঁড়াইয়া অনিমেষে চাহিয়া দেখিতে থাকেন,—মনে মনে শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বলেন,—

হেসে হেসে গলাগলি ক'রে খেলেছিল যাহাদেরে নিয়ে,
আজো তারা ঐ খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে।
সেই রাব উঠেছে গগনে, ফুটেছে সমুখে সেই ফুল;
ও কখন খেলাতে খেলাতে মাঝ খানে ঘুমিয়ে আকুল!
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয় বেদনা;
চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে, থাম, থাম, হেসনা—কেঁদনা।

কিন্তু এ যে বড়ই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ! এই হৃদয়বিদারণ বর্তমান বিচ্ছেদের তুলনায় মরণের প্রত্যাশিত ভাবী শান্তি যে সময় সময় বড়ই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কবি জানেন মরণের গৃহে অসীম অন্তিম শান্তি বিরাজ করিতেছে কিন্তু যাহা আছে তাহাকে বিদায় দিতে যে বর্ত্তমানে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। এই নিষ্ঠুর শূন্যতার তুলনা কোথায়?

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই,
নিতান্ত সামান্য একি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে, কত আছে কত হবে
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত?

আছে সেই সূর্য্যালোক নাহি সেই হাসি,
আছে চাঁদ নাই চাঁদ মুখ ;
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ—নাই কেহ,
রয়েছে জীবন নেই জীবনের সুখ !
সেই টুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ
নিতান্ত সামান্য একি এ বিশ্ব ব্যাপারে ?

সে যে এস্থানেই শত প্রাণ-বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ ছিল. কত প্রভাত সন্ধ্যার মাধুরী এই খানেই তাহার জীবনে মিশিয়া গিয়াছিল, এখানে সে কত জনকে ভাল বাসিয়া ছিল, কত জনের ভালবাসা পাইয়াছিল ! কিন্তু আজ আর একজন তাহার প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে, আজ অশ্রুজলের বন্যা চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে তবু সে থাকিবে না। বঙ্গদেশে যেমন পুত্রপৌত্রপরিবৃতা প্রবীনা গৃহিনী ও সময় সময় পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, নিজের বর্ত্তমান সংসারের শত কাজের মধ্যেও সহসা পিতৃগৃহের অতীত দিনের কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া উঠেন, এই মরণস্বামীর গৃহে যাত্রার প্রাক্কালে একবার পশ্চাৎ পরিত্যক্ত ধরা গৃহের দিকে ফিরিয়া তাকান ও ঠিক সেই রকম স্বাভাবিক।

ফিরিয়া তাকাইলেই যে হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে ! প্রাণপণ ভালবাসা যাহার পরশে মিথ্যার বন্ধন হইয়া যায় এবং নিমেষে খসিয়া পড়ে অন্য সমস্ত ভালবাসা আঁধার করিয়া তবে সে ভালবাসিবে,—এত বড় যাহার দাবী, তাহাকেত সহসা প্রিয়তম বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যাহার গৃহে গমন অর্থই পিতৃ-গৃহ হইতে,—জীবনের সমস্ত কোমলতম প্রিয়তম স্মৃতি হইতে চির নির্ব্বাসন, তাহাকে ও আত্মীয় বলিয়া মনে হয় না। অশ্রুজলে তখনই নয়ন আকুল হইয়া উঠে। মনে হয়,—হায় দেবতা ! এমন করিয়াই যদি বিচ্ছিন্ন করিবে তবে বাঁধিয়াছিলে কেন ?

তখন ক্ষণেকের তরে মৃত্যুর মধুর রূপ লুপ্ত হইয়া যায়, মৃত্যুকে সহসা নিষ্ঠুর দস্যু বলিয়া আতঙ্ক হয়। মনে হইতে থাকে আপন আপন প্রিয়তম স্নেহ ভালবাসা সুখ দুঃখগুলি লইয়া কত অসহায় আমরা ! কি নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ডের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব ঢালিয়া ঘর কন্না পাতিয়া বসিয়াছি ! সেই নিষ্ঠুর দস্যু যখন আসিয়া বলিবে—"চল"—যখন নীরব, স্থির, শীতসঞ্চারী নয়নে চাহিয়া তাহার অকম্পিত হস্তখানি সে বাড়াইয়া দিবে.—তখন মুহূর্ত্তে সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে ;—প্রাণ শতধা দীর্ণ হইয়া গেলেও কোন ওজর আপত্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে হইবে !

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন ;
এর মাঝে কেন রয় . ব্যথা ভরা স্নেহময়
মানবের মন !
মা কেন রে এইখানে শিশু চায় তার পানে
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে !
মধুর রবির করে কত ভালবাসা ভরে
কত খেলা করে তারা কত সুখে দুখে !
কেন করে টলমল দুটি ছোট অশ্রুজল
সকরুণ আশা,
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালবাসা !

কিন্তু এ বিদ্রোহ ক্ষণিক। মৃত্যুর আপাত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে উত্তেজনার বশে বিদ্রোহবাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া যখন মন কতকটা শান্ত হইয়া আসে তখন নিজের বাক্যবলীকে নিজেরি প্রলাপ বলিয়া মনে হইতে থাকে। ধীরে ধীরে বক্ষের মাঝে প্রিয়তমের বুকজোড়া অস্তিত্ব অনুভূত হইতে থাকে, উদার আকাশের মত তাহার নীল নেত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি সমস্ত হৃদয় মন শান্তিতে আপ্লুত করিয়া ফেলে। উদ্ধত মস্তক নত হইয়া আসে। বিদ্রোহের অবসান হয় এবং মুহূর্ত্তে প্রিয়তমের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হইয়া যায়। তখন কেবল অশ্রুকরুণ মিনতি—"হে প্রিয়তম, হে অনন্তশান্তিময়, তোমার জয় হইয়াছে, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এখন হইতে তুমিই আমার

মহা-আনন্দ, আমার মহা পরিণাম। তোমাকে চিরদিনের জন্য পাইয়াছি, তোমার সহিত আর আমার বিচ্ছেদ হইবে না; কিন্তু তোমাকে পাইবার জন্য যাহা ছাড়িয়া আসিলাম, যাহা ক্ষণেকের মিলনে চিরপরিচয় রেখা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে, প্রাণপণ ভালবাসা দিয়া যেগুলি একদিন আকড়িয়া ধরিয়াছিলাম সেই খেলেনাগুলির মধ্যে আমাকে আরও কিছুকাল বিলম্ব করিতে দাও। তাহারা অসার, তাহারা ক্ষণস্থায়ী, তাহারা মায়া,—তবু তাহারা এক দিন আমারি ছিল,—আজ তাহারা চিরদিনের জন্য চলিয়াছে! শুধু এই মুহূর্ত্তে জন্য দাঁড়াইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিতে দাও!

তারপর? তারপর আমি সম্পূর্ণ তোমার। "মহা বরষার রাঙ্গাজল" আমি তোমারি হাত ধরিয়া তীর্ণ হইয়া যাইব।

সম্মুখে নক্ষত্রদীপালোকিত অনন্তের যাত্রাপথ পড়িয়া। ধরণীর তৈলহীন দীপ অর্দ্ধ রজনীতে ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে। চারিধারে অসংখ্য অদৃশ্য ফুলের সুগন্ধ চঞ্চল সমীরণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের নিঃশব্দ বিরাট স্রোতের স্বপ্নময় অপর কূল হইতে তরঙ্গ ধ্বনি উত্থিত হইয়া অন্ধকার গগণ প্রাঙ্গন পূর্ণ করিতেছে। গভীর ক্লান্তিতে আমার পরাণবধূর নয়ন পত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। অসহায় সে, তাহাকে বক্ষে নিবিড় বাহুবন্ধনে তুলিয়া লও, গভীর চুম্বনে তাহার রক্তিম অধর পাণ্ডু করিয়া দাও,—হতচেতন, অবশ হইয়া সে তোমার বক্ষে ঢলিয়া পড়ুক।—বিরাট পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্বে বাহির হইয়া পড়;—

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন শূন্য পথে!
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে!
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির কুমারী;
আলোক পরশ
একটি রোমাঞ্চ রেখা আঁকেনি যাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ;
সৃজনের পর প্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈব বশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে;
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধন বিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নব পরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন!
* * * * *
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্ত্তি
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীল নেত্র বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট,
নির্ব্বাক অধর;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দ গুলি
তুচ্ছ মনে হবে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে?

বিশাল, প্রসন্ন, শান্ত, মরণ-সমুদ্রে মানবের অশান্তিময়, উষ্ণ, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনস্রোতের গভীর আনন্দময় মিলন চিত্র! এচিত্র কল্পনায় ও অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের চরম বিকাশ।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

লগ্নহারা

তখনো চাহিনি ফিরে,
লাজে ভয়ে থামি' থামি' ধীরে অতি ধীরে
তৃণাঙ্কিত ছায়া ঢাকা সরসী তীরে
সে যবে দাঁড়াল আসি, শুধু মিছা কাজে
শত বার শত ছলে ছিনু জলমাঝে।
পরে যবে ধীরে ধীরে বাঁধা ঘাট বাহি'
কাছে আসি' নামি' মোর মুখ পানে চাহি'
সুধাল—'চেন কি মোরে?'—আমি দূরে সরি'
গুণ্ঠন টানিয়া দিনু। যবে হাত ধরি'
কহিল,—'চাহলো বালা! দরশ-পিয়াসী
আসিয়াছি বড় আশে; এক বার হাসি'
কহলো একটি কথা',—লাজ ভরে নত
শিহরি উঠিনু আমি লতিকার মত।
নীরবে টানিয়া লয়ে হাতখানি ধীরে
শিথিল আঁচল টানি গৃহপানে ফিরে
আম্র-বন-ঘেরা স্তব্ধ গ্রাম্য পথ পাশে
দাঁড়ানু ক্ষণেক তরে।—সুদূর আকাশে
শুভ্র মেঘ খণ্ডগুলি চলিয়াছে ভাসি',
সরসীর ভরা বুকে স্বচ্ছ বারিরাশি
ছলকিছে কলগান, দূর বন-ছায়
বিরহিনী পিকবধূ মরম-ব্যথায়
পঞ্চমে উঠিল গাহি', ঘিরি সারা বন
সহসা বহিয়া গেল উতলা পবন,—
বাঁশ-বনে, ঝাউ-শাখে, পাতায় পাতায়
সহকার শাখে বদ্ধ মাধবী লতায়
রোমাঞ্চ উঠিল যেন; সারা বন ভরি'
শুষ্ক পত্রে, তরু শাখে মর্ম্মরি' মর্ম্মরি'
তরঙ্গিয়া মুখরিয়া কানন-বিতান
শত যুগ যুগান্তের বিরহের গান
একটি সুরেতে যেন উঠিল জাগিয়া,—
'লো বালা! চাহলো ফিরি', তোমারি লাগিয়া
আসিয়াছি দূর হ'তে, শুধু এক বার
কহলো একটি কথা!'—মুছি, আঁখি-ধার
আসিলাম গৃহে ফিরি' বন-পথে ধীরে;
এক বার তবু তারে দেখি নাই ফিরে।
—আজি এ পরাণ মাঝে
কত ব্যর্থ হাহাকার রহি' রহি' বাজে,—
ফিরে আমি চাহিনিক' হেলা ভরে লাজে
অনাহুত এলে যবে; এস এস আজ,
নীরবে টানিয়া লব হৃদয়ের মাঝ।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মূঢ়

(সেখ সাদির মূল পারসী হইতে)

সুদূর প্রবাস হ'তে ভ্রমি সে আসিল যবে
শুধাইনু তায়,
কি বার্ত্তা এনেছ আজি বিদেশ ভ্রমিয়া বল
তুষিতে আমায়।
কহিল সে "প্রিয়তম, যথার্থই আনিয়াছি
বারতা নূতন,
অনন্ত শয়ন রচি' ঘুমায়েছে বৈরী তব
জন্মের মতন।"
কাতরে কহিনু তারে, 'হায়! প্রিয় কি শুনালে
বিদরিছে প্রাণ,
মৃত্যুর কবল হ'তে তোমারো আমারো সখা
কোথা পরিত্রাণ?"

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগবতী ডাঙা

হুগলী জেলায় ইলছোবা নামে একটি গ্রাম আছে। উহার পূর্ব্বদিকে একটি লোকালয় শূন্য প্রশস্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। অধুনা ঐ প্রান্তরে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে বিস্তৃত অংশ এখন ধান্য-ক্ষেত্র, ঐ স্থানে যে পূর্ব্বে নদী ছিল তাহা উহার আকার প্রকার দেখিলেই সহজে বুঝা যায় নদী মজিয়া গিয়া এখন ঐ স্থান ধান্যাদির ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পুকুর আছে ; তাহাদের মধ্যে একটির নাম 'দেউল গড়'। ঐ প্রান্তরের মধ্যে একটি স্থান 'ঝিঁট্‌কী পোতা' নামে অভিহিত হয়, তথায় এখনো পুরাতন খাপ্‌রা ইষ্টক পাওয়া যায়। এই সুবিস্তৃত প্রান্তরের নাম "ভগবতী ডাঙা"।

অনুমান পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভগবতী ডাঙায় রাজা লক্ষ্মীকান্তের রাজধানী ছিল। তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন ; যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি এক জন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করেন। তৎপরেই লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডুয়ায় গিয়া তথাকার রাজা গণেশের নিকট স্বীয় পরিচয় দিয়া তথায় বাস করেন।

কালক্রমে তিনি মহারাজ গণেশের প্রাড়বিবাক্ হন, এবং তদনন্তর তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, সেনা ও বিস্তৃত রাজ্য সহ 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুয়ায় এখনো সকলে রাজা গণেশের সভাকে 'বাইশ দুয়ারী' বলিয়া থাকে। রাজা গণেশের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল যদু। তিনি স্বহস্তে একটি চিত্র-ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া 'চিত্রমল্ল' আখ্যা পাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ এবং জেলালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা লক্ষ্মীকান্তের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম হরিদাস ও কন্যার নাম ইলা। হরিদাস পাণ্ডুয়ায় থাকিতেন, চিত্রমল্লের সহিত তাঁহার খুব প্রণয় হইয়াছিল অনন্তর হরিদাস মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাণ্ডুয়ার তদানীন্তন উজিরের কন্যা সোণাবিবিকে বিবাহ করেন।

লক্ষ্মীকান্ত নিজে অত্যন্ত একনিষ্ঠ শক্তি উপাসক হিন্দু ছিলেন। তিনি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ভগবতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেউলের নামানুসারে দেউলগড় নামে পুষ্করিণী খনন করান। ঝিঁটকী পোতায় পূর্ব্বে অনেক কুম্ভকারের বাস ছিল। ভগবতী ডাঙার যে স্থানে নদী ছিল বলিয়া বুঝা যায়, তথায় কঙ্ক নামে একটি ছোট নদী ছিল উহার তীরেই রাজ-প্রাসাদ ও প্রজাদের বাসস্থান ছিল।

লক্ষ্মীকান্ত রাজা দেবপালের সহিত স্বীয় কন্যা ইলার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ইলা পাণ্ডুয়ার যুব রাজ চিত্রমল্লকে গোপনে হৃদয় দান করিয়াছিলেন। এদিকে রাজা লক্ষ্মীকান্ত কন্যার বিবাহের যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া এবং দিন স্থির করিয়া বিবাহ সভা আহ্বান করেন। ঐ সভার নাম হইয়াছিল 'ইলা সভা'। বিবাহ সভায় সকলে উপস্থিত হইয়াছে রাজা দেবপাল বরবেশে বরাসনে সমাসীন হইয়াছেন, ইলা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সম্প্রদান স্থানে আনীত হইয়াছেন লক্ষ্মীকান্ত কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন এমন সময়ে হঠাৎ চিত্রমল্ল সৈন্য সামন্ত সহ তথায় উপস্থিত হইয়া ইলাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, এবং নিজ গৃহে যাইয়া যথারীতি ইলার পাণিগ্রহণ করেন।

রাজা লক্ষ্মীকান্ত দারুণ মনঃকষ্টে তৎপর দিনই সপরিবারে দিল্লী চলিয়া যান। আর কখনো এদেশে আসেন নাই। গ্রামবাসিগণও ক্রমে ক্রমে ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকে। সুতরাং তদবধি উক্ত স্থান জন শূন্য প্রান্তরে পরিণত হইয়া যায়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ভগবতী ডাঙায় প্রতি রাত্রে ভগবতী বিচরণ করেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ সমালোচনা

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ প্রণীত, ঢাকা সাধনা লাইব্রেরী হইতে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। আকার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ২৪৯ পৃষ্ঠা। ছাপা মন্দ নহে, কিন্তু কাগজ তত ভাল নয়। দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন এরূপ লেখকের সংখ্যা সাহিত্য ক্ষেত্রে আজি ও মুষ্টিমেয় সুতরাং যাঁহারা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্যম অল্লাধিক সারস্বতী ঋদ্ধি সংবর্দ্ধন করিবেই করিবে।

এই ক্ষেত্রে গ্রন্থকার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কাছাড় সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন; এবং মাঝে মাঝে কৌতুহলোদ্দীপক যে সকল উপাখ্যান এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে সেগুলি সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে। কাছাড়ের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নাই—এখানি কতকটা তাহার স্থান পূর্ণ করিবে। সুতরাং গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি তিনি এই ঐতিহাসিক গবেষণায় তৎপর থাকিয়া পুস্তক খানিকে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইবেন।

শান্তিময়।

অবকাশ—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০। ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদর্শী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয় "সমালোচকের দোদুল্যমান খড়্গাতলে সোদ্বেগচিত্তে বিনিদ্র নয়নে" অবস্থিত গ্রন্থকারের পরিচয় ভূমিকা স্বরূপ দিয়া "ভয়বিহ্বল" গ্রন্থকারকে "আশ্বস্ত" করিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়কে আমরাও আশ্বাসবাণী শুনাইতে পারিয়া সুখী হইতেছি। লেখায় নিজস্ব, নূতনত্ব, অথবা নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কোথাও বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু সমস্তগুলি রচনায় মধ্য দিয়া লেখকের মঙ্গলাভিসারী মনের যে শান্তির আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উপভোগ্য। পুস্তকে গাথা, তত্ত্বমসি, পরমাণু, সুখ, পরমাত্মা, প্রতিমা পূজা, মৈত্রেয়ীর আত্মশ্রবণ, আত্রেয়ীর দীক্ষা, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী এই কয়টি সন্দর্ভ আছে; ইহার কোনটিই অসার কিংবা প্রাণহীন নহে। ভাষায় যে একটু নীরসতা আসিয়া পড়িয়াছে সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিতের লেখায় তাহা ক্ষমার্হ

শ্রীন্যায়পাশিক।

ভগীরথ শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ঢাকা আরমানিটোলা ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন অষ্টাংশিত, ৮০ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে, ব্রঞ্জব্লু কালির সুন্দর ছাপা— 'জহ্নুমুনি' নামক তিন রঙ্গের ছবিযুক্ত সুন্দর মলাট। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

শিশুসাহিত্যে ভগীরথ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। পুস্তক খানি তিন অংশে বিভক্ত প্রথম অংশে গ্রন্থকার বালক-বালিকাগণের জন্য সরল গদ্যে সগর বংশের ধ্বংশ ও উদ্ধার মূলক পৌরাণিক কাহিনী লিখিয়াছেন: দ্বিতযাংশে সগর বংশের বিবরণ গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ও পরিশিষ্টাংশে গঙ্গার পাবনী শক্তি ও গঙ্গাবতরণের ব্যাখ্যা কৌতুহলের সামগ্রী হইয়াছে।

উপসংহার ভাগের মনীষী শঙ্কর ও কবিগুরু বাল্মিকী কৃত হিন্দুর নিত্য পঠনীয় গঙ্গাস্তোত্র দুটি আবৃত্তি করিলে বালক বালিকাগণের মনে ভক্তি ভাবের সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইবে। এরূপ পুস্তক হিন্দু গৃহে পরম আদরের বস্তু হইবে আমরা আশা করি।

চারি খানি হাফটোন চিত্রের মধ্যে সাগর-সঙ্গমে সুন্দর হইয়াছে—কিন্তু সাগরের বর্ণ "মেহগেনি ব্রাউন" হওয়ার বড় অস্বাভাবিক হইয়াছে।

শান্তিময়।

২২। রাজমঙ্গল—(পূর্ব্বার্দ্ধ—বীর ব্রত)—দেব বীর বাপ্পারাও; ভূতপূর্ব্ব নির্ম্মাল্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মডার্ণ পাবলিসিং কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত—আকার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১১৬ পৃষ্ঠা; কাপড়ে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা; কাগজ ভাল।

আলোচ্য রাজমঙ্গল একখানি মহাকাব্য, অর্থাৎ, মহাত্মা টড প্রণীত সমগ্র রাজস্থানের পদ্যময় বিবৃতি—অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত।

গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের নামকরণ হইয়াছে বীরব্রত—ইহা বাপ্পারাও, হামীর, চণ্ডরাজ, পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের জীবন কাহিনী। দ্বিতীয়াংশের নামকরণ হইয়াছে সতী-ক্ষেত্র। ইহাতে রমণীরত্ন সাধ্বী পদ্মিনী, পান্না, সরোজিনী, কৃষ্ণকুমারী ও যোধাবাইর অপূর্ব্ব জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বীরভূমি ও পুণ্যভূমি রাজস্থানের ইতিহাস ভারতবাসী মাত্রেরই আদরের সামগ্রী; সুতরাং এই দ্বাদশ খণ্ড কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-ভাণ্ডারের মূল্যবান রত্নরূপে গৌরব লাভ করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব, এবং তাহা হইলেই সারস্বত মন্দিরের একটা অপূর্ণ প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হইবে। তবে আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন স্থল পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। মাত্র কয়েকটি অংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম—

(১) অকস্মাৎ চারি দিকে ফুটিল (?) সৌরভ।

(২) শিশু বাপ্পা নবীন সঞ্চারে (?) ধায় ধেনুর পশ্চাতে।

(৩) যাগ, যজ্ঞ, মঠ, বর্ত্ম, দীর্ঘিকা-খনন কর রাজ্যে অনুষ্ঠিত (?)।

(৪) আত্ম হতে আত্মতর (?) হইবে তাহারা।

(৫) — — ভীম বাদল— —

খেলাইবে রাজস্থানে ইরম্মদ নাদে (?)

(৬) কুলায় (?) বিহগ মর্ম্মরিছে (?) পর্ণ-কুঞ্জে—

(৭) আকাঙ্খার (?) উচ্চ স্তরে উঠি ভিন্ন গ্রাম (?)

অধিকন্তু পুস্তকখানিতে বর্ণাশুদ্ধি অতি সুলভ; কমা প্রভৃতি পাঠ চিহ্নাদির অপব্যবহারে প্রায় প্রতি পংক্তির ভাব উদ্ধারেই গোলযোগ ঘটে।

আবার আর এক শ্রেণীর প্রমাদ লক্ষ্য করুন—

(১) দাঁড়াইল বন্দীপদ (বন্দি পদ) বিনম্র সুধীর।

(২) পূরাইব উচ্চ লক্ষ্য অভীষ্ট-প্রবল।

(৩) বিভাতিল (?) বিভাবরী সংগ্রাম হুঙ্কারে—

অলমতি বিস্তরেণ

শান্তিময়।

২৩। মহরম—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ঢাকা পপুলার লাইব্রেরী হইতে শ্রীহরিরাম ধর, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত, আকার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাণস্পর্শী মহরম-কাহিনী বালক বালিকাগণের জন্য সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মহাত্মা হাসেনের ক্ষমা, চরিত্র-মাহাত্ম্য, ধর্ম্ম ভাব ও উদারতা, এবং হাসেনাবানুর অপূর্ব্ব স্বামি-ভক্তি ও সপত্নী-প্রীতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুর্লভ। বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া এই আদর্শ চিত্রণে গ্রন্থকার অকৃতকার্য্য হন নাই। আবার পার্শ্বেই মামুনা ও জায়েদার চরিত্রের লোমহর্ষণ অভিনয় ও ভীষণ পরিণাম। এই সকল দৃষ্টান্ত পাঠ করিলে মনে পুণ্য ও ধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং পাপ ও অধর্ম্মের প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ যুগপৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। পাতায় পাতায় সুন্দর রঙিন বর্ডার—এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মক্কা, মদিনা, কুফা ও কারবালার চারিখানি হাফ্‌টোন্ ছবিই অতি সুন্দর হইয়াছে।

শান্তিময়।

সহদেব *

পঞ্চ পাণ্ডবের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব ছাড়া আমাদের বঙ্গের পল্লী নিকুঞ্জে আর এক সহদেব বাস করে। এ সহদেবও ছোট বটে, কিন্তু সে মানুষ নয়,—পাখী।

সহদেবকে পাড়াগাঁয়ে চলিত কথায় 'সওদেব' পাখী বলে। কেহ কেহ ইহার "কৃষ্ণসখী" আখ্যাও দিয়া থাকেন। সহদেব যে শিষ্ দেয় তাহাতে ঠিক যেন বলে "স-হ-দে-ব, "ও স-হ-দে-ব"! অপর পক্ষ বলেন, না সে বলে "কৃষ্ণ সখী" "ও কৃষ্ণ সখী।" তবে শেষোক্ত মতের সমর্থনকারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম সুতরাং ভোটের বিচার মতে আমরা সহদেব নাম গ্রহণ করিতে পারি। লেখক স্বয়ংও এই মতের পক্ষপাতী ইহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ দেশে শাক্তের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিরদিকে চলিতেছে, এমতাবস্থায় স্বয়ং কৃষ্ণের পক্ষ পাওয়াই দায়. "কৃষ্ণসখীর" ত কথাই নাই।

সহদেবের বর্ণ গেরিমাটীর মত। গেরিমাটী জলে বেশ ঘন করিয়া মারিয়া লইলে যে রঙ্ হয় তাহার চাইতে একটু ময়লা রকম সহদেবের বর্ণ। ইহারা বেশ গোলগাল ছোট পাখী। চড়ুই অপেক্ষা সহদেব বড় নহে; তবে মোটা একটু বেশী এবং লম্বে ঈষৎ খাট। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে একই বর্ণ। কেবল তৈল-কোষের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ঈষৎ ফিকে লাল। সে স্থানে পাখীর সঞ্চিত 'সার' বা 'তৈল' থাকে, কাজেই পার্শ্ববর্ত্তী পালখ-গুলি সতেজ হইয়া প্রকৃত বর্ণের উপর একটু গাঢ় হইয়া প্রকাশিত হয়। অত্যধিক সারের মাটীর ঘাস চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ঘাসের অপেক্ষা তেজীয়ান ও চক্‌চকে হইয়া উঠে।

সহদেবের পায়ের রংও অনেকাংশে পালখের রঙেরই মত। পা সরু এবং অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। চক্ষু দুটি চল্‌চলে ও পরিষ্কার। তাহার চারিদিকে ফিকে শাদা রঙের অতি সরু ডোরা দেওয়া। ঠোঁট সোজা এবং সিকি-ইঞ্চি লম্বা। ঠোঁট ও পায়ের বর্ণ প্রায় একরূপ। তবে ঠোঁট একটু পরিষ্কার দেখা যায়; কারণ,—প্রসাধনের সহায়তা করিতে ঠোঁটের ব্যবহার। ব্যবহারের গুণে ইহা বেশী পরিষ্কার বোধ হয়।

সহদেবের ডানার পালখ মাত্র আড়াই ইঞ্চি লম্বা। পালখের অপর পৃষ্ঠ (নিম্ন দিক) ঈষৎ শাদা। এই পাখীর ডানা মজবুত হইলেও ইহারা কদাচিৎ বাহিরের মুক্ত বায়ুতে বেড়ায়। দুর্ব্বলের পক্ষে স্পর্দ্ধা করিয়া সমাজের মধ্যে আপনাকে খাড়া করা অপেক্ষা আত্মপ্রকাশ না করায় লাভ বেশী। এজন্যই সহদেব কাহারও সঙ্গে মেশামেশি করিতে চাহে না। ইহারা উষা সমাগমেই জাগিয়া বাসা পরিত্যাগ করতঃ বাঁশের ঝোপ বা লতাকুঞ্জে অথবা ছোট ঝোপের ভিতর কখন বসিয়া, কখন নাচিয়া নাচিয়া ডালে ডালে বেড়াইয়া গান করে.—"সহদেব" "ও সহদেব।" ঠিক তাহার পরেই আর এক ঝোপ হইতে উত্তর হয় "সহদেব" "ও সহদেব।" অতি মধুর পঞ্চমে এই ক্ষুদ্র পাখী শত কণ্ঠে, উষা রাণীর সম্বর্দ্ধনা করে। প্রত্যুষে উঠিয়া ঝোপের আসে পাশে বা অদূরবর্ত্তী রাস্তায় ভ্রমণ করিলে উষার শীতল বায়ু যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে সুখ সেব্য হয়, এই ক্ষুদ্র পাখীর গানও তেমনই শ্রুতি-মধুর হইয়া থাকে। প্রায় একই সময়ে চারি দিকে কুড়ি পঁচিশটা সহদেবের সমবেত শিষ শোনা যায়। সকলেই মন প্রাণ খুলিয়া গাইতেছে "সহদেব", "ও সহদেব।"

সহদেব উচ্চ শাখায় ভ্রমেও পা দেয় না, প্রকাশ্য স্থানে তাহার গতিবিধি নাই। সহদেব যেন গৈরিকে রঞ্জিত বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নির্জ্জন বনান্তরালে আত্মরক্ষা করতঃ ভগবানের নাম গানে বিভোর হইয়া থাকে। ইহারা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দেড় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নাচিয়া গাহিয়া কাটাইয়া দেয়। আবার অপরাহ্নে যখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন প্রান্তে চলিয়া পড়েন, তখনও সহদেব গান করিয়া তাঁহাকে বিদায় বন্দনা করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় বারমাসই আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া কাটায়।

* "গায়ক পাখী।"

সহদেব অনুচ্চ ঝোপে বা বাঁশ ঝোপের মধ্যে কোনও বিশেষ সুরক্ষিত স্থানে পালখ, আঁশ, লোম প্রভৃতি দ্বারা গোলাকৃতি করিয়া বাসা তৈয়ার করে। ইহারা ফাল্গুন মাসের শেষ বা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে ডিম্ব প্রসব করে। এক কালে তিন চারিটি ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে ডিমগুলি ঈষৎ নীলাভ এবং আধুল্লির চেয়ে ছোট। ইহারাও পরের বাসায় ডিম পাড়িবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত থাকে এবং সুবিধা পাইলে "নাচ্‌নী ঘুরণীর" বাসায় ডিম পাড়ে। "নাচ্‌নী" পাখীও পরের হাতে ছেলের ভার দিতে উদ্যোগী; সুতরাং সহদেব সর্ব্বদা পরের উপর ধাত্রীগিরিটা দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারে না। "নাচ্‌নী" প্রায়ই আপন বাসার অদূরে তাহার নাচের আসর জমাইয়া লয় এজন্যও সহদেবের অসুবিধা নিতান্ত অল্প হয় না। মোট কথা সহদেব ও কতকাংশে পরভৃত। তবে সে স্বয়ং ধাত্রীবিদ্যায় অপটু নহে।

ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সহদেব সহজেই পোষ মানে কিন্তু নালবর্ণের ছ'ভাজ কাপড় দিয়া খাঁচা ঢাকিয়া না রাখিলে সে শিষ্‌ দেয় না, কেবল খাঁচার এ পাশে ওপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে "রাধাকৃষ্ণ" বুলি ধরিতে দেখা যায় না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রাজা চিত্রসেন রায়

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মহব্বৎ জঙ্গ ময়ুরভঞ্জের রাজার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই অবসরে নাগপুরের অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতও ষষ্টিসহস্র মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিতেছেন শুনিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ ময়ুরভঞ্জ জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বঙ্গদেশের দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য ময়ূরভঞ্জের উপকণ্ঠস্থ বন অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রগণ বর্দ্ধমানের অভিমুখে ধাবিত হইয়া নগর বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ও প্রচুর ধনরত্ন তাহাদের হস্তগত হইল। মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ নগরের গৃহসকল দগ্ধ করিতে লাগিল। নাগরিকগণ প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া দূরে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় লইল। ইহাই বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে আবালবৃদ্ধ বনিতার ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইত্যবসরে আলিবর্দ্দীর সেনা বর্দ্ধমান পঁহুছিল। মুসলমানে মহারাষ্ট্রে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ মারহাট্টাগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিলেন। তথাপি তিনি রণে বিরত হন নাই! সারাদিবস অনাহারে, অনিদ্রায়, কখনও বৃক্ষপত্র ভোজন করিয়া, কখনও বা তৃণক্ষেত্রে শয়ন করিয়া তিনি কাটোয়ায় উপস্থিত হয়েন। সেই সময়ের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। সৈয়দ্‌ গোলাম হোসেন তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সায়র উল মুতাক্ষরীণে তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ কাটোয়ার দুর্গ হইতেই ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহারাষ্ট্রগণকে পরাজিত করেন। ‡

বর্গীর হাঙ্গামার সময় চিত্রসেন রায় বর্দ্ধমানে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। হাণ্টার সাহেব বলেন যে, বর্দ্ধমান যে সময়ে বর্গীগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সে সময়ে চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র তিলক চন্দ্র বর্দ্ধমানের রাজ গদীতে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, চিত্রসেন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২ খৃষ্টাব্দ) যে তাঁহারই সময় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। (Vide Hunter's

† ইহার খাঁটী নামটি এপর্য্যন্ত জানিবার সুবিধা হয় নাই। অগত্যা যে নামে সে আমাদের নিকট পরিচিত সেই নামই ব্যবহার করিলাম। নাম জানিতে পারিলে উহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে। লেখক।

‡ Duff's History of Mahrattas.

Statistical Account of Bardwan) হান্টার তিলক চন্দ্রের লিখিত একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহেন যে, তাঁহার সময়ে বর্দ্ধমান বর্গীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

কিন্তু উল্লিখিত পত্র খানির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। আলিবর্দ্দী খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতকে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নিহত করেন। তাহার পর হইতে পুনরায় মহারাষ্ট্র বর্গীর অত্যাচার বঙ্গ দেশে প্রবল ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সময়ে তাহারা আর একবার বর্দ্ধমান লুণ্ঠন করে। তাহারই কথা সম্ভবতঃ পত্রে উক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, চিত্রসেন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান হইতে পলায়ন করিয়া যশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। নলডাঙ্গায় সে সময়ে রঘুদেব রায় রাজা ছিলেন। রঘুদেব বর্দ্ধমানের রাজাকে সাদরে নলডাঙ্গায় গ্রহণ করেন। নলডাঙ্গায় প্রবাদ এই যে, রঘুদেব চিত্রসেনের সহিত পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্ব সূত্র স্থাপিত করেন। বর্গীগণের আক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্ম চিত্রসেন এক সুরক্ষিত গড় নির্ম্মান করেন। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী তৈলকূপ গ্রামে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত গড়ের পরিধি ন্যূনাধিক অর্দ্ধমাইল। চতুর্দ্দিকের গভীর পরিখা এখনও এই স্থানের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই পরিখা তিন চার হাত গভীর এবং প্রস্থে ছয় সাত হাত হইবে। নদী-তীর হইতে একটি আঁকা বাঁকা পথ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে নিম্নতর ভূমির মধ্য দিয়া গড়ে প্রবেশ করিয়াছে। এই পথ ধরিয়া গড়ের উপর উঠিলে সম্মুখেই একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও চিত্রসেন খনন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই পুষ্করিণী এক্ষণে কর্দ্দমপূর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিক বেতস বনে আচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। অধুনা গড়ের মধ্যে প্রচুর পরিমানে পুরাতন ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে এই ধ্বংসপ্রায় দুর্গ "রামধন দত্তের গড়" নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থান রামধন দত্ত নামে এক ব্যক্তির অধিকারে থাকায় উক্ত গড় এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।*

গড়ের অনতিদূরে দুইটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরে পূর্ব্বে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। অধুনা ইহা কোনও নৈসর্গিক কারণে মৃত্তিকানিম্নে বসিয়া গিয়াছে।

চিত্রসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বেগবতী নদী-তীরে বর্ত্তমান। এখানে তিনি একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শিবের নাম "গুঞ্জনাথ"। তাঁহার নামে নদীর পর পারে অবস্থিত গুঞ্জ নগরের নামকরণ হইয়াছে। গুঞ্জনাথকে লোকে "বুড়োশিব" বলিয়া থাকে। গুঞ্জনাথের মন্দির বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময়ই ইষ্টকের উপর মনোহর শিল্পকার্য্য সর্ব্বপ্রথম দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। দরজার উপর নিপুণ হস্তে রামচন্দ্রের সহিত রাবণের সমরাভিনয় চিত্রিত হইয়াছে। এক পার্শ্বে রথারূঢ় রামচন্দ্র ও তাঁহার আগণিত বানর সৈন্য এবং অপর পার্শ্বে লঙ্কাপতি রাবণ ও তাঁহার ভীষণ দর্শন রাক্ষস-অনীকিনী। এই চিত্রটি দেখিয়াই শিল্পীর শিল্প কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মন্দির গাত্রস্থ প্রত্যেক ইষ্টক খোদিত কারুকার্য্য শোভিত। কোনও ইষ্টকের উপর এক জন শিকারী ক্ষিপ্রহস্তে ভল্লদ্বারা শূকর বিদ্ধ করিতেছেন; কোনও ইষ্টকের উপর দ্বারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে; কোথাও বা মনোহর কুসুমহার শিল্পীর শিল্পকুশলতার পরিচয় দিতেছে। অঙ্কিত চিত্রগুলি শিল্প নৈপুণ্যে সজীব বলিয়া বোধ হয়।

চিত্রসেন বর্গীর হাঙ্গামার অবসানে বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করেন। মৃত্যুপর্য্যন্ত তিনি নলডাঙ্গার মন্দিরগুলির পরিচালনাকার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বহু দিন ধরিয়া গুঞ্জনাথের সেবা করিয়াছিলেন।* এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয় ভার নলডাঙ্গার রাজা কর্তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে। চিত্রসেন চলিয়া গিয়াছেন, সে আজ কত দিনের কথা, কিন্তু তাঁহার কাহিনী আজিও নলডাঙ্গার অধিবাসিগণের মুখে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

* Vide "the Naldanga Raj" family.

* Vide the Naldanga Raj family.



প্রতিভা

২য় বর্ষ আশ্বিন ১৩১৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গলা ভাষার প্রসর বৃদ্ধি

অর্থাৎ

বাঙ্গলার প্রান্তবাসী পার্ব্বত্য জাতি সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর প্রচলন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব

(চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

ভারতের সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে বাঙ্গলার স্থান আজি সর্ব্বোচ্চ। কবিতা ও নাটক, পুরাণ ও উপন্যাস, ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা, ব্যাকরণ ও বাদার্থ, ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনী, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন, জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র, সমাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতিষ, জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যার প্রায় সকল শাখায়ই অল্পাধিক বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, সাহিত্য, প্রতিভা প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্রেও এই সকল শাস্ত্রের নানারূপ প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। ইহা স্বীকার্য্য যে, এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরাজি বা সংস্কৃত পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, অনেকগুলি কেবল অনুবাদ। তাহা হইলেও এই সকল দ্বারা বঙ্গভাষার কলেবরের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। আর ইহাদের মধ্যে মূল গ্রন্থও আছে; অনেকগুলি পুস্তকে মৌলিক গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দৃষ্ট হয়। কতকগুলি গ্রন্থে প্রতিভার বিকাশও পূর্ণ বা আংশিক ভাবে দেখা যায়। ইহা বাঙ্গালির কম গৌরবের কথা নয়।

আর একটি গৌরবের কথা এই যে, এই সকল গ্রন্থের পাঠক এখন বাঙ্গলায় বর্ত্তমান। পাঠক না থাকিলে গ্রন্থপ্রকাশে প্রবৃত্তি থাকে না, গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। স্থূল কথা, বঙ্গদেশে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও শিখিবার আগ্রহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। বাঙ্গালি এত দিন পাশ্চাত্য বিদ্যার ভার বহন করিয়া আসিয়াছে মাত্র—এখনও সে ভার সম্পূর্ণ রহিয়াছে। তবে বাঙ্গালি এখন বুঝিয়াছে, বুঝিতেছে যে, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, মাতৃ ভাষায় না পড়িলে সেই সকল বিষয়ে পূর্ণ অধিকার লাভ করা বড়ই কঠিন। কেবল শাস্ত্রপাঠে বিদ্যা হয় না! শাস্ত্র সুচিন্তিত হইলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। লোকে প্রায়ই মাতৃভাষায় চিন্তা করিয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন ভাষায় রচিত শাস্ত্রগুলি বাঙ্গলায় বিশুদ্ধরূপে অনুদিত করিয়া লইলে ঐ সকল গ্রন্থে সাধারণ বাঙ্গালি পাঠকের অধিকার লাভ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। আপনাদের ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা অল্পতর আয়াসে মূলগ্রন্থলেখক নানাদেশবাসী দেবমানবগণের সাহচর্য্য লাভে সমর্থ হইতে পারি। ভিন্ন ভাষায় বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার পরিশ্রম তত্ত্বচিন্তায় প্রযুক্ত

হইলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। তাহাতেই শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে—ক্রমে আত্মদর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়। সেই জন্যই এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন অধিকতর বিস্তার লাভ করিলেও বাঙ্গালি মাতৃভাষায় অনুদিত বাঙ্গলায় লিখিত বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। ফলতঃ বাঙ্গালি এখন জ্ঞান-বলে মানুষ হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; পরানুবর্ত্তিতা ক্রমে ছাড়িতেছে; সকল প্রকার অসুবিধা, ব্যাঘাত ও উপহাস সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজের পরিশ্রম একাগ্রতা ও তপস্যার বলে মানবসমাজে আপনার জাতিগত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছে। তাহাতেই অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের এত উন্নতি।

বিদ্যার নানা শাখায় বাঙ্গলার যেরূপ কলেবর পুষ্টি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রসরবৃদ্ধিও তদনুরূপ হইতেছে কি না, তাহাও আমাদের বিচার্য্য বিষয়। বাঙ্গলাভাষী ও বাঙ্গলাপাঠীর সংখ্যা বৃদ্ধিতেই বঙ্গভাষার প্রসর বৃদ্ধি। সে দিকে কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। তাহার একটা প্রধান কারণ, বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভাষার উপর বর্ত্তমান বিতৃষ্ণা। পূর্ব্বে মুসলমানেরা হিন্দুর ন্যায় বাঙ্গালা শিখিতেন, বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতেন, গান বাঁধিতেন। বাল্যকালে, ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা মুসলমান প্রতিবেশী বালকদিগের সহিত একত্র এক বাঙ্গলা পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি। মুসলমানের বাঙ্গালা শিখিবার আগ্রহ হিন্দুর অপেক্ষা কম ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা জাতিনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালাতেই সম্পাদিত হইত। এখন কিন্তু ঐ পাঠশালা সমূহে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। ইহার কারণ, অনেক মুসলমান এখন বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত।

তাঁহাদের এই বিতৃষ্ণা কেবল বঙ্গভাষার উপর নয়, বঙ্গাক্ষরের উপরেও কতকটা আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত উর্দ্দু পদবহুল মুসলমানি বাঙ্গলা গ্রন্থ সকল সচরাচর পঠিত হইত। এখন ঐ সকল পুস্তকের প্রচলন সেরূপ দেখা যায় না। আবার শ্রীহট্ট অঞ্চলের কতক মুসলমান 'সিলেটি হিন্দি' নামে এক অপূর্ব্ব ভাষা প্রচলনের প্রয়াসী। ইঁহারা বর্ণের সংখ্যা কমাইয়া লিখিত ভাষা উচ্চারণানুগ করিতে চাহেন। এ চেষ্টায় বিশেষ দোষ নাই। বর্ত্তমান সময়ে অনেক দেশে অনেক ভাষা-ভাষীদিগের মধ্যে এই নূতন রোগের আবির্ভাব দেখা যায়। তবে বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী শ্রীহট্টের উক্ত মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে বঙ্গাক্ষর ও বঙ্গভাষায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ লঙ্ঘন করিয়া সিলেটি 'হিন্দি' চালাইতে চাহেন, ইহাতে হয়ত শক্তিক্ষয়েরই সম্ভাবনা। শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার ব্যতীত স্থায়ী উপকার লাভ হয় না।

হিন্দু মুসলমানের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য, পূর্ব্ব সাহায্য সাহচর্য্যের অন্তর্দ্ধানের সহিত বাঙ্গালা ভাষার প্রতিও মুসলমানের অনুরাগ কমিয়াছে। এখন প্রধান প্রধান গ্রামে, সহরের প্রায় পল্লীতে পল্লীতে, বাঙ্গালা পাঠশালার ন্যায় উর্দ্দু পাঠশালা বসিয়াছে ও বসিতেছে। ইহার ভিতর রাজনৈতিক কথা সংসৃষ্ট আছে কি না, তাহা আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালা সেবকের এইরূপ শিবির পরিবর্ত্তন বড় ক্ষোভের কথা। সুখের বিষয় এই এখনও দেশে এমন মুসলমান আছেন, যাঁহাদের জীবন মাতৃভাষার সেবায় উৎসৃষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা সুলেখক ও সুলেখিকাও আছেন। ইমদাদুল হক্, সৈয়দ এমদাদ আলী, আব্দুল করিম, ওসমানআলী, মহাম্মদ কে চাঁদ, এবং কোহিনুরের বর্ত্তমান সম্পাদক প্রকৃত শক্তিশালী বাঙ্গালা লেখক। কিন্তু তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাতৃভাষানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইতেছে না। কারণ, এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যেন একটু মনোমালিন্য দাঁড়াইয়াছে, অনেক অনেক বাঙ্গালি মুসলমান এখন বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া মনে করিতেছেন। বাঙ্গালাকে তাঁহারা মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। কতকগুলি প্রধান পরিবারে

যথাসম্ভব উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা চালাইবারও প্রয়াস চলিতেছে। জননী বঙ্গভাষা অনেকগুলি সুসন্তান হারাইতে বসিয়াছেন।

প্রকৃতই বাঙ্গালি মুসলমান সম্প্রদায়ে উর্দ্দু বা পারসি কথোপকথনের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে—এরূপ আশঙ্কা হয়ত অমূলক। আর মুসলমানদিগের উক্তরূপ মনোভাবে বঙ্গভাষার প্রসর-হ্রাসের আশঙ্কা প্রকৃত না হইতেও পারে। তাহা হইলেও যাহাতে বিভিন্ন উপায়ে বঙ্গভাষার প্রসর বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক বাঙ্গালিরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বাঙ্গালি সমাজের বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি।

বঙ্গের উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বহু সংখ্যক পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। পূর্ব্বে ও উত্তরপূর্ব্বে ত্রিপুরি, মণিপুরি কুকি, খাসিয়া, মিথান নাগা, তাবলঙ নাগা, খাসি নাগা, আঙ্গমি নাগা; মধ্যে গারো; পশ্চিমে সাঁওতাল; এবং উত্তরে নেপালি, পার্ব্বত্য লেপছা, সিকিমি ও ভুটিয়া জাতির বাস। এই সকল জাতির মধ্যে যথাসম্ভব বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর প্রবেশ করাইতে পারিলে অনেক কাজ হয়। তবে কোন কোন জাতির মধ্যে বঙ্গাক্ষর বা বঙ্গভাষার প্রচলন সম্ভব, তাহা অনুসন্ধেয়।

উত্তরে পর্ব্বতবাসী নেপালি, পার্ব্বত্য সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপছা জাতির মধ্যে বাঙ্গলা প্রবেশিত করা সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি একার্থ বোধক শব্দ দেখিলেই বুঝা যায় যে, নেপালি পার্ব্বত্যদিগের (পাহাড়িয়া জাতির) ভাষা প্রায় হিন্দি। সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপছা জাতির ভাষা প্রায় তিব্বতীয় ভাষার অনুরূপ।

বাঙ্গলা	নেপালি পাহাড়িয়া	ভুটিয়া	তিব্বতীয়	সিকিমি	লেপচা
হাওয়া বায়ু	বাতাস	লুং	লুং	লুং	
পিপড়া, রুই	কমিলা	কোমা	টোমা	কোমা	
বান, শর, তীর,	দা	দা	দা	দা	শিসি
পক্ষী	চারা (Tsara)	পিকুং	কিউ	পিকুং	কো
রক্ত	রগ	খ্যাগ	ঠাক	খ্যাক	
নৌকা	নাশ	টু	টু	টু	
অস্থি, হাড়	হাড় -	রিতোক	রুইপা	বিত্যেক	
মহিষ	ভইসী	মহি	মহি	মহি	
বিড়াল	বিড়ালু	পিলি	শিমি	আলুই	
গো	গাই	নো	পাজুক	নো	
কাক	কাগ	অইলা	ওরোগ	অইলা	
দিন	দিন	ঞিম্	ঞিমা	ঞিন্	
কুকুর	কুকুর	খি	খি	খি	
কর্ণ, কান	কান	নম্‌কো	নাওয়া	নম্‌কো	
পৃথিবী	নাটো	সা	সা	সা	

নেপালি পাহাড়িয়া জাতির লিখিত সাহিত্য আছে; লিখনে হিন্দি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপছা দিগের মধ্যে তিব্বতীয় সাহিত্য প্রচলিত, এবং ইহাদের নিজের ভাষা তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত হয়। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে রোমান্ বা ইংরাজী বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টাও হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। এই সকল জাতির যখন লিখিত ভাষা দাঁড়াইয়াছে, এবং লিখনার্থ নির্দ্দিষ্ট বর্ণমালাও আছে, তখন ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর প্রচলনের প্রয়াস বৃথা। তবে সিকিমি, ভুটিয়া ও লেপছা জাতির মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্য চালাইবার চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে ফলপ্রসূ হইতে পারে; কারণ এই সকল

জাতির তিব্বতের সহিত সম্বন্ধ ক্রমেই কমিতেছে এবং বাঙ্গলার সহিত সংস্রব বাড়িতেছে।

ত্রিপুরি (টিপরা) মণিপুরি ও কুকি জাতির মধ্যে আমাদের কার্য্যের প্রসর সম্পূর্ণ আছে। ত্রিপুরি ও মণিপুরিদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও ইহারা অনেকে বাঙ্গালির সংস্রবে আসিয়া বেশ বাঙ্গালা বলিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরি ও মণিপুরি ভাষা ঐ দুই জাতির পারিবারিক ভাষা মাত্র। বাঙ্গালির সহিত ইহারা বাঙ্গালাতেই কথা বলে। অপেক্ষাকৃত উন্নত ত্রিপুরিগণ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন। উন্নত মণিপুরিগণও অনেকে বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থ আলোচনা করেন। ইহাদের পারিবারিক ভাষা লিখিবার জন্য স্বতন্ত্র বর্ণমালা নাই। সুতরাং অনায়াসেই ত্রিপুরি ও মণিপুরি ভাষা লিখনে বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে।

কুকি জাতির লিখিত ভাষা নাই। ইহারা প্রধানতঃ স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা—ঐ রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে বাস করে। ইহাদের অধিনেতৃগণ ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত রাজা বলিয়া পরিগণিত। ত্রিপুরাপতি এই জননায়কদিগকে রাজোপাধি প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা প্রচলনের চেষ্টা পূর্ব্বেও হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের যত্নে ও উদ্যোগে (১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে বা ১৮৮৪ সালে) কৈলাসহর মহকুমার মধ্যে মৃত কুকিরাজ রাঙবুম বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা মুরচুঙ্গী বাহাদুর ও তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী লালমুরিচুঙ্গী উল্লিখিত কুকিরাজের উজিরের কন্যা শ্রীমতী লাল থুমি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুকি বালকবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য প্রথমে একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়। তৎপরে ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে প্রধানতঃ স্বর্গীয় খথ মনাই রাজার শিক্ষার্থ তাঁহার বাটীতে একটি এবং মৃত লালসইয়া রাজা বাহাদুরের পুত্রগণের শিক্ষার্থ আর একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার পর অন্যতম কুকিরাজ খ৮া বাহাদুরের বাটীতেও একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অধিকার কালে এই বিদ্যালয়গুলির অবস্থা বেশ ভাল ছিল এবং শিক্ষাপরিদর্শনাদি কার্য্য সুচারুরূপে চলিত। এই বিদ্যালয় এখন আছে কি না—থাকিলে ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা বলা যায় না। তবে কুকিদিগের শিক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন ও আগ্রহ নাই এইরূপ জনরব শুনা যায়। যাহাই হউক এখানে কর্ম্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিকের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত। বিশেষ চেষ্টা করিলে এই মহৎ কার্য্যে ত্রিপুরা ও মণিপুর দরবারের সাহায্যও মিলিতে পারে।

উল্লিখিত জাতি সমূহের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যের প্রবর্ত্তনের সহিত যাহাতে বঙ্গাক্ষরে উহাদের তথা কথিত পারিবারিক ভাষা লিখিত হয় সে চেষ্টাও কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা ভাষা এই সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ প্রসর লাভ করিলে হয়ত ক্রমে বর্ত্তমান কথিত ভাষাগুলি হতাদর হইয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, তত দিন ঐ সকল ভাষা উপেক্ষা করিলে অন্য পক্ষ হইতে ভিন্নাক্ষরে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ ভাষাগুলিকে সাহিত্যিক গৌরব প্রদানের চেষ্টা হইতে পারে। তখন বর্ত্তমান আসামিগণের ন্যায় ঐ সকল জাতির মধ্যেও কেহ কেহ জাতিগত ভাষাগত স্বতন্ত্রতাকাম হইয়া শক্তিহীন মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ সৃষ্টির পক্ষপাতী হইতে পারেন। বাঙ্গালি কর্ম্মী সাহিত্যিকগণ এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করেন এই প্রার্থনা।

উল্লিখিত জাতিসমূহের ন্যায় গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত নাগাদিগেরও কথিত ভাষার বর্ণমালা নাই। পাদ্রিসাহেবদিগের চেষ্টায় রোমান অক্ষরে ঐ সকল ভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও বাইবেলাদি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এ উদ্যম এখনও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই; কারণ এখনও এই সকল জাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা বিস্তার লাভ করে নাই। আরও এ দেশীয় ভাষাসমূহে উচ্চারিত স্বর ও ব্যঞ্জনগুলির জ্ঞাপক সকল অক্ষর রোমান বর্ণমালায় নাই। বাঙ্গালা

বর্ণমালাও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নহে। তাহা হইলেও রোমান বর্ণমালায় এ অসম্পূর্ণতা অনেক অধিক। আবার এই সকল জাতির মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালির সংস্রবে আসিয় বাঙ্গালা বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষিত লোকের বঙ্গাক্ষরে আদর স্বাভাবিক। তবে খাসিয়া জাতি এবং মেলা অঞ্চলের অধিবাসীদিগের (ইঁহারাও একশ্রেণীর খাসিয়া), মধ্যে অনেকে ইংরাজি শিখিয়াছেন। ইহারা বেশ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী। অল্পকাল মধ্যেই ইহঁাদের মধ্যে অনেকে এরূপ ইংরাজি শিখিয়াছেন যে, সরকারি আপিষের কাজকর্ম্ম বেশ চালাইতে পারেন। এই শিক্ষিত খাসিয়াগণ ইংরাজি ভাষা ও রোমান অক্ষরের পক্ষপাতী। এই শ্রেণীর লোক অনেকে খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ইহঁারা বাঙ্গালির সহিত মিলিতে মিশিতে প্রয়াসী। কোন কোন ধর্ম্মে নবদীক্ষিত হইলে যেমন জাতি, বর্ণ, পরিচ্ছদ—এমন কি নাম পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া নূতন মানুষ হইতে হয়, খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষায় তেমন কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে না; সুতরাং স্বজাতীয়দিগের মধ্যে, আপনাদের সমাজে তাহাদের স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় না, বাঙ্গালি হিন্দুর সহিতও পূর্ব্ববৎ মিলিয়া মিশিয়া থাকেন। এইখানেই আমাদের আশা আছে। ইহারা যদিও এখন আপনাদের ভাষা লিখন পঠনে রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা ভাষা শিখিলে ঐ সকল কার্য্যে বাঙ্গালা বর্ণমালার উপযোগিতা বুঝিবেন। আর ঐরূপ শিক্ষিত খাসিয়ার সংখ্যা অতি অল্প, আর ইহাদের বাঙ্গালি বিদ্বেষ বা বাঙ্গালা বিদ্বেষ নাই, বরং বাঙ্গালিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে গারোদিগের অবস্থা হীন হইলেও ইহারা অনেকেই বাঙ্গালা বুঝে। গারোপর্ব্বতের দক্ষিণে অধিত্যকা ও উপত্যকাবাসিগণ সর্ব্বদাই ক্রয়বিক্রয়ার্থ মুন্সীর হাট, হালুয়ার ঘাট প্রভৃতি বিপণিস্থলীতে আসিয়া থাকে। বেত্রনির্ম্মিত নানা দ্রব্য এবং পর্ব্বতোৎপন্ন অন্যান্য সামগ্রী ঐ সকল বিপণিতে বিক্রয় করিয়া ইহারা তৈল লবণাদি কিনিয়া লইয়া যায়। ইহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখিয়াছি, ইহারা বাঙ্গালা একরূপ বুঝিতে পারে এবং এরূপ মিশ্রিত ভাঙ্গা বাঙ্গালা বলে, যাহাতে হাটের লোক তাহাদের অভিপ্রায় বেশ বুঝিতে পারে। এই জাতির বুদ্ধি তত প্রখর নয়, কিন্তু ইহারা ধীরপ্রকৃতি এবং বাঙ্গালিকে বেশ সম্মান করিয়া চলে। তবে ইহারা বাঙ্গালির সহিত একত্র এক গ্রামে প্রায়ই বাস করে না। মাঠে, পর্ব্বত-পাদে উপত্যকায়, স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রবৃহৎ পল্লীসমূহে, মঞ্চোপরি নির্ম্মিত গৃহমণ্ডলীতে ইহাদের বাস। এই স্বতন্ত্রতার জন্য বাঙ্গালিই দায়ী। তাঁহারা গারোদের সহিত একত্র থাকিতে চাহেন না—তাহাদিগকে 'বাঙ্গাল' নামে আখ্যাত করিয়া নানারূপ অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন। গারোদের পল্লীতে প্রবেশ করিলে তাহারা বিরক্ত হয় না, অথবা নবাগত হিন্দু বা মুসলমানকে দেখিলে তাহাদের 'পচুই'-পান বা নৃত্যবাদ্যের ব্যাঘাত ঘটে না।

ছোটনাগপুরে—বিশেষতঃ মানভূম জেলা এবং কয়লার খনি ও রেলওয়ের নগরসমূহে শত শত সাঁওতাল বাঙ্গালির সংস্রবে সর্ব্বদাই আইসে। কলিকাতাতেও অনেক সাঁওতাল থাকে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় অক্স্‌ফোর্ড মিশন স্কুলে যাইতাম। অনেক সাঁওতাল বালক সেখানে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস ও শিল্প শিক্ষা করে। শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড মতিলাল ঘোষ প্রমুখ সুশিক্ষকদিগের যত্নে ইহারা প্রায় বাঙ্গালি হইয়া উঠিয়াছে। এই ছাত্রদিগকে সাঁওতাল বলিয়া চেনাই যায় না ইহারা বেশ বাঙ্গালা বলে এবং পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন—সকল বিষয়েই ঠিক বাঙ্গালি খৃষ্টান বালকের ন্যায়। ইহারা দেশ-নির্ব্বাসিত বা সমাজ-সংস্রবশূন্য নহে। এই বালকেরা এখানে বাঙ্গালা শিখিয়া দেশে গিয়া যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালার প্রসর বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালি প্রচারক, যাজক ও শিক্ষকদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী করিতে পারিলে এই কর্ম্ম সিদ্ধির পথ অনেক উন্মুক্ত হয়। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি

মিশনরি বঙ্গের সীমান্তে পার্ব্বত্য দেশসমূহে থাকিয়া ধর্ম্ম ও বিদ্যালোক বিস্তার করেন। তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষানুরাগীও অনেক আছেন। তাঁহারাও বাঙ্গালি ও বঙ্গভাষী। আর বাঙ্গালি সাহিত্যিকদিগের মনে সাম্প্রদায়িক ভাব বড় নাই। সুতরাং বাঙ্গালি মিশনরিগণের সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগকে এই জাতীয় কার্য্যে আকৃষ্ট করা বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। অথচ ইঁহারা আমাদের সাহিত্যসহযোগী হইলে অনেক কাজ হইবার সম্ভাবনা। সাঁওতালেরা সর্ব্বদাই বাঙ্গালির সংস্রবে আসে বলিয়া ইহারা অনেকে বাঙ্গালা বুঝে এবং বাঙ্গালায় আপনাদের মনোভাব একরূপে ব্যক্ত করিতে পারে। ইহারা বাঙ্গালিকে শ্রদ্ধা করে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাদিগকে বাঙ্গালি-প্রীতি শিখাইয়াছেন।

গারো ও সাঁওতালদিগকে বাঙ্গালা শিখান এবং উহাদের ভাষা লিখনে বঙ্গাক্ষরের প্রবর্ত্তন বিশেষ কঠিন নয়। রোমান অক্ষর ইহাদের মধ্যে এখনও বিশেষরূপে চলিত হয় নাই।

ফল কথা—শিক্ষিত বাঙ্গালি বিদ্যাগর্ব্ব সভ্যতাগর্ব্ব ছাড়িয়া, একটু লঘুতা স্বীকার করিয়া উদার-ভাবে এই সকল সরল প্রকৃতি পার্ব্বত্যদিগের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিলে ইহারা সানন্দে মিশিবে। তখন ইহাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যে দীক্ষিত করা এবং ইহাদের কথিত ভাষা সমূহের লিখনে বঙ্গাক্ষর প্রবর্ত্তন করা কঠিন হইবে না। কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ ও হীনতা স্বীকার ভিন্ন লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না, স্থায়ী ভাল কাজ করা যায় না, প্রকৃত বড় হওয়া যায় না। কর্ম্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিক যদি আত্মগৌরব ছাড়িয়া এই মহৎ কাজ সাধিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণপ্রিয় বাঙ্গালা ভাষা সমধিক প্রসর লাভ করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি জাতিও এই সকল প্রতিবেশী জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত হইবেন। আত্মগৌরবের একটু লাঘব স্বীকার করিয়া একাগ্রভাবে কাজ করিলে সাহিত্যসেবী বাঙ্গালি এখন বাক্‌সর্ব্বস্ব বলিয়া ঘৃণিত হইলেও সময়ে সাহিত্যিক কর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইবেন—ধন্য হইবেন।

মানব সমাজের উন্নতির সহিত কার্য্য সাধনের উপায়ও ফিরিয়াছে — আরও ফিরিবে! এখন যে কাজ সৈনিকের পক্ষে দুরূহ, তাহা রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে সহজ; সাহিত্যিকের নিকট আরও সহজ। পৃথিবীতে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা যতই বাড়িবে—এ মহৎ সত্য ততই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত—প্রতিপন্ন হইবে; কার্য্য সাধনে সাহিত্যিকের অসাধারণ শক্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে। পূর্ব্বে বাহুবল বা ক্ষত্র বলই একমাত্র কার্য্য সাধনের উপায় ছিল। এখন বুদ্ধি বা ব্রহ্ম বল ক্রমে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতেছে। অস্ত্রবল অপেক্ষাও রাজনীতিজ্ঞের দূরপ্রসারিণী বুদ্ধির বলে এখন অধিক কার্য্য সাধিত হইতেছে। রাজনীতিজ্ঞের এই বল ক্ষাত্র বল ও ব্রহ্ম বলের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। সাহিত্যিকের বল কেবল ব্রহ্ম বল। যেখানে ব্রহ্মবল ব্যর্থ, যাহা রাজনীতিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও অবিষয়, সেখানেও সাহিত্যিকের ব্রহ্মবলের প্রসর আছে, এই প্রসর ক্রমেই বাড়িবে। শেষে সাহিত্যিকের এই মহাশক্তিই মানব সমাজকে পরিচালিত করিবে।

এই মহৎ সত্য হৃদয়ে ধরিয়া কর্ম্মী বাঙ্গালি সাহিত্যিক একাগ্রতার সহিত, অদম্য উৎসাহে, অথচ তপস্বীর ন্যায় দীনভাবে কার্য্যসাধনে অগ্রসর হউন;—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন--এই মহাবাক্য অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হউন, ঐশিক বিধানে নিশ্চয়ই তাঁহার একনিষ্ঠ কর্ম্মের উপর অমৃত—সিদ্ধি-অমৃত বৃষ্ট হইবে।

শেষে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। সেটি ব্যয়ের কথা। কমলার কৃপাভাজন সাহিত্যিকের সংখ্যা বড়ই কম। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও অর্থস্রোত এখন সর্ব্বতোমুখী। সাধারণ সাহিত্যিকের অর্থবল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ এই শিক্ষা-প্রচার কার্য্য অর্থসাপেক্ষ। সে অর্থ কোথায়? আমার কিন্তু মনে হয়—অধ্যবসায় ও উদ্যম বলে সকল প্রকার বিঘ্নবাধাই অতিক্রম করিতে পারা যায়; আপাততঃ দুই চারি জন দৃঢ়-

সংকল্প ধীরপ্রকৃতি প্রচারক লইয়াও কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। এক জন ইংরাজ আপনার ভূপ্রদক্ষিণ কাহিনী বর্ণন উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, তিনি একবার অশেষ ক্লেশ সহিয়া পাপুয়া দ্বীপের নিবিড় বনাচ্ছন্ন এক পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করেন। সেখানে নরমাংসাশী অসভ্য মানবগণের একখানি বড় গ্রাম ছিল। সেখানে দেখেন—গ্রামের মধ্যে এক ক্ষুদ্র কুটীরে দুই জন ফরাসি ধর্ম্মপ্রচারক রহিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে না; বরং বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিয়া চলে। ধর্ম্মপ্রাণ সাহেব দুটি যেরূপ সেই সভ্যতালোকবর্জ্জিত ভীষণ স্থানে, সেই ভীষণ জাতির মধ্যে, অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বকার্য্যসাধনে নিরত ছিলেন, সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া এক মহদুদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশে সেরূপে কাজ করিবার লোক কি আজিও জন্মে নাই?—এই নিজের দেশে, ইংরাজ-রাজ শাসিত, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে, বন্ধুবান্ধবাদির অনতিদূরে, সভ্যতালোকমণ্ডলের ঠিক পার্শ্বে থাকিয়া কাজ করিবার লোক কর্ম্মী সাহিত্যিকগণের মধ্যে নিশ্চয়ই আছেন। এইরূপে অল্পে অল্পে কার্য্য আরম্ভ করিলে ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা নাই। সামান্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকমণ্ডলী—বিশেষতঃ তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় মহারাজ-রাজগণের যত্ন ও সদিচ্ছা বলে সহজেই সংগৃহীত হইবে। অনেক স্থলে প্রতিবেশী কর্ম্মী সাহিত্যিক অতি অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট কাজ করিতে পারিবেন।

কথিত পার্ব্বত্য ভাষা সমূহের মূল নির্ণয় এবং উহাদের সাহিত্যিক সমীকরণ সম্ভব কি না তাহা আমাদের ভাষাতত্ত্ববিৎ সাহিত্যিকগণের বিচার্য্য। তাঁহাদের বিচারার্থ কয়েকটি ভাষার একার্থবোধক কতকগুলি শব্দের তালিকা এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইল।

সাঁওতালের ভাষার সহিত বঙ্গের পূর্ব্ব ও উত্তর প্রান্তবাসী পার্ব্বত্যগণের ভাষার দূর সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ঐ সকল জাতির ভাষার সহিত সাঁওতালি ভাষার সমীকরণ প্রয়াস বিফল হইবারই কথা। সেই কারণে সাঁওতালি প্রতিশব্দ দিয়া পরিশিষ্টের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা	ত্রিপুরা	মণিপুরি	খাসিয়া	মিথাননাগা	তাবলংনাগা	খাসি নাগা	অঙ্গামিনাগা
হাওয়া, বায়ু	নকবার	সুংসিৎ	কানাঃয়ার	রাংবিন	ওয়াংয়াক	আনিং	চিখে
পিঁপড়া, রুই	সুইস্রুম	কাকচেং	উদ্খিউ	টিকমা	টিক্হা	হুংজা	হাচে
বাণ,শর,তীর	—	—	উখনম	সান	লাহান	টাকাবা	মিইউ
পক্ষী	তক্সা	উচেক্	কাসিম্	ও	ওউহা	ওজা	পাড়া
রক্ত	থুই	ই	কাস্নাম্	আজি	ইহ্	অই	উনি
নৌকা	রুড	হি	কালিঙ্	খোআ	ইসেং	আরাং	রু
অস্থি, হাড়	বেক্রেং	সরু	কাসিঙ,কাচিং	রা	ওয়ান্	টরেট্	উরু
মহিষ	মিসিপ্	ইরই	উসিন্‌রেত্র	লোই	টেক্	অনং	রণি
বিড়াল	আমিং	হোদং	মিউ	মিয়া	অমি	মোচি	নোমো
গো	মুমুক	সন্	কামাসি	মাহু	মাহু	মাসু	মিথু
কাক	তথা	কোআক	কাটিআব	ওথা	—	ওয়াক্ক	যেজা

বাঙ্গালা	ত্রিপুরা	মণিপুরি	খাসিয়া	মিথান নাগা	তাবলং নাগা	খাসি নাগা	অঙ্গামি নাগ
দিন	—	..	কাসিঙ্গি	অখি, অচ্চি	তিনি	অসোজ	তিসো
কুকুর	সুই	হুই	উকমিউ	হি	কুই	আই	তসু
কর্ণ, কান	কুবজু	নাকং	ক্ষসকর	না	না	তেনহৌ	অন্তে
পৃথিবী	—	—	কাখিণ্ডিউ	হাওয়ান	কাতক	অনি	ক্কিজে
ডিম	তকতুই	যেরুম	কিপিলেঙ	ওতি	কেয়	অপসু	পোদজু
হাতি	মায়ুং	সামু	কাহাতি	লোয়াক	লোকনিউ	সাতি	ড্যু
চক্ষু	মকল	মিৎ	কাখিমত	মিক	মিক	তেলিক	অমহি
পিতা	বা	পা	উথ্পা	আপা	ওপা	তপ	অপো
অগ্নি	হর	মই	কাডিঙ	ডন	আ	মৎসু	মি
মৎস্ত	তন্	ঙা	কাড্খা	ন্দিয়া	ন্যানে	অঙ্গো	খো
ফুল	খুঙ	লৈ, লেই	উসিং, টিউ	মাইপোয়া	চুপেং	তবেন	পপু
পা	য়াকুং	খং	কাপঙ কিজাত	চ্যা	য়ালান	তচং	উকি
ছাগ	পুন	হামেত্র	উব্লাও সিনরাং	রোন	যুব	নবোং	তসু
চুল	খলাই	সম্	উস্ক্র	খো	নি, সু	খা	অতসুখা
হাত	ইয়াক	খুৎ	কাক্ট	চক	য়ক	তখেত	অবি
মাথা	খড়ক	কফ	কাঘি	খাং	সং	তেমিন	অৎসু
শূকর	ওয়াক	অক	উখিঙ খ্লাউ	ভক	অক	আউক	থাডো
শিং,শৃঙ্গ	বকয়ং	—	কিরেঙ	রোং	ওয়ং	তি	পখ্যে
ঘোড়া	কয়াই	সগন	উকুলাই	মন	কোয়াই	কুংরি	চেকুইর
বাটী, বাড়ী	ন-ক	য়ুম্	কাইঙ	হম	লোক	অকি	কি
লোহা	সর	য়ৎ	কানার	জিয়ান	রান	অয়িন	যে
গাছের পাতা	ব্রই	লা	কিম্লাডিং	পন্বক	কুময়াক	তুয়া	পণ্যে
আলোক	পহুর	—	কাজিংসাই	রংগাই	নিনিং	স্নোগো	জুকি
মানব, মানুষ	বরক	মি	উব্রিট	মি	সৌনিয়াক	অমি	থেমে
বানর	মখরা	য়ং	উ স্রি	মৈনুক	সিমাই	কিসা	তকি
চাঁদ	তাল,	থা	উবনাই	লেট্ণু	লে	লেটা	খর
মাতা,	মা	মা	কাকমি	আন্ন,	ওনু	টু	আজো
পর্ব্বত	হাটুক্	—	উলম,	—	—	অপি	চজু
মুখ	মখাং	মাই	উবনাই	তুন	চুমিম	তয়ো	অসু
মশক, মশা	থাম্পুই	কাং	উদখিউ	—	—	মৃণা	ভিকু
নাম	মুং-	মিং	কাকর-তেং	মন	মিন	আচু	প্রা
রাত্রি	হর	অহিং	কামিট্	রঙনক	ভঙনিয়াক	আয়া	টিজি
তৈল	থক	থাট	কবকিনিয়িং	মঙ্গা	মৌগা	তৎসু	ককিজু
কলা, কদলী	থাইলক	লকই	কাকায়ৎ	—	—	মঙ্গো	তেকসি
নদী	তুইমা	তুরেন	কাওয়া	সুয় ।	রাংসু	অৎসু	খর

বাঙ্গালা	ত্রিপুরা	মণিপুরি	খাসিয়া	মিথান নাগা	তাবলং নাগা	খাসি নাগা	অঙ্গামি নাগা
পথ	লামা	লম্বেৎ	কাসতক	লম	লম	ন্সি	চা
লবণ	সম্	থুম	কমেল্	হুম	হুম	মচি	মৎসে
চামড়া, চর্ম্ম	বুকুর	মকু	কান্নি	পোয়াণ	সো	তাগাপ	বিথর
আকাশ	নথা	—	কাসুইন্‌চিনেঙ	—	—	অনিঙ	মি
সর্প	চিবুক	লিন	উসিঙ	পু	পু	আহু	থিন্‌ব্যো
নক্ষত্র	আথু কুরি	থৌয়ান মচা	উথ্‌র	লেসি	চাকা	পেন্তি	থেমু
পাথর	হলং	...	উমাও	লাং	য়োং	অলোং	কচে
সূর্য্য	সাল	নুমিৎথা	কাপিঙি	রংহান	ওয়াংহি	সুহি	নথি
ব্যাঘ্র, বাঘ	মসা	কৈ (কই)	উথা	চিরাঙ্গু	সাম্নু	আখু	তাখু
দাঁত	ওয়া	ইয়া	কাথিনিয়াৎ	ভা	ফা	তাকা	উহ
গাছ	বুকাং	উপান্	...	পন	পে	সুন্দোং	সি
গ্রাম	পারা	খুনং	...	তিং	তিয়াং	অয়িম্	অয়মে
জল	তুই	ইসিং	কাউম্	ভি	রিয়াং	অৎসু	জু

সর্ব্বনাম

আমি	আং	আই (ঐ)	ঙা	কু	ভৌ	নি	আ
তুই, তুমি	নুং	নং	ফি	নং	নং	নং	সো
আমরা	চুং	য়াশে, য়াখয়,	ঙি	—	—	অকৌ	আথে
তোমরা	নরক্	নখৈ, নগয়	—	—	—	নিথল্	নটলেলি
তিনি	—	—	উ	মি	তৌপা	পৌ	মে
তাহারা	বরথ্	মখৈ	জংকি	—	—	তুংথল	ভে
আমার, মদীয়	আনি	য়াক্‌কি	জঙ্গা	কুকুহে	ভোসেই	নি	—
তোমার, ত্বদীয়	নিনি	নংগি	জংকি	–	—	তুংখল	তথতে
এক	কাইসা	অমা	ওয়ে	আভৌ	চা	মথেত	পো
দুই	কুমুই	আনি	আর	আনি্য	ই	মন্নে	কনে
তিন	কথাম্	অহুম্	লাই	আজম্	লেম	অলম্	সু
চারি	বুরুই	মরি	সাউ	আলি	পিলি	কলি	দেঃ
পাঁচ	বা	মঙ্গা	সান	আগা	ঙা	কঙ্গা	পঞ্জু
ছয়	দক	তরুক	হিড্ডো	আরোক	স্তোক	তরোক	সোরু
সাত	স্নি	তরেত	ঙিথ্যা	আনথ্	নিথ	তনি	খেনে
আট	—	নিপান্	ক্যা	আচেট্	মাথ	সচেত্ত	মেথা
নয়	—	মপান্	খাডাই	অকু	থু	তেকু	থাকু
দশ	—	ত্‌রা	সিকো	বন	পন	তরঃ	কুর
বিশ	—	কুন্	আরোকো	চা	—	মথি	মকু
ত্রিশ	—	—	লাইকো	—	—	সময়া	সুয়

বাঙ্গলা	ত্রিপুরা	মণিপুরি	খাসিয়া	মিথান নাগা	তাবলং নাগা *	খাসি নাগা	অঙ্গামি নাগ
চল্লিশ	—	ফুন্থ্রা	সাউকো	পণ্যি	—	লির	ইহিদে
পঞ্চাশ	—	—	সানকো	—	—	ভনম্	স্নিপজু
শত	—	চা	সিম্পা	পুগা	—	রুক্স্না	ক্রে
ইহা	ইম	অসি	কা	হিহা	মইনান্	পিও	হওএ
উহা	উম	অসি	কাতা	হিহা	থইমিত্ত	পৈচোচু	লিওএ
কোন্ (which)	বু (বুব)	করি	কাবা	—	—	কুবই	কিউরু
কি (what)	তমে	করি	কায়ে	তেম্	তোইনান্	চবউ	কজে
কে ?	সাব	ক্লা	উএই	ওভিঃ	ওয়াই	সুই	সোরু
বাকিছু (anything)	—	—	কানো কানো	—	—	কুইয়াই	কাজিপুর
যে কোন লোক (anybody)	সাব	ক্লান	উনো উনো	—	—	কোইমুর	চক্রপরু
			বিভক্তি				
হইতে	নি	তকি	না	—	—	আসে	—
এ, তে	অ	তা, দা	হাজান	থা	সঃ	গু	কিমু
			ক্রিয়া বিশেষণ				
উপর (on)	সাকা	মাথক্	—	—	—	তমুগে	—
এখন	তাবুক	হজিক	মিন্তা	অথা	চাহ	হিকু	আকিহবে
তখন	আক্রু	—	তে	—	—	জিকু	লিলিতিহা
কখন	বুফ্	কদং অয়	ল্যামো	—	—	কুইম	তাদজুনে
আজি (অদ্য)	তিনি	ওসি	মিনতাকা	সিওলি ; অম্মি	তিম্মি	খনি	তেজে
কল্য	খানা	হয়েং	লাসাই	নাইনি	জাইনি	অলং	থেহু
গত কল্য	মিয়া	লাহান্	লিনহিন	নিন ; মম্মি	মম্মি	হসি	কোসে
এখানে	অর	আসিদা	হাংনে	—	—	নিকো	হবি
সেখানে	উর	—	হাংতাই	—	—	ওয়াদঙ্গু ওজু	লিথে
কোথায় ?	বর, বুর	কদহিদা	স্থানো	পু (পউ)	তউ, ওয়াই,	কুচি	কিরপরু
উপর (above)	সাকাও	মথক্	হানেও	দিং	কওসং	তমচিঙ্গু	তলে
নীচে	তলাও	মখাদা	হাপ	হোলং	ওপং	তমোক্সিং	চকিমে
মধ্যে	কচার	মৈয়ায়দা	হাপডেং	—	—	চিওং	—
ছাড়া (without)	বাদে	বাদে	খেম	—	—	তকিও	কিতে
মধ্যে	বিসিং	মচুং	হাপ	—	—	তিসিঙ্গো	কিমু
দূর (far)	হাকচাম,	আথাপ্পা	সাচাও গাই	আতাই	কাতিকে	উরুও	চগুএ
নিকট	সাম	নকপা	হাজাম্	হোলে	ওতিকে	আনহাও	চগুনো
ছোট	বসাতে কুমু	পিকপা	কাবারিদ	ওহিপিতা	এচিংথা	ইচনঙ্গো	কটুনো
ঢের, অনেক	রুওসা	আয়াবা,য়াবা	সিবুন	ওইহ	এসেলই	কালঙ্গু	ক্যাপুর
কত ?	বুসুক	কৈয়া	কৎনো	—	—	কুইয়া	কিচুরু
এইরূপে	উবতুই	অসুম তৌদ্না	কুমনো	—	—	ইট্যাঙ্গো	সেওএ

বাঙ্গালা	ত্রিপুরা	মনিপুরি	খাসিয়া	মিথান নাগা	তাবলং নাগা	থাসি নাগা	অঙ্গামি নাগা
কিরূপে	—	—	কুমনে	—	—		
কেন	তমানি	করিপি	এম,	—	—	কোতিপা	নকিদিহি
হাঁ	অয়্	হৈসেঃয়্	হয়্	ভই	অইয়া	চিবৎ সউই	কজি
না	না	নতে	এম	মনভই	মংচ	হো	এ
						নোঙ্গো	মোই
ক্রিয়াপদ							
খাওয়া	চামান	চাবা	বাম	সাহা	হাঠি	সোং	চিলিবে
পান করা	মুংমনি	থকৃপা	ডি	সিওহা	য়ংয়িং	অংসিওং	জুক্রোটোএ
ঘুমান	থুমনি	হিপপা	থিয়া	শিপদউ	চুনশি	ইপিজলি	জু
						ইপিসিলি	
জাগা	হজাগ্	হৌবা	করসিউ	—	-	সিসউগো	সিরটে
হাসা	মুমুইমনি	নকপা	কাবারাখি	নিলে	লিচি	মনিংলি	মু
কাঁদা	কাবমণি	কপপা	লেনইয়ার	সপ্লে	সপ্তিপে	চিপ লি	কৃরা
চুপকরা	তাপুংদি	ডাজগু	সনগাপ,জার,	—	--	তুকুরা	চাসিবলে
বলা	সামান	হৈবা	বান,ক্রন	কা	তা	ঐহসং	পুমিচে
আশা	ফাইমানি	নাকৃপা	বানওয়ান	রাহই	ওংকই	হিনেয়ং	ওকিকিয়িচে
যাওয়া	থাংমানি	চাংপা	বানলেটং,	তোং	অংমি	ওআ	তোতচে
দাঁড়ান	বাচামানিু	লেপ্পা	বামইয়েঙ	অজোং	য়ংডি	হুংলিগিলি	খেলে
বসা	আচুকমানি	ফমুবা	বানসং	জেদো	ওম্চি	এনিও	বচে
বেড়ান	বেরাইমানি	কৈবা	বানইয়াইকাই	তোংথা	অংমি	য়োংজেন্মা	তোথে
দৌড়ান	খাইচকমানি	চেনবা	বানকেট	কিক্লে	কলচি	সেমেকা	কাথেলে
দেওয়া	রুমানি	পিবা	বানআই	লাইই	য়খু	খিউগো	সুওআএ
লওয়া	নামানি	লৌবা	বানসিম	পোলে	য়কেই	হিরাউগো	খুলিওয়ে
মারা	বুমানি	কুবা	বানস	মৈথুন	সেতচি	য়াকচো	ততএ
হত্যাকরা	বুথামানি	হাতকৃপা	নংপিনিক্র	লংদো	তোইচি	য়াকসিতোগো	ছুখিআওএ
আনা	তবুমানি	পুরুকপা	ওয়ালাময়া	লাহই	য়কেই	হেনেরংলি	সেয়াওয়ে
লইয়া যাওয়া	তিলাংমানি	পুখিবা	সিমনো	পইপউ	নোঃসি	হেনেরোগা	সতেলে
তোলা	তিসামানি	থাওংপা	রাসাজেবং	লোকো	নোঃসি	চুঙ্গোংসো	ভুপেলে
শুনা	খানামানি	তাবা	সন্গাব	অথক	চৈহা	জোগো	সিলোওয়ে
বুঝা	সি মানি	য়াংবা	সঙউথ	অভন	তৌসিংপু	মেত্তে বো	সিওএ
বিশেষণ							
ভাল	কাহাম্	আফাবা	বাভা	মৈলে	মৈমুক্বে	অরো!	ভিওএ
মন্দ	হাইম	ফতে বা	স্নিউ	মন্‌মৈ	য়েমেই	মরো	সোওএ
শীতল	কাচাং	ইংবা	থাইয়াৎ	য়াংণম্	ওয়াংসম	আইয়াং	সি
গরম	তুতুং	আসাবা	সিট	থম	নোম	তেতসা	থাকউ

বাঙ্গালা	ত্রিপুরা	মণিপুরি	খাসিয়া	মিথান নাগা	তাবলং নাগা	খাসি নাগা	অঙ্গামি নাগা
কাচা	কুথুং	অসংবা	বমপুট্টই	—	—	তাচম	মেমো
পাকা	কুমুন্	আমুন্‌বা	কা বাই	জুম	রিম	তেনহিং	মে
মিষ্ট	কুতুই	আথুম্ বা	থিয়ং	তি	উন্নং	মিঅং	চে
টক	কুখুই	সিন্‌বা	কবাজে	শি	সি	তেসন্	খো
তিত	কথা	আখাবা (খাবা)	কথাও	খা	খা	খা	চাদি
সুন্দর	নাইথক্	ফজাবা	ইভনাদ	—	—	কুরৈতয়ো	ভিসু
কুৎসিৎ	সিত্রা	থিবা	ইসি	—	—	ন.য়ো	সোপুর
সোজা	—	—	কাবাবেই	—	—	মথুজো	থেথা
বাঁকা	ককয়ং	আপৈবা	কালি্য়ং	কোম	কোম	তিকিহং	ক্রেউই
কাল	কসম্	আমুবা (মুবা)	কাবাইয়ং	নক	নিঅক	নক	কতি
সাদা	কুকুর	আঙোবা(ঙোবা)	কাবালি	থোঃ	হেং	মেসিং	কচ
রাঙা	কচাক	আঙাংবা	—	—	—	টমুরম্	ত্রি
লম্বা	কলক	সাংবা	কাবাজ্রং	লো	লউ	টিল হো	জোমু
সবুজ	কচুয়া	অসংবা	জিরনাম	—	—	শিমপুলুবা	কপজে
খাট	—	—	লিঙবাটু	মো	সোঃ	তুৎসিজো	জু
ঢেঙ্গা	কলক	সাংবা	কাবাজ্র	চোঅক	ভো	ওরেগু	করথে্র
বেঁটে, নীচু	বারা	তেম্‌বা	লঙ বাটু	—	—	ওয়েজুতে	গর ঔ
ক্ষুদ্র, ছোট	খসাতে, কুসু	পিকৃপা	বারিদ	অহিাপআ	সুই	মিংইজি	কমচপো
বৃহৎ, বড়	কতর	চাউবা	বাম্রাও	অচুংনো	যংসোং	তপেতিও	জোপুর
গোল	কিতিং	—	পন্নুন	—	—	মেকেতং	খুহি
মোটা, স্থূল	কতর	—	কাবাসিনগাই	চোং	মিওম	ভবিতি	পোমোজা
রোগা	চিকন	আপিকপা	কা অইয়ো	—	—	অচি	সোপোৎনারু

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

আচার্য্য হরিনাথ

১৩১৮ সনের ১৩ই ভাদ্র বুধবার বাংলা দেশে একটা 'ইন্দ্রপাত' হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের কেন, সমগ্র এশিয়ার অদ্বিতীয় ভাষাবিৎ আচার্য্য হরিনাথ দে সেই দিন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র চৌত্রিশ বৎসর হইয়াছিল; এত বড় লোকের জীবনসূর্য্য এরূপে অসময়ে মধ্য-গগনে পূর্ণ তেজে বিকাশের পূর্ব্বে যে অনন্তের কোলে আপনার অন্তিম শয়ন বিছাইয়া কালনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল, তাহাতে দেশের অশেষ ক্ষতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হায় হতভাগ্য দেশ! এখনও হরিনাথের মত লোককে পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিবার সৌভাগ্য তোমার হয় নাই, তাই হরিনাথ অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাই হেলায় এমন রত্ন হারাইলে! তিনি অকালে চলিয়া গিয়াছেন, কে জানে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সাহিত্যকে কি অপূর্ব্ব সম্পদে ভূষিত করিতেন!

হরিনাথ দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষাই দিয়াছিলেন, এবং সবগুলিতেই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের কারণ নহে। খুঁজিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে এরূপ অনেকের নাম পাওয়া যায় যাহারা সমান সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোলাভ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বিদ্বান হইবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। হরিনাথ প্রকৃত পক্ষে বিদ্বান ছিলেন; শুধু তাহাই নহে, জীবনের শেষ সজ্ঞান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যার্থী ছিলেন। মাথার উপর বিপদ ঝুলিতেছে, কিন্তু তখনও তিনি জ্ঞান-উৎসের ক্ষীরধারা পানে আত্মহারা। তখনকার সেই পাঠনিরত গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সেই সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিয়াছে, এঁর মাথার উপর কি এত বিপদ ঝুলিতেছে!

তাহার পাঠাবস্থার সফলতার কথা সকলেই জানেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে বিলাতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ঐ বৎসর তিনি বিলাতে অবস্থান কালেই গ্রীক ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহারই জন্য সে বৎসর সাধারণ নিয়ম হইতে ব্যতিক্রম করিয়া বিলাতে ঐ পরীক্ষা গৃহীত হয়! তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর 'ট্রাইপস' পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ঐ খানে অবস্থান কালেই তিনি ল্যাটীন ও গ্রীক কবিতার জন্য স্কীটস পুরস্কার ও লর্ড চ্যান্সলারের পদক লাভ করেন। মিণ্টন ও টেনিসন তাঁহাদের সময়ে ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন; ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে! অতঃপর তিনি কিছুদিন জার্ম্মাণী ও ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়সমূহে পাঠ করেন। পাঠসমাপনান্তে তিনি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নিয়োজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর ঢাকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছু দিনের জন্য অধ্যাপকতা করিয়া হুগলী কলেজের অধ্যক্ষতা করেন, এবং তাহার পরে রাজকীয় পুস্তকালয়ে (Imperial Library) গ্রন্থরক্ষকের পদে বৃত হন। তিনি সর্ব্বসমেত ঊনত্রিশটি ভাষা জানিতেন।

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে প্রায় তাঁহাদের সকলের জীবনেই জননার প্রভাব অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; হরিনাথেরও তাহার অভাব ছিল না। তাঁহার জননী নিজে বিদুষী মহিলা। তিনি ইংরাজী, বাংলা, মারাঠি ও হিন্দি এই চারিপ্রকার ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না। জননীর প্রতি হরিনাথের অপরিসীম ভক্তি ছিল। মাতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং সে জন্য সময়ে সময়ে তিনি নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

হরিনাথের অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায় ছিল।

এই দুই গুণের বলেই তিনি অল্প বয়সে এত মহৎ সম্মানের অধিকারী হইতে পরিয়াছিলেন। তিনি কখনও অধিকক্ষণ ধরিয়া বা রাত্রি জাগরণে অধিক পরিশ্রম করিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল; তাহারই বলে তিনি একবার যাহা দেখিতেন তাহাই তাঁহার স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া যাইত! ইদানীং তাঁহার কাছে এত লোক আসা যাওয়া করিত যে তাহাতে তাঁহার পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত হইত, কিন্তু তিনি সে জন্য কখনও চিন্তিত হইতেন না। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, আর অধিক বিলম্ব নাই, অথচ এক এক দিন দেখিয়াছি তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্প করিতেছেন, অথবা অন্য কোনও কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আবার এক এক দিন এরূপও দেখিয়াছি যে, চারিদিকে নানারকমের লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—তিনি পাঠে আত্মহারা! পাঠ সমাপন করিয়া আবার সাধারণের কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন! এই মেধা ও একাগ্র চিত্ততাই তাহার উন্নতি ও সাফল্যের মূল মন্ত্র।

প্রায় ৭।৮ বৎসর আগে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। এক দিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ হইতে প্রোফেসার হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সকলেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সাধারণতঃ নূতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলেরা তাঁহাকে একটু জ্বালাতন করে; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষুদুটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতিঃ ছিল, তাঁহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল।

সে সময়ে মিল্টনের 'কোমাস' ও 'হেল্পসের এসেস্' আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি সেই পুস্তক দুখানি আমাদিগকে পড়াইতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া কোমাসের allusion গুলি তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, আর দ্বিতীয় বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না। অনেকে বলেন যে, তিনি বড় বেশী 'নোট' দিতেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, ছাত্রেরা নোট না পাইলে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া তিনি এত নোট দিতেন। এইরূপ অনবরত নোট দেওয়া তিনি নিজেও পছন্দ করিতেন না, কিন্তু বলিতেন, উপায় নাই, নোট না দিলে ছেলেরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

কলেজের অধ্যাপকতা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্ম নয়। তিনি কতদিন বলিয়াছেন, এ কাজ আমার ভাল লাগে না; ইহাতে আমি ছেলেদেরও বিশেষ উপকার করিতে পারি না, নিজেরও কোন উপকার হয় না, বরং পড়াশুনার বড় ক্ষতি হয়। শেষে যখন তিনি ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদে বৃত হন, তখন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, এই বার নিজের ইচ্ছামত কাজ পেয়েছি, বোধ হয় এখন হইতে নিজের ইচ্ছামত পড়িতে পারিব। হায়! তিনি জানিতেন না যে, এই ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদই তাঁহার অদৃষ্টাকাশের রাহু!

ইউরোপীয় আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যে ও ভাষায় তিনি বিশেষ রকম বিদ্বান ছিলেন। শুনিয়াছি না কি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসার সুপণ্ডিত পার্সীভেল সাহেব এক বার তাঁহার ক্লাশের ছেলেদের কাছে হরিনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'Yes, he can teach me Latin and Greek for several years!' হরিনাথ দ্বিতীয় বার যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার Guide ছিলেন। মহারাজ রোম নগরীতে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আধুনিক রোমের ভাষা ইতালীয়, ল্যাটিন আমাদের সংস্কৃতের

ন্যায় দেবভাষা। পোপ বিদেশীয়ের সহিত সাক্ষাতের সময় ল্যাটিন ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় কথা কহিতেন না। কাজেই হরিনাথকে সে স্থলে দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে হয়। তিনি সে কার্য্য এত সুন্দর রূপে সম্পন্ন করেন যে, পোপ একজন বিদেশীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়ের ল্যাটিন ভাষায় এরূপ অধিকার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন।

কিছু দিন পূর্ব্বে রুষীয় পণ্ডিত বার্ব্বাট্স্কী যখন ভারতে আসেন, তখন হরিনাথের পাণ্ডিত্যে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে সেণ্ট পিটার্সবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন; কিন্তু হরিনাথ মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থের জন্য সুদূর তুষারাবৃত রুষদেশে যাইতে স্বীকৃত হন নাই।

তিনি কখনও অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না। বাল্যে কৈশোরে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত হইয়া ছিলেন, যৌবনে নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কেবল মাত্র বৃত্তি পারিতোষিক হিসাবেই তিনি ন্যূনাধিক ২০,০০০ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তিনি মৃত্যুকালে নিজের বর্ষীয়সী জননী, ভ্রাতা ও অনাথ স্ত্রীপুত্রাদির জন্য কোনও সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। নিজের জন্য কেহ কখনও তাঁহার ব্যয়-বাহুল্য দেখে নাই; তিনি সর্ব্বদাই সাধারণ মূল্যের পরিচ্ছদ পরিতেন; কখনও তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিতে দেখি নাই।

জীবনে তাঁহার একটি প্রধান সখ ছিল, পুস্তক ক্রয়। যদি শুনিতেন, কোথাও কোনও ভাল পুস্তক বিক্রয় হইতেছে, অমনি তিনি তাহা দেখিতে ছুটিতেন, অথবা আনাইতেন; এবং যদি তাহা ক্রয়যোগ্য হইত তখনই তাহা ক্রয় করিতেন। কত দিন তাহার সঙ্গে কত পুস্তকের দোকানে ঘুরিয়াছি। অনেক দিন তাহার বাড়ীতে প্রাতঃকালে গিয়া দেখিয়াছি, তিনি চারিদিকে পুস্তক লইয়া বসিয়া আছেন, সম্মুখে কয়েক জন পুস্তকবিক্রেতা —তিনি পুস্তকগুলি দেখিয়া কোনটি বা রাখিতেছেন কোনটি বা ফেরৎ দিতেছেন। এইরূপে তিনি একটি সুন্দর পুস্তকালয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এরূপ সুন্দর পুস্তকের সংগ্রহ আমাদের দেশেও নাই, অন্য দেশেও বিরল। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় লোকের বড় বড় পুস্তকালয় আছে, হয় ত তাঁহাদের পুস্তক সংখ্যা হরিনাথের পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ পুস্তকের পৃষ্ঠা এখনও অকর্ত্তিত, আর হরিনাথের সকল পুস্তকই সযত্নে অধীত! একের পক্ষে পুস্তকগুলি শোভা ও সৌন্দর্য্যের সামগ্রী, অন্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের— আত্মোন্নতি ও আত্মতৃপ্তির প্রকৃষ্ট উপকরণ। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন এক দিন তাঁহার পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার আর পূর্ব্ব শ্রী নাই, সমস্ত ধূলায় আচ্ছন্ন! যেন তারাও দুর্দ্দিন ও বিপদ আসন্ন বুঝিয়া, মৌন, শ্রীহীন! Sherlock Holmes-এর জার্ম্মান অনুবাদ ও বট তলার খনার বচন একসঙ্গে গড়াগড়ি যাইতেছে! কেই বা তখন তাহাদের দিকে তাকায়?

তাহার জীবনের আর একটি সখ, অথবা টাকা নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলুন—দান। খৃষ্টের উপদেশ, Let not your left hand know what your right hand doth, তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। বিদ্যাসাগরের পর এরূপ দান করিতে কাহাকেও শুনি নাই। যে কেহ যখন তাহার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়াছে, তখনই সাহায্য পাইয়াছে, নিতান্ত পক্ষে কেহ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরে নাই। সে জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে পরের নিকট ঋণ করিতে হইয়াছে, অনেক রকম অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বিপন্নকে সাহায্য করিতে তিনি বিমুখ হন নাই। এমন অবস্থায়ও পড়িতে হইয়াছে যে, তিনি হয় ত পাওনাদারকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সে নির্দ্ধারিত দিনে আসিয়া উপস্থিত, তাহাকে টাকা দিবার জন্য টাকা বাহির করিয়াছেন, এমন সময় এক জন বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করিল; তিনি তখনই আর দ্বিতীয় বার চিন্তা না করিয়া সেই টাকার সমস্ত বা কতকাংশ তাহাকে দিয়া

ফেলিলেন। পাওনাদার হয় ত অসন্তুষ্ট হইল, দুটা কড়া কথা শুনাইল, তিনি অবনত মস্তকে তাহা সহ্য করিলেন, তথাপি বিপন্নকে বিমুখ করিতে পারিলেন না!

এইরূপে তিনি যে কত দরিদ্র ছাত্রকে, কত বিপন্ন, কত কন্যাদায়, পিতৃমাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের উপকার করিয়াছেন, তাহা স্থির করা কঠিন। যখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন এই সকল উপকৃত ব্যক্তি মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইবার নিমিত্ত দলে দলে আসিয়া পঁহুছিল। যে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা অনাহূত হইয়াই আসিয়াছিল; কেহ তাহাদিগকে ডাকিতেও যায় নাই, অথবা সে জন্য হ্যাণ্ডবিলও বিতরিত হয় নাই।

'কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট' নামক ছাত্রদিগের সমিতিতে ষ্টুডেণ্টস্ ফণ্ড নামক একটি ধনভাণ্ডার আছে। প্রধানতঃ ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক কিছু কিছু লইয়া এই ভাণ্ডারে জমা করা হয়; দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণও সময় সময় ইহাতে চাঁদা দিয়া থাকেন। এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ হইতে অনেক দুস্থ বিপন্ন ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন না যে উক্ত সমিতির সভ্যেরা ৺ হরিনাথ দের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি পাইয়াই উক্ত ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করেন, নতুবা সমিতির প্রতিষ্ঠাতার এরূপ গুরুভার নিজ নিজ স্কন্ধে বহন করিতে সাহস করিতেন না।

ছাত্রদিগের তিনি 'মা বাপ' ছিলেন। শুধু যে গরীব ছাত্রদিগকে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা নহে, অন্যান্য শত উপায়ে তিনি ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন। পরীক্ষক রূপে তিনি কখনও ছাত্রদিগের উপর অযথা কঠোর হন নাই। সে জন্য সময় সময় তাঁহাকে উপর ওয়ালার নিকট জবাবদিহি করিতে হইত।

ইউনিভারসিটির সহিত যখন তাঁহার সংশ্রব ছিল, সে সময় তিনি তথায় প্রকৃত পক্ষে Students' Champion ছিলেন। কাহারও কাগজ পুনর্ব্বার পরীক্ষা করাইতে হইবে, সে তাঁহাকে ধরিত; কোনও পরীক্ষার কালে প্রশ্ন অযথা কঠিন হইয়াছে, ছেলেরা তাহাকে উকীল পাকড়াইত; এইরূপ যখন যাহার কিছু দরকার পড়িত, সেই তাঁহাকে ধরিত, আর তিনিও প্রকৃত পক্ষে সে অনুরোধ অন্যায় না হইলে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই সিনেট সভার একটি অধিবেশন হইলেও তথায় তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা সভ্যদের মধ্যে কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই!

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষা দিবার ইতিহাস মনে পড়িল। সেটি বেশ কৌতুহল উদ্দীপক। তিনি নিজে আমার কাছে গল্প করিয়াছিলেন।

এক বার কোনও একটি সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অযথা কঠোরতা প্রভৃতির জন্য তিনি তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কৃতের কিছুই জানেন না বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী পণ্ডিতেরা তাহার সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান! তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা তাহা অমূলকপ্রমাণ করিবার জন্য কিছুদিন পরেই তিনি সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন!

হরিনাথ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান বা গর্ব্ব করিতেন না। বাহির হইতে তাহাকে দেখিলে কেহ বুঝিতেই পারিত না যে, তিনিই এত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত! তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতা ছিল। স্বীয় গৃহে তিনি যখন নগ্নগাত্রে নগ্নপদে একখানি মোটা কাপড় পড়িয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত সরস গল্প করিতে করিতে কক্ষস্থল হাস্যকোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিতেন, তখন দূর হইতে তাহাকে দেখিলে ভ্রমেও কেহ ভাবিত না যে ইনিই স্বনামধন্য হরিনাথ দে! তিনি বিদ্বান ছিলেন, পদস্থ ছিলেন, তবু কি উচ্চ কি নীচ সকলের প্রতি তাঁহার ব্যবহার সমান বিনয়পূর্ণ, সমান উদার ছিল; তাঁহার অন্তর বাহির সমান ছিল।

হরিনাথ দে বিলাতফেরৎ ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য

অধিকাংশ বিলাত ফেরতের মত সাহেবী ভাবাপন্ন ছিলেন না, অথবা সমাজ ত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের আশ্রয়ে বর্ষীয়সী মাতা ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত স্বীয় স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেন। হিন্দুর দেব দেবীতে তিনি প্রকৃত আস্থাবান ছিলেন কি না জানি না, তবে তিনি যে দেশাচার ও কুলাচার মানিয়া চলিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়া অনেকে হয় ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার অসুখ করিলে অনেকবার দেখিয়াছি তাঁহার জননী তাহাকে দেবতার চরণামৃত আনাইয়া দিয়াছেন, এবং তিনি দ্বিধা না করিয়া উহা শিরে ধারণ করিয়া পান করিয়াছেন! তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শয়িত, তখনও স্নেহময়ী জননী তাঁহার হাতে রক্ষাবন্ধনী ও নয়নে হোমধূমের কজ্জল পরাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদও তাঁহাকে মৃত্যু হইতে রাখিতে পারিল না!

যাহারা অনেক বড় বড় কথার দোহাই দেন, তাহারা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ কালে বলিয়াছেন—তিনি আমাদের জন্য নিজের অসৎ আদর্শ ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তিনি ত সময়ে চলিয়া যান নাই! তিনি যে সময়ের পূর্ব্বেই মহাপ্রস্থান করিলেন. ভগবান্ তাহাকে কিছু রাখিয়া যাইবার অবকাশ দিলেন কই? তাঁহাকে কিছু লিখিবার কথা বলিলে তিনি বলিতেন, 'শিখলাম কি যে লিখবো? এখনো শিখবার যথেষ্ট বাকী।' জীবনক্ষেত্র সমস্তই সম্মুখে পড়িয়াছিল, কার্য্যে নামিবার জন্য সবেমাত্র উদ্যোগ করিয়াছিলেন, জগতে জ্ঞানবৃদ্ধির সূচনা হইয়াছিল মাত্র!

তাঁহার অসমাপ্ত লেখার বিষয়বৈচিত্র্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, কোনটাই সম্পূর্ণ নহে! কোনও বিষয়ে হয়ত দুই পাতা, কোথাও বা দুই লাইন, কোনও বিষয়ে হয় ত Synopsis মাত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন।

তিনি তিব্বতীয় ও চীন ভাষা হইতে গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতেছিলেন; অমৃত বাবুর সরস প্রহসন বাবুর ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; শকুন্তলারও একটি সরল ছন্দে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন—তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। মাত্র দুই অঙ্ক প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত 'ষ্টুডেণ্টস ম্যাগাজিন' পত্রিকায় অধুনালুপ্ত নামক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বহস্তলিখিত অনুবাদটি আজও আমি সযত্নে রক্ষা করিতেছি; কি সুন্দর মুক্তার মত লেখা! ইহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশীয় কতকগুলি কবিতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, সেগুলি এক করিয়া মুদ্রিত করিলে একখানি সুন্দর পুস্তক হইতে পারে। তাহার অসংখ্য বন্ধু ও গুণগ্রাহী ভক্তদের ভিতর ইহা কেহ করিবেন কি?

তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ সাধ ছিল, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিবর্ত্তন অনুসন্ধান করা; একথা তিনি নিজে আমাকে অনেক বার বলিয়াছেন। হায় অভাগিনী বঙ্গভাষা, অন্তর্যামী জানেন বাঁচিয়া থাকিলে দূর ভবিষ্যতে হরিনাথ তোমাকে কোন গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন!

এরূপ এক জন মহৎ লোকের মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্য ও দৈন্যের চিহ্ন সন্দেহ নাই। আত্মীয়স্বজনের অশ্রুকাতর প্রার্থনা. শত শত ভক্তের ও বন্ধুর হৃদয়ভেদী আবেদন তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না! অকালে তিনি দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, তথায় পরম সুখের অধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু দেশ যে একটি রত্ন হারাইল! ভারত—ভারত কেন, সমগ্র জগৎ যে তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিল! অতীতের তিমিরময় গর্ভ হইতে যে সকল জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া তিনি জগতের সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যশালী ও গৌরবান্বিত করিতে পারিতেন, আবার কেহ এমন আসিবে কি যে সেগুলির উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে? না, এক হরিনাথের মৃত্যুতে রত্ন লুপ্তই থাকিয়া যাইবে? কে জানে নিয়তির কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে কি আছে? তাঁহার নশ্বর শরীর

পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে. কিন্তু তাঁহার স্বর্গস্থ আত্মা আজও তাঁহার শত শত ভক্তের ও বন্ধুর কর্ণে আশার বাণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি. তাঁহারা এই আশার বাণীতে প্রবুদ্ধ হউন, সেই পরলোকগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহারই আরব্ধ কর্ম্ম নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করুন; নিশ্চয়ই সকলের সমবেত চেষ্টায় তাহা সফল হইয়া তাঁহার স্মৃতিকে চিরকালের জন্য উজ্জীবিত রাখিবে।

"He is not dead! Though summoned to the skies,
Still in our hearts he lives, and then will reign;
Still the dear memory will the power retain
To teach us where our foremost duty lies,
Truth, justice, Honor, simple worth to prize,
And what our best have been to be again"

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ

নমস্কার

কি স্নিগ্ধ, মাধুরীমাখা স্নেহের অঞ্চল
বিছায়েছ ধরণীর গায়!
বিস্ময়পুলকে স্তব্ধ, ভক্তিনত প্রাণ—
অপলক—স্থির নেত্রে চায়।

ফুলে ফুলে ঢেকেছ ভুবন,
প্রতি দলে রাখিয়াছ মধু।
বিষাদের নাহিকো আভাস,
ঢেলে দে'ছ স্নেহটুকু শুধু।

পবন গগনে বহে—ছুটে দিশি দিশি
তোমার সে যশের বারতা।
তুমি সত্য, তুমি প্রেম, তুমি সনাতন,
চিরারাধ্য প্রাণের দেবতা।

নিশির আঁধার নাশি উষার কিরণ
ফুটে তব চরণ পরশে।
কুসুমের মৃদু হাসি, নদীকলতান
জেগে উঠে তোমার দরশে।

মরুভূমি কর ফুলময়,
শুষ্ক কণ্ঠে ঢাল সুধা-ধারা।
মৃদু আলো কর বিকীরণ—
পথ পায় চির পথ-হারা।

তুমি ছিলে, তুমি আছ, র'বে চির দিন
কোন কালে নাহিকো বিনাশ।
চিরতৃপ্ত, চির শান্ত, চির নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ প্রেমের বিকাশ।

অনন্ত প্রেমের বিন্দু পড়িলে হৃদয়ে
হাসে প্রাণে অমৃত কিরণ।
ভুলে যাই সুখদুঃখ স্বার্থের বারতা
টুটে যায় মায়ার বন্ধন।

বক্ষে রাখ তাপিত পরাণ
অশরণে কোলে দাও স্থান।
উচ্চ নীচ নাহিকো গণনা,
পাপ দগ্ধে কর পরিত্রাণ।

এ জগতে তুমি সব—সব তোমা ময়,—
অতুলন মহিমা অপার!
বিস্ময় পুলকে স্তব্ধ, সরে না বচন—
নত শিরে করি নমস্কার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শ

সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ, সেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধেও প্রকৃত অর্থজ্ঞান না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্যই অর্থ পরিগ্রহ না করিয়া কেবল পাঠ করিলে বেদাদিপাঠের কোন ফল হয় না, ইহা শাস্ত্রে পরিষ্কার ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টো বৈভবেৎদ্বিজঃ।
পাঠমাত্রাবসন্নস্তু পঙ্কে গৌরিবতিষ্ঠতি॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥" ইতি
শব্দকল্পদ্রুমধৃত কৌর্ম্মে উপরিভাগে ১৩শ অধ্যায়।

"কেবল বেদপাঠ করিয়াই দ্বিজ সন্তুষ্ট হইবে না। কেবল পাঠ করিয়াই যে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সে পঙ্কে পতিত গরুর দশা প্রাপ্য হয়। যে বেদপাঠ করিয়া বেদের প্রকৃতার্থের বিচার না করে, সে পুত্রাদিসহ শূদ্রকল্প থাকে এবং কখনও যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।" প্রকৃতপক্ষে যে শিক্ষাতে বিচারশক্তি না জন্মে সে শিক্ষাকে নিষ্ফল শিক্ষা মনে করিতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর কার্লাইল লিখিয়াছেন যে, বোধ-শক্তি বিশেষ বরণীয় দ্রব্য বটে, কিন্তু অনেক সময়ই শিক্ষাতে তাহা অর্জ্জিত হয় না; সুতরাং শিক্ষাও নিরর্থক হয়।

এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন অনুশীলন দ্বারাই শিক্ষা ছাত্রের মানসিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞতা। কার্লাইল তদীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত মৌলিক বিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট মন্তব্য করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এখানে উদ্ধৃত করা আমরা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করি:—

"তোমাদের যেন মনে থাকে যে, পুস্তক ও শিক্ষার অন্তরালে, যাহাকে বিজ্ঞতা বলে, তাহার অর্জ্জন বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে সমস্ত পদার্থ তোমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান ও যথার্থ বিচারে সেই বিজ্ঞতা প্রকটিত হইয়া থাকে, এবং ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যবিষয়ে একান্ত আসক্তির সহিত আচরণের অভ্যাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে॥"

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না হইলে শিক্ষার্থী কখনও শিক্ষার প্রকৃত ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতেই সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র বলিতেছে,

"যস্য নাস্তি স্বয়ংপ্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥"

"যাহার নিজের জ্ঞান নাই শাস্ত্র তাহার কি উপকার করিবে। যে জন দুটী চক্ষুতে বঞ্চিত, দর্পণ তাহার কি উপকার করিবে?"

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে জ্ঞানই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। যে শিক্ষাতে জ্ঞানের বিকাশ হয় না, তাহা নিষ্ফল শিক্ষা। জ্ঞানের অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কিছুই উৎকৃষ্ট নহে। তাহাতেই শাস্ত্রে বলে, "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।" কার্লাইলও জ্ঞানকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছেন যথা:—'জ্ঞান মহৎ, জ্ঞান অমূল্য। ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ বর্ণনাই অতিরঞ্জিত নহে। ইহা মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধিকার। যাহার জ্ঞান আছে, তিনিই শ্রেয়োলাভ করিয়াছেন।' আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রে 'ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়েৎ' বলিয়া জ্ঞানের জন্যই আমরা প্রার্থনা করিয়া থাকি।

বস্তুর মূল তত্ত্ব জ্ঞান আমরা বিদ্যার শেষ ফল বলিয়া উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্ত বস্তুর মূলতত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারাই আমরা ঈশ্বর জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি; কারণ পরমেশ্বর সমস্ত বিশ্বেরই মূলাধার। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া যে আমরা বলিয়াছি তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞানই বুঝাইয়া থাকে। এই ঈশ্বর জ্ঞান হইতেই আমরা মুক্তির অধিকারী হইতে পারি। বেদপাঠ ও বেদাচরণ দ্বারা ব্রহ্মচারী কিরূপে ক্রমে ক্রমে চরম ঈশ্বর তত্ত্বে উপনীত হয়, নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্র বিবরণ হইতে তাহা জানিতে পারা যাইবে যথা—

"গত্বা বনং যো বিধিবজ্জুহুয়াৎ জাতবেদসম্।
অধীয়ীত সদানিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিত॥
সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদান্তাংশ্চ বিশেষতঃ।
অভ্যাসেৎ সততং মুক্তোভস্মস্নানপরায়ণঃ॥
এতদ্বিধানং পরমং পুরাণং বেদাগমে সম্যগিহেরিতং বঃ।
পুরামহর্ষি প্রবরাভি পৃষ্টঃ স্বায়ম্ভুবো যন্মনুরাহ দেবঃ॥
এতমীশ্বর সমীরিতং নরোযোঽনুতিষ্ঠতি বিধিং বিধানবিৎ।
মোহজালমপহায় সোঽমৃতোযাতি তৎপদমনাময়ং শিবম্

শব্দকল্পদ্রুমধৃত কৌর্ম্মে উপরিভাগে ১৩শ অধ্যায়।"

"যিনি বনে যাইয়া যথাবিধি অগ্নিতে হোম করেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মকে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সাবধান হইয়া সাবিত্রী ও শতরুদ্রীয় নিত্য পাঠ করেন, এবং বিশেষরূপে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন; পক্ষান্তরে যিনি বিধানজ্ঞ হইয়া সংসার-বন্ধন দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া ভস্মস্নানপরায়ণ হইয়া পুরাকালে মহর্ষিশ্রেষ্ঠদিগের দ্বারা বেদ ও আগমে (তোমাদের জন্য) সম্যক্ উপদিষ্ট এবং স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বারা উক্ত ঈশ্বরাদিষ্ট বিধান সকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অজ্ঞান জাল ভেদ করিয়া মঙ্গলময় নিত্যপদ লাভ করতঃ অমর হইয়া থাকেন।"

অতএব বিদ্যার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তপস্যায় মুক্তি লাভ হইবে, ইহাই বিদ্যার প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রে এই জন্যই বিদ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক ভাগ 'পরা বিদ্যা', অপর ভাগ 'অপরা বিদ্যা' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরাবিদ্যা ধর্ম্ম জীবনের বিশেষ উপযোগিনী, অপরা বিদ্যা বৈষয়িক জীবনের বিশেষ উপযোগিনী। একটীতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রধান লক্ষ্য, অপরটীতে বৈষয়িক শিক্ষা প্রধান লক্ষ্য। পাশ্চাত্য General বা Secular এবং Relegious বা Theological Education ও এই রূপেই কল্পিত হইয়াছে।

কেবল জ্ঞান লাভই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বলা যায় না। সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহাতেই নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা চাণক্য লিখিয়াছেন, "পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং। কার্য্যকালে ন আয়াতি, ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম॥" "যে বিদ্যা পুস্তকেই থাকে এবং যে ধন পরের হাতে থাকে, তাহা বিদ্যা বা ধন নয়; কারণ তাহা কাজের সময় পাওয়া যায় না।"

যেমন আহার্য্যের পরিপাক না হইলে তাহাতে শরীরের পরিপোষণ হয় না, তেমনই সুশিক্ষা না হইলে মানসিক কোন উন্নতিই সাধিত হয় না প্রত্যুত তাহা বিষবৎ অপকারই করিয়া থাকে। তাহাতেই চাণক্য বলিয়াছেন, "দূরধীতা বিষংবিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্॥"

যে শিক্ষা জীবনে প্রতিভাত না হয় তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে, তাহা অশিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হওয়াই উচিত। শিক্ষা দ্বারা জীবন গঠিত হইলে, চরিত্র গঠিত হইলে, পৃথিবীর কার্য্য সাধিত হইলে, তবেই তাহা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভারতে শেষোক্ত শিক্ষাটী কিরূপ উচ্চমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রথমোক্ত শিক্ষাটী কিরূপ অধঃকৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বাক্য দুটী হইতেই জানিতে পারা যায়, যথা

শাস্ত্রাণ্যধীত্যপি ভবন্তি মূর্খাঃ।
যস্তু ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥

শাস্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে। যে ক্রিয়াশীল সেই প্রকৃত বিদ্বান।

"পঠকাঃ পাঠকা শ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
"সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খঃ যঃ ক্রিয়াবান্ সঃ পণ্ডিতঃ॥"

অধ্যয়নশীল, অধ্যাপক, আরও শাস্ত্রচিন্তাকারী সকলেই ব্যসনাসক্ত এবং মূর্খ। যে ক্রিয়াশীল সেই পণ্ডিত।

এখানে শিক্ষার কার্য্যে তৎপরতার যেমন নিরতিশয় প্রশংসা দেখা যায়, পণ্ডিতপ্রবর কার্লাইলের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবেও তদ্রূপ প্রশংসাই দেখা যায় যথা—

"তখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তুমি যখন নিজে স্বাধীন ভাবে অধ্যয়নে নিরত হইবে, তুমি যে কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছ—যাহা তোমার রুচির অনুরূপ—

যাহাতে তুমি অধ্যয়ন ও কার্য্য করিতে পার—তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হইবে। পৃথিবীর মধ্যে সেই লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগা যে পৃথিবীতে তাহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে বলিতে পারে না, যে তাহার জন্য পৃথিবীতে কোন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পায় না ও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না।"

গ্রন্থাদি পাঠের অভ্যাস যে ছাত্রাদির পক্ষে বিশেষ রূপে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা "আবৃত্তি সর্ব্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী", এই প্রচলিত কথা হইতেও প্রমাণ হয়। গ্রন্থাদি সংগ্রহ অর্থাৎ নিজের একটী পাঠাগারের মত সংস্থাপনও যে জ্ঞান সঞ্চয়ের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত তৎসম্বন্ধে ও একটী সুন্দর কথা প্রচলিত আছে যথা "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ।" "গ্রন্থ থাকিলেই পণ্ডিত হয়।"

অধ্যয়নের কি কি উপকরণ পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, গ্রন্থ পাঠ হইত এবং তাহা ভূর্জ্জবল্কলে বা তালপত্রাদিতে লিখিত হইত, তাহাই আমরা জানিতে পারি। এই জন্যই ভূর্জ্জবৃক্ষের এক নাম "বিদ্যাদল" এবং তালপত্রাদি হইতেই পুস্তকের পাতার নাম "পত্র" হইয়াছে। পত্রগুলি যে সূত্রের দ্বারা একত্র গ্রথিত হইত, গ্রন্থ নামের দ্বারা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা শিক্ষাজীবনের পরই গার্হস্থ্যাশ্রম অর্থাৎ সাংসারিক জীবন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গার্হস্থাশ্রমকেই আপনার সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের ন্যায় সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইত।

ব্রহ্মচারী জীবন বা ছাত্রজীবন সাধারণতঃ ২২ বৎসর ব্যাপী হইত। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুর হস্তে অর্পিত হইত, এবং ২২ বৎসর পরে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের সময় তাহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসর। সমাপ্তাবস্থ ত্রিংশদ্বর্ষ যুবক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দারপরিগ্রহ করিত; যথা "ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥" মনুতে বিশেষ স্থলে ছত্রিশ বৎসর পাঠেরও উল্লেখ আছে, যথা,

"ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম। তদর্দ্ধিকং বার্দ্ধিকংবা গ্রহণান্তিকমেবৰা॥ বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদংবাপি যথাক্রমম্। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥"

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকরতঃ ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষ ব্যাপিয়া ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়নরূপ ব্রতাচরণ করিবেন, বা অষ্টাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন, কিংবা নয়বৎসর বেদত্রয় অভ্যাস করিবেন; অথবা যাবৎ পরিমিত কাল এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে পারেন, ততকাল গুরু গৃহে অবস্থিতি করিয়া অধ্যয়ন করিবে।

স্নাতক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া যথাক্রমে বেদশাখাত্রয় বা বেদশাখাদ্বয় অথবা একমাত্র বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া, কৃতদার হইয়া গৃহস্থাশ্রমে বসতি করিবেন।"

পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য সন্দর্শন করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের ব্রহ্মচারীগণ যেমন ভিক্ষা বা শিক্ষক প্রদত্ত অন্নের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রজীবন যাপন করিত, পাশ্চাত্য বিদ্যালয়েও ভিক্ষা বা বৃত্তির উপরই ছাত্রকে নির্ভর করিতে হইত। পাশ্চাত্য কলেজ (College) নামটির প্রধান প্রতিপাদ্যই ভিক্ষা বা বৃত্তি বিতরণ। আমাদের শিক্ষা যেমন পবিত্র আশ্রমে বা মঠে হইত, পাশ্চাত্য ছাত্রদিগের শিক্ষাও তেমনই ধর্ম্ম মন্দিরে বা মঠে হইত। আমাদের মধ্যে যেমন কুমার থাকিয়া শিক্ষা শেষ করিবার নিয়ম ছিল, পাশ্চাত্য দিগের মধ্যেও তদ্রূপ কুমার থাকিয়াই শিক্ষার শেষ করিবার নিয়ম; তাহাতেই এখনও তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধি Bachelor (কুমার)। এই উপাধি লাভ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রদিগকে লিখিত বা মৌখিক বিচারে আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হইত।

সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাচিত দুই বা ততোধিক প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইত। যে সমস্ত শিক্ষক এই বিচারে অধ্যক্ষতা করিতেন, তাঁহারা মধ্যস্থ বলিয়া কথিত হইতেন। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের Wrangler উপাধিটীর অর্থানুধাবন করিলে ইহার মূলে এক প্রকার বিচারপ্রণালী বর্ত্তমান থাকারই যেন প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের চতুষ্পাঠীতে যেরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা ছাত্রদিগের অধ্যয়ন ও শিক্ষা হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমন তর্কবিতর্ক দ্বারাই বিদ্যার চর্চ্চা ও শিক্ষা হইত।

আমাদের বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীর উপাধি ও সভায়ও পূর্ব্বোক্ত বিচারপ্রথার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের তর্কচূড়ামণি তর্কভূষণ তর্কপঞ্চানন তর্কবাগীশ প্রভৃতি উপাধি বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। পণ্ডিতদিগের আহূত সভায় এখনও পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ এই দুই পক্ষ বিভাগ হইয়া বিচার হইয়া থাকে, এবং প্রবীণ অধ্যাপকগণ মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর যে চিত্রাভাস আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হইতে আমরা তাহার মূলাদর্শটী এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

The word College or Collegium, may have been derived from the Latin word College, I collect or gather ; and the academic gatherings from which College arose very probably took place in connection with Churches and monastaries simply for the reception of alms to which subsequently a condition was added to learn and perform something for the service of the Church. In England the legal definition of a College is that it is an eleemosynary lay Corporation, because its object is perpetual distribution of alms in the shape of stipends. Even in our times, we have seen alms-houses converted into work-houses, and prisons into reformatory and industrial institutions.

The exercises by which the competency of the Scholars was determined were first of a private character and were carried on in the schools of the respective teachers at stated periods and were called disputations, determin ation, responses. They were afterwards converted into general and public academic Solemnities. The candidate took part in the private disputations of the schools in order to make himself known to the teachers, and he gave cursory lectures.

These public exercises were exacted after the candidate was emancipated from his teacher's scholarship but was still under his auspices and patronage and eventually gave rise to the distinction called the Bacca laureate or the Bachelor. Up to the 12th century the bachelor's position was looked upon as a scholastic step simply.

Still subject to the superintendence and patronage of his teacher, the candidate for the license was bound to attend lectures on specified subjects and to terminate his career of study by an "Act" which in those times signified "the delivery of some specimen of erudition in the shape of a thesis or oration, or disputation in which the candidate proposed to maintain and defend a proposition, true or false, and was called the respondent, because he answered to the objections of two or three others selected

for the purpose, and hence called opponents; and the masters presiding over the disputation were called moderators." A Manual on Universities, by William Masters.

ঋষিগণই শিক্ষাগুরু পদে বরিত হইতেন বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু হিন্দুগণ এরূপ সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না যে ঋষি ব্যতিরিক্ত উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরুর ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন। তাহাতেই যে মনু নব্য শিক্ষিতের নিকট অনুদারতার অপবাদ গ্রস্ত হইয়া থাকেন, তিনিও দুই স্থানে মুক্তকণ্ঠে সেই অধিকারের বিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন; যথা—শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতেতরাদাপি। ২৩৮, ২য় অধ্যায়।

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর জাতি হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।'

"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে। অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥" ২৪৬, ২ অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে অব্রাহ্মণের নিকটও অধ্যয়ন করিতে পারে। যে পর্য্যন্ত গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন ও শুশ্রূষা করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-বিধান প্রকৃত কার্য্য পরিণত হইয়াছিল কি না এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ থাকিলে "নীচাদপ্যুত্তমাবিদ্যা" এই সুপ্রচলিত নীতিবাক্য স্মরণ করিলেই তদীয় সংশয় অপনোদিত হইতে পারে। কারণ বিধি বা বিধান যেমন শাস্ত্রের উপদিষ্ট নিয়ম, নীতি তেমনই সাধারণের পালিত নিয়ম।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিয়া আসিলাম। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে বিদ্যা বিদ্বান্ ও বিদ্যাগুরুকে ভারতবর্ষ যেরূপ উচ্চমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশে কখনও সেরূপ উচ্চ মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এখানে আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনে নিত্যপ্রচলিত কয়েকটি নীতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, তৎসমস্ত দ্বারাই আমাদের কথায় যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হইবে। যথা, বিদ্যার মর্য্যাদা—

সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্। অহার্য্যত্বাদনর্ঘত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥"

"সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অনুত্তম দ্রব্য, কারণ ইহা অপহরণ করিতে পারে না। ইহা অমূল্য এবং সর্ব্বদাই অক্ষয়।"

"বিদ্যারত্নং মহাধনম্।" বিদ্যা বড় মহামূল্য ধন। বিদ্বানের মর্য্যাদা—"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বংচ নৈব তুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্ব পূজ্যতে॥

"বিদ্যাবত্ত্ব ও নৃপত্ব কখনও তুল্য নহে। রাজা মাত্র স্বদেশে পূজিত হন, বিদ্বান সর্ব্বত্রই পূজিত হন।

"অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।"

"শাস্ত্রজ্ঞ কুলহীন হইলেও দেবতাদিগের দ্বারা পূজিত হন।"

গুরুমর্য্যাদা—একমপাক্ষরংযস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্বা সোঽনৃণীভবেৎ॥

"যে গুরু এক অক্ষরও শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন, পৃথিবীতে এমন বস্তু নাই, যাহা দিয়া শিষ্য গুরুর সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে।"

"ন চ বিদ্যা সমোবন্ধু নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ॥"

"বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, এবং গুরু হইতে অধিক মান্য আর কেহ নাই॥"

বিদ্যার প্রভাব সম্বন্ধেও আমরা সবিশেষ উজ্জ্বল বর্ণনা প্রাপ্ত হই, যথা—"বিদ্যা নাম কুরূপরূপমধিকং, প্রচ্ছন্ন মস্তর্দ্ধনং। বিদ্যা সাধুজনপ্রিয়া শুচিকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ॥ বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশকরী বিদ্যা পরং দেবতা। বিদ্যা ভোগ্যযশঃ কুলোন্নতিকরী বিদ্যাবিহীনঃ পশু॥"

"বিদ্যা কুরূপদিগের অধিকরূপ। ইহা গূঢ় মানস ধন ইহা সাধু লোকদিগের প্রীতির বস্তু। ইহা উজ্জ্বল প্রভা সম্পাদনকারী। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ইহা বন্ধুদিগের পীড়াদূরকারী ইহা পরম দেবতা, ইহা ভোগযশঃকরী, কুলোন্নতিবিধায়িনী। বিদ্যাহীন লোক পশুতুল্য।

চাণক্য বলিয়াছেন "বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্॥" "বিদ্যা সকলেরই অলঙ্কারস্বরূপ।' চাণক্য আরও বলিয়াছেন— "বিদ্যা সমস্ত গুণের আকর এবং অজ্ঞতা সমস্ত দোষের আধার; সুতরাং সহস্র মূর্খ অপেক্ষাও এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অধিক বৈশিষ্ট্য, যথা—

"পণ্ডিতেচ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলম্।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞ একোবিশিষ্যতে॥"

উদ্ধৃত বাক্য সকল হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ভারতে বিদ্যার মাহাত্ম্যই সর্ব্বোপরি স্বীকৃত হইয়াছে।

শিক্ষক দ্বারা আমাদের জীবনে যে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদিত হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের নীতি শাস্ত্রের সাধারণ ভাবের যে একটি বাক্য প্রচলিত আছে তাহাতে আমরা প্রাচীন আর্য্য শিক্ষার অতীব সুন্দর একটী সংক্ষিপ্ত আদর্শ প্রাপ্ত হই! সেই বাক্যটী এই—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥"

বিদ্যা হইতে বিনয় (নম্র ভাব) হয়, বিনয় হইতে যোগ্যতা জন্মে, যোগ্যতা হইতে ধনোপার্জ্জন হয়। ধন হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে বিদ্যানুশীলন করিলে আমাদের বিনয়গুণ জন্মিবে। বিনয়গুণের দ্বারা আমরা যোগ্য হইতে পারিব। যোগ্য হইলে আমাদের ধনলাভ হইবে। ধনের দ্বারা আমরা ধর্ম্মকার্য্য করিতে সমর্থ হইব। তাহার ফলে আমরা নির্ম্মল সুখ শান্তি ভোগ করিয়া জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব। বিদ্যার দ্বারা লোক জ্ঞানী হইয়া সৎপথ ও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করতঃ এইরূপেই জীবনের সফলতা লাভ করে। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তি বৈষয়িক কার্য্যের মধ্যেও আপনার জ্ঞানপ্রভাবে ধর্ম্মের বিমল আনন্দকে চরম লক্ষ্য জানিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হন. ইহাই উদ্ধৃত নীতিবাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য। অতএব ধর্ম্ম ও তজ্জনিত বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখই যে আর্য্যদিগের শিক্ষার শেষ লক্ষ্য তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। আর্য্যগণ জানিতেন যে জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্য বিদ্যার্জ্জনই প্রথম আবশ্যক। বিদ্যার্জ্জনে আরম্ভ হইয়া বিসর্জ্জনে জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। এই পূর্ণতা সাধিত হইলে নিরবচ্ছিন্ন পরম সুখে জীবনের চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহারা বলিয়াছেন,

"প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়েনার্জ্জিতং ধনম্। তৃতীয়ে নার্জ্জিতো ধর্ম্মঃ চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥"

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শিক্ষার আদিতে যেমন ধর্ম্মের যোগ অন্তেও তেমনই ধর্ম্মেরই যোগ। ইহা হইতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে আর্য্যদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ ধর্ম্মাত্মক শিক্ষা ছিল, বর্ত্তমানবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যায় তাহা ধর্ম্মহীন শিক্ষা ছিল না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি শিক্ষার প্রতি আদর, বিদ্যার প্রতি সম্মান, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ, উন্নত জ্ঞান ও উন্নত সভ্যতার পরিমাপক হয়, তবে ভারতবর্ষ যে একসময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার চরম সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দর্পহারী ভগবান

(১)

শ্রীযুক্ত হরকিশোর বাবু মফঃস্বলের এক সহরে মস্ত এক পাটের আফিসের বড় বাবু। তাঁহারই হাতে বড় বড় তিন তিনটা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে,সুতরাং ঘরে রজত খণ্ডের কোন অভাব ছিল না। তবে যে আজও চাকুরী ইস্তফা দেন নাই, সেটা নিতান্ত সখ্ করিয়া। সে যা হ'ক, সম্প্রতি ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লইয়া তিনি বড় গোলের মধ্যেই পড়িয়াছেন। বয়স বিয়াল্লিশ পার হয় নাই, এ কথা নূতন গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিতে তিনি কখনো চেষ্টার কসুর করেন নাই, অথচ ইহাতে যে একটা "কিন্তু"র গোলযোগ

থাকিয়া যাইত, তাহা উভয় পক্ষের কাহারও অগোচর থাকিত না। কোষ্ঠীপত্রে এ সম্বন্ধে জ্যোতিষী ঠাকুর যে একটা গুরুতর প্রমাত্মক সংবাদ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রমাণের জন্য বিশেষ সাক্ষীসাবুদেরও প্রয়োজন ছিল না। হৃদয়ে যৌবনমত্ততার তরঙ্গ ছিল না। হরদম্ হাত পাখা চালাইয়াও মরা গঙ্গায় কিছুতেই ঢেউ উঠিত না। মনের নদীতে এমন অবস্থায় ভাটার টান যখন অত্যন্ত প্রবল, তখন হরকিশোর বাবু মনের জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া, দোকানের জিনিষ দিয়া, নব যুবতীর মন হরণের জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, এই ভাবে রঙ্গমঞ্চের উপর সীন টানাইয়া, মিথ্যাকে স্বপ্নের তবকে জড়াইয়া যদি সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখা যাইত, তবে অবশ্য সংসার সুখের হইত। হরকিশোর বাবু এ ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি দেখিতে না পাইয়া মনে মনে কেবল পত্নী লীলাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, লীলা যেন হল্‌করা তাসের হরতনের বিবিটি, তার রূপ আছে, যৌবন আছে, পারিপাট্যের বাহার আছে, কিন্তু হৃদয় নাই! তাহাতে ঘর সাজানো যায়, কিন্তু মন সাজানো যায় না! তবু শরীরে যত দিন বল ছিল, বিশেষতঃ মনে যত দিন অহঙ্কার ছিল, তত দিন এক রকমে কাটিয়াছে; কিন্তু এই ভাটির মুখে, হরকিশোর বাবু নিজেকে লইয়া নিজে বড় আরামে ছিলেন না।

(২)

সে দিন হরকিশোর বাবু দুপুর বেলা ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত ক্লান্ত দেহটাকে কষ্টে টানিয়া লইয়া, আফিস হইতে ঘরে ফিরিলেন। স্নানাহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া আবার ২টা ৩৩ মিনিটের সময়, পাটের দাদনের টাকার হিসাব বুঝ করিয়া দিতে হইবে। দুই দিন দেরী হইয়াছে বলিয়া সকালে বড় সাহেব বড় তম্বি করিয়াছেন। আষাঢ় মাস। চারি দিকের সবুজ গাছ পালার উপর যেন একটি সজলতা ছল্‌ছল্ করিতেছে। সারা আকাশময় একটা অবয়বহীন মেঘের বিষণ্ণতা;—তার মাঝে এক জায়গায় উজ্জ্বল কুজ্ঝটিকার ন্যায় একটা তেজের আভাস সূর্য্যদেবের নিরুৎসাহ সূচনা করিতেছে।

হরকিশোর বাবুর বাড়ার পেছনে একটি ছোট্ট খাল। বর্ষার কপিশ জল তার দুই কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পানাগুলি সারি বাঁধিয়া সবুজ তারার ছিন্ন হারের মত জলের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। লীলা সেই খালের ঘাটে একটা পড়া গাছের গোড়ার উপর বসিয়া আন-মনে হাতে বার বার সাবান মাখিতেছিল, আবার জল দিয়া ধুইয়া ধুইয়া বার বার তার স্বচ্ছ, সোণার চুড়িপরা হাতখানি দেখিতেছিল। জলে ছায়া তার অনুকরণ করিতেছিল। পাশে একটা কামিনী ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। তার নীচে কয়েকটি পাতি হাঁস কাছাকাছি হইয়া বসিয়াছিল। একটা বড় সবুজ গোল পাতার উপর একটি অকাল পদ্মের কুঁড়ি লীলার পায়ের কাছে তার আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া ধরিয়াছে।

লীলাকে এমন সময় একাকী ঘাটে দেখিতে পাইয়া হরকিশোর বাবু বড় আমোদ পাইলেন না, অথচ আসল মনের কথাটা ব্যক্ত করিতেও সাহস পাইলেন না। একে হিসাবের চিন্তা, তার উপর সাহেবের কড়া হুকুম, তার উপর ক্ষুধা! এই ত্র্যহস্পর্শের জ্বালায় লীলাকে এমন মধুর ভাব-রাজ্যের মধ্যে নাগাল পাইয়াও তিনি নিজের মনে যে যথেষ্ট কাব্যের উত্তেজনা অনুভব করিলেন না, সে জন্য তিনি বঙ্গদেশের সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী-সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ ভাবে মার্জ্জনীয়।

হরকিশোর বাবু কল-তলায় তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া খাবার ঘরে আসিয়া দেখেন, লীলা তখনো বসিয়া বসিয়া হাতে সাবানই মাখিতেছে! এবার তিনি মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিলেন। তবু ত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী! সুরটি তাই কিছু নামাইয়া লইয়া ডাকিলেন,—

"লীলা, ও লীলা! আজ্‌কে কি চব্বিশ ঘণ্টা খালি স্নানযাত্রাই চল্‌বে, না, কারো খাবার টাবার দেখে শুনে দিতে হবে!"

লীলার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া রঙ্গীন গামছা দিয়া চুল হইতে জল মুছিতে মুছিতে ভিজা কাপড়ে তার স্বামীর নিকট হাজির হইল। হাসি

হাসি মুখখানির চারি ধারে কুঞ্চিত কুন্তল রাশি, দেখিতে মেঘের ঝালরের মত। হরকিশোর বাবুর মনে হইতেছিল, বুঝি বা প্রাবৃট-লক্ষ্মী শস্যশ্যামল প্রান্তর ভুলিয়া গিয়া সিক্ত বসনে আজ তাঁর দীন-ভবনে আসিয়া উদিত হইয়াছেন! মনের অবস্থাটা খুব হাল্কা থাকিলে ভক্তিভরে সে দিন হরকিশোর বাবু যে কি করিয়া ফেলিতেন তা বলা যায় না। কিন্তু স্ত্রী-জাতির, বিশেষতঃ দ্বিতীয়পক্ষগ্রস্তাদিগের বিশেষ দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর মনটা সে দিন নিতান্ত বিরস—কে যেন তাতে যথেষ্ট পরিমাণে 'কষ্টিক লোসন' মাখাইয়া দিয়াছিল!

নিজের মন যখন তিক্ত থাকে, তখন সমুদয় দুনিয়াটাই বিরস বোধ হয়। লীলা হরকিশোর বাবুর আহারের যোগাড় করিয়া দিল। কিন্তু আহারে বসিয়াই তিনি মুখটা বেজায় বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি রান্নাই করেচ মাথা মুণ্ডু! ডালনাটা ত কেউ মুখে দিতে পারে না, অত ঝাল! দেখ, রাগ করো না, লীলা, পেটের জন্যই তো এত ঝকমারী! যে রোজগার করে, তারো তো দুমুঠা খেতে হবে! কি ছাই খাব, এ সব খেয়ে খেয়ে ডিস্‌পেপসিয়া ধরে গেল! কাল মাছের ঝোলটা নুন দিয়ে পুড়িয়ে রেখেছিলে, আজকে এ ভাব।"

লীলার মুখের উপর তখন একটা খণ্ডপ্রলয়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। প্রায় বর্ষণোন্মুখ! কিন্তু আজ হরকিশোর বাবু কিছুতেই ঘাবড়াইলেন না। সাহেব আজ তাঁহাকে বেশ কড়া রকমের দম দিয়াই বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন।

লীলা বলিল, "তা আর কি করবো বল! পরশু অত করে তোমার জন্য ডিমের 'কারি' করে দিলাম, নলিনী দিদি নিজে দেখিয়ে দিলে। তুমি তো দেখেই চীৎকার দিয়ে উঠ্‌লে, এত মস্‌লা দিয়ে রেখেছ, হজম কর্‌বে কে? সে দিন ইলিশ মাছ দিয়ে ঝোল হলো, টক হলো, তুমি ত চাকরটাকেই বকে অস্থির—বেটা বারো আনার মাছ আনালি কি বলে! পয়সা দিবে একটি, গান শুনবে অক্রুর হরণ! তা আমাকে নিয়ে যদি তোমার অসুবিধা হয়, তো আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই চলে!"

লীলা যখন শরাসন ধারণ করিয়া হরকিশোর বাবুর প্রতি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল, পাটের বড় বাবু তখন কিছু দমিয়া গেলেন। পরে আপোষের ভাবে কহিলেন, "আহা; রাগ করচ কেন, লীলা, আমি তোমায় কিছু বল্‌চি না। আমার পেট্‌টাই হচ্চে বড্ড খারাপ। যা খেয়ে হজম কত্তে পারব না, মনে হয়, তা দেখেই ঘাবড়ে যাই! আর তুমি যখন হচ্চ আমার স্ত্রী—ঘরের লক্ষ্মী, তখন আমার সুবিধা অসুবিধা সব তো তোমাকেই বলতে হবে! কেমন, তাই নয় কি, লীলা?"

লীলাও আপোষের প্রস্তাবে কোনও দিনই বিমুখ নয়। আপন হৃদয়ের সঙ্গে আপোষ করিয়াই ত সে হরকিশোর বাবুর সংসারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে! নতুবা লীলার পক্ষে হরকিশোর বাবুর ঘর করা অসম্ভব। তিনি তার ঠাকুরদাদার বয়সী!

লীলা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, "তা-তো-বটেই!"

হরকিশোর বাবু বলিলেন, "এই দেখ, তপসী মাছটা অত নরম করে ভাজ্‌তে হয় না—ভেতরটা কাচাই রয়ে গেছে!"

লীলা নাকের নোলকটাতে একটা প্রবল নাড়া দিয়া বলিল, "আহা, তাকি আর আমি জানি! কড়া ভাজলে তোমার যে আবার পেটে সয় না! শ্যাম রাখবো না এখন কুল রাখবো?"

হরকিশোর বাবু আরো কয়েক ঘাট খাদে নামিয়া বলিলেন, "আহা, চট কেন লীলা; আমি কি আর বলচি তুমি পার না! মোদ্দা কথাটা হচ্চে এই যে, পেটের অবস্থা বুঝে রান্নাটার মাঝে একটু রকম সকম করে নিতে হয়। কিন্তু তাই বলে একেবারে কাচা মাছ খাওয়া—তা হলে রান্না করার ত আর দরকার দেখি না!"

এবার একেবারে ধারা-বর্ষণ!

পরে লীলা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার ঘরে যখন টাকার দুঃখু ছিল না, তখন দেখে শুনে একটা

দ্রৌপদী ঘরে আনলেই হতো! আমার না আছে রূপ না আছে গুণ, এমন অকর্ম্মার ঢেঁকী আমি!"

কথাগুলির ভিতর দিয়া আহত চাতকিনীর তৃষ্ণা ও নিরাশার বেদনা দুইই অতি করুণ সুরে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল!

হরকিশোর বাবু ভাবিলেন, কথা যখন ফুটিয়াছে, তখন যুবতীর হৃদয় আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। পরে ভাব-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—

"পাগলামি করো না লীলা! তোমার রান্নায় কোন খুঁত নাই! তবে কি না ডিস্‌পেপসিয়ার মুখ, সর্ব্বদাই বিরস; আর মেজাজটা আমার সব সময় ঠিক থাকে না! কখন যে কি বলে ফেলি, ঠাহর থাকে না।"

লীলা তার মুখে চুপ্ করিয়া থাকিল, "সান্দ্রেহহ্নীব স্থলকমলিনী ন প্রবুদ্ধা ন সুপ্তা!"

হরকিশোর বাবু বেশ একটু ফেনাইয়া কথাটা পাড়িলেন—"জান কি লীলা, যেমন তেমন লোকের যে সে রকম রান্না হলেই এক রকম চলে যায়। কিন্তু আমাদের বংশে কেউ খারাপ রান্না কখনো দেখে নাই। আমাদের পলাশপুরে আজো মা দিদির লোকে কত সুখ্যাতি করে, কেবল এই জন্যে। আমি বেটা ছেলে, কিন্তু এক বার হাতা বেড়ী নিয়ে যদি লেগে যাই, তবে একেবারে ফেলে দিতে পারবে না! মোট কথা, এ বিদ্যাটা বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলে আসছে এখন একেবারে মজ্জাগত হয়ে পড়েছে!"

লীলা হরকিশোর বাবুর কথা শুনিয়া অতি সংক্ষেপে এমন ভাবে একটা "হুঁ" করিয়া জবাব দিল, তাহাতে সে যে তাঁহার কথাগুলা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না! স্বামীর কথার উপর আবার সন্দেহ! শুধু লীলার উপর কেন, তিনি বাংলা মুলুকের সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-সম্প্রদায়ের উপর আন্তরিক চটিয়া গেলেন। কিন্তু সেটা খুব মনে মনে। কারণ এক বার হার মানিয়াছেন, পুনরায় লীলার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না! পরে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যা হোক, এখন থেকে রান্নার উপর তোমার খুব ঝোঁক হবে আশা করি।"

লীলা হাসিয়া বলিল, "আশা অমর, মরণ কাল! আমার বাপের কুলে রান্নাবান্নার কোন কালে তেমন নাম ছিল না! কাজেই আমি যে তোমার 'আশা' এ জন্মে পূরণ করে যেতে পারবো, আমার তো তেমন ভরসা হচ্চে না!"

হরকিশোর বাবু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর স্বামী; কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নন। বক্তৃতাটা অন্তঃপুরে যে বিশেষ কাজে লাগে, প্রথম বিবাহের পর হইতেই সে কথা হরকিশোর বাবু জানিতেন। তিনি অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি লীলা, তোমরা না পার কি? চোখের জলে তোমরা ত্রিভুবন জয় করে রেখেছ!"

লীলা খুসী হইল। সে যে এমন হাতে হাতে সার্টিফিকেট পাইবে, এতটা মনে করে নাই। মনে মনে কি একটা ফন্দি আঁটিয়া লইয়া লীলা বলিল,

"তুমি মাছের দমটা খুব পছন্দ কর, না?"

হরকিশোর বাবু খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক ঠিক বলেছ লীলা! তুমি সে দিন যে দমটা রান্না করেছিলে তা বেশ হয়েছিল। তবে কি না মাছটা একটু শক্ত ছিল, আর ঝোল রেখেছিলে কিছু বেশী! আর তত তেল ঘি না ঢাল্‌লেও হতো; ঝালটা একটু জেয়াদা হয়েছিল, আর কিস্‌মিস একেবারে দেওই নি!"

লীলা বলিল "বা, সেদিন ত আমায় এ সব কিছু বল নি! যা পাতে দিয়েছিলাম, খেয়েছিলেও তো সবটুকু। তা যা হোক, তোমাদের বাপের বাড়ীর রান্নাটা এক দিন শিখিয়ে দিয়ো আমায়!"

হরকিশোর বাবু খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন,

"তা নিশ্চয়। তোমার এমন শিখবার আগ্রহ আছে বলেই ত এ সব কথা বলচি; নৈলে আমার হজমের শক্তি একেবারে লোপ পেলেও তোমায় এ সব কিছু বলতুম না।"

লীলা বলিল "কাল বুঝি রবিবার, তোমাদের আপিস বন্ধ?"

হরকিশোর বাবু সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন।

লীলা বলিল, "দেখ, আসচে কাল নলিনী দিদির ননদের বর আসচে। নলিনী দিদি আজ মাথার দিব্যি দিয়ে বিকেল বেলা থেকে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাতা-হাতি কাযকর্ম্ম করে দিতে বলে পাঠিয়েছে। তার শাশুড়ীর অসুখ সে নিজে কোলের ছেলে ফেলে সব কায কর্ত্তে পারে না। মাছ, ঘি, তেল, মসলা, সব আমি ঠিকঠাক করে রান্না ঘরে রেখে যাব। তুমি শুধু তোমার বাপের বাড়ীর ধরণে মাছের দমটা করে রেখে দিও। আমি এসে তাড়াতাড়ি ভাতটা নামিয়ে নেবো এখন, নৈলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।"

হরকিশোর বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তা পারব না? নিশ্চয় পারব, কিন্তু জান কি—"

লীলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু, কিন্তু নয়, আজকে তোমায় এটা করে রাখতেই হবে; আমার মাথার দিব্যি; তোমার বাপের বাড়ীর রকম করে মাছের দমটা করা চাই।"

হরকিশোর বাবু আরও একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "বাঃ, লীলা তুমি আমাকে নিজে রান্না কর্ত্তে বলচো? বরঞ্চ তুমি সব করো, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো এখন!"

লীলা হাসিয়া উঠিল; অতি কষ্টে হাসির ঝঙ্কারটা থামাইয়া বলিল, "সে আবার কি! তোমাদের বংশে রান্না করাও যা, হাঁসের ছানায় জলে সাঁতার কাটাও তা; বংশের গুণ; তোমায় কোনও ল্যাঠায় পড়তে হবে না!"

লীলার হাসিটা হরকিশোর বাবুর দর্পের উপর যেন কতকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল। হরকিশোর বাবু আবার মনে মনে কিছু চটিলেন—পরে বলিলেন, "তা ত নয় তবে কি না, নিজে নিজে উনুন ঠেলা, সেটা পুরুষের কায নয়।"

লীলা পুনরায় হাসিয়া বলিল, "তা খুলে বল না যে, পারবে না, তা হলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়। আমি না হয় নলিনী দিদিদের বাড়ী আজ আর নাই গেলাম!"

হরকিশোর বাবুর অভিমানের একটা কচি ডগা মিছরির ছুরির আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল। হরকিশোর বাবু আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পারব না! সামান্য একটা মাছের দম রান্না করা, তাই পারব না! নৈলে পলাশপুরে বনেদি রায়দের ঘরে আমার জন্মই বৃথা!" পরে সুরটা একটু নামাইয়া বলিলেন, "তবে কি না, সকলে বলাবলি হাসাহাসি করবে; বলবে বাবু, বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর খাবার কত্তে হেঁসেলে গেছে!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি আমার বুড়ো, না?"

হরকিশোর বাবু কয়েক বার ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "তা বুড়ো হই বা না হই, সে কথা হচ্চে না; কিন্তু ছোটলোকগুলো যে বলাবলি হাসাহাসি করবে, সেইটে অসহ্য।"

লীলা হাত নাড়া দিয়া বলিল, "তবে তো বয়ে গেল! বেশ তো, দিক না ওরা সব কথা খবরের কাগজে ছাপিয়ে! বেশ নতুন রকম একটা মজা হবে।"

হরকিশোর বাবু রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের মত নিস্তেজ ভাবে বলিলেন, "মজা আর এতে কি বেশী হবে!"

"কেন, তোমার নিজের হাতে তৈরী মাছের দম, ঐতো মজা! সেটা পুরুষ লোকের পক্ষে কি কম কথা?"

"আমি তো আর মোগলাই ফ্যাশনে রাঁধবো না, আমার সব প্লেনের উপরে।"

"সে দেখা যাবে, এখন।"

হরকিশোর বাবু তখন খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বহুত আচ্ছা, আজ দেখাবো তোমায় মাছের দম কাকে বলে!"

সহসা হরকিশোর বাবুর এতটা তেজের কারণ এই যে, শ্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর "আমিষ ও নিরামিষ আহার" নামক বইখানা ঘরেই ছিল।

(৩)

সন্ধ্যায় পাখীগুলি যখন কলরব করিয়া আপন আপন নীড়ে ফিরিয়া যায়, তখন হরকিশোর বাবু বড় সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবোধ করিয়া সবে বাড়ী ফিরিয়াছেন। মনের গতি কিছু ভাল, কারণ সাহেব হিসাবের ফাঁকি ধরিতে না পারিয়া জমাখরচ পাশ করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে আসিয়া আপিসের কোটটা সবে আলনার উপর রাখিয়াছেন, এমন সময় লীলা বিদ্যুতের ঝিলকের মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া গেল, "আমি যাচ্চি কিন্তু, মশলা, ঘি, নুন, মাছ, লঙ্কা তেজপাত সব ঠিক্‌ঠাক্‌ করে রান্না ঘরে রেখে দিয়েছি!"

হরকিশোর মেঘনাদী ছন্দে জবাব দিলেন,

"নিবাস পলাশপুরে, পত্নী লীলা মোর, আমি কি ডরাই সখি মাছের দামেরে!"

সিঁড়ির দিকে লীলার হাসির তরঙ্গটা কিছুদুর অগ্রসর হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল!

তখন ঘরে আলো জ্বলিয়াছে।

লীলা যখন চলিয়া গেল, তখন হরকিশোর বাবু দৃঢ় সংকল্প করিলেন—"আজ আমি এমন মাছের দম রান্না করব, যা লীলার চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও খায় নাই!" এই ভাবিয়া সাটের আস্তিন কনুই এর কাছে গুটাইয়া লইয়া একটা সিগারেট ধরাইলেন। তার পর কি কি জিনিষ লাগিবে, তার একটা খসড়া ফর্দ করিবার জন্য কাগজ পেন্সিল লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া বসিলেন। কাটিয়া ছাঁটিয়া খসড়া ফর্দ মনোমত হইলে পর কালো কলম দিয়া "ফেয়ার কপি" করিয়া লইলেন, এবং প্রজ্ঞাসুন্দরীর বই দেখিয়া কোন জিনিষটা কখন কি পরিমাণে দিতে হইবে "মার্জিনে" তার একটা "নোট" লিখিয়া রাখিবেন স্থির করিলেন। তারপর এমন আশ্চর্য্য দম তৈয়ারী হইয়া যাইবে, যা লীলার বংশে কেউ কখনও চোখেও দেখে নাই!

এই সংকল্প করিতে করিতেই রাত্রি ৭টা বাজিয়া গেল। ইতিমধ্যে হরকিশোর বাবু তিনটি সিগারেট ধ্বংশ করিলেন। তারপর তিনি আলমারী হইতে প্রজ্ঞাসুন্দরীর বইখানা বাহির করিয়া আনিতে গেলেন। আলমারীর কাছে আসিয়া হরকিশোর বাবু দেখিলেন ভীষণ ষড়যন্ত্র!। পুথির আলমারির গায়ে আজ একটির স্থানে দুইটি তালা পড়িয়াছে!

চাকরের নিকট শুনিলেন লীলা তালা বন্ধ করিয়া চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া তার সই নলিনীদের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। হরকিশোর বাবুর অনেক খানি দর্প এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল।

হরকিশোর বাবু ভাবিয়া হয়রাণ হইয়া গেলেন। অবশেষে ঠিক করিলেন যে, আজ মাছের দম্‌ এমন Original styleএ (মৌলিক ভাবে) তৈরী করা যাইবে যে, আজ লীলা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া থাকিবে। তারপর ফর্দ্দে পেনসিল দিয়া লিখিলেন—মাছ সাড়ে এগার ছটাক। ঘি লাগিবে কি তেল লাগিবে এ সংবাদ কোন অভিধানে লেখা আছে? আর কি লাগিবে? লঙ্কা, হলুদ, দারুচিনি, লবঙ্গ, ধ'নে এলাচ মাথামুণ্ডু সব তো আছে। এর মধ্যে কি লাগবে কি লাগবে না, কে বলিয়া দিবে? আগে ঘি গরম করিয়া কি তাহাতে মাছ চড়াইয়া দিতে হইবে, না আগে মাছ সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে ঘি দিতে হইবে। আজ বিপদের দিনে এ জটিল সমস্যা কে সমাধান করিবে? হরকিশোর বাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন এর চাইতে পাটের দর কসা অনেক সহজ!

এমন বিপদের সময়, হরকিশোর বাবু ঘরের পশ্চিমা চাকর মঙ্গলুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাঁরে মঙ্গলু, মছলি ক্যায়সে পাকানে হোতা, তা বল্‌তে পারিস্‌?"

মঙ্গলু সংক্ষেপে বলিল, "মছলি হামলোক কব্‌হি নাহি খাতা, বাবুজী!"

মঙ্গলু কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। তখন হরকিশোর বাবুর মনে হইল, যা যা আছে, সবই ত ভাল ভাল

জিনিষ, আদা, নুন, লঙ্কা, ধ'নে, জাফ্রাণ, হলুদ, মাছ ইত্যাদি! এ সমুদয়ই ত খাবার জিনিষও বটে! এ সব দিলে ত আর রান্না খারাপ হতে পারে না। আর এ সব যখন দিতেই হইবে, তখন আর অগ্রপশ্চাৎ করিয়া দিয়া বিশেষ লাভ কি? সব জিনিষপত্র মাছের সহিত এক সঙ্গে ডেকচিতে তুলিয়া দিলেই আপদ শান্তি! পরিমাণ, হাতের আন্দাজ! রসনা হাতের আন্দাজের সাহায্য করিবে।

এ রসনা পথে বহু সুরস মাছের দম তলাইয়াছে, সে কি আজ এ বিপদের দিনে হাতের আন্দাজকে একটুও সাহায্য করিবে না?—মন বলিল, "করিবে বৈ কি?" বেইমান রসনা চুপি চুপি বলিল, "না, কখনই ন।"!

তারপর হরকিশোর বাবু ডেকচি ভরিয়া উনুনের উপর জল তুলিয়া দিলেন। জল উষ্ণ হইলে তাহাতে মাছ ছাড়িয়া দিলেন। তার পর, তেল, ঘি, নুন, হলুদ, জাফ্রাণ, তেজপাত, ধ'নে সব এক সঙ্গে চড়াইয়া দিয় একখানা থালা দিয়া ডেকচির মুখ ঢাকিয়া দিয়া ঘড়ি খুলিয়া বসিলেন। মনে মনে হরকিশোর বাবু স্থির করিলেন, ৪৫ মিনিটের পর ডেক্‌চি নামাইয়া মুখের থালা নামাইলেই দেখা যাইবে যে, অতি সুস্বাদু মাছের দম রান্না হইয়া গেছে!

এতক্ষণ চুপটি করিয়া উনুনের সামনে বসিয়া থাকা! হরকিশোর বাবু, আর একটা সিগারেট ধরাইয়া খবরের কাগজটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলেন। তখন রুষ জাপানে ভয়ানক যুদ্ধ! বল্টিক ফ্লিট জাপানীরা উড়াইয়া দিয়াছে! খবরের কাগজ নানা সংবাদ ও কাহিনীতে পূর্ণ। পড়িতে পড়িতে হরকিশোর বাবু পুরা দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন। তিনি যে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, খবরের কাগজ হাতে লইয়া সে কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

সহসা একটা কেমন গন্ধ অনুভব করিয়া হরকিশোর বাবুর চমক ভাঙ্গিল। হরকিশোর বাবু ভাবিলেন ডেকচির ভিতরে একটা নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। তিনি ডেকচির মুখ হইতে থালা সরাইয়া দেখিলেন, জল সব শুকাইয়া গিয়াছে, এবং পোড়া মাছ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া উঠিতেছে! তাড়াতাড়ি ডেক্‌চি নামাইয়া ফেলিয়া হরকিশোর বাবু দেখিলেন কতক মাছ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আর উপরের কতক মাছ এখনও কাচাই রহিয়া গেছে! হরকিশোর বাবু ভাবিলেন রান্নাটা যে ভাল হয় না, তা কেবল লীলার দোষ নয়। আসল কথা, ডেকচিটাই যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত পাতলা হইয়া গেছে। সামান্য আঁচ লাগ্‌লেই ভিতরের অনেক জিনিষ ঝল্‌সে যায়।

(৪)

রান্নার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সবে বড় আয়নার কাছে হরকিশোর বাবু দাঁড়াইয়াছেন। আয়নার ভিতরে দেখিলেন, ডেক্‌চির তলার প্রায় সমুদয় কালী তাঁহার নাকে মুখে লাগিয়া গিয়াছে, এবং চেহারাটা যাহারা লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, তাহাদেরই এক জনের মত হইয়া পড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি আলনা হইতে তোয়ালেখানা পাড়িয়া লইয়া সাবানটার জন্য আয়নার দেরাজে হাতড়াইতে ছিলেন, এমন সময় পেছন হইতে একটা হাসির তরঙ্গ কানে আসিয়া পৌঁছিল! হরিকিশোর বাবু মুখ ফিরাইলেন না, কিন্তু আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইলেন, হাসিতে হাসিতে লীলা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে! লীলাও আয়নার মধ্যে হরকিশোর বাবুর মুখ দেখিয়াই হাসিয়া উঠিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হরকিশোর বাবু বলিলেন, "তবু তুমি এলে যা হোক! নয়টার সময় আসবে বলে গেলে, আর এখন রাত ১১॥ টা!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "কেন আমি আর নলিনী দিদি ঠিক ৯। টায় ঘরে ফিরে এতক্ষণ পালিয়ে তো তোমার রান্নাই দেখ্‌ছিলাম! নতুন ধরণের রান্না তোমার! বাপের বাড়ীর নমুনাটা দেখান চাই তো!"

হরকিশোর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তামাসা রাখ লীলা, দম নিতান্ত মন্দ হবে না খেতে!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "আমি কি তাই বলেচি!"

*   *   *   *   *

আহারে বসিলে পর, লীলা যখন হরকিশোর বাবুর পাতে তাঁহার স্বপক্ক মাছের দম আনিয়া দিল, তখন তাহার অন্ন প্রাশনের অন্ন শুদ্ধ পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল! এমন অবস্থায় ত আর বাপের বাড়ীর রান্নার গর্ব্ব বজায় রাখা যায় না। তবু হরকিশোর বাবু নিজের বাহাদুরী ছাড়িতে রাজি হইলেন না। এটা তাঁর পাটের আপিসের শিক্ষা! তিনি বলিলেন, "দেখ লীলা, আজ যা হয়েছে তা মোগলাই দম নয়, এটা হচ্চে বিলাতি দম—English pattern.

লীলা হাসিয়া বলিল, "তা ভাল জিনিষ সবখানি তুমিই না হয় খেয়ে ফেল!"

কিন্তু আজ হরকিশোর বাবুর আহারে বিশেষ রুচি দেখা গেল না! আঙ্গুল দিয়া বিলাতী দম কয়েকবার নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন; "তুমি বুঝি কখ্খনো কোলকাতায় যাও নি, লীলা?" লীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না"।

"ওঃ, তবে এ সব তোমার তত ভাল লাগবে না! এ সব সাহেবী খানা—গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এই দম খেয়ে বড় বড় সাহেবরা কত তারিফ করে। আমি এক বাবুর্চ্চিকে নগদ তিন টাকা দিয়ে এ রান্না শিখেছি।

লীলা হাসিয়া বলিল, "এমন ভাল জিনিষটা মুখে তো তোমার দেখচি একেবারেই রুচ্‌ল না!"

হরকিশোর বাবু এবার লজ্জায় লাল লইয়া উঠিলেন। বার কয়েক কাশিয়া বলিলেন "পেটের গতিকটা আজ বড় ভাল বোধ হচ্চে না, লীলা! ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ভাব! কাল তোমার কাচা তপসী মাছ খেয়ে অবধি আজ পর্য্যন্ত পেটটা বুটবুট কচ্চে। আর আমি খাবো না, তুমি দমটা খেয়ে দেখো এক বার!"

লীলা একটু মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল, "ও সব বিলিতী খানা, চৌদ্দ পুরুষে আমরা কখনো চোখেও দেখি নি!"

হরকিশোর বাবু নিতান্তই অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া যান দেখিয়া লীলা হাসিয়া বলিল, "নলিনী দিদি তাদের ঘরে যে মাছের দম করেছিল, তা একটু পাঠিয়ে দিয়েচে। তা একটু চেকে দেখ দেখি!"

হরকিশোর বাবু নিঃশব্দে লীলার সঙ্গত প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হরকিশোর বাবু সে রাত্রিতে যে ভাবে লীলার প্রদত্ত মাছের দমের সদ্ব্যবহার করিলেন তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে, হরকিশোর বাবুর কোনও দিন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ছিল।

পরদিন প্রাতে আফিসে যাইবার জন্য ধরা চূড়া পরিয়া হরকিশোর বাবু তাকের উপরে চসমার কেসটা খুঁজিতেছিলেন, লীলা হাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু খেয়ে গেলে হয় না? আপিস থেকে ফিরবে তো সেই এগারোটায়!"

"কেন, তোমার নলিনী দিদির বাড়ীর দমটা আজও আছে নাকি?"

লীলা হাসিয়া বলিল, "না, কিন্তু তোমার সেই বিলাতী দমটা, প্রায় সবখানিই মজুত আছে। এক টুকরো পাঁ'রুটী দিয়ে খানিকটে খেয়ে যাও না।"

"ওটা টেপী কুকুরটাকে দিয়ে ফেল," এই বলিয়া হরকিশোর বাবু হাসিতে হাসিতে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া তাড়াতাড়ি আপিসের দিকে পলাইলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা

প্রাচীন জাপান

নারা যুগ

(৬৪৫—৭৮১ খৃঃ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

স্থপতি বিদ্যায় চীনা শিল্প ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। দেশের নানা স্থানে তিন হইতে নয় তালা, এমন কি কচিৎ তের তালা উচ্চ 'প্যাগোডা' নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ষোমু আদেশ প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইবে; এবং তাহাদের মধ্যে বুদ্ধের তিন ভাবের তিনটি কারুমূর্ত্তি ও এক একখানি 'দাইহান্ন্যাক্যো' বা 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিত সূত্র' রক্ষিত হইবে, সম্রাট্ ষোমুর আদেশে নির্ম্মিত প্রাদেশিক মন্দিরগুলির মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ মূর্ত্তি সমন্বিত তোদাইজি মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। এই সব মন্দিরগুলি সুগঠিত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

আমরা এ যুগে শিল্পের অন্যান্য বিভাগেও উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাই। বস্ত্রবুনন শিল্পে সর্ব্বপ্রথম 'আকৃতি'-বুনন হইতে দেখি। সম্রাট্ তেন্মুর রাজত্বকালে লাল 'ল্যাকার' সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অন্যান্য নানারকম 'ল্যাকারে'র কাজও এই সময়ে আরম্ভ হয়।

দেশের সর্ব্বত্রই বাজার বসিত। সাধারণতঃ কোনও একটি ছায়াশীতল স্থানে বাজারগুলি দ্বিপ্রহরে খোলা হইয়া সূর্য্যাস্তের সময় বন্ধ হইত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাজার বসিত। বাজারের সময় ঢাক বাজান হইত।

৭০৮ খৃষ্টাব্দে গেন্মেই সম্রাটের রাজত্ব সময়ে প্রথম তাম্র-মুদ্রার প্রচলন হয়। ইহার কিছুকাল পরে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু জনসাধারণ প্রথমে মুদ্রা প্রচলনের পক্ষপাতী হয় নাই; কারণ তাহারা বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়েই অভ্যস্ত ছিল। রাজসরকার মুদ্রা প্রচলন করাইবার জন্য নিয়ম করিলেন যে, অতঃপর মুদ্রায় কর দিতে হইবে; ও যাহাদের তোষাখানায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা মজুত থাকিবে তাহাদিগকে অভিজাতবর্গের সামিল করিয়া দিবেন বলিয়া লোভ দেখাইলেন। কিন্তু ইহার ফল এই হইল যে, মুদ্রার প্রচলন কমিয়া গেল, তাহা স্থানে স্থানে জমা হইতে লাগিল। তখন সরকার বাধ্য হইয়া নিয়ম রদ করিলেন ও মুদ্রা জমা করিবার বিরুদ্ধে ইস্তাহার জারি করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল। ইহা সম্রাট্ ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ধর্ম্ম ছিল। পুরোহিত ও অভিজাত বংশীয়ের এ ধর্ম্ম প্রচার করিবার সবিশেষ চেষ্টা সত্বেও প্রথম প্রথম নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এ নবধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। কথিত আছে, গ্যোকি নামে পুরোহিত র‍্যোবুষিন্তো বা বৌদ্ধধর্ম্ম ও জাপানের প্রচলিত ধর্ম্ম—এই উভয় ধর্ম্মের এক মিশ্রিত সংস্করণ প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বপ্রচলিত হরিণের শিঙের পরিবর্ত্তে কচ্ছপের খোলা পোড়াইয়া ভবিষ্যৎ বলা হইত। চীন হইতে নবাগত জনপ্রিয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য বিশেষ কার্য্যবিভাগ খোলা হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ কথন বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণী করিবার এক অভিনব প্রথা ছিল; কোনও লোকের ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া পথিকের কথা শুনা; এবং পথিকের দৈবাৎ কথিত কোনো একটা কথা ভগবানের ইচ্ছা, ও তাহা নিশ্চিতই ঘটিবে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত।

কুসংস্কার যথেষ্ট ছিল। অবিশ্বাসীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুরোহিতেরা আত্মার দেহান্তরভ্রমণ মতের সাহায্য গ্রহণ করিত। পরজন্মে কুকুর কিংবা শূকররূপে জন্মগ্রহণ অসম্ভব নয়, এ কথা অনেকের মনে ভীতিসঞ্চার করিত। পুরোহিতেরা ভয় দেখাইবার জন্য অনেক উদ্ভট কথার প্রচার করিত। যথা, কোন ব্যক্তির মৃতদেহ একব্যক্তি কবরস্থ করিয়াছিল। মৃত ব্যক্তির মাথার খুলিটা নাকি পরজন্মের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইতে

যে তাহাকে কবর দিয়াছিল তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল! কোনো এক গ্রামের মোড়ল পবিত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছিল; তজ্জন্য ভগবান তাহার মুখ বক্র করিয়া দিয়াছেন! সকল দেশের ন্যায় এদেশেও অনেক ছোট খাটো কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যথা, স্বপ্নে বঁধুদর্শনপ্রয়াসী নারী শয়নের পোষাক ভিতর-দিক উপর করিয়া পরিধান করিত; ভ্রূ চুলকান, হাঁচি, বা হঠাৎ কটিবন্ধের শিথিল হওন, প্রেমাস্পদের আগমন সূচিত করিত; পথপার্শ্বে কেহ ঘাসের আঁটি বাঁধিলে এবং সেই আঁটি কয়েক ঘণ্টা বাঁধা থাকিলে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ইহাই সূচিত হইত। শ্বেত হরিণ, শ্বেত শৃগাল, শ্বেত ইঁদুর, শ্বেত পারাবত কিংবা এক বৃন্তে যুগ্মপদ্ম শুভচিহ্নস্বরূপ রাজসভায় উপহার প্রদত্ত হইত!

চীনা বিদ্যা শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে হইত বুঝি বা এ বিদ্যা দেশজাত। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে চার শতেরও অধিক ছাত্র হইয়াছিল। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি সকল গুণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। গভর্ণমেণ্ট পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র বা পৌত্র, বিশ্বস্তা পত্নী বা সদয় পতিগণকে প্রশংসা করিতেন ও পারিতোষিক দানে সম্মানিত করিতেন।

৭১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কিন্‌মেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নারা নামক স্থানে স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেশের রাজধানীর উপযুক্ত সাজে এই স্থান সজ্জিত হইল। কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর পরে দেশের রাজধানী অন্যত্র কোথাও স্থাপিত হওয়া উচিত বোধ হওয়াতে ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সমাট্ কাম্মু কর্ত্তৃক রাজধানী নাগাওকা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইল।

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে দেশময় সংবাদ প্রেরণের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। নূতন নূতন রাস্তা ও বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছিল, ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছিল; চিঠি পত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য অশ্ব ও লোক নিযুক্ত ছিল। সকল প্রদেশের সীমান্তে রক্ষীদের আড্ডা স্থাপিত হইয়াছিল ও ছাড়পত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ফেরার আসামী ধরিবার অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া নূতন নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতেরা দেশের উন্নতির প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার ছিল। তাঁরা ডাকের ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন; ডাক বদলাইবার স্থানে রাত্রিকালে শয়ন ও বিশ্রামের উপযোগী গৃহ ছিল। দরিদ্র পথিকের কিন্তু দুর্গতির সীমা ছিল না। বুঁচকিবোঁচকা এবং ভ্রমণ সময়ের উপযোগী খাদ্য বহন করিয়া তাহাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইত। পথের মধ্যে সরাই বা বিশ্রামের স্থান ছিল না, এমন কি খাদ্য ক্রয় করিবার দোকানও ছিল না। ফলে, কারিগর দূর দেশে কার্য্য সারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথের মাঝে অন্নাভাবে মরিত, এরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। ইহার প্রতীকারার্থ ৭০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী গেন্‌মেই ও ৭২৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী গেন্‌ষো পথিকগণের পরিচর্য্যার জন্য স্থানে স্থানে বাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। সেখানে বাঁধা দরে খাদ্য ও বাসস্থান পাওয়া যাইত; পথের ধারে ধারে যে সব ধনী ব্যক্তি বাস করিত, পথিকদিগের চাউল বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইত। যারা বৎসরে এইরূপে এক শত কোকুর অধিক চাউল বিক্রয় করিত তারা রাজসরকারে সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইত। ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের প্রস্তাব ক্রমে পথিকদের সুবিধার জন্য পথপার্শ্বে ফলবৃক্ষ রোপণ করার প্রথা প্রচলিত হয়।

রাজধানীর বাটীগুলির ছাদ টালি দ্বারা আচ্ছাদিত হইত। লাল ল্যাকারের আবিষ্কার হওয়াতে মন্দিরগুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ রেশমী পোষাক পরিধান করিত। কর্ম্মচারীদের পদ অনুসারে তাদের পোষাক নিরূপিত ছিল। ৬৮১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে রমণীরা দুই পার্শ্বে পা দিয়া অশ্বে আরোহণ করিতে লাগিল। এতাবৎকাল

তারা এক ধারেই দুই পা দিয়া অশ্বে আরোহণ করিত; এরূপ ভাবে উত্তমরূপে অশ্ব পরিচালন সম্ভব হইত না।

স্ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাসের একটা বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছিল। কেবল সম্ভ্রান্ত মহিলারাই স্কন্ধদেশের উপর দিয়া মুক্ত কেশ ঝুলাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এ নিয়ম বেশী দিন টিঁকিতে পারে নাই।

সকলকে আদবকায়দা মানিয়া চলিতে হইত। এ বিষয়ে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল। সম্রাটের প্রাসাদের ফটকের সামনে দিয়া যাইবার সময় পায়ে হাঁটিয়া যাইবার যো ছিল না. শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইত। সম্রাট্ তেন্মু এই হাস্যকর প্রথা রহিত করিলেন ও হুকুম দিলেন যে, প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া একটা সেলাম করিলেই চলিবে। এই সম্রাট্ প্রাসাদের মেঝেগুলি তক্তা দিয়া আচ্ছাদিত করাইয়া লইয়াছিলেন ও চীনাদের দেখাদেখি চেয়ার ব্যবহার করিতেন। তিনি সৌখীন লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। সম্রাট্ ও দেবতাদিগকে অভিবাদন করিবার সময় হাততালি দেওয়া হইত—পূজার সময় এরূপ করা এখনো প্রচলিত আছে।

মাংসাহার বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু গোপনে অনেকে যে না খাইত এমন নয়। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কোতোকু কোরিয়া হইতে দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে কিছুকাল দুগ্ধপান করা একটা 'ফ্যাশানে'র মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কোনিনের রাজত্বকালে সম্রাটের জন্মদিন সর্ব্বপ্রথম জাতীয় পর্ব্বদিনরূপে বিবেচিত হইয়াছিল।

স্ত্রীর বাপের বাটীতে, বা শ্বশুরালয়ে স্বামী প্রত্যহ স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত; স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখিবার ইচ্ছা হইলে স্বামীকে পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করাইতে হইত। ভাবী স্বামী ভিন্ন কাহাকেও বাগ্‌দত্তা স্ত্রীলোক তার প্রকৃত নাম বলিত না, ও বালিকা নারীত্বে উপনীত হইয়া সর্ব্বপ্রথম যখন চুল বাঁধিত, তখন বাগ্‌দত্তার স্বামী চুলে গেরো বাঁধিয়া দিতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানগুলি প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল। শবাধারটি 'মোয়া' বা 'মৃতের বাটী'তে রাখা হইত। মৃতের উদ্দেশে আহার্য্য দ্রব্য ও মন্ত্র অর্পিত হইত। মৃত ব্যক্তির এক জন আত্মীয় মৃত ব্যক্তির গুণ ব্যাখ্যা করি। বক্তৃতা পাঠ করিতেন। তৎপরে ধ্বজ পতাকা ও বাদ্য সহকারে শবাধার সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত। নিকটতম আত্মীয়েরা হপ্তাখানেক সমাধি পাহারা দিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করিবার (ভারতীয়) রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথম ৭০০ খৃষ্টাব্দে দোষো নামক পুরোহিতের মৃতদেহ দাহ করা হইল, পর বৎসর সম্রাজ্ঞী জিতো এই প্রথা অনুসরণ করিয়া ইহা প্রচলিত করিয়া দিলেন। রাজকীয় কবরগৃহগুলি বেড়া দিয়া ঘেরা হইল ও মৃতের গুণব্যাখ্যাঙ্কিত সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইল। শোকচিহ্ন ধারণ করিবার প্রথাও চীন হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রচলিত ছিল। কুস্তি, বাণ নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড়, 'ফুটবল' খেলা ও "পোলো"র ন্যায় একপ্রকার খেলা ও কুকুর ও বাজপাখী লইয়া শিকার করা প্রচলিত ছিল। বাটীর অভ্যন্তরে 'সুগোরোকু' ও 'গো' নামে অনেকটা দাবা খেলার মত খেলা প্রচলিত ছিল। ফুল, পাখী ও কবিতা রচনার সখ্ প্রায় সকলেরই দেখা যাইত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদ মঙ্গল

কহ্লার কোকনদ আহ্লাদে গদ্গদ শীতল সরিত-তড়াগে,
কুঞ্জ ভবন অব অভিনব পেলব পল্লব পুষ্প-পরাগে!
তড়িত-জড়িত কত শ্বেত জলদ-রথ শৈল-শিখর পুরোভাগে
নীল সুনির্ম্মল নগ্ন গগনতল মগ্ন জ্যোছন-সোহাগে!
তরুণ অরুণ-তনু অলস জবাজনু প্রভাত-ভালে ভাল শোহে,
স্বচ্ছ নদী নদ; সিনগধ নীরদ অচ্ছোদ হ্রদে অবগাহে!
কিরণ-বিকীরণ—শষ্পে শিশিরকণ; পুষ্পে মদির-মকরন্দ;
ধন্য ধরণী ধামে; স্তব্ধ তটিনী দানে; বন্দ্য বিহগে নব ছন্দ!

উৎসবে উনমত বালক-যুন যত, উত্তর পবন সুমন্দ ;
ভ্রমর কেয়া-কোলে, কাশ-চামর দোলে, শিউলি-শীলি-
মুখে ঘন্দ !
প্রসন্ন নিশানাথ, প্রোজ্জ্বল ছায়াপথ ধরিত্রী রিক্তপঙ্ক,
নেত্র অভিরাম ক্ষেত্র নবীন শ্যাম ; মণ্ডপে মঙ্গল শঙ্খ !
শারদা ! মনোরমা ! কল্যাণী ! কমলা রমা ! শস্যসুষমা-
শ্যামা ! করুণা !
লীলা-কমল-করে, কুন্দ অলক পরে, বিশ্বজননী, ওমা
অরুণা !

শ্রীকমল চন্দ্র দে।

কাছাড়ে হিন্দু প্রভাব*

সাম্প্রদায়িক মহোৎসব

পৌষ ও চৈত্র 'বিহু' ছাড়া কাছাড়ীদের আর কোনও সাম্প্রদায়িক বিশেষ উৎসব নাই। এই উৎসবকে ঠিক জাতীয় উৎসব বলা যাইতে পারে না, এবং এই উৎসবের মূল নির্ণয় করা দুরূহ। কাছাড় প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যেও এই উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। সমগ্র বঙ্গদেশেও মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে চড়ক পূজা হইয়া থাকে। এই বিষু বা বিহু উৎসব সম্ভবতঃ অনার্য্য প্রথা—ধীরে ধীরে আর্য্য সমাজে পরিবর্ত্তিত আকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পৌষ বিষুর উৎসব পোষ সংক্রান্তিতে ও চৈত্র বিষুর উৎসব চৈত্র সংক্রান্তিতে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশেও পৌষ পর্ব্ব বিখ্যাত। পৌষ সংক্রান্তি স্থান বিশেষে পিষ্টক বা তিল্লাই সংক্রান্তি নামে অভিহিত আছে। খৃষ্টান দিগের নিকট কমলা ও 'কেকে'র মধুর স্মৃতি লইয়া যেমন 'খৃষ্টমাস', বাঙ্গালীদের নিকটও পিষ্টকের স্মৃতি লইয়া পৌষ সংক্রান্তি।

পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ বিহুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই কাছাড়ী যুবকেরা নিশানবাঁধা লম্বা লম্বা বাঁশ পুতিয়া ইহাদের চতুর্দ্দিকে বেশ উচু করিয়া খড়ের স্তূপ দিতে আরম্ভ করে। এই স্তূপের পার্শ্বে আবার খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মিত হয়। এই গুলিকে বিহুর ঘর বলে। বিহুর রাত্রে খড়ের স্তূপে ও বিহুর ঘরে আগুন লাগাইয়া যুবকেরা বিপুল আনন্দে পান ভোজন ও নৃত্য করিতে থাকে। এই উপলক্ষে প্রচুর "জু" বা মদের ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য।

পৌষ মাসে ধান পাকে, এবং সমস্ত পৌষ মাসটা এই পাকা ধান কাটিতে, মারিতে ও গোলায় তুলিতে কাছাড়ীরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, এবং এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অবসানে বিহুর আনন্দোৎসবে কর্ম্মক্লান্তির অবসর-সুখের মাধুর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করে। বিলাতের Harvest Home এর সঙ্গে এই পর্ব্বের সুন্দর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালা দেশের কোনও কোনও জেলায় বিশেষতঃ ত্রিপুরায় ও শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণাংশে "মাঘ স্নানের" একটা প্রথা আছে। বালকেরা পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নান করে এবং দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত খড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়া অগ্নি সেবা করিয়া থাকে। এটাও বোধ হয় এই অনার্য্য প্রথার একটা শেষ চিহ্ন আর্য্য সমাজের গায়ে আজিও লাগিয়া রহিয়াছে।

চৈত্র বিহুর আমোদটা বড় অসংযত। এই উপলক্ষে কাছাড়ীদের মধ্যে পান ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তির উদ্দাম প্রশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। দরাঙ্গ জেলায় এই উৎসব সপ্তাহ ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দলে কখন কখন গুরুতর হাঙ্গামাও হইয়া থাকে।

বিহুর দিন প্রাতঃকালে গৃহস্থ আপন আপন গরুগুলিকে নিকটবর্ত্তী পুকুর বা নদীতে লইয়া গিয়া স্নান করায়। স্নানের পর বিলাতি বেগুন এবং হরিদ্রামিশ্রিত 'জু' ইহাদের গায়ে ছিটাইয়া

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত কাছাড় ও কাছাড়ী প্রবন্ধের পঞ্চমাংশ ; চতুর্থাংশ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দেয়, এবং শিংগুলি তৈলাক্ত করে। পরিশেষে তৈল, ছাই ও চালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া গরুর গায়ে স্থানে স্থানে লাগাইয়া দেয়। এই অনুষ্ঠানের পরেই নৃত্য গীত ও আমোদ উৎসব আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে শিশুদের মুখে কাছাড়ী ভাষায় যে সকল সঙ্গীত শুনা যায় নিম্নে তাহারই দুই একটা মর্ম্ম দেওয়া গেল--

(১) বিহুর দিনে আজি
বৈশাখী আয় সাজি ;
ছেড়ে ঘরের কোণ
খেল্‌তে আয় বোন্।

(২) দাদা আমার সোনামণি,
এই যাই, এই এখনি।
করিও না তাড়াতাড়ি
পরছি আমি ভাল সাড়ী।
একটু দেরী কর ভাই,
মেয়ে—না সেজে যেতে নাই।

(৩) রাজার চাকর আমার কাকা—
মৌজাদারের কত টাকা!
ছয়টা মোটা শূয়র কাটি
দিবে খাওয়া পারিপাটি।

এই সকল সঙ্গীতে মিল আছে, অথচ বিশেষ অর্থ নাই এমন কয়েকটা শব্দের সমষ্টি মাত্র। উল্লিখিত সঙ্গীত তিনটিতে কোনও কাছাড়ী পরিবারের ভ্রাতা-ভগিনীর বিহুর উৎসবে যোগ দেওয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভ্রাতা বৈশাখী নাম্নী ভগিনীকে আর বিলম্ব না করিয়া বিহুর উৎসবে যোগদান করিতে অতি আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছে ; ভগিনী স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ বেশবিন্যাসের জন্য একটু সময় চাহিতেছে, এবং উভয়ে মিলিয়া কোনও ধনী আত্মীয়কে বিহু উপলক্ষে তাহার উচ্চ পদের উপযুক্ত এক ভোজের আয়োজন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

কাছাড়ী রমণীর আত্ম সম্মান

কাছাড়ী যুবতীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে সে আত্ম-সম্মান বজায় রাখিতে সুসভ্য জাতীয় রমণী হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। কোনও অস্থিরমনা প্রেমিক এক সময়ে একটি গ্রাম্য সুন্দরীর প্রেম প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে অন্য যুবতীর পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাহার পত্নী বিয়োগ হয়, এবং বিপত্নীক কাছাড়ী পুনরায় তাহার পূর্ব্বপ্রণয়িনীর প্রেম ভিক্ষা করে। আধুনিক সভ্যতাবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পার্ব্বত্য রমণী এই প্রেমার্থীকে যে তেজোগর্ব্বদৃপ্ত উত্তর দিয়াছিল তাহা শুনিলে সকলের চিত্ত এই নারীর প্রতি নীরব প্রশংসায় ভরিয়া উঠিবে।

সরে যাও দূরে আজি নির্লজ্জ বর্ব্বর,
মদন-মোহন বেশ!—কি তার আদর!
কপট, বঞ্চক!—হবে তুমি মম বর!
এত আশা! এত স্পর্দ্ধা! ঘৃণিত তস্কর!
উচ্ছিষ্ট প্রণয়পূর্ণ যাহার অন্তর
সে কাম্বিবে স্পর্শ মোর সুপবিত্র কর!

এই জাতিতে মানব প্রকৃতির এই উচ্চ নৈতিক ভাবের বিকাশটা কত বিকশিত এক বার ভাবিয়া দেখুন।

মেচ

এই কাছাড়ী জাতির অনেক সম্প্রদায়ই হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকের মতে মেচ সম্প্রদায় ভীমের ঔরষে ও হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন রাজা যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু হইতে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। তুর্ব্বসু পিতার অভিশাপে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার পুত্রগণ 'ম্লেচ্ছ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। মেচ শব্দ ম্লেচ্ছ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুমোদিত আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের নাম ম্লেচ্ছ বা মেচ হইয়াছে। মেচেরা শিবের নিকট মোরগ বলি দেয়। মেচ পুত্র বা কন্যা পিতামাতার মৃত্যুর ৭, ৯ বা ১১ দিন পরে শ্রাদ্ধ কার্য্যের ন্যায় এক প্রকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ধীমাল

ধীমাল সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখা হিন্দু শাক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহারা বৈশাখ, মাঘ

রাভা

ও কার্ত্তিক মাসে একটা পূজা করে। এই পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হয় না, বা কোনও মন্দির নাই। দেউড়িরাই পূজার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

হাজং

হাজংদিগের দুই শাখা। এক শাখা বৈষ্ণব ও অপর শাখা শাক্ত। বৈষ্ণবেরা বরাহ-মাংস ভক্ষণ বা মদ্য পান করে না। কিন্তু দুই শাখার মধ্যেই বিবাহার্থ কন্যার আদান প্রদান হয়। ইহাদেরও ব্রাহ্মণ নাই এবং ইহারা সিজ বৃক্ষকে দেবতা বলিয়া মান্য করে না।

মোরাণ

মোরাণ নামে আর একটা অতি নগণ্য সম্প্রদায় আছে। যদিও বড়া জাতির সহিত তাহারা কোনও সম্পর্ক স্বীকার করে না, তথাপি তাহারা যে বড়াজাতির অন্তর্ভুক্ত উভয়ের ভাষাগত সাদৃশ্য হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। মোরাণেরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা গো-মাংস বা বরাহ-মাংস ভক্ষণ করে না, কিংবা মদ বা ফটিক পান করে না। কিন্তু তাহারা অন্যান্য গৃহপালিত পশু ও মৎস্য আহার করে, এমন কি পতঙ্গ পর্য্যন্তও ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহারা কোনও মূর্ত্তি পূজা করে না এবং তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণও নাই। মেধী বা ভক্ত নামক এক সম্প্রদায় ধর্ম্মকার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। "সভা" বা সামাজিক সম্মিলনে মোরাণেরা মৃদঙ্গ ও করতাল বা মন্দিরা বাজাইয়া কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে চা'ল, কলা, লবণ, সুবারি প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দেয়। প্রাচীন কালে মোরাণদিগের তিনটা 'ছত্র' বা ধর্ম্ম কেন্দ্র ছিল। এক একটা সত্র বুড়া বা ডাঙ্গেরিয়া উপাধিধারী এক এক অধিপতির অধীনে চালিত হইত। আজিও এই সকল ডাঙ্গেরিয়া আসামে ধর্ম্মগুরু বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। মোরাণ পরিবার ইচ্ছামত আপন আপন ডাঙ্গেরিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। এক ডাঙ্গেরিয়ার শিষ্য অপর ডাঙ্গেরিয়ার শিষ্যের প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করে না। এমন কি, এক ডাঙ্গেরিয়ার শিষ্য না হইলে পুত্রও পিতা কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না।

নরবলি প্রথা

বহু প্রাচীন কালে চুটিয়াগণের মধ্যে নরবলি প্রথা বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বে যে 'তাম্র মন্দির' বা দেউড়ি মন্দিরের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটা প্রস্তর নির্ম্মিত যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে আহম দিগের সময়ে এই মন্দিরে নরবলি হইত। প্রথম প্রথম এ স্থলে অপরাধীর শিরশ্ছেদ হইত মাত্র, কিন্তু ক্রমশঃ এই নরবলি ধর্ম্মের একটা অঙ্গ হইয়া উঠে। বলির উপযুক্ত সুলক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ নর অনেক সময় পাওয়া যাইত না। সুতরাং আহম রাজার অধীন খেলে নামক একটা চুটিয়া উপশাখা বলির জন্য 'নর' সরবরাহ করিত, এবং এই রাজ-সেবার প্রতিদান স্বরূপ তাহারা বিনা করে 'খেয়া' পার হইত এবং 'বাজার শুল্ক' হইতে অব্যাহতি পাইত। উচ্চ জাতীয় নর না হইলে বলির উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত না, এবং সামান্য অঙ্গহীন হইলে, এমন কি কানে একটু ছিদ্র থাকিলেও নর বলির অযোগ্য হইয়া পড়িত। অথচ, ব্রাহ্মণ-বলি নিষিদ্ধ ছিল এবং হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপবিত্র বলিয়া বলির অযোগ্য বিবেচিত হইত।

বলির যোগ্য নর পাইলে কয়েক দিন 'দেউড়ি মণ্ডপে' বন্দী স্বরূপে রাখিয়া বিশেষরূপে তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। পরে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে সুন্দররূপে শোভিত করিয়া গুপ্তপথে দেউড়ি পুরোহিতেরা একটা সুগভীর কূপের পার্শ্বে তাহাকে উপস্থিত করিত। সেখানে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করা হইত। দেহটা কূপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং মুণ্ডটা কূপের পার্শ্বে স্তুপাকৃত মনুষ্য-কপালের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। কেহ কেহ বলেন আহম রাজ্য ব্রহ্মরাজের করতল গত হইলে এই নরবলি প্রথা তিরোহিত হয়। সে সময়ে দেউড়িরা তাম্রমণ্ডপের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

যায়। আবার কেহ কেহ বলেন রাজা গৌরীনাথ মিশমি-দিগের আক্রমণ হইতে দেউড়িদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মপুত্রের একটা সুবিস্তৃত চরে তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপে দেউড়িরা সদিয়ার কয়েক মাইল পূর্ব্বদিকে চুনপুরা নামক স্থান হইতে বাস উঠাইয়া চলিয়া যায়। (সমাপ্ত।)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব (২)

বুদ্ধের নীতিমূলক ধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্ব আদর্শের সঙ্গম ফলে, ভারতবর্ষের মনুষ্যমন যে নানাদিকে স্বাস্থ্য লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, 'আচার' ধর্ম্মের আদর্শ দেবতা-বাদ কিংবা পৌরাণিকতাকে নিগৃহীত করিয়া, ভারতের অন্তরাত্মা যে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং এই সূত্রে তাহার সাহিত্যের মধ্যেও যে এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা এবং মনুষ্যত্ব-আদর্শের সূত্রপাত হইয়াছিল, এই বিষয় আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। ভারতীয় সাহিত্যের এই আদর্শলাভ বিশ্বমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। খ্রীষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলেই আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের এই মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নাটকাদি নানামতে গ্রীস দেশের ধর্ম্ম এবং পূজা পৌরোহিত্যের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। গ্রীক জাতির অতুলনীয় ঋজুবুদ্ধি-বিষয়, বস্তুনিষ্ঠা এবং ভাবসংযমের আদর্শ গতিকে তাহার সাহিত্য-হৃদয় ব্যাপক ভাবে অত্যাচার করিতে না পারিলেও তাহার সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র অদৃশ্য কিংবা অদৃষ্ট দেবতার মাহাত্ম্য খ্যাপন বই নহে। ভাস্কর শিল্পের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লেকুন (Lacoon) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীকজাতির হৃদয় নিহিত সাহিত্য-প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি! উহার মনুষ্যত্ব আদর্শের প্রতিকৃতি! অতিকায় মহাসর্পের অশেষ কুণ্ডলী মধ্যে নিরাশ্রয়ভাবে বিজড়িত, এবং নির্দ্দয় নিষ্পিষ্ট ওই মহাবল মনুষ্য মূর্ত্তি সকল দিকেই গ্রীক আদর্শের অদৃষ্ট-নিয়তির দৃষ্টান্ত! মানুষ এই ভবজীবনের মধ্যে এইরূপ নিয়তি-চক্রে নিপতিত হইয়াই অসহায় ভাবে লীলা শেষ করিতেছে! গ্রীক আদর্শের দৈব-নিয়তির এবং গ্রীক ট্রেজিডির অধ্যাত্ম ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে লেকুন পরিদর্শন করুন। এই নিয়তিটাকে অকুণ্ঠিত মুখে মানিয়া চলাই গ্রীক-বীরত্বের আদর্শ! দুঃসহ দুঃখ-নিয়তির মধ্যেও গ্রীক হৃদয় নিজের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় অটল! অপরিহার্য্যকে অম্লান মুখে শিরোধার্য্য করিয়াও গ্রীক পুরুষকার নিজের আদর্শে অটুট, ঝটিকা-বায়ু-প্রহত হেলিকন পর্ব্বতের ন্যায় নিরাকুল এবং নিষ্কম্প! এই স্থলেই বিশ্বমধ্যে গ্রীক সভ্যতার গুরুতা, গৌরব এবং মাহাত্ম্য! আমরা এই বিষয়ে সময়ে বিস্তারিত ভাবে প্রসঙ্গ করিতে পারিব। সংপ্রতি এইমাত্র দেখিব যে, মনুষ্যত্বের এই মাহাত্ম্য-ঘোষণা সত্ত্বেও গ্রীক আদর্শের মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্যই সমধিক প্রবল! উহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট দেব-বাদের আদর্শ, উহা পৌরাণিকতা! সংস্কৃত সাহিত্য এই নিয়ন্ত্রণার লেশ-লক্ষণ হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া মনুষ্যত্বকে অনাবিল সুপ্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছে। কালিদাসাদির কাব্য মধ্যে যেমন কোনরূপ অজেয় দৈব-আদর্শের প্রভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ন্ত্রিত নহে, তেমন উহারা কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দেবতা-পূজা অথবা দেবতা-বাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেও উদ্গীর্ণ নহে। উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্য-হৃদয়ের আনন্দরস—মানব রস—সাহিত্য-রস! কালের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইলে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি এত অগ্রগামী হইয়া এই সাহিত্য-রসটাকে এত নিরাবিল ভাবে ধারণা

(২) এই প্রবন্ধ বাণী-পদ্মার 'সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি' প্রসঙ্গের অন্তর্গত,—লেখক।

করিতে পারে নাই। প্রকৃত সাহিত্যাদর্শের সাধন ক্ষেত্রেও এই দেশের মনুষ্যাত্মাই অগ্র-জাগরণ লাভ করিয়া গিয়াছে! বুদ্ধদেবের নির্ম্মল নীতিমূলক ধর্ম্ম আদর্শের গতিকেই ভারতের সাহিত্যরীতিমধ্যে এই অগ্র-জাগরণের মাহাত্ম্য সম্ভব হইয়াছিল! নতুবা ভারতীয় আর্য্যগণের আত্মাও দেবতাবাদী। বুদ্ধদেবের অজ্ঞিজ্ঞাসাবাদ বা অনীশ্বর উপসনার আদর্শ হইতে সাহায্য লাভ না করিলে, ভারতবর্ষের সাহিত্য-সরস্বতী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কবল হইতে কোন কালে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা পরমা প্রাপ্তি! ইহাকে হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যেই যাবতীয় ভবিষ্য উন্নতির ভিত্তি। পরম শৈব কালিদাস কুমারসম্ভব রচনা করিতে গিয়াও, উমাশিবের মনুষ্য-আচরণকেই সাহিত্যরসের ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন; শিবের পূজা-প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ভবভূতি কালপ্রিয়নাথের উৎসব বিশেষের জন্য নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও তন্মধ্যে দেবস্তুতি কিংবা পূজা-প্রচার লক্ষ্য করেন নাই। ভারতীয় কবিগণের নাটকাদি প্রায়ই বিবাহ, অভিষেক বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মোৎসবের সম্মিলিত মণ্ডলীর আনন্দবিধান উদ্দেশ্য করিয়াই বিরচিত হইয়াছিল! তথাপি উহাদের মধ্যে এই ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য মাত্রও যে আঘ্রাত হইতেছে না, কবিগণের হৃদয়মধ্যে বিনির্ম্মল সাহিত্য আদর্শ সমুদিত হইতে না পারিলে এই ঘটনা কোন মতেই সম্ভব হইত না; বরং উহারা সর্ব্বপ্রকারে ইয়োরোপের মধ্যযুগের ধর্ম্মনাট্যগুলির বা আমাদের যাত্রা প্রভৃতির সমধর্ম্মা হইয়া পড়িত।

কবি শূদ্রক ও মৃচ্ছ কটিক।

সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য চেষ্টার দৃষ্টান্ত শূদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটিক। এই গ্রন্থ নানাদিকে অপূর্ব্ব! বিশ্ব সাহিত্যের পরম গুরু এই শূদ্রক! রামায়ণ মহাভারতও স্থানে স্থানে পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া আসিয়াছে; ওই কলঙ্ক কখন কোন মতলবী মনুষ্যের দ্বারা আরোপিত তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। মৃচ্ছকটিকই ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য সরস্বতীর আদর্শ বহন করিতেছে। এই কাব্যকে কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান নাটক বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। উহাই হয় ত ঠিক। যখন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বা ঋষি সভ্যতাও ভারতের মনুষ্যমনকে প্রবল ভাবে অধিকার করিতে পারে নাই, এই নাটক হয়ত সেই দূরবর্ত্তী অতীতের প্রকোষ্ঠেই বিরচিত হইয়াছিল! অন্যেরা উহাকে বৌদ্ধপ্রভাবের সমকালবর্ত্তী এবং উহার ফলপ্রসূত বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন—অন্ততঃ খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী। যাহাহউক, এই নাটক ভারতীয় প্রাচীন কবিহৃদয়ের—মনুষ্যহৃদয়ের অতুলনীয় স্বাধীনতার বার্ত্তাই বহন করিতেছে! যখন ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিকতার আদর্শ ভারতের সাহিত্য বা সমাজকে একটা বিশেষ 'ছাঁচের' মধ্যে ফেলিতে পারে নাই, উহাই মৃচ্ছকটিক নাটকের কাল! এই নাটকের মধ্যে যেই প্রণালীতে তৎকালীয় ভারতবর্ষের একটি সুপ্রসিদ্ধ নগরের লোকরীতি, সমাজরীতি, রাজনীতি প্রভৃতির সুস্পষ্ট স্বভাব-ছবি ধরা হইয়াছে, সেই প্রণালীটাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরম আধুনিক হইতেও আধুনিক! এ কালের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে প্রাকৃতবাদ বা 'রিয়েলিজম্' (Realism) ও 'নেচরেলিজম' (Naturalism) বলিয়া যে একটা আদর্শ বহু পূজা লাভ করিতেছে, ভারতবর্ষীয় শূদ্রক কবি তাহার সর্ব্বাদিম পুরোহিত! শূদ্রক সাহিত্যে স্বভাববাদিতার আদি গুরু! মৃচ্ছকটিকের মতন এইরূপ অবিকল 'ফোটো' ভারতীয় সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই, কোন প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না জানি না। শূদ্রকের হৃদয় একটা অতুলনীয় ফোটোগ্রাফীর যন্ত্র। আবার দেখুন, কত বড় সাহসী এবং স্বাধীন প্রকৃতি এই শূদ্রক! ঋষি-ভারতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কে এত দূরবর্ত্তী কালে আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া কেবল মনুষ্যত্ব দাবীর উপরেই নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে!

শূদ্রক যাহাই হউন, এই আখ্যায় নিজকে পরিচিত করার পশ্চাতে যে একটা অপূর্ব্ব মহত্ব এবং অনম্য মেরুদণ্ডের অবলম্বন আছে, আমরা নিজের হৃদয়কে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বকার সমাজ আদর্শের মধ্যে উপনিবিষ্ট করিতে না পারিলে, তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হইবে না।

এই সূত্রে সংস্কৃত সাহিত্য আম্নায়ের নিসর্গবাদ এবং নিসর্গানন্দের যতদুর অনুবর্ত্তী হইয়াছিল, রামায়ণ মহাভারতের মহানুভব মনুষ্যত্ব অথবা লোকাতিগ উচ্ছ্বাসের যতদুর অনুগত হইয়াছিল, প্রবল 'ধর্ম্ম' লক্ষণাক্রান্ত পৌরাণিকতা অথবা ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে ততই দূরবর্ত্তী হইতেছিল! চাণক্য এবং শূদ্রক প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত সাহিত্য ধারার উহাই প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই সাহিত্যের একটা মহত্তম লক্ষণ উহার নিসর্গ প্রেম অযত্নসুলভ বস্তুবিষয়ে মনুষ্যহৃদয়ের অনাবিল সুখানুভূতি, উহাদিগকে নিজের ন্যায় প্রাণময় এবং ভাবময় জ্ঞান করিয়া কবিহৃদয়ের পরম সরল সহানুভূতি! এই লক্ষণের মূল বীজ আর্য্যসমাজের শ্রুতিবিদ্যার মধ্যেই নিহিত ছিল। উপনিষদ যুগের 'তপোবন' সাংখ্যদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতিবাদের মধ্যেও এই 'আনন্দ' জ্ঞানের বীজটাই অভিব্যক্ত। এই লক্ষণ সংস্কৃত সাহিত্যকে যাবতীয় সাহিত্য মধ্যে অতুলনীয় মহিমায় বিশিষ্ট করিয়া গিয়াছে। আর্য্য ভারতের উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে আম্নায়ের সরল শক্তি উপাসনা এবং আধুনিক শক্তি উপাসনার মধ্যেও একটা সূত্রসামঞ্জস্য বলবৎ রাখিয়াছে! সূক্তদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে যেই সরল মনুষ্যভাব প্রকটিত, মহাকাব্যগুলির মধ্যে উহাই প্রসার লাভ করিয়া 'মহাপুরুষ' আদর্শের সৃষ্টি পূর্ব্বক উহাদিগকে বিপুলবিক্রান্ত ভারতজাতির হৃদয়গাথা স্বরূপে রাখিয়া গিয়াছে! সুতরাং পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের এই মনুষ্যত্ব আদর্শও প্রাচীনতম শ্রুতির সহিত ধারাবাহিক ভাবেই সম্বন্ধ। ফল কথা, ভারতীয় সাহিত্যের মূল প্রতিষ্ঠা এই প্রাচীন শ্রুতি, এই পরম্পরাক্রান্ত আম্নায়। আর্য্যগণ সত্যযুগে যেই হৃদয় লইয়া ভূলোকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যেই হৃদয় লইয়া ভারতবক্ষে উপনিবেশ স্থাপন এবং তপোবন রচনা করিয়াছিলেন, যেই হৃদয় লইয়া জগতের অভ্যন্তরে প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই অনুপম সাহিত্য সঙ্গীতে উৎসারিত করিয়া গিয়াছে! আমরা আরও দেখিব যে, আর্য্যগণ আর একটা তত্ত্বও দর্শন করিয়াছিল। পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়টাই যে একই পরমাত্মা সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন লহরী, একই মহাত্মার প্রকট লীলা, আর্য্যগণ তাহাও অনুভব করিয়াছিল। বেদান্তের এই তত্ত্ব পরিচয় প্রাচীনতম বেদ এবং উপনিষদের মধ্যেই মিলিতেছে! কিন্তু ওই তত্ত্বের সমস্ত সূক্ষ্ম ফল সংস্কৃত সাহিত্য হয়ত সকল দিকে চয়ন করিতে পারে নাই; উহা ভবিষ্যৎ কালের জন্য হয় ত উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী বা ইয়োরোপীয় সাহিত্যের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল; হয়ত ভারতবর্ষ হইতেই বিশেষ দীক্ষা প্রাপ্ত ইংরাজী সাহিত্য!

যাহাহউক, আমরা নবযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের এই মহানুভব লক্ষণগুলির সঙ্গপরিচয় আরও কিছুক্ষণ অনুসরণ করিব। ইহা ভারতীয় মনুষ্যহৃদয়ের একটা নব জাগরণ এবং নবজীবনের যুগ। ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য ভারতবর্ষের হৃদয়গুণ সঙ্গমেই আপনা হইতে এই নব জাগরণ লাভ করিয়াছিল। ইহা সাহিত্যে মনুষ্যহৃদয়ের প্রথম রোমান্স যুগ (১)। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের আর্য্যহৃদয়সম্ভূত শিল্প সাহিত্য হইতে প্রবল উদ্দীপনা লাভ করিয়া ইয়োরোপের সাহিত্যে এবং শিল্পে চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের যে নব জীবন এবং নব জাগরণের সূচনা হইয়াছে, বুদ্ধ দেবের বলীয়ান্ 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের সঙ্গমফলে সচেতন হইয়া ভারতবর্ষের হৃদয় আপনা হইতেই উহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে।

এই জাগরণের প্রধান লক্ষণ, প্রাচীন দেব-বাদ হইতে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য এবং যাবতীয় কৃচ্ছ্র ধর্ম্মের আদর্শ হইতে মনুষ্য হৃদয়ের উদ্ধার! দেব-ভীতি হইতে উদ্ধার!

(১) উহার মূল লক্ষণ গুলি ইয়োরোপীয় সাহিত্য বিচার কালে বিস্তারিত ভাবে চিন্তা করা যাইবে।—লেখক

সাহিত্য রসের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবল মনুষ্যত্ববাদ, আনন্দবাদ, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার অনুসরণ। বুদ্ধদেব নীতি-আদর্শ খ্যাপন পূর্ব্বক মনুষ্যমনকে, তাঁহার ধর্ম্মকে, পরাক্রান্ত আচার আদর্শ হইতে দেব-ভীতি, যজ্ঞ এবং পূজাপ্রণালী হইতে উদ্ধার করিয়া পরম আশ্বাস দান করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত আচারমূলক ধর্ম্ম হইতে বুদ্ধদেবের নীতিমূলক ধর্ম্মের এই স্থলেই পার্থক্য!—মহাপার্থক্য! সমস্ত প্রাচীনতামূলক সামাজিক ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মাধিকৃত সমাজ-আদর্শ হইতে, আধুনিক সভ্যতা-আদর্শের এই স্থানেই পার্থক্য! নীতিই ধর্ম্ম, এবং নীতি অনুসরণে জীবন যাপন করিলেই যে দেবতার প্রীতি-পরিতোষ বা পরমার্থ লাভ করা যায় উহাই বুদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান আশ্বাস বলিয়া ইতিহাস উল্লেখ করিয়াছে। এইরূপ আদর্শ প্রকারান্তরে মানিয়া লওয়াইতে মনুষ্যের সভ্যতা মধ্যে অতর্কিতে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে! এখন শূদ্রক প্রভৃতি ভারতীয় কবিগণ, নিজের হৃদয়ের প্রবল শোণিতগতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আদর্শকেই বরণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মোপাসনা বা দার্শনিকতার ক্ষেত্রে শৈবই হউন, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, রামায়ত, অদ্বৈত মতাবলম্বী বা মায়াবাদী যাহাই হউন, সাহিত্যের আসরে অবতরণ মাত্র সকলেই মানুষ। আপনার হৃদয়-গতির একান্ত অনুসরণকারী, হয়ত প্রাচীন ধর্ম্ম-আদর্শের নানাদিকে বিদ্রোহী, কেবল মাত্র 'মনুষ্য'। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ দেব-পূজা, বৈরাগ্য বা বিশ্বমায়া হইতে পলায়নের আদর্শ একেবারে অন্তর্হিত। শূদ্রক হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্ডী, বিষ্ণুশর্ম্মা, কালিদাস, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, অমরু, শ্রীহর্ষ, ধাবক, মাঘ, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণভট্ট, ভট্টনারায়ণ বা জয়দেব সকলের মধ্যেই নানাদিকে এই অপরূপ মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা, এমন কি বিদ্রোহের আদর্শই লক্ষিত হইবে। বিদ্রোহ! কেন না, কোন ব্রাহ্মণ পবিত্র যজ্ঞসূত্র স্পর্শ করিয়াই শপথ করিতেছেন—"সুন্দরী তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না"। কেহ বা জীবনের সমস্ত অখণ্ড পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, সেই 'অনঘ' রূপের প্রত্যাশায় লালায়িত হইতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিয়ত যাঁহার দাসকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, ত্রিভুবন-বিজয়ী প্রেম-দেবতার, কুসুমায়ুধ দেবতার পবিত্র নামোল্লেখ পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন পুরঃসর কোন ব্রাহ্মণ কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত, প্রিয়তমার শ্রীচরণে ভাব-বিকশিত পুষ্পাঞ্জলিদানে অবহিত। মায়াবাদী এবং বৈরাগ্যবাদী সন্ন্যাসীগণের দুরবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক কোন কবিদার্শনিক অপরূপ অসূয়ার সহিত যেন তাহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"উহারা মন্মথ-রাজার রাজ্য মধ্যে 'মহাপরাধী,' 'সর্ব্বার্থসম্পৎকরী' স্ত্রীমুদ্রাকে অবহেলা করার অপরাধে, রাজা উহাদিগকে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, মাথা মুড়াইয়া নগ্নীকৃত করিয়া দেশে দেশে ভ্রমাইতেছেন!" কোন মহাত্মা অম্লানমুখে পরম সমুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া বসিয়াছেন—

যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক যপঃ ক তপঃ ক সমাধিবিধিঃ।

সংহিতাপন্থী ব্রাহ্মণ, নিবৃত্তি-আচারী ধার্ম্মিক, পরম শৈব এবং বেদান্তশিষ্যগণের এই কথা।

এই সমস্তই সামাজিক কৃচ্ছ্র ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মনুষ্য হৃদয়ের বিদ্রোহ। তন্ত্রমন্ত্র-সংহিতা বা একান্ত বৈরাগ্য বাদের বিরুদ্ধেই এই জ্ঞানকৃত বা অতর্কিত বিদ্রোহ!

কেবল ইহাই নহে। কেবল বিদ্রোহ আচরণ করিয়াই মনুষ্য-হৃদয় ক্ষান্ত হয় নাই। এই নব অধিকার সুদৃঢ় করিয়া, আপনাদের কবিধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের সমান আসনে স্থাপন করিয়া বরঞ্চ উহাকেই একটা বিশিষ্টতর ধর্ম্মরূপে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, তবে কবিগণ বিরত হইয়াছেন! ভারতবর্ষে সকল ধর্ম্ম এবং কর্ম্মজিজ্ঞাসার, সকল গ্রন্থচেষ্টার প্রাক্কালেই একটা সংকল্প, একটা প্রয়োজনজিজ্ঞাসা এবং অর্থবাদের প্রণালী স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত! প্রয়োজন-জিজ্ঞাসা, কেন না "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"। তাই ভারতের সকল দর্শন শাস্ত্রের গোড়াতেই একটা জিজ্ঞাসা আছে। ভারতীয় দার্শনিকমাত্রই প্রায় দুঃখবাদী।

সুতরাং "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা"। মনুষ্যহৃদয় ত্রিবিধ দুঃখে আহত হইয়া উহার পরিহারকল্পে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। তাই 'জিজ্ঞাসা' উঠিতে পারে, কাব্যের আবার প্রয়োজন কি? মনুষ্যের পক্ষে এই 'অতথ্যের সেবা' এবং অযথা বচন-রচনার কি দরকার? কবিগণ সাহংকারে এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর করিয়াছেন। কবিগণের হৃদয়নিহিত এই প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ করিয়াই অলংকার শাস্ত্রের আরম্ভ। "তুমি যশ চাও, অর্থ চাও, লোকব্যবহারের জ্ঞান-লাভ করিতে চাও, দুঃখ-দৈন্য অমঙ্গল বা ব্যাধি-বিপত্তির নিবারণ করিতে চাও, কবিধর্ম্ম সে সম্বন্ধেও আশ্বাস প্রদান করিতেছে! তুমি নীতি-ধর্ম্মশাস্ত্রের 'উপদেশ চাও, ভাল, কাব্য তাহাই দিবে? এবং আরও একটা বিশেষ কিছু, যাহা তোমার সুধীর অতিরিক্ত, তাহাই দিবে! উহা প্রীতি-পরিচ্ছন্ন উপদেশ—'কান্তাসম্মিত' উপদেশ! ধর্ম্ম অধিকারের পরম আনন্দ চাও? কাব্য সকল কৃচ্ছ্র সাধনার সম্পর্ক হইতে বহু দূরে, তোমার হৃদয়কে পরম 'দুঃখসম্ভিন্ন' দেশে লইয়া গিয়া, সেই 'পর-নির্ব্বৃতি' প্রদান করিবে।" উপনিষদের ঋষি বলিয়াছিলেন, "রসো বৈ সঃ"। আবার বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" কবিগণ অমনি জোটবন্দী হইয়া পরম উৎসাহে বলিয়া বসিলেন, "ওই রসের বোদ্ধা, ভোক্তা, যোক্তা ত আমরা! কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য ওই রস! আমাদের 'সাহিত্য রস' কি? উহাই ত সেই পরম রস!" এই 'রসের' চরমসীমা প্রদর্শন করিতে গিয়াই সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥

এই সকল গৌড়া-গোবিন্দের সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে? এখন দেখুন, ইহা সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ! কবিতার আত্মার নামই রস। এই রস মনুষ্যের ভাব-বৃত্তির খাদ্য। মনুষ্য-হৃদয়ের ভাববৃত্তির পরিপোষণ করিয়া এই রস-গঙ্গা মনুষ্যত্বকে বিষ্ণুপদের সঙ্গে অতর্কিতে সংযুক্ত রাখিয়াছে। [illegible] স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে বিবাহ সংঘটন করিয়াছে। কবিগণ হৃদয়-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই অনন্তপদের সহিত মনুষ্যত্বের এই 'রসানন্দ' যোগ সর্ব্বাগ্রে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলেন! ভারতীয় মনুষ্যহৃদয়ের বহুকালীয় পুরাণ-চেষ্টাও ইহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যসমাজের মধ্যে ক্রিয়া-কৌশলবাদ প্রীতিহীন যজ্ঞতন্ত্র এবং কৃচ্ছ্র-পীড়ন অত্যন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দেশের হৃদয় দেবভীতি এবং শুষ্ক জ্ঞানবৈরাগ্যের প্রবল নাগপাশে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল! এমন সময়েই কবিহৃদয়ের উৎক্রোশপক্ষী প্রভাত ডাকিয়াছে! জগতের সকল প্রাচীন ধর্ম্মের আদর্শই যে এইরূপ প্রীতিহীন ক্রিয়াকৌশল, কৃচ্ছ্র অনুষ্ঠান এবং অবিচল আচারতন্ত্রে জড়সর, তাহা আমরা দেখিতে পাইব। কবির আত্মাই উহার মধ্যে ভাগবত তন্ত্রের সুরধুনী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে। রসের আস্বাদ এক বার পাইয়াই মনুষ্য-হৃদয় আর তাহাকে কোন মতেই ভুলিতে পারে নাই।

এক দিকে প্রবল বিদ্রোহ-ভাব অন্য দিকে কবিকর্ত্তব্যের পবিত্রতা বিষয়ে পরম বিশ্বাস! উহাই নবজাগরিত কবিসংঘ এবং সাহিত্যসাধনার হৃদয়মর্ম্মকে পরিচালিত করিয়াছিল! উহাকে পরমধর্ম্মরূপে সকল ধর্ম্মের উপরিকার আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছিল! ইহা সম্পূর্ণ 'মানব' আদর্শ! সারস্বত ক্ষেত্রে এই আদর্শই পৌরাণিকতা এবং দেবভীতির কবল বা সংস্রব হইতে মনুষ্যমনকে উদ্ধার করিয়া, মানবত্বের স্বাধীন ভিত্তির উপরেই সাহিত্যকে স্থাপন করিয়াছে; ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও এই আদর্শটাই ভক্তি-পুরাণগুলির সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যমনকে পরম পদের অভিমুখে সোজাসুজি পথ দেখাইয়া গিয়াছে! মধ্যবর্ত্তিতা, সাম্প্রদায়িক অচলতা, অথবা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিবাদ মধ্য হইতে পলকে উদ্ধার সাধন করিয়া মনুষ্যকে নিজের রসতত্ত্বের মধ্যেই প্রাচীন আর্য্য-আদর্শের 'তপোবন' রচনা করিতে দীক্ষা দান করিয়াছে! 'নব রসের মানুষ-ভাবে উপগত হইবার জন্য, যেমন দেবতাকে প্রিয়, তেমন প্রিয়কে দেবতা' করিবার জন্যও পথ দেখাইয়াছে! ইহা নানাদিকে যুদ্ধ আদর্শের ফল!

দম্ভই বা কত! এই দীনহীন, এবং সংসারযুদ্ধে পদে পদে অযোগ্যতম ব্যক্তিরদ্বারাই পরাভূত কবিগুলার অহংকারই বা কত! দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বৈয়াকরণ, দিকপাল রাজা, নিজেদের হর্ত্তাকর্ত্তা প্রভু, যোগী, সন্ন্যাসী কেহই বাদ পড়ে নাই! নিবৃত্ত ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম চিত্তবৃত্তির নিরোধ, অন্য দিকে স্থূলতা জড়তা বা ইহসর্ব্বস্বতার আদর্শ কিছুই ইহাদের কটাক্ষ বিচার হইতে রক্ষা পায় নাই! "তুমি রাজা, তুমি ক্ষমতাবান; আমরা উদরান্নের জন্য তোমার সভায় আসিতে বাধ্য হই; তুমি যেমন ইচ্ছা আমাদিগকে ডাহিনে বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে বসাইতে পার! কিন্তু মনে রাখিও তাহাতে আমাদের মূল্য কমিবে না, আমরা বচনরচনা দ্বারা তোমার এই রাজ্যটা—সমস্ত পৃথিবীটা কিনিয়া ফেলিয়াছি; দুঃখ-দারিদ্র্য অপমানবিনিকার ইহাদিগকে দমাইতে পারে নাই। ইহারা কালের পটে অবিনশ্বর আলোকের অক্ষরে নিজেদের নাম লিখিয়া যাইতেছিলেন! জয়দেব গোস্বামী জীবনে কি পরিমাণ শর্করার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নিজের প্রাণ-কোষ মধ্যে গীতগোবিন্দের মধুচ্ছন্দ এবং রসের আস্বাদ লাভ করিয়া, অপরূপ উৎসাহ সহকারে চীৎকার করিয়া গিয়াছেন—

"শর্করে কর্করাসি"! কিংবদন্তী আছে, দরিদ্র ভবভূতি উত্তররামচরিতে শ্লোকবিশেষ (১) ধারণা করিয়া এমন একটা উল্লম্ফন প্রদান করিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র কুটিরের বর্গায় মাথা ঠেকাইয়া রক্তাক্ত দেহেই ভূমিসাৎ হন। এই গুজবটার মধ্যে ভাবের রাজা কবির অন্তর্ভাণ্ডার এবং উহার ঐশ্বর্য্য বিষয়ে তাঁহার নিজের একটা উন্মত্ত উল্লাসের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তাঁহার শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনার মধ্যে সে কালের একটা মহারাজের সার্টিফিকেটটুকুও যেমন দেখা যায়, হায়, তেমনি জীর্ণ কুটিরখানিও উঁকি দিতেছে!

"বিনমিত পটলাগুং দৃশ্যতে জীর্ণকুট্যাং"

কিন্তু দরিদ্রতা! দারিদ্র্যকে ত ইহারা নিজের মাহাত্ম্যের পতাকারূপেই ব্যবহার করিয়াছেন। "সরস্বতীই আমার মা, লক্ষ্মী, বিমাতা। মা-টা মুখরা, বিমাতাও চঞ্চলা, দুটীতে মিলিয়া প্রত্যহ আমার গৃহে ঝগড়া, বিমাতা রুষ্টা হইয়া বাড়ী ছাড়িয়াছেন। তুমি লক্ষ্মীমন্ত, তুমি মহারাজ, বিমাতার তালাসেই তোমার দরজায় এসেছিলাম; তোমার কথায় বুঝতে পেরেছি, তিনি এক দিন এ'বাড়ীতে ছিলেন সত্য, কিন্তু এস্থান ত্যাগ করেছেন। তুমি বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক, তুমি দার্শনিক। বড়ই অবজ্ঞ-ভাবে এবং গম্ভীরমুখে আমাদের খুঁটি-নাটি ধরিতে লাগিয়া যাও; কিন্তু তোমাদের মতন মূর্খ কে? তোমরা আদৌ জান না কাব্যের মূলতত্ত্ব কোথায়; কাব্যকে কোন দিক হইতে দৃষ্টি করিতে হয়—

পঠন্তি কতিচিদ্ধঠাৎ খ-ক-ছটেতি বাচং শঠাঃ।
ঘটঃপটেতি কতিচিৎ পটু রটন্তি নৈয়ায়িকাঃ॥
বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদপাররমাধ্বীঝুরী—
ধুরীণঃ পদরীতিভি র্ব্বর্তিতা বিনোদামহে॥"

মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় কবির যে সাহংকার উক্তি আছে, কোন টিপ্পনীকার উহার একটা বুকচেরা ব্যাখ্যার আভাস দিয়াছেন। ব্যাখ্যা যথার্থ না হউক, উহার মধ্যে অন্ততঃ এক দল সাহিত্যপ্রেমিকের একটা মনের কথা পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

এই একটা অর্থও যেন কবির অভিপ্রায় ছিল বলিয়াই মনে হয়—"যে সমস্ত লোক আমাদের ইহসংসারকে, ঐহিকতার সম্পর্ক মাত্রকেই অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের জন্য কিন্তু আমার এই কাব্য-চেষ্টা নহে—একথা গোড়া-

(১) অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈদুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

স্তেই বলিয়া রাখি। তাঁরা কি-ই-বা জানেন! তা' লইয়াই পরম সুখে দূরে থাকিতে পারেন। মনুষ্যের মধ্যে কি আমার সমধর্ম্মা ব্যক্তির অভাব হইবে—হয়ত এখনও আছে! যে হেতু, এক দিকে কাল যেমন অনন্ত, অন্ত দিকে পৃথিবীটাও তেমনি বিপুলা।" ঐহিকতার উপর মনুষ্যত্ব ভিত্তির উপরেই সাহিত্যের নিষ্ঠা; অন্যদিকে যেমন স্বাধীনতা তেমন সমধর্ম্মতা বা সহানুভূতির উপরেই উহার প্রধান প্রতিষ্ঠা!

যে রূপেই হউক, শ্লোকটির মর্ম্ম মধ্যে এই নব-জাগ্রত সাহিত্য-আত্মার প্রধান মর্ম্মটাই লুক্কায়িত দেখিতেছি। যাঁহারা সংসারের সহিত তাবৎ সম্পর্ক ছেদন করার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন—"কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ" তাঁহাদের বিরুদ্ধেও যেন একটা জবাব পাইতেছি! মনুষ্যত্ব এবং সংসার-ভিত্তির উপরেই সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত! নশ্বর, হয়ত পার্থিব বিষয়কে আলম্বন করিয়াই অবিনশ্বর স্থায়ী ভা'বর উদ্দীপন করা, অপার্থিব রস-সংযোগ সিদ্ধি করাই সাহিত্যের বিশেষত্ব! এই পরম সার্ব্বজনীন অথচ আধ্যাত্মিক পন্থাই বুঝি বাণী-পন্থা! ললিতকলামাত্রেরই কি কারে-প্রকারে উহাই উদ্দেশ্য নহে! আমরা দেখিতে পাইব, এই নব আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথোচিত অনুসরণ করার মধ্যেই সমগ্র মনুষ্য-সভ্যতার একটা বৃহৎ কর্ত্তব্য নিহিত রহিয়াছে!

যাহা হউক, ভারতভূমে এই নব সাহিত্য-পদ্ধতির জন্ম হইল। সাহিত্য গ্রন্থের এক জন কর্ত্তা চাই; কেবল ব্যাস, বাল্মীকি, খনা বা শুভঙ্করের নামকর্ত্তৃত্বে প্রচারিত হইলে সাহিত্য-পদার্থের একটা প্রধান লক্ষণই খণ্ডিত হইয়া যায়। এই কর্ত্তৃত্ব, এবং স্বয়ং কর্ত্তার একটা ব্যক্তিত্ব এবঞ্চ দায়িত্বের লক্ষণ সাহিত্যের স্বরূপ নিরূপণে অপরিহার্য্য। সাম্প্রদায়িত্ব অনুষ্ঠান এবং পূজা প্রচার উদ্দেশ্য করিয়াছিল বলিয়া পৌরাণিক রচনার মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণের বেশীকম অসদ্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। পৌরাণিক গণের সারস্বত আদর্শকে অতিক্রম করিয়া অথচ উহারই ক্রমপরিণতি স্বরূপে ভারতবর্ষে এই নব সাহিত্যের জন্ম হইল! শূদ্রক, দণ্ডী, বিষ্ণুশর্ম্মা, কালিদাস প্রভৃতি আপনাদের কর্ত্তৃত্ব এবং দায়িত্ব ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইলেন! দায়িত্ব—কথার দায়িত্ব! এক একটা কথা হয়ত অনন্ত কাল মনুষ্যসমাজের মধ্যে জীবিত থাকিয়া কোটী কোটী মনুষ্যের মনকে ভালমন্দের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিবে বলিয়াই দায়িত্ব!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

ছায়াচ্ছন্ন।

ছিন্ন ছায়া ঘনিয়ে এল
ঘুমে নয়ন আলা,
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা;

হাওয়ার ভয়ে যায় পরীরা,
ঢেউয়ের ফণায় নিবল হীরা,
জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে
শিদ্‌কুসুমের মালা!
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা।

তোলে নি আজ বৈকালী ফুল,—
ভরে নি আজ থালা,
ছায়ায় ছাওয়া রূপের রসের
ডালা;

গন্ধ তৃণের গহন শ্বাসে
শিউলি কুঁড়ি ঝিমিয়ে আসে,
তন্দ্রা-ভারে পড়ল ভেরে
আঁধারে ডাল-পালা!
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা।

শিয়রে থোও সোনার কাঠি
সন্ধ্যা-মেঘে ঢালা,
খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক্
জ্বালা ;
হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল্,—
অশথ পাতায় দেয় না সে দোল,
আঁধার শুধু কোল ভরেছে,—
হিমে শীতল—কালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ ভবে
বালা।

শুন্‌বে না সে আজ ঝিঁঝিদের
রাত্রি ব্যাপী পালা,
দেখ্‌বে না গো বনে জোনাক্-
জ্বালা ;
পর্দাখানি দাও গো টানি'
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী,
লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ
মৃত্যু'-ভুবন আলা ;—
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে
বালা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নাম-কো

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহজীবন

কাওয়াবিমা-গৃহিণী আগুনের ধারে বসিয়াছিলেন। সেই মাত্র ঘড়িতে আটটা বাজিল ; কাঁধের উপরে ঘড়ির দিকে দেখিয়া তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আটটা বাজলো! তাদের ফেরা উচিত ছিল।" হৃষ্টপুষ্ট হাতখানি বাড়াইয়া তিনি তামাকের বাক্সটি গ্রহণ করিলেন, ও খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়া স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

সহরের উপকণ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলেও রাস্তা হইতে কুরুমা যাতায়াতের শব্দ আসিতেছিল। নব বর্ষের পর কয়েক দিন ধরিয়া সন্ধ্যায় এইরূপ হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী একটি বাটী হইতে ক্রীড়ামত্ত বালকবালিকাদের আনন্দ কোলাহল বৃদ্ধার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, মাঝে মাঝে নিশার নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া হাসির তরঙ্গ উঠিতেছিল।

অসহিষ্ণু ভাবে তিনি একবার গজ্ গজ্ করিয়া বলিলেন, "এতে হাসির কি আছে ? হাঁ।" তারপর তাকেওর কথা মনে পড়িয়া গেল, "যখনি আকাশাকা যায় তখনি এই রকম—সকলেই সব কাজ ভুলে যায়, তাকে, নামি, সকলে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর পারবার জো নাই!" বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে একটু নড়িতে গেলেন, অমনি কোন্ বেতো জায়গায় আঘাত লাগাতে 'উঃ' করিয়া উঠিলেন। মুখবিকৃতি করিয়া রাগতভাবে তামাকের নলটা ঠুকিতে ঠুকিতে উচ্চকণ্ঠে ঝিকে ডাকিলেন, "মাৎসু, মাৎসু, অ মাৎসু!" ঠিক সেই সময়ে ফটকে দুইখানি কুরুমা আসিয়া দাঁড়াইল, ভৃত্য হাঁকিল, "প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।"

নববর্ষের সৌখীন পোষাক পরিয়া পরিচারিকা ত্রস্ত ভাবে বেগে ঘরে প্রবেশ করিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী কেন ডাকিয়াছেন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন, "এত দেরী কেন ?" পরিচারিকা থত মত খাইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় তাকেও আসিয়া মাতাকে শুভসন্ধ্যা জ্ঞাপন করিল। তাঁহার নিজের ও স্বামীর কোর্ত্তা পরিচারিকার হাতে দিয়া তাকেওর ঠিক পশ্চাতে নামি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে মাতাকে শুভসন্ধ্যা জানাইয়া বলিল, "বড় দেরী হয়ে গেল।"

"থাক্, তোমরা ফিরেছ তা হলে ? গেস্‌লে ত আজকে নয়।"

তাকেও কহিল, "হ্যাঁ, মা! আমাদের দেরীই হয়ে গেছে। আমরা প্রথমে গেলুম কাতোদের ওখানে। তাঁরা বল্লেন, আমাদের সঙ্গে আকাশাকা যাবেন। যেসো মশাই, মাসীমা, চিজুকোসান, নামি আর আমি পাঁচ জনে মিলে আকাশাকা গেলুম। আকাশাকার ওঁরা আমাদের দেখে ভারি খুসী। সেখানে আরো অনেকে এসেছিলেন, গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেল।" পরিচারিকার হাত হইতে এক পেয়ালা চা লইয়া পান করিয়া তাকেও আপনার মনে বলিল, "একটু যেন দেরী হয়েছে।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "আকাশাকার সকলে ভাল ত, নামি?"

"হ্যাঁ, তাঁরা সবাই ভালো আছেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। তাঁরা আসতে পারলেন না, আপনি যেন কিছু মনে না করেন এই কথা বল্‌তে বলেছেন। আপনার সুন্দর উপহারের জন্যে আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

"উপহারের কথায় মনে পড়ে গেল, নামি, কোথায় গেল ওদের—এই যে!" এই কথা বলিয়া তাকেও নামির হাত হইতে একখানি রেকাবি লইয়া মাতার সামনে রাখিলেন। কতকগুলি শীকার করা পাখী রেকাবির উপর সাজানো ছিল।

"পাখী দেখছি যে? এতগুলো"—

"হ্যাঁ মা, শ্বশুর মশাই এবারে খুব শীকার করেছেন, তিনি সবে একত্রিশে তারিখে ফিরেচেন। পাখীগুলো আজই আমাদের এখানে পাঠাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কাল একটা বুনো শুয়োর শীকার করচেন বোধ হয়।"

"বুনো শুয়োর? সত্য নাকি? নামি তোমার বাবা ত আমার চেয়ে কেবল তিন বছরের ছোট, না? ছেলে বেলা থেকেই খুব সাহস তাঁর, এখনো দেখচি কম নয়।"

"তবে শোন মা, তাঁর এত শক্তি যে, তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে তিন রাত্তির কাটিয়েছেন, কিন্তু শরীর তাঁর একটুও খারাপ হয় নি। ছেলে ছোকরার মত কষ্ট সইতে পারেন বলে তিনি গুমর করেন।"

"তা তো করবারই কথা বাপু। আমাদের মত যারা বাতে পঙ্গু তারা আর কোন্ কাজে লাগে বল। ব্যামোর মত আর মানুষের শত্তুর নেই। যাও তোমরা কাপড় ছেড়ে শোওগে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে, আজ য়্যাসুহিকো এসেছিল।"

তাকেও উঠিতে যাইতেছিল, কথাটা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইল বলিয়া বোধ হইল না। নামিও সচকিত হইয়া উঠিল।

"চিজিওয়া?"

"সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।"

ক্ষণকাল থামিয়া তাকেও কহিল, "তাই নাকি? আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে টাকা চাইতে এসেছিল না কি মা?"

"কেন? না, না। এ রকম ভাব্‌ছ কেন তুমি?"

"আমি তার বিষয়ে কিছু শুনেছি। থাক্, শীগ্‌গিরই তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

"আর, য়ামাকিও এসেছিল।"

"অ! সেই মুর্খ্‌টা নাকি?"

"দশুই তোমাকে খাবার জন্যে বলে গেছে।"

"জ্বালালে!"

"তোমার যাওয়া উচিত। সে এখনো তোমার বাবার দয়া ভুল্‌তে পারে নি।"

"কিন্তু————"

"না, তোমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। আমি শুতে চল্লুম।"

তাকেও ও নামি উভয়ে তাঁহাকে শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় হইল।

ঘরে আসিয়া নামি স্বামীর কোটটি খুলিয়া লইয়া একটি তুলাভরা রেশমী পোষাক পরাইয়া দিল। তাকেও একটি সাদা ক্রেপের কোমরবন্ধ বাঁধিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল। নামি তাহার কোটটি ঝাড়িয়া পাশের ঘরে টাঙাইয়া রাখিল, পরিচারিকাকে চা তৈয়ারি করিতে বলিয়া পতির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার আজ বড় কষ্ট হয়েছে, না?"

তাকেও চুরুট টানিতে টানিতে নববর্ষের চিঠি, কার্ড্ প্রভৃতি দেখিতেছিল, এই কথা শুনিয়া মুখ তুলিল। "তোমার কষ্ট হয়েছে, নামিসান্। আহা, কি সুন্দর!"

"কি?"

"এই তোমাকে কি সুন্দর দেখতে!"

"আর ঠাট্টায় কাজ নেই।"

পতি তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন, সে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল, চোক দুটি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক হইতে ফিরাইয়া লইল। তাহার ম্লান কপোল গোলাপী আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, মাথার গোল খোঁপা কাচের মত চক্ চক্ করিতেছে। তাহার পরণে একটি কালো রঙের রেশমী 'কিমোনো', পা দুটি বেড়িয়া কিমোনোর যে অংশটি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে সেখানে ঢেউ আর সমুদ্রচর পাখীর ছবি আঁকা। কোমরে দুধের সরের রঙের একটি প্রশস্ত কোমরবন্ধ, বুকে একটি মণিবসানো পিন্, তাকেও সেটি আমেরিকা হইতে আনিয়াছিল। আলোকের সম্মুখে লজ্জাজড়িত স্মিতহাস্যে দণ্ডায়মানা পত্নীকে দেখিয়া তাকেও মুগ্ধ হইয়া গেল।

"তোমাকে ঐ পোষাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আমার একটি নতুন স্ত্রী লাভ হয়েছে।"

"ও সব কথা বল ত চলে যাব।"

তাকেও হাসিল, "আর বল্‌বো না। কিন্তু চলে যাবে কেন?"

এইবার নামিও হাসিয়া ফেলিল, "এই কাপড় ছাড়তে যাব।"

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই তাকেও সমুদ্র যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছিল, শরতেই তাহার ফিরিবার কথা ছিল কিন্তু জাহাজের কলকব্জা খারাপ হইয়া যাওয়াতে, সেগুলি মেরামতের জন্য স্যন্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে অনেক দিন বিলম্ব হইয়া গেল। বছরের শেষাশেষি তাকেও বাড়ী ফিরিল। আজ, জানুয়ারি মাসের তেসরা সে প্রথম নামিকে সঙ্গে লইয়া কাতো ও কাতাওকাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

তাকেওর মাতা সেকেলে ধরণের স্ত্রীলোক, তিনি বিদেশী ধরণধারণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাহার পুত্র একালের ছেলে, তার রুচি একটু ভিন্ন রকমের হওয়া স্বাভাবিক, তাই তার সম্বন্ধে তিনি বেশী কড়াকড়ি করিতে পারিতেন না।

পুত্রের প্রশস্ত বৈঠকখানাটি দেশী ও বিদেশী, উভয় ধরণেই সজ্জিত। ঘরের মেঝের উপর কোমল মাদুর বিছানো, তাহার উপর একখানি সবুজ কার্পেট পাতা। একটি দেয়ালে একখানি 'লেণ্ডস্কেপ' ছবি। তাহার সামনের দেয়ালে তাকেওর পিতা মিচিতাকের একখানি ছবি বিলম্বিত। ঘরের এক কোণে একটি পুস্তকের আলমারি ও কয়েকটি শেল্ফ্। সেখানে পিতার প্রিয় একখানি তরবারি। একটা শেলফের উপর নাবিকের একটা টুপি ও একটি দূরবীণ। একটা থামের গায়ে একখানা ছোরা ঝুলিতেছে। দেয়ালের গায়ে আরো কয়েকখানা ছবি, তন্মধ্যে, সে যে যুদ্ধজাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল তার একখানি ও শিক্ষানবীশ এক দল নাবিকের একখানি ছবি। এখানি বোধ হয় সে যখন য়েদাজিমার ইস্কুলে পড়িত, তখনকার। টেবিলের উপরেও কয়েকখানি ছবি; এক খানিতে তিনটি চেহারা—তাকেওর পিতামাতা ও তাকেও নিজে— তাকেওর যখন প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স তখনকার, সে পিতার হাঁটুর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর একখানি, সেনাপতির পরিচ্ছদে তাহার শ্বশুর কাতাওকার ছবি। ঘরের মালিকটি অল্পবয়স্ক ও অসাবধান হইলেও ঘরটি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত, কোথাও কণামাত্র ধূলা নাই। টেবিলের উপর পুরাণো একটি ধাতুনির্ম্মিত ফুলদানিতে কয়েকটি 'প্লাম'গুচ্ছ সুচারুরূপে রক্ষিত। সমস্তই একটি স্নেহ কোমল হৃদয় ও এই ঘরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কার্য্যে ব্যাপৃত দুইখানি বিপুল সুন্দর হস্তের পরিচয় দিতে ছিল। সেই

হৃদয় ও হাতের মালিক ফুলদানির নিকটে একখানি রূপার ফ্রেমের মধ্য হইতে হাসিতেছে যেন সে প্রাণের মধুর সুরভিতে পরিস্নাত! ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক ঘরের চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছ, সবুজ কার্পেটের উপর আগুনের বাক্স, তাহা হইতে কয়লার আগুনের বেগুনে শিখা উঠিয়া বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস দিতেছিল।

অনেক জিনিসই আমাদিগকে আনন্দ দেয়; কিন্তু দীর্ঘ ভ্রমণের পর নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া ভ্রমণের পোষাক ছাড়িয়া একটি ঢিলেঢালা পোষাক পরিয়া আগুনের ধারে যখন বসি, এবং বসিয়া বসিয়া বাহিরে নিশীথ বাতাসের করুণ ক্রন্দন ও ভিতরে সদাজাগ্রত ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ শুনি, তখন যেমন আনন্দ পাওয়া যায় এমন আর কিছুতে নয়। এই আনন্দ আবার শতগুণ বাড়িয়া উঠে, যদি গৃহে নীরোগ মাতা ও সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা থাকেন।

আরাম কেদারায় বসিয়া ধূমপানরত তাকেও ঠিক এমনি ধারা আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মাতা যাহার কথা বলিতেছিলেন কেবল সেই চিজিওয়ার চিন্তাই তাহাকে পীড়া দিতেছিল। এইমাত্র আগন্তুকদের কার্ডের মধ্যে সে তার নাম দেখিতে পাইয়াছে। আজই সে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ লজ্জার কথা শুনিতে পাইয়াছে। গত মাসে সমর বিভাগের সদরে চিজিওয়ার নামে একখানা পোষ্টকার্ড আসে। ভ্রমক্রমে এক জন কর্ম্মচারী কার্ডখানি উঠাইয়া লইয়া পড়ে। সেইখানি এক নামজাদা সুদখোরের নিকট হইতে আসিয়াছিল; তাহাতে লাল কালিতে চিজিওয়ার দেনার পরিমাণ লেখা ছিল। তারপর মাঝে মাঝে কোন অজানিত দ্বার দিয়া সামরিক গুপ্ততত্ত্বসকল বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে কয়েক জন ব্যবসায়ীর বেশ ধনবৃদ্ধি হইতেছিল। চিজিওয়াকে নাকি ষ্টকের বাজারে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। সে স্থানে সামরিক কর্ম্মচারীর গতিবিধি কোনক্রমেই মার্জ্জনীয় নয়। এই সব নানা কারণে চিজিওয়ার উপর সকলের সন্দেহ হইয়াছে। শ্বশুর মহাশয়ের নিকট তাকেও সব শুনিয়াছে, তিনি সদরের প্রধান কর্ম্মচারীর বিশেষ বন্ধু। তিনি তাকেওকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, চিজিওয়াকে তাহার স্বভাব সংশোধন করিবার জন্য যেন সে বলে।

"পাজি কোথাকার"! নিজের মনে এই কথা বলিয়া তাকেও পুনরায় চিজিওয়ার কার্ড দেখিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে এই সব অপ্রীতিকর চিন্তা করিতে পারিল না। সে নিজে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা করিবার তা করিবে। তাহার মন পুনরায় বর্ত্তমান স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। এমন সময় নামি পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া চায়ের পেয়ালা হস্তে উপস্থিত হইল।

"চা? ধন্যবাদ।"

চেয়ার ছাড়িয়া সে আগুনের ধারে গিয়া বসিল।

"মা কি কর্‌চেন?"

"তিনি এই শুতে গেলেন।"

নামি পতির হাতে এক পেয়ালা চা দিল। তাহার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কি মাথা ধরেচে? অতটা 'সাকে' না খেলেই হত। মা পেড়াপীড়ি কর্‌তে লাগলেন!"

"না, না। আজ ভারি আমোদ করা গেছে। বাবার কথা শুনে আমার এমন ভালো লাগ্‌ছিল কতটা 'সাকে' খেলুম কিছুই হুস ছিল না।" তাকেও হাসিয়া উঠিল। "বাস্তবিক নামি তোমার বাবা বড় ভাল!" নামি ঈষৎ হাসিল, পতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর তার চেয়েও ভালো আমার—"

"কি? কি বল্‌লে?"

বিস্ময়ের ভান করিয়া তাকেও চক্ষু ঘুরাইতে লাগিল।

"জানি না" বলিয়া নামি রক্তিম মুখ নত করিল, আংটিটি লইয়া ঘুরাইতে লাগিল।

"ও বাবা! এসব কথা তুমি শিখলে কবে? এসব কথার দাম যে অনেক বেশী, পিন্‌টায় ত কুলুবে না!"

আগুনে তাতানো হাত দুখানি লাজরক্তিম কপোলে ঘষিয়া একটি ছোটখাটো নিশ্বাস ফেলিয়া নামি চিন্তা-

জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "সত্যি মা, নিশ্চয়ই অনেক দিন বড় একলা বোধ করেছেন। যখন ভাবি আবার তুমি শীগগির কাজে বেড়িয়ে যাবে তখন মনে হয় সময়টা যেন ছুটে চলেছে।"

"আবার আমি যদি সব সময় বাড়ী থাকতে আরম্ভ করি তুমি নিশ্চয়ই এক দিন অন্তর বলবে, যাও, যাও একটু বেড়িয়ে এস।"

"কি বলচ? আর কি বোলব?"

পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া ও সীগারের ছাই আগুনের বাক্সে ফেলিয়া তাকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত ঘরের চারিদিকে চাহিল।

"ছ মাসের বেশী জাহাজে সরু বেঞ্চের উপর দোলা খেয়ে এখন এ ঘরটাকে বড্ড বড় বলে বোধ হচ্ছে। এখানে যেন সবই স্বর্গের মত আরাম দিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার মধুবাসর উপভোগ কচ্ছি। তোমার কি তা মনে হয় না নামি?"

বিবাহের পরই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আজ প্রায় ছয় মাসের পর তাহাদের মিলন, এমন সুখের সময় আর কখনো আসিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। মুখে কথা নাই, অধরে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, উভয়ে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া তাহারা যেন কোন স্বপ্নের আবেগে বিভোর! প্লামের গন্ধে ঘরটি আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে, তরুণ দম্পতী আগুনের ধারে বসিয়া বসিয়া কোন সুখের স্বর্গে উধাও হইয়া গিয়াছিল। নামি মাথা তুলিল, হঠাৎ যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

"তুমি তা হলে য়্যামাকির ওখানে যাচ্ছ।"

"য়্যামাকির ওখানে? মা বলছেন যেতে; যেতেই হবে বোধ হয়।"

"আমিও যাব।"

"নিশ্চয়ই আমরা এক সঙ্গে যাব।"

"না আমি যাব না।"

"কেন যাবে না?"

"আমার ভয় করে।"

"ভয়? কিসের ভয়?"

"আমায় দেখতে পারে না, জান ত।"

"দেখতে পারে না? কে দেখতে পারে না?"

"এক জন আমায় দেখতে পারে না। বলবো? ওতোয়ো-সান।"

"পাগল! সে একটা অদ্ভুত মেয়ে, না? তাকে কে বে করবে তাই ভাবি।"

"মা বলছিলেন, য়্যামাকির সঙ্গে চিজিওয়ার খুব আলাপ। সে ত বে করতে পারে।"

"চিজিওয়া? চোর সে! আমি ভাবতুম সে বেশ বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর লোক; একবারও ভাবিনি তার ওপর কখনো সন্দেহ আসতে পারে; আজ কালকার কর্ম্মচারিদের কথা ভাবলে লজ্জা হয়, যদিও আমিও তাদের এক জন। সেই সামুরাইদের তেজের এক কড়া তাদের নেই। তারা চায় কেবল বড় লোক হতে। আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে, কর্ম্মচারীরা গরীব হয়ে থাকুক। তারা টাকা জমাক, তাদের পরিবারের যাতে কষ্ট না হয়—এতে আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই, যার ওপর দেশরক্ষার ভার রয়েছে, তার টাকা রোজকার করা অন্যায়; বিশেষতঃ বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে, বা গরীব সৈনিকের খাবার চুরি করে, কিংবা জোগানদারদের সঙ্গে জোট করে বেআইনি রকমে টাকা রোজকার। সব চেয়ে আমার রাগ হয় জুয়ো খেলায়। আমি জানি আমাদের কোনো কোনো কর্ম্মচারী এই কাজ করে। এ আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না। আজ কাল সবাই যেন ওপরওলার খোসামুদি ও তাবেদারের টাকা লুট করতে ব্যস্ত।"

সংসারানভিজ্ঞ তরুণ কর্ম্মচারী—অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ত্রুটিগুলো ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতেছিল, যেন তাদের মুখের সামনে বলিয়া যাইতেছে! তাহার প্রত্যেক কথা নামি পুলকমুগ্ধ হৃদয়ে পান করিতেছিল। তাহার এমন স্বামী! তিনি নৌবিভাগের মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ত্রুটি ও দোষের সংস্কার করুন!

"তুমি যা বলছ, তা আমার খুব সত্য বলে মনে হয়। আমি অবশ্য এসব বিষয়ে বেশী কিছু জানি না, কিন্তু বাবা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন কত লোক কত উপহার নিয়ে আসত, তারা কত রকম যে আর্জ্জি করত তা আর কি বলব। বাবা তাদের রকম সকম ভাল বাসতেন না; বলতেন, যা করবার তা তিনি করবেন, তা তারা আর্জ্জি করুক আর নাই করুক; আর যা করবার নয় তা তিনি করবেন না, তারা উপহারই দিক আর যাই দিক! কিন্তু তবু তারা কোন না কোনো ছল করে উপহার পাঠাতো। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, সবাই যে কর্ম্মচারী হতে চায় তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"ঠিক তাই। এবিষয়ে নৌবিভাগও যেমন সেনা-বিভাগও তেমনি। টাকাই সব।"

ঘড়িটা বাজিতে আরম্ভ করিল। তাকেও ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "দশটা বাজলো যে!"

নামি কহিল, "সত্যি, সময়টা কি করে গেল, বল দেখি।"

শ্রীহেমনলিনী রায়।

হায়দার আলি খাঁ বাহাদুরের দৈনিক জীবন

হায়দার আলি খাঁ বাহাদুরের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। আজ এই বীরপুরুষের দৈনিক জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

হায়দার সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তিনি গাত্রোত্থান করিলে পর সৈনিক বিভাগের যে সমস্ত নিম্নতম কর্ম্মচারী পূর্ব্বরাত্রে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে অবসর করিবেন এই উভয় পক্ষ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব বিবরণী কথনানন্তর সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্যদিগের প্রতি যে সমস্ত আদেশ হইত তাহা অবধান করিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ও অমাত্যগণও বিশেষ জরুরী কার্য্য থাকিলে নবাবের পরিচ্ছদাগারে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন। যে সমস্ত বার্ত্তাবহ রাত্রে অথবা প্রত্যূষে আসিয়াছে তাহারাও আসিয়া তদীয় চরণে স্ব স্ব সংবাদ জ্ঞাপন করিত। অনন্তর নবাব স্নানাগারে প্রবেশ করিতেন। এখানে তাঁহার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইত। তবে যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত থাকিলে অবশ্য এই স্নান কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হইত।

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় তিনি একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেন। এখানে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বিভাগানুযায়ী প্রাপ্ত পত্রাদি তিনি তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিতেন ও তৎসমুদয়ের কি প্রকার উত্তর দিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও উপদেশ দিতেন। অনন্তর তাঁহার পুত্রগণ, আত্মীয়বর্গ ও বিশেষ অনুগৃহীত ওমরাহগণ প্রবেশ করিতেন এবং নয় ঘটিকার সময় তাঁহারা প্রথানুযায়ী আহার করিতেন। এই সময় অবসর থাকিলে হায়দার বারান্দায় বাহির হইতেন এবং তাঁহার হস্তী ও অশ্বগণের সেলাম গ্রহণ করিতেন। এই সকল জন্তু এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ থাকিত। এই সময় ব্যাঘ্রগুলিও তাঁহার পরিদর্শনের জন্য তাঁহার সম্মুখে আনা হইত। হায়দার স্বহস্তে তাহাদিগকে এক একটি লাড্ডু প্রদান করিতেন, এবং তাহারা যখন থাবা দিয়া সেই গুলি তুলিয়া লইত তখন তাহাদের হাবভাব পূর্ণ সেই বিচিত্র দৃশ্য বড়ই নয়নাভিরাম হইত।

আহারের পর হায়দার দরবার গৃহে (অথবা সৈন্য-মধ্যে হইলে একটি বৃহৎ বস্ত্রাবাসে) প্রবেশ করিতেন। তিনি সাধারণতঃ একটি সুবিস্তৃত অঙ্গনে একটি সোফায় বসিতেন; তাঁহার মস্তকোপরি একটি চন্দ্রাতপ থাকিত। সম্মুখে এবং উভয় পার্শ্বে তাঁহার কতিপয় আত্মীয় উপবিষ্ট থাকিতেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তির এই দরবারে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি ছিল।

প্রয়োজন হইলেও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিলে সকলেই দরবারে প্রবেশ করিতে পারিত; অথবা তাহাদের প্রয়োজনের বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেই ঐ সকল কর্ম্মচারীর মারফৎ উত্তর পাইত। গুরুতর ব্যাপার না হইলে অথবা দরবারে প্রবেশ করিতে বাধা প্রাপ্ত না হইলে কেহই আবেদনাদি দ্বারা হায়দারকে ভ্রমণ সময়ে পথিমধ্যে বিরক্ত করিতে পারিত না।

এই দরবারে ভূপতির বামদিকে দেওয়ানের বরাবর প্রায় ৩০।৪০ জন সেক্রেটারী উপবিষ্ট থাকিয়া ক্রমাগত লিখিতেন। প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই বার্ত্তাবহগণ আসিয়া পৌঁছিত এবং তাহাদিগকে সশব্দে নবাবের পদপ্রান্তে উপস্থিত করা হইত। তাহারা সেখানে তাহাদের কাগজপত্র রাখিত। অনন্তর এক জন সেক্রেটারী নতজানু হইয়া ঐ কাগজপত্র খুলিয়া পাঠ করিতেন। তৎক্ষণাৎ হায়দার উত্তর বলিয়া দিতেন এবং পত্রখানি এক জন মন্ত্রীর কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইত। উত্তর লিখিত হইলে হায়দার ক্রমান্বয়ে তৎসমুদয় স্বাক্ষর করিতেন। এই সঙ্গে গোপনীয় আদেশগুলিও স্বাক্ষর করা হইত। মন্ত্রীদের কার্য্যালয় হইতে যে সকল হুকুম জারী হইত তাহাতে কোনও স্বাক্ষর থাকিত না,কেবল একটি বড় মোহর অঙ্কিত করা থাকিত, ও পত্রগুলি মন্ত্রীদের নিজ নিজ মোহর দিয়া বন্ধ করা হইত। হায়দারের নিজ স্বাক্ষরিত পত্রাদি মুড়িয়া তাঁহার নিজের মোহর দিয়া পাঠান হইত। এই মোহর প্রধান সেক্রেটারীর জিম্মায় থাকিত। যখন নবাব কোনও জরুরী হুকুম দিতেন অথবা কোনও বিশেষ বিষয় লিখিতেন তখন তিনি তাঁহার অঙ্গুরীস্থিত মোহরের ছাপ দিয়া স্বয়ং এক জন বার্ত্তাবহের নিকট কাগজগুলি প্রদান করিতেন। এই কাগজের পুলিন্দার সহিত সংলগ্ন এক টুক্‌রা কাগজে উহা প্রেরণ করার সময় লিখিত হইত এবং প্রতি ডাকঘরে উহা পৌঁছিবার সময় লিখা হইত।

যদি হায়দার অশ্ব বা হস্তী ক্রয় করিতেন অথবা যদি কোনও নূতন তোপ নির্ম্মিত হইত বা কোনও বন্দর কিম্বা অস্ত্রাগার হইতে আনীত হইত তবে তিনি এই দরবারে তৎসমুদয় পরিদর্শন করিতেন।

অমাত্যবর্গ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, রাজদূতগণ এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অথবা নবাব বাহাদুরের অনুজ্ঞাভিন্ন কদাচিৎ এই দরবারে উপস্থিত হইতেন। অপরাহ্নে যখন বড়লোক ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিত না তখন দরবারে উপস্থিত হইয়া নবাবের সহিত আনন্দ উপভোগ করাই যেন তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদার একটু বিশেষত্ব ছিল। সকল সময় এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হইতেন না। তখন ইঁহাদের পক্ষ হইতে উকিল নিযুক্ত হইত। এই সমস্ত উকিল সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, এবং নিযুক্ত হইলে ইঁহারা সসম্মানে দরবারে প্রবেশ লাভ করিতেন। মন্ত্রীদের পরিবর্ত্তে সময় সময় তাঁহাদের বিভাগীয় সেক্রেটারী প্রেরিত হইত। তাঁহারা অন্যান্য সেক্রেটারীর ন্যায় দস্তুর অনুযায়ী উপবেশন করতঃ স্ব স্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেন। কোনও বিশিষ্ট রাজদূত অথবা কোনও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রধান অভ্যর্থনাকারী "রাজন্, অমুক স্থানের অধীশ্বর আপনাকে অভিবাদন করিতেছেন" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে রাজসমীপে উপস্থিত করিতেন। কিন্তু মন্ত্রী, সেক্রেটারী, উকিল,অথবা অন্যান্যবিষয়ী ব্যক্তিগণের আগমন ঐরূপে বিঘোষিত হইত না। তাঁহারা বিশেষ কোনও প্রকার দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াই দরবারে আসা-যাওয়া করিতেন। তবে তাঁহারা প্রতিবারেই নবাব বাহাদুরকে অভিবাদন করিতে ভুলিতেন না। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞাপিত হইলে নবাব তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেন। নবাবের সহিত সমাসীন বন্ধুবর্গ এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণও তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন, এবং নবাগত ভদ্রলোকের নবাব বাহাদুরের সহিত যতদূর ঘনিষ্ঠতা তদনুযায়ী তাঁহাকে নবাবের সমীপস্থ হইবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেন। কোনও সাধারণ পদস্থ ব্যক্তি

সাক্ষাৎকারের প্রার্থী হইলে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে ভূমি পর্য্যন্ত হস্ত নত করিয়া তৎপরে মস্তক স্পর্শ করতঃ তিন বার কুর্নিশ করিয়া প্রধান অভ্যর্থনাকারীর এক ধারে করজোড়ে নির্ব্বাক হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। নবাব হস্তদ্বারা স্বীয় উষ্ণীষ স্পর্শ করিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সহিত সমাসীন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপে ব্যাপৃত থাকিবার ভান করিতেন। অনন্তর তিনি আগন্তুককে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেন এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষক সুমিষ্ট বচনে তাহার বক্তব্য কি তাহা বলিতে আদেশ করিতেন।

প্রার্থীর প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইলে তিনি তাহাকে তাহার প্রশ্নের পূর্ণ ও পরম্পর উত্তর দান করিতেন। প্রার্থী, সাধু উপজীবিকাবলম্বী ব্যবসায়ী অথবা সওদাগর হইলে তাঁহাকে বসিতে বলা হইত এবং তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে সেক্রেটারীদের দিকে সম্মুখ দিয়া উপবেশন করিতেন। তাঁহার জীবিকা, দেশ এবং সমুদ্র-যাত্রাদি বিষয়ে নবাব তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার বাণিজ্য দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিবার জন্য এক সময়টি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। তৎপরে আগন্তুককে পান দেওয়া হইত এবং তদ্দ্বারা বুঝাইত যে তাঁহাকে দরবার পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হইল। দরবার ত্যাগ কালেও প্রবেশ কালের দস্তর মত কার্য্য হইত।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় এই দরবার ভাঙ্গিত এবং নবাব নিজ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ নিদ্রা যাইতেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি দরবার গৃহ অথবা অন্য কোনও প্রশস্ত গৃহের বারান্দায় আগমন করিয়া নিজ সৈন্য দলের কুচ্ দর্শন করিতেন। এই সময়েও প্রাতের ন্যায় তাঁহার উভয় পার্শ্বে তাঁহার বন্ধু ও স্বগণগণ অবস্থান করিতেন এবং সেক্রেটারীগণ পত্র পাঠ ও লিখনে ব্যস্ত থাকিতেন।

প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় দিবা অবসান হইলে বহু-সংখ্যক মশালচী প্রাসাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠগুলিতে যাইবার সময় নবাব বাহাদুরকে অভিবাদন করিয়া যাইত। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা প্রকোষ্ঠ গুলি (বিশেষতঃ যেইটিতে নবাব থাকিতেন সেইটি) আলোকিত করিত। প্রকোষ্ঠগুলিতে এই নিমিত্ত অতি বিচিত্র পত্রপুষ্পের কারুকার্য্যে শোভিত ঝাড় লম্বিত ছিল এবং বাত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংলিশ কাচের আবরণ ব্যবহৃত হইত। প্রাসাদের স্থানে স্থানে নানা কারুকার্য্য খচিত বড় বড় লণ্ঠনও ছিল। ওমরাহ, মন্ত্রী এবং রাজদূতগণ রাত্রে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহারা নানাবিধ বহু মূল্য বস্ত্র ও দিব্য সুগন্ধ ব্যবহার করিতেন। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এবং কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত অনেক অল্পবয়স্ক আমীরগণে প্রকোষ্ঠ-গুলি পরিপূর্ণ হইত এবং সকলেই উপযুক্তরূপ আদব কায়দা রক্ষা করিয়া চলিতেন। নবাবকে অভিবাদন করিয়া তদীয় পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে তাঁহারা সরলভাবে অভিবাদন করিতেন। অল্পবয়স্ক আমীরগণের মধ্যে কতি-পয় সংখ্যকের পদবী আরবস্‌বেকী; প্রত্যহ সাধারণতঃ তাঁহাদের চারি জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। ইঁহাদের বিশেষত্ব এই ছিল যে,ইঁহারা প্রায় ভ্রমণ-যষ্টির ন্যায় কোষ-নিবদ্ধ তরবারি হস্তে রাখিতেন। অন্যান্য সকলে তাঁহাদের বালক ভৃত্য ও অন্যান্য ভৃত্যের নিকট স্ব স্ব অস্ত্রাদি রাখিয়া প্রবেশ করিতেন। এই সকল ভৃত্যাদিতে প্রাসাদের স্তম্ভাকীর্ণ বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ থাকিত। কেবল বালক ভৃত্যদিগেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তাহাদের প্রভুগণ যতক্ষণ না প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া পাদুকা ত্যাগ করিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহাদের পরিচ্ছদের লম্বমান পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। পাদুকা উন্মোচিত হইলে সেইগুলি একটি ব্যাগের ভিতর পুরিয়া বাহিরে গিয়া বারান্দায় অপেক্ষা করিত। নবাবের প্রকোষ্ঠসমুদয় উৎকৃষ্ট পারস্যদেশীয় গালিচার উপরে আস্তৃত শুভ্র মসলিনে আবৃত থাকিত। নবাব শুভ্রবর্ণ এত ভালবাসিতেন যে, মল্‌মলে ঢাকা কাজ করা চেয়ার, সোফা এবং এমন কি দেওয়াল-সংলগ্ন রং করা, বার্ণিশ করা ও সোনালী কাজ করা

কাষ্ঠগুলি পর্য্যন্ত শ্বেত বর্ণের মস্‌লিনে আবৃত করিতেন।

প্রায় প্রতি রাত্রেই একটি মিলনাত্মক নাটক অভিনীত হইত। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় হইতে ইহা আরম্ভ হইত এবং একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিত, ইহা নাচ ও গানমিশ্রিত ছিল। এই সময় আরব্‌স্‌বেকীগণ আগন্তুক ভদ্রলোক দিগের নিকট বসিয়া তাঁহারা যাহা জানিতে চাহিতেন ভদ্রতার সহিত তাহা তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিতেন। আগন্তুক পানাহার করিতে ইচ্ছা করেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইঁহারা ভুলিতেন না। তাঁহারা আহার করিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে সরবৎ ও অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হইত; কিন্তু প্রায়ই তাঁহারা আহারে স্বীকৃত হইতেন না। নবাব প্রায়ই নাচ গানে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শে ব্যাপৃত থাকিতেন; মধ্যে মধ্যে গুপ্ত মন্ত্রণাদির জন্য তাঁহাকে কক্ষান্তরে যাইতে হইত। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় গীতবাদ্য শেষ হইত এবং সকলে শয়ন করিতেন।

মহাবীর হায়দারের দৈনিক জীবনযাত্রা সাধারণতঃ এইরূপে নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সৈন্য মধ্যে ও যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত থাকিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত সন্দেহ নাই।

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

ঘুঘু পাখী *

(১)

নিঝুম মধ্যাহ্নে যবে নিখিল অবনী
নীরব নিশ্চল,
জালি' রাখে চারি ধারে দীপ্ত দিনমণি
সুতীব্র অনল,
মহাযোগে সমাহিত বিশ্ব-আত্মাখানি
করে কার ধ্যান,—
এমন সময়ে নিত্য ভেদি' অরণ্যাণী
জাগে কিবা গান!
একি অনাহত ধ্বনি! পবিত্র ওঙ্কার!
স্বতোত্থিত সুর!—
অনন্তের কূল হতে দিগন্তের পার
আসে সুমধুর!

(২)

চিনেছি চিনেছি তাহে—পেয়েছি সন্ধান—
এযে ঘুঘু গায়,—
কোথা বন-অন্তরালে খুলে দিল প্রাণ
সুস্নিগ্ধ ছায়ায়!
উদাস করুণ কণ্ঠে করিছে হৃদয়
উদাস আকুল,
মনে হয় এ জগতে কিছু ধ্রুব নয়
সব কিছু ভুল!
কত-শোভা-হাসি-গান উঠিছে উথলি'
সকলি বৃথায়,—
কোথা যেন যেতে হবে—ডাকিছে কেবলি
কে যেন আমায়!

(৩)

আমারি বক্ষের প্রেম—মর্ম্মের সঙ্গীত—
প্রাণের সাধনা,—
বিহঙ্গম রূপে আজি এসেছে নিশ্চিত
পেয়েছে চেতনা!
ক্ষুদ্র পাখী কোথা পাবে অত ভালবাসা
অমন রাগিণী,—
কেমনে জাগাবে চিতে ব্যাকুল পিপাসা
প্রয়াণ-কাহিনী!
প্রচ্ছন্ন কানন-কোলে মিলন-মন্দির
বিরচিয়া আজ,

---

* এই কবিতাটির ছন্দে ঘুঘু পাখীর ধ্বনি তরঙ্গের অনুসরণ করা হইয়াছে।

আমারি সর্ব্বস্ব বুঝি পুলকে গভীর
করিছে বিরাজ!
(৪)
হৃদি-পিঞ্জরের পাখি! মধ্যাহ্নের সাথি!
অনাদির গান!
বনদেবী তোর তরে শ্যামাঞ্চল পাতি'
আদরে মহান্
পত্রের মর্ম্মর তানে—মৃদুল পবনে—
কম্পিত ছায়ায়—
তোরে বুঝি বরি লয় প্রেয়সীর সনে
নিভৃত হিয়ায়!
মুগধ প্রণয়ী তুই—প্রণয়িনী তোর
চির-গরবিনী —
ভুলিলি—ভুলালি ধরা প্রেমে রহি ভোর
দিবস যামিনী!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

হল্‌দে পাখী *

হল্‌দে পাখী প্রায় পাপিয়ার সমান বড় হয়। ইহা-দিগকে হল্‌দে পাখী, কুটুম্ পক্ষী (কুটুম্ব), ইষ্টি কুটুম পক্ষী প্রভৃতি বলা হয়। ইহারা সাধারণতঃ "ইষ্টি-কুটুম" বলিয়া ডাকে, ইহাই লোকের ধারণা। পল্লীগ্রামে এখনও প্রাচীনাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যদি ইষ্টিকুটুম-পক্ষী "ইষ্টিকুটুম" বলিয়া গৃহের উপর দিয়া যাতায়াত করে, তবে সেই দিন বাড়ীতে কুটুম্বের আগমন অবশ্যম্ভাবী, অন্ততঃ পর দিন কুটুম্ব আসিবেই। এই সংস্কারের মূলের সত্যতা পরীক্ষা করি নাই; কিন্তু ছেলেবেলায় ইষ্টি কুটুমকে ঘরের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিলে কাহারও আগমনের দৃঢ় প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেহ আসিত কি না সে কথা ঠিক মনে পড়ে না। সে সংস্কার অনেক দিন ছুটিয়া গিয়াছে।

হল্‌দে পাখীর মাথা ও গলার কতকাংশ পর্য্যন্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সমুদয় শরীর উজ্জ্বল পীতবর্ণ। তেমন গাঢ় এবং চাক্‌চিক্যময় পীতবর্ণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। উভয় ডানা-তেই দুই তিনটি গাঢ় পালখ্ আছে। হল্‌দে পাখী পাখা গুটাইয়া বসিলে ঐ উভয় পার্শ্বের কাল পালখ দুটিতে তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। ইহাদের লেজের মধ্যেও কাল পালখ্ আছে। বসিয়া থাকার কালে ঐ কাল পালখ্ ঈষন্মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়; কিন্তু যখন উড়িয়া যায় তখন লেজ কতকটা বিস্তৃত হয়, সেই সময় লেজের দুই পার্শ্বে এক এক ইঞ্চি আন্দাজ হল্‌দে, তার পর দুই পার্শ্বে দুইটি গাঢ় কৃষ্ণ রেখা (এক ইঞ্চির কম) ও মধ্য স্থান হল্‌দে দেখা যায়। হল্‌দে পাখীর ঠোঁটের রং চুণ-হলুদে মিশান রঙ্গের মত, অগ্রভাগ একটু হল্‌দে। ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। চক্ষু উজ্জ্বল কাল এবং চারিদিকের বেষ্টনী ঈষৎ পীতাভ, পা জানু পর্য্যন্ত পীত পালখে আবৃত, অবশিষ্টাংশ পীতাভ। পায়ের অঙ্গুলি, নখ প্রভৃতি অন্যান্য পক্ষীরই মত।

হল্‌দে পাখীর ডানা খুব মজবুত নহে. এজন্য ইহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে না। পূর্ব্ব কথিত অন্যান্য পাখীর তুলনায় ইহারা একটু দুর্ব্বল। হল্‌দে পাখী বাড়ীর আশে পাশে গাছের ডালে বসে বটে, কিন্তু ঘরের চালে বা মাটিতে কদাচিৎ বসিয়া থাকে। ইহারা রৌদ্রের ভয়ে গাছের ছায়ায় অবস্থান করে। রৌদ্রে উড়িয়া যাইতে ইহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহা-দিগকে ফল খাইতে দেখা যায় না। বড় বড় গাছে যে সকল কীট পতঙ্গ পায় তাহা ভক্ষণ করিয়াই ইহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহারা এক স্থানে অনেকক্ষণ সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকে না; কয়েক মিনিট পরই অন্যত্র উড়িয়া যায়। সকালে এবং বিকালে ইহাদের "ইষ্টিকুটুম" ধ্বনি শোনা যায়, মধ্যাহ্নে ইহারা খুব কমই ডাকিয়া থাকে।

এই পাখীর উপর ডোম চিল ও বাজের দৃষ্টি তত

* "গায়ক পাখীর" অন্তর্গত।

সুপ্রসন্ন নহে। সময় সময় ইহারা চিল ও বাজের জঠরানল নির্ব্বাণে ব্যবহৃত হয় এই জন্যই হলদে পাখী ময়দানে ঘুড়িয়া বেড়াইতে বেশী অগ্রসর হয় না। দুঃখের বিষয় নানা কারণে আমাদের দেশে এই সৌন্দর্য্যের আধার বিহঙ্গটির বংশ হ্রাস পাইতেছে। এখন আর আগেকার মত বেশী হলদে পাখী দেখিতে পাওয়া যায় না।

হলদে পাখী অনেক সময়ই একাকী বিচরণ করে। কখন কখন ক্রৌঞ্চ মিথুনের মত এক জোড়া হলদে পাখী "ইষ্টিকুটুম"কে ডাকিয়া উড়িয়া বেড়ায়! অন্য কোনও পাখীর সংস্রবে যাইতে ইহাদেরে কিছুমাত্রও অগ্রসর দেখা যায় না। এমন কি ইহারা যে গাছে বসিয়া থাকে, সেই গাছে অন্য জাতীয় দুই একটি পাখী বসিয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেই নিরীহ ভাল মানুষের মত ইহারা "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। হলদে পাখী ঘাস, লোম, প্রভৃতিদ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করে এবং জঙ্গলের মধ্যে উচ্চস্থানে ঘন পাতার অন্তরালে সেই বাসা ঝুলাইয়া দেয়; বিশেষ চেষ্টা না করিলে হলদে পাখীর বাসা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। বাসার এক ধারে মুখ থাকে। সেই পথ দিয়া এক একটি পাখী ভিতরে যাইয়া ডিমে তা দেয়। শাবক উড়িয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলে ইহারা বাসার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে।

হলদে পাখী মাঘ মাসের শেষভাগে গর্ভ ধারণ করিয়া ফাল্গুনের শেষভাগে তিন চারিটি ডিম্ব প্রসব করে। ডিমগুলি প্রায় একইঞ্চি বড় হয়। ডিমে ঈষৎ লম্বা—হাঁসের ডিমের আকৃতি বিশিষ্ট, রঙ্ ফিকে সাদা এবং তাহাতে স্থানে স্থানে কাল দাগ আছে।

হলদে পাখীর শাবকগুলি প্রথমে পাঁতিহাঁসের শাবকের মত থাকে, ক্রমে বড় হয় এবং ইহাদের জাতীয় বর্ণ লাভ করিতে থাকে। পাঁচ ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত ইহাদের শাবকগুলির পালখ্ ফিকে হলদে রঙ্গের থাকে। শরৎকাল আসিলে বর্ণ গাঢ় হয় এবং বসন্তকালে ইহারা সম্পূর্ণ রূপে আপনার জাতীয় বর্ণ প্রাপ্ত হয়। শরৎ কালের পরও একটু নিবিষ্টভাবে দেখিলে শাবকগুলি চিনিয়া লওয়া নিতান্ত দুষ্কর হয় না। শীতকালে ইহারা বাহিরে আসিতে ইচ্ছুক হয় না। নিবিড় জঙ্গলেই অনেক সময় অবস্থান করে!

হলদে পাখীর সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর কাহিনী আমরা ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি। এখনও সেকেলে ধরণের স্ত্রীলোকদিগের মুখে এই কাহিনীটি শোনা যায়।

সে ছিল এক গৃহস্থের ঘরের বৌ। এক দিন বাড়ীতে জামাই আসিল, শাশুড়ী বৌকে রাঁধিতে ফরমাইস করিলেন; বৌ রাঁধিতে গেল। আদরের বৌ সে, কোনও দিন রান্না ঘরে যায় নাই, আজ নূতন গিয়াছে। বেচারী খালি কতকগুলি হলুদবাটা জল দিয়া এক হাঁড়ি ঝোল রাঁধিয়াছে! শাশুড়ী আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! বৌ এর উপর পুষ্প বৃষ্টি হইল। অবশেষে শাশুড়ী রাগ করিয়া খোদ কর্ত্তার নিকট নালিশ করিতে গেলেন। বৌ দেখিল লজ্জার আর কূল কিনারা নাই। তখন সেই হলুদ জলের হাঁড়িটা মাথায় ভাঙ্গিয়া দিয়া বৌ পাখী হইয়া লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। হাঁড়ি মাথায় ভাঙ্গিয়া ছিল, তাই মাথা কাল আর হলুদের জল গায় পড়িয়াছিল তাই সর্ব্বাঙ্গ হলুদময়। পাড়াগাঁয়ের বৌ ঝিরা স্নান করিয়া মুখে পান দিয়া তবে রন্ধন শালায় যায়*। তাই হলদে পাখীর মুখ রাঙ্গা।

আর ইষ্টি কুটুম্ব আসিয়াছিল বলিয়া তাহার এই দুর্দ্দশা হইল বলিয়া সে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া গান করে "ইষ্টি কুটুম"। ইষ্টিকুটুম 'আসিতে দেখিলেই—সে ঘরের চালের উপর দিয়া উড়িয়া যায় এবং "ইষ্টিকুটুম ইষ্টিকুটুম" বলিয়া বাড়ীর বৌ দিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। জানি না বধূগণ এজন্য হলদে পাখীর নিকট কৃতজ্ঞ কি না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* স্নান করিয়া যে বা নারী মুখে দেয় গো পান, লক্ষ্মী বোলেন্ সেই নারী আমারি সমান॥—লক্ষ্মীর ছটা বা ছড়া

গ্রন্থ সমালোচনা

২৪। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৩১ পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র, প্রাচ্য দেশের দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তথাপি তিনি মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত। ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে "শিক্ষা বিজ্ঞান" নামক এক বিরাট খণ্ডশঃ প্রকাশ্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গভাষার প্রত্যেক সুহৃদকেই যে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থ সে ঋণপাশকে আরও দৃঢ় করিয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান কর্ণধার সুধী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইতিহাসের গ্রন্থ অনেক মুখস্থ করিয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাস বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই। * * * * * বাঙ্গালা সাহিত্যের এই কক্ষটা একেবারে শূন্য। খানকতক পাঠশালার পাঠ্য ইতিহাস আছে, না থাকিলেও চলিত। * * * * * * স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা দেখি না। * * * * * এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এজন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ঘরটি পূরণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, কেবল সেই জন্যই আমাদের তাঁহার কাছে ঋণী হওয়া কর্ত্তব্য। বোধ হয় ইতিহাসের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইতিপূর্ব্বে খুব কম লোকেই করিয়াছেন; এবং এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে সর্ব্বত্র আমাদের মতের ঐক্য না থাকিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ও বিশ্লেষণক্ষমতা ও গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তিনি যে সকল ঐতিহাসিক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন—সেই গুলিই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভরসা করি পুস্তকাকারে ইহা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছাড়া আরও বহুতর পাঠকের হৃদয়ে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার জন্য স্পৃহা, উদ্যম ও অধ্যবসায় সঞ্চারিত করিবে।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ পরিষ্কার। চক্রবর্ত্তী বানার্জ্জি এণ্ড কোং (কলেজ স্কোয়ার) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। আমাদের মনে হয় মূল্য আরও সুলভ হইলে এরূপ সদ্‌গ্রন্থের আরও বহুল প্রচারের সুবিধা হইত।

বর্ত্তমান যুগের উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থনিবদ্ধ তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করিয়া গ্রন্থকার সমালোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীঅঃ—

২৫। ডালি,—শ্রীযুক্ত সৈয়দ এমদাদ আলী কর্ত্তৃক রচিত, ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আকার, ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ১০২ পৃষ্ঠা, মনোরম সিল্কের বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রঞ্জ কালীর ছাপা, মূল্য ১৲ এক টাকা। মূল্য একটু বেশী বলিয়া বোধ হইল।

আলোচ্য গ্রন্থ ৩২টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি তন্মধ্যে কয়েকটি মাসিক পত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবীন নহেন, সুতরাং তাঁহার নাম সাহিত্যিকের অনেকেই অবগত আছেন। টেনিসন প্রভৃতি অমর কবিগণের কয়েকটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ আছে,—মৌলিক কবিতা হইতে এগুলি নিকৃষ্ট হয় নাই। 'সেকেন্দ্রা' কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে। গ্রন্থখানি 'কবির মন' প্রভৃতি কয়েকটি হাফটোন ছবিতে শোভিত, তন্মধ্যে 'কবির মন' তিন রঙ্গে রঞ্জিত।

শান্তিময়।



পরলোকগত হরিনাথ দে।

(শ্মশানে)

E. B. P. & Publishing House, Dacca.



প্রতিভা

২য় বর্ষ কার্ত্তিক ১৩১৯ ৭ম সংখ্যা

দুগ্ধ ও বীজাণু *

আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল বিভিন্নজাতীয় অসংখ্য বীজাণুতে পরিপূর্ণ। মরুভূমির বালুকণার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বায়ুস্থিত বীজাণু-সমূহের সংখ্যা নির্দ্ধারণ অসম্ভব। এই বীজাণু-সমূহ নগ্নচক্ষে অদৃশ্য, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ইহাদের অবস্থিতি অনুভব করা যায়। প্রত্যেক প্রকার বীজাণুর নিজস্ব বিশেষ কার্য্য আছে। এক প্রকার বীজাণুর কার্য্য অন্য কোন বীজাণু বা বস্তু দ্বারা, বা বীক্ষণাগারে রসায়নবিদের কোন যন্ত্রসাহায্যে তত সহজে, এবং অনেক স্থলে একেবারেই, সম্পাদিত হইতে পারে না। হস্ত পদ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিহীন, এমন কি অনেকস্থলে অদেহবদ্ধ (unorganised) এই বীজাণুসমূহ কত প্রকারে আমাদের কাযে আসিতেছে, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। বিভিন্ন প্রকার বীজাণুসমূহ স্থান এবং অবস্থাভেদে কি প্রকারে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা অনেক স্থলে বিশদভাবে কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই।

অনেক সময় বীজাণুসমূহের শরীর হইতে এক প্রকার জলীয় রস নির্গত হয় এবং উক্ত রস দ্বারাই তাহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। অত্যধিক শৈত্যে বা উষ্ণতায় প্রথমতঃ বীজাণু-সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতা ক্রমে লোপ হইতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তাহাদের বংশই সম্পূর্ণ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বীজাণু-সমূহের একটী বিশেষত্ব এই যে উপযুক্ত স্থান বা বস্তু পাইলে তাহাদিগের সংখ্যা এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বিষয়ে দুগ্ধ অতুলনীয়; কারণ বীজাণু-সমূহের বংশ দুগ্ধমধ্যে যেরূপে সহজে ও দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সেইরূপ পারে না। বার্গথেল (Bergtheil) কোন বিবাক্ত দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ১ ঘন সেণ্টিমিটার (1 cubic centimetre) বা ২০ ফোঁটা দুগ্ধে ১,৫০,০০০০০০০, এক শত পঞ্চাশ

দুগ্ধে বীজাণুর বংশবৃদ্ধি

* গত বৎসরের ফাল্গুন মাসের "প্রতিভায়" প্রকাশিত "দুগ্ধের বিশুদ্ধতা" শীর্ষক প্রবন্ধ সহ পাঠ করিলে ভাল বুঝা যাইবে —লেখক

কোটি বীজাণু পাইয়াছেন। দুগ্ধে বীজাণু-সমূহের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উক্ত দৃষ্টান্তটী হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। যে সমস্ত বীজাণু দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—

(১) দুগ্ধ বিয়োজনকারী বীজাণু; এই প্রকার বীজাণু বিষাক্ত নহে; সুতরাং নিরাপদ। ইহারা কেবল দুগ্ধকে বিয়োজিত (decomposed) করিয়া নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে।

(২) রোগবাহক বীজাণু; এই প্রকার বীজাণুসমূহ দুগ্ধের কোন- রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায় না। বিসূচিকা, সান্নিপাত জ্বর, ডিপথেরিয়া (Diphtheria) টিউবারক্যুলসিস্ (Tuberculosis) প্রভৃতি রোগের বীজাণু শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইহারা অতিশয় অনিষ্টকারী।

বীজাণুসমূহের দুগ্ধের প্রতি এমনই একটা আকর্ষণ আছে যে দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশে রাজকীয় নিয়মানুসারে, যে দুগ্ধের ১ ঘন সেন্টিমিটার বা ২০ ফোঁটাতে ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক বীজাণু নাই, উহা প্রথম শ্রেণীর দুগ্ধ। কারণ, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলেও দুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম করা যায় না। ২০ ফোঁটা দুগ্ধে পাঁচ হাজার হইতে এক লক্ষ পর্য্যন্ত বীজাণু থাকিলে দুগ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং উহা ব্যবহারের যোগ্য থাকে। কিন্তু প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে একলক্ষের অধিক বীজাণু থাকিলে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

দোহনের পর রাখিয়া দিলে বায়ু হইতে অসংখ্য প্রকার বীজাণু ক্রমে দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া উহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে এবং ঐ দুগ্ধও ক্রমে সন্ধিত (Formented) হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

বীজাণুর আক্রমণে দুগ্ধের বিকার

কয়েক ঘণ্টা পর পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ঐ দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবর্ত্তনক্রিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দুগ্ধ ক্রমে অম্লস্বাদবিশিষ্ট হইতে থাকে। তাহার কারণ এই যে দুগ্ধস্থ শর্করাভাগ এক প্রকার অণুজীব (micro-org mis n) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আংশিকরূপে দুগ্ধজাম্ল বা দুগ্ধাম্লে (lactic acid) পরিণত হয়। উক্ত বীজাণু-সমূহকে দুগ্ধাম্ল বীজাণু বা দধি বীজাণু (Lactic acid bacilli) বলা হইয়া থাকে। এই বিশেষ প্রকার বীজাণু ব্যতিরেকে আরও কয়েক প্রকার বিজাণু বা কিণ্ব (Ferment) দুগ্ধ-শর্করাকে দুগ্ধাম্লে (lactio acid) পরিণত করিতে পারে। স্থান ও অবস্থাভেদে কোনটির ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়; কিন্তু মোটামুটী বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ দুগ্ধাম্ল-বীজাণুর সংখ্যাধিক্য হেতু উহাদের ক্রিয়াই বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহাই উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বপ্রকারে দুগ্ধশর্করা হইতে দুগ্ধাম্ল উৎপত্তিকে দুগ্ধাম্ল-সন্ধান (lactic acid fermentation) বলা হয়।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজাণু-সমূহের রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিলে উহাদিগের আশ্চর্য্য ও দ্রুত বংশবৃদ্ধিক্ষমতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পরীক্ষার জন্য অল্প পরিমাণ অম্লস্বাদবিশিষ্ট অর্থাৎ দুগ্ধাম্ল বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত দুগ্ধের সহিত এক সহস্র ভাগ জল মিশাইয়া তাহা হইতে এক বিন্দু লইয়া কিঞ্চিৎ শিরীস (Gelatin) এর উপরে

বীজাণু রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন।

ফেলিয়া কয়েক দিন রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে ঐ দুগ্ধ-বিন্দু হইতে দুগ্ধাম্ল বীজাণুসমূহ দ্রুতভাবে বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া শিরিসের উপর সরু দণ্ডাকারে বিভিন্ন সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছে।

বিপুলদর্শক কাচের (Magnifying glass) সাহায্যে উহাদের আকৃতি অনেকটা বাদামের ন্যায় দেখায়। বীজাণু-সমূহের বংশবর্দ্ধনের পক্ষে শিরীস বিশেষ উপযোগী ; বিশেষতঃ শিরীস দুগ্ধের ন্যায় তরল পদার্থ নহে বলিয়া বীজাণু-সমূহের অস্তিত্ব সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

১০° সিঃ (10 Degree centigrade) শৈত্যে দুগ্ধাম্ল বীজাণু-সমূহের কোনও ক্রিয়া নাই। উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের উপর উহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হয় ; কিন্তু ১৬° সিঃ উষ্ণতা পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা অতি মৃদু থাকে। ৩৫° সিঃ হইতে ৪২° সিঃ পর্য্যন্ত উষ্ণতার মধ্যে উহাদের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয় এবং উষ্ণতা ৪৫° সিঃ হইলে কার্য্যকরী ক্ষমতা পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। দুগ্ধকে ৭০° সিঃ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিলে বীজাণু সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশসমূহের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ১৫° সিঃ ; কাযেই দুগ্ধাম্ল বীজাণুসমূহ দুগ্ধের উপর সহজে বিশেষ ক্রিয়া করিতে পারে না, এবং ঐ সকল স্থানে দোহনের ৮।১০ ঘণ্টা পরও দুগ্ধ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে ; এমন কি, সতর্কতার সহিত রাখিয়া দিলে, দোহনের ২।৩ দিন পরেও দুগ্ধের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ৩০° সি ; কাযেই দোহনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়া অম্লস্বাদবিশিষ্ট করিয়া ফেলে।

উষ্ণতাভেদে বীজাণুর ক্রিয়া।

দুগ্ধস্থ শর্করাভাগ পূর্ব্ব প্রকারে দুগ্ধাম্লে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে অম্লের মাত্রা যখন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছিবে, তখন দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে বায়ুর স্বাভাবিক শৈত্য নিবন্ধন দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইতে অধিক সময় লাগে ; কারণ উক্ত অবস্থায় বীজাণু-সমূহ দ্রুত ভাবে কাজ করিতে পারে না। এই কারণেই আমাদের দেশে শীতকালে দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, যে পাত্রে দধি প্রস্তুত হইতেছে, গোয়ালাগণ উহা চুল্লীর নিকটে রাখিয়া দেয়, অথবা লেপ কম্বল প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া উহাকে শৈত্যের সংস্পর্শে আসিতে দেয় না। শীতকালে দধি প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ বার ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দশ ঘণ্টায়ই উত্তম দধি প্রস্তুত হয়। থরনার (Thorner) দেখাইয়াছেন যে ১০০ একশত ভাগ দুগ্ধে অন্ততঃ ·২০৭ ভাগ দুগ্ধাম্ল থাকিলে দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। দধি প্রস্তুত হইবার কারণ এই যে, অম্ল বর্ত্তমান থাকাতে দুগ্ধস্থ যে কেসিন (Casein) বা ছানা-ভাগ পূর্ব্বে দ্রব অবস্থায় ছিল, উহা চাপ বাধিয়া যায়। দুগ্ধস্থ চর্ব্বিভাগের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, শর্করাভাগ আংশিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুগ্ধাম্ল রূপে (Lactic acid) থাকে। নিম্নে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ দধির বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গেল :—

দধি।

	বিশুদ্ধ দুগ্ধ		বিশুদ্ধ দধি
প্রতিদ (Proteid)—	শতকরা ৪.২৮ ভাগ	....	শতকরা ৪.৭৭ভাগ
চর্ব্বি (F at)—	,, ৩.২৫ ,,	....	,, ৩.৫৭ ,,
দুগ্ধ শর্করা—	,, ৩.৯ ,,	....	,, ২.৮ ,,
দুগ্ধাম্ল (Lactic acid)	,, ০ ,,	....	,, .৪ ,,
ধাতব পদার্থ	,, .৯৮ ,,	....	,, .৬২ ,,
জল	,, ৮৭.০৪ ,,	....	,, ৮৭.৮৪ ,,
	মোট ১০০ ভাগ	....	মোট ১০০ ভাগ

দধি বীজাণু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী নহে। যে দধিতে দধি-বীজাণু ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বীজাণু নাই, তাহাকেই বিশুদ্ধ দধি বলা যাইতে পারে। দোহনের পর দুগ্ধ রাখিয়া দিলে দধি-বীজাণুর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্থ অন্য প্রকার বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে আক্রমণ করিবে। তন্মধ্যে কোন প্রকার রোগবাহক বীজাণুও থাকিতে পারে। ঐ প্রকার দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষাক্ত বীজাণুও বর্ত্তমান থাকিবে। অসিদ্ধ দুগ্ধ জাত দধি আমাদের কোন

প্রচলিত দধি প্রস্তুত প্রণালী।

মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। দুগ্ধকে সিদ্ধ করিলে কোন প্রকার বীজাণু থাকিতে পারে না। বায়ুর সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ঐরূপ দুগ্ধকে যত দিন ইচ্ছা অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। ইহাই দুগ্ধসংরক্ষণপ্রণালীর মূলসূত্র। বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে আক্রমণ না করিলে দুগ্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কাযেই বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, দুগ্ধকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে উহাতে দধি বীজাণু ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইয়ুরোপে দধি বীজাণুর (Lactic acid bacilli) এক প্রকার বটিকা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, এবং দধি প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণতঃ উহাই ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে দুগ্ধ সিদ্ধ হইবার পর তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণে পুরাতন দধি "সাজা" দেওয়া হয়; অর্থাৎ, পুরাতন দধিতে যে বীজাণু ছিল, তাহা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থলে কোনরূপ "সাজা" ব্যবহার না করিয়া, পূর্ব্বে যে পাত্রে দধি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই পাত্র ধৌত না করিয়া পুনরায় তাহাতেই দধি প্রস্তুত করা হয়। পুরাতন দধি হইতে যে দধি-বীজাণু পাত্র-গাত্রে সংলগ্ন ছিল, উহারা ক্রিয়া আরম্ভ করে। কখনও বা পুরাতন দধি-পাত্র-ধৌত জল "সাজা" রূপে ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত কোন প্রকার প্রণালীই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। তাহার কারণ এই যে, পুরাতন দধি-পাত্রে বা তৎ-ধৌত জলে বায়ু হইতে অন্যান্য প্রকার বীজাণুও সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে; অতএব উহা হইতে যে দধি প্রস্তুত হইবে, তাহা কখনও বিশুদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ দুগ্ধে দধি-বীজাণু ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষতিকারক বীজাণু থাকিলে উত্তম দধি প্রস্তুত হইতে পারে না। যে দধি বিশুদ্ধ নহে তাহা খাওয়া অনুচিত।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র ফুটন্ত জলে (boiling water) উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাত্র-গাত্রে কোন বীজাণু সংলগ্ন থাকিলে ঐ প্রক্রিয়ায় ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অপর একটি পাত্রে দুগ্ধের সহিত কিছু জল মিশাইয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের পূর্ব্বের আয়তনের সমান করিতে হইবে। উক্ত দুগ্ধ পূর্ব্বোক্ত পাত্রে ঢালিয়া তৎসঙ্গে এক চামচ পরিমাণ বিশুদ্ধ পুরাতন দধি মিশ্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে ঢাকিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপ করিলে ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তম দধি প্রস্তুত হইবে। চামচটিকেও ব্যবহারের পূর্ব্বে গরম জল দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত।

বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত প্রণালী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধস্থ শর্করাভাগ দুগ্ধাম্লে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। দুগ্ধাম্ল ছাড়া অন্যান্য অম্লও উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। অনেক সময় দুগ্ধে একটু তেঁতুল ফেলিয়া দধি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উত্তম ও উপকারী দধি খাইতে হইলে দধি-বীজাণু ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। তাহার কারণ এই যে, উক্ত বীজাণু-সমূহের প্রক্রিয়া দ্বারা যে অল্প পরিমাণ দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত হয়, উহাতে আমাদের পরিপাক-কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হয়।

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু দধি পরিপাক করিতে দুগ্ধ অপেক্ষা কিছু অধিক সময় লাগে। দধিতে দুগ্ধাম্লের মাত্রা অধিক হইলেও পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়; এবং তাহা হইতে সর্দ্দি, কাশি, বেদনা প্রভৃতি অম্লজনিত রোগও হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দধি পরিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। ইহা ছাড়া দধির আরও একটি বিশেষ গুণ আছে। বীজাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে, ৪০ বৎসর বয়সের পর মনুষ্যের অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণু-

সমূহের সংখ্যা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং উহারা ভুক্তদ্রব্যস্থ পচনশীল প্রভিদ (proteid) ভাগকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে; এবং যখন আমাদের শরীরে কোন প্রকার পীড়া হয়, তখন এই সকল জীবাণু-সমূহ দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া নানা প্রকার রোগের বিষ উৎপাদন করে। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্ (Metchni koff) এর মতে, মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্নমধ্যে এ সকল জীবাণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং উক্ত বিষ দ্বারা জর্জ্জরিত হওয়াতে, মানব-দেহে বার্দ্ধক্যজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। উক্ত অধ্যাপক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে. পূর্ব্বোক্ত বার্দ্ধক্য আনয়নকারী জীবাণু-সমূহের বৃদ্ধি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা দুগ্ধাম্ল (lactic acid) দ্বারা আংশিকরূপে প্রতিহত হইতে পারে। এই স্থলে মনে হইতে পারে যে. নিয়মিতরূপে দুগ্ধাম্ল (lactic acid) বাজার হইতে ক্রয় করিয়া সেবন করিলে, এই সকল দেহধ্বংসকারী জীবাণু-সমূহের আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ লেকটিক এসিড্ সেবন করিলে তাহা অন্নমধ্যে যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত জীবাণুসমূহ রাজ্য বিস্তার করিয়া শরীরের ধ্বংসসাধন করিতেছে তত-দূর পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায়, এবং কাযেই ঐ জীবাণু-সমূহের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত জীবাণু-সমূহের আবাস-স্থানে যদি দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করান যায়, তাহা হইলে উহা জীবাণু-সমূহকে সহজেই আক্রমণ করিয়া উহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা কতক পরিমাণে নাশ করিয়া দিতে পারে। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্ দেখাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ দধি ভোজন দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ দধি ভোজন করিলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধাম্ল বীজাণু-সমূহও lactic acid bacilli) তৎসহ অন্নমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং ঐস্থানে দধিস্থ অবশিষ্ট শর্করাভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিবে। এই দুগ্ধাম্ল অন্নমধ্যস্থ দেহক্ষয়-কারী জীবাণু-সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অকাল-বার্দ্ধক্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের রোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করে।

দধির গুণ

দধির গুণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, নিয়মিতরূপে বিশুদ্ধ দধি ভোজন করিলে অকাল বার্দ্ধক্য এবং বিবিধ প্রকার রোগের হস্ত হইতে কতক পরিমাণে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

নিয়মিত দধিভোজন দীর্ঘজীবন-লাভের উপায়

অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্ ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যহ দুগ্ধাম্ল বীজাণু অন্নমধ্যে প্রবেশ করাইলে. অর্থাৎ, প্রত্যহ বিশুদ্ধ দধি ভোজন করিলে, মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয়, এবং ইন্দ্রিয়সকল সবল ও কার্য্যক্ষম থাকে। মেচ্‌নিকফ্ বুলগেরিয়া (Bulgaria) প্রদেশের অধিবাসিগণের আয়ুসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উক্ত সত্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ইয়ুরোপে বুলগেরিয়াতেই দধির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন এবং উক্ত প্রদেশের অধিবাসিবর্গ প্রত্যহ অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে অল্লাধিক মাত্রায় "টক দুগ্ধ" (বা দধি) পান করিয়া থাকে। সমগ্র বুলগেরিয়াতে ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস; তন্মধ্যে ১০ জনের বয়স ১২৫ এর অধিক, ৮৮ জনের বয়স ১২০ হইতে ১২৫ এর মধ্যে, ২৩৪০ জনের বয়স ১১০ এর উপর। পৃথিবীতে বুলগেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মনুষ্যের দেশ। অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে, ঐ দেশের অধিবাসিগণ প্রত্যহ দধি ভোজন করে বলিয়াই তাহারা এত দীর্ঘজীবী হয়। মেচ্-নিক্‌ফের উক্ত আবিষ্কারের পরে ইয়ুরোপে দধিভোজনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে, এবং অনেকেই নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দধিভোজন আরম্ভ করিয়াছেন! কিন্তু মনে রাখা উচিত, যে বিশুদ্ধ দধিই উপকারী।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের জীবাণুতত্ত্বের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে,বুলগেরিয়া প্রদেশে যে দধিবীজাণু দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে এবং দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করে, তাহা হইতে আমাদের দেশীয় দধি-বীজাণু সম্পূর্ণ পৃথক এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী। বুলগেরিয়ার দধি-বীজাণুর তুলনায় ইহারা প্রায় দ্বিগুণ দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করিতে পারে; কাজেই দ্বিগুণ তেজে অনিষ্টকারী বীজাণু-সমূহকে ধ্বংস করিতে থাকে অর্থাৎ, শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আমাদের দেশের দধি ইয়ুরোপীয় দধি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এদেশে দধি-বীজাণুর সহিত মিশ্রিত হইলে বিসূচিকার বীজাণু ১২ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং একদিন পর তাহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। সান্নিপাত জ্বরের (Typhoid) বীজাণু দধির সহিত মিশ্রিত হইলে ৪৮ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। *

আমাদের দেশের দধি-বীজাণুর শ্রেষ্ঠতা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দধিস্থিত কেসিন ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগীদের পক্ষে, উহা পরিপাক করা কিঞ্চিৎ কষ্ট সাধ্য। এইরূপ স্থলে দধির পরিবর্ত্তে ঘোল বা মাঠা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঘোলেও দধি বীজাণু থাকে। পেটের পীড়াতে ঘোল পরম উপকারী। কিন্তু একান্তই দধি ব্যবহার করিতে হইলে তৎসঙ্গে উত্তমরূপে জল মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া উচিত।

ঘোল

ইয়ুরোপে অল্প দিন যাবৎ দধির গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে দধির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ভোজ-ব্যাপারে দধি একটি প্রধান উপকরণ। বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা জেলায় গজারিয়া, তিল্লি, সুয়াপুর প্রভৃতি স্থানের দধি বিখ্যাত। প্রত্যেক জেলায় দধিপ্রস্তুত প্রণালীতে অল্পাধিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। বাজারের দধিতে অনেক অনিষ্টকারী বীজাণু থাকে। দধিপ্রস্তুত বিষয়ে এ দেশের গোয়ালাগণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হিন্দু শাস্ত্র মতে দধির গুণ—"উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ, কষায়, গুরু, অম্লবিপাক, ধারক, রক্তপিত্তকারক, শোথনাশক মেদোবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতক নামক বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচি, ও কৃশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।"

হিন্দু শাস্ত্রে দধির গুণ।

ভাব-প্রকাশের মতে দধি পাঁচ প্রকার যথা:—(১) মন্দ দধি—"যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্তরস, অর্থাৎ সম্যক্ দধিরূপে পরিণত হয় নাই, এই জন্য আপনা হইতেই স্বীয় রস বিহীন হয়, তাহাকে মন্দ দধি বলে। ইহার গুণ—মল ও মূত্র নিঃসারক এবং ত্রিদোষজনক। (২) স্বাদু দধি—যে দুগ্ধ সম্যক্ গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রস যুক্ত হয়, অম্লরস অনুভব হয় না, তাহাকে স্বাদু দধি কহে। ইহার গুণ—অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, শুক্রজনক, মেদোবর্দ্ধক, কফকারক, বায়ুনাশক, মধুর, বিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক। (৩) স্বাদম্ল-দধি—যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায়যুক্ত, মধুর অম্ল স্বাদ হয়, তাহাকে স্বাদম্ল দধি বলে। ইহার গুণ দধির সামান্য গুণের ন্যায়। (৪)অম্ল-দধি—যে দধি মধুরতা-বিহীন হইয়া অম্ল রস পায়, তাহাকে অম্ল দধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিসন্দীপক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক, ও কফবর্দ্ধক।

প্রকারভেদে দধির গুণ।

* দধির আলোচনা বিষয়ে বর্ত্তমান বৎসরের "স্বাস্থ্যসমাচারের" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "দধি ও দধি বীজাণু" হইতে কতকটা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—লেখক

(৫)অত্যম্ল দধি—যে দধি দ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ, কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে অত্যম্ল দধি কহে। ইহার গুণ —অগ্নিদীপ্তিকারক ও রক্তপিত্তজনক।”

সুশ্রুতের মতে দধি সাত প্রকার—যথা স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত, পক্বদুগ্ধজাত, দধিরস, ও অসার। পক্বদুগ্ধ জাত দধি—পক্ব দুগ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ু নাশক এবং ধাত্বগ্নি সমূহের বলকারক। দধিরস—দধি মস্ত অর্থাৎ, দধি-নিঃসৃত জল তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের দ্বার শোধনকর, অম্ল, কষায়, মধুর, বাতশ্লেষ্মায় শান্তিকর, কিন্তু তেজো-বর্দ্ধক নহে। অসার দধি—দধি অসার হইলে (উহাতে চর্ব্বি জাতীয় ভাগ না থাকিলে—অর্থাৎ,টানা দুধের দধি হইলে), উহা রুক্ষ, মলরোধক,বায়ুবর্দ্ধনকর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি-ভোজন প্রশস্ত,এবং রাত্রে দধি-ভোজন নিষেধ।

বিশুদ্ধ দধির যে বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, তাহাতে কেবল মাত্র শতকরা ৪ ভাগ দুগ্ধাম্ল আছে, এবং অবশিষ্ট শর্করাভাগের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐরূপ দধি উৎকৃষ্ট। অনেক দধিতে শতকরা ২ ভাগ পর্য্যন্ত দুগ্ধাম্ল থাকে। অত্যধিক অম্ল থাকা হেতু ঐরূপ দধি অহিতকর গুণ দর্শায়। সুতরাং অত্যম্ল দধি ভোজন করা উচিত নহে।

অত্যম্ল দধির দোষ।

দুগ্ধাম্ল বীজাণু দ্বারা দুগ্ধে কি কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। আর এক জাতীয় বীজাণু দুগ্ধস্থ বিউটিরিন (Butyrin) ভাগকে আক্রমণ করিয়া ইহাকে আংশিকরূপে বিউটিরিক অম্ল নামক অম্লে পরিবর্ত্তিত করে। উক্তরূপ পরিবর্ত্তনকে বিউটিরিক অম্লসন্ধান (Butyric Acid Fermentation) বলা হয়। বিউটিরিক অম্লবীজাণুর ক্রিয়া প্রায় দুগ্ধাম্ল বীজাণু ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়; কিন্তু প্রথমতঃ অতি মৃদু ভাবে ক্রিয়া হয় বলিয়া উহা বিশেষ লক্ষিত হয় না। দুই দিন পর উহাদের ক্রিয়া অতি প্রবল ভাব ধারণ করে, এবং তখন দুগ্ধে এক প্রকার দুর্গন্ধ ও ক্ষারস্বাদ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাকে “পচা” দুধ বলে। বিউটিরিক-অম্ল বীজাণুসমূহ অপকারী না হইলেও, পচা দুধ কখনও পান করা উচিত নহে।

পচা দুধ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধস্থ শর্করাভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিতে পারে, দুগ্ধাম্লবীজাণু ব্যতিরেকে এমন আরও কয়েক প্রকার বীজাণু দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যখন দুগ্ধ কেবল দুগ্ধাম্ল বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন দুগ্ধ-শর্করা হইতে দুগ্ধাম্লের সঙ্গে সঙ্গে কোনও মস্তসার বা সুরাসারের (alcohol) উৎপত্তি হয় না। কিন্তু দুগ্ধ যখন অন্য কয়েক প্রকার বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সন্ধিত হয়, তখন দুগ্ধ শর্করাভাগ কেবল দুগ্ধাম্লে পরিবর্ত্তিত না হইয় অল্লাধিক মাত্রায় সুরাসারেও পরিবর্ত্তিত হয়। এই প্রকারে সুরাসারের উৎপত্তিকে সুরাসার সন্ধান (Alcoholic Fermentation of milk) বলা হইয়া থাকে। দুগ্ধস্থ শর্করাকে বিশেষ ভাবে এবং সহজেই সুরাসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, ডুক্লে (Duclanx) এবং কেসার (Kayser) এইরূপ কয়েক প্রকার বীজাণু আবিষ্কার করিয়াছেন।

দুগ্ধ-সুরা।

পনীর প্রস্তুত কালে দুগ্ধস্থ চর্ব্বিভাগ ও প্রতিদ্ ভাগই ব্যবহৃত হয়। শর্করাভাগ পরিত্যক্ত জলীয় অংশে পড়িয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত বীজাণু দ্বারা ঐ জলীয় ভাগকে সন্ধিত করিয়া উৎকৃষ্ট “দুগ্ধসুরা” (Whey Wine) প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর পনীর প্রস্তুতের জন্য ২২,৪০,০০,০০০ গ্যালন বা ২,৮০,০০,০০০ মণ দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত দুগ্ধস্থ জলীয় অংশের কিঞ্চিৎ ভাগ দুগ্ধশর্করা

(Milk of sugar) প্রস্তুতের জন্য, এবং অবশিষ্ট ভাগ শূকরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জলীয় অংশকে সুন্দররূপে "দুগ্ধসুরাতে" পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে একটী নূতন ব্যবসায় প্রচলিত হইবে। "দুগ্ধসুরা"তে শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকৃত সুরাসার থাকে। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ দধিতে কোন সুরাসার থাকে না।

তাতারগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে দুগ্ধ হইতে কৌমিষ (Koumiss) নামে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কৌমিষ সাধারণতঃ ঘোটক বা উষ্ট্রদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দশ ভাগ সদ্যঃ উষ্ট্র দুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া এক ভাগ পুরাতন বা অম্লস্বাদবিশিষ্ট (অতএব সন্ধিত) দুগ্ধ মিশাইয়া কয়েক ঘণ্টা নাড়িয়া তাতারগণ উত্তম কৌমিষ সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কৌমিষ সুরাতে শতকরা ১·৫ ভাগ হইতে ২ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সুরাসার থাকে। মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ গো-দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত বীজাণু দ্বারা সন্ধিত করিলে অবিকল কৌমিষের ন্যায় এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করা যায়। ইহা শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট বলকারক খাদ্য।

ককেশাস্ প্রদেশে গো-দুগ্ধকে চর্ম্মনির্ম্মিত থলিয়াতে পুরিয়া সন্ধিত করিয়া 'কেফির' নামক এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে "কেফির" উৎকৃষ্ট কায করে। নিম্নে বিশুদ্ধ কৌমিষ ও কয়েক প্রকার প্রচলিত সুরার বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গেল :—

	১০০ ভাগে চর্ব্বির অংশ	১০০ ভাগে প্রতিদের অংশ	১০০ ভাগে শর্করার অংশ	১০০ ভাগে দুগ্ধাম্লের অংশ	১০০ ভাগে সুরাসারের অংশ	১০০ ভাগে জলের অংশ
বিশুদ্ধ দুগ্ধ	৩.৮	৪.৮	৪.১	০	০	৮৭.৩
কৌমিষ সুরা	২.০৫	১.১২	২.২০	১.১৫	১.৭৫	৯১.৮৩
কেফির সুরা	২··	৬.৮	২.০	০.৯	০.৮	৯০.৪৯
উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি (একথা নং ১)	....	....	....	....	৫১	....
পোর্ট মদ	....	....	....	....	১৮—২০	....
বীয়ার (Beer)	....	....	....	....	৫—৬	....
শ্যাম্পেন্ মদ	....	....	....	....	১৫—২০	....

এই বিশ্লেষণ-ফল হইতে দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রচলিত সুরার তুলনায় দুগ্ধসুরাতে বিশুদ্ধ সুরা-সারের অংশ অতি কম। কাজেই অন্যান্য সুরার ন্যায় দুগ্ধসুরার মাদকতা নাই; অথচ ইহা অতিশয় বলকারক এবং তেজোবর্দ্ধক।

কখনও কখনও দুগ্ধ স্বতঃই নীলবর্ণ ধারণ করে। এরেন্‌বার্গ (Ehrenberg) দেখাইয়াছেন যে, ছাইনোজেনাস্ নামক এক প্রকার বীজাণু (Bacillus cynogenous) দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া উক্তরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। এই বীজাণু-সমূহ দেখিতে যেটে নীলবর্ণ এবং সরু দণ্ডের ন্যায়। ইহারা অপকারী নহে। হিউপ্ (Houppe) উক্ত বীজাণু-মণ্ডিত খাদ্য বিভিন্ন প্রাণীকে খাওয়াইয়া তাহাদের দেহে কোন প্রকার রোগলক্ষণ বা

দুগ্ধ বিবর্ণকারী বীজাণু-সমূহ

বিষপ্রক্রিয়া প্রাপ্ত হয় নাই। দুগ্ধপাত্র নিয়মিতরূপে ফুটন্ত জল দ্বারা ধৌত করিলে এই বীজাণুসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুগ্ধ পীত, রক্ত, সবুজ বা বেগুণে বর্ণ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ স্থলে বীজাণুসমূহের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পূর্ব্ব প্রবন্ধে * লিখিত সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃষ্টির দিনে কখনও কখনও দুগ্ধ পাতলা আঠার আকৃতি ধারণ করে। ইংরেজীতে ঐরূপ দুগ্ধকে 'রোপী' দুধ (Ropy milk) বলে। এই দুগ্ধ এত ঘন এবং আঠা হয় যে, এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালিতে গেলে তরল পদার্থের ন্যায় না পড়িয়া উহা গাঢ় তৈলের ন্যায় পড়ে। দুই তিন প্রকার বীজাণু দ্বারা ঐরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে। বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ পুনরায় স্বাভাবিক তরলতা প্রাপ্ত হয়। দুই এক স্থলে দেখা যায় যে, দুগ্ধে একটি তিক্ত স্বাদ থাকে। লেইব্‌সার (Leibscher) দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ স্থলে গাভীর বাঁট-নিঃসৃত কয়েক ধার দুগ্ধই কেবল তিক্তস্বাদবিশিষ্ট থাকে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বরূপ দুগ্ধবিরসকারী বীজাণুসমূহ গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধে প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায় গোশালা এবং গাভীর পালান তিন চারি দিন পর্য্যন্ত কার্ব্বলিক এসিড্ দ্বারা ধুইয়া শোধন করিয়া দিলে এই সকল বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে দুগ্ধ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিতে হইলে গোয়ালাগণ দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে কয়েকখানা খেজুর পাতা বা মরিচ পাতা ফেলিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ পাতা দুগ্ধকে অম্লস্বাদ হইতে দেয় না, অর্থাৎ দুগ্ধবিয়োজনকারী বীজাণুসমূহের ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ঐ পাতা ব্যবহার করার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, ঐরূপ করিলে দুগ্ধপূর্ণ ভার লইয়া দ্রুত গমন কালে পাত্রস্থ দুগ্ধ ঝলকাইয়া পড়িতে ও মথিত হইতে পারে না।

গোয়ালাগণের দুগ্ধ-সংরক্ষণ-প্রণালী।

কোন কোন গাছের পাতার দুগ্ধকে ঘন করিবার ক্ষমতা আছে। কাযেই, দুগ্ধে জল মিশাইয়া ঐরূপ পাতা ফেলিয়া রাখিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব বর্দ্ধিত হওয়াতে জলমিশ্রিত দুগ্ধও স্বাভাবিক দুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। লিস্‌বোয়া (Lisboa) বোম্বাই প্রদেশে এই কার্য্যে এরারুট গাছের পাতা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন। এরারুট গাছের পাতার দুগ্ধকে ঘন করিবার ক্ষমতা আছে।

বায়ু-সংস্পর্শে রাখিয়া দিলে পূর্ব্ববর্ণিত নির্দ্দোষ বীজাণুসমূহ ব্যতীত নানাপ্রকার রোগবীজাণুও দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া বিষাক্ত করিতে পারে। সংক্রামক রোগবাহক বীজাণুসমূহ দুই প্রকারে দুগ্ধে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, গাভীর কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি থাকিলে, দোহনকালে উহার উধঃ বা দেহ হইতে ঐ রোগের বীজাণু দুগ্ধে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বায়ু হইতে বিসূচিকা, সান্নিপাত জ্বর, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু দুগ্ধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। দেশে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলে শেষোক্ত উপায়ে দুগ্ধ বিষাক্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা। কেহ ঐরূপ দুগ্ধ পান করিলে শীঘ্রই বিষাক্ত বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কাজেই সাবধানতার জন্য দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করা উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে বিশেষ বিধি করিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতে দুগ্ধের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "দুগ্ধ অগ্নিতে পাক করিলে লঘু হয় এবং নারীর দুগ্ধই অপক্কাবস্থায় হিতকর। অপক্ক দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ (অর্থাৎ দোহনের পর স্বভাবতঃ যতক্ষণ উষ্ণ থাকে) দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট; দোহনের পর শীতল হইলে বিপরীত গুণ দর্শায়।" উত্তাপপ্রদানে বীজাণু-সমূহ ধ্বংস পাইয়া থাকে। কত উত্তাপে কোন

দুগ্ধে রোগবাহক বীজাণু

* "দুগ্ধের বিশুদ্ধতা"—প্রতিভা, ফাল্গুন ১৩১৮

তাপ-প্রয়োগে বীজাণুর ধ্বংস।

বীজাণু বিনষ্ট হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—(অবশ্য দুগ্ধকে ফুটাইলে দুই এক মিনিট মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়। বীজাণুশূন্য দুগ্ধপানে কোন প্রকার রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না।) ঃ—

যক্ষা বীজাণু	৭৭ সিঃ (77 Cent)	১০ মিনিটে
সান্নিপাত জ্বরের বীজাণু ...	৮৫ সিঃ	" "
দুগ্ধাম্ল বীজাণু ...	৮৫ সিঃ	" "
বিসূচিকা বীজাণু ...	৬০সিঃ	" "
টিউবারকিউলসিস্ বীজাণু ...	৬০ সিঃ	" "
পচনকারী ও অম্ল উৎপাদনকারী সর্ব্বপ্রকারের বীজাণু ...	৪৬ সিঃ	১৫ "

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য করার প্রণালীকে "দুগ্ধ অনুর্ব্বরা" (Sterilise) করা বলে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য বা "অনুর্ব্বরা" করিতে হইলে ১৫ হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তম রূপে ফুটাইয়া যাহাতে বায়ুর সংস্পর্শ না ঘটে এরূপভাবে আটকাইয়া রাখা হয়।

উক্তরূপ সংরক্ষিত দুগ্ধ সদ্যঃ দুগ্ধের মত গুণকারী কি না সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মতভেদ আছে। তাহার কারণ এই যে—(১) যদিও উত্তাপ-প্রয়োগ হেতু বিসূচিকা, সান্নিপাতিক জ্বর, ডিপথেরিয়া ও টিউবারকিউলসিসের বীজাণু অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, কিন্তু ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা শিশুদিগের উদরাময় রোগের বীজাণুসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। কারণ উহারা দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত জলের স্ফুটন তাপ (boiling temperature) সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ঐ বীজাণুসমূহ দুগ্ধে পেপ্‌টোন্ (Peptone) প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগের উদরাময় রোগ আনয়ন করে।

দুগ্ধে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগের দোষ।

(২)—সদ্যঃ দুগ্ধেরও বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ, সদ্যঃ দুগ্ধ পান করিলে উহা শরীরস্থ অন্যান্য অপকারী বীজাণু-সমূহকে আংশিকরূপে বিনষ্ট করিতে পারে। দুগ্ধের উক্ত ক্ষমতা দোহনের কয়েক ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু দুগ্ধে তাড়াতাড়ি অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার পূর্ব্ববর্ণিত বীজাণু-নাশক গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) উত্তাপহেতু দুগ্ধস্থ "অণ্ডলালময় ভাগ" (Lacto-albumin) জমাট বাঁধিয়া দুগ্ধের উপর সর পড়িতে থাকে। কাজেই উহা পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হয়।

(৪) অত্যধিক তাপে দুগ্ধস্থ কেসিন (casein) ভাগের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয় এবং ছানা বাঁধিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

(৫) খাদ্য দ্রব্যস্থ শ্বেতসার (starch) ভাগকে পরিপাক করিতে পারে, পূর্ণবয়স্কদের মুখস্থিত লালাতে এইরূপ একপ্রকার বীজাণু আছে। কিন্তু শিশুদের লালাতে এইরূপ কোন বীজাণু নাই। উক্ত কার্য্য করিতে পারে এইরূপ একজাতীয় বীজাণু সদ্যঃ দুগ্ধেও থাকে, এবং উহা শিশুদের পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। দুগ্ধে উত্তাপ প্রয়োগ কালে উহারা সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কাযেই শিশুদের পরিপাক ক্রিয়ার কোন সহায়তা করিতে পারে না।

(৬) স্বাভাবিক দুগ্ধে চর্ব্বিভাগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিন্দু বিন্দু ভাবে পৃথক হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে এবং কাযেই তখন উহা পরিপাক করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(৭) অত্যধিক তাপ-প্রয়োগে দুগ্ধস্থ শর্করা-ভাগও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উক্ত কারণেই ঘন দুগ্ধে বা ক্ষীরে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, অসিদ্ধ দুগ্ধ কোন মতেই পান করা উচিত নহে, অথচ অতি মাত্রায় সিদ্ধ করিলেও দুগ্ধের গুণ ঈষৎ কমিয়া যায়। দুগ্ধ কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত উত্তমরূপ গরম করিয়া পান করাই শ্রেয়ঃ। উত্তপ্ত করার পর অধিকক্ষণ গত হইলে, উহাতে পুনরায় কোন প্রকার বীজাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারে। হিন্দু শাস্ত্র মতে "দুগ্ধ জাল দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। জাল দিবার পর তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সেই দুগ্ধকে অতপ্ত বলিয়া জানিবে। এই দুগ্ধ দূষিত হয়। দুগ্ধে তাহার চতুর্থ ভাগ জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়।"

দুগ্ধ পান বিধি

দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য এবং সংরক্ষিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে কি কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

পরমার্থ

স্থির হও! এ বিশ্বের সাগর গভীরে
যে না জানে নিমজ্জিতে মিছা সেই কবি;
অতলে অলখে ডুবি, মনে মণি-পুরে
প্রাণের আরণে কবি, ধর' বিশ্ব-ছবি।
ছবি সে, বসতি যার লোকালোক-পুরে
প্রকাশে ঈষারা-রসে আলোক-ছায়ায়!
জড়ের ভাবের দেশে সজতের সুরে
প্রতি-টি রেখায় যার রহে অভিপ্রায়!
যুগ-যুগান্তর ধরি' কোটি হৃদয়ের
তৃষ্ণা-আক্রমণে যার না ফুরাবে আশা;
কোটিরূপে কোটি মুখে হৃদয় মনের
পিয়াসে তিরাবে যার উথলায় ভাষা!
গভীরে অতলে সেই পুণ্য-ফলোদয়
কবিতার পরমার্থ করহ সঞ্চয়।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং*

ইউয়ান চ্যাংয়ের বিস্তৃত জীবনী "বৃহৎ মঠের ত্রিপিটকে পারদর্শী প্রভুর বর্ণনা" (Record of the Tripitaka Master of the Great Compassion Monastery) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। জুলিয়েন এই গ্রন্থ হইতেই সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং বীলও জুলিয়েনের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য কয়েক-খানি চৈনিক পুস্তক হইতে পর্য্যটকের বংশাবলী ও জীবনী প্রদত্ত হইল।

পর্য্যটকপ্রবর যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চেন বংশের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর্য্যটক নিজে "আই" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম্মগ্রন্থ বা সমসাময়িক কোন লেখকের গ্রন্থেই স্যুয়ান (Hsuan) বা ইউয়ান (Yuan) চুয়াং (Chuang) ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন নাম দৃষ্ট হয় না। ইউয়ান চুয়াং যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা হুয়াংটী (Huang-Ti) হইতে উদ্ভূত হয়। সম্রাট সান্ এই বংশ সম্ভূত, এবং পূর্ব্বে এই বংশ সান্ নামে আখ্যাত হইত। পুরাকালে বংশধরেরা হোনানের পূর্ব্বদিকে কুইটিঙ্ জিলায় বাস করিতেন ও পরে সানট্যাংয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। চৌ-বংশের প্রথম রাজা উওয়াংয়ের (Wu-wang) রাজত্বকালে 'হুকাংকুই-

* ওয়াটার্স লিখিত ইউয়ান চ্যাং বা হিউয়েন সাংয়ের 'সি-ইউ-কি'র ভূমিকা অবলম্বনে।

মান্ (Hn-kang kuoi-man) নামক এক ব্যক্তি মান বংশের বংশধর বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

এই ব্যক্তি উওয়াংয়ের স্কুল পরিদর্শক ওয়ুর পুত্র। এই পদ বংশানুক্রমেই ভোগ করা হইত এবং উওয়াং মান্‌কে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়া মাকু্ ইস্ ("How") উপাধিতে ভূষিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে জামাতাকে চেন(Chen) নামক জায়গির প্রদান করেন। ইহাতে মান বিশেষ সম্মানিত হন। ৪৭৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মানের বংশধরগণ এই জায়গির ভোগ করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন বটে, কিন্তু 'চেন' উপাধি ধারণ করিতে থাকেন।

তৃতীয় পূর্ব খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর আমরা চেন বংশীয় বিখ্যাত কোন ব্যক্তির দেখা পাই না। কিন্তু এই শতাব্দীতে আমরা সুবিখ্যাত চেন-পিংয়ের (Chen-Ping) দেখা পাই। চেন-পিং তখন হুয়াংউতে (বর্ত্তমান কৈফেং) বাস করিতেন। পিং সামান্য অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন। জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবার এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইবার কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত রসিক ছিলেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা উদ্ভাবন করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইত না। তিনি যে সকল পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ছয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাহা হইতে একটি প্রবাদবাক্যও সৃষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হ্যাংকাও-সুর (Han-Kao-Tsu) উপকারার্থেই পিং এই সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সকল গুলিই ফলবতী হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইউয়ান চুয়াংয়ের অন্য একটি প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন। বর্ত্তমান হোনানের অন্তঃপাতী সু-চৌ-ফু (Hsu chow-foo) অথন সু (Hsu) নামে খ্যাত ছিল এবং চেংসি (Chen-shi) বা চ্যাং ক্যাং (Chung-Kung) এই সু প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট হ্যাং হুয়াংটী (Han-Huan-Ti)র রাজত্বকালে চেংসি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। সি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সৎ ছিলেন এবং প্রজার হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি যদিও করুণাপরবশ ছিলেন তথাপি অবিচলিতচিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে প্রজাবৃন্দ দুষ্কর্ম করিতে লজ্জা বোধ ক'রত। নিকটবর্ত্তী জিলার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবার জন্য স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসিত। কয়েক বৎসর পরেই তিনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং ধার্ম্মিক পুত্র ও পৌত্রগণ পরিবৃত হইয়া তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবার "ধার্ম্মিক নক্ষত্র পুঞ্জ" নামে অভিহিত হইতে লাগিল, এবং ভগবানও ইহা লক্ষ্য করিলেন। পুনরায় রাজকর্ম্ম গ্রহণের জন্য আহুত হইলে চ্যাং ক্যাং অস্বীকার করিলেন এবং ১৮৭ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহ ত্যাগ করিলেন।

পরবর্ত্তী বংশধরগণের মধ্যে চেংটার (Chen-Ta) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তখন চিং (Chin) বংশ তদ্দেশীয় রাজা। ইনিও পণ্ডিত ছিলেন এবং উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চ্যাং চেংয়ের (Chang-cheng) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার বংশধরগণ সিংহাসনারোহণ করিবেন, তিনি এইরূপ ভবিষ্যবাণী করেন। ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ভবিষ্যবাণী পূর্ণ হয়, কারণ টার বংশধর সুবিখ্যাত চেং-পা-সিয়েং (Chen-Pa-hsein) চেং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশ দুটোতে দুই শত বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। কিন্তু আমাদের পর্য্যটকের পূর্ব্বপুরুষগণ খুব সম্ভব এই শাখার অন্তর্ভূত নহেন।

ইউয়ান চ্যাংয়ের প্রপিতামহ চিং (Chin) স্যাং ট্যাংয়ের শাসনকর্ত্তারূপে কার্য্য করিতেন। পর্য্যটকের পিতামহ ক্যাং (Kang) সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজধানীর জাতীয় উচ্চ শিক্ষালয়ে (National College) অধ্যাপক ছিলেন।

এই পদের পারিশ্রমিকস্বরূপ তিনি চৌনান নগরের রাজস্ব উপভোগ করিতেন। পর্য্যটকের পিতৃদেব হুই (Hui) সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘাকার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। যথাসময়ে তিনি রাজকার্য্য গ্রহণ করেন এবং রাজ্য-বিপ্লব উপস্থিত হইলেই পদ ত্যাগ করেন। পরে তিনি চেং-পাও-কু (Chen-pao-ku) নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই গ্রাম কৌ-সি নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ইউয়ান চুয়াংকে কখনও কখনও কৌ-সিবাসী বলা হয় এবং সম্ভবতঃ এই নগরের সন্নিকটস্থ তাঁহার পিত্রালয়ে তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

চিয়েং হুইর পরিবারবর্গের সংখ্যা কম ছিল এবং ইউয়ান চুয়াংয়ের জ্যেষ্ঠ আরও তিনটি ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকালে তিনি, তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত পিতার নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকও ছিলেন। শৈশবেই ইউয়ান চুয়াং তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁহার প্রখর স্মরণশক্তি ছিল এবং তিনি সাতিশয় বিদ্যানুরক্ত ছিলেন। শৈশবে, অন্যান্য বালকের ন্যায় তিনি আদৌ ক্রীড়াশক্ত ছিলেন না, এবং একাকী থাকিতেই ভাল বাসিতেন। তিনি কনফিউ-সিয়াসের মতানুমোদিত সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনানন্তর যতিব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ইউয়ান চুয়াং অজ্ঞাত ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মঠে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারও অন্তঃকরণে যতিব্রত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে তিনি গভীর মনোনিবেশ করিলেন। বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি যতিব্রত গ্রহণ করেন, এবং তদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন মঠে পরিভ্রম করিতে থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট তিনি এই ধর্ম্ম সংক্রান্ত মূল্যবান পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সুপণ্ডিত ও বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি অধিক কাল চীনে থাকিতে পারিলেন না; কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের আদিস্থান ও সুবিখ্যাত তীর্থগুলি দেখিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। বিশেষতঃ, ধর্ম্ম পুস্তকগুলির চীন দেশীয় প্রচলিত অনুবাদে তিনি আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, এবং মৌলিক পুস্তকগুলি দেখিতে এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি করিয়া ও আয়োজনাদি শেষ করিয়া গোপনে তিনি ৬২৯ খৃঃ অব্দে চ্যাং আন (বর্ত্তমান সিয়ান) পরিত্যাগ করিলেন। যে যে স্থানে তিনি পর্য্যটন করেন, তাহার বর্ণনা তাঁহার পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ষোড়শ বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া তিনি চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চ্যাং আনে পৌঁছেন। তখন ট্যাং টৈ সাং রাজত্ব করিতে ছিলেন।

ইউয়ান চুয়াংকে দেশাধিপতি যেরূপ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে অথবা পরে আর কোনও বৌদ্ধ যতি এরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন নাই। সম্রাট স্বয়ং, রাজকর্ম্মচারী, বণিকগণ এবং জনসাধারণ সকলেই ইউয়ান চুয়াংকে অভ্যর্থনা করেন। রাজপথে স্ত্রী ও পুরুষগণ পতাকা ও বাদ্যধ্বনি সহকারে পর্য্যটকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রকৃতি দেবীও সেদিন এই অভ্যাগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আকাশ রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন। পর্য্যটকের প্রিয় পাইন বৃক্ষও তাহার শাখা প্রশাখা কম্পিত করিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছিল। যে দিন ইউয়ান চ্যাং প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন, সেই দিন এই বৃক্ষ ইউয়ান চ্যাংয়ের প্রার্থনানুসারে ইহার শাখা প্রশাখা পশ্চিমদিকে নত করিয়াছিল এবং যতদিন পর্য্যটক ঐ দিকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ততদিন এই ভাবেই ছিল। কিন্তু যখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন, তখনই বৃক্ষটি ইহার শাখা প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পসহ পূর্ব্বাভিমুখী হইল। এই দৃশ্যে অধিবাসীবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইউয়ান

চ্যাং গৃহাভিমুখী হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং অনেক দিবস ধরিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিবেন। যে স্থানে অন্য কোন চীনবাসী ইতঃপূর্ব্বে যান নাই, তিনি সেই দেশে গমন করিয়াছিলেন। যে দেশ পূর্ব্বে অন্য কোন চৈনিক পর্য্যটক দেখেন নাই তিনি সেই দেশ দেখিয়াছেন। একাকী তিনি ভূতপ্রেতসমন্বিত প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশ দেখিয়াছেন এবং যে স্থানে সকল দ্রব্যের শেষ, তিনি সেই স্থান দেখিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিরাপদে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং সঙ্গে মূল্যবান বহু দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত ৬৫৭ খানি পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি অদৃষ্ট বিপদ দূরীভূত করিতে পারে, এবং সকলগুলিই অদ্ভুত ভারতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং তালপত্র বা গ্রথিত বল্কল-নির্ম্মিত। অধিকন্তু, সুন্দর সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি এবং সুবর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক এবং চন্দন কাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধের ও সিদ্ধ পুরুষগণের মূর্ত্তি সঙ্গে আনিয়াছেন! এতদ্ব্যতীত অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্র, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বুদ্ধদেবের প্রকৃত দেড় শত স্মরণ চিহ্ন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। এই সকল চিহ্ন কুড়িটা ঘোড়ায় বহন করিয়া আনয়ন করে এবং বিশেষ জাকজমক ও শিষ্টাচারের সহিত নগর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়।

সম্রাট তৈসাং পর্য্যটক বিনানুমতিতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, এই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, ইউয়ান চ্যাংয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। তিনি অন্তঃপুরে ইউয়ান চ্যাংয়ের অভ্যর্থনা করিলেন এবং অক্লান্তচিত্তে ইউয়ান চ্যাং-বর্ণিত অজ্ঞাত দেশের বর্ণনা এবং সেই দেশে বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইয়াছেন, তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইউয়ান চ্যাং যাহাতে যতিব্রত পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সম্রাট যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পর্য্যটক এ সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং সত্বর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চৈনিক ভাষায় ভারতীয় পুস্তকগুলির অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আবেদনের ফলে অনুবাদ-সম্পাদন ও অনুলিপি করণার্থে সম্রাট কয়েকজন শিক্ষিত যতি ও পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। ইতি মধ্যে ইউয়ান চুয়াং সম্রাটের অনুরোধে তাঁহার সি-ইউ-চি সঙ্কলন করেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের প্রথম 'খসড়া' সম্রাটের নিকট উপস্থিত করা হয় কিন্তু ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পুস্তক শেষ হয় নাই। গ্রন্থকারের জীবিত কালে পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রচার করা হয়। সি-ইউ-চি শেষ করিয়া পর্য্যটক প্রচুর অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। অবসর মত তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন এবং নির্ব্বিকারচিত্তে কাল যাপন করিতেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ দিবসে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং 'প্রস্থানের' আয়োজনও করিয়াছিলেন। এজন্য ভীত হইবারও তাঁহার কোন কারণ ছিল না, এবং তিনিও দেহান্তে স্বর্গবাসী হইবেন, ইহা স্থির জানিয়াই সন্তুষ্টচিত্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। যতদিন মৈত্রীয় পৃথিবীতে আগমন না করেন, ততদিন তিনি তথায় তাঁহার সহিত অপেক্ষা করিবেন, এবং তাঁহারই সঙ্গী হইয়া ইউয়ান চুয়াং পৃথিবীতে প্রত্যাগমন ও অন্যের উপকারার্থে পুনরায় বুদ্ধদেবের আদেশাবলী প্রতিপালন করিবেন, এই আশায় তিনি স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন।

বাহ্যিক আকৃতিতে ইউয়ান চুয়াং তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু সুন্দর ছিল এবং তিনি সুশ্রী ছিলেন। তিনি একাধারে নৈতিক ও মানসিক গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন, এবং সাধারণ চীনবাসীদিগের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মাতাপিতা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি তাঁহার যথার্থ আসক্তি ছিল, এবং বাল্যে ও বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি উৎসাহী, কষ্টসহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি নীরস ছিল এবং তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না। তিনি অতিশয় কর্ম্মপটু ছিলেন এবং তাঁহার

বিদ্যাচর্চার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী ছিল। যদিও তাঁহার পিতৃপিতামহগণ কনফিউসিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং বাল্যে সেই মতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি পরে তিনি এক জন গোঁড়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার পিতৃদেব ও বাল্যকালের শিক্ষকগণের নিকট হইতে যে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যশালী গরিমা ও ইহার ধর্ম্মের মহিমা তাঁহাকে তাঁহার চীনের প্রতি ভালবাসা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। চীনের পারিবারিক,সামাজিক বা রাজনৈতিক আচার ব্যবহারের তিনি সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতেন। ষাট বৎসর বয়ঃক্রম কালেও তিনি তাঁহার স্বর্গীয় মাতাপিতার সমাধিস্থলে পুত্রোচিত কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। এইগুলি কোথায় অবস্থিত জানিতে না পাইয়া তিনি তাঁহার বিবাহিতা ভগ্নীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের নির্দ্দেশ করেন। তখন সমাধিমন্দিরগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সম্রাটের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মৃতদেহের অবশেষ স্থানান্তরিত করিয়া পুনরায় সমারোহের সহিত প্রোথিত করেন। যদিও তিনি বহুপূর্ব্বে শাক্যমুনির ভক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ইউয়ান চুয়াং বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম-পদ্ধতি প্রতিপালনে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার প্রকৃতিই উদার ছিল। তাহা হইলেও তিনি সম্রাট তৈস-জের অনুরোধে 'তাও-তি-চিং" (Tao-Te-ching) অনুবাদে স্বীকৃত হয় নাই অথবা তাও-তি-চিং য়ের গ্রন্থকার লাওজুকে (Lao-Tzu) বুদ্ধদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করিতে পারেন নাই। আত্মত্যাগী হইলেও ইউয়ানচুয়াং সদাসর্ব্বদাই তাঁহার ধর্ম্মের মহত্ব ও গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেকে তাঁহাকে অসন্দিগ্ধ বলিয়া মনে করেন কিন্তু কোন বিষয়কে সহজেই প্রত্যয় করা বা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বিশ্বাস করা তাঁহার প্রকৃতি ছিল না। ইউয়ান চুয়াং সর্ব্বদাই নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে কোন বিষয়ে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক সময় তাঁহাকে অনেক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনৈসর্গিক বর্ণনায় তিনি সহজেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। সামান্য একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, পর্ব্বত-গাত্রে কোন চিহ্ন, এবং যে কোন ঘটনা বর্ণয়িতা কর্ত্তৃক বাস্তবিক বলিয়া বর্ণিত হইলেই তিনি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং এই সকলই তাঁহার সন্দেহ দুরীভূত করিয়া, তাঁহাকে বিমল আনন্দ প্রদান করিত। এই জন্যই পর্য্যটক প্রবর সকল সময়ে প্রকৃত ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ পান নাই। প্রকৃত পক্ষে, তিনি মনোযোগ সহকারে অনেক বিষয় দেখেন নাই বা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করেন নাই অথবা সন্তোষজনক ভাবে বর্ণনা করেন নাই, এবং সেইজন্য অনেক বর্ণয়িতব্য বিষয় ছিল, যাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

আমাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইউয়ান চুয়াং কেবল বুদ্ধ ও বুদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় জানিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস এবং উৎসাহ, তাঁহার সমসাময়িক লোক সমূহের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়। কেন না, ইউয়ান চুয়াং যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত ছিলেন, যে পদ্ধতি তিনি অধ্যয়ন, সম্মান ও প্রচার করিতেন, সে পদ্ধতির সহিত গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। শেষোক্ত ধর্ম্ম যোগ বা যাদুবিদ্যার ধার ধারিত না। প্রজ্ঞাপরিমিতা অথবা অনিশ্চিত এবং নিষ্ফল দর্শনের সূক্ষ্মানুসন্ধান কিংবা স্বপ্নরাজ্যের কথা বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের নিকট বিচার বা প্রচার করেন নাই। কিন্তু ইউয়ান চুয়াং মৌলিক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে প্রত্যয় স্থাপন করিতে কোন দ্বিধা বা দোষ বোধ করেন নাই। তথাপি হীনযানমতাবলম্বিগণকে তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে মহাযান

পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

ইউয়ান চ্যাংয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার কয়েক জন শিষ্য তাঁহার দর্শন পাইয়াছিল। জীবিতকালে তিনি "বর্ত্তমান শাক্যমুনি" নামে কথিত হইতেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য করিতে থাকেন। একখানি গ্রন্থে তিনি তিনটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং অন্য গ্রন্থে তিনি চীন দেশে চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্ত সম্প্রদায় ইউয়ানচ্যাংয়ের সহাধ্যায়ী শীলভদ্র কর্ত্তৃক নালন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ কথিত আছে।

কোন কোন বৌদ্ধ মন্দিরে আমরা এই পর্য্যটকের মূর্ত্তি দেখিতে পাই ; এগুলিকে পূজা করা হয়। সাধারণতঃ পর্য্যটকপ্রবর ভ্রমণের বেশে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক এবং বাম হস্তে ভিক্ষা পাত্র লইয়া উপবিষ্ট আছেন, মূর্ত্তিগুলি এই ভাবেই গঠিত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

আদর্শ ধনপতি *

(১)

যাহার অর্থের অভাব, তাহার রূপের কোনও প্রয়োজন নাই। ভালবাসা, প্রেম, কবিত্ব সেত ধনীদের জন্য, কাজকর্ম্মহীন বেকার লোকের জীবন নিতান্ত সাদাসিদে গদ্যময় হওয়া উচিত। নিজেকে কিসে সুন্দর দেখাইবে, কিসে দশজনে তাহার সুখ্যাতি করিবে, সে চেষ্টা না করিয়া কিসে দু পয়সা রোজগার করা যায়, সে চেষ্টা করাই তাহার কর্ত্তব্য। সংসারের এই সত্যগুলি আর্ছিনের মাথায় কিছুতেই প্রবেশ করিত না। দেখিতে সে ভারি সুন্দর—চল্ ঢলে ছাঁচে ঢালা মুখখানি, মাথায় ঘনকুঞ্চিত কেশরাজি, নীলকান্তমণির মত চক্ষু দুটি—স্ত্রীপুরুষ সকলের নিকটই সে প্রিয় ছিল। তাহার সব গুণই ছিল, একটি ছাড়া—সেটি অর্থোপার্জ্জনের কৌশল।

পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে সে মাত্র একখানি সে কালের তরবারি ও পঞ্চদশ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি পনিনসুলার (Peninsular) যুদ্ধের ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ! সেগুলিকে তাহার বসিবার ঘরে সযত্নে সাজাইয়া রাখিয়া তাহার বৃদ্ধা খুল্লতাতপত্নীর প্রদত্ত বাৎসরিক দুই শত পাউণ্ডের সাহায্যে সে দিব্য নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিত।

সে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জ্জনের জন্য কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। প্রায় ছয় মাস এক্সচেঞ্জে দালালী করে, কিন্তু সে কার্য্য তাহার মত নিরীহ লোকের জন্য নহে—সে তাহা ছাড়িয়া দিল। তাহার পর চায়ের ব্যবসা আরম্ভ করিল— ছয় মাস না যাইতে যাইতে চায়ের নাম মুখস্থ করিতে করিতে বেচারা অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার পর সে মদের ব্যবসা লইয়া পড়িল, কিন্তু হিতৈষী বন্ধু বান্ধবের শুভ ইচ্ছায় তাহাও টিকিল না। তখন বেচারী কাজকর্ম্মের আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিল।

এইত তাহার অবস্থা'—তাহার উপর সে প্রেমে পড়িয়াছিল। যুবতীর নাম লরা মেট্রন—এক জন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের কন্যা। কর্ণেল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে তিনি তাহার মেজাজ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিপাকশক্তি হারাইয়াছিলেন ; উত্তরকালে দুয়ের কোনটাকেই আর ফিরিয়া পান নাই।

লরা তাহাকে ভালবাসিত ; আরছিন তার জুতার ফিতাটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিত। দুটিতে বেশ মানিয়েছিল ; লোকে

* Oscar Wilde হইতে ভাবানুদিত।

বলাবলি করিত, এরূপ যোড় লণ্ডনের মত সহরেও দুর্ল্ভ।

কর্ণেল তাঁহার কন্যাকে খুবই ভাল বাসিতেন; কিন্তু তাহাদের উভয়ের বিবাহের কথায় একেবারেই কর্ণ-পাত করিতেন না। সে বিষয় প্রস্তাব করিলে কর্ণেল আরস্কিনকে বলিতেন, "আগে দশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন কর, তার পর এ কথা বলিও। তখন ভাবিয়া দেখিব।" যুবক মর্ম্মাহত হইয়া লরার কাছে গিয়া সান্ত্বনা পাইত।

(২)

আরস্কিনের এক সম্ভ্রান্ত বন্ধু ছিল, তাহার নাম এলেন ট্রেভর। সেদিন লরাদের বাড়ী যাইবার পথে সে এক বার তাহার এই বন্ধুটির সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। ট্রেভর তখনকার এক জন বিশিষ্ট প্রতিভা-শালী চিত্রকর। দেখিতে সে অতি রুক্ষমূর্ত্তি, মাথায় একরাশ তামার রঙের চুল, কিন্তু সেই ট্রেভর যখন রং ও তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে দাঁড়াত, তখন তাহার সাথে পাল্লা দেয়, এমন চিত্রকর দেশে ছিল না। তখনকার বাজারে ট্রেভরের ছবির মূল্য খুবই বেশী।

ট্রেভর প্রথম এই তরুণ যুবকের চল্‌চলে মুখখানি দেখিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল; ক্রমে সে আরস্কিনের সরল উদার প্রকৃতিতে ও নিবিড় প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, তাহাকে তাহার ষ্টুডিওতে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিল।

সেদিন তাহার ষ্টুডিওতে প্রবেশ করিয়া আরস্কিন দেখিল, ট্রেভর একটা প্রকাণ্ড প্রমাণ আকারের ভিক্ষুকের চিত্রে শেষ তুলিকাপাত করিতেছে। অদূরে ঘরের এক কোণে একটি মঞ্চের উপর একটি ভিক্ষুক দণ্ডায়মান। জরা এই ভিক্ষুকের উপর আপনার আধিপত্যের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; মুখখানা কোঁকড়ানো পার্চমেণ্ট কাগজের মত ফ্যাকাশে ও রুক্ষ, পরণে একটা ছেড়া ঝরঝরে বাদামি রংএর আলখেল্লা—পায়ে এক জোড়া জুতা, তাও শততালী বিশিষ্ট। ভিক্ষুকের এক হাতে একটা লাঠি, অপর হস্তে একটি টুপি ভিক্ষার জন্য প্রসারিত।

বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া, বসিতে বসিতে আরস্কিন বলিল, "কি আশ্চর্য্য আদর্শ!"

উচ্চ হাস্যে ষ্টুডিও ঘর প্রতিধ্বনিত করিয়া ট্রেভর, বলিল, "আশ্চর্য্যই বটে—এরকম ভিক্ষুক যখন তখন মেলে না; আমার অদৃষ্ট আজ বড় ভাল। রেমব্রাণ্ট এরকম একটা আদর্শ পেলে কি সুন্দর ছবিই না আঁকত।"

আরস্কিন বলিল—"আহা বেচারীর সারা মুখখানায় দুঃখের নিদারুণ কাহিনী ফুটে উঠ্‌ছে। তুমি হয়ত ভাবছ, মুখের ঐ ভাবটার জোরেই সে দু' পয়সা রোজগার করে খায়!"

ট্রেভর বলিল, "তা আর বলতে! যদি তার মুখখানা বেশ পরিপুষ্ট ও হাস্যোজ্জ্বল হয় তা' হলে তার ভিক্ষুকত্ব থাকে কোথায়?"

একটা ডাইভ্যান চেয়ারে আরাম করিয়া বসিয়া আরস্কিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আদর্শের পারিশ্রমিক কি?"

"ঘণ্টায় এক শিলিং!"

"আর তুমি তোমার ছবিখানার জন্য কত পাবে?"

"ওঃ সে অনেক! এই ছবিখানার জন্য দু'হাজার!"

"পাউণ্ড!"

"গিনি, গিনি! কবি, চিত্রকর ও চিকিৎসক এরা কেহ গিনির নীচে কথা ক'ন না, বুঝেছ?"

হাসিতে হাসিতে আরস্কিন বলিল, "আমার মনে হয় তোমাদের উপার্জ্জনের কিছু অংশ এই আদর্শদের দেওয়া উচিত। তারাও প্রায় তোমাদের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করে।"

"পাগল! একলাটি সমস্ত দিন ঘরের ভিতর বদ্ধ হয়ে কাপড়ে রংএর তুলি ঘসা কত সহজ তা'ত জান না আরস্কিন! লোককে বলা খুব সহজ; কিন্তু আমাদেরও এমন সময় আসে যখন মুটে মজুরের মত খাটতে হয়! যাক, আর বেশী বকিও না, আমার অনেক কাজ আছে, নাও লক্ষ্মী ছেলেটির মত চুপটি করে বসে বসে এই সিগারেটটি খাও।"

ট্রেভর একমনে ছবি আঁকিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া জানাইল ফ্রেমওয়ালা একবার ট্রেভরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।

"এখনি আসছি আরস্কিন, পালিয়ো না, বস" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই অবসরে বৃদ্ধ ভিখারী পশ্চাৎস্থিত একটি বেঞ্চে এক বার বসিয়া হাত পা একটু ছড়াইল। তাহার জরা-জীর্ণ দুর্ভিক্ষপীড়িত মুখখানি দেখিয়া আরস্কিনের মনে দয়ার উদয় হইল। সে এক বার হাত দিয়া পকেটস্থিত অর্থের পরিমাণ অনুমান করিয়া লইল। একটা স্বর্ণ ও গোটা কয়েক তাম্র মুদ্রা ছাড়া আর বিশেষ কিছু সেখানে পাওয়া গেল না।

আরস্কিন মনে মনে ভাবিল, "আহা বেচারীর যেরূপ অভাব দেখিতেছি তাহাতে আমার অপেক্ষা উহার এ অর্থের প্রয়োজন বেশী; যদিও এইটুকু স্বার্থ ত্যাগের জন্য আমাকে পনেরো দিন পদব্রজে বেড়াইতে হইবে, গাড়ীর ভাড়া যোগাইতে পারিব না।" পরক্ষণেই সে উঠিয়া গিয়া বৃদ্ধের হাতে স্বর্ণ মুদ্রাটি গুঁজিয়া দিল।

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল, তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দিয়া হাসির একটা ক্ষীণ তরঙ্গ বহিয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!"

এমন সময় ট্রেভর ফিরিয়া আসিল। আরস্কিন নিজের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া পলায়ন করিল।

সেদিন সমস্ত বেলাটা লরার সহিত একত্রে কাটিল, তাহার এইরূপ অযথা অমিতব্যয়িতার জন্য একটু মৃদু মধুর ভর্ৎসনা লাভ করিল এবং অর্থাভাবে সন্ধ্যার পরে পদব্রজে আরস্কিনকে গৃহে ফিরিতে হইল।

(৩)

তখন রাত্রি আন্দাজ ১১॥০ টা। ফিরিবার পথে আরস্কিন এক বার "প্যালেট ক্লাবে" প্রবেশ করিল। ট্রেভর তখন ধূমপান কক্ষে একাকী বসিয়া কিছু পানীয় পান করিতেছিল। তাহার পার্শ্বস্থিত একখানা চেয়ারে বসিয়া চুরুট ধরাইতে ধরাইতে আরস্কিন বলিল, "কি এলেন, তোমার ছবি আঁকা শেষ হল?"

ট্রেভর বলিল, "আঁকা শেষ কি বল, বাঁধানো পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি' ত বড় ভয়ানক লোক হে! সেই যে ভিখারী, যাকে তুমি আজ সকালে আমার ঘরে দেখেছিলে, সে তোমাকে দেখে একেবারে ভুলে গিয়েছে! তুমি যাবার পর সে কেবলই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—তুমি কে? কোথায় থাক? কি কর? তোমার--"

তাহাকে বাধা দিয়া, আরস্কিন বলিয়া উঠিল, "তবেই হয়েছে! নিশ্চয় বাড়ী গিয়ে দেখবো, সে বেচারা কিছু পাবার আশায় দরজার কাছে বসে আছে। আহা তাকে দেখলে আমার বড় দয়া হয়; আমার দ্বারা তার যদি কোনও উপকার হয় তা হলে, আমি তা' এখনি করতে প্রস্তুত! লোকের দুঃখ দারিদ্র্য দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। হ্যাঁ, দেখ আমার অনেকগুলি পুরানো কাপড় পড়ে রয়েছে, তা'র কিছু হয়ত বেচারার কাজে লাগতে পারে। আহা তার পরণের ন্যাকড়া খানা একেবারে ছিঁড়ে ঝল ঝল করছিল!"

উচ্চ হাস্য করিয়া ট্রেভর বলিল, "কিন্তু সেই ছেড়া ন্যাকড়ায় তাকে কি সুন্দর দেখিয়েছিল! আমাকে' ত লক্ষ টাকা দিলেও, আমি তাকে ফ্রক কোট পরিয়ে ছবি আঁকবো না! তুমি যাকে ছেড়া ন্যাকড়া বললে, আমার কাছে তার ভিতরেই সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। যাহোক্ তোমার এই পুরানো কাপড় দেবার প্রস্তাবের কথা তাকে আমি জানাবো।"

আরস্কিন একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "ছিঃ এলেন তোমরা—চিত্রকরেরা বড় হৃদয়হীন।"

ট্রেভর বলিল—"শিল্পীর মাথাই তাহার হৃদয়। আর কি জান, আমাদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে তার ভাল, তার মন্দ, তার বর্ত্তমানে যা দোষ গুণ আছে তাই নিয়ে দেখা, পৃথিবী কি রকম হওয়া উচিত, বা সকলে চেষ্টা করলে কি রকম হতে পারতো তা জানা নয়। যাক্,

ওকথা ; এখন তোমার লরা কেমন আছ বল দেখি ? বৃদ্ধ আদর্শটি ত খুব আগ্রহের সহিত সংবাদ নিচ্ছিল।”

আরস্কিনের মুখ লাল হইয়া উঠিল ; সে বলিল, “সত্য সত্যই কি তুমি তার কাছে লরার গল্প করেছিলে ?”

“নিশ্চয়ই ! সে তোমার সুন্দরী লরা, একগুঁয়ে কর্ণেল, ও তার ১০,০০০ পাউণ্ডের ধনুর্ভঙ্গ পণের সকল কথাই জানে !”

ক্রোধে অধীর হইয়া আরস্কিন বলিল, “তুমি কি-বলে আমার পারিবারিক রহস্য একটা বৃদ্ধ ভিখারীকে বল্‌লে ?”

ঈষৎ হাস্য করিয়া ট্রেভর বলিল, “আহা ! রাগ কর কেন ? তুমি যাকে বৃদ্ধ ভিখারী বলে জান, সে ইয়োরোপের এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। সে যদি ইচ্ছা করে ত আজ এখনই সমস্ত লণ্ডন সহরটা কিনে ফেলতে পারে, ব্যাঙ্কে তার এত টাকা জমা আছে। ইয়োরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে তার বাড়ী আছে, সোনার থালায় সে নিত্য ভোজন করে এবং তার এমন ক্ষমতা আছে যে, সে মনে করলে এখনি রাশিয়ার অন্য সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধোদ্যম বন্ধ করতে পারে।”

আরস্কিন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল ; সবিস্ময়ে বলিল, “তার মানে ?”

“ঠিক যা বল্‌লাম্‌ ! আজ যে বৃদ্ধটিকে আমার ঘরে দেখেছ, তাঁর নাম ব্যারণ হ্যান্‌স্‌বার্গ ! তিনি আমার এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। আমার আঁকা প্রায় সব ছবিই তিনি কেনেন ; আজ প্রায় মাস খানেক হ’ল তিনি ভিখারী বেশে তার এক খানা ছবি আঁকতে আমাকে ভার দেন। কিন্তু, এ কথা স্বীকার করতেই হবে তাঁকে তাঁর সেই ছেড়া পোষাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল ! তাঁর ছেড়া কাপড়ই বা বলি কেন ? সেটা আমারই, সেবারে স্পেন থেকে আমি সেটা এনেছিলাম।”

“ব্যারণ হ্যান্‌স্‌বার্গ (Baron Hansberg) ! বল কি ? আমি যে সত্য সত্যই ভিখারী মনে করে তাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছি !” আরস্কিন আর বলিতে পারিল না, হতাস হইয়া সে একটি আরাম চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

উচ্চ হাস্য করিয়া ট্রেভর বলিল, “বল কি ? তাঁকে একটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলে ! বেশ ; কিন্তু মনে থাকে, যেন সেটি আর ফিরে পাচ্ছ না।”

একটু অনুযোগপূর্ণ স্বরে আরস্কিন বলিল, “কিন্তু এলেন, এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল ; এরকম করে আমাকে বোকা বানানো তোমার উচিত হয়নি।”

ট্রেভর বলিল, “প্রথমতঃ, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি তুমি আজকাল এই রকম করে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করে দুহাতে দান করছো। যদি আমার ষ্টুডিওতে কোনও সুন্দরী রমণী—আদর্শকে তুমি চুম্বন করতে তাহ’লে তার মানে বুঝা যেত, কিন্তু একটি কদাকার দরিদ্র ভিক্ষুকে দেখে তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার কোনও সদর্থই পাওয়া যায় না। তা’ছাড়া, আমি সে সময়ে বাহিরের কাহারও সহিত দেখা করতে প্রস্তুত ছিলাম না ; তার পর তুমি যখন এলে, তখন, হয়ত ব্যারণ সেটা পছন্দ করবেন না, এই ভেবেই তাঁর পরিচয় তখন তোমাকে দিই নি ; জানই ত তখন তিনি কি রকম পোষাক পরেছিলেন।”

“ছি, ছি, তিনি নিশ্চয়ই আমকে পাগল ভেবেছেন।”

“মোটেই না। তুমি চলে যাওয়ার পর তাঁর মেজাজটা ভারি সুন্দর ছিল। মনের আনন্দে তিনি থেকে থেকে কেবলই নিজের শীর্ণ হাত দুখানা রগড়াচ্ছিলেন। তখনো আমি বুঝতে পারি নি তোমার সম্বন্ধে খোঁজ নেবার তার এত আগ্রহ কেন ? এখন বুঝতে পারছি। ভয় কি আরস্কিন—তিনি তোমার টাকাটি খাটিয়ে ছ’মাস অন্তর ঠিক তোমার সুদটি পাঠিয়ে দিবেন, আর মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়ার পর বন্ধু বান্ধবের কাছে তোমার এই অসীম দয়া ও দানশীলতার আখ্যানটি বলে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করবেন !”

হতাস হইয়া আরস্কিন বলিল, “থাক্‌, কি করবো বল সবই অদৃষ্ট ! কিন্তু এলেন এ সম্বন্ধে কাকেও কিছু

বলো না, লক্ষীটি, বুঝেছ? ছি, ছি, তা হলে কাকেও আর মুখ দেখাতে পারবো না।"

"আরে পাগল, এতে আর লজ্জা কি? এতো তোমার দয়া প্রবৃত্তির পরিচায়ক মাত্র। আরে বসো, পালিয়ো না। এই, নাও আর একটা চুরুট খাও; হ্যাঁ, তোমার লরার দু চা'রটি খবর দাও?"

কিন্তু আরস্কিনকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা গেল না। নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়ে সে চলিয়া গেল; ট্রেভর বসিয়া বসিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল।

(৪)

পর দিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় ভৃত্য আসিয়া তাহাকে একখানি কার্ড দিয়া গেল, তাহাতে লেখা—

"মিঃ গাষ্টেভ নডিন, (Gustave Naudin)
ব্যারণ হ্যান্‌স্‌বার্গের নিকট হইতে।"

ভদ্রলোকটিকে উপরে আনিতে বলিয়া আরস্কিন ভাবিল, "বোধ হয় ব্যারণের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করতে এসেছে?"

ক্ষণপরেই, এক জন পক্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধ—তাহার চক্ষে সোনার চসমা, কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটু ফরাসী উচ্চারণের সহিত বলিল,

"নমস্কার, বোধ হয় আপনার নামই মিঃ আরস্কিন?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"আমি ব্যারণ হ্যান্‌স্‌বার্গের নিকট হইতে আসিতেছি; তিনি—"

তাঁহাকে বাধা দিয়া আরস্কিন শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি দয়া করিয়া ব্যারণ সাহেবকে জানাইবেন, আমার কল্যকার ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত; তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মার্জ্জনা করেন।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "ব্যারণ সাহেব আপনাকে এই পত্রখানি দেবার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন।" বৃদ্ধ একখানি শীলমোহর করা চিঠি আরস্কিনকে প্রদান করিল।

বিস্মিত হইয়া আরস্কিন দেখিল চিঠির বহিরাবরণের উপর লেখা "আরস্কিন ও লরা মার্টনের বিবাহোপলক্ষে প্রীতি উপহার—এক জনবৃদ্ধ ভিক্ষুক।" আর ভিতরে ১০,০০০ দশ হাজার পাউণ্ডের এক খানি চেক্!

* * * * * * * * * * *

তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল; সে বিবাহে এলেন ট্রেভর মিৎ-বর (bestman) হইলেন আর বিবাহের পরবর্ত্তী আনন্দ ভোজে ব্যারণ সাহেব বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বক্তৃতা করিলেন।

উভয়ের বন্ধু চিত্রকর এলেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "চিত্রকরের ক্রোরপতি আদর্শ সাধারনতঃ দুর্ল্লভ, কিন্তু তাহারও অপেক্ষা সুদুর্ল্লভ ব্যারণের মত আদর্শ ক্রোরপতি!"

শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ।

শ্মশানের পাশে

চুপ কর নদি! বরষা-চঞ্চল, যেয়ো না এমন
নিঠুর হেসে,
এই তো শ্মশান, এখানে দাঁড়াও, ওই যে নিবান
চিতার পাশে!
এখানের তারা, মেঘজালে ঢাকা,—ব্যথাভরা তার
মধুর দিঠি,
কত আঁখি-জল, বন ফুল হয়ে, চিতারে ঘেরিয়া
উঠেছে ফুটি!
বুল্ বুল্ গাছে চুপ করে যায়,—মূলে ঝরি পড়ে
বকুল রাশি,
ঘোমটা টানিয়া, পাণ্ডুর বদনে, চমকি দাঁড়ায়
অমিয়-শশী!
ঢেউয়ের চূড়ায়, মুকুতা গুচ্ছ বাঁধিয়া, তটিনি:
হাসিয়া যাও—
দুখের মাঝারে যে পড়েছে ঘুমে, তার কাছে শুধু
কথা না কও!

তীর্থরাজ সবে মিলেছে নীরবে, বন-তরু-ঘেরা
শ্মশান-বুকে,—
সুখ দুখ দোঁহে মিলিয়া মরণে কাব্য মহান্
রেখেছে লিখে!
সে কাব্যের মাঝে, কবিতা একটি, হৃদয় ভুলানো
কাহিনী তার,
লেখা আছে তায়, কোন চাতকীর পিপাসা মেটেনি
সাগর-পার!
সেই তো কবিতা, যে ফুলের কুঁড়ি পায় না ফুটিতে
শিশির-বাতে,—
গন্ধ-লেখা যার, স্বপনে মিলায়, কুহেলিজড়িত
চাঁদিনি রাতে!
হাসি তার ছিল পাণ্ডুর অতি, কণ্ঠ অশ্রু ভরা
নয়ন কালো,
প্রাণ সঁপি এক শঠের ছলায়, তবু তারে নারী
বাসিত ভালো!
চির বিদায়ের ছন্দে লেখা তারি পরিণামখানি
শ্মশান কূলে—
শান্তি কহে, নদি! কথা কও ধীরে, ঘুমটি তাহার
ভেঙ্গো না ভুলে!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা

বিদ্যামন্দিরে অনুপ্রাস

বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি বিদ্যা-মন্দিরে বিরাজিতা দেবী; অতএব বিদ্যার আদান-প্রদান বা আধুনিক কালের ক্রয়বিক্রয়-বাণিজ্যব্যাপারে অনুপ্রাস অনায়াসলভ্য হওয়াই উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে অনুপ্রাসের অবারিত অধিকার।

পাঠশালার পড়ুয়ার পাততাড়ীতে, বেতহাতে গুরু-মহাশয়ের ছেলে-লেখানতে, কাগের ছা বগের ছা বা হিজি-বিজি বা হিজিবিজি লেখায়, কোদালে 'ক'এ, অাঁকুরে 'ক'এ, আনাগোনা 'ঘ'এ, বেগুনবীচি 'চ'এ, কাঁকে কলসী 'ঝ'এ, হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ'এ, পেটকাটা 'ষ'এ, হলহলে 'হ'এ, 'ক'এ করাত 'খ'এ খরগোস প্রভৃতি প্রাচীন কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে, অনুপ্রাস গজ্ গজ্ করিতেছে। শিশুশিক্ষাকালে 'অবুতবু (অবতু বো) গিরিসুতা, মায়ে বলে পড় পুতা' 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই' ইত্যাদি স্তোকবাক্যে অনুপ্রাসের খর নজর আছে। কালী কলম কাগজে, কালী কলম মনে, লালনীল পেন্‌শিলে, ফাউন্টেন পেনে, অনু-প্রাসের অাঁচড় আছে। না-প'ড়ে পণ্ডিতও অনুপ্রাসের খাতির রাখেন। ঠেকে শেখা ও দেখে শেখা—উভয়ই অনুপ্রাসের অনুগ্রহে।

'কমারশ্যাল' কলেজ বা বাণিজ্যবিদ্যালয়ে, কৃষি-কলেজ, কারিগরি-কলেজ, বয়ন-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান-বিদ্যালয়,হাতে-হেতেড়ে শিক্ষা, সায়ান্স এসোসিয়েশন, কিণ্ডারগার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, সাধারণশিক্ষা, শিশু-শিক্ষা, প্রতিযোগিপরীক্ষা, ব্রাহ্ম বয়েস্ বোর্ডিং, ডেফ্ এণ্ড ডম্ স্কুল, প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা, কবীন্দ্র কলেজ, বারাণসী বেদ-বিদ্যালয়, বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়—সর্ব্বত্রই অনুপ্রাস। মেডিক্যাল কলেজের মাঝখানে অনু-প্রাস উঁকি মারিতেছেন, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল, ন্যাশন্যাল কাউন্‌সিল্ ও মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউশানের পশ্চাতে অনুপ্রাস লাগিয়া আছেন। মাষ্টার মশায়, প্রাইভেট টিউটর, সেকালের জুনিয়র সিনিয়র স্কলার, হেয়ার-হিন্দু, হেয়ার স্কুলের পূর্ব্বপরিচয় স্কুল-সোসাইটীর স্কুল,—অনুপ্রাসই এ সকলের মূল। বড়দিনের বন্ধ, শেষ শনিবারে ছুটি, অনু-প্রাসের যোগাযোগে। এল্ এ ফেলের মাষ্টারী করিতে করিতে মোক্তারী পড়া অনুপ্রাসেরই অনুরোধ।

স্ত্রীশিক্ষায়, বালিকা বিদ্যালয়ে, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যা-লয়ে, বীটুন বালিকা বিদ্যালয়ে,প্রথম প্রতিষ্ঠান প্যারীচরণ সরকারের বারাসত বালিকা-বিদ্যালয় ও চোর-বাগান বালিকা-বিদ্যালয়ে, মাতাজী মহারাণীর মহাকালী পাঠ-শালায়, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ', এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাসের শুভ অবসর রহিয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষায়, বিদ্যাবিনোদিনী সভায়, বঙ্গবিবুধ-জননী সভায়, বর্দ্ধমান বিজয়কেন্দ্রে, আর্য্যশিক্ষা সমিতিতে, সংস্কৃতসঞ্জীবন সমাজে, সংস্কৃত-সঞ্জীবনী সভায়, সংস্কৃত সমিতিতে, সম্মিলনী সভায়, সারস্বত সমিতিতে, সারস্বত সম্মিলনে, সারস্বত সমাজে, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস সুপ্রকাশ। টোল চৌপাঠীর উপাধিতেও অনুপ্রাসের উপরোধ উপেক্ষিত হয় না। যথা—কাব্যকণ্ঠ, তর্কতীর্থ, ভক্তিভূষণ, ভাগবত ভূষণ, বাণীবিনোদ, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবিশারদ, বিদ্বদ্‌বল্লভ, বেদবিদাংবর, বেদান্তবাগীশ, বেদান্তবাচস্পতি বা চঞ্চু, বেদান্তরত্ন, সাংখ্যসাগর, সাহিত্যসরস্বতী, সিদ্ধান্তসাগর সিদ্ধান্তশিরোমণি—অনুপ্রাস সকলেরই মাথার মণি। ফল কথা, স্মার্ত্তশিরোমণিই বলুন আর বিদ্যাদিগ্‌গজই বলুন, মহামহোপাধ্যায়ই বলুন আর পোলিটিক্যাল পণ্ডিতই বলুন, কেহই অনুপ্রাসের অতীত নহেন।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্পস্ ক্রিষ্টি কলেজ, সিডনি-সাসেক্স কলেজ, ক্লেয়ার কলেজ কেমব্রিজ, ট্রিনিটি টার্ম সমার সেমেষ্টার (জার্ম্মান), পিট প্রেস সিরিস, হোরেস হার্ট, ক্রেভন্ ক্লাসিক্যাল স্কলারসিপ, সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার -সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের বাহার।

স্কুল কলেজের খেলাধূলায় আমোদপ্রমোদেও অনুপ্রাস উঁকিঝুঁকি মারেন। যথা—কলেজ ক্রিকেট ক্লাব, প্রেসিডেন্সী স্পোর্টস্, দীননাথ ও বঙ্কিমবিহারী সেন শীল্ড্ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অনুপ্রাস জল্ জল্ করিতেছে। বালকবাসের বোর্ডিং ব্যবস্থায়ও অনুপ্রাসের হাত আছে; যথা, হিন্দু-হোষ্টেল, ডান্‌ডাস্ হোষ্টেল।

মাধব বাবুর বাজারের ধারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রাসের হাট জমজমাট। শিক্ষা ও পরীক্ষা, বিধিব্যবস্থা, পরীক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র, প্রশংসাপত্র, পদক প্রাইজ পারিতোষিক পুরস্কার, স্কুল-কলেজ, সেকসান, পেপার-সেটার, ল লেকচার, মুট্ কোর্ট, রীডার, Rules & Regulations, Senate & Syndicate, Subjects & Syllabus, Curriculum, Tabulator & Moderator, Keys Cribs & Cram-books, Subscription & Donation, Fees & Fines, I. A., B. A., M.A., I. Sc, B. Sc., M. Sc., Ph. D, D. Sc, B. L, M. L., D. L, মামুলি এল এল ইত্যাদি উপাধিধারী—সর্ব্ব ঘটে অনুপ্রাস। General Geography, Mixed Mathematics, পুরাতন ব্যবস্থার Sanitary Science প্রভৃতি বিষয়নির্দ্দেশেও অনুপ্রাস। History & Economics এ অনুপ্রাসের অভাব দেখিয়া হাল আইনে Economics & Politics এ যোড় মিলান হইয়াছে। Entrance Examination বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুন্দর অনুপ্রাস ছিল; নূতন নাম Matriculation Examination এও আছে, তবে পুচ্ছদেশে জবড়জঙ্গ গোছের।

প্যাচেটি প্রাইজ, মতিলাল মল্লিক মেডাল, ষ্টিফেন ফিনি মেডাল, সংস্কৃতে সোনামণি মেডাল, মোহিনীমোহন মিত্র রৌপ্যপদক, এম্ বিতে ম্যাকলাউড্ মেডাল, ম্যাথাম্যাটিক্সে ম্যাক্‌কান্ মেডাল, এবং ছাত্রজীবনের সেরা সম্মান (blue ribbon) মাউয়াট মেডাল ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিতে অনুপ্রাসেরই অনুবৃত্তি। অনুপ্রাস-প্রবণ ম্যাথাম্যাটিক্সে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী দুই দুই জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে 'নমিনেশান' পাইয়াছেন, ইহাতেও অনুপ্রাসের জয়জয়কার। অনুপ্রাসের অনুগ্রহে, প্রথম বাঙ্গালী প্রোফেসার প্রেসিডেন্সীতে প্যারীচরণ সরকার, প্রথম বাঙ্গালী কলেজ মেট্রপলিট্যান্ ইনষ্টিটিউশ্যান্। সিটিকলেজ ও সেন্‌ট্রাল কলেজেও ইংরাজীতে অক্ষরগত অনুপ্রাস আছে। অনুপ্রাসের অনুরোধে বহরমপুর কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজ হইয়াছে, গৌহাটী কলেজ কটন কলেজ হইয়াছে, ও ময়মনসিংহে কলেজের নামে আনন্দ-মোহনের স্মৃতি সম্মানিত হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বয়োবৃদ্ধি ও পরিশ্রম-প্রযুক্ত পরীক্ষা-পাশে কৃতকার্য্যতা বা সসম্মানে উত্তরণ অনুপ্রাসের পোষক প্রমাণ নহে কি? অনুপ্রাসের অনুসারেই প্রথম বিভাগে পাশের পরিমাণ বাড়িয়াছে কি না (বিশেষতঃ

প্রবেশিকা পরীক্ষায়) কে জানে? বাড়াবাড়ি দেখিয়া পরীক্ষা-পাশে প্রতিভার পরিমাপ বা বিদ্যার বহর বিচার হয় না এই অজুহতে কেহ কেহ পরীক্ষাপাশ পণ্ডশ্রম ও উপাধি ব্যাধি বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছল্য করেন। তাঁহাদিগকে অনুপ্রাসে অনুরক্ত ভবভূতির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে,—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভসাধনাকল্পে নবনিযুক্ত শিক্ষাসচিব ও সহকারী শিক্ষাসচিব অনুপ্রাসের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন। সে যাহাই হউক, আমরা হীনপ্রাণ, হোমরা চোমরা সাহেব-সুবার ধার ধারি না। অস্মদাদির অদৃষ্টের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—অক্লান্তকর্ম্মা অন্বর্থনামা ডবল ডাক্তার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের সারসর্ব্বস্ব স্যার শ্রীআশুতোষ সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, ডি এল, ডি এস্ সি,এফ আর এ এস, এফ আর এস ই. ৭৭ রসা রোডে রহিয়াছেন। ইতি

বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা। } শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যু (১)

সোনার বাঙ্গলার এ সুখৈশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি গৌরবের কথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রবাদের মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নীলাম্বুতরঙ্গবিক্ষুব্ধ করিয়া পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য-তরণি এদেশে আগমন করে। তৎকালে সুদূর ভারতে আগমন করিতে কত বীরহৃদয়ই না কম্পিত হইত। কিন্তু অদৃষ্টনেমীর আশ্চর্য্য আবর্ত্তনে মুষ্টিমেয় পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যব্যপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া যে ভীষণ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলেও শরীর আতঙ্কে কণ্টকাকীর্ণ হয়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজ ও আরাকানবাসী মগ এই দুইটি বিদেশীয় জাতি দ্বারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা কখনও সম্মিলিত ভাবে এবং কখনও বা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের অত্যাচার সে সময়ে কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে ঃ—

"মহেশ সেনজাভর্ত্তু গোপীনাথাৎ সুতো হভবৎ।
চাটীগ্রাম মসৌ নীতো বলাস্মগচমূচরৈঃ" ॥

অর্থাৎ, মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্রকে মগেরা বলপূর্ব্বক চট্টগ্রামে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই ঐ বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়।

এই নরপিশাচ দস্যুগণ যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূল বিভাগেই আতঙ্কস্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে; উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক উহারা পদ্মা, মেঘনাদ, কালীগঙ্গা ও তাহাদের খাড়ির মধ্যে পরিক্রমণ করিয়া জনসাধারণের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিত। "বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত" ও ডানভারের "পর্ত্তুগীজ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উহাদের অধিকাংশই নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত ও পাপানুষ্ঠান-পরায়ণ হওয়ায় গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালক্কা ও পূর্ব্বোপদ্বীপের পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হয়। যাহারা দস্যু ও বদমায়েস তাহারাই বঙ্গদেশে আসিয়া দলবদ্ধ হইত। চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তিই উহাদের প্রধান সম্বল ছিল। নৌচালনবিদ্যায় পারদর্শী থাকায়, ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করিয়া উহারা বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে এবং কখনও কখনও মেঘনাদ. পদ্মা প্রভৃতি নদীতে প্রবেশ করিয়া তীরবর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিত। স্ত্রীপুরুষদিগকে ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, অবশিষ্ট দাস ভাবে রাখিয়া দিত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্য্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত, যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া দাস

(১) ১৩১৮ সনের ১৮ই আশ্বিন দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য-সম্মলনে পঠিত।

রূপে বিক্রয় করিত, অথবা স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে অথবা অন্য কোনও পর্ব্বোপলক্ষে যখনই লোক-সমাগম হইত, তখন তাহারা অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসংঘের উপর পতিত হইত, এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিত। ইহাদের নৈতিক অধঃপতন এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সমগ্র ভারতের পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ অন্বেষণ করিলেও একখানা বাইবেল পাওয়া যাইত না। ফলতঃ ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারে বহু জনপদ ভস্মসাৎ ও লোকহীন হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্র-তীরস্থ অধিকাংশ অধিবাসীরাই হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদসকল বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন পর্ত্তুগীজগণের অঙ্কিত মানচিত্রে সুন্দরবনের অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরের নাম পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ সমুদয় স্থান ভীষণ অরণ্যানী-সঙ্কুল হিংস্র জন্তুর আবাসস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোনওরূপ সংক্রামক রোগের প্রকোপে অথবা অন্য কোনও দুর্ঘটনায় ঐ সমুদয় স্থানের অধিবাসিবৃন্দ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবল বন্যায় প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কালকবলিত হওয়ায় জনহীনতার মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। মিঃ গ্রাণ্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষা প্রবল।" মেজর রেণেলের বাঙ্গলার মানচিত্রে অনেকগুলি জেলা "মগদিগের অত্যাচারে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে" বলিয়া চিহ্নিত আছে।

তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নর-পিশাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই তত্রত্য অধিবাসিগণ জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ মগে-তিলি, মগে-কামার, মগে-কুমার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে "সূর্য্য দীঘালি" প্রাচীন পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মগাই পুকুর বলিয়া পরিচিত। (১)

মোগল কুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়েই এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়; এজন্য তিনি সাহাবাজ নামক এক জন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলনব্যপদেশে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ মেঘনাদের মোহানায় সেনা সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় নামানুসারে ঐ স্থানকে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন। সাহাবাজ ১৫৮৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৮৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া মগও পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সন্দ্বীপের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরারাজ, আরাকানরাজ, পর্ত্তুগীজ, মোগল এবং কেদার রায়ের সঙ্গে সর্ব্বদা সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। এই সময়ে পর্ত্তুগীজগণ সন্দ্বীপে আপনাদিগের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়ের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পর্ত্তুগীজেরা তাহাকেই সন্দ্বীপের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। কেদার রায় পর্ত্তুগীজদিগকে হস্তগত করিবার জন্য সন্দ্বীপের শাসনভার কার্ভালোর হস্তে অর্পণ করেন।

এই সময়ে মোগলগণের লুলোপ দৃষ্টি সন্দ্বীপের উপর নিপতিত হইল। মোগলেরা অসংখ্য রণতরী সহ সন্দ্বীপের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলে। কার্ভালো অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মাটুস চারি শত সেনা লইয়া সন্দ্বীপে উপনীত হন। ফিরিঙ্গী ও

(১) আমাদিগের বিবেচনায় এই সমুদয় দীর্ঘিকা মোসলমান আমলে খনিত হইয়াছিল, পরে মগদিগের সংস্রব হেতু মগাই পুকুর বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে।

মোগলের জল-যুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মোগলগণ অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু ফিরিঙ্গীর গোলার নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ফলে, তাহারা অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সন্দ্বীপ কার্ভালো ও মাটুসের হস্তে পতিত হইল।

এই সময়ে সেলিম সা আরাকানের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। অনেক পর্ত্তুগীজ তাহার অধীনে অবস্থিতি করিল, কিন্তু ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করে। উহাদের মধ্যে ফিলিপ্ ডি ব্রিটো প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্ত্তুগীজ-প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া সেলিম সা তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি দেড় শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান-সজ্জিত বৃহৎ রণতরী সন্দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। কার্ভালো এই সংবাদ কেদার রায়ের নিকট পাঠাইলে, তিনি স্বীয় এক শত কামান ও বন্দুক সজ্জিত "কোষা" নৌকা তাহার সাহায্যার্থ শ্রীপুর হইতে সন্দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত সেই নৌ-বাহিনী পদ্মা ও মেঘনাদের উত্তালতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ করিয়া সন্দ্বীপে উপনীত হইল। বাঙ্গালী ও পর্ট্তুগীজের সহিত মগদিগের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বন্দুক ও কামানের গর্জ্জনে নীলাম্বুরাশি মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইল। মগেরা অবশেষে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ভালোর হস্তে পতিত হইল।

যে সময়ে কার্ভালোর সহিত সেলিম সার সৈন্যগণের জলযুদ্ধ হইতেছিল, ব্রিটো সেই অবসরে আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। সেলিম সা পর্ত্তুগীজদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্ব্বার এক সহস্র রণতরী প্রেরণ করিলেন। রণতরী-সমূহ তোপধ্বনি করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের উর্ম্মিমালা চুম্বন করিয়া সন্দ্বীপে উপনীত হইল। কার্ভালো তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বীয় পর্ত্তুগীজ সৈন্য ও কেদার রায়ের প্রেরিত বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে আপন আপন রণতরীতে সজ্জিত করিয়া বিপুল উদ্যমে সেই বিরাট নৌ-বাহিনীর সহিত অগ্নিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাহাদের রণকৌশলে মগদিগের রণতরী সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশি মধ্যে সলিলশায়ী হইল, কতকগুলি কামান ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল, অবশিষ্টগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মগদিগের প্রায় দুই সহস্র সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়।

কার্ভালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহার রণতরী সমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তিনি আবার নৌ-বহর গঠনের জন্য শ্রীপুরে আগমন করেন। শ্রীপুর, বাকলা, ও সাগর দ্বীপে তাহার রণতরী-সমূহের সংস্কার ও নূতন রণতরীর নির্ম্মাণ হইতে লাগিল।

বারভূঞাগণের সহিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায় মগ ও পর্ত্তুগীজগণ প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। এই সময়ে ঢাকাতে রাজধানী সংস্থাপিত হইলেও উহাদের অত্যাচার-স্রোত প্রশমিত হইয়াছিল না। সমরকুশল ইসলাম খাঁ সন্দ্বীপের যুদ্ধে আরাকান ও মগদিগের সম্মিলিত শক্তি বিধ্বস্ত করিলেও উহারা তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা কাসেম খাঁর সময়ে মোগলশাসিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে থাকে। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গও মগদিগের উপদ্রব হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। "উহাদের অত্যাচারের কবল হইতে ঢাকা নগরীকে রক্ষা করিতে পারিলেই বঙ্গের সুবাদারের কর্ত্তব্য শেষ হইত বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। এতদুদ্দেশ্যে ঢাকার নালাটিকে লৌহশৃঙ্খলিত করিয়া বংশ নির্ম্মিত সেতু দ্বারা উহাদের আগমন পথ আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।"

"নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের যে শাখা শিতললক্ষ্যা নামে

অভিহিত হইয়া খিজিরপুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, মগ দস্যুগণ বর্ষাপ্রভাতে ঐ পথ দিয়াই ঢাকা নগরীর দিকে অগ্রসর হইত। বাঙ্গলার সুবাদার উহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিলেই খিজির-পুরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতেন। শীত ঋতুর শেষে ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে কালক্রমে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় উহারা এই পথে ঢাকাতে আসিতে পারিত না। সুতরাং তাহারা ফরিদপুর ও যাত্রাপুরের পথ দিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিত।"

"চট্টগ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে ভুলুয়া ও বাম দিকে সন্দ্বীপ রাখিয়া উহারা একেবারে সংগ্রামগড়ে উপনীত হইত।" ফরিদপুরের ইতিহাস ও বিভারিজের বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গাঙ্কিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীতীরে সংগ্রামগড় বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটি মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। সগ্রামসাহ মগদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ এই স্থানে একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নৌ-বহর সংস্থাপন করিলে মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের বঙ্গদেশে প্রবেশের পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যেই এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয় কালে এই স্থানে প্রায় শতাধিক রণতরীর বহর রাখিয়াছিলেন।"

বঙ্গদেশে মোগল পতাকা প্রোথিত হইবার পরে মগেরা বিপুল বিক্রমে তিন বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করে।* (১) মহব্বৎ খাঁর পুত্র নবাব খানজাদ খাঁর সুবাদারী আমলে মগেরা ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল। মগী সৈন্যের তাণ্ডব নৃত্যে ঢাকা সহর টলটলায়মান হয়। উহারা নগর ভস্মসাৎ করিয়া ধনরাশি লুণ্ঠন ও আবালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে বহুলোক বন্দী করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে চলিয়া যায়। (২) নবাব আবদাস সালামের (ইসলাম খাঁ মেসেদী) সময়ে আরাকানরাজ সেলিম সার মৃত্যু ঘটে। সেলিম সার জনৈক কর্ম্মচারীর পুত্র এই সময়ে পরাক্রান্ত হইয়া রাজ সিংহাসন অধিকার করে। মৃত আরাকানরাজ সেলিম সার ভ্রাতা ধরম সা ১২টি হস্তী এবং তদীয় পরিবারবর্গ ও চারি পাঁচ সহস্র অনুচরবর্গ সহ ভুলুয়ায় মোগল ফৌজ-দারের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে নবাব ইসলাম খাঁ মেসেদীর নিকট স্থলপথে ঢাকা নগরীতে প্রেরণ করেন। ভুলুয়াতে স্থান প্রদান করিতে মোগল ফৌজের সাহসে কুলাইল না।

প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যাপহারক দস্যু ধরম সার উদ্দেশে আরাকান নৌবাহিনী প্রেরণ করিল। তাহারা খিজিরপুরে উপনীত হইলে ধরম সা প্রাণে প্রাণে লক্ষ্যা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা নগরীতে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে ইসলাম খাঁ অধিকাংশ রণপোত ও মোগল সৈন্য আসাম অভিযানে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, সুতরাং মগদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি "নল খাগরা এবং বংশ খণ্ড দ্বারা ঢাকার নালার (বুড়িগঙ্গার) নানা স্থানে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া মগ-বাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করেন। মহালদর খাঁ দ'রয়াবাদীকে বহু সৈন্য সহ ধাপাতে মগদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রেরণ করেন। ধরম সা ঢাকা নগরীতে পৌঁছিয়াছে শ্রবণ করিয়া মগেরা খিজিরপুরে এক দিন অপেক্ষা করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের শাখায় নবাবের উদ্দেশে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া যায়। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমাদের রাজ্যের পলাতককে ধৃত করিবার জন্যই আমাদের

* প্রবাদ এই যে, নবাব খানজাদ খাঁ এইরূপ ভীরুস্বভাব ছিলেন যে, তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতে সাহস করিতেন না। মোল্লা মুরসিদ ও হাকিম হায়দরকে ঢাকার তদীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজমহলে অবস্থান করিতেন। মগেরা সসৈন্যে ঢাকাতে আগমন করিলে প্রতিনিধিদ্বয় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছেন, "মগের সহিত যুদ্ধ করা মোল্লা ও হাকিমের কর্ম্ম নয়।"

রাজা আদেশ করিয়াছিলেন। মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অথবা মোগল-শাসিত স্থান উপক্রুত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ঢাকা নগরীতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং আমরা রাজার অনুমতির অপেক্ষায় স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিলাম। যদি তিনি যুদ্ধ করাই সমীচীন জ্ঞান করিয়া অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমরা আগামী বৎসরে আসিয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিব।"

অনতিকাল পরে ইসলাম খাঁ দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করায় ধরম সার সাহায্য করিতে পারেন নাই। ধরম সা ও তদীয় অনুচরদিগকে "মগবাজারে" প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। ক্রমে মগদিগের নামানুসারে এই স্থানের নাম "মগবাজার" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে। ধরম সার ভরণপোষণ জন্য খালসা জমী হইতে দৈনিক বৃত্তির বন্দোবস্ত ছিল। ধরম সার মৃত্যুর পরে তদীয় তিন পুত্র মোগল সরকারে চাকুরীজীবী হইয়া প্রবেশ লাভ করে। (৩) সুলতান সুজা ঔরংজেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঢাকা নগরীতে আগমন করিলে, তদীয় পুত্র জৈনউদ্দিন মোহম্মদ আরাকানরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। আরাকানরাজ সুলতান সুজার সাহায্যার্থ তিন শত রণতরী ঢাকাতে প্রেরণ করেন। জমিদার মানোয়ার খাঁ সুজার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, উহারা মানোয়ার খাঁর সহিতই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এবারে তাহারা ঢাকা নগরীতে কোনও প্রকার উৎপাত করে নাই। ঢাকা ছাড়াইয়া ৪।৫ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আরাকান নৌ-বহর ঢাকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং পরাজিত সুজাকে তদীয় পরিবারবর্গ সহ আরাকান রাজ্যে লইয়া যায়।

আসাম অভিযানের প্রাক্‌কালে নবাব মীরজুমলা হাজিগঞ্জ, বন্দর ও ইদ্রাকপুরের (মুন্সীগঞ্জ) কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এই কয়টি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নওয়ারার সংস্কার সাধন করে ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিয়া এই তিন স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

মীরজুমলার আসাম অবস্থান কালে এহিতিসিম খাঁ তদীয় প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে এহিতিসিম খাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। রায় ভগবতী দাসের প্রতি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। এহিতিসিমের পালকপুত্র সয়রাবের সর্দ্দার (নওয়ারার সর্দ্দার) পদে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। মগ দস্যুগণ মীরজুমলার অনুপস্থিতির সুযোগে পুনরায় বিক্রমপুর ও যাত্রাপুর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, এবং এহিতিসিমের পালকপুত্রকে বন্দী করিয়া খিজিরপুর অভিমুখে প্রস্থান করে।

খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলীর অনন্তরবংশ্য মানোয়ার খাঁ, সাহসুজা, মীরজুমলা ও সায়েস্তা খাঁর সময়ে সয়রাবের সর্দ্দার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অসীম সাহসী ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে তিনি মগদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কতিপয় রণতরী সহ বাগদিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মীরজুমলার আসাম অভিযানের ফলে বাঙ্গলায় নওয়ারা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সুতরাং মগেরা অতি সহজেই মানোয়ার খাঁকে পরাজিত করতঃ সোণারগাঁও ও বিক্রমপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া বিনা বাধায় অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকে।

মীরজুমলার মৃত্যুর পরে নবাব সায়েস্তা খাঁর পুত্র আকিদাদ খাঁ ঢাকার ফৌজদারপদে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি নওয়ারার সর্দ্দার মীরাক সুলতান ও ফরহাদ খাঁকে ঢাকার সন্নিহিত ধাপাতে (১) নৌবহর সহ প্রেরণ করেন,

(১) রেণেলের ম্যাপে এই স্থান "দাপেকা কেল্লা" বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। মিঃ পিটারসনের রিপোর্টে এই স্থানের বিপরীত দিকে বুড়ীগঙ্গার অপর তীরেও একটি দুর্গ ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থান এক্ষণে বুড়ীগঙ্গার কুক্ষিগত হইয়াছে। বর্ত্তমান ফতুল্লার সন্নিকটেই ধাপার কেল্লা অবস্থিত ছিল।

এবং এহিতিসিম খাঁকে খিজিরপুর ও রাজা ইন্দ্রমনকে ইদ্রাকপুরের কেল্লা রক্ষার্থে নিযুক্ত করেন। শ্রীপুরে থানাদারের সাহায্যার্থে মহম্মদবেগ আকাশকে কতিপয় রণতরী সহ তথায় প্রেরণ করেন।

এই সময়ে সেখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ লড়িকুল বন্দরের দারোগা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লড়িকুল বন্দরে পর্ত্তুগীজগণ কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া লবণের ব্যবসা করিতেছিল। দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে আঙ্গারিয়া ও লড়িকুল পর্ত্তুগীজগণের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে পর্ত্তুগীজগণের কয়েকখানা রণতরী সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। বর্ত্তমান সময়েও দক্ষিণ বিক্রমপুরে পর্ত্তুগীজ প্রাধান্যের চিহ্ন স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। মৌজে কোয়রপুরের নিকটে হাওদা গঞ্জালেস বলিয়া যে একটি প্রাচীন জমার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পর্ত্তুগীজ বীর সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেসের নামানুসারেই হইয়া থাকিবে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। মুলফৎ গঞ্জের ১ মাইল পশ্চিমে নড়িয়া গ্রামে দর্ত্তা দিঘী-(Da Aitas tank) তথাকার পর্ত্তুগীজ প্রাধান্যের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আসাম অভিযানে আবুল হোসেন নৌযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাকে দেড় শত (রণতরীর) নয়রাবের সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া শ্রীপুরে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে মগেরা ফরিদপুরের পথ হইয়া লড়িকুলের সমীপবর্ত্তী হইলে আবুল হোসেন দেড় শত নৌবহর সহ উহাদিগকে আক্রমণ করেন। সংবাদ পাইয়া খিজিরপুর হইতে মহম্মদ বেগ অবকাশও আবুল হোসেনের সাহায্যার্থ আগমন করেন। মোগলের দুর্জ্জয় কামান মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধে কালীগঙ্গার তরঙ্গ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। রণপোতগুলি সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে অনেক মগবীর জীবনাহুতি প্রদান করিল। ফলে মগেরা বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল।

নবাব সায়েস্তা খাঁ মগদিগকে দমন করিবার জন্য নিম্নলিখিত রূপে নওয়ারা গঠন করিয়াছিলেন :—

কোশা, জলবা, ঘ্রাব, পারেন্দা, বজরা, পাতেলা, সলব, পালে, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহাল কুড়ি, পালওয়ার। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীও সঙ্গে থাকিত! এই সমুদয় তরণী দৈর্ঘ্যে ৭০ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্ত হইত। খাটকুড়ি ও মহালকুড়ি, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বালাম, বজরা, পালেন ও বহর প্রভৃতি তরণীতে রসদপত্র ও গোলাবারুদাদি থাকিত। পারেন্দা ও সলব শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত ; বলা বাহুল্য য, এই শ্রেণীর নৌকাগুলি খুব দ্রুতগামী ছিল। সলবের আকার কতকটা আধুনিক খোন্দা নৌকার মত এবং পারেন্দা ছিপ নৌকার আকার ছিল। কোষ, জলবা, ঘ্রাব ও পাটেলা সুধু যুদ্ধ সময়েই ব্যবহৃত হইত। ঘ্রাব নৌকার গলুই এত দীর্ঘ ও উচ্চাকারে নির্ম্মিত হইত যে, নদীগর্ভ হইতে উহা তীরস্থিত দুর্গ প্রকোর স্পর্শ করিতে পারিত, সুতরাং নৌকা হইতেই একেবারে সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইত।

সায়েস্তা খাঁ নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ রাজমহলে আসিয়া উপনীত হন। তথা হইতে ঢাকা অভিমুখে রওনা হইয়া জাজরা হাটীতে উপনীত হইলেন এবং ফরিদপুরের পথে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঢাকা যাইবার উহাই একমাত্র সোজা পথ। ঝানকের পথে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তদীয় কর্ম্মচারীবর্গ ফরিদপুরের পথ মগদিগের অত্যাচারের লীলাভূমি এবং বিপদসঙ্কুল বলিয়া তাহাকে এই পথে যাইতে নিরস্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ শত্রুর ভয়ে ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নাজিরপুর ও যাত্রাপুর হইয়া এই পথে আসিতে আসিতে কি প্রকারে মগদিগকে দমন করিবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করেন। ঢাকায় পৌঁছিয়া তিনি লড়িকুলের দারোগা জীয়াউদ্দিন ইয়ুসুফের নিকট আদেশ প্রেরণ করিলেন যে, লড়িকুলের ফিরিঙ্গিগণ যেন তাহাদের চট্ট-

গ্রামের আত্মীয় স্বজনের নিকট এই বলিয়া চিঠি লিখিয়া দেন যে, যদি ফিরিঙ্গিগণ লুণ্ঠন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবাবের অধীনে চাকুরী স্বীকার করে তবে তাহারা যথেষ্ট রূপে পুরস্কৃত হইবে। জীয়াউদ্দিনের যত্নে সায়েস্তা খাঁর এই উদ্যম ফলবতী হইয়াছিল। ফলে চাটিগাঁ অধিকার কালে অনেক ফিরিঙ্গি সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে যোগ দান করিয়া মগদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম প্রদেশে মোগল পতাকা প্রোথিত করিয়া তথাকার কতিপয় ফিরিঙ্গি যোদ্ধাকে ঢাকাতে আনয়ন করেন, এবং তাহাদিগকে ফিরিঙ্গিবাজারে জায়গীর দিয়া স্থাপন করেন। এখনও ফিরিঙ্গিবাজারে পর্ত্তুগীজগণের বংশধরগণ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। উহারা ক্যাথলিক খৃষ্টান, ইহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান দেশীয় কৃষকগণের কোনই পার্থক্য নাই। মগবন্দীদিগকে তিনি মগবাজারে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবারিত হয়, এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী জনগণ প্রায় শতাধিক বৎসর পরে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কালক্রমে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের অনন্তরবংশীয়গণ ইংরেজ রাজের অধীনে গোলন্দাজ সৈনিকের অথবা গার্হস্থ্য ভৃত্যের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়া কবির দল বাঁধিয়া সুনিপুণ বেহালা বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

পেয়ারা, কামরাঙ্গা, চীনাবাদাম প্রভৃতি অনেক দক্ষিণ আমেরিকার ফল সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম এদেশে আনয়ন করে। পর্ত্তুগীজেরা বড়ই উদ্যানপ্রিয় ছিল। সূর্য্যমুখী, মুকুট ফুল, পীত করবী, গাঁদা প্রভৃতি অনেকগুলি মেক্সিকো দেশীয় ফুল উহারা এদেশে আনয়ন করিয়া এ দেশের পুষ্প-সম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছে।

পর্ত্তুগীজদিগের এ দেশে আগমনের ফলে একটি কদর্য্য রোগেরও আমদানী হইয়াছিল। ভাবপ্রকাশ-নামক বৈদ্যক গ্রন্থে এই রোগটি ফিরঙ্গ নামে অভিহিত। যথা:—

"গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥
ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধি র্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥"

রোগীর পথ্য পাউরুটি ও বিস্কুট প্রস্তুতপ্রণালী আমরা পর্ত্তুগীজগণের নিকটই প্রথম শিক্ষা লাভ করি। এক সময়ে এ দেশের সুন্দরীদিগের মধ্যে ফিরিঙ্গি খোপার খুব প্রচলন ছিল, উহা নিশ্চয়ই পর্ত্তুগীজদিগের অনুকরণের ফল। তাসের নানা প্রকার ক্রীড়াও উহাদিগের প্রসাদেই আমরা শিখিয়াছি।

যে তাম্রকূট আজকাল বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া আতিথেয়তার প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, যে আনারসের সুরস বৃদ্ধেরও রসনার তৃপ্তি সাধন করে, যে বেহালার সুমধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মাতিয়া উঠে, তাহার জন্য পর্ত্তুগীজগণের নিকট আমরা ঋণী।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

সে আজ কোথায় !

শরতের লঘু মেঘ সে কোন্ সুদূর
ভাসিয়া চলিছে ধীরে স্বচ্ছ শুভ্রকায় ;
সপ্তমীর ক্ষীণ আলো ম্লান মূর্চ্ছাতুর
লভিছে বিরাম মোর নিঃসঙ্গ শয্যায়।
নক্ষত্র-বিরল আজি উজ্জ্বল গগন
রচিয়াছে ইন্দ্রজাল—মুগ্ধ স্বপনের
স্নিগ্ধ ভ্রান্তি-বিজড়িত। ব্যাকুল পবন,
অশান্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস সুপ্ত নগরের,
নিঃশেষিছে আপনারে অক্ষুব্ধ অটল
গর্ব্বোদ্ধত প্রাসাদের পাষাণ উরসে !
নিদ্রাহীন নিশীথেরে করিয়া চঞ্চল
বিরহ বিষাদখিন্ন অঙ্গুলি পরশে,
ভাদরের আর্দ্র বায়ু গাহিছে কোথায়—
এমন মধুর রাতে সে আজ কোথায় !

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

পূজার ছুটি

১

পূজার ছুটিটা কাশীতে কাটাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম, এবং সেইজন্য তিন দিন মাত্র মার নিকট থাকিয়া কাশী যাত্রা করিলাম।

গাড়ীতে ভিড়ের অন্ত নাই, সুতরাং কোনরূপে দেহটাকে মাত্র রক্ষা করিয়া চলা। কিন্তু মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদলের পর তাহাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; ছোট একটি কামরায় লোক যখন আর কিছুতেই ধরে না, এবং ট্রেন ছাড়িবার বিলম্ব নাই, তখন কাঁচা-পাকা-চুল এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সঙ্গে পর্ব্বত প্রমাণ লগেজ ও তিন চারিটি স্ত্রীলোক লইয়া তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

গাড়ীতে প্রবল আপত্তির একটা কলরোল পড়িয়া গেল,—সকলেই ভদ্রলোকটিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তিনিও কোন সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং স্ত্রীলোক কয়েকটি নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমি নিজের জায়গা ছাড়িয়া দিয়া কহিলাম—"সকলকেই যখন যাইতে হইবে, তখন সামান্য অসুবিধার জন্য ভদ্রলোককে আপনারা অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন। মহাশয় আমার বসিবার স্থান যদিও এক জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু আমি তাহা ছাড়িয় দিতেছি, কোনও এক জন স্ত্রীলোককে বসিতে বলুন।"

কথাটার ফল হইল। গাড়ী শুদ্ধ লোক থামিয়া গেল—এবং ভদ্রলোকটি সকৃতজ্ঞ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মশায় আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো জানি না! আপনাকে কষ্ট করে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না—এখান থেকে কাশী কতটুকুই বা,—আমরা বেশ যাব। আপনি বসুন।"

আমি বলিলাম—"তবে জায়গাটা খালিই থাক্, আমি বসিতে প্রস্তুত নই।"

শুনিয়া ভদ্রলোকটি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন "লীলা, তুই বস!"

মেয়েটি নড়িয়া চড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, সে বসিতে প্রস্তুত নহে।

তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে।

যদিও আমার জায়গায় আমরা কেহ বসিলামনা তথাপি তাহা খালি রহিল না। পার্শ্বের আরোহীটি একটুখানি ভাল করিয়া ছড়াইয়া বসিয়া সে স্থানটুকু অধিকার করিয়া লইল।

তাহা দেখিয়া লীলা আমার দিকে চাহিল। তাহার চোখ দুটি সকরুণ সুন্দর—বোধ হয় তাহাদের জন্য আমি নিজের স্থান হারাইলাম, এইজন্যই সকরুণ। আমিও তাহার দিকে চাহিলাম—গ্যাসের আলো তখন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল এবং বাহিরের উষার আলো তখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় নাই,—তাহারই মাঝখানে তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য আলো-অন্ধকারে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

২

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মশায়ের নিবাস ?"

উত্তরে বলিলাম "হুগলী জেলায় হরিদেবপুর গ্রামে।" শুনিয়া তিনি খানিকটা থামিয়া বলিলেন, "সেখানকার বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার পরম বন্ধু ছিলেন,—আহা, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।"

আমি বলিলাম "তিনি আমার পিতা।"

শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন "এঁ্যা—বিনোদের ছেলে আপনি—তুমি ? তাই তুমি আমার এত পরমাত্মীয়ের মত !—তা শুনেছি, তুমি নাকি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছ—উপস্থিত কোথায় আছ ?"

আমি কহিলাম, "গয়ায়"।

"তা বেশ। আহা তোমাদের দেখে কত আনন্দ হয় ! ছোট বেলা থেকে বিনোদ আর আমি এক সঙ্গে পড়েছি, এক বাসায় এক সঙ্গে থেকেছি—কর্ম্মজীবনেও যখন অবসর পেয়েছি তখনই সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়ি নি—তার পর এক দিন শুন্‌লাম বিনোদ নেই। একেবারে বুকের হাড় ক'খানা যেন ভেঙ্গে গেলো।" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দুটা চক্ চক্ করিয়া উঠিল। "আহা," বিনোদের ছেলে তুমি, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো বাবা—"

বলিয়া তিনি খানিকটা চুপ্ করিয়া রহিলেন। এবং তাহার পর বলিলেন, "তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছো—না কোন বন্ধুর বাড়ীতে এসেছো—না শ্বশুর বাড়ী এখানে?"

আমি কহিলাম, "বিবাহ এখনও আমার হয় নাই,—বন্ধুরও বাড়ী এখানে নাই,—বেড়াতে এসেছি মাত্র।"

ভদ্রলোকটি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন "বিবাহ এখনও হয় নি। —কেন ?"

"আমি কহিলাম "ইচ্ছা করিয়াই করি নাই—বিবাহ করিবার কল্পনা উপস্থিত নাই।"

শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, 'আজকালকার ছেলেদের ও-একটা হয়েছে বটে। ওটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশী আমদানী।"

আমি কহিলাম, "আপনি আমার পিতৃ-বন্ধু, আপনার পরিচয় পাইলে কৃতার্থ হইব" —

তিনি কহিলেন, "আমার নাম শ্রীনীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ী হরিদেবপুরেরই কাছাকাছি, পলতায়। তবে অনেক দিন দেশত্যাগী, রাঁচিতে উপস্থিত কর্ম্মস্থান, সেখানে ওকালতী করিয়া থাকি, এবং উপস্থিত বাস সেই খানে। মেয়েদের ইচ্ছায় ও অনুরোধে কাশীতে তীর্থ করিতে বেরিয়েছি, কিন্তু গোড়াথেকেই যে রকম সুবিধা দেখছি—হাঁ তুমি নাববে কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "সম্ভব বেনারেস হোটেলে।"

"বেনারেস হোটেল ? সেটা কোথায় ?"

"শুনিয়াছি দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই"। নীলকণ্ঠ বাবু সাগ্রহে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা কি হয় ?" আমি যখন মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বাসা করে থাক্‌ব তখন তুমি গিয়ে একটা হোটেলে থাক্‌বে, তা কি হয় বাবা ? তুমি বিনোদের ছেলে, তোমাকে আমি অন্য কোথাও উঠ্‌তে দিতে পারি না।"

আমি কহিলাম, "ইহার উপর আমারও বক্তব্য বিশেষ কিছু থাকিতেই পারে না। তবে একটা কথা। আমার আর ২।১ জন বন্ধুর ঐ হোটেলে আসিবার কথা আছে—তাহাদের সঙ্গে ক'টা দিন দেখা সাক্ষাৎ করার কল্পনা আছে—সেই জন্যই হোটেলে ওঠা প্রয়োজন।"

নীলকণ্ঠ বাবু কহিলেন, "আমার বাসায় দু'বেলা দুটি খেলে আর তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কি ক্ষতি হবে বাবা। তোমার কথা আমি শুনবো না।"

এমন সময় ষ্টেশন আসিয়া পড়িল,—নীলকণ্ঠ বাবু "কুলি, কুলি" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন "তোমাকে আমি যেতে দেবো না।"

আমি কহিলাম "হাত আমার ছেড়ে দিন,—জিনিষ পত্রগুলা নামাইতে সাহায্য করিতে হইবে। আপনি যদি আমাকে না ছাড়েন, ত আমি কি পালাইয়া যাইব ?"

জিনিষপত্রের স্তূপ নামান হইল,—তাহার পর স্ত্রীলোকগণ নামিলেন।

তাহার পর গাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে চড়াইয়া দিয়া নীলকণ্ঠ বাবু আমাকে ডাকিলেন "এসো"।

আমি কিন্তু অনেক করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম, তিনি আমাকে তাঁহার ঠিকানা দিয়া গেলেন—স্থির হইল, যে বন্ধুরা যদি আসিয়া থাকেন তাহা হইলে দু'দিন হোটেলে থাকিয়া তাঁহার বাসায় যাইব, তাহা না হইলে আজই যাইতে হইবে। উপস্থিত পরিত্রাণের ভরসায় তাহাতেই সম্মত হইতে হইল।

নীলকণ্ঠ বাবু গাড়ীতে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কথাই ঠিক রইল?"

তখন তরুণ সূর্য্যের কনক কিরণে লীলার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার দু'টি করুণ চোখ গাড়ীর এক কোণ হইতে আমারই মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—আমি কি উত্তর দি তাহারই প্রতীক্ষায়! মানুষের মুখ এত সুন্দর হয় আমি জানিতাম না,—আমি অন্য উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না, কহিলাম "হাঁ"! শুনিয়া নীলকণ্ঠ বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীর ভিতর মুখ ঢুকাইয়া লইলেন এবং লীলা মাথায় কাপড় টানিয়া দিল!

বিবাহ করিব না এমন একটা কল্পনা আমি পোষণ করিয়াছিলাম! আমার মা আমাকে তাহার জন্য কত অনুযোগ করিতেছেন—কত অনুরোধ করিয়াছেন। পূজার ছুটিতে যে তিন দিন তাঁহার নিকট ছিলাম, তাহারই মধ্যে গুটিদশেক রাজকন্যা ও তাহাদের অর্দ্ধ-রাজত্বের সন্ধান আমাকে দিয়াছিলেন,—কিন্তু আমি সম্মত হই নাই। মানুষের জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝিতে পারিতাম না—এক জন সঙ্গিনী না হইলে যে জীবন যাত্রা সম্ভব হইতে পারে না,—এমন কথা আমি স্বীকার করিতাম না। তাই এই কৌমার্য্য। আমার এইটুকু ইতিহাসই যথেষ্ট।

৩

বেনারেস হোটেলে উঠিয়া দেখিলাম বন্ধুদের মধ্যে কেহই আসেন নাই. পূজার এই কটা দিন তাঁহারা বেনারসের নীরস হোটেলে কাটান অপেক্ষা, আপনাদিগের গৃহের মাঝখানে, যেখানে দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া নীরব প্রেম ও অপরিমিত স্নেহ এই বারো দিনের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানে যাওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছেন,—এই মর্ম্মের এক পত্রও এক বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম।

এই বিবাহিত জীবন! কথা দিয়া যাহার জন্য কথা রাখা যায় না, বন্ধুর বন্ধুত্বকে যাহা পদে পদে আঘাত করে, সেই জীবন এত বাঞ্ছনীয়! মানুষ তাহারই জন্য পাগল! বন্ধুর পত্রখানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া কঠিন রাস্তার পাথরের উপর লক্ষ লোকের পদতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যেন কতকটা আরাম পাইলাম!

সমস্ত দিন আর কোথাও বাহির হইলাম না,—বিকাল বেলা রৌদ্র যখন পড়িয়া গেল, তখন বারান্দায় একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া বিচিত্র জনতাস্রোতের মধ্যখানে আমাকে হারাইয়া ফেলিলাম।

বন্ধুরা আসে নাই,—সঙ্গীর অভাব, মনটা প্রসন্ন ছিল না! কিন্তু তবু যেন মনের স্তরে স্তরে আজ প্রভাতের স্নিগ্ধ কনক-কিরণেরই মত ঐ কিসের মাধুরী আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় হোটেলের দরজায় একটা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা হইতে নীলকণ্ঠ বাবু নামিলেন। তাঁহাকে আমার নিকট বসাইলাম।

নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন, "তোমার বন্ধুরা বোধ হয় আসেন নাই?"—

আমি বলিলাম, 'না'।

তিনি বলিলেন, "তবে আমাদের ওখানে চলো।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম,—কহিলাম, "হয়ত আপনাদের অসুবিধা হইতে পারে।"

নীলকণ্ঠ বাবু কহিলেন, "হোটেলের অন্ন যদি তোমার বিশেষ ভাল লাগিয়া থাকে, তা হ'লে আমি কেমন করে তোমাকে নিয়ে যাব! কিন্তু আমার অসুবিধার দোহাই

দিও না। প্রথম আমি তোমার দ্বারা অসুবিধার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখি না। তার পর আমার স্ত্রী আর আমার বোন – তুমি হয়ত, বিশ্বাস করবে না যে, তাঁরাই জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তারপর আমার মেয়ে সুহা,—তুমি গেলে তার অসুবিধা হবে এমন কোন সংবাদ পাই নি। তারপর লীলা, আহা! তাকে যদি জানতে, বুঝতে পারতে ভাগ্যহীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান মানুষকে হৃদয়হীন করেন না।"

বুকের ভিতর একটা কোমল স্থানে যেন কিসের আঘাত লাগিল, আমি কহিলাম, "ভাগ্যহীন কি রকম?"

নীলকণ্ঠ বাবু পথের পানে জনতা-স্রোতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সে আমার বন্ধু হরিহর বাঁড়ুয্যের মেয়ে। দারুণ কলেরা রোগে যখন একে একে হরিহরের স্ত্রী ও হরিহর মারা গেল, তখন মৃত্যুর সময় হরিহর লীলাকে আমার কাছে দিয়ে গেছে! যার বাপ নেই, মা নেই তার আর কি আছে! কিন্তু লক্ষ্মী, মেয়েটি লক্ষ্মী! রূপে যেমন গুণেও তেমনি।— আমাদের সংসারটি সে একাই চালায়,— কি সেবা! আর আনন্দ যদি বিশ্বে কোথাও থাকে ত ঐ মেয়েটির মুখে চোখে! ওর সমবয়সী আমার এক মেয়ের বিয়ে আজ দেড় বৎসর হল দিয়েছি, কিন্তু ৪৫ বর আজ দেড় বৎসরে আর মিল্‌লনা! অভাগিনী, বাবা অভাগিনী!"

মুহূর্ত্তে আমার কাছে যেন সব পরিষ্কার হইয়া গেল। লীলা যে জীবন্ত লক্ষ্মী তাহা আমি দেখিয়াছি। কিন্তু পরের সংসারে আসিয়া সে অনাদৃত! সংসারের সমস্ত কাজ সে করে—তাহার মানে দাসীর কাজ তাহাকে করিতে হয়। তারপর উহার সমবয়সী মেয়ের বিবাহ আজ দেড় বৎসর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পিতৃমাতৃহীনা এই অভাগিনীর কথা কেহ ভাবে নাই! আহা, ভাগ্যহীনার চোখে কত অশ্রু নিরুদ্ধ হইয়া আছে, বুকে কত দীর্ঘ শ্বাস সঞ্চিত আছে, তাহার সন্ধান কেহ রাখে না! জীবনের নিরবচ্ছিন্ন নিরানন্দকে মুখে চোখে আনন্দরূপে ফুটাইয়া তুলিতে দিবারাত্র সে অন্তরের বহ্নিতে যে ইন্ধন জোগাইতেছে—তাহা বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ কি জানে!

আমাকে স্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া নীলকণ্ঠ বাবু বলিলেন, "হাঁ—হাঁ—বলছিলাম কি,—আর এইত লীলা, একটা চড়ুই পাখী পড়তে দেখ্‌লে কেঁদে অস্থির হয়—এরাই তোমার যাওয়াতে কষ্ট পাবে?—কি বল বাবা!—চলো তোমাকে এখনি যেতে হবে—মস্ত বড় বাড়ী অকুলন হবে না, কোন অসুবিধা হবে না।"

ইহার পর নীলকণ্ঠ বাবুর উপর আমার শ্রদ্ধার পরিমাণ অনেকটা কমিয়া গেল—কিন্তু লীলা! লীলার কথা মনে করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, বলিলাম, "চলুন।"

হোটেলের ম্যানেজারের হিসাব পত্র চুকাইয়া দিয়া, জিনিষ পত্র লইয়া নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে উঠিলাম।

(৪)

সেই দিন সন্ধ্যার পর একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার জিনিষপত্রগুলি যথাস্থানে গোছান রহিয়াছে,—এবং তাহার ভিতর এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা স্বতঃই চোখে পড়ে।

নীলকণ্ঠ বাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে যথোচিত আদর সম্ভাষণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "লীলা, অমলের জন্য খাবার নিয়ে আয় ত!"

এক থাল খাবার লইয়া যখন লীলা আমার নিকট আসিল, তখন তাহাকে সত্যই প্রতিমার মত দেখাইতেছিল! ভগবান তাহাকে রূপ দান করিতে কৃপণতা করেন নাই, এবং তাহার সহিত এমন একটা পবিত্রতাও দিয়াছেন যাহা একান্তই দুর্ল্লভ! সুন্দর মুখে নির্ম্মল চোক দুটি তাহার অন্তরের শুচিতার নিদর্শন স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেহের যৌবন যেন অর্দ্ধপথে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

লীলার মত যাহার গুণ, লীলার মত যাহার রূপ, সে অভাগিনী,—তাহার জন্য পাত্র পাওয়া যায় না! বিচিত্র ভগবানের বিধান!

লীলার সেই অপরূপ মধুর মুখ,—হাস্যময় কিন্তু ঈষৎ বিষণ্ণ,—সমস্ত রাত্রি আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন বেড়াইয়া আসিয়া যখন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকিলাম,তখন দেখিলাম পার্শ্বের জানালার গরাদে ধরিয়া লীলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি যে ঘরে ঢুকিয়াছি, সে কথা সে জানিতে পারে নাই। নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া সে কি ভাবিতেছিল! তাহার স্তিমিত স্তব্ধ ধ্যান ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা আমারও ছিল না, আমি ধীরে ধীরে বসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার তারার মত পবিত্র নির্ম্মল তাহার রূপ! আঁধার যখন চারিদিকে ঘনাইয়া উঠে, তখনও উজ্জ্বল, সুন্দর! দেবতার আশীর্ব্বাদের মত শুচি, সুগন্ধ পুষ্পের মত অনবদ্য!

হঠাৎ সে আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া গেল;—তাহার গোপন চিন্তা তাহার রূপের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া পাছে বাহির হইয়া পড়ে, বোধ হয় সেই লজ্জায়! তাহার পর একটি মাত্র কথা না কহিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই,—অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একি! এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে একাকী লীলা কাহার কথা ভাবিতেছিল! তাহার নারী-হৃদয়ে হয় ত কোন গভীর বেদনা জাগিয়াছিল,—হয় ত কোন গোপন কথা! কি সে বেদনা, কি সে কথা! আমার অন্তর যে আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারই ব্যথায় যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, এ কি!

এমন সময় নীলকণ্ঠ বাবু ঘরে আসিয়া কহিলেন, "কি বাবা, কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছে না ত?"

আমি বলিলাম "না"।

* * *

পরদিন সমস্ত দিন আর লীলাকে দেখিতে পাইলাম না,—তবে আমার পাশের ঘর হইতে একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মন বলিয়া দিল, এ লীলার কান্নার শব্দ—আর তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না।

মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল! এই আশ্রয়হীনা অনাথা বালিকা,—সে কি গভীর মনোবেদনায় দিনের পর দিন এখানে যাপন করিতেছে! সংসারের সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হয়,—কিন্তু তাহার পরিশ্রম ও বেদনার পরিবর্ত্তে সে হয় ত দিনান্তে একটি মাত্র সান্ত্বনার কথাও শুনিতে পায় না! সত্যই অভাগিনী সে! অন্তরের বেদনা নিদারুণ না হইলে এমন করিয়া কেহ কাঁদিতে পারে না!

সর্ব্ব প্রকারে সৌভাগ্যের উপযুক্ত এই অভাগিনীর জন্য আমার অন্তর সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! উদ্ধার কি তাহার নাই? কথাটা বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ চমকে আমার সমস্ত মনকে সজাগ করিয়া তুলিল। পরগৃহে অনাদৃত এই উপেক্ষিতার উদ্ধার কি আমারই হাতে নাই? আমি যদি উহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে সহজেই ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া যায়!

কিন্তু আমি কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি! বহু দিনের আমার কল্পনা বিবাহ করিব না, বহু যুক্তি ও তর্কের পর সে সিদ্ধান্ত করিয়াছি,—আজ এত সহজেই কেমন করিয়া তাহা উপেক্ষা করিতে পারি?

এত সহজে? এক জন বালিকা এবং লীলার মত বালিকা, নিঃশব্দে এমন গভীর বেদনা দিনের পর দিন সহ্য করিতেছে,—হয় ত' তাহার বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে,—ইহা কি এত লঘু কারণ? ইহার জন্য কি অসুবিধা ভোগ করিয়াও নিজের একটা সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করা উচিত নহে?

কিন্তু লীলা কি আমাকে চায়? সে যে আমাকে পাইয়া সুখী হইবে, তাহার প্রমাণ কোথায়? তাহাকে বিবাহ করিয়া যদি নূতন করিয়া আমি তাহাকে অসুখী করি, তাহা হইলে আমার পাপের সীমা থাকিবে না।

কিন্তু লীলা কি সত্যই আমাকে চায় না? কাল

প্রভাতের নবীন সূর্য্যকিরণে তাহাকে যে ভাবে দেখিয়াছিলাম, এবং সন্ধ্যার পর সে যেমন করিয়া আমারই ঘরে ছিল—তাহা হইতে কি বুঝা যায় না যে, সে আমাকে চায়? হয় ত বুঝা যায় না, হয়ত আমার এ কল্পনা ভিত্তিহীন!

নানা সন্দেহ ও চিন্তায় মনটা এমনই বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল যে, নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সন্ধ্যার পর যখন দেখা হইল, তখন তাঁহাকে বলিলাম, "আমাকে ছুটি দিন, আমি কাশী থেকে কালই চ'লে যেতে চাই।"

নীলকণ্ঠ বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "কালই? কেন, এত তাড়াতাড়ি? অসুবিধা হচ্ছে বুঝি?"

আমি বলিলাম, "না মনটা হঠাৎ খারাপ হ'য়েছে—মার কাছে যেতে চাই।"

নীলকণ্ঠ বাবুর আগ্রহাতিশয়ে তাহার পর দিন থাকিয়া পর দিন প্রাতের ট্রেণে যাওয়া স্থির হইল।

(৫)

পরদিন সমস্ত দিন বাড়ীর বাহিরে কাটাইলাম; সে দিনটা যেন আর কিছুতেই কাটিতে চায় না। সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিলাম।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম, ঘরের একটা টেবিলে হেলান দিয়া লীলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আমি আসিতেও সে সরিল না। বোধ হয় কোন কথা ভাবিতেছিল।

তাহার নিকট গিয়া ডাকিলাম, "লীলা।" লীলা চমকিয়া উঠিয়া, মুহূর্ত্তেক আমার পানে চাহিয়া—ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

আমি ডাকিলাম "লীলা, শোন।"

লীলা ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি কহিলাম, "লীলা, কাল সকালেই চলে যাবো।"

লীলা আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমি কহিলাম, "লীলা, তোমার মুখের একটা কথা আমি শুনতে চাই,—আমি গেলে তোমার কিছু কষ্ট হবে না?"

লীলার মুখ লাল হইয়া গেল, সে আমার দিকে চাহিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল,—মুখের কথা যেন বাহির হইতে চায় না। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "হবে।"

তাহার পর চকিতে আমার পানে চাহিয়া কহিল, "এবার যাবো?"

তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল—ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াও সে ঢাকিতে পারিল না!

প্রেম! প্রেম যদি ইহারই নাম হয়, ত তাহা বেদনা ও আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ! সমস্ত অন্তরকে মথিত মর্দ্দিত করিয়া পদ্মের সুকুমার রক্ত-দলের মত তাহাকে রক্ত-লোহিত করিয়া তুলে!

* * *

পর দিন প্রভাতে ট্রেণ—সেই জন্য সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম।

নিদ্রা ও স্বপ্নের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া রাত কাটিয়াছিল জানি না; কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও ভোর হয় নাই, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া চাঁদের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং ঘরের কোণের কেরোসিন ল্যাম্প মিট্‌মিট্ করিতেছিল।

আমি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এইবার যাইবার উদ্যোগ করি। এমন সময় পাশের দুয়ার খুলিয়া দিয়া আমার সম্মুখে কে এক জন আসিয়া দাঁড়াইল,—আলো-আঁধারে প্রথমে স্পষ্ট দেখা গেল না, তাহার পর দেখিলাম, লীলা।

বিস্ময়ের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কহিলাম, "লীলা?"

লীলা ধীরে ধীরে কহিল, "মাপ করবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সময় এখানে?"

লীলা কহিল, "আর দেখা হবে না, তাই।"

ধীরে ধীরে আসিয়া লীলা আমার বিছানা হইতে খানিকটা দূরে মেঝের উপর বসিল।

বলিল "একটা কথা।"

আমি বলিলাম "কি, বল?"

লীলা কহিল "আমাকে এমন কিছু দিয়ে যান, যাকে

আমি যত্ন ক'রে রেখে দিতে পারি,—যা আমাকে এ দুটো দিনের কথা— ”

আমি বিস্মিত, স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া কহিলাম, “সে কি লীলা—তুমিই বল।”

লীলা কাপড়ের ভিতর হইতে সযত্ন-রক্ষিত একখানি খাতা বাহির করিয়া কহিল, “এতে আপনার নাম লিখে দিন।”

আমি বড় বড় অক্ষরে লিখিলাম, “তোমারই অমল-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।”

খাতাখানি আপনার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া লীলা কহিল, “এখন যাই।”

আমি কহিলাম, “একটা কথা; তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আশা করি।”

লীলা আমার মুখের পানে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল!

মার কাছে ফিরিয়া গিয়া কহিলাম, “মা তোমার দাসীর ঠিকানা করিয়া আসিয়াছি,—তবে সে রাজকন্যা ত নয়ই,—পথের ভিখারী বলিলেও চলে!”

মা বলিলেন, “তা হ'ক;” এবং আনন্দে পাঁচ সিকার সিন্নি দিলেন।

বেশী বয়সে বিবাহ করার একটা গোল যে নিজেকেই কর্ত্তা সাজিতে হয়। যা হোক, উপায় নাই। সেই জন্যই অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভ দিনে রাঁচী যাত্রা করিলাম।

সেখানে বিবাহে খুব ধূম হইয়াছিল, এ কথা বলিলে হয় ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না,—কেননা লীলা পরের মেয়ে বই ত নয়। আমারও একটু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু বিবাহের পরে সে বিস্ময়ের কারণ আর রহিল না। নীলকণ্ঠ বাবু, এখন আমার শ্বশুর মহাশয়ই বলি,—বিবাহের পর আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, “একটা কথা তোমাকে মিথ্যা বলেছিলাম—সেইটের সংশোধন করতে চাই। লীলা আমারই মেয়ে!”

কথাটা শুনিয়া আমি এত বিস্মিত হইলাম যে, কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, “আমি বুঝেছিলাম যে, তোমার করুণা আকর্ষণ ভিন্ন আমি তোমাকে অন্য উপায়ে কিছুতেই পেতে পারি না। অর্থের প্রলোভনও বৃথা। তাই আমার এই মিথ্যা রচনা! করুণা ও সমবেদনা জাগিয়ে তোমাকে পেয়েছি! আমরা উকীল মানুষ, বাক্যে ও কার্য্যে আমাদের দিবা-রাত্র মিথ্যা আচরণ করতে হয়; মেয়েটার সদ্গতির জন্যে যদি একটা মিথ্যা কথা বলে থাকি ত তার ক্ষমা আছে এমন ভরসা করি,—বিশেষ তুমি যখন বিনোদের ছেলে! কিন্তু বাবা, আমার আশার যদি কোন মূল্য থাকে, ত' আমি বল্‌তে পারি, তুমি অসুখী হবে না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার লীলা যেন তোমার যোগ্য হ'তে পারে।”

ক্ষমা করা ভিন্ন তখন অন্য উপায় ছিল না। বিশেষ সব দিক ভাবিয়া দেখিলাম, রাগ করিবার কোন কারণও ছিল না। লীলাকে সে দিন ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল।

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, “আমার এ মিথ্যা রচনার মধ্যে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না—সুতরাং অপরাধটা সমস্তই আমার।”

মনে কিন্তু ভারী খট্‌কা রহিয়া গেল। রীতিমত একটা প্লট হইয়াছিল নিশ্চয়ই, তা নইলে অকারণ লীলা সমস্ত দিন কাঁদিল কেন? সে দিন যদি সে না কাঁদিত, তাহা হইলে হয় ত এত দূর অগ্রসর হইতাম না।

কথাটা কিন্তু সে দিন আর ভাবিলাম না। পরে কথা-প্রসঙ্গে এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি সে দিন অত কেঁদেছিলে কেন?”

লীলা কহিল, “আমার মাঝে মাঝে দাঁতে ভারি বেদনা হয়, ক'দিন ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল।”

আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম! হায় চক্রান্ত শুধু নীলকণ্ঠ বাবুর নহে, তাহার সহিত লীলার দাঁত, ও আমার নির্বুদ্ধিতা সকলেই যোগ দিয়াছিল!

আমার বিবাহের গল্পটা আগাগোড়া একদিন লীলাকে বলিলাম। শুনিয়া সে ভারি হাসিল। কহিল, “ভাগ্যিস্ আমার দাঁতে ব্যথা হইয়াছিল।”

কিন্তু সেই দিন হইতে একটা বিপদ হইয়াছে। লীলাকে দাঁত সারাইবার জন্য কয়েকবার ডেন্‌টিস্‌টের বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এমনই কুসংস্কার যে সে কিছুতেই তাহার দাঁত বদলাইবে না। বলে আমার ঐ খারাপ দাঁতই ভালো তা নইলে আমি আজ কোথায় থাকিতাম!

ঐ জন্যই ত' স্ত্রীজাতিটার উপর আমার এত রাগ।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কবিতার প্রতি

স্বপনের মধুময় শেষ শুভ ক্ষণে,
এসেছিলে তুমি, অয়ি গরবিনি! মম
বাসনা-জড়িত-বুকে; পরশে তোমার,
উজলিলে কি আলোকে পূর্ণ ইন্দু সম
বিমুগ্ধ হৃদয় মোর: নিদ্রালসভরা
শিথিল নয়নে হেরি, একি গো কল্পনা!
ভাবের আবেশে প্রাণ উঠিছে মাতিয়া
লয়ে শত আশা ভয়, আকুল বেদনা।
নিখিলের রূপরাশি প্রসারিত আজি
আঁখির সম্মুখে মম; কোন্ যাদুকর
বিশ্বপটে আঁকিয়াছে রহস্যের ছবি
বিস্ময় পুলকে সদা মুগ্ধ যাহে নর।
জীবনের কুহেলিকা সরাইয়া দূরে,
বিরাজ সতত দেবী ভক্তের অন্তরে।

শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী।

ব্রহ্মচর্য্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম

ভারতভূমি সন্ন্যাস ধর্ম্মের জন্ম-ক্ষেত্র। নির্ব্বৃতি ও শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুগে যুগে অসংখ্য ব্যক্তি আর্ত্ত-দুঃখ-কাতর মহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়াছেন; দুষ্ট সংসার তাহাদিগকে মায়ার পাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সমাজের অনিয়ম, আশা-ভঙ্গ, অসার সংসার-সুখ এবং স্পৃহাসম্পৃক্ত কর্ম্মকোলাহল হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই তাহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের জল বায়ু, ভারতের প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় মনের ধ্যানপরায়ণতা প্রভৃতি সমস্তই সন্ন্যাস ধর্ম্মের আনুকূল্য করে, সুতরাং কর্ম্মসঙ্কুল সংসার-গণ্ডীর বাহিরে অবাধে নিবিষ্ট মনে ধর্ম্মচর্য্যা না করিতে পারিলে, এবং কথঞ্চিৎ কৃচ্ছ্র সাধন না করিলে, মনুষ্যের চরম শ্রেয়ঃ বা যথার্থ নির্ব্বৃতি লাভ হইতে পারে না এরূপ মনে করা ভারতীয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। এই সকল কারণেই প্রাচীন আর্য্য সমাজের ঋষি-জীবনে প্রথমতঃই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্যাগ-ধর্ম্ম মুখ্য বলিয়াই ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যই সন্ন্যাসের প্রথম সোপান। আবার চিরপ্রচলিত ভারতীয় আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের বীজ গুপ্ত রহিয়াছে। এই চারিটি আশ্রমেই আমরা পবিত্র ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরু-গৃহে বেদাধ্যয়ন কালে ব্রহ্মচারীকে শৌচশুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সংযত থাকিতে হয়। ব্রহ্মচারী মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না, অহিংসা পালন করেন, ও নৃত্য-গীতাদি আমোদপ্রমোদ একান্ত ভাবে বর্জন করিয়া থাকেন। তিনি পরম শিষ্টাচারসম্পন্ন মৃগচর্ম্মধারী ও গৈরিক বসনে ভূষিত হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় বৌদ্ধ ও অপরাপর সন্ন্যাসাশ্রমীর ধর্ম্মেও এই সকল বা এই সকল নিয়মের অনুরূপ নিয়ম পালনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আবার ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলে আজীবন গুরু-গৃহে শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিরত থাকিয়া গুরু লোকান্তরিত হইলে তদীয় পারিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচারীর জীবনীর সহিত চতুর্থাশ্রমাশ্রয়ী যতি, মুক্ত, সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের জীবনের কোনও প্রভেদ নাই, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী যে সকল

নিয়মের অধীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীবর্গও সূক্ষ্মভাবে সেই সকল নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিব বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন এই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শেই গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন যুগে জ্ঞানপিপাসু আজীবন ব্রহ্মচারী সত্যের অনুসন্ধানে বিশিষ্ট গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতেন, সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে, এইরূপ এক এক জন বিশিষ্ট গুরুর তিরোধান হইলে তদীয় শিষ্যবর্গ আপন আপন গুরু-প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর শাসনাধীন হইয়া এক একটি 'সন্ন্যাস সংঘ' বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেন, এবং এই রূপেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান, বিধি ব্যবস্থা, নিয়ম প্রণালী, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও এই রূপেই শিক্ষালাভ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এখন আমরা এস্থলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধ যুগ কোন সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে মহারাজ অশোকের (অশোক সংঘ) সময় সুগঠিত বৌদ্ধ 'সংঘ' বা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল এবং এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিয়মে পরিচালিত ও শাসিত হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, নিগ্রন্থ ও আজীবক সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও যথেষ্ট প্রাচীন। বিশেষতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে নিগ্রন্থ ও আজীবকগণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং এই দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের সহিত শাক্যগণের সংঘর্ষের কাহিনীও বর্ণিত আছে। সুতরাং এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ই যে এক সময়ে গঠিত হইয়াছিল এই রূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে।

প্রতিমাসে বুদ্ধভক্তগণের পূর্ণিমা ও 'উপসথ' প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা আছে। এসকল নিয়মও যে কোনও প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের ব্যবস্থার অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা মনে করা যাইতে পারে। এরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এমন কি আমরা দেখিব যে, সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গঠন ও প্রবর্ত্তন প্রণালী এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের শাসনসম্পর্কীয় বিধি প্রভৃতিও কোনও প্রাচীনতর সম্প্রদায় বিশেষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে এই সকল নিয়মানুষ্ঠানের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণরূপে ঋণী তাহা স্বীকার করা যায় না।

বৌদ্ধ সংঘ বা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা স্বয়ং কোনও বিধি প্রণয়ন করেন নাই, তিনি প্রচলিত বা প্রবর্ত্তিত বিধি যথা নিয়মে পালিত হইতেছে কি না শুধু তাহাই দেখিতেন। তিনি প্রায়শঃ কোনও আদেশ প্রদান করিতেন না। কেবল প্রবর্ত্তিত বিধির অনুমোদন করিতেন; কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষু বা অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে তিনি তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। তারপর বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত নীতিগল্পগুলির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিব যে এগুলি অনেকটা আধুনিক।

কোন কোন নিয়ম বা বিধির অনুমোদনের জন্য সময় সময় উল্লিখিত নীতিমূলক গল্প রচিত হইয়াছে; ইহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। এগুইলি সম্প্রদায় বিশেষে প্রবর্ত্তিত বিধি বা নিয়মাবলীর ঐতিহাসিক ছায়া মাত্র; বস্তুতঃ এই সকল গল্পের মূলে অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শিতা ভিন্ন আর কোনও অবলম্বন নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এই সকল নীতি-গল্পের সহিত মূল বৌদ্ধ শাস্ত্রের পর্য্যন্ত ঐক্য নাই, এমন কি কোন কোন গল্প বাস্তবিক পক্ষে মূলের বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে, এবং এই সকল গল্প পাঠ করিলে পাঠকের মনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মিয়া থাকে; অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল নীতি-গল্প শাস্ত্র বচন সমর্থন বা বিশদ করার উদ্দেশ্যে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে সে গুলি শাস্ত্র প্রণয়নের বহু কাল পরেই রচিত হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধ দণ্ডবিধি যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই দণ্ডবিধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কয়েকটি মাত্র অতিরিক্ত বিধি বাদ দিলে প্রতি-

মোক্ষকেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দণ্ডবিধি বা শাসন শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই প্রতিমোক্ষই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাচীনতম। এই দণ্ডবিধিই বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রতিমোক্ষ মূলতঃ সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন। প্রতিমোক্ষের পালি সংস্করণই (পতিমোক্ষ) প্রাচীনতম ও সংক্ষিপ্ত। প্রতিমোক্ষে ভিক্ষুগণের পালনীয় মোট ২২৭ টি বিধি আছে; কিন্তু ধর্ম্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের চৈনিক সংস্করণে, তিব্বতীয় সংস্করণে, এবং মহাভ্যুৎপত্তি সংস্করণে সর্ব্বসাকল্যে যথাক্রমে ২৫০ টি, ২৫৩ টি ও ২৫৯ টি বিধির উল্লেখ দেখা যায়।

ভগবান বুদ্ধের আদেশ আছে যে, প্রতিমাসের মধ্যভাগে চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা তিথিতে অন্ততঃ চার জন ভিক্ষু সমবেত হইয়া প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন। সাধারণতঃ আবৃত্তি আরম্ভের পূর্ব্বেই সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ প্রতিমোক্ষের কোনও বিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে সেই পাপ স্বীকার করিয়া তবে প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিতেন; কিন্তু এক একটি বিধির আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্রই সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ সেই বিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তখন তাঁহার অপরাধ স্বীকার করাই ব্যবস্থা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থূল কথায় বৌদ্ধ দণ্ড বা শাসনবিধি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘনজনিত পাপ স্বীকারের জন্য কয়েকটি লিপিবদ্ধ নিয়মের সমষ্টি মাত্র। এখন আমরা ধুতাঙ্গনামক বৌদ্ধ দণ্ডবিধির কথা আলোচনা করিব। ধুতাঙ্গবাদিগণের পালনীয় নিয়মেও বানপ্রস্থাবলম্বিগণের ধর্ম্মের ছায়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধুতাঙ্গ প্রতিমোক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধুতাঙ্গ নিবদ্ধ নিয়ম শুধু ভিক্ষুগণের জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছে: এবং যে সকল ভিক্ষু বাণপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী বৈখানসগণের ন্যায় অরণ্যে আশ্রয় লইতেন কেবল তাঁহারাই সেই সকল নিয়ম পালন করিতেন।

দক্ষিণ ভারতে ত্রয়োদশ ও উত্তর ভারতে দ্বাদশ ধুতাঙ্গের উল্লেখ আছে। ধুতাঙ্গের আর একটি নাম ধুতগুণ। পালি গ্রন্থে বর্ণিত ধুতাঙ্গ বা ধুতগুণগুলির ধারাবাহিক তালিকা এস্থলে সংযোজিত হইল।

(১) পাংশু কুলিক। ধূলিস্তূপ বা আবর্জ্জনারাশি হইতে সংগৃহীত জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান।

পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে আরণ্যক ভিক্ষুর অভাব ছিল না। তাঁহারা বিশেষ ভাবে কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন। ভগবান বুদ্ধের জীবিত কালে কাশ্যপ ধুতগুণবাদিগণের অগ্রণী ছিলেন। এই সকল ভিক্ষু অরণ্যবাসী ছিলেন বলিয়াই ছিন্ন ও জীর্ণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিতেন। পরে এই নিয়ম প্রায়ই প্রতিপালিত হইত না।

(২) ত্রৈচিবরিক। কোনও ভিক্ষুরই এক সময়ে তিনটির অধিক পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ রাখিতে না পারা।

(৩) পৈণ্ডপাতিক। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া লব্ধ ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করা। যাঁহারা এই নিয়ম পালন করিতেন তাঁহারা কদাপি সলাকভত্ত, * সংঘভত্ত ও আমন্ত্রণান্ন গ্রহণ করিতেন না।

(৪) সপদানচারিকা। ভিক্ষাকালে পালনীয় নিয়ম।

(৫) ঐকাসনিক। একাসনে উপবেশন করিয়া ভোজন।

(৬) পত্তপিণ্ডিক। একটি মাত্র পাত্রে ভোজন।

(৭) খলুপশ্চাদ্ভক্তিক। অতিরিক্ত কিংবা পূর্ব্বে পরিত্যক্ত দ্রব্য ভোজন না করা।

(৮) আরণ্যক। তপস্বীর ন্যায় অরণ্যে বাস।

(৯) বৃক্ষমূলিক। বৃক্ষ মূলে বাস।

---

* টিকেট দেখাইলে যে অন্ন পরিবেশিত হইত তাহার নাম "সলাকভত্ত;" এবং মঠবাসিগণের আহারের জন্য যে অন্নাদি প্রদত্ত হইত তাহার নাম "সংঘভত্ত।"

(১০) আভ্যবকাসিক। অনাবৃত স্থানে বাস।

(১১) শ্মশানিক। শ্মশানে বাস।

(১২) যথাসনন্তরিক। যে কোন আসনে বিশ্রাম। "রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা না করা"ই বোধ হয় যথা সনন্তরিকের প্রকৃত অর্থ।

(১৩) নৈশদ্যিক। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাওয়া।

পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সকল নাম উল্লিখিত তালিকাভুক্ত হইয়াছে এইগুলি গুণ, কিন্তু এই নামগুলি ব্যক্তিকেও বুঝাইতে পারে; তাহা হইলে এক একটি নামে সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বা ভিক্ষুকে বুঝাইবে।

চতুর্থ ও ষষ্ঠ নিয়ম উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল না। সেই প্রদেশে ভিক্ষুগণ তুলার বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। শীতাধিক্য বশতঃই বোধ হয় এই ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ এই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য নহেন, তবে এই সকল বিধি পালন করিলে পুণ্য লাভ হয় শাস্ত্রে এরূপ আভাস আছে। ৮ম, ৯ম, ১০ম, ও ১১শ নিয়ম ভিক্ষুণীগণের পালনীয় নহে, এবং তাহাদের ১১শ, ১২শ ও ১৩শ বিধি পালনে স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে। শ্রমণ, শ্রমণীগণ দ্বিতীয় বিধি পালন করিতেন না, কারণ তাঁহাদিগকে সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত না। সাধারণ ভিক্ষুগণ মাত্র ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিয়ম পালন করিতেন।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

দু'য়ে এক

দুই হয়ে কিবা প্রয়োজন?

রাত্রিদিন ব্যবধান বাধা বাঁধি সবধান,
প্রচণ্ড প্রয়াসে শুধু আংশিক মিলন,
নয়নের বাতায়নে বসি শুধু দুই জনে,
মিতি মিলিবার লাগি বাহু-প্রসারণ।
দুইটি খাঁচায় থাকি ছট্‌ফট্ দুটি পাখী,
শুধু ব্যর্থ ডাকাডাকি চঞ্চুবিদারণ।
মাংস অস্থি-পঞ্জরের রন্ধ্রহীন ভূধরের
গাত্রে প্রতিহত দুটি নদীর স্পন্দন,
দুই হ'য়ে কিবা প্রয়োজন?
এক হলে বাঁচে দুটি প্রাণ,
দুই তৃষা, দুই জন, দাউদাউ—টলমল,
মরীচিকা অলূজ্বল্ সারা দিনমান,
ভেঙে বাধা বন্ধরাজি দুটি প্রাণ মিশে আজি,
উছলি উঠুক সুখে দীর্ঘিকার প্রায়,
ফুটাইয়া শতদল আত্মানন্দে ছলছল্,
তৃষা যেন তট সম তাহাতে হারায়,
আকণ্ঠ ডুবিয়া তাহে মিলন-সঙ্গীত গাহে
পূর্ণ প্রেমানন্দে সর্ব্বতৃষা অবসান।
এক হলে বাঁচে দুটি প্রাণ।

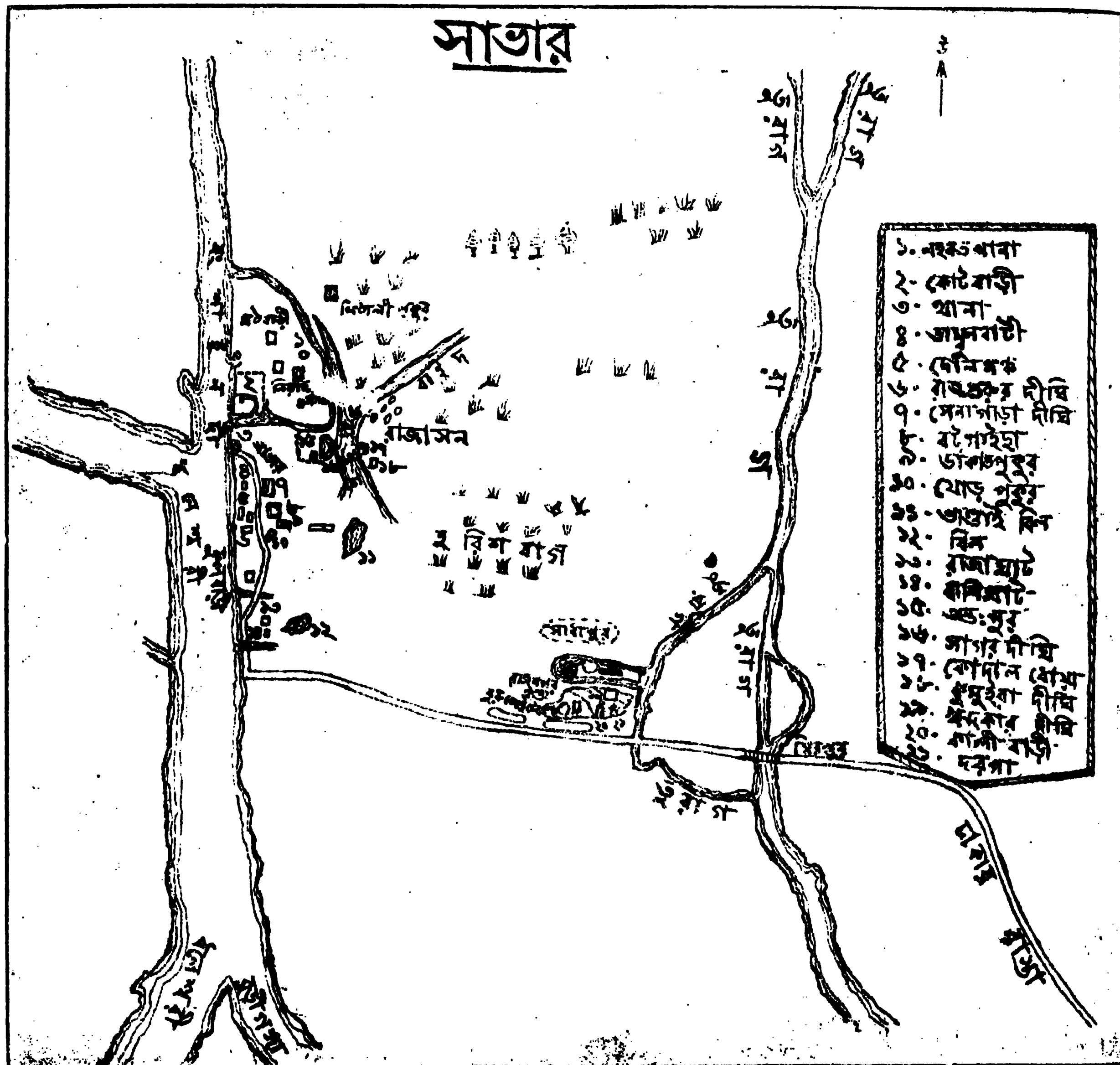
শ্রীকালিদাস রায়

স্মৃতি।

(Shelley)

তান কাঁপে হিয়ার মাঝার,
গান যবে থেমে যায়,
কুসুম শুকা'য়ে যায় তবু
আকুল সুবাস ভাসে বায়।
পাতা রচে বাসক-শয়ন
(যবে) গোলাপ সে ঝরে যায়;—
তুমি যাবে, স্মৃতিটি তোমার
রবে প্রেম-স্বপনের ছায়।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।



East Bengal Printing and Publishing House, Dacca.

সাভারে প্রাচীন কীর্ত্তি

(ঢাকা-সাহিত্য পরিষদে পঠিত)

ঢাকা নগরীর ছয় ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ফুলবাড়ী, কর্ণপাড়া, সাভার, গান্ধারিয়া, কুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম অবস্থিত। গ্রামগুলি পরস্পর এক মাইল কোথায়ও বা দুই মাইল ব্যবধান। ইহাদের মধ্যে সাভার গ্রামটি ধলেশ্বরী ও বংশাই নদী দ্বয়ের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত থাকাতে বাণিজ্যের সুবিধা হেতু উহা একটি দ্রুত উন্নতিশীল বন্দরে পরিণত হইয়াছে। সাভারের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ধলেশ্বরী-তটে ফুলবাড়ী গ্রাম। ফুলবাড়ীর বরাবর পূর্ব্বদিকে এক ক্রোশ অভ্যন্তরে কুণ্ডা ও গান্ধারিয়া অবস্থিত। ঢাকা জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যে লোহিত-মৃত্তিকাময় ও বনাবৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি সে উচ্চ ভূমির সর্ব্বদক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহাদের অব্যবহিত দক্ষিণ দিক হইতেই নিম্নভূমি আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ভূতাত্ত্বিকের মতে এই নিম্নভূমি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে সমুদ্রতরী আগমনের বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রাম ও সাভার প্রায় এক অক্ষরেখাতেই (Latitude) অবস্থিত এবং ইহাদের দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এই হিসাবে আমরা প্রাচীন কালে ঢাকা জেলার দক্ষিণ ভাগ সমুদ্রনিমগ্ন ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। অন্যদিকে পূর্ব্বকথিত গ্রামগুলি হইতে আরম্ভ হইয়া একটি বিস্তীর্ণ উচ্চ ভূমি ঢাকার উত্তর সীমা দিয়া মৈমনসিংহ জেলার মধুপুরের গড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। এই অরণ্যভূমি পূর্ব্বদিকে শীতললক্ষা হইতে পশ্চিমদিকে বংশাই নদীর তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উচ্চতা ও মৃত্তিকার অবস্থা দৃষ্টে এই নগরকে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। হিংস্রজন্তুবহুল নিবিড় বনে আবৃত থাকায় এ প্রদেশটিতে অতি বিরল বসতি। অনুসন্ধান ক্লেশের ভয়ে এবং এতদঞ্চলে শিক্ষিত লোকের অভাবহেতু এপর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিকথা এই অরণ্য-ভূমিতে লোহিত মৃত্তিকা-স্তূপের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। মৃগয়া ব্যাপারে বা অন্য কোনও কারণে যাহারা এই বন্ত ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিজন বন মধ্যে বিশাল দীর্ঘিকা, ইষ্টকস্তূপ, মৃৎপ্রাচীর প্রভৃতি দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই অঞ্চলে বিলাবো গ্রামে ভোজবর্ম্মদেবের যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এপ্রদেশটি প্রাচীন পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভোজবর্ম্মদেব "শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতী উষ্যলিকাগ্রাম" দান করিতেছেন বলিয়া উক্ত ফলকে বিবৃত আছে।

এই অরণ্য ভূমিতে কতিপয় প্রাচীন নরপতির রাজত্ব-কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সকল নরপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ এখনও অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদ্য আমরা ইহাদের একতম রাজা হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাস আলোচনা করিব।

পূর্ব্বকথিত সাভার, ফুলবাড়ী, গান্ধারিয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় দেশ হইতে যাত্রা করেন ও কিছুকাল ভোজগৌড় নগরীতে বিশ্রাম করিয়া সসৈন্যে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হন, এবং এপ্রদেশ বিজয় করতঃ বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করেন। বংশাবতী তটে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে আমার জনৈক বন্ধু এই পয়ারটি পাঠাইয়াছেন—

বংশাবতী-পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী॥

উক্ত পয়ার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র বংশাবতী বা বংশাই নদীর পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। পয়ারটি কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, উহা নাকি লোক-মুখে গীত হইয়া থাকে। কাজেই আমরা তদুপরি বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। সর্ব্বেশ্বরের বর্ত্তমান নাম সাভার; অন্য মতে সাভারকে সম্ভার করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে

সম্ভারপতি বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় সংস্কৃত কোন শব্দের অপভ্রংশ সাভার হইতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে কোনও মনস্বী সম্ভার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ সম্ভার নামটিও সকলের অজ্ঞাত। সম্ভার বা সর্ব্বেশ্বর ইহাদের কোনটিও ঠিক না হইতে পারে। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত নাম বাহির হইবে। আমরা সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীকে সর্ব্বেশ্বর নগরই বলিয়া যাইব।

রাজা হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তি স্থাপন করতঃ বহু জনপদ অধিকৃত ও করায়ত্ত করিয়া বিজয়লব্ধ অর্থে রাজকোষ পরিপূর্ণ করেন; এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া রাজধানী সর্ব্বেশ্বর নগর সুশোভিত ও সমলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সর্ব্বেশ্বর নগরের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে তিন ক্রোশ এবং পরিসর পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় দেড় ক্রোশ স্থানব্যাপী ছিল। এই সুবিস্তৃত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বংশাবতী তটে গভীর অরণ্য মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে ভগ্ন স্তূপরাশি এবং তাহাদের অবস্থিতি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় সর্ব্বেশ্বর নগর বর্ত্তমান ঢাকা নগরী হইতেও বৃহৎ এবং বহু সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল।

ঢাকার উত্তরস্থ লোহিত মৃত্তিকাময় সমগ্র অঞ্চলেই পানীয় জল বড়ই দুর্ঘট। বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মকালে কূপ ব্যতীত জল প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রজাবর্গের এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ রাজধানী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে বহু কূপ, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। রাজবাটীর চতুঃপার্শ্বেই 'সাড়ে বার গণ্ডা' বা পঞ্চাশটি দীঘি খনিত হয়। এখনও উহাদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। রাণী কর্ণাবতীর বিলাসভবন কর্ণপুরীতে সাড়ে সাত গণ্ডা অর্থাৎ ৩০টি সরোবর খনিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত রাজ্ঞী ফুলবতীর বিলাসবাটী, গান্ধারগড়, ভট্টপল্লী, মদনপুর প্রভৃতি রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য স্থানে বহু পুষ্করিণী খনিত হয়। কথিত আছে রাজধানীতে দীঘির সংখ্যা মোট "কুড়ি বুড়ি" অর্থাৎ ৪০০ শত; কাহারও কাহারও মতে ৭০০ শত। সর্ব্বেশ্বরের সমগ্র স্থান ভ্রমণ করিলে একথা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ সরোবরই এখন ভরট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকের অতি ক্ষীণ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কতকগুলিতে এখন ধান্য রোপিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দীঘিগুলির চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে সে সমুদয় জলহীন শুষ্ক ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অল্প কয়েকটি দীর্ঘিকাই গ্রীষ্মকালে জলহীন হয় না। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিতে ৩০টি দীঘি ও ৫০টি কূপ খনন করাইয়াছিলেন।*

এই সকল দীঘির অনেকগুলিরই পূর্ব্বনাম বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষকগণ পরিচয়ার্থ উহাদের অবস্থিতি ও তটভূমির প্রকৃতি দৃষ্টে এক একটি নামে উহাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকে। আমরা যে কয়েকটি দীঘি ও পুষ্করিণীর নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা ছাড়া বহু দীঘি ও পুষ্করিণী স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। কেহই তাহাদের নাম বলিতে পারে না।

রাজধানীর অন্তর্গত কতিপয় দীঘি ও পুষ্করিণীর নাম

* ১। সাগর দীঘি	* ৬। ধন পুকুর
* ২। সুখ সাগর	৭। নির্ম্মইল পুকুর
* ৩। রাজ সাগর	৮। লাল পুকুর
* ৪। নিরামিষ দীঘি	৯। ছোবামারা
* ৫। সতিনী দীঘি	* ১০। বন পুকুর

* কেহ কেহ বলেন একদা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে রাজা শত শত দীর্ঘিকা ও কূপ খনন করাইয়া জলপ্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং প্রজাগণ খনন কার্য্যদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বোধ হয় রাজধানীতে সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বাটীতে ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্থানে এই সকল সরোবর নিখাত হয়।

১১। জলরি
* ১২। মঠবাড়ী পুকুর (১)
১৩। দেওপুকুর
১৪। পেটকাটা
১৫। লালটেকি
১৬। সাতগাইছা
* ১৭। হাড়িবাড়ী
১৮। আন্ধারডথা
* ১৯। দোয়াতধোয়া
* ২০। কুমইরা পুষ্করিণী (২)
* ২১। কোদালধোয়া } (৩)
* ২২। কোদালধোয়া }
* ২৩। সলারপুকুর
(ঝাঁটা ধোয়া)
২৪। সলার পুকুর
(ঝাঁটা ধোয়া)
* ২৫। চাইরা
* ২৬। চৌমাথা
* ২৭। চটিমারা
২৮। চৌমাচ্চা
২৯। নাওগাড়া
৩০। বেকাই পুষ্করিণী
৩১। আইচা পুকুর
* ৩২। ভাটপাড়া দীঘি
(ভট্টপল্লীতে)
* ৩৩। সাতপুকুর
(সাতটি দীর্ঘিকা এক স্থানে)
৩৪। কেউচার পুষ্করিণী
৩৫। শোলার পুষ্করিণী
৩৬। মাগর ডুগী
* ৩৭। সাত বোয়াইলা
৩৮। নালার ঘোণা
৩৯। পিটালী পুকুর
৪০। যোড় পুকুর
(৩টি এক স্থান)
৪১। বেলগাইছা
৪২। কলাগাইছা
৪৩। বটগাইছা
৪৪। আন্ধা পুকুর
৪৫। তাল গাইছা
৪৬। বড়ই গাইছা
৪৭। জীয়স পুকুর
* ৪৮। রাজগুরুর পুষ্করিণী
৪৯। সানবাধা পুষ্করিণী
* ৫০। তাম্বুল বাড়ীর পুষ্করিণী (৪)
৫১। দাইতা বাড়ীর পুকুর
* ৫২। বড় খুড়া
* ৫৩। ছোট খুড়া
৫৪। ইছামতী
৫৫। ডাকাত মারা
* ৫৬। সেনাবাড়ীর দীঘি
(কর্ণপাড়াস্থিত সেনা-নিবাসের অন্তর্ভুক্ত)
৫৭। ধোপা খোলার পুকুর
৫৮। মালী পুকুর
৫৯। কুমার পুকুর
* ৬০। রাজার পুকুর
* ৬১। শ্মশান পুকুর
(মানুষ পোড়ার টেক সংলগ্ন)
৬২। পলোয়ানের দীঘি

এই সমুদয় সরোবর ব্যতীত অসংখ্য কূপ ও ইন্দারা খনিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে তাহাদের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও স্থলে দুই একটি কূপের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বোক্ত দীঘিগুলির মধ্যে সাগরদীঘি অতি বৃহদায়তন। ইহাতে চৈত্র মাসেও প্রায় ২ হাত জল অবশি থাকে। এই সাগরাকার বিশাল দীর্ঘিকার পশ্চিম তটে রাজবাটী ও অন্তঃপুর ছিল। এ স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, অবস্থিতিও তেমন রাজনৈতিক কৌশলপূর্ণ। সমভূমি হইতে প্রায় ১৫।২০ ফিট্ উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক ও মৃত্তিকাস্তূপ এখন রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। স্তূপনিচয় বনবাঁশ ও লতাদি বিজড়িত হইয়া অতি দুর্গম ও নিভৃত অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। এখনও ব্যাঘ্র, বরাহ, সর্প প্রভৃতি শ্বাপদনিচয় রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রিয় নিকেতনে বসতি করিয়া থাকে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার বাদামতলিঘাটনিবাসী আমিন হায়দর নামক জনৈক ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া কতিপয় ইষ্টকব্যবসায়ী রাজ-অন্তঃপুর খনন করিয়াছিল। খননচিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। স্থানীয় বৃদ্ধ অধিবাসিগণ এক বাক্যে বলিয়া থাকে যে, এ স্থান খনন করিয়া শত শত নৌকা বোঝাই ইট ও সুরকি ঢাকাতে চালান দেওয়া হইয়াছিল। বন্দোবস্তকারিগণ ৩০।৪০ টাকা দিয়া এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত লইত। সারা বৎসর খনন করিয়া যে ইষ্টকরাশি সংগৃহীত হইত উহাই বর্ষাকালে

(১)। রাজার স্থাপিত মঠের নিম্নে এই পুষ্করিণী অবস্থিত। মঠ এখন নাই। উহা ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণীতে পতিত হয়। এখনও পুষ্করিণীর সেই অংশে প্রচুর ইষ্টক পাওয়া যায়।

(২) ইহাতে কুম্ভীর ছিল।

(৩) পুষ্করিণী কাটাইবার কালে প্রত্যহ কার্য্যশেষে হাত পা ও কোদাল ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত।

(৪) ইহার পশ্চিম তটে দোলমঞ্চ, উত্তরে তাম্বুলবাড়ী ও দক্ষিণে রাজগুরুর আশ্রম।

* চিহ্নিত নামগুলি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক।

সাগরদীঘির ঘাট হইতে নৌকা (১) বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া হইত। এইরূপে স্থানে স্থানে ২০ এমন কি ৩০ হাত পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্ত করিয়া "কপিকল" দিয়া ইট উঠান হইত। প্রাচীর-ভিত্তি এরূপ খনন করাতে স্থানে স্থানে খালের ন্যায় গভীর অথচ সুদীর্ঘ গর্ত্ত এখনও বিদ্যমান আছে। গর্ত্তগুলির দুই ধারে ভগ্ন ইট ও সুরকির স্তূপ সমভূমি হইতে এখনও প্রায় ২০ হাত উচ্চ হইবে। এই সমুদয় খালের ন্যায় বিস্তৃত প্রাচীর-ভিত্তির খাত দেখিয়া বোধ হয় দ্বিতল রাজবাটীর প্রাচীরগুলি প্রায় ৩।৪ হাত পরিসর ছিল। বর্ত্তমানে কোনও প্রাচীরই এক গজের অধিক প্রশস্ত হয় না। ইষ্টকগুলিও অতি দৃঢ়দায়তনের।

এই সময়ে সাভারনিবাসী সাহা ও পাল মহাজনগণও এস্থান হইতে বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের আবাস বাটী নির্ম্মাণ করে; এখনও ঐ সকল বাটীতে অব্যবহৃত বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টক রহিয়াছে। যেগুলি দালানে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা এখনও গাঁথা আছে। স্বার্থান্ধ ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন কীর্ত্তির এরূপ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে সহৃদয় ঐতিহাসিক দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবেন সন্দেহ নাই। আজ যদি রাজবাটী পূর্ব্ববৎ অখনিত থাকিত তবে প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক উহা যথানিয়মে খনিত হইয়া জগতের সম্মুখে বঙ্গীয় প্রাচীন কীর্ত্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবিষ্কৃত ও উপস্থাপিত করিত। ভারত-বিখ্যাত মগধরাজপুরী খনন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হন নাই বঙ্গরাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদে সে সমুদয় অবিকৃত ভাবে প্রাপ্ত হইতেন, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে এক নব যুগের আবির্ভাব হইত সন্দেহ নাই।

(১) তৎকালে ইট বোঝাই নৌকা রাজাসনের উত্তরস্থিত "বাইদ" বা শুখা নদী দিয়া তুরাগ হইয়া ঢাকাতে পৌঁছিত। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে উক্ত শুখা নদীটি প্রকৃত নদীরূপে বারমাস রাজধানীর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহাতেই তৎকালে বাণিজ্যাদির বিশেষ সুবিধা ছিল বলিয়া বোধ হয়।

রাজবাটী খনন কালে যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল তাহারা এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। আমরা এরূপ কয়েকটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের * সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম বাটী খনন কালে ধনরত্ন ও মোহর সম্বলিত কতিপয় ভাণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে গোপন করা হইয়াছে যে, তাহাদিগের উদ্ধারের আর আশা নাই। তাহা ছাড়া কয়েকটি স্বর্ণ থালা এবং তামার বড় বড় পরাত (বড় থালা)ও পাওয়া গিয়াছিল। প্রাচীর ভাঙ্গিবার কালে খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি সম্বলিত বহু ইষ্টক পাওয়া যায়। দেবমূর্ত্তিও অনেক বাহির হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি স্থানীয় লোকেরা লইয়া যায়। যেগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় সেগুলি খননকারিগণ আত্মসাৎ করে। এই সময় চারিখানি ইষ্টক একটি মুসলমান বাটীতে নীত হয়। সেগুলি প্রাঙ্গণে হস্তপদ প্রক্ষালনার্থ ব্যবহৃত হইত। মূর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাইয়া কর্ণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত আচার্য্য মহাশয় সেগুলি চাহিয়া আনেন। তাহাই শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছে। বহুমূল্য শাল ও পরিধেয় বস্ত্র এবং ধান্যপূর্ণ কতিপয় ভাণ্ডও (মট্‌কি) পাওয়া গিয়াছিল। বস্ত্রাদির ও ধান্যের বর্ণ শত শত বৎসর পরেও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু হস্তস্পর্শ মাত্র সেগুলি ধূলিতে পরিণত হইয়া যায়। অনুসন্ধানে ভাণ্ডগুলির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অন্তঃপুরের অব্যবহিত উত্তরে কাটাগাঙ্গ। এই কাটাগাঙ্গ বংশাবতী হইতে আরব্ধ হইয়া প্রায় সরল রেখা ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে সাগর দীঘির উত্তর তট পর্য্যন্ত আসিয়া উত্তর দিকে যাইয়া রাজবাটী হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে পুনরায় বংশাবতীতে পতিত হইয়াছে। কাটাগাঙ্গের তটদেশে উচ্চ মৃত্তিকা-প্রাচীর উহার উৎপত্তি হইতে পতন

* ইহাদিগের মধ্যে জনৈক মুসলমান রমণীর পিত্রালয় রাজ-অন্তঃপুরেই বর্ত্তমান। উহারা প্রায় একশত বৎসর হইল ঐ স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতেছে। রমণী বালিকা বয়সে স্বচক্ষে খনন-স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি দেখিয়াছিল।

স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মৃত্তিকা-প্রাচীরের বর্ত্তমান বিস্তার ৪ হইতে ১০ ফিটের মধ্যে; বর্ত্তমান উচ্চতা ৫ ফিট হইতে ১৫ ফিট্। ইহাতে মধ্যে মধ্যে বড় বড় ইষ্টকখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। কাটা-গাঙ্গ খনন করিয়া উহার মৃত্তিকা দ্বারা এই সুদীর্ঘ প্রাচীর বা বেড় প্রস্তুত হইয়াছিল। কাটাগাঙ্গ একটি কুল্যা বা পরিখা বিশেষ। উহার বর্ত্তমান পরিসর ৪০ হইতে ৫০ ফিট। গভীরতা ৫ হইতে ১০ ফিট। বর্ষাকালে কাটাগাঙ্গে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। রাজধানীর অভ্যন্তরে নৌকা যোগে গমনাগমনের ইহাই একমাত্র অবলম্বন।

যে সমতল ভূভাগের উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় কাটাগাঙ্গ ও তটস্থিত প্রাচীর এবং পশ্চিম সীমাতে বংশাই নদী, রাজধানীর মধ্যে সেই সমতল প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত স্থান। সাগর দীঘির উত্তর তীর হইতে প্রায় ৭০০ গজ উত্তরে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরের অভ্যন্তরে "নিরামিষ দীঘি" অবস্থিত। দীঘি অতি বিস্তৃত। চারি পার সমভূমি হইতে প্রায় ৪ হাত উচ্চ। গ্রীষ্মকালে উহা শুষ্ক হইয়া যায়। হবিষ্যাশিনী ধর্ম্মরতা রাজ-মাতার নিমিত্ত এই পুষ্করিণী খোদিত হয়। ইহা একেবারে মৎস্য বিহীন। এজন্য ইহাকে আজিও নিরামিষ দীঘি বলে। চতুর্দ্দিকের মুসলমানগণ বলিল, বর্ষাকালে নিরামিষ দীঘির চতুঃপার্শ্বে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ দীঘিতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্যের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। সজীব মৎস্য উহাতে নিক্ষেপ করিলে উহা সত্বর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নিরামিষ দীঘির ৩০০ হাত উত্তরপূর্ব্বে কাটা-গাঙ্গের ১০০ শত হাত পশ্চিমে একটি উচ্চ ভিটি বর্ত্তমান আছে। উহা সমভূমি হইতে ৩০ ফুট উচ্চ। স্তূপের উপরে দুইটি কূপ বর্ত্তমান আছে। উহাদের চারিধার ইষ্টকে বাঁধান ছিল। ইষ্টকগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা ছাড়া স্তূপের উপরিভাগ শুধু ইষ্টকে আবৃত। এই স্থানে একটি সমুচ্চ গম্বুজ (Dome) ছিল। উহার উপরি-ভাগ হইতে প্রত্যহ তানলয় সংযোগে নহবত বাদ্য হইত। অনেক সময় মহারাজ স্বয়ং গম্বুজের শিখর-দেশে বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেন।* এতদ্ব্যতীত গম্বুজ-শীর্ষ হইতে কতিপয় প্রহরী সৈন্য সুদূরে নিরীক্ষণ করিয়া শত্রু সমাগম পর্য্যবেক্ষণ করিত। স্থানটি এখনও নহবতখানা নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই, রাজা হরিশ্চন্দ্র এই গম্বুজ-শীর্ষ দিয়া স্বর্গপথে যাতায়াত করিতেন।

নহবতখানার উত্তরপশ্চিমে মঠবাড়ীর পুকুর। ইহার তটদেশে বিরাটকায় সমুচ্চ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঠের অভ্রভেদী চূড়া সর্ব্বেশ্বরের গৌরবস্বরূপ দিগ্‌দিগন্তে রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিত। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধ শ্রমণদিগের একটি আশ্রম ছিল।

মঠবাড়ীর বহু উত্তরে ভট্টপল্লী। এই স্থানে রাজ-ভট্টগণের বসতি ছিল। সেকালে ভাটগণ দেশের জীবন্ত সংবাদপত্র রূপে বিরাজ করিতেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তৎকালীন নিয়মানুসারে ভাটদিগকে বহু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দ্বারা পালন করিতেন। তাঁহারা দেশ দেশান্তরে রাজকীর্ত্তি প্রচার ও দৌত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভাটগণও এস্থান হইতে বহু কাল হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন কতিপয় মুসলমান ভাটপাড়ায় বসতি করিয়া থাকে।

ছইলাকলমানামক স্থানে রাজ-সৈন্যের "চান্দমারি" হইত, অর্থাৎ এই স্থানে তীরদ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দেওয়া হইত।

অন্তঃপুরের উত্তরাংশে মদনপুরনামক স্থানে প্রকাণ্ড বাজার ছিল। এতদ্ব্যতীত ভাটপাড়ার উত্তর-পশ্চিমস্থ চাইরা-চৌমাথা নামক স্থানেও দুইটি বৃহৎ সরোবর ও দুইটি প্রসিদ্ধ বিপণি অবস্থিত ছিল। চারিটি

* সাধারণের বিশ্বাস এই যে, উক্ত গম্বুজশীর্ষ আকাশের সহিত সংলগ্ন ছিল। রাজা গম্বুজের শীর্ষদেশ দিয়া প্রত্যহ আকাশে বেড়াইতে যাইতেন।

বৃহৎ রাজ-পথের সংযোগ-স্থান বলিয়া উহা চাইরা চৌমাথা নামে খ্যাত। মেরিখোলা এবং আরও অন্যান্য স্থানে রাজার বন্দর থাকার প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজবাটীর পশ্চিমে কাটাগাঙ্গের উত্তর তটে এবং বংশাবতীর পূর্ব্বপারে যে স্থানে কাটাগাঙ্গ ও বংশাবতী একত্র মিলিত হইয়াছে, তথায় হরিশ্চন্দ্রের কোটবাড়ী বা দুর্গ অবস্থিত। কোটবাড়ী চতুষ্কোণ। চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ লাল মাটীর প্রাচীর। প্রাচীরের পরিসর নিম্ন দিকে ১২ হাত। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত পরিখা চতুর্দ্দিকে কোটবাড়ীকে বেষ্টন করিয়াছে। পশ্চিম দিকে বংশাবতীর প্রবাহ বর্ত্তমান থাকায় সে দিকের মাত্র কিয়দংশ পরিখা-বেষ্টিত। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে কাটাগাঙ্গ পরিখা রূপে বর্ত্তমান। দুর্গের চারি দিকে চারিটি বহির্গমন পথ বা দ্বার দৃষ্ট হয়। প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমভূমিতে সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। সমভূমির পরিমাণ ৬০ বিঘা হইবে। উহা এখন কাঁঠাল বাগিচায় পরিণত হইয়াছে। দুর্গটি ঢাকা লালবাগ কেল্লা হইতে কিছু ছোট হইবে। কিন্তু উহার অবস্থান অতি কৌশলপূর্ণ এবং নির্ম্মাতার রণ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কোটবাড়ীর দুর্গ রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিক রক্ষা করিত। "ধলেশ্বরী" বা বংশাই অতিক্রম করিয়া কোনও শত্রুর পক্ষে নগর প্রবেশ করা তৎকালে অসাধ্য ছিল।

রাজ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিশাল সাগরদীঘিতে তিনটি বাঁধান ঘাটের অবশেষ পাওয়া যায়। দীঘির পশ্চিম তটে রাজপুরীর অভ্যন্তরে প্রমোদবন ছিল। প্রমোদ-বনের অভ্যন্তরস্থ "কেলি-সরোবর" এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে ; উহা প্রায় ভরট হইয়া আসিল।

সাগর দীঘির পূর্ব্বতীরে একটি জলপ্রণালী বা "বাইদ" রহিয়াছে। বাইদটি (১) প্রায় ৩০০ শত হস্ত বিস্তৃত। উহার তলদেশে ধান্য রোপিত হইয়া থাকে। এই বাইদটি নহবতখানার উত্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া কাটাগাঙ্গের সহিত সমান্তরাল ভাবে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া সাগর-দীঘির পূর্ব্বতট দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া আসিয়াছে। বাইদের পশ্চিম তটে সাগর দীঘি এবং বরাবর অপর তটে "কোদাল ধোয়া" ও "কুমইরা দীঘি" বর্ত্তমান আছে। কুমইরা পুষ্করিণীর ২০০ শত হাত উত্তর হইতেই রাজাসনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজাসনে রাজার বহির্ব্বাটী ও দরবার গৃহ ছিল। দরবার গৃহে বা 'সভা নিকেতনে' রাজ সিংহাসন স্থাপিত থাকায় উহা "রাজাসন" নামে বিখ্যাত হয়। বর্ত্তমানে 'সভা নিকেতনে'র চিহ্ন মাত্রও নাই। স্থানটি আবাদ হইয়া যাওয়াতে কৃষকগণ চতুর্দ্দিক কাটিয়া সমভূমি করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল পাঁচটি শীর্ণকায় স্তূপ এখনও ক্ষীণ দেহে রাজ-সমৃদ্ধির ক্ষীণ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই স্তূপগুলিও কর্ত্তিত ও কর্ষিত হইয়াছে। স্তূপের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিকের প্রিয় পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে পারে। কৃষকগণ কোদাল দিয়া যতদূর সাধ্য স্তূপের উচ্চতা কমাইয়া তদুপরি হলকর্ষণ ও শস্যরোপণ করিতেছে। হলকর্ষণকালে বহু ভগ্নমূর্ত্তি স্তূপ হইতে বাহির হইয়াছিল। কোনটির হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা কেবলমাত্র কোমর পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি প্রায় সমুদয়ই লাল মাটির, এবং কতকগুলি অতি বৃহদাকার ছিল সন্দেহ নাই। কয়েক মাস হইল একটি স্থান কর্ষণ-কালে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি ও তিনখানি গোলাকার প্রস্তর দ্রব্য বাহির হয়। মূর্ত্তিগুলি অভগ্ন ও অতি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত ছিল। কৃষক বালকগণ সেগুলি ভাঙ্গিয়া চুড়মার করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও পাঁচখানি কৃষ্ণ বর্ণের মূর্ত্তি অন্য এক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। কৃষকেরা সকলেই মুসলমান। তাহারা মূর্ত্তি পাইয়া সকলেই পর্য্যবেক্ষণে রত হয়, সেই সময় কতিপয় নীচ জাতীয় হিন্দু সন্তান সে পথে চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা মূর্ত্তিগুলি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনখানি মূর্ত্তি না কি রোয়াইলের জমিদার বাড়ীতে প্রেরিত হয়। রাজাসনস্থ

(১) উচ্চ ভূমি হইতে জল সরিবার নিমিত্ত খালের ন্যায় অদীর্ঘ পয়ঃপ্রণালীকে এতদঞ্চলে 'বাইদ' বলা হয়।

এই ধ্বংসাবশেষগুলির উত্তরেই পূর্ব্ববর্ণিত বাইদের ন্যায় আর একটি বাইদ উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে আসিয়া প্রথমোক্ত বাইদে মিশিয়াছে। বাইদ দুইটির সঙ্গমস্থানটি ধ্বংসাবশেষ নিচয়ের উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত; সুতরাং রাজাসনের অবস্থিতি কিরূপ প্রাকৃতিক রহস্য-পূর্ণ এবং উহার দৃশ্য কিরূপ মনোরম তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইবে। সম্ভবতঃ সুদূর অতীত যুগে এই বাইদ দুইটি তুরাগের ন্যায় পার্ব্বত্য নদীরূপে বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে নদী-খাত ভরট হইয়া উহা বাইদে পরিণত হইয়াছে। শুনা যায় রাজাসনের উত্তরস্থিত বাইদকে ঢাকার বাইদ বলে। উহাদ্বারা পূর্ব্বে নৌকাদি তুরাগ নদীতে বাহির হইত। রাজাসনের পূর্ব্বদিকে সমতল প্রান্তর। দক্ষিণপূর্ব্বে গোপের বাড়ী। এই স্থানে রাজার প্রকাণ্ড গোশালা বর্ত্তমান ছিল। উহার নিকটেই ঘাসমহাল ও গোচারণ-মাঠ।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দুই জন মহিষী ছিলেন। প্রথমা করণাবতী (কর্ণাবতী); দ্বিতীয়া ফুলবতী। রাজা বৃদ্ধ বয়সেও পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া অবশেষে ফুলবতীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিধির বিপাকে পুণ্যবান্ হরিশ্চন্দ্রের পুত্রমুখদর্শন ঘটে নাই। রাজা দুই রাণীর নিমিত্ত রাজধানীতে দুইটি দীঘি খনন করেন। তাহাই এখন "দুই সতিনের" দীঘি নামে খ্যাত।

রাণীদ্বয়ের নিমিত্ত দুইটি বিলাসভবনও নির্ম্মিত হয়। রাণী কর্ণাবতীর বিলাসভবন কর্ণপুরী এখন কর্ণপাড়া নামে পরিচিত। আর ফুলবতীর কেলি-নিকেতন এখন ফুলবাড়িয়া নামে কথিত হয়।

কোটবাড়ীর অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণদিকে বংশাবতী-তটে রাজ্ঞী কর্ণাবতীর বিলাসভবন কর্ণপুর নির্ম্মিত হয়। কর্ণপুরীতে কেবল রাজ্ঞীর বিলাসভবন ছিল না। এই স্থানে বংশাবতীর তটদেশ হইতে প্রায় ১০০ হাত পূর্ব্বদিকে রাজার দোলমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। দোলমঞ্চ এখনও রাজকীর্ত্তির নিদর্শনরূপে নীরবে দণ্ডায়মান আছে। মঞ্চের অর্দ্ধাংশ লোকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভিত্তি বিদ্যমান আছে তাহার বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য পূর্ব্বপশ্চিমে ১২০ ফিট এবং উত্তর-দক্ষিণে ৯৬ ফিট। সম্ভবতঃ মঞ্চটি উত্তর দক্ষিণেই অধিক বিস্তৃত ছিল। মঞ্চের অবস্থিতি দৃষ্টে উহাই প্রতীত হয়। কিন্তু মঞ্চ-ভিত্তির অব্যবহিত উত্তরাংশ কাটিয়া জনৈক লোকের বাসভবন প্রস্তুত হওয়াতে এখন কিছুই চিনিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান মঞ্চটি কাটিয়া যে টুকু অবশিষ্ট রাখিয়াছে তাহার নিম্নদিকের আয়তন পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪২ ফিট। শিরোভাগের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪০½ ফিট, পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৪½ ফিট। মঞ্চের শিরোভাগ ভূমি হইতে ২৮ ফিট উচ্চ। দোলমঞ্চের বিভিন্ন স্থানের যে পরিমাপ দেওয়া হইল তাহা দেখিয়া বুঝা যাইবে মঞ্চটি কিরূপে কর্ত্তন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্বে ইহা একটি বিরাট মঞ্চ ছিল। ঢাকা পল্টন মাঠের উত্তরে সৈন্যদিগের জন্য যে "চাঁদমারি ভিটী" প্রস্তুত হইয়াছে দোলমঞ্চটি প্রায় তত বড় অথচ চতুষ্কোণ ঘন-ক্ষেত্রের (cube) আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। এই বিশালকায়, সমুন্নত দোলমঞ্চে মহাসমারোহে রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র অমাত্যবন্ধুসহ বসন্তোৎসবে যোগদান করিতেন।

দোলমঞ্চের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কত ঐতিহাসিক গৌরবস্মৃতি উদিত হইয়া মন আনন্দ রসে আপ্লুত করে! বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় দোলমঞ্চ অল্পদিন পরেই কোদালের আঘাতে সমভূমিতে পরিণত হইবে। আমরা কর্ণপাড়া নিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছে।

দোলমঞ্চের পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী। উহা উৎসবকালে ব্যবহৃত হইত। মঞ্চের অব্যবহিত দক্ষিণ দিকে বংশাবতী-তটে রাজগুরুর আশ্রম ছিল। এখন সে স্থানটীতে কতিপয় বাটী ও বৃক্ষ অবস্থিত আছে। উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগেই "রাজগুরুর দীঘি" এখনও সাধারণের নিকট পূর্ব্বনামে পরিচিত।

দোলমঞ্চের উত্তর দিকে রাজার তাম্বুলবাড়ী ছিল। কর্ণাবতী-ভবনে বিশ্রাম ও তাম্বুলবাড়ীতে রাজা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেন। তাম্বুলীরা তাম্বুলপাত্র হস্তে সসম্মানে

দণ্ডায়মান থাকিত। তাম্বুলিনীরা রাণীর সহচরীর কার্য্য করিত এবং তাম্বুল-করঙ্ক হস্তে রাণীর অনুগমন করিত। তাম্বুলবাটীর পূর্ব্বে এখন জেলা বোর্ডের সড়ক প্রস্তুত হইয়াছে। তাম্বুলবাটী ও বর্ত্তমান সড়কের পূর্ব্বদিকে সেনাপাড়া অবস্থিত। এই স্থানে সহস্র সহস্র রাজসৈন্য পরিখা-বেষ্টিত ভূমিতে অবস্থিতি করিত। পরিখার ক্ষীণ রেখা এখনও বিদ্যমান আছে। সেনাপাড়ায় সেনাপতিও বসতি করিতেন। এই স্থানের উত্তরদিকে একটি দীঘি বর্ত্তমান আছে; উহাকে সেনাপাড়ার দীঘি বলে। দক্ষিণদিকে বটগাইছা, ডাকাতপুকুর, কলাগাইছা, বেলগাইছা, যোড়পুকুর প্রভৃতি পুষ্করিণী সৈন্যগণের পানীয় সংগ্রহার্থ খনিত হইয়াছিল।

তাম্বুলবাটীর উত্তরেও একটি দীঘি বর্ত্তমান আছে; উহাকে "সানবাধা" দীঘি বলে। গ্রীষ্মকালে উহা শুষ্ক হইয়া যায়। পুষ্করিণীটির দক্ষিণ তীরে এখনও ইষ্টক বাঁধান সুন্দর ঘাট বর্ত্তমান আছে। ঘাটটি পাঁচ, ছয় রকমের ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। নিম্নে তাহাদের পরিমাণ ইঞ্চিতে প্রদত্ত হইল।

১।	৬×৫×১·৩	ইঞ্চি
২।	৫·৫×৪৮×১·৫	"
৩।	৫×৫×১·৮	"
৪।	৬×৪৫×১·৩	"
৫।	৭×৫×১·৪	"
৬।	৮×৬·৫×১·৮	"
৭।	৬×৫·৫×১·৫	"

রাজবাটীতে যে সমুদয় ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাদের কতকগুলির পরিমাণ ঐরূপ; অনেকগুলি আবার অতি বৃহৎ আয়তনের—

	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	বেধ
১।	২০—২২ ইঃ	১০—১২ ইঃ	৩—৪ ইঃ
২।	১০—১২ ইঃ	৫—৬ ইঃ	৩—৪ ইঃ

যাহা হউক কর্ণপাড়ায় "সাড়ে সাত গণ্ডা" অর্থাৎ ত্রিশটি দীঘির প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা যে কয়েকটির নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই সৈন্যদের নিমিত্ত খনিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেনাপাড়া রাজার প্রধান সেনানিবাস ছিল। সম্ভবতঃ এইজন্যই সুরক্ষিত স্থান বোধে ইহার নিকটেই পাটরাণীর বিলাসভবন নির্ম্মিত হয়। সেনাপাড়া রাজধানীর মধ্যস্থলে থাকিয়া নদী-তট ও মধ্যভাগ রক্ষা করিত।

সেনানিবাসের উত্তরাংশে কাত্‌লাপুর নামক স্থানে এখন ৺কানাইলাল নামক বিগ্রহের একটি আখড়া বিদ্যমান আছে। আখড়াটি বোধ হয় শত বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। স্থাপয়িতার নাম আন্দিরাম মাঝি, (১) জাতিতে জালিক। কানাইলালের মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত অতীব সুঠাম। এই মূর্ত্তিটি ছাড়া আরও দুইখানি প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি নরসিংহ মূর্ত্তি অন্যটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিও স্থাপিত আছে। প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা প্রায় দেড় হাত হইবে।

কর্ণপাড়ার অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে বংশাবতী বা ধলেশ্বরী-তটে ছোট রাণী ফুলবতীর বাসভবন পরে নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে রাজার পুষ্পোদ্যান ছিল। রাজফুলবাড়ীর অনেক স্থান ধলেশ্বরীর কুক্ষিগত হওয়াতে প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে। যে স্থান অবশিষ্ট আছে তথায়ও এরূপ ঘন বসতি হইয়া গিয়াছে যে, প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ অসম্ভব। তথাপি এইস্থানে দুইতিনটি প্রাচীন বৃহৎ দীর্ঘিকা

(১) আন্দিরাম নবাব সরকারে নৌকা বাহিত। একদা পদ্মা নদী অতিক্রম কালে আন্দিরাম মাঝি নৌকার ভিতর হইতে শুনিতে পাইল কে তাহাকে "আন্দিরাম আন্দিরাম" বলিয়া ডাকিতেছে। আন্দিরাম বাহির হইতে প্রশ্ন করিল "কে আপনি?" উত্তর হইল—"আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি—কানাইলাল, পাষাণমূর্ত্তিতে নদীগর্ভে পতিত আছি। এখন আমাকে উঠাও; আমি আর নদীগর্ভে থাকিব না।" আন্দিরাম উঠাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে দৈববাণী হইল "জাল ফেলিলে যখন টান পড়িবে তখনই আমাকে উঠাইবে।" আন্দিরাম তদনুসারে কার্য্য করিয়া কানাইলালকে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়।

এখনও শুষ্ক দেহে আপনাদের প্রাচীনতা ও খননকারীর রাজসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। একটি প্রাচীন দীঘির নাম "ক্ষিদ্রগতি (ক্ষিপ্র ?) সরোবর।" ফুলবাড়ীয়ার পূর্ব্বাংশে রাজাঘাট ও বালিঘাট বর্ত্তমান আছে; এই উভয় ঘাটের মধ্যস্থলে শুষ্ক নদীর ক্ষীণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। রাজ্ঞী ফুলবতীর বাসভবনে অবস্থান কালে রাজা এই ঘাটের জলে স্নান করিতেন বলিয়া আজিও উহা রাজাঘাট নামে কথিত হইয়া থাকে। রাজফুলবাড়ীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতেই উচ্চ ভূমি ও লোহিত মৃত্তিকাময় আরণ্য অঞ্চল শেষ হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বেশ্বর নগরের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। কোটবাড়ী হইতে ফুলবাড়ীর দক্ষিণাংশ দেড় ক্রোশ ব্যবধান।

পূর্ব্বকথিত কোটবাড়ী, সাভার, তাটপাড়া, মদনপুর, কর্ণপাড়া এবং ফুলবাড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি সর্ব্বেশ্বর নগরের বিভিন্ন অংশ বিশেষ। বংশাবতীর পূর্ব্বতটে রাজবাটী কর্ণাবতী ও ফুলবতীর বাসভবন সমসূত্রে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেকটিই পূর্ব্বে পরিখাবেষ্টিত থাকার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। রাজবাটী হইতে বিস্তৃত সকল রাজপথই নদী-তট দিয়া কর্ণপাড়া ও ফুলবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাহারও কাহারও মতে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর নাম সম্ভারনগর। একথা সত্য হইয়া থাকিলেও বোধ হয় কেবল রাজবাটী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানকে সম্ভার বলা হইত, তাহাই এখন সাভার আখ্যা পাইয়াছে।

প্রাচীন রাজবাটীর বিভিন্ন অংশ এখন বড়বলীমেহার, মস্‌জিদ্‌পুর (১) ও ইমাম্‌দিপুর (২) নামে খ্যাত।

কোটবাড়ীর ও সেনাপাড়ার দুর্গ ব্যতীত আর একটি বিশাল দুর্গ রাজধানীর দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করিত। উহার নাম গান্ধারপুর। বর্ত্তমানে গান্ধারিয়া নামে পরিচিত। গান্ধারগড় ফুলবাড়ী হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে এবং রাজাসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। গান্ধারিয়ার বর্ত্তমান অবস্থান সন্দর্শন করিলে স্থানটি যে অতি যত্নে নির্ম্মিত বৃহৎ দুর্গ ছিল তাহা স্বতঃই প্রতিভাত হয়। গান্ধারিয়ার চতুর্দ্দিকে প্রায় ৩৫০ হস্ত পরিসর বিশাল পরিখা বিদ্যমান আছে। পরিখাটি প্রায় তুরাগ ও বংশাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদীদ্বয়ের ন্যায় বিস্তৃত। এখন উহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। মধ্যভাগে এখন প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হস্ত বিস্তৃত একটি খাল বর্ত্তমান আছে। এই মধ্য অংশ এখনও সমস্ত বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে। গ্রীষ্মকালেও ইহার গভীরতা তিন হাতের কম নহে। প্রায় ডিম্বাকারে পরিখাটি গান্ধারপুর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন পরিখা যতদূর বিস্তৃত ছিল উভয় তটের ততদূর হইতে ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বর্ত্তমান শীর্ণকায় পরিখার তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন উভয় তটস্থিত ঢালু জমিতে ধান্য রোপিত হইয়া থাকে। পরিখাটী পূর্ব্বদিকে দুইটি শাখাদ্বারা তুরাগ নদীর সহিত সম্মিলিত। পরিখাতে এখনও রীতিমত জোয়ার ভাটা খেলিয়া থাকে। পশ্চিম দিক হইতে আর একটি খাল বংশাই হইতে আসিয়া পরিখাতে পতিত হইয়াছে। এই খালটি কেবল বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। গান্ধারপুরের সমৃদ্ধির সময়ে উভয় দিক হইতে উক্ত খাল দ্বারা পরিখার সহিত বংশাই ও তুরাগের সংযোগ রাখা হইত। ফলে পরিখা সর্ব্বদা গভীর জলে পূর্ণ থাকিত এবং নৌকারও সুবিধা ছিল। পরিখার বর্ত্তমান গভীরতা সমভূমি হইতে ২৫—৩০ ফিট্ হইবে। বঙ্গদেশে এরূপ সুদৃঢ় পরিখাপূর্ণ দুর্গ অতি বিরল। পরিখার অন্তর্ভুক্ত স্থান অতি উচ্চ এবং মৃত্তিকা ঘোর লোহিত বর্ণের। স্থানটির দৈর্ঘ্য পূর্ব্বপশ্চিমে এক মাইল এবং প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল হইবে।

এই বিশাল গড়ের পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাটীর

দৈববাণী হওয়াতে তাঁহাকে তথা হইতে পুনরায় কাত্‌লাপুরে আনা হইয়াছে। আখড়াটি জনৈক জালিক কর্ত্তৃক পরিচালিত। উহার ৩ খাদা ৫ পাখী (৩৷/ পাখী) দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত।

(১) মস্‌জিদ্ =ধর্ম্মমন্দির।

(২) ইমাম্—ধর্ম্ম।

ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। রাবণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশীয় ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তদীয় আবাস বাটীতে সঙ্গীত কলাভিজ্ঞ বহু ব্যক্তি বসতি করিতেন। তৌর্য্যত্রিকি সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা স্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশবিখ্যাত ছিল। সঙ্গীতজ্ঞগণ রাজা রাবণের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ তানলয় সংযুক্ত রাগ রাগিণী আলাপন দ্বারা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সন্তোষ বিধান করিতেন। কাল বশে রাজা রাবণের সে পুরী অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু স্থান ও বংশ-মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয় নাই। আজিও তথায় কতিপয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কর্ত্তৃক সাময়িক রাগ রাগিণীর আলাপন হইয়া থাকে। রাজা রাবণ এই প্রসিদ্ধ দুর্গকে গান্ধারপুর আখ্যা প্রদান করেন।

রাজা রাবণের বাটীর উত্তর দিকে পরিখা-তটে শ্মশান-ভূমি। শ্মশান-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত ছিল। শ্মশান ভূমির বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য ৪৪০ ফিট্ এবং পরিসর ২০০ ফিট্। দুইটি উচ্চ স্তূপে শব দাহ করা হইত। শ্মশান-স্তূপসংলগ্ন পূর্ব্বদিকে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সলিল সংগৃহীত হইত। পুষ্করিণীর বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য ১৮০ ফিট্। বহু কাল যাবৎ এ শ্মশান-ক্ষেত্রে কোনও শব দাহ করা হয় না। কারণ উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনও বসতি নাই। অনেকটা ব্যবধানে ঢালিপাড়ায় মুসলমান বসতি। কিন্তু আজিও স্থানটি "মানুষ পোড়া টেক্" নামে পরিচিত।

রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিম দিক হইতে ঢালিপাড়া আরব্ধ হইয়াছে। গড়ের অধিকাংশই ঢালিপাড়ার অন্তর্গত। ঢালিপাড়ায় ৫২ হাজার ঢালি সৈন্য বসতি করিত বলিয়া, প্রবাদ শুনা যায়। উহারাই গড়ের সংরক্ষক ছিল। সম্ভবতঃ রাজা রাবণ উহাদের নেতা স্বরূপ বসতি করিতেন। এই বিশাল ঢালিবাহিনী কর্ত্তৃক রাজধানীর দক্ষিণপূর্ব্বভাগ সুরক্ষিত ছিল।

ঢালিবাড়ীর উত্তরপশ্চিমাংশে একটি উচ্চ স্তূপ ছিল। স্তূপটি এখন কর্ত্তন করিয়া উহাতে কদলী বন প্রস্তুত হইয়াছে। এই উচ্চ স্তূপ হইতে সৈন্যগণ দূরাগত শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত। স্তূপের নিম্নে ইষ্টক বাঁধান বিস্তৃত ঘাট পরিখার তলদেশ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। ঘাটের ইষ্টকাদি এখন অপসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড ইষ্টক বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঘাটটির চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট।

ঢালিবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে বাগবাড়ী। বাগবাড়ীর পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ এতদঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজবাটীর দ্বারপণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেন। বাগবাড়ীর পণ্ডিতদিগের কথা লোকে শত-মুখে কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কিন্তু হায় কালের কুটিল গতিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিপুল কীর্ত্তিনিচয়ের সহিত সে দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বংশও বিলুপ্ত হইয়াছে। বাগবাড়ীর ন্যায় এরূপ সমতল উচ্চ ভূমি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ স্থান অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বাগবাড়ীর দক্ষিণেই রাজার দীঘি। উহার দৈর্ঘ্য ৪১২ ফিট্ এবং বিস্তার ২৭৬ ফিট্। দীর্ঘিকাতে চৈত্র মাসেও এক হস্ত গভীর জল থাকে। কেহ কেহ ইহাকে সম্প্রতি "আন্ধা পুকুর" বলিয়া থাকে। রাজপণ্ডিত বর্গের নিমিত্তই এই দীঘি খনিত হইয়াছিল। "রাজা রাবণের বাটী", "ঢালিবাড়ী" এবং "বাগবাড়ী" বেড় দ্বারা অপরাংশ হইতে পৃথক থাকাতে গান্ধারিয়ার অবশিষ্টাংশ "বেড়াইদ" নামে কথিত হয়। শেষোক্ত স্থানে "নগর বসতি" অর্থাৎ নাগরিকগণের বাসস্থান ছিল!

গান্ধারগড়ের পূর্ব্বদিক হইতে নিম্ন ভূমি তুরাগ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়ের উত্তরদিকস্থ পরিখার অব্যবহিত উত্তরে সাধাপুরগ্রাম। এখানেও অনেক প্রাচীন দীঘি বর্ত্তমান আছে। এই স্থানটিতে ধোপা, মালী, কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতীয় লোকের ব্যবহারার্থেই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। তজ্জন্য পুষ্করিণীগুলির নামও তদনুযায়ী। যথা :—(১) ধোবাখোলার পুকুর, (২) মালী-পুকুর ইত্যাদি।

সাধাপুরের উত্তরে রাজাসন হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ

দক্ষিণপূর্ব্বে হরিশবাগ (১) অবস্থিত। এইস্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্র বিবিধ ফলের উদ্যান প্রস্তুত করেন। স্থানটি এখন নিবিড় বনে আবৃত, বহু বৃক্ষসমন্বিত এবং বিজন। হিংস্র শ্বাপদনিচয়ের আবাসভূমি বলিয়া কেহই তথায় নিরস্ত্র যাইতে সাহসী হয় না। এখানেও ইষ্টকখণ্ড বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ এস্থানে রাজার উদ্যানবাটী নির্ম্মিত ছিল।

আমরা সংক্ষেপে রাজধানী সর্ব্বেশ্বর নগর ও তদন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা করিলাম। বিশাল রাজধানীর প্রত্যেক স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে আরও ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যাইবে। রাজধানী বিজন অরণ্যে পরিণত হওয়াতে অনুসন্ধান অতীব কষ্টদায়ক হইয়াছে সন্দেহ নাই।

রাজা হরিশ্চন্দ্র এই বিশাল রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুবিজয় করতঃ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। প্রত্যহ দুগ্ধবতী গাভী ও স্বর্ণ দান করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন। কৃষকগণ বলিয়া থাকে রাজা প্রত্যহ ৫।৬ পণ্ডরি স্বর্ণ দান করিতেন। পুণ্যবান্ হরিশ্চন্দ্রের নাম এতদঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয়।

রাজা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াও পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারেন নাই। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সহোদরা রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত রাজা দামোদরকে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। *

রাজবাটীতে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্ম্মেই আস্থাবান্ ছিলেন। বৌদ্ধমূর্ত্তি নিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দোলমঞ্চ, রথখোলা প্রভৃতি দর্শনে এ কথাই সমর্থিত হয়। বস্তুতঃ রাজা উভয় ধর্ম্মেই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। সেকালে বহু রাজপরিবারেই এরূপ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত এবং বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণের প্রাধান্য থাকাতে অনেক স্থলেই এরূপ হইত। বিশেষতঃ বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করাতে আর কোনও গোলযোগ ছিল না। ফলে রাজগণ হিন্দু প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানেও বিমুখ হইতেন না। তবে যাহারা রথযাত্রাকে দন্তযাত্রা বলিতে চাহেন আমরা তাহাদিগকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিব কি না সন্দেহ।

হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন একথা শুনিবা মাত্র কতিপয় নব্য ঐতিহাসিকপ্রবর ঘরে বসিয়া বসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে 'পাল' উপাধিতে ভূষিত করিয়া পালবংশের তালিকাভুক্ত করিতে ব্যগ্র হন। এরূপ গবেষণা প্রশংসাজনক বটে। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, কাহারও নিকট এই ভিত্তিহীন কথার প্রমাণ পাইতে পারি নাই। বিশেষতঃ রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে অধস্তন পুরুষগণ এখনও বিদ্যমান তাহারা এ কথা ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন না। এরূপ স্থলে কাল্পনিক বিষয়ে বিতণ্ডা অনর্থক। দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নূতন ব্রতী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণও ইহাদিগের দ্বারা বিপথে

(১) কেহ কেহ ইহাকে হরিরবাগও বলিয়া থাকে।

* হরিশ্চন্দ্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এতদঞ্চলে আপামর সাধারণে প্রচারিত রহিয়াছে—বৃদ্ধবয়সে রাজা নিজপুরীস্থিত রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়া সশরীরে স্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান্ হরিশ্চন্দ্রের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দেবগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। রাজা অনুচরবর্গের কোলাহলে স্বর্গে অবস্থান অসম্ভব হইবে স্থির করিয়া তাঁহারা রাজাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বকৃত পুণ্যবলে রাজা আর ধরাধামে পতিত না হইয়া তদবধি ত্রিশঙ্কুর ন্যায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় লোকেরই বিশ্বাস যে, ধান, চাউল বা শস্যাদি গৃহে আনিয়া মাপিয়া না রাখিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র পরিবারবর্গের আহারার্থ উহা হইতে কতক অংশ অপহরণ করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্ মহীপতির কি শোচনীয় পরিণাম!! স্ত্রীলোকেরা পারিবারিক কোনও কার্য্যের ক্রততা হেতু শস্যাদি মাপিয়া রাখিবার অবসর না পাইলে অন্ততঃ উহার কিয়দংশ করপুটে লইয়া তিন চারিবার মাপিবার অভিনয় করিয়া রাখিয়া যাইবেই।

চালিত হইয়া পড়েন। এই শ্রেণীর লোকদিগের রচিত দুই একখানি আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া সর্ব্বেশ্বর অঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তিও পাল উপাধি ব্যবহারের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। বারান্তরে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র আবির্ভূত হন। বংশ পত্রিকামতে হরিশ্চন্দ্র হইতে বর্ত্তমানে ৩৮ আটত্রিশ পুরুষ চলিতেছে। তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরিলে রাজা এখন হইতে প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১২ – ১৩০০ = ৬১২ সনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। বংশ পত্রিকার বিবরণী ব্যতীত আরও নানাবিধ প্রমাণ দর্শনে আমরা সপ্তম শতাব্দীতেই হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব স্থির করিতে অভিলাষী। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকীর্ত্তির যাহা কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাতেই একথা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন না। রামপালে বল্লালসেনের যে কীর্ত্তিশেষ দৃষ্ট হয় তাহা ইহার শতাংশেরও তুল্য নহে। সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্র সেনবংশের সমসাময়িক হইলে বিক্রমপুরের অব্যবহিত উত্তর-স্থিত সর্ব্বেশ্বর নগরীর বিবরণী অন্ততঃ কথাপ্রসঙ্গেও উল্লিখিত থাকিত। ইহাতে বোধ হয় হরিশ্চন্দ্র নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্য দিকে বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসন কালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রাধান্যই সূচিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট এবং নবমে শঙ্করাচার্য্য ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত করেন। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতে হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাবই সম্ভবপর হইয়া উঠে। হরিশ্চন্দ্রের পর তদীয় ভাগিনেয় রাজা দামোদর এবং তৎপর দামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধস্তনের সময় কোচ সৈন্যগণ সর্ব্বেশ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়াছিল। আমরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে আসামরাজ (১) হর্ষদেব কর্ত্তৃক গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্ত্তা পাইয়া থাকি। সম্ভবতঃ ঐ সময়েই কোচ ও আহম সৈন্য সর্ব্বেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ৩৪ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়। খৃষ্টীয় ৬২৯—৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত পরিব্রাজক হিউয়েনথ্ সাঙ্ এদেশে অবস্থিতি করেন। তদীয় বিবরণে 'সর্ব্বেশ্বর' বা 'সম্ভার' কোনও নামই পাওয়া যায় না। বোধ হয় সর্ব্বেশ্বর নগর সংস্থাপনের কতিপয় বৎসর পরেই হিউয়েনথ্ সাঙ্ এদেশে আগমন করেন। নব রাজধানী তখনও দেশ বিখ্যাত হইতে না পারায় উহা উল্লিখিত হয় নাই। অথবা খৃষ্টীয় ৬৪৫ অব্দের অব্যবহিত পরেই সর্ব্বেশ্বর নগর বিনির্ম্মিত হয়।

সর্ব্বেশ্বর পরিভ্রমণ কালে তথাকার জনৈক শিক্ষিত লোকের সহিত আমাদিগের আলাপ হয়। তাঁহার মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র মগধরাজ অশোকের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। আমরা কথাটি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাগিনেয় দামোদরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। রাজা দামোদর হরিশ্চন্দ্রের সহোদরা রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভসম্ভূত। কৃষকগণ দামোদরকে "দামুরাজা" ও রাজেশ্বরী দেবীকে "রাজিরাণী" বলিয়া থাকে। রাজা দামোদর রাজাসনেই অধিক সময় বসতি করিতেন। তাঁহার সময়ে রাজাসন পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। রাজাসনকে তজ্জন্য দামোদর রাজার রাজধানীও বলা হয়। রাজা দামোদরের শাসনকালেও রাজবংশের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বর্ত্তমান ছিল। রাজা দামোদর কর্ত্তৃক রাজাসনের দক্ষিণ দিকে রথখোলানামক স্থানে প্রতিবৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এখন তথায় রথযাত্রার কোনও লক্ষণ বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু স্থানটি এখনও রথখোলা নামে পরিচিত। রাজাসনের সন্নিকটে সর্ব্বেশ্বর পতি রাজা দামোদরের

(১) Vide Indian Atiquary Vol IX p. 178.

'পীলখানা' ও অশ্বশালার চিহ্ন এখনও লোকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া থাকে।

দামোদরের পর হইতেই রাজবংশের অবনতি আরব্ধ হয়। বিশাল রাজ্য ক্রমশঃ কোচগণ অধিকার করিতে থাকে। আহম ও কোচগণ রাজসৈন্য নির্ম্মূল করিতে করিতে মধুপুর ভাওয়াল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিল। সর্ব্বেশ্বরপতি প্রাণপণ সত্বেও রাজধানী রক্ষা করিতে না পারিয়া সপরিবারে সর্ব্বেশ্বরের দক্ষিণ—পূর্ব্বস্থিত সুরক্ষিত গান্ধারগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বিপক্ষদল মহোল্লাসে রাজধানী অধিকার করিয়া রাজভবন ও পণ্যবীথিকানিচয় লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রাসাদ ও দেবালয় বিচূর্ণ এবং হট্টস্থান ও প্রকৃতিপুঞ্জের আবাস নিচয় অগ্নিসাৎ করিয়া প্রস্থান করে। এই সময় হইতেই কোচগণ ভাওয়াল অঞ্চলে বসতি নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে।

কোচবাহিনী চলিয়া গেলে বিধ্বস্ত সর্ব্বেশ্বরের পুনর্নির্ম্মাণ বহুব্যয়সাধ্য এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া তদানীন্তন সর্ব্বেশ্বরপতি গান্ধারপুর পূর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত করতঃ তথায় বসতি করিতে থাকে। এই সময় হইতেই রাজাসন প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়। একমাত্র কোটবাড়ীতে তখন কতক সৈন্য রাজ্যের উত্তর দিক সংরক্ষণার্থ অবস্থিতি করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসামরাজ হর্ষদেবের শাসনকালে সম্ভবতঃ এই আক্রমণ ব্যাপার সংঘটিত হয়।

এই সময়ে গান্ধারপুরে নব রাজধানী নির্ম্মাণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পরিখাবেষ্টিত গড়ের অভ্যন্তরে কেবল রাজ-অন্তঃপুর, গুপ্তভবন, অস্ত্রাগার, সৈন্যনিবাস ও দ্বারপণ্ডিতবর্গের সমাবেশ স্থান ছিল। রাজবাটী, রাজকর্ম্মচারিগণের বসতি, সভাক্ষেত্র, বিপণি প্রভৃতি সম্বলিত রাজধানীর নিমিত্ত গান্ধারপুরের দক্ষিণদিকে পরিখার অব্যবহিত দক্ষিণস্থ উচ্চ ভূমি মনোনীত হয়। বর্ত্তমানে উহা "রাজনগর কোণ্ডা" (কুণ্ডা) নামে কথিত। গান্ধারগড় ও "রাজকুণ্ডার" মধ্যে কেবল পরিখাটি ব্যবধান। "রাজকুণ্ডা" গান্ধারিয়া হইতে আয়তনে অনেক বিস্তৃত। উহার দৈর্ঘ্য দেড় মাইল এবং প্রস্থ প্রায় এক মাইল হইবে। গ্রামটি প্রায় ডিম্বাকার। ইহার উত্তর দিকে গড়ের পরিখা কার্য্যতঃ ইহারও পরিখারূপে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে তুরাগ নদী প্রবাহিতা। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকেও পরিখা-বেষ্টিত করিয়া কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বহির্গমন পথ রাখা হইয়াছিল। বিস্তৃত পরিখার সুস্পষ্ট নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। উহার অনেক স্থান ভরাট হইয়া গেলেও তলদেশ এখনও অতি নিম্ন। গ্রামটির চতুর্দ্দিকেই জলাভূমি; স্থলসৈন্যের পক্ষে দুর্গম। নব রাজধানীর পশ্চিম প্রান্তে বহির্ব্বাটী (সভাগৃহ) ও প্রকাণ্ড বিপণিক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। *

রাজা দামোদর হইতে একাদশ অধস্তন রাজা শিবচন্দ্র রায় অতি বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার সময় হইতেই রাজবংশ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইনি ব্রহ্মচারী বেশে ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন, এবং কতিপয় বৎসর ৬পুরীধামে অবস্থিতি করিয়া তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজা শিবচন্দ্রের সময়ে কোটবাড়ী ও গান্ধারপুর এই দুইটি দুর্গ রাজবংশের অধিকৃত ছিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র হইতে দ্বাদশ অধস্তন শিবচন্দ্র সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বল্লালসেন কিম্বা তৎপিতা বিজয়সেনের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। শিবচন্দ্রের পর হইতেই তদীয় বংশধরগণের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতে

* রাজকুণ্ডার দক্ষিণ হইতেই নিম্ন ভূমি আরব্ধ হইয়াছে। এই নিম্ন ভূমি বৎসরে প্রায় সাত মাস জলে পরিপূর্ণ থাকে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই সমুদয় নিম্ন ভূমি নল, খাগড়া প্রভৃতি জলজ তৃণাদি পরিপূর্ণ ও হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি ছিল। সম্প্রতি উহা আবাদ হইয়া গিয়াছে। এই নিম্ন ভূমি দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

থাকে। সেন রাজত্বের শেষ সময়ে ইহারা কার্য্যতঃ একটি প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশে পরিণত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

ইহার দুই তিন শত বৎসর পরে এই বংশে মুসলমান রাজত্বকালে কতিপয় মহাপুরুষ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা বারান্তরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে অদ্য এখানেই আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

পরিশেষে আর একটি কথা বক্তব্য এই যে, সর্ব্বেশ্বরের রাজকীর্ত্তিনিচয় সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কতিপয় কৃতবিদ্য লেখক স্বল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ঢাকার খ্যাতনামা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় এবং বিক্রমপুর নিবাসী পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় একাদিক্রমে সাভার, ফুলবাড়িয়া, গান্ধারিয়া প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া রাজবংশ-ধরগণের নিকট পূর্ব্ববিবরণ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষানুগত সংস্কার ও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা তৎকালে বিশেষ কোনও বিবরণ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়। ৺গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় এতদর্থে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিয়াও রাজকীর্ত্তি নিচয়ের যৎসামান্য পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বৃদ্ধদিগের নিকট প্রাচীন পুঁথি বা কাগজপত্র দেখিতে চাহিলে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই অস্বীকৃত হন এবং অনুসন্ধিৎসুর প্রতি সন্দিগ্ধনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। আমরা অনেক স্থলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা হউক যে সমুদয় বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহারই স্থূল মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত আরও যে সমুদয় কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান ও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে একে একে তৎসম্বন্ধে আলোচনার বাসনা রহিল। সর্ব্বেশ্বরের চতুঃপার্শ্ব বিজন অরণ্যে পরিণত হওয়াতে এক দিকে যেমন অনেক স্থানই দুর্গম ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে অন্য দিকে তেমনই ধ্বংসাবশেষ নিচয়ের চিহ্ন সমূহ অতি সুস্পষ্ট বিদ্যমান। তথাপি বর্ত্তমান বংশধরগণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনেক কীর্ত্তিরই মূল আবিষ্কার কষ্টকর হইয়া পড়িত। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রবাদ চিরকালই প্রবাদ। উহার উপর ইতিহাস দণ্ডায়মান হইতে পারে না। তবে প্রবাদের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলে বিলুপ্ত ঐতিহ্য তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। ইহা ভাবিয়াই আমরা সমগ্র বিষয়টি সুধীবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। ভরসা করি কৃতবিদ্যব্যক্তিগণ এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন ইতি-হাস সঙ্কলনে প্রয়াসী হইবেন।

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

ঝঞ্ঝা

নিবিড় মেঘেতে ঘেরা সঙ্গীহীন সাঁঝে
গ্রন্থগুলি দূরে রেখে রুদ্ধ কক্ষ মাঝে
ছিনু একা চিন্তামগ্ন ; থাকিয়া থাকিয়া
ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা বসুধার বক্ষ আলোড়িয়া
অধীরে বহিতেছিল করিতে প্রকাশ
বিরাট বিশ্বের কোন্ অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস!
যেন সতীদেহত্যাগে ক্ষিপ্ত রুদ্র দূত
আস্ফালিয়া দক্ষপুরে তাণ্ডব অদ্ভুত

বিগত আষাঢ়ের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথার অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ পূর্ব্বেই লিখিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে এবার আলোচনার অবকাশ হইল না। বারান্তরে হরিশ্চন্দ্রের অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপসহ শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

লেখক।

নিবেদিতে ভূতনাথে শোক-সমাচার
কৈলাসে ছুটিতেছিল করি হাহাকার !—
ভাবিতে লাগিনু সেই বিদায়ের কথা,
শৈলশৃঙ্গে শৈলসুতা, সৌদামিনী যথা,
প্রণমিয়া ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটির পায়
দক্ষযজ্ঞে যেতে যবে মাগিলা বিদায় !
আশীর্ব্বাদী জবা দুটি কর্ণমূলে দিয়া
ভোলার মঙ্গল হস্ত উঠিল কাঁপিয়া !
হায় মা সে জবা দুটি নিয়ে কর্ণমূলে
আর না আইলি ফিরে মহেশের কোলে !
তখন মেলিয়া জিহ্বা ক্রুদ্ধ রুদ্র নাগ
গর্জ্জিয়া ঘোষিল যেই ভৈরবের রাগ,
আজিও গবাক্ষ-রন্ধ্রে বুঝি সে রসনা
ঝলসিছে ব্যোমে করি বিজলী রচনা !

ক্ষুদ্র কক্ষে ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছে ক্ষীণ
আমি বসে' শয্যাপার্শ্বে হেন চিন্তালীন ;--
সহসা খুলিল দ্বার, একটি উচ্ছ্বাস
উন্মত্ত বন্যার ন্যায় করি অট্টহাস
মুহূর্ত্তে সে ক্ষীণ দীপ করিয়া নির্ব্বাণ
শত রন্ধ্রে অন্ধবেগে করিল প্রস্থান !—
হারে মূঢ় অন্ধ ঝঞ্ঝা ! কে তুই কৌতুকী
ফিরিস্ সতত বিশ্ব-রন্ধ্রে দিয়ে উঁকি ?
কে তুই সৃষ্টির শান্তি করে' সদা গ্রাস
ধ্বংসের আনন্দ নিয়ে করিস্ উল্লাস ?
ক্ষুদ্র কীট তন্তুজালে বৃক্ষের কোটরে
রচি যেই ক্ষুদ্র গৃহ নীরবে বিহরে,
ফুৎকারে যেমন তাহে দিস্ উড়াইয়া
তেমতি আবার চণ্ড উচ্ছ্বাসে বহিয়া
কক্ষ-চ্যুত করে' দিস্ গ্রহ উপগ্রহ,
ধ্বংস নিয়ে একি তোর খেলা অহরহ !

সৃষ্টির দু'কূলে বসি জীবন-মরণ,—
তুই কিরে সে দূরত্ব করিতে হরণ
খুঁজিয়া বেড়াস্ বিশ্ব ! যেথা আলো হাসে,
মুছে ফেলে' তোর দৃপ্ত উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
বিশ্বেরে ঠেলিস্ যেন নিতে অনিবার
ঘনীভূত রহে যথা মৃত্যুর আঁধার !
আঁধার কক্ষের মম মুক্ত দ্বার দিয়া
যে অন্ধ আবেগ ওই যাইছে ছুটিয়া,
তার মধ্যে তুই কিরে হাহা হাহা করি
হাসিছিস্ ব্যঙ্গ-হাস্য জয়-গর্ব্ব স্মরি !
চিরস্থির অন্ধকার মৃত্যুর যে স্থান,
তুই কিরে সেথা মোরে করিস্ আহ্বান !
কোথা নিয়ে যেতে চাস্ ! শূন্যে তারা নাই,
নিয়ে জড় জীব কিছু দেখিতে না পাই,
শুধু তুই, আর আমি ! যে অজানা দেশে
যাত্রী করে' নিতে মোরে এলি সাথী বেশে,
কত দূরে সেই দেশ ! অঙ্গুলি ধরিয়া
নিয়ে যবে যাবি মোরে অন্ধকার দিয়া,
মোর যদি মনে হয়, বিশ্বভূমণ্ডল
হারা'য়ে অতীতে কোন্ নিগূঢ় মঙ্গল,
সতীহারা শিব সম, মথিয়া আকাশ
করিছে সতত হেন আকুল উচ্ছ্বাস.
রুদ্র কণ্ঠে নাগ সম তুই ঝঞ্ঝা তার
করিস্ সে শুভ তরে সদা হাহাকার,—
তোর সনে সে মঙ্গল আমি যদি চাই,
তুই কি কহিবি শুধু, নাই, নাই, নাই !

শ্রীযশোদালাল বণিক।

সাধক মৃত্যুঞ্জয়

ভূমিকা। সোনার বাংলার নির্জ্জন পল্লীতে বিভিন্ন সময়ে কত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-বলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহার একটা

ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই,—বর্ত্তমান যুগে নবীন ঐতিহাসিকগণ ধ্বংস-স্তূপ, শিলালিপি, তাম্র-শাসন হইতে প্রকৃত ঘটনার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারে যেরূপ বিপুল শক্তি, প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা এদিকের লুপ্ত-প্রায় ইতিহাস ও জীবনচরিতের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইয়া দেশবাসীকে বিপুল ঋণে আবদ্ধ করিবেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-বীরদের পুণ্য কাহিনীর উদ্ধার সাধন হইলে বঙ্গদেশ ধন্য হইবে, বাঙ্গালীর জীবন কল্যাণ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

বালক মৃত্যুঞ্জয়।

প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অধীন দেবভোগ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে "বারুই" বংশে মৃত্যুঞ্জয় দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা বারুই, পানের কৃষি ও পান বিক্রয় ইঁহাদিগের ব্যবসায়। মৃত্যুঞ্জয় দত্তের পিতার আর্থিক অবস্থা বড় সচ্ছল ছিল না। কাজেই ইঁহার লেখাপড়ার কোন ভাল বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের মাসি আদর—যত্নে ইঁহাকে লালন-পালন করিতেন। অর্থকরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলেও মৃত্যুঞ্জয় সংযমী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার উন্নত ললাট ও প্রতিভাব্যঞ্জক চক্ষু দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইত। গ্রামের লোক তখনও মৃত্যুঞ্জয়কে জানিত না। গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ সরল-প্রাণ সাধকের কোনও সংবাদ রাখিত না। এক দিন প্রভাতে মাসী-বাড়ীর সংলগ্ন পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভিটায় এমন এক দৈব ঘটনা ঘটিল যে, সেই হইতে নিরক্ষর মৃত্যুঞ্জয় 'সাধক মৃত্যুঞ্জয়' নামে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বারুই সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

সত্যগুরু প্রাপ্তি।

ভোর হইয়াছে। প্রভাতারুণ বাগানের গাছের পাতার ফাঁক দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। বালক মৃত্যুঞ্জয় মাসির গৃহ হইতে একটু দূরে পরিত্যক্ত ভিটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে মুখ ব্যাদান করিয়া একটা ব্যাঘ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে মানুষ দেখিয়া ব্যাঘ্রের সর্ব্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, ক্রোধে তাহার দুইটি চক্ষুর তারা হইতে অগ্নি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় অস্ফুট গর্জ্জন করিতেই মৃত্যুঞ্জয়ের অঙ্গুলি সঞ্চালনে

'নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
নীরব বিহঙ্গকুল, শান্ত বনচর,
বলি হারি প্রহরীর এমনি শাসন,
চিত্রলেখা সম ভাব সমস্ত কানন!' *

সহসা সমুজ্জ্বল আলোর বন্যায় সেই তিমিরাবৃত বন-ভূমি ভাসিয়া গেল—মায়ারূপী ব্যাঘ্র নিজ সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের কানে মন্ত্র দিয়া চলিয়া গেল। বাল যোগীর ফুল্লারবিন্দ তুল্য দুই নেত্র নিমীলিত হইল এবং তাহার দেহের চতুর্দ্দিকে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় যোগানন্দে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মাসি খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—মৃত্যুঞ্জয়ের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল সংসারের সঙ্গে তখন তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিছুক্ষণ পর মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার রসনা হইতে 'সত্য-গুরু' এই বাক্য বাহির হইল। মাসি অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"বাবা, আজ তোমাকে যেন কেমন দেখাইতেছে। তোমার মুখশ্রী ও চক্ষু দেখিয়া মনে হয় তোমার প্রাণের ভিতর কি একটা নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমার শরীর ভাল ত?"

মৃত্যুঞ্জয় কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন। যোগাসন হইতে উঠিয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

* "নবরত্নমালা" হইতে গৃহীত।

মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছের নীচে তিনি যোগাসন করিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল মৃত্যুঞ্জয় 'গুরু-সত্য' (সাধারণ লোকে 'গুরুসত্য'ই বলিত) পাইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক (স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক) তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার পায়ে মাথা লুটাইয়া পড়িল।

বিরুদ্ধবাদী।

বিরুদ্ধবাদীরা বলিল,—"এ কিছু নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের ইহা বুজরুকি। এ ভেল্কী কয় দিন থাকিবে?" কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল। চারিদিকে এত যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ণগোচর হইল না। তিনি পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন—তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন একটা স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় সাধকের ধ্যানভঙ্গ হইল,—তিনি চক্ষু মেলিলেন। তাঁহার মুখ হইতে 'সত্যগুরু' এই অমৃত বাক্য বাহির হইল। সমাগত জনমণ্ডলী 'সত্যগুরুজীকি' জয় বলিয়া চারিদিক নিনাদিত করিয়া তুলিল। সেই দিন হইতে যে সর্ব্বদিনব্যাপী নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তাঁহার তিরোধানের দিন পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল।

সত্যগুরুর কৃপায় সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তি-বিশেষের ভবিষ্যজীবনী তিনি এমন ভাবে বলিতেন যে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইত। কোন জটিল বিষয়ের সমাধান করিতে গেলে তিনি প্রশ্ন শুনিয়াই উত্তর দিতেন না। তিনি সমাধি-গৃহে অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কি ভাবিতেন, পরে বাহিরে আসিয়া সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। এক বার আমাদের পরিবারে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক দিন আমার এক পিসার কোনই সংবাদ না পাইয়া আমার ঠাকুর-মা স্বয়ং 'সত্য-গুরুর' আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কখনও বাহিরে আসিতেন না। কন্যার ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ইঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। ঠাকুর-মাকে আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিস্মিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে তিনি এখানে আসিবেন কেন? সাধক ঠাকুর-মাকে বলিলেন,

বাক্-সিদ্ধি।

"মা, আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন? আপনার দেবর ইহা শুনিলে যে অসন্তুষ্ট হইবেন। আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর বাহিরে আসিয়া ঠাকুর-মাকে তিনি বলিলেন,—'মা, সংবাদ ভাল নয়। আপনার ছোট জামাতাটিকে সর্পে দংশন করিয়াছে। বাঁচিবার আশা কম। দুই এক দিনের মধ্যেই এবিষয়ে চিঠি পাইবেন।'

এই ঘটনার দুই দিন পর আমার পিসার সর্পাঘাতে মৃত্যু-সংবাদের চিঠি আসিয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপচাঁদকে শ্বশুরালয়ের পথে শৃগালে দংশন করিয়াছিল। দেড় বৎসর পর এক দিন ভোরের বেলা সে শ্বশুরগৃহে চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় গমনোন্মুখ পুত্রকে বলিলেন,—'বাবা, তুমি শ্বশুরালয়ে চলিয়াছ, বেশ, কিন্তু আজ আমি তোমার জীবনে বড়ই অশুভ দেখিতেছি।' অদৃষ্টের নিয়ম কে লঙ্ঘন করে? দুপুর বেলা সংবাদ আসিল, হঠাৎ রূপচাঁদের পূর্ব্ব ব্যাধি জলাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, তাহার জীবনের আশা নাই বলিলেই হয়। তখন বহু লোক রূপচাঁদকে গৃহে লইয়া আসিবার জন্য ছুটিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রূপচাঁদের মৃতদেহ পুণ্যাশ্রমে আনা হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণশূন্য দেহ দেখিয়া সাধকের প্রাণ একটুও বিচলিত হইল না। তখন সাধক

"সত্য গুরু ধ্যানে হ'ল আপনি মগন
মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের বাক্‌সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। বাহুল্যবোধে আমরা সেইসব এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না।

মৃত্যুঞ্জয়ের সহধর্ম্মিণী স্বামীর মতই ধর্ম্মশীলা ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়-গৃহিণী।

রন্ধনশালায় তিনি মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা ছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সত্য গুরুর আশ্রমে সমাগত বহু শিষ্য ও ভক্তের আহারের বন্দোবস্ত থাকিত। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' 'সত্য-গুরুজীকি জয়' ধ্বনি শতকণ্ঠ হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সাধ্বী জীবকে অন্ন দান করিয়া স্বামীর সাধনার পথে পুণ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার মুখশ্রী নিয়ত সুমধুর হাসিতে অনুরঞ্জিত থাকিত। পতিব্রতার মৃত্যু সময়ে সাধক মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—তাঁহার আনন্দময়ী তপস্বিনী মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত; তিনি ধীরে ধীরে অনন্তের দিকে বাহু মেলিতেছেন, তাঁহার বিম্বাধরে শুভ্র হাসি, কৃতজ্ঞতার নলিন-নেত্র অশ্রুপূর্ণ। সাধক দেখিলেন মৃত্যুর নিবিড় ধূমরাশি বিদীর্ণ করিয়া প্রেয়সীর আত্মা সত্যগুরুর অমল জ্যোতিতে মিশিয়া যাইতেছে। দেবী যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখার ন্যায় তপস্বিনীর সোনার অঙ্গ অধিকতর সমুজ্জল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সাধক মৃত্যুঞ্জয় পত্নী-বিয়োগে বিচলিত হইলেন না, প্রসন্ন মুখে 'সত্যগুরু' বলিতে বলিতে সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। এদিকে শিষ্য-মণ্ডলী দেবীর মৃতদেহ সৎকারের জন্য নদী-তীরে লইয়া গেল। সতীর মৃত্যুতে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উত্থিত হইল। শিষ্যমণ্ডলীর মুখে 'মা—মা' ধ্বনি নদীতীর প্রতি-ধ্বনিত করিয়া ফেলিল। কাটাখালি কুলকুল স্বরে বিষাদের গান গাহিয়া উভয় তীর মুখরিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। অগ্নিসংযোগে সতীর মাটীর দেহ ভস্মসাৎ হইল।

কথিত আছে, মৃত্যুর পরদিন সতীর দেহ ভাসিতে ভাসিতে আশ্রমের ঘাটে আসিয়াছিল। শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল সেই শব ঘাটে থাকিয়া কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহা কেহই বলিতে পারিত না।

বিক্রমপুরের বারুইসমাজ এক দিন সত্য-গুরুর নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আত্মগৌরব বোধ

সত্য-গুরু কি।

করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিষ্ঠিত সত্য-গুরু-কথা সর্ব্বত্র প্রচার করেন। সত্যগুরু কি? ভগবান্ গুরুরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন। তিনিই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম-পথ-প্রদর্শক। 'অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' সেই পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত যোগই সত্যগুরু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সত্য-গুরু সম্প্রদায় রোগের সময় কখনও ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, তিন বেলা স্নান ও গুরু নাম জপ করিয়াই ইঁহারা রোগ-মুক্ত হইতেন। বিশ্বাসে ব্যাধিমুক্তি (Faith cure) এই কথাটা ইঁহারা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া থাকেন। মৃত্যুঞ্জয়ের ধর্ম্মমত খুব সরল ছিল। তাঁহার সত্যগুরু সকলের জন্য, বিশ্ব-মানবের দুঃখ নিবারণের জন্য, তিনি এই নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতেন; মনকে সমাহিত করিবে, সংকীর্ত্তন দ্বারা সত্যগুরুর মহিমা প্রচার করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। সৎকর্ম্মের দ্বারা, সংযম ও সত্যের দ্বারা যাহাতে বিশ্ব সংসার, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উপকৃত হয়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি সংকীর্ত্তন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সকলকেই বলিতেন, 'সত্যগুরুকে আশ্রয় করিয়া নাম কীর্ত্তনের দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে অচঞ্চল করিয়া লও। সত্যগুরুতে জীবাত্মার পুনঃ প্রবেশই মুক্তি। এই পুনঃ প্রবেশের জন্য জীবকে সদাচারী হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণ দ্বারা জীবাত্মাকে কখনও পাপ-পথে টানিয়া লইও না। সদাচারী হইলে মানুষের উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান থাকিতে পারে না। ভবের হাটে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিরক্ষর ডোম-চণ্ডাল সকলেই সমান। সেখানে বিদ্যার পরীক্ষা নাই, কেবল মাত্র খাঁটি মন দেখিয়াই পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অসদাচারী হইলে সত্য গুরুর নিকট কখনই উপস্থিত হইতে পারেন না। সদাচারী ডোমকেও তিনি কোলে তুলিয়া লন। সত্য গুরুর মত দয়াল কে? তিনি স্বয়ং যোগে বসিয়া

সত্য গুরুর ওঁ-কার শক্তির উপাসনা করিতেন। তাঁহার মতে সত্য গুরুর নাম-কীর্ত্তন অপেক্ষা দুঃখ-নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছুই ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের মহাপ্রস্থানের সময়ে তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ছিল। তিনি দিব্য-

মৃত্যু।

জ্ঞানে সমাধিযোগে পদ্মাসনে ধ্যানের ভঙ্গীতে হৃদয়মধ্যস্থ প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে 'সত্য গুরু' সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ কেবল ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কাহারও মতে মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ ভস্মীভূত করা হয় নাই, বৃহৎ একটি কাঠের সিন্দুকে তাঁহার সমাধি-মগ্ন দেহ স্থাপিত করিয়া উহা গৃহমধ্যে ভূপ্রোথিত করা হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে বলিয়া উহার কোন্‌টি সত্য নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে কতকগুলি কারণে আমাদের মনে হয় তাঁহার দেহ বৈষ্ণব সাধুদের অনুকরণে ভূপ্রোথিতই করা হইয়াছিল।

সত্য-গুরুপন্থী সামান্য বারুই ধর্ম্মজগতে যে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিবার বিশেষ অধিকার আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আজিও বিক্রমপুরের বারুই সমাজ সাধক মৃত্যুঞ্জয়ের পুণ্য নাম প্রত্যহ প্রভাতে স্মরণ করা পুণ্যসূচক মনে করেন এবং তীর্থস্বরূপ তাঁহার সমাধি-স্থান দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নামিকো

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

য়্যামাকির ভোজ।

ষিবায় হ্যোজো য়্যামাকির যে ভূসম্পত্তি, তা খুব বেশী না হইলেও উহা নিশিনোকুবো পাহাড়ের কতকটা অংশ অধিকার করিয়াছিল। সাকুরাগাওয়ার রাস্তার খানিকটা অংশ ইহার এক ধারের সীমানা। বাগানে একটা পুষ্করিণী। অনেকগুলি স্বাভাবিক পাহাড় স্থানটিকে বনশ্রী প্রদান করিয়াছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সরু পথ; পুষ্করিণীর যে অংশগুলি অপ্রশস্ত সেখানে ছোট ছোট পুল। মেপল্, চেরি, দেবদারু আর বাঁশের ঝাড় স্থানটির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। এ সবার মাঝে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ল্যাম্প পোষ্ট ও একটি অদ্ভুত রকমের ইনারি মন্দির কেমন একটা বৈসাদৃশ্য সৃজন করিয়াছে। রাস্তা হইতে অনেক দূরে একটি গ্রীষ্মবাটিকা যেন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আগন্তুকের বিস্ময়বর্দ্ধনের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটা সাধারণ গোছের জমির মধ্যে এমন সুন্দর বাগান, আশ্চর্য্যের কথা বটে; কিন্তু ইহাই য়্যামাকির বাতাসের উপর কেল্লা! ইহা তাহার অসম্ভব কল্পনা নয়; এই বাস্তব পদার্থটি তৈয়ার করিতে তাহার অন্যায়লব্ধ অনেক সহস্র টাকা খরচ হইয়াছে।

বৈকাল বেলা। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। দূরে ও নিকটে কাকেরা কোলাহল করিতেছে। বাগানের মধ্যে একটি পাহাড় অস্তমান সূর্য্যের আলোকে ঈষৎ উদ্ভাসিত। সেই পাহাড় বহিয়া দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি লোক উপরে উঠিতেছিল।

সে তাকেও; মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া য়্যামাকির ভোজে আসিয়াছিল। কতকগুলো অজানা লোকের সঙ্গে বসিয়া বিস্বাদ 'সাকে' পান করায় সে কোনো আনন্দ পাইল না। আমোদের আয়োজন

নানা রকমের ছিল; শেষ পেশাদার নর্ত্তকীর নাচ ও সমবেত সকলের বিকট হল্লা। এই সব অসভ্যতা দেখিয়া বহুপূর্ব্বেই সে ফিরিয়া যাইবে মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু য়্যামাকি বার বার শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা করাটাও নিতান্ত প্রয়োজন, সে তখনও আসে নাই। তাই সে কিছুক্ষণের জন্য বাহির হইয়া বেড়াইতেছে, উষ্ণ মুখ সে সন্ধ্যার শীতল বাতাসে জুড়াইতে চায়।

শ্বশুর মহাশয়ের নিকট চিজিওয়ার কীর্ত্তিকাহিনী শুনিবার কয়েক দিন পরে, কুমীরের চামড়ার একটী মনিব্যাগ হাতে একটি অজানা লোক তাকেওকে একখানা হ্যাণ্ডনোট দেখাইয়া তিন হাজার টাকার দাবি করিল। নোটখানি তাকেও কখনও চক্ষে দেখে নাই। উহার উপর য়্যাম্নহিকো চিজিওয়ার স্বহস্ত লিখিত সহি। আর, কি আশ্চর্য্য! নোটখানি দিয়াছে তাকেও; তাহার নামের মোহরের ছাপ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। লোকটি বলিল, নোটে লিখিত সময় অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কর্জ্জকারী ইহা ফেরত লইবার কোনো চেষ্টাও করে নাই, হঠাৎ কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার দেখা নাই। সেই জন্য সে টাকা দাবি করিতে আসিয়াছে। চিজিওয়ার আপিসেও তাহার দেখা পায় নাই। নোট খানি বোধ হইল আইনতঃ নির্ভুল, নিঃসন্দেহ চিজিওয়ার লেখা। এই ঘটনায় আশ্চর্য্য হইয়া তাকেও তৎক্ষণাৎ খোঁজখবর আরম্ভ করিল। মাতা ও ভাণ্ডারী তাজাকি উভয়েই বলিলেন, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাকেওর নামের মোহরও তাঁহারা কখনো চিজিওয়াকে ব্যবহার করিতে দেন নাই। চিজিওয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব গুজব রটিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, ব্যাপারটা যে কি, তা বুঝিতে তাকেওর বিলম্ব হইল না। সেই দিনই সে চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল; কিন্তু চিজিওয়ার পত্র আসিল; পরদিন য়্যামাকির বাড়ীতে দেখা করিতে লিখিয়াছে।

তাহার সহিত সাক্ষাৎ মাত্র ব্যাপারটা কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে, স্পষ্ট কথায় চট্‌পট্‌ তাহার সম্বন্ধে নিজের অভিমতটা শুনাইয়া দিয়া, ব্যস্! চলিয়া যাইবে—ইহাই তাকেও স্থির করিয়াছিল। কিন্তু চিজিওয়ার দেখা নাই। রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে সরু বাঁশের ঝোপের ধার দিয়া পাহাড়ে পথ দিয়া তাকেও উঠিতে লাগিল। আইভি লতায় ঘেরা গ্রীষ্মবাটিকায় কিছুক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় সে নিকটস্থ পথে কাষ্ঠপাদুকার মৃদু শব্দ শুনিতে পাইল, হঠাৎ তাহার সামনে তোয়ো আসিয়া হাজির। মাথায় উঁচু শিমদো খোঁপা, পরণে তিন থাক ক্রেপের বসন, তাহার জমকালো পোশাক ও খারাপ চেহারার মধ্যে কী অসামঞ্জস্য! কান্তের মত সরু চোখ আরো সরু করিয়া সে কহিল, "তুমি তা হলে এখানে!"

কামানের প্রচণ্ড গোলার মুখে যে কখনো ভয় পায় নাই, সে এই অপ্রত্যাশিত শত্রুর আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িল। পিছন ফিরিয়া একেবারে চম্পট্‌ দিবার উপক্রম করিল। ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া মেয়েটি 'তাকেও সান' 'তাকেও সান' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিল।

"কেন?"

"বাবা আমাকে তোমায় বাগানটা দেখাবার জন্যে বল্‌লেন।"

"তোমাকে দেখাতে বল্লেন? আমাকে দেখাবার কিছু দরকার নেই।"

"কিন্তু—"

"আমার ইচ্ছামত করতে দাও। আমি তাই ভালবাসি।" আর কেহ হইলে এরূপ কঠিন প্রত্যাখ্যানে দমিয়া যাইত। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নয়।

"আমার কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছ কেন বলতে পার?"

তাকেও থামিল।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তাকেওর পিতা একটি জেলার

শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তোয়োর পিতা তাঁহার অধীনে কার্য্য করিত। সেই সময় তাকেওর সহিত তোয়োর প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। তখন তাকেও বালকমাত্র। মেয়েটিকে সে জ্বালাতন করিত কখনো কখনো কাঁদাইতেও ছাড়িত না, কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাকেও তাহার স্নেহলাভে বঞ্চিত ছিল না। আজ কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, শিশু যুবক হইয়া উঠিয়াছে; দুষ্ট বালক তাকেও এখন যুবক ব্যারণ কাওয়াবিমা, তাঁহার পত্নী যুবতী! কিন্তু তোয়ো এখনো তাহাকে ভালবাসে! সাদাসিধে ধরণের হইলেও তাকেও তাহার মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিত, তাই কালেভদ্রে যখনি য়্যামাকির নিকট আসিত, তখনই খুব সাবধানে থাকিত। আজ অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

"পালাবো? পালাবো কেন? আমার ইচ্ছামত আমি ঘুরে বেড়াই।"

"তুমি বড় নিষ্ঠুরের মত কথা কইচ।"

তাকেওর বিরক্তি বোধ হইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল ফিরিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু কেমনধারা বোকা বনিয়া গিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। বাগানের এই নির্জ্জন অংশটায় মেয়েটির হাত হইতে আর নিস্তার নাই! অবশেষে তাকেওর মাথায় একটা মতলব আসিল।

"চিজিওয়া এসেচে নাকি? ওতোয়ো সান্, লক্ষ্মীটি গিয়ে দেখনা এক বার।"

"সন্ধ্যের আগে চিজিওয়া আসবে না।"

"সে এখানে সর্ব্বদা আসে না কি?"

"আসে বই কি। কাল অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গে কথা কইছিল।"

"তাই নাকি? কিন্তু এতক্ষণ সে এসেচে বোধ হয়। লক্ষ্মীটি এক বার দেখ না।"

"না আমি যাব না।"

"কেন?"

"তুমি তা হলে নিশ্চয় পালাবে। তুমি আমায় ভালো না বাসতে পার, নাম্মিকো-সানকে খুব সুন্দর ভাবতে পার, কিন্তু আমায় এমন করে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি ভাল?"

তাহার সহিত তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তাকেও চলিতে লাগিল। এমন সময় শুনিতে পাইল কে যেন তোয়োকে ডাকিতেছে। পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে কি বলিতে লাগিল। অবসর পাইয়া তাকেও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে একেবারে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এখানে আর আক্রমণের ভয় নাই!

সূর্য্য ডুবিয়াছে; অভ্যাগতেরা বিদায় হইয়াছে; দিবসের কোলাহলটা এখন রন্ধনশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উপরকার জোব্বাযাব্বা পোশাক খুলিয়া গৃহস্বামী য়্যামাকি টলিতে টলিতে বাড়ীর পিছনের একটা ছোট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে এক খানা চুরটের রেকাবি। ঘরে ঢুকিয়াই সে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল, ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে তাহার রক্তবর্ণ কপাল চক্ চক্ করিতেছিল।

"মাপ করবেন, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেচি। যাহ'ক আজ খুব আনন্দ করা গেছে।" সে হাসিল। "ব্যারণ, আপনি ত নাবিকের মত পান করতে পারেন না। আপনার বাবা বোতলের পর বোতল ওড়াতেন। বুড়ো হলেও আমি হ্যোজো য়্যামাকি—আধ গ্যালন্ খানেক পার করতে আমি সহজেই পারি।"

চিজিওয়া য়্যামাকির উপর গাঢ়-কৃষ্ণ চক্ষু ফিরাইল।

"ফূর্ত্তি যে আর ধরে না, য়্যামাকি সান্! খুব পয়সা করচ বুঝি?"

"তা নয় ত কি। তা যদি বল্‌লে তবে"—অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে সে পাইপটি ধরাইতে সমর্থ হইল। পাইপে একটা টান দিয়া বলিল,

"সেইটে—কি বলচি বুঝ্‌চ বোধ হয়—এখন বাজারে। আমি ভেতর ভেতর খবর নিয়েচি। অবস্থা তাদের সঙ্গীন। আমরা সস্তায় খুব দাঁও মারতে পারি। কাজটায় খুব লাভ; আর বিদেশীরা যখন দেশের ভেতরে থাকবার

অনুমতি পেয়েচে, তখন ত কথাই নেই, একেবারে পোয়া বারো। ব্যারণ আপনি কেন বিশ কি ত্রিশ হাজার টাকা তাজাকি কুনের নামে খাটান না, নিশ্চয় লাভ করবেন।"

মাতালের কথা স্রোতের মত হু হু করিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাকেও চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল, চিজিওয়া একবার তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া বলিতে লাগিল।

"ঐ আওমোনো ষ্ট্রীটের ওরা ত? ওদের এক বার খুব ভালো কাজ হয়েছিল না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু চালাবার দোষে সব মাটি করে ফেল্লে। ঠিক করে চালানো যদি যায় তাহলে এটা একটা 'সোনার খনি' হয়ে দাঁড়াবে!"

"আহা, কি সুযোগটাই ছিল! কিন্তু আমার মত গরীবের ত আর কর্ম্ম নয়। তাকেও-কুন্ তোমার চেষ্টা করা উচিত।"

এ পর্য্যন্ত তাকেও একটিও কথা কহে নাই। অসন্তোষের কালো ছায়া তাহার ভ্রূর মধ্যে পতিত হইয়া উহাদিগকে কুঞ্চিত করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের উভয়ের উপর একটা সরোষ কটাক্ষপাত করিয়া সে বলিতে লাগিল, "তোমায় ধন্যবাদ। আমি যে কাজে রয়েচি, তাতে কবে যে মাছের পেটে যাব বা গোলার ঘায়ে মরব, তার কিছু স্থিরতা নাই। আমাদের টাকা করবার কি দরকার তা ত বুঝি না। আমার যদি টাকা থাকত, আমি তা হলে ত্রিশ হাজার টাকা তোমাদের এই কাজে না খাটিয়ে নাবিকদের শিক্ষার জন্যে দিতুম!"

চিজিওয়া চট্ করিয়া তাকেওর মুখখানি দেখিয়া লইল ও য়্যামাকির দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল।

সে বলিল, "য়্যামাকি সান্ তুমি আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পার, কিন্তু তোমার একটু সবুর করতে হবে, আগে আমার কাজটা হয়ে যাক। ব্যারণ কাওয়াবিমা দয়া করে আমার অনুরোধ শুনেচেন, তোমায় যা করতে হবে বলেছিলুম তাই কর। তোমার নামের মোহরটা সঙ্গে আছে ত?"

প্রমিসারি নোটের মত কি এক খানা বাহির করিয়া সে য়্যামাকির সামনে রাখিল।

চিজিওয়াকে যে লোকে সন্দেহ করিত, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। গত বৎসর সে য়্যামাকির পরামর্শদাতা ও গুপ্তচরের কাজ করিয়া তাহার লাভের অংশীদার হইয়াছে; শুধু তাহাই নয়, সরকারি টাকা লইয়া ষ্টকের বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গিয়া ফলে পাঁচ হাজার টাকার উপর লোকশান দিয়াছে। য়্যামাকির নিকট হইতে ও নিজের পকেট কাঁটাইয়া সে কষ্টেসৃষ্টে দুই হাজার টাকা জোগাড় করিল, কিন্তু এখনও তিন হাজার টাকা বাকি। তাহার একমাত্র কুটুম্ব কাওয়াবিমা ধনী এবং বুড়ীর সে বিশেষ প্রিয়পাত্র। কিন্তু বুড়ীর মুটোর ভিতর দিয়া জল গলে না, তাহার নিকট ধার চাওয়া যায় কেমন করিয়া! টাকাটাও না হইলে নয়। তাই সে তাকেওর মোহর জাল করিয়াছে এবং অতিরিক্ত সুদে কর্জ্জ করিয়াছে! ধার শোধ করিবার সময় শীঘ্রই উত্তীর্ণ হইল এবং পাওনাদারটা এমন অসহিষ্ণু যে তাহার আপিসে এক নোটিস জারি করিয়াছে! তাকেও সেইমাত্র গৃহে ফিরিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে তাকেওর নিকট তিন সহস্র টাকা কর্জ্জ লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাকেওর অর্থে তাকেওর মান রক্ষার চেষ্টা হইতেছে! সে দিন তাকেওর বাড়ী গিয়াছিল, দেখা হয় নাই। তারপর সরকারি কাজে কয়েকদিনের জন্য সহরের বাহিরে যাইতে হইয়াছিল, ইতিমধ্যে পাওনাদারটা যে কাওয়াবিমার বাড়ী গিয়াছে সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

য়্যামাকি ঘাড় নাড়িল। ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে লাল কালির প্যাড আনিতে বলিল, তারপর তাড়াতাড়ি একবার নোটের উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া নীল মোহরটি বাহির করিল ও নিজ নামের নীচে জামিন স্বরূপ একটি ছাপ দিল।

চিজিওয়া নোটখানি উঠাইয়া লইয়া তাকেওর সামনে রাখিয়া কহিল—"এই ত নোট তৈরি। টাকাটা কখন পাওয়া যাবে?"

"সঙ্গেই আছে।"

"তোমার সঙ্গে? ঠাট্টা করচ!"

"হ্যাঁ আমারই সঙ্গে। এই নাও—তিন হাজার টাকা।

"ঠিক আছে ত?"

পকেটের মধ্য হইতে কাগজে মোড়া কি একটা বাহির করিয়া সে চিজিওয়ার দিকে ছুড়িয়া দিল।"

সে উহা তুলিয়া লইয়া খুলিল—হঠাৎ তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই ভয়ানক ক্রোধে তাহার দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল। যে নোট সে ভাবিতেছিল এখনো সুদখোরটার হাতে, এ যে সেই নোট! সবিশেষ অনুসন্ধানের পর তাকেও ইতিপূর্ব্বেই গোপনে দেনা চুকাইয়া দিয়াছে। "কেন, এটা ত—"

"চিন্‌তে পারচ না যেন! মানুষের মত এই বার দোষ স্বীকার কর।"

যে তাকেওকে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বালক বলিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছে তাহার নিকট এই পরাজয়! ক্রোধে চিজিওয়ার গা জ্বলিতে লাগিল।

য়্যামাকি হতভম্বের মত বসিয়া লম্বা ধূমপানের নলটি উল্টা দিকে ধরিয়া উভয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

তাকেও কহিল—"চিজিওয়া, এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলিতে চাই না। আমাদের মধ্যে ভায়ের সম্বন্ধ, মোহর জাল করার জন্যে কখনো নালিশ করব না। আমি তিন হাজার টাকা দিয়ে দিয়েচি, আর তোমার আপিসে তার তাগাদা যাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক।"

অপ্রতিভের একশেষ হইয়াও, যেন বিচলিত হয় নাই, এরূপ ভাব দেখাইবার জন্য চিজিওয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকেওর উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি চাপিতে পারিলে তবে তাহার ক্ষোভ যাইত; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, ব্যাপার এখন অনেক দূর গড়াইয়াছে; তাই চট্ করিয়া ভাব ফিরাইয়া ফেলিল।

"তোমার কথা শুনে ভাই আমার লজ্জা হচ্ছে। কি করব বল, বাধ্য হয়ে—"

"বাধ্য হয়ে? সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম ভেঙে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়েছিলে?"

"আরে আমার কথাটা শোন। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান, আমার টাকার ভারি দরকার পড়েছিল কোথায় পাই তার ঠিক ছিল না। তুমি বাড়ী থাকলে তোমাকে গিয়ে বলতুম, মাসীমাকে ত আর বলতে পারি না। টাকাটা না পেলেই নয়, গত মাসে কিছু পাবার আশা ছিল তার উপর নির্ভর করে আমি—কাজটা বড়ই অন্যায় হচ্ছে বুঝেছিলুম কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেলে তোমার কাছে স্বীকার করব ঠিক করেছিলুম।"

"ও সব বাজে কথা। দোষ স্বীকার করবার যার ইচ্ছে ছিল, সে কি কখন আরো তিন হাজার টাকা বিনা বাক্য ব্যয়ে ধার করতে চায়!"

তাকেওর ক্রোধ দেখিয়া য়্যামাকি চিন্তিত হইয়া পড়িল, যদি সে চিজিওয়াকে আক্রমণ করে! তাই বলিল, "ব্যারণ থামো। রেগো না। আমি এ বিষয় কিছুই জানি না, কিন্তু উনি তোমার ভাই, তোমার একটু নরম হওয়া দরকার। হাজার দু তিন টাকা আর এমন বেশী কি? চিজিওয়ার দোষ হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাটা যদি জানাজানি হয় ত ওর চাকরি যাবে। তাই ব্যারণ মিনতি করচি—"

"আমি ত বলেছি সেই জন্যেই আমি ধার শোধ করেছি, নালিশও করব না। য়্যামাকি তুমি চুপ কর, তোমার ত আর কিছু হয় নি।" চিজিওয়ার দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "না, তা আমি করব না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা এই মুহূর্ত্ত থেকে ভেঙে দিতে চাই।"

ব্যাপারটা যখন এতদূর গড়াইয়েছে তখন আর ভয় করিবার প্রয়োজন নাই; চিজিওয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিতে

লাগিল, "ভেঙে দেবে? আমার তাতে বিশেষ দুঃখ নেই, কিন্তু—"

তাকেওর চক্ষু হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছিল। "হ্যাঁ, এখন টাকা পেয়েছ, এখন আর বন্ধুত্বে দরকার কি? চোর কোথাকার!"

য়্যামাকি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে বলিতে লাগিল "ব্যারণ—চিজিওয়া সান্—শোন,—একটু—একটু স্থির হও। ও রকম করে ত মীমাংসা হবে না। বলি শোন—বুঝচ।" এধার ওধার চাহিয়া সে বলিতে লাগিল, "শোন, শোন!"

তাহারা স্থির হইল। কিছুক্ষণ পরে চিজিওয়ার উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাকেও কহিতে লাগিল, "চিজিওয়া, আর আমার বলবার কিছু নেই; ছেলেবেলা থেকে আমরা সহোদরের মত বেড়ে উঠেচি। বাস্তবিক বল্‌তে কি বয়স ও বুদ্ধিতে তুমি আমার চেয়ে বড় এই রকমই ভেবে এসেছি। ভেবেছিলুম দুজনে দুজনকে সাহায্য করব। যতদিন সম্ভব আমার যথাসাধ্য তোমার জন্যে করব স্থির করেছিলুম। এই সে দিন পর্য্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা আমি শুনতে চাই নি। কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েচ। আমাকে ঠকানো, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু তার চেয়েও বেশি তুমি—যাক্ বলব না। তিন হাজার টাকা কি করে খরচ করলে সে কথা আমি শুনতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই। লোকের চোখ কান কত তীক্ষ্ণ তুমি হয় ত জান না, কিন্তু আমার কথা শোন, তোমায় এখন সন্দেহ করচে অনেকে। সাবধান হও, যেন সৈনিকের সম্মান হারিও না। তোমার কাছে অর্থের বাড়া আর কিছু নেই; বেশি বলায় কোন লাভ নেই, কিন্তু লজ্জাটা কি তা একবার ভেবে দেখ। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কখনো দেখা করব না। এইবার তোমায় দস্তুরমাফিক তিন হাজার টাকা দিই।"

গম্ভীরভাবে এইরূপ কহিয়া তাকেও সম্মুখস্থিত নোটখানি তুলিয়া লইয়া টুকরা টুকর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে বেগে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল, য়্যামাকির কন্যা তোয়ো সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। তাহার সহিত ধাক্কা লাগাতে সে পড়িয়া গেল। তাহার ক্রন্দনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাকেও ফটকের দিকে চলিয়া গেল।

চিজিওয়া সেই মাত্র য়্যামাকির দিকে চোখ তুলিয়াছে। হতভম্ব য়্যামাকি তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি—ছেলেমানুষ! কিন্তু চিজিওয়া সান্, আত্মীয়তা ভাঙার জন্য তিন হাজার টাকা, নেহাৎ মন্দ নয়, কি বল?"

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নোটের টুকরার উপর দৃষ্টি ন্যস্ত ন্যস্ত করিয়া চিজিওয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

সংসার অসার

অমোঘ অলঙ্ঘ্য তব স্নেহের বিধান
কঠিন বলিয়া ভাবি করুণা-নিদান,
অবোধ মানব মোরা পারিনা বুঝিতে
ভাল মন্দ শুভাশুভ। চাহি যে খুঁজিতে
আপন ক্ষুদ্রতা মাঝে অসীমের সীমা,
নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায় জটিল গরিমা;
মোহের রঙ্গিন জালে জড়িত হইয়া
অকুল পাথারে যাই ভাসিয়া ভাসিয়া।
তখন হারায় প্রভু হৃদয়ের বল,
অবিশ্বাস হয়ে উঠে সকল সম্বল,
পলে পলে বে'ড়ে যায় জীবনের ভার,—
তখনি হৃদয়ে জাগে "সংসার অসার"।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

একাচোরা ব্রত

আমাদের দেশের রমণী সমাজে একটা প্রবাদ আছে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার আঠার মাস মধ্যে সেই শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার মায়ের একটা "ষল্লি" দোষ ঘটিয়া যায় অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে এইরূপে সন্তান মরিতে থাকে। সচরাচর এইরূপ ঘটিতেও দেখা যায়। এই আঠার মাস পরে শিশু মরিলে আর সেরূপ কোন দোষ হয় না। প্রাচীনাগণ, এই দোষ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই একাচোরা ব্রত করিয়া থাকেন। এই জন্য বনদুর্গা, হকুমাই প্রভৃতি দেবতার পূজাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকল মানত ব্রত প্রায়ই অন্নারম্ভে চূড়াকরণে ও বিবাহের সময় অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রতের নিয়ম—শনিবারে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একটি কলার আগপাতে নয়টি দূর্ব্বা, নয়টি তুলসী পাতা, রাখিতে হয়। তাহার নিম্নে অন্য একটি আগপাতে ভাজা চাউলের গুঁড়া, কলা, চিনি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দিতে হয়। পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ব্রতান্তে এই ব্রত কথা বলিতে হয়।

ব্রত কথা—এক দরিদ্র গৃহস্থ দিন আনে দিন খায়—কোন রকম কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আছে; কিন্তু দুঃখের উপর আরও দুঃখ—তাহার স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না, কোনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া এক দিন, কোনটি দুই দিন কোনটি তিন দিনের হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। এইরূপে একুশটি সন্তান মারা গেল। একে দারিদ্র্যদুঃখ তাতে আবার পুত্রশোক! গৃহস্থ ও গৃহস্থ-পত্নী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। দিন যাইতে লাগিল। এক দিন গৃহস্থ-পত্নী অন্নজল ত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের উদ্দেশ্যে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন চলিয়া গেল। গৃহস্থ-পত্নী জল ও গ্রহণ করিলেন না।

ভগবানের একটু দয়া হইল। তিনি এক ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত। লোকজন কেহ নাই, গৃহিণী শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "মা তোমার কি হইয়াছে, আমায় বল; আমি ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত।" গৃহিণী সহসা এই মা সম্বোধন শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; তিনি করযোড়ে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল,—"মা গাত্রোত্থান কর, এবং আমায় বল তোমার কি হইয়াছে।" গৃহস্থ-পত্নী তখন বলিলেন—"আর উঠিয়া কি হইবে, এ প্রাণ আর রাখিব না।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন বড় বিপদ। তাই বলিলেন—"মা আমি ব্রাহ্মণ আমার কথা শুন, তুমি উঠ এবং আমার নিকট তোমার মনের কষ্টের কারণ খুলিয়া বল।" তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট আপন দুঃখদারিদ্র্যের কথা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণের মন ভিজিল, তিনি বলিলেন—"মা তুমি একা চোরা ব্রত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার সন্তানের কোন অমঙ্গল হইবে না।" গৃহস্থ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, ব্রতের নিয়ম কি?"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা তুমি দরিদ্রা, কোন প্রকারে ভক্তিভাবে একাচোরা ঠাকুরকে পূজা কর, তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে। এই ব্রতে চাউলের গুঁড়া লাগিবে। তুমি আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে কি? না পার সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করিও, তাতে বাধা নাই। কলার পাতে চাউলের গুঁড়া দিয়া ভোগ দিও; পারিলে দধি-দুগ্ধ দিও, না পারিলে দিও না। সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ব্রতিনীকে সে দিন থাকিতে হই'ব জানিও।" ভিখারী ব্রতের নিয়মগুলি বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শুদ্ধ ভাবে স্নান আহ্নিক করিয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাহার

* ব্রত কথা যন্ত্রস্থ।

গর্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটি ছেলে হইল। গৃহস্থ ও তাহার পত্নী আনন্দে আটখানা হইয়া গেল।

ছেলে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। গৃহস্থের অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল। অভাবে পড়িলেই দেবতার আদর হয়, সুতরাং এখন আর গৃহস্থপত্নী সেই একাচোরা ব্রত প্রতিমাসে না করিয়া তিন মাস পরে করিয়া থাকেন। না ছয় মাস চলিয়া গেল।

আজ ছেলের অন্নারম্ভ। দেবদেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙ্গালী বিদায়ের মহা ঘটা; কিন্তু একাচোরা ব্রতের কোন আয়োজন নাই, গৃহিণী ভূলিয়া গিয়াছেন। এমন সময় এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে ব্রাহ্মণ ভিতরে গিয়া বাড়ীর দাসীকে বলিল—"ঝি, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে আমাকে চারটি চাউলের গুঁড়া আর একটি বীচিকলা দিতে পার? তাহা হইলে আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি।"

ঝি বাড়ীর ভিতরে গৃহিণীকে ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা জানাইল। গৃহিণী শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। "আমার বাড়ীতে আজ রাজভোগ, তোর কাছে চাউলের গুঁড়া, কলা চাহিল কে? এখানে এসব কিছুই মিলিবে না।"

ঝি গৃহিণীর কথা গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল ব্রাহ্মণ দাসীর কথা শুনিয়া চটিয়া গেল এবং বলিল—'শুন ঝি! তোমার কর্ত্রীর বড় অহঙ্কার হইয়াছে, আচ্ছা!' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল, কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে বালক ঘুমাইতেছিল, কেহ আর তাহার খবর লইতেছে না। কিছুকাল পরে যখন তাহার কাজ পড়িল তখন বালককে জাগাইতে যাইয়া দেখে, সর্ব্বনাশ! বালক জীবিত নাই! তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। আমোদ-প্রমোদ থামিয়া গেল। বাদ্যভাণ্ড সব বিদায়। গৃহিণী মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

সহসা গৃহিণীর মনে পড়িল, তিনি যে দেবতার বরে ছেলে পাইয়াছিলেন, সেই পরম দেবতা একাচোরার ব্রতেরই কোন আয়োজন নাই। তখন তাহার মনে জাগিল—দাসীর কাছে যিনি চাউলের গুঁড়া চাহিয়াছিলেন তিনিই সেই ছদ্মবেশী একাচোরা ঠাকুর। তাড়াতাড়ি গৃহিণী একাচোরা পূজার "আগ" রাখিয়া ঝিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে তাহাদের সঙ্গে সেই ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইল। গৃহস্থ-পত্নী ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর দোহাই তোমার, আমার ছেলেকে বাঁচাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার বড় অহঙ্কার হইয়াছে! তুমি আমার বরে সন্তান লাভ করিয়াছ, আর এখন আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। এক মুষ্টি চাউলের গুঁড়া দিতে যার এত শৈথিল্য তার সন্তানের আবশ্যকতা কি? তুমি যেমন অলক্ষ্মী তেমনই থাক।" তোমার সন্তানের প্রয়োজন নাই।" গৃহস্থপত্নী বড় কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার আবদার ছাড়াইতে পারিলেন না। তাহার মন ভিজিয়া গেল। তিনি ছেলেকে বাঁচাইয়া দিলেন আর বলিলেন, "একাচোরা ব্রত কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

গৃহস্থ পত্নী এখন হইতে কায়মনে আবার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার সংসার সুখের হইল। সেই অবধি জগতে একাচোরা ব্রত প্রচলিত হইল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অলিরাজ

বা

হল্‌দে পাখী (২) *

পাখীটীর প্রকৃত নাম আমি জানতে পারি নাই। দুই ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, এই পাখীর নাম অলিরাজ। অন্য মত সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইহাকে অলিরাজ নামে অভিহিত করিব। তবে বিশেষ পরিচয়ের জন্য ২নং হল্‌দে পাখী বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিলাম।

"অলিরাজ" বাবুইর মত বড় পাখী। ডানা দুইটি এবং লেজ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ ফিকে হল্‌দে রঙ্গের পালখে আবৃত। পালখ গুলির উপরিভাগ একটু ঘন হল্‌দে রঙ্গেরই ছিল, কিন্তু অপর পৃষ্ঠা মেটে ধূমল বর্ণের বলিয়া ইহাদিগকে ফিকে হল্‌দে দেখা যায়। মাথার উপরের দিকের পালকের হরিদ্রাভা একটু বেশীপরিমাণে ধূমল মিশ্রিত। ইহাদের লেজে পঁচিশ হইতে আটাশটি খুব পাতলা এবং মসৃণ কাগজের মত পালখ আছে। পালখের মধ্যে যে দাঁড়া (quill) আছে, তাহার দুই পাশের লোম বা পাখগুলির এক দিক ঈষৎ কালো, অপর দিক ঈষৎ হল্‌দে। যখন অলিরাজ এক গাছ হইতে উড়িয়া অন্য গাছে যায় তখন লেজের হল্‌দে রঙটা চক্ষে পড়ে; নতুবা লেজটি ফিকে কালোই দেখায়। ডানা দুইটি সরু এবং শক্ত। লেজের পালখের সহিত ডানার পালখের কতক সাদৃশ্য আছে। তবে ডানার পালখের নিম্নভাগ মেটে সাদা পালখে আবৃত। অলিরাজ যখন বসিয়া থাকে, তখন তাহার ডানা দুটি ও লেজ একরূপই দেখায়। ঠোঁট অত্যন্ত চোখা এবং ঠোঁটের পার্শ্ব ধারাল। ঠোঁটের অগ্রভাগ সাদার উপর পাতলা কালো বর্ণে মিশান কতকটা ছাইয়ের মত সাদা। তৎপরে উপরের দিকে ক্রমে কালো। চক্ষু দুটি অতিশয় উজ্জ্বল। পা সরু এবং কালো। নখগুলি বাঁকা এবং তীক্ষ্ণ।

অলিরাজ অতি মৃদু শিস্ দেয়। বেশ একটু চড় রাগিণীতে অ— বলিয়া অপেক্ষাকৃত মোটা আওয়াজে — লি— বলিয়া শিস্ সমাপ্ত করে। এই অ—লি— হইতেই সম্ভবতঃ উহার নাম অলিরাজ হইয়াছে। ইহারা কেবল ঐ গান করিতেই দক্ষ তাহা নহে, গান করিতে করিতে ইহারা ডালে ডালে নাচিয়া বেড়ায় এবং একটু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই মুহূর্ত্তমধ্যে উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। স্থানান্তরে যাইবার সময় ইহারা এমন একটা অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করে, তাহা শুনিয়াই তাহার সঙ্গিনী পক্ষিণীও তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। অলিরাজের পুরুষ ও স্ত্রীজাতির পার্থক্য অতি সামান্য। পক্ষিণী অপেক্ষা পক্ষীর রং একটু বেশী উজ্জ্বল।

অলিরাজ গাছে গাছে ঘুরিয়া ডালায় বা পাতায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বা পীপিলিকা পায়, তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কখন কখন আকাশে উড্ডীন ক্ষুদ্র পতঙ্গের উপর পড়িয়া তাহাকে উদরসাৎ করিয়া থাকে।

অলিরাজ বারমাসই আমাদের দেশে দেখা যায়, তবে শীতকালে ততবেশী দৃষ্ট হয় না। ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অলিরাজের মধুর শিস্ প্রায় সর্ব্বদাই শোনা যায়। বর্ষারম্ভ হইলেই ইহারা একটু আত্মগোপন করে। বৃষ্টি পতনের পর রৌদ্র উঠিলে আবার ইহারা শিস্ দিতে আরম্ভ করে।

অলিরাজ মধুকর প্রভৃতির মত বাসা নির্ম্মাণ করে। ডিমগুলি সবুজ তাহাতে সাদা রেখাও আছে। ইহারা এককালে ২ হইতে ৪টি ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ডিমগুলি বাবুইরই ডিমের মত বড় হয়। বাসার অতি নিকটে গেলেও ইহারা শব্দ করে না, যেন এখানে তাহাদের ক্ষতির কোনও কারণই নাই। কিন্তু বাসা স্পর্শ করা মাত্রই বিকট স্বরে চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া চীৎকার করতঃ এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে।

ডিম হইতে ছানা বাহির হইলে অলিরাজ পরিত্যক্ত খোসা ঠোঁটে করিয়া বহু দূরে নিয়া ফেলিয়া দেয়। কাক

---

*গায়ক পাখী।

ছিল, বাজ প্রভৃতি ইহাদের শত্রু। ইহাদের বাসার সন্ধান পাইলে ডিম বা শাবক ঐ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অলিরাজ ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ডিম পাড়ে এবং চৈত্র মাসে ছানা হয়। ছানাগুলি সম্যকরূপে উড়িয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত মাতাপিতা ইহাদিগকে লইয়া নিবিড় জঙ্গলে গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়।

অলিরাজ কাহাকেও পুষিতে দেখি নাই। ইহাদিগকে ধরিবার সহজ উপায় আছে। একই গাছের ডালে প্রায় প্রত্যহই ইহারা যাতায়াত করে। ঐ গাছের যে সকল ডালে ইহাদিকে উড়িতে বসিতে দেখা যায় ঐ ডালের উপর তালের আঁশ বা শণের কিম্বা সূতার জাল পাতিয়া রাখিতে হয়। ঐ জালে পা দিলেই, পাখী জালে জড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। অলিরাজকে ধরিয়া রাখিলে সে এমন নিরীহ ভাব অবলম্বন করে, যেন পলাইবার তাহার কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই। কিন্তু একটু অসতর্ক হইলেই সে এক ছুটে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

অলিরাজ লোকালয়ের নিকটে যাতায়াত করে, কিন্তু ইহাদিগকে কখনও ঘরের চালে বা উঠানে বসিতে দেখা যায় না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গর্ভিণীর স্বাস্থ্য

গর্ভস্থ শিশুর ভাল মন্দ সকল বিষয়ই গর্ভিণীর নিজের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। এই কারণে এ সময় শরীর ও মন, উভয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শরীরটি যাহাতে নীরোগ ও সবল থাকে, আর মনটি যাহাতে শান্ত, পবিত্র, প্রফুল্ল এবং ক্রোধ, শোক, অসূয়া ঈর্ষ্যা, ভয়, ত্রাশ প্রভৃতি শূন্য হয়, সদাসর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা চরক কহিয়াছেন, "গর্ভিণী সদা শোকার্ত্ত থাকিলে ভীত ক্ষীণ বা অল্পায়ু সন্তান প্রসব করিয়া থাকন।" আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহার অনুমোদন করিয়া থাকেন। প্রসব কাল যতই নিকট বর্ত্তী হইতে থাকিবেক, স্বাস্থ্যের প্রতি ততই মনযোগী হওয়া আবশ্যক। যে সকল নিয়মাদি পালন করিলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে, আমরা একে একে সে গুলির বর্ণনা করিব।

বসনভূষণ—সুশ্রুত গর্ভিণীকে শুক্ল বসন ও দিব্য অলঙ্কার ধারণ করিতে বলিয়াছেন। আমাদের নিকট ইহা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয় না। উত্তম বেশ ভূষায় চিত্তের আনন্দ ও প্রফুল্লতা জন্মায় তাহাতে গর্ভিণীর নিজের ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভব। গর্ভিণীর বসনভূষণগুলি যেন বেশী আঁটা না হয়। আঁটা কাপড়চোপড়ে তাহার বুকে ও পেটে চাপ পড়ার সম্ভব। বুকের উপর অন্যায় চাপ পড়িলে, স্তন দুইটি উপযুক্ত ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না, এবং তাহাদের বোঁটা দুইটি বসিয়া যায়; তাহার ফল এই হয় যে, প্রসবের পর প্রসূতী সন্তানকে স্তন্য দান করিতে পারে না: আবার আঁটা কাপড়ে কোমরে ও পেটে এত অধিক চাপ পড়িতে পারে যাহাতে গর্ভপাত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। গর্ভিণীর বস্ত্রাদি খুবই ঢিলা ঢালা ও আলগা হওয়া আবশ্যক।

স্নান—গর্ভিণীর পক্ষে প্রতিদিন শীতল জলে স্নান করা ভাল; শীতল জল সহ্য না হইলে, অল্প উষ্ণ জল ব্যবহার করিতে পারেন। খুব গরম জলে স্নান করা কোনমতেই উচিত নহে; তাহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এদেশে স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্ব গাত্রে তৈলমর্দ্দন বিধি প্রচলিত আছে। গর্ভাবস্থায় তৈলমর্দ্দন কালে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এসময় উদরদেশে বল প্রয়োগ করা কিম্বা টেপাটিপী ভাল নহে। নব্য চিকিৎসক দিগের ত কথাই নাই, প্রাচীন চিকিৎসকগণও এ বিষয়ে গর্ভিণীকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুত উভয়েরই মতে "গর্ভ সংপীড়ন" (টেপা-

টেপী) এবং তৈলাভ্যঙ্গ (আভাং করিয়া তৈল মাখা) গর্ভিণীর পক্ষে নিরাপদ নহে। ইহাতে গর্ভপাতের সম্ভাবনা আছে।

কাজ কর্ম্ম প্রভৃতি—গর্ভিণীর পক্ষে অতিরিক্ত শ্রম করা অথবা দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা কোনমতেই ভাল নহে। তাই বলিয়া দিন রাত্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অথবা শুইয়া থাকাও উচিত নহে। সম্ভব মত কাজ কর্ম্ম করা ও ভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। দিনের বেলায় যত অধিক সময় তিনি ঘরের বাহিরে কাটাইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ততই মঙ্গল। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে এবং সাধ্যমত শ্রম না করিলে কোন মতেই স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না; গর্ভাবস্থায় প্রায় সকলেরই কেমন এক রকম মূর্চ্ছা-ভাব এবং শরীর ও মনের অবসাদ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যে সকল স্ত্রীলোক কাজকর্ম্ম করেন না তাহাদের মধ্যে উহা আবার খুব অধিক পরিমাণে ঘটিতে দেখা যায়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং সম্ভব মত পরিশ্রম করিলে কেবল যে স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হয়, তাহা নহে; প্রসব সময়েও বিশেষ সুবিধা হইতে দেখা যায়। আলস্যপরায়ণা শ্রমভীতা স্ত্রীলোকদিগের বেলায়, প্রসব কালে একটা না একটা গোলযোগ প্রায়ই উপস্থিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপর ইহাদের "খালাস" হইতে অযথা অধিক সময় লাগে এবং সে সময় যন্ত্রণাও খুব বেশী হয়। এবিষয়ে ভদ্র ঘরের মেয়েদের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের খুব ভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাদের দিবা রাত্র শুইয়া বসিয়া কাটাইবার উপায় নাই। কাজ না করিলে ইহাদের কিছুতেই চলিতে পারে না; তাহার ফলে প্রসব ব্যাপারটি তাহাদের নিকট নিদারুণ সঙ্কট কাল রূপে প্রতীয়মান না হইয়া নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এবিষয়ে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের তাহাদের দরিদ্রা ভগ্নীগণের নিকট বিস্তর শিখিবার আছে বলিয়াই মনে হয়। গর্ভিণীর পক্ষে কাজকর্ম্ম করা খাটা খুটা একান্ত আবশ্যক; তাহা বলিয়া তাহাদের যে সে কাজ করিতে যাওয়া উচিত নহে। যে সকল কাজে অতিশয় পরিশ্রম অথবা বল প্রয়োগের আবশ্যক, সেরূপ কাজে তাহাদের কদাপি অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। গর্ভিণীকে কোনরূপ ভারি জিনিষ তুলিতে দিতে নাই। কুয়া হইতে জল তোলা কি উনান হইতে ভাতের হাঁড়ি নামান প্রভৃতি কাজ গর্ভিণীর পক্ষে নিরাপদ নহে। বার বার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপর নীচু করাও ভাল নহে। আবার যে সকল কাজে অতিশয় ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততার আবশ্যক, সেরূপ কাজ করাও গর্ভিণীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। উনুনে ফুঁ পাড়া কি দৌড় ধাপ করা প্রভৃতিও তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। সুশ্রুত গর্ভিণীকে খুব জোরে কথা কহিতেও নিষেধ করিয়াছেন: ইচ্ছা করিলে তিনি একটু আধটু রাঁধা বারার কাজ না করিতে পারেন এমন নয়। কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রান্তি বোধ হইলে, কিছুক্ষণের জন্য শয়ন করিয়া বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে অনেকেই গর্ভকালটাকে পীড়ার হিসাবে দেখিয়া থাকেন, তাই জন্য তাঁহারা গর্ভিণীকে বড় একটা খাটিতে খুটিতে দিতে চাহেন না; দিন রাত শুইয়া থাকিতে বাধ্য করেন। বলা বাহুল্য ইহা অতীব অন্যায়। গর্ভিণীকে কাজ কর্ম্ম না দিয়া দিন রাত্ শুইয়া বসিয়া থাকিতে দিলে তাহার শরীর ও মন উভয়েরই স্বচ্ছন্দতা বিনষ্ট হয়; আর প্রসবের সময় তাহাকে অকারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আলস্যপরায়ণা রমণী যে সকল সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন তাহাদের কদাচিৎ সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়। মানুষের যত কিছু দুঃখ কষ্ট অভাব যন্ত্রণা তাহার প্রধান কারণ আলস্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। সামর্থ্য সত্বেও যে ব্যক্তি কাজ করে না তাহার শরীর ও মন উভয়েরই দুর্গতির সীমা থাকে না। আলস্য অপেক্ষা মানুষের ঘোরতর শত্রু আর কিছুই থাকিতে পারে না; দুঃখের বিষয় এই যে, ভদ্র সমাজের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মধ্যে শারীরিক শ্রম না করা, আজ কাল যেন পোষাক পরিচ্ছদের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহাদের মধ্যে যে সকল পুরুষ আপনাদের হাতে শয্যা রচনা করেন

কিম্বা বস্ত্রাদি কাচেন কি এইরূপ কাজ কর্ম্ম করেন লোকে আর তাহাদিগকে ভদ্র মনে করিবে না, সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য করিয়া বসিবে এই কারণে ভদ্র সমাজে অনেক কার্য্য দাস দাসীর উপর ন্যস্ত হয়। ইহার ফলে উক্ত সমাজের নর-নারীর স্বাস্থ্যের দিন দিনই অবনতি সাধিত হইতেছে। দরিদ্র গৃহে সহস্র অভাবের মধ্যে প্রত্যেকের হৃদয়ে যে শান্তি যে আনন্দ থাকিতে দেখা যায় ধনীর অট্টালিকার প্রাচুর্য্যের মধ্যে, কদাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। শারীরিক শ্রম উপেক্ষা করাতেই ত আজকাল শিক্ষিত মহিলাদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়া মৃগী, প্রভৃতি বিবিধ স্নায়বীয় রোগের এত প্রাদুর্ভাব হইতেছে। মানুষ যতক্ষণ না নিদ্রিত হয় জাগিয়া থাকে ততক্ষণ তাহার আর মনের বিশ্রাম থাকে না, একটা চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হইতে থাকিবেই। অলস ব্যক্তির হৃদয়ে এ অবস্থায় নিয়ত বিবিধ রূপ কু-বাসনা কু-অভিপ্রায় প্রভৃতির যে উদয় হইতে থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। এই সকল কারণে নর-নারী কাহারও কোন কালে কোন অবস্থায় সামান্য শক্তি সত্ত্বে আলস্য করা উচিত নয়।

গর্ভিণীর বাসের ঘর—গর্ভিণী যে ঘরটিতে বসবাস করিবেন, সেটি যেন বেশ প্রশস্ত হয়; উহার মধ্যে যেন অবাধে বায়ু চলাচল ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে। সূর্য্যালোকে ও বায়ুর দ্বারা বাসভবন যেরূপ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হয় এমন আর কিছুতে নহে। যে ঘরে ভালরূপ আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ অন্ধকার ঘরই যত প্রকার সংক্রামক রোগের জন্মভূমি বলিয়া মনে হয়। রোগবীজ সকল এই সকল স্থলে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এমন আর অন্য কোন স্থলে নহে। গর্ভিণী যত সহজে রোগাক্রান্ত হন সাধারণ ব্যক্তি এত সহজে হয় না; এই কারণে তাঁহার বাসগৃহটি খুব ভাল হওয়া চাই। ইহার নিকট পায়খানা বা ময়লা জল নিকাসের নর্দ্দমা প্রভৃতি না থাকাই উচিত। যদি একান্তই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। তাহার ঘরে, কোনরূপ দুর্গন্ধ যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দিবসে ঘরটির সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। কতকগুলি অনাবশ্যক বাক্স পেটারা খাট চৌকী দ্বারা ঘরটির স্থান জুড়িয়া রাখা উচিত নয়।

দিবানিদ্রা—গর্ভিণীর পক্ষে দিনের বেলায় মধ্যে মধ্যে একটু আধটু নিদ্রা যাওয়া মন্দ নহে। এক এক বারে কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক শুইয়া থাকা উচিত নয়। এইরূপে সারাদিনে মোটের উপর দু ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিলেই যথেষ্ট বিশ্রাম করা হয়।

গর্ভিণীর খাদ্য—যে সকল খাদ্য বেশী উত্তেজক অথবা সহজে জীর্ণ হয় না, গর্ভিণীর পক্ষে সে সকল খাদ্য না খাওয়াই উচিত। তাহার পক্ষে ঘন ঘন নিমন্ত্রণ খাওয়া ভাল নহে। গর্ভের প্রথম ৩।৪ মাস গর্ভিণীর পাকস্থলী ও অন্যান্য পরিপাক যন্ত্র সমূহের এরূপ একটি অবস্থা হয় যাহাতে তাঁহার পক্ষে অধিক খাদ্য জীর্ণ করা কঠিন হইয়া পড়ে; এই কারণে সে সময় তাহার খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিতে নাই; করিলে, তাহার বিশেষ অসুবিধা হয়। কিন্তু যে সময় হইতে ভ্রূণটি পেটের মধ্যে নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করে, সেই সময় হইতে অধিকাংশ স্থলেই গর্ভিণীর অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। তখন হইতে তাঁহার ক্ষুধা ও জীর্ণ শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। তখন হইতে তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহা সহজেই জীর্ণ হয় এবং তাহাতে তাঁহার কোনই অসুবিধা হয় না। এ সময় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় যতটা খাদ্য খাইতেন ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য দিলে চলিতে পারে না, কেন না এসময় হইতে ভ্রূণ-দেহের শীঘ্র শীঘ্র খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। গর্ভিণীকে যদি যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহার গর্ভস্থ শিশুর দেহ-পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আবার বেশী খাদ্যের আবশ্যক বলিয়া যা তা খাইতে

দিলে চলিবে না।

যে সকল খাদ্য বেশ পুষ্টিকর অথচ দুষ্পাচ্য নহে সেইরূপ খাদ্যই ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাত, দাইল, দুধ, দই, রুটি, লুচি, মৎস্য প্রভৃতি খাদ্য বেশ পুষ্টিকর। গর্ভিণীর পক্ষে অধিক মাংস খাওয়া ভাল নহে। গর্ভাবস্থায় দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। যাঁহাদের দুগ্ধ ভাল সহ্য হয় না দধি খাইয়া সেই অভাব পূরণ করিয়া লওয়া উচিত। তাঁহার সাধারণ তরিতরকারী ও কলা, পেপে প্রভৃতি ফল মূলাদিও প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া আহার করা উচিত। ইহাদের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। গর্ভিণীর প্রতিদিন নিয়ম মত কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে সকল স্ত্রী নড়া চড়া করেন না কেবল শুইয়া থাকেন. তাঁহাদের প্রায় সকলেই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অধিক ঘৃত-মশলাসংযুক্ত খাদ্যে গর্ভিণীর বিশেষ অনিষ্ট হয়।

গর্ভিণীর চিত্ত বিনোদন—গর্ভিণীর মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে গর্ভিণীর নিজের এবং তার আত্মীয় স্বজন সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। যে সকল বিষয়ে অতি সহজেই মানসিক উত্তেজনার সম্ভাবনা সেই সবের মধ্যে তাহার না যাওয়াই উচিত। গর্ভিণীর পক্ষে ক্রোধ বড় সর্ব্বনাশ করে। গল্প গুজব এবং সংগ্রন্থাদি পাঠে চিত্ত বিনোদন সম্ভব। এই কারণে এ সকল করিতে তাহার কোন বাধা থাকিতে পারে না। গর্ভিণীর নিকট কোনরূপ নিরানন্দকর শোকাবহ কিম্বা লোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিতে নাই।

নিদ্রা— রাত্রি জাগরণে গর্ভিণীর বিশেষ অনিষ্ট হয়। দশটা বাজিতে না বাজিতে তাহার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করা আর ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করা উচিত। গর্ভিণীর শয়ন ঘরটিতে কতকগুলি অনাবশ্যক সাজসজ্জা, বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা 'জবড় জঙ্গ' করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঘরটি যাহাতে অধিক গরম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটিলে ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখা ভাল। অনেক সময় গর্ভিণীর রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না। তাঁহার শরীরের ভিতর কেমন এক রকম গরম বোধ হয়। বেশী পুরু বিছানায় শয়ন করিলে, তুলার গরমে ওরূপ হইতে পারে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলেও এমন হইতে পারে। আহারের দোষে কিম্বা দৈনিক স্নান বাদ রাখিলেও ওরূপ না হয় এমন নয়। কাজকর্ম্ম না করিয়া দিন রাত শুইয়া থাকিলেও অনিদ্রা জন্মাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি

গ্রন্থ সমালোচনা

২৬। **সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান**—শ্রী বিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ২৲ টাকা—আকার ডবল ক্রাউন, অষ্টাংশিত সুন্দর বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। এই গ্রন্থ মহাত্মা কর্ণেল টডের রচিত রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ। ইতি পূর্ব্বে টডের সুবিখ্যাত গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উক্ত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ বোধ হয় এই প্রথম। মিবার, অম্বর, মারবার প্রভৃতি রাজস্থানের সপ্ত জনপদের কাহিনী সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থকার পয়ারাদি ছন্দে ৩৯২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রাজস্থান ভারতবর্ষের এক মহা তীর্থ ক্ষেত্র। উহার প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত অলৌকিক শৌর্য্য ও সতীত্বের গৌরব স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই পুণ্যভূমির বিচিত্র কাহিনী ধারাবাহিকরূপে নিবদ্ধ করিয়া কর্ণেল টড ভারতের জাতীয় জীবনে যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? রাজস্থানের ইতিহাস এক মহাকাব্য। এরূপ অমূল্য গ্রন্থ অনুবাদ সাহায্যে যত অধিক প্রচারিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এই কারণেই আমরা এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকার যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ বিরাট

গ্রন্থ আকারে কবিতায় রচনা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় স্থানে স্থানে একাধিক বার পাঠ না করিলে অর্থ গ্রহ হয় না। এরূপ বৃহৎ কাহিনীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়াই আবশ্যক, সন্দেহ নাই। তথাপি রচনা আরও হৃদয়গ্রাহী হইলে অধিকতর সুখী হইতাম। এই সমস্ত সত্বেও এই গ্রন্থখানি আমাদের নিকট মোটের উপর ভালই লাগিয়াছে।

আর একটি বিষয়েও গ্রন্থকার প্রশংসার যোগ্য। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। ঐতিহাসিক চিত্রের বৈষম্য ঘটাইলে গ্রন্থ কাব্যাংশে উৎকৃষ্টতর হইতে পারিত; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহা সাধিত হইত না। রাজস্থানের ইতিহাস চিত্তাকর্ষক রূপে বাঙ্গালার নর-নারীর নিকট উপস্থিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য এইল পরিনির্ণে সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিলে সুখী হইব।

উপেন্দ্র

২৭। প্রহ্লাদ,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, শ্রীহরিরাম ধর, বি, এ, কর্ত্তৃক ঢাকা পপুলার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা। এই পৌরাণিক কাহিনী বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে; এবং ইহাদের চিত্ত-রঞ্জনের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি হয় নাই। এণ্টিক কাগজে ব্রঞ্জ-ব্লু কালীর ছাপা; প্রতি পৃষ্ঠা লাল বর্ডারে রঞ্জিত ও পুস্তকটি ছয়খানি হাফটোন ছবিতে শোভিত।

২৮। হাস্যাব্ধি,—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কাত্তিক প্রেসে মুদ্রিত, কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস (২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) হইতে প্রকাশিত, রয়েল ষোড়শাংশিত, ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা মাত্র। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, প্রচ্ছদপটে জাপানী ছাঁদে নাম লেখা।

এটি জাপানী গল্পের বই—আটটি গল্পের সমষ্টি—গল্পগুলি প্রায় সমস্তই পূর্ব্বে কোন না কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচনাকৌশলে, ভাষা মাধুর্য্যে প্রত্যেকটি গল্পই রমণীয়—পড়িতে পড়িতে যেন এক নূতন রাজ্যের কোমল সৌন্দর্য্যের একটি অভাবনীয় ছায়া-চিত্র হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গল্প সম্পূর্ণ নূতন।

শ্রীন্যায়শরণ।

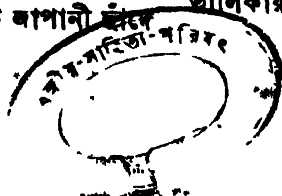
২৯। ছোট রামায়ণ—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত, ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক কলিকাতা ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; আকার—রয়েল ষোড়শাংশিত, এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, মোটা কাগজের রঞ্জিত প্রচ্ছদপট, ৮৯ পৃষ্ঠা, মূল্য লেখা নাই। সরল পদ্যে মহাকবিকৃত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুন্দর হইয়াছে; ভাষা, ঘটনা নির্ব্বাচন ও সমাবেশ সমস্তই কোমলমতি বালক বালিকাগণের উপযোগী, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি জীবন্তভাবে তাহাদের চিত্তরঞ্জন, উপদেশ ও শিক্ষার কার্য্য করিবে। একাধারে আমোদ ও উপদেশের সঙ্গত সমাবেশ! আমরা বালক বালিকাগণকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—

এ বড় সুন্দর কথা পড় দিয়া মন।

৩০। গল্পের বই,—শ্রীসুখলতা রাও প্রণীত, কলিকাতা ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত; আকার ডবল ক্রাউন—১৬ পেজী, ১৪৮ পৃষ্ঠা, দাম মাত্র ৷৷০ আনা। কাগজ বেশ, ছাপা পরিষ্কার ও সুন্দর। মোটমাট কুড়িটি গল্প আছে—বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই।

যিনি বইখানি লিখিয়াছেন তিনি রমণী—সুতরাং রমণীসুলভ কোমলতা লইয়া তিনি কুশল হস্তে কলমের ব্যবহার করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ হস্তে তুলিকা পাত করিয়া গল্পগুলি সার্থক করিয়াছেন। তাহাতেই উপকথাগুলি এত উপাদেয় ও ছেলেদের এত উপযোগী হইয়াছে। লেখিকা উপাখ্যান রচনায় যেমন সিদ্ধহস্তা চিত্রশিল্পেও তেমনই অভিজ্ঞা। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রূপ কথার মর্ম্মানুবাদ হইলেও রচনাকৌশলে আখ্যায়িকাগুলি বাঙ্গলার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি বালক বালিকার মন ভুলান পুস্তকের তালিকায় আলোচ্য পুথিখানার স্থান অতি উচ্চে।

শ্রীন্যায়শরণ।





প্রতিভা

২য় বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ ৮ম সংখ্যা

সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবন *

বুদ্ধদেবের 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের সঙ্গম-ফলে পৌরাণিক সাহিত্যে এক নূতন স্রোত দেখা দিয়াছিল, পূর্ব্বপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখন, প্রকারান্তরে এই মনুষ্যত্ব আদর্শের নাম সরলতা। প্রাচীন মনুষ্যসমাজের ইতিহাস বিচার করিলেই দেখিবেন, মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, কথায় এবং চিন্তায় সরল হওয়া ব্যাপারটা কত শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও এই পদার্থটাই বিশেষ মহার্ঘ বলিতে হইবে। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের জ্ঞানকৃত কর্ম্মগতিকে জীবনের মধ্যে এতই জঞ্জালের সৃষ্টি করিতেছে যে, এবং পদে পদে তাহার দ্বারা জড়িত বিজড়িত হইয়াই পাপ ভোগ করিতেছে যে, মনুষ্যের সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে এইরূপে "স্বখাদ সলিলে" ডুবিয়া মরার আশঙ্কাটাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মানুষ কালেকালে যুগেযুগে এক এক বার এই সরলতা লাভ করিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মনুষ্য-সভ্যতার সমস্ত বিভাগেই এই অপরূপ সত্য ঘটনা লক্ষ্য করিবেন। মানুষ চিরকাল জ্ঞানের জন্য, সত্যের জন্য লালায়িত। উহার গতিকে যৎসামান্য যাহা প্রাপ্তি হয়, অতর্কিতে অনন্ত উপসর্গ উপজাত হইয়া উহাকে পদে পদে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে; এবং মানুষ এক এক বার উন্মত্ত ভাবে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আর এক "থাক" অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করে। ইহাই মনুষ্যের সভ্যতার গতি; এবং সকল বিভাগেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। মানুষ সঙ্ঘধর্ম্মা বলিয়া, এবং দলবদ্ধ হইয়াই চলে বলিয়া, সমগ্র জাতিটাই সমূহভাবে নব নবতর সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করে বলিয়া, এই ঘটনা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমন জাতিগত জীবনেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। গীতাকার অবতার পুরুষের মুখে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটার মধ্যে মানব সভ্যতার অন্তরতম তত্ত্বেরই খ্যাপন করিয়াছেন। 'ধর্ম্ম' সংজ্ঞাকে ঋষি দার্শনিকগণের মতসঙ্গতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলে, মনুষ্যসভ্যতার যাবতীয় বিভাগের অন্তরধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইলে, এই কথাটার মধ্যে একটা পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বের আভাষ লাভ করিব। আবার, ধর্ম্ম সংস্থাপন কি? এই 'ধর্ম্ম' একটা অনাদি, অনন্ত অথচ নিত্য অভিব্যক্তিশীল স্থিরতার তত্ত্ব বই নহে।

উহারই অন্য নাম এই সরলতা; সোজাসুজি ভাবে আপনার চিরন্তন তত্ত্বটাকে প্রাপ্তি; জগতের গতি-বশে, মনুষ্যসমাজের গতি-বশে ওই স্থিরপদার্থ চিরকাল আব-

* এই প্রসঙ্গ 'বাণী পন্থায়' 'সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি' নামক অধ্যায়ের অন্তর্গত ও 'ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব' নামক পূর্ব্বপ্রবন্ধের সহিত সম্বন্ধ। —লেখক।

রিত হইয়া দূর দূরান্তরবর্ত্তী হইবার উপাধি অবলম্বন করিতেছে। মানবজাতির 'বিরাট পুরুষ' এক এক বার একই আঘাতে ওই অবিদ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সরলতার আদর্শে স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ওই চিরন্তন 'ধর্ম্ম'—মানব ধর্ম্ম, সরলতার ধর্ম্ম এতই অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল যে, পৌরাণিক ধর্ম্ম-ভাবুকতা এবং নানা অপধর্ম্মের জঞ্জাল দ্বারা এতই আবিষ্ট হইয়াছিল যে. তাহার বিরাটপুরুষ শূদ্রক এবং বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতিকে মুখপাত্র করিয়া এই এক বার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া দাঁড়াইলেন। চিন্তা করিয়া দেখুন, এক দিকে উহা কত সোজা কথা! মনুষ্যত্ব মানুষের অন্তর্নিহিত স্থির তত্ত্ব বলিয়াই উহা এত সোজা! অন্য দিকে, উহা কত কঠিন, বিপুল পৌরাণিক সাহিত্য তাহার পর্ব্বতপ্রমাণ দৃষ্টান্তরূপেই দাঁড়াইয়া আছে! গীতার "ধর্ম্ম" কথাটাই বা কত সোজা!—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

একের শরণ লওয়া! প্রীতিভক্তিরসার্দ্র হইয়া শরণ লওয়া! ইহা কত সরল সহজ কথা! দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অনুপল বিপলের যজ্ঞতন্ত্রজটিল এবং ভয়-ভীতি-সমাকুল বহুদেবনিষ্ঠা এবং অশেষ ক্রিয়াগহনতা ইহার ভিতর নাই! সংসারের 'মোহবন্ধ' ছিন্ন করিবার জন্য অশেষ বিশেষ কর্ম্মচেষ্টা. চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে শতসহস্র প্রকারের রাজ-হঠ-মন্ত্রের উপায় কৌশল, সমস্তই যেন নিমেষে তুলাধুনী হইয়া উড়িয়া গেল! কত সোজা কথা, অথচ মানুষের পক্ষে ওই কথাটার সামনাসামনি উপস্থিত হওয়াটাই কত কঠিন হইয়াছে! কত কাল কত যুগযুগান্তের বহু সাধনা-ব্যাপার আবশ্যক হইয়াছে! দেশ বিদেশের মনুষ্যসমাজের ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিবেন, এই একের তত্ত্ব, একের প্রতি প্রেম তত্ত্ব, মনুষ্যের নেত্র সমক্ষে প্রকট হইবার পক্ষে কত কাল, কত বিড়ম্বনা, কত অভাবনীয় অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়া আসিয়াছে! এখনও— এত কাল পরেও, ওই সোজা কথাটার অনুবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, উহা বুঝিয়া লওয়ার পক্ষেও আমাদের অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে কত দিক হইতে কত প্রকারের নিষেধ এবং অন্তরায়! সরল এবং মানুষ হওয়াটাই মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন! সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কি তাহাই নহে? আধুনিক বিজ্ঞান যেমন মানুষের জ্ঞানকর্ম্মের সমক্ষ-স্থান হইতে মনুষ্য-অদৃষ্টের এই জালজঞ্জাল অপসারিত করিতে চেষ্টিত আছে, আধুনিক সাহিত্যও সকল দিকে মুখ্যভাবে এই সরলতা এবং অনার্জ্জবই লক্ষ্য করিতেছে!

যাহা হউক, ভারতের সাহিত্যহৃদয় এই এক বার সরলতা এবং মনুষ্যত্বনিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফল যে নিরতিশয় মহার্ঘরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সরলতা এবং মনুষ্যত্বনিষ্ঠাই কবির নিজের সাপক্ষে আসিয়া স্বাধীনতা রূপে উপস্থিত হয়। আমাদের ভাষার এই শব্দটা ইংরাজী 'লিবারটি' বা 'ফ্রীডম্' হইতে অনেক বৃহৎ এবং ব্যাপক অর্থের সঙ্কেত করিতেছে। অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে উভয় দিকেই উহার অধিকার। এই স্বাধীনতা 'স্বাতন্ত্র্য বা আত্মাধীনতা' ইহা পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যত্বনিষ্ঠা বা সরলতার আত্মজা বই নহে। সকল দিকেই, মনুষ্যের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য এবং শিল্পের রক্ষয়িত্রী রূপে, এক কথায় মনুষ্যসভ্যতার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী পরমদেবতা রূপে, এই স্বাধীনতাকেই নির্দ্দেশ করিতে পারি! ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যেমন আত্মজ্ঞানই চরম কথা, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির জীবনে বা জাতীয় জীবনে, তেমনই এই স্বাধীনতা! কবি কাব্য রচনা করেন, স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া, এবং স্বাধীনতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া! পাঠক উহা অধ্যয়ন করে, নিজের পরিব্যাপক আত্মতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য! আপনার অহংতত্ত্বকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য! নব নব রসলোকে উল্লসিত হইয়া নিজের আনন্দময় তত্ত্বকে ঘনিষ্ঠতরভাবে উপলব্ধি করার জন্য! মনুষ্যের শিক্ষা, দীক্ষা

বা জ্ঞানকর্ম্মের ব্যাপার মাত্রই স্বকীয় তত্ত্বকে অবিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য বই আর কিছুই নহে। এই কারণে অনন্তের সন্তান মনুষ্যকে যেই কবি ভাবতত্ত্ব অথবা বস্তুর পন্থায় যতদূর আত্মজ্ঞানী করিয়া তুলিতে পারেন, সপক্ষে বা পরোক্ষে গৌণ বা মুখ্যভাবে যিনিই মনুষ্যকে এই স্বাধীনতার তত্ত্বে যতই উপনীত করিতে পারেন, তিনিই তত সখা, মিত্র, বন্ধু বা গুরুর পদবী অধিকার করিতে সক্ষম হন। জগৎতত্ত্বের মধ্যেও এই স্বাধীনতাই পরা প্রকৃতি! ভারতীয় দার্শনিকের চক্ষে, শবরূপী পরমাত্মার বক্ষঃস্থলে অনন্তলীলাময়ী মহাকালী! চতুর্ভুজার দুই করে অসি-খর্পর, এবং অপর দুই করে বরাভয়! ইনি গলদ্রক্তরসনা এবং ইঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা! মহাকালরূপিণী করালী, অথচ ভক্ত মনুষ্য-হৃদয়ের জন্য চিরন্তনী এবং করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি! পৌরাণিক ঋষি প্রাচীন সাংখ্য-বেদান্তের আনুগত্য রক্ষা পূর্ব্বক অনুপমভাবে বিশ্বপ্রকৃতির এবং সমগ্র মনুষ্য-সভ্যতার অন্তরস্থা এই বিশ্বভয়ঙ্করী অথচ যুগপৎ করুণারসার্দ্রা এই মাতৃকামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন! সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাই সংযমনিষ্ঠ ভক্তগণের জন্য অমৃত অমরতা এবং অভয়বর লইয়াই সর্ব্বত্র স্থির হইয়া আছেন; আবার অনাস্তিকগণের মুণ্ডমালা গলে পরিয়াই নৃত্য করিতেছেন! পৌরাণিক ঋষির এই ভাবগত মূর্ত্তিটাকে আধুনিকের চক্ষু লইয়া এই ভাবে দৃষ্টি করিলে, সাহিত্য-লোকের একটা পরম রহস্য-তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে পারি! কবিগণের আত্মনিষ্ঠা এবং উহার সু-কু ব্যবহারই চিরকাল সাহিত্যের সৃষ্টিস্থিতি এবং বিলয় সংঘটন করিয়া আসিতেছে! শিল্পকলার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই মূর্ত্তিটাকে আরও একটু বিশেষ ভাবে এবং অভিনিবিষ্ট ভাবে দর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

নবজীবিত সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ ভাবে এই মনুষ্যত্ব সরলতা এবং স্বাধীনতাকেই সম্মুখে রাখিয়াছিল। নবজাগ্রত মনুষ্যমন নানা জঞ্জালের মধ্যে বিজড়িত থাকিয়াও এই লোক-পাবনী, 'তিনে এক' এবং 'একে তিন' মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াই উহার পূজা করিয়াছিল! উহার ফলেই ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য! পূর্ব্বাপর মনুষ্যের সকল উন্নত সাহিত্যের ইতিহাসেই এই ইচ্ছাময়ী মহাদেবতার সাধন প্রকার, তাঁহার বহুমুখী আরাধনাই পরিদৃষ্ট হইবে। সাহিত্য মধ্যে ভাল মন্দ জীবন বা মৃত্যু যখন যাহা আসন্ন হইয়াছে, সমস্তই দেবতার তুষ্টি, পরিতোষ, অপ্রীতি কিংবা অসন্তোষ ঘটিত বলিয়া দর্শন করিব। মনুষ্যের হৃদয়-কালীদহ মধ্যে কমলকামিনী এই দেবী! কত নিকটে, অথচ কত দূরে! শত সহস্রের মধ্যে কেবল শ্রীমন্তগণই ইঁহার দর্শন লাভ করেন, সাহিত্যের চৌতিশার মধ্যে ইঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির ধারণা করিতে পারেন, নিজের সাধনভজন এবং যোগ্যতা গুণে জগতের মশান মধ্যে, বীভৎস রক্তসমুদ্রের বক্ষঃস্থলেও, এই ইচ্ছাময়ীর নব নব আবির্ভাব আকর্ষণ করিয়া, তাহাকে সংশয়ীর চক্ষু সমক্ষেও মূর্ত্তিমতী করিয়া যান; নিজের জীবনকে এবং সংসর্গী পাঠকগণকেও ধন্যতা প্রদান করেন।

আমরা দেখিতেছি, মৃচ্ছকটিক হইতে আরম্ভ করিয়া গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বত্র এই চমৎকার-নিষ্ঠ এবং রস-নিষ্ঠ মনুষ্যত্বের আদর্শ, সরলতা এবং স্বাধীনতাই ক্রিয়াগতি কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্যহৃদয়ের চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন সুর আলাপ করিয়াই, এই সমস্ত কবি সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; অযোগ্যগণ পরাস্ত হইয়া নীরবে বিস্মৃতিজলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। পুরাণের সাম্প্রদায়িক আদর্শ ইঁহাদের নেত্র সমক্ষ হইতে অপসারিত! মনুষ্যের হৃদয়-নীতি এবং বুদ্ধির জগতে এক নূতন আশা এবং আদর্শের বাতাস বহিতেছে! সংহিতা শাস্ত্রের চক্ষে হয়ত যাহা নিতান্তই বিগর্হিত, এই সকল ব্রাহ্মণ অনেকে তাহাই পরম বীরত্বে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! মনুষ্য হৃদয়ের মূলভাব বা passion গুলি আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে! ইঁহারা একান্ত মনে ওই স্থায়ীভাবগুলিকে রসাত্মক বাক্যে আকারিত করিতে, কামক্রোধাদি রিপুগুলিকেই ভাল-মন্দ স্বরূপ দান করিতে একাগ্র হইয়া গিয়াছেন। অন্য কোন অভিসন্ধি প্রবল নাই! কেবল

মনুষ্যের আত্মনিরূপণ, তাহার চিত্তবৃত্তির প্রতিরূপ গ্রহণ, তাহার ভিতর-চরিত্রের গলি-ঘুঁজিগুলি যথাযথভাবে নির্ণয়; মনুষ্যকে বিশেষ বিশেষ অবস্থা-ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া তাহার মর্ম্মের কথাগুলি, তাহার অন্তরাত্মার প্রীতিশান্তির প্রকোষ্ঠ কিম্বা বীর-করুণ-রৌদ্র, ভয়ানক বা বীভৎস রসের কুঠরীগুলাকেও অনাবৃত করিয়া ধরাটাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য! উহার সম্মুখে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য কণ্টকিত হইয়া উঠে নাই! এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই যেন সকল ইতিহাস পুরাণ বা সংহিতাশাস্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর একটা কার্য্যফল লাভ করা যাইবে। সাহিত্য অধিকারের অজড়, অশোক এবং অলোক পুরীটার মাহাত্ম্য যেন সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন! সাহিত্যরসের সুখ, দুঃখ, আপদ, বিপদ, সাহিত্যলোকের নর-নারী-চরিত্র, জীবনের অবস্থা এবং ভাবের বৃত্তান্ত সমস্তই মনোজগতের—মনুষ্যের অধ্যাত্মজগতের সম্পত্তি। প্রাকৃত সুখদুঃখের সহিত তাহার দুরান্তরের—লোকান্তরের ব্যবধান! ইহলোকের হাসি-অশ্রু, শোকতাপ, সমস্তই সাহিত্যলোকে আসিয়া অপরূপ আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়।

'আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ।' ভারতের হৃদয়ঙ্গম কবি ওই বাক্যে যেন সাহিত্যের এই অলকাপুরীর, এই অপরূপ মানসী পুরীটারই সন্ধান দিয়াছেন! নব আষাঢ়ের নব বারিসংরম্ভ হৃদয়ের মেঘটাকে অনুপম মন্দাক্রান্তা ছন্দের তালেতালে ওই পুরীর অভিমুখেই ছুটাইয়াছেন! বেদান্তশীর্ষ ভারতবর্ষের অভ্রভেদী হিমালয়শিখরকে 'ক্রৌঞ্চরন্ধ্র পথে' ফাঁকি দিয়া গলিয়া পড়িয়া, এই ব্রাহ্মণ ওই দুরান্তরস্থিত অথচ অন্তরতম পুরীর ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার সঙ্কেতটাই যেন 'বাৎলাইয়া' দিয়াছেন! ওই পুরীর অভ্যন্তরে কি মনুষ্য-হৃদয়ের চিরকালের মধু-মূর্ত্তি, কবিহৃদয়ের চিরকালের প্রিয়তমা "জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্" আনন্দ-সরসী রূপে অবস্থান করিতেছেন না? মেঘদূতটাকে এই ভাবে—এই নবসাহিত্যপুরীর আন্তরিক রসপরিচয় এবং সঙ্কেতবার্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিব। দ্যুলোক ভূলোকের অন্তশ্চর কবি-হৃদয় সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-সংহিতা অথবা বৈরাগ্য-মন্ত্র পরিহার পূর্ব্বক, ভারতবর্ষের মাটিটাকে পরম আনন্দে এবং পবিত্র বোধে বারংবার আলিঙ্গন করিতেছে; মনুষ্যহৃদয়ের প্রীতি-রস আনন্দ-রসটাকেই সারাৎসার জ্ঞান করিয়া, উহাকে একেবারে সোজাসুজি কৈলাসপুরীর পথ দেখাইয়া দিয়াছে! মনুষ্যের সমক্ষে এই অভিনব 'রোমান্স'—এই নবসাহিত্যদেশের সংবাদ! এই দেশ, এই নব আবিষ্কৃত নূতন মহাদেশ এত সহজ, অথচ এত কাল মনুষ্যের সতর্ক-বিজ্ঞান এবং যাতায়াত হইতে এত দূরবর্ত্তী ছিল! এই আবিষ্কারের পর হইতেই মনুষ্যের সভ্যতা মধ্যে এক নব অধ্যায় এবং নব যুগের আরম্ভ হইয়াছে!

সর্ব্বোপরি প্রকৃতি-নিসর্গ-প্রীতি! উহা ভারতীয় আর্য্যহৃদয়ে বেদ-দীক্ষার উত্তর ফল বই নহে। নিসর্গকে একটা স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং চরিত্র জ্ঞান করিয়া সংস্কৃত কবিগণ কাব্যে নাটকে খণ্ড কবিতায় সর্ব্বত্র একটা পরম পবিত্র অথচ রসমধুর উচ্ছ্বাস লাভ করিয়াছেন! উপবন, উদ্যান, অরণ্য, পৃথিবীর সিন্ধু, শৈল, আকাশ, স্বাভাবিক অথবা মনুষ্য হস্তালঙ্কৃত সর্ব্বপ্রকার নিসর্গ-ব্যক্তি বিষয়ে ভারতীয় মনুষ্যমন অপরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। এই দেশে মনুষ্যজীবন, মনুষ্যের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন নিসর্গের সহিত এত আত্মীয়তমভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করে যে, পদে পদে এই সম্বন্ধটার মধ্যে জাগ্রত থাকাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। তাই ভারতীয় কাব্যে নাটকাদিতে বর্ণনায় কিংবা কথাবার্ত্তায় ভদ্র ব্যক্তিমাত্রেই প্রতিপদে এই নিসর্গ নামক তৃতীয় ব্যক্তিটাকে যেন সর্ব্বত্র উপস্থিত জানিয়াই চলিতে থাকেন। এই দেশের race-culture বা জাতিগত সৎশিক্ষা কিংবা ভদ্রতা আদর্শের এই বিশেষ লক্ষণটুকু মনে রাখিতে না জানিলে, পাঠকমাত্রকেই কিছু না কিছু বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। পদে পদে অবান্তর বর্ণনা বা বিষয়সঙ্কেতে কাব্যের শিল্পগতি নিরন্তর ব্যাহত হইতেছে বলিয়াই মনে হইতে থাকে। ভারতীয় নিসর্গ-

প্রকৃতির এই শান্ত-সৌম্য নিস্তব্ধতা হৃদয়চরিত্রে সাধন করাটাই নানা দিকে ভারতীয় ধর্ম্মের এবং জাতীয় সভ্যতার চরম আদর্শ হইয়াছিল। নিসর্গের সহিত নির্ব্বিরোধ দাক্ষিণ্য আচরণ করিয়া, যথাসাধ্য নিসর্গ-সঙ্গত জীবন যাপন করাটাই ভারতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ! জীবনে কর্ম্মে ভূমা এবং শাশ্বতের শান্তি এবং নিস্তব্ধতার অনুভবে সচেতন থাকিয়া সমগ্র জীবনটাকে সর্ব্বশেষে বিশ্বসৃষ্টির অনাদি অনন্ত চরম নিস্তব্ধতার মধ্যে হারাইয়া ফেলাই ভারতীয় তপোবনের, বেদান্তের বা বৌদ্ধ নির্ব্বাণের প্রধান লক্ষ্য! বেদাচারসঙ্গত ধর্ম্মকর্ম্ম মাত্রেরই চরম কথা "শান্তি! শান্তি! শান্তি!" এই অনন্ত অর্থময় শান্তির আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিল তপোবন! বহিঃপ্রকৃতির মুনি-মনোরমা শান্তিই ভারতীয় আর্য্যহৃদয়কে অন্তর্লোকের শান্ত-পন্থা দেখাইয়া গিয়াছে! সুতরাং ভারতীয় হৃদয় নগরজনতার কলকল্লোলের মধ্যে অবস্থান করিলেও, ত্রিসন্ধ্যা উহাকে প্রণব পথে অতিক্রম করিয়া, সমস্তের অন্তর্বর্ত্তী এই নিবিড় শান্তি-নিস্তব্ধতার সাধনাটুকুই সার করিয়া আসিয়াছে! এখন, সারস্বত লোকে এই নিসর্গ দীক্ষা এবং শান্তির মাহাত্ম্য এবং উহার কার্য্যকরা শক্তি অপরিসীম! এই নিস্তব্ধতার গর্ভ হইতেই, কবিহৃদয়ের শান্তিনিষ্ঠ ভাব-তন্ময়তা হইতেই, চিরকাল মহাকাব্য এবং মহাগাথার জন্ম হইয়া থাকে! জগতের সকল দেশের কবিগণ এবং বাণীপন্থীগণই এই তত্ত্বের সাক্ষ্য দান করিবেন।

অন্য দিকে, ভারতীয় নিসর্গ-প্রেমের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহার মধ্যে আপাততঃ কোনরূপ 'দার্শনিকতার' নামগন্ধও নাই। সকল 'পরমার্থ' আদর্শের ন্যায়, এই নিসর্গ প্রেম গভীর; অথচ উহা আধুনিক ইয়োরোপীয় নিসর্গ-কবিতার ন্যায় আত্ম-জাগ্রত হইয়া অহং-মুখ হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। এই সবল অথচ স্থিরনিষ্ঠ মহাযোগই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বপ্রকাশ লাভ করিতে চাহিয়াছে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড, মহাভারতের বনপর্ব্ব, কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত, বিক্রমোর্ব্বশী বা কুমারসম্ভবে, ভবভূতির উত্তরচরিত বা মালতীমাধবে, ন্যূনাধিক সর্ব্বত্র সকল কাব্যে নাটকে এই পরম যোগনিষ্ঠ নিসর্গসহানুভূতিই অতর্কিতে হৃদয় অধিকার করিয়া উহাকে চিরকালের জন্য কিনিয়া ফেলে। বেদের সবল সরল নিসর্গ-পূজা এবং তপস্বিগণের "তপোবন" জীবন হইতেই উপনিষদ্ এবং রামায়ণ মহাভারতের তপোনিষ্ঠ হৃদয় দীক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছিল। উহাদের নিসর্গ-নিমগ্ন চিত্ত হইতে, যেন গুরুপরম্পরায় দীক্ষা সিদ্ধি করিয়াই, শূদ্রক বিষ্ণুশর্ম্মা কালিদাস প্রভৃতির কাব্যাদি, পরবর্ত্তী সংস্কৃতের কটমট কাব্যাদির মধ্যে পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র এই মহান্ আদর্শই জাগরূক থাকিয়া সংস্কৃত সাহিত্যকে অতুল মাহাত্ম্য দান করিয়াছে! মানব-হৃদয় প্রকৃতি ও অব্যক্ত! সংস্কৃত সাহিত্য পরম ঋজুভাবে এই ত্রিপথগা বিশিষ্টতায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নব যৌবনের সুস্থির রস-নিষ্ঠার গতিকেই সংস্কৃত সাহিত্য কোনরূপ সতর্ক দার্শনিক উদ্দেশ্যে কণ্টকিত না হইয়া এবং কাব্য-শিল্পের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়াই চলিতে পারিয়াছিল! এই লক্ষণটাকে বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান মাহাত্ম্যটাই চাপা পড়িয়া যাইবে।

এই মনুষ্যত্বনিষ্ঠা, সরলতা, স্বাধীনতা, নিসর্গ-প্রীতি এবং মনুষ্য-হৃদয়ের অনার্জ্জব রস-নিষ্ঠা সমস্তই একটি মাত্র ধর্ম্মের—সাহিত্য-ধর্ম্মের নামান্তর। উহাই আধুনিক সাহিত্য আত্মার ইতিহাস সূত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের মুখ্যতা, গুরুতা এবং অতুলনীয়তা সপ্রমাণ করিবে। আমরা দেখিব, এই বিশেষত্ব বিষয়ে হেলেনিক বা রোমক সাহিত্য তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেও পারে নাই। গ্রীকজাতির অতুলনীয় ভাস্কর্য্য-আদর্শ হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া তাহার সাহিত্য অনুপম রস-সংযমের সাহায্যে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ওই দৃঢ়তার দরুণেই আধুনিক সাহিত্য-সেবীর চক্ষে পরম আদর্শ পদবী অধিকার করিয়া আছে। গ্রীকশিল্পের অতুলনীয় সংযত ভাব ভারতীয় কাব্যের মধ্যে নানা কারণে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই; রামায়ণ মহাভারতের সরল সবল তারস্বর কিংবা মাহাত্ম্য-সাধনাও বিকশিত হইতে

পারে নাই ; পুরাণের অপরিচ্ছন্ন দার্শনিকতা কিংবা ধর্ম্ম-ভাবুকতাও বিলাসী হইতে পারে নাই। ভিতরে দৃষ্টি করিলেই বুঝিব, পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য-বিদ্রোহ, দৈব-দ্রোহ এবং মনুষ্যত্ব-আদর্শের দরুণেই পারে নাই। ভারতীয় সাহিত্য-মতি তাহার সর্ব্ববিস্মারক এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতির বিরুদ্ধে নানা দিকে প্রতিকুলতা আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আত্মরক্ষা করিতে গিয়াই মনুষ্য অতর্কিতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতেই দেখা যাইবে যে, তখনও এই জাতির মধ্যে পার্থিবতা এবং প্রাণ ছিল। তখনও এই জাতির সমাজ-পরিবেশের মধ্যে মনুষ্যকে একেবারে অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের এই আদর্শ সম্পূর্ণ আধুনিক। ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং ইয়োরোপীয় মনুষ্য-সভ্যতার নবজীবনযুগে বহু পরবর্ত্তী কালে এই বিদ্রোহ এবং উদ্দাম রসপ্রবণতাই কার্য্যকর হইয়া আধুনিক 'রোমান্টিক' আদর্শের খ্যাপন করিয়া গিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, পুরাণের রস-প্রবণতা এবং জগতের কারণ বিষয়ে একটা "সত্যশিব সুন্দর" বুদ্ধি, অধিকন্তু ভাগবতী প্রীতি-ভক্তির আদর্শ হইতেই, ভারতীয় সাহিত্য এই আধুনিক মনুষ্যত্ব আদর্শটাকে স্বতঃসিদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শটাও স্বয়ং আর্য্যদ্রাবিড়ের সম্মিলন, বুদ্ধবিদ্রোহ এবং বুদ্ধদেবের আদর্শটাকে ব্যাপকভাবে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা বই নহে। বর্ত্তমানের তীরবাসী আমরা, এই সমস্তের মধ্য হইতে অতীতের মনুষ্য-হৃদয়োত্থিত বিপুল সমুদ্র-কল্লোল এবং উহার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসটুকুই অনুভব করিতেছি ; এবং অনাগতের মহিমাই উপলব্ধি করিতেছি!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

শেফালিকা

(১)

ক্ষুদ্র শেফালী আমি!
শারদ নিশার সুকুমার বুকে
কি জানি কে মোরে ফুটা'ল কৌতুকে,
মোর হাসি-খেলা, জীবনের মেলা,
কেবলি একটি যামি!
ক্ষুদ্র সেফালী আমি!

(২

নাহি মোর অবসর!
আকাশ, বাতাস, চাঁদিমা, তারায়
কেন বা আকুলি ডাকিছে আমায়,
মোর ভালবাসা, কে করিছে আশা,
কাঁদিবে ক্ষণেক পর!
নাহি মোর অবসর!

(৩)

এখনি পড়িব ঝরে!
ধরা-রাণী ওই পেতেছে আঁচল,
বন-মাতা বুঝি ফেলে আঁখি-জল,
পলকের মোর পুলক-লহর
ঘুচে যাবে চির তরে!
এখনি পড়িব ঝরে!

(৪)

তুমি এস এক বার!
ওগো অজানিত, ওগো প্রিয়তম,
তব লাগি নিশি-অভিসার মম,
নীরবে চরণ করিব ধারণ
হৃদি মাঝে প্রাণাধার!
তুমি এস একবার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

যখাইয়া

"Superstition is a misdirection of religious feeling."——Whitely.

আজ পাঠকগণকে একটি তীর্থ স্থানের পরিচয় দিব। তাহার নাম, যখাইয়া। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, আগ্রা হইতে কিছু দূরে ও মাইনপুরী জেলার সীমান্ত ভাগে এই তীর্থক্ষেত্রে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। 'যখাইয়া' শব্দটি উক্ত প্রদেশের গ্রাম্য ভাষায় সংস্কৃত 'যক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ। এই যখাইয়া তীর্থের উৎপত্তির বিবরণ বড়ই রহস্যজনক।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে—এক দিন অন্ধকার রাত্রে এক জন গৃহস্থের বাটিতে তিন জন লোক আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করে—এক জন জাতিতে ব্রাহ্মণ, অপর ব্যক্তি গোয়ালা, ও তৃতীয় ব্যক্তি জাতিতেহাড়ি। সেই রাত্রেই উক্ত গৃহস্থের বাটিতে কে আসিয়া তিন জনকেই হত্যা করে। তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আর কোনই বিবরণ জানা যায় না; হত্যাকারী কে তাহাও এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ তিন জন হত ব্যক্তি ভূতযোনি গ্রহণ করিয়া তিন প্রকার ভূতে পরিণত হয়, ও দু'এক দিন পরে যে গৃহস্থের বাটীতে তাহারা হত হইয়াছিল তাহার নিকটে আসিয়া এইরূপ প্রকাশ করে যে, "আমরা এখন তিন জনেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, আর আমরা সম্মুখবর্তী প্রান্তরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমাদের তিন জনের জন্য তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর, তাহা না হইলে তুমি শীঘ্রই সবংশে নিহত হইবে। আর, এই তিনটি মন্দির স্থাপিত করিয়া দেশ বিদেশে সকল লোককে বিজ্ঞাপিত কর যে, যাহারা মাঘ মাসে প্রতি রবিবার আমাদের পূজা দিবে তাহাদের পুত্রকন্যা চিরদিন সুস্থ ও নীরোগ থাকিবে। যদি কেহ কখনও কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয় তবে পূজান্তে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিবে। বন্ধ্যা নারী পূজার পর অচিরাৎ পুত্রবতী হইবে।" তিন জনের পূজা প্রকরণ কিরূপ হইবে তাহাও তাহারা বলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভূত বলিল—"আমার পূজার উপকরণ তণ্ডুল ও নারিকেল;" গোয়ালা ভূত কহিল—"আমাকে দুগ্ধ ও মদ্য দ্বারা পূজা করিতে হইবে;" হাড়ি ভূত বলিল—"আমার সম্মুখে শূকর বলিদান দিতে হইবে।" এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাসাধ্য নগদ কিছু দেওয়ারও অবশ্য আদেশ হইয়াছিল! ভূতগণের আদেশ মত গৃহস্থ তিনটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিল ও যক্ষ তিন জনের আদেশ শীঘ্রই বিদেশে প্রচারিত হইল। সেই দিন হইতে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে চারিটি রবিবারে পূজা দিবার জন্য কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, ফরক্কাবাদ প্রভৃতি জেলা হইতে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। পুত্র কিংবা কন্যা জন্মিবার পর অসংখ্য যুবতী রমণী আপন আত্মীয়গণ পরিবৃত হইয়া, সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই "যখাইয়া" মহাতীর্থে সমাগত হয়; এবং সকলেই তণ্ডুল, নারিকেল ও দুগ্ধ এবং মদ্য উৎসর্গ করিয়া ও শূকর বলিদান দিয়া ভূতত্রয়কে পূজা করে। এই অসংখ্য লোকের জন্য অসংখ্য শূকরের প্রয়োজন। কিন্তু, পাণ্ডারা কয়েকটি মাত্র ছিন্নমুণ্ড শূকর পূজা স্থলে লইয়া আসে, ও এক একটি শূকর সহস্র সহস্র লোকের পূজা সমাপন করে। এই প্রকারে পাণ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে।

তীর্থটি যেমন অপরূপ, তীর্থযাত্রার সময়টিও তেমনই বিচিত্র। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—বিশেষতঃ আগ্রার নিকটস্থ প্রদেশ-সমূহে মাঘ মাসে ভয়ঙ্কর শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। তদ্ভিন্ন ঐ সময়ে প্রায়ই মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে; কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কার—বিশেষতঃ যে সংস্কার পালন করিলে সন্তানের মঙ্গল হয়-ইহা এতদূরই বদ্ধমূল যে, সেই দারুণ শীতও কাহাকেও সেই ধর্ম্মপালনে বিরত করিতে পারে না। আমরা অনেকবার শুনিয়াছি—এই দুঃসহ শীতে, তুষারপাতের ন্যায় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে,

ঘোর অন্ধকার রাত্রে সিক্ত বসনে কাঁপিতে কাঁপিতে, ক্ষুদ্র শিশু কোলে লইয়া, অসংখ্য নর-নারী পদব্রজে অথবা গো-যানে আগমন করে। এই বৃষ্টি ও শীতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। উহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের সংখ্যাও বিস্তর। যখন এই সকল লোক সেই অনাবৃত, আশ্রয়শূন্য প্রান্তরে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা পাঠক সহজেই কল্পনা করিতে পারেন।

এ পর্য্যন্ত কোন যাত্রীর পুত্র-কন্যা এই পূজা দিয়া ভূতত্রয়ের মাহাত্ম্যে কোন সংঘাতিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে কি না, অথবা কোন বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করিয়াছে কি না, আমরা তাহার সংবাদ পাই নাই। কিন্তু, এই 'যখাইয়া' তীর্থে এখন পর্য্যন্ত এই বিংশ শতাব্দীতেও অগণ্য লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই তীর্থে থাকিবার কোন স্থান নাই, এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহেও ইহারা কাহারও বাটীতে বাসস্থান পায় না। অতএব, এক রাত্রি মাত্র ঐ প্রান্তর মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রাতে পূজা দিয়াই যাত্রিগণকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই এক রাত্রির মধ্যে তাহাদিগকে যে কত প্রকার বিপদে পড়িতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, হয়ত যাত্রীদিগের পুত্র কন্যা চুরি গিয়াছে, কিংবা কাহারও শিশু পুত্রের স্থানে কন্যা রাখিয়া, কে পুত্রটিকে লইয়া গিয়াছে; অথবা কন্যার স্থানে পুত্র রাখিয়া কন্যাটিকে লইয়া গিয়াছে; কেহ বা সস্ত্রীক পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, প্রভাতে,উঠিয়া দেখেন যে, স্ত্রীর কোনই সন্ধান নাই। হয়ত অনেক অনুসন্ধানের পর, অনেক দিন পরে দূর দেশে গিয়া কাহারও বাটিতে স্বীয় স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করায় গৃহস্বামী অতি ক্রুদ্ধ ভাবে বংশদণ্ড লইয়া তাড়না করিলেন, কিম্বা স্ত্রী স্বয়ং ফিরিয়া যাইতে অসম্মতা হইলেন। এইরূপ ঘটনা সম্বন্ধে ফৌজদারি আদালতে প্রতি বৎসরই মোকর্দ্দমার কথা শুনা যায়।

এই তীর্থস্থান যে কেবল হিন্দুদের তীর্থ তাহা নহে,—অনেক নীচ বংশীয় মুসলমানও সেখানে পূজা দিতে যায়। অবশ্য তাহারা শূকরের পরিবর্ত্তে শুপারী অথবা হিন্দু আচার অনুসারে অন্য কোন সামগ্রী দিয়া পূজা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সময়ে তাহাদিগকেও এই সকল বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। এই উপলক্ষে কখনও কখনও "মুট্‌," বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত মহা অনিষ্টকর তীর্থযাত্রা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন উপায় অবধারণ করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। তবে গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা তাঁহাদের বিধি-বিরুদ্ধ এই মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারীও কন্‌ষ্টেবল উপস্থিত হয়। তাহাতে না কি যাত্রিগণের এই বিবিধ বিপদের উপর আবার একটি নূতন উপদ্রব সহ্য করিতে হয়।

যে গৃহস্থ তিনটি মন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাত্রিগণের উপহার সামগ্রী তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু, এখন সে সকলের অনেক অংশীদার জুটিয়াছে। প্রত্যেক রবিবারের পূজা শেষ হইলে পুলিশের সম্মুখে অংশীদারগণ ভাগ করিয়া লন। তন্মধ্যে পুলিশকে কিছু অংশ দিতে হয় কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু, এই পূজা হইতে যাহা আদায় হয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার উপরে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অংশীদারগণকে পুলিশের নিকট হিসাব দিয়া, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সরকারকে রাজস্ব দিতে হয়। এই তীর্থ উপলক্ষে কোন কোন বৎসর অন্যূন পোনেরো হাজার টাকা আমদানী হয়।

যাত্রিগণকে তীর্থস্থানে যাইবার সময় কয়েকটি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। যথা—তাহারা গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পর পথে যেখানে দাঁড়াইবে কিংবা তাহাদের শকট থামিবে, সেইখানেই প্রত্যেক যাত্রীকে টাকা, পয়সা,—অন্ততঃ একটি কড়ি ফেলিয়া দিতে হইবে। পথি মধ্যে যদি কেহ তাহাদের সঙ্গে কলহ করিতে আসে কিম্বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, এমন কি

প্রহার করে বা তাহাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের গাত্র-স্পর্শ করিয়া অপমানিত করে, তবুও তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে নাকি পূজা ব্যর্থ হইয়া যায়! এই বিচিত্র প্রথার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অনেক দুশ্চরিত্র লোক স্ত্রালোকদিগের উপর বহুবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে; কিন্তু, তাহারা সে অত্যাচার বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়া, মহাতীর্থে মহা-ফল-প্রাপ্তির আশায় সকল কষ্ট ও সকল অপমান সানন্দে উপেক্ষা করিয়া থাকে। আরও কত কাল এই অপূর্ব্ব তীর্থ প্রচলিত থাকিবে, বলিতে পারি না।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

প্রসূতি ও সূতিকাগৃহ

গর্ভের প্রথম ৩ মাস ও শেষ ৩ মাসে যত সহজে গর্ভ-পাত হইবার সম্ভাবনা এমন মধ্যকার ৩।৪ মাসে নয়। এই কারণে গর্ভিণীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে ৪ মাস হইতে ৭ মাসের মধ্যে তাহা করা উচিত। ইহার পূর্ব্বে বা পরে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে গাড়ী বা পাল্কীর ঝাকুনিতে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভাবী সন্তানের জন্য প্রস্তুত হওয়া—প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর, প্রসূতি ও সন্তানের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, সে সমস্তই সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। গর্ভিণী ইচ্ছা করিলে, বিস্তর জামাজোড়া বিছানাপত্র প্রভৃতি স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে কিছু অর্থও বাঁচে, আর গর্ভিণীর সময় কাটাইবার একটি সুন্দর অবলম্বনও হয়। আমা-দের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; এখানে খুব বেশী কাপড়চোপরের আবশ্যক হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশকাল প্রভৃতির সম্যক্ বিচার না করিয়া অনেকেই শিশুর জন্য ইংরাজদিগের অনুকরণে পোষাকপরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা যে কেবল অনাবশ্যক বলিয়া নিন্দনীয় তাহা নহে; ইহার দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্যেরও বিশেষ অনিষ্ট সাধন করা হয়। শীতকালের জন্য পশমী কাপড়ের, আর গ্রীষ্মকালের জন্য নয়ানশুকের ফ্রক প্রভৃতি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

শিশুর কোমরে জড়াইবার জন্য ৩।৪ ডজন নেঙটীও প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। এগুলি দেখিতে রুমালের ন্যায় হইবে। এ ছাড়া আরও যে সকল দ্রব্যাদির আবশ্যক হইতে পারে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।—

১। ৪ ইঞ্চ্ স্কোয়ার ২৪ খানি পুরাতন বস্ত্র-খণ্ড। এগুলি অনেকক্ষণ ধরিয়া গরম জলে ফুটাইয়া পরে শুকাইয়া লইতে হয়। নাড়ী কাটা হইলে নাড়ীকে ঢাকিবার জন্য এগুলির আবশ্যক হয়।

২। ৪ ইঞ্চ দীর্ঘ ৩ ইঞ্চ প্রস্থ 'এবসরবেণ্ট' কটন নামক তুলার একটি পুরু গদি। নাড়ী খসিয়া পড়ার পর নাভিমূলে প্রয়োগ করিবার জন্য ইহার আবশ্যক।

৩। কতকগুলি ছোট ছোট পরিষ্কার ন্যাকড়ার টুকরা—এগুলি যেন বেশ নরম হয়। শিশুর মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য এগুলির আবশ্যক।

৪। এব্‌সর্‌বেণ্ট্ কট্‌ন্ নামক তুলার এক প্যাকেট

৫। সূঁচ, সুতা, কাঁচি প্রভৃতি।

৬। টার্কী স্পঞ্জ্।

৭। এক খানি খুব ভাল সাবান। যে সকল সাবানে চর্ব্বির ভাগ বেশী আছে, শিশুদের ব্যবহারের জন্য সেই সকল সাবানই প্রশস্ত।

৮। ভিনোলিয়া টয়েলেট্ পাউডার।

৯। নাড়ী শুকাইবার পাউডার। এই পাউডার নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঘরেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। বোরিক এসিড অর্দ্ধ আউন্স, অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক্ অর্দ্ধ আউন্স, ষ্টার্চ অর্দ্ধ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই ৩ টি ঔষধ কোন ডাক্তারখানা হইতে আনাইতে হয়।

১০। জিঙ্ক্ অয়েণ্টমেণ্ট্, একটু বোরিক লোসন্ এবং গ্লীসিরিন্ অব্ বোরাক্স্ এক আউন্স। এ তিনটি ঔষধ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

১১। কতকগুলি সেফ্‌টী পীন ও শিশুর চুল আঁচড়াইবার জন্য একখানি খুব নরম বুরুষ।

১২। শিশুকে ধরিবার জন্য এক খানি পিঁড়ি বা কাষ্ঠ ফলক।

শিশুর কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি একটি পৃথক বাক্সে রাখিয়া দিলে, কার্য্যকালে বিশেষ সুবিধা হয়। এখানে ওখানে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে হয় না। শিশুর স্নানের জন্য একটি গাম্‌লা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর শোবার জন্য একখানি ছোট খাটের আবশ্যক। এখানিও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। খাটখানি যেন আড়াই ফুটের বেশী উচ্চ না হয়; ইহার চারিদিকে রেলিং দেওয়া আবশ্যক। শিশুর জন্য দোল্‌নার কোন আবশ্যক নাই। খাটের উপযুক্ত মশারি ও একখানি ম্যাকিংটস বা 'অইল ক্লথ' কিনিয়া রাখিতে হয়। একটা ছোট তোষক, কয়েকখানি কাঁথা, মাথার বালিস এবং লেপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর বিছানার জন্য চাদরের কোন আবশ্যক নাই। অনেক শিশু তুলার বালিস মাথায় দিতে পারে না, দিলে তাহাদের মাথা অনবরত ঘামিতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে তুলার বদলে ঘোড়ার বালামচির বালিসের ব্যবস্থা করিতে হয়।

শিশুর কবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভব— সাধারণতঃ শিশু ২৭৫ দিন গর্ভে থাকিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়। ২৭৫ দিনে ৪০ সপ্তাহ বা ১০ চান্দ্র মাস হয়। নবম মাস পড়িতে না পড়িতে সূতিকাঘর প্রস্তুত করা আবশ্যক, এবং সূতিকাঘরে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে, সে সমস্তও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

অনেক সময় গর্ভিণী ও তাহার আত্মীয়গণ যে সময় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে মনে করিয়া থাকেন, তাহার এক মাস পূর্ব্বে কিম্বা পরে শিশুকে জন্মগ্রহন করিতে দেখা যায়। গর্ভকাল গণনায় ভ্রমবশতঃই ঐরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাব্য দিন নির্ণয় করিবার একটি সঙ্কেত আছে। সে সঙ্কেতটি জানা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত গোলযোগের খুব অল্পই সম্ভাবনা। আমরা আবশ্যক বোধে উক্ত সঙ্কেতটি এইস্থানে উল্লেখ করিলাম।

রমণী যে দিন ঋতু স্নান করিয়া থাকেন, সেই দিন হইতে ৩ দিন গণিয়া গিয়া যে তারিখটি পাওয়া যায়, সেই তারিখ হইতে গর্ভের আরম্ভ দিন ধরিয়া ২৭৫ দিন গণিয়া গেলে যে তারিখ হয়, সেই দিন অথবা তাহার ২।৪ দিন অগ্রে কিংবা পশ্চাতে কোন এক সময়ে সন্তানের ভূমিষ্ঠ হইবার খুবই সম্ভাবনা।

সূতিকাগারে শিশুর মৃত্যু—কেহ যদি একটা সম্পত্তি হাতে পায়, তখন তাহার এই চিন্তা হয়, সম্পত্তিটি রক্ষা হয় কিসে, এবং ইহার সম্যক্ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিই বা কি করিয়া হয়। বাপ-মার নিকট সন্তান অপেক্ষা বহুমূল্য সম্পত্তি আর কিছু থাকিতে পারে না। সন্তানের জীবনরক্ষা এবং তাহার শরীর ও মনের পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য তাহারা যে দিনরাত চেষ্টিত ও চিন্তিত থাকিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। শিশুটির লালন-পালনে এবং শিক্ষা-বিষয়ে যদি কোন ভ্রম বা ত্রুটি না ঘটে, তবেই ত পিতা-মাতার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে প্রায় সকলেই কি করিয়া ছেলে মানুষ করিতে হয় তাহা মোটেই জানেন না। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কলিকাতা সমস্ত বাঙ্গলা দেশের শীর্ষস্থান বলিলেই হয়। এখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক যতটা বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন বাঙ্গলা দেশের অন্যত্র আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি কলিকাতায় যতগুলি করিয়া শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার কোন একটি বৎসরের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, এত দিনের শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চ্চা কলিকাতার অধিবাসীদিগের মজ্জাগত কুসংস্কার এবং

অজ্ঞানতার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা এস্থলে কলিকাতায় এক বৎসরে শিশুর মৃত্যু-তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ইংরাজ শিশু	১০০০	মধ্যে	৫৮ মৃত্যু
ফিরিঙ্গি ,, ...	"	"	৩.৬ "
হিন্দু ,, ...	"	"	৩১৫ "
মুসলমান ,, ...	"	"	৩১৩ "

উক্ত তালিকা দৃষ্টে, শিশুপালন বিষয়ে আমরা যে কতটা অজ্ঞ, আমাদের দায়িত্ববোধ যে কত অল্প, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সূতিকা-ঘরের দোষে অনেক শিশু সূতিকাগারেই বিনষ্ট হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক ডাক্তার মেক্ লিয়ড (Dr. Mc. Leod) বলেন, এই কলিকাতা নগরে যে সকল শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের শতকরা ৪৩ টির মৃত্যুর কারণ ধনুষ্টঙ্কার ভিন্ন আর কিছু নহে। সূতিকাগারটি যথোচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া, এবং উহার মধ্যে অবাধে বায়ু চলাচল ও আলোক-প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকা, এবং শিশুর নাড়ীটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখাই যে এই রোগের এত বেশী প্রতিপত্তির কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকে শিশুর এই ধনুষ্টঙ্কার রোগকে শিশুকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলিয়া থাকে। এই রোগ অতিশয় প্রাণঘাতক, ইহার আক্রমণে একটি শিশুরও বাঁচিবার আশা থাকে না। এই সাংঘাতিক রোগের নিবারণের একমাত্র উপায়, সাধারণের মন হইতে কুসংস্কা দূর করা আর সূতিকাগারের সংস্কার করা। ইডেন হাসপাতালে প্রতি বৎসর অনেকগুলি করিয়া শিশুর জন্ম হয়, কই তাহাদের নিকট ত পেঁচো অগ্রসর হইতে পারে না; পেঁচোর যত কিছু বিক্রম-পরাক্রম আমাদেরই নিকট। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার সাণ্ডার্সও (Dr. Sanders) মেক্লিয়ডের কথার অনুমোদন করেন। তিনি বলেন,ইডেন হাসপাতালে একটি শিশুরও যে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইতে দেখা যায় না, তাহার কারণ সেখানে দিন রাত বায়ু অবাধে চলাচল করিতে পারে। শিশুকে যেস্থানে রাখা হয়, সে স্থানটি সঙ্কীর্ণ ও আলোক-বিরল নহে। আমাদের ঘরগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, চিকিৎসা উদ্দেশে ধনী নির্ধন প্রায় সকলপ্রকার ব্যক্তির বাটীতেই তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে; এ সব বাটীতে তিনি যে সূতিকা-ঘর দেখিয়াছেন, তাহা বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার বায়ু এত দূষিত যে, তাহা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণের উপযোগী বলা যায় না। অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ ঘরটিতে আবার একটি করিয়া রাবণের চিতা জ্বালাইয়া রাখা হয়। ইহার উপরে ঘরটির দুয়ার জানালাগুলি ২৪ ঘণ্টা ধরিয়াই বন্ধ। প্রসূতি ও শিশুকে অন্ততঃ ১১ দিন ঐ ঘরেই থাকিতে হয়।

ডাক্তার সণ্ডার্স আরও বলেন যে, এদেশীয়দিগের সূতিকা ঘরে তিনি যত বারই গিয়াছেন,তত বারই তাঁহার নিশ্বাস অবরোধ হইবার মত হইয়াছিল। এই ত গেল কলিকাতার ধনকুবেরদিগের সূতিকা-ঘরের কিঞ্চিৎ মাত্র পরিচয় প্রদান।

পল্লিগ্রামের সূতিকাগারের ব্যবস্থা আরও যে কত লোমহর্ষণ তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এখানে প্রায় বাড়ীতেই গৃহের প্রাঙ্গণে ঠিক নর্দ্দমার নিকটে অস্থায়ী রকমের একটি কুটীর প্রস্তুত করান হয়। এই কুটীরের না আছে দুয়ার, না আছে জানালা। প্রবেশ-নির্গমের জন্য একটিমাত্র দরজা থাকে বটে; কিন্তু তাহাও আবার দিনরাত বন্ধ রাখার ব্যবস্থা। এই কুটীরের উচ্চতা এত অল্প যে, হামাগুড়ি দিয়া না গেলে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। এই ঘরটীতে একটিমাত্র প্রাণীরই স্থান হওয়া দুর্ঘট; ধাত্রী, শিশু ও প্রসূতি এই তিন জনকেই অন্ততঃ ১১ দিন ধরিয়া ইহার মধ্যে থাকিতেই হইবে। এ ঘরের সাজসজ্জা বিছানা-পত্র প্রভৃতির যেরূপ ব্যবস্থা, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, মাঘ মাসের শীতে বাড়ীর অন্যান্য সকলে দিব্য লেপ মুড়ি দিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছেন; আর সূতিকাগারে প্রসূতি ও শিশু উভয়ে দারুণ শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ

করিয়াছে। লেখকের বেশ মনে আছে তিনি যখন প্রথম ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন, সেই সময় একটি নবজাত শিশুকে দেখিবার জন্য কোন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহাকে আহ্বান করা হয়। জন্ম হইতেই শিশুটীর আর ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। সে সময় আষাঢ় মাস, অতিশয় গরম। লেখক দেখিলেন, যে ঘরটীতে শিশুকে রাখা হইয়াছে, সে ঘরটীর দুয়ার জানালাগুলি রীতিমত বন্ধ। ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত আছে। শিশুটীর গাময় ঘামাছি নির্গত হইয়াছে, পিপাসায় তাহার তালু বিশুষ্কপ্রায়। শিশুটী যে গরমের জন্য কাঁদিতেছে, এই সহজ কথাটি বুঝাইবার জন্য সে দিন যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, লেখক আজও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সূতিকা-ঘরের রীতিমত সংস্কার এবং প্রসূতির ও শিশুর আরামের দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। আশ্চর্য্য এই যে, সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি এদেশের অতি প্রাচীন চিকিৎসকগণ সূতিকা-ঘরের এবং সূতিকাবস্থায় প্রসূতি ও শিশুর প্রতি যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি কোন ক্রমেই বর্ত্তমান কালে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার মত ভীষণ লোমহর্ষণ বলিয়া মনে হয় না। আমরা চরক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করাইবে। যে স্থানে সূতিকা-গৃহ নির্ম্মিত হইবে, সে স্থানে অস্থি-শর্করা খোলা খাপরা প্রভৃতি যেন না থাকিতে পায়; সে স্থানটী যেন প্রশস্ত রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণ যে যে কাষ্ঠ প্রশস্ত বলিয়াছেন, সেই সেই কাষ্ঠ দ্বারা যেন সূতিকা-গৃহ নির্ম্মিত হয়। পিঁড়ি খাট প্রভৃতি গৃহের চতুঃপার্শ্বের আবরণ কপাট প্রভৃতি যেন সেই সেই কাষ্ঠ দ্বারা করান হয়। অতি বিবেচনা করিয়া অগ্নি, জল মলত্যাগের স্থান, স্নানের স্থান প্রভৃতির এমন ব্যবস্থা করিবে যেন তাহা ঋতুসুখকর হয়।" সুশ্রুতের মতে "সূতিকা-গৃহ ৮ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। ইহা পূর্ব্বদ্বার অথবা দক্ষিণদ্বার হইবে। গৃহের সাজসজ্জা যথাবিহিত স্থানে সন্নিবেশিত করিবে; উহার ভিত্তি উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে।"

সুশ্রুত ও চড়ক সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই অপ্রীতিকর বা অস্বাস্থ্যকর বলা যাইতে পারে না। সূতিকা-ঘরের দুরবস্থা কবে কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বর্ত্তমান বিষয় সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে সকলেই আতুর ঘর এবং আতুর ঘর সংশ্লিষ্ট যাবৎ পদার্থকে নিতান্ত অস্পৃশ্য ও হেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস আতুর ঘর স্পর্শ করিলে অশুচি ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণ হয়। আতুর ঘরকে এরূপ চক্ষে দেখার একটা কারণও যে নাই তাহা নহে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে, যে সূতিকা-ঘর একবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে পুনঃ সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ না করিয়া ব্যবহার করিতে দিতে নাই। তাহাতে দ্বিতীয়া প্রসূতির বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এক-প্রকার জ্বর হইয়া মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। সূতিকা-ঘর সম্বন্ধে যে নিয়ম, প্রসূতির শয্যাবস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। আমাদের দেশের সে কালের চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞ লোকহিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ ব্যবস্থাপকগণও এ সকল না জানিতেন তাহা নহে। জানিতেন বলিয়াই সূতিকা-ঘর ও তাহার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহকে নিতান্তই অস্পৃশ্য, ধর্ম্ম-হানিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার ফল এই হইয়া দাড়াইয়াছে যে, লোকে সূতিকা-ঘর এবং নব প্রসূতির বিছানা প্রভৃতির এরূপ ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে সেগুলির কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ফেলিয়া দিতে বা নষ্ট করিতে কোনই কষ্ট হয় না। সেই কারণেই বোধ করি আমাদের দেশের আতুর ঘরের আজ কাল এইরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছে।

কোন একটি বিধির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি গোপন রাখিয়া অন্য একটি কৃত্রিম উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া জনসাধারণকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিলে, কালক্রমে সেই

বিধির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি একেবারেই ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। সকলেই জানেন, নব প্রসূতির পক্ষে অন্ততঃ একমাস কোন কার্য্য করিতে নাই। এ সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক। নব্য চিকিৎসকগণ ইহা জানেন প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণও যে তাহা না জানিতেন, এমন নহে; কিন্তু নব্য চিকিৎসক ইহার প্রকৃত কারণটি বুঝাইতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, প্রাচীনেরা তাহা করেন নাই। তাঁহারা প্রকৃত উদ্দেশ্যটি গোপন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে এইরূপ ভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যত দিন ষষ্ঠী দেবীর পূজা না হয়, তত দিন প্রসূতি একান্ত অস্পৃশ্যা, তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও যেন পাপাচরণ করা হয়। ইহার ফলে, বিশ্রামের আবশ্যকতা তলায় পড়িয়া ষষ্ঠী পূজারই প্রাধান্য হইল।

এইরূপে আমাদের আচারে ব্যবহারে ধর্ম্মে কর্ম্মে কতরূপ কুসংস্কারই যে স্থান লাভ করিয়াছে তাহা দু' এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল কুসংস্কার দেশ হইতে দূর করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে ইহা না করিলে জাতীয় উন্নতির আর আশা নাই। কিন্তু ইহা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি? শিক্ষা ব্যতিরেকে হৃদয়ের কুসংস্কার যাইতে পারে না। সাধারণে যাহাতে সুশিক্ষা পাইতে পারে, আমাদের কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলে হইবে না। তাঁহাদের বিধিব্যবস্থাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। যেগুলি কালের উপযোগী নহে তাহাদের পরিহার করিতে হইবে, এবং কেন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ, ইচ্ছা করিলে, অনেক কাজ করিতে পারেন। জাতীয় চরিত্র গঠন অনেক সময় তাঁহাদেরই হস্তে অর্পিত থাকিতে দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষিত চিকিৎসক-গণেরও এ বিষয়ে কম দায়িত্ব নাই। চিকিৎসার জন্য তাহাদের ধনীদরিদ্র ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোকদের সংসর্গে আসিতে হয়; সুতরাং সাধারণের হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ কুসংস্কার দূর করার পক্ষে ইহাদের যত সুযোগ আছে, এমন আর কাহারও নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ডাক্তারগণ এই প্রধান কর্ত্তব্যটির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। ডাক্তার শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য আচার্য্য। আচার্য্যের প্রধান কর্ত্তব্য, সাধারণকে হিতকর আচার সমূহ শিক্ষা দেওয়া। কবে আমাদের দেশের ডাক্তারগণ তাঁহাদের নামের সার্থকতা করিতে চেষ্টিত হইবেন?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

একটী ঘড়ির কাহিনী *

সে দিন নিলামের দিন। লোন আফিসে ভয়ানক ভিড়। ছুটিতে ছুটিতে আফিসে প্রবেশ করিয়া সিল্‌সেড্‌ একজন কর্ম্মচারীকে বলিল, "মহাশয়, আমার ঘড়িটা ছাড়িয়ে নিতে এসেছি, এখন পাব কি?" কিছুদিন হইল সে তাহার একটী ঘড়ি লোন আফিসে বন্ধক দিয়াছিল—'সুদে আসলে' এখন তাহাকে ১০০ ফ্রাঙ্ক দিতে হইবে। তাহার উপার্জন হইতে কিছু কিছু জমাইয়া সে প্রয়োজনীয় টাকা কয়টীও সংগ্রহ করিয়া আজ সেটি উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল।

কর্ম্মচারি খাতাপত্র উল্টাইয়া চসমার নীচের দিকে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"না, বড় দেরী করে এয়েছেন! শীঘ্র নিলামঘরে যান, বোধ হয় এখন তাহা বিক্রয় হয় নাই। যান, আর দেরী করবেন না।"

"ধন্যবাদ, তাই দেখি!" বলিয়া সিলসেড ফিরিতেছিল, এমন সময় একজন অশীতি পর বৃদ্ধ একখানা ছিন্নপ্রায় রসিদের ভাঁজ খুলিতে খুলিতে সেই কর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমার ঘড়িটা।"

* ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

"আপনারও দেরী হয়ে গিয়েছে; দেখুন, নিলামঘরে গিয়ে কি হয়।"

"হাঁ, অদৃষ্ট!" বলিয়া বৃদ্ধ কম্পিত পদে নিলাম-ঘরের দিকে ছুটিল।

নিলাম-ঘরে প্রবেশ করিয়া সিলসেড্ বৃদ্ধটিকে দেখিবার বেশ সুযোগ পাইল। বৃদ্ধের আকৃতি নিতান্ত বিষণ্ণ, দুর্ব্বল, মস্তকটি প্রায় কেশশূন্য, বয়সের ভারে যেন নত হয়ে পড়েছে, কিন্তু মুখখানা সর্ব্বদাই হাস্যোজ্জ্বল তার সেই সেকালের পোষাকে—বাহারে লম্বা লেজওয়ালা নীলরংয়ের উঁচু কলারওয়ালা জামা, বগলস্‌ওয়ালা জুতা ইত্যাদি—সে যেন সেকালের লোকের আদর্শ ছিল।

সম্মুখে অসংখ্য জনতা! প্রাচীরের উপর দিয়া নিলামকারীর টেবিলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল "আমার শৈশবের খেলার সাথী, যৌবনের বন্ধু ঘড়িটিকে কি আবার পাব?—ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ঐ টেবিলের উপর! যাক, তা'হলে এখনো বিক্রী হয়ে যায়নি, এখনো সময় আছে; ঠিক সময়েই এসেছি!"

বলিতে বলিতে আনন্দে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, অবলম্বনের জন্য সে নিকটেই একটী থাম ধরিয়া ফেলিল। তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল—ক্ষীণ অস্থিময় পা দু'খানি, জীর্ণ বক্ষঃপঞ্জর, অবনত পৃষ্ঠদেশ বিরলকেশ মসৃণ মস্তকটি, কম্পিত কর দু'খানি, আগতপ্রায় আনন্দের কল্পনায় কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, রক্তহীন ওষ্ঠপ্রান্তে বিমল হাস্য জাগিয়া উঠিল। আনন্দে তাহার মুখে কথা সরিল না, কিন্তু তার জলভারাক্রান্ত উজ্জ্বল চক্ষু দুটি সিলসেডের হৃদয়টীকে করিয়া তুলিল।

সিলসেড যে কার্য্যে আসিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গেল—বৃদ্ধের অমায়িক, সরল, হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিতে তাহার হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিল; যদিও উভয়ের ভিতর কোনও বাক্যবিনিময় হয় নাই, তথাপি সিলসেডের মনে হইল, তাহারা উভয়ে যেন কত কালের পরিচিত।

বৃদ্ধও একটু সামলাইয়া তাহার আরও কাছে আসিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আমি আমার ঘড়ির কাহিনীটী বলব—ঐ যে ডেস্কের উপর রয়েছে, ঐ ঘড়িটি! আশা করি, আর কিছুক্ষণ পরেই ওটি আজ আবার আমার হাতে পাবো! কিন্তু তোমাকে তার কাহিনীটি আগাগোড়া না বলে আমি যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না—মনে হচ্ছে যেন তোমাকে বল্লেই, মিলনের পূর্ব্বে বিরহের এই শেষ মুহূর্ত্তটুকুর উদ্বেগের অনেক লাঘব হয়ে যাবে।"

হৃদয়ের এরূপ উচ্ছ্বাসের উপর আর কোনও কথা বলা চলে না। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া সিলসেড-বৃদ্ধের কাছে সরিয়া গেল;—বৃদ্ধ তখন আরম্ভ করিল—

"সেটা একটা বড় সোনার ঘড়ি; ডালাখানার একদিকে রাজা সলোমনের বিচার-দৃশ্য, আর দিকে একটি সুন্দর মিনে করা ফলফুলের ছবি। সেকালের সব ঘড়ির মত ইটিতেও ঘণ্টা বাজিত। আমার জন্মাবার ঘণ্টাটিও নিশ্চয়ই এতে বেজেছিল, কারণ বাবা যখন সদ্যঃপ্রসূত আমাকে আমার মায়ের কোল থেকে নিয়ে আমার কপাল-দেশে প্রথম চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন, তখন তাঁহার বুকের পকেটে এই ঘড়িটাই ছিল।

"হায় হতভাগ্য পিতা, হায় দুর্ভাগ্য ঘড়ি! পিতা আমার জীবনের প্রথম সুহৃদ, আর ঘড়িটি প্রথম খেলনার সামগ্রী, আমার বালক কালের প্রথম আকাঙ্ক্ষার বস্তু!

"বাবা বলিতেন, তুমি যখন বড় হইবে—যখন তোমার বয়স পনেরো বৎসর হইবে, তখন তোমাকে চেনশুদ্ধ এই ঘড়িটি দিব।

"কবে সেই পনেরো বৎসর আসিবে, আমি কেবল সেই কথাই ভাবতাম। ঘড়িটীকে নিতান্তই নিজের করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার এত তীব্র হইয়া উঠেছিল যে এই কটা বৎসর সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইত, বৎসর যেন কাটিতেই চাহিত না। "মাঝে মাঝে আমি দুঃখ করিয়া বলিতাম, নাঃ, এ জন্মে আর আমি ঘড়িটা পাবো না।

"বাবা আমায় বড় আদর করিতেন। সেইজন্য প্রতি রবিবারই আমাকে ঘড়িটি ব্যবহার করিতে দিতেন।

সে সময় আমার মনের ভাব কি হ'ত তা তুমি সহজে বুঝতে পার; কিন্তু তবু আমি ঘড়িটিকে একান্ত ভাবে নিজস্ব করিতে চাহিতাম। তাই থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মনে হইত, পনেরো বৎসর বুঝি আর কাটবে না।

"হায়, পনের বৎসর পার হবার আগেই আমি সেটা পেয়েছিলেম; কিন্তু পিতৃদত্ত উপহার হিসাবে নয়, পিতার উত্তরাধিকারী-সূত্রে।

"যখনকার কথা বল্‌ছি—তখন দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব চলিতেছে—কাহারো মানসম্ভ্রম, ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। একদিন সন্ধ্যার পর একদল ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি লোক পিতাকে ধরিয়া লইয়া গেল—পরদিন দুর্বৃত্তেরা আর একটি নির-পরাধীর রক্তে বধ্যভূমি কলঙ্কিত করিল! বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে ও আমার মাকে মুহূর্ত্তেক মাত্র সময় দেওয়া হইয়াছিল—ক্ষণিকের জন্য মাত্র। হায়, সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই কত অশ্রু ঝরিয়াছিল! বিদায়-গ্রহণের সময় পিতা আমার হাত বাড়িয়ে তার ঘড়িটি আমায় দিলেন। দেবার সময় তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বাহির হয় নাই, কিন্তু একটু ম্লান হাসি দেখা দিয়েছিল। হায়, এখনও আমি সেই হাসি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

"যে গাড়ী করে তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম; ঘাতকের অস্ত্রে পিতার স্কন্ধ থেকে মাথা খসে পড়্‌ল দেখলাম-পরক্ষণেই চোখ বুজে এল—সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরে আসছে বলে মনে হল, সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল, আর সেই সঙ্গে সজোরে পকেটস্থ ঘড়িটাকে চেপে ধর্‌লাম!

"ঘড়িতে হাত দেবা মাত্রই একটা ভাব মাথার ভিতর ঢুকলো; একসঙ্গে আমি আমার চোখ ও হাতের মুঠা খুল্‌লাম, এবং পিতার মত হাসবার চেষ্টা করে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, তখন ১২টা বাজ্‌তে ১০ মিনিট!'

এমন সময় আবার নিলামের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল; কিন্তু এবারও তাহার ঘড়ি নয়। তখন সে আশ্বস্ত হইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—

"হ্যাঁ, তারপর। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পর, স্নেহময়ী মা আমার যে শোক সহ্য না কর্‌তে পেরে তাঁর কাছে চলে গেলেন; আমি সংসার-সমুদ্রে একা, আপন বলিতে পৃথিবীতে আমার কেহ রহিল না। শত সুখস্মৃতি-বিজড়িত সুখময় অতীতের সহিত বন্ধনকে নিত্য জাগরূক রাখিতে এক আমার এই আবাল্যকাঙ্ক্ষিত ঘড়িটি ছাড়া আর কিছুই রহিল না! কি হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘড়িটি আমার নিজের হইয়াছিল তাহা আগেই তোমাকে বলেছি; সেইদিন থেকে সে আমার এই দুর্ব্বহ জীবনের প্রত্যেক সুখদুঃখের ঘটনায় তার নিজের কর্ত্তব্য ভুলে নাই এবং সেইদিন হইতে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে!

"তারপর যে দিন আমি জারট্রুডকে বিবাহ করি, সে দিন আমার সকলের চেয়ে সুখের দিন। জারট্রুড আমার কখনো আমাকে দরিদ্র বলে ঘৃণা করেনি—সেটা তার নিজের গুণে! আমি এখন যা আছি, তখনও তাই ছিলাম; একজন সামান্য নকলনবীশ, কোনও রকমে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করি! আমার নিজের যদি প্রশংসনীয় কিছু থাকে, সে আমার জারট্রুডের প্রতি প্রগাঢ় অখণ্ড ভালবাসা! এই বিশ্বসংসারে আমাকে নিঃসঙ্গ, সকলের পরিত্যক্ত দেখিয়া তাহার হৃদয় স্বাস্থ্যলভ, করুণা ও সহানুভূতিতে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সে আমাকে সর্ব্বদাই আনন্দ সুখ ও প্রীতি প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই! চল্লিশ বৎসর আগেকার নব বধূ আজ এ বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন, নির্ভরে যষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তবু সে আমার সেই চিরপুরাতন জারট্রুডই আছে।

"খুব চুপি চুপিই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহের উপসর্গ স্বরূপ কোন আনন্দ উৎসব, কোনও

বৃহৎ ভোজ বা 'বল' নাচের আয়োজন হয় নাই; আমরা দুইটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গির্জ্জায়, এবং পরে, বিবাহ আইন মতে সিদ্ধ করিবার জন্য, আদালতে গেলাম; এবং বিবাহ অন্তে পতিপত্নী ঘরে ফিরিলাম। এ বিবাহে আমাদের উভয়ের কেহ কোনও রূপ যৌতুক বা উপহার পাই নাই, তথাপি আমাদের দৈন্যদশা সত্বেও আমাদের মত সর্ব্বপ্রকারে সুখী দম্পতী আর তখন ছিল কিনা সন্দেহ!

"দুজনে যখন এ দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিলাম, তখন জারট্রুড আমাকে কটা বেজেছে জিজ্ঞাসা করিল। তার এই কথাগুলি যেন দৈব-প্রেরিত বলিয়া মনে হইল। আমিও তার প্রশ্নের উত্তরে আমার ঘড়িটি লইয়া তাহাকে বলিলাম, 'জারট্রুড এইটি আমার উপহার, আমার হৃদয় ও মনের সঙ্গে সঙ্গে এটিকেও তোমার করে আমাদের বিবাহের উপহার-স্বরূপ অর্পণ কর্‌লাম। ইহাই আমার একমাত্র ধনসম্পত্তি, এটি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। কেন, তা তুমি জান।'

'প্রিয়তম, ধন্যবাদ' বলিয়া জারট্রুড তাহার শিরীষ-কোমল অমল-ধবল হস্তখানি প্রসারিত করিলে আমি ঘড়িটি তাহার হাতে দিলাম, ঘড়িতে তখন রাত্রি ১২টা বাজিতে ১০ মিনিট!

"ওকি!" বলিয়া সহসা সে ফিরিয়া দেখিল—আবার নিলামের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল! "না! ও আমার ঘড়ি নয়" বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হলে, আমার কাহিনীটা শেষ করে ফেলি!"

"একমাস পরে আমার জন্ম-তিথি আসিল। সে দিন জারট্রুড সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, 'প্রিয়তম, এই একটা মাত্র জিনিষ আমার আছে আজকের দিনে তোমাকে উপহার দিবার জন্য। আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসার সহিত আমি তোমাকে ইহা দিলাম।' এই বলিয়া সেই ঘড়িটি আমার হাতে দিল!

"তিন মাস পরে তাহার জন্ম-তিথি উপলক্ষে আমি আবার সেই ঘড়িটাই তাকে উপহার দিলাম; আবার আমার জন্ম-তিথিতে-সেটা ফিরে পেলাম! এইরূপে পচিশ বৎসর ধরিয়া যখন যে উৎসব আসিয়াছে, তখনি এই ঘড়িটাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইয়াছে! আর, অন্য কোনও উপহারের চেয়ে আমরা এই টীকেই অধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতাম; কারণ নিতান্ত আপন বলিতে এই একটীমাত্র জিনিষ আমাদের ছিল, এবং আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ হইতে ইহার সহিত কত সুখস্মৃতি বিজড়িত ছিল।

"সেই ঘড়ি আজ নিলাম-ঘরে এসেছে দেখে নিশ্চয়ই তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ, কিন্তু তার কারণ তুমি যদি শোন, তা হলে আর তোমার সে ভাব থাকিবে না।

"একদিন সহসা জারট্রুড রোগে পড়িল; সে রোগ আর কিছুতেই সারে না! ঔষধ ও পথ্যে আমাদের যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহার শেষ কপর্দ্দকটিও নিঃশেষ হইয়া গেল, তবু সে রোগ সারিল না। শেষে একদিন তার শয্যার পার্শ্বে বসে হতাশ হয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, এমন একটি পয়সা নেই যা দিয়ে ঔষধ ও পথ্য দিয়ে তাকে বাঁচাইয়া তুলি!

"চোখের সামনেই আমার ঘড়িটা পড়ে ছিল, সহসা মনে হল, হয়ত সেটী দিয়ে তার জীবন-রক্ষার কোনও উপায় হতে পারে! আমি আর ইতস্ততঃ করলাম না, যদিও সেটা তখন তাহার সম্পত্তি! কিন্তু লোন আফিসে ঢোকবার আগে আমি তিনবার অর্দ্ধপথে ফিরেছিলাম, এইটুকু স্বার্থত্যাগ করতে হৃদয় যেন আমার ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিল। অবশেষে আমি ঘড়িটি বাঁধা রেখে চল্লিশটি ফ্রাঙ্ক নিয়ে এলাম, জারট্রুডের রোগ আরোগ্যের উপায় হইল।

তার পর তার আরোগ্য-স্নানের পর যে দিন নানা রকম ছলনা, মিথ্যা প্রবোধ-বাক্য ও সত্যের অপলাপের পর বাধ্য হয়ে আমাকে ঘড়িটার অবস্থা সম্বন্ধে সত্য কথা বল্‌তে হয়েছিল, সে দিনের কথা আর কি বলব?

"ক্লেশে ও ঘৃণায় মুখ রক্ত বর্ণ করিয়া সে বলিল, 'এর চেয়ে আমার মরণই ভাল ছিল'।

"আমি তাকে আবেগ-ভরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লাম, 'কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমার কি অবস্থা হ'ত প্রিয়তমে'?

কিছুক্ষণ পর সে কাঁদ্‌তে লাগল। ক্রমে ক্রন্দন সংক্রামক হয়ে উঠ্‌ল, আমিও আর থাক্‌তে পার্‌লাম না. কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম।

ছেলে বেলায় পিতা আমার যেমন করুণ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেন, তেমনি ভাবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলিলাম, 'কোনও ভয় নাই প্রিয়তমে. এখন তুমি বেশ সামলাইয়া উঠিয়াছ; এখন থেকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে আমি শীঘ্রই তোমার ঘড়িটি উদ্ধার করে দেব'!

'কত টাকায় সেটি বাঁধা দিয়েছ'?

'চল্লিশ ফ্রাঙ্ক।'

"টাকার পরিমাণ শুনিয়া জারট্রুড্ একটু ভীতা হইল, কারণ সে জানিত. অতগুলি টাকা বাঁচাইবার জন্য আমাদের কত পরিশ্রম করিতে হইবে। তবু সে সঙ্কল্প স্থির করিয়া বলিল,

'হ্যাঁ, এই চল্লিশ ফ্রাঙ্ক কোনও রকমে শোধ দিতেই হইবে'।

"তোমাকে সত্য বল্‌ছি সে সংকল্প আমরা রেখেছিলাম। সকাল সন্ধ্যা সকল সময় আমরা খাইতাম-তবু আজও সেই ঘড়িটি এখনো এখানে পড়ে! এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরে যে টাকা আমি ধার করেছিলাম, তার প্রায় পাঁচ গুণ সুদ দিতেছি! ওঃ! এই সকল মহাজনেরা কি নির্দ্দয় ভাবে দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে, তা ভাবলেও আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া ওঠে। ঘড়িটি অপরকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার আশঙ্কায় প্রতি বৎসরেই অর্থ কিছু কিছু করিয়া তাহাকে দিয়া আসিতেছি। তথাপি আজও তাকে একেবারে উদ্ধার করিতে পারিনাই। আজ উহার দাম পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক!

"অনেক বারই আমরা নানা রকমে ব্যয় সঙ্কোচ করে প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করেছি, কিন্তু প্রতিবারই একটি না একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে পড়ে ঘড়িটি উদ্ধার করতে পারিনি। অসুখ. কাজকর্ম্মের টানাটানি বাস-পরিবর্ত্তন, জিনিস পত্রের মহার্ঘতা, এইরকম একটি না একটি ব্যাপারে পড়ে গিয়েছি। কখনও হয়ত আমাদেরও চেয়ে দুঃস্থ কোনও পরিবার দায়ে পড়ে আমাদের নিকট হইতে টাকা ঋণ করেছে, পরে সময়ে শোধ দিতে পারে নাই। আমার মাঝে মাঝে তাদের উপর বড় রাগ হত। আজ কিন্তু আমি তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি। দু' দুবার আমি আসলটী পুরা সংগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু সুদের টাকা সংগ্রহ হয়ে উঠেনি। বিশেষতঃ গত বৎসর আমাদের অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না; জারট্রুড আমাকে বল্লে 'দেখ ক্রমেই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে; কে জানে আমাদের কার কবে ডাক পড়বে, আর সে যে তোমার পিতার ঘড়িটি তার শয্যার পার্শ্বে না রেখে মরে যাবে, সে হ'তেই পারে না. সে হ'তে দেওয়া হবে না, সেটা বড় বেশী নিষ্ঠুরতা হবে। শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে চলবে না আজ থেকে আমার একটু একটু স্বার্থ ত্যাগও করা হবে'।

"ইতিপূর্ব্বে আমরা একটু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলাম; কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও নূতন নূতন স্বার্থ ত্যাগের উপায় বাহির করাতে আমাদের ঘাট্‌ পোড়ত হয় নাই।

"প্রথমে আমরা নস্য লইবার সংখ্যা কমাইয়া তিনবার করিলাম সকাল দুপুর, সন্ধ্যা। তারপর কফি পানের সংখ্যাও কমাইলাম; মাত্র সকালে একবার কফি খাইতাম সেটা বাদ দিতে পারিলাম না: আমাদের পোষা বেড়ালটারও সেটা না হলে চলিত না; রবিবার কিন্তু দুপুরে খাইতাম।

"এত দেনা সত্ত্বেও তিন মাস পরে দেখা গেল, এখনও পাঁচ ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন। জারট্রুড এক রকম হতাশ হইয়া পড়িল. কিন্তু অগতির গতি ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। সে দিন সহসা একটী নকল করিবার কাজ জুটিয়া গেল; গত তিন রাত্র ধরিয়া আমি সে কাজটি করিয়াছি। আজ সকালে জারট্রুড হাসিতে হাসিতে পঞ্চাশটি ফ্রাঙ্ক গণিয়া আমার হাতে দিল।

"টাকা কয়েকটি হাতে পেয়েও আমার এখানে আসতে ভয় হচ্ছিল পাছে এসে শুনি ঘড়িটি আমার

বিক্রয় হয়ে গিয়াচে; কিন্তু ভগবান মঙ্গলময়, এখনও সময় আছে। আর একটু পরেই আমি আমার সেই পুরানো ঘড়িটিকে দেখতে পাব, নিজের হাতের মুটোর ভিতর সেটিকে অনুভব করতে পারবো, সে কি আনন্দ কি সুখ! সেটি আমার পিতার একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন; উঃ আজ পনেরো বৎসর পরে তাকে বুকের কাছে রেখে না জানি সে কি সুখই হবে। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় প্রতি পদক্ষেপে সে যেমন সময় নির্দ্দেশ করতো, আজ থেকে মৃত্যুর আহ্বান না পাওয়া পর্য্যন্ত সে আবার তার সেই পুরাতন কাজই করবে সেটী মনে করেও কত সুখ! ছেলেবেলায় যখন সেই ছিলাম, তখন তার টিক্ টিক্ শব্দ আমার কর্ণে যত মিষ্ট লাগত, এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই তেমন মধুর লাগবে।

"আর জারট্রুড যখন এর উদ্ধারের খবর পায় তখন সে কত সুখীই হবে। আমি যেন বলতে পারি তাকে সে জন্য বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না; সে হয়ত এত ক্ষণ খুব কাছেই আছে। আমার পিছনে পিছনেই সে আসছিল কিন্তু সে বাহিরেই আছে—পাছে উৎকণ্ঠায় সে কাতর হয়ে পড়ে তাই তাকে ভিতরে আসতে বারণ করেছি।

ভাগ্যে ঘড়িটি বিক্রয় হয়ে যায়নি; তাহলে সে আসত আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। যাক্ সে ভয় কেটে, গিয়েছে, এখন আমাদেরি জয়; এত দিন পরে ঘড়িকে-বিজয়-গর্ব্বে আমাদের করে জারট্রুডের আছে নিয়ে যাব, সে কি কম সুখ!"

বৃদ্ধ সবেমাত্র তাহার কাহিনীটি শেষ করিয়াছে, এমন সময় নিলামকারী একটি সোনার পুরাণো ধরণের ঘড়ি বিক্রয়ের জন্য তুলিল, বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিল, "ঐযে, ঐযে আমার ঘড়ি!"

নিলামকারী হাঁকিল—"যায় সোনার ঘড়ি—৪৫ ফ্রাঙ্ক!"

বৃদ্ধ তাহার ক্ষীণ-কণ্ঠ যথা সম্ভব উচ্চ করিয়া বলিল "৪৬ ফ্রাঙ্ক!"

কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল: বৃদ্ধের ডাকের চেয়ে আর বেশী দর উঠিল না দেখিয়া নিলামকারী হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধকে ঘড়িটি দিতে উদ্যত হইল—বৃদ্ধ আগে হইতেই হাত বাড়াইয়া ছিল।

এমন সময় আর একখানি প্রসারিত হস্ত ঘড়িটির উপর গিয়া পড়িল; হাত খানি একজন ইহুদীর—কৃপণের মত আকৃতি তার—ছোট ছোট দুটি টেরা চোখ, লম্বা ময়লা দাড়ী।

"দেখি একবার জিনিষটা; এখনও এগুলোর খুব চলন আছে, কিছু দরে এটা বিক্রী হতে পারে। আচ্ছা ৪৭ ফ্রাঙ্ক!" বলিয়া ঘড়িটি নিলামকারীকে ফিরাইয়া দিল।

বৃদ্ধ নূতন ক্রেতাটির উপর জ্বালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাকিল "আট চল্লিশ!"

ইহুদী প্রশান্ত ভাবে ডাকিল "উন পঞ্চাশ!"

আবার হস্ত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধ প্রাণ পণে হাঁকিল "পঞ্চাশ!"

মুহূর্ত্তের জন্য সকলে নীরব।

"কি ভয়ানক গোঁয়ার, কিন্তু আমি ছাড়ছিনা" বলিয়া ইহুদী হাঁকিল "একান্ন!"

বৃদ্ধের সে সময়কার মুখের ভাব কথায় বর্ণনা করা যায় না। তাহার সমস্ত মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, অতি ক্ষীণ স্বরে কাতর কণ্ঠে সে বলিল,"আমার মোট পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আছে!"

এদিকে নিলামকারী তাদৃশ অনুনাসিক সুরে হাঁকিতে লাগিল,—যায় একান্ন ফ্রাঙ্ক!—যায় একান্ন ফ্রাঙ্ক!

সে ইহুদীরও দেরী সহিতেছিল না, সে বলিয়া উঠিল আর দেরী করিতেছ কেন? দাও না শেষ ঘা দিয়ে আমাকে দাও!

কথাটা শুনিয়া বৃদ্ধের যেন চমক ভাঙ্গিল, পাগলের মত সে হাঁকিল - বায়ান্ন ফ্রাঙ্ক!"

ইহুদী হাঁকিল "তিপ্পান্ন!",

বৃদ্ধ সজোরে হাঁকিল "চুয়ান্ন!" পরক্ষণেই অপর দিকে তাকাইয়া বলিল "কিন্তু অত টাকা আমার নাই!"

কিছুক্ষণ সবই নীরব—আবার ইহুদী হাঁকিল "পঞ্চান্ন!"

হতাশ ও ক্রোধ পূর্ণ স্বরে বৃদ্ধ বলিল, "নাঃ আর আশা নাই, বলিয়া পরক্ষণেই সে পিছন ফিরিল নিশ্চয়ই তাহার চোখের জল টুকু লুকাইবার জন্য!

এমন সময় সময় একজনের নূতন কণ্ঠ স্বর শোনা গেল সেটা সিলসেড্ এর! সে হাঁকিল "ষাট ফ্রাঙ্ক!' তাহার স্বরে একটা কঠোরতা, একটা দৃঢ়তা ছিল!

ঘটনাটি এরূপ অপ্রত্যাশিত পথে ফিরিতে দেখিয়া বৃদ্ধ অর্দ্ধ পথে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ইহুদী ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ডাকিল "পঁযটি!"

"সত্তর!"

"পঁচাত্তর!" কিন্তু এবার আর ইহুদীর স্বরে সে পূর্ব্বকার দৃঢ়তা নাই!

সিলসেড্ আর থাকিতে পারিল না—একেবারে কায শেষ করিবার জন্য সে হাঁকিল নব্বই! তাহাতে সুফল ফলিল সন্দেহ নাই ঘড়িটি তাহার নামেই ক্রীত হইল।

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া একটু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল এ তুমি কর্‌লে কি! তোমার অসীম দয়া, কিন্তু তুমি আমার জন্যে এত পয়সা নষ্ট কর্‌লে কেন? না, না এ ভারী অন্যায় হল। ভাগ্যে আমি তোমাকে আমার দুঃখের কাহিনী বলেছিলাম! তোমার এ দয়ার কথা আমি কখনও ভুলব না, নিজের চোখে দেখলাম তাই, নতুবা আর কাহার কাছে শুনিলে বিশ্বাসই করতাম না।

সিলসেড্ আর কি উত্তর দিবে! জননী যেমন শিশুসন্তানের ছোট ছোট হাতের মুঠি খুলিয়া তাহার অপেক্ষিত খেলনা তুলিয়া দেয়, তেমনই সন্তর্পণে সে বৃদ্ধের কৃশ হাতখানি ধরিয়া, তার চির আকাঙ্ক্ষিত ঘড়িটি দিয়া হাতটি বন্ধ করিয়া দিল; পরক্ষণেই সে জনস্রোতে কোথায় মিশিয়া গেল!

বৃদ্ধ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! যখন তাহার সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন সিলসেড্ সেখানে নাই; সে তার সাধারণ দ্রুতপদ বিক্ষেপে কোথায় যে মিশিয়া গিয়াছে তাহা বলা শক্ত!

এদিকে সিলসেড্ নিলাম ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইতেই সম্মুখে এক কম্পিতপদ বৃদ্ধার ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। সে কখনও জারট্রুডকে দেখে নাই, কিন্তু কি জানি কেন ইহাকে দেখিয়াই তাহার জারট্রুড বলিয়া মনে হইল; কিছু দূরে একটা থামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে বৃদ্ধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আজ আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সে এই বৃদ্ধ দম্পতীকে যে সুখ ও আনন্দ দান করিয়াছে তাহার প্রকাশ নিজের চোখে দেখার প্রলোভন সামলাইতে পারিল না; আজকের এই স্বার্থ-ত্যাগে সে যে আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহার কাছে তাহার নিজের ঘড়িটি উদ্ধারের জন্য যে ক্ষতি—তাহাকে ক্ষতি বলিয়াই বিবেচনা করিল না!

কিছুপরেই বৃদ্ধ ঘড়িটি এক হাতে উচু করিয়া ধরিয়া যাহাতে তার-স্ত্রী সেটা দূর হইতে দেখিতে পায়-হাপাইতে হাপাইতে দেখা দিল। তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জারট্রুড কম্পিত পদে ছুটিয়া গিয়া ঘড়িটিকে আবেগভরে দু'হাতে চাপিয়া ধরিল এবং অনতিবিলম্বে তাহার অবিরল অশ্রুধারায় সেটি সিক্ত হইয়া উঠিল!

উভয়েই কিছু শান্ত হইলে, বৃদ্ধ গদ্‌গদ্ ভাবে নিলাম ঘরের সমস্ত ঘটনাটি জারট্রুডকে বলিল এবং তৎপরে উভয়ে মিলিয়া উৎকণ্ঠিত চক্ষে চারি দিকে বেশ করিয়া খুজিয়া দেখিল যদি তাদের এই অজ্ঞাত অখ্যাত পলাতক উপকারীর সন্ধান পায়! কিন্তু বৃথা! হতাশ হইয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল!

তাহারা চক্ষুর অন্তরাল হইলে, গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া সিলসেড্ ভাবিল "কি সুখী এরা আজ! কাল সকালে উঠে তারা যখন এত দিনের হারানো জিনিষ আবার পূর্ব্বকার মত তাদের শয্যার পার্শ্বে দেখতে পাবে, আবার কাল থেকে যখন সেটি আগেকার মত তাদের সহস্র সুখ দুঃখ, আনন্দ আমোদের মধ্যে জড়িত হবে, তখন না জানি তাদের কত সুখই হবে!"

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

চুনারের স্মৃতি

যাই তবে, যাই ছেড়ে হে প্রিয় চুনার,
কে জানে কখন দেখা পাই কি না আর!
কাটাইনু কত দিন তোমার আবাসে,
উন্মুক্ত বাসনা লয়ে উদ্ভ্রান্ত উল্লাসে।
হেরিয়াছি তব রূপ বিমুগ্ধ নয়নে,
ঘন নীল পীত মিশি বিচিত্র বরণে
শুদ্ধ গগনের শোভা! ধীরে উঠি রবি
বাবলার ডালে ডালে আঁকে দীপ্ত ছবি
ছড়াইয়া স্বর্ণ-রশ্মি। উতালা বাতাসে
বাজরা. জনার তরু কাঁপি ঊর্দ্ধ শ্বাসে
অদূরে বাজাতে থাকে অস্ফুট বাঁশরী,
বিরহিণী ব্রজনারী সর্ব্বস্ব পাসরি.
ধাইত এমনি বুঝি শুনিয়া সুস্বর—
কল্পনা খুলিয়া দিত সে মধুর স্তর।
পরিয়া রঙ্গিন সাড়ি আঁটিয়া কাঁচুলি
লাজের ভূষণখানি শিরে লয়ে তুলি
সারি সারি নারীগণ পূর্ণ কুম্ভ লয়ে
ফিরিত মন্থর পদে আপন আলয়ে,
হেরিতাম মহিয়সী মহিমার ছবি।
আবার চমকি চাহি অস্তাচল রবি
মুগ্ধ নেত্রে হেরিতাম, জাহ্নবী ওপারে
কি বিচিত্র শোভা! দাঁড়ায়ে চণ্ডালগড়ে
ভেবেছি কি কীর্ত্তি আছে এ ক্ষুদ্র চুনারে!
এই সে গুহকালয়, শ্রীরাম যেখানে
বন্ধু ভাবে বদ্ধ হন সীতার সন্ধানে
আসি গহন কাননে। কাহিনী এখন---
পুথিতেই আছে শুধু তার নিদর্শন—
আর কোন চিহ্ন নাই। এ চণ্ডালগড়
এবে শুধু বিজেতার ক্ষমতা আকর।
কি দুর্ভেদ্য. নিরলঙ্ঘ্য দুর্গের প্রাকার
পদতল চুমিতেছে পরিখা আবার
পাবনী জাহ্নবী। উড়েছিল বিজয়-কেতন;
কত রাজ অধিরাজ কীর্ত্তি অগণন
নিবে গেছে একে একে—দেউটি সকল;
মনে হয় সব যেন স্বপন বিফল।
কি বলিতে কি বলিনু হে চুনারেশ্বরী.
যাই তবে যাই ছেড়ে ভাসাইয়া তরী,
ধুইয়া প্রাণের কালী জাহ্নবী সলিলে;
দাবদগ্ধ অন্তরের যন্ত্রণা ভুলালে।
জ্যোৎস্না-সিক্ত রজতাভ পথে পদচারী,
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অই শ্যাম শষ্পোপরি
মখমল ঢাকা তব কোমল আসনে
বসি যে লভেছি শান্তি নির্জীব পরাণে,
তাই আজ ছেড়ে যেতে চোখে আসে জল
কৃতজ্ঞতা-ভরে হৃদি করে টল্‌মল্।
কি বলে তোমার কাছে লইব বিদায়
স্নেহ-প্রতিদান আজি কি দিব তোমায়?
এ ক্ষুদ্র কবির লও প্রাণের বন্দনা.
দিও পায়ে চিরকাল এমনি সান্ত্বনা।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে ভিক্ষুব্রত

ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকারের জন্য ভিক্ষু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। যাহারা ভিক্ষু হইতে চায় তাহাদিগকে প্রথমতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু

ভিক্ষুব্রত

উপসম্পদা লাভ না করিলে তাহাদিগকে ভিক্ষু বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা হইল, এবং উপ-

সম্পদা লাভ করিলেই প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করা হইল।*

কিন্তু সকলেই ভিক্ষু হইতে পারে না। নরঘাতক, দস্যু, সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাস ও সৈনিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে না; এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে উপসম্পদাও লাভ করা যায় না, আর উপসম্পদা লাভ না করিলে কেহই ভিক্ষু বলিয়া গণ্য হয় না।

আবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও যাহারা গুরুতর অপরাধ করে, কিংবা যাহারা পুরুষত্ব-বিহীন তাহারা ভিক্ষু হইতে পারে না। ভিক্ষুণীগণের ও উপসম্পদা লাভে কতিপয় বাধা আছে—এই রূপ বাধার সংখ্যা ২৪টি। আবার শ্রমণেরাও ইচ্ছা করিলেই ভিক্ষু হইতে পারে না। পিতামাতার অনুমতি না হইলে কিংবা বয়স পূর্ণ সাত বৎসর না হইলে শ্রমণেরা উপসম্পদা লাভের অধিকারী হয় না।

এখন আমরা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রভেদ বুঝিতে পারি। প্রব্রজ্যা সংসার ত্যাগ, আর উপসম্পদা প্রব্রজ্যাবলম্বিগণের ভিক্ষুধর্ম্মে প্রকৃত দীক্ষা।

প্রব্রজ্যা

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ পাঁচ জন সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে পর আরও ষাট জন শিষ্য তাঁহার নিকট এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের প্রার্থী হইয়া সমাগত হয়। ভগবান বুদ্ধ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অল্প কাল পরে তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার-কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসে, এবং তাহাদের সঙ্গে কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট হইতে এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের প্রার্থনা করে। ভগবান বুদ্ধ তখন তাঁহার শিষ্যবর্গকেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদানের ক্ষমতা দান করেন। তদনুসারে প্রার্থিগণ কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণের নিকট হইতেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিত। প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাপ্রার্থিগণকে তখন হইতেই মস্তক মুণ্ডন করিতে হইত, শ্মশ্রু ফেলিতে হইত, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া স্কন্ধদেশ আবৃত করিতে হইত, ভিক্ষুগণের চরণে অবনত মস্তকে প্রণাম করিতে হইত, আসন করিয়া মাটীতে উপবেশন করিতে হইত, এবং করযোড়ে "আমি বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম" এই বাক্য তিন বার পাঠ করিতে হইত। এই বাক্য পাঠ করিলেই ভগবান বুদ্ধ প্রার্থিগণের প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা সিদ্ধ হইল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন।

শেষে কিন্তু এই নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। একটা নূতন নিয়মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। এই পরিবর্ত্তিত আকারেও উপসম্পদা পবিত্র প্রব্রজ্যায় জীবন উৎসর্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মহারাজ অশোকের সময়ে এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বন্ধুক প্রভৃতিও এক সময়েই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্যূন ২০ বৎসর বয়স না হইলে কেহ উপসম্পদায় দীক্ষিত হইতে পারিত না; সুতরাং শ্রমণগণকে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর উপসম্পদা লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত।

বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম ভাগে বালকদিগকে দীক্ষিত করিতেন কি না এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। তবে ভগবান বুদ্ধের পুত্র রাহুল বালক বয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাহুলের প্রব্রজ্যা

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মচারীর ন্যায় শ্রমণেরা ভিক্ষু নহে,—তাহারা শ্রমণোদ্দেশক, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অবশ্যই ভিক্ষু হইতে হইবে। দশটি শিক্ষাপদ আয়ত্ত করাই এই সকল শ্রমণোদ্দেশকের কর্ত্তব্য।

যে সকল সমাজে দেবদেবী পূজার পদ্ধতি আছে, সেই

* বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রব্রজ্যা ভিক্ষুব্রত গ্রহণের সঙ্কল্পের পরিচায়ক; আর উপসম্পদা লাভ করিলেই ব্রতে দীক্ষা লাভ হয়।

সমাজ হইতে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেও এই সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন করিতে হয়। তবে, ভিক্ষু হওয়ার পূর্ব্বে ধর্ম্মার্থিগণকে কিছু কাল শিক্ষা কার্য্যে ব্যয় করিতে হয়। সেই কালকে "পরিবাস" বলে। মাত্র জটিল বা অগ্নিপূজকগণ এবং শাক্যগণ "পরিবাস" না কাটাইয়াই উপসম্পদা লাভ করিত, প্রব্রজ্যার ত কথাই নাই। শাক্যগণ বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি, ছিল আর অগ্নিপূজকগণ বিশ্বাস করিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাপ মোচন হয়; এই কারণেই এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত।

ভিক্ষুর দীক্ষা

ভিক্ষুব্রতার্থী প্রথমতঃ করঙ্ক এবং ভিক্ষুর পরিচ্ছদ গ্রহণ করে; এবং গুরু নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। অনূর্দ্ধ দশ ও অন্যূন পাঁচ জন ভিক্ষুর সম্মুখে ব্রতার্থীকে এই সকল কার্য্য করিতে হয়। পরে এই সমিতির সভাপতি ব্রতার্থী এবং তাহার গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করেন, এবং ভিক্ষুব্রত গ্রহণে তাহার কোন বাধা আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানের পর ব্রতার্থী ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা সমিতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। সমিতি মৌনাবলম্বন করিয়া সম্মতি প্রকাশ করে, এবং এই রূপে সম্মতি প্রদত্ত হইলে সভাপতি ভিক্ষুর অবশ্য পালনীয় চতুর্ব্বিধ নিয়মের উল্লেখ করেন, এবং যাহাতে ব্রতার্থী এই সকল নিয়ম কদাপি লঙ্ঘন না করে ও যাহাতে চারিটি পাপ কার্য্য জীবনে কদাপি অনুষ্ঠিত না হয় তজ্জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী ব্যতীত শাক্যবংশীয় কেহই পূর্ব্বোল্লিখিত অবশ্য পালনীয় চারিটি পবিত্র নিয়মের একটিও পালন করে নাই, অথবা যে চারিটি পাপ কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধেও তাহারা কোন নিষেধ বিধি অবলম্বন করে নাই।

ভিক্ষুর সন্ন্যাস ধর্ম্ম

কোন কোন অবস্থায় ভিক্ষু ইচ্ছা করিলে সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা-কালে আজীবন স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকিতে হইবে ভিক্ষুগণের এইরূপ প্রতিজ্ঞা সেই সকল অবস্থার অঙ্গীভূত নহে। স্ত্রীসংসর্গ করিলেই ভিক্ষুকে বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হয়।

ভিক্ষুণীগণের দীক্ষা কার্য্যও উল্লিখিত নিয়মেই পরিচালিত হইয়া থাকে। মাত্র যিনি প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাঁহাকে "পবত্তিনী" বলা হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে উপসম্পদা প্রায় একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হইত। অতি সামান্য যে পার্থক্য আছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

ভিক্ষুগণের অঙ্গাবরণ তিন অংশে বিভক্ত; যথা, অন্তর্ব্বাসক, উত্তরাসঙ্গ, ও সঙ্ঘাটী। ত্রিচির বলিলে এই ত্রিবিধ পরিচ্ছদের সমস্তগুলিকেই বুঝায়। বর্ণানুসারে ভিক্ষুগণের পরিচ্ছদকে কাষায়ও বলা হইয়া থাকে। রক্তাভ পীত বস্ত্রের নাম কাষায়। দক্ষিণ ভারতে ভিক্ষুগণের পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ পীত, কিন্তু মধ্য যুগে ভিক্ষুগণ রক্তাভ বস্ত্র পরিধান করিতেন।

'অন্তর্ব্বাসক' নিম্নাবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা অনেকটা মহিলাগণের সেমিজের ন্যায় আগুল ফলম্বী এবং "কায়বন্ধন" বা কোমরবন্ধ দ্বারা আঁটা। কেহ কেহ এই অন্তর্ব্বাসককে "নিবাসনও" বলিয়া থাকেন। "উত্তরাসঙ্গ" বক্ষঃ ও স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়া জানুদেশের কিঞ্চিৎ নিম্ন পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। হুয়েন-সাংএর মতে "উত্তরাসঙ্গ" ও "সংকক্ষিকায়" বিশেষ প্রভেদ নাই; কিন্তু "প্রতিনিবাসন" ও "উত্তরাসঙ্গ" অভিন্ন কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

"সঙ্ঘাটী" মিশ্র পরিচ্ছদ; ইহা দুই ভাঁজে বিভক্ত হইয়া স্কন্ধ হইতে জানু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে এবং কোমরে বাঁধা থাকে। মগধের ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দ এইরূপ পরিচ্ছদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্যই ইহা এত ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রখণ্ডে নির্ম্মিত।

° অব্রহ্মচর্য্য, অদত্তাদান, বধ ও উত্তরমনুষ্যধর্ম্মপ্রলাপ! প্রতিমোক্ষেও এই চারিটি পাপ কর্ম্মের উল্লেখ আছে—ব্রহ্মচর্য্য, চৌর্য্য, হিংসা, "উত্তর মনুষ্য" দান।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সময় সময় এক প্রকার পোষাক পরিধান করে। ইহার নাম "বর্ষা-সাঠী" বা প্রাবৃট্‌ পরিচ্ছদ।

বর্ষা-শেষে "প্রবারণান্তে" সঙ্ঘ-সমূহে বস্ত্র বিতরিত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানের নাম "কঠিন," এবং লোকের বিশ্বাস ইহাতে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ভিক্ষুগণ "পরিষ্কার," "কটিবন্ধ," "বিসি" (ক্ষুর), সূঁচী, "পরিস্রাবণ," "ঠবিকা," "কত্তর" বা "খক্‌খর," দণ্ডকাষ্ঠ, জপমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন।* পাদুকা বিলাস-দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে পাদুকা-ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু খড়ম বা খড়মের ন্যায় পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ছত্র ব্যবহারে নিষেধ নাই। তাল-ব্যজনী ও সাধারণ চামর ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত।

হিন্দুসম্প্রদায়ের অনুকরণে "বার্ষিক" বা বর্ষাকালে বিশ্রাম-প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে ভ্রমণে বহির্গত হইতে পারেন না, সুতরাং

বাসস্থান

সেই সময়ে একটা বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হয়। "বর্ষোপ-নায়িকা" দুই সময়ে পালিত হইয়া থাকে। আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষোপনায়িকা প্রথম আরম্ভ হয় এবং কার্ত্তিকের পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইয়া থাকে। উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধগণের মতে "বর্ষোপনায়িকা" শ্রাবণের প্রথম ভাগে আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে শেষ হইয়া থাকে। আষাঢ়ের পূর্ণিমার এক মাস পর হইতে কার্ত্তিকের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই তিন মাস সময়কেও "বর্ষোপনায়িকা" বলিয়া ধরা হয়।

বৌদ্ধ যুগের প্রথম অবস্থায় ভিক্ষু ব্যতীত সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণ "বর্ষোপনায়িকাতে" কিংবা বৎসরে অন্যান্য সময়ে গৃহে অবস্থান

বর্ষোপনায়িকা

করিতেন কি না নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে সিংহলে ভিক্ষুগণ বর্ষোপনায়িকার সময়ে অল্প কালের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। কিন্তু বুদ্ধঘোষের উক্তি এই প্রথার অনুমোদন করে না। তিনি বলেন বর্ষোপনায়িকার সময় ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং পবিত্র মন্দিরাদি দর্শন করিতেন। "বর্ষোপনায়িকা" আরম্ভ হইলে তাঁহারা উচ্চ কণ্ঠে এই বাক্যটি আবৃত্তি করিতেন——"তিন মাসের জন্য আমরা (আমি) এই বিহারে "বস্‌স" (বর্ষোপনায়িকা) আরম্ভ করিলাম।" সুতরাং দেখা যায় যে, এক স্থানে অবস্থানের জন্যই 'বস্‌স' প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে কোনও নির্দ্দিষ্ট আবাসে বা মঠে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্যান্য ঋতুতেও মঠে অবস্থান করিতে পারিতেন।

বৌদ্ধ-যুগের প্রারম্ভে ভিক্ষুগণের নির্দ্দিষ্ট আবাস বা "শয়নাসন" ছিল না। তাঁহারা বনে, বৃক্ষমূলে, পর্ব্বতে গিরিগুহায়, শ্মশানে, তৃণ-স্তূপে

ভিক্ষুগণের আবাস

কিংবা মুক্ত স্থানে বাস করিতেন; ইহা দেখিয়া রাজগৃহের এক জন সঙ্গতিশালী বণিক ভিক্ষুগণের বাসের জন্য আবাস নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবান বুদ্ধও ভিক্ষুগণকে পাঁচ প্রকার আবাসে বাস করিতে অনুমতি দেন।* বুদ্ধদেবের আদেশ লাভ করিয়া সেই বণিক এক দিনেই ভিক্ষুগণের বাসের জন্য ৬০টি বাস-গৃহ নির্ম্মাণ

* ভিক্ষা-পাত্রের নাম "পরিষ্কার।" "পরিস্রাবণ" ছাকুনি বিশেষ। ভিক্ষাপাত্র যে থলিতে রক্ষিত হয় তাহার নাম "ঠবিকা"। সন্ন্যাসীগণই "ঠবিকা" ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মঠবাসী ভিক্ষুগণ প্রতিপক্ষেই পরস্পরকে ক্ষৌরি করিয়া থাকেন. মস্তক মুণ্ডন ও দাড়ি গোঁফ ফেলার জন্যই ক্ষুরের প্রয়োজন।

জপমালার ব্যবহার অনেকটা আধুনিক। বৌদ্ধ যুগের প্রবর্ত্তন সময়ে জপমালার ব্যবহার ছিল না। কেহ কেহ মনে করেন এই জপমালার ব্যবহার বিদেশ হইতে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

* বিহার, অড্ড যোগ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য (সমতলপৃষ্ঠ প্রস্তর গৃহ) ও মঠতলস্থ গৃহ।

করিয়া দেন। 'মহাবগ্‌গ' ও 'চুল্লবগ্‌গ' গ্রন্থেই এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু যখন এই সকল পুস্তক রচিত হয়, তখনই উল্লিখিত হর্ম্ম্যাদি সঙ্ঘাধীন ছিল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উপখ্যানটি যে সম্পূর্ণ অমূলক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিহার শব্দে সাধারণতঃ মন্দিরকেই বুঝায়, কিন্তু বিহার বলিলে মঠকেও বুঝাইয়া থাকে। সিংহলে অদ্যাপি পূজামন্দিরকে বিহার বলা হইয়া থাকে। সেখানে ভিক্ষুগণের আবাসের নাম "পন্নশালা"। একমাত্র 'সঙ্ঘারাম' শব্দেই শুধু মঠকে বুঝায়। প্রত্যেক বৃহৎ মঠের সঙ্গেই এক একটি বিহার থাকিত বলিয়াই বোধ হয় বিহার ও মঠ অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সারনাথে ও নালন্দে মঠ-সংশ্লিষ্ট এরূপ বিহার আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং বিহার ও মঠের এইরূপ বর্ণনাই করিয়াছেন।

মঠ. বিহার

মহারাজ অশোক এবং তাঁহার প্রপৌত্র দশরথ সঙ্ঘশক্রে আজীবকগণের বাসের জন্য পর্ব্বতগাত্রে গুহা খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি ঠিক গৃহের ন্যায়। বিহার প্রদেশের বরাবর ও নাগার্জুনী গুহা এই জাতীয় গুহার মধ্যে প্রাচীনতম। সন্ন্যাসীরা অনেক সময় কুটীরে বাস করিতেন।

উপসথ ক্রিয়া যে গৃহে সম্পন্ন হয় তাহার নাম উপসথাগার। সিংহলে উপসথাগারকে "পত্রগা" বলে। "লোহপাসাদ" সেখানকার একটি বিখ্যাত উপসথাগার ছিল। মঠের কুঠরীগুলিকে পালিভাষায় "পরিবেণ" বলে।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ হইতে মধ্যযুগে ভারত ও সিংহলের সঙ্ঘারামগুলির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আবাসিক" নামক ভিক্ষুগণ তখন মঠে অবস্থান করিতেন। রাজা ও ধার্ম্মিক ধনিগণ তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ভিক্ষুগণ নিরুদ্বেগে মঠে থাকিয়া ইষ্টচিন্তায় নিরত থাকিতেন এবং ধর্ম্ম-সূত্র আবৃত্তি করিতেন। কোনও ভিক্ষু অতিথি মঠে উপস্থিত হইলে "আবাসিক" ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র, পরিধেয় বস্ত্র, পদ প্রক্ষালনের জন্য জল, অভ্যঙ্গের জন্য তৈল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়াতিরিক্ত পানীয়াদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। অতিথি বিশ্রাম করিলে পর ভিক্ষুগণ আগন্তুক কত কাল যাবৎ ভিক্ষুব্রত পালন করিতেছেন প্রশ্ন করিয়া জানিতেন, এবং তদনুসারে তাঁহাকে নিদ্রা-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের অভ্যর্থনা-বিধি বিনয়গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সঙ্ঘারাম

আগামিক, * প্রস্থানোদ্যত ভিক্ষু, ভিক্ষার্থে গমনোদ্যত ভিক্ষু, পিণ্ডচারিক, ও আরণ্যক ভিক্ষুগণের অভ্যর্থনা ও সৎকার-বিধিও বিনয়গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

অশ্বক, পুনর্ব্বসু, নন্দ, উপানন্দ, ছন্দ ও উদায়িন নামে ছয় জন দুষ্কর্ম্মান্বিত ভিক্ষু ছিল। ভগবান বুদ্ধ প্রতি পক্ষে প্রতিমোক্ষের আবৃত্তি অনুমোদন করিলে পর এই ছয় জন ভিক্ষু পাপমোচনের জন্য পুনরায় পরস্পরের সন্নিধানে প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিত। বুদ্ধদেব জানিতে পারিয়া নিয়ম করিয়া দিলেন যে, স্থানীয় সমগ্র ভিক্ষু বা তপস্বী সম্প্রদায়ের নিকট প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। এই কারণে প্রত্যেক স্থানের সীমা-নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেব আদেশ করিলেন যে, পর্ব্বত, প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ, পথ, বল্মীক, নদী বা জলাশয়কে কোনও স্থানের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া এক জন সুযোগ্য ভিক্ষুর প্রস্তাবক্রমে সঙ্ঘ উপসথানুষ্ঠানের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইবে।

সঙ্ঘ মঠের দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করার ভার যোগ্য ভিক্ষুর উপরই সমর্পণ করিত।

ভক্তোদ্দেশক বা "সেনাসনপঞ্ঞাপক" খাদ্য বিতরণ করিতেন এবং বাসগৃহের বন্দোবস্ত করিতেন।

* যে সকল ভিক্ষু অল্পকাল অনুপস্থিতির পর মঠে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

"ভাণ্ডাগারিক" ভাণ্ডার-গৃহ রক্ষা করিতেন. "চিবর পতিগ্গাহক" পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেন; "চিবরভাজক" পরিচ্ছদ বিতরণ করিতেন, "যাগুভাজক" চাউলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বিতরণ করিতেন। "ফলভাজক" ফল বিতরণ করিতেন; "খাদ্যকচারক" শক্ত খাদ্য বিতরণ করিতেন ও "অপ্প মত্তক বিসর্জ্জক" সামান্য দ্রব্য বিতরণ করিতেন। "শলাকাগাহাপক" 'টিকেট' বিতরণ করিতেন। "বর্ষাসাটিগোপক" ধর্ম্মপরিচ্ছদ রক্ষা করিতেন। "পত্তগাহাপক" ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিতেন। "আরামিক পেশক" উদ্যান-রক্ষকগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন, এবং "শামনের পেশক" শ্রমণগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। উত্তর ভারতে "পানীয়বারিকগণ" পানীয় জলের কর্ত্তা ছিলেন। "ভাজনবারিকগণের" হস্তে ভাজন বা পাত্রের ভার অর্পিত ছিল। "পরিমণ্ডাবারিক" মঠের চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষপুঞ্জের রক্ষক ছিলেন।

"নবকম্মিক" বা স্থপতির পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হইত না। কোনও ধর্ম্মাত্মা বা তপস্বী কোনও নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ কালে এইরূপ লোক নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন।

প্রাচীন কালে উচ্চ-নীচ ভেদে ভিক্ষুগণের কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, কিন্তু বয়স ও জ্ঞান অনুসারে ইঁহাদের মধ্যে সম্মানের তারতম্য হইত, যথা—স্থবির, দহর, উপাধ্যায়, সার্দ্ধবিহারী, আচার্য্য ও অন্তেবাসী। সিংহলে প্রত্যেক মঠেই একজন "মহানায়ক" আছেন; কিন্তু মধ্যযুগে অন্ততঃ মহাযানী মঠে এরূপ কোনও অধিনায়কের নাম পাওয়া যায় না।

ভিক্ষুগণের শ্রেণী বিভাগ

বৌদ্ধ শাস্ত্রে খাদ্যের ব্যবস্থা বড় সুন্দর। এই ব্যবস্থা কঠোরব্রতী এবং সাধারণ ভিক্ষু এই দুইয়েরই উপযোগী। কোনও ভিক্ষু সুস্থ শরীরে ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, চিনি, মৎস্য, মাংস, দধি, ও দুগ্ধ আহার করিলে তাঁহার "পাচিত্তিয়" পাপ হইয়া থাকে। তবে মৎস্য ও মাংস অদৃষ্ট, অশ্রুত (?) বা অসন্দিগ্ধ হইলে আহারে বাধা নাই। কিন্তু জালিক ও কসাইগণ কিরূপে মৎস্য-মাংসাদি আহরণ করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং এইরূপ বিধি যুক্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে মনে করেন, সঙ্ঘের নিয়মপ্রণালী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ তপস্বিগণের আদর্শে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতেন, সুধু তপস্বিগণ মধু, মাংস ভক্ষণ করিতেন না; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের আদর্শেই বৌদ্ধ সঙ্ঘেও মৎস্য মাংসাশন বিধি একটু পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছিল। *

খাদ্য

ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই শাক্যমুনির শিষ্যবর্গের বিধি। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় তাহারা বাচনিক ভিক্ষার প্রথা পালন করেন না। বুদ্ধভক্তগণের প্রকৃতি স্থির ও গম্ভীর হইবে, ইহাই ভগবান বুদ্ধের উপদেশ। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আচার-ব্যবহার সিংহলী বৌদ্ধগণ অনেকটা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

ভিক্ষুগণ ঘৃত মধু, প্রভৃতি ঔষধি রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ, ঔষধ ও অস্ত্র প্রয়োগ প্রভৃতির ব্যবস্থা বিনয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা তাৎকালিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ও চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থা কতকটা অবগত হইতে পারি।

ঔষধ

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

---

* কেহ কেহ মনুর উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, কলিযুগে মৎস্য-মাংসের এইরূপ অপ্রচলনই শারীরিক অবনতির কারণ; বৌদ্ধগণও কলিযুগে প্রচলিত সামাজিক রীতিরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

বাঙ্গলা বচন *

সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষার প্রতি দেশের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, ইহার ফলে আমরা বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহৃত বর্ণ বিশেষের প্রকৃতি বা ব্যবহার, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কৌতুহলোদ্দীপক নূতন নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়া সুখী হইতেছি. এবং জ্ঞান লাভ করিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম শুনিয়া যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে লেখক ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বঙ্গ ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র লেখকের প্রতি বড়ই অবিচার করা হইবে সুতরাং অগ্রেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা মাতৃভাষার সেবা করেন তাঁহাদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি "বাঙ্গালা ভাষার ভাল ব্যাকরণ নাই"। কথাটা আপাতত প্রহেলিকার মত বোধ হয় এবং পণ্ডিতের মুখের কথা বলিয়া ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও অনেকে মনে মনে নিশ্চয়ই এ কথা ভাবেন, "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নাই" ইহা কি রকম কথা? তবে আমরা কি পড়িয়াছি! ছেলেপিলেদের বা কি পড়াই।" কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ আছে, কিন্তু বস্তুতঃই বাঙ্গালা ভাষার কোন ভাল ব্যাকরণ নাই। যদি কোন ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্য হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অদ্যাপি এমন একখানি ব্যাকরণ রচিত হয় নাই, শুধু যাহা-পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারে। বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া ব্যাকরণে এই প্রকার ক্রটী আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাপ্রয়াসু কোন বিদেশীয় অতি সহজেই এই ক্রটী ধরিতে পারেন। তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ অদ্য বাঙ্গালা ভাষার বচন সমন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

বাল্যকালে ইংরাজী ব্যাকরণ পড়িবার সময় একবচনান্ত শব্দগুলিকে বহুবচনে পরিবর্ত্তন করিবার নিয়মগুলি মুখস্থ করিতে কাহাকে বেগ পাইতে না হইয়াছে? ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে প্রবেশিবার দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিতে বচন সম্বন্ধীয় জটিল নিয়মগুলি বিকটমূর্ত্তি দ্বারবানের ন্যায় শিশুহৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি কিন্তু বালকের প্রতি বড়ই সদয়। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, সকল প্রকার বাঙ্গালা ব্যাকরণেই বচন-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী দ্বারা ভারগ্রস্ত নহে। "বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যাকে বচন বলে, এক বচন দ্বারা এক সংখ্যা, এবং বহুবচন দ্বারা দুই অবধি বহু সংখ্যার বোধ হয়"। বচন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন কথা প্রায় কোন ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয় না। শব্দের পর কোন্ কোন্ বিভক্তি যোগ করিয়া একবচনান্ত পদকে বহুবচনান্ত করা যায়, তাহা নিরূপণের ভার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণকারই শিক্ষার্থীর উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বচন-বৈচিত্র্য ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে কোন অংশেই কম নহে, বরং বেশী। এই বিচিত্রতার সহিত আমরা শিশুকাল হইতেই এরূপভাবে অভ্যস্ত হইতে থাকি যে ইহা আমাদের নিকট অনুভূতই হয় না। জননীর স্নেহ-সম্ভাষণ, ভ্রাতা-ভাগিনীদের মধুর আহ্বান, সুহৃদ্বর্গের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি, মাতৃভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আশৈশব সহায়তা করিয়া আসিতেছে; সুতরাং উল্লিখিত বিচিত্রতা সত্ত্বেও বাঙ্গালা শিখিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। জন্ম-ভূমির ন্যায় ভাষা-জননীও আপনি ধরা দিয়া থাকেন, শিক্ষকের

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৌহাটী শাখার ১লা বৈশাখ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ থাকা উচিত নহে।

প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত এক বচনের চিহ্ন "অ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন; কিন্তু সমুদয় শব্দের পরস্থিত "অ" বিভক্তি লোপ হয়, অধিকাংশ ব্যাকরণে এই সূত্রটী না থাকায় ভিন্ন দেশীয় শিক্ষার্থিদিগকে বিশেষ গোলে পড়িতে হয়। সকলেই জানেন কেবল আকারান্ত শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে, অন্যত্র নহে, যেমন "হরি যাইতেছে" বলিতে "হরি-অ যাইতেছে" বলা চলে না! কোন কোন ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তিতে • শূন্য অর্থাৎ কোন চিহ্ন নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কথা-ভাষাতে বঙ্গ-দেশের কোন কোন স্থানে ইহার প্রতিক্রম হইলেও লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এনিয়ম অনেকটা মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বহুবচনের চিহ্ন কেবল "রা" বা "দিগেরা" বলিয়াই যে সকল বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখক নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে কখনই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত হিতৈষী বলা যায় না। নিম্নলিখিত কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে অধিকাংশ স্থলেই এ নিয়মটী সম্পূর্ণরূপে খাটে না। The boys are playing এই বাক্যটীর বাঙ্গালা করিতে যদি কোন ইংরাজ বাঙ্গালা ব্যাকরণ অনুযায়ী "বালকেরা খেলিতেছে" লেখেন, স্বয়ং বৈয়াকরণিকও তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন না। অথচ আকারান্ত শব্দ যে বহু বচনে একারান্ত হইয়া যায় অনেকেই ব্যাকরণে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। আবার বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে "দিগেরা" এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ কি কেহ কখনও লিখিয়াছেন? বালক-দিগেরা এই রূপ লিখিলে পরীক্ষকদিগেরা তাহাদিগকে কখনই নম্বর দিবেন না! সুতরাং ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তির বহু বচনে "দিগেরা" প্রত্যয়ের উল্লেখ না করাই ভাল। কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব এক বচনে প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন নাই বহুবচনে 'রা' বা 'এরা' হয়, অনেক স্থলেই এনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

The boy is reading ইহার অনুবাদ যদি 'ঐ বালক পড়িতেছে' বা 'বালক পড়িতেছে' করা যায় তাহা হইলে কোনটীই খাঁটি বাঙ্গালা হয় না। এস্থলে বালক শব্দের পরে 'টী' এই প্রত্যয়টীর যোগ করিয়া বলিতে হইবে 'বালকটী পড়িতেছে'। এই 'টী'ই আবার 'টা' রূপ ধারণ করিয়া শব্দের পশ্চাতে, কখনও ২ বা আগেও, বসিয়া থাকে। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্যে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই 'টী' কোন স্থানে 'টা' হয় তাহার একটা নিয়ম বাহির করা যায়।

সহানুভূতি, প্রশংসা প্রভৃতি বুঝাইতে হইলে প্রায়শঃ একবচনান্ত ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের পরে 'টী' প্রত্যয় বসিয়া থাকে, যেমন, ছেলেটী বেশ শান্ত, মেয়েটী শুনেছি বেশ লেখা পড়া জানে। তেমনই অবজ্ঞা বুঝাইতে 'টা' প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন, লোকটা বড় পাজী। এই টা-ই আবার কলিকাতা অঞ্চলে চেহারা বদলাইয়া 'একটা' 'দুটো' এবং তিনটে হইয়া পড়ে। এস্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। সংস্কৃতে 'নমস্' শব্দটী যেমন কখনও ২ বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞা বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে টী-ও কখন ২ সেই রূপ অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন "লোকটী কিন্তু কম নন, বজ্জাতের হাঁড়ী" সেইরূপ আবার প্রশংসা বুঝাইতেও কখন ২ 'টা' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন, 'লোকটা তেজীয়ান বটে' এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম বাঙ্গলা ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচনান্ত শব্দের পরে যে কোন চিহ্ন নাই সর্ব্বত্র ইহা ঠিক নহে, ইংরাজীতে যেরূপ article ব্যবহার করিতে হয় বাঙ্গলাতেও সেইরূপ টী, টা, প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এবং এসম্বন্ধে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীতে যেমন Proper nounএর আগে articel বসে না, বাঙ্গলাতেও সেইরূপ নাম বাচক বিশেষ্যের পরে টী, টা প্রভৃতি বসেনা। The Ram is going বলা যে রূপ ভুল 'রামটী যাইতে' বলাও তেমনই ভুল। টী, টা প্রভৃতি প্রত্যয় বহুবচনের সঙ্গে বসিয়া

থাকে; কিন্তু সেস্থলে উহারা শব্দের আগে বসে কখনও পরে বসে না। যেমন 'দুইটী বালক' হয় কিন্তু 'দুই বালকটী হয় না। এস্থলে টী যেন সংখ্যা বাচক শব্দের আঁচল ধরা, কদাপি উহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না; এই সংখ্যা-বাচক শব্দই আবার যখন মূল বিশেষ্যের পরে বসে তখন টীরও তাহার পরে বসিতে কোন আপত্তি দেখা যায় না। যেমন, 'বালক দুইটী'। খানি, খানা, গাছি, গাছা প্রভৃতি-জাত টী ও টার আরও কতক গুলি প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। ইহারা জাত্যংশে হীন, মনুষ্য দূরের কথা সজীব পদার্থের সহিতও ইহাদের বসিবার অধিকার নাই। তথাপি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায় আপন সমাজে ইহাদের প্রতি-পত্তি আছে, এমনকি অনেক স্থলে টী ও টা-রও কলিকা পাইবার জো নাই। তবে ইহারা কতকটা উচ্চবংশজ বলিয়া খানা, খানি, বা গাছি প্রভৃতির সভায় যাইতে পারে বটে; কিন্তু সেস্থলে মূর্খের সভায় পণ্ডিতের ন্যায় তাহাদের মূল্য কেহই বড় একটা বুঝিতে পারে না; বরং অনেক স্থলে কতকটা হীন হইয়াই থাকিতে হয়। আমরা বলিয়া থাকি 'বইখানা তুলিয়া রাখ' আহা! বইটা ফেলে দিলে বলিলেও এস্থলে টার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু 'টা' উদার প্রকৃতির ব্রাহ্মণের মত কোট, সার্ট প্রভৃতি বিলাত ফেরৎ দিগকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু গাছি এবং খানি বা খানার মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বীতা খুবই বেশী; যেখানে গাছি বসে সেখানে খানির ব্যবহার কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়; অমরা সুতোগাছি বলি কিন্তু সুতো খানা বলি না; আবার থালা খানা বলিয়া থাকি; কিন্তু খানা, গাছি কখনও বলিনা; কিন্তু ঘটিটা বাটীটা বলিয়া থাকি। ঘটী খানা, বাটী খানা কখনও বলি না। সুতরাং দেখা যায় অচেতন পদার্থের মধ্যে যে সকল বস্তু কঠিন এবং নিরেট তাহাদের সঙ্গে টী বা টা বসে; যেমন, গাছটা, ঘড়ীটা, কলমটা, ইত্যাদি আবার পাতলা, বিস্তৃত এবং কঠিন পদার্থের সঙ্গে খানা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, দড়ী গাছি, সুতোগাছি ইত্যাদি। কাপড় সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও সম্ভবতঃ বিস্তার বেশী বলিয়া তাহার পরে খানা বসিয়া থাকে। অতএব দেখা-গেল টী, টা, খানি, গাছা, প্রধানতঃ এই চারিটী প্রত্যয় বিশেষ্য পদের পরে বসিয়া একবচন বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সংখ্যা বাচক শব্দের পরে বসিয়া ইহারা বহুবচন ও প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল চিহ্ন ব্যতিরেকে ও এক বচনের বোধ হইয়া থাকে, যেমন, চোর ধরা পড়িয়াছে; শিশু ফরিং ধরিয়াছে। কিন্তু এস্থলে চোর এবং শিশু, চোরটা বা শিশুটীদ্বারা বক্তার যে মনো-ভাব বুঝাইত তাহা বুঝায় না, ইহা সহজেই অনুমেয়।

সংখ্যাবাচক শব্দের দ্বারা মনুষ্য বোধক শব্দের এক বচন ও বহু বচন করিতে হইলে সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে 'টী' অথবা জন দিতেই হইবে। যেমন পাঁচটী বালক বা পাঁচজন বালক; পাঁচ বালক এরূপ কখনও হয় না; পাঁচ ভ্রাতা, তিন পুত্র এরূপ প্রয়োগ সচরাচর দেখা গেলেও এইরূপ প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ স্থলে সীমাবদ্ধ। সংখ্যাবাচক শব্দের পরে 'টী' 'টা' বা জন এবং উভয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হইলেও উহার অর্থ সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। আমরা ৬০ জন মানুষ বলি এবং ৬০টী মানুষও বলিয়া থাকি; কিন্তু এস্থলে টী যেন এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে সে এই সংখ্যা প্রচুর নহে এবং এই জন্য বহুত্ব জ্ঞাপক শব্দের পরে টী প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না; হইলেও তদ্দ্বারা বহুত্ব কতকটা খর্ব্বীকৃত হইয়া থাকে। সংখ্যাবাচক শব্দের পরে 'জন' শব্দটীর প্রয়োগ হইলেও 'শত' শব্দের পরে উহার প্রয়োগ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন, পাঁচশত জন লোক, না বলিয়া পাঁচশত লোকই বলা হয়। কিন্তু শতের পরে শতের নিম্নস্থ কোন সংখ্যা থাকিলে তাহার পরে 'জন' ব্যবহার করিতে হয়। যেমন, পাঁচশত কুড়িজন লোক। বহুত্ব বুঝাইলেও কখন কখন 'টীর' ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন, "হাজারটী টাকা গণিয়াদিয়াছি"; ইহার দ্বারা বুঝা যায়, বক্তা যাহার নিকট বলিতেছেন তিনি যেন টাকার পরিমাণকে কম মনে করিয়াছিলেন। কখন কখন বিশেষণ শব্দের দ্বিরুক্তি করিয়া বহুত্ব জ্ঞাপন করা হইয়া

থাকে ; যেমন বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কোন চিহ্ন ব্যতিরেকেও এক বচনের বোধ হইয়া থাকে ; যেমন, শিশু ফড়িং ধরিতেছে সেই রূপ কখন কখন বহুবচনের চিহ্ন যুক্ত না হইয়াও বহুত্ব জ্ঞাপন করিতে পারে ; যেমন, সে দেবতা ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না। কিন্তু এস্থলে ইংরেজীতে Man is mortal বলিতে যেমন মানব জাতিকেই বুঝায়, কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝায় না, সেইরূপ দেবতা এবং ব্রাহ্মণ শব্দ দুইটীর দ্বারা সমস্ত জাতিকে বুঝাইতেছে। অন্যান্য ভাষাতে বহুত্ব জ্ঞাপক বিশেষণের সঙ্গে থাকিলেও মূল বিশেষ্য পদে বহু বচনের চিহ্নযুক্ত হইয়া থাকে ; যেমন ইংরেজীতে Five boys, সংস্কৃতে পঞ্চ বালকাঃ ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গলাতে পূর্ব্বে বহুত্ব-বোধক বিশেষণ থাকিলে মূল পদটীকে বহুবচনান্ত করিতে হয় না। 'পাঁচজন বালক' ব্যবহৃত হয় কিন্তু পাঁচজন বালকেরা এইরূপ হয় না। বাঙ্গলা ভাষার বহুবচনবোধক 'রা' বিভক্তিটীর একাধিপত্য দৃষ্ট হইলেও সকল সমাজের সহিত ইনি মেশেন না। কৌলীন্য মর্য্যাদা বশতঃই হউক, কি যে কারণেই হউক, অপ্রাণী বাচক শব্দের পরে কখনও 'রা' ব্যবহৃত হয় না ; যেমন, 'নৌকারা নদীতে ভাসিতেছে' এইরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না। এস্থলে সকল, গুলি, গণ, সমূহ প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দ যোগ করিয়া বহু বচন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে 'সকল' শব্দটী বিভিন্ন অর্থে কখন শব্দের আগে ও কখন পরেও বসে। যেমন, প্রাণী সকল রাত্রিতে নিদ্রা যায়, নৌকা সকল ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। এস্থলে 'সকল' শব্দ 'রা'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার 'সকল প্রাণীই' মরিবে, সকল নৌকাই খালি', এরূপও বলা যায় ; কিন্তু এখানে 'সকল' শব্দের অর্থ রা নহে। কিন্তু গণ গুলি, প্রভৃতি শব্দ, শব্দের পরেই বসে কদাচ আগে বাসে না। ইহাদের মধ্যে গুলি শব্দটী প্রায়ই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন, ছেলেগুলি বড় দুষ্ট আবার কখন কখন সহানুভূতি বুঝাইতেও গুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা, আহা! মানুষগুলির দুর্দ্দশা দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। কখন কখন বা ইহা চেহারা বদলাইয়া 'গুলা' রূপ ধারণ করে যেমন,

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পরে তার আছে কত গুলা॥

কলিকাতা অঞ্চলে এই গুলাই আবার 'গুলো' হয় ; যেমন, "বই গুলো নিয়ে এস হে"।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বহুত্ব জ্ঞাপক 'গণ' বিভক্তির ব্যবহারেও অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে। এই বিভক্তিটী প্রায়ই মনুষ্য বাচক শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি। ইতর প্রাণীর জাতিবাচক শব্দের পরে 'গণ' বিভক্তির ব্যবহার হইলেও কোন বিশেষ শ্রেণীর পরে ইহা বসে না ; যেমন পশুগণ, পক্ষিগণ এরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গরুগণ, মহিষগণ হয় না। ঋকারান্ত শব্দের পরে 'গণ' বসাইতে হইলে মূল শব্দটীর পরেই উহা বসাইতে হয় ; প্রথমা বিভক্তি যুক্ত করিয়া বসান ব্যাকরণ সঙ্গত নহে। যেমন 'ভ্রাতৃগণ' ইহাই বিশুদ্ধ প্রয়োগ ; ভ্রাতাগণ নহে। রাজা শব্দের পর গণ ব্যবহার করিতে হইলে রাজা শব্দটী অকারান্ত হইয়া যায় ; যেমন, রাজগণ। অপ্রাণীবাচক শব্দের পর কদাচ 'গণ" বসে না ; যেমন, "পুস্তকগণ" 'নৌকাগণ' এরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না। 'সকল' শব্দের বদলে অনেক স্থলে 'সবশব্দের' প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর পদ্যেই দৃষ্ট হয়। যেমন "পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল"। ইংরাজীতে যেমন The এই article টীর যোগে বিশেষণ শব্দ বহুবচনান্ত বিশেষ্য পদের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন, The rich are happy, সেইরূপ বাঙ্গলাতেও বিশেষণ শব্দ বহুবচনান্ত বোধক রা বিভক্তির যোগে বহুবচনান্ত বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ধনীরা সুখী। সকল এবং সব প্রভৃতি বহুবচনবোধক বিশেষণের পরে আর 'রা' বসাইবার প্রয়োজন হয় না ; যেমন, সকলেই মরিবে এরূপ বলা যায়, কিন্তু সকলেরাই মরিবে, এরূপ প্রয়োগ হয় না।

"ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে।"
(মেঘনাদ বধ)

এই স্থলে 'সবে' শব্দটি বহুবচনান্ত বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমুদয়, সমূহ প্রভৃতি শব্দ অনেক সময় 'সকল' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শীতকালে নদী সমুদয় শুকাইয়া যায়। কখন কখন শ্রেণী শব্দটীকেও সকলের অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যেমন, "এই যে বিটপী শ্রেণী হেরি সারি সারি" (সম্ভাবশতক)। অনেক সময় বর্গ শব্দটী বহুবচনের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, তাহার জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। বহুবচনের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতে দ্বয়, ত্রয়, চতুষ্টয়, পঞ্চক, ষষ্ঠ, সপ্তক, অষ্টক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ভ্রাতৃদ্বয়, পুস্তকত্রয়, ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়, প্রবন্ধাষ্টক, ইত্যাদি।

বচন বৈচিত্র্যের এইরূপ আরও বহুসংখ্যক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা গেল না। প্রবন্ধটী যে সর্ব্বতোভাবে ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। আমার বক্তব্যগুলি সকল স্থানে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারি নাই। আশা করি, বঙ্গভাষার সুযোগ্য সন্তানগণ বঙ্গভাষার একখানি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হইবেন। ব্যাকরণের এক একটী সামান্য বিষয়েও যে বহু আলোচনা এবং গবেষণার অবসর রহিয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। হয় ত বিষয়ের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু অল্প বুদ্ধি মজুর কর্ত্তিত বন্য বৃক্ষ সুনিপুণ সূত্রধরের হস্তে পতিত হইয়া সুদৃশ্য গৃহসজ্জায় পরিণত হয়, তাই সুধীজন-সমক্ষে বাঙ্গলা বচন সম্বন্ধে আমার সামান্য মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস।

মা

মায়ের—

পায়ে অলঙ্কার—লঙ্কার কমল
ফেনিল মুকুতা ঝলে ঝল মল
সুনীল মেখলা—বিন্ধ্য-নীলাচল
শোভিছে থরে

যুগ্ম কোহিনূর, কিরীট-চূড়ায়
হিমাদ্রি যাঁহার কুন্তল উড়ায়
শ্রান্ত তনু যাঁর মলয় জুড়ায়
বীজন করে'

অমৃত ক্ষরিছে মর্ম্মে মর্ম্মে
গোদাবরী-গঙ্গা-কাবেরী-নর্ম্মে
প্রাচী পশ্চিমে—করাচী ব্রহ্মে
অঞ্চল উড়ে

আশ্রম মোদিত হোম গন্ধে
অরণ্য রণিত সামছন্দে
চারণভৃঙ্গ চরণ বন্দে
গুঞ্জন সুরে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে

ভিখারীর দান

সে বৎসর আমি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলাম। কলির এ রাজসূয় যজ্ঞে ভালরকম "তদ্বির" করিবার জন্য, আমি পূজার কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জেলা সহরে বাস করিতেছিলাম। "পরিবার" কলিকাতাতেই ছিলেন। কারণ দেশের আব্‌হাওয়া তাঁর তত সহ্য হয় না। সহরের একপ্রান্তে আমার নিজের একখানা একতালাবাড়ী. সম্মুখে বিস্তৃত বাগান। বাড়ীতে সর্ব্বদা বাস করা হয় না বলিয়া তখন আমার বাগানে ফুল অপেক্ষা গাছের, এবং

গাছ অপেক্ষা আগাছারই যাহার ঢের বেশী ছিল। কি উপায়ে মফঃস্বলস্থ বড় বড় মক্কেলগুলিকে পাকড়াইয়া ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে একটা সৎপরামর্শ করিবার জন্য গুটী দুই তিন উকীল বন্ধু লইয়া সেদিন একটা মজলিশ বসাইয়াছিলাম।

আমরা কজনেই আমার বাড়ীর সম্মুখস্থিত উদ্যানেই চেয়ার ফেলিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলাম। তখন ভাদ্র শেষ হইয়া গিয়া সবে সোনালি আশ্বিন পড়িয়াছে। অপরাহ্ন কাল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিমের নীল আকাশে তখনো একখানি সুমধুর গোলাপী রেশ মাখানো। তেমন রঙীণ আকাশে আর কোনও ঋতুতে বড় দেখা যায় না। সমুদয় বাঙ্গলার হৃদয়ের বাঞ্ছিত-মিলনের প্রফুল্লতার লাল আলো লাগিয়াই বুঝি এ সময়ে বাঙ্গলার আকাশ এমন স্বপ্নময় হইয়া উঠে!

বাগানের একধারের বাতাপী কুঞ্জের দিক হইতে একটা অম্লমধুর রকমের মাদক সৌরভ নীহারসিক্ত বাতাসে পথহারার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গাছে হেলানো ডালটীর উপর একটী কোকিল বুঝি তার সঙ্গিনীর অপেক্ষায় বসিয়াছিল। কিন্তু আজ আর তার কুহুস্বরে সে রাগিণীর ঝঙ্কার ছিল না; কারণ সে যে বসন্তের কোকিল, শরতের তো সে আর কেহ নয়!

এমন শরতের সন্ধ্যায় বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্যামল তরুলতা বেষ্টিত পল্লীজননীর ছায়াঢাকা, স্নেহমাখা কোমল আনন্দ ভরা কোলটীর কথাই মনে পড়ে, তখন আর কায ভাল লাগে না। কেবল আপিস আদালত, ইস্কুল কলেজের জন্য নয়, শরৎ কালটা যেন সকলেরই পূজার ছুটী! তাই আমাদের বৈঠকটায় আজ কাযের কথা জমিয়া উঠিতে চাহিল না! এমন সময় রাস্তার দিক হইতে একটা গানের সুর, বাতাপি লেবুর ফুলের গন্ধের সহিত জড়িত হইয়া, মৃদু শীতল পবনের হিল্লোলে হিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া আমাদের রাজনীতির উত্তেজনা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিল।

নীলকমল বাবু অন্যমনস্কভাবে হাতের আলবোলার নলটা নিঃশব্দে ঘাসের উপর ফেলিয়া দিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। বিধু বাবু হাতের কাছে আর কিছুই নাগাল না পাইয়া চেয়ারের হাতাটার উপরেই তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি কবি গেটের মত দুই চোখ মুঁদিয়া কান দিয়া সে সুরের সরবত পান করিতে লাগিলাম। চারু বাবু তো একেবারে হিপনটাইজড্ সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

এমনি আশ্চর্য্য সে গান! সারং যখন খাদে নামিয়া ঠিক পুরুষের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে রাগিণীর আলাপ জুড়িয়া দিল, তখন একটী পুরুষ তাতে তার আপন ভাববিহ্বল হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, একটী পুরাকালের রসাল পদাবলী পল্লবিত করিয়া তুলিল। আর যেই রাগিণী এক সুরের দৌড়ে সারঙ্গের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া সুধাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল, অমনি নারীকণ্ঠ-বিনিসৃত একখানি সাধা কোমল সুর তাতে একখানি ভাবের ঝালর গাঁথিয়া দিয়া সে শারদ সন্ধ্যার শোভার সহিত একখানি অনির্ব্বচনীয় করুণতা মাখাইয়া দিল! স্ত্রী গাহিল :—"তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই", অমনি পুরুষ-কণ্ঠ গানে জবাব দিল :—"তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই।" এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষে গাহিতে লাগিল :—

স্ত্রী। তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীলসাড়ী
পুরুষ। তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী!
স্ত্রী। তুয়া অনুরাগে হাম হৈনু কলঙ্কিনী—
পুরুষ। তুয়া অনুরাগে নন্দের বাঁধা বৈনু আমি!
স্ত্রী। তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি
পুরুষ। তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁখি।

এ কোন চিরন্তন শুকসারীর অপরূপ প্রেম-নিবেদন! এ কোন স্বপ্ন-জগতের আদিম প্রেমিক-প্রেমিকার অনাদি অনন্তের সুরে বাঁধা মুগ্ধ কূজন-ধ্বনি! আবেশে আমার দুই মুদ্রিত চোখ দিয়া দুটী আনন্দের ধারা বহিয়া আসিতে চাহিল;—আমি স্বপ্ন-জড়িত কণ্ঠে আমার খানসামাকে ডাকিয়া বলিলাম :—ওরে ডাক্, ডাক্, দেখি কারা যায়

এমন গান গেয়ে! ডেকে নিয়ে আয় তাদের এখানে :—আমি তাদের গান শুনবো!"

মিনিট দশ পরে নটো খানসামা এক বৈষ্ণব ভিক্ষুক আর তার সহচরীকে আমার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। পুরুষটী কিছু কালো, প্রকৃতিটা যেন কিছু গম্ভীর, চেহারাটাও একটু মোটাসোটা রকমের! বড় বড় লম্বা লম্বা চোখ দুটীতে কেমন একটা উদাস ভাব; দেখিয়া মনে হয় তাদের দৃষ্টি যেন পৃথিবীর সুখদুঃখের চঞ্চলতার উর্দ্ধ স্থিত শাশ্বত আনন্দের আভাষ পাইয়াছে। লম্বা লম্বা কুঞ্চিত কেশের রাশি কাঁধের দিকে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। বয়স চল্লিশের উপরে নয়!

তার সঙ্গিনীর বয়স ত্রিশের নীচে হইবে। স্ত্রীলোকটীর বর্ণে একসময়ে উজ্জ্বলতা ছিল, দেহলতায় একদিন যৌবন-শ্রী ছিল এখন, মরুভূমির হাওয়া লাগিয়া সে নিকুঞ্জ শুকাইয়া গিয়াছে। এক যৌবন ছিল নীলোৎপলের মতো তার দুটী করুণ নয়নে! সে কি চক্ষু—না প্রেমের সুধা-প্রস্রবণ?

পুরুষের হাতে সারং, নারীর হাতে মন্দিরা। পুরুষের পিঠে একটী ভিক্ষার ঝুলি, স্ত্রীলোকটীর হাতে কমণ্ডলু। পুরুষের পরণে ছিন্ন গেরুয়া বসন, স্ত্রীলোকের পরণে মলিন নীলাম্বরী। তেমন সন্ধ্যায় তাদের দেখিয়া কে বলিবে তারা শুধু ভিখারী-ভিখারিণী! আমার মনে হইল, আজ বুঝি বা ভিখারী শিব, মা পার্ব্বতীকে ভিখারিণীর বেশে সাজাইয়া সখ করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন!

তারা দুজনে যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন ধূসর সন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়াছে। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। আকাশে চাঁদ ছিল না। কিন্তু আকাশের অনন্ত নীলিমা একেবারে তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে—কোথাও একটু ফাঁক ছিল না। চারিদিক অন্ধকার কেবল আমার নীল বাগানখানি অসংখ্য তারকাকুলের মৃদু দৃষ্টিধারায় নিতান্ত পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। আমি মেয়েটীর দিকে চাহিয়া সন্দেহে বলিলাম —

"তোমাকেও ভিক্ষা কত্তে রাস্তায় বেরুতে হয়েছে, বাছা?"

আমার অগোচরে আমার সে স্নেহভরা প্রশ্নের ভিতর বোধ হয় কোথাও একটা নিষ্ঠুরতার শেল লুকান ছিল—নচেৎ আমার প্রশ্নে তার চোখে জল আসিল কেন? সে কি চোখের জল,—মৃদু নক্ষত্রালোকে তো তা সুধাবিন্দুর মতই দেখাইতেছিল। তার পর সে নীরবে, জলভরা-চোখে তার সঙ্গী পুরুষটীর পানে চাহিল। তাদের চোখে চোখে যে ভাষায় কথা হইল, আমি তার কি বুঝিব? নিজে দুঃখী না হইলে কি কেউ কখনো চোখের ভাষায় মর্ম্মের কথা বুঝিতে পারে! আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম স্ত্রীলোকটীকে, কিন্তু উত্তর করিল পুরুষটী। সে বলিল —

"আমরা ঠিক ভিক্ষুক নই, মহাশয়! আমরা কৃষ্ণ-নামের উদাসিন-উদাসিনী।"

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম —"কৃষ্ণনামের উদাসিন-উদাসিনী! কিন্তু আর সে বৃন্দাবন কোথায়, চৈতন্যের সে নদীয়া কোথায় সে কৃষ্ণনামের মহিমাই বা কোথায়?" প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া বলিল, কোথায়?

তখন স্ত্রীলোকটী ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া তার স্বামীর আড়ালকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইল। সে যেন অতগুলি বিস্ফারিত চোখের কৌতূহল-দৃষ্টি সহিতে পড়িতেছিল না। সে লাজের একখানা কোমল অন্তঃপুরে আপনাকে লুকাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

এবার মন হইতে কাব্যের নেশাটা একটু কাটাইয়া দিয়া মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিলাম, "এক যায়গায় বসে স্বামীস্ত্রীতে খেটে খাও না কেন তোমরা খেটেখেলে কি আর মুখে কৃষ্ণনামের রোস থাকে না?"

নীলকমল বাবু নলটায় হঠাৎ গুড়ুৎ করিয়া দিয়া বলি-লেন, "সে আবার বলতে! আমাদের দেশের লোকের আত্মসম্মান একেবারে গিয়েছে কিনা!"

নীলকমল বাবু জলদগম্ভীর আওয়াজ দিতেই মেয়েটী আরো একটু স্বামীর দিকে-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটী চোখ নত করিয়া আরক্ত মুখে বলিল, "সে অনেক কথা, মহাশয় আমাদের এমনি পোড়া কপাল যে আমাদের কোথাও খেটে খাবারও যো নেই!"

আমি বলিলাম, "এতো লজ্জার কথাও বটে ; এমন সমর্থ স্ত্রী নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করে ফেরা !"

মেয়েটী এবার আরো সঙ্কুচিত হইয়া পুরুষটির দিকে ছায়ার মতন সরিয়া আসিল। পুরুষটী বলিল, এক সেই লজ্জা-নিবারণ ভরসা আর কি ? তিনি তো দ্রৌপদীর লজ্জাও রেখেছিলেন !"

কি বেদনা-কম্পিত কোমল কণ্ঠস্বর ! সে কথায় কত নির্ভর ! কি ভক্তির উচ্ছ্বাস ! সে কথার সুরে আমার উদ্ধত কথাগুলির ফণা একেবারে পড়িয়া গেল। আমি আবার উদাসভাবে বলিলাম, "আর কথায় কায নেই, দু জনে এবার একটী গান গাও !"

বিধু বাবু ফরমাশ করিলেন, "ঐ গানটা একবার গাও দিকিন্, আমার ধরম করম সকলি গেল মন—গিরীশ ঘোষের গানটা—আরে ঠিয়েটারী গানটা, বাকী পদটুকু মনে আস্চে না !"

নীলকমল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, একটা গ্রামোফোণের গান জান তো গাও, ও সব বাজে গান আমার ভাল লাগে না !"

চারু বাবু তেজের সহিত হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "ওরা এ সব গান জানবে কেমন করে ! না হে, তোমর 'শ্রীমতীর মান' গাও একটী !"

আদালতে বিধু বাবু চিরকালই চারু বাবুর বিপক্ষে দাঁড়ান, তাই চারু বাবুর ফরমাস বাতিল করিয়া দিয়া "তিনি বলিলেন, আরে না, না, সন্ধ্যাবেলা, পূর্ব্বরাগটাই জমবে ভালো !"

পুরুষটা তখন বিনয়নম্র স্বরে বলিল, "আমাদের তেমন বেশী জানাশুনো নেই, যাও দু চারটী জানি, সেগুলিও বেশীর ভাগ দুঃখের গান—"

আমি ভাব-জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "না ভায়ারা, অত ফরমাশ করে দরকার নেই, ওরা যেটা জানে, সেটাই গাক্ না ! ওদের সব গেছে, গান গাওয়ার স্বাধীনতা টুকুও লোপ করো না !"

পুরুষটী শিশিরজাল-জড়িত সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া, স্বপ্ন-মণ্ডিত বিহ্বল চোখে আকাশের নক্ষত্র-পুঞ্জের পানে তাকাইয়া সারঙ্গখানিকে বিচিত্র গানের সুরে মণ্ডিত করিয়া তুলিল ! স্ত্রীলোকটী একটু সরিয়া একটী পাতা-বাহারের গাছকে আব্রু করিয়া তার পিছন হইতে মন্দিরার মধুর ধ্বনি, করিয়া রাগিণীর তালে তালে রজত-পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ! আকাশভরা তারাগুলি যেন সে গান শুনিয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, আমার বাগানখানি সে গানে যেন বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এবার তারা দু জনে সমস্বরে গাহিল —

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না !
ও দুটী চরণ, বিনা আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না ;
তপন তনয় আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তা ত জানি না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা
অকুল পাথারে ডুবাবে আমারে স্বপনেও তা জানি না।
অহর্নিশি দুর্গা নামে ভাসি তবু দুঃখরাশি গেল না
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী—তোর দুর্গা নাম আর কেউ লবে না !"

গানের শেষ ঝঙ্কারটী যখন থামিয়া গেল, তার মূর্চ্ছনাখানি তখনো আমার হৃদয়ে অনুরণিত হইতেছিল। আমি গান শুনিতেছিলাম, কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। শেষে সুরের চমক ভাঙ্গিলে পর, পকেট হইতে দুটী টাকা তুলিয়া পুরুষটীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলাম,

"এই নাও তোমাদের বক্‌শিশ্। ভারি খুসী হয়েচি তোমাদের গান শুনে। আরেকদিন এ দিকে এসো !"

পুরুষটী কুণ্ঠিত ভাবে তার হাতখানি সরাইয়া লইয়া অতি বিনয়নম্র স্বরে বলিল, "মাপ করুন—আপনি অতি সহৃদয় ব্যক্তি—কিন্তু দুটী গানের জন্য দু টাকা নিতে পারবো না ! গুরুর নিষেধ ! চার গণ্ডা পয়সা হলেই আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট ! তাই বা আমাদের ক জন দেয় !"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "আমি তো খুসী হয়ে দিচ্ছি, নাও না !"

পুরুষটী হাতযোড় করিয়া বলিল, "মাপ করুন, মহারাজ হোন্ আপনি! কিন্তু ভগবান নিজে যা হতে আমাদের বঞ্চিত করেছেন, দয়া করে আপনি আর তাতে আমাদের আসক্তি বাড়িয়ে দিবেন না—"

অবশেষে আমাকে একটী সিকিই দিতে হইল। কিন্তু সিকিটা তুলিয়া দিতে আমার চোখে জল আসিতে চাহিল! কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "তবে আজ এখানেই রাত্রের জন্যে থেকে যাও, খাওয়া দাওয়া কর, কাল ভোরে চলে যেয়ো এখন।"

পুরুষটী বলিল, 'আপনি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকুন। কিন্তু আমাদের অতখানি সুখ নিয়তি কথনো সইবে না। আর এই খোলা আকাশের নীচে আমাদের মত হতভাগা লোকের যায়গার অভাবই বা কি?"

দরিদ্রের অভিমান, নিঃস্বের আত্মমর্যাদা-জ্ঞানদেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম—আমার মুখে আর কথা ফুটিল না। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত কতক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, তখনা দেখি, সে আশ্চর্য্য নরনারী রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রহস্যের মত কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

(২)

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। তখন আমি পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় একখানি চেয়ারে বসিয়া দৈনিক খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। টেবিলের উপর ঝক্‌ঝকে সামাদানের মাঝে মোমবাতি জ্বলিতেছিল। কিন্তু আমার মন খবরের কাগজের উপরে ছিল না। শারদ সন্ধ্যার সে মধুর স্বপ্ন যেন আমার চোখে তখনো লাগিয়াই আছে!

এমন সময় চাকর দৌড়িয়া আমাকে খবর দিল যোগেশ আমার সঙ্গে এখনি দেখা করিতে চায়;—ভারি জরুরী কায। এই যোগেশ আমার দুরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। ভারি গরীব সে। তাই তাকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটরীর অধীনে কেরাণীগিরিতে "বাহাল" করিয়া লইয়াছিলাম। যোগেশ লোকটা ভারি লাজুক, নিতান্ত না ঠেকিলে সে আমার কাছেও বড় একটা ভিড়িত না। তবুও যোগেশের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তখন মনে মনে কোনও প্রকার উত্তেজনা অনুভব করিলাম না। কারণ, সে সময়ে আমি যে দেশে বিচরণ করিতেছিলাম, সে দেশের রাজা ঐ ভিখারী আর রাণী সেই ভিখারিণী! সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে নিতান্ত নির্জ্জীব ভাবে চাকরকে বলিলাম, "উপরে নিয়ে আয় তারে।"

কিছুক্ষণ পরে যোগেশ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম তার মুখ অসম্ভব রকমের সাদা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হয়েছে কি, যোগেশ"

"আপনার বাইসিকেল খানা যদি একবার পাই—"

"এত রাত্রে বাইসিকেল দিয়ে কি হবে?

"ডাক্তার আনতে, খুকীর কলেরা হয়েচে!"

আমি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "নিয়ে যাও বাইসিকেল—শীগ্‌গীর ডাক্তার নিয়ে এসো!

যোগেশ বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমার আর খবরের কাগজ লইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব বোধ হইল। এবার ভিখারী-ভিখারিণীর চিন্তার সহিত যোগেশের মোমের পুতুলটীর মত মেয়েটীর কচি মুখখানির ছবিটী আসিয়া জুটিল। তারা তিন জনে মিলিয়া আমাকে একেবারে পাগল করিয়া দিল; কাগজ ফেলিয়া দিয়া দিয়া রুমালে খানিকটা ইউকেলিপটাস্ অয়েল ঢালিয়া চটি জুতা পায়েই আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমি নিজে নিঃসন্তান, তাই যোগেশের মেয়েটাকে বড় ভালবাসিতাম। মেয়েটা আমায় দাদা বাবু বলিয়া ডাকিত। আজ আমার মনে হইল, চারিদিক হইতে সেই রুগ্ন শিশুর আর্ত্ত স্বর আমাকে 'দাদা বাবু' 'দাদা বাবু' বলিয়া ডাকিতেছে:

রাস্তায় আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিলাম, কলেরা রোগীর কাছে যাইব কি না। ভাবিতে ভাবিতে ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিয়া দেখি, আকাশের সবগুলি তারাই যেন আমার উপর রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া

রহিয়াছে। তাদের তিরস্কার-সূচক দৃষ্টিতে আমার সমুদয় দ্বিধা দূর হইয়া গেল—আমি তাড়াতাড়ি যোগেশের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম, তার দুই পাশে বড় বড় গাছের সারি। স্থানে স্থানে যেন রাস্তার দুধারের গাছগুলি শাখাবাহু মেলিয়া দিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া রাস্তার উপরে সবুজ তোরণ সাজাইয়া রাখিয়াছে; তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেন অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অস্পষ্ট মৃদু নক্ষত্রালোকে রাজপথখানি রেশমী ফিতার মত ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে।

যোগেশদের বাড়ীর নিকটে আসিবামাত্র একটা করুণ রোদনধ্বনি আমার কানে প্রবেশ করিল। সহসা আমার পা যেন জমিয়া বরফ হইয়া গেল—মনে হইল, বুঝি বা এতক্ষণে সব শেষ হইয়া গেছে! তবু বহু কষ্টে দরজার কাছে আসিয়া দরজাতে ঘা দিতেই দরজা খুলিয়া দিল—সেই ভিখারিণী! ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, মিটি-মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিখারিণী তাড়াতাড়ি যোগেশের স্ত্রীর মাথাখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল, সে ছিন্ন লতিকার মত মেজেতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছিল। কোণে একখানা তক্তপোসের উপর রুগ্না বালিকা, আর সেই ভিখারী তাকে একখানি চামচে দিয়া একটা কি ঔষধ খাওয়াইতেছিল।

কিন্তু তখন তো আর তারা ভিখারিণীর মত দেখাইতেছিল না। ভিখারীর চোখে আর সেই স্বপ্নের জড়তা জড়তা নাই ভিখারিণীর চোখে মুখে আর কোথাও কুণ্ঠা নাই। সে ভিখারী এখন চিকিৎসক, ভিখারিণী তার সেবাপরায়ণা সহচরী।

আমি ভিখারীর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেশ কোথা?

ভিখারী তখন রুগ্না বালিকার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতেছিল, সে কোনও কথা কহিল না। ভিখারিণী ধীরে ধীরে বলিল, "ডাক্তার নিয়ে তিনি এখনো ফেরেন নি!"

নাড়ী দেখা শেষ করিয়া ভিখারী আমার পানে চাহিল। সে চোখে তখন স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে আমায় বলিল "আপনি বাড়ী চলে যান, দেখচেন না কলেরা! আমরা যা হয় করবো এখন। যে অষুধটা দিয়েচি, যেন একটু কাজ কর্ম্মে বোধ করি।"

এই কথা শুনিয়া যোগেশের ধূলিবিলুণ্ঠিতা বধূ আবার মর্ম্মান্তিক কাঁদিয়া উঠিল। ভিখারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এখন গোল করো না মা,—এই কি কাঁদবার সময়! এখন বিপদ-ভঞ্জনের নাম স্মরণ করে—একবার যাও দিকিন নেবুর রস দিয়ে একটু বার্লির জল নিয়ে এসো! মালতী তুমি ওর সঙ্গে যাও।"

ভিখারিণীর নাম মালতী।

এর মধ্যে ভিখারী কয়েক মিনিটের জন্য একবার বাহিরে গেল। পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার রুগ্নার পরিচর্য্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "এতক্ষণ তুমি খাটচো এবার আমি একটু রোগীর কাছে বসি, তুমি না হয় একটু বিশ্রাম করে নাও ততক্ষণ।"

ভিখারী ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি বলিলাম, "নৈলে তোমারো অসুখ হয়ে পড়া আশ্চর্য্য কি!"

ভিখারী হাসিয়া আমার স্নেহের তিরস্কার গ্রহণ করিল। পরে বলিল "রোগীর অবস্থা এমন নয়, যে, আমি ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত এক মিনিটের জন্যও এখান থেকে সরে যেতে পারি।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পরে সে আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "নারায়ণ!—এ কি দায়িত্ব!—এখন ডাক্তার এসে পড়লে বাঁচি।"

আরো মিনিট দশেক নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল; কিন্তু সময় যেন আর কাটিতে চায় না। ছোট একটা আলমারীর উপর একটা "বী" টাইমপিস টিক্ টিক্ করিতেছে,—শুধু তারই শব্দ শুনা যায়! রুগ্না বালিকা মাঝে মাঝে আকুল কণ্ঠে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া

উঠিতেছে!

আমি একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন কেমন বুঝ্‌চো?"

ভিখারী বলিল—"এখনো খুব ভরসা করি তো—তবে কি না, সবি তাঁর ইচ্ছা!"

এর মধ্যে যোগেশের স্ত্রী বার্লি লইয়া আসিল। সে মেয়েকে চামচে দিয়া বার্লি খাওয়াইতে লাগিল। ভিখারিণী বালিকাকে বাতাস করিতে লাগিল। ভিখারী এই অবসরে একবার বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

এমন সময় ঘণ্টা ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তার উপর দুটী চলন্ত আলো দুটী বাইসিকলের আগমন সূচনা করিল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে লইয়া যোগেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। যোগেশ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আছে—এখনো আছে বেঁচে?"

আমি তার কথার কোন জবাব না দিয়া ডাক্তারকে চুপি চুপি বলিলাম—"শীগ্‌গীর আসুন ভেতরে! অবস্থা বড় খারাপ!"

রুগ্নার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ভিখারীকে রোগীর পেটে ঔষধ মালিশ করিতে দেখিয়া এবং ভিখারিণীকে বাতাস দিতে দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন—"এরা কারা?"

আমি বলিলাম—"ছদ্মবেশী দেবতা!"

ডাক্তার তাহাদের পানে বিস্ময়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রুগ্নার দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলেন। ভিখারী অমনি তাড়াতাড়ি রোগীর শয্যা-প্রান্ত ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল আর কি! পরে দাঁড়াইয়া একটু স্থির হইয়া সে ডাক্তারকে বলিল, "ঠিক সময়ে এসেচেন আপনি! আমি ভগবানের অনুগ্রহে এখনো রোগিণীটাকে কোন মতে বাঁচিয়ে রেখেছি, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে খালি ভয় হচ্ছিল, আর বুঝি পারলুম না!"

ডাক্তার রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কিন্তু প্রফুল্ল হইলেন। তারপর যোগেশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আর কোন ভয় নেই যোগেশবাবু; ক্রাইসিস (crisis) পার হয়ে গেছে। নাড়ী এখন ক্রমশঃ ভাল বোধ হচ্চে!"

(৩)

আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সে রাত্রিতে সে ভিখারী-ভিখারিণীকে আমার বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া আসিলাম। তারা শুধু হাসির জোরে আমার অনুরোধটাকে উড়াইয়া দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি একেবারে নাছোড়বান্দা। কাযেই তারা দুজনে যেন কিছু অনিচ্ছার সহিতই আমার বাড়ীতে সে রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিল। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরেই ভিখারীর প্রবল এসিয়াটিক কলেরার সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে তার নাড়ী বসিয়া গেল, চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়া কোটরস্থ হইয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে এক বার আসিয়া ভিখারীকে দেখিয়া যাইতে সংবাদ পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া তার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "ব্যারাম দেখচি অনেকক্ষণ হয়েছে। এতক্ষণ চাপা দিয়ে রেখেছিলে কেন?" ভিখারী ডাক্তারকে কিছু না বলিয়া অন্ধকারের দিকে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। ডাক্তার দেখিলেন, ভাবিলেন, ঔষধও দিলেন; কিন্তু হায়! রোগ যে তখন তার চিকিৎসা শাস্ত্রের আয়ত্তের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! ডাক্তার ঔষধপত্র দিয়া আবার যোগেশের মেয়েকে দেখিতে চলিয়া গেলেন। ভিখারিণীর এখন আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। মাথায় কাপড় নাই, মাথার চুল বন্ধন-মুক্ত হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, সে শুধু একমনে তার স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ছিল। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম, এবং ডাক্তারের উপদেশমত রোগীকে বারবার ঔষধ খাওয়াইতেছিলাম। রাত্রি প্রায় যখন একটা তখন ডাক্তার আর একবার ভিখারীকে দেখিতে আসি-লেন। নাড়ীতে হাত দিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া আমাকে

বলিলেন :—"নাড়ী এখন আর একবারেই পাওয়া যাচ্চে না—sinking very rapidly."

ভিখারিণীর সেবারত হস্ত সহসা কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানি প্রভাতের চাঁদের মত পাণ্ডুর রক্তহীন হইয়া গেল।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন যোগেশের মেয়ে কেমন?"

ডাক্তার বলিলেন, "তার জন্য আমার বেশী কিছু কত্তে হয় নি, ভিখারীর অষুধই তাকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে তুলেছে!"

কথাটা বুঝি ভিখারীর কানে গিয়া পঁহুছিল। সহসা তার রোগাতুর অলস চক্ষু একবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া আবার ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। ভিখারিণী কায়াহীন ছায়ার ন্যায়, মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায়, অনাহারে অনিদ্রায় কলের পুতুলের মত কেবল তার স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। দেহে যেন ক্লান্তির লেশ মাত্র নাই, ভিতরে যে প্রলয়ের ঝড় বহিতেছিল বাহিরে তার কোন চিহ্নমাত্র নাই! অত্যন্ত তৃষ্ণায় যখন ভিখারী বড় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তখন তার মুখে এক টুকরা বরফ ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলাম, "তুমি কে ভাই?"

ভিখারী চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "ভিখারী—পথের ভিখারী, তা ছাড়া আর কেউ নই।"

আমি আরো একটু ধীরে বলিলাম, "আমি তোমার নামটা শুধু শুন্‌তে চাচ্চি।"

সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"মাপ করুন মহাশয়, যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ ঐটুকু বল্‌তে আমার আপত্তি আছে।"

আমি কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া অপর কথা পড়িতে গিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, তুমি যোগেশের মেয়েকে অমন চট্ করে সারালে কি করে?"

ভিখারী হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে আমি শিহরিয়া উঠিলাম, ভিখারিণী কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে স্বপ্নজড়িত চক্ষে অস্পষ্ট ভাষায় বলিল,—"আমি সারালুম? আমি সারাবার কে, দয়াময়! আমি যদি সারাবার মালিক, তবে নিজকে সারাতে পারলুম কই?"

আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি ভিখারীর অস্বাভাবিক চক্ষে তখন যেন পৃথিবীর ছবি ম্লান হইয়া গিয়া পরলোকের ছায়াজগৎ পরিছন্নভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের এই ছায়াঢাকা স্নেহঘেরা ফলফুল-শোভিত বহু সুখদুঃখের সুন্দর পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার পালা, সেই নীরব নির্ম্মম মুহূর্ত্ত অজ্ঞাত রহস্যের পথে ভিখারীকে অপরিচিতের দেশে আহ্বান করিতেছে।

তখনো সেবার মঙ্গল হস্ত লইয়া ভিখারিণী তার ভিখারী পতিকে মৃত্যুর কবল হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য নারীর সমুদয় শক্তি লইয়া যুঝিতেছিল। তখনো ত সব শেষ হইয়া যায় নাই!—তাই তখনো তার সেবার প্রয়োজন ফুরায় নাই। তখনো ত স্বামীর কণ্ঠে প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করিতেছিল, তাই তখনো তার কাঁদিবার সময় আসে নাই! তার সেবার কায যতই কমিয়া আসিতেছিল, সে ততই তার সমুদয় প্রাণ চোখে ভরিয়া লইয়া তার বিদায়প্রার্থী জীবন-সঙ্গীটিকে প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিতেছিল! তখন ভিখারিণীর নয়ন আকুল দৃষ্টিময়; সে দৃষ্টিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়, সংসারের কর্ম্ম-প্রবাহ সহসা থামিয়া যায়, সে দৃষ্টিতে একটা মহাপ্রলয় নিঃশব্দে সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে!

রাত তখন পোহায় পোহায়। শেষরাত্রির ক্ষীণ চন্দ্র একবার দেখা দিয়া অস্ত গিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নারী তার পতির মাথাখানি আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া অনিমেষ লোচনে তার ইহজীবনের দেখার সাধ পূর্ণ করিয়া লইতেছিল। বারবার বসনাঞ্চল শীতল বারিধারায় সিক্ত করিয়া লইয়া তার স্বামীর তৃষিত অধর যুগল ভিজাইয়া দিতেছিল! আর সে তৃষিত

বিদায়প্রার্থী বিস্ফারিত চোখে তার সাধের ভিখারিণীর পানে বার বার তাকাইতেছিল। তখন তার মুখের ভাষা বন্ধ হইয়া গেছে, শুধু যেন চোখের ভাষায় বলিতেছিল, "ওগো আমার ভিখারিণী, ওগো আমার রাজরাজেশ্বরী! আমার আরো কত কি কথা বলিবার ছিল—আমার কত কথা রহিয়া গেল, সে সব যে আর কিছুই বলা হ'ল না!" ভিখারিণী কম্পিত হস্তে পতির পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চাহিল, কিন্তু চোখে তার জল ছিল না, মুখে শব্দ ফুটিল না!

ধীরে ধীরে সে অনন্ত পথের ভিখারী পথিক —ক্রীড়াক্লান্ত শিশুর মত ভিখারিণীর কোলে অবসন্ন হইয়া পড়িল! ভিখারিণী মর্ম্মভেদী স্বরে কাঁদিয়া ডাকিল—"স্বামিন্—বন্ধু—ভিখারিণীর শেষ সম্বল।" ভিখারী আর কথা কহিল না। সে শুধু তেমনি করিয়া ভিখারিণীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তখন সে চোখে আর পলক ছিল না!

ভিখারী তখন এত যে স্থির, এমন নিশ্চল, প্রাণ যে তার আর নাই, তবু যেন সে দুটী হাসি হাসি চোখে ভিখারিণীর পানেই চাহিয়াছিল! যেন সে অর্দ্ধজাগ্রতভাবে একখানি সাধের স্বপ্ন দেখিতেছিল! কে বলিবে, সে মরিয়াছে? আর ভিখারিণী! সে ভিখারীর মুখখানি আপন স্নেহতপ্তকোলের উপর টানিয়া লইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে অহল্যার পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল;—কে বলিবে যে, ভিখারিণী মরে নাই, এখনো জীবিত আছে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ *

[ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত]

বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাঁদপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ এবং তালিপাবাদ এই পাঁচটী পরগণা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রস্থল। [১নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য] ইহার অধিকাংশ স্থান এখনও নিবিড় অরণ্যে সমাকুল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই প্রদেশবাসিগণ এখনও অনেক পশ্চাৎবর্ত্তী। এই জন্য অনেকে হয়ত এই বনাবৃত প্রদেশকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কিন্তু এই অরণ্যের অন্তরালে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের অতীত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, এবং তাহার আলোচনা ব্যতীত বঙ্গের ইতিহাসের একটী অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে।

---

* প্রবন্ধারম্ভেই আমি নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সুতরাং ইঁহাদের নিকট আমি চির ঋণী।

গড়কাশীমপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় আমার ভ্রমণ কালীন সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্তাদি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং উপকরণ-সংগ্রহে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন। রোয়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যমোহন রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়দ্বয় ও প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কাশীমপুরের জমিদারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীযুক্ত সারদামোহন ঘোষ মহাশয়গণও এই প্রবন্ধের উপকরণ-সংগ্রহার্থ বহু পরিশ্রম করিয়াছেন।

চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ভ্রমণ-কালীন সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া নানা স্থানের আলোক-চিত্র (Photograph) প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-সংলগ্ন সমস্ত চিত্রই উঁহার প্রস্তুত।

সাভারের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত কবিরাজ মহাশয়, এবং শ্রীযুক্ত কালীমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ সাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত যশোদালাল সাহা, এবং কতিপয় স্বর্ণকার উঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১নং ঢাকা জেলার উত্তরাংশ.

(রেণেলের মানচিত্র অনুযায়ী)।

২নং. লোহাকইড়।

১নং ঢাকা জেলার উত্তরাংশ,
(রেণেলের মানচিত্র অনুযায়ী)।

২নং, লোহাকইড়।

E. B. P. & P. House, Dacca.

এই প্রদেশের প্রাচীনত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ ইহার অতি পুরাতন মৃত্তিকা। এই প্রদেশের মৃত্তিকা যেরূপ গাঢ় রক্তবর্ণ, সেরূপ আর বঙ্গদেশের, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের, অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে যখন পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থান জলে নিমজ্জিত হয়, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থান তখনও জলতল হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত থাকে। ভাওয়াল হইতে আরও কিয়দ্দূর উত্তরে ২০ হইতে ৫০ ফিট্ উচ্চ বহু লোহিত মৃত্তিকার টিলা দৃষ্ট হয়। এই টিলা শ্রেণী ত্রিপুরার পর্ব্বত-মালার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত (১)। কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি ভাওয়ালের বর্ণনায় গাহিয়াছেন,

"রাঙ্গা মাটী পলা কান্তি খাঁটী সোণার মত।
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত॥

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই মৃত্তিকার অধিকাংশ লোহিত কঙ্কর, এবং তাহাতে লৌহের অংশ অত্যন্ত অধিক। (২) মৃত্তিকা কত পুরাতন হইলে এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবুল ফজলের সময়ে সরকার বাজুহাতে লৌহের খনি ছিল, এবং ঐ প্রদেশ নিবিড় অরণ্যাবৃত ছিল (৩)। ভাওয়ালের কতকাংশ বোধ হয় সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। এই প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি কাশীমপুর হইতে ৬.৭ মাইল দূরবর্ত্তী লোহাকইড় নামক একটী স্থান দর্শন করি। স্থানটী যে অতীব পুরাতন তাহা দর্শনমাত্রই প্রতীয়মান হয়। লোহাকইড়ের কতকাংশে ২।৩টা প্রাচীর এবং কতগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ বর্ত্তমান আছে। উক্ত প্রাচীর এবং স্তূপ লৌহের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত, এবং অদ্যাপি প্রায় ২।৩ হাত উচ্চ আছে। [২নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, উহা অপরিণত লৌহ (iron ore), —কঙ্কর এবং লৌহের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। হইতে পারে, আবুল ফজলের বর্ণিত লৌহ-খনি এই স্থানেই বিদ্যমান ছিল। শুনা যায়, লোহাকইড়ে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে লৌহ-নির্ম্মিত অতি বৃহদাকার কটাহের ভগ্নাংশ এবং হাতুড়ী, বাটালি, প্রভৃতি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, এবং এখনও যায়। যাঁহারা স্বচক্ষে উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি এই বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি।

এতদ্দেশীয় হিন্দু মুসলমান মাত্রেরই ধারণা যে, বহু প্রাচীন স্থান এবং দ্রব্যাদি দেবানুগৃহীত। তদনুযায়ী লোহাকইড়েও পরবর্ত্তী কালে একটী দরগা স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বহু পুরাতন বৃক্ষরাজি সূর্য্যকিরণপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। ঐ স্থানের বৃক্ষাদি কর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। কেশা পাগলা নামক কোনও ব্যক্তি নাকি ঐ স্থানের একটী সুবৃহৎ গজারী বৃক্ষ ছেদন করাতে পুত্র-পৌত্রাদি সহ অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তিত বৃক্ষের একটী অংশ অদ্যাপি ঐ স্থলে পতিত আছে, অপর তিন অংশ জল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ঐ অংশের মধ্যস্থিত সার-ভাগ টুকু মাত্র এখনও বর্ত্তমান; তাহা নয় হাত লম্বা, এবং উহার বেষ্টনী প্রায় তিন হাত। কিংবদন্তী এই, যে, ভাওয়ালরাজ ঐস্থানের দৈবী শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য গজারী বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ টুকু লইয়া আসিবার জন্য দুইটী হস্তী প্রেরণ করেন। বৃক্ষাংশ স্পর্শ করিবার অব্যবহিত পরেই হস্তীদ্বয় প্রাণ ত্যাগ করে। আলোচ্য বিষয়ের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্থানের

স্নেহাস্পদ শ্রীমান শ্যামাচরণ সরকার নানাবিধ প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগ্রহে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বান্ধবের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক এবং ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়, এবং ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় বি, এ, বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনার সাহায্যার্থ উপকরণ-সংগ্রহ এবং মূল্যবান উপদেশাদি প্রদানে লেখককে বাধিত করিয়াছেন।

(1) Taylor's "Topography and Statis tics of Dacca" Page 4.

(2) Ibid. page 62.

(3) "The forests of this Sircar (Bazoha) supply timbers fit for building boats and for the beams of houses, and here is an iron mine".—Ayeen Akberi, as translated by Francis Gladwin.

প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য লোহা-কইড়ের বিবরণ বিবৃত হইল।

মৃত্তিকার প্রাচীনত্ব ব্যতীত ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীনত্বের আরও বহু প্রমাণ বিদ্যমান। হিন্দুদের পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতে এই সমস্ত স্থানের যে উল্লেখ আছে, তাহা যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, এবং তাহাতে কতক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং উহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে টলেমি (Ptolemy) ভারতের যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মপুত্র-তীরে অবস্থিত অ্যান্টিবোল (Antibol) নামক একটীস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড (Captain Wilford) এই অ্যান্টিবোলকে আধুনিক ফিরিঙ্গি-বাজার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁহার অনুমান সন্দেহ-জনক বলিয়া মনে হয়; কারণ, টলেমির বর্ণনার সহিত ফিরিঙ্গি-বাজারের কোনই সাদৃশ্য নাই। পরন্তু, ডাক্তার জেমস টেলর এই অ্যান্টিবোলকে এবং ভাওয়াল একই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)। ভাওয়ালের উত্তরস্থিত আঁটি (পরগণা) ভাওয়ালের সহিত সংযোগ করিলে, আঁটি ভাওয়াল হয়। এই আঁটি-ভাওয়াল এবং অ্যান্টিবোল একই স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমির বর্ণনানুযায়ী ভাওয়ালের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্ম-পুত্র নদ প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত, ভাওয়ালের সংস্কৃত নাম "অন্তমেল"। (৫) এই অন্তমেল হইতেই বোধ হয় আঁটি এবং ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। অন্তমেল, অ্যান্টিবোল এবং আঁটি-ভাওয়াল, ইহাদের মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। সুতরাং, টলেমির সময়েও, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, ভাওয়াল একজন বৈদেশিক ভ্রমণ-কারীর নিকটও ভারতের মধ্যে একটী উল্লেখ-যোগ্য স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

(4) Taylor's "Topography and Statis tics of Dacca." page. 111.

(5) I bid. Page 111.

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভাষা-তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রামকমল সেন মহাশয় তদ্রচিত অভিধানের (A Dictionary from Eng. to Beng.) ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ভাওয়ালে মহাভারত-বর্ণিত ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এবং তাঁহার মতে "ভগালয়" হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি।

অনেকের বিশ্বাস মোগল রাজত্ব-কালে ভাওয়াল গাজি হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। কিন্তু, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। হয় ত ভাওয়াল হইতেই উক্ত গাজির নাম ভাওয়াল গাজি হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ার সূক্ষ্ম বস্ত্র পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। কার্পাস হইতেই বোধ হয় কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি। কাপাসিয়ার নির্ম্মিত বহু সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বিদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক, এমন কি রোম (Rome) প্রভৃতি স্থানেও নীত হইত। রোমান পণ্ডিত প্লিনী (Pliny) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাপাসিয়া জাত সূক্ষ্ম বস্ত্রের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী রোমেও উহা ধনীর বিলাস-সামগ্রী বলিয়া আদৃত হইত। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভাওয়ালের শিল্প-কার্য্য সুবিখ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাঙ্ ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কামরূপ এবং সমতট রাজ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ভাওয়াল এই উভয় রাজ্যের মধ্য-বর্ত্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। বরাহ-মিহির আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গকে সমতট আখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। (৬)

প্রয়াগ স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তর-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গকে সমতট আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। (৭) কানিংহাম সাহেব (Sir Alexander Cun-

(6) Dr. Kern's "Brihat Samhita" XIV. 6.

(7) Journal of the Asiatic Society of Bengal. VI. 793

ningham) নানারূপ প্রমাণ সহ দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গকেই(Delta of the Ganges)হিউয়েন্থ সাঙ্ সমতট এবং টলেমী গাঙ্গে রিজিয়া (Gange Regia) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন (৮)। হিউয়েন্থ সাঙ্ এই প্রদেশে জাত পনস (কাঁঠাল) ফলের যে বর্ণনা দিয়াছেন, (৯) তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক; এবং উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিউয়েন্থ সাঙ্ ভাওয়াল-জাত পনসেরই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাওয়ালে যেরূপ প্রভূত পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট পনস জন্মে, অন্য কুত্রাপি তদ্রূপ জন্মে কি না জানি না। ভাওয়াল বোধ হয় এখনও এই জন্য বিখ্যাত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে. বহু বিদেশীয় লেখক এবং পরিব্রাজক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ হইতে ভাওয়াল সভ্য জগতে বিদিত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে নৃপতিগণের বিবরণ পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি. তাঁহারা দ্বিসহস্র না হইলেও, প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।

ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল, তালিপাবাদ পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে (গাজী বাড়ীতে) যশোপাল, এবং কাশীমপুর পরগণার অন্তর্গত সাভার কোটবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র পাল রাজত্ব করিতেন। পরে যথাক্রমে ইঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। এই নৃপতিগণ-সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা, ইঁহারা নীচবংশ-সম্ভূত এবং গৌড়ের পালরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ, কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ অবলম্বনে ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ বর্ণনা স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণ ভূঁইঞা (১০), আবার কাহারও মতে বানিয়া (১১) ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে। সাভারে মাহিষ্য জাতীয় কতিপয় ব্যক্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নিজেদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কোণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়কে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া

Line 19 of inscription.

(৮) Cunningham's "Ancient Geography of India." Page. 502, 3.

(৯) The panasa (pan—na—so) fruit, though plentiful, is highly esteemed. The fruit is as large as a pumpkin. When it is ripe, it is of a yellowish-red colour. When divided, it has in the middle many tens of little fruits of the size of a pigeon's egg; breaking these, there comes forth a juice of a yellowish-red colour and of delicious flavour. The fruit sometimes collects on the tree-branches, but sometimes at the tree roots as in the case of the earth growing fu-ling (the china root). Samuel Beal's "Buddhist Records of the Western world." Vol II P. 194.

(১০) "The Bhuiya, or Buddhist Rajas (Founders of the Pal dynasty of Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took their abode in this (Dacca) District, to the north of the Buriganga and Dhaleswari, where the sites of their Capitals are still to be seen. Jas Pal resided at Madhabpur in Talipabad, Haris Chandra at Katibari near Sabhar, and Sisu Pal at Capasia in Bhowal"—Mr. A.L. Clay's Reports (Quoted in Hunter's Statistical account of Bengal, Dacca).

(১১) (After Bikramadit) "The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Buddhist Rajas, who emigrated from the western side of India to perform a religious ceremony in one of the rivers lying to the east of the Ganges and who settled in Dinajpore, Rungpore, and several of the eastern districts. The date of the arrival of these chiefs is not known, but it is said to have been at a very remote period. * * * * * * * These Booneahs were the ancestors of the Pal-dynasty of the Kings of Bengal. * * * * * Three of the Booneah Rajas took up their abode in this (Dacca) district and in that portion of it lying to the

উল্লেখ করিয়াছেন (১২)। ইহাঁরা হরিশ্চন্দ্রকে আদি-পুরুষ করিয়া এক বংশাবলীও উপস্থিত করেন। বংশাবলী অনুসারে ভারতচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন অষ্টত্রিংশ পুরুষ। ইহাঁদের উক্তি অনুসারেও বংশাবলীখানা একশত বৎসরের অধিক কালের লিখিত নহে। অন্য কোনরূপ বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই বংশাবলী ঐতিহাসিক হিসাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, তাহা তাঁহার সদ্যঃ প্রাপ্ত ইষ্টকলিপি হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে সুতরাং তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি জীবিত থাকিলে পালের পরিবর্ত্তে রায় উপাধি ধারণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, হরিশ্চন্দ্র গৌড়ের পাল নৃপতিগণের বংশধর, তাহা পরে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। গৌড়ের পাল নৃপতিগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিলেন না, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময় হরিশ্চান্দ্রর বংশধরগণ সমাজের নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণসাপেক্ষ। সমাজ বিনাদোষে রাজবংশীয়গণকে এইরূপ নিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে, ইহাও বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, রাজা হরিশ্চন্দ্র কোন বংশীয় ছিলেন, তাহা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করা এখন দুঃসাধ্য। পালবংশীয় নৃপতিগণকে আবুল ফজল "কায়েত" (কায়স্থ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩)

---

north of Booriganga and Dulleswary, where the sitesd of their capitals are still to be seen. Jash Pal reside at Moodabpore in the pargannah of Talipabad, Harischandra at Catebury near Sabhar and Sisu Pal at Capasia in Bhowal" Taylor's Topog aphy and Statistics of Dacca.' Pp, 63, 64.

(১২) প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।

(১৩) "The family of Bhowpaul, of the Koyth (kayeth) caste, ten princes reigned 698 years"—Ayeen Akberi as translated by Francis Gladwin. Page 314.

যাহা হউক, হরিশ্চন্দ্রের জাতি-নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা এখন যথাক্রমে শিশু পাল, যশোপাল, এবং হরিশ্চন্দ্র পালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

শিশুপাল।

ভাওয়াল পরগণার বহুস্থানে ইষ্টকস্তূপ, মৃৎ-প্রাচীর বৃহদায়তন দীর্ঘিকা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহার অধিকাংশই শিশুপাল রাজার কীর্ত্তি-চিহ্ন, দেশ-প্রচলিত প্রবাদ এইরূপ। ভাওয়াল পরগণাস্থিত কাপাসিয়ার অন্তর্গত দুরদুরিয়া, কোট এবং দিঘলির ছিট নামক গ্রাম-সমূহেই শিশু পালের কীর্ত্তি-চিহ্ন বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

বঙ্গের স্বাধীন নৃপতিগণের ইতিহাসে একডালা দুর্গের বহু স্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একডালা গ্রামে বর্ণিত দুর্গের কিম্বা কোন রূপ প্রাচীন কীর্ত্তির কোন রূপ চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু এক ডালার ৮ মাইল উত্তরে কাপাসিয়ার অন্তর্গত দুরদুরিয়া গ্রামে উক্ত দুর্গের বহু চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। সুতরাং মনে হয়, ঐ স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ একডালার দুর্গ অবস্থিত ছিল।

দুরদুরিয়া গ্রাম বানার নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। ঠিক নদীতটেই একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং তাহার বিপরীত দিকে একটী গড়ের বহুচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই নগরী এবং দুর্গ উভয়ই শিশুপাল রাজার নির্ম্মিত, এইরূপ প্রবাদ। দুর্গ-নিম্নে বানার নদী পাঁচশত হস্তেরও অধিক বিস্তৃত ও অতিশয় গভীর, এবং পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় খরস্রোতা। নদীগর্ভ হইতে তটদেশ প্রাচীরের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে, এবং শীতকালে তটের প্রায় ৫০ফিট নিম্নে জল থাকে। সুতরাং তটদেশের উচ্চতা সহজেই অনুমেয়। বানার নদী দুর্গটীকে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়াছে। তটদেশে কঙ্করময় কঠিন লোহিত মৃত্তিকা। নদীতীর এবং দুর্গের চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত মৃৎ-প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকার এখনও প্রায় ১২।১৪ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। পশ্চিম দিকে দুর্গ-নিম্নেই বানার

নদী, এবং অপর তিন দিকে ঠিক দুর্গ প্রাকারের অব্যবহিত নিম্ন দিয়া প্রায় ৩০ ফিট প্রশস্ত পরিখা। পরিখার অনেক স্থান এখন ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান। দুর্গ-প্রাচীরের দৈর্ঘ্য দুই মাইলেরও অধিক। সুতরাং, অতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাকারে পাঁচটী প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোনটীতেই ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত থাকার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। দুর্গটীর অবস্থান এবং এইরূপ সুরক্ষিত স্থান-নির্ব্বাচন নির্ম্মাতার-রণ কৌশলের পরিচায়ক।

দুর্গ-প্রাকার-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে পুনরায় অন্য একটী স্থান প্রাচীর বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থিত। এই প্রাচীরেরও বহু চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে আবার একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের পরিবর্ত্তে এখন একটী লম্বা মৃৎস্তূপ এবং তদুপরি বহু ইষ্টক পতিত আছে; কোনও কোনও স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের ভিত্তিও দৃষ্ট হয়, প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার আর একটী পরিখা দৃষ্ট হয়, এবং বোধ হয় উক্ত ইষ্টক প্রাচীর উহারই এক অংশ যেন বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এই পরিখা নদীর সহিত সংযুক্ত এবং আনুমানিক প্রায় ৬০০ গজ লম্বা।

দুর্গের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীর এবং পরিখাবেষ্টিত স্থানটী বোধ হয় সুরক্ষিত রাজপুরী। এই পুরীর তিনটী প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়, এবং পুরীমধ্যে দুইটী অট্টালিকার চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। দুইটী উচ্চ স্তূপ প্রায় নদীতীরে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকস্থ স্তূপোপরি প্রায় বৃত্তাকার একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিত্তি দৃষ্ট হয়। উহা বোধ হয় পূর্ব্বে শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অত্যুচ্চ বুরুজ' (tower) ছিল। বুরুজের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান এবং প্রাচীরের চারি কোণে বোধ হয় চারিটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 'বুরুজ' (Bastions) ছিল। উহারও স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

উত্তর দিকস্থ স্তূপের ভিত্তিচিহ্ন-সমূহ স্পষ্ট নহে। দুইটী চতুষ্কোণ সমুন্নত স্থান উহাতে দৃষ্ট হয়; উহার অদূরে একটী দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। দীর্ঘিকা দুর্গ-পরিখার সহিত একটী অপ্রশস্ত খাল দ্বারা সংযুক্ত।

দুর্গমধ্যস্থ বিভিন্ন প্রাচীরের মধ্যস্থিত ভূভাগ-সমূহে বহু ইষ্টক এবং মৃত্তিকা-স্তূপ বর্ত্তমান, এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘিকার চিহ্নও দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত জলাশয় কালক্রমে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে স্তূপীকৃত এবং বিক্ষিপ্ত বহু ইষ্টক পড়িয়া আছে। নদীতীরে বহু মৃত্তিকা এবং ইষ্টক-স্তূপ দৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজপুরীর নানা অংশ বলিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হয়। দুর্গ এবং রাজপুরীর অনেক অংশ নদীর স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীনগণের উক্তি অনুসারে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে নদী অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল।

এই দুর্গ স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রাণীবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, শিশুপালবংশীয়া রাণী ভবানী ঐ দুর্গে বাস করিতেন; এবং মুসলমানগণ বোধ হয় (১২০৪ খৃষ্টাব্দে) ইঁহাকে পরাজিত করিয়াই শিশুপাল-রাজ্য জয় করেন। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোধ হয় এই দুর্গেই বঙ্গের দ্বিতীয় স্বাধীন মুসলমান নৃপতি ইলিয়াস সামসুদ্দিন্ সম্রাট ফিরোজ সাহ দ্বারা অবরুদ্ধ হন। অবরোধ-কালে ইলিয়াস সাহ্ ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ ত্যাগ করিয়া রাজা ভবানী নামক জনৈক দেশ বিখ্যাত সাধুর মৃতদেহের সৎকার কার্য্যের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছদ্মবেশে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। (১৪) এই রাজা ভবানী বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত রাণী ভবানীর কোন বংশধর।

দুর্গ জয়ে অসমর্থ সম্রাট ফিরোজ সাহ্ ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইলিয়াস সাহের পুত্র সেকেন্দর সাহের রাজত্ব-কালে সম্রাট কর্ত্তৃক পুনরায় এই দুর্গ আক্রান্ত হয়। এবারেও দুর্গজয়ে অসমর্থ সম্রাট

(১৪) Stewart's "History of Bengal".

অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দিন হোসেন বঙ্গদেশে অবস্থানকালে এই দুর্গেই তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফকির কুতুব্ আল্আলমের সিদ্ধ স্থান পাণ্ডুয়াতে প্রতি-বৎসর একবার পদব্রজে তীর্থ দর্শন করিতে আসিতেন,।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, শিশুপাল-নির্ম্মিত এই দুর্গ মুসলমান রাজত্বের সময়েও একডালা দুর্গ নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বানার নদীর পূর্ব্ব তীরে এই দুর্গ অবস্থিত। পশ্চিম তীরে ঠিক দুর্গের বিপরীত দিকে শিশুপাল প্রতিষ্ঠিত নগরের চিহ্নসমূহ বর্ত্তমান। অতি বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত ছিল। নদীতীরে এবং প্রাচীন নগরের সর্ব্বত্রই বহু ইষ্টক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। নদীতীর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দুইটী প্রকাণ্ড এবং অতি গভীর দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। উহারা উভয়ই শিশুপাল কর্ত্তৃক খনিত, এইরূপ জন প্রবাদ।

নদীতীরে শিশুপালের কাচারী বাড়ী অবস্থিত। এখন শুধু সেখানে একটী ইষ্টকবহুল মৃৎস্তূপ উহার অতীত জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাচারী বাড়ীর অদূরে দুর্গাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, এবং একটী মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়। মস্‌জিদটী প্রায় প্রস্তর-নির্ম্মিত; এবং সেখ আলার মস্‌জিদ্ নামে খ্যাত। খুব সম্ভবতঃ সুলতান আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে উক্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দুরদুরিয়ার (একডালা দুর্গের) পর টোকের নাম উল্লেখ যোগ্য। টোকেও শিশুপালের বহু কীর্ত্তি-চিহ্ন বর্ত্তমান। টোক কাপাসিয়ার অন্তর্গত এবং বানার ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থলের অদূরে বানার নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। টোক শিশুপালের রাজধানী (আধুনিক দীঘলির ছিট) হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, শিশুপালের প্রকৃত রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দীঘলির ছিট গ্রামে বিদ্যমান। দুরদুরিয়া কিংবা টোকে শিশুপালের রাজধানী ছিল না; এতদুভয় স্থানেই শিশুপালের দুর্গ এবং প্রতিষ্ঠিত নগর অবস্থিত ছিল।

টলেমি বর্ণিত টুগমা (Tugma,) দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব দেশীয় ভৌগোলিক অল এদ্রিসি (El Edrissi) বর্ণিত টক্কে (Tauke) এবং নবম শতাব্দীর মুসলমান পরিব্রাজকগণ বর্ণিত টফেক (Tafek) এবং শিশুপালের দুর্গ টোক একই স্থান বলিয়া টেলর অনুমান করিয়াছেন। (১৫) ক্যাপটেন উইলফোর্ড এবং ড্যানভিল (D'Anville) টুগমা প্রভৃতি স্থানকে অন্য স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এবিষয়ে—টেলরএর অনুমানই আমাদের নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং টোকের ঐতিহাসিকত্বও বহু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। টোকের অবস্থান অতি সুন্দর—ঠিক দুর্গের উপযোগী। এই স্থানে শিশুপালের দুর্গের বহু চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান, কিন্তু অতি নিবিড় বনাকীর্ণ এবং শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থান হওয়াতে সমস্ত প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন করা সম্ভবপর নহে।

টোক হইতে কয়েক মাইল দূরে দীঘলিয়ার ছিট নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামেই শিশুপালের রাজধানী ছিল এইরূপ জন-প্রবাদ। গ্রামটী ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশ-স্থিত এবং নিবিড় অরণ্যাবৃত। উহা এখন কালবশে শ্বাপদসকলের আবাসভূমি হইলেও, উহার স্থানে স্থানে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীরাদির জীর্ণ স্তূপ এবং শুষ্ক দীর্ঘিকা-নিচয় পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত করিয়া প্রবাদ-বাক্যের পোষকতা করিতেছে। দীঘলিয়ার ছিটে কয়েকটী ইষ্টক-বহুল মৃৎস্তূপ বর্ত্তমান, এবং উহার সান্নিধ্যে একটী সুবৃহৎ গভীর দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ঐ স্তূপগুলি রাজধানীর অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষ; এবং উক্ত দীর্ঘিকাটী শিশুপালের খনিত। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস, যে, ঐ স্থানে প্রভূত ধনসম্পত্তি স্তূপনিম্নে নিহিত আছে;

(১৫) Taylor'r "Topography and Statistics of Dacca." Page 116.

কিন্তু যক্ষের ধন বলিয়া কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে সাহসী হয় না। শিশুপালের বাড়ী অতি দুষ্প্রবেশ্য নিবিড় বনাকীর্ণ; কয়েকটী বনাবৃত বৃহৎ স্তূপ দূর হইতে দৃষ্ট হয়। দীঘলিয়ার ছিট আধুনিক নাম; রাজধানীর প্রাচীন নাম জানা যায় না।

গৌড়ের পাল রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে কাম্বোজ (নেপাল) বাসী কোনও ব্যক্তি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বিগ্রহ পালের রাজত্বের একাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং আধুনিক দিনাজপুরে এক জয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি," নিজের এই উপাধি উৎকীর্ণ করেন। সেই স্তম্ভলিপি এখনও বর্ত্তমান (১৬)। পুনরায় দুষ্কার্য্যরত দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্য বা দিব্বোক যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া বরেন্দ্র-ভূমি অধিকার করেন, এবং দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রের রাজপদে অভিষিক্ত হন; পরে বহু চেষ্টায় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম পাল যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করিয়া বিজিত রাজ্য পুনরধিকার করেন (১৭)। "ভীম রামপাল দেবের আক্রমণ বেগ প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্র মণ্ডলের প্রান্তভাগের নানা স্থানে যে সকল মৃৎ-প্রাকার রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহা এখনও "ভীমের ডাইঙ্গ" এবং—"ভীমের জাঙ্গাল নামে কথিত হইতেছে।" (১৮)

গৌড়ের পালরাজগণের রাজত্বকালে যেরূপ নানা নিম্নজাতীয় ব্যক্তির বিদ্রোহের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা তৎবংশধরগণের রাজত্বকালেও আমরা তদ্রূপ চণ্ডাল-বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনিতে পাই। শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব-সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক চণ্ডাল জাতীয় দুই ভ্রাতা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। রাজেন্দ্র পুরের সন্নিকটে, এবং আধুনিক জয়দেবপুরের ছয় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এখনও রাজাবাড়ীতে রাজবাটীর চিহ্ন-স্বরূপ প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ ও পরিখাদি দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানটী এখনও "চাড়াল রাজার বাড়ী" নামে খ্যাত। এই চণ্ডাল জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন।

প্রবাদ এই, তাঁহারা নীচজাতীয় বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেন না। ক্ষমতা-গর্ব্বিত চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয় বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গণকে স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইতে দৃঢ় সংকল্প করিয়া রাজ্যস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয় ভ্রাতার স্ত্রীই পরিবেশনার্থ অন্নপাত্রহস্তে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি জনৈক ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, আমরা রাজার অন্ন গ্রহণ করিব। উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রকৃত রাজা কে তাহা নির্ণীত হইল না, এবং এই সূত্রেই গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইয়া প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয়েই রাজ্যচ্যুত হইলেন। ব্রাহ্মণগণেরও জাতি নষ্ট হইল না। যুদ্ধে উভয় ভ্রাতাই প্রাণ হারাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। প্রতাপ ও প্রসন্নের মোগণী নাম্নী এক ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ এখন মোগণীর মঠ, নামে খ্যাত হইয়া চাঁড়াল রাজার বাড়ীর অদূরেই বর্ত্তমান।

খাইডা ডোক্কা নামক এক নিম্নজাতীয় রাজার নামও ভাওয়াল অঞ্চলে শ্রুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভাটের গানও এদেশে প্রচলিত আছে। এবং তাহাতে তিনি কায়েৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু জনশ্রুতি ও নাম পর্য্যালোচনায় ইনি যে তিব্বত দেশীয় ছিলেন, এইরূপই বোধ হয়। খাইডা ডোক্কা কায়স্থ জাতির সহিত

(১৬) "গৌড়রাজমালা" ৩৭ পৃঃ।

(১৭) সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "রাম চরিতম্"। (Edited by Mahamohopadhaya H. P. Sastri)

(১৮) "গৌড়রাজমালার" উপক্রমণিকা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—।৹ পৃষ্ঠা।

মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ভাট পরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। (১০)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "খাইডা ডোস্কা" সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সেন মহাশয় বোধ হয় অবগত আছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডকে খাইডা এবং স্থূলকায়কে ডোস্কা অথবা ঢোস্কা বলিয়া থাকে। হয়ত নৃপতি অত্যন্ত স্থূলদেহ হওয়াতে লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে খাইডা ডোস্কা বলিত এবং ক্রমে সেই নামই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত নৃপতি তিব্বত দেশীয়, অথবা বিদেশাগত এরূপও কোন প্রবাদ নাই। সুতরাং, বিনা কারণে পূর্ব্বোক্ত রূপ সিদ্ধান্ত করা আমরা সমীচীন বোধ করি না। তবে, খাইডা ডোস্কা নৃপতি যে নিম্নজাতীয় ছিলেন, তাহা তাঁহার ঐ অদ্ভুত নাম শ্রবণেই প্রতীয়মান হয়।

শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহার রাজত্ব কালে এই দেশে এই সমস্ত নিম্ন জাতীয় ব্যক্তি-গণের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

পূর্ব্বে শিশুপালের যে সমস্ত কীর্ত্তি-চিহ্নের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত ভাওয়ালের আরও বহু স্থানে এই নৃপতির কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। কিন্তু, ঐ সমস্ত স্থান অধিকাংশই নিবিড় বনাবৃত হওয়াতে অতিশয় দুর্গম; সুতরাং সমস্ত স্থানের সন্ধান পাওয়াও দুঃসাধ্য।

যশোপাল।

যশোপাল রাজার কীর্ত্তি-চিহ্নাদি মাধবপুর এবং তৎসন্নিহিত বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান রাজত্ব-কালে মাধবপুরের নাম গাজীবাড়ী হইয়াছে, এবং অদ্যাপি ঐ গ্রাম উক্ত নামেই পরিচিত। যশোপালের গৃহদেবতা মাধবের নামানুসারেই বোধ হয় যশোপালের রাজধানীর নাম মাধবপুর হইয়াছিল। এই বিগ্রহের বিবরণ পরে উক্ত হইবে।

(১০) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন: প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।

গাজীবাড়ী গ্রাম চাঁদপ্রতাপ ও তালিপাবাদ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত; বোধ হয়, উহা চাঁদপ্রতাপ পরগণারই অন্তর্ভুক্ত। গাজীবাড়ী গাজীখালি নামক নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে উহার নাম কানাই নদী ছিল।

রেনেলের মানচিত্র, এবং টেলর সাহেবের "টপোগ্রাফি" পুস্তক সংলগ্ন মানচিত্রে উহার কানাই নামই লিখিত আছে। গাজীখালির পূর্ব্বদিকে নদীতীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যশোপালের বড় দীঘি ও ছোট দীঘি নামে খ্যাত দুইটী বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান (৩ ও ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। উভয় দীর্ঘিকাই "জান" (সংযোজক পয়ঃ প্রণালী) দ্বারা একটী বিলের সহিত সংযুক্ত। শীতকালেও উভয় দীর্ঘিকাতে গভীর জল থাকে। উভয় দীর্ঘিকাই উত্তর দক্ষিণে খোদিত ও পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত; এবং উভয়ের পরস্পর ব্যবধান বোধ হয় ৪০০ গজের অধিক হইবে না। বড় দীঘি ও ছোট দীঘি এতদুভয়ই আনুমানিক এক খাদা (১৭৫ হাত × ২০০ হাত) পরিমাণ বিস্তৃত। বড় দীঘিতে বাঁধান ঘাটের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, বোধ হয় কাল-বশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ছোট দীঘির উত্তর তটে এখনও ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের সুস্পষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বড় দীঘি ও ছোট দীঘি আধুনিক নাম, দীর্ঘিকা-দ্বয়ের প্রাচীন নাম জানা যায় না

দীর্ঘিকাদ্বয়ের উত্তর তটে এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত [৫নং, মানচিত্র দ্রষ্টব্য]। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল; গ্রামস্থ বহু প্রাচীন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঐ সমস্ত গ্রামে বসতি হওয়াতে গ্রামবাসিগণ ক্রমে তাহা সমতল করিয়া ফেলিয়াছে। যে স্থানে বাটী অবস্থিত ছিল, তথায় অদ্যাপি বহু ইষ্টক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। কৃষকগণ বলিল যে, ইষ্টকের পরিমাণ এত অধিক যে তথায় হলচালন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। গ্রামবাসীগণ রাজবাটীতে একটী ইষ্টকে বাঁধান বৃত্তাকার ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা প্রদর্শন করিয়া বলিল যে, প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি মৃত্তিকা খননকালে ঐ স্থানে পাত্রপূর্ণ

বহু সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারীও ঐ উক্তি সমর্থন করাতে উহা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হইল। যে ব্যক্তি ঐ গুপ্ত ধন পাইয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এবং বহু পুরস্কার ঘোষণা করা সত্বেও উহার একটী মুদ্রাও কেহ দিতে পারিল না। ঐ মুদ্রা পাওয়া গেলে হয় ত যশোপাল রাজার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের অনেক সহায়তা হইত। উক্ত ইষ্টকনির্ম্মিত চৌবাচ্চাটীর ইষ্টকগুলি এত পুরাতন, যে সামান্য অঙ্গুলির চাপেই উহা একেবারে গুঁড়া হইয়া যাইতে লাগিল।

রাজবাটীর চতুর্দ্দিকই সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত। বাটীর দক্ষিণ দিকে বহুদূরব্যাপী বিল (জলাকীর্ণ স্থান) এবং অপর তিন দিকেই পরিখার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বড় দীঘির অব্যবহিত পশ্চিম হইতে পরিখা আরম্ভ হইয়া বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করতঃ, ছোট দীঘির অব্যবহিত পূর্ব্ব দিক দিয়া বিলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরিখার অপর দিকও বিলের সহিত সংযুক্ত। পশ্চিম দিকের এবং উত্তর দিকের পরিখায় বর্ষাকালে জল থাকে। উত্তর দিকের কিয়দংশ অনেক পরিমাণে ভরিয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র বাইদ্ (সজল নিম্নভূমি) রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকের পরিখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু, এখনও উহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। পরিখার পার্শ্বে স্থানে স্থানে মৃৎপ্রাকারের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

যশোপালের বাটীর পশ্চিম দিকস্থ পরিখা হইতে অনুমান অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে গাঙ্গীখালি (কানাই) নদী প্রবাহিত। গাঙ্গীখালির পশ্চিম তীরে মাধব-চালা বা মাধব টেক্ অবস্থিত; মাধব চালার দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বোক্ত বিস্তৃত বিল। এই মাধবচালার প্রসঙ্গে এ স্থানের যশোপালের গৃহদেবতা মাধবের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দেশপ্রচলিত প্রবাদ এই, একদা যশোপাল নৃপতি হস্তীপৃষ্ঠে কোনও স্থানে যাইতে ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অদূরেই একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তী হঠাৎ ভয়চকিত ভাবে দণ্ডায়মান হইল, শত অঙ্কুশপ্রহারেও অগ্রসর হইল না, এবং শুণ্ড উত্তোলন করিয়া একটী স্থান পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিতে লাগিল! সুশিক্ষিত হস্তীর ঈদৃশ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া রাজা ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন। বহুদূর খনন করিলে, একটী মন্দিরের কিয়দংশ এবং মাধবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তখন হঠাৎ দৈববাণী হয় যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। ভক্ত নৃপতি ইহাতে বিচলিত হইলেন না; পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক সম্পদকেই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া যশোপাল মাধবকে ঐ স্থান হইতে উত্তোলিত করিলেন, এবং ঐ স্থানে প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মাধবকে স্থাপিত করিলেন। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্ত্তটী এখনও বিদ্যমান, এবং মাধবের চৌবাচ্চা নামে খ্যাত [৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। উহা একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায় এবং প্রায় ২৫ হাত লম্বা ও ২০ হাত প্রশস্ত। যশোপাল যে স্থানে মাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, সেই স্থান এখন মাধব চালা অথবা মাধব টেক্ নামে খ্যাত, এবং তাহারই মধ্যে মাধবের চৌবাচ্চা অবস্থিত। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন বর্ত্তমান নাই, কিন্তু সমস্ত টেক্‌টীতে (উচ্চ ভূমি) বহু ইষ্টক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত থাকিয়া অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দৈববাণী কার্য্যে পরিণত হইয়া যশোপাল নির্ব্বংশ হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইল। ভক্তের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাধব তদবধি নিজ নামের পূর্ব্বে ভক্তের নাম সংযোগ করিয়া 'যশোমাধব' নামে খ্যাত হইলেন। যশোপালের রাজ্যবিনাশের পর তাঁহার রাজধানীও ক্রমে জনশূন্য হইয়া গেল। মাধব বোধ হয় অনাদৃত অবস্থাতেই তথায় অনির্দ্দিষ্ট কাল অবস্থান করেন। পরে স্থানীয় জনৈক জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ রায় জঙ্গল মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ

জনৈক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা ধামরাইর পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চাশ নামক পল্লীবাসী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামজীবন রায় মৌলিককে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ (?) উক্ত মূর্ত্তি দান করেন। তদবধি মাধব, যশোমাধব নামে ধামরাই গ্রামে উক্ত মৌলিক বংশেই প্রতিষ্ঠিত আছেন [৭নং মাধব মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য]। মৌলিক মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ১৭৭৯ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৬০৩) মাধব মূর্ত্তি তাঁহাদের হস্তগত হয়। (২০)

কাহারও কাহারও মতে পূর্ব্বোক্ত মৌলিক মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বনভূমি হইতে মাধবকে তুলিয়া নিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাধবের নামে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে; তদ্দ্বারা প্রত্যহ মাধবের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। ধামরাইর মাধবের রথ-যাত্রা দেশ-বিখ্যাত ঐ সময়ে ধামরাইতে প্রায় লক্ষ লোক সমবেত হয়। বিচিত্র বসনভূষণও প্রভৃত স্বর্ণালঙ্কার-সজ্জিত মাধবমূর্ত্তি বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি এতদ্দেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

মাধব সম্বন্ধে আরও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মাধবমূর্ত্তি নিম্বকাষ্ঠনির্ম্মিত এবং নবজলধরশ্যামবর্ণ। কথিত আছে, যে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা শ্রীক্ষেত্রধামের জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাহারই অবশিষ্টাংশ দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা মাধব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে ভীত হইয়া মাধব সস্ত্রীক পূর্ব্ববর্ণিত স্থানে মৃত্তিকা-নিম্নে অবস্থান করেন এবং তথা হইতেই যশোপাল নৃপতি তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, মাধব-প্রতিষ্ঠার পর যশোপালের উপর স্বপ্নাদেশ হয় যে, মাধবের স্ত্রী তখনও সেই গর্ত্ত মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। যশোপালের আদেশে পুনরায় সেই গর্ত্ত খননকালে খননকারীদের অনবধানতা বশতঃ খনিত্রের আঘাতে মাধবের স্ত্রীর নাসিকা ভগ্ন হইয়া যায়। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপ্রোথিতা হইলেন, বহু চেষ্টাতেও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

কথা প্রসঙ্গে যশোমাধবের প্রতিষ্ঠা-স্থান ধামারাই গ্রামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দু একটী কথা বোধ হয় এ স্থানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় ধামরাই সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যাহার সমর্থন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

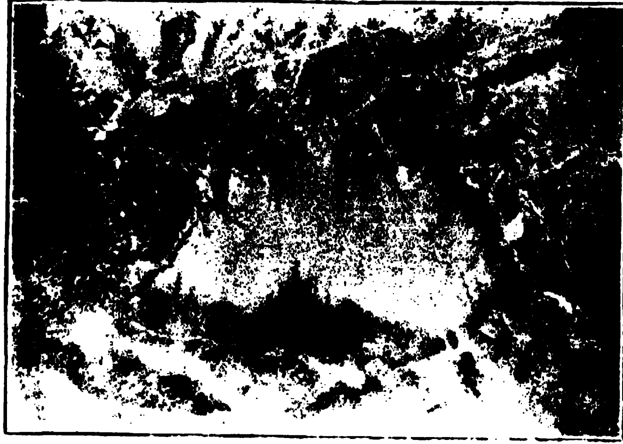
বসু মহাশয় বলিতেছেন,—"বহু দিবস হইল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ধামরাই নামক প্রাচীন গ্রামের নাম শুনিয়া তৎকালে বলিয়াছিলাম, যেঐ স্থান ধর্ম্মরাজিকা শব্দের অপভ্রংশ। মৌর্য্য সম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা 'প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে অশোকাবদান হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি। 'অশোকো নামা রাজা বভূবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্ম্মরাজিকাসহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্য যশঃ স্থাস্যীৎ।"

বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন একখানি প্রাচীন দলিলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। "সম্প্রতি ধামরাই বাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যা প্রসাদ বসু, বি, এল্ মহাশয় একখানি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দলিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্ম্মরাজিই ছিল। ধর্ম্মরাজি চলিত ভাষায় ধামরাই হইয়াছে। উক্ত অশোকাবদান হইতে জানিতে পারি যে, সম্রাট অশোক যে সকল ধর্ম্ম-রাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, পুষ্যমিত্র সেই সকল ধ্বংস করেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্ম্মরাজিকা ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্ম্মরাজিকা নামকরণ হইয়া থাকিবে। (২১)

যশোপালের রাজধানী মাধবপুর (গাজীবাড়ী) এবং মাধব মন্দির (আধুনিক মাধব চালা) হইতে কিয়দ্দূরে বাইদগাও নামক গ্রামে জীয়ন পুষ্করিণী নামে একটী দীর্ঘিকা

(২০) শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধ—প্রতিভা শ্রাবণ, ১৩১৯।

(২১) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।



৬নং, মাধবের চৌবাচ্চা।



৭নং, ধামরাইর শ্রীশ্রীযশোমাধব।

E. B. P. & P. House, Dacca

আছে। সাধারণের বিশ্বাস, যে গাভী অতি অল্প পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে, তাহার কিঞ্চিৎ জীয়স পুষ্করিণীতে দিলে গাভী দুগ্ধবতী হয়। উক্ত জলাশয়ের আরও বহু দৈবী ক্ষমতার নানাবিধ গল্প সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। জীয়স নামধেয় বহু পুষ্করিণী বঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, ঐ জলাশয়-সমূহে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মের কোনরূপ প্রক্রিয়াদি সাধিত হইত। (২২) এই অনুমানের কোন কারণ তিনি উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক প্রবাদ এই যে, বাইদগাও গ্রামস্থ জীয়স পুষ্করিণী যশোপালের খনিত।

বাইদগাওর সন্নিকটে কাউইনদিয়ার দীঘি নামক আর একটি অতি বৃহৎ জলাশয় বর্ত্তমান। কাউইনদিয়া গ্রামের নামানুসারেই উক্ত দীর্ঘিকার নাম হইয়াছে। উহার প্রাচীন নাম জানা যায় না। এই দীর্ঘিকাটি যশোপালের রাজধানীস্থিত বড়দীঘি ও ছোটদীঘি হইতেও বৃহত্তর, প্রায় উহাদের দ্বিগুণ হইবে। এই জলাশয়ও যশোপালের খনিত এইরূপ প্রবাদ।

মাধবপুরের সন্নিকটে গণকপাড়া গ্রাম বর্ত্তমান। গণকপাড়া এবং গুড়িয়াপাড়া রেণেলের (Rennel) মানচিত্রে বৃহৎ এবং বিখ্যাত স্থান বলিয়া চিহ্নিত। এই গ্রামদ্বয়েও যশোপালের বহু কীর্ত্তিচিহ্নাদি ছিল। নদীর গতি এই স্থানে বহু পরিবর্ত্তিত হওয়াতে উহার প্রায় সমস্তই নদীস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। টেলর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েরও কতিপয়বর্ষ পূর্ব্বে গুড়িয়াপাড়াতে দুর্গপ্রাকার সমূহের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। (২৩) টেলরের সময়ের পূর্ব্বেই তাহা নদীকবলিত হয়। প্রবাদ এই, গ্রামদ্বয়ে রাজগণকগণ বাস করিতেন, এবং এখানেও যশোপালের রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। এখনও এস্থান বহু ইষ্টকাদি এবং সময়ে সময়ে নানা কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টকও দৃষ্ট হয়। (পরসংখ্যায় প্রকাশিতব্য সাভার হইতে সংগৃহীত ইষ্টক-সমূহের চিত্র দ্রষ্টব্য)

হিন্দু রাজত্বের অবসানের পরও এইস্থান সুবিখ্যাত ছিল। বঙ্গের পাঠান নৃপতিগণ মোগল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই প্রদেশেই বহুদিন লুক্কায়িত থাকেন, এবং তখন তাঁহারা গণকপাড়াতে দুর্গ এবং বাসভবনাদি নির্ম্মাণ করেন। ধামরাইর নিকটে পাঠানতলি নামক গ্রাম এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, ইসলাম খাঁ যখন বঙ্গের রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন তিনি গণকপাড়াতেই বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু উহা নিম্নভূমি এবং অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত হয় (২৪)। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, ইসলাম খাঁর পূর্ব্বেও, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই গণকপাড়া সুবিখ্যাত স্থান ছিল, নচেৎ এ স্থানে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়া অসম্ভব।

গড় কাশীমপুর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত জরুন এবং সুরাবাড়ী নামক পল্লীদ্বয়ে যশোপালের কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

জরুন গ্রামে কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটি প্রাচীর দৃষ্ট হয়। পরে আরও বিস্তৃত ভাবে ঐ স্থান খনন করাতে বহু অট্টালিকার চিহ্নাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রবাদ এই, ঐ স্থানে যশোপালের বাসভবনাদি ছিল।

কালবশে উহা ভূ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সুরাবাড়ী গ্রামেও ৪।৫ মাস পূর্ব্বে মৃত্তিকা খননকালে একটি অট্টালিকার ভূপ্রোথিত ভগ্নাবশেষ বহির্গত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপাল, যশোপাল, শিশুপাল, প্রভৃতি পাল রাজগণের যে সমস্ত কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্ত স্থানেরই ইষ্টক সমূহ দুর্গ প্রাকার, এবং পরিখা প্রভৃতিতে অত্যাশ্চর্য্য

(২২) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।

(23) Taylor's Topography & Statistics of Dacca. Page 117.

(24) Ibid. Page 114.

সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সুরাবাড়ী ... সাভার প্রভৃতি সমস্ত ...া, জরুন, মাধবপুর, একডালা, সমস্ত স্থানের ... স্থানই আমি দর্শন করিয়াছি, এবং কিছু ... ইষ্টকাদিই আমার নিকট সংগৃহীত আছে, ...াহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত বড়ইবাড়ী গ্রামে যশোপালের বহু কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। এ স্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়ইবাড়ী গ্রামটি তুরাগ নদীর উপর অবস্থিত, নদীতীর হইতে বর্ত্তমান বড়ইবাড়ী গ্রাম প্রায় এক মাইল উত্তর দিকে। গ্রামের উত্তরে একটি সমুন্নত ভূমিখণ্ডের উপর যশোপালের কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। ঢোল সমুদ্র সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এরূপ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা এ অঞ্চলে অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রায় তিন খাদা ভূমির উপর এই সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা বিরাজমান। ইহার গভীরতাও সুপ্রসিদ্ধ; শীত কালেও ইহাতে প্রায় ১৫।২০ হাত জল থাকে। কথিত আছে যে, দীর্ঘিকার নিম্ন হইতে ঢোল বাজাইলে উপর হইতে তাহার শব্দ শুনা না যায়, যশোপাল নৃপতি এইরূপ গভীর করিয়া এই দীর্ঘিকা খনন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে ইহার নাম ঢোল সমুদ্র হইয়াছে। এই প্রবাদ-বাক্য মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। কিরূপ গভীর করিয়া খনন করিলে জীর্ণ সংস্কার ব্যতীতও, খননের প্রায় সহস্র বৎসর পরে শীত কালে দীর্ঘিকাতে ১৫।২০ হাত জল থাকিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঢোল সমুদ্রের উত্তর ও পশ্চিম দিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ঢোল সমুদ্র হইতে অনতিদূরে কোটামণি নামক আর একটী দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। ইহা ঢোল সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ না হইলেও ক্ষুদ্র নহে। ইহাও প্রায় এক খাদা ভূমির উপর খনিত। কোটামণির পশ্চিম দিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্ত্তমান। এই জলাশয়ের পশ্চিম তটে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে বহু ইষ্টক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি ভগ্ন স্তূপ আছে; উহার ব্যাস প্রায় ১০।১২ হাত। শুনা যায়, রাজবাটীর সন্নিহিত স্থলে হল-চালনা কালে কৃষকগণ প্রাচীন মুদ্রাদি, এবং ইষ্টক অথবা প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানেও বড়ইবাড়ী হইতে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

রাজবাটীর অভ্যন্তরে কোটামণি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আর একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। উহা রাজান্তঃপুরান্তবর্ত্তী ছিল, এইরূপ প্রবাদ, এতদ্ব্যতীত বড়ইবাড়ীতে আর একটি পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে; তাহাও বেশী বড় নহে। ঐ জলাশয়ে রাজার হস্তী স্নান করান হইত, এইরূপ জনশ্রুতি।

বড়ইবাড়ী হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তরে জাঠিলিয়া গ্রামে যশোপাল-খনিত আর একটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। উহাতেও একটি বাঁধান ঘাটের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান।

জাঠিলিয়া হইতে কয়েক মাইল উত্তরে বক্ষুরি নামক গ্রাম। এখানেও যশোপালের বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। রাজবাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দুইটি দীর্ঘিকা আছে, এবং তাহাতে বাঁধান ঘাটের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলে যশোপাল রাজার কীর্ত্তি-চিহ্নাদির বিবরণ আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উপরে তাহা বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত অরণ্যাভ্যন্তরে হয় ত আরও বহু ধ্বংস-চিহ্নাদি বর্ত্তমান আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

প্রকাশ্যে

[বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে, চট্টগ্রামে কর্ণফুলির সাগর-সঙ্গমে যে জলস্তম্ভ দৃষ্ট হইয়াছিল পরীশৈল হইতে তদ্দর্শনে বিরচিত]

১

'ওগো মেঘ, ওগো শ্যামসুন্দর,
স্নিগ্ধ-গভীর গর্জ্জন,
ঘন চিক্কণ, পুষ্কর-সুত
চিত্ত-অতল-মন্থন।
উচ্ছ্বাস উঠে হৃদি অঞ্চলে
গম্ভীর তব ছন্দে ;
নব-রোমাঞ্চে এ'তনু তরলে,
নিবেদিত হয়ে নন্দে'।
এস এস বঁধু, হৃদয় আসনে
বৈদ্যুতী তব বহিয়া
উৎকল এই হিয়া-উল্লাসে
হৃদয়ে লহ গো ঝাঁপিয়া!'

২

নামি' এল মেঘ কানফুলী বুকে
মন্থর ধীর গরবে,
কুল কৌলিন্য বৃংহিত যার
বঙ্গসাগর গরভে!
এল গর্ব্বিত দিগ্‌গজ সম
আস্ফালি' মহা শুণ্ডে—
সাগর-বপ্রে কুর্দ্দন- জাত
মৃত্তির ভরা তুণ্ডে!
ভীত উৎসুক বিশ্ব-নেত্র
স্তম্ভিত রহে লক্ষি'
নদীর বক্ষে নামিছে ও কি ও'
—কালো গজরাজ পক্ষী!

৩

ফুলিয়া উঠিল তটিনী-বক্ষ
উচ্ছ্বাসি ঘন সঘনে!
ছুটে ঘনায়িত তড়িত-জড়িত
পিচকারী যেন গগনে!
মস্থিত ব্যোমকন্দর হতে
মন্দরে কিগো সিন্ধু—
ফেণ-ফণাকুল লিহ লিহ করি'
উগরে অর্ণ-বিন্দু!
পূর্ব্বে পাহাড় পছিমে সিন্ধু
নেহারে মুগ্ধ নয়নে—
নদী উধা'ইছে হিয়া-উচ্ছ্বাসে
প্রকাশ্যে ও কি গগনে!

৪

লক-লকি উঠে সলিল ধমনী
স্তম্ভ আকারে ছাপিয়া!
দিকে দিকে উঠে নিসর্গ মুখ
বাষ্প বসনে ঝাঁপিয়া!
কে তুমি—কে তুমি বর্ষা বাসরে
বিরঙ্গে আজি খেলিছ?
জল-কুণ্ডলী চুমুকে উর্দ্ধে
প্রাণ শুড়ঙ্গে পুরিছ?
ধরা ধমনীরে উর্দ্ধ আকাশে
ঘন চুম্বনে টানিয়া
কে লইছ তুমি? বরষিতে পুনঃ
সলিল-সত্রে ঢালিয়া?

৫

দ্যুলোকে-ভুলোকে নেত্র সমুখে
প্রণয়ের চির কাহিনী
অ-তনু আবেগে জগতের তনু
উল্লাসে দিবা যামিনী
বিশ্ব ভুবনে প্রকাশে-গোপনে
প্রেমেরি প্রতিমা বারতা ;
এ' উহারে টানে আপনার বুকে
প্রকাশি মর্ম্ম-মমতা'

আপনার বুকে ডাকিয়া ঊর্দ্ধে
সৃষ্টি শিহরে হর্ষে;
এক গুণে লয়ে ঊর্দ্ধ পুন সে
ভাণ্ডার ভাঙি বর্ষে!

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

নামিকো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে নামির ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। শীঘ্রই সে আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু একদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত শ্বাশুড়ীর পোশাক সেলাই করিয়া আবার সে পীড়িত হইয়া পড়িল। আজ মাসের পনেরই, আজও সে শয্যাশায়িনী।

প্রতি বৎসরই শীতের সময় লোকে বলে যে এবারকার মত শীত আর কখনো হয় নাই; কিন্তু এ বৎসর তাহাদের মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না; প্রতিদিন কন্‌কনে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল, তুষার ও বৃষ্টিপাত হইতেছিল—পরিষ্কার দিনেও শীতে হাড় পর্য্যন্ত কম্পমান। বলিষ্ঠ লোকেরা পীড়িত হইয়া পড়িল, দুর্ব্বলেরা মরিতে লাগিল—সংবাদ পত্রে মৃত্যুর সংবাদ যথেষ্ট বাহির হইতেছিল। নামি বলিষ্ঠ ছিল না, শীতের জন্য সে সারিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; বিশেষ কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও মাথা ভার, ক্ষুধার লেশমাত্র নাই, এই অবস্থায় মন্থর ভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

ঘড়িতে সেই মাত্র দুইটা বাজিয়াছে। বাজার শব্দ মিলাইয়া গেলে কিছু কালের জন্য সমস্তই নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘড়ির মৃদু টিক্ টিক্ শব্দ নিস্তব্ধতা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। বড় সুন্দর; নবীন বসন্ত কালের নীলিমা চারিখানি কাগজের পর্দ্দার অন্তরালে ঢাকা পড়িলেও, সূর্য্যের মৃদু আলোকে তাহাদের উপর উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। নামি শুইয়া শুইয়া একটি কালো মোজা বুনিতেছিল; তাহার চপল অঙ্গুলির চারিদিকে ও তুষার শুভ্র বালিসের উপর অযত্নে ছড়ানো মসৃণ চুলের উপর কয়েকটা অদৃশ্য আলোকের রশ্মি যেন নাচিয়া বেড়াইতেছিল। বাম দিকে পর্দ্দার উপর রঙীন পাতার ক্ষীণ ছায়া একটি পিতলের পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; দক্ষিণে একটি স্থূলকাণ্ড পুরাতন প্লাম গাছের ছায়া সুস্পষ্ট দেখা যায়, উহার নগ্ন শাখাগুলি কোলাকুলি করিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর সামান্য দুই চারিটা ফুল বসন্ত যে এখনো নিতান্ত অপরিণত তাহাই জানাইতেছিল। পর্দ্দার মাথায় তক্তাখানির উপর রৌদ্র পোহাইতে ব্যস্ত বিড়াল শিশুর ক্ষুদ্র মস্তকের ছায়া পরিয়াছে। সূর্য্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া একটি পতঙ্গ আসিয়াছিল, উহাকে ধরিবার জন্য বিড়ালটি লাফাইয়া উঠিল, ধরিতে না পারিয়া মেজের উপর চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার যেন খেয়াল নাই, যেন সে থাবাগুলি চাটিতে চাটিতে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মস্তকের প্রতিবিম্বটি কেবলি নড়িতেছে। নামি কাগজের উপরকার ছায়ার সমস্ত ঘটনাটি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, তার পর, চোখ টাটাইয়া উঠিয়াছিল তাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। তার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত মোজাটা এক বার থাবড়াইয়া লইল, সূঁচগুলা আবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

বারান্দার উপর গুরু পদশব্দ শুনা গেল, একটি স্থূল মনুষ্যমূর্ত্তির বেঁটে ছায়া কাগজের পর্দ্দার গায়ে গায়ে চলিতেছিল। অবিলম্বেই ছায়াটি থামিল, কাওয়াষিমা গৃহিণী প্রকাশিত হইলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানার ধারে বসিলেন।

"আজ কেমন আছ?"

"অনেক ভালো, মা, উঠিতে পারি কিন্তু—"

কাজ রাখিয়া পরিধেয় বসন গুছাইয়া নামি উঠিয়া বসিতে গেল, বৃদ্ধা নিবারণ করিলেন।

"না, না ও রকম করো না। আমি ত আর বারের লোক নই, আমি এলুম বলে কিছু করতে হবে না। এই যে আবার তুমি বুনছিলে! ওটাও আর করতে পারবে না। অসুখ হলে নিজের যত্ন ছাড়া আর কিছু করতে নেই। তাকেওর জন্য এ সব ভুলে গেলে ত চলবে না, নামি। সাবধানে থেকে শীগ্‌গির সেরে ওঠো বাছা—"

"এই অনেক দিন থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি তাই--" "এমনি করে কি মা'র সঙ্গে কথা কয়? আমি এ রকম ভালোবাসি না। তুমি যেন ভারি দুরে দুরে থাক।"

বৃদ্ধার মনে যাহা ছিল সমস্ত বলিলেন না। তিনি বলিতেন আজ কালকার বধূরা শাশুড়ীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা করে না। নামির অন্তত একটি গুণ তিনি স্বীকার করিতেন তাহার এ দোষ লেশ মাত্র ছিল না। কিন্তু আজ তিনি অন্য কিছু ভাবিতেছিলেন; হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তাকেওর চিঠি পেয়েছ, না? কি লিখেচে?"

নামি বালিসের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল, খানিকটা অংশ তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল. "আসচে শনিবার আসবেন লিখেচেন।"

"তাই নাকি?"

চিঠিখানির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বৃদ্ধা উহা ফেরত দিলেন। "হ্যাঁ, তোমাকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবে, এ সব কথা কি লিখেচে। এই শীতের সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তোমার শরীর ভালো থাকলেও অসুখ হয়ে পড়বে। চুপ করে শুয়ে থাকলে সর্দ্দিকাসি শীগ্‌গিরই সেরে যায়। তাকেও ছেলেমানুষ কি না তাই একেবারে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে; ডাক্তার ডাকান, হাওয়া খেতে যাওয়া এই সব কথা বলে। ছেলেবেলায় অল্পস্বল্প অসুখে আমি কখনও বিছানায় শুই নি, যখন ছেলে হলো তখনো দশ দিনের বেশ শুই নি। তাকেওকে লেখো তোমার জন্য যেন না ভাবে. আমি ত এখানে রয়েছি।"

বৃদ্ধা হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দেখিয়া তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল। যখন তিনি বাহির হইয়া গেলেন নামি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "মাপ করবেন, উঠতে পারলুম না।" তারপর সে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

মাতা যে পুত্রের পত্নীর উপর ঈর্ষান্বিতা হইতে পারে এ কথা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করে! কিন্তু পতির প্রত্যাবর্ত্তনের পর সে দেখিয়াছে, তাহার ও শাশুড়ীর মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাকেও দেখিল নামির স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতির সময় ভাবিয়া ভাবিয়াই যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! পত্নীর প্রতি স্নেহ ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পতির সোহাগ যত্নে নামির সুখের আর অন্ত রহিল না, কিন্তু শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী ঈর্ষান্বিতা হইতেছেন মনে করিয়া সে চিন্তিত হইয়া উঠিল। এমন স্বামিকে ভালবাসিয়া ও তাঁহার ভালবাসা পাইয়া আবার তাকেওর মাতার ন্যায় শ্বাশুড়ীর তুষ্টিসাধনে যত্নবান হওয়া—এ কী বিড়ম্বনা!

"কাতো-সান আপনাকে দেখতে এসেছে।"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া নামি চক্ষু মেলিল। অভ্যাগতকে দেখিয়া মুখখানি তার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"এই যে ওচিজু-সান! বেশ করেচ ভাই এসেচ।"

"আজকে কি একটু ভালো বোধ হচ্ছে?"

রেশমী হাত-ব্যাগ ও ক্রেপের মস্তকাবরণটি এক পাশে রাখিয়া শিমাদা-খোঁপা-বাঁধা একটি সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা নামির বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার কৃশ তনু কালো ওভারকোটে ঢাকা, সুগঠিত ভ্রূযুগলের নীচে কালো চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে চিজু-কাতো, নামির মাসিমা ব্যারণেশ কাতোর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

শৈশব হইতেই, যখন তাহারা কিণ্ডারগার্টেন পড়িত, নামি ও চিজুর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। নামির ছোট বোন বেচারি কোমা প্রায়ই অভিযোগ করিত, তাহার একটিও খেলার সঙ্গী নাই। নামির বিবাহের পর ইস্কুলের সঙ্গীরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, রহিল কেবল চিজু। সে নামিদের বাড়ীর নিকটেই থাকিত; প্রায়ই সে নামির সহিত দেখা করিতে আসিত। তাকেওর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি কালে দুঃখভারপীড়িত নামির নিঃসঙ্গ জীবন যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাকেওর প্রেমপূর্ণ পত্র ও চিজুর আগমনেই তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিত।

ঈষৎ হাস্য করিয়া নামি কহিল, "আজ অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে : কিন্তু মাথাটা এখনো ভার, কাশিটাও কমচে না।"

"তাই ত! তা হলে ত ভাল নয়। বেজায় শীত পড়েচে।"

পরিচারিকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রদত্ত আসনে সে নামির নিকটে গিয়া বসিল, হীরকাঙ্গুরীশোভিত হাত দুখানি আগুনে গরম করিয়া বার বার স্বীয় গোলাপী কপোলের উপড় চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

"মাসি-মা মেসোমশাই দু'জনেই ভালো আছেন?"

"হাঁা ভালো। ভারি শীত পড়েচে, তাই তাঁরা তোমার জন্য ভাবচেন। এই কাল রাত্তিরে আমাদের কথা হচ্ছিল যে, তুমি একটু সেরে উঠলেই তোমার জুশিতে হাওয়া খেতে যাওয়া দরকার। এতে তোমার নিশ্চয়ই উপকার হবে।"

"তাই নাকি? তাকেও য়োকোস্কা থেকে লিখেচে যে, আমার হাওয়া বদ্‌লানো দরকার।"

"তা হলে ত তোমার যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া উচিত।"

"যাই বা না যাই শীগ্‌গিরই ত সেরে উঠব।"

"খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমার।"

পরিচারিকা চিজুর জন্য চা লইয়া প্রবেশ করিল।

"কানে, মা কোথায়? লোক এসেচে? কে? পাড়াগাঁ থেকে এয়েচে? ও-চিজু-সান তোমার বোধ হয় আজ খুব অবসর আছে, কেমন? কানে, ওচিজুর জন্যে ভালো কিছু নিয়ে এস।"

"কেন আমি ত প্রায়ই আসি। আমার জন্যে আবার এত আয়োজন কেন?—রোসো" (একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া) "তোমার খাশুড়ী ভাতের পিঠে খেতে ভালোবাসে, না? তাঁর জন্য অল্প এনেচি। লোক কেউ থাকে ত এর পরে নিয়ে যেও।"

"বেশ করেচ। তিনি খুব খুসি হবেন।"

তারপর চিজু কয়েকটি লাল কমলা লেবু বাহির করিল। "এই দেখ কেমন! এগুলি তোমার জন্যে। কিন্তু বেশী মিষ্টি নয় বোধ হয়।"

"বেশ, বেশ। আমার জন্যে একটা ছাড়াওনা ভাই?"

চিজু তাহাকে একটি ছাড়াইয়া দিল। নামি সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে কপালের উপর পতিত চূর্ণ কুন্তলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

"অসুবিধে হচ্ছে, না? আলগা করে বাঁধলেই হয়। দাঁড়াও, ঠিক করে দিচ্ছি। বসতে হবে না।"

পার্শ্বের ঘর হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিয়া সে ধীরে ধীরে নামির চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

আমাদের কালকের সভার কথা তোমায় বলি নি, তোমার কাছেও চিঠি এসেছিল ত? খুব আমোদ করা গেছে, সকলেই তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে।" একটু হাসিয়া সে বলিতে লাগিল, "এই বছর খানেক আমরা ইস্কুল ছেড়েছি কিন্তু এরি মধ্যে প্রায় বারো জনার বে হয়ে গেছে। ওকুবো-সান, হোন্দা-সান, কিতাকোজি-সান—এদের যদি দেখতে! মাথায় তাদের মারুমাগে খোঁপা, কী গম্ভীর! লাগচে না ত? তারা সব নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত। তারপর আমাদের তর্ক হল, ছেলের বে হলে তার বাপ মার সঙ্গে থাকা উচিত কি না—এই বিষয়ে। কিতাকোজি-সান বললে উচিত, তার না কি গিন্নীপনা কিছুই জানা ছিল না, তার

শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ তাকে নাকি খুব সাহায্য করে। ওকুবোসান বললে উচিত নয়, তার শ্বাশুড়ী—তুমি ত জানই, বেজায় খিট্‌খিটে।"

"হাসবো কত! তারপর আমিও তর্ক জুড়ে দিলুম, তারা বল্লে আমার বলবার কোনো অধিকার নেই, কারণ আমি এখনো তাদের দলের বাইরে। এখানটা বেশী কথা হল কি?"

"না, না। কাল তা হলে খুব মজা হয়েচে বল! যার যেমন অভিজ্ঞতা সে তেমনি বলেছে আর কি। সব বাড়ী ত আর এক রকম নয়, একটা নিয়ম কেমন করে হয় বল। মাসী এক বার কি বলেছিলেন তোমার মনে পড়ে কি ওচিজু? তিনি বলেছিলেন যে, অল্প বয়সীরা একসঙ্গে থাকলে স্বার্থপর আর কুড়ে হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। বয়স্কদের অবহেলা করাটা উচিত নয়, তোমার কি মত?"

নামি মেয়েটি ছিল একটু ভাবুক ধরণের, সংসার কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল। পিতার উপদেশগুলি সে আগ্রহ-সহকারে শুনিত, বিমাতার ধরণধারণ তাহার পছন্দ হইত না। বাড়ীর গৃহিণী হইয়া যে দিন নিজের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে, সেই দিনের অপেক্ষায় সে ছিল। কিন্তু কাওয়াসিমা পরিবারে আসিয়া দেখিল সবই উল্টা—স্বপ্নেও সে এরূপ ভাবে নাই। এখানে শাসন কার্য্যটা সমস্তই বুড়ো রাণীর হাতে, সে যেন নামেমাত্র রাণী! কিছু কাল এই নূতন অবস্থার অনুগত হইয়া শুভ দিনের অপেক্ষায় থাকা—ইহাই সে করিতে ছিল। কিন্তু যখন দেখিল, সে স্বামী ও শ্বাশুড়ীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইচ্ছা মত পতির পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছে না, তখন সে নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। বিমাতা পৃথক বাসের পক্ষপাতী ছিলেন, নামি এক দিন মনে করিয়াছিল উহা দেশের উপযোগী নয়; কিন্তু এখন—এখন সে ভাবিত বুঝি বা বিমাতার মতটাই ঠিক। কিন্তু বহুদিন হইতে সযত্নে সে যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহাও হঠাৎ পরিত্যাগ করা নামির পক্ষে অসম্ভব।

চিজু নামির চুল সাদা ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিল। বিমাতার অধীনে দশ বৎসর, এবং শ্বাশুড়ীর অধীনে প্রায় এক বৎসর যে কাটাইয়াছে সেই ভগ্নীর মনোভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কি এখানো রাগারাগি করেন না কি?"

"হ্যাঁ, কখনো কখনো, কিন্তু অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত ভালো ব্যাভারই করচেন। কিন্তু—তাকেওর কথা অত করে ভাবি এটা ওঁর ভালো লাগে না, মুস্কিল হয়েছে এই। তাকেও আবার বলে এখানে মা-ই হলেন রাণী তাঁর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করতে হবে আমাকে! যাক্ এ সব কথা থাক। হ্যাঁ, আমার এখন বেশ আরাম হচ্ছে, ধন্যবাদ। মাথাটা অনেক হালকা হয়ে এসেছে।" খোঁপায় হাত বুলাইতে বুলাইতে নামি শ্রান্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

চিরুণিখানি রাখিয়া দিয়া নরম কাগজে চিজু হাত মুছিয়া ফেলিল। ক্ষণকাল আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি ছোট বাক্স দেখিতে পাইল। বাক্সটি খুলিয়া কি একটি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—"কী চমৎকার! এটি দেখতে আমার এত ভালো লাগে। তাকেওর পছন্দটি খুব ভালো বলতে হবে কেমন?" (আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) "শুজি কেবলি আমাকে ফরাসি নয় জর্ম্মন পড়তে বলে। সে মনে করে এর মত একটা ভাষা রাজনীতিবিদের স্ত্রীর জানা দরকার। কিন্তু যে শক্ত!" চিজুর ভাবী পতির নাম শিঞ্জু। সে বৈদেশিক বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী।

নামি হাসিয়া বলিল, "তোমার মাথায় মারুমাগে খোঁপা দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়, কিন্তু শিমাদা খোঁপায় তোমায় এমনি মানায়!"

"সত্যি!"

তাহার সুন্দর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া আসিল, অধর কোণে একটু খানি হাসি ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

"নামি-সান তোমার মনে আছে বোধ হয় হাভি-ওয়ারা-সানকে। আমাদের এক বছর আগে যে ইস্কুল থেকে বেরিয়েছিল ?"

"আছে বৈ কি, যার সঙ্গে মাৎসুদাইরার বে হয়েছিল।"

"সেই শুন্‌চি কাল্ল তাকে তার স্বামী ত্যাগ করেচে।"

"তাই না কি ? কেন, কি হয়েছিল ?

"শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাকে খুবই ভালোবাস্‌ত, কিন্তু মাৎসুদাইরার পছন্দ হল না তাকে।"

"হ্যাঁ! মাৎসুদাইরা একটা খারাপ মেয়ে মানুষের সঙ্গ নিয়ে এমন নির্লজ্জ ব্যাভার করতে লাগল যে, হাভিওয়ারা-সানের বাবা রেগে বল্লেন এমন লোকের সংশ্রবে মেয়েকে রাখবেন না। তিনিই মেয়েকে নিয়ে গেছেন।

আহা! কেন পছন্দ হল না ? লোকটা ত ভারি নিষ্ঠুর।"

"বাস্তবিক কথাটা ভাবলে রাগ হয়। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ভালবাসা পেয়েও স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের কথা!"

নামি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

"একই ইস্কুলে একই ঘরে যারা পড়েছিল তারা এখন কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েচে, অদৃষ্টে যা ছিল তাই ঘটেচে। ভাবলে আমার ভারি দুখ্যু হয়! ওচিজু, ভাই, আমরা চিরকাল বন্ধু থাকবো, কেউ কাকেও ত্যাগ কর্‌বো না, কেমন!"

"আমারও প্রার্থনা তাই!"

অজ্ঞাতসারে তাহাদের হস্ত মিলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে নামি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এখানে একলাটি যখন শুয়ে থাকি তখন কত কথাই যে ভাবি তা আর কি বল্‌বো! একটা ভাবনার কথা তোমায় বলি, হেসো না কিন্তু। ধর অনেক বছর পর আমাদের অন্য কোনো দেশের সঙ্গে লড়াই হবে, আর জাপান জিতবে। তখন শুক্তি-সান বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী হয়ে সন্ধি কর্‌তে যাবে আর তাকেও আমাদের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হয়ে শত্রুর বন্দরে বন্দরে জাহাজ রেখে দেবে—"

"আর আকাশাকার মেশোমশাই স্থল সৈন্যের প্রধান সেনাপতি হবেন, আর আমার বাবা, পার্ল্যামেণ্টে, যুদ্ধের খরচের জন্যে কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়ে এক 'বিল পাশ' করাবেন।"

"আর তখন ওচিজু-সান আর আমি 'রেড্ ক্রশের' সভ্য হব।"

চিজু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু গায়ে জোর না থাকলে ত তুমি তা কর্‌তে পারবে না।"

নামি যেই হাসিয়াছে অমনি কাশিতে লাগিল। ডান বুকের উপর সে হাত রাখিল।

"আমরা বড্ড বেশী বকেছি! ওখানে ব্যথা নাকি ?"

"কাশলে এই খানটায় লাগে", বলিয়া নামি দিবসের ম্লানায়মান আলোকের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

ঘুঘু পাখী *

ঘুঘু পাখীকে আমাদের দেশে ঢুপী বলে। ইহারা পারাবত জাতীয় পাখী। ইহাদের দৈহিক গঠন, ঠোঁট, পা, শব্দ, উড়িবার ভঙ্গী অনেকাংশে পারাবতেরই অনুরূপ।

ঢুপী দুই জাতীয়-"তিলা ঢুপী" ও নীলা ঢুপি"। তিলা ঢুপী আমরা যেখানে সেখানে দেখিতে পাই। ইহারা আমাদের প্রতিবেশী। ছেলেবেলায় নীলা ঢুপী অনেক দেখিয়াছি। জঙ্গল আবাদ হওয়ায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে তৈলের আধিক্য এবং মাংসের স্বাদ ইহাদের বংশ ধ্বংসের সহায়তা করিতেছে। এখন 'নীলা ঢুপি' খুব কমই দৃষ্ট হয়। প্রাথমিক জীবনে ঢুপীর আকৃতিবিশিষ্ট লাল রঙ্গের

* গায়ক পাখী।

পাখী দেখিয়াছি, উহা ঢুপী কি না জানি না ; উহার স্মৃতি মাত্র আছে, অন্য সংবাদ জানি না। এখন আর ঐ পাখী দেখা যায় না। উহা ঢুপী কি না জানি না, তবে ইহাদের গঠন ঢুপীরই অনুরূপ।

তিলা ঘুঘু।

তিলা ঢুপি আমাদের দেশে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। ইহারা লম্বায় ১০।১১ ইঞ্চি ; শরীরের বর্ণ ধূসর ও চক্‌চকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পালকের অগ্রভাগ দ্বিতীয়ার চন্দ্র-কলার মত ; বর্ণ মলিন গেরিমাটীর মত। দূর হইতে কতকটা মাছের আঁশের মত দেখায়। ডানার বা পুচ্ছের পাখায় (quill) ঐ রূপ চন্দ্রক নাই। ডানা দৃঢ়, হালকা এবং অত্যন্ত শ্রমসহ। দেহের উপরিভাগের, বক্ষের ও গলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালখ গুলিও ধূসর এবং চক্‌চকে। পেটের নিম্নভাগের পালখ্ মেটে সাদা। পুচ্ছের নিম্নভাগের কতক পালখ্ ধূসর এবং কতক পালখ্ মেটে সাদা। গলার চারিদিকে উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের উপর উজ্জ্বল নীল ছিট তিলের মত দেখায়। এই তিলের দাগ থাকায়ই ইহার নাম তিলা ঢুপী। ইহা-দের মস্তক ছোট, গলা সরু, ঠোঁট অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা ও নরম। অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও ধারবিহীন। উপরের ঠোঁটের সূক্ষ্মাগ্র ঈষৎ বক্র। ঠোঁঠের গোড়ায় দুই দিকে নাকের ছিদ্র এবং উহার উপরিভাগ ঈষৎ স্ফীত। চক্ষু দুটি পাটনাই মসুরীর মত বড়, উজ্জ্বল টল্‌টলে কৃষ্ণবর্ণ ; তাহার চারিদিকে মেটে হরিদ্রাভ সরু বেষ্টনী। চক্ষুর উপর অতি পাতলা ধূম্র বর্ণের পরদা আছে। উহা চক্ষুর পলক ফেলিতে ব্যবহৃত হয়, এবং ঐ পরদা দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া নিদ্রা যায়।

ঘুঘুর পা তিন ইঞ্চি লম্বা, বর্ণ ধূসর। হাঁটু পর্য্যন্ত ধূসর। পালখের যে সকল স্থান সাদা ' তাহা পাখীটি বসিয়া থাকা অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না, উড়িয়া চলিবার সময় মাত্র দৃষ্ট হয়।

ঘুঘু পাখী কখন কখন কয়েকটিতে দলবদ্ধ হইয়া শস্য ক্ষেত্রে পতিত হয়। ঘুঘুর দাম্পত্য প্রণয় উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রায়ই যোড়া ছাড়া হয় না। পুরুষ বা স্ত্রী ঘুঘুর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। উভয়ে বিভিন্ন বৃক্ষশাখায় বসিয়া পালাক্রমে গান করিয়া থাকে। কখন কখন গাছে গাছে বহুসংখ্যক ঘুঘুর করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যায়। তাহার সঙ্গীতে যেন কি এক বিষাদ—কাহার জন্য মর্ম্মন্তুদ রোদন দিগন্ত ছাপাইয়া পড়ে। বর্ষার শেষে যখন শারদ গগন নির্ম্মল হয় এবং বঙ্গদেশ শস্যশ্যামল হইয়া উঠে তখনই বঙ্গপল্লী সমূহে বিহঙ্গমের সুমধুর কাকলী শোনা যায় ; ঘুঘুও এই সময়েই গান করে। গান করিবার সময় ঘুঘুর গলাও পারাবতের গলার মত স্ফীত হয়। তখন সুন্দর দেখায়। কখন কখন ঘুঘু "ঘু-ঘু-ঘু" "ঘুঘু-ঘু" করিয়া করিয়া মাথা কুটিতে থাকে।

ঘুঘু অতি চতুর। ইহারা অত্যন্ত গোপনীয় স্থানে কয়েকখানা খড়কুটা দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে ; কখন কখন একটু মজবুত রকমের বাসাও তৈয়ার করিয়া থাকে। ঘুঘু ফাল্গুন মাসে দুই তিনটি ডিম পাড়ে।

কেহ ঘুঘুর বাসার সন্ধান পাইলে, ঘুঘু তৎক্ষণাৎ সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ঘুঘু এ অবস্থায় অত্যন্ত আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশলে ডিম লইয়া নূতন বাসায় গমন করে। ডিমের উপর মল ত্যাগ করিয়া একটু শুকাইয়া উহাতে নখ বিদ্ধ করিয়া লইয়া যায়। ঘুঘু সদ্যোজাত আপন শাবক পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। কখন কখন পক্ষী ও পক্ষিণী বাসা নখে ধরিয়া লইয়া যায়, কখন বা শাবক পিঠে তুলিয়া লইয়া নূতন বাসায় প্রস্থান করে। এ অবস্থায় নূতন বাসা বেশী দূরে নির্ম্মিত হয় না। নিকটে এবং বিশেষ গোপনীয় স্থানেই বাসা করে। মোট কথা ঘুঘু অত্যন্ত সতর্কতার সহিত আপন সন্তানের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।

ঘুঘুর ডিম পাতলা নীল বর্ণের। তাহাতে সাদা ছিট। ডিমগুলি পারাবতের ডিম অপেক্ষা ছোট। ঘুঘুর মাংস তৈলাক্ত, মোলায়েম এবং সুস্বাদ। ইহাদের দেহ এত

কোমল যে, অতি সতর্ক হস্তে ধরিলেও অনেক পালখ খসিয়া যায়।

ঘুঘু পাখী অতি দ্রুত গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। লেজ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া পলকের মধ্যে বিভিন্ন দিকে উড়িয়া যায়। কখন কখন বৃক্ষ শাখা হইতে পাখায় চটাচট্ শব্দ করিয়া তীর বেগে উপরের দিকে অনেক দূর উঠিয়া পাখা মেলিয়া বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়। ঘুঘু ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়। ইহারা "কুর্ কুর্—কুর্ কুর্—কুর্" গান করে। আমাদের দেশের মেয়েরা বলেন ঘুঘু পাখী বলে—,"সতী ঝি গো পূর্ পূর্ পূর্ (পূর্ণ কর্), চোকলে বাকলে (খোসা সমেত) কুড়ায়ে তোল"। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে।

"সে ছিল এক গৃহস্থের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। সে তাহার সতীন-মেয়েকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। বেচারী সতীন-মেয়ে কিন্তু সৎ মা'র মনস্তুষ্টির জন্য খুব চেষ্টা চরিত্র করিত। এক দিন বাড়ীতে জামাই আসিলেন; খাবার তৈয়ারের ধুম পড়িয়া গেল। গৃহস্থ-বৌ আপন মেয়ে ও সতীন-মেয়েকে মাপিয়া সমান সমান তিল পরিষ্কার করিতে দিল। আপন মেয়ে তিলগুলি ধুইয়া আনিল। মা মাপিয়া বুঝ করিয়া লইল। সতীন-মেয়ে অনেকক্ষণ পর তিলগুলি মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া আনিল। তিলের খোষাগুলি এক জায়গায় জমাইয়া রাখিল। সৎ-মা মাপিয়া দেখিল, তিল অনেক কম। সে বুঝিল অভাগা মেয়েটা তিলগুলি ফেলিয়া দিয়াছে। রাগে সৎ-মা সতীন মেয়ের মাথায় এক আঘাত করিল, তাহাতেই মেয়েটি মরিয়া গেল। একটু পরেই সে দেখিল মেয়ের তিলগুলি অপরিষ্কৃত আর সতীন মেয়ের তিলগুলি পরিষ্কৃত, এবং তাহার খোসাগুলি অন্যত্র রক্ষিত। সৎ-মা সেই বাকল এবং মার্জ্জিত তিল মাপিয়া দেখিল, তাহার পরিমাণ পূর্ (পূর্ণ) হইয়াছে। তাহার মনে গভীর অনুতাপ হইল। সৎমেয়ের তিলগুলিই ত ঠিক তৈয়ার হইয়াছে! আপন মেয়ের তিলগুলি পাক করিবার যোগ্যই হয় নাই। অনুতাপে সৎ-মা তিলের হাঁড়ি মাথায় ভাঙ্গিয়া মরিয়া পাখী হইল এবং পূর্ব্ব-স্মৃতিবশতঃ কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, "সতী ঝি গো পূর্ পূর্—চোকলে বাকলে কুড়ায়ে তোল"।

ঘুঘু পাখী ধরিবার জন্য শিকারীরা ঘুঘু পোষে। একটা খাঁচার মধ্যে তাহাকে রাখা হয়। খাঁচার সম্মুখে একখানি জাল থাকে। খাঁচাটি লতাপাতায় আবৃত। খাঁচার নীচে বাঁশের একটি চোঙ্গ থাকে। উহাতে তিন চারি হাত লম্বা কয়েকখানি বাঁশ লাগান হয়। এই ভাবে খাঁচাটিকে ১১।১২ হাত উপরে পাতা ঢাকা এক শাখায় নিকট রাখিয়া দেয়। পোষা ঘুঘু আপন খাঁচায় বসিয়া ডাকিতে থাকে। বন্য ঘুঘু যখন সঙ্গী-বিহীন ঘুঘুর ডাক শুনে, তখনই তাহাকে বিপত্নীক অপিচ প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া আক্রমণ করে, এবং জালে আটকাইয়া শিকারীর রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে।

জাঙ্গী পাতিয়াও ঘুঘু ধরা হয়। এক গাছি সরু অথচ দৃঢ় রজ্জুতে তালের আঁশ বা ঘোড়া বা গরুর পুচ্ছ-লোম এক একটি পৃথক পৃথক আটকাইয়া ঐ আঁশ বা লোমের মধ্যে এক একটি ফস্‌কা গেরো দেওয়া থাকে। মূল রজ্জুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের কাঠি বাঁধা হয়। ঐ কাঠিগুলি মাটিতে পুতিয়া ঐ গেরোগুলির নীচে ধান, সরিষা, কলাই প্রভৃতি ফেলিয়া রাখে। আহারের লোভে আসিয়া বেচারী প্রাণ হারায়। কখন কখন জাঙ্গি ছিঁড়িয়া পলায়ন করিতে পারে। ঘুঘু এক বার জাঙ্গীর সন্ধান পাইলে আর সে দিকে পদার্পণ করে না।

ঘরের নিকটবর্ত্তী স্থানে খাদ্যাদির আহরণে ঘুঘু আসিয়া থাকে।

নীলা ঘুঘু।

ইহাদের ঠোঁট লাল এবং আধ ইঞ্চি লম্বা। উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ঠোঁট নরম, ধারাল নহে। কপালের নিম্নে এবং ক্রমে উভয় পার্শ্বের চক্ষুর উপর পর্য্যন্ত বক্রভাবে ঈষৎ শ্বেতাভ অল্প ক্ষুদ্র পালখ। বকের

এবং ডানার নিম্ন দিকের ও গলার উপরের পালখ তাম্রাভ, তেমন উজ্জ্বল নহে।

চক্ষুর তারকা কৃষ্ণাভ নীল। ছোট মশুরীর অপেক্ষাও ঈষৎ ক্ষুদ্র। তাহার চারিদিকের অক্ষি-গোলক তাম্রাভ কৃষ্ণ। চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের পাতলা পরদা ঈষৎ লাল এবং সম্মুখের দিকে একটু বিস্তৃত। ডানা মজবুত। উপরের পালখ বেগুনে মিশ্রিত গাঢ় সবুজ। সবুজ পালখের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার যতটুকু অন্য পালখের নীচে থাকে ততটুকু পর্য্যন্ত ফিকে কাল। পিঠের কতক পালখ তদ্রূপ এবং অবশিষ্ট কতক পালখ কৃষ্ণাভ, তৎপর এক লাইন শ্বেতাভ, তৎপরে অর্দ্ধ ইঞ্চি এক লাইন কৃষ্ণাভ ও, বেগুনে মিশ্রিত সবুজ। তৎপরে (অত্যন্ত অস্পষ্ট) ছাই রঙ্গের এবং ক্রমে ধূসর বর্ণের, তৎপরে তাম্রাভ ফিকে কাল বর্ণের পালখ।

কিন্তু পিঠের পালখগুলি এরূপ সুশৃঙ্খল রূপে শ্রেণী-বদ্ধ যে, বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশ থাকাতেও বিশ্রী দেখায় না। পুচ্ছের পালখ সংখ্যা (বড় পালখ) বারটি। নীচের দিকের ছোট পালখ ১২ হইতে ১৫টি। বক্ষের পালখ তাম্রাভ ধূসর। পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত রং ঐ রূপ। তন্নিম্নে সম্মুখের দিকের রং বেগুনে। পেছনের রং শ্বেতাভ, আঙ্গুলে তিনটি পর্ব্ব। নখ ঈষৎ বক্র এবং ধারাল। আঙ্গুলের নীচের দিকে কটা নহে। পেছ-নের আঙ্গুলে তিনটি, মধ্যের আঙ্গুলে নয়টি এবং তাহার দুই পার্শ্বের আঙ্গুলে আটটি করিয়া পর্ব্ব আছে। এই জন্যই আঙ্গুলগুলিকে নীচের দিকে সম্পূর্ণ রূপে বক্র করিতে পারে। পেটের উভয় পার্শ্বের পালখ ধূসর। ঐ সকল পালখ গুলি (quill) পরিষ্কার সাদা এবং সূক্ষ্মাগ্র; তাহাদের অগ্রভাগ অতি কোমল, একটু হাড় আছে। এই অংশ অর্দ্ধ ইঞ্চির বেশী নহে। কিন্তু পূর্ব্বার্দ্ধ প্রায় এক ইঞ্চি। ইহাদের পালখ অতি সহজেই শরীর হইতে বিচ্যুত হয়।

শরীরের চর্ম্ম রক্তাভ, দেহ অতি কোমল। পুচ্ছের পালখ-রাশির উভয় পার্শ্বের দুইটি পালখের দুই তৃতীয়াংশ ছাইয়ের মত সাদা, তদগ্রে একটু কাল এবং অবশিষ্টাংশ ছাইয়ের মত। তাহার পরের দুই দিকের দুইটি পালখের এক স্থানের কতকটা পিঙ্গল। অন্যান্য পালক ঈষৎ তাম্রাভ কৃষ্ণ। ডানার পালখের যে অংশ অন্য পালখের পরতের নীচে থাকে তাহাও পিঙ্গল। অবশিষ্টাংশ ফিকে কাল। পাখার (Quill) দাঁড়া নীচের দিকে সাদা উপরের দিকে ঈষৎ কাল।

ইহাদের সমগ্র পা প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা। ঠোঁট হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১০ ইঞ্চি লম্বা।

নীলা ঘুঘুও বাড়ীর আশেপাশে খাদ্যসংগ্রহের জন্য আসিয়া থাকে। ইহাদের ডিম্বও তিলা ঘুপির ডিম্বের প্রায় অনুরূপ। একটু বেশী সাদা রকমের নীল। ইহাদিগকে দলবদ্ধ ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিতে দেখা যায় না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাটিয়াল গান*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৭

এ গানটিতে প্রাণের উদাস ব্যাকুলতা—সেই অজানা অনন্তের পানে একটা কেমন আকুল আকর্ষণের ভাব সুন্দর কবিত্বের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

"সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ"

এ টানের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সৃষ্টির প্রারম্ভ-কাল হইতে এ আকর্ষণ। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানব সকল সময়ে ইহা অনুভব করিতে পারে না; জীবনের কোন কোন শুভ মুহূর্ত্তে সেই অসীমের আহ্বান অনুভূত হয় আর অমনি সংসারের কুটিলতা দূরে সরিয়া দাঁড়ায়—এক উদাস, গম্ভীর, অমৃতময় ভাবে চিত্ত ডুবিয়া যায়।

* এ গানটি গ্রামোফনে মিস্ দাস দিয়াছেন।

গানটি এই—

ওগো দরদী—

ওগো দরদী—আমার মন কেন
উদাসী হইতে চায়!
ও তার ডাক নাহি, হাঁক নাহি গো—
আপ্‌নে আসি চইলে যায়।

ধৈরয না ধরে অন্তরে—
সদা কেঁপে ওঠে মন শিহরি,—
নয়ন ঝরে,
যেন নীরবে, সুরবে সদা—
ডাকিতেছে আয় গো আয়।

যেন ভাটীর স্রোতে ভাটার গড়ান,—
সাগর যেমন সদা গো টানে
নদীর পরাণ,
সে টান এতই সরল, মনেরই গরল
অমৃত হইয়ে যায়।

৮

মানব সারা জীবন এই সংসারের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া শেষ জীবনে নিজের অক্ষমতায় অসহায় ভাবে হাল ছাড়িয়া দিতেছে। এই ভাবটি নিম্নলিখিত গানটিতে অতি সরল ভাবে বলা হইয়াছে।

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বইঠা রে—
তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না।

ওরে জাঙ্গী রসী যতই কসি,
ওরে হাইলেতে জল মানে না।

নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গা রে,
নায় ত গাব গয়নি মানে না।

দরদী—ব্যথার ব্যথী।
গড়ান—স্রোত।
সয়—বৈ।
জাঙ্গী—জঙ্ঘা।
গয়নি—নায়ের ফাঁটা যায়গায় নেকুরা দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া।

৯

এ গানটিতে সময় থাকিতে থাকিতে ভগবানের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য মনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ওরে দিন থাকিতে
তুমি কূলে কূলে লও কিনারা।
(মন পাগেলা রে)

আরে বাহার্ত্তের বচ্ছরের পাড়ি,—
বেলা আছে দণ্ড চারি রে;
আরে অসময়ে ধরলে পাড়ি—
পাবি নি রে কূল কিনারা।

১০

একদা শ্যাম-প্রেমে বিহ্বলা রাধিকা তাহার নবীন নাগরটিকে কাছে পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিতেছেন যে, তুমি সময়ে অসময়ে যখন তখন বাঁশীর সুরে রাধা রাধা বলিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিও না। আমি "গুরু-জনার মাঝে" থাকিলে ঐ রূপ আহ্বান শুনিয়া লজ্জায় মরমে মরিয়া যাই!

রাধিকা নিষেধ করিতেছেন বটে, কিন্তু এ নিষেধের প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উদ্বেল প্রেমের প্রকাশ রহিয়াছে।—

"ও পার বইসা বাজাও বাঁশী—
এই পার বইসা শুনি;—
হায় রে আমি ত অবলা নারী—
সাঁতার নাহি জানি রে!"

ইহার তুলনা নাই।

বাঁশী বাজান জান না।
ওরে অসময়ে বাজাও বাঁশী—
কালা মন ত মানে না রে।

যখন আমি বইসারে থাকি—
গুরুজনার মাঝে,
ওরে নাম ধরিয়া বাজে রে বাঁশী,—
শুইনা মরি লাজে রে।

ওরে রন্ধনশালাতে বইসা—
যখন আমি রাঁধি,—
ওরে ভিজা কাষ্ঠ চুলায় রে দিয়া—
ধুঁয়ার ছলে কাঁদি রে।

ওপার বইসা বাজাও বাঁশী—
এই পার বইসা শুনি ;—
হা রে আমি ত অবলা নারী—
সাঁতার নাহি জানি রে।

যেই না ঝাড়ের বাঁশী রে তোমার—
লাগুর যদি পাই—
ওরে জারে মূলে উপারিয়া—
সায়রে ভাসাই রে। *

১১

আর এক দিন রাধা সখী সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে গিয়াছেন। তখন অপরাহ্ণ। জল আনিবেন কি? ঘাটে যাইয়া দেখেন, তাঁহার মদনমোহন কদম্ব-শাখায় ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া বাঁশীর সুরে সুধা ঢালিয়া দিতেছেন। তখন নব অনুরাগ--রাধিকা কৃষ্ণকে প্রাণ খুলিয়া —আঁখির আশ মিটাইয়া—চাহিয়া দেখিতে পারিতেছেন না—হায় লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়। অথচ ও নয়ন-মন-মোহন রূপ না দেখিলেও ত চলিতেছে না। তাই যমুনার নীল জলে সেই নীরদবরণের রূপচ্ছায়া নিরীক্ষণ মানসে সখীদিগকে বলিতেছেন,—

জলে ঢেউ দিও না গো সখী—
আমি কাল রূপ—ও রূপ নিরখি।
ওগো ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না
(দিলে) তোমরা হবে পাতকী।
ঐ কদম ডালে ডেইরে কৃষ্ণ
বাঁশী বাজায় বেইল ভাটি।
ওগো বাঁশীর স্বরে পরাণ গো হরে,
ঘরে ফিরে যাব কি!

১২

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার দর্শন মানসে উধাও ভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন—আর মোহন মুরলীর সাহায্যে নাম ধরিয়া রাধাকে ডাকিতেছেন—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান ভক্তের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশ্ববিমোহন সুরে তাহাকে আকুল আহ্বান করিতেছেন, ইহাই এই গানটির ভাব।

আমি বিকাইলাম গো
রাই কমলিনী,
রাধে তোমার চরণে।
ওগো তোমার প্রেমের খাতক হয়ে গো
আমি বেড়াই বনে বনে।
আপন হাতে কজ্জ পত্র
আমি লেইখে দিলেম মনের মত,
মহাজন বানাইলাম গো রাধে তোমারে ;
ওগো তোমার প্রেমে ঋণী গো হয়ে
(ওগো ও রাই কমলিনী)
আমি বেড়াই গহন কাননে।
লেখে দিলাম দাসখত—
এ দেহ জনমের মত,
ধরা চূড়া দিলাম গো রাধে তোমারে,
আমি আর কিছু ধন চাই না গো রাধে
(ওগো ও রাই কমলিনী)
আমায় রেইখো রাঙ্গা চরণে।

চুলায়—চুল্লীতে।
লাগুর—লাগাল।
জর—শিকর।
সায়রে—সাগরে।
*সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বেইল ভাটি——অপরাহ্ণে।
ডেইরে——দাঁড়াইয়া।

যখন আমি গোচারণে যাই,
কদম তলায় বাঁশীটি বাজাই,
বাঁশীর স্বরে ডাকি গো রাধে তোমারে,
তুমি বাহির হও গো ওগো রাধে,
(ওগো ও রাই কমলিনী)
তোমায় দেখি দু'নয়নে।

১৩

এটি প্রেম সঙ্গীত। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত, হংসদূত, প্রভৃতি দেখা যায়; কিন্তু আমাদের বাঙ্গলার গ্রাম্য কবি তাহার নায়িকাটির দ্বারা "বাঐ" অর্থাৎ বাবুই পক্ষীকেই দৌত্যে বরণ করাইয়াছেন। কারণ দীঘীর পাড়ের বাঁশ ঝাড়ে ও অন্যান্য বৃক্ষে উক্ত পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে সর্ব্বদা আনাগোনা করে।

ও বাঐ রে, ওরে ঝাকে ওড় ঝাকে রে
পড় তারে বল সাড়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ
পিরীতি জানমারা রে বাঐ—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।

ও বাঐ রে, ওরে নলের আগে নল ফুল,
ও ফুল বাঐ, বাঁশের আগে টিয়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ,
না যেন্ করে বিয়া রে বাঐ,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।

ও বাঐ রে ওরে যখনে করিলাম প্রেম,
বাঐ তুমি আমি জানি,
ওরে এখন কেন সে সব কথা বাঐ
লোকের মুখে শুনি রে—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।

ও বাঐ রে, যখনে করিলাম প্রেম
বাঐ শানবাঁধা ঘাটে,
ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন
তুইলা দিলা হাতে রে বাঐ—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।

ও বাঐ রে, হায় রে ওপারে বুনিলাম ধান
বাঐ, টিয়ায় কাইটা খাইল।
ঐ যে কইও মোর বঁধুয়ার আগে
যৌবন বইয়া গেল রে,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।

ও বাঐ রে, ওপারে কদমের গাছ বাঐ
বায়ে হালে আগা,
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম বাঐ
যৌবন কালে দাগা,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।*

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

প্রবাসী

ঝুমকো লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা
কুটীরখানি তার
সুদূর প্রবাসে;
রাত্রি দিন ঘরের কথা ছাড়া
অন্য কথা আর
মনে না আসে।
যে গানে তার জাগে ভোরের রবি,
সেই গানেতেই উঠে সাঁঝের তারা;
চোখের পরে ভাসে হাজার ছবি,
বুকের তলে একটি মুক্তা জলে
সকল আলো করা।

---

*সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আল্‌তা-মাখা রাঙা চরণ দুটি
পাতায় পাতায় ফেলে
এল ফাগুন রাণী ;
হাজার বার পঞ্চমেতে উঠি
গেল নেমে নেমে
পিকের গলাখানি ;
কে অলক্ষ্যে বাঁকিয়ে চাঁদের ধনু
ঝর্‌ ঝরিয়ে হান্‌ল জ্যোৎস্না-শর !
জর্‌ জরিয়ে দিল যে তার তনু ;
তবুও তার থাম্‌লো নাকো গান,
কাঁপল নাকো স্বর।

•

বর্ষা এল বাজিয়ে বিজয়-ঢাক
বলির তরে নিয়ে
কালো মেঘের দল ;
বিজলী খড়্গে কোপের পর কোপে
রক্তে হ'লো গেরী
জাহ্নবীর জল ;
অমানিশায় দিগম্বরী শ্যামা
এলিয়ে দিল বৃষ্টিধারার চুল
ঝঞ্ঝা নৃত্যে চাপল ধরার বুকে,—
তবুও তার কাট্‌ল নাকো তাল,
সুর হ'লো না ভুল।

এমনি কোরে সারা প্রবাস-জীবন
একতারাটি নিয়ে
গাইল একই গান ;
হঠাৎ সে দিন এল উপর হ'তে
মঞ্জুরী সই দেওয়া
ছুটির চিঠিখান,
চমক ভেঙে একতারাটি ফেলে
দেশের মুখে ভাসিয়ে দিল তরী।—
—দাঁড়িয়ে কে ওই সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলে ?
মিলন সাজে, কাঁকনে কার বাজে
একতারার সেই সুরই ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা

৩১। **প্রথম শিক্ষা শারীর-ক্রিয়া ও স্বাস্থ্য বিধি,**—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচি এল, এম, এস প্রণীত, বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দু মাধব মল্লিক কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত—আকার ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত, মূল্য আট আনা, কলিকাতা, ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে Twentieth century Publishing Co কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ছাপা ভাল, কাগজ মন্দ নহে।

সমাজের মহৎ হিত সাধনের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। শরীর-বিজ্ঞানের ন্যায় এরূপ একটা জটিল ও দুর্ব্বোধ শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা সহজ ভাষায় এত সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন যে, আমাদের বালকবলিকাগণ সহজেই বুঝিতে পারিবে। গ্রন্থস্থ চিত্রগুলি তাহাদের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহয্য করিবে।

এই পুস্তকখানির প্রচার যত বেশী হইবে সমাজের মঙ্গলও তত বেশী হইবে। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এই পুস্তকখানি লিখিয়া গ্রন্থকার সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীত্রাণশরণ।

৩২। সোঽহংগীতা। হিমালয়বাসী সোঽহংস্বামী প্রণীত। কাগজ পুরু, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। সোঽহং-স্বামীর বিভিন্ন বয়সের তিনখানি প্রতিকৃতি দ্বারা গ্রন্থখানি সুশোভিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সার্কাসমঞ্চে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধের প্রবর্ত্তক শার্দ্দুলতেজা শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের নাম সম্ভবতঃ কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালীই বিস্মৃত হন নাই। এই বীরবরই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সোঽহংস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার যেমন অকুতোভয়ে বন্য শার্দ্দুলের পিঞ্জরে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন, সেইরূপ সাহসে নির্ভর করিয়াই সম্প্রতি এই গ্রন্থে বহু দেশাচার, শাস্ত্র বিচার ও পণ্ডিতের মতকে তীব্র কশাঘাতে প্রপীড়িত করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

যথা,—

গুরুশিষ্য অধ্যায়—

"ধার্ম্মিক-খ্যাতি-লোলুপ শিষ্যবিত্ত অপহারী
বহু গুরু অবনী ভিতরে
না জানে গন্তব্য স্থান, নাহি চিনে সত্য পন্থা
অন্যে পথ উপদেশ করে।"

অবতার অধ্যায়ে—

"অবতাররূপে প্রভু নারায়ণ কেবল ভারতে জনম গ্রহণ
করিলেন কি কারণ
অপর প্রদেশে দুষ্টের দমন, সাধু-পরিত্রাণ-ধর্ম্ম-সংস্থাপন
ছিল না কি প্রয়োজন ?

আবার,

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহার কটাক্ষে সঙ্ঘটিত হয়
সেই সর্ব্বশক্তিময়।
জীবসাধ্য কর্ম্মসাধনের তরে, জঠর যাতনা উপভোগ করে
কিরূপে সঙ্গত হয় ?"

আহার অধ্যায়ে—

"মাংসাশী সিংহাদি হয় পশুরাজ
তাদের সাম্রাজ্য বন
মানব সমাজে করিতে রাজত্ব
আমিষ আহারীগণ॥
"নিরামিষাহারী হীনবীর্য্য ভীরু
মৃদুল স্বভাব হয়।
ভোগ কিম্বা যোগ হেন পুরুষের
কদাপি আয়ত্ত নয়॥

পরিশেষে মুমুক্ষু লোকদিগকে সোঽহংস্বামী এই উপদেশ দিয়াছেন—

"জ্বালিয়া হৃদয়ে বৈরাগ্য অনল, করি ভস্ম
রাগ দ্বেষ চিত্তমল
কর লয় দুষ্টগণ।
হ'লে বিমোচিত মন আবরণ, তুমি ভূমা—
আত্মা নিত্য নিরঞ্জন
তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥"

সোঽহংগীতায় দেখিলাম—শাস্ত্র বিভিন্ন ও অবিশ্বাস্য,—কাম্য ধর্ম্মকর্ম্মে কোনও প্রয়োজন নাই,—ভক্তিমার্গ সুপন্থা নহে, আর "জীব জন্ম পুনর্জ্জন্ম কিছু সত্য নয়। বৃথা তর্কশাস্ত্রযুক্তি বৃথা বাক্যব্যয়॥"

সোঽহংগীতায় নির্দ্ধারিত সকল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত না হইতে পারিলেও, ইহাতে উল্লিখিত বহু মন্তব্য যথাযথ ও সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করি না। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অনেক ক্ষত স্থলে সঙ্গতভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের একটি প্রধান বিশেষত্ব। আশা করি, গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীভূ—

প্রতিভা

২য় বর্ষ　　পৌষ ১৩১৯　　৯ম সংখ্যা

সোনা বারইর গান *

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত ভাদ্র, ৯—১৩১৯)

এইটি শ্রীহট্ট জেলায় পল্লী-প্রচলিত একটি গ্রাম্য সঙ্গীত, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বহুল ভাবে গীত হইয়া থাকে। সোনা বারইর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা পিতার প্রাণ ও স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কিরূপে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, গ্রাম্য ভাষায় ইহাই এই সঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। শিশ্বারুণ-দীপ্ত কর্ষিত মাঠে, নিবিড় পল্লী-বীথিতে, লক্ষ্মীরাণীর ঐশ্বর্য্য শোভিত হরিৎ ক্ষেত্রে, এই সতীধর্ম্মের করুণ ও পবিত্র কাহিনী নিরক্ষর গ্রামবাসীগণের মনে সতী ও জাতি-মাহাত্ম্যের প্রতি একটা বিশিষ্ট অনুরাগ ও শ্রদ্ধার ভাব সর্ব্বদা সতেজ ও সবল করিয়া রাখে।

আমরা এই গানটিতে কয়েকটি সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মানুষ্ঠানের উল্লেখ পাই, সুতরাং ঐতিহাসিক ভাবেও এই গ্রাম্য গীতি বিশেষত্ববর্জ্জিত নহে। শ্রীহট্ট জেলার আজমপুর থানার হেড়েঙ্গা পাঠশালা হইতে প্রায় ৬।৭ কেদারা † দূরে পশ্চিম দিকে সোনা বারই ও কালা বারই নামে দুইটি দীঘি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং সেই হেড়েঙ্গা পাঠশালা হইতে প্রায় ৪½ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ী আছে, ইহাকে আজও মদনহায়দার বাড়ী বলে। এই মদনহায়দারই (মদন সা) আলোচ্য সঙ্গীতের নায়ক, এবং সোনা বারই নায়িকা বারই-কন্যার পিতা। মদনহায়দার বাড়ী একটি সুগভীর পরীখা-বেষ্টিত—ইহা প্রায় কুড়ি হাত চওড়া; সুতরাং তৎকালে মদন সা যে এক জন সঙ্গতিপন্ন, প্রতিপত্তিশালী ও প্রতাপান্বিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর হেড়েঙ্গা বাজারের কাছে "ফিরোজ খাঁ" দীঘিও বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং বারই-কন্যার পাণিপ্রার্থী ফিরোজ সা দেওয়ানের অস্তিত্বও একেবারে অবিশ্বাস করা চলে না। তবে ইহারাই এই আলোচ্য সঙ্গীতে উল্লিখিত ব্যক্তি কি না এবং এই সঙ্গীতের কোনও ঐতিহাসিক মেরুদণ্ড আছে কি না, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। আর এই পল্লী-সঙ্গীত কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ফিরোজ খাঁ প্রভৃতি কোন সময়ের লোক তাহা নির্ণয় করিতে হইলে এই সম্বন্ধে স্থানীয় গবেষণার প্রয়োজন।

"সোনা বারৈ রূপা বারৈ তারা দুটি ভাই
সোনা বারৈর ঘরে কন্যা নামেতে কমাই (জেলাই)।"

* এই গানটি সংগ্রহ ও এই প্রবন্ধ রচনায় অন্যান্য সাহায্যের জন্য আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ—লেখক।

† এক কেদার এক বিঘার কিঞ্চিৎ কম।

কন্তার জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে বারই-পত্নীর বর্ণনা আছে ঃ—

"চতুর্থ মাসের কালে এই যে সিক্রীম চী খাইল রে

*   *   *   *   *

*   *   *

নয় মাসের কালে বারৈর স্ত্রীয়ে সাদাসরদা(সাধ)খাইল রে"

তার পর কন্তার জন্ম, জাতক-সংস্কার ও নামকরণ ইত্যাদি ঃ—

"নাপিত ডাকিয়া এই যে ক্ষুসাইদ করাইল রে,
ছয় দিনের কালে ঐ যে ষষ্ঠী পূজা করাইল রে—
বাছি রিছি নাম থইলা কমাই সুন্দরী রে
ছয় মাসের কালেরে ঐ যে মদনসার জুড়নী করিল রে"

জুড়নী * প্রথা আমাদের অঞ্চলে নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই প্রথা বর্ত্তমান সময়ে আছে কি না জানি না। প্রাচীন কালে কন্তার জন্মের ষষ্ঠ মাসে বর মনোনীত হইয়া থাকিত এবং কন্তা বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার সহিত বিবাহ হইত। ইহাই জুড়নী প্রথা; 'জুড়নী' বোধ হয় জোড়া শব্দ হইতে আসিয়াছে; হিন্দুশাস্ত্রে "বাগ্-দত্তা" কন্তার উল্লেখ পাওয়া যায়—জুড়নী প্রথার সহিত এই 'বাগ্দত্তা' কন্তার কোন সংশ্রব ছিল কি না চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

"সাত দিনের কালে রে মদন সা আসিল
হাকার বান্ধিয়া মদন সায় কন্তা তুলি থইল।
সাত ডিঙ্গা দাড়ী মাঝি মদন সায় লইলা
বার বৎসরের লাগি মদন সা বানিজ্যে চলিলা।
বার বৎসর গেলে মদন সা ঘরে ত আসিবা"

বোধ হয় তক্তপোষের পরিবর্ত্তে "হাকার" বা মাঁচার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সোনা বারইর আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না, এ অবস্থায় মাঁচার বন্দোবস্ত হওয়ার কারণ বুঝা যায় না।

জুড়নী হইলে কন্যা অবরোধ-প্রথার সম্পূর্ণ অধীন হইত, এমন কি স্নানের জন্যও বাড়ীর বাহির হইত না।

"শুন শুন বাবা তুমি শুন রে বচন
তুলিল্ পানি বাটিল্ খিলায় না জুড়ায় জীবন।"

জুড়নী কন্যা তোলা জলে স্নান করিত এবং খিলায় চুল ও গা পরিষ্কার করিত—বলা বাহুল্য তখন দেশে সুগন্ধি সাবানের আবির্ভাব হয় নাই।

তোলা জলে স্নান করিয়া কমাইর তৃপ্তি হইত না; তাই বারইকে বলিল ;—

"সাধ মোর সানের বান্ধাইল্ ঘাটেতে গমন
এ কথা শুনিয়া বারৈ জুড়িল কান্দন্

*   *   *

*   *   *

সোনা বারই শুনিয়া উত্তর দিল—

"এখন বুঝি করিতায় কি গো জাতি ধ্বংস মোর"

পিতার উত্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়া

'মাও মাও ডাকেন কন্তায় মাও নি আছ ঘরে রে"

মাতা উত্তর করিল—

"কিসের লাগি ডাক কন্তা সুললিত রাও রে"

মাতা পিতা কেহই কন্তার নদী-স্নানে সম্মতি দিল না।

মাতা বলিল—

"মদন-সা দেওয়ানে তোমারে জুড়নী করিছে রে
ঘুরের ঝিয়ারী কইন্তা লজ্জা নাই তুর রে।

---

* জুড়নী অর্থে জোড়া বাঁধা বা জোড়া মিলান।

সঙ্গীতের এই অংশটুকু কোন কোন স্থলে বিভিন্নরূপে গীত হইয়া থাকে—

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

রূপস তেলাই চলি গেলা নদায়ার ছিনারে
সখীগণ লইয়া কইন্তা কট্ খেইড় খেলে
বউল গাছের তল বসি মদন রাজা দেখে
খেশ্ ভালা দেখিল্ রাজা আরিয়ার চর
মাথা ভালা দেখিল্ রাজা ডাব নারিকল
চক্ষি ভালা দেখিল্ রাজা হাগের দুই তারা
ঠোঁট ভালা দেখিল্ রাজা হাচিপানের বিয়া
এই সব দেখিয়া রাজা গুয়া পিঠি লইলা
পাটে হামাইয়া রাজা কবাট লাগাইলা
বাইরে জিগাইলে রাজা না দিলা উত্তর

*   *   *   *   *   *   *   *

কইন্তা বাইরে যদি খুসিয়ে না দেও বিয়া
আস্পায় রাখিমু আমি বারইর বাড়ী গিয়া

বাড়ীর নিকট যাইগো দীঘ খনাই দিমু রে
চারি পারে রোপিয়া দিমু চাম্পা নাগেশ্বর রে।
কাপিলার দুগ্ধ দিয়া যাইগো দাঘি ভরাই দিমু রে
তাহাতে নামিয়া যাই গো বাইছালী * খেলাও রে।"

বারই বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিল বোধ হয়, তাই দীঘি কামধেনুর দুধ দিয়া ভরিয়া দিতে সাহসী হইয়াছিল।

কিন্তু কন্যার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পাড়িয়া বারই পত্নী বলিল—

"যাও যাও আরে যাইগো আসিও সত্বর রে।"

কন্যা অনুমতি পাইয়া বড় খুসী হইল।

"গঙ্গার নামে লইলা কন্যায় ধলা খই ডিম রে
গঙ্গার নামে লইলা কন্যায় তৈল সিন্দুর রে।
লাল খরম পায়ে দিয়া চলিলা সুন্দরী রে
আগে পাছে দশ ধাই মধ্যে বারের ঝি রে।

নদীতে খই, ডিম ও তৈল-সিন্দুর দেওয়া আর্য্য প্রথা নহে। অনার্য্যদিগের নিকট হইতে বঙ্গীয় আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কাছাড়ী জাতি নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত এবং তাহারা নদীর প্রীতির জন্য নদীতে ডিম দিত। ভদ্র সমাজে রমণীগণ খড়ম ব্যবহার করেন না, পূর্ব্বে করিতেন কি না জানি না।

তারপর কন্যার জল-কেলির বর্ণনা আছে—

"জলেতে নামিয়া কন্যা এক শত বুড় দিল রে
গঙ্গাতে নামিয়া ভইন আলা করিল রে।"

আমাদের দেশে সয়ালার প্রথা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘমণ্ডল ব্রতের প্রতিষ্ঠার সময় ব্রতিনীকে সয়ালা করিতে হয়। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে "গঙ্গা জল" "বকুল ফুল" "দেখন হাসি" প্রভৃতি পাতাইবার প্রথা আছে। রবি বাবুর "চোখের বালিতে" ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সময়ে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কমাইকে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল—

"কার বধূ কার ঝিউ নদী সিনান করে রে
সিনান করিয়া কেশ ঝিলা * দিছে রে
ইহা দেখি ফিরোজ খাঁ বাড়ী চলি গেলা রে।"

তারপর ফিরোজ খাঁ দেওয়ান বালিকার নিকট পান পাঠাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এইরূপে ঈপ্সিতা প্রণয়িণীর প্রেম-প্রার্থনার জন্য তাম্বুল প্রেরণের প্রথা শ্রীহট্টে আজ কাল আছে কি না জানি না।

"কে না গেলায় ছাউলিয়া মুই বলি তরে রে
পান লইয়া যাও শীঘ্র বারৈ কন্যার আগে রে।"

ফিরোজ খাঁর ছাওয়াল পান লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—

"ফিরোজ খাঁ দেওয়ান তোমারে দিছইন খাইবার কাজে রে"

বালিকা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেওয়ানকে বিস্তর গালি দিল—

"ভেচায়া (এমন) ভুকক কেনে পান দিছে মোরে রে
বাপের কালীন নকর রৈলে ঘাটে পৈঠা দিতু রে
মদন সার নকর রৈলে আছাড়িয়া মারিতু রে।"

ফিরোজ-নন্দন অপমানিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ফিরোজ স্বয়ং কমাই সুন্দরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ফিরোজ স্বেচ্ছায় আপন হৃদয়ের পবিত্র প্রেম যথোচিতভাবে কমাইকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে যাইতেছিলেন। কমাই সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে অপমানিত করিয়াছে, সুতরাং তাহার হৃদয় এখন প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ফিরোজ কমাইর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—

†"গুয়া খাইয়া চাবা দিল কমাই সুন্দরীর আগে রে।"

কমাই নির্ভীকচিত্তে এবারও দেওয়ানকে বিস্তর গালি দিল। সতীর হৃদয়ে দেবতা বল দেন, ক্ষমতাশালী

* নৌকা দৌড়।

* স্নানের পর জল ঝাড়ার জন্য কেশদাম মুক্ত করিয়া দেওয়া।

† চিবান পান প্রদান অসঙ্গত প্রস্তাবের পরিচায়ক।

দেওয়ানকে সে ভয় করিল না, পাপ-কলুষিত-হৃদয় ফিরোজ খাঁ দুর্ব্বল বালিকার নিকট পরাভব স্বীকার করিল—অবনত মস্তকে চলিয়া গেল।

কমাইও মলিনমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল, বৃদ্ধা ধাইকে সাবধান করিয়া দিল যেন ঘটনা প্রকাশ না পায়—

"এত খবর না জানাইও মা বাপের আগে গো
ভেচামা তুরুক মোর কড়ার জাতি খাইল রে।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিল—

"আজিকার সিনানে মা গো এতেক বিলম্ব কেন গো
আজিকার সিনানে মা গো মুখ মইলান দেখি রে।"

ফিরোজ খাঁ কিন্তু কমাইকে ভুলিতে পারিল না, অন্য উপায়ে তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিল। সোনা বায়ইকে প্যাদা পাঠাইয়া তলপ করিল। সোনা বায়ই দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইল—আজ দেওয়ান তাহাকে অসম্ভাবিতরূপে সম্মান করিলেন। দেওয়ান আজ প্রথম তাহাকে সেলাম করিলেন—পরে নানা প্রকার সম্মান দেখাইলেন। ফিরোজ ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিয়া বলিলেন—

"শুন শুন লোক লস্কর শুন রে বচন
বায়ইরে বসিবারে দেও উত্তম আসন
(দেও নিয়া বায়েরে উত্তম সিংহাসন)
সুনার হুক্কায় তামাক দেও বায়েরে খাইতে
সুনার থালে পান দেও বায়েরে খাইতে
সুনার ঝাড়িতে জল দেও পদ পাখালিতে
জল পান আনিয়া দেও বায়েরে খাইতে
দেও নিয়া বায়েরে ডালায় মাপি টাকা রে"—ইত্যাদি

এই সম্মানের যোগ্য নয় বলিয়া সোনা বায়ই বিনীত-ভাবে অবনত মস্তকে দেওয়ানকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দেওয়ান বিবাহের প্রস্তাব করিলেন—

"তোমার ঘরে হইছে বেটী আমারে নু দিতায় রে।
তোমার ঘরের বেটী কিনি বিয়া দিবায় মোরে রে।"

শুনিয়া বায়ই শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু বিনয়-নম্র স্বরে উত্তর করিল—

"তুমিত পাস্সাই বাবা আমার কড়ার জাতি রে"

দেওয়ান এখন দেখিল বায়ই সহজে বিবাহে সম্মতি দিবে না। তখন উৎপীড়ন করিয়া সম্মতি লাভের চেষ্টা করিল। হুকুম হইল—

"হাতে দেও হাত কড়ুয়া রে পায়ে লোহার বেড়ী রে
৮০ মণ পাথর বায়ের বুকের উপর দিল রে
মর্‌চর্ ধুম্বা দিয়া বায়ইরে গরু ঘরে থইবায় রে
বুক ফাটিয়া রুধির পরে সোনা বায়ের গায়ে রে"।

কিন্তু সহিষ্ণু, অটল, অচল সোনা বায়ই—

"তবে ত না কবুল করে বিবাহের কোন কথা রে"

এদিকে—

"খবর উলিয়ারা সরা দিল কমাই সুন্দরীর আগে রে—
কি কর কন্যা তুমি কি কর বসিয়া
সোনা বায়ের কষ্ট দেখি আইলাম দৌড়িয়া।"

কমাই শুনিয়া সাহসে বুক বাঁধিল—পিতার কষ্ট বালিকা সহ্য করিতে পারিল না, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। মাতা ও ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"শুন শুন আরে মাইগো কইয়া বুঝাই তরে
সোনা মুখে বিদায় দিবায় মাইগো লাড়াই যে করিমু রে
একই বেঞ্জন ভাত ছালন মাই গো একই জালে
রান্দবায় রে।
কোথায় গেলা দাসী মাই গো কইয়া বুঝাই তরে রে
জল্‌দি করিয়া দুই মারারে সাজন করিয়া আন রে।"

তৎক্ষণাৎ দুই মারা* মাওফা লইয়া উপস্থিত হইল।

---

* পাকীবাহক—যাহাতে পাকীতে গমনকালে হিন্দুগণ পান তামাক খাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই হিন্দুজাতীয় বেহারার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কোন কোন সঙ্গীতে এই ঘটনার বৈষম্য লক্ষিত হয়, যথা :—

"হেন কালে ফিরোজ খাঁর কি না কর্ম্ম কইল রে
লাড়কাড়ের মারা দিয়া মাওফা পাঠাইল রে।"
লাড়কাড়ের চুড়ি দিয়া নবৈন্ত বসাইলা রে
মুসলমানী চুড়ি মাংগী পাটায় পুষাইলে ছেচ রে,
হিন্দুয়ানী চুড়ি গাছি পরিধান কর রে।"

কমাই অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মাতা, খুড়ী ও ধাত্রীর নিকট বালিকা সাশ্রু নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়ের পূর্ব্বে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন (পদ্মপুরাণে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের তালিকা আছে) রন্ধন করিয়া কমাই সকলকে ভোজন করাইল ও পিতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন সযত্নে তুলিয়া রাখিল। পরে ভাণ্ডার হইতে এক বাটা পান ও একটি ঘৃতের হাঁড়ি সঙ্গে লইল ও একখানা হীরার কাটারী খোঁপায় লুকাইয়া রাখিল। পরে সকলের নিকট বিদায় লইয়া বালিকা মাওফায় উঠিল—

"সাক্ষী হইও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইও তোমরা রে
সাক্ষী হইও দেবদুর্গা সাক্ষী হইও তোমরা রে
সাক্ষী হইও মারা ভাই সাক্ষী হইও তোমরা
আওলা আকবরে মদন সাহা স্বামী রে।"

বালিকার হৃদয়ে স্বামি ভক্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে মদন সাহাকেই আত্মদান করিয়াছে—জীবনে মরণে মদন সা তাহার স্বামী; সুতরাং বিদায় কালে স্বামীর চরণ চিন্তা করিয়া লইল।

পরে,

"পৃছে মেলা দিয়া হুকুম ফিরোজ খাঁর বাড়ী যায় রে
গুয়া বাটা খাইয়া কমাই রে ছাবা বাটা কইল রে।"

ইত্যবসরে এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া গেল—

"ঘরের মারা উঠিয়া বলে আগার মারা ভাই রে
সুয়ারির তলে দেখি রক্ত বহিয়া যায় রে।"

কিন্তু 'আগার মারা' এই কথা বিশ্বাস করিল না, উত্তর করিল—

"জাত বারৈর কন্যা গুয়া খাইছে বিস্তর রে।"

ফলে ফিরোজ খাঁর জাঙ্গালে উঠিয়া কন্যা গলায় ছুড়ি দিয়া স্ত্রী-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছিল।

"ঘৃত খানি দিয়া কন্যা গলা মাজন করে
ফিরোজ খাঁর জাঙ্গালে গিয়া সোণার কাটাইল করে
পান যে খাইয়া কমাই রে কাটারি যে খাইল রে।"

পরে ফিরোজ খাঁর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া মাওফা পৌঁছিল—মাওফা বরাবর অন্দর মহলে নেওয়ার জন্য ফিরোজ খাঁ আদেশ করিলেন—

"আবের পাখা লইয়া ফিরোজ খাঁর মা আসিলা সত্বরে
ঢাকুনী খসাইয়া দেখে কাটারী যে খাইছে রে।
ছিহ্বাতে কামর দিয়া ঐ যে ফিরোজ খাঁর মা গেলেন
চলিয়া রে—
পটকন খাইয়া পড়ে ঐ যে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান রে।
খাইলু না ছুইলু না বধের ভাগী হইলু রে।"

ইত্যবসরে মদন সা বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল। শোকে ও দুঃখে একান্ত পীড়িত হইয়া মদন অস্থির হইয়া গেল—এই ভীষণ অনর্থের মূলে ফিরোজ খাঁ, এই সংবাদ শুনিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

"ঢুল কাড়ার বারি শুনি মদন সায় জিজ্ঞাসে রে
কিসের ঢুল কাড়ার বারি এই নগরেতে রে।
ঢুল কাড়ার বারি হইছে ফিরোজ খাঁর বাড়ী রে
ফিরোজ খাঁয় করিতা বিয়া সোণা বারুইর পুড়ি রে।
অগ্নির মধ্যে ঘৃত দিলে যেমন জ্বলি উঠে রে—
তেন মত জ্বলে ঐ যে মদন সায় অন্তরে রে।
ঘোড় ঘোড়া দৌড়াইয়া গেলা ঐ যে ফিরোজ খাঁর বাড়ী রে
ফিরোজ খাঁর বাড়ী ঘর পুড়িয়া ভস্ম কইল রে
ফিরোজ খাঁর পুতায় মদন সায় পুষ্করিণী দিল রে।
ফিরোজ খাঁর বংশ নাশ কমাই কন্যার লাগি রে।"

এইরূপে মদন সা প্রতিহিংসা সাধন করিয়া তৃপ্ত হইল।

উপসংহার ভাগটি কোনও কোনও সঙ্গীতে ভিন্ন রূপে গীত হইয়া থাকে। ফিরোজ যখন বুঝিলেন তিনিই কন্যার মৃত্যুর কারণ, তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজেও গলায় ছুড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

"আমার কারণে কন্যায় আপনে কাটাইল খাইছে
আপন হস্তে ফিরোজ খাঁর কাটাইল করে লইছে।
আপন্নার সাথে ফিরোজ কাটাইল যে খাইছে।

* * * *

* * * * * *

মদন সার জুড়া কন্যা ফিরোজ না পাইছে
সেই কন্যার জন্য ফিরোজ আপনি মরিছে—
মরা ফিরোজ মদন সায় শূলে দিয়া থইছে।"

আজিও সেই প্রদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—সেই প্রবাদের মূলে ফিরোজ খাঁ—

উকীল মাইনকর হাটা দুটি
টেরা মাইনকর বিয়া।
তিন দিন রইলায় রে ফিরোজ
পাগুড়ী মাথায় দিয়া॥

এই ঘটনার পরে সাত ঘর লোক * আদমপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকে, ইহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি আদমপুরে বাস করিতেছে।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

সন্তান পালন

শিশুর জন্ম হইতে ছয় মাস—শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার নাড়ী কাটার আবশ্যক। নাভিমূল হইতে ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমিত নাড়ী বাদ দিয়া ছেদন করিতে হয়। ছেদন করিবার পূর্ব্বে ছেদ্য স্থানটীর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ও নিম্নে সূতা দ্বারা দৃঢ়ভাবে দুইটী বন্ধন করিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে শিশুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ করে। এখন আর তাহার মাতার আহারে তাহার আহার হয় না। মাতার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ হয় না। নাড়ীচ্ছেদ হইলে শিশুকে কাপড়ে জড়াইয়া পিড়িতে করিয়া সূতিকাগারের যে স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া প্রসূতীর সুশ্রূষার দিকে মন দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে অবসর মত শিশুটির দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

সদ্য প্রসূত শিশু—মাটীতে পড়িয়াই শিশু কাঁদিয়া উঠে, ইহা খুবই সুলক্ষণ। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদে না, অনেক সময় তাহার জীবন লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এরূপ স্থলে শিশুর বুকে পিঠে চাপড় মারিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে শীতল জলের ঝাপটা দিতে হয়, তাহা হইলে শিশু কাঁদিয়া উঠে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ করে। সদ্যোজাত শিশুর ওজন প্রায় সাড়ে তিন সের। ইহা লম্বায় এক হাতের কিছু উপর। ইহার নখগুলিকে প্রায় আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে দেখা যায়। মাথায় চুল যে কিছু না থাকে এমন নয়, কিন্তু খুব বেশী নয়। শরীরটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল। সমস্ত শরীরে এক রকম তৈলময় লেপ লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। এ সময় ইহার ইচ্ছা-শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবন রক্ষার জন্য সে সর্ব্বতোভাবেই জননী বা ধাত্রীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ধাত্রীর শিশুর সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করা উচিত। তাহার কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি আছে কি না, হস্তপদাদিতে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা আছে কি না, এ সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। চক্ষুর পাতা খুলিয়া দেখা উচিত যে চোক দিয়া কিছু পড়ে কি না। শিশু মলমূত্র ত্যাগ করিল কি না তাহারও সংবাদ রাখা উচিত।

সদ্যোজাত শিশুর স্নান—ইহার পর শিশুকে স্নান করান আবশ্যক। অষ্ট প্রহরের জন্য যে স্ত্রীলোকটি থাকিবে, যাহাকে চলিত কথায় "আটপউরে" দাই বলে—শিশুকে স্নান করান তাহারই কাজ। স্নানের সময় ঘরের দুয়ার

* আজবদি, সেখ পরাণ, মঙ্গল খাদিমদার, সেখ লাথু, মাধাবদি মাংলখিল, ভুবার খাঁ।

জানালাগুলি বন্ধ করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া শিশুর সর্দ্দি হইতে পারে। স্নানের গামলাটির অর্দ্ধেক জলপূর্ণ করিবে। জল অল্প গরম হওয়া চাই। স্নানের পর শিশুর জন্য যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে, স্নান করাইবার পূর্ব্বে সেগুলি হাতের কাছে রাখা আবশ্যক। "আটপউরে" দাই, আপনার ক্রোড়ের উপর একখানি তোয়ালে বিছাইয়া তাহার উপর শিশুকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে। তাহার পর ক্ষিপ্রতা সহকারে অথচ খুব সাবধানতার সহিত স্নান করাইতে থাকিবে। সর্ব্বপ্রথমে কোমল টার্কি স্পন্জ্ দ্বারা, অভাবে নরম ন্যাকড়া সাহায্যে, শিশুর মুখমণ্ডল ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুখ মুছাইয়া দিবে। তাহার পর এক খণ্ড লিণ্টে অথবা মোটা অথচ নরম ন্যাকড়াতে সাবান মাখাইয়া মুখ বাদে শিশুর সর্ব্বগাত্রে সাবান মাখাইয়া উহাকে জলপূর্ণ গামলাটির মধ্যে বসাইয়া দিবে। গলা পর্য্যন্ত যেন জলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। শিশুর ঘাড় অতিশয় নরম। মাথাটাকে খাড়া করিয়া রাখিতে সে একবারেই অসমর্থ। এই কারণে স্নান করাইবার কালে ধাত্রী তাহার বাম হস্তখানি শিশুর ঘাড় ও বগলের নিম্নে স্থাপন করিয়া উহার মস্তকটী যেন সোজা করিয়া রাখেন। এই সময় শিশুর মাথায় সাবান মাখাইয়া স্নান-কার্য্য শেষ করিবেন। শিশুর মাথায় প্রথম দিন সাবান দেওয়ার পর কয়েক দিন আর সাবান দিতে নাই। নবজাত শিশুর গাত্রে তৈলময় যে সকল পদার্থ সংলগ্ন থাকে, সেগুলিকে আলগা করিবার উদ্দেশ্যে এ দেশের দাইয়েরা শিশুর সর্ব্বশরীর তৈল দ্বারা ভিজাইয়া রাখে। ইহার কোন আবশ্যকতা নাই। প্রথম দিনের স্নানে না হউক, দ্বিতীয় দিনের স্নানের সময় এগুলি আপনা হইতে উঠিয়া যায়। স্নান করাইবার সময় শিশুর গায়ে যে যে স্থানের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া থাকে (যেমন গলদেশ বগল কুচকি প্রভৃতি) সেই সেই স্থলগুলি বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত ও ধৌত করা আবশ্যক। বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি সাহায্যে ঐ সকল স্থানের এক একটি ভাঁজ ফাঁক করিয়া দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। শিশুকে কখনও ২।৩ মিনিটের অধিক জলে রাখিতে নাই। ইহার পর তাহাকে জলের মধ্য হইতে উপরে তুলিবে। জল হইতে উঠাইবার সময় বাম হস্ত শিশুর ঘাড়ের পিছনে ও উহার বাম বগলের নিম্নে রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত উহার জানুদ্বয়ের পশ্চাতে রাখিবে। এইরূপে শিশুকে জল হইতে উঠাইয়া আপনার হাটুর উপর এক খানি শুষ্ক তোয়ালিয়া বিছাইয়া তাহার উপর উহাকে উপুর করিয়া স্থাপন করিবে, এবং অন্য একখানি শুষ্ক তোয়ালিয়া দ্বারা উহার পৃষ্ঠদেশ হাত পা মাথা গলা প্রভৃতি মুছাইয়া দিবে। অতঃপর ইচ্ছা করিলে উহার গলদেশে পৃষ্ঠে ও হস্তপদাদিতে পাউডার মাখাইয়া দিবে। ইহার পর শিশুকে এমন কৌশল সহকারে চিৎ করিবে যে চিৎ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিজা তোয়ালিয়াখানি যেন মাটিতে পড়িয়া যায়। এখন তোয়ালিয়া দ্বারা শিশুর সম্মুখটা মুছাইয়া দিবে। ইহার গলা কান বগল কুচকি প্রভৃতিতে যেন জল না থাকিতে পায়। মুখ বাদ দিয়া শিশুর দেহের অন্য সকল স্থানেই পাউডার মাখাইতে পারা যায়। ইহার পর উহাকে জামা প্রভৃতি পরাইতে হয়।

নবজাত শিশুকে জামা পরান—নাড়ী ছেদ করার পর নাড়ীর যে অংশটুকু নাভির সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে আপনা হইতে খসিয়া পড়ে। যে কয়দিন ইহা না পড়ে সে কয়দিন ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্যক। ইহাকে খুলিয়া রাখিতে নাই। দৈর্ঘ প্রস্থে ৪ ইঞ্চি করিয়া কয়েক খণ্ড ন্যাকড়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেগুলির এখন আবশ্যক। উহাদের এক খানি লইয়া কাঁচি দিয়া কাটিয়া মাঝামাঝি ফাক্ করিয়া নাড়ীর নিচে দিয়া উপরে আনিবে। তাহার পর এই বস্ত্র খণ্ডের দক্ষিণ অর্দ্ধ ভাঁজিয়া নাড়ীর উপরে রাখিবে। সেইরূপ বাম অর্দ্ধও করিবে। ইহাতে নাড়ীটী সম্পূর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত

হইবে। এইরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত নাড়ীটিকে তুলিয়া পেটের উপরে রাখিবে। তাহার পর একটা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় নাড়ীর নীচের দিকে বেশী কষিবে আর উপর দিকে ঢিলা করিয়া কষিবে। এমন না করিলে শিশুর পেটে ও বুকে অধিক চাপ পড়িয়া তাহাতে উহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ও পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। নাড়ী বেশ শুষ্ক রাখার আবশ্যক। নাড়ী শুষ্ক করার এক প্রকার চূর্ণের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নাড়ী বাঁধা শেষ হইলে শিশুকে ঋতুর উপযোগী বস্ত্র পরাইবে, ও একখানি রুমালের আকারের ন্যাকড়াকে কোণা-কুণি দুভাঁজ করিয়া শিশুর কোমরে ও সম্মুখে বাঁধিয়া দিবে। নাড়ী যত দিন না খসিয়া পড়ে ততদিন পূর্ব্বোক্ত ভাবে নাড়ীর যত্ন করিবে। নাড়ী খসিয়া গেলে, নাড়ীর উপর পুরু করিয়া একটা তুলার গদি দিয়া তাহার উপর ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিবে।

শিশুর চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির যত্ন—শিশুকে জামা পরাণের পর তাহার চোক কান নাক মুখ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। চোক দিয়া কিছু পড়িতেছে কিনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবে: সকলের শেষে মুখের মধ্যটা পরিষ্কার করিয়া দিবে। ডাইন হাতে তর্জ্জনীতে নরম ন্যাকড়া জড়াইয়া আঙ্গুলটি অল্পোষ্ণ জলে ডুবাইয়া তাহার দ্বারা মুখের মধ্য পরিষ্কার করিয়া দিবে। ইহার পর গ্লিসিরিন্ অব্ বোরাক্স নামক ঔষধ অথবা মধুতে সোহাগার খৈ মাড়িয়া তাহার একটু শিশুর মাড়িতে, জিহ্বায় ও তালুতে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিবে।

শিশুর প্রাত্যহিক স্নান—শিশুকে প্রত্যহই একবার করিয়া স্নান করান আবশ্যক। স্নানের পর প্রতিদিনই নূতন বস্ত্রাদি পরাইয়া দিবে। পূর্ব্ব দিনের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি না কাচিয়া পুনরায় ব্যবহার করিতে নাই। স্নান করাইবার কালে শিশুর হাত পা পাছা মুখ বেশ করিয়া ধোয়ানের আবশ্যক। স্নানের সময় নাড়ীটার প্রতিও লক্ষ্য করিতে হয়। স্নানের পর অনেকে একবার মাথায় বুরুষ দিয়া থাকেন। বুরুষ দিয়া চুল আঁচড়াইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়ার আবশ্যক। এ সময় শিশুর মাথার হাড় ভারি নরম থাকে। মাথার একটি স্থান এত নরম থাকে যে, হাত দিলে "তুল তুল" করে। দেড় বৎসর বয়স হইলে, তবে এ স্থানটি শক্ত হয়। মাথার এই কোমল স্থানটিতে যদি সামান্যমাত্র আঘাত লাগে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

শিশুকে খাটে শোয়ান—এদেশে শিশুকে ও প্রসূতিকে এক বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহা ভাল নহে, শিশুকে পৃথক ভাবে তাহার নিজের কাছে শোয়াইয়া রাখা উচিত। কেবল স্তন্যদান করিবার সময় প্রসূতির নিকট আনা উচিত। স্নানের পর শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া তাহার নিজের খাটে শোয়াইয়া রাখিবে, কোনরূপ বিরক্ত করিতে নাই। অনেকে শিশুকে অযথা দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে শিশুর ঘুমের পক্ষে সুবিধা না হইয়া বরঞ্চ অসুবিধা হইতে দেখা যায়। স্তন্যদান করার পর শিশু আপনা হইতেই ঘুমাইয়া পড়ে। শিশুর পক্ষে প্রচুর নিদ্রা ও বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত আবশ্যক। তাই বলিয়া তাহার গাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগিতে পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখার অবশ্যক।

শিশুর নেঙটী ও মলমূত্র ত্যাগ—শিশু যে সময় নিদ্রিত থাকে, তাহাকে না নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না করিয়া ধাত্রী বা দাই মধ্যে মধ্যে দেখিতে থাকিবে যে সব ঠিকঠাক্ আছে কি না, মলমূত্র দ্বারা কাপড়চোপড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে কি না। যদি এমন দেখা যায়, শিশু ঘুমাইতেছে না, কেবল ক্রন্দন করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইয়াছে, সে যে পাশে শুইয়াছিল সে পাশে

আর শুইয়া থাকিতে পারিতেছে না। পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার পরও যদি তাহার ক্রন্দন না থামে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয়ত প্রস্রাব করায় তাহার বিছানাপত্র ভিজিয়া গিয়াছে, সেই জন্য তাহার অসুবিধা হইতেছে। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে ভিজা নেওটি প্রভৃতি বদলাইয়া দিবে। শিশুর নেওটিগুলি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। এগুলি সোডা দিয়া কাচা উচিত নয়। সোডায় কাচা কাপড় পরাইলে, শিশুর চামড়া লাল হয়, এবং চাকা চাকা দাগ বাহির হয়। মলমূত্রযুক্ত বস্ত্রাদি অধিক কাল শিশুর ঘরে রাখিতে নাই এবং সেগুলি ঐ ঘরের মধ্যে কাচা উচিত নয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে এক বার মলমূত্র ত্যাগ করিতে দেখা যায়। প্রথম ৪।৫ দিন শিশু যে মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা কতকটা কালচে গোচ, এবং কতকটা আঠার মত। ইহার পর মলের রঙ ফিকে হলদে হয়। এই মলই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। সুস্থ শিশু সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টায় ২।৩ বার মল ত্যাগ করে। শিশুর মলে কোন রূপ দুর্গন্ধ থাকিতে দেখা যায় না। শৈশবে মল কতকটা নরম থাকে, এবং উহার বর্ণ ফিকে হলদে হয়। একটু বড় হইলে তবে ধাধা মল হয়। মলের মধ্যে দুগ্ধের কুচি থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর ভাল হজম হইতেছে না। মলের রঙ যদি সবুজে গোছ হয় এবং উহার মধ্যে যদি দুগ্ধের কুচি থাকে, কিম্বা মল যদি আমরক্ত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য চিকিৎসক ডাকার আবশ্যক জানিবে।

শিশু যেমন অভ্যাসের দাস এমন আর কেহ নহে। অভ্যাস করাইলে সে নিয়ম মত সময় ভিন্ন অন্য সময় মলমূত্র ত্যাগ করে না। শিশুর নেওটি যদি প্রস্রাব লাগিয়া ভিজিয়া যায়, তাহা হইলে বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বদলাইয়া দিবে। ভিজা নেওটি অধিক ক্ষণ থাকিতে দিলে শিশুর চর্ম্মের প্রদাহ, অথবা সর্দ্দি হইতে পারে। নেওটি বদলাইবার সময় শিশুর গাত্রে যেখানে যেখানে প্রস্রাব লাগিতে দেখিবে সেই সেই স্থান মুছিয়া দিয়া পাউডার মাখাইয়া দিবে। শিশু মল ত্যাগ করিলে উহার পাছাটি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া পাউডার লাগাইয়া দিবে। কেহ কেহ পাউডারের পরিবর্ত্তে মলম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম ভাগ জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট ও অলিভ অইল মিশ্রিত করিলে, সুন্দর মলম হয় এবং ইহার দ্বারা উত্তম কায চলিতে পারে। মল লাগিয়া লাগিয়া শিশুর পাছার চামড়া যদি লাল বর্ণ হয়, তাহা হইলে পাউডার ব্যবহার না করিয়া মলম ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

শিশুর ওজন—শিশুকে প্রতি সপ্তাহে এক বার করিয়া ওজন করা মন্দ নহে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় সে ঠিক বাড়িতেছে কি না; সাধারণতঃ জন্মিবার কালে শিশুর ওজন সাড়ে তিন সের থাকে। প্রথম সপ্তাহে তাহার ওজন বাড়ে না, বরঞ্চ কতকটা কমিতেছে দেখা যায়। ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে জন্ম সময়ে তাহার যে ওজন থাকে সেই ওজনটি ফিরিয়া আসে; ইহার পর হইতে ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে উহার ওজন ২।৪ ছটাক করিয়া বাড়িতে থাকে। গড়ে প্রতি সপ্তাহে তাহার ওজন ৩ ছটাক হিসাবে বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। জন্ম সময়ে যাহার ওজন ৩॥ সের থাকে, দেড় মাস বয়সে তাহার ওজন প্রায় ৪॥ সের হইতে দেখা যায়। তিন মাস বয়সে পৌণে আট সের, নয় মাস বয়সে পৌণে দশ সের, এক বৎসর বয়সে ১০॥ সের কি ১১ সের। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে জন্ম কালে শিশুর যে ওজন থাকে ৫ মাস বয়সে তাহার দ্বিগুণ, আর ১২ মাস বয়সে তিন গুণ হয়।

শিশুকে হাওয়া খাওয়ান—এ দেশে শিশুর যত দিন ছয় মাস বয়স না হয় তত দিন উহাকে বাড়ীর বাহির করিবার নিয়ম নাই। ইহার পূর্ব্বে বাহির করিলে যে কোন ক্ষতি হইতে পারে, আমাদের এমন মনে হয় না। দেড় মাস দুই মাসের শিশুকে অবাধেই বাহির করা যাইতে পারে। বাহির করিবার কালে

উহার দেহটি বেশ করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করা আবশ্যক। ২।৩ মাসের শিশুকে ক্রোড়ে করিয়াই বাহির করিতে হয়। আর একটু বড় হইলে গাড়ী করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে পারা যায়।

প্রথম প্রথম ১৫।২০ মিনিটের বেশী বাহিরে রাখিতে নাই। দিনটা যদি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থাকে, কি ঝড়ো হাওয়া বহিতে থাকে তাহা হইলে শিশুকে বাহির না করাই উচিত। আবার যদি এমন দেখা যায় বাড়ীর বাহির করায় শিশুর উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে; তবে বাহির না করাই ভাল। হাওয়া খাওয়াইয়া শিশুকে যখন ঘরে আনিবে তখন অতিরিক্ত বস্ত্রাদি খুলিয়া দিবে। প্রথম দিন বাহির করিয়া যদি কোন বিঘ্ন না ঘটিতে দেখা যায়, তাহা হইলে পর দিন আর একটু অধিক সময় বাহিরে রাখিবে। এই রূপে সাত দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেলে, শিশুকে সকাল বিকাল বাহিরে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল করিয়া রাখা যাইতে পারে।

শিশুর গাড়ী—শিশুর গাড়ীকে ইংরেজীতে পেরামবুলেটার্ কহে। শিশুর জন্ত গাড়ীর যে একান্ত আবশ্যক, ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। তবে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা যে কেন ইহা না দিবেন তাহারও কোন অর্থ নাই। গাড়ীখানি কিনিবার সময় বেশ করিয়া দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার স্প্রীংগুলি যেন বেশ ভাল হয়। চলিবার সময় যেন ইহা "হ্যাকোচ ম্যাকোচ" না করে। ইহার চাকাগুলিতে যেন রবার দেওয়া থাকে। ইচ্ছামত ওঠাতে নামাতে পারা যায় এমন একটি ছাদ থাকারও একান্ত আবশ্যক।

শিশুর চুষী—শিশুকে কোন রূপ চুষী চোষান উচিত নহে। সাধারণতঃ শিশুকে নিজের আঙ্গুল চুষিতে দেখা যায় ইহা মন্দ নহে। মা-ই হউন, আর ধাত্রীই হউন, ইহাদের কাহারও শিশুকে আপনার আঙ্গুল চোষান উচিতন হে।

শিশুর খেলনা—শিশুকে এক সঙ্গে একটির অধিক খেলনা দিতে নাই। এক সঙ্গে বেশী খেলনা দিলে সে কোনটি লইবে স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। ছোট শিশুর পক্ষে রাঁধারের পুতুল উত্তম খেলনা। চরক শিশুদের যে সকল খেলনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল। "বালকের ক্রীড়নার্থ এইরূপ দ্রব্য প্রদেয় যাহা চিত্রবিচিত্র, শব্দবিশিষ্ট, মনোরম, যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নহে, যাহা মুখপ্রবেশযোগ্য নহে; এবং যাহা প্রাণনাশক বা ভয়োৎপাদক নহে, তাহাই বালককে খেলা করিতে দিবে। বালককে ভয় দেখান ভাল নহে, তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।

সুস্থ শিশুকে চিনিবার উপায়—যে শিশুর দেহ সুস্থ এবং চিত্ত প্রফুল্ল, তাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিলেই চিনিতে পারা যায়। ইহার গায়ের রং মলিন বা লালচে নয়। হাত পা বেশ শক্ত, শরীরটি যেন হাড়ে মাসে জড়িত, অন্যায় রূপ স্থূলাকার নহে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩ ছটাক করিয়া তাহার ওজন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়; দিবসে এক বার কি দু'বারের বেশী মল ত্যাগ করে না। মল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নিয়মিত ভাবে প্রস্রাব করে; মল ত্যাগ কি প্রস্রাব করিবার সময় ক্রন্দন করে না; বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এবং খাইতে পাইলে তৃপ্ত ও প্রফুল্ল হয়। স্তন টানিতে কিম্বা দুগ্ধ গিলিবার কালে কোন কষ্ট হয় না, খাওয়ার পর স্বচ্ছন্দ ভাবে নিদ্রা যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনরূপ কষ্টের লক্ষণ বুঝা যায় না, স্নানের সময় অকারণ অন্যায় ক্রন্দন করে না, বরঞ্চ স্ফূর্ত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়; দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশের লক্ষণ টের পাওয়া যায়, আর একটু বড় হইলে শুইয়া শুইয়া আপন মনে হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতে থাকে। সুস্থ শিশু বেশী কান্নাকাটি করে না। ক্ষুধার সময় ভিন্ন অন্য সময় ইহাদের প্রায় কাঁদিতে দেখা যায় না। সুস্থ শিশুর চোক, কান, নাক দিয়া কিছু পড়ে না। ছয় মাস বয়সে উহার মস্তকে দিব্য চুল গজায়, তাহার গাত্রে কোন রূপ দাগ বাহির হয় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

প্রেমের স্মৃতি

কিশোর কালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
জেগে উঠে মাঝে মাঝে, হিয়ার মাঝে লুপ্ত রয়।
বাঁশ বনটির ঝুঁকে ঝাঁকে
পায়রাগুলোর ঝাঁকে ঝাঁকে,
পল্লী--পথের বাঁকে বাঁকে ফুল বাগানের মধ্যখানে
ফল পাড়া আর জল সেঁচাতে সে প্রেম বুকে সঙ্গ আনে।
কিশোর কালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
লতায় পাতায় পাড়ার পথের যথায় তথায় গুপ্ত রয়।
সাঁজ পূজুনীর শাঁখের ডাকে,
বিকাল বেলার কলস কাথে,
পল্লী-বালার উজল আঁখে, দীঘির বাঁধা ঘাট্‌টি 'পরে
ছুটাছুটি খেলাধুলায় পাড়ার মাঠের বাটটি ভরে'।
শিউলি ছোপা কাপড়ে আর হোলীর দিনে রাসবাড়ীতে
পাথর পূজার পৌরোহিত্যে, শিশু পাঠের মাষ্টারিতে।
তুলসী তলার দীপ জ্বালাতে
সাঁজের ভোরের জল ঢালাতে,
কিশোর কালের ফুল তলাতে, যে বীজ বুকে উপ্ত হয়
অঙ্কুর তার জীবন ভরে' লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

সি-ইউ-কি

(ওয়াটার্স-লিখিত-ইউয়ান-চ্যাং বা হিউয়েন সাংয়ের সি-ইউ-কি'র ভূমিকা)

টমাস্‌ ওয়াটার্স ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ইয়েজিং নগরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে, তাঁহার পিতৃদেব রেভারেণ্ড ওয়াটার্সের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে বেলফাষ্টের "কুইন্স কলেজে" (Queen's College) অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করেন। ছাত্রজীবনে ওয়াটার্স সাতিশয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবর্ত্তী সনে সুখ্যাতির সহিত এম, এ উপাধি লাভ করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি চীনে গমন করেন, এবং নানাস্থানে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপে দ্বাবিংশ বৎসর চীনে অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বলা বাহুল্য, রাজকীয় কার্য্যেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। চীনে বাসকালীন তিনি চীন ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন, এবং চৈনিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৭০ সনে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হন। উক্ত দর্শন বিষয়ক পুস্তক ব্যতীত তিনি "বর্ত্তমান চীনবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহার," "চৈনিক ভাষা" প্রভৃতি আরও তিন খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া যশস্বী হন।

উল্লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত, ওয়াটার্স সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং বা ইউয়ান-চ্যাংএর পর্য্যটন কাহিনী সি-ইউ-কির অনুবাদ করেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবিত কালে এই অমূল্য গ্রন্থ যন্ত্রস্থ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে সুনামখ্যাত অধ্যাপক রিস ড্যাভিডস্‌ এবং ডাক্তার বুসেল এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

[পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ব্যারিষ্টার প্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভারতী" সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া প্রভৃতির প্ররোচনায় আমরা গত দুই বৎসরের অধিক কাল হইতে হিউয়েন সাংয়ের অনুবাদে ব্যাপৃত আছি। এই অনুবাদ (যাহা ধারাবাহিক রূপে "ভারতীতে" প্রকাশিত হইতেছে)। হিউয়েন সাংয়ের অন্যতম অনুবাদক বিল (S. Beal) কর্ত্তৃক অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া করা হইতেছে। আমরা ওয়াটার্সের অনুবাদেরও অনেক সাহায্য লইয়াছি। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক প্রবরের মতে ওয়াটার্সের অনুবাদই উৎকৃষ্ট। আমরা সেই জন্য আমাদের প্রস্তাবিত গ্রন্থে ওয়াটার্স ও বিলের যে যে স্থলে মতভেদ দৃষ্ট হইবে তাহার উল্লেখ এবং ওয়াটার্সের টীকাগুলিরও অনুবাদ সংযোজিত করিয়াছি। ওয়াটার্স লিখিত ভূমিকাও গ্রন্থে সংযোজিত হইবে। ওয়াটার্সের ভূমিকা এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

হিউয়েন-সাংয়ের নামের উচ্চারণ ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। জুলিয়েন ফরাসী ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি হিউয়েন-থসাং (Hiouen-Thsang) অধ্যাপক লেজ হুয়াম চোয়াং, বিল (Hiuen Tsiang), এবং জাপানে সুবিখ্যাত অধ্যাপক ভূনিয়ো ন্যাঞ্জো হিউয়েনখান (Huen kwan) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত উচ্চারণ হিউয়েন সাং

আমরাও আপাততঃ হিউয়েন-সাং লিখিব। এ সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের বিশেষতঃ সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য সভার কৃতবিদ্য সদস্যগণের মতামত জানিতে পারিলে বাধিত হইব।]

চীন, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে সি-ইউ-কি অন্যতম। তত্রস্থ বৃহৎ মঠগুলির অনেক পুস্তকাগারেই এই গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময় সময় ইহা বিক্রয়ার্থও উপস্থিত করা হয়। বিক্রয়ার্থ যে সকল গ্রন্থ দেখা যায় প্রায়ই তাহা এই সকল মঠস্থিত গ্রন্থের নকল এবং সাধারণতঃ কোন বিদ্যোৎসাহী বা ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্ররোচনায় নকল করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ভ্রমপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি গ্রন্থে সি-ইউ-কির দ্বাদশ খণ্ডের কেবল মাত্র দুই খণ্ডের নকল রহিয়াছে দেখা যায়।

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম " টা-ট্যাং সি-ইউ-কি " (Ta-Tang-Hsi-Yu-Chi), অর্থাৎ " সুবিখ্যাত ট্যাং রাজত্বকালীন পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা " (Records of western Lands of the great Tang period)। " সুবিখ্যাত ট্যাং " এই পরিমিত কথাটি ব্যবহৃত হওয়াতে, কোন সময়ে এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এবং এই গ্রন্থখানিকে ঐ নামীয় অন্য গ্রন্থগুলি হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। চীন দেশীয় কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থখানি কেবল সি-ইউ-চুয়ান (Hsi-Yu-Chuan) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সি ইউ-চুয়ান' অর্থে 'পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা' ধরা যাইতে পারে। কিন্তু শুধু এই নামে যে এই গ্রন্থ কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল বা প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। গ্রন্থখানি প্রথমাবস্থায় যে রূপে লিখিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে ইহাকে যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু চীনের উত্তরাঞ্চলে দশম খণ্ডে বিভক্ত একখানি এরূপ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

পুস্তকখানির 'নামপত্র' দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, ইহা ইউয়ান-চুয়াং কর্ত্তৃক "অনুবাদিত" হইয়াছে; এবং ইহা পিয়েংচি দ্বারা "গ্রথিত" হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদ কথাটি সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা উচিত নহে। ঐ শব্দটি হইতে বড় জোর অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়গুলি ইউয়াম-চ্যাং বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জনৈক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ইউয়ান-চুয়াংয়ের সংগৃহীত উপাদান হইতে পিয়েংচি এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মতান্তরে, ইউয়ান-চুয়াং সময় বিশেষে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলি পিয়েংচিকে জ্ঞাত করেন, এবং পরে পিয়েংচি এই সকল একত্রে গ্রথিত করিয়া একটি ধারাবাহিক বর্ণনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

সম্রাট্ তৈসঙ্গ (Tai-Tsung) কর্ত্তৃক যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ইউয়ান-চ্যাং আনীত ভারতবর্ষীয় পুঁথিগুলির অনুবাদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, পিয়েংচি তাঁহাদেরই অন্যতম। অনুবাদগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করাই পিয়েংচির প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি হুই-চ্যাং মঠের অন্যতম যতি ছিলেন এবং সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু পরে, তিনি সম্রাট্ দুহিতার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ইউন-চ্যাংয়ের ন্যায় ধর্ম্মাত্মার সহিত এবম্প্রকারের দুশ্চরিত্র লোকের সখ্য সম্ভবপর নহে। সি-ইউ-চি সম্বন্ধে বাস্তবিক তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। যদি কিছু থাকে, তবে, সম্ভবতঃ তিনি ইউয়ান-চ্যাংয়ের বর্ণনাগুলি একত্রীভূত করিয়াছিলেন এই মাত্র। অন্যত্র আমরা ইউয়ান-চ্যাংয়ের যে সকল রচনা দেখিতে পাই, তাহাতে তিনি এ কার্য্যের জন্য যে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের হেতুই দেখা যায় না। অধিকন্তু, একখানি পুরাতন পুস্তকের তালিকায় আমরা ইউয়ান-চ্যাং লিখিত "সুবিখ্যাত ট্যাং রাজত্বকালীন পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা" ও পিয়েংচি লিখিত "পশ্চিমাঞ্চলের বর্ণনা" নামক পুস্তকদ্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। অপিচ ট্যাং এবং স্যাং রাজত্বকালীন বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদিতে

হিউয়ান-চুয়াং 'সি-ইউ-চি' প্রণয়ন করিয়াছেন এমন উক্তি অনেক সময় দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ পুস্তকখানির দ্বাদশ খণ্ডের অন্ততঃ সপ্তখণ্ড হিউয়ান-চুয়াং স্বয়ং প্রণয়ন করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। হয়ত পিয়েংচি কোন কোন স্থানে পাদটীকা সংযোজিত করিয়াছিলেন। কতকগুলি পাদটীকা যে পরবর্ত্তীকালে দেওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি পুস্তকে এইসকল টীকা পুস্তক লিখিত হইবার পরে যোজিত হইয়াছে; এবং ইহাও সম্ভবপর যে, কতকগুলি অংশ গ্রন্থকার ব্যতীত অনেকেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সেজন্য সেগুলি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

'সি-ইউ-চির' কয়েকটি বিভিন্ন সংস্করণ দেখা যায় এবং প্রত্যেক সংস্করণের মূল গ্রন্থে ও টীকায় যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান অনুবাদের জন্য চারিটি সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম বইখানি "হ্যাংস্যাং-সি-ইউ-চি" নামে খ্যাত এবং মিং বংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মঠ সমূহে ইহার ব্যবহারের আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। লণ্ডনের "ভারত আফিসের" (India Office) পুস্তকাগারে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত জাপানী ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক আছে তাহার সহিত উল্লিখিত সংস্করণের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ "ভারত আফিসের" পুস্তকাগারের পুস্তকখানি অথবা মিং বংশের রাজত্বকালে যে পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই এতদিন পর্য্যন্ত ইউরোপবাসী পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন। ফুচোর নিকটবর্ত্তী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠের পুস্তকাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহাই দ্বিতীয়। তৃতীয়খানি জাপানী, কিন্তু লিপিকরপ্রমাদ ও অন্যান্য ভ্রমে পূর্ণ, এবং অন্যান্য সংস্করণে ও ইহাতে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। চতুর্থখানিও জাপানী সংস্করণ, কিন্তু সংশোধিত। এই সংস্করণ প্রধানতঃ কোরীয়া দেশে প্রচলিত মূল পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, এবং কোরিয়ার পুস্তকে যে সকল ভ্রম রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ এই সংস্করণে সংশোধিত হইয়াছে।

অনুবাদকগণের কথা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে করাসী দেশীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার, "টাট্যাং-সি-ইউ-চির" অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি "হিউয়েন অসঙ্গের ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ভারত ভ্রমণ কাহিনী" * প্রকাশিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যটক যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাদের ভৌগোলিক বৃত্তান্তাদিসহ অন্য আর একখানি গ্রন্থও সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যদিও মনস্বী জুলিয়েন কর্ত্তৃক অনুবাদ নির্ভুল নহে, তত্রাপি এ গ্রন্থগুলি যে যথেষ্ট মূল্যবান্ সেবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য দেশীয় ইংরাজি ভাষায় অন্য একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—উহা পরলোকগত বিল সাহেবের। এই গ্রন্থ ১৮৪৪ সনে "পশ্চিম পৃথিবীর বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক বিবরণ; হিউয়েন সিয়াংয়ের লিখিত চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত" বিল সাহেব এরূপ লিখিলেও বস্তুতঃ তিনি গ্রন্থের কতকাংশ চীন কতকাংশ ফরাসি হইতে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জুলিয়েন কর্ত্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের অনেকগুলি ভ্রম ইহাতে সংশোধন করা হয় এবং যে সকল মূল্যবান পাদটীকা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে. তাহাতে শিক্ষার্থীর প্রভূত উপকার হইবে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সি-ইউ-চির ভূমিকা কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৮৯৪ সনের 'মিউজিয়ন' (Museon) নামক সংবাদ পত্রের নবেম্বর সংখ্যায় ফরাসী দেশীয় সমালোচক গুলু (M. Gueluy) জুলিয়েন কর্ত্তৃক অনুবাদিত সি-ইউ-চির ভূমিকার সমালোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটি অনুবাদ প্রদান করেন। কিন্তু গুলুর সমালোচনা ও অনুবাদের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। এই সমালোচনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান

* Histoire de la Vie de Hiouen-Thsang et de Ses Voyages dans ('Inde, depais') an 629 jusqu'en 645.

* Buddhist Records of the Western World, Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A. D. 629).

হয় যে, সমালোচকের বৌদ্ধধর্ম্ম ও চীনভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নাই।

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক স্লিগেল সি-ইউ-চির ভূমিকার একটি অনুবাদ ও তাহার সমালোচনাও করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই প্রবন্ধে গুলুর মন্তব্যের অসারতা সপ্রমাণ করেন। যদিও স্থানে স্থানে অধ্যাপক স্লিগেলের অনুবাদ সুন্দর হয় নাই, এবং তিনি গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য ধরিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার এই প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান। গুলুর মন্তব্যের সমালোচনা করাতে, শেষোক্ত লেখক তাহার সমালোচনা ও অনুবাদের সাপক্ষে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করেন, কিন্তু গুলুর শেষোক্ত এই প্রবন্ধপাঠেও কেহ তাঁহার মতের সমর্থন করিবেন না।

সি-ইউ-চির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে একটি করিয়া ভূমিকা আছে; কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে দুইটি ভূমিকা আছে। এই দুইটি ভূমিকার শেষ ভূমিকাটি সকল সংস্করণেই বর্ত্তমান, কিন্তু প্রথমটি কেবল এই চতুর্থ ও কোরিয়া দেশীয় সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত ভূমিকাটি এতদ্দেশীয় এবং বৈদেশিক অনুবাদকগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এই ভূমিকা ট্যাং-কাওস্থ (Tang-kao-tsu) এবং তৈ-সাং (Tai-tsung) ভূপতিদ্বয়ের রাজ কর্ম্মচারী ও সুলেখক চিংপোর লিখিত। চিংপো চীন দেশীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞ ছিলেন; এবং ইতিহাস সংক্রান্ত-বিষয়ে তাঁহার মতামত বিশেষ সম্মানিত হইত। চিংসু (Chin-shu) নামক অন্যতম সুবিখ্যাত গ্রন্থের ইনিই সংগ্রাহক। চিংপোর নাম অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের সহিতও সংশ্লিষ্ট। বিশেষতঃ ট্যাং বংশের উদ্ভব এবং তৈসঙ্গ নরপতির রাজত্বের প্রারম্ভের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, উহার সহিত চিংপোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভূমিকা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকা-লেখক ইউয়ান চুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি ভূমিকায় ইউয়ান-চুয়াংয়ের নামোল্লেখ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ভূমিকা-লেখক চিংপোর মতে ইউয়ান-চুয়াংই সি-ইউ-কির একমাত্র গ্রন্থকার। চিংপো লিখিয়াছেন যে, ইউয়ান-চ্যাং এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে কিছুই ক্লেশ বোধ করেন নাই। চিংপো এই ভূমিকা ৬৪৯ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন, কারণ ঐ বৎসর তিনি রাজধানী হইতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হন, এবং পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ইউয়ান-চুয়াং ও সম্রাটকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি উভয়কেই ভালরূপে জানিতেন।

দ্বিতীয় ভূমিকাটি কোরিয়া দেশীয় সংস্করণ ব্যতীত অন্য সকল সংস্করণেই রহিয়াছে; এবং ইহা চ্যাং-ইউ (Chang-yueh) লিখিত। জুলিয়েন ইহার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন এবং মূল গ্রন্থ ব্যাখ্যাকল্পে অনেক-গুলি পাদটীকা যোগ করিয়াছেন। জুলিয়েন নিঃসন্দেহে গভীর মনোনিবেশ সহকারে ভূমিকা অধ্যয়ন এবং ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথাপি চ্যাং-ইউ কে এবং তিনি কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন, সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন নাই।

এই চ্যাং-ইউ ৬৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ এবং ৭৩০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি কাও-সাং, চ্যাং-স্যাং, জুই-স্যাং, এবং সুয়ান-স্যাং নরপতিগণের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গ্রন্থকার, পণ্ডিত ও রাজ কর্ম্মচারী বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কবিতা ও রচনাগুলি শুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে লিখিত। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চ্যাং-ইউ রাজ-কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন, এবং কিয়দ্দিবস পরেই তিনি সম্রাজ্ঞী উহৌর (Wu-Hou) কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিংনান-টাওতে (Lingnántao) স্থানান্তরিত হন, পরে তিনি আরও উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

চাং-ইউর সম্বন্ধীয় সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই ভূমিকার লেখক হইতে পারেন না। ভূমিকা-লেখক তাঁহার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজা যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি স্থ-সেং-চি প্রণয়ন করেন, এই স্থ-সেং-চির গ্রন্থকার

কাও-সাং ৬৮০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তখন চ্যাং-ইউর বয়ঃক্রম মাত্র ষোড়শ বৎসর। অর্থাৎ জুলিয়েন, শ্লিগেল প্রভৃতির মতে এই ভূমিকা ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের লেখা। আমরা ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। ভূমিকা-লেখক শুধু যে কনফিউ--সিয়াসের ধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় অবগত ছিলেন তাহা নহে, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন। বিশেষতঃ গ্রন্থকার শুধু যে ইউয়ান-চুয়াংয়ের সমসাময়িক ছিলেন তাহা নহে, তিনি ইউয়ান-চুয়াংয়ের বন্ধুও ছিলেন। তবে এ ভূমিকালেখক কে?

প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে চ্যাং-ইউর নাম দৃষ্ট হয় না। কথিত হয় যে, মিং রাজত্বকালে গ্রন্থের সম্পাদকগণ ইহা যোগ করিয়া দেন। প্রথমে ভূমিকার পূর্ব্বে কেবল নাম ও গ্রন্থকর্ত্তার পদের বিষয়ই উল্লিখিত ছিল। সুতরাং ৬৫০ হইতে ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সকল উপাধিধারী কেহ জীবিত ছিলেন কি না তাহাই দেখা যাউক। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ইউ-চি-নিং (yu-chih-ning) নামক পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তৈসাং ইহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, এবং অপ্রিয় হইলেও রাজনীতি কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তৈসঙ্গের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রও তদীয় স্থলাভিষিক্ত হইয়া ইউয়ের প্রতি আরও নানারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। সম্রাট ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউ ও অন্যান্য কয়েক জন উচ্চ পদারূঢ় রাজকর্ম্মচারীকে ইউয়ান-চুয়াংয়ের সাহায্যে নিযুক্ত করেন। ভূমিকায় যে সকল উপাধি দৃষ্ট হয় ইউ সেই সকল উপাধি এই সময়ে ধারণ করিতেন।

ইউ-চি-নিংই প্রকৃত পক্ষে এই ভূমিকার-লেখক। ইউয়ান-চুয়াংয়ের জীবিত কালেই এই ভূমিকা লিখিত হইয়াছিল এবং হিউয়ান-চুয়াংয়ের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও এরূপ ভূমিকা লেখা সম্ভবপর নহে। এই ভূমিকা হইতে সকলে অনুমান করেন যে, রাজাদেশে পর্য্যটক প্রবর হিউয়ান-চুয়াং ৬৫৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ করেন; অর্থাৎ যত গুলি পুস্তক আনীত হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই অনুবাদিত হয়। কিন্তু এক জনের পক্ষে এতগুলি পুস্তকের অনুবাদ কার্য্য যে অসম্ভব তাহা কেহই মনে করেন না। বস্তুতঃ, ইউয়ান-চুয়াং মাত্র ৭৪ খানি পুস্তকের অনুবাদ করেন। সপ্তদশ বৎসরে ৭৪ খানি পুস্তক অনুবাদ করাও বড় কম কথা নহে।

ইউয়ান-চুয়াং কর্ত্তৃক অনুবাদ গুলি রাজাদেশেই সম্পাদিত হইয়াছিল, নামপত্র হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি এবং সি-ইউ-চি যে রাজার বিশেষ আদেশে প্রণীত হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাই। ভূমিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পর্য্যটক প্রবর ৬৫৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত ট্যা-ট্যাং-সি-ইউ-চি গ্রন্থে তিনি যে সকল অজানিত দেশ, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য ও সামাজিক রীতি নীতি দেখিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

যে ৬৫৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের কথা দৃষ্ট হয়, সে গ্রন্থগুলি কি কি বিষয়ে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু মত ভেদ আছে। তৃতীয় সংস্করণে নিম্নোক্ত তালিকা দৃষ্ট হয়। যথা—

মহাযান সূত্র		২২৪
মহাযান শাস্ত্র		১৯২
স্থবির সূত্র ইত্যাদি		১৪
মহাসঙ্গিক সূত্র	”	১৫
মহিস্পশক	”	২২
সম্মিতিয়া	”	১৫
কাশুপিয়	”	১৭
ধর্ম্মগুপ্ত	”	৪২
সর্ব্বাস্তিবাদিন	”	৬৭
আরোপদ্ধতিবিষয়ক		৩৬
বাবেদর ব্যুৎপত্তিবিষয়ক		১৩
	মোট	৬৫৭

ওয়াটার্সের ভূমিকা এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। মূল ভূমিকার যদিও আমরা সুন্দর রূপে অনুবাদে সক্ষম হই নাই, তত্রাপি আশা করা যায় যে, ইহা হইতেও ওয়াটার্সের বিদ্যা, বিচার-শক্তি ও সমালোচনার প্রভাব বোধগম্য হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরিশ্চন্দ্র পাল

ঢাকা নগরীর প্রায় ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে ধলেশ্বরী তীরে সাভার গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে ধলেশ্বরীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি স্বতঃই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। সাভারের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে বংশাই নদী এবং ঢাকা নগরীর নিম্ন বাহিনী বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনটি বৃহৎ নদীর প্রায় সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হওয়াতে, সাভার স্বভাবতঃই বাণিজ্য-প্রধান স্থানের উপযোগী, এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। কাশীমপুর পরগণায় প্রায় সীমান্ত ভাগে অতি উচ্চ ভূমির উপর সাভার অবস্থিত।

এই সাভারে এবং ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে হরিশ্চন্দ্র রাজার বহু কীর্ত্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। সাভার রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীন নাম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

"অক্ষাং ২৩° ২৫′ ৫৫″ উঃ, দ্রাঘিং ৯০° ১৭′ ১০″ পূঃ। (২৫)

"বংশাবতী পূর্ব্ব তীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী,
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী॥"

এই পয়াঃটি সাভারে লোক মুখে শুনিয়াছি। ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিলে সাভারের প্রাচীন নাম সর্ব্বেশ্বর এইরূপ অনুমিত হয়। কিন্তু কাহারও মতে সাভারের প্রাচীন নাম সম্ভার। (২৬) আপাততঃ যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

কথিত আছে, হরিশ্চন্দ্র গৌড় হইতে সসৈন্যে আগমন করিয়া সাভারে রাজ্য স্থাপন করেন। বিশ্বকোষকার অনুমান করেন যে, "যে সময় সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পালরাজগণ বিক্রমপুর হইতে মানিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।" (২৭) এই উক্তির কোনরূপ প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং হরিশ্চন্দ্র রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধেও কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন।

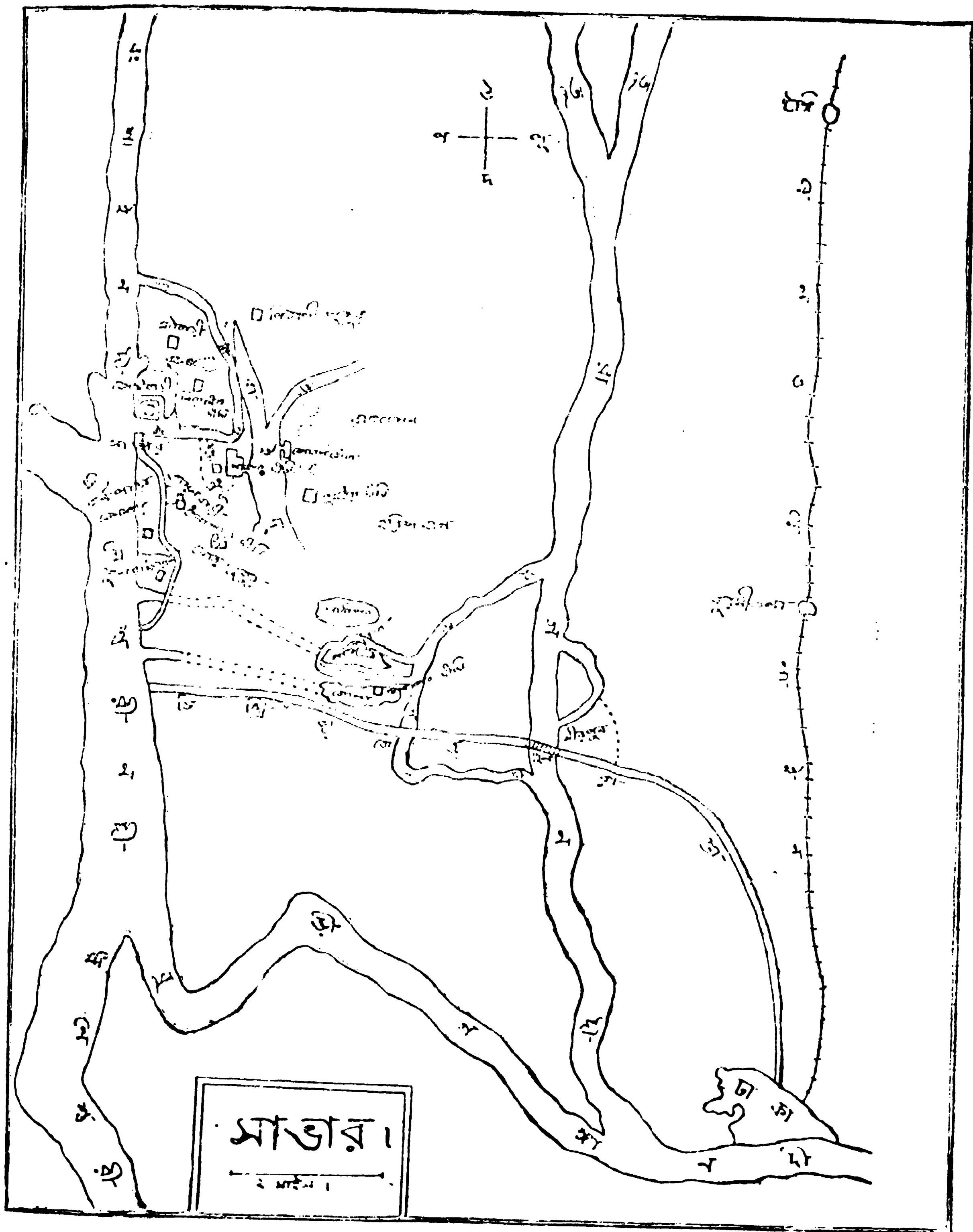
সাভার এবং তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ নিয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজধানীতে হরিশ্চন্দ্র খনিত এত দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান যে, অন্যান্য অঞ্চলে একটা পরগণাতে ইহার অর্দ্ধেক সংখ্যক জলাশয়ও দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে "কুড়ি বুড়ি" (৪০০ শত) দীর্ঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজ বাটীর চতুর্দ্দিকে ১২॥ গণ্ডা (৫০) এবং রাণী কর্ণাবতীর ভবনে (আধুনিক কর্ণ পাড়ায়) ৭॥ গণ্ডা (৩০টা) দীর্ঘিকা খনিত হয়। প্রকৃত পক্ষে সাভার অঞ্চলে এখনও এত জলাশয় দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বাক্য নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

---

(২৫) বিশ্বকোষ।

(২৬) শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার রায় বি, এ। প্রতিভা কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(২৭) বিশ্বকোষ।


উ
প
পূ
দ
সাভার।
২ মাইল।

আমরা বহুসংখ্যক দীর্ঘিকার নাম সংগ্রহ করিয়াছি; নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রবাদবাক্যানুসারে যে চারিশত দীর্ঘিকা খনিত হয়, খননের প্রায় সহস্র বৎসর পরে, অধুনা তাহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি "বাইদ্" (নিম্ন ভূমি) এবং ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয় সাভারে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে, অর্থাৎ প্রাচীন রাজধানীর সীমার মধ্যে অদ্যাপি প্রায় ২০০ দীঘিকা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরই কোন নাম নাই, সুতরাং তাহা তালিকাভুক্ত করা গেল না। যেগুলির নাম আছে, তাহাদেরও প্রায় অনেক নামই আধুনিক; হয়ত অবস্থান, প্রচলিত প্রবাদ, এবং সন্নিহিত গ্রামের নামানুসারেই পরবর্ত্তী কালে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে দীর্ঘিকাসমূহের দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইল; এবং অধিকাংশ নামের পার্শ্বে, ইহা যে গ্রামে অবস্থিত, তাহারও নাম লিখিত হইল।

১। সাগর দীঘি। দীর্ঘিকা-সমূহের মধ্যে ইহার নামই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা অতি বৃহদায়তন এবং অদ্যাপি ইহাতে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহার পশ্চিম তটে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। সাগরদীঘি 'আইচের নন্দা' (মজিদপুর) গ্রামে অবস্থিত।

২। কেলি সরোবর। মজিদপুর গ্রামে সাগরদীঘির পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা অন্তঃপুরস্থিত ছিল, এবং রাজ্ঞীগণ ইহাতে জলকেলি করিতেন, এইরূপ প্রবাদ। দীর্ঘিকাটি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে।

৩। নিরামিষ দীঘি। জালেশ্বর গ্রামে সাগর দীঘি হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রবাদ এই, ইহা বিধবা রাজ-মাতার জন্য খনিত হইয়াছিল। মৎস্যস্পর্শে জল অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় ইহাতে কোন মৎস্য থাকিতে দেওয়া হইত না। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, এই জলাশয়ের এরূপ কোন গুণ আছে, যদ্দ্বারা ইহাতে জীবিত মৎস্য ছাড়িয়া দিলেও অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪। মঠবাড়ীর দীঘি। ভাটপাড়া গ্রামে "বুরুজের" (ইহার বিষয় পরে উক্ত হইবে) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কথিত আছে, রাজস্থাপিত মঠ এই জলাশয়ের তীরেই স্থাপিত ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। এই মঠ হইতেই বোধ হয় দীঘিকার নামকরণ হইয়াছে।

৫। দুই সতীনের দীঘি। মজিদপুর গ্রামে অবস্থিত। দুইটি দীর্ঘিকা এক স্থানে খনিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষী কর্ণাবতী এবং ফুলবতীর স্মরণার্থই বোধ হয় ইহা খনিত হইয়াছিল।

৬। কোদাল ধোয়া দীঘি। আড়াপাড়া গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র একদা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজার সুবিধা ও জলকষ্ট নিবারণের জন্য এক রাত্রির মধ্যে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা খোদিত করান। খননকারিগণ এই দীঘিকায় তাহাদের কর্দ্দমাক্ত কোদাল (খনিত্র) ধৌত করিয়াছিল; তাহা হইতেই এই নামের উৎপত্তি।

৭। দোয়াত ধোয়া দীঘি। এই স্থানে রাজকর্ম্মচারিগণ দোয়াত ধৌত করিতেন; তজ্জন্যই এই নামের উৎপত্তি। ইহা বাগুইলপুর গ্রামে অবস্থিত।

৮। ছোবামারা পুষ্করিণী। জালেশ্বর গ্রামে অবস্থিত। রাজার তৈজসপত্রাদি 'ছোবা' সাহায্যে এই জলাশয়ে ধৌত করা হইত, এইরূপ প্রবাদ।

৯। কুমারা পুষ্করিণী। কথিত আছে, ইহাতে পূর্ব্বে কুম্ভীর ছিল। সাগর দীঘির পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত, মধ্যে মাত্র একটি বাইদ ব্যবধান।

১০—১৬। সাত পুকুর। জামসিন গ্রামে সাতটি পুকুর এক স্থানে অবস্থিত আছে। মধ্য স্থানের জলাশয়টি বেশ বিস্তৃত ও গভীর, অন্যগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

১৭। ধোপাখোলার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত, রাজ-রজকের জন্য খনিত।

১৮। মালী পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত। মালীর ব্যবহারের জন্য খনিত।

১৯। কুমার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত। কুম্ভকারের সম্পত্তি।

২০। তাম্বুল বাড়ীর পুষ্করিণী। কর্ণপাড়া গ্রামে অবস্থিত। দোলমঞ্চ, তাম্বুল বাড়ী এবং রাজ-গুরুর আশ্রমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান।

২১। সেনা বাড়ীর দীঘি। কর্ণপাড়াস্থিত; প্রাচীন সেনানিবাসের অন্তর্ভূত।

২২। রাজ-গুরুর পুষ্করিণী। কর্ণপাড়া গ্রামে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে রাজগুরুর আশ্রম বর্ত্তমান ছিল।

২৩। শ্মশান পুকুর। মানুষপোড়া টেকের সংলগ্ন শ্মশান-সন্নিহিত।

২৪। বেল গাছি পুকুর।
২৫। কলা গাছি পুকুর।
২৬। বট গাছি পুকুর।
২৭। তাল গাছি পুকুর।
২৮। বড়ই গাছি পুকুর।
(২৪–২৮) সেনাপাড়ার দক্ষিণে অবস্থিত। বোধ হয় সেনাগণের ব্যহারের জন্য খনিত হইয়াছিল। নাম শেষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

২৯। জীয়স পুষ্করিণী। প্রবাদ এই, ইহাতে দুগ্ধ দিলে গাভী দুগ্ধবতী হয়, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, জীয়স পুষ্করিণী নামধেয় জলাশয় গুলিতে কোনরূপ বৌদ্ধ ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইত।

৩০। চৌমাথা পুষ্করিণী। ভাটপাড়ার নিকটে রাজধানীর চারিটি সুপ্রশস্ত রাজপথের সঙ্গম-স্থলে এই জলাশয় খনিত, এইরূপ প্রবাদ।

৩১। কবিরাজ পুষ্করিণী। সাভার।

৩২। ব্রহ্মচারীর পুষ্করিণী। সাভার।

৩৩। বড় আখরার দীঘি—সাভার (পুকুর পাড়)।

৩৪। শোলার দীঘি—বলি মেহার।

৩৫। দেব পুষ্করিণী—বলি মেহার।

৩৬–৩৮। তাল বাগের পুষ্করিণী—(পাশাপাশি তিনটি) বলিমেহার।

৩৯। সাত গাছি পুকুর—বলি মেহার।

৪০। লাল টেকির পুষ্করিণী—বলি মেহার।

৪১। বড় ফুরার পুষ্করিণী—বলি মেহার।

৪২। ছোট ফুরার পুষ্করিণী—আনন্দপুর।

৪৩। বন পুকুর—বাড্ডা।

৪৪। জলরি—বাড্ডা।

৪৫। কইঠার পুষ্করিণী—বাড্ডা।

৪৬। ইমাম বাড়ীর পুষ্করিণী—বাড্ডা।

৪৭। ইদ বাড়ীর পুষ্করিণী—বাড্ডা।

৪৮। লাল পুকুর—জালেশ্বর।

৪৯। চটীমারা পুষ্করিণী—জালেশ্বর।

৫০। আইচের পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫১। চৌধুরী বাড়ীর পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫২। ঠাকুর বাড়ীর পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫৩। ভাটপাড়ার দীঘি—ভাটপাড়া।

৫৪। চাইরা পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫৫, ৫৬। জোড় পুষ্করিণী—(পাশাপাশি দুইটি) গাওা।

৫৭। বিরিঙ্গির পুষ্করিণী—গাওা।

৫৮। রাজা বাড়ীর পুষ্করিণী—গাওা।

৫৯। পিঠালী পুকুর—নয়া বাড়ী।

৬০। বাঘার পুষ্করিণী—মদনপুর।

৬১। দীঘি—রাড়ী রাড়ী।

৬২। সারাক্ষেত শুখা পুষ্করিণী—রাজার নন্দা।

৬৩। দেবপুকুর—জামসিন।

৬৪ ডাকাতমারা পুষ্করিণী—জামসিন।

৬৫। ছইলার পুষ্করিণী—ছইলা।

৬৬। মজুমদার বাড়ীর পুষ্করিণী—উলাইল।

৬৭। কানাইলালের পুষ্করিণী—কাৎলাপুর।

৬৮। বয়রা বাড়ীর পুষ্করিণী—বয়রা বাড়ী।

৬৯। শুখা পুষ্করিণী—মজিদপুর।

৭০। ইছামতী পুষ্করিণী—কর্ণপাড়া।

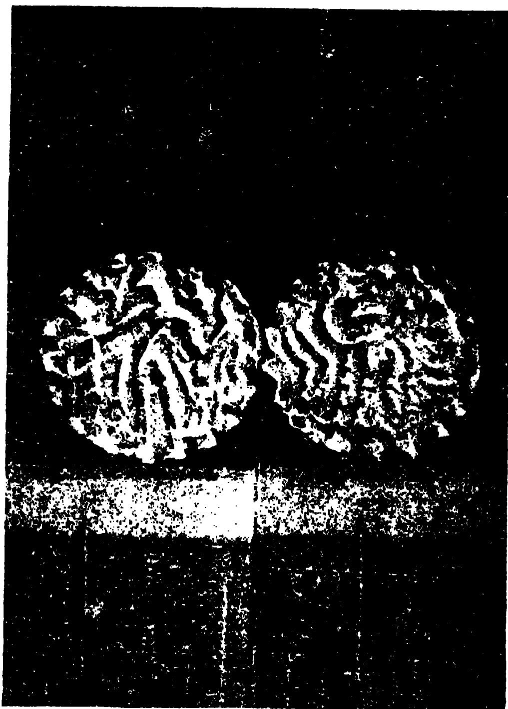
৭১। ক্ষিপ্রগতি সরোবর—ফুলবাড়িয়া।

৭২। খন্দকার পুকুর—কোণ্ডা, ইহার নামের উৎপত্তি পরে বর্ণিত হইয়াছে।

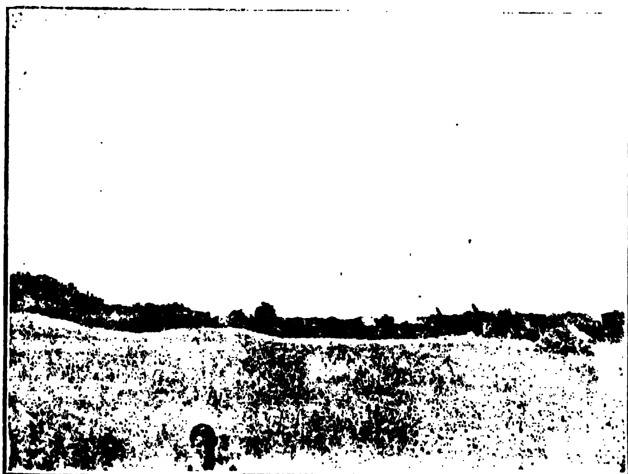
৭৩। রাজার পুকুর—বাগবাড়ী।



[১নং] সাগর দীঘি এবং তাহার পশ্চিম তটস্থ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ।



[২নং] সাভারে প্রাপ্ত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা।



[৩নং] হরিশ্চন্দ্রের রাজাসন।

৭৪। সুখসাগর।

৭৫। রাজসাগর।

৭৬। ধন পুকুর।

৭৭। নির্ম্মুইলা পুকুর।

৭৮। পেট কাটা পুকুর।

৭৯। হাড়ি বাড়ীর পুষ্করিণী।

৮০। আন্ধার ডথা।

৮১। সলায় (ঝাঁটা ধোয়া) পুকুর—কথিত আছে পুরবাসীগণের সম্মার্জ্জনী ধৌত করিবার জন্য এই জলাশয় খনিত হয়।

৮২। চৌমাচ্চা পুষ্করিণী।

৮৩। নাওগাড়া পুষ্করিণী।

৮৪। বেকাই পুষ্করিণী।

৮৫। কেউচার পুষ্করিণী।

৮৬। সাগর ডুগী।

৮৭। সাতবোয়াইলা পুকুর।

৮৮। নালার ঘোণা।

৮৯। আন্ধা পুকুর।

৯০। সানবান্ধা পুষ্করিণী—ইহাতে সুস্পষ্ট বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্ত্তমান।

৯১। দাইতা বাড়ীর পুকুর।

৯২। সত্তপালোয়ানের দীঘি।

৯৩। গজারিয়ার দীঘি।

৯৪। মরা পুকুর।

দীর্ঘিকার এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী কিরূপ সুশোভিত, সমৃদ্ধিশালী, এবং বহুবিস্তৃত ছিল। সাভারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ত্রিশ খানি গ্রাম লইয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তাহা তৎখনিত দীর্ঘিকা সমূহের অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়।

জলাশয় ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের আরও বহু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সাগর দীঘি সুবিস্তীর্ণ জলাশয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই বৃহৎ দীর্ঘিকার পশ্চিম তটে রাজবাটী এবং রাজান্তঃপুরের ভগ্নস্তূপাদি বর্ত্তমান। [১নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রায় ১৫।২০ হাত উচ্চ কয়েকটি ইষ্টকবহুল মৃত্তিকাস্তূপ এখন সেই সুবিশাল রাজপ্রাসাদের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। স্তূপগুলি এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ এরূপ নিবিড় বর্ণাকীর্ণ যে, এমন কি হস্তীরও তথায় প্রবেশ লাভ বহু আয়াসসাধ্য। হস্তী-পৃষ্ঠে আমরা বহু পরিশ্রমে এই স্থান দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিদর্শকগণের পক্ষে এই সমস্ত স্থান দর্শন করিবার জন্য শীতকালই উপযোগী, কারণ তখন অরণ্যানী এত নিবিড় থাকে না।

স্তূপগুলির উপরিভাগে খালের ন্যায় লম্বা ৫।৬ ফিট প্রশস্ত, এবং সুগভীর বহু গর্ত্ত দৃষ্ট হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম, সাভারের অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়িগণই এই স্থান খনন করিয়া লব্ধ ইষ্টকসমূহ দ্বারাই স্ব স্ব বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপে অতীত ইতিহাসের শেষ চিহ্নসমূহও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই সমস্ত স্থান বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে খোদিত হইলে, অতীতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের বহু উপকরণাদি অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বহু প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক ঐ স্তূপসমূহ খনন কালে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি, ইষ্টকমূর্ত্তি, খোদিত ও লিখিত ইষ্টক, কয়েকখানা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থালা এবং বহু গুপ্ত ধন অনেকে প্রাপ্ত হয়। এখনও কৃষকগণ হলচালনা-কালে প্রাচীন মুদ্রাদি, এবং মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, অজ্ঞ কৃষকগণ ইহার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া ইহা রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। আমরা বহু চেষ্টায় কয়েকটি প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি; ক্রমে যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিব।

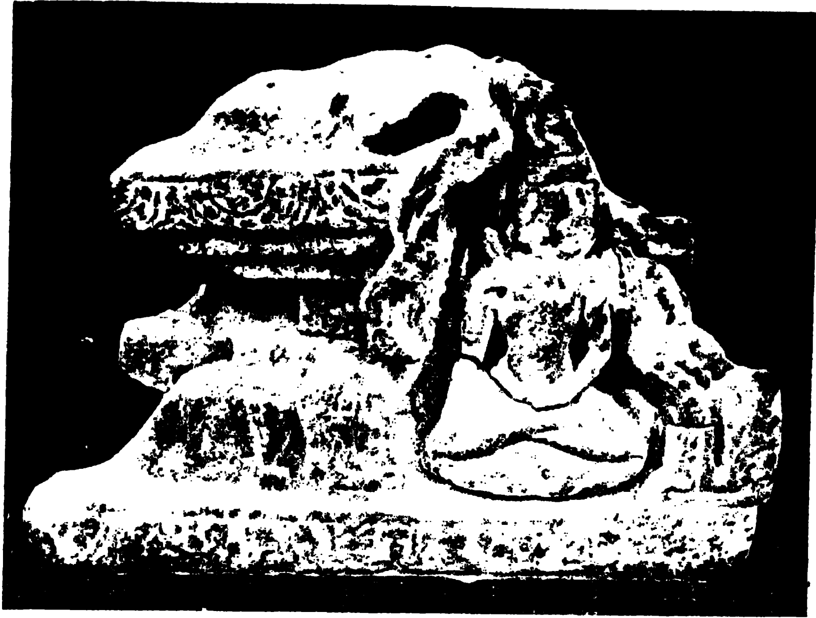
এই স্থানে আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হই যে, রাজবাটীর

সন্নিকটস্থ একটি ক্ষেত্রে হলচালন-কালে কিয়দ্দিন পূর্ব্বে জনৈক দরিদ্র মুসলমান কৃষক ৩৪টি অতি প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া উহা সাভারের জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। তদনুযায়ী অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, বহু চেষ্টায় এবং নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া উহার একটি স্বর্ণমুদ্রা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। [২নং চিত্র দ্রষ্টব্য] সাভার এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু পল্লী হইতে আমরা বহু পরিশ্রমে এবং বহু অর্থ ব্যয়ে ৫১৬টি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি; উহার কোনটিই ৪০০ বৎসরের ন্যূন প্রাচীন নহে, কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণ মুদ্রাটি ভিন্ন অপর কোন মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক মনে করি।

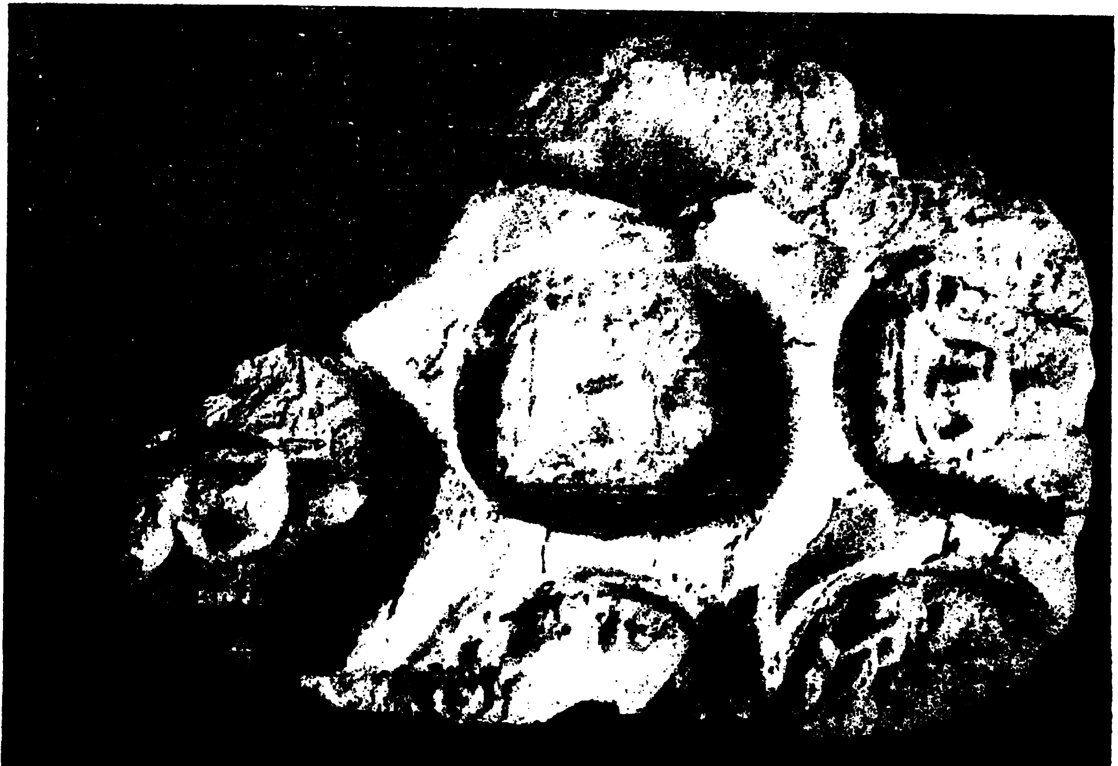
সাভারে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, হরিশ্চন্দ্র রাজা অলক্ষ্মীমূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রা তাহার রাজ্যে প্রচলিত করেন, এবং তাহাতেই তিনি নির্ব্বংশ হওয়াতে তাঁহার ভাগিনেয় দামোদর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সাভারের বহু ব্যক্তি আমাদের সংগৃহীত স্বর্ণ মুদ্রাটিকে হরিশ্চন্দ্রের সেই মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। মুদ্রাটির উভয় দিকেই দুইটি নগ্ন মূর্ত্তি অঙ্কিত, কিন্তু কোনরূপ লেখার চিহ্ন নাই। উহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন ইহার অঙ্গেই বর্ত্তমান, এবং অজ্ঞ কৃষক কর্ত্তৃক মৃত্তিকানিম্নে প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীতে যদি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে, এই মুদ্রাটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুদ্রা বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি না। এতৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিবেন, এই আশায় আমরা মুদ্রাটির চিত্র প্রকাশিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় তৎপ্রণীত " মুর্শিদাবাদের ইতিহাস " নামক গ্রন্থে রবিগুপ্তের একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাপ্ত মুদ্রাটির সহিত ঐ মুদ্রার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্থানীয় মুদ্রাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতেও, ইহা পরবর্ত্তী কালের গুপ্তরাজগণের মুদ্রা। " বিক্রমপুরের ইতিহাসে " আমাদের মুদ্রার অনুরূপ একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাহাকে সেন-রাজগণের মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু, তাহার অনুমানের কোনরূপ কারণ লিখিত হয় নাই। মুদ্রাটি কোথায় এবং কিরূপে পাওয়া গিয়াছে তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

রাজবাটী এবং রাজান্তঃপুরের পূর্ব্বদিকে সাগর দীঘি অবস্থিত; তাহার পূর্ব্ব পারে একটি বাইদ; এবং বাইদের পূর্ব্বদিকে রাজাসনের ভিটা অবস্থিত। এই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের (এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী রাজা দামোদরের) বহির্ব্বাটী ছিল। এইস্থানে রাজ সিংহাসন স্থাপিত ছিল বলিয়া ইহার নাম রাজাসন হইয়াছে। রাজাসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কুমইরা দীঘি অবস্থিত। ৪।৫টি স্তূপ মাত্র এখন রাজাসনের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। [৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য] তন্মধ্যে দুইটি স্তূপ কৃষকগণের নির্দ্দয় হল-চালনে ভূমির সহিত প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে কেবল বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি ভিন্ন এই স্তূপসমূহের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান থাকিবে না। হল-কর্ষণ-কালে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক মূর্ত্তি এবং নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত ইষ্টক কৃষকগণ প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে প্রাপ্ত তিন খানা খোদিত ইষ্টক কর্ণপাড়া নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক প্রাপ্ত হন। উহার মধ্যে একখানা বুদ্ধ মূর্ত্তি মাত্র ঢাকা সাহিত্য পরিষদে সযত্নে রক্ষিত আছে। [৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য] রাজাসনে প্রাপ্ত অপর একখানা ইষ্টক নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি রোয়াইল জমীদার বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। জমীদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন রায়, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্য মোহন রায়, এম, এ, বি এল, মহাশয় দ্বয় উক্ত ইষ্টক খণ্ড লেখককে প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। [৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য] ইষ্টক খানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত মধ্যে আটখানা বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত ছিল। পাঁচ খানা মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট আছে।



[৪নং] সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টক নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি ।



[৫নং] সাভারে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক ।

অপর তিনখানা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ মূর্ত্তি গুলি বিভিন্ন প্রকার আসন-বদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক মূর্ত্তি কৃষকগণের তাচ্ছিল্য বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজাসনে বহু খোদিত ইষ্টক পাওয়া যায়। চেষ্টা করিয়া আমরাও তাহার কয়েক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। [৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। (দক্ষিণ দিকের ক্ষুদ্র খোদিত ইষ্টকখানা পূর্ব্ব বর্ণিত গণক-পাড়ায় প্রাপ্ত; অপর তিনখানা সাভার রাজাসনে প্রাপ্ত। স্থানাভাবে মাত্র তিনখানা ইষ্টকের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল; এরূপ বহু ইষ্টক লেখকের নিকট সংগৃহীত আছে।) এই সমস্ত কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টকসমূহ হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ের স্থাপত্যের উন্নতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই রাজাসনে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা দুইখানা ভগ্ন ইষ্টক-লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। আশা করি, তদ্দ্বারা হরিশ্চন্দ্রের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার হইবে। যথা স্থানে তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে।

রাজাসনের পশ্চিমে ও উত্তরে দুইটি বাইদ্ দৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজাসনের অদূরেই পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, উহা পূর্ব্বে কোন জলাশয় ছিল। অথবা উহা রাজ-পুরীর পরিখা চিহ্নও হইতে পারে।

সাভারের উত্তর দিকে কোট বাড়ী অবস্থিত। হিন্দু রাজত্বে সাধারণতঃ দুর্গকে কোট বলা হইত। এই কোট-বাড়ী রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্গ ছিল। [৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য।] কোট বাড়ী ৫০ বিঘারও অধিক পরিমাণ ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত; এই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে এখন নানা প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়াছে, এবং ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। কোট বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এখনও ১০।১২ হাত প্রশস্ত, এবং প্রায় ১৫ হাত উচ্চ লোহিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাকার দণ্ডায়মান। দুর্গ-প্রাকারের অব্য-বহিত নিম্নেই পশ্চিমে বংশাই নদী, দক্ষিণে কাটাগাঙ্গ (ইহার বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে), এবং উত্তর ও পূর্ব্বে প্রায় ৩০ হাত প্রশস্ত পরিখা বর্ত্তমান। দুর্গটি চতুষ্কোণ, এবং চতুর্দ্দিকে চারিটি প্রবেশ পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ঐ স্থানে দুর্গ-প্রাকারে পথ পরিমিত স্থান ফাঁক আছে। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে বংশাই নদীতে একটি বাঁধান ঘাট ছিল। এখন তাহার কোন চিহ্নাদি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু, প্রাচীনগণ ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে উহার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়াছেন।

কোট বাড়ীর দক্ষিণ দিকস্থ প্রাকারের নিম্ন দেশ দিয়া বংশাই নদী হইতে কাটাগাঙ্গ আরম্ভ হইয়া রাজান্তঃপুর এবং সাগর দীঘির উত্তর দিক দিয়া ঘুরিয়া, প্রায় চতুষ্কোণ একটি ভূমি খণ্ডকে বেষ্টন করতঃ, কোট বাড়ীর প্রায় দুই মাইল উত্তরে পুনরায় বংশাই নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহা দুর্গ এবং রাজধানীর কিয়দংশের চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। কাটাগাঙ্গ অদ্যাপি প্রায় ৪০ ফিট গভীর। কাটা-গাঙ্গের ধারে ধারে প্রাকার বর্ত্তমান; কাটাগাঙ্গ খনন কালে বোধ হয় সেই মৃত্তিকা দ্বারাই এই প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাকারের বহুস্থানে ইষ্টক রাশিও দৃষ্ট হয়; এবং উহা ৭।৮ ফিট প্রশস্ত, এবং ৫ ফিট উচ্চ; স্থানে স্থানে উহা কাল-বশে অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ফুলবতী এবং কর্ণাবতী নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন। উভয়ের পৃথক পৃথক বাস-ভবন ছিল। ফুলবতীর ভবন এখন ফুলবাড়িয়া, এবং কর্ণাবাতীর ভবন কর্ণপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে। ফুলবাড়িয়া গ্রামে এখনও বহুলোকের বসতি হওয়াতে প্রাচীন চিহ্নাদি সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, এখনও তথায় হরিশ্চন্দ্র খনিত ২।৩টি দীর্ঘিকা বর্ত্তমান; এবং ফুল-বাড়িয়ার পার্শ্বে যে একটি শুষ্ক খালের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, উহাই ফুলবতী-ভবনের পরিখা ছিল।

সাভার হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কর্ণাবতী-ভবন (আধুনিক কর্ণপাড়া) এখনও অবস্থিত। এস্থানে এখনও বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

কর্ণাবতীর-ভবনে অবস্থান কালে রাজা তাম্বুলবাড়ীতে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেন, এবং বিশ্রামাদি করিতেন। একটি ভগ্নস্তূপ এখন তাম্বুলবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

তাম্বুলবাড়ীর দক্ষিণে নদী-তট হইতে অনতিদূরে দোলমঞ্চের ভগ্ন স্তূপ বর্ত্তমান। বাসন্তী পূর্ণিমায় এই স্থানে দোলোৎসব হইত। মঞ্চের অধিকাংশ সমতল করিয়া বসতি হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ আনুমানিক প্রায় ২০ হাত লম্বা, ১৫ হাত প্রশস্ত, এবং ১০ হাত উচ্চ।

দোলমঞ্চের দক্ষিণে নদী-তীরে রাজ-গুরুর আশ্রম অবস্থিত ছিল। এখন তথায় বসতি হওয়াতে তাহার চিহ্নাদি বর্ত্তমান নাই; নিদর্শন স্বরূপ উহার পূর্ব্ব দিকে অদ্যাপি রাজ-গুরুর দীঘি বর্ত্তমান আছে।

তাম্বুলবাড়ীর পূর্ব্ব দিকে সেনাপাড়া নামক গ্রাম অবস্থিত। বোধ হয়, এই স্থানে সৈন্যগণের বাসস্থান ছিল, এবং ইহা হয়ত রাজধানীর পার্শ্ব রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ ছিল। সেনাপাড়ার উত্তরে সেনাপাড়ার দীঘি অবস্থিত। সেনাপাড়ার চতুর্দ্দিকে পরিখা ছিল, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রাজান্তঃপুরের উত্তর দিকে মদনপুর নামক স্থান বর্ত্তমান। এই স্থানে হাট বাজার ছিল, এইরূপ কথিত হয়।

রাজাসনের দক্ষিণপূর্ব্বে একটি বিশাল প্রান্তর আছে। প্রবাদ এই, এই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের গোশালা এবং গোচারণ মাঠ ছিল। যে স্থানে গোশালা ছিল, তাহা অদ্যাপি গোপের বাড়ী, এবং তৎসন্নিকটস্থ গোচারণ মাঠ ঘাসমহাল নামে খ্যাত।

রাজাসনের নিকটে একটি স্থান পীলখানা নামে খ্যাত। এই স্থানে রাজার হস্তীশালা ছিল, এইরূপ প্রবাদ।

পীলখানার সন্নিকটে রথখোলা বর্ত্তমান। রথ যাত্রার দিন এই স্থানে রথ টানা হইত।

রাজাসন হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে হরিশবাগ অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থানে রাজার উদ্যান ছিল। এখন উহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজাসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং ফুলবাড়িয়া হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে গান্ধারিয়া গ্রাম অবস্থিত; ইহার প্রাচীন নাম গান্ধার গড়। বোধ হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে দুর্গ ছিল। ইহা অতিশয় সুরক্ষিত; ইহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০০ হাত প্রশস্ত পরিখা বর্ত্তমান। পরিখার কোনও কোনও স্থান সুগভীর, কিন্তু, অধিকাংশ স্থানই ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পরিখা বেষ্টিত গান্ধারিয়া গ্রাম প্রায় দেড় মাইল ভূমি খণ্ডের উপর অবস্থিত। গান্ধারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাড়ী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাবণরাজা হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয় দামোদরের বংশোদ্ভূত।

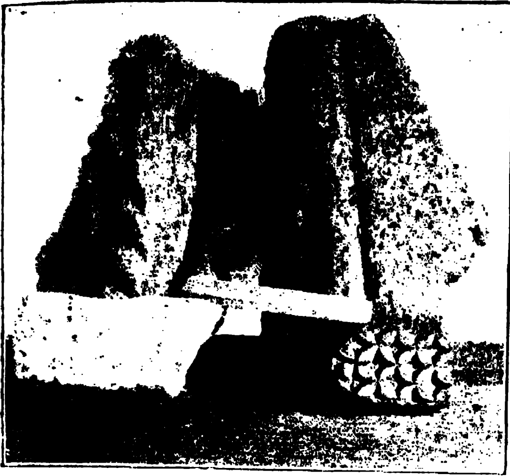
রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিমে ঢালিপাড়া নামক স্থানে বহু ঢালি সৈন্য বাস করিত, এইরূপ প্রবাদ। ঢালিপাড়ার উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বাগ বাড়ীতে রাজ-পণ্ডিতগণ বাস করিতেন।

গান্ধারিয়ার উত্তরে সাধাপুর নামক গ্রামে রজক, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ বাস করিত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি তথায় ধোপাখোলার পুকুর, মালী পুকুর, কুমার পুকুর, প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।

রাবণ রাজার বাড়ীর উত্তর দিকে মানুষপোড়ার টেক (উচ্চ স্থান) দুইটি অবস্থিত। এই স্থানে পূর্ব্বে শ্মশান ছিল। ইহার নিকটেই শ্মশান কার্য্যের জন্য একটি পুষ্করিণী বর্ত্তমান।

গান্ধারিয়ার দক্ষিণে রাজকোণ্ডা নামক একটি গ্রাম আছে। ইহাও পরিখা বেষ্টিত। হরিশ্চন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ পরবর্ত্তী কালে এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ।

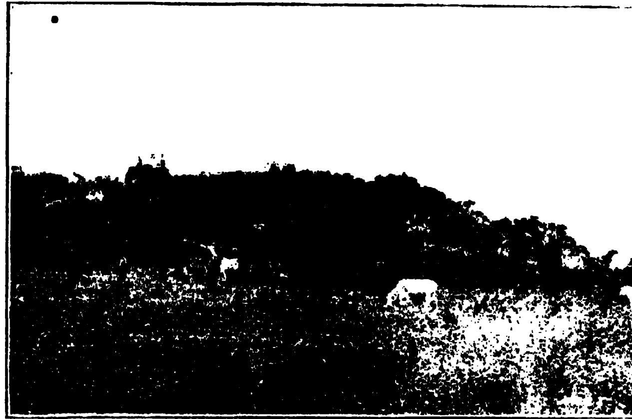
কোট বাড়ী হইতে ১॥০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ভাটপাড়া গ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম ভট্টপল্লী। রাজভট্টগণ এই স্থানে বাস করিতেন, এইরূপ প্রবাদ। এস্থানেও বহু প্রাচীন দীঘিকাদি বর্ত্তমান। তাহাদের নাম পূর্ব্বেই



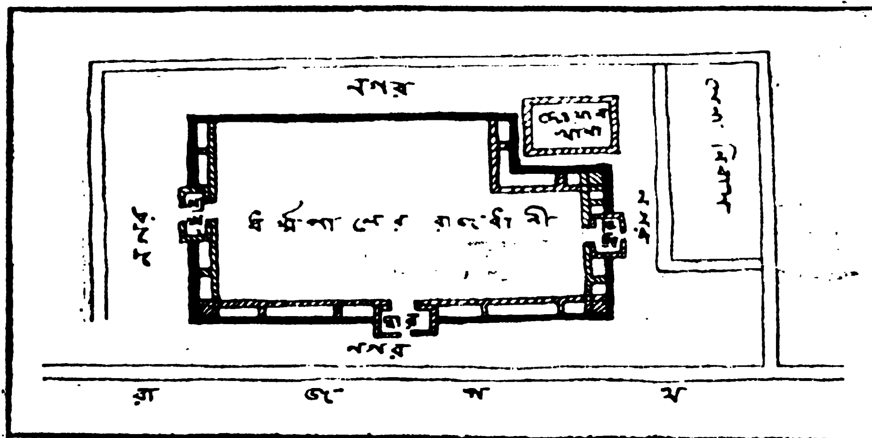
[৬নং] সাভারে প্রাপ্ত খোদিত ইষ্টক।



[৭নং] রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোট বাড়ীর প্রাকারের কিয়দংশ



[৮নং] বুরুজ অথবা নহবৎখানা।



[৯নং] ধর্ম্মপালের রাজধানীর অনুমানিক মানচিত্র।

তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রাম হইতে আমরা প্রায় ৫০ খানা প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। (২৮) সময়ান্তরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভাটপাড়ার উত্তর পশ্চিমে চাইরা চৌমাথা নামক স্থানে চারিটি রাজ পথের সম্মিলন স্থল ছিল। ইহার নিকটেই চাইরা পুষ্করিণী। মেরিখোলা নামক স্থানে পূর্ব্বে হাট বাজার ছিল, এইরূপ প্রবাদ।

ভাটপাড়ার সন্নিকটে ছইলাকল্‌মা নামক স্থানে রাজসৈন্তদিগকে লক্ষ্য স্থির করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত এইরূপ প্রবাদ। এখন সেস্থানে নিবিড় গজারী বন। বনের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু ইষ্টক স্তূপ দৃষ্ট হয়।

নিরামিষ দীঘি ও কাটাগাঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, প্রায় এক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া, এবং সমভূমি হইতে প্রায় ২৫।৩০ হাত উচ্চ একটি প্রকাণ্ড মৃৎস্তূপ বর্ত্তমান আছে। ইহাকে সচরাচর বুরুজ বলা হয়। [৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য]। স্তূপোপরি দুইটি ইষ্টকে বাঁধান কূপ দৃষ্ট হয়। একটি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে, অপরটি এখনও ১৫ হাত গভীর আছে। রাজপুরীর প্রহরীগণ বোধ হয় এই বুরুজের (Tower) উপর হইতে শত্রুর আগমন লক্ষ্য করিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা নহবৎ খানা ছিল।

সাভার এবং তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীস্থিত যে সমস্ত কীর্ত্তিচিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ আমরা উপরে সংক্ষেপতঃ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিবিড় অরণ্য মধ্যে নানাস্থানে হয়ত আরও কত অনাবিষ্কৃত ভগ্নস্তূপাদি লোক চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত আছে।

আধুনিক রঙ্গপুর জেলার যে ধর্ম্মপাল রাজার কীর্ত্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাঁহার সহিত সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্র পালের বৈবাহিক সম্পর্কাদি বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ প্রবাদ। এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, গৌড়ের পাল রাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপাল, এবং নিম্ন বর্ণিত ধর্ম্মপাল বিভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম ধর্ম্মপালের প্রায় দুই শত বৎসর পরে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় হয়। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ, চতুর্ভুজ রচিত হরিচরিত কাব্য, এবং দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরি লিপিতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্নে যথাস্থানে বিশদভাবে তাহা বিবৃত হইবে।

রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে দণ্ডভুক্তি-পতি (সম্ভবতঃ গৌর মণ্ডল) ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। সুতরাং, ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু লামা তারানাথের গ্রন্থ, এবং খালিমপুরে প্রাপ্ত প্রথম ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং, এই উভয় ধর্ম্মপালের মধ্যে দুই শতাব্দীর অধিক ব্যবধান বর্ত্তমান। গৌড়ের পাল রাজবংশের বংশাবলিতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের নাম দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র পাল প্রভৃতির ন্যায় তিনিও পালরাজবংশের আদিশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক একটি খণ্ড-রাজ্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ধর্ম্ম পালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। (২৯) ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ও বহু কীর্ত্তি চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই ধর্ম্মপাল যে পালবংশীয় নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি বহু প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তিতে পালরাজগণের রাজচিহ্ন সিংহারূঢ় হস্তীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। (৩০) ঐ মূর্ত্তি সন্নিকটস্থ এক বৈরাগীর আখড়ায় পূজিত হয়।

(২৮) ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন অধিকারী, এবং শ্রীমান শ্যামাচরণ সরকারের চেষ্টাতেই এই গ্রন্থ সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা লেখকের আন্তরিক ধন্যবাদ ভাজন।

(২৯) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 406.

(৩০) J. A. Vas's "District Gazetteer of Rangpur." Page 20.

পটিকানগর-পতি মাণিক চন্দ্র কাহারও মতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের ভ্রাতা, (৩১) এবং কাহারও মতে শ্যালীপতি (৩২) ছিলেন। মাণিকচন্দ্র মহিষী ময়নামতী এবং ধর্ম্মপাল মহিষী বনমালা (ধর্ম্ম--মঙ্গল প্রণেতা মানিক গাঙ্গুলির মতে সফুল্লা বা সাফুলা, সীতারাম ও ঘনরামের মতে সামুলা) ভগ্নী ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপী চন্দ্রের (দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ চন্দ্র, এবং চৈতন্য ভাগবতের গোপীলালের) সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার অদুনা এবং পদুনা নাম্নী দুহিতৃদ্বয়ের বিবাহ হয়। (৩৩) ইঁহারা ভারতবিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, —"যে অদুনা পদুনার নাম এক সময়ে ভারত বর্ষের সর্ব্বত্র ভাট; যোগী ও চারণগণের গাথায় প্রচারিত হইত, সে দিনও মোম্বাই হইতে যাহাদের চিত্র রবিবর্ম্মা অঙ্কিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমে লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ বহুসংখ্যক কবি যাহাদের গুণ গাথা গাহিয়াছেন, এবং যাহাদের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গলা দেশ ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপী চন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের প্রথম প্রেম-মিলন এই সাভারেই হইয়াছিল।" (৩৪)

দুর্লভ মল্লিক রচিত "গোপীচন্দ্র রাজার গান" নামক দেশ প্রচলিত পুঁথিতে মাণিকচন্দ্রের পিতৃ পিতামহের নাম পাওয়া যায়। অন্য কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইলে উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যাহা হউক, আপাততঃ আমরা উহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছি। পূর্ব্বোক্ত পুঁথিতে দুইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া যায়।

"সুবর্ণ চন্দ্র মহারাজা ধারিচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মানিকচন্দ্র শুন তার কথা।"

এই দুই ছত্র হইতে মাণিকচন্দ্রের পিতৃপিতামহের নাম পাওয়া যাইতেছে।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। সুতরাং, মাণিকচন্দ্রের তেজস্বিনী পত্নী ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের রাজ্যঘটিত গোলযোগ এবং মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র সসৈন্যে জামাতার সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। ত্রিস্রোতা অথবা তিস্তা নদী--তীরে যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র বোধ হয় নিহত হন। কারণ, এইস্থানে এই যুদ্ধে নিহত না হইলে স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রের এইস্থানে প্রাণ ত্যাগ সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না। যুদ্ধস্থলের অদূরেই হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান দৃষ্ট হয়। দেওনাই নদী তীরে অবস্থিত ময়নামতীর দুর্গ এবং বাসভবন হইতে বহু দক্ষিণে, এবং রামগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ চড়চড়া গ্রামে "হরিশ্চন্দ্র পাট" নামে খ্যাত একটি প্রায় বৃত্তাকার স্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহাই হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান, এইরূপ প্রবাদ। এই স্তূপ খনন করাতে মৃত্তিকা নিম্নে একটি গৃহাংশ দৃষ্ট হয়। এখন তাহার নিম্ন ভাগ মাত্র বর্ত্তমান। যে প্রস্তর বাঁধান গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, তাহার উপরিভাগ ১৩ ফিট এবং নিম্নদেশ ৮ ফিট প্রশস্ত। পার্শ্বের প্রস্তরখণ্ডগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত যে, উভয় দিকেই দুইটি সিঁড়ি নিম্নদিকে নামিয়া গিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা যে কাহারও সমাধি স্থান, তাহা দর্শন মাত্রেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং উহা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি-মন্দির এইরূপ জন-প্রবাদে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। (৩৫)

(৩১) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 407.

(৩২) ধর্ম্মমঙ্গল, এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গান

(৩৩) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 407.

(৩৪) প্রবাসী। আষাঢ়, ১৩১৯।

(৩৫) Montgomery Martin's "Eastern India."

ধর্মপালের মৃত্যু অথবা পরাভবের পর গোপীচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনারূঢ় হন। প্রবাদ এই, ইনি মাতার উপর রাজ-কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া এক শত স্ত্রীর সহিত বিলাসতায় মগ্ন হন। কিন্তু, ইঁহার মাতৃ-গুরু হাড়িসিদ্ধার উপদেশে শীঘ্রই ইঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হয়, এবং গোপীচন্দ্র উক্ত যোগীর সহিত সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, তিনি অদ্যাপি বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। গোপীচন্দ্রের এই অদ্ভুত জীবন কাহিনী অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং এমন কি কামরূপ প্রভৃতি স্থানেও 'শিবের" গীত অথবা "মাণিক চাঁদের" গীত আখ্যায় ইতর সাধারণ কর্ত্তৃক সোৎসাহে গীত হইয়া থাকে। গ্রীয়ারসন এই "মাণিক চাঁদের গীত" সংগ্রহ করিয়া, বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছেন, এবং এমন কি ইহাকে 'Epic of Rangpur' আখ্যা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। (৩৭)

উক্ত গ্রাম্য গীতির আখ্যায়িকা ভাগ আমরা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদিতে অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন; তাঁহার গুরু হাড়িসিদ্ধা প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী পুরুষ ছিলেন। মাণিকচন্দ্র বহু দিন অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন, পরে এক জন দক্ষিণদেশী (বাঙ্গালী) দেওয়ান নিযুক্ত করাতে তাঁহার অত্যাচারে প্রজাগণ প্রপীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হয়; এবং এই বিদ্রোহ দমনেই মাণিকচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করেন। সতী-প্রথা অনুসারে ময়নামতী জ্বলন্ত চিতায় মৃত স্বামীর অনুগমন করিলেন, কিন্তু অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁহার একগাছি কেশও দগ্ধ করিল না। তাঁহার মৃত্যু দেবগণের বাঞ্ছিত নহে জানিয়া ময়না চিতা হইতে অবতরণ করিলেন। ইহার ১৮ মাস পরে তাঁহার পুত্র গোপীর জন্ম হয়, এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ কাল গর্ভবাস পুত্রের ভবিষ্যৎ মহত্বের নিদর্শন। ময়নামতী যথা সময়ে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় অদুনা ও পদুনার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে এক শত পরিচারিকা আগমন করে। ময়না আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সাহায্যে জানিতে পারেন যে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, পুত্র গোপীচন্দ্র অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মাতার চেষ্টায় পুত্র নবীন যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন। মাতৃগুরু হাড়িসিদ্ধা অরণ্যে তাঁহার সহগামী হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে অদুনা পদুনার বিলাপ এবং স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনুনয় এবং নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগ গ্রাম্য গীতিতে অতি মর্ম্মগ্রাহী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

'মাণিক চাদের গান' হইতে এই অংশ নিম্নে এবং, গ্রীয়ারসন্ কৃত তাহার মর্ম্মগ্রাহী ইংরেজী অনুবাদ পাদ টীকায় উদ্ধৃত হইল।

" না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমায় বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরিব মা ও বইন রবে স্যামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও।
আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও॥
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
আইল পাছার দেখিক যথা বহিচা হয়।
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু জাম বলিমু॥

(৩৭) The song of Manik chandra. J. A. S. B. Vol XLVII (1878). P. 135.

সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।
কাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥
হাত থানি দুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা সুতি ভুঞ্জিমু এ সুতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে বেসিয়া রমু গাও ॥ (৩৮)

(৩৮) "Nay, nay, my kingto distant lands thou shalt not fare

Nor desolate the life that breathes for thee alone.

Few are my years, no grey yet mingles with my hair:

Will widow me, my lord, before my bride-hood's done ?

"In dreams thy face will haunt me, and my arms close pressed will seek to hold thee.

Ev'n the poorest wife and bride upon her bosom bends her master's head to rest :

Shall sorrow be my mate and love unsatis-fied ?

"The voice of scandal ne'er hath spared a widow's fame ;

Therefore, beloved, if thou goest, I go with thee !

In hunger, and in thirst, oh king, my care thou 'lt claim,

The night I will beguile with song and poesy.

"In summer's heat, a palm-leaf fan shall still thy sighs.

Against thy breast I'll nestle close, when cold winds blow,

দুর্লভ মল্লিক রচিত "গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান" হইতে এই অংশের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥
তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্ন পানি ॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥
নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন।
তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জালিব আগুনি।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী ॥
সর্ব্ব দুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে।
আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে ॥
না ছাড়্যা না ছাড়্যা মোরে বঙ্গের গোসাঞি।
তোমা বিনে উদুনা থাকিবে কোন ঠাঞি ॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥"

গোপীচন্দ্রের অরণ্য- যাত্রার পূর্ব্বে পুত্রের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী ময়নামতী অগ্নিতাপে ফুটন্ত তৈলপূর্ণ কটাহে অনায়াসে নিমজ্জিত হইয়া, অক্ষতশরীরে পুনরায় পুত্রের মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার প্রক্রিয়াদি করেন।

And holy Indra's joy—the lap of five score wives—

Alone I'll give, with thee beloved, let me go.

Now am I young and comely, worthy of a king.

Will youth and beauty stay orsu ffer to be tied

'Gainst thy return ? My banian tree, to thee I cling

A helpless creeper—Bide with me, my husband, bide."

অরণ্যবাস-কালে একদা গোপীচন্দ্র গঞ্জিকা ক্রয় করিবার জন্য হাড়িসিদ্ধাকে ১২টি কড়ি দিতে প্রতিশ্রুত হন। প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ গোপীচন্দ্র অগত্যা হীরা নাম্নী জনৈকা বারাঙ্গনার নিকট দ্বাদশ বর্ষের জন্য আত্মবিক্রয় করেন। প্রণয়প্রার্থিনী হীরা গোপীচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে তাঁহার দ্বারা অতি হীন এবং কষ্টদায়ক কার্য্যাদি করাইত, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রহার করিত। অবশেষে হাড়িসিদ্ধা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া হীরা এবং তাহার পরিচারিকাকে তাহাদের দুর্ব্যবহারের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। হীরাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার উর্দ্ধাংশ বাদুড়, এবং নিম্নাংশ মৎস্যরূপে পরিণত করেন; এবং দুঃশীলা পরিচারিকাকে তাহার বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্বৃত্তের নিকট বিবাহ দেন; এবং সে উহাকে প্রত্যহ নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিত।

বহু কাল পরে গোপীচন্দ্র পুনরায় রাজধানীতে, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত রাজ্য পুনর্গ্রহণ করিয়া কর হ্রাস করিয়া প্রজাদিগকে সুখী করেন। "মাণিকচন্দ্রের গীতে" পটিকানগরে গোপীচন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, এইরূপ উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপালের রাজধানী হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত পটকপাড়া ও উল্লিখিত পটিকানগর অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। (৩৯)

গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র অথবা হবচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার অপর নাম উদয়চন্দ্র হইতেই তাঁহার রাজধানীর নাম উদয়পুর হইয়াছিল। বাঘদ্বার পরগণাস্থিত এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখন নিবিড় বনাচ্ছাদিত। বহু বর্ষ পূর্ব্বে বুকানন এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন স্তূপ, এবং উদ্যানাভ্যন্তরস্থ পথাদির সুস্পষ্ট চিহ্নাদি দর্শন করিয়া তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা একটি পথের দুই পার্শ্বস্থিত দুই শ্রেণী দীর্ঘিকামাত্র দৃষ্ট হয়।

ভবচন্দ্র একদা কোন নিষিদ্ধ সময়ে রাজ-প্রতিষ্ঠিত দেবী-মন্দিরে গমন করাতে দেবীর অভিশাপে তাঁহার বুদ্ধি লুপ্ত হয়, এইরূপ প্রবাদ। ভবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতা দেশবিখ্যাত। "ভবচন্দ্র (হবচন্দ্র) রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী" ছিলেন। এতদুভয়ের নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক পুকুর চুরি প্রভৃতি বহু কৌতুকাবহ প্রচলিত গল্প প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত। এই নির্ব্বোধ রাজার রাজত্ব-কালেই বোধ হয় রঙ্গপুরের পাল-রাজত্বের অবনতির সূত্রপাত হয়। ভবচন্দ্রের পরেও অপর এক জন তদ্বংশীয় রাজার রাজত্বের বিষয় আমরা অবগত আছি, কিন্তু তাঁহার নাম অজ্ঞাত। ক্ষেণবংশীয় নীলধ্বজ এই নৃপতিকেই পরাজিত করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, এবং ধরলা নদীর পূর্ব্বতীরে কোচবেহার-রাজ্যান্তর্গত কমাৎপুর নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন।

অনুসন্ধানে রঙ্গপুরে আমরা পূর্ব্বোক্ত চারি জন পাল-বংশীয় নৃপতির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে ইঁহাদের রাজধানী, দুর্গ, এবং প্রতিষ্ঠিত নগর প্রভৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলার কিঞ্চিৎ নিম্নে তিস্তা নদীর যে প্রকাণ্ড বাঁক দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপাল রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় [৯ নং চিত্র]। নগরটি চতুষ্কোণ, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল, এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত। নগরের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ প্রাকার দণ্ডায়মান। প্রাকারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দেওয়ান থানার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকস্থ নগর-প্রাকারের অব্যবহিত নিম্নেই প্রায় ৪০ ফিট প্রশস্ত একটি পরিখা, কিন্তু নগরের পূর্ব্ব দিকে এই পরিখা কিংবা প্রাকারের মধ্যে কোন প্রবেশ-পথ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত তিন দিকের প্রাকার এবং পরিখার ঠিক মধ্যস্থলে প্রতিদিকে এক একটি প্রবেশ পথ। ঐ সকল প্রবেশ-দ্বারের নিকট বহুল পরিমাণে ইষ্টক দৃষ্ট হয়, এবং উহা যে সুরক্ষিত ছিল তাহার

(৩৯) Babu Bisweswar Bhattacharya in the J. A. S. B. vol. vi. March, 1910.

চিহ্নাদি সুস্পষ্ট। প্রাকারের প্রত্যেক কোণে, এবং মধ্যে ও বহু স্থানে চতুষ্কোণ মিনার (bastion) ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান; এবং বোধ হয় ঐ মিনার-সমূহ হইতে প্রহরীগণ দূর হইতেই শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিত। উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকের পরিখা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে নগর-প্রাকারের সমান্তরাল ভাবে আর একটি প্রাকার এবং পরিখা দৃষ্ট হয়। নগরের বহির্ভাগে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ বাস করিত; এবং এই বহির্ভাগস্থ নগরের চতুর্দ্দিকেই এই প্রাকার এবং পরিখা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের দক্ষিণদিকস্থ বহিঃ প্রাকারেরও বহির্দ্দেশে রাজার অশ্বশালা ছিল; তাহারও চিহ্নাদি বর্ত্তমান। নগরের পশ্চিম দিকস্থ প্রাকারের প্রায় ৩০০ হাত ব্যবধানে উহার সমান্তরাল ভাবে একটি উচ্চ এবং সুপ্রশস্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোধ হয়, উহা নগরের পশ্চিমদিকস্থ বহির্ভাগের বহিঃপ্রাকার ছিল। নগরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে ধর্ম্মপাল-খনিত চন্দনপাট নামক একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। সন্নিকটবর্ত্তী আরও নানা স্থানে বহু দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত নগরের সুরক্ষিত অবস্থিতি দর্শনে মনে হয় ঐ স্থানে ধর্ম্মপালের দুর্গ ছিল। রাজা দুর্গ মধ্যে না থাকিয়া, ঐ স্থান হইতে প্রায় ¼ মাইল দূরে, এবং হস্তীঘোষ নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অবস্থিত রাজপুরীতে থাকিতেন; এখন সেখানে পুরীর ভগ্নাবশেষ কয়েকটি ক্ষুদ্র ইষ্টকস্তূপ, দীর্ঘিকা, এবং চতুষ্কোণ একটি ইষ্টকবহুল বৃহৎ মৃৎস্তূপ মাত্র বর্ত্তমান। শেষোক্ত স্তূপটির নাম 'বার মেসলাতের কাজি'; মুসলমান রাজত্বে ২৫ জন ফকিরের নামে উহা উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহার এরূপ নাম হইয়াছে এইরূপ প্রবাদ। স্থানের মুসলমান আখ্যা সত্ত্বেও কোন মুসলমান রাজপুরী অথবা দুর্গের সীমামধ্যে বাস করিতে সাহস করে না; তত্রত্য সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু।

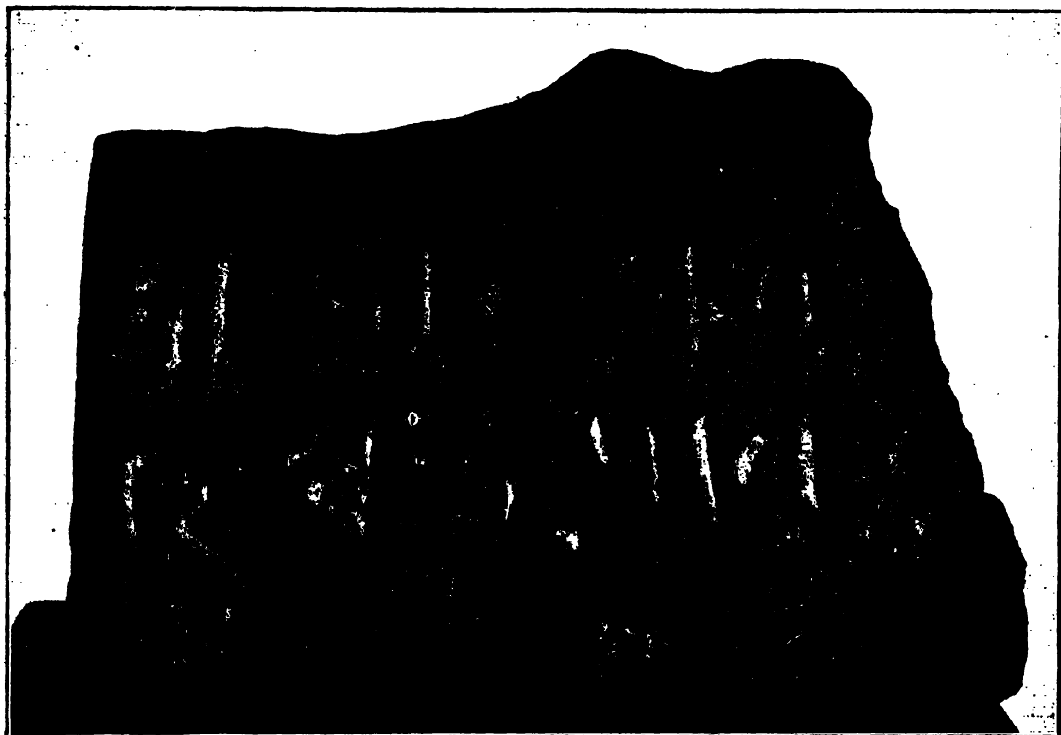
ধর্ম্মপালের পর গোপীচন্দ্রের রাজধানী দেওনাই নদীর পশ্চিম তটে, এবং ধর্ম্মপালের দুর্গের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; ময়নামতীও এই স্থানে বাস করিতেন। এই দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি ঠিক ধর্ম্মপালের দুর্গাদির অনুরূপ। গোপীচন্দ্রের নগর আনুমানিক ৪০০ গজ লম্বা, এবং ৩০০ গজ প্রশস্ত; এবং উহা হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে নগরের বহিঃপ্রাকার দণ্ডায়মান। ধর্ম্মপাল, অথবা গোপীচন্দ্র কাহারও রাজধানীতেই ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের চিহ্নাদি পাওয়া যায় না। রঙ্গপুর জেলার মধ্যে এইরূপ বহু স্থানে ধর্ম্মপাল এবং তাঁহার বংশধরগণের বহু কীর্ত্তি-চিহ্নাদি বর্ত্তমান। কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় তাহার অবতারণা করিলাম না।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গে আমরা ধর্ম্মপাল এবং তদ্বংশীয়গণের বিবরণও প্রদান করিয়াছি। কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আশা করি, ইহা পাঠকগণের নিকট বিরক্তিকর হইবে না। যাহা হউক আমরা পুনরায় আমাদের পূর্ব্ব প্রসঙ্গে উপস্থিত হইতেছি।

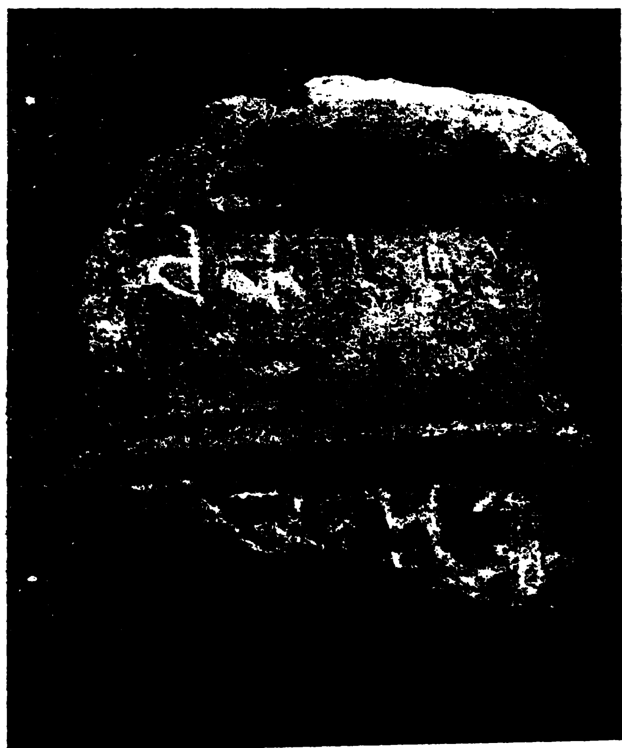
রাজা হরিশ্চন্দ্রের লিখিত বংশাবলী সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার উপর বিশেষ কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না, তাহা আমরা পরে দেখাইব। গান্ধারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পীযূষ কিরণ চক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণের যে বিবরণ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন নিম্নে আমি তাহা যথাযথ বিবৃত করিলাম।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকাতে, তাঁহার ভাগিনেয় দামোদর (দামু রাজা) রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি হরিশ্চন্দ্রের ভগ্নী রাজেশ্বরী দেবীর (রাজি দেবীর) পুত্র। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ব বর্ণিত রাজাসন তাঁহারই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

হরিশ্চন্দ্র হইতে অধস্তন দশম পুরুষ শিবচন্দ্র নানা তীর্থ দর্শন করিয়া ভারত ভ্রমণ করেন। ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও পরম ভক্ত ছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে রাজ-বংশের



[১০] সাভারে প্রাপ্ত খোদিত ইষ্টক লিপি।



অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। বিশাল রাজধানীর অধিকাংশ পতিত ও বনাকীর্ণ হইয়া যাওয়াতে, রাজ-বংশীয়েরা সর্ব্বেশ্বর নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, চান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতে থাকেন। শিবচন্দ্রের একাদশ অধস্তন পুরুষ তরুরাজ খাঁ মুসলমান রাজত্বে হুগলীর ফৌজদারের সহযোগী পদে নিযুক্ত হইয়া খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। শুভরাজ, যুবরাজ বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত, তরুরাজের এই চারি পুত্র। শুভরাজ ও যুবরাজ পিতার সহিত হুগলীতে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সেই দেশেই থাকেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সোণাবাড়ীর চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া সোণাবাড়ীয়া গ্রামে বাস করিতেন। বুদ্ধিমন্ত রায় ও ভাগ্যবন্ত রায় নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন। যবন সংস্রব-দোষে জাতিপাত হওয়াতে ভাগ্যবন্ত রায় দেশত্যাগ করেন। তিনি 'খন্দকার' নামে পরিচিত হন, এবং তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি 'খন্দকারের দরগা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোণ্ডা গ্রামে তাঁহার নামানুসারে একটি পল্লীর নাম ভাগ্যবন্তপাড়া হইয়াছে এই বংশের যশোবন্তরায় ঢাকার দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাসে সুপরিচিত। পূর্ব্বো গ্রথিত বংশাবলী অনুসারে শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় এখন হরিশ্চন্দ্রের বংশধর।

আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১২) ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টায় যখন সাভারে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন এক দিন সাভারের রাজাসন দর্শন কালে তত্রত্য জনৈক কৃষকের নিকট হইতে একখানি খোদিত ইষ্টক-লিপি সংগ্রহ করি। [১০নং চিত্র দ্রষ্টব্য] ইহার কয়েক দিন পরেই আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু উক্ত রাজাসন হইতেই সংগৃহীত অপর এক খানা ইষ্টক লিপি আমাকে প্রেরণ করেন। [১১ নং চিত্রদ্রষ্টব্য]। উভয় ইষ্টক-লিপিই বাঙ্গলার অভাসযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। এই ইষ্টক-লিপিদ্বয়ের সাহায্যে আশা করি, সাভারের লুপ্ত ইতিহাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ধার হইতে পারে।

প্রথমোক্ত ইষ্টকলিপিখানা অতি বৃহৎ একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত ছিল, তাহা দর্শন মাত্রই প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় ইহাতে ৪ পংক্তি লিপি খোদিত ছিল। কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষর 'প'টি বেশ সুস্পষ্ট আছে। প্রথম ইষ্টক-লিপিখানার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

* * * প
শ্রীশ্রীমদ্রাজ
রিশ্চন্দ্র পাল দ * *

দ্বিতীয় পংক্তির 'প'টি বোধ হয় "অধিপ" শব্দের শেষ অক্ষর। প্রথম দুই পংক্তিতে বোধ হয় হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য এবং রাজধানীর পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয় ইষ্টক-লিপিখানার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই লিপিখানার প্রত্যেকটি পংক্তির উপরে ও নীচে সুন্দর খোদিত কারুকার্য্য বর্ত্তমান।

এই লিপিখানাতে কয় পংক্তি ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন,—তবে উহাতে দুইটি পংক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বোধ হয় উহার উপরে ও নীচে আরও কয়েকটি পংক্তি ছিল। দ্বিতীয় ইষ্টক-লিপিখানার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

** * * বত ১২৫৪
* * * পুরী*

এই 'বত' শব্দের পূর্ব্বে নিশ্চই 'সং' শব্দ ছিল, এবং 'পুরী' শব্দের পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর নাম ছিল।

এই ইষ্টক-লিপিদ্বয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি প্রমাণিত হইতেছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি ছিলেন। (তৃতীয় পংক্তির ভগ্ন শেষ অক্ষরটি নিঃসন্দেহ 'হ' ছিল) 'পাল' শব্দের পর যে অর্দ্ধভগ্ন 'দ'টি দৃষ্ট হয় উহা বোধ

হয় 'দে', এবং তাহার পর একটি 'ব' ছিল। এই 'দেব' শব্দ জাতিবাচক নহে; প্রত্যেক নৃপতির নামের পরেই এই সম্মানসূচক উপাধি সংযুক্ত থাকে। হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, এবং কোন পালবংশীয় নৃপতিই মাহিষ্য-জাতীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্র পালকেও মাহিষ্যজাতীয় অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই।

দ্বিতীয় ইষ্টকলিপিখানা হরিশ্চন্দ্রের নামযুক্ত না হইলেও, তাঁহার বাসভবনের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া যাওয়াতে, উহা তাঁহার কোন বংশধরের, এইরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। এই ইষ্টকখণ্ডে খোদিত তারিখে (১২৫৪ সংবতে) সাভারে কোন নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এ বিষয় মীমাংসার জন্য, এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব-কাল স্থির করিবার জন্য আমরা হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আধুনিক রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পটিকানগরের রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা-পদুনা নাম্নী কন্যা দ্বয়ের বিবাহ হয়। সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, জামাতা গোবিন্দচন্দ্র যে সময়ে পটিকানগরে রাজত্ব করিতেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হরিশ্চন্দ্র সাভারে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। জামাতার সিংহাসন লাভের জন্যই ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র নিহত হন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত তিরুমলয় গিরিলিপিতে তামিল ভাষায় মহারাজ রাজেন্দ্রচোল দেবের যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। পাদটীকায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। (৪০)

ইহা হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্রচোল দেব ওড্ডবিষয়, এবং কোশলনাডু দেশ যুদ্ধে অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তন্তবুত্তি অথবা তন্ত্রভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল, তক্কণলাড়ম্‌পতি রণশূর, বঙ্গালদেশপতি গোবিন্দচন্দ্র, এবং উত্তরিলাড়ম্‌পতি মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। (৪১)

৪০ "In the 13th year (of the reign) of King Para-Kesori Varman alias the lord Sri-Rajendra Chola Deva, who... ..seized by (his) great, warlike army (the following)......Odda-vishaya which was difficult to approach, (and which he subdued in) close fights; the good Kosalainadu, where Brahmans assembled; Tandabutti, in whose gardens bees abounded, (and which he acquired) after having destroyed Dharma Pal (in) a hot battle; Takkanaladam, whose fame reached (all) directions, (and which he occupied) after having forcibly attacked Ranasura; Vangaladesa, where the rain wind never stopped, (and from which) Govinda chandra fled, having descended from his male elephant; elephants of rare strength and treasures of women, (which he seized after having been pleased to put to flight on a hot battle-field Mahipala, decked (as he was) with ear-rings, slippers and bracelets; Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean; and the Ganga, whose waters dashed against bathing-places covered with sand.' Hultzech's "South Indian Indian Inscriptions" vol 1.

(৪১) ওড্ডবিষয় = উড়িষ্যা (গৌড় রাজমালা, ৪০ পৃঃ) কোশলনাডু = কোশল দেশ (?)

তন্তবুত্তি = তন্তভুক্তি বা বিহার, সম্ভবতঃ গৌড়মণ্ডল (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—শূন্যপুরাণ)

বঙ্গাল দেশ = বঙ্গদেশ (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, এবং গৌড় রাজমালা)

তক্কন লাড়ম্ = উত্তর রাঢ় (শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু এবং গৌড় রাজমালা)।" রায় বাহাদুর বেঙ্কয় এবং ডাক্তার হুলজ "তক্কণ লাড়ম্" দক্ষিণ বিরাট বা দক্ষিণ বেরার অর্থে এবং উত্তরিলাড়ম্ উত্তর বেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।"

"কিন্তু, ওড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) বঙ্গাল দেশ (বঙ্গ) গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া "লাড়" কে রাঢ়অর্থে গ্রহণই সমীচীনতর বোধ হয়।" গৌড় রাজ মালা ৩০ পৃঃ, পাদ টীকা।

প্রথম রাজেন্দ্রচোল দেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় তাহার অনতিপরেই পূর্ব্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিরুমলয়গিরিলিপি তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে, অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের নবম বর্ষে উৎকীর্ণ মেলপাড়ির চোলেশ্বর মন্দির-লিপিতে পূর্ব্ব ভারতের দিগ্বিজয় কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অথবা পূর্ব্বোক্ত নৃপতি এবং দেশসমূহেরও কোনরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (৪২) সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের নবম হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি পূর্ব্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; এবং ঐ সময়ে বিহারপতি ধর্ম্মপাল, উত্তর রাঢ়পতি মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়পতি রণশূর, এবং বঙ্গদেশপতি গোবিন্দ চন্দ্র দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

তিরুমলয়গিরি লিপিতে উল্লিখিত বৎসরের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নে আমরা আরও প্রমাণ উল্লেখ করিলাম। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথে ভূগর্ভ হইতে একটি বুদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তাহার পাদপীঠে প্রথম মহীপালদেবের একটি প্রস্তরলিপি খোদিত আছে। তাহাতে "সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১" অতি স্পষ্টাক্ষরে খোদিত। (৪৩) ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১০৮৩ সংবতে অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেব জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিরুমলয়গিরি লিপি অনুসারে ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্রচোল দেব কর্ত্তৃক মহীপালদেবের পরাজয় বার্ত্তায় অবিশ্বাস্য কিছুই নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। মাণিকচন্দ্র মহিষী ময়নামতী পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের সিংহাসন লাভের জন্য ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন। জামাতা গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য সাভার-নৃপতি হরিশ্চন্দ্র পাল দেব সেই যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধেই নিহত হন।

সুতরাং, হরিশ্চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিরুমলয় লিপি অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সিংহাসনরূঢ় ছিলেন, এবং যুদ্ধে রাজেন্দ্রচোল দেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই (একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে) হরিশ্চন্দ্রপাল দেব সাভার-সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, রামাই পণ্ডিত রচিত "শূন্য পুরাণে" বহু স্থানে হরিশ্চন্দ্র অথবা হরিচন্দ্র রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"হরিশ্চন্দ্র রাজা করে ধর্ম্ম পূজা
ভর এ নবাহুতি ঘর।"

* * * * *

হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম পূজার বর্ণনায় কবি পুনরায় গাহিয়াছেন,—

"চন্দ্র সুর্জ্য আইলাক গ্রহ-তারাগণ।
ধন্য হরিশ্চন্দ্র ধন্য আমরা ভুবন॥"

* * * * *

"হরিশ্চন্দ্র মহারাজা রাজা রাণী করে পূজা
উরিলেন ধর্ম্ম জুগ পতি।"

* * * * *

"শূন্যেপূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"শূন্য পুরাণের" মুখবন্ধে প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নানাবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা, রামাই পণ্ডিতের বর্ণনানুযায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং

(৪২) Epigraphia Indica vol. VII—appendix. List of Inscriptions of Southern India.

(৪৩) গৌড় লেখমালা। প্রথম ভাগ।

তৎসাময়িক ধর্ম্মের ইতিহাস অতি বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপাল এবং হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। বাহুল্য জ্ঞানে সেই সমস্ত আলোচনার পুনরবতারণা করা হইল না। বসু মহাশয় বিশিষ্ট প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক হরিশ্চন্দ্রও ঐ সময়ে রাজত্ব করিতেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণবলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব বিচারেও উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

বসু মহাশয় মুখবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "রাজা হরিশ্চন্দ্র বা হরিচন্দ্রকেও আমরা রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক লোক বলিয়া মনে করি। * * কিন্তু, তিনি কোন স্থানের রাজা ছিলেন তাহা জানা যায় না।" সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে অতি অল্প দিন হইল আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং "শূন্যপুরাণের" মুখবন্ধ লিখিবার সময় হয়ত বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ অবগত ছিলেন না, এবং তজ্জন্যই এইরূপ লিখিয়াছেন। "শূন্যপুরাণ" বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রই যে সাভারের হরিশ্চন্দ্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সময়ে আবির্ভূত অন্য কোন হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। মছ্‌লি সহরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, গাহড়বাল-রাজ হরিশ্চন্দ্র দেব ১২৫০ সংবতে, অর্থাৎ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। (৪৪) কিন্তু সাভারের হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। সুতরাং প্রায় দুই শত বৎসরের ব্যবধান থাকাতে এতদুভয় হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে গোলযোগের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন, রামাই পণ্ডিতের বর্ণনানুযায়ী হরিশ্চন্দ্র যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং শূন্যবাদী ছিলেন, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি সাভারে পাওয়া যায়। সাভারে রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত কতিপয় বুদ্ধ মূর্ত্তির বিবরণ ও চিত্র পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সাভারে অনুসন্ধান কালে আমরা কয়েকখানা বহু পুরাতন হস্তলিখিত "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থ, এবং বোধ হয় "শূন্যপুরাণের" অতি জীর্ণ ৩।৪ খানা মাত্র পৃষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হরিশ্চন্দ্রের সময় সাভার অঞ্চলে ধর্ম্ম পূজার এবং শূন্যবাদের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। "শূন্য পুরাণের" মুখবন্ধে প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সহদেব চক্রবর্ত্তী রচিত "ধর্ম্ম মঙ্গলের" উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহাতে "হরিচন্দ্র" বা হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম্ম-নিন্দা, অপুত্রক হেতু মহিষী সহ রাজার বনগমন, তাঁহার নানা দেবদেবীর উপাসনা, বন-মধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্ম্মস্তুতিতে ধর্ম্মের অনুগ্রহ, রাজার প্রাণলাভ এবং পুত্রলাভ, ধর্ম্মের ছলনায় পুত্রবলিদান, এবং পুনরায় তাঁহার কৃপায় পুত্রের প্রাণ লাভ,' প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত আছে। কিন্তু, আমাদের সংগৃহীত "ধর্ম্মমঙ্গলে" ইহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। অপর এক প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বসু মহাশয়ই অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ ধর্ম্মের জন্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলিদানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু শূন্যপুরাণে এ প্রসঙ্গ নাই। পরবর্ত্তী কবিগণ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, চতুর্ভুজ রচিত "হরি চরিত কাব্যে" লিখিত আছে—

"প্রামোত্তমো হস্ত্যমলমঞ্জু গুণৈক পুঞ্জঃ।
শ্রীমান করঞ্জ ইতি বঙ্গ্যত্তমো বরেন্দ্র্যাম্॥

(৪৪) Epigraphia Indica. Vol. X part v.

* * * * * * *

কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ।
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরো হ্যবতীর্ণঃ॥
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং।
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপ ধর্ম্মপালাৎ॥" (৪৫)

অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমে করঞ্জনামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এই গ্রামে বিপ্রপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত সমগ্র গ্রামখানি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি যে, স্বর্ণরেখ আমাদের বর্ণিত ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখের তারিখ স্থির করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ধর্ম্মপালের এবং তৎসঙ্গে তাহার সমসাময়িক (তিরুমলয় লিপি অনুসারে) গোবিন্দচন্দ্রের, এবং তৎসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর সাভারপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব-কালও স্থিরীকৃত হইবে। এতদুপায়ে প্রাপ্ত তারিখ এবং পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে প্রাপ্ত তারিখের ঐক্য হইলে, আমাদের সিদ্ধান্ত বলবত্তর হইবে।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থমতে, বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ-পুরুষ সুষেণ আদিশূরের সভায় উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং, তিনি আদিশূরের সমকালবর্ত্তী। হরিচরিত কাব্যোল্লিখিত স্বর্ণরেখ বীজ-পুরুষ সুষেণ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ। (৪৬) সুতরাং, আদিশূরের সময় নির্ণীত হইলে তৎসঙ্গে স্বর্ণরেখের সময়ও নির্ণীত হইবে।

(৪৫) হরি চরিত কাব্য। ১৩শ স্বর্গ।

(৪৬) বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ-পুরুষ সুষেণ, তৎপুত্র ব্রহ্মা ও তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র শান্তনু মহামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জীকন), তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের পুত্র স্বর্ণরেখ। সুতরাং, স্বর্ণরেখ সুষেণের ১০ম পুরুষ অধস্তন হইয়াছেন।"—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শূন্য পুরাণ, মুখবন্ধ।

আদিশূরের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বহু মতামত লক্ষিত হয়। কুলার্ণবের মতে ৮৫৪ শকে ("বেদবাণাঙ্গিমে শাকে"); "বারেন্দ্রকুলপঞ্জীর" মতে ("শাকে বেদ কলঙ্কষট্‌ক বিমিতে"), এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে ("বেদ বাণাঙ্গ শাকে") ৬৫৪ শকে; ভট্টগ্রন্থমতে ৯৯৪ শকে "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা। অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্ত তদা॥ কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিনে।); "ক্ষিতীশ বংশাবলীর" মতে ৯৯৯ শকে ("নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে"); "কায়স্থ কৌস্তভ" রচয়িতার মতে ৩৮০ বাংলা সনে, অর্থাৎ ৮১৪ শকে; "দত্তবংশমালার" মতে ৮০৪ শকে ("শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দকে"; "Indo-Aryans" গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ৮৮৬ শকে; "সম্বন্ধ নির্ণয়ের" মতে ৯৯৯ সংবতে, অর্থাৎ ৮৬৪ শকে; "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" রচয়িতার মতে ৯৫৪ শকে;" (৪৭) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকের মধ্যে; "গৌড়রাজমালা"র মতে আনুমানিক ৯৮০ শকে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে) আদিশূর গৌড় মণ্ডলে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই বিভিন্ন মতাবলীর মধ্যে কোনটি প্রকৃত পক্ষে গ্রহণীয়, তাহা স্থির করিতে গেলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। যাহা হউক, নিম্নে আমরা এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "Indo-Aryans" গ্রন্থে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরসেন ও আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন।

৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই আমরা সমীচীন বোধ করি। কারণ, (১) প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলগ্রন্থে "বেদবাণাঙ্গ শাকে" [৬৫৪ শকাব্দে] আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আন-

(৪৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম ভাগ, ৬৭পৃঃ।

য়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা"র মতও ইহার অনুকূল। তাহাতেও "শাকে বেদকলঙ্কষট্‌ক বিমিতে" [৬৫৪ শকাব্দে] আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, "পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন"। (৪৮) দেবপাল ৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭৬৬ শকাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। (৪৯) সুতরাং হরিমিশ্রের উক্তিও আমাদের মতের অনুকূল।

(৩) বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপাল সুপ্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনী তীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞি বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং স কনক-রজতৈর্ধাম সারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ" ॥ (৫০)

এই আদিগাঞি ওঝা আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের একতম শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌত্র। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা।

তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে।
ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
তৎপুত্রাঃ ভুবিবিখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ ॥
আদ্যো বরাহ বাটুশ্চ রামো লালো নিপোস্তথা।"(৫০)

(৪৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম খণ্ড ৯৮পৃঃ।
(৪৯) V. A. Smith—"Indian Antiquary" Vol. XXXVIII.
(৫০) লাহেড়ী বংশাবলী।

এরূপ স্থলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধর্ম্মপালের অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আদিগাঞি ওঝার পিতামহ ক্ষিতীশ কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ৭৮০ খৃষ্টাব্দে, ৭০২ শকাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। (৫২) সুতরাং ইহা হইতেও অর্থাৎ ৭০২—৫০=৬৫২ শকাব্দ পাইতেছি, এবং এতদ্দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে।

(৪) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খৃঃ [৬১৭ হইতে ৬৫৪ শকাব্দ] পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার দিগ্বিজয় কালে তিনি যাইতেছে; কান্যকুব্জ পতি যশোধর্ম্মকে [ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ এই মহারাজার সভা শোভিত করিয়াছিলেন] পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। (৫৩) গৌড় রাজ্যের তৎকালীন নৃপতির নাম "রাজতরঙ্গিণী"তে উল্লিখিত নাই। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য (জয়াপীড়) ৬৬৬ হইতে ৬৯৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই পিতামহের ন্যায় তিনিও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। নানাদেশ জয় করার পরে রণক্লান্ত সৈন্য এবং সামন্ত নৃপতিগণকে স্বদেশ গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি একাকী গৌড় রাজ্যে এবং ক্রমে সমৃদ্ধিশালী গৌড় রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করেন। গৌড়ে তখন জয়ন্ত নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। (৫৪) নানারূপ ঘটনার পর জয়াপীড়

(৫১) হরিমিশ্র।
(৫২) V. A. Smith Indian Antiquary Vol. XXXVIII.
(৫৩) "রাজ তরঙ্গিণী"। চতুর্থ তরঙ্গ।
(৫৪) গৌড় রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা ॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
রাজ তরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ।

জয়ন্তের একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং দিগ্বিজয়ী জামাতা অচিরে পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজিত করিয়া শ্বশুড়কে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলেন (৫৫) হরিমিশ্ররচিত প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় এবং অন্যান্য বহু কুলগ্রন্থে আদিশূর "পঞ্চগৌড়াধিপ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনায় এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থাদির বর্ণনায় ঐক্য দর্শনে, এবং প্রায় সমকালবর্ত্তী হওয়াতে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় জয়ন্ত এবং আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। জামাতার সাহায্যে "পঞ্চগৌড়াধিপ" হইয়া, বোধ হয় জয়ন্ত আদিশূর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তৎসাময়িক অন্য কোন নৃপতি "পঞ্চগৌড়াধিপ" ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীর এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থাদির বর্ণনার পরস্পর সামঞ্জস্য করিবার জন্য জয়ন্ত এবং আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা অযৌক্তিক নহে। ৭৫৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, তাহার ১২।১৫ বৎসর পরে জয়ন্ত আদিশূর বৃদ্ধকালে জয়াপীড়কে কন্যাদান করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক। এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, ৬৫৪ + ১৫ = ৬৬৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি। এই তারিখের সহিত রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত জয়াপীড়ের দিগ্বিজয়ের তারিখের সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়াতে আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

(৫) আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধস্তন প্রায় পঞ্চদশ পুরুষগণকে আদিশূরের দৌহিত্র বংশে জাত বল্লালসেন (৫৬) কৌলিন্য প্রদান করেন। (৫৭) সুতরাং, আদিশূর বল্লাল সেন হইতে আনুমানিক ১৫ × ২৫—৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বল্লাল সেন ১০৯১ শকে "দানসাগর" গ্রন্থ, (৫৮) এবং ১০৯০ শকে "অদ্ভুত সাগর" গ্রন্থ (৫৯) রচনা করেন। "অদ্ভুত সাগরে" এক স্থানে লিখিত আছে, —"ভুজ-বসু দশ মিতে শকে শ্রীমদ্ বল্লাল সেন রাজ্যাদৌ" ইত্যাদি। ইহাতে ১০৮১ শকাব্দ বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৬০) ১০৬০ শকের আনুমানিক ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যদি আদিশূর বর্ত্তমান থাকিয়া থাকেন, তবে এতদ্দারা ৭০৬ শকাব্দ তাঁহার আবির্ভাবকালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, ইহা আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। আনুমানিক গণনায় যথার্থ সময় নিরূপণ করা সুকঠিন, এবং তাহাতে এইরূপ সামান্য ব্যবধান হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব্বোক্ত এই সকল যুক্তির বলে, ৬৫৪ শকাব্দেই আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় নির্দ্দিষ্ট করা আমরা সমীচীন বোধ করি। যাহা হউক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে করঞ্জ গ্রাম দান করেন; সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি। স্বর্ণরেখ আদিশূরানীত বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ পুরুষ সুষেণ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ২৫ বৎসর এক পুরুষের আনুমানিক কাল ধরিয়া লইলে, স্বর্ণরেখ আদিশূরের সমসাময়িক সুষেণ হইতে ২৫০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ৬৫৪ শকে আদিশূর ব্রাহ্মণানয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৫৫) ৪১৮ হইতে পরবর্ত্তী শ্লোকাবলী দ্রষ্টব্য। রাজ তরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ।

(৫৬) "জাতো বল্লালসেনো গুণিগণিতগুণ্য দৌহিত্রবংশে।" বারেন্দ্র কুলপাঞ্জিকা।

(৫৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।" প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ।

(৫৮) নিখিল চক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন পূর্ণে
শশি-নব-দশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥

বল্লালসেন রচিত "দানসাগর"। J. A. S. B. 1896.

(৫৯) "শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে। Bhandarkar's Report on the search for Sanskrit manuscripts during 1887—88, and 1890-91

(৬০) Babu Manomohan Chakravarty: J. A. S. B. 1906.

সুতরাং, স্বর্ণরেখ, এবং তৎসঙ্গে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল, এবং তৎসঙ্গে (তিরুমলয় লিপি অনুসারে) গোবিন্দচন্দ্র ৬৫৪ +২৫০=৯০৪ শকাব্দে, অর্থাৎ, ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর সাভারপতি হরিশ্চন্দ্র পালদেব ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ, খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, বর্ত্তমান যুক্তিতে এইরূপই প্রতীয়মান হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেও, নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হরিশ্চন্দ্র খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং, এই যুক্তি তাহার পোষকতাই করিতেছে।

চতুর্থতঃ, গ্রীয়ারসন্ মাণিকচন্দ্র (গোবিন্দ চন্দ্রের পিতা এবং হরিশ্চন্দ্রের বৈবাহিক) খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (৬৬)। কিন্তু, আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতেই গ্রীয়ারসনের অনুমান অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মাণিকচন্দ্র যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে, অর্থাৎ, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাও উক্ত হইতে পারে, যে, "মাণিকচন্দ্রের গীতে" কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে।

"মাণিক চাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতি।
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজানা যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥"

এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা হিন্দুশাসন কালে প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে মাণিকচন্দ্র এবং তৎসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই প্রসঙ্গে পরে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য") পাঠ করিয়া মান্যবর গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এখন তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার গান মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বিরচিত বলিয়া মনে করেন।

যাহাহউক, বহু আলোচনার পরে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, সাভারপতি হরিশ্চন্দ্রপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদ, অথবা, খুব সম্ভবতঃ, একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাভারে আগমন করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। কোন স্থান হইতে তিনি সাভার আগমন করেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, ইহাই অনুমিত হয় যে, গৌড়ের পালবংশীয় দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বারেন্দ্র ভূমি যখন "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" করতলগত (৬৭) "অনধিকারী" কাম্বোজ (নেপাল) বাসীগণ কর্ত্তৃক বিজিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যখন গৌড় রাষ্ট্রের কোনও নিভৃত কোণে, মগধে অথবা মিথিলায় লুক্কায়িত; গৌড়ের এই মহাবিপদের সময়ে চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেব ১০০২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গ ও রাঢ় আক্রমণ করিয়া সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন; (৬৮) গৌড়ের পালরাজবংশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, খুব সম্ভবতঃ তখনই হরিশ্চন্দ্র গৌড় ত্যাগ করিয়া সাভারে আগমন করিয়া একটি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন।

পালরাজবংশ যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন রাজবংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গের জলবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানসমূহে প্রস্থান

(৬৬) J. A. S. B Vol. XLVII. 1878

(৬৭) দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় অথবা বাণনগরের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত, এবং দীনাজপুরের রাজবাটীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটী প্রস্তর।

(৬৮) খাজুরাহাতে প্রাপ্ত ১০০২ খৃষ্টাব্দের একখানা শিলালিপিতে বঙ্গের এই বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। Sir A. Cunningham's "Archœological Survey of India." Vol. XXI.

করেন, (৬৫) তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র গৌড় হইতে আগমন করিয়া সাভারে রাজ্য স্থাপন করেন, দেশপ্রচলিত এই প্রবল কিংবদন্তীও আমাদের উক্তির সমর্থন করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য বোধ হয় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ টোগলক্ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় কালে মুসলমানের করতলগত হয়।

স্তম্ভের পাদদেশে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" শিবমন্দির উৎসর্গমূলক কয়েক পংক্তি লিপি উৎকীর্ণ আছে।—গৌড়রাজমালা। ৩৮ পৃঃ।

পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত এবং আংশিক প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এচ্, ই, ষ্টেপ্‌ল্‌টন্ মহোদয় গত ডিসেম্বর মাসে (১৯১২ খ্রীঃ অঃ) আমাকে সংবাদ দেন যে ভাওয়ালের অন্তর্গত শাকাগর গ্রামে একটি প্রস্তর স্তম্ভ পতিত আছে, এবং লোকে তাহাকে মাধব আখ্যা প্রদান করিয়া মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে। শাকাগরের এই মাধবের বিষয় পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু, আমার সংবাদ দাতৃগণ তাহাকে বিষ্ণু মূর্ত্তি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন। সচরাচর যে রূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপই একটি, এই বিবেচনায় আমি ইতি পূর্ব্বে উহা দেখিতে যাই নাই।

শ্রীযুক্ত ষ্টেপ্‌ল্‌টন্ মহোদয়ের সংবাদ দানের অব্যবহিত পরেই আমি ঐ গ্রামে গমন করি। স্তম্ভটী এখন যেস্থানে পতিত আছে, তাহার সন্নিকটে বহু পুরাতন দুইটী দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। শীতকাল বলিয়া উভয় দীর্ঘিকাতেই জলে অনতি গভীর। দীর্ঘিকাগর্ভে বহু পুরাতন বৃক্ষাদি জন্মিয়া উহাদের প্রাচীনত্বের সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ সমুচ্চ তীর ভূমিও উহাদের বৃহদায়তনের পরিচায়ক। দীর্ঘিকাদ্বয় এবং স্তম্ভটি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রচলিত জনশ্রুতির সন্ধান পাইলাম না। স্মরণাতীত কাল হইতে স্তম্ভটিকে মাধব জ্ঞানে গ্রামবাসীগণ পার্ব্বণাদিতে তৈল সিন্দূর প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে।

শুনিলাম কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে কোনও মুসলমান ফকির হিন্দু পূজিত এই প্রস্তর খণ্ডকে নিকবর্ত্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। হিন্দুগণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সাহায্যে ফকীরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। কার্য্যটি নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুর স্বীয় ব্যয়ে হিন্দু দ্বারা প্রস্তরটিকে পুনরায় নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া সংস্কারাদি করাইয়া দেন। তদবধি প্রস্তরের মহিমা হিন্দুর নিকট আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রস্তরটি স্তম্ভের উপরিভাগ মাত্র, নিম্নভাগ হয়ত নিকটেই কোথাও ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। অন্য কোনও স্থান হইতে উহা ঐস্থানে আনীত হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয় না, কারণ, উহা এত ভারী, যে উহা স্থানান্তরিত করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্তম্ভটী Sandstone নির্ম্মিত, এবং অষ্টকোণ, স্তম্ভগাত্রে নানারূপ মূর্ত্তি বর্ত্তমান, কিন্তু কোনও লিপি দৃষ্ট হইল না। হয়ত উহার অনাবিষ্কৃত নিম্নভাগে কোনরূপ লিপি থাকিতে পারে। শীর্ষদেশে আট দিকে আটটী মূর্ত্তি খোদিত আছে; মূর্ত্তিগুলির ধ্যানাসন, মস্তকে কিরিট, পদনিম্নে পদ্ম। মূর্ত্তিগুলির নিম্নে কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া কারুকার্য্য খোদিত আছে, কিন্তু, তাহার প্রত্যেকটী অংশই এক একটী নৌকার ন্যায়। উহা কোন রাজচিহ্ন কি না, স্থির করিতে পারিলাম না। স্তম্ভগাত্রে আরও নানা স্থানে বোধ হয় নানারূপ মূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল, কিন্তু, তাহা এতই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে মূর্ত্তিগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাও Magnifying glass দ্বারা দেখিলে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে খোদিত মূর্ত্তিগুলি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতে

(৬৫) Journal & Proceedings of the A. S. B. (New Series) Vol. VII. No. 11.

পারে না। ঢাকা জেলার অধিকাংশ প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়াছি, কিন্তু, অন্য কুত্রাপি প্রস্তরস্তম্ভ আছে কি না জানি না। যদিও এই স্তম্ভের সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, তথাপি ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। স্তম্ভটি বৌদ্ধযুগের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই,—খোদিত বৌদ্ধ মূর্ত্তিসমূহ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে পালরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, হয় ত ইহা তাঁহাদেরই কাহারও কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ধামরাই গ্রামের সহিত অশোকের ধর্ম্মরাজিকার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তদ্বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ধামরাই গ্রাম শাকাগর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। আমি এবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছিনা। আশা করি, ভবিষ্যতে উহার নিম্নভাগ আবিষ্কৃত হইলে স্তম্ভটীর কাল নির্দ্ধারণের সুবিধা হইবে।

স্তম্ভটী ভাওয়ালের শ্রদ্ধাস্পদ কুমার বাহাদুরের জমীদারীর মধ্যে পতিত আছে, সুতরাং, উহা তাঁহার সম্পত্তি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক লেখককে উহা দান করিয়া উহা স্থানান্তরিত করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট তদনুযায়ী আদেশ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্তম্ভটী স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলে বহু গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া তাহাদের আপত্তি জানায়। এতগুলি ধর্ম্মব্যক্তির প্রাণে আঘাত দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্তম্ভটি স্থানান্তরিত করা হয় নাই। পরন্তু, উহা ঐ স্থানেই যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত শীঘ্রই করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

হাসিকান্না

(১)

একটি নাতিবৃদ্ধ কাঁচা পাকা মাথা ভদ্রলোক একরাশ লম্বা দাঁড়ি লইয়া মেসের দোতালায় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনার নামই বুঝি ললিত বাবু।" আমি "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া, শশব্যস্তে, উঠিয়া পড়িয়া বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিলাম এবং একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বলুন দেখি।"

ভদ্রলোক "তা বাবা, তুমি ত প্রাইভেট টিউটারী খুঁজিতেছিলে. আমার বাসায় এস না, খাবে থাক্‌বে, আমার ছেলেটিকে পড়াবে।"

নূতন রেগুলেশনে ইউনিভার্সিটি সেবার বিস্তর গ্র্যাজুয়েট্ প্রসব করিয়াছিল, ফলে প্রাইভেট টিউটারের দাম বিশ টাকা হইতে দশ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। "একটি গ্র্যাজুয়েট্ দশ টাকায় ছেলে পড়াইতে রাজি আছে" বলিয়া নীচে নাম ঠিকানা লিখিয়া কলিকাতার রাস্তার থামে থামে নোটীশ লাগাইয়া দিয়াছিলাম। ভাবিলাম ভদ্রলোকটি তাহা হইতেই আমার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। খাবার থাক্‌বার সুবিধা হইল, তারপর যদি উপরি কয়েকটা টাকা দেয়, তবে ত কথাই নাই; আমি স্বীকৃত হইলাম। ভদ্রলোকটি আমার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"চল বাবা, আমাদের বাড়ীটা দেখে এস, এই ত মীর্জ্জাপুরের মোড়ে।"

তাঁহার সঙ্গে চলিলাম, তিনি বকিয়া, যাইতে লাগিলেন—"আমার বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে এখন কল্‌কাতাতেই থাকি, টাকাপয়সা হাতে কিছু আছে। একটা ছেলে একটা মেয়ে; মেয়েটা বেথুন স্কুলের ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ে। পড়া, শুনায় [illegible] ভাল, বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ বিবাহ-যোগ্য

বয়স কিন্তু গিন্নির দোষে কিছু হবার যো নেই, এমন গোবেচারী আর দেখ নেই—ওঁর পিতার দেশের কত জানাশোনা ছেলে আছে, ওঁর এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র তাগিদ নেই, আমিই যেন সব, সে মেয়ে যেন একটা আমারই, ওর যেন নয়। ছেলেটার কিছুই আক্কেল নেই বাবা, একেবারে গাধা, কত মারপিট করে দেখলাম, কিছুতেই কিছু হয় না। তুমি একটু চেষ্টা বেষ্টা করে দেখ, কিছু হয় কি না। তোমার কিছু কষ্ট হবে না বাবা, খাবার শোবার কিছুর জন্যই তোমার ভাবতে হবে না—তোমাকে একটি পৃথক ঘর করে দেব। আর তোমাকে কিছু টাকা না দিলে চল্‌বে কেন? আচ্ছা দশ টাকা? না হয় পনের টাকা করেই দেওয়া যাবে।"

আমি ত উৎফুল্ল হইয়া বাড়ী ও দোতালায় আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবার ঘর দেখিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন "তা এসে পড়, বাবা?" আনন্দের আতিশয্যে আমার তখনই আসিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল, মুখে বলিলাম "তা দু এক দিনের মধ্যেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে আসা যাবে।"

ভদ্রলোক—"তা আজকেই নয় কেন? এখনি নয় কেন? তুমি জিনিষপত্র সব নিয়ে এস, আমি বেহারাকে দিয়ে সব পরিষ্কার করিয়ে রাখি।"

আমি—"তবে আজকেই"—

ভদ্র—"তা তোমার যদি আজ্‌কে কোন অসুবিধা থাকে, তা হলে নাই এলে। হাঁ, অসুবিধা ত হওয়ার কথাই, সব ঠিকঠাক করে আস।"

আমি—"না, তেমন কোনো অসুবিধা নেই, ইচ্ছা কর্‌লে আজকেই—"

ভদ্র—"না বাবা, তোমার অসুবিধা, জন্মিয়ে এত শীগ্‌গীর আসার কোনো দরকার নেই—আমাদের ত আর তেমন কিছুই ঠেকা নেই, পাঁচ সাত দিন পরে এলেও চল্‌বে।"

আমি—"আচ্ছা, আজ্‌কে রবিবার, আস্‌ছে বুধবারে এখানে আস্‌ব।"

ভদ্র—"তা এত সকালে কেন? তোমার সুবিধে মত আরো পরে এলেও পার।"

আঃ, মহা মুস্কিল! আমি ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়া মেসের খোরাকির পয়সাগুলি বাঁচাব! আমি বলিলাম—"না, বুধবারেই আস্‌তে পার্‌ব।"

ভদ্র—"আচ্ছা তাই এসো, কিন্তু দেখো তোমার নিজের কোনো অসুবিধা করে এসো না কিন্তু। আমি এখনি তোমার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখছি।—বেহারা বেহারা" আমি "তবে এখন আসি" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

প্রত্যাশিত বুধবারে দুপুরের খোরাকিটা বাঁচাইয়াও খুব সকালেই আমার জিনিষপত্র লইয়া সেখানে একেবারে আমার দোতালার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই এবং কক্ষটিও পূর্ব্বের মতই ধূলাবালি এবং জঞ্জালে পরিপূর্ণ। অন্য কক্ষ হইতে অনুচ্চ কণ্ঠে বেহারাকে ডাকিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া নাম এবং আজ্‌কেই আসবার কথা ছিল এই কথা বলিলাম। গৃহিনী শশব্যস্ত বলিয়া উঠিলেন, "সব ঠিকঠাক করে একে আস্‌তে বলে দিয়েছে, অথচ তার কিছু বলা কহা নেই সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে। বেহারা এখানে জিনিষ পত্রগুলো নাবা, আর বাবুকে নীচে বৈঠকখানা ঘরে বস্‌তে বল।" নীচে বসিয়া মিনিট পনের পর্য্যন্ত উপরে ঝুপঝাপ ধুপধাপ শব্দ শুনলাম, তারপর উপরে ডাক পড়িল। গিয়া দেখি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একধারে আমার বিছানা পাতা, অন্য ধারে একটি টেবিল ও দু'টি চেয়ার আমার সব জিনিষপত্র নিপুণভাবে গোছান।

২

রীতিমত অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া গিয়াছে। ছেলেটি সম্বন্ধে আমার প্রথম সিদ্ধান্ত পিতা ভবতারণ বাবুর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়া গেল; মনে হইল, এমন হাবা ছেলে ত্রিসংসারে আর নাই। ছেলেটির নাম প্রবোধ, বয়স দশ এগার, পড়াইবার সময় ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া একবার আমার দিকে একবার পুস্তকের

দিকে চাহিয়া থাকে—ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু বাংলা ইংরাজী সম্বন্ধে বর্ণজ্ঞানটাও তাহার ভাল করিয়া হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। তাহাকে পড়াইবার চেষ্টা করিয়া আট দশ দিনেই আমি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গেলাম, মাষ্টারী করিতে মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না।

কিন্তু ইতিমধ্যে পরিবারে বেশ একটু জড়াইয়া গিয়াছি, গৃহিণীর সস্নেহ আত্মীয়ত ভাব এড়াইয়া চলিয়া যাইবার কল্পনাও মনে উদিত হইল না।

প্রবোধের দিদি সুধার বয়স তের চৌদ্দ হইবে; এদিকে ইস্কুলে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, লজ্জা তাহার লেশমাত্র নাই, একটা প্যানপ্যানে আব্দারে মেয়ে; একেবারে কুৎসিতা না হউক, সুন্দরী তাহাকে মোটেই বলা যায় না; তাহার মুখে শোভন অশোভন এটা ওটা সম্বন্ধে নানা অবান্তর কথা লাগিয়াই আছে, আর তাহার অতি-সারল্য আমার নিকট বুদ্ধিহীনতার নামান্তরের মতই ঠেকিল। এই জীবটি মাঝে মাঝে আমার নিকট পড়া শিখিয়া লইতে আসিত, এবং মাঝে মাঝে আসিয়া এ-তা' করিয়া মুখ ছুটাইয়া দিত, আমার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইত।

আমার দিনগুলি যাইতে লাগিল মন্দ নয়। সকালে সন্ধ্যায় ছেলেটা বই খুলিয়া কিছুক্ষণ আপনাআপনি বিড়-বিড় করিয়া, জানালার ফাঁক দিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, এমন সময় মেয়েটি হাতে বই অথবা মুখে বাক্যের ভাণ্ডার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; দুই বেলা পরিপূর্ণ তৃপ্ত আহার, বিকালে লুচি মোহন-ভোগে জলখাবার; আর মাঝে মাঝে ভোজনের সময়, আমার পিতামাতা আছেন কি না, আমার বিয়ে হইয়াছে কি না, আমার বিধবা পিসীমার স্বামী কত দিন হইল কেমনে মারা গিয়াছেন, ইত্যাদি সম্বন্ধে গৃহিণীর সস্নেহ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া, এমনি ভাবে দিন যাইতে লাগিল।

একদিন গৃহিণী বলিলেন "দেখ বাবা, তোমাকে আমরা তেমন আদর যত্ন করতে পারছি না, আমাদের অবস্থাও কলিকাতা থাকার পক্ষে খুবি খারাপ, তবু এখানে কিছু দিন আরো থাকতে হচ্ছে। তুমি ত পরের ছেলে বাবা; পরের ছেলেকেও যে এমন ভাবে নিজের ছেলের মত ভালবাসা যায় তা এই তোমায় নিয়েই প্রথম বুঝলাম—সুধার বড় আমার আর একটি ছেলে ছিল, সে থাকলে হয় ত তোমারই মত বড় হোত।"

গৃহিনীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। গৃহিণীর স্নেহে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম, আমার মাতৃহীন হৃদয়ের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই স্নেহ ও সেবা পরায়ণা রমণীটিকে ঘিরিয়া নানা দিকে তৃপ্ত হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিল।

এমনি করিয়া পরিবারে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে ছেলে-টাকে পড়ান ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিতে লাগিলাম। ছেলে পড়ানো সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যের শিথিলতা লইয়া কেহ কোনো শব্দই করিল না। কিন্তু মেয়ে পড়ানো আরম্ভ হইয়া গেল; সেও আবার কিরূপ?

হয়ত মেয়েটি দিব্য সরল ভাবে একটি চেয়ার টানিয়া আমার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া আমার খোলা পুস্তক বন্ধ করিয়া দিল, এবং আব্দারের স্বরে বলিল, "মাষ্টার মশয়, আমারে এই পরাটা কইয়া দ্যান্ না।"

আমি—'কেন, কালকেই ত বলে দিয়েছি, ক'বার বলে দিতে হয়?"

সুধা—"হ, একবার কইছেন এইরাতেই অইল আর কি। আমি চাইর পাচ বার কইলেই শিক্ষ্যা ফালাই; ভোলাটা (প্রবোধ) একশত বার কইলেও পারে না; আর মাষ্টার মশয়, (উৎফুল্ল হইয়া) ভোলাটার বাপ্পা কেমন মানু ত আপনে দেখেন নাই, তবও এইটা কেমন বোকা কিছুই শিখতে পারে নাই আপনে ভোলারে পিটাইবেন খুব, না অইলে অর কিছুই লেখা পড়া অইব না।"

আমি—"হাঁ তা' মারব; কিন্তু তোমারও ত মার খাওয়া দরকার, নইলে পড়াশুনা ত তোমার কিছু মনে থাকছে না দেখছি।

সুধা—হ, আমি বুঝি; আপনে আমার লগে ঠাট্টা করতে লাগছেন। আপনে আমারে মারতে লজ্জা পাইবেন। বুরা দাদা (ইস্কুলের বৃদ্ধ মাষ্টার) এক দিন আমার উপুর খুব রাগ অইছিল; কইছিল, বিয়াব উপযুক্ত মাইয়া অইলি, অখন এই পরা পারছ্‌না, এত বর অইছছ্‌ আবমারুম্‌-অই বা কেমতে। আইচ্ছা মাষ্টার মশয়, আপনেব বৌরে পরান না? পরানের সময় মারেন নাকি?

আমি—"হাঁ, মারি বৈকি। মার না খেলে তার আজকের কথা কালকেই মনে থাকে না; আজকে রাতে যদি তাকে বলে দিলাম, "দেখ কালকে রাতে তোমার ফটোখানা নিয়ে এসো" সে পর দিন ট্রাঙ্ক খুলে সাতপরত ভাঁজ খুলে আমার নিকট একটা চুলের দড়ি এনে হাজির করলে। ফরমাসের সঙ্গে শক্ত রকমের একটা কিল না দিয়া দিলে তার কিছু মনে থাকে না।"

সুধা—(আশ্চর্য্য হইয়া) ওমা ট্রাঙ্কের মধ্যে সাত পল্লা ভাজের ভিতরে চুলের দড়ি থাকে না কি। আপনের বৌটা ত কম কিপ্পিন্‌ না!

আমি—"কৃপণ বলতে কৃপণ! তারপর পেটুক। ভাত দেবার সময় বড় মাছখানা নিজের জন্য রেখে ছোটটি আমাকে দেয়, কখনো বা মাছ রেখে শুধু কাঁটাই দিয়ে বসে।"

সুধা—"ও, এইটা ঠাট্টা করে, আপনে তা বুঝতে পারেন নাই—আমাগো ফুলপুরে দেখছি, এক জামাইরে দুব্বার বয়া দিছিল, জামাইটা কেমন আহম্মক, কচ্‌কচ্‌ কইরা খাইয়া ফালাইল। আর তার একটুও লজ্জা নাই, আমাগো কুসুমকেই তার বৌয়ের লগে কথা কয়। বৌটাও বেলাহাজ। মুখচন্দ্রিকার সময় দেখছি, কত চাও চাও, জামাইর দিগে চাইল না। আচ্ছা, মাষ্টার মশয়, আপনার বৌ কেমন?"

আমি—"তার কথা আর বলো না; সে বিয়ের সময়ই শুভদৃষ্টি করতে বলবার আগেই তিরের ফলার মত দুটো চোক দিয়ে আমাকে তাকিয়ে দেখছিল, আর এখন ত কথাই নেই, তার বাপ মায়ের সামনেই আমার সঙ্গে আলাপ করে, একদিন একটা কানমলা পর্য্যন্ত দিয়ে বসল।"

সুধা—সত্য নাকি, এমন বেলাহাজ—ওমা আমিত এমন করতে পারুম না। আপনের বিয়া কতদিন অইছে?"

আমি—"এইত ঠিক এক বৎসর হলো।"

সুধা—"আপনার পোলাপান কয়জন।"

আমি—"এই সবে, দু'টি মাত্র। সুধা, তুমি এখন যাও ত, আমার একটু কাজ আছে।"

সুধা—"আপনের কাম আপনে করেন, আমি আপনের কি করছি।"

আমি—(একটু রাগিয়া) "না, সুধা, যাও, তুমি থাকলে কাজের বাধা হয়।"

সুধা—(ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) "আইচ্ছা যাই, আমি মায়ের কাছে কই গিয়া, আপনে আমারে দেখতে পারেন না, পরা কইয়া দেন্‌ না।" এই বলিয়া হয় ত সে গৃহিণীর কাছে গিয়া প্যান্‌প্যানানি আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার মেয়ে পড়ানো অধিকাংশ সময়ই প্রায় এমনি ভাবে চলিতে লাগিল।

৩

প্রবোধ ছেলেটি এক হিসাবে তার দিদির ঠিক উল্টা। পড়ার সময় তাহার অনতিস্ফুট উচ্চারণগুলিকে সরস্বতীর বিশেষ প্রেরণা বলিয়া বাদ দিলে, পাঁচ সাত দিন তাহার সঙ্গে থাকিয়াও তাহাকে বোবা মনে করাটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গৃহিণী এক দিন বলিলেন, "ভোলাটা দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছে কেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না; দু'তিন বছর আগে ত ওর বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ছিল, শরীরও ভাল ছিল। পড়ার সময় ছাড়াও একে সঙ্গে সঙ্গে রেখো, বেড়াবার সময় সঙ্গে নিয়ে দেখ ত বাবা, একে কিছু শুধরে দিতে পার কি না।" সেই দিনই বিকালে বেড়াইতে

বাহির হইবার সময় তাহার মায়ের নির্দ্দেশে এই বোবা ছেলেটি সিন্ধুবাদের ভূতের মত আমার কাঁধে চাপিয়া বসিল। দুই এক দিন সঙ্গে নিয়া বেড়াইবার পর দেখিতে পাইলাম যে, এটা ওটা সম্বন্ধে দুই একটা সকৌতুক প্রশ্ন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রভুভক্ত কুকুরের মত বাক্যহীন পশ্চাদনুসরণের পরিবর্ত্তে সে ধীরে ধীরে মানব-সখার মত আমার অঙ্গুলি ধারণ করিয়া আমার পার্শ্ব-দেশটি অধিকার করিয়া লইল। আমি তাহার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়া অল্পে অল্পে সযত্নে কলিকাতার রাস্তার চারি দিকের ঘরবাড়ী, গাড়ীঘোড়া, গাছ, পাখী, আকাশ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া তাহাকে গল্পের মত করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। সে যেন বহুদিনের উপবাস ক্ষুধিত কর্ণে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সব শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দেখিলাম, তাহার বুদ্ধির দ্বার অনেক দিকে খুলিয়া গিয়াছে। আমার কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে আমি আরও গভীরতর কথা মুখে মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয়, দু'তিন মাসেই দেখিলাম সে বেশ একটি বুদ্ধিমান ছেলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরি মধ্যে তাহার শরীরও পূর্ব্ব হইতে অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথাবার্ত্তা চালচলনে বেশ বুদ্ধিমান হইলেও, বই খুলিলেই তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তখন সে যেই মূষিক ছিল সেই মূষিকই হইয়া যায়।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান ও পাঠাভ্যাস তাহার ভিতর এই দুটা জিনিষের সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টাই তখন আমার একমাত্র কাজ হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল, আমি যেন ধীরে ধীরে একটি জীবন-কাব্য গড়িয়া তুলিতেছি। কিন্তু আমার এই শুভ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন গৃহিণী, সুধা ও প্রবোধকে নিয়া মিত্রদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছেন। বড় একা একা বোধ হইতে লাগিল, বসিয়া বেহারার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম। বেহারা এই পরিবারের সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল— কেমনে ভবতারণ বাবু দেশের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতার কাজ লইবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া দুই বৎসর বসিয়া বসিয়া খাইয়াছেন, ও কাজের অভাবে বুদ্ধিমান ছেলেকে মারিয়া পিটিয়া গাধা করিয়া তুলিয়াছেন; কর্ত্তা কেমন হাবা, আর গৃহিণী কেমন সুনিপুণ; কর্ত্তার মুখে তাদের টাকা পয়সা সম্বন্ধে কেমন বড় বড় ফাঁকা কথা, আর গৃহিণীর হাতের তহবিল কেমন শূন্য; গৃহিণীর অনুরোধে কাজের চেষ্টায় কর্ত্তার কেমন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ ভ্রমণ, আর গৃহিণী কেমন মিত্রদেরে বলিয়া কহিয়া একটি কাজের প্রায় যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন; বেহারা কেমন রীতিমত তা'র বেতন পর্য্যন্ত পাইতেছে না এবং এমন কি অর্দ্ধ বেতনে কাজ করিতেছে, কিন্তু অনেক দিনের চাকুরী বলিয়া এবং এই পরিবারের মায়ার জন্যও সে কিছুতেই এই চাকরী ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না; সুধার বিবাহ লইয়া কেমন মুস্কিল হইয়াছে, কিছুতেই যে উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, এবং শেষে যে আমাকেই পাত্ররূপে মনোনীত করিবার কিছু কিছু ইচ্ছা ওদের হইয়াছে; এই সব সম্বন্ধে বেহারা অনেক কথা বলিল।

আমি ত প্রথমটা বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমিই সুধার পাত্র মনোনীত হইয়াছি!

সে দিন দুপুরে খাইয়া বিছানায় চোক বুঁজিয়া পড়িয়া আছি, ঘুম আসিতেছিল না। কর্ত্তা সারা কলিকাতা ঘুরিয়া খাইতে আসিয়াছেন। কর্ত্তাগৃহিণীতে আলাপ চলিতেছিল, সব কথা শুনা যাইতেছিল না,—তবে বুঝা গেল, গৃহিণী অনুচ্চকণ্ঠে কি বলিলেন, 'বিবাহ' 'মাষ্টার' 'পছন্দ' এই দুই একটি কথা আমার কানে পৌঁছিল; হঠাৎ সুধা উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল—"বাবা, মাষ্টার মশয়র বিয়া অইয়া গেছে, দুইটা"—গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, "যা এখান থেকে।"

আমার শরীর রাগে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সেবাযত্নে জড়াইয়া ফেলিয়া এই অদ্ভুত জীবটির সহিত আমাকে জুড়িয়া দিবার জন্য যে একটা সয়তানী ফন্দি চলিতেছে, তাহা আমি আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত তখনই বুঝিয়া ফেলিলাম। এই বোকা, কুৎসিৎ, বহুভাষী

মেয়েটার সঙ্গে বিবাহ! সুধাকে আমি পূর্ব্বে কৌতুক ও কৃপার পাত্র বলিয়াই মনে করিতাম, এখন তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু গৃহিণীর যে আদরে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই আদরকেই যখন স্বার্থপ্রণোদিত এবং কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল, তখন সমস্ত বাড়ীটা আমার নিকট কষ্টকর হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় সুধা পড়িতে আসিল। রাত্রি তখন আটটা।

সুধা—"কি মাষ্টার মশয়, আপনে না বোলে বিয়া করছেন? আমার কাছে মিথ্যা কথা কইছেন ক্যান্?"

ঘৃণা ও রাগ আমার মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। যথাসম্ভব সংযত হইয়া আমি বলিলাম—"না হয় বিয়ে করি নাই, তাতে কি হলো? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না কি?"

সুধা—"আপনের কাছে কেটা কইল?"

আমি—"যেই বলে থাক্, তোমার কি ইচ্ছা?"

সুধা অতি সহজে পরিষ্কার কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—"আমার ইচ্ছা আছে, আপনের ইচ্ছা নাই?" এমন বুদ্ধি ও লজ্জাহীনতার পরিচয় সচরাচর মেলে না!

আমি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম—"সুধা, তুমি এখন যাও ত, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

সুধা—"এখনই কি ঘুম! মা সকালে শুইতে গেলে কয়।" আমি ভাবিলাম—একে বেশীক্ষণ আমার নিকট রাখিবার এ আর একটা ফন্দি! বলিলাম—"না, যাও বলছি, আমি ঘুমোই।"

সুধা—"না অয়, আপনে ঘুমান, আমি একটা গল্প কই।—"

"এক রাজার পোলা—"

আমি লাফ দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে আসিতেই ভবতারণ বাবুকে ঢুকিতে দেখিলাম। আমি একটু চাপিয়া গিয়া সহজভাবে বলিলাম—"আপনার কাছেই আসছিলাম, আপনার কাছে হুঁকোরপাড়ার আমার যে আত্মীয়টির কথা বলেছিলাম (পূর্ব্বে কিন্তু আর কখনো বলি নাই) তিনি খুব ধরে বসেছেন, বলেছেন, আমাকে তার বাসায় যেতে হবে।"

ভব—"ও, সেই আত্মীয়টির কথা, তিনি না কি কাজ করেন?"

আমি—"তিনি উকীল।"

কর্ত্তার সঙ্গে উপরে উঠিলাম। গিন্নি আসিয়া সব শুনিয়া প্রথমটা যেন কিছু স্তম্ভিত হইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, শেষে বলিলেন—"চলে যাচ্ছ কেন বাবা, আমাদের কিছু অন্যায় হয়েছে?"

আমি—"ওঁকে আমার এই আত্মীয়ের কথা পূর্ব্বেই বলেছিলাম, তিনি উকীল, আমার কলিকাতার অভিভাবক—ওঁর কথা না শুনিয়া ত পারি না।"

গিন্নি—"আমরা ত তোমাকে পরের মত দেখি নি, তেমন ব্যবহারও করি নি। হঠাৎ এমন চলে যেতে চাচ্ছ, এর কারণ ত কিছু বুঝি না। কোনো কারণে আমাদের 'পরে রাগ করেছ কি?"

আমি কোনো উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে আমার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পর দিন ঘুম হইতে উঠিয়াই কুলি ডাকিয়া জিনিষপত্র সব বাঁধিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। নীচে নামিয়া আসিবার সময় দেখিলাম, গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে। সুধা পথে একা দাঁড়াইয়া ছিল—সে ধীরে ধীরে বলিল—"মাষ্টার মশয়, চইল্যা যায়েন ক্যান্, আমি আর কখনো বিয়ার কথা কইমু না, আপনে থাকেন।" আমি কি একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু রসনাকে অতি কষ্টে সংযত করিয়া রাখিলাম। বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, একতালার ভিত্তিতে ভোলা চুপটি করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে আমার সঙ্গে যে আত্মীয়তাটুকু পাতিয়া বসিয়াছিল, সে যেন হঠাৎ আজ এক মুহূর্ত্তে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে,—সে আমার সঙ্গে একটি কথা বলিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইল না, সে পুস্তকের ভোলা হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

আমি তাহাকে দেখিয়াই আজ তাহার প্রতি একটা প্রাণের টান অনুভব করিলাম,—তাহার নীরবতায় আমি তাহার অন্তর-মন্থন পাঠ করিলাম, তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

৪

সে বৎসর ছিলাম বেনেটোলার মেসেই। কিছু দিন পর্য্যন্ত ভোঁদাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু গৃহিনী ও সুধাকে দেখা দিবার ভয়ে আমি সে পথ আর মাড়াই নাই। তারপর বৎসর ছিলাম রাজাবাগান লেনের এক বোর্ডিংএ। ধীরে ধীরে এই সব কয়টি প্রাণীই আমার মনে একই বর্ণহীন স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল। তারপর বিবাহ করিলাম—বিবাহের সময় একটা কুৎসিৎ মুখের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি মনে আসায় রাণীর মুখটিকে আরো সুন্দর দেখাইল।

বিবাহের পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন হইল, অতি সাদা কথায় তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম। সেই চিঠির উত্তর, রাণীর প্রথম চিঠি, আজ আসিয়াছে। আমি ত চিঠি পড়িয়া অবাক,—এত সুগভীর প্রেমের কথা হৃদয়ের রঙ্ মাখাইয়া এমন সুন্দর ভাষায় সে প্রকাশ করিতে পারিল কি করিয়া! পাঁচ সাত বার চিঠিখানা পড়িলাম। দুই তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া চিঠি পড়িয়া শুনাইলাম—সকলই বিদুষী স্ত্রী বলিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। আমি বিকালে চিঠিখানা বুকের পকেটে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

অন্যমনস্ক ভাবে মীর্জ্জাপুরের মোড় দিয়া যাইতেছিলাম,—সেই বাড়ী! নিমেষে ভিতরকার চিত্রখানা আমার মনে উদিত হইল, বেহারা নীচে বসিয়া আছে, একটু বেশী বুড়া হইয়াছে—পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলাম, সে আমাকে চিনিল না। কি ভাবিয়া—আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলাম। সে "মাষ্টারবাবু" বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া আমাকে উপরে আহ্বান করিল,. আমি যন্ত্রচালিতের মত উপরে গেলাম। তিন বৎসর তিন মাস আগেকার সেই বোকা ভোলা কক্ষে বসিয়া আছে, তবে কতকটা বেশী লম্বা বটে, আর একটু বেশী কাহিল, চোখের চারি দিকে কালিমা পড়িয়াছে,—একটা বাক্যহীন নিশ্চল পাথর জানালার কাছে বসিয়া! আমাকে দেখিয়াই পাথরের নির্ব্বাণোন্মুখ দুটা চোখ যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, সারা অঙ্গে জীবন-লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইল, পাথর নড়িয়া উঠিয়া চীৎকার করিল—"মাষ্টার মশয়! দিদি, দিদি, মাষ্টার মশয়—" এই বলিতে বলিতে আমাকে টানিয়া তার দিদির কাছে উপস্থিত করিল। সে আমাদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া চেয়ারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া টেবিলে বই রাখিয়া পড়িতেছিল,—বই—রবিবাবুর "প্রেম" —খোলা পাতায় তার দুটি লাইন লাল পেন্সিলে দাগান—

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।"

একটু আশ্চর্য্য হইলাম,—সুধা গম্ভীর হইয়া বসিয়া "প্রেম" পড়িতেছে!

সুধা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া আমাকে দেখিয়া বিস্ময়-চমকে দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্ষণকালের জন্য তার সকৌতুক আঁখি দুটি কি একটি নীরব প্রশ্ন আমার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিল, আবার মেঝেতে নামিয়া পড়িল। সুধা একটু সরিয়া গিয়া ধীরে বলিল—"বসুন"। আমি চেয়ারে বসিলাম, তার মুখের দিকে চাহিয়া আরো একটু বেশী আশ্চর্য্য হইলাম—পাণ্ডুরবর্ণ মুখ! একটা স্নিগ্ধ সলজ্জ দীপ্তিতে তাহা এখন বেশ সুন্দরই দেখাইতেছে! মেঝেতে চাহিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে সুধা বলিল—"আপনি এতদিন বেশ ভাল ছিলেন?" আমি বলিলাম—"হাঁ, তোমরা সব ভাল ছিলে?" সুধা নীরব।

আমি—"তুমি কি বই পড়ছিলে?" চিলের মত ছোঁ মারিয়া সুধা খোলা বইটি বন্ধ করিয়া দিয়া আঁচলের ভিতর লুকাইয়া ফেলিল, বলিল—"ও কিছু নয়।"

আমি—"তুমি রবি বাবুর কবিতা বুঝ্তে পার?"

সুধা কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপ্নি কলিকাতায় ছিলেন না?"

আমি—"হাঁ ছিলাম।"

দুই জনই অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম, তারপর সুধা বলিল—"আপ্‌নি মার সম্বন্ধে হয় ত কোনো ভুল ধারণা ক'রে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু মা বাস্তবিক আপ্‌নাকে মনে মনে খুব ভালবাসেন, মুখ ফুটে আপ্‌নাকে কিছু বল্‌তে পারেন নি। এ তিন বছর এমন দিন যায় নি, যে দিন তিনি আপ্‌নার কথা স্মরণ করে চোখের জল না ফেলেছেন।"

আমার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল! সুধা বলিতে লাগিল—"আর, একে আপ্‌নি কত আদর কর্‌তেন, এই ভোলাটার কথাও কি আপ্‌নার এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হয় নি? আপ্‌নাকে পেয়ে আপ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ও দু'দিনে কেমন ভাল হয়ে উঠেছিল, আপ্‌নি চলে গেলে আবার যেই সেই হয়েছে।"

ভোলা এত ক্ষণ একবার আমার দিকে, এক বার তার দিদির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল,—আমি তাহাকে সস্নেহে আমার দিকে টানিয়া আনিলাম, সে আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছু ক্ষণ সকলই নীরব।

ধা একটু হাসিয়া বলিল—"আপ নার শরীর বেশ ভাল হয়েছে দেখ্‌ছি। বিয়ে করেছেন বোধ হয়।" সুধার নত চোখ দু'টি আরো নত হইয়া গেল।

আমি—"হাঁ হয়ে গেছে।"

সুধা—"বিয়ে হয়েছে কত দিন হলো?"

আমি—"এই ত ঠিক এক বৎসর হলো।" দু'জনেই কি মনে করিয়া কিছু হাসিলাম।

আমি চেষ্টা করিয়া সহজে বলিলাম—"তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায় সুধা?" সুধা মাথা নত করিয়া রাখিল কোনো উত্তর করিল না। ততক্ষণে ভোলা হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"দিদি যে বিয়ে কর্‌বে না বলেছে।" আমি হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিলাম। সুধা একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"বাঃ, মাষ্টার মশায়কে পেয়েই যে মুখে কথা ফুটে বেরুল। ললিত বাবু, মা আজ্‌কে বাসায় নেই; তাঁর আর এই ভোলাটার জন্য আপনি আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বেন ত?"

আমি—"তা নিশ্চয়ই আস্‌ব।"

গৃহিণী ফিরিয়া বেহারার নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং নিরভিমান স্নেহকণ্ঠে ডাকিলেন, "ললিত।" আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে বলিলাম, "মা"। এই বলিয়া তাঁহাকে এমন আন্তরিকতার সহিত প্রণাম করিলাম যেমন ভাবে পূর্ব্বে আমি আর কাহাকেও করি নাই। গৃহিণীর হৃদয়ে বহু দিনের রুদ্ধ ভাবমেঘগুলি অশ্রুভাবে গলিয়া আসিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তিনি সংযমের সহিত সেগুলিকে চক্ষে বহিয়া আসিতে দিলেন না। আমার হৃদয় ফুলিয়া উঠিতেছিল—এঁরি সঙ্গে আমি এমন খারাপ ব্যবহার করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম! আমার প্রাপ্যের চেয়েও বেশী টাকা এঁরি মুখের গ্রাস হইতে আমি কাড়িয়া নিয়াছিলাম! গৃহিণীর দিকে চাহিয়াই আমি আর আমার হৃদয়ভাবকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, আমার চোখে তাহা ঝরিয়া আসিল। গৃহিণী তাহা দেখিয়া চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি চলে গেছ বাবা, আর আমার সুধা দিন দিন তোমার কথা ভেবে ভেবে মর্‌ছে।" আমি চমকিয়া সুধার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে যেন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর বেদনাঘাতে, এবং মায়ের প্রতি যেন একটু ক্রুদ্ধ হইয়া, মুখ ফিরাইয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, "মেয়েটা হাবা ছিল সত্য; কিন্তু আমি কি আর জান্‌তাম না যে, বিয়ে হলে তার একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হবে? তা না জান্‌লে তোমার মত ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের ইচ্ছা কর্‌তাম!" অপর কক্ষ হইতে সুধার চাপা ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম। অনুতাপে ও বেদনায় আমার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আমি বলিয়া ফেলিলাম, "মা, আমি সুধাকে বিয়ে করব।"

গৃহিণী গিয়া বলিলেন, "ললিত বিয়ে কর্‌তে স্বীকৃত আছে—"

"আমি বলি নি মা, আমি কাউকে বিয়ে কর্‌ব না?"

বলিয়া সুধা বাহিরে আসিয়া বলিল, "ললিত বাবু, আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল।"

সে দিন রাত্রে মেসে ঘুমাইয়া অনেক স্বপ্ন দেখিলাম। প্রভাতে উঠিয়াই রাণীকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখিলাম, চিঠির শেষ দিয়া আমার এই করুণ প্রাইভেট টিউটরীর কাহিনীটিও লিখিয়া দিলাম। শ্যালী ও শালা-মহলে জনরব শুনিয়াছি, চিঠি পড়িয়া রাণী অন্তরের আনন্দে হাসিতে হাসিতে না কি কাঁদিয়া ফেলিয়াছে,তাহার ঠোঁটে হাসির রেখা মিলাইতে না মিলাইতেই না কি তাহার চোখে অশ্রুরেখা দেখা দিয়াছে! ঠোঁটের হাসিটি আমি ও রাণী বাটিয়া লইয়াছি, চোখের অশ্রুটুকু আর একজনের নামে পবিত্র হইয়া সেখানে চিরদিন বিরাজ করুক।

শ্রীসুধরঞ্জন রায়।

অমর প্রেমিক

"দেওয়ান হাফেজ" হইতে

পাত্র[১] মোর কর সমুজ্জ্বল
সুরা-দাতায়[২] রাগ[৩] প্রভায়;—
গান গাও হর্ষে হে, গায়ক,
সংসারের কাজ শেষ, হায়!

তুমি মোর সুরারসাস্বাদে
কেন নিত্য বিমুখ এমন,—
পান-পাত্রে হেরিয়াছি আমি
সখার সে কমল-আনন!

প্রেমেতে জীবিত যার মন
কোন দিন মৃত্যু নাই তার;
জগতের কর্ম্মালয়ে সেই
অমরত্ব অঙ্কিত আমার।

যবে তুমি সখার উদ্যানে
উপনীত হবে সমীরণ,
সখারে সে আমার সংবাদ
উপহার দিও হে তখন।

কহিও আমার নাম কেন
ভুলিবারে চাহে অকারণ,
সে সময় আসিছে আপনি
যবে আর হবে না স্মরণ।

অশ্রু-বিন্দু-শস্য-কণা শুধু
হে হাফেজ! কর গো বর্ষণ;—
হয়ত সে মিলন-বিহগ
তব জলে মানিবে বন্ধন।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

(১) পাত্র—হৃদয়। (২) সুরাদাতা—প্রেমোদ্দীপক গুরু। (৩) সুরা—প্রেম বা মত্ততা।

মধ্যযুগে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও য়ুরোপীয় ছাত্রজীবন

য়ুরোপের মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রজীবনের ইতিহাস বঙ্গবাসীদের নিকটে কিরূপ স্থান লাভ করিবে জানি না। কিন্তু আজকাল বহুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যেও যেরূপ ঘনিষ্টতার আভাষ দেখা যাইতেছে এরূপ অবস্থায় উক্ত বিষয় আলোচনা করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিক্ষার একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া মনে হয়। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণের উপরই শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। যাহাতে তাঁহারা নানারূপ সাংসারিক চিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া একমাত্র শিক্ষকতা কার্য্যেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি

নিয়োজিত করিতে পারেন, প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাহার সুব্যবস্থা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভাব যদিও তৎকালীন মনীষিগণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তথাপি সেই সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাদের ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। রাজা শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে (৬০৭—৬৪৭) ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর না হইলেও এসিয়াখণ্ডের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার বিরাট পুস্তকাগারের খ্যাতি (১) দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পালরাজগণের রাজত্বকালে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দের মতই প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পরেই মুসলমানগণের আবির্ভাব। বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বক্তিয়ারের জনৈক সেনাপতি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় ও চারি দিকে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে।

য়ুরোপখণ্ডেও গ্রীস ও রোমের সভ্যতাকালে তদ্দেশবাসী রাজন্যবর্গ শিক্ষাবিস্তারে যত্নপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার আন্দোলন মন্দীভূত হইতে থাকে। ভারতবর্ষে যেমন মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কিছুকালের জন্য শিক্ষার আন্দোলন চাপা পড়িয়া রহিয়াছিল, য়ুরোপখণ্ডেও হুন্, গথ, প্রভৃতি অসভ্যজাতির উৎপীড়নে তদ্রূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত তথায় বিক্রমশীলা বা ওদন্তপুরীর ন্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১২০০ খৃঃ অব্দের স্থাপিত প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ই য়ুরোপখণ্ডের মধ্যযুগের সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের মত য়ুরোপেও কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকদের হস্তেই শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত ছিল। এক একটি ধর্ম্মযাজকের হস্তে ১০।১২টি ছেলের ভার অর্পিত হইত। উচ্চ শিক্ষাভিলাষী যুবকদিগের বড় বড় সহরে প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইয়া শিক্ষালাভ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যাতায়াতের নানারূপ অসুবিধা থাকার দরুণ অতি কম লোকই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইত।

শিক্ষার ভার কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকদের উপরেই ন্যস্ত থাকায় অতি সঙ্কীর্ণভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইত। ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের অভিলাষানুসারে ও যাহাতে ছাত্রগণ পরে তাঁহাদেরই উদ্দেশ্য সাধনের উত্তম সহায় হইতে পারে, ঠিক সেইভাবে শিক্ষা দিতেন। (২) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ৮ ভাগে বিভক্ত ছিল—৭টি সাধারণ বিষয় (soven liberal arts) ও থিওলজি বা ধর্ম্মতত্ত্ব। ৭টি সাধারণ বিষয় আবার দুইভাগে বিভক্ত ছিল:—

১। ত্রৈয়িক (Trivium)
- (i) ব্যাকরণ
- (ii) অলঙ্কার (Rhetoric)
- (iii) তর্কশাস্ত্র (Logic)

২। চাতুর্থিক (Quadrivium)
- (i) গণিত
- (ii) জ্যামিতি
- (iii) সঙ্গীত
- (iv) জ্যোতিষ

সাহিত্য ব্যাকরণের অঙ্গীভূত ছিল। থিওলজিকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হইত ও সমাজে উক্ত বিষয়ে উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত য়ুরোপে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায় না। প্রকৃত জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতি অল্প থাকায় তাঁহারা

(১) ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, নালন্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ের অট্টালিকাটি ৯ তালা ছিল, এবং তাহার নাম "রত্নোদধি" ছিল।

(২) Education was intended wholly for the church and most of the students became members of the Secular or Regular clergy. This determined to a very great extent the character of the teaching."

নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। মাঝে মাঝে দেখা যাইত সেই সকল মনীষিগণের জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া অনেক জ্ঞানপিপাসু ছাত্র তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। মনীষি আবেলার্ড (Abelard) যখন ঐরূপ ভাবে ঘুরিয়া পুনরায় নিজ মাতৃভূমি প্যারিতে পদার্পণ করিলেন, তখন দেখিলেন প্রায় শতাধিক ছাত্র তাঁহার অনুবর্ত্তী। জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ আবেলার্ড ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"যদি তোমরা প্রকৃতই জ্ঞানপিপাসু হইয়া থাক, আমি তোমাদের জ্ঞানপিপাসা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তোমাদের আর ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না।" সেই শতাধিক ছাত্র লইয়া আবেলার্ড প্যারি সহরে তাঁহার শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টিই যে পরে বিখ্যাত প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে, এবং ইহারই অধ্যাপকগণ যে এক সময়ে রোমের পোপদিগের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য আহূত হইবেন, বৃদ্ধ আবেলার্ড তাহা বোধ হয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারেন নাই।

আবেলার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যবর্গ তাহাদের গুরুর পদানুসরণ করিয়া শিক্ষাদানে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমশঃই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারি সহরের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাজা ফিলিপ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকারিতা শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী ছিল। তিনি দেখিলেন, এক দিকে যেমন তাঁহার রাজ্যে ধনাগমের এক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে, অপর দিকে তেমনই তাঁহার রাজ্যের যশঃ ও খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতেছে (৩)। তিনি বুঝিলেন, বিদেশী শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে সন্তুষ্ট রাখাই তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন একদিন সহরস্থ শান্তিরক্ষকদের সহিত দাঙ্গা করিতে যাইয়া ৫টি ছেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ও তাহার ফলে যখন সমগ্র শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া প্যারি পরিত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হয়, রাজা ফিলিপ ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ দোষ জানিতে পারিয়াও তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ছাত্রদিগকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রধান প্রধান সর্ত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল (৪)—

১। ছাত্রগণ এবং তাহাদের পত্র, অর্থ, ও অন্যান্য জিনিষবাহকদিগকে কেহ অত্যাচার বা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

২। প্রত্যেক ছাত্রকেই ধর্ম্মযাজকের ন্যায় দেখিতে হইবে।

৩। ছাত্রগণের বিচার যে ধর্ম্মযাজকগণ না হয় অধ্যাপকগণ করিবেন।

৪। শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের শিক্ষা-স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। (Right of migration).

শেষোক্ত সর্ত্তটিই ছাত্র ও শিক্ষকগণের নিকট অধিকতর মূল্যবান্ ছিল। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল না। সুবিধানুসারে ঘর ভাড়া করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইত। এরূপ অবস্থায় রাজা অথবা সহরস্থ অন্য কাহারও সঙ্গে একটু মতদ্বৈধ হইলেই তাঁহারা স্থান পরিবর্ত্তনের ভয় দেখাইয়া নানারূপ সুবিধাজনক সর্ত্ত মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারিতেন।

উপযুক্ত উপকরণাভাবে শিক্ষকগণ কিরূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা বিশদ ভাবে জানা যায় না। তবে যত দূর জানা যায় তাহাতে অনুমান করা যায় যে, শিক্ষকগণ প্রধানতঃ পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট কিয়দংশ পড়িয়া সহজ ভাষায় ছাত্রদিগের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। ছাত্রগণ অধ্যাপকের বক্তৃতার 'নোট' লইতে চেষ্টা করিত। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা তখনও পৃথিবীতে দেখা দেন নাই, সুতরাং পুস্তকের অভাব যথেষ্টই ছিল। পুস্তকগুলি সাধারণতঃ

(৩) "The king was very glad to have the scholars on acount of the added *wealth* which they brought to the capital, and decanse of the *prestige* which the great school conferred upon Paris."

(৪) "It was in the year 1200, and this may be considered the date of the official recognition of the University of Parisı"

পার্চ্চমেণ্ট কাগজে লেখা হইত। এই কাগজও উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত না। বৎসরে দুই বার করিয়া প্যারিতে বিশ্বমেলা বসিত এবং সেখানে পার্চ্চমেণ্ট কাগজের বেচাকেনা হইত। রাজার আদেশানুসারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের পুর্ব্বে কেহই ঐ কাগজ কিনিতে পারিত না।

যে সকল গরিব ছাত্র অর্থাভাবে পুস্তক অথবা নোট লিখিবার কাগজ কিনিতে পারিত না, তাহারা স্বভাবতঃই ধনী ছাত্রগণের শরণাপন্ন হইত। যাহাতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছাত্রগণ দুই পয়সা বাঁচাইয়া চলিতে পারে, তৎপ্রতি তাহাদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে ১৬।১৭টি ছেলে একটি ক্ষুদ্র সেঁৎসেঁতে ঘরে একখানি মাত্র বই কিনিয়া একটি আলোর সাহায্যে দুরূহ ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছে। শীত কালে ঘরে আগুন জ্বালিয়া ঘরটিকে একটু উষ্ণ করিবার খরচও তাহাদের কুলাইয়া উঠিত না। সেই বরফ-পড়া ভীষণ শীতে কোন প্রকারে জড়সড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া তাহারা রাত্রিটা কাটাইয়া দিত।

যে দিন হইতে বিধাতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই বোধ হয় তিনি মানব জাতির মধ্যে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এক সম্প্রদায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত অভাবহীন, আর এক সম্প্রদায় অভাবপরিপূর্ণ, অর্থহীন। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের নিয়ত কতই না আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের ক্ষয় নাই। যত দিন এ পৃথিবীর আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই ভীষণ বৈষম্যও বোধ হয় তত দিনই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া আনন্দ ও নিরানন্দকে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। বৈচিত্র্য রক্ষাই যেন বিধাতার সার খেলা।

নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপন করিতে না পারিলে ছাত্রগণকে যথোপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সুদৃশ্য বেত্রদণ্ডের মোটেই অভাব ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে বলিতে পারি না—তাহাদের বড় বিশেষ কিছুই পড়িতে হইত না।

১। গণিত—সাধারণ জমাখরচ রাখা শিক্ষা করিতে পারিলেই হইত।

২। সঙ্গীত—কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে পারিলেই হইত।

৩। জ্যামিতি—কয়েকটি মাত্র অনুশীলন করিতে হইত।

৪। জ্যোতিষ—ইষ্টারের দিন গণিতে পারিলেই হইত—ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতেই উপরোক্ত বিষয়গুলি উচ্চ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৭টি সাধারণ বিষয়ের যে কোনটিতে উপাধি লইতে হইলেই ৬ বৎসর পড়িতে হইত; কিন্তু থিওলজিতে উপাধি লইতে হইলে ৮ হইতে ১৪ বৎসর পড়িতে হইত। প্রত্যেক ছাত্রেরই জ্ঞানার্জ্জনের একটা প্রবল ইচ্ছা থাকায় সকলেই সকল বিষয় পড়িতে চেষ্টা করিত। সপ্ততি বর্ষ বৃদ্ধও উপাধি পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে পড়িতে আসিত; কারণ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে বয়সের কোনই সম্বন্ধ নাই। মানুষ যত দিনই জীবন ধারণ করুক না কেন, জীবনের শেষ স্পন্দন পর্য্যন্তও সে ছাত্র। তাহারা বুঝিয়াছিল, বিদ্যার সীমা নাই। আমেরিকাতেও আজকাল এ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—৮০ বৎসরের কম্পিত কলেবরা বৃদ্ধা জ্বলন্ত উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া যুবক ছাত্রগণের সহিত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে!

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ঋষি আরিষ্টটলের মহামূল্য গ্রন্থ সকল টীকাটিপ্পনী সহ স্পেন দেশ হইতে প্যারিতে নীত হইল, তখন প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দূরে চলিয়া গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রভৃতি দুরূহ তথ্য আবিষ্কারে সকলে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। যেন এক প্রবল বন্যা আসিয়া দার্শনিক গবেষণায় সকলকে ডুবাইয়া রাখিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছাত্রগণ বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের আলোচনায় পুনরায় মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করে।

শিক্ষার ভার যখন কেবল ধর্ম্মযাজকদের উপরই ন্যস্ত

ছিল তখন কাহাকেও শিক্ষালাভের প্রতিদান স্বরূপ কোনরূপ বেতন দিতে হইত না। শিক্ষকতা ব্যাপারটি নানা লোকের হস্তে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বেতন লওয়া পদ্ধতি প্রচলিত হইতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও নিয়মিতরূপে বেতন দিতে হইত। ১৪শ শতাব্দীতে আল্পস পর্ব্বতের উত্তরাংশে প্যারি সহরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল। জার্ম্মাণীতে ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই। দক্ষিণে ইটালিতে বলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারি ও বলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০০০ হইতে ৭০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ২০০০ করিয়া ছাত্র ছিল(৫)।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মধ্যযুগেও সমপাঠী ছাত্রগণের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান হইত। সময় সময় অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা প্রকার সংবাদ জানিবার জন্য সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের নিকটেও চিঠি লেখা হইত(৬)। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ পুস্তক ও খাওয়াখরচ প্রভৃতির ব্যয়সঙ্কুলনের জন্য তাহাদের অভিভাবকদের নিকট প্রায়ই চিঠি লিখিত(৭)। এই সকল চিঠি হইতেই আমরা মধ্যযুগের ছাত্রজীবনের বিবরণ কতক পরিমাণে জানিতে পারি। ছাত্রগণ অভিভাবকদিগের নিকটেই অধিক চিঠি লিখিত। অভিভাবকগণ কৃপণ হইলে নানাপ্রকার ওজুহাত দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা হইত,—এ সহরে সব জিনিষেরই দাম বেশী, বিশেষতঃ এবার অত্যধিক শীতে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সহরের লোকসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়াতে সব জিনিষই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে; বিদ্যালয়ের বেতন বাড়িয়াছে ইত্যাদি। সন্তান-বৎসল পিতামাতা একটু নম্রভাবে খরচ কম করিতে উপদেশ দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ পাঠাইয়া দিতেন।

শিক্ষকগণ মাঝে মাঝে ছাত্রের চরিত্র ও পড়াশুনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া গোপনে অভিভাবকের নিকট চিঠি লিখিতেন। কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনও শিক্ষক তাহার পিতার নিকট পত্র লিখিলে পিতা পুত্রকে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, তুমি নিয়মিতরূপে পড়া চালাইতেছ না, এবং বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার অসদ্ব্যবহারের পরিচয় দিতেছ। যখন তখন নানা স্থানে ঘুরিয়া সময় নষ্ট করিতেছ। ইহা ছাড়া

---

(৫) য়ুরোপের মধ্যযুগের (ত্রয়োদশ শতাব্দী) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম:—

(ক) ইটালীতে—১। বলোগ্না (Bologna)
২। পেভিয়া (Pavia)
৩। পেডুয়া (Padua)
৪। সিএনা (Siena)
(খ) স্পেন — ১। সেলামেনকা (Salamanca)
(গ) অষ্ট্রীয়া — ১। প্রেগ (Prague)
২। এরফার্ট (Erfurt)
(ঘ) ফ্রান্স—১। প্যারি (Paris)
২। ওরলিয়াঁ (Orleans)
৩। টুলু (Toulouse)
৪। মণ্টপেইয়ে (Montpellier)
(ঙ) ইংলণ্ড—১। অক্সফোর্ড (Oxford)
২। কেম্ব্রিজ (Cambridge)
(চ) জার্ম্মাণী (১৫ শতাব্দীর পরে)—
১। ভিএনা (Vienna)
২। লাইপসিক (Leipsig)

(৬) Letters to fellow-students occupy a considerable place in these collections, but they are confined to the most part to messages of condolence, introductions, request for news, protestations for friendship and similar common-places. We also find students urging friends to join them at the university, arguing to make the journey together.

(৭) The students after arriving at a university town generally wrote letters to their parents giving a general description of their town and the help they had got from the masters and the fellow-students. Then follows the inevitable demand for money, this time for the purchase of a desk, ink, parchment etc."

আরও অনেক গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতেছ, যাহা উল্লেখ করাও আমি উচিত মনে করি না, ইত্যাদি।" তাহার পর শিক্ষকদিগকে গোপনে শাস্তির ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হইত।

পথের নানাপ্রকার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রগণ বহু দূর দেশ হইতে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়িতে আসিত। জার্ম্মেণী হইতে বহু ছাত্র দুর্লঙ্ঘ্য তুষারাচ্ছন্ন আল্পস্ পর্ব্বত পার হইয়া বলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতে আসিত। জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল উদ্দীপনায় তাড়িত ছাত্রবৃন্দের নিকটে পথের কষ্ট ও চোর ডাকাতের ভয় প্রভৃতি ক্ষণিক ভীতিসমূহ কোথায় উড়িয়া যাইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের রক্তরঞ্জিত অধ্যায় হইতে বিদায় লইয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুন্দর ইতিহাসে মনোনিবেশ করা যায়, তখন মনে কিই না এক বিমল আনন্দের উদয় হয়! এক দিকে স্বার্থান্ধ রাজ্যলিপ্সু রাজন্যবর্গ খড়্গহস্তে স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য সহাস্য বদনে রক্ত পাত করিতে প্রস্তুত; অপর দিকে কোমলমতি শিশুসন্তানগুলি পিতামাতার নেত্রজলে সিক্ত হইয়া সরস্বতী দেবীর আরাধনার জন্য বিদেশ-যাত্রায় বদ্ধপরিকর; এক দল রক্তের নদী দ্বারা পৃথিবীকে ভাসাইতে চলিল, আর এক দল জগতে জ্ঞান-বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে চলিল।

ছাত্রগণ এক বার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলে সহজে আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিত না। অনেক চিঠিতে দেখিতে পাই, মাতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, পিতা জননীকে এক বার শেষ দর্শন দিবার জন্য পুত্রকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু জ্ঞানপিপাসু পুত্র সে দিকে দৃক্‌পাতও করিতেছে না। আর একখানি চিঠিতে দেখিতে পাই—পিতা সিএনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার পুত্রের নিকট চিঠি লিখিলেন—"বৎস, তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে। তোমার পরিজনবর্গ এক রূপগুণবিভূষিতা ধনশালিনী পাত্রী ঠিক করিয়াছেন। বিলম্ব না করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই যাহাতে শিক্ষকগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী পৌঁছিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও।" পুত্র উত্তর দিল—"পিতা, সামান্য বিবাহের জন্য লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে যাওয়া আমি অতি নির্ব্বোধের কাজ বলিয়া মনে করি। কারণ, মানুষ যখন ইচ্ছা তখনই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা এক বার হারাইলে পুনরায় পাওয়া বড়ই দুষ্কর—ইত্যাদি"

শিক্ষকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাত্রগণের সমস্ত অভাব অভিযোগ জানিয়া লইয়া তাহা পূরণ করিতে যত্নপর হইতেন। কতিপয় চিঠিতে দেখা যায়, শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন; অভিভাবকগণ তাঁহাদের সহিত ছেলের ভবিষ্য জীবনালোচনাতেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেছেন।

মধ্যযুগে বহুগুণসম্পন্ন না হইলে কেহই উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না (৮)। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রথিতনামা অধ্যাপক রবার্ট ডি সরবর্ণ (Robert de sorborn) তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে নিম্নলিখিত ৬টি নিয়মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে বলিতেন:—

১। বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্ধারণ করা।

২। পাঠকালে একাগ্রচিত্ত হওয়া।

৩। পুস্তকের উৎকৃষ্ট অংশগুলি মুখস্থ করা।

৪। অধ্যাপকের বক্তৃতাকালে নোট লওয়া।

৫। অধ্যাপক ও সমপাঠিগণের সহিত আলোচনা করা।

৬। উপাসনা বা সাধনা করা।

প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ অনেকগুণের অধিকারী হইলেও বালসুলভচপলতা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

৮। "The ideal scholar of the pulpils was a rather colourless personage, obedient, respectful, eager to learn, and keeping very much to himself................. Should be assiduous in lecture, quick at lerning, and bold in debate................."

সময় সময় তাহাদের নানাপ্রকার উপদ্রবে সহরশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। রাজপথের উপরে ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটী ও মারামারি হইত। অনেক সময় সামান্য মতদ্বৈধ হেতু ছাত্রগণ অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া সহরবাসীদিগের আবাসসমূহের দরজা জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তানের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণও তাহাদের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইত না। নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময়ও ছাত্রগণ ছোরা প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না[১]। ছাত্রগণের এবম্বিধ উদ্ধত স্বভাব কেবল প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়েই দৃষ্ট হয় নাই, বলোগনা, সিয়েনা, ওরলিঁয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরাও সমভাবে ছাত্রগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইত। নিম্নলিখিত দোষগুলিও বহুপরিমাণে[২] ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

১। জুয়াখেলা (এমন কি গির্জ্জা ঘরে পর্য্যন্ত)
২। নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য পান।
৩। মাতাল হইয়া রাজপথে বাহির হওয়া।
৪। কুস্থানে ভ্রমণ। ইত্যাদি।

বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রগণের মার্জ্জিত আমোদ-প্রমোদ তৎকালীন ছাত্রদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সময় ও ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আমোদ-প্রমোদ সকল এখন অসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ক্রিকেট, টেনিস্, অথবা ফুটবল খেলিয়া তাহারা আমোদ করিতে জানিত না। মদ্যপানই তাহাদের প্রধান আমোদ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণও এবিষয়ে ছাত্রদিগের সাহায্যকারী ছিলেন। মধ্যযুগের শেষ ভাগে যখন প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব প্রবেশ করিল তখন দেখিতে পাই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য বিজ্ঞাপন বিলাইয়া বেড়াইতেন।* মদ্যপান ব্যতীত আরও নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে তাহারা সময় কাটাইত। সময় সময় দ্বিতল হইতে গোবর মিশ্রিত জল অথবা আলকাতরা রাজপথের লোকদের উপর নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের অদ্ভুত ভাবভঙ্গী দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিত। পশুক্রীড়াও তাহাদের এক প্রধান আমোদের মধ্যে গণ্য হইত।

এইরূপে অসভ্য আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া মধ্যযুগের ছাত্রজীবনের ইতিহাসে এক দিকে যেমন অসভ্য রীতিনীতির প্রচলন দৃষ্ট হয় অন্য দিকে তেমনই আবার তীব্র জ্ঞানপিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থ, বিবাহ, এমন কি জননীর মৃত্যুসংবাদও ছাত্রদিগকে জ্ঞানের গভীর সাধনা হইতে টলাইতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে সমুজ্জ্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন দৃশ্য কয়টি মিলিবে জানি না।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।
উইস্কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিসন্।

প্রাচীন জাপান

হইয়ান্ বংশের রাজত্বকাল

(খৃঃ ৭৮২—১১৫৫)

এই যুগে রাজদরবারে ফুজিওয়ারা বংশের প্রাধান্য ও অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। মিচিনাগা ফুজিওয়ারার চার কন্যা সম্রাজ্ঞী ও এক কন্যা রাজবধূ হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, তিনি যা' খুসি তাহাই করিতে

১। They quarrel among themselves over dogs, women, or what not, sleashing off one another's fingers with their swords or, with only knives in their hands and nothing to protect their tonsured parts, rush into the conflicts from which armed knights would hold back...... Some of the attacks are planned in advance at organized meetings of students.

* Here only the students can get wine and women profusely.

পারিতেন। চার সম্রাটের এই ঠাকুর্দাটি নিজ মহত্বের ব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

"নিখিল ভুবন মম করতলে
(কোনো) অভাবের কথা জানি না.
যেন গগন মাঝারে পূর্ণচন্দ্র ;
(কভু) কা'রো কথা আমি মানি না।"

দেশের কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ গণ্ডগোল না থাকায় পুরুষগুলো আমোদপ্রিয় ও ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কাম্মু হেইয়ান্ বা কিওতো সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। 'রেষ্টোরেসন' পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী ১০৭৫ বৎসর এখানেই সম্রাটেরা বাস করিয়াছিলেন। নূতন রাজধানীটি অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাস্তাগুলি পরস্পর সমকোণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। সহরের উত্তরাংশে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি দক্ষিণমুখো। উহার চারি দিকে গভর্ণমেণ্ট আপিস ও কর্ম্মচারীদের থাকিবার স্থান। সহরে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১২১৬টি রাস্তা ও ৩৮৯১২টি বাটী ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে সহরটি বিভক্ত, দোকানপশার উভয় অংশেই ছিল। মাসের প্রথমার্দ্ধে পূর্ব্ব অংশে ও শেষার্দ্ধে পশ্চিমাংশে হাট বসিত। পথের ধারে 'চেরি' ও দেবদারু গাছ রোপিত হইয়াছিল। বেড়াইবার জন্য সহরে অনেক নয়নাভিরাম সুন্দর স্থান ছিল। নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর মন্দির, দূর দেশ হইতে পূজার্থীরা এই সব মন্দিরে পূজা করিতে আসিতেন। রাস্তায় লোকের ভিড়, কচিৎ কখনো একখানা গো-শকট মৃদুমন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছে, কোথাও ফেরিওয়ালীরা সারি দিয়া ঝুড়ি মাথায় চলিয়াছে। ক্রমশঃ পশ্চিমের সহরটির অবনতি এবং পূর্ব্বের সহরটির উন্নতি হইতে লাগিল। শাসনকার্য্য চারিদিকে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে অরাজকতা দেখা দিল; সীমান্তপ্রদেশগুলো হাত-ছাড়া হইয়া যাইতে লাগিল; বড় বড় ব্যারণদের সামুরাই অনুচরেরা পদস্থ নাগরিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে মদ্য ও শস্যাদির কর আদায় করিতে লাগিল। সিঁধেল চোরের প্রাদুর্ভাবে নাগরিকেরা অস্থির হইয়া উঠিল, রাস্তাঘাটেও চলাফেরা দায় হইল। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে নগর রক্ষার জন্য পুলীশের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু তাহারা যে ঐ কার্য্য করিতে অপারগ এক্ষণ তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। দূর প্রদেশ হইতে রাজকোষে রাজস্ব আসা বন্ধ হইল। অর্থাভাবে সরকারি বাটীগুলির সংস্কার হয় না। অনুক্ষণ গৃহদাহ ঘটিতে লাগিল, রাজপ্রাসাদেই একাধিক বার অগ্নি সংযুক্ত হইল। ৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি স্থান হইতে কারাগার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফুজি পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে আসিগারা পর্ব্বত-পথ নষ্ট হইয়া গেলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য হাকোনে পার্ব্বত্য-পথ উন্মুক্ত হইল। একেই ত ভ্রমণে নানা অসুবিধা তাহাতে আবার জলে স্থলে দস্যুর ভয়। দেশে একমাত্র সমৃদ্ধ বন্দর ছিল নানিওয়া বা ওসাকা। সেখানে অবিরাম লোকজনের আনাগোনা হইত।

এ যুগে বৌদ্ধ ও যিস্তো ধর্ম্ম উভয়ই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা সমর-বিদ্যা শিখিতেন ও বুদ্ধকে তাঁহার শত্রুগণ হইতে রক্ষা করিবার অছিলায় অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতেন। ক্রমশঃ এই পুরোহিতেরা পৌরোহিত্য বিসর্জ্জন দিয়া অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইল, তাহাদিগকে বশে রাখা সম্রাটেরও অসাধ্য হইল।

বিবাহ ও উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি ক্রমে শিথিল হইয়া গেল। পিতা অন্য পুত্রগণকে বাদ দিয়া প্রিয় পুত্রকেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক করিতে লাগিলেন, কখনো বা পুত্রের পরিবর্ত্তে ভ্রাতা বা রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পর আত্মার শান্তির জন্য কেহ কেহ সমস্ত সম্পত্তি বৌদ্ধ মন্দিরে অর্পণ করিতেন। পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকেই বিবাহ হইতে লাগিল।

কৃষিকার্য্যে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একখানি তুলা বোঝাই ভারতীয় পোত ঝটিকাবেগে তাড়িত হইয়া মিকাওয়ার তীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়। ইহা হইতেই জাপানী কার্পাস চাষের উৎপত্তি। ৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'চা'র চাষের আরম্ভ। ৮২২ খৃষ্টাব্দে য্যামও

য়োবিমিনে স্রোতশ্চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন ও ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য উহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট নিন্মেই প্রজাবর্গকে গোধূম, শিম্, জনার প্রভৃতির চাষ করিতে অনুরোধ করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিলেন।

বিভিন্ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ওমরাহদের অবস্থা স্বচ্ছল, অর্থও অনেক, সেই হেতু নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রচুর কাটতি হইত। তাহাদের বসতবাটীগুলি সুসজ্জিত করিবার জন্যও নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্যের প্রয়োজন এবং সেই সব সৌখীন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুদক্ষ শিল্পীর উদ্ভব হইয়াছিল। 'পরসীলেন' বা চীনামাটির দ্রব্যাদির উপর 'এনামেল'-কৌশল উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানাগুলি ইজুমি, ওয়ারি, মিকাওয়া ও বিজেন৽ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য ল্যাকার, ঝিনুক প্রভৃতি প্রসাধন-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত; তাহাদের দীপ্তি বাটীর অভ্যন্তরভাগ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিত। এমন কি গাড়ী, টুপি এবং ভদ্রলোকদের কোর্ত্তার হাতার উপরও কখন কখন ল্যাকারের কাজ করা থাকিত।

এই সময়ে যে সকল চিত্রকরের অভ্যুদয় হইয়াছিল তন্মধ্যে কুদারা কাওয়ানারি ও কোসেকানাওকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সম্রাট্ কাম্মুর পরবর্ত্তী সম্রাটগণের উৎসাহে বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল—তাঁহারা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নূতন নূতন পথ, পোত ও গাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত হইত এবং জনসমূহের মধ্যে উহা প্রচলিত করিবার চেষ্টাও হইত, কিন্তু তাহারা টাকা ব্যবহারে অনভ্যস্ত থাকায় উৎপন্ন শস্যাদির অংশ কররূপে প্রদান করিত।

কর্ত্তৃপক্ষের দৌর্ব্বল্যে নানা দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছিল। পথিকেরা প্রায়ই দস্যুহস্তে সর্ব্বস্ব হারাইত। ইসে প্রদেশে সুজুকা পাহাড়ে প্রায় ৭০-৮০ জন বিখ্যাত ডাকাত বাস করিত। সমুদ্রেও জলদস্যুর অভাব ছিল না, সেই হেতু দেশে বিদেশে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতে লাগিল। কয়েক জন মাত্র দুঃসাহসিক ব্যবসায়ী কোরিয়া ও চীনে বাণিজ্যযাত্রা করিয়া সেখান হইতে নানাপ্রকার বহুমূল্য পদার্থ লইয়া আসিত ও অমিতব্যয়ী অভিজাতদিগের নিকট বিক্রয় করিত। পশ্চিমে হাকাতা ও রাজধানীর অপেক্ষাকৃত সন্নিকটে নানিওয়া, কান্জাকি, এঙ্চি, কাওয়াকিতা ও ওৎসু এইগুলিই তখনকার দিনে সমৃদ্ধ বন্দর ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম উত্তরোত্তর জনসমূহের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া নিম্ন স্তরের লোকদের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল। তেন্দাই ও সিঙ্গোন্, এই দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইচো ও কুকাই উভয়েই বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি এন্র্যাকুজি নামক বৃহৎ মঠ ও শেষোক্ত ব্যক্তি কোয়াসান্ পাহাড়ের উপরকার সুবিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পুরোহিতেরা শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র নকল, নূতন মন্দির নির্ম্মাণ ও পবিত্র মূর্ত্তি পূজা করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করিত না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহস্র দিবসব্যাপী সংযমের ব্রত গ্রহণ করিত, কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য গুহাবাসী হইত। কোনো ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিত!

অভিজাতগণ, বিশেষতঃ ফুজিওয়ারা বংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ও অর্থ ও ভূসম্পত্তি দানে ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সিরাকাওয়ার বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে জীব-হিংসা হইতে একেবারে বিরত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি ৮৮০০ জাল নষ্ট করিয়াছিলেন, সমস্ত শিকারী বাজপাখী ও অন্যান্য খাঁচায় পোরা পাখী মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট্ তোবা আর এক জন মহাবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ স্তূপ-মন্দির নির্ম্মাণ করান। 'কুয়ো' বা পিতৃলোকের উদ্দেশে আহার্য্য প্রদানের যজ্ঞে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। যে যজ্ঞে যত পুরোহিত নিযুক্ত থাকিত তাহা ততই ফলোৎপাদক বলিয়া বিবেচিত হইত। এক শত পুরোহিতের নিয়োগ কিছুই অসাধারণ কথা ছিল না। সম্রাট্ সিরাকুয় এক সহস্র ও সম্রাট্

মুরাকামির দশ সহস্র পুরোহিত ছিল! পুরোহিতেরা যে কেবল অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দান করিত এমন নয়,পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বেও শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনা করিবার জন্য তাহাদের তলব পড়িত। অভিনন্দন ও আনন্দ-সভাতেও তাহাদের গতিবিধি ছিল। কোনো উচ্চবংশীয় ব্যক্তির বয়স চল্লিশ হইলে চল্লিশটি মন্দিরে পূজা দেওয়া হইত, ষাট বৎসর হইলে ষাটটি মন্দিরে পূজা দেওয়া হইত! স্বকৃত পাপ কার্য্যের পরিণাম হইতে মুক্ত হইবার জন্য, কখনো বা পরিবার-বর্গের মঙ্গলের জন্য লোকে সংসার ত্যাগ করিয়া পৌরোহিত্য গ্রহণ করিত। কয়েক জন সম্রাট্ এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ভূ-কম্প, ধূমকেতুর আবির্ভাব, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এরূপ কোন কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটিলেই পুরোহিতকে প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করা হইত। যুদ্ধে জয়লাভ বা বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে সর্ব্বাগ্রে পুরোহিত-দিগকে তাহাদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইত; পরে ধন্যবাদ দেওয়া হইত সৈন্যগণকে,—তাহারা ত কেবল যুদ্ধ করিয়াছে মাত্র!

ভবিষ্যদ্বচন, কুসংস্কার, সম্মোহন বিদ্যা প্রভৃতির অভাব ছিল না; তদুপরি ছিল স্বপ্ন দর্শন পূর্ব্বক অনুমান করা। অনেক স্ত্রীলোক এই ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। লোকের বিশ্বাস ছিল, অন্যের নিকট হইতে সুস্বপ্ন ক্রয় করিয়া লইলে ক্রয়কারীই স্বপ্নদর্শিত উপকার লাভ করে!

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি। এ যুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতা, ও আত্মীয়দের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজধানীর ধ্বংসের সহিত এগুলি লোপ পাইয়াছিল।

স্ত্রীলোকেরা নিভৃতে বাস করিত। স্ব স্ব পরিবারের বাহিরে নিজদের কণ্ঠ-স্বরও অন্যের কর্ণগোচর হওয়া তাহারা লজ্জার বিষয় মনে করিত! বাহিরে যাইবার সময় তাহারা রুদ্ধদ্বার শকটে আরোহণ করিয়া বা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া যাইত। কোন পুরুষের সহিত কথা কহিতে হইলে উচ্চবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা পরিচারিকাকে দিয়া কথা কওয়াই-তেন। পুরুষটি পরিচিত হইলে পর্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া নিজেরাই কথা কহিতেন। একান্তই পুরুষটির সম্মুখে আসিতে হইলে মুখখানি পাখায় ঢাকিয়া মৃদু স্বরে কথা কহিতেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

৩৩। হেরম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত সচিত্র ভূমিকা সমেত। গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। ডিমাই ৮ পেজী, ছাপা এবং পুস্তকের বহিরাকৃতি মন্দ নয়। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সমেত ৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দণ্ডবিধি পুঁথিখানির অধিকারী হেরম্বরাজমন্ত্রিবংশজ শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র দেব লস্কর মহাশয়। ভূমিকাটি ১৩ খানি চিত্র সম্বলিত তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগে প্রাপ্ত পুঁথিখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে হেরম্ব রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। পাঠক সাধারণের বুঝিবার জন্য এই ঐতিহাসিক অংশটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কাছাড় প্রদেশের নাম, তাম্রধ্বজ রাজার রাজত্বের সময়, কাছাড়ী রাজগণের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কাল, প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষুদ্র ২ বিষয়ে গেইট সাহেব হইতে বিভিন্ন মতের পোষকতায় পদ্মনাথ বাবুর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকার তৃতীয় অংশে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর মহাশয়ের পরিবারের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মূল পুস্তকের সঙ্গে ভূমিকার এই অংশটির কোনও বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হইক মোটের উপর ভূমিকাটি বেশ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

মূল দণ্ডবিধি পুস্তক ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ব্রাহ্মণের প্রতি সামান্য ত্রুটি প্রদর্শনের জন্যও শূদ্রের প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা, অথচ ব্রাহ্মণের একেবারে সাত খুন মাপ! মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নির্ব্বাসনই ব্রাহ্মণের

চরম দণ্ড। ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও বিশেষ বিধি দ্বারা সংরক্ষিত; গোবিন্দচন্দ্রের দণ্ডবিধিতে সংস্থান প্রণালী থাকিলেও (যথা প্রতি প্রকরণের পূর্ব্বে একটি ভূমিকা এবং সংস্কৃতের পার্শেই বঙ্গানুবাদ) সংহিতার দোষগুণ সমস্তই ইহাতে বর্ত্তমান। সংহিতার ন্যায় ইহাতেও সামান্য বিষয় বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং অনাবশ্যক শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে—যেমন গবাদি পশুদ্বারা শস্য নাশ বিষয়, অসাধু দোকানদারের বিষয় ইত্যাদি; এবং বর্ণ সম্পর্কীয় অপরাধ ব্যতীত ও অনেক সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যথা আক্রমণ কারী কুকুরের অপ্রতিষেধ কারী প্রভুর প্রতি।

যদিও এই বিধি সকল প্রায়শঃ প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এই দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের দণ্ডবিধান আলোচনা করিলে তখনকার সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মে। উত্তম পুরুষকে হরণ করিলে প্রাণদণ্ড এবং অধম পুরুষকে হরণ করিলে সহস্র পণ (আধুনিক প্রায় ১৬৲ টাকা) দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান "দূষণীয়" বলিয়া গণ্য হইত। স্বামী স্ত্রীকে, পিতা পুত্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে, প্রভু ভৃত্যকে, শারীরিক দণ্ড বিধান করিতে পারিলেও, শাস্তি গুরুতর হইলে দণ্ডনীয় হইত। পিতামাতার প্রতি পুত্রের, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে দণ্ড হইত। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উপর কোনও শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সমাজে স্ত্রীজাতি বিশেষ অসম্মানের ভাজন ছিল না। প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে ১০০ এক শত সুবর্ণ দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদা সাধু ছিল না। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র মাংস দেখা যায়। অধম ধাতুকে স্বর্ণের ন্যায় আকৃতি করিয়া প্রতারণা করার উল্লেখ দেখা যায়। সমাজে কুসংস্কারও যথেষ্ট ছিল। স্তম্ভন, বশীকরণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস ছিল এবং এই সকলের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের দণ্ডবিধি পুঁথির ভাষা প্রায় আধুনিক বাঙ্গালা ভাষারই মত। ঐতিহাসিক হিসাবে পরিশিষ্টে প্রদত্ত পুঁথিখানির মূল্যও কম নহে। ইহাতে ক পুঁথি হইতে অতিরিক্ত যে সকল অংশ আছে, তাহার ছাপায় একটু বিশেষত্ব থাকিলে পাঠকগণের পক্ষে সুবিধা হইত। দণ্ডের মধ্যে অর্থ দণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাণদণ্ড ছিল, কারাদণ্ডের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩৪। মন বুলবুল—শ্রীযুক্ত সুশীলমালী সরকার প্রণীত। ইহা একখানি গীতিকাব্য। গ্রন্থের উৎসর্গ কবিতাটিতেই লেখিকার মাতৃহৃদয়ের করুণা-উৎস উৎসারিত দেখিতে পাই, এবং বহু কবিতার ভিতর দিয়া ভগবদ্ভক্তির একটি পবিত্র স্বর ধ্বনিত হইতেছে।

কাব্যখানি সমগ্র পাঠ করিলে কবিত্ব অপেক্ষা ইহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য হয় যে, কেমন করিয়া একটি রমণী-হৃদয় সংসারের অসহ্য দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরনিষ্ঠার বলে ক্রমশ প্রশান্তিলাভ করিয়াছে।

গ্রন্থের বহু স্থলেই লেখিকার বিষাদমাখা আত্মকাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে এখন তিনি তাঁহার শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তির আস্বাদ পাইয়াছেন, এবং সদ্গুরুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছেন

"অব্যক্ত অচিন্ত্য, ব্যক্ত আপন আত্মায়,
কোথায় খুজিব বৃথা? রাজিত হিয়ায়;
আবরণ উন্মোচনে জীবাত্মার ক্ষয়,
পরমাত্মা নিত্যানন্দে মোক্ষ লাভ হয়।"

গ্রন্থকর্ত্রীর এই প্রথম রচনা। তাঁহার পরিপক্ক হস্তের সুন্দরতর কবিতা পাঠ করিবার জন্য ঔৎসুক্য রহিল।

শ্রীঘোঃ—

প্রতিভা

২য় বর্ষ | মাঘ ১৩১৯ | ১০ম সংখ্যা

ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি

(১)

জাপানের শিল্প-ঐতিহাসিক ওকাকুরা তাঁহার 'প্রাচ্য-শিল্পের আদর্শ' নামক গ্রন্থের সুরুতেই এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, Asia is one. শিল্প দার্শনিক যদিও কথাটাকে সকল দিক হইতে বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ করিতে চাহেন নাই, তথাপি, শোনামাত্রই প্রত্যেক এসিয়া-বাসীর হৃদয়ে এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইতে থাকে। এসিয়ার সমাজসাহিত্য এবং শিল্পের মধ্যে এমন একটা 'একতা' আছে যে, বর্ত্তমান ইয়োরোপের সঙ্গে উহার নিদান-পার্থক্যটাও দৃষ্টিমাত্রেই উপলব্ধি হইবে। এসিয়ার তিনটি জনপদে প্রকৃত সাহিত্যের বিকাশ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে—ভারতবর্ষ, চীন ও পারস্য। প্রাচীন এসিয়ার ককেশীয় এবং মঙ্গোলীয় সভ্যতা যেন হাতে-হাতে ধরিয়া, পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিতেছিল। উভয় সভ্যতার মধ্যে যে একটা ভাবের আদানপ্রদান ছিল; প্রাচীন পৃথিবীর আব হাওয়ার সঙ্গে উভয়েই যে সমসূত্রে জীবন সাধনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে না। ভারতবর্ষে একান্নবর্ত্তী পরিবার, গোষ্ঠী, গ্রাম-সমাজ এবং এবং সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ কেমন প্রবল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। চীনবাসী মনুষ্য-সমাজেও পরিবারের অখণ্ড-স্বরূপটাই মুখ্যতা লাভ করিয়াছে। পারস্য কিংবা আরবও এই পরিবার-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গতিকে এই তিন দেশের সাহিত্য সভ্যতার মধ্যেই ন্যূনাধিক সবর্ণ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত। চীনে অতি প্রাচীন কাল হইতেই রাজাধীন রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে নির্ব্বাচন-প্রথা এবং প্রতিযোগী সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষার পদ্ধতি প্রবল থাকায়, তাহার সমাজ-মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যায় জাতিভেদ পরিস্ফুট হইতে কিংবা প্রবল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু ভারতীয় আর্য্য-সমূহের পিতৃ-তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রথা বরং আরও অগ্রসর হইয়া পিতৃ-পূজায় পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় জাতিভেদ কিংবা পরিবারের স্বার্থ রক্ষা-কালে, স্ত্রীজাতির মুখে অবগুণ্ঠন দেওয়া হয় নাই সত্য, কিন্তু পায়ে বেড়ী জড়াইয়া তাহাদিগকে প্রকারান্তরে অকর্ম্মণ্য করা হইয়াছে। আরব-পারস্যে এমন কি গ্রীক জাতির মধ্যেও (পরিবার-তন্ত্রকে অটুট রাখিবার জন্যই) স্ত্রীশক্তিকে সঙ্কুচিত করিবার নানা চেষ্টা চলিয়াছিল। মনুষ্যের প্রাচীন সভ্যতা পরিবারকেই সামাজিক 'ব্যক্তি' রূপে স্থির রাখিতে চাহিয়াছিল; তাই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির নিয়ন্ত্রণ-ক্রমেই সাম্য

(১) এই প্রবন্ধ 'বাণী পন্থার' 'সাহিত্য-আত্মার অভিব্যক্তি' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। লেখক—

রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে; ব্যক্তি স্বত্বকেও (individualism) কুত্রাপি প্রকাশ্য আমল দিতে চাহে নাই। এই স্থান হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন পন্থার আরম্ভ। ব্যক্তি-স্বত্ব বা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা নামক কথাগুলি আধুনিক সমাজ-আদর্শের হৃদয়-মন্ত্র। বর্ত্তমানের ইয়োরোপ এই মন্ত্রের পরিপোষণ উদ্দেশ্য করিয়াই সর্ব্বত্র প্রাচীন পরিবার, গোত্র, বা গ্রামসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভগ্ন করিতেছে, জাতিভেদ অপ্রতিষ্ঠ করিতেছে; ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পোষণ করিয়া স্ত্রীজাতির অবগুণ্ঠন কিংবা পায়ের শৃঙ্খলও উড়াইয়া দিতেছে। প্রাচীন এবং আধুনিক সমাজ-আদর্শের মূল মন্ত্র এবং ক্রিয়া-প্রণালীর পার্থক্য হৃদ্বোধ না হইলে, প্রচীন বা আধুনিক সাহিত্য কোনটারই মূল বর্ণটুকু হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

চীনে এই পরিবার-নীতি অবলম্বন করিয়াই বিপুল সাহিত্যের উদ্ভব। পরিবার-নীতি এবং পরিবারের স্থিতি-রক্ষাই চীনের প্রধান 'ধর্ম্ম'। সুতরাং, চীনে ধর্ম্ম এবং সমাজ-নীতি একরূপ অভিন্ন হইয়া, একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্মসাহিত্য পৌরাণিক সাহিত্য বা লোক সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। সর্ব্বত্র পরিবারকেই সমাজের ব্যক্তি বলিয়া আদর্শ রাখার দরুণ, চৈন সাহিত্যে যেমন প্রকৃত ব্যক্তি-চরিত্রও কোন বিশেষ জটিলতা বা প্রগাঢ়তা লাভে অভিব্যক্ত হইতে পারে নাই, তেমন ঐ সাহিত্য এসিয়ার বিপুল নিসর্গ-প্রকৃতির সহানুভবী হইয়া নিসর্গ-সৌন্দর্য্য এবং নিসর্গগত শান্তি সাধনার আদর্শেই সমধিক বিলসিত হইয়াছে; এই ক্ষেত্রে, সংস্কৃত সাহিত্যের সমধর্ম্মা হইয়াছে। অন্যদিকে চীন সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের 'ইতিহাস' কাব্যের বা মহাকাব্যের একটা দৃষ্টান্তও নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ একটা যুগ-যুগান্তরজীবী মহাজাতির সাহিত্য-মধ্যে, ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য সমাজের 'মহাকাব্য' বা মহাপুরুষনিষ্ঠ বিবরণ গাথার একটি দৃষ্টান্তও মিলিতেছে না! কিন্তু নাটকের সংখ্যা অগণ্য! অতিরিক্ত পরিবার-নিষ্ঠতার দরুণেই এই অভাব ঘটিয়া থাকিবে। এদিকে পারস্যেও মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত (তাহাও নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তী *) ভূরি ভূরি; কিন্তু প্রকৃত নাটক একটিও নাই। বুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যযুগে যেমন মহাপুরুষনিষ্ঠা প্রবল থাকিয়া মহাকাব্য-গঠন সম্ভব করিয়াছিল, তেমনি, বুদ্ধ-পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও কিয়ৎকাল, ব্যক্তি-চরিত্রের বিশিষ্টতা এবং সমাজ-চিত্রণের উদ্দেশ্য রাখিয়া কয়েকখানি নাটক রচিত হইতে পারিয়াছিল। উভয়ই নানা দিকে ভারতবর্ষের পরিবার-নিষ্ঠ কিংবা গ্রাম-সমাজনিষ্ঠ ধর্ম্ম-আদর্শের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই ধারণা হইবে। অন্ততঃ ঐ সময়ে ভারতীয় আর্য্য হৃদয়ের সহজ মনুষ্যত্বগতি কোন প্রবল বুদ্ধি অধিকৃত আদর্শের দ্বারা তখনও নির্জ্জিত হয় নাই, বলিয়াই ধারণা হইবে। ভারতের নাটকগুলি চীন-নাটকের সংখ্যার তুলনায় স্বল্প হইলেও, শিল্প-সামর্থ্যের গরিষ্ঠতা এবং প্রগাঢ়-ত্বয় উহারা বিশ্ব-বিশ্রুতি লাভ করিয়াছে। তথাপি, স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কারণে ভারতীয় সমাজেও নাট্য সাহিত্য পরিব্যাপ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি যে, এসিয়ার প্রাচীন সাহিত্য-মধ্যে, ভারতীয় সাহিত্যই মহাকাব্যে, নাটকে এবং খণ্ডকাব্যেও সমধিক সর্ব্বাঙ্গীনতা এবং পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই দেশের প্রাচীন সমাজ-বক্ষে সহজ 'হৃদয়'-আদর্শের, বিশেষতঃ বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাব গতিকেই সাহিত্য বিকাশের এই সর্ব্বতো-ভদ্র ভাব-গতি সম্ভব হইয়াছিল— সংখ্যায় স্বল্প হইলেও সাহিত্যের এই অতুলনীয় মাহাত্ম্য তখনও ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল। প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন সমাজ-গতির সহিত অপরিহার্য্যভাবে সম্বদ্ধ। এসিয়ার সাহিত্য-মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের এই বিশেষত্বটুকু সকল সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষেই বিস্তারিত ভাবে প্রণিধানের যোগ্য। অপিচ, এসিয়ার সমাজ সভ্যতা এবং সাহিত্যের হৃদয়গত এই একত্ব লক্ষ্য করিয়াই বলিতে পারা যায়, 'এসিয়া এক'! 'Asia is one'.

* দশম শতাব্দীর ফেরদৌসীই' পারস্য সাহিত্যের পিতা বলিয়া উল্লিখিত। পারস্যে ইসলাম প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য [illegible] তাহার অবস্থা-গ্রন্থ; উহা বেদের ন্যায় সূক্ত বা গাথার সমষ্টি।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, ভারতীয় সাহিত্যে নাটক স্বল্প হইবার বা উহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা না ঘটিবার কারণ কি? সংস্কৃত সাহিত্যে নবজীবনের ঐ মহানুভবতা দীর্ঘকাল এবং ব্যাপকভাবে স্থির ছিল কি? সংস্কৃত সাহিত্যে স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের প্রশস্ত লক্ষণ-সমূহ ক্রমিক সমুজ্জ্বলতা লাভ করে নাই কেন? সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভাষা ক্রমে 'মৃত' হইয়া গেল কেন? বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রশ্ন চিন্তা করিতে গেলেই আমাদিগকে ভারতীয় সমাজের মূল প্রকৃতি এবং উহার ক্রম-বিকাশের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সমসূত্রে, সমাজগতির সমসূত্রে, ভারতীয় সাহিত্য-গতির অনুসরণ করিলেই এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে। সুতরাং বলিতে হইবে না যে, উহা ভারতীয় সমাজ এবং সাহিত্যের অধোগতির ইতিবৃত্ত। আমরা বর্ত্তমানের হিতকল্পেই ঐ চিন্তায় অবহিত হইব।

সাহিত্য মনুষ্য-মনকে মুক্তি দান করে। অতর্কিত জ্ঞানভাবের মানসরাজ্যে মনুষ্যের হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া, তাহার ইচ্ছাব্যাপারকে অজ্ঞাত ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতে থাকে। এই কারণে আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্যের সভ্যতাগতির অগ্রদূতগণ, অগ্রদ্রষ্টৃগণ সকলেই ন্যূনাধিক কবিত্ব-শক্তি লইয়াই জন্মধারণ পূর্ব্বক, এই সভ্যতাকে চিরকাল অগ্রিমপথে পরিচালিত করিয়া যান। এইরূপে, অজ্ঞাত ক্ষেত্রে সারস্বত পতাকা বহন করিয়া অগ্রবর্ত্তী হওয়ার নামই সাহিত্যে কবিত্ব-শক্তি! বলা বাহুল্য, মনুষ্য এই অজ্ঞাত ভূমির কোন সীমা ঠিকানা আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কদাচিৎ পারিবে না। অন্য দিকে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তি ও নবনব জ্ঞান এবং ভাব কল্পনার সাহায্যেই চিরকাল সাহিত্যকে অগ্রসর করিতে থাকে। নবনব জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্য আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র মনুষ্য সাহিত্যের সাঙ্গোপাঙ্গসহ তথায় অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে। ইহারই নাম সাহিত্য এবং মনুষ্য-মনের পরস্পর সম্বন্ধ—বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ।

সংস্কৃত সাহিত্যে নবজাগ্রত ভারতীয় মনুষ্য-হৃদয়ের নবীন উৎসাহ-প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এই উৎসাহ অভিনব স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠায় প্রবাহিত হইয়া কিছুকাল সংস্কৃত সাহিত্যকে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছিল; কিন্তু, এই অবস্থা দীর্ঘজীবী হইতে কিংবা ভারতের মনুষ্য-আত্মাকে স্থির সংকল্পে প্রসারিত করিতে পারে নাই। উহার উত্তর-ফল সকল দিকে প্রারম্ভের অনুরূপ হয় নাই। ভারতের মনুষ্যমন ও তাহার সাহিত্য বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে অভ্যুদয় সিদ্ধি পূর্ব্বক ভারতের মনুষ্য-সভ্যতাকে নিজের পরমার্থে উপনীত করিতে পারে নাই। কিয়ৎকালের জন্য উল্কাজ্বালা বিস্তারিত করিয়া, নিগহন নির্জ্জীবতার অন্ধকারেই বিলীন হইয়াছে। কেন পারে নাই? আমরা দেখিব, ভারতের বিশেষ আদর্শ-নিষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সমাজ-সভ্যতার প্রবল প্রাদুর্ভাবই উহার প্রধান হেতু! ভারতীয় নবসাহিত্য সভ্যতা বলীয়ান হইয়া তাহার সীমানিবদ্ধ ধর্ম্ম কিংবা সমাজ-আদর্শের গণ্ডীসীমা অতিক্রম করিতে, স্বয়ং প্রসারিত হইতে, কিংবা এই সমস্তকেও প্রসারিত করিতে পারে নাই। তাহার সমাজ ধর্ম্ম সাহিত্য কিংবা ভাষা সমস্তই কালে নিজের চলৎ-শক্তি এবং জীবৎ-শক্তিটাও অপরিহার্য্য ভাবে হারাইয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এই বিচারে অগ্রসর হইতে হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রসঙ্গের বস্তুবিষয়গুলি আমাদিগের স্মরণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রাচীন আর্য্য জাতির ধর্ম্মাধিকৃত সমাজ এবং সমাজাধিকৃত ধর্ম্মের আদর্শ এবং উহাদের গৌণমুখ্য ফলগুলির বিষয়ে দৃষ্টি পরিচালিত করা আবশ্যক। আদিম আর্য্যজাতির ধর্ম্মাধিকৃত সমাজ-আদর্শ গতিকেই, তাহার একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং কুল-গোত্র পদ্ধতি হইতে ক্রমে ভারতবর্ষে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র অনন্ত জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা উপজাত হইয়াছে। সারস্বত চর্চ্চাও কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায়মধ্যে জন্মগতভাবে আবদ্ধ থাকার দরুণ, উহা সমগ্র জাতির মনোজীবন হইতে নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেশের সাধারণ-সমূহ বা কুলগোত্র-সমূহ হইতে বিচিত্রতার খাদ্য লাভ করে নাই।

প্রবল 'ধর্ম্ম' আদর্শের গতিকেই চিরকাল ভিতরে ভিতরে সাহিত্য-আচারের মধ্যেও পৌরাণিকতার ঝোঁকটুকু প্রবল রাখিতে চাহিয়াছে, জন্মগত ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রযোনির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বা পরিবার-আদর্শের বহির্ভূত ভাবে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষণ করিতে চাহে নাই। ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য বা স্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল চাপিয়া রাখিয়াছে, কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি বা ইতিহাস-বুদ্ধিও প্রবল হইতে দেয় নাই। মনুষ্যজীবনকে পৌরাণিক ভাবুকতার আদর্শেই বেশীকম স্থিতিশীল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে; সাধারণ্যের মধ্যে উন্নত বা প্রসারিত সারস্বতশিক্ষা চিরকাল ব্যাহত রাখিয়াছে; 'সাধারণ' নামক কোন কথাকে কোন দিকে বিশেষ আমল দিতে চাহে নাই। ধর্ম্মকেই মনুষ্যজীবনের মুখ্য প্রাপ্তি এবং পরামার্থ ঘোষণা করিয়া, জন্মগত এবং সম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-ব্যবসায়কে, অপিচ এইরূপ ব্যবসায়নিষ্ঠ কর্ম্মশিক্ষাকেই প্রত্যেকের 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া খ্যাপন করিয়াছে; এবং এইরূপ 'স্বধর্ম্মই' প্রত্যেকের অপরিহার্য্য আধ্যাত্মিক পন্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। এই নির্দ্দেশ পদে পদে সাম্প্রদায়িকগণ কর্ত্তৃক অবহেলিত হইলেও উহার সত্যতা বা সারবত্তা কোন কালে প্রকাশ্যভাবে সংশয়ারূঢ় হয় নাই। সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিগত আদর্শের পোষণ করিতে গেলে, তাহার মধ্যে আপাততঃ যে বিরোধ, স্বার্থ-সংঘর্ষ এবং স্বেচ্ছাচারের উদ্ভব হয়, উহাতে স্থিতি-মাত্রই নিত্য নব নব ভাবে চঞ্চল হইতে থাকে, শাসক বা পরিচালকগণের হৃদয় নিত্য নব নব সমস্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন সমাজ এই আন্দোলনটুকু সহ্য করিতে চিরকাল কুণ্ঠিত ছিল। তৎকালে সমাজশাসক, রাষ্ট্রশাসক বা ধর্ম্ম-পরিচালকের বিভিন্ন কর্ত্তব্য এবং স্বরূপটুকু স্বতন্ত্রভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে নাই বলিয়াই এই কুণ্ঠা। মনুষ্য-সভ্যতা ক্রমে বহুতর বিপদ-আপদ এবং কায়ক্লেশের মধ্য দিয়াই বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি এখন একে-অন্যের হৃদয়-রক্তে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা হইতেই লাভবান হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সমক্ষে এইরূপ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা ঘটে নাই। কালে, ভারত-বক্ষে এই জাতিগত স্থিতি আদর্শের অবহেলাগতিকে অপরিহার্য্যভাবে অনন্ত সংকর বর্ণের উৎপত্তি হইলেও, প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমস্তকেই কোন-না-কোন প্রকারে চাতুর্বর্ণ্যের আমলে আনিয়া, নানামতে জোড়াতাড়া দিয়াই 'সনাতন স্থিতির' আদর্শ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সমাজাধিকৃত ধর্ম্মের বিশেষ আদর্শ-গতিকে, স্ত্রীজাতিকে চিরকাল পরিবার গোত্র এবং কুলের স্বার্থেই নিষ্পিষ্ট করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির মধ্যেও কোনরূপ সাধারণ শিক্ষাকে, কিংবা পরিবার-স্বার্থ এবং সেবাধর্ম্মের বহির্ভূত অন্য কোন রূপ শিক্ষাকে কোন কালে প্রকাশ্যতঃ আমল দেওয়া হয় নাই। পরিবারের এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থেই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত করিয়া, বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া, বৈধব্য 'ধর্ম্ম', এমন কি সহমরণ পর্য্যন্ত সমর্থন করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্যকে খাটো করিবার উদ্দেশ্যে, পিতৃধনে এমন কি স্বামীর ধনেও তাহাকে কোনরূপ প্রকৃত স্বামিত্ব দেওয়া হয় নাই। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াও পিতার বা স্বামীর সম্পত্তিতে প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল জীবন-স্বত্বমাত্র দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বা সাধারণ শিক্ষা কোন মতে প্রবল হইলে, কেবল উহার ফলেই যে পরিবার, গোত্র, কুলধর্ম্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা এক কালে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িবে, (নানা-দিকে যথার্থ) এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়াই উহার স্বাতন্ত্র্যকে এমন কি উহার 'মনুষ্যত্ব' দাবীটাকেও নানামতে নিষ্পেষিত করার চেষ্টা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির পক্ষে সতীত্ব এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, তাহার পতিসেবা এবং পরিবার-সেবারূপ ধর্ম্মটুকু যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, স্ত্রীজাতির পক্ষে কোনরূপ ব্যভিচার বা স্বাতন্ত্র্য-কামনার বিরুদ্ধে যাহাতে সমাজমধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা পরিপুষ্ট হইতে পারে, তাহার উদ্দেশ্যেই অসংখ্য আদর্শ-প্রতিমা এবং অনন্ত পুরাণ গাথার সৃষ্টি করিয়াছে।

সুতরাং ভারতীয় সমাজ এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ এক দিকে যেমন এই জাতিভেদ বা সম্প্রদায়িকতা, অন্য দিকে তেমনই স্ত্রীজাতির অধীনতা। উভয়েই জগতের অন্য যাবৎ

জাতি মধ্যে হিন্দুদের বিশেষত্ব। উভয়েই তাহার সনাতন পরিবার এবং গোত্র প্রবার অপরিহার্য্য ফল। এই ফল হইতেই হিন্দু সমাজের অন্য সকল বিশেষত্ব প্রসূত বলিয়া এক বাক্যে নির্দ্দেশ করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম-আদর্শের ফল নহে; উহারা 'ধর্ম্ম' আদর্শের সম্পর্কহীন, বরঞ্চ তদপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ভূত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুর 'ধর্ম্ম-কর্ম্মের'যাবতীয় বিধিনিষেধ বেদ—হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত—তাহার 'পরিবার' তন্ত্র অপেক্ষা অর্ব্বাচীন; বরং উহার প্রভাবেই কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম বলিতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির পরিবারতন্ত্রীয় সমাজ আদর্শ বুঝাইলে ভুল হয় না। সমাজ-বিধিকেই ধর্ম্ম নামের শীল-মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পবিত্রতা এবং অচলতা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রাম-সমাজ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাহারাদার। উহা জন্মমৃত্যু-বিবাহের সম্পর্কিত কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ বিধিনিষেধ অধিকার করিয়াই সকলকে 'মুঠির ভিতরে' রাখিয়াছে। গ্রামবাসী গৃহস্থের পক্ষে অসামাজিক বা 'এক ঘরে' হওয়া ঘটনাটিকে দ্বীপান্তর অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াই এই পাহারা সমাধা করিতেছে; সুতরাং, বলিতে পারা যায়, উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই যেমন পুরুষজাতির, তেমন স্ত্রীজাতির অধীনতা! উভয় দিক হইতেই মনুষ্যজাতি-মধ্যে এই জাতির পার্থক্য! সভ্যতাক্ষেত্রে তাহার সমস্ত দোষগুণ, স্থিতি-রীতি এবং মৃত্যু-জরাব্যাধির নিদান! এই 'পরিবার'স্থান হইতে দৃষ্টি করিলেই ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং ধর্ম্মের সমস্ত বিশেষ তন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিদান-বিষয়ে আলোকপাত হইবে! দুই দিকের কোন একটা ইট খসাইতে গেলেই হিন্দু আদর্শের সমস্ত এমারত ধূলিসাৎ হইতে পারে! আবার যেই পর্য্যন্ত এই দুই প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে সেই পর্য্যন্তই 'হিন্দুত্ব' অবিচল আছে, অন্য কোন দিক হইতে এই প্রাচীনদুর্গের ছিদ্র লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। যুগযুগান্তর ধরিয়া, হিন্দু সমাজ এইরূপে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির অধীনতা সংঘটন করিয়া এই যে ভারতবর্ষের মাটী কামড়াইয়া কোন মতে বাঁচিয়া আছে, জগতের গতিপ্রবাহে 'অচল' এবং 'সনাতন' হওয়াই আদর্শ করিয়াছে; তাহার সমস্ত পাপতাপ অবনতি এবং অধোগতির মূল কারণটুকুও যে এই স্থানেই নিহিত তাহা ধারণা করিতে না পারিলে, এই দেশের মনুষ্য অদৃষ্টের প্রধান তত্ত্বটাই অবজ্ঞাত থাকিবে।

এই স্থান হইতে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিব, সমাজতন্ত্র-বিষয়ে বুদ্ধদেবের স্বাধীনতা এবং নির্ব্বাচন আদর্শের ফলে এই সমাজের সাহিত্য-আত্মায় নব প্রাণের আবেগ ছুটিয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে কিংবা সমগ্র জাতিটাকে সাহিত্য-স্বাধীনতার আদর্শেও পরিব্যাপ্ত ভাবে সচেতন করিতে পারে নাই। ভারতের ক্ষেত্রে সাধারণ, সাধারণ শিক্ষা, সাধারণের স্বার্থ, বা সাধারণ তন্ত্র বলিয়া কথাগুলি কোন কালে প্রচলিত ছিল না। দেশমাতা দেশের স্বার্থ প্রভৃতি কথাও ছিল না—থাকিতেই পারিত না। জন্মগত জাতি,গোত্র,কুল,সম্প্রদায়, গ্রাম-সমাজ এবং উহাদের রক্ষা-উদ্দিষ্ট ক্রিয়া-কর্ম্মই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্ম্ম। স্ত্রী-জাতিকে বাহ্যিক ভাবে ঘোমটা পরিতে হইলেও, পুরুষ মাত্রকেও অধ্যাত্মভাবে পরস্পর-সম্পর্কে ঘোমটাই পরিতে হইয়াছে। স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেয় নাই বলিয়া উপরি উপরি দৃষ্টিতে দেখিলেই চলিবে না; তাহার পুরুষজাতির অন্তরাত্মাও যেমন পরিবারে তেমন গ্রামে এবং গ্রামের বাহিরেও অনন্ত দিক হইতেই সীমাবদ্ধ অশেষ অবগুণ্ঠনেই পরিবৃত; এবং এই সীমা মানিয়া চলাটাই তাহার ধর্ম্ম আদর্শের প্রধান নিষেধ লক্ষণ।

এই বিচারে আর একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারা যায়, তবে উহার ধর্ম্মের বিধিলক্ষণ কি? প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রাচীন কালে ধর্ম্ম-আদর্শের 'দশকর্ম্ম'ই ছিল তাঁহার অপরিহার্য্য বিধি। এখন উহারা নানাদিকে সংক্ষিপ্ত হইয়া কেবল ত্রি-কর্ম্মে (জন্মমৃত্যু ও বিবাহ কালীন ইষ্ট এবং পৈত্র কর্ম্মে) পর্য্যবসিত। সুতরাং দেখা যাইবে, এই জাতির ধর্ম্ম-আদর্শ বিধিবিষয়ে মনুষ্যকে নানা দিকে আপাততঃ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও সমাজের দিক হইতে উহাকে অনন্ত নিগড়-পাশেই আবদ্ধ

রাখিয়াছে; যুগযুগান্ত কাল তাহাই প্রবল রাখিতে চাহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটা পরম রহস্য-তত্ত্বই পরিদৃষ্ট হইবে! ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কারক বা সমাজসংস্কারকগণ চিরকাল বিধিবিষয়েই সংস্কার লক্ষ্য করিয়াছেন। নিষেধের দিকটা আপাতদৃষ্টিতে এত অতর্কিত এবং অরক্ষিত যে, উহার দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাটাও যেন দরকারী মনে করেন নাই। অথচ ঐ দিক হইতেই যুগেযুগে সকল মহাপুরুষের সমস্ত সংস্কারকার্য্য পণ্ড হইয়া গিয়াছে! জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা বা স্ত্রীজাতির অধীনতাকে কেহই দৃষ্টতঃ বিবেচনাযোগ্য সংস্কার কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। উহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াটাই যেন অসম্ভব ছিল! আমরা দেখিব, মনুষ্য-সভ্যতার প্রধান প্রাণ —'উহার প্রধান রক্ষক নিয়ামক এবং পরিচালক—এই' সাধারণ শিক্ষা। প্রাচীন কালে সাধারণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য বিষয়ে মনুষ্যের দৃষ্টি সম্যক্ পরিচালিত হওয়াই যেন অসম্ভব ছিল। অথচ, এই অরক্ষিত দিক হইতেই সনাতন গ্রাম-সমাজ এক অদৃশ্য এবং অভেদ্য পাষাণ-প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াই সকল মহাপুরুষের সমস্ত সংস্কার-চেষ্টাই ন্যূনাধিক পণ্ড করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু সমাজ সকল নূতন বিধিব্যবস্থাকেই সুবিধামতে ব্যাহত করিয়া, অথবা 'রক্ষা' করিয়া, অনন্ত সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে না হয় আর একটা সম্প্রদায়ের সমর্থন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার এখনও চলিতেছে।

এখন দেখিব, ভারতীয় সমাজের এই লক্ষণ এবং উহার বিশেষত্বের বর্ণ-প্রভাব হইতে ভারতীয় সাহিত্য কোন কালেই সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেবের পর হইতে খ্রীষ্টোত্তর দশম শতাব্দী পর্য্যন্তই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য-যুগ। এই সাহিত্যে নাগরিকতার সম্পত্তি। ভারতবর্ষে গ্রামসমাজ হইতে কিরূপে নগর অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই নগর অনেক দিকে কেবল ঘনবিস্তৃত গ্রাম-সমাজ বই নহে। উজ্জয়িনী, কনোজ, কাশ্মীর (কৌশাম্বী?) ও গৌড় ভারতের চারি দিক হইতে এই চারিটা নগরই এই কালের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান ধাত্রী; সুতরাং এই সাহিত্য আধুনিক আদর্শের কোন রূপ জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয় ভাব হইতে পরিপুষ্ট হয় নাই। নৃপ-বিশেষের বা রাজশক্তির অনুগ্রহেই প্রাণ ধারণ করিয়াছে। তৎকালের উচ্চাভিলাষী মনুষ্যগণ বা বাণীপুত্রগণ সকলেই এই জাতীয় কোন-না-কোন নগর-চক্রবর্ত্তীর অনুগ্রহ স্বীকার করিয়াই সরস্বতীর সেবা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা স্বয়ং দেশের প্রচলিত ভাষা বা পালী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা হইতে নানাদিকে পৃথক হইয়া এবং শুচিতা লাভ করিয়া সমস্ত ভারতের পণ্ডিত-ভাষা রূপে পরিণত হইয়া যায়। এই কারণে, কবিগণও সাধারণের মর্ম্ম-সমানুভূতি হইতে জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না বলিয়াই রাজার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালিদাসের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। দাক্ষিণাত্যের ভবভূতিও প্রথমতঃ কনোজরাজ যশোবর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরে কনোজ-বিজয়ী ললিতাদিত্যের আশ্রয়ে কালাতিপাত করেন। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা নানাদিকে কথিত ভাষা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াও সমস্ত ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মস্তিষ্করূপে ভাবতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন নাগরিকতার নামই সভ্যতা বা civilisation. সংস্কৃত ভাষা এইরূপে রাজ-দরবারকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সাহিত্য এবং সভ্যতার মধ্যে একটা একত্ব বিধান পূর্ব্বক সমাজের প্রাকৃত আত্মা হইতে ন্যূনাধিক দূরতা রক্ষা করিয়াই চলিতেছিল; প্রাকৃতকে বা দেশের সাধারণকে চিরকাল অগ্রাহ্য করিতেছিল।

সুতরাং উহা ভারতের উন্নত বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক এবং হৃদয় প্রসূত সাহিত্য! নগরে পরিপুষ্ট বলিয়া উহার মধ্যে নাগরিকতার লক্ষণই সবিশেষ পরিস্ফুট। এই ক্ষেত্রেই বেদ-উপনিষদ বা রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণাদি হইতে বুদ্ধপরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের পার্থক্য! বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের কিংবা ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য সংকেত করিলেও উহা কোথাও স্পষ্ট বাক্যে তাহাকে ঘোষণা করিতে চাহে নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের, বিজাতীয় আক্রমণের, কিংবা বিপরীত আদর্শ-সংঘাতের কোন তরঙ্গও এই সাহিত্যের

মধ্যে আপতিত হইয়া নিজের প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই। দেশের হৃদয় উহা হইতে এক দিকে মাত্র খাদ্য লাভ করিতে পারিত; উহা বিশেষ ভাবে কেবল ভাবগত এবং প্রাকৃত জীবন দূরান্তরিত রস-সাধনার দিক। ভারতীয় জাতি সমস্যা, ধর্ম্মরাষ্ট্র বা সমাজ সমস্যা তাহার সাহিত্য-মর্ম্ম হইতে কোন বিশেষ আঘাত-প্রতিঘাত, সাহায্য কিম্বা অন্তরায় প্রত্যাশা করিতে পারে নাই। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্য যেরূপ দেশের সাধারণ ধর্ম্ম রাষ্ট্র বা সমাজের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বর্দ্ধমান হইয়, জাতীয় হৃদয়ের সমগ্রতার প্রতিনিধিরূপে বিচারিত হইতে পারিতেছে; ইউরোপের সাহিত্য যেইরূপ বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে তাঁহার সভ্যতারও পরিপুষ্টি বিধান করিতেছে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ঘটনার সম্ভব হয় নাই। ইয়োরোপীয় জাতির প্রধান সমস্যা তাহার ধর্ম্ম সমাজ এবং রাষ্ট্র আদর্শের মধ্যে, তাহার প্রাচীনতা এবং আধুনিকতার সামঞ্জস্য-চেষ্টার মধ্যেই নিহিত। প্রাচীনকালের সাহিত্য ঐ পথে কোন বিশেষ প্রেরণা বা আকুলতা লাভ করিতেপারে নাই। সাহিত্যের পক্ষে নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং নিষ্ঠাটুকু পরখ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার পক্ষেই শত শত বৎসরের দরকার হইয়াছে। প্রাকৃত জীবনের, অধিকন্তু সাধারণের হৃদয় হইতে, দূরবর্ত্তী থাকিয়াই রসের'সাধনা' করিতেছিল বলিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যের এই দূরত্ব পরিস্ফুট। অন্যদিকে হয় ত এই দূরত্বের গতিকেই সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণের চলচ্চিত্ততা এবং রুচিগত বিপ্লববিপর্য্যাস হইতে দূর-ক্ষেত্রে স্থিত থাকিয়া, নিজের অসঙ্গ মাহাত্ম্যের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

সাহিত্য-সেবকের পক্ষে সামাজিকগণের সাময়িক দাবি-দাওয়া উতরাইয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, এই কারণে সাহিত্যে চিরকাল দুই রকমের আদর্শ কার্য্য করিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, সাহিত্যে জাতির হৃদয়ের জ্ঞানকর্ম্ম-ভাবের বর্ত্তমান অবস্থা অনুযায়ী ন্যূনাধিক উন্নতিশীল প্রতিকৃতিই ফুটিয়া উঠে। এই অবস্থায়, সমাজ যাহা জানে, যাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম আদর্শের ছন্দঃ-অনুবর্ত্তন করিয়াই আনন্দদান করে, কবিগণ তাহার অবলম্বনেই রস-সিদ্ধিপথে অগ্রসর হন। সকল প্রাচীন সাহিত্যের এই লক্ষণ। দ্বিতীয় স্থলে, সাহিত্য দূর-দর্শন অদৃ-দর্শন অথবা অপ্রাপ্ত আদর্শ-দর্শনের প্রণালী অবলম্বন করিয়াই 'অঘটনঘটনপটু' কল্পনার সাহায্যে মনুষ্যহৃদয়কে অপূর্ব্ব ক্ষেত্রে, অজ্ঞাত কর্ম্ম-ভাবের ভবিষ্যক্ষেত্রে পরিচালিত করিতে চাহে। এই আদর্শ আপাততঃ যশস্কর হয় না; বর্ত্তমানের প্রকোষ্ঠ হইতে যেমন সহানুভূতি বা সাধুবাদ ঘটে না, তেমন উহার ভবিষ্যৎফলও সংশয়াচ্ছন্ন থাকে; সুতরাং এই পথ সাহসিকতা বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে সাহিত্যের ভাব কিংবা বস্তুর ক্ষেত্রে, অপূর্ব্বপথযাত্রীর সংখ্যা চিরকাল বিরল। ঐকান্তিক ব্যক্তি-তন্ত্রতা কিংবা স্বাধীনতার অনুসরণেই এইরূপ দৃষ্টান্তের সম্ভব হইতে পারে। যাহা হউক, সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সমকালীন সমাজ অবস্থার প্রতিবিম্ব,বিশেষতঃ অতীত যুগের স্বপ্নই উহার মধ্যে প্রকটিত। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টোত্তর চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত-সমাজের উপরি-স্তরের প্রতিচ্ছায়া মুদ্রিত হইয়াছে, বিশেষতঃ উহার নাট্যসাহিত্যে। মৃচ্ছকটিকের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নাটক প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা উচিত; সুতরাং তদ্বিষয়ে বেশী বাক্যব্যয় করিব না। মৃচ্ছকটিকে সাধারণ সমাজ-চ্ছবি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় অবস্থার যে একটা আভাষ করে, তাহাও পরম কৌতুহলপ্রদ। উহার মধ্যে ভারতে শক আক্রমণের বিশেষতঃ কণিষ্ক প্রভাবের যেন একটা ইশারা পাইতেছি! (১) ঐরূপ মুদ্রারাক্ষস নাটকে অষ্টম শতাব্দীর রাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্র অবস্থার যেন স্পষ্ট প্রতিভাস আছে! হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতিও এই আদর্শে পরম কুতূহল উদ্দীপনা করিবে। মাল-

১। শকারের (শকরাজার সাহায্যকারী) সাহায্যে পরিপুষ্ট এবং প্রাচীন আর্য্য আদর্শের অবজ্ঞাতা (ব্রাহ্মণ চারুদত্তের বধাজ্ঞাদাতা) 'পালক' রাজাকে হত্যা করিয়া গোয়ালার পুত্রের রাজসিংহাসন লাভের মধ্যে কি কোন পোলিটিকেল উদ্দেশ্য ছিল না। মৃচ্ছকটিকের প্রত্যেক অঙ্কই প্রাচীন ভারতের সমাজ ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্র বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ আছে। লেখক।

বিকা রত্নাবলী কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতির মধ্যে ষষ্ঠ হইতে একাদশ-শতাব্দীর রাজভবনের বিলাস-ছবিটাই অপরূপভাবে মুদ্রিত! এই সাহিত্য-দর্পণে সমকালীয় ভারতসমাজের যেই দিক প্রতিকৃত, তাহার আনন্দের সুখসৌখ্যের এবং বিলাসের যে প্রভাব আভাসিত, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় যেন অতর্কিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে! তৎকালের ভারতবর্ষ কত সহজ সুখবিলাসে দিন কাটাইতেছিল। সুখসম্ভোগের ক্ষমতাও জাতীয় মাহাত্ম্যের প্রধান দিকটাই প্রদর্শন করে। কারণ এই, কর্ম্মী সুখী ভোগী এবং রাগী ব্যক্তিরাই জাতি-দেহের প্রধান শক্তি! পাপী পতিত বা হতভাগ্য ব্যক্তির প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে,তাহার চরিত্রে কোনরূপ 'বীরত্ব' নাই; তাহার যেমন কোনরূপ সম্ভোগের বা গ্রহণের ক্ষমতা নাই, তেমন দানের ক্ষমতাও নাই। সুখ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যই অধিকাংশ লোকের ঘটে না। এই কারণে যেমন ক্ষুদে-পরি-তৃপ্ত ক্ষুদ্রতা, তেমনি বীর্য্যহীন বিরাগ বিতৃষ্ণা, উভয়টাই জাতীয় হতভাগ্য-লক্ষণের প্রমাণ। ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্র বা সমাজ তন্ত্রের নানা সঙ্কীর্ণতাসত্বেও এই-একটি পরম বীরত্বনিষ্ঠ এবং সুখসৌখ্যনিষ্ঠ মহামানব-সঙ্ঘের হৃদয়-তরঙ্গিণীই সংস্কৃত ভাষার উদাত্তছন্দে প্রবাহিত হইতেছে! এই অপরূপ সুখবিলাস এবং রস-লালসার প্রমোদউদ্যান গত হইয়াও ভারতবর্ষের হৃদয় কোন দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল? কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কবিই তাহা বিস্মৃত হন নাই! এবং নানা মতে তাহা শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন! প্রণয়বিলাসের আনন্দ-উদ্যান মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর আবির্ভাব, পুষ্পকাননের সুখবিলাসের মর্ম্মদেশে অকস্মাৎ সিংহ ব্যাঘ্র গজ বানর বৃত্তির আবির্ভাব, এবং প্রচণ্ড হঠকারিতার সহিত সমস্ত সুখ-তন্তু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষগুলাকে সমস্ত স্বপ্ন-সন্দেশ হইতে জাগাইয়া দিয়া অন্তর্ধান, এইরূপ চক্র সংস্কৃত নাটকমাত্রের নিত্য ঘটনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা ভারতীয় নাট্যকারগণের মধ্যে একটা সাধারণ 'নিয়তি-যন্ত্র' বা machinery বলিলে ভুল হয় না। ভারতীয় সাহিত্য-মতির সাধারণ উদ্দেশ্যটুকু বুঝিতে না পারিলে, এই ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নাট্যকারগণের মধ্যে এইরূপ একটা সাধারণ 'যন্ত্র' লক্ষ্য করি নাই; গ্রীক নাটকের 'অদৃষ্ট' অথবা চৈনিক নাটকের 'পরিবার নীতি' কতকটা ইহার নিকটবর্ত্তী! ভারতীয় আর্য্য আদর্শের ভোগিগণ রাগি-গণ প্রতি-মুহূর্ত্তে ত্যাগী হইবার জন্য প্রস্তুত তাহারা 'শিয়রে তুরঙ্গ এবং কটিবন্ধে অসি' লইয়াই পুষ্প শয্যায় আরাম ভোগ করিতেছে! যেই মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যের হাঁকডাক পড়িবে, অথবা যমপুরীর দক্ষিণদ্বার খুলিয়া গিয়া মহাকালের প্রলয়-বিষাণ বাজিতে থাকিবে, তখন ত উহারা এক নিমেষে পুষ্প-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া যাইবে! সমস্ত 'চণ্ড-কৌশিক' নাটক অত্যন্ত এই আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি ভারতের বিশেষতন্ত্রীয় ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের আদর্শ! অনাসক্ত থাকিয়াই সুখী হইবার আদর্শ!

এই কালের রমণীজাতির, মনোরমাজাতির নামগুলিই চিন্তা করুন। জাতীয় রমণীগণের, বিশেষতঃ সাহিত্য-লোকের অধিবাসিনীগণের নামকরণ হইতেই অনেক সময় সমগ্র জাতিটার সভ্যতা পরিমাণ করা যায়। প্রাচীন কাব্য আদর্শের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী অনসূয়া সত্যভামা বা শৈব্যা হইতে, যেমন সাগরিকা মদয়ন্তীকা বাসবদত্তা তরলিকা অবলোকিতা উশীনরী নিপুণিকা কর্পূরমঞ্জরী বসন্তসেনা জয়সেনা জ্যোৎস্নিকা বিচক্ষণা প্রভৃতি সহস্র সহস্র বৎসর দূরবর্ত্তী, তেমন এ কালের বহুপ্রচলিত কামিনী নিতম্বিনী সুহাসিনী সোহাগিনী প্রভৃতি হইতেও কম দূরবর্ত্তী নহেন। এ কালের কামিনীকুমার রমণীরঞ্জন সুন্দরী মোহন কুমুদিনী-কান্ত হইতেও মলয়কেতু কলহংস জীমূতকেতু ভূরিবসু দেবরাত প্রভৃতি কম দূরবর্ত্তী কি? এই সমস্ত গুণবাচক নাম-সংজ্ঞার ভিতর দিয়া অনেক সময় জাতীয় হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দেখিতে পারা যায়।

সেকালের উজ্জয়িনী কৌশাম্বী কাশ্মীর প্রভৃতি নগর হৃদয়মধ্যে উদাত্তমধু অধিকার বিস্তার করে! তবে দেখা যাইবে, এই অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী কিম্বা সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল না। মাহাত্ম্য ন্যূনাধিক কেন্দ্রগত ছিল এবং সর্ব্ব সাধারণের কোন অংশে ব্যাপক ছিল না বলিয়াই

পরকালে স্বল্পপরিমিত বৈদেশিকের আক্রমণ সম্মুখে ভারতবর্ষ নিরাশ্রয় ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল! এই স্থানেই প্রাচীন মনুষ্যজীবন এবং সভ্যতার মহারোগ! যেই অবস্থা হইতে প্রবল কেন্দ্রপ্রতাপান্বিত গ্রীক বা রোমক সভ্যতা বর্ব্বরতম জাতিসমূহের পদাঘাতেই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, রাজকেন্দ্রজীবী ভারতীয় সভ্যতাও সেইরূপ অবস্থা হইতেই রাজন্যজাতির বিনাশ বা অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই অধঃপতিত হইয়াছে; উন্নত স্তরের সমুচ্চ আধ্যাত্মিকতা কিম্বা সভ্য জীবন সত্ত্বেও, অসভ্যগণের সমক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই; লৌকিক তথা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের সুফলটুকুও হারাইয়া বসিয়াছে। মনুষ্য-সমাজের অতীত ইতিহাসকে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের শিক্ষক রূপে গ্রহণ করিয়াই মনুষ্য-সভ্যতা ক্রমবিকাশের উন্নতি-আদর্শে লাভবান হইতেছে।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

শিশুর খাদ্য

নব প্রসূতির দুগ্ধ—সকল প্রসূতিরই যে সমান দুগ্ধ হয় তাহা নহে। আবার সকলেরই যে দুগ্ধ সমান গুণবিশিষ্ট তাহাও বলা যাইতে পারে না। প্রসবের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় প্রসূতির একটু আধটু দুধ, হয় এবং সেই দুধ দ্বারাই তখনকার মত শিশুর কাজ চলিতে পারে। অনেকের আবার ২।৩ দিন না গেলে দুধ দেখা যায় না। প্রসবের পর ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তবে শিশুকে স্তন্য পান করাইবে। প্রথম কয়েক দিনের দুধের কতকটা বিরেচক শক্তি থাকিতে দেখা যায়। ইহা খাইয়া শিশুর বাহ্য হয়, তাহাতে উহার বেশ উপকার হয়। শিশুকে স্তন্য না দিলে স্তনে অধিক দুগ্ধ হইতে পারে না। যদি এমন দেখা যায় ৩।৪ দিনের পরও মাতার স্তনে দুধ দেখা দিল না তাহা হইলে গরুর দুধ খাওয়ানের আবশ্যক হয়। এক ভাগ টাটকা দুধের সহিত তিন ভাগ পরিস্কৃত জল মিশাইয়া তপ্ত করিতে থাকিবে; যেই ফুটিতে আরম্ভ করিবে, অমনি নামাইয়া ফেলিবে। এই দুধ একটু গরম থাকিতে শিশুকে খাওয়াইয়া দিবে। অধিক খাওয়াইবার আবশ্যক নাই। ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এক বা দুই ঝিনুক করিয়া খাওয়াইতে থাকিলেই যথেষ্ট কাজ চলিতে পারিবে।

কেমন করিয়া স্তন্য পান করাইতে হয়—শিশুকে কেমন করিয়া স্তন্য দিতে হয় তাহাও জানার আবশ্যক। প্রসবের পর এক সপ্তাহকাল প্রসূতির পক্ষে ইচ্ছামত উঠিয়া বসিতে নাই। এই সময় তাঁহাকে সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে হয়। এ সময় শিশুকে শয়নাবস্থাতেই স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রসূতিরা এ সকল নিয়ম বড় একটা মানিতে চাহেন না; তাঁহারা প্রসবের পর হইতেই আপনার ইচ্ছা মত উঠিয়া বসেন কিম্বা চলাফেরা করিতে থাকেন। ইহার ফলে বিবিধ "স্ত্রীরোগ" দেখা দেয়। তাঁহাদের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান না। সূতিকাবস্থায় প্রসূতির যে সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, এস্থলে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে গেলে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। এসময় প্রসূতির পক্ষে বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক। এই কারণে প্রসবের পর অন্তত ১ মাসকাল প্রসূতিকে কোনরূপ গৃহের কাজে যোগদান করিতে দিতে নাই। এসময় তিনি একেবারেই কাজের বাহির এইরূপ মনে করিবেন। সূতিকাবস্থায় তাহাকে কিরূপ ভাবে বিশ্রাম করা উচিত নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল।

প্রথম সপ্তাহ—এ সময় খাওয়ার সময় ও মল-মূত্র ত্যাগের সময় মাত্র উপবেশন করিতে পারেন, অন্য সময় শয়ন করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহ—এসময় খাওয়ার ও মল-মূত্র ত্যাগের সময় পুরাপুরি সোজা হইয়া বসিতে পারেন; অন্য সময় শুইয়া থাকিবেন।

তৃতীয় সপ্তাহ—দিনের বেলাটা বসিয়া কাটাইতে পারেন।

চতুর্থ সপ্তাহ—ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে

পারেন। এক মাস পূর্ণ হইয়া গেলে তবে ঘরের বাহির হইতে পারেন। অবশ্য এসময়ের মধ্যে তাঁহার শরীর যদি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হয় তাহা হইলে আরও কিছু দিন বিশ্রাম করা আবশ্যক।

শিশুকে স্তন্য দান— প্রসবের পর কিছু দিন ধরিয়া শিশুকে শয়নাবস্থাতেই স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক। শয়নাবস্থায় কি করিয়া স্তন্য পান করাইতে হয় তাহা জানিয়া রাখিতে হয়। মনে কর বাম স্তন খাওয়াইবে। শিশুকে বাম বাহুর উপর শোয়াইয়া বাম হস্ত দ্বারা তাহার মাথাটি ও দেহটা ধারণ করিবে, আর দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির সাহায্যে স্তনের উপর চাপ প্রয়োগ করিবে। এমন না করিলে স্তনটি শিশুর নাসিকার উপর পড়িয়া তাহার নিঃশ্বাস অবরোধ করিবার উপক্রম করিতে পারে। দক্ষিণ স্তন খাওয়াইবার সময় ইহার বিপরীত করিবে, অর্থাৎ শিশুকে দক্ষিণ বাহুর উপর শোয়াইয়া বাম হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলের সাহায্যে শিশুর নাকের নিকট হইতে স্তনটি দূরে রাখিবে। এখন কথা এই যে, এক এক বারে শিশুকে কতক্ষণ স্তন্য দেওয়া যাইতে পারে? আমাদের মনে হয় এক এক বারে ১০।১৫ মিনিট কালের বেশী স্তন্য দিতে নাই। অনেক সময় আবার এমন ঘটিতে দেখা যায় শিশু স্তন মুখে দিয়া রাখে কিন্তু দুধ টানে না। এরূপ সন্দেহ হইলে স্তন্য দিবার পূর্ব্বে ও পরে শিশুকে ওজন করিবে তাহা হইলেই সে দুধ টানিতেছে কি না বুঝা যাইবে। প্রায় সকল শিশুই অতি সহজে বিনা চেষ্টায় স্তন ধরিতে শিখে; কতকগুলি শিশুর বেলায় কিছু বেগ পাইতে হয়। ইহারা সহজে স্তন ধরিতে চাহে না; ইহাদিগকে স্তন মুখে দেওয়া অভ্যাস করাইতে হয়। স্তনের বোঁটাতে একটু মধু লাগাইয়া দিলে, শিশু অতি সহজেই স্তন টানিতে শিখে। এক একটি প্রসূতির স্তনের বোঁটা এত ছোট যে, শিশু ঠিক বাগাইয়া ধরিতে পারে না, এরূপ স্থলে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে বোঁটাটি টানিয়া বড় করিয়া তবে শিশুর মুখে দিবে। স্তন্য দেওয়ার পর শিশুকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে আপনার কাছে রাখিবে, তাহার পর উহাকে নিজের খাটে শোয়াইয়া দিবে। স্তন্যদান ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে প্রসূতির স্তনের বোঁটাটি বেশ করিয়া ধুইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। স্তন্য দানের পর বোঁটাটি না ধুইয়া ফেলিলে, স্তনটির প্রদাহ হওয়া খুবই সম্ভব। শিশুকে এক এক বারে একটির অধিক স্তন দিতে নাই। মনে কর প্রথমে দক্ষিণ স্তনটি দেওয় হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণটি না দিয়া বাম স্তনটি দিবে, এইরূপে পালাক্রমে দিতে থাকিবে।

২৪ ঘণ্টায় কত বার স্তন্য দেওয়া উচিত—

প্রসবের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিন হইতে শিশুকে নিয়মিত ভাবে স্তন্য দান করার আবশ্যক। স্তন্য দিবার সময় হইলে যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু নিদ্রিত আছে, তাহা হইলে অতি ধীরে ধীরে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তবে স্তন্য দিতে হয় ঘুমের অবস্থায় কদাচ স্তন্য পান করাইতে নাই। কয়েক দি চেষ্টা করিলেই শিশুর এমন অভ্যাসটি হইয়া দাঁড়ায় যে, ঠিব খাবার সময়টি হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; অন্য সময় নিদ্রা মগ্ন থাকে। এ অভ্যাসটি যে সকল শিশুর হয়, তাহাদে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও সুস্থ থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখে বিষয় এই যে, আমাদের জননীগণ শিশুদের এই অভ্যাস জন্মাইয়া দিবার জন্য তেমন চেষ্টা করেন না। এবিষয়ে ইহাদের বিশেষ শৈথিল্য থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের কেমন অভ্যাস শিশু কাঁদিলেই অমনি উহার মুখের মধে স্তন্য গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করেন ইহা যে কত অন্যায় কাজ তাহা আর কি বলিব। ইহাতে শিশুর পরিপাক শক্তিটির বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। ক সুস্থ হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে এইরূপ অনিয়মিত ভাবে যখন তখন স্তন্য দেওয়ার ক্ষীণ ও রুগ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। শিশু যে কেবলই ক্ষুধার জন্য কাঁদে অন্য কোন কারণে কাঁদিতে পারে না ইহা যেন কেহ মনে না করেন। অনেক সময় সে বিনা কারণেই কাঁদিয়া থাকে। সেস্থলে কোলে করিয়া একটু আদর করিলেই চুপ করিয়া থাকে। আবার এমন যদি বুঝা যায় যে, কোনরূপ যন্ত্রণায় অসুবিধার জন্য ক্রন্দন

করিতেছে, তাহা হইলে যন্ত্রণা বা অসুবিধার যেটি কারণ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যাঁহাদের সন্তান পালন বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে তাহারা শিশুর ক্রন্দন শুনিলেই, সে কেন কাঁদিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। তৃতীয় দিবস হইতে শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দিতে হয়। আর রাত্রিকালে দুই বার দিতে হয়। দিনের বেলায় ৫টা ৭টা, ৯টা, ১১টা, ৩টা, ৫টা ও ৭টা, রাত্রে ১০টা ও ১৷৷০টা তাহার পর ২ ঘণ্টা অন্তর না দিয়া আড়াই ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়। এরূপ না করিলে আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক খাওয়ান হয়। তাহার ফলে শিশুর "দুধতোলা" রোগ দেখা দেয়। প্রসবের পর প্রসূতির স্তনে প্রথম ৭।৮ মাস প্রতি মাসেই দুধের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। পূর্ব্বের হিসাবে শিশুকে স্তন্য দিতে থাকিলে উহার যে অধিক ভোজন হইল তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দেড় মাস বয়স হইলে শিশুকে নিম্নের হিসাবে স্তন্য দিতে থাকিবে—৭টা, ৯৷৷০টা, ১২টা, ২৷৷০টা, ৫টা, ৭৷৷০টা, ১০টা, ১টা ও ৫টা অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় সর্ব্বশুদ্ধ ৯ বার স্তন্য দিবে। অধিকাংশ শিশুই ১০টার সময় যে নিদ্রা যায় ভোর ৪টা কি ৫টা না বাজিলে আর বড় একটা উঠে না, এ অভ্যাস মন্দ নহে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এবস্থায় ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্তন্য দিতে নাই। তবে যদি এমন বুঝা যায় যে, ইহাতে শিশুর দেহের তেমন বৃদ্ধি হইতেছে না, তবেই রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া এক বার স্তন্য পান করাইবার আবশ্যক, নতুবা নহে। যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু দিন দিন বেশ বাড়িতেছে, আর রাত্রি ১০ টার পর যে নিদ্রা যায় ভোর না হইলে আর উঠে না, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টায় ৯ বার স্তন্য না দিয়া ৮ বার দিলেই যথেষ্ট কাজ চলিতে পারে—যথা ৫টা, ৭৷০টা, ১০টা, ১২৷৷০টা, ৩টা, ৫৷৷০টা, ৮টা, ১০৷৷০টা। তিন মাস বয়স হইলে সাধারণতঃ শিশুকে ৮ বার স্তন্য দেওয়া আবশ্যক হয় বটে কিন্তু অনেক শিশু আবার ৭ বার খাইয়াই বেশ তৃপ্ত থাকে। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকলের বেলায় ঠিক একরূপ নিয়ম খাটে না। আবার সকল প্রসূতির দুধ যে সমান বলকারক ও পরিপোষক এবং সকল প্রসূতির দুধের পরিমাণ যে সমান এমনও নহে। ২৪ ঘণ্টায় ৭বার স্তন্য দিতে হইলে নিম্নের হিসাবে দিতে হয়, ৫টা, ৭৷৷০টা, ১০৷৷০টা, ১টা, বৈকালে ৪টা, ৬৷০টা, ও ১০টা। শিশুর বয়স যখন ছয় মাস হয় তখন দিনে রাত্রে ছয় বারের বেশী খাওয়াইবার আবশ্যক নাই—যথা ৭টা, ১০টা, ১ট, ৪টা, ৭টা, ১০টা। এদেশে ছয় মাস না হইলে শিশুকে বড় একটা বাড়ীর বাহির করা হয় না। শিশুর পক্ষে মুক্ত বায়ু কম আবশ্যকীয় নহে। সকালে বিকালে কিছুক্ষণের জন্য উহাকে ঘরের বাহির করা একান্ত আবশ্যক; এরূপ স্থলে, সকালে বিকালের খাওয়ার সময়টা একটু আধটু নড়া চড়া হইলে কোন ক্ষতি নাই।

বোতলে করিয়া দুধ খাওয়ান—শিশুকে দুধ খাওয়াইবার জন্য বাজারে একরকম বোতল কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরেজীতে ফিডিং বটল কহে। স্থল বিশেষে শিশুকে ইহাতে করিয়া দুধ খাওয়ান হইয়া থাকে। মনে রাখা আবশ্যক শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য তাহার মাতৃস্তন্য। বিশেষ কোন বিঘ্ন না থাকিলে সকল মাতারই আপনার শিশুকে স্তন্য দান করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এমন যদি ঘটিতে দেখা যায় যে, মাতার স্তনে যে পরিমাণ দুগ্ধ হইতেছে তাহাতে শিশুর পেট ভরিতেছে না, কিম্বা তাঁহার দুধ ভাল নহে, খাইয়া শিশুর উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে, কিম্বা তাঁহার স্তনে ফোড়া কি প্রদাহ হইয়াছে, অথবা তাঁহার এমন কোন রোগ আছে যাহাতে শিশুকে স্তন্য দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে মাতার পক্ষে স্তন্য দান করাইবার চেষ্টা না করাই উচিত। এমন ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে যে, যক্ষ্মা রোগগ্রস্তার দুগ্ধ পান করিয়া সুস্থ শিশুকে উক্ত রোগগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বিনা কারণে যে মাতা শিশুকে স্তন্য দান হইতে বিরত হন আমাদের মতে তিনি মাতৃ নাম ধারণের উপযুক্তই নহেন। দুঃখের বিষয় ইংরাজ মহিলাদিগের দেখাদেখি আমাদের সমাজে অনেকেই শিশুকে গোড়া হইতেই বোতলে করিয়া দুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস করাইয়া থাকেন। ইহা অতিশয় অন্যায় বলিতে হইবে। সে যাহাই হউক এখন কোন

কোন অবস্থায় শিশুকে বোতলে করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইতে পারা যায় তাহারই আলোচনা করা যাউক। যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু রীতিমত মাতার স্তন্য খাইতেছে অথচ তাহাকে আশানুরূপ বাড়িতে দেখা যাইতেছে না, তাহা হইলে মাতার স্তন হইতে একটুখানি দুগ্ধ লইয়া ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার আবশ্যক। ডাক্তার বলিয়া দিবেন সন্তানের পরিপোষণোপযোগী পদার্থ উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ আছে কি না। যে সকল ছেলের স্তন্য খাইয়া পেট ভরে না তাহারা প্রায়ই খিট্‌খিটে ও বদমেজাজী হয়, এবং সর্ব্বদাই কাঁদিতে থাকে। শিশু-চরিত্রে যাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাহারা এ ক্রন্দনের প্রকৃত অর্থ কি তাহা শুনিবা মাত্রই বুঝিতে পারেন।

—স্তন্যদায়িনী ধাত্রী—অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন মাতৃ-স্তন্য পানে শিশুর যেস্থলে পেট ভরে না কিম্বা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ শিশুর নিজের মাতা যেখানে স্তন্য দিতে একেবারেই অসমর্থ সেরূপ ক্ষেত্রে আর কাহারও স্তন্য দিলে কি কোন ক্ষতির সম্ভব? ইহার উত্তরে আমরা এই কথা বলি মাতা যেখানে স্তন্য দানে অসমর্থা সেখানে এক জন স্তন্য-দায়িনী ধাত্রী নিযুক্ত করিতে পারিলে সব চেয়ে ভাল হয়। কিন্তু ধাত্রীটিকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। ডাক্তার দ্বারা উহাকে এবং উহার ক্রোড়স্থ শিশুকে পরীক্ষা করা উচিত। ডাক্তারের অভিমত হইলে তবেই তাহাকে নিযুক্ত করিবে। শিশুর যে বয়স ধাত্রীর শিশুটিরও সেই বয়স হইলে ভাল হয়। ধাত্রীর ছেলে-টিরও বেশ আদর যত্ন করা উচিত। আপনার সন্তানটিকে অনাহারী ও অসুখী থাকিতে দেখিলে কোন মাতার চিত্ত স্থির থাকিতে পারে? এ অবস্থায় তাহার স্তনে যে দুগ্ধ হয় তাহাতে দোষ বর্ত্তায় এবং সেই দুধ খাইয়া শিশুর অনিষ্ট হওয়া একেবারেই অসম্ভব নহে। ধাত্রীটির বয়ক্রম যেন একুশের নিম্নে ও পঁয়ত্রিশের উর্দ্ধে না হয়। ইহার মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহার স্বাস্থ্যের যাহাতে কোনরূপ হানি না হয় সেদিকেও সমান দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এক কথায় গর্ভধারিণী জননী শিশুকে স্তন্য দিতে হইলে যে সকল নিয়মাদি পালন করিতেন এবং যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন, ধাত্রীরও ঠিক সেই সকল নিয়ম পালন এবং ঠিক সেই ভাবে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। দুশ্চরিত্রা, বদমেজাজী, উদ্ধতস্বভাবা স্ত্রীলোককে কখনও ধাত্রী নিয়োগ করিতে নাই। ধাত্রী নিয়োগ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসকগণও কম সাবধান ছিলেন না। চরক নিম্ন-বর্ণিত গুণবিশিষ্ট স্ত্রীলোককে ধাত্রী নিযুক্ত করিতে বলেন—"সমানজাতীয়া যুবতী, অনুন্নত, রোগরহিতা, সর্ব্বসম্পূর্ণাঙ্গী, (হীনাঙ্গী নহে), অব্যসনা (কামক্রোধাদি দোষরহিতা) অবিকট রূপা, অজুগুপ্সিতা (অনিন্দিতা), স্বদেশজা, অক্ষুদ্র-স্বভাবা, অক্ষুদ্রকর্ম্মকারিণী, সৎকুল জাতা, বৎসলা, অরোগ-জীবদ্‌বৎসা (যাদের সন্তান অরোগ ও জীবিত আছে), দোগ্ধ্রী (যাহার দুগ্ধ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়) অপ্রমদা, অশয়ানা (অকালে শয়নশীলা নহে), অনুচ্চারশয়ানা (অপরিমিত স্থানে শয়নশীলা নহে) ভদ্রোপচরিতা, শুচি, অশুচিদ্বেষিণী, স্তন্য ও স্তনসম্পৎসম্পন্না"। এইরূপ এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিবে।

গরুর দুধ—শিশু যেখানে মাতার স্তন্য পায় না সেরূপ স্থলে সাধারণতঃ গরুর দুধ খাওয়াইয়াই উহাকে মানুষ করিতে হয়। কেহ কেহ গাধার দুধ খাওয়াইয়া থাকেন, কেহ বা গরুর দুধ না দিয়া ছাগলের দুধ খাওয়াইয়া থাকেন। এক একটি শিশু গরুর দুধ সহ্য করিতে পারে না অথচ ছাগলের দুধ বেশ সহ্য করিতে পারে। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত যে খুব বেশী তাহা নহে। দুগ্ধের মধ্যে যে সকল পরিপোষক পদার্থ আছে, মোটামুটি বলিতে গেলে তাহারা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত—১ম, প্রোটিড্; দুধে ইহা আবার ২ প্রকার আছে—(অ) কেসিন্ বা দুগ্ধ সার (আ) দুগ্ধ-এল্‌বুমেন। ২য়, ঘৃত। ৩য়, দুগ্ধ শর্করা বা মিল্ক সুগার। নিম্নের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মাতৃস্তন্যে, গো-দুগ্ধে গাধার দুধে, ও ছাগ-দুগ্ধে কোন উপাদান কি পরিমাণ আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

		মাতৃ-দুগ্ধ	গোদুগ্ধ	গর্দ্দভ-দুগ্ধ	ছাগ-দুগ্ধ
প্রোটিড্	(অ) কেসিন্	১/২	১১/৪	১	৩
	(আ) দুগ্ধ-এল-বুমেন্	১১/২	৪/৫	৪/৫	১/৮
	ঘৃত	৩১/২	৩১/২	১	৪১/২
	দুগ্ধ-শর্করা	৭	৪	৫১/২	৪

উক্ত তালিকায় এই দেখা যাইতেছে যে, মাতৃদুগ্ধে ও গো-দুগ্ধে ঘৃতের পরিমাণ ঠিক সমান বটে, কিন্তু গো-দুগ্ধে শর্করার পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা ঢের কম; সুতরাং গো-দুগ্ধকে শিশুর উপযোগী করিতে হইলে উহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আর একটি কথা এই যে, মাতৃ-দুগ্ধে যে কেসিন্ আছে, তাহা যত সহজে জীর্ণ হয়, গো-দুগ্ধের কেসিন তাহা হয় না; এই কারণে এক একটি শিশু কোন মতেই গরুর দুধ সহ্য করিতে পারে না।

শিশুর জন্য দুগ্ধ—শিশুর জন্য দুগ্ধ খুব টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। যে গরুটির দুধ খাওয়াইবে সেটি যেন বেশ নীরোগ ও সুস্থ হয়; তাহার থাকিবার স্থানটি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, তাহাকে যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উত্তম খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়, এবং প্রতিদিন একবার করিয়া মাঠ হইতে চরাইয়া আনা হয়। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দোহন করিবে তাহার হাতে যেন কোনরূপ ময়লা না থাকিতে পায়। দোহন পাত্রটি যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় এমন ঘটিতে দেখা যায় যে, শিশু হয় ত কোন একটি বিশেষ গাভীর দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু ৩।৪ গাভীর দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দিলে অবাধে সহ্য করিতে পারে। এই কারণে শিশুকে একটি গরুর দুধ না দিয়া ৩।৪টি গরুর দুধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান ভাল। এখন কথা এই যে, শিশুর জন্য ২৪ ঘণ্টার উপযোগী দুধ এক বারেই প্রস্তুত করিয়া রাখা ভাল না। যখন যখন আবশ্যক হইবে তখন তখন প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল। আমাদের দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ; এখানে সকালের দুধ বিকাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে না, প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। এদেশে অন্ততঃ ২ বার দুধ প্রস্তুত করা আবশ্যক। সকালে যে দুধ তৈয়ার করা হয়, বেলা ১ টা পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা কাজ চলিবার সম্ভব। আর ইহার পর যে দুধ তৈয়ার হয়, তাহা রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। গরুর দুধকে শিশুর উপযোগী করিতে হইলে তাহাতে জল, দুগ্ধ-শর্করা ও মাখন বা ক্রীম মিশ্রিত করিতে হয়; কি কি পরিমাণে মিশ্রিত করিতে হয় তাহা পরে কথিত হইবে। দুগ্ধের সহিত ঐ সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে থাকিবে; যেই ফুটিতে আরম্ভ করিবে অমনি নামাইয়া ফেলিবে। দুধ প্রস্তুত হইলে তাহা যেখানে সেখানে রাখিতে নাই। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সেই ঘরে ঠাণ্ডা যায়গায় ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়, যেন উহাতে মাছি না বসিতে পায়। উহা হইতে আবশ্যক মত ঢালিয়া লইয়া তপ্ত করিয়া 'ফিডিং বোতলে' পূরিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন, সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে আবার দুধ রাখার আবশ্যক কি। আবশ্যক খুবই আছে, দুধে যেমন খারাপ গন্ধ টানিয়া লয়, এমন আর কিছুতেই নহে। যে ঘরে নর্দ্দামা, পায়খানা প্রভৃতির গন্ধ প্রবেশ করে, সেখানে দুগ্ধ রাখিলে ঐ সব গন্ধ দুধের মধ্যে গিয়া দুধকে দূষিত করিয়া তুলে, এবং সেই দূষিত দুধ খাইতে দিলে শিশুর নানাপ্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। শিশুকে ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াইতে নাই, উহা যেন একটু গরম হয়। এখানে এই কথা উঠিতে পারে যে, যে দুধ একবার ফুটান হইয়াছে, তাহা বার বার ফুটাইতে থাকিলে তাহা

পান করিয়া শিশুর অনিষ্ট হওয়া সম্ভব নয় কি? অবশ্যই সম্ভব। বার বার ফুটাইলে দুগ্ধ খুবই গুরুপাক হয়, শিশুর পক্ষে সেরূপ দুধ জীর্ণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু না ফুটাইয়াও যে দুধ গরম না করা যায় এমন নহে। দুগ্ধপূর্ণ বোতলটি যদি কিছুক্ষণের জন্য গরম জলে বসান যায়, তাহা হইলে বোতলস্থিত দুগ্ধ গরম হয়, অথচ তাহার গুণের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। শিশুর দুধ ঐ উপায়েই গরম করিতে হয়। এক বারের অধিক ফুটাইতে নাই। দুধ খাওয়ান শেষ হইলে ফিডিং বোতলটি ঠাণ্ডা জলে কয়েকবার বেশ ধৌত করা উচিত। তাহার পর গরম জল ও বুরুষ দ্বারা বোতলের ভিতরটি বেশ করিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বশেষে পুনরায় ২।১ বার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া বোতলের মুখটা নীচু করিয়া রাখিয়া দিবে।

দুধ কেন ফুটাইতে হয়—দুধের মধ্যে অনেক সময় বিবিধ রোগ-বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে। ফুটাইয়া লইলে ঐ সকল রোগ-বীজ বিনষ্ট হয়, সুতরাং সেই দুধ খাইয়া রোগ হওয়ার কোন ভয় থাকে না। তাই বলিয়া খুব বেশী ক্ষণ ধরিয়া ফুটাইতে নাই, তাহাতে দুধ অতিশয় গুরুপাক হইয়া পড়ে। ২।৩ মিনিট ফুটাইলেই যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

স্তনদুগ্ধবঞ্চিত শিশুকে মানুষ করা—রোগের জন্যই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক, মাতা যেখানে শিশুকে স্তন্য দিতে অসমর্থ এবং যেখানে স্তন্যদায়িনী ধাত্রী নিয়োগেরও কোন সুবিধা নাই, সেরূপ স্থলে গরুর দুধ ভিন্ন শিশুকে মানুষ করার অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। শিশুর পক্ষে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য স্বাভাবিক নয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে যতদিন তাহার দাঁত না উঠে, তত দিন একমাত্র দুগ্ধের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। গরুর দুধে হিসাব মত জল, দুগ্ধ-শর্করা, ক্রীম বা মাখন মিশাইলে উহা অনেকটা স্তন্য দুধেরই অনুযায়ী হয়। কিন্তু এই দুধ ২৪ ঘণ্টায় শিশুকে কত বার এবং কি পরিমাণ খাওয়ান উচিত, তাহাই ভাবিবার বিষয়। ইহা স্থির করিতে হইলে, শিশু এক এক বারে মাতার স্তন হইতে কতখানি করিয়া দুধ টানিয়া লয় তাহা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্যারি নগরে এক বার পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় স্থির হয় যে, একটি ৩ মাসের সুস্থ শিশু তাহার মাতার স্তন হইতে ফি বারে অন্ততঃ পাঁচ ছটাক দুধ টানিয়া লয়। তাহাকে যদি ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ পাঁচ বার স্তন্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে, দিন রাতে সে সর্ব্বশুদ্ধ অন্ততঃ পাঁচ পোয়া কি দেড় সের দুধ খাইয়া থাকে। শিশুকে গরুর দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করিতে হইলে, নিম্নের তালিকার মতে চলিলে সব দিকেই সুবিধা হওয়ার সম্ভব।

জন্ম হইতে দশ মাস পর্য্যন্ত।

বয়স	২৪ ঘণ্টায় কত বার খাওয়ান আবশ্যক	প্রত্যেক বারে যতটা পরিমাণ দিবে	২৪ ঘণ্টায় সর্ব্বশুদ্ধ যতটা পরিমাণ দিবে	গরুর দুধ	পরিস্রুত জল	দুগ্ধ-শর্করা	মাখন বা ক্রীম্‌-ইহাতে শতকরা ৪৮ ভাগ ঘৃত আছে
		আউন্স	আউন্স	আউন্স	আউন্স	টিস্পুন	টিস্পুন
৩ দিন	১০	½—⅔	৫—৭	১⅝—১⅞	৩⅜—৫⅛	১	১—২
১ সপ্তাহ	১০	১	১০	৩	৭	২	২½
২ ,,	১০	১½	১৫	৬	৯	৩	৩
৪ ,,	১০	২½	২৫	১০	১৫	৬	৬
৬ ,,	৯	৩	২৭	১১	১৬	৭	৭
৮ ,,	৯	৩½	৩১½	১৩½	১৮	৮	৮
১০ সপ্তাহ	৮	৪	৩২	১৫	১৭	৮	৮
৩ মাস	৮	৪½	৩৬	১৮	১৮	৯	৮
৪ মাস	৭	৫¼	৩৭	২০	১৭	৯	৯
৫ মাস	৭	৬	৪২	২৫	১৭	৯	৯
৬ ,,	৬	৭	৪২	৩২	১০	৮	৬
৭ ,,	৬	৭½	৪৫	৩৭	৫	৭	৩
৮ ,,	৬	৮	৪৮	৪৩	৫	৮	৩
৯ ,,	৬	৮	৪৮	৪৩	৫	৮	৩
১০ ,,	৬ অথবা ৫	৮	৪৮ বা ৪০	৪৪ বা ৩৬	৪	৮	৩

১ আউন্স = অর্দ্ধ ছটাক; এক টিস্পুন = ৬০ হইতে ৯০ ফোটা।

উপরের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, গরুর দুধকে মাতৃ-দুগ্ধের তুল্য গুণশালী করিতে হইলে উহার সহিত জল দুগ্ধ-শর্করা ও মাখন বা ক্রীম মিশ্রিত করা আবশ্যক।

বয়স হিসাবে দুগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। সেই সঙ্গে জল, দুগ্ধ-শর্করা মাখন বা ক্রীমের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচি।

প্রবাসে

হে স্বামী তব লিপি বিনেও
দিন ত কাটে মোর,
শরৎ কালের শুভ্র আলোয়
ঘনায় না ত ঘোর,
আকাশের এই আলোর পাতে
আঁক পড়ে না কালীর তাতে ;
রবি-করের অঞ্জনেতে
পরাণ আজো ভোর।

তোমারি এই বিশ্ব-ঘরে
লোকের আনাগোনা,
হাজার কাজের হাট বসেছে
বিকায় রূপা-সোনা,
লক্ষ বেচা-কেনায় মিছে
চিত্ত আমার চঞ্চলিছে,
কতই টানে নিত্য টানে
যায় নাকো তায় গোণা।

তোমা বিনেও পুলকে মোর
কাটছে সারা বেলা ;
চিত্ত-গগন জুড়ে আজ যে
রৌপ্য মেঘের খেলা ;
শ্যামল ঘাসের যে মখমলে
শিউলি ফুলের চুম্‌কি জ্বলে
সেই শোভন শয়ন সে যে
পরাণে মোর মেলা।

ভালো লাগে এ বাতাস আর
এই আকাশের আলো,
নদীর বেলায় চামর দোলে
লাগে তা মোর ভালো ;
নিমের শাখে কপোত দু'টি
পরাণ আমার লইছে লুটি,
তাদের প্রেম-লীলায় আমার
এ চিত্ত ঘনালো।

সতীর বড়াই করি নাকো
নাইকো সতীর মান,
শতেক টানে ফির্‌ছি, নাইকো
তোমার দিকে টান ;
তোমার ঘরের আলো-ছায়া
হিয়ায় আমার ঘনায় মায়া,
তোমার আপন জনার প্রাণে
বহায় পুলক বান।

জগৎ-ফুটা বর্ণ-রাগে
রঙের জোয়ার খেলে,
সেই খানেতে হৃদয় আমার
দিইছি ওগো মেলে ;
সেই গোপন জ্যোতির মাঝে
তোমার চির আসন রাজে
ছড়িয়ে-পড়া মন আমার তা'
ছেড়েছে অবহেলে।

আজ তোমারি আলো-ছায়ায়
তোমায় আছে ঘিরে,—
কোথায় রবি, ইন্দ্রধনু
শুধু চূর্ণ নীরে ?
তবুও জানি গভীর প্রেমে
লিপি তোমার আস্‌বে নেমে
করুণ কাঁদন ফুট্‌বে সারা
বক্ষ আমার চিরে !

সে দিন আঁধার পর্দাখানি
নাম্‌বে ধরণীতে,
হাজার-ফাটা হিয়ায় টেনে
উঠবো তরণীতে !
আকাশ-বায়ের তরঙ্গিমা
ফুটাক্‌ না আজ এ ভঙ্গিমা,
কাটুক্‌ না প্রাণ হাজার রঙের
রঙ্গ কলগীতে।

শ্রীসুধীরঞ্জন রায়।

পরিত্রাণ *

সুবিশাল নদ-বক্ষে তরণীর তরঙ্গ-বিক্ষেপে
ছল-ছল, সমুজ্জ্বল, জলরাশি ওঠে কল-হাসি ;
পরিচিত সে কল্লোল পশিল শ্রবণে যবে আসি'
আনন্দ-আগ্রহ-ভরে চেতনায় উঠিলাম কেঁপে !'
এই যে জননী মোর—নীলাম্বরে আঁখি দু'টি তুলি,
কাঞ্চন-কুন্তলরাশি হিরণ কিরণে মুক্ত করি,
বিশ্রাম-আলসে আজি আছেন বসিয়া আহা মরি,—
কতই যে স্নেহ-ভরে !

মা আমার, কারা-দ্বার খুলি'।
অভাগা এসেছে তোর—শান্তি-সুধা করিবারে পান !
ওরা মোরে ধরে' রাখে-বন্ধ করি' নিরন্ধ্র কারায়,
আসিতে দেয় না ; তাই, আইলাম আজি মা' পালায় !
মা জননি, তোর কোলে আজি হ'ল পুণ্য পরিত্রাণ !
শুধুই এখন ওই সোণা-গালা স্নেহের প্রবাহে
ভেসে' যাবে, দয়াময়ি,—আর্ত্ত-হিয়া এই শুধু চাহে !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে পবিত্রাবশেষাদি

মহারাজ অশোকের রাজত্বের পূর্ব্বেই বুদ্ধ ভগবান রূপে পূজিত হইতেন। কিন্তু কোন সময়ে তাঁহার মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত হয় তাহার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সাঁচী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন প্রস্তর শিল্পাদিতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে যে স্থলে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির কল্পনার আবশ্যকতা, সে স্থলেও বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক, ধর্ম্মচক্র প্রভৃতি তাঁহার মূর্ত্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক অর্হতের প্রস্তর শিল্পচিত্রে বুদ্ধদেবের পদাঙ্কের সম্মুখে জানুর উপর উপবিষ্ট মহারাজ অজাতশত্রুর উৎকীর্ণ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অশোকের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ভগবান রূপে পূজিত হইলেও তাঁহার মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হয় নাই।

মথুরায় ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীরের মূর্ত্তির অভাব নাই। সেই সকল মূর্ত্তি সংশ্লিষ্ট উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে যে তারিখের উল্লেখ আছে তাহাদিগকে শকাব্দ অনুসারে গণনা করিলে (এবং এইরূপ গণনা করার যথেষ্ট কারণ আছে) প্রতিপন্ন হইবে যে, মূর্ত্তি পূজার পদ্ধতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই প্রচলিত ছিল।

ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি কোন আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না। তথাগত পদ্মাসনে উপবিষ্ট, এবং একটি বহু প্রাচীন মূর্ত্তির নিম্নে "ভগবতো পিতা-মহস্য" এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মার আদর্শেই বুদ্ধমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে স্মরণ করা উচিত যে, বৌদ্ধ শিল্পে গ্রীক প্রভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। গান্ধারের প্রস্তর শিল্পে গ্রীক আদর্শের স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং এরূপ অনেক কারণ আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত গান্ধারের প্রস্তর শিল্পে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে খোদিত বুদ্ধ মূর্ত্তিতে শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণসকল দৃষ্ট হয়, এবং এই আদর্শে যথেষ্ট শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

নানা কারণে সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, বুদ্ধ মূর্ত্তির পূজা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতেই চলিত হইয়াছিল। ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং উভয়েই সাংকাশ্যে ১০ হস্ত উচ্চ একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। আবার হুয়েন-সাং পেশোয়ারে কনিষ্কস্তূপের সন্নিধানে ১৮ ফিট উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি দেবভাবাপন্ন ছিল বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। ইহা রাত্রিকালে কণিষ্ক স্তূপের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিত।

---

* বিশ্বাজি নদী-বক্ষে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপর মন্দির গুলিতেও মণিমাণিক্যখচিত এবং সুগঠিত বহু মূর্ত্তি ছিল। এগুলি হইতে সুমধুর শব্দ ও গন্ধ নির্গত হইত। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ বিহারে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছে তথাগতের এরূপ একটি পিত্তল-মূর্ত্তি ছিল। বামিয়ানে প্রায় সহস্র ফিট উন্নত একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তিটি হেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ ভাবের মূর্ত্তিতে বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ লাভের অবস্থা সূচিত হয়। কুশি নগরের সন্নিকটে শালবনে এক পবিত্র স্থানে হুয়েন-সাং বুদ্ধদেবের এই রূপ নির্ব্বাণের অবস্থাসূচক মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন।

তথাগতের চিত্র

মধ্য যুগে তথাগতের চিত্রও দুর্ল্লভ ছিল না। পেশোয়ারে কণিষ্ক-স্তূপের নিকটে হুয়েন-সাং এইরূপ একটি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই স্তূপের পার্শ্ব-দেশে বোধি বৃক্ষের নিম্নে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ৪ ফিট ও ৬ ফিট উচ্চ দুটি বুদ্ধ মূর্ত্তিও তাঁহার নয়ন-গোচর হইয়াছিল।

বুদ্ধ-শিষ্যগণ শাক্য মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী তথাগতগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ঔদাসীন্য করেন নাই। অনেক স্থলে শাক্যমুনির মূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বা ছয় জন তথাগতের মূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে মানবের উদ্ধারকর্ত্তা বোধিসত্ব মৈত্রেয় এই সকল তথাগত অপেক্ষা সমধিক সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। উদ্যানের সমীপবর্ত্তী একটি উপত্যকায় এই বোধিসত্ব মৈত্রেয়ের ৯০ হাত উচ্চ এক মূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তিটি স্বর্ণবর্ণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত। বোধিসত্ব এখনও ভূতলে অবতীর্ণ হন নাই, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা অর্হৎ মধ্যান্তিকের ঋদ্ধি-বলে স্বর্গে গিয়া তাঁহার শারীরিক গঠনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, এবং পরে তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

বোধিসত্ব

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণও অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রীনামক বোধিসত্বদ্বয়ের প্রতি মৈত্রেয়ের অপেক্ষা কম সম্মান প্রদর্শন করে না। ফা-হিয়ানের লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাযান পথাবলম্বী বৌদ্ধগণ মথুরাতে প্রজ্ঞা-পারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিতেন। দুই শতাব্দী পরে অবলোকিতেশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি কপিশ, উদ্যান, কাশ্মীর, কাণ্যকুব্জ, গয়া এবং মহারাষ্ট্র দেশের কপোত মঠ প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ সমন্তমুখ নামে পরিচিত, এবং বোধ হয় সেই নামানুসারেই তাঁহার মূর্ত্তিকে বহুমুখী করা হইয়াছে; কিন্তু ফা-হিয়ানের বিবরণীতে অবলোকিতেশ্বরের বহু মুখের উল্লেখ নাই।

অবলোকিতেশ্বর

মঞ্জুশ্রী

মঞ্জুশ্রী মথুরাতেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। কোন এক মঠে তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মূর্ত্তির কোনও উল্লেখ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে মঞ্জুশ্রীর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু আদিত্যবর্ম্মণ নির্ম্মিত যব দ্বীপের মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি চতুর্ভুজ নহে।

মহাযান পথাবলম্বী বৌদ্ধগণের মন্দিরাদিতে ধ্যানী বুদ্ধগণের মূর্ত্তি প্রবর্ত্তিত হইলে পর তাঁহারা সম্মানের সহিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের এবং ইঁহাদের তারাগণ ও পুত্রগণের চিত্র এবং মূর্ত্তি নেপাল, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া দেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ধ্যানী বুদ্ধগণের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠন বুদ্ধ মূর্ত্তির অনুরূপ, এবং তাঁহাদের সকলেরই পদ্মাসন, কিন্তু বাহন বিভিন্ন। বৈরোচনের বাহন সিংহ, অক্ষোভ্যের বাহন হস্তী, রত্নসম্ভবের বাহন অশ্ব, অমিতাভের বাহন হংস এবং অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড়। আবার এই পাঁচ জনের মুদ্রাও ভিন্ন ভিন্ন। ইঁহাদিগকে চিত্রে অঙ্কিত করিতে হইলে প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক বুদ্ধের যে বর্ণ তাঁহার তারা, বোধিসত্ব এবং পুত্রগণও সেই সেই বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে। এই সকল মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘকে ত্রিরত্ন বলে। এই ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয় অতি পবিত্র। ত্রিরত্নের পরে ধাতু। ধাতু (ত্রিরত্ন) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, শারীরিক, উদ্দেশিক, এবং পারিভোগিক। সাধারণতঃ ধর্ম্মাত্মাদিগের দেহাবশেষ শারীরিক এবং তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্ম সমাধি-স্তম্ভ বা স্তূপকেই উদ্দেশিক, এবং যে সকল পদার্থ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন সে সকল পদার্থ, পবিত্র স্থান বা তীর্থ এবং পবিত্র বৃক্ষাদিকে পারিভোগিক ধাতু বলে। কথিত আছে ভল্লিক ও ত্রপুশ নামক দুই জন বণিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর ভগবান বুদ্ধ তাহাদিগকে কয়েকটি কেশ প্রদান করেন। সেই গুলিই প্রাচীনতম শারীরিক ধাতু। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে লোকে বলিতে লাগিল যে, সেই দুই জন বণিকই বুদ্ধদেবের নিকট হইতে তাঁহার নখ, ভিক্ষাপাত্র, যষ্টি, এবং পরিচ্ছদত্রয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দেবশ্রেষ্ঠ সুমনাকে বুদ্ধ এক মুষ্টি কেশ প্রদান করেন। সুমনা সেই কেশগুচ্ছ একটি স্বর্ণ-কৌটায় রাখিয়া মণির স্তূপে প্রোথিত করিয়া রাখেন। এই পবিত্রাবশেষ অদ্যাপি সিংহলে রহিয়াছে, এবং ইহা ভগবান বুদ্ধ প্রদত্ত কেশাবশেষের ন্যায় প্রাচীন বলিয়া সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। অযোধ্যা, কাণ্যকুব্জ, মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরে স্তূপ-মধ্যে তথাগতের কেশ ও নখাদি প্রোথিত আছে, তন্মধ্যে কান্যকুব্জের অবশেষগুলির অলৌকিক দৈব ক্ষমতা আছে বলিয়া জন সাধারণ বিশ্বাস করিত।

বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহাবশেষ

বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত স্বর্গে, একটি গান্ধারে, একটি কলিঙ্গে এবং একটি নাগলোকে পূজিত হইয়া থাকে। দন্তপুরে (কলিঙ্গ পত্তন্) রক্ষিত দন্তাবশেষের ঐতিহাসিক বিবরণ দাঠাবংশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই দন্তাবশেষটি সিংহলের অনুরাধাপুরে আনীত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান ইহা সেখানে দেখিয়াছিলেন। তিনি গান্ধার প্রদেশস্থ নগরের স্তূপে রক্ষিত একটি দন্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েন-সাং এর বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার সময়ে ইহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি কান্যকুব্জেও ভগবান বুদ্ধের দন্তাবশেষ দেখিয়াছেন। বামিয়ান, বল্‌খের সমীপবর্ত্তী নববিহার এবং কপিশ প্রভৃতি স্থানেও বুদ্ধদেবের দন্তাবশেষ ছিল। কাবুল নদীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী নগর নামক স্থানে ভগবান বুদ্ধের বহু পবিত্রাবশেষ ছিল। হিদ্দ নগরে একটি স্তূপে তথাগতের করঙ্কাবশেষের কিয়দংশ রক্ষিত ছিল। ইঁহার বাকী অংশ ও চক্ষুতারা দুটি সেই নগরেই আরও দুটি মন্দিরে বিদ্যমান ছিল।

জিনের স্কন্ধাস্থি

পূর্ব্বলিখিত দন্তাবশেষ ব্যতীত সিংহলে বুদ্ধদেবের একটি স্কন্ধাস্থি তাঁহার চিতা হইতে আনীত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের বহু অস্থ্যবশেষ রুয়ানওয়েলি স্তূপে সংরক্ষিত ছিল। মহারাজ অশোকের সময় দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিটি শ্রামণের সুমন সিংহলে আনয়ন করেন, কিন্তু কথিত আছে যে, এই অস্থিটি তিনি স্বর্গে ইন্দ্রদেবের নিকট প্রাপ্ত হন।

তথাগতগণের দেহাবশেষ

গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তথাগতগণের অস্থ্যবশেষ একান্ত দুর্লভ। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র কাশ্যপ বুদ্ধের অস্থি খণ্ডগুলি শ্রাবস্তি নগরীর একটি স্তূপে রক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মহাপুরুষগণের শরীরাবশেষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈশালী নগরীর নিকটে আনন্দের দেহার্দ্ধের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপরার্দ্ধ পবিত্রাবশেষরূপে মগধে রহিয়াছে। সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র, উপালি, আনন্দ এবং রাহুলের সম্মানার্থে তাঁহাদের পবিত্র দেহাবশেষের উপর মথুরা নগরীতে স্তূপ নির্ম্মিত

হইয়াছিল। আবার বৌদ্ধশ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের নখ ও শ্মশ্রুরাজি এই নগরেই সম্মানের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছিল। কম্বণ প্রদেশের বনভাগে শ্রুতবিংশতি-কোটির (শ্রোণকোটি বিংশ?) অবশেষসমূহ একটি স্তূপ মধ্যে নিহিত ছিল। কুক্কুটপাদনামক পর্ব্বত-বিবরে ভগবান কাশ্যপের সমগ্র দেহ রক্ষিত আছে।

অস্থ্যবশেষের ন্যায় পরিভোগ ধাতুও সম্মানিত ও পূজিত হইত; তবে কোন সময়ে ইহাদের প্রতি এই রূপ ভক্তি প্রদর্শন আরব্ধ হয় নিশ্চয় বলা যায় না। সম্ভবতঃ মধ্য যুগের প্রারম্ভেই ইহাদের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারত ভ্রমণ কালে ফা-হিয়ান নগর নামক স্থানের নিকটে ১৬ কি ১৭ হাত লম্বা বুদ্ধদেবের চন্দন কাষ্ঠের যষ্টি দেখিয়াছিলেন। যিনি

বুদ্ধদেবের যষ্টি

১৬ হাত লম্বা যষ্টি ব্যবহার করিতেন তিনি কিরূপ দীর্ঘাকার ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আবার নগরের অনতিদূরবর্ত্তী একটি মন্দিরে হুয়েনসাং বুদ্ধদেবের সঙ্ঘাঠী ও কাবায় দুইই দেখিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের ভারত-প্রবাস কালে তথাগতের ভিক্ষাপাত্র পেশোয়ারে ছিল। জন সাধারণ ভক্তি করিয়া এই ভিক্ষাপাত্রের নিকট নানা উপহার প্রদান করিত। দুই শতাব্দী পরে এই ভিক্ষাপাত্র বৈশালী হইতে পেশোয়ারে আনীত হয়। ফা-হিয়ান এই ভিক্ষাপাত্র সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই

তথাগতের ভিক্ষাপাত্র

ভিক্ষাপাত্র যথাক্রমে তুর্কিস্থান, খোটান, করচর, চীন, সিংহল ও ভারতবর্ষ হইয়া শেষে স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে। দীপ-বংশে আরও অনেক পরিভোগধাতুর উল্লেখ আছে যথা, ককুসন্ধবুদ্ধের পানপাত্র, কোণাগমনের কটিবন্ধ, এবং কাশ্যপ ও গৌতমের স্নানবস্ত্র। গৌতমের কটিবন্ধ কায়বন্ধন চৈত্যে রক্ষিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে কঙ্কণপুরের একটি বিহারে সিদ্ধার্থের

সিদ্ধার্থের উষ্ণীষ

শৈশবকালের একটি উষ্ণীষ সপ্তম শতাব্দীতে ছিল বলিয়া জানা যায়। পর্ব্বদিনে এই উষ্ণীষটি বাহির করা হইত এবং জনসাধারণ পুষ্পোপহারে ইহার পূজা করিত। বৌদ্ধশ্রেষ্ঠ সাণবাসিকের পরিচ্ছদ হুয়েন-সাং বামিয়ানে দেখিতে পান। পরিচ্ছদটি ঈষৎ রক্তাভ ও শাণনির্ম্মিত ছিল। সাণবাসিক ১৫০০ বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিবারেই এই পরিচ্ছদটি তিনি পরিধান করিয়াছেন, এবং যত দিন বৌদ্ধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে তত দিন এই পরিচ্ছদের লয় হইবে না।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন কোন স্থানে ভগবান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের ছায়ামূর্ত্তি অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহাদের মতে কৌশাম্বী, গয়া, ও নগর নামক স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের এই রূপ ছায়া মূর্ত্তি দেখা যাইত।

কৌশাম্বীর নিকটে যে গুহায় এই ছায়ামূর্ত্তি দৃষ্ট হইত বলিয়া কথিত হইত, হুয়েন-সাং

ছায়াবশেষ

সেই গুহাটি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। তিনি গয়ার গুহাতে এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। পরিব্রাজক ফা-হিয়ানও তাহার পূর্ব্বে এই ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ ফিট্ ও দেখিতে বেশ উজ্জ্বল বলিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন। নগর নামক স্থানের ছায়ামূর্ত্তিই সমধিক বিখ্যাত। এই গুহায় নাগগোপাল বাস নির্ম্মাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তথায় বুদ্ধদেব তাঁহার এই ছায়ামূর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই গুহার প্রবেশ-পথে ধর্ম্মচক্র চিহ্নিত তথাগতের পদচিহ্নযুক্ত দুইটি বর্গাকার প্রস্তরখণ্ডও দৃষ্ট হইত।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

রিজডেভিড্‌স্‌, কার্ণ, বার্গেস প্রভৃতির গ্রন্থ এবং হুয়েন সাং ও ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত। লেখক।

নামি-কো

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুশি

হৃদয়ে হিংসা লইয়া, হতমান চিজিওয়া গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পাঁচ দিন পরেই হঠাৎ সদরের আপিস হইতে একটা সৈন্যদলে বদলি হইয়া গেল।

জীবনে অন্ততঃ এক বার এমন সময় আসে, যখন আমরা যে কাজে হাত দিই তাহাই নষ্ট হইয়া যায়, অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া পড়ে,—যেন ভগবানের শাস্তির আর বিরাম নাই। গত বৎসর চিজিওয়ার অবস্থা ঠিক এই রূপই হইয়াছিল, এখনো সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। নামিকে তাকেও ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল; ব্যবসায়ে লোকসান হইল; টাকা ধার করিতে গিয়া লাভ হইল অপমান; শেষে কি না যাহাকে সে সামান্য ছোকরা বলিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছে সেই তাকেও তাহাকে অপদস্থ করিল! তাহার একমাত্র আত্মীয় কাওয়াশিমা পরিবারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। তারপর কথা নাই বার্ত্তা নাই, তাহার দ্রুত উন্নতির সোজা রাস্তা, সদরের চাকুরিটি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেওয়া হইল সৈন্য-দলে একটা সামান্য কাজ—যা সে এত দিন দাস-বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে!

চিজিওয়া কিন্তু স্বীয় অপরাধের কথা ভালো রকমই বুঝিত, তাই কোনো প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইয়া সে নূতন কাজে মনঃসংযোগ করিল। এত দিন সে খুব ধীর-স্থির গোছের লোক ছিল, তাহার উপস্থিত বুদ্ধি কখনো লোপ পাইত না; কিন্তু শেষোক্ত ঘটনাটি তাহাকে এমন একটা ঘা দিয়া গেল যে, অপমানের কথা মনে হইলে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না, তাহার রক্ত যেন ফুটিতে থাকিত।

সোপান শ্রেণীর দু' এক ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় সহসা সেখান হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, চিজিওয়ার জীবনের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা সেই রূপ। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া দিল কে? তাকেওর কথার ভঙ্গী হইতে, এবং সদরের যিনি প্রধান তাঁহার সহিত লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ জেনারল্‌ কাতাওকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া চিজিওয়ার সন্দেহ হইত যে, এবিষয়ে কাতাওকার কিছু হাত ছিল। সে জানিত তাকেও অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তবে তাহার তিন হাজার টাকার জন্য এত রাগ কেন? সে নয় তাহার নামের মোহরটি জাল করিয়াছে! ইহার মধ্যে অর্থের চেয়েও গভীরতর আরও কিছু নাই ত? সেই পুরানো প্রেম প্রার্থনার কথা নামি তাকেওকে বলিয়া দেয় নাই ত? যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই তাহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রেম-পরাজয়, কার্য্য হইতে বিতাড়ন প্রভৃতি তাহার মনে যে দারুণ হিংসা, ঘৃণা ও হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখন জেনারল্‌, তাকেও ও নামির চারি দিকে আগুনের হল্কার মত লাফাইয়া উঠিল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে বলিয়া সে গৌরব করিত এবং উত্তেজনার বশে যাহারা জ্ঞানশূন্য হয় তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া বিদ্রূপ করিত। কিন্তু এখন—বার বার ব্যর্থকাম হইয়া মেজাজ তাহার এমনি বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, সে ক্রোধ রাখিবার আর স্থান পাইতেছে না।

প্রতিহিংসা! যাহাদের ঘৃণা করি তাহাদের রক্তপানে যে আনন্দ তাহার তুলনা নাই। প্রতিহিংসা! কিন্তু কেমন করিয়া? বিস্ফোরক সংযোগে কেমন করিয়া কাতাওকা ও কাওয়াশিমা এই দুইটা ঘৃণ্য পরিবারকে উড়াইয়া দেওয়া যায়। এই ঘৃণ্য স্ত্রী-পুরুষগুলোর গায়ের মাংস যখন টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে, হাড়গুলো গুঁড়া হইতেছে, আধমরা অবস্থায় তাহারা যখন মরণের পথে চলিয়াছে, তখন

নিরাপদে দূরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া এই চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করা যায়! এই কথাই গত জানুয়ারি মাস হইতে দিন রাত চিজিওয়ার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে।

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি প্লামের ফুলগুলি যখন তুষার কণার মতন ঝরিয়া পড়িতেছিল তখন চিজিওয়ার এক বন্ধু তোকিওতে বদলি হইয়াছিল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চিজিওয়া শিন্‌বাশি ষ্টেশনে গিয়াছিল। ওয়েটিং রুম্ হইতে বাহিরে আসিয়াই মহিলাদের ঘরের সম্মুখে একটি দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক ও একটি তরুণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

"কেমন আছ ?"

কাতাওকা-গৃহিণী ও কোমা তাহার সামনে দাঁড়াইয়া। মুহূর্ত্তের জন্য চিজিওয়া বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের মুখ দেখিয়া বুঝিল, তাহারা তাহার কার্য্যাবলীর কথা অবগত নহে; তাই তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইল। জেনারল্ ও নামির উপর তাহার রাগ। কতাওকা-গৃহিণীর সহিত শত্রুতা করিয়া কোনো লাভ নাই! তাই সে সবিনয় নমস্কার করিয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কেমন আছেন ?"

"তোমার ত আর দেখাই পাওয়া যায় না।"

"দেখা কর্‌ব কর্‌ব মনে করছিলুম, কিন্তু ভারি ব্যস্ত ছিলুম তাই পারি নি। কোথায় চলেচেন ?"

"জুশি। তুমি কোথায় যাবে ?"

"এই এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বেড়াতে যাচ্চেন না কি ?"

"কেন তুমি শোন নি না কি ? রোগী দেখতে যাচ্চি।"

চিজিওয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রোগী ? কে ?"

ভাইকাউণ্টেস্ বলিলেন, "নামি।"

ঘণ্টা বাজিল। আরোহীর দল বন্যার মত প্ল্যাট্‌ফর্মের ফটকের দিকে ছুটিয়া চলিল। কোমা কহিল, "দেরি হয়েছে, শীগ্‌গির চল।"

ভাইকাউণ্টেসের হাত হইতে থলিটি লইয়া চিজিওয়া তাঁহার পাশে পাশে চলিল।

"অসুখ বেশী না কি ?"

"হ্যাঁ, বুকের অসুখ।"

"যক্ষা ?"

"মুখ দিয়ে ভয়ানক রক্ত পড়েছিল তাই সে দিন জুশি গেছে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।" ফটকের নিকট গিয়া চিজিওয়ার হস্ত হইতে থলিটি নিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ও কহিলেন চল্লুম। শীগ্‌গির ফিরব। এসো এক দিন দেখা করতে।"

চিজিওয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, সুন্দর কাশ্মীরি শাল ও লালফিতা বাঁধা খোঁপা একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তার পর সে ফিরিল, মুখে তাহার প্রতিহিংসার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নামির রোগের লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। চিকিৎসক আশঙ্কা না জাগাইয়া যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। মার্চ মাসের প্রারম্ভে বেশ বুঝা গেল যে, তাহার যক্ষা রোগ হইয়াছে। এমন কি নামির শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর, যিনি এতাবৎকাল স্বীয় স্বাস্থ্যের গৌরব করিয়া আসিয়াছেন ও জলহাওয়া বদলের দ্বারা রোগের প্রতিকার ছেলেমানুষের আজগবি কল্পনা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনিও নামির রক্ত-বমন দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই ভয়ানক রোগটা ছোঁয়াচে রোগ তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন, তাই পরিণাম-ভয়ে ভীত হইয়া চিকিৎসকের উপদেশ মত নামিকে উপযুক্ত সেবিকার সঙ্গে জুশিতে কাতাওকার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রোগের প্রথম আক্রমণটা দেখিয়া নামি ত্রস্ত ও চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন এক বর্ষণোন্মুখ ঘনকৃষ্ণ মেঘাস্তরণে ঢাকা জনহীন অসীম প্রান্তরের মধ্য দিয়া একাকিনী চলিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভয়ানক স্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়াছে, নামি বজ্রবিদ্যুৎ, উদ্দাম বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া; এখন সে ভাবিতেছে

যেমন করিয়া হউক ঝড়-ঝঞ্ঝার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবেই হইবে। কিন্তু তবুও রোগের সেই প্রথম আক্রমণের কথা মনে হইলে গাত্র শিহরিয়া উঠে!

সে দিন মার্চ্চ মাসের দোসরা। নামি খুব সুস্থ বোধ করিতেছিল। সে ফুল সাজাইতেছিল। বহু দিন এ কাজ সে করে নাই। তাকেও বাড়ী ছিল, তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে বলিয়া বারান্দায় বসিয়া সে একটি সুন্দর ফুটনোন্মুখ লাল প্লাম গাছ হইতে ডাল বাছিয়া লইতেছিল। হঠাৎ তার বুকে একটা ব্যথা অনুভূত হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল, চীৎকার করিয়া সে ঢলিয়া পড়িল। দারুণ শঙ্কার সহিত সে যে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল অবশেষে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বার তাহার মনে হইল, সে যেন দূরে অস্পষ্ট ভাবে মৃত্যুর দ্বার দেখিতে পাইয়াছে।

হায়, মৃত্যু! নামি যখন অসহায় শিশু তখন জীবনে তাহার সুখ ছিল না, মরণেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু এখন সে জীবনে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে, এখন জীবনের অবসান কল্পনা করা কি ভয়ানক! তাই মৃত্যুর কথা মনে হইলেই সে ভাবিত, ইহার বিরুদ্ধে সে প্রাণপণ যুদ্ধ করিবে। দুর্ব্বল চিত্ত দৃঢ় করিয়া, চিকিৎসকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, সে বিশেষ আগ্রহ সহকারে শরীরের যত্ন করিতে লাগিল।

তাকেও সে সময়ে জুশির নিকটবর্ত্তী য়োকোসুকা নামক নৌনিবাসে থাকিত। একটু সময় পাইলেই ছুটিয়া নামিকে দেখিতে আসিত। পিতার নিকট হইতে পত্র আসিত, মাসিমা ও চিজু প্রায়ই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তার পর তাহার বৃদ্ধা ধাত্রী ইকু এমন স্নেহের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতেছিল যে, নামি পীড়ার দুঃখের মধ্যেও আনন্দ অনুভব করিত। গত গ্রীষ্মকালে কাওয়াশিমা পরিবার হইতে বিতাড়িত হইয়া অবধি ইকুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; পীড়া না হইলে ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত না, এই কথা ভাবিয়া নামির আনন্দ হইত। আর এক জন পুরাতন অনুরক্ত ভৃত্য তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সদাই ব্যাপৃত থাকিত। শীতের সময় সহর ছাড়িয়া নামি রৌদ্রালোকিত তটভূমির সুখোষ্ণ আশ্রয়ে আসিয়াছিল। উদার প্রকৃতির উষ্ণ আলোক ও মানুষের প্রীতির বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া নামি সুস্থ বোধ করিল। দুই সপ্তাহ পরে রক্ত-বমন বন্ধ হইল, কাশিও কমিয়া গেল। সপ্তাহে দুই বার তোকিও হইতে চিকিৎসক আসিতেন। রোগ না সারিলেও বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন, এবং নামিকে কহিলেন, সহিষ্ণুতার সহিত চিকিৎসকের শুশ্রূষাধীনে থাকিলে ও উদ্বেগশূন্য হইলে তাহার সারিয়া উঠা অসম্ভব নয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম শনিবার। রাজধানীতে চেরি ফুল ফুটিবার বিলম্ব থাকিলেও এখানে পাহাড়ের উপর বন্য চেরি গাছগুলিতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে; পাহাড়ের সবুজ গাত্রে মাঝে মাঝে সাদা ছাপ পড়িয়াছে। আজ কিন্তু প্রকৃতির মূর্ত্তি বিষণ্ণ। প্রত্যুষ হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, পাংশুবর্ণ কুয়াশায় পাহাড় ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বসন্তের দীর্ঘ দিনের আর যেন অবসান হয় না। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, বাতাস বহিতে লাগিল, দরজা জানালার মধ্য দিয়া ঝটিকা হাহা রবে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ সাগরের গর্জ্জন শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন লক্ষ লক্ষ বন্য তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে।

কাতাওকার বাড়ীতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে তাকেওর অভ্যর্থনা চলিতেছিল। তাহার সকাল সকাল আসিবার কথা ছিল কিন্তু কার্য্যগতিকে বিলম্ব ঘটায় ঝটিকাসঙ্কুল রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়া সে আসিয়াছে। পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যার আহার সারিয়া সে এখন একটি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পত্রপাঠে নিমগ্ন। টেবিলের অপর দিকে নামি বসিয়া একটি সুন্দর থলি সেলাই করিতেছিল; ক্ষণে ক্ষণে সেলাই থামাইয়া পতির দিকে চাহিয়া

মৃদু হাস্য করিতেছিল, কখনো বা নীরবে বাহিরের শব্দ শুনিতেছিল। এক গুচ্ছ চেরি ফুল ও পাতা তাহার কেশে আবদ্ধ। টেবিলের উপর উভয়ের মধ্যে একটি আলোক, আবরণের মধ্য হইতে গোলাপী আভা ছড়াইতেছিল। নিকটে একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ চেরি পুষ্প। তুষারের মত ফুলগুলি অবসন্ন ভাবে ধীরে ধীরে নুইয়া পড়িতেছিল। সে দিন প্রভাতে পাহাড়ের মাথায় যে বসন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে ফুলগুলি বোধ হয় তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল!

বৃষ্টির ঝাপট ও বাতাসের শন্ শন্ শব্দ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছিল।

তাকেও চিঠিখানি মুড়িয়া কহিল, "বাবা তোমার জন্য ভারি চিন্তিত হয়েছেন্। কাল আমার তোকিও যেতে হবে, আকাশাকাতেও যেতে চেষ্টা করব।" "কাল যাবে? এই বৃষ্টি বাদলায়? ও! মা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। তোমার সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছে করচে।"

"নামি-সান্! এখানে তুমি কেন এসেচ সে কথা ভুলো না। মনে কর, কিছু দিনের জন্য তুমি বনবাসে এসেছ।"

"এ যদি বনবাস হয় ত সারা জীবন এখানেই কাটাতে ইচ্ছে করে। তুমি চুরুট খেতে পার। শুন্‌ছ।"

"আমাকে দেখে বোধ হচ্ছে কি আমি চুরুট খেতে চাইচি? না, এখানে চুরুট না খাওয়াই ভালো। কিন্তু এখানে আসবার এক দিন আগে আর পরে সাধারণতঃ যা খাই তার ডবল খাবো, কেমন?"

নামি হাসিয়া বলিল, "তুমি যখন এমন ভালো ছেলে তোমাকে খান কতক ভালো কেক খাওয়াই। ইকু আনবে এখন।" "ধন্যবাদ। কেকও চিজু-সান্ এনেছিল না কি? ওকি? বেশ সুন্দর ত!"

"সময় কাটাবার জন্যে যার জন্যে এটি তৈরি করচি। না, না এতে আমার কষ্ট হবে না। আস্তে আস্তে কচ্ছি বই ত নয়। আজ আমার খুব ভালো বোধ হচ্ছে। ওগো! আজ আমায় একটু বেশীক্ষণ জেগে থাকতে দাও না। আমাকে আর ব্যারামীর মত দেখায় না, দেখায় কি?"

তাকেও হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার কাওয়াশিমা যখন উপস্থিত তখন তোমার ভালো বোধ হওয়া খুবই উচিত। না, না, বাস্তবিক আজকাল তোমায় অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে। আর কোনো ভয় নেই।" চা ও কেক লইয়া বৃদ্ধা ইকু প্রবেশ করিল। সে কহিল, "কি ঝড়টাই বইচে। কর্ত্তা না এলে আজ রাত্তিরে ঘুমুনো দায় হ'ত। চিজু দিদি চলে গেছেন দাইও তোকিও ফিরে গেছে। বুড়ো মোহেই থাকলেও, ওরা না থাকলে এমন একলা বোধ হয়!"

"এমন দিনে সমুদ্রে নাবিকের অবস্থা কি রকম! কিন্তু আমার মনে হয় নাবিকের জন্যে বাড়ীতে বসে যে ভাবে তার অবস্থাই আরো শোচনীয়।"

এক পেয়ালা চা পান করিয়া ও টপ্ টপ্ করিয়া খান তিনেক কেক খাইয়া ফেলিয়া তাকেও কহিল, "হুঁঃ, এ আর এমন কি ঝড়! দক্ষিণ চীন সমুদ্রে যদি দিন দুই তিন একটা বড় ঝড়ের মধ্যে পড়তে ত ঝড় কা'কে বলে তা বুঝ্‌তে। চার হাজার টনের বড় জাহাজ মোচার খোলার মত টল্‌মল্ করত, পাহাড়ের মত ঢেউগুলো ডেক ধুয়ে দিয়ে যেত, জাহাজের খোলটা কাঠের বাড়ীর মত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করত। নিশ্চয় বলতে পারি সেটা বিশেষ আরামের হয় না।"

ঝড়ের বেগ বাড়িয়া উঠিল। একটা দম্‌কা বাতাস বাড়ীর গায়ে বৃষ্টির ঝাপট মারিল, পাথরের নুড়ির বর্ষণ হইলে যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দ হইল। নামি চক্ষু মুদ্রিত করিল, ইকু ঘাড় কাঁপাইল। তাহারা কথোপকথন থামাইল, কিছুক্ষণ কেবল ঝড়ের ভীষণ ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

"নিরানন্দ বিষয়ের আলোচনা আর ক'রে কাজ নেই। এমন দুর্য্যোগে বাতির আলো উজ্জ্বল করে দিয়ে আনন্দের কথাবার্ত্তা কওয়াই ভালো। এ জায়গাটা

য়োকোহামার চেয়েও গরম। এরি মধ্যে বুনো চেরি গাছ গুলোতে এই রকম ফুল ফুটেচে।" ফুলগুলি ফুলদানিতে রাখিয়া নামি বলিল, "আজ সকালে মোহেই বুড়ো পাহাড় থেকে এগুলি এনেচে। কেমন, সুন্দর নয়? ঝড় বৃষ্টিতে পাহাড়ের উপরকার গাছগুলোর ভারি ক্ষতি হবে। কিন্তু ফুলগুলি কেমন নির্ভীক! হ্যাঁ, হ্যাঁ আজই বিকেলে রেঙ্গেৎসুর এই সুন্দর কবিতাটি পড়ছিলুম –

"ফুটিয়া সে মনের হরষে
কুসুম ঝরিয়া প'ড়ে যায়;
ভয় তবু নাই তা'র প্রাণে
ঝ'রে যায় কনক-উষায়!

"কি? বীরের মত পড়ে যাচ্চে? আমরা ফুল আর অন্যান্য জিনিসের ঝ'রে পড়াটা খুব তারিফ করি। তারিফ করাটা মন্দ নয়, কিন্তু এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাটা আবার কিছু নয়। যুদ্ধে বা আর কোনো কাজে শীগ্‌গির ম'রে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া। আমাদের লোকেদের চরিত্রের দুর্দ্দমনীয়, একগুঁয়ে, সহিষ্ণু দিকটার আমি তারিফ করুতে চাই। শোন। আমার গানটা হবে এই রকম। শুনতে একটু অদ্ভুত হবে, এই আমার প্রথম চেষ্টা কি না—

"বসন্ত ফুরায়
ফুল তবু নাহি ঝ'রে যায়।
ঝ'রে গিয়ে কোন ফল নাই,
ফুটে থাকা চাই!
ম'রে গিয়ে কিবা ফল বল?
বেঁচে থেকে কাজ করা ভাল!"

"কেমন? রেঙ্গেৎসুকে হারিয়েচি কি না বল?" ইকু বলিল "বাঃ! কর্ত্তা দেখচি রীতিমত কবি। কেমন নয় কি দিদি?"

তাকেও আনন্দিত হইয়া বলিল; "ইকু যখন মঞ্জুর করেছে তখন আর কি! কে বলে আমি কবি নয়!" ক্ষণেকের জন্য কথোপকথনের বিরাম হইল। ঝড়ের ও ঢেউয়ের মিলিত শব্দ তরণীতে শোনা গেল। তাহাদের মনে হইতেছিল, তাহারা যেন উদ্দাম সাগরবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে! ইকু কেতলিতে জল আনিতে বাহির হইয়া গেল। নামি বুকের মধ্য হইতে থার্ম্মমিটারটি বাহির করিয়া লইয়া আলোকে দেখিয়া স্বামীকে সানন্দে বলিল, শরীরের তাপ সাধারণতঃ যা থাকে তার চেয়েও কম। তারপর কিছুক্ষণ টেবিলের উপরে ফুলগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ অধরে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "ঠিক এক বছর হ'ল—দিনটা আমার বেশ মনে পড়ে, আমি গাড়ী চড়ে তখন বেরুচ্চি, বাড়ীর লোকেরা তুলে দিতে এসেচে। বিদায় সম্ভাষণ করতে গেলুম, মুখে একটা কথা জোগাল না। তাযেইকের পোল যখন পার হলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, চাঁদ উঠেছে। অদূরে পাহাড়ের উপর চেরি ফুল খুব ফুটেছিল, গাড়ীখানা যখন সেখান দিয়ে গেল তখন ফুলের পাপড়িগুলো বরফের মত ঝির্ ঝির্ করে ঝ'রে পড়চে, নাচতে নাচতে সেগুলো গাড়ীর জানালার ভেতর দিয়ে এসে পড়তে লাগলো। একটা পাপড়ি আমার চুলে আটকে গিয়েছিল, আমি কিছুই জানতে পারি নি। নামবার সময় মাসিমা যখন তুলে নিলেন তখন দেখতে পেলুম।"

তাকেও হাতের উপর মুখ রাখিয়া বলিল "বছর খানেক সময় কী শীগ্‌গিরই কেটে যায়? বে'র সময় তুমি কী স্থির হয়ে ছিলে ভাবলে আমার হাসি পায়। আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'ত কেমন করে তুমি অত গম্ভীর হ'তে পেরেছিলে।"

"তুমি যে অবাক হয়ে গিয়েছিলে তা আমি জানি। সত্যি বল্‌ব? আমার এমন ভয় হয়েছিল যে পেয়ালাটাও ধরে রাখতে পারছিলুম না।"

ইকু হাস্যমুখে কেত্‌লি লইয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "তোমাদের আমোদ দেখে এত সুখ কখনো হয় নি। গেল বছর 'ইকাও'এ থাকার কথা মনে হচ্ছে।"

নামি কহিল, "ইকাও! আহা, কেমন আমোদ হয়েছিল!" তাকেও জিজ্ঞাসা করিল, "আর ফার্ণ

তোলা? একটি মেয়ের কথা মনে আছে—সে এত দেরি কচ্ছিল!"

"আর তুমি আমার এমন তাড়া দিচ্ছিলে!"

কার্ণের সময় এল ব'লে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, আবার আমরা কার্ণ তুলতে যাব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি সেরে উঠব।"

রাত্রের ঝড়ের পর, পরদিন আকাশ নির্ম্মল হইয়া দেখা দিল।

বৈকালে তাকেওকে তোকিও যাইতে হইবে। সেই উষ্ণ শান্তিময় প্রাতে একটু বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়াতে সে নামিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর পিছন হইতে একটি দেবদারু গাছে ঢাকা বালুকাময় পাহাড় অতিক্রম করিয়া সমুদ্র-তীরে চলিয়া গেল।

নামি কহিল, "কি সুন্দর দিন! কাল রাত্তিরে মনে হয় নি যে আজ এত পরিষ্কার হবে।"

তাকেও উত্তর দিল, "না। দেখ ওপারের তীর কত কাছে বলে বোধ হচ্ছে। মনে হয় যেন এখান থেকে ডাকলে ওপার থেকে শোনা যায়!"

বালুকাময় তীর-ভূমি ইহারি মধ্যে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি শিশু ঝিনুক কুড়াইতেছিল, জেলেরা জাল ফেলিবার উদ্যোগে ব্যস্ত। উভয়ে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার তীর-ভূমির উপর দিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

হঠাৎ যেন কি একটা মনে পড়িয়াছে এমনি ভাবে নামি জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, চিজিওয়া আজকাল কি করচে জান কি?"

"চিজিওয়া? সেই নির্লজ্জটা! সেই অবধি আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। কেন? তার কথা জিজ্ঞেস করচ কেন?"

নামি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "শুনলে তুমি হাসবে। কাল রাত্তিরে তাকে স্বপ্নে দেখেছি।"

"তাকে স্বপ্নে দেখেচ?"

"হ্যাঁ, সে মার সঙ্গে কথা কচ্ছিল।"

তাকেও হাসিয়া বলিল, "তুমি এই সব বিষয় নিয়ে বড় মাথা ঘামাও। সে বলছিল কি?"

"তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু মা অনেক বার মাথা নাড়লেন। ও-চিজুপান্ সে দিন বলছিল যে সে, তাকে য়্যামাকির সঙ্গে বেড়াতে দেখেচে। বোধ হয় সেই জন্যই স্বপ্নটা দেখেচি। হ্যাঁগা, চিজিওয়াসান্ আমাদের বাড়ী আসবে না ত?

"সে কখনো আসবে না। মাও তার ওপর রেগেচেন।"

নামি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

"আমি সদাই ভাবি আমার অসুখ হওয়াতে মা বড় ব্যাজার হয়েচেন।"

বেদনায় তাকেওর অন্তর টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে চলিয়া আসার পর হইতে তাহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যে তাহার উপর উত্তরোত্তর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যে পুত্রকে ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে জুশি হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন, নামির পীড়া হওয়াতে যে সব অসুবিধা ঘটিয়াছে তজ্জন্য অভিযোগ করিয়া থাকেন; এমন কি কাতাওকা পরিবারের নিন্দা করেন—এ সব কথা সে তাহার পীড়িতা পত্নীকে বলে নাই। মাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তিনি তাকেওকে নির্ব্বোধ বলিতেন, স্ত্রীর জন্য সে মাতার অবাধ্য হইতেছে, এমন কথাও বলিতেন। একাধিক বার এরূপ ঘটিয়াছে।

"তুমি কেবলই ভাবো! মনের জোর করো, ভালো হয়ে ওঠো। আসচে বসন্তের জন্য প্রস্তুত হও। মাকে নিয়ে আমরা য়োশিনোতে চেরি ফুল দেখতে যাবো। তাইত, আমরা যে অনেকটা এসে পড়েচি! ক্লান্তি বোধ করচ কি? ফেরা যাবে না কি?"

বালুকাময় তীরভূমি যেখানে পাথরের পাহাড় হইয়া উঠিয়াছে সেই খানে তখন উভয়ে দাঁড়াইয়া।

"ফুদোয় যাওয়া যাক চল। আমি একেবারেই হাঁপাই নি। মনে হচ্চে যেন আমেরিকা পর্য্যন্ত হাঁটতে পারি।"

"ঠিক ত? তবে এই শালখানা গায়ে দাও। পাথর গুলো পিছল, আমার হাত ধরে চল।"

তাকেও নামিকে ধরিয়া পাহাড়ের উপর একটা সরু পথ দিয়া চলিতে লাগিল, রাস্তায় অনেক বার থামিল,

অবশেষে উপর হইতে যেখানে একটি ক্ষীণ জল ধারা পড়িতেছিল সেই খানে উপস্থিত হইল। প্রপাতটির ধারে সুন্দোর এক মন্দির, যেন সমুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

একখানি পাথরের উপর হইতে ধূলা ঝাড়িয়া নামির বসিবার জন্ম তাকেও শালখানি পাতিয়া দিল। তাহার পাশে বসিয়া হাঁটুর উপর হাত দুখানি রাখিয়া কহিল, "আঃ চারি দিকে কি শান্তি!"

বাস্তবিকই সমুদ্র বড়ই শান্ত। মধ্যাহ্নের আকাশে মেঘের কণা মাত্র ছিল না, আকাশের অন্তস্থল পর্য্যন্ত নীল। বিরাট সমুদ্র স্থানে স্থানে শ্বেত রেশমী চাদরের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় কোথাও একটি ঢেউও নাই—জলস্থল স্বপ্নাবিষ্টের মত স্থির হইয়া আছে।

নামি ডাকিল, "প্রিয়তম!"

তাকেও জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"একি ভালো হবে?"

"কি?"

"আমার অসুখ।"

"কী বল? ভালো হবে না কেন? নিশ্চয়ই ভালো হবে। আমি ভালো করব তোমায়!"

স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নামি কহিল, "আমি কিন্তু অনেক সময় ভাবি যে, আমি কখনো ভালো হব না। মা আমার এই ব্যরামে মরেছিলেন; আর—"

"নামি-সান্ তুমি আজ এ সব কথা কেন বলচ? নিশ্চয়ই তুমি সেরে উঠবে। ডাক্তার এই কথাই বলছিলেন, শুনেচ ত? তোমার মা সেই অসুখেই হয়ত—কিন্তু তোমার বয়স কুড়ি বছরের নীচে, ব্যারামের এই প্রথম অবস্থা, নিশ্চয়ই তুমি ভালো হয়ে যাবে। আমাদের আত্মীয় ওকাহারাকে জান ত? তার ডানদিকের ফুসফুস্ সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারেরা তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল; কিন্তু তবুও সে পনের বছর বেঁচেছিল। তোমার মনের যদি জোর থাকে ত তুমি ভালো হবে। তা যদি না হয় ত বুঝব তুমি আমায় ভালোবাস না। আমায় ভালোবাসলে তুমি সারবেই সারবে। কেমন ভালো হবে ত?"

নামির দক্ষিণ হস্ত লইয়া তাকেও আবেগের সহিত ওষ্ঠে চাপিয়া ধরিল। তাহার আঙুলে তাকেও প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরী দীপ্তি পাইতেছিল।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে রহিল। রেনোশিমার দিক হইতে একখানি সাদা পাল বাহির হইয়া অচঞ্চল সমুদ্রের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জেলেদের হর্ষ-সঙ্গীত স্থির বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নামির সজল চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "হাঁ। আমি সেরে যাব। নিশ্চয়ই সারব। আচ্ছা মরণ আসে কেন? আমার হাজার বছর বাঁচতে ইচ্ছে হয়। মরতেই যদি হয় আমরা দুজনে এক সঙ্গে মরব।"

"তুমি গেলে আমিও যাব।"

"সত্যি? আহা এক সঙ্গে মরতে কত সুখ। কিন্তু তোমার মা আছেন, কর্ত্তব্য কাজ আছে, তুমি ত তোমার ইচ্ছা মত করতে পারবে না। আমিই প্রথমে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। আমি চলে গেলে তুমি আমার কথা ভাববে ত? হাঁ। গা! ভাববে না?"

তাকেওর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। নামির মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "এসব দুঃখের কথা আর করে কাজ নেই। নামি-সান্, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমরা কত বছর বেঁচে থাকবো।"

তাকেওর হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া নামি কাঁদিয়া বলিল, "আমি মলেও তোমারই! কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না—শত্রু নয়, রোগ নয়, মরণ নয়! চিরকাল আমি তোমার—তোমারই!"

শ্রীহেমনলিনী রায়।

মৎস্য ভক্ষণ

মৎস্যভক্ষক বাঙ্গালীকে হিন্দুস্থান প্রভৃতি দেশের অমৎস্যভুক্ অধিবাসীগণ নিরতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং বাঙ্গালী "মছলী খাখায়" এই চিরাভ্যস্ত ঘৃণা-ব্যঞ্জক ভাষা দ্বারা বাঙ্গালীকে আপ্যায়িত করিতেও ত্রুটি করেন না। এক দেশের অধিবাসী অপর দেশের অধিবাসীর আচার ব্যবহারের সমালোচনা করিয়া থাকে ইহা এক প্রকার নৈসর্গিক রীতির মধ্যেই গণ্য, সুতরাং বাঙ্গালীগণ অমৎস্যভোজী দিগের এই এক ঘেঁয়ে সুরের সমালোচনা অক্ষুদ্ধ ভাবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত এবং ধার্ম্মিক অনেক বাঙ্গালীও আত্মসমাজের সংস্কার কামনায় বাঙ্গালীর স্বরূপনের কলঙ্কস্বরূপ মৎস্য-ভক্ষণ অভ্যাসকে বাঙ্গালা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া মৎস্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষ দিগের আচরিত এই প্রথার দোষোদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হইতেছেন। শাস্ত্রীয় আর কোন প্রমাণ না জানিলেও "মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাস স্ত্র্যহং বসেৎ" এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের সাহায্যে মৎস্য ভক্ষণের অশাস্ত্রীয়তা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়া আত্মপক্ষের সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেকে মনে করেন, মাছ খাওয়ার ফলে বাঙ্গালার সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজই পতিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা দেব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজগুলি করান আর সঙ্গত নহে। এই রূপ মতের উপদেশ এবং তদনুযায়ী আচরণও দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং যে প্রথা চির প্রসিদ্ধ, এমন কি যাহার উপর বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নির্ভর করে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষজুষ্ট সেই প্রথম শাস্ত্রীয় কি পাতিত্যজনক, তাহা এক বার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে মৎস্য মাত্রই অভক্ষ্য কি না? দ্বিতীয়তঃ মৎস্য অভক্ষ্য হইলেও, তাহাতে বাঙ্গালীর পাতিত্য ঘটিয়াছে কি না? মনু বলিয়াছেন "যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তাহার মাংসভুক্ রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, যেমন বিড়াল মূষিকভুক্; সুতরাং মৎস্য-ভোজীকে সর্ব্বমাংসভুক্ বলা যায়; অতএব মৎস্য-ভক্ষণ করিবে না।" ১

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইচ্ছা পূর্ব্বক মৎস্য খাইলে তিন দিবস উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ২

এই দুইটি মাত্র বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে আপাততঃ মৎস্য মাত্রই অভক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বচনের পরেই পুনরায় মনু বলিয়াছেন, "পাঠীন (বোয়াল), রোহিত, রাজীব (যাহার শরীরে রেখা আছে,—মেধা তিথি), সিংহতুণ্ড (যাহার মুখ সিংহের মত) এবং যাহা দিগের শরীরে আঁইস্ আছে, সেই সকল মৎস্য ভক্ষ্য ৩; সুতরাং দেবতার নৈবেদ্যে এবং পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধীয় অন্নে প্রদেয়। এই সকল মৎস্য যে ভক্ষ্য কুল্লূক-ভট্ট স্পষ্ট ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন:—যথা, "ইদানীং ভক্ষ্য মৎস্যান্ হি পাঠীন রোহিতাবিতি"। ভট্ট মহাশয় মৎস্যের ভক্ষ্যতা প্রতিপাদনের জন্য অন্যান্য মহর্ষিদিগের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই সমস্বরে সশল্ক মৎস্যের ভক্ষ্যতা বিঘোষিত করিতেছে—যথা, শঙ্খঃ

"রাজিবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ, সশল্কাশ্চ তথৈবচ।
পাঠীন রোহিতৌ চাপি ভক্ষ্যা মৎস্যেষু কীর্ত্তিতাঃ"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ খাবিৎ গোধাঃ কচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপিতু সিংহতুণ্ডক রোহিতাঃ।
তথা পাঠীন রাজীব সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

১। যোযস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ৫।১৫

২। মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাস স্ত্র্যহং বসেৎ।

৩। পাঠীন রোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ৫।১৬

হারিণঃ—সশল্কান্ মৎস্যান্ ভারোপ পেতান্ ভক্ষয়েৎ"।

বিষ্ণু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধে মৎস্যের মাংস প্রদান করিলে, তাহাতে পিতৃ লোকের দুই মাস তৃপ্তি হয়—

"প্রিয়ন্তে দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন।" ৮০ অ। ২ সূ

ইহার সমানার্থ বচন যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায়—যথা,

"হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্।
মাৎস্য হারিণ কৌরভ্রশাকুনচ্ছাগ পার্ষতৈঃ।
ঐনবৌরব বারাহ শাশৈর্মাংসৈর্যথা ক্রমম্
মাস বৃদ্ধ্যাহি তৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ॥"

১ম অ ২৫৮—৫৯

এই স্থলে সামান্যতঃ মাৎস্য মাংসের বিধান হইলেও, বিজ্ঞানেশ্বর "মিতাক্ষরায়" তাহা স্পষ্ট ভাষায় বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে,

"মৎস্যো ভক্ষ্যঃ পাঠীনাদিঃ তস্যেদং"

অর্থাৎ মাৎস্য পদে দ্বিজাতির ভক্ষ্য পাঠীন প্রভৃতি মৎস্য বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি উশনাও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন,

দ্বৌ মাসৌ মাৎস্য মাংসেন
ত্রিমাসান্ হরিণেনচ"। ৪ অ

যে বর্ণের পক্ষে যাহা খাদ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারাই দেবতার এবং পিতৃলোকের অর্চ্চনা করা বিধেয়, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই। রামচন্দ্র ইঙ্গুদী বৃক্ষের পিণ্যাক এবং বদর ফল দ্বারা পিণ্ড দিয়া পিতৃ দেবকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া ইহাই ভক্ষণ করুন, কারণ পুরুষের যাহা খাদ্য, তাহার পিতৃগণ এবং দেবগণও সেই অন্ন পাইবারই যোগ্য।

"ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ! প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ"॥

ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন,"অভক্ষ্য" অর্থাৎ যে জাতির যাহা অখাদ্য, তাহা নৈবেদ্যে দেয় নহে; ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যেও বিষ্ণুর নৈবেদ্যে ছাগীর দুগ্ধ, মহিষীর দুগ্ধ, পঞ্চনখের, মৎস্যের এবং বরাহের মাংস দানের অযোগ্য।"

"না ভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে।" ৬৫ অ ১২ সূ
ভক্ষ্যেষ্বপ্যজা মহিষী ক্ষীরে॥ ১৩
পঞ্চনখ-মৎস্য-বরাহ-মাংসানিচ॥ ১৪।

বিষ্ণুর নৈবেদ্যে মৎস্য প্রভৃতি অদেয় হইলেও নিজের খাদ্য মৎস্য প্রভৃতি বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া খাইতে হইবে, কারণ অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য এবং জল মূত্র তুল্য, তাহা মৎস্য সূক্তে উক্ত হইয়াছে।

"অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্য-মাংসঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্"॥

অতএব যাহা কেবল নিজের খাইবার উদ্দেশে প্রস্তুত হয় নাই, দেবতার উদ্দেশেই প্রদেয়, সেইরূপ মৎস্য-মাংসই বিষ্ণুর নৈবেদ্যে অদেয়। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। *

বিষ্ণু বচনে অভক্ষ্য শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—যথা, "যে বর্ণের পক্ষে স্বভাবতঃ যাহা অভক্ষ্য (যেমন রশুন প্রভৃতি) তাহাই অদেয়। রাত্রিতে দধি প্রভৃতি দানে নিষেধ নাই। †

ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে পাঠীন এবং রোহিত মৎস্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেই খাদ্য, সশল্ক প্রভৃতি মৎস্য শ্রাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলেও খাদ্য—যথা,

"পাঠীন রোহিতৌ মৎস্য জাতি বিশেষৌ তয়ো
র্হব্য কব্য নিয়োগেন শ্রাদ্ধাদৌ ভক্ষ্যতা ভ্যনুজ্ঞায়তে
নত্বাহ্নিকে ভোজনে রাজীব সিংহ তুণ্ড সশল্কানাং সর্ব্বশঃ
হব্য কব্যা ভ্যামন্ত্রাপ্য নিবৃত্তি র্ভোজনে।

শ্রাদ্ধাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে পাঠীন রোহিত খাদ্য নহে, এই মত কুল্লূক খণ্ডন করিয়াছেন,—যথা,

* অনেন স্বয়ং ভোজ্যমন্নাদি দেয়মিত্যুক্তম্
বিষ্ণু বচনেতু অনেবংবিধং নিষিদ্ধম।
আহ্নিকতত্ত্ব।

† না ভক্ষ্য মিতি যদ্বর্ণস্য যদভক্ষ্যং স্বরূপতো লশুনাদিস্তন্নৈব
ন দেয়ং নতু রাত্রৌ দধ্যাদ্যপি। একাদশীতত্ত্ব।

"এবঞ্চ ভোক্তব্যৌ মাতৌ ন কর্ত্রাপি শ্রাদ্ধে পাঠীন রোহিতৌ
রাজীবাস্তা তথা নেতি ব্যাখ্যান মুনি সম্মতা ॥"

গোবিন্দ রাজের মত মেধাতিথির মতের অনুরূপ। তবেই দেখা যায়, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, শঙ্খ, হারীত প্রভৃতির মতে অধিকাংশ মৎস্যই খাদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং মেধাতিথি, কুল্লুক ভট্ট, গোবিন্দ রাজ, বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণও বিশদ ভাবে ঋষি-মতের ব্যাখ্যা করিয়া মৎস্যের ভক্ষ্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; বিজ্ঞানেশ্বর মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ ইঁহারা কি বাঙ্গালী ছিলেন? শঙ্খ প্রভৃতির সংহিতা কি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছিল? আরও দেখুন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিগ্রহসমর্থ ব্রাহ্মণের পক্ষেও প্রতিগ্রহ পরিত্যাগে বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিয়া মৎস্য প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক বস্তুর প্রতিগ্রহ করিবে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—যথা,

"প্রতিগ্রহ সমর্থোপি না দত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং সতানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ॥
কুশাঃ শাকং পয়োমৎস্যা গন্ধা পুষ্পং দধিক্ষিতিঃ
মাংস শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়ং নবারিব।"

১ অ ২১৩।১৪

মৎস্য গুলি কি তামাসা দেখিবার জন্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন?

ইহার সমানার্থ আরও অনেক ঋষি-বচন দেখিতে পাওয়া যায়, অনাবশ্যক বোধে তাহা উপেক্ষিত হইল। এই সকল প্রমাণের বলে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মৎস্য মাত্রই অভক্ষ্য নহে, প্রত্যুত দেব-পিতৃ-কার্য্যে প্রদেয় বিধায় মাষ মসুর প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য। যদি মৎস্য খাদ্য হয়, তবে নিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধান দাঁড়ায় কোথায়? তাহা এক বার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমাদের শাস্ত্রে সামান্য বিশেষ ভাব বলিয়া একটা কথা আছে; অর্থাৎ সামান্যতঃ নিষেধ হইলে, বিশেষের পক্ষে বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং মৎস্য সামান্যতঃ ভক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং বিশেষ মৎস্য ভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; অতএব প্রায়শ্চিত্ত বিধানও নিষিদ্ধ মৎস্যের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে বালবলভিভুজঙ্গ ভবদেবভট্ট প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডের অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রকরণে বিশেষরূপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ব্যাস সংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "নকুল-মূষিক-সর্প-মণ্ডূক" এবং বিকৃত মৎস্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে—যথা,

"ব্যাসঃ নকুলং মূষিকঞ্চৈব সর্প মণ্ডূক মেবচ
বিকৃতাংশ্চৈব মৎস্যাংশ্চ জগ্ধা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।"

উদ্ধৃত হারীত বচনে ভক্ষ্য জন্তুর আম মাংস ভক্ষণেও ত্রিরাত্রোপবাসের বিধান দেখা যায়—

"ভক্ষ্যানামপ্যাম মাংসরুধিরপ্রাশনে ত্রিরাত্রম্।"

দেবলের মতেও বিকৃত মৎস্য ভক্ষণেই প্রায়শ্চিত্ত।

"মৎস্যাশ্চ বিকৃতানক্রাঃ সর্পশীর্ষা বিলেশয়াঃ"

এই রূপ আরও অনেক মুনি-বচনে নিষিদ্ধ মৎস্য-ভক্ষণে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে, তাহা কামতঃ, অকামতঃ এবং অভ্যাস অর্থাৎ অনেক বার ভোজন এইরূপ বিষয় ভেদে ব্যবস্থা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অনিষিদ্ধ মৎস্য-মাংস ভক্ষণে দোষ নাই, অতএব প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না—যথা,

"অনিষিদ্ধ মৎস্য মাংস ভক্ষণেতু দোষাভাবাৎ
প্রায়শ্চিত্তাভাব এব"।

যদি তাহাই হয়, তবে বৃথা মাংস-ভক্ষণে ছাগলের ঋষি যে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য ত্রিরাত্রোপবাসের বিধান করিয়াছেন, তাহার বিষয় কোথায় হইবে, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, এই সকল প্রায়শ্চিত্ত চতুর্দ্দশী প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিনে মাংস ভক্ষণে বুঝিতে হইবে; কারণ যদি সাধারণতঃই অখাদ্য হয়, তবে তিথি বিশেষে নিষেধ অনর্থক হইয়া পড়ে।

"যত্ত বৃথা মাংসং ন ভোক্তব্যং অতত্র শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি
অভুথা ভক্ষয়ন্ বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেদিতি।

ছাগলেয়েনোক্তং, যদপি মৎস্যাংশ্চ কামতোঽশ্ন্।
সোপবাস স্ত্র্যহং বসেদিতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তং
তৎসর্ব্বং নিষিদ্ধ চতুর্দ্দশ্যাদি বিষয়ম্।"

আর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে,যদি মৎস্যাদির মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ না হয়, তবে মনু মাংসকে অসুরান্ন রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে ভবদেব বলিয়াছেন, মনুর এই বচনে আম মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণ অন্যান্য শাস্ত্রেও আম মাংসই "অসুরান্ন" রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—যথা,

"যচ্চ মনুনোক্তং—

"যক্ষ রক্ষঃ পিশাচান্নং মদ্য মাংসং সুরাসবং
তদ্ব্রাহ্মণেন ভোক্তব্যং দেবানামশ্নতা
হবিরিতি তদপ্যাম মাংসাভি প্রায়েণৈব
আমমাংসস্যৈব রাক্ষসান্নত্বেন নান্যা—
গমেষু প্রসিদ্ধত্বাৎ"।

পূর্ব্বোক্ত হারীত-বচনেও আম মাংস ভক্ষণে ত্রিরাত্র প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহারই বচনান্তরে যুক্তি-যুক্ত অর্থাৎ পক্ক, সশল্ক মৎস্য খাইবার উপদেশ আছে। সুতরাং শল্করহিত, রেখারহিত, বিকৃত, এবং আম মৎস্য ভক্ষণেই নিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মৎস্য দ্বিজাতির সর্ব্বতোভাবে ভক্ষ্য। বিকৃত শব্দে বোধ হয় কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা রক্ষিত লোণা ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য বুঝাইতেছে। এখন দেখা যাউক, মৎস্য যদি সকল দেশের দ্বিজাতির পক্ষেই খাদ্য হয়, তবে বৃহস্পতি পূর্ব্বদেশবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালীকে মৎস্যাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাদের এই দুষ্কার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তের এবং রাজদণ্ডের প্রসক্তি নাই এই কথা বলিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "মৎস্যাশিনোজনাঃ পূর্ব্বে ব্যভিচার রতা স্ত্রিয়ঃ অনেন কর্ম্মণানৈতে প্রায়শ্চিত্ত দমাবহাঃ" এই বচনটি বৃহস্পতির নাম দিয়া "ব্যবহার ময়ূখে" সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা মিতাক্ষরা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই বচন গ্রন্থকারের বিদ্বেষ-মূলক ও উদ্ভাবিত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষাবহ রূপেই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে ভারতের কোন কোন স্থানে এই প্রথা দোষাবহ নহে। ব্যবহার ময়ূখধৃত বৃহস্পতি-বচনের পরবর্ত্তী অংশে বলা হইয়াছে, "ভক্তা-চ্ছাদং প্রদায়ৈষাং শেষং গৃহীত পার্থিবঃ।" এই সকল দুষ্কার্য্যকারীদিগের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রদান করিয়া রাজা ইহাদিগের বিত্তের অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবেন। বচনের পূর্ব্বাংশের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের এবং রাজদণ্ডের অভাব কীর্ত্তন করিয়া শেষ ভাগের দ্বারা সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়াতে বচনটি পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ, বিদ্বেষমূলক বলিয়া বুঝিতে আর বাকী থাকে না।

বচনের পূর্ব্বভাগ মাত্র 'শুক্রনীতিসারে' গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয় দেশান্তরপ্রসিদ্ধ লোক-পরম্পরাপ্রাপ্ত অনার্য্য এই বচন শুক্রনীতিসারে অবিচারিত ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। বচনটি যদি প্রমাণ বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায় তাহাতেও তাহা বাঙ্গালীর মৎস্য ভক্ষণের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হয় না। কিন্তু ব্যভিচাররতা স্ত্রীর এই অংশটি বাঙ্গালার পক্ষে বুঝিতে হইবে না। কারণ, বিশেষরূপে বাঙ্গালীকে মৎস্যাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগের এই প্রথা দোষাবহ নহে এইরূপ কীর্ত্তন করাতে বুঝা যায় যে, শল্করহিত এবং রেখারহিত যে সকল মৎস্য দ্বিজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহাও বাঙ্গালীর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং মৎস্য ভক্ষণে বাঙ্গালীর পাতিত্য দূরের কথা ইহাতে কোন রূপ দোষই হইতে পারে না। স্মৃতি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ ছাড়িয়া, ইতিহাস গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, দেশান্তরবাসী খাঁটি দ্বিজাতির মৎস্য ভক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবন্ধ, রামচন্দ্রকে বলিয়াছিল, "হে রাঘব! তুমি পম্পা সরোবরের রোহিত, চক্রতুণ্ড, নলমীন নামক উৎকৃষ্ট মৎস্যগুলিকে বাণের দ্বারা হত্যা করিয়া লৌহ-শলাকায় ঝলসাইয়া ভক্ষণ করিবে। এই সকল মৎস্য

অরুণ অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট এবং ইহাদের একটি মাত্র কণ্টক বৃহৎ। *

মৎস্য অখাদ্য হইলে রামের প্রতি কখনই এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শিত হইত না; এবং অরুণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতা ব্যঞ্জক বিশেষণ সন্নিবেশেও বাল্মীকির লেখনী হইতে লালা নিঃসরণ হইত না। মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা, মৎস্যাসিকা বিশেষণে ভূষিত হইলেন কেন? (১)

শকারের ভৃত্য আপন মনিবের প্রতি বসন্তসেনাকে প্রলুব্ধ করিতে যাইয়া (২) অন্যান্য ধন দৌলতের উল্লেখ না করিয়া মনিব বাড়ীর মৎস্য মাংসের বাহুল্যে কুকুরে আর মরা খায় না গৌরব সূচক এই কথাই বা বলিতে গেল কেন? এক্ষেত্রে তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে? এই ঘটনার সহিত বাঙ্গালার অথবা বাঙ্গালীর কোনই সংস্রব নাই। নায়কনায়িকা প্রভৃতি সকলই খাঁটি অবন্তী দেশের অধিবাসী। লেখক এক জন বেদবিদ্দিগের অগ্রগণ্য তপোধন প্রমাদশূন্য অশ্বমেধকর্ত্তা সার্ব্বভৌম নৃপতি।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মৎস্য খাইতেই হইবে এমত বিধান হইতে পারে না, কারণ প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে বিধি খাটে না, এবং মৎস্য খাইতেহইলেই মৎস্যের হত্যার অনুমোদন করা হয়, তাহাতে হিংসা জন্য কতক পাপ স্বীকার করিতে হয়; এই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

"ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে,
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

মৎস্য মাত্রই অভক্ষ্য নহে, তাহা দেখান হইল। যাহা পবিত্র খাদ্য বলিয়া অনেকেই ভক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে কোন দোষ আছে কি না, তাহা এক বার দেখা যাউক। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে "দেবতায়, সিদ্ধ (সাজিনা) কৃসর, পায়স, অপূপ (পিষ্টক), লুচী প্রভৃতি ভক্ষণে এবং মৎস্য ভক্ষণে ত্রিরাত্র উপবাস বিহিত হইয়াছে। * ইহার সমানার্থ বচন প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং শূলপানি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে দেবতা পিতৃলোক অথবা অতিথির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয় নাই এমন পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে।

"তেন দেব পিত্রতিথি বর্জ্জং কামতঃ সকৃদ্ মীষাং
ভক্ষণে ত্রিরাত্রম্"

অতএব রুটি চর্ব্বণে যাহারা অভ্যস্ত শাস্ত্রানুসারে তাহারাই প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য। বাঙ্গালীর প্রতি মৎস্য ভক্ষণের দরুণ পাপের আরোপ অজ্ঞতানিবন্ধন। আর্য্যযুগে আমিষ ভক্ষণের বাহুল্য ছিল, সর্ব্বদেশবাসী আর্য্য গণ মৎস্য প্রভৃতি আমিষের দ্বারা দেব-লোকের এবং পিতৃ-লোকের অর্চ্চনা করিতেন এবং যজ্ঞ-শেষ ভক্ষণ করিতেন। জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে অনেক দেশ হইতে আর্য্য প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমিষ ভোজনও নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ঋষিজুষ্ট সরণির অন্যতম পথিক বাঙ্গালীগণই কেবল অদ্যাপি এতদ্বিষয়ে আর্য্য শাস্ত্রানুযায়ী আচার কতক পরিমাণে রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

* রোহিতাংশ্চক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চরাঘব।
পম্পায়া মিষুভির্মৎস্যান্ তত্ররাম! বরান্ হতান্।
নিস্বক্ পক্ষানয়স্তপ্তান্ অকৃশানেক কণ্টকান্॥
রামায়ণ অরণ্য কাণ্ড ৭০ সর্গ ১২।১৩

১। এষা নানক মূষিকাসকর্ষিকা, মচ্ছাশিকা লাশিকা।
মৃ ১ অ

২। লাভেহি অলা অবলহং তো কথা হিশি মচ্ছমংশকম্।
এদেহিং মচ্ছমংশকেহিং শুন আ মলমং ণ শেবন্তি।
মৃ। অ ২৬

* দেবতারং হবিঃসিদ্ধং লোহিতান্ ব্রশ্চনাং তথা,
অনুপাকৃত মাংসানি বিড্জানি কবকানিচ।
তথা—বৃথা কৃসর সংযাব পায়সা পুপ-শস্কুলীঃ
কল বিড্জাবরং কোণং কুররং রজ্জু বালকং
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধা সোপবাস স্ত্র্যহং বসেৎ।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও তাঁহার শ্রীপাট

(চুঁচুঁড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার ভুবন-মঙ্গল গ্রন্থে "বিঘ্ননাশ" ও "অভীষ্ট পূরণ এর" জন্য—

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

বলিয়া যে ছয় জন গৌরগতপ্রাণ ভক্তশ্রেষ্ঠ গোস্বামী পাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যাহার নিয়ম-নিষ্ঠা ও ভজন-সাধনরীতির কথা স্মরণ করিলে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, যাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও অলৌকিক প্রেমভক্তি দর্শনে কলিযুগপাবনাবতার স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যন্তও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সপ্তগ্রাম-মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণপুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীতীরস্থ এই কৃষ্ণপুর গ্রামেই তাঁহার শ্রীপাট বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে "চান্দপুর" বা "চাঁদপুর তাঁহার জন্মস্থান। যথা:—

হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তার॥

* * * *

* * * *

রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন॥

৩য় পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

১৪০০ শকের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণপুরে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুইজন ধনবান জমীদার বাস করিতেন। রঘুনাথ দাস কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র। তাঁহারা কায়স্থ পরিবার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁহাদিগকে "সৎকুলীন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে রঘুনাথ ভক্তি-প্রবণ ছিলেন। ভক্তচূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম মিলনে, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় বার্ত্তা প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া পুলক-বিহ্বল-হৃদয়ে নবদ্বীপচন্দ্রের শ্রীমুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। "প্রভাতী তারা" দেখিয়া মানব-প্রাণ যেমন সূর্য্যদেবের আগমন-প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, "প্রভাতী-তারা"-প্রতিম হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাবেও রঘুনাথ ব্যাকুলভাবে নবদ্বীপ-সূর্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু প্রেমময় দয়াল ঠাকুরের সহিত রঘুনাথের মিলন হইল। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের হৃদয়-নিহিত ভক্তি-নদী উথলিয়া উঠিল।

সংসারে তাঁহার অনাসক্তি ও বৈরাগ্যভাব দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন দাস চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। বলদৃপ্ত জমীদার প্রথমে পুত্রের গৃহত্যাগের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য বহুলোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ভাবিলেন, এ বাঁধন সামান্য, তাই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। এবং এক অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত দিলেন। মনে ভাবিলেন, মায়ার এই অপূর্ব্ব নিগড়ে পুত্রের বৈরাগ্য ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু হায়! যাঁহার প্রেম-প্রবণ হৃদয় সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমাম্বুতে ঝাঁপ দিবার জন্য উন্মাদভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন পার্থিব বন্ধনে কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়?

এক রাত্রিতে সুযোগ পাইয়া রঘুনাথ পলায়ন করিলেন। কিন্তু সন্ধান করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। রঘুনাথের মাতা স্বামীকে বলিলেন,—"রঘু বাতুল হইয়াছে। পায়ে দড়ি দিয়া রঘুকে বাঁধিয়া রাখ।" রঘুনাথের পিতা উত্তর করিলেন—

ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
ঐ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে?

বাস্তবিকই বাঁধিয়া রাখা গেল না। কোন বিশেষ সুযোগ পাইয়া রঘুনাথ এক রজনীশেষে সত্য সত্যই পলায়ন করিলেন। স্নেহময় পিতা-মাতা-পিতৃব্য, অতুল ধন-জন-পরিপূর্ণ গৃহ, বিস্তৃত ভূসম্পত্তি—সর্ব্বোপরি অপ্সরো-বিনিন্দিত রূপলাবণ্যময়ী তরুণী ভার্য্যা—এক কথায় সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলেন। এমনই ভাবে কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ এক গভীর নিশীথে সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্ববিধ প্রলোভন পদদলিত করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। আর একজন এমনই ত্রিযাম যামিনীশেষে 'সাজান সংসার' পরিত্যাগ করিয়া, পতিতের দুঃখ দূর করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পদানুসরণে রঘুনাথ দাস সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি গৃহ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। শেষরাত্রে তিনি পলায়ন করেন। প্রাতে গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার সন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। কৃষ্ণপুর হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা তিনি ছুটিয়াই গিয়াছিলেন।

নীলাচলে গিয়া রঘুনাথ শ্রীপ্রভুর চরণোপ্রান্তে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের দ্বিতীয় স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—

এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহা কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ হইল ইহার নামে॥

রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যাচরণ ও অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জমালা প্রদান করিলেন এবং শিলার সাত্ত্বিক পূজা করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিলেন। অহর্নিশ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-চিন্তায় বিভোর থাকিতেন, আহার-নিদ্রার কথাও তাঁহার মনে পড়িত না। ভিক্ষাবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিলেই হয়। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড সেও নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভূত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥

স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপা ও সাহায্যে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর ভাব-গম্ভীর বিরহোন্মাদ শ্রীচৈতন্যলীলার অন্ত্যখণ্ড বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইল বৃন্দাবন॥

এই বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া তিনি "নিম-সেবা" বা "নিয়ম সেবা" বলিয়া একটী সেবা-বিধি চালাইয়াছিলেন। আজিও তাহা বাঙ্গালার বহু পল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিজয়া-একাদশী হইতে ৺ উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত একমাস কাল ইহা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবেরা প্রথমে কোন একটি মহাজনপদ গান করেন, পরে নিম্নলিখিত অংশটুকু গাহিয়া এই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্মৃতি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে জাগাইয়া দেন—

দাস গোঁসাই রঘুনাথ
গোঁসাই নিয়ম করে দাস গোঁসাই
রঘুনাথ দাস গোঁসাই নিয়ম করে
রাধাকুণ্ডের তীরে বসে' নিয়ম করে

শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে বসে' নিয়ম করে। প্রতি প্রাতে গৃহে গৃহে একমাস কাল এইরূপে নামগান করিয়া বৈষ্ণবেরা এই নিয়ম সেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাস

পূর্ণ হইলে তাঁহার প্রতি গৃহ হইতে গৃহবাসীর অবস্থামত চালদাল পরিপূর্ণ সিধা, বস্ত্র গামছা ও পয়সাদি পাইয়া থাকেন। নন্দোৎসবের দিন গৃহস্থেরা যেমন গৃহাগত কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবের বস্ত্র, খোল ও অঙ্গে হলুদ জলের ছিটা প্রদান করিয়া থাকেন, এ দিনও সেইরূপ করেন।

এই শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য ও অপূর্ব্ব ভজন-সাধনের যে মহিমাময় পরিচয় আমরা পাই, তাহার কিঞ্চিৎ—

অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥

তাহার পর একজন প্রাচীন পদকর্ত্তার পদ হইতে কঠোর বৈরাগ্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার আহার পরিত্যাগের একটী ক্রমিক তালিকা পাই—

রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
সুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥

শ্রীপাটের কথা।

সপ্তগ্রামে,—হুগলীর অতীত-গৌরবের প্রাচীন নগরীর পাদবিধৌতকারিনী সরস্বতী নদীর তীরে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর পাট বিরাজিত। দাস গোস্বামী কৈশোরে এই স্থানে কিছুদিন সাধন ভজন করেন। আজিও এই শ্রীপাটে তাঁহার পিতাপিতৃব্য-প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন ঠাকুর বিরাজিত। সপ্তগ্রামের গৌরবমহিমার সকলই একে একে লোপ পাইয়াছে, কেবল কায়স্থকুল-ভাস্কর রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও সুবর্ণবণিককুলগৌরব উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট দুইটী অতীতের চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ত্রিশবিঘা হইতে ১॥ মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে এই পাট অবস্থিত। শ্রীপাটে যাইবার কোন প্রশস্ত রাস্তা নাই, আম্রকানন বা বনমধ্যস্থ সরু পথ দিয়া শ্রীপাটে যাইতে হয়।

দেবালয়টি পূর্ব্বদ্বারী। সম্মুখেই বিস্তৃত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের দক্ষিণদিকে সেবায়েৎ মহান্ত মহাশয়ের দ্বিতল গৃহ। পশ্চিম দিকে অতিথিশালা, পূর্ব্বে গোশালা। দক্ষিণ দিকে মন্দির-গৃহ, তৎসংলগ্ন দালান এবং দুই পার্শ্বে অন্য দুইটি গৃহ। ইহার একটিতে পাক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং অপরটিতে শ্রীমৎ দাস-গোস্বামীর ব্যবহৃত দেড়ফুট চতুষ্কোণ এক প্রস্তরখণ্ড ও তদীয় ছয় অঙ্গুলি পরিমিত কাষ্ঠ-পাদুকা আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর-আসনে বসিয়া দাস গোস্বামী ভজন সাধন করিতেন। আজিও এই প্রস্তর-আসন ও কাষ্ঠ-পাদুকা সযত্নে রক্ষিত হইয়া অনেক ভক্তের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছে।

পাণ্ডুয়া থানার এলেকাধীন ভট্টাচার্য্য-দমদমা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস মহাশয় শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবাইত।

মন্দির-গৃহটির তিনটি দ্বার। মধ্য দ্বারের সম্মুখেই চতুর্দ্দোলায় দারুনির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজিত। ইঁহাদের নাম রাধামোহন। এই বিগ্রহ দুইটি দাস গোস্বামীর পিতার আমলের। মধ্য স্থলে একটি শালগ্রাম শিলা আছে। রাধামোহন বিগ্রহের বামদিকে অপর একটি চতুর্দ্দোলায় শ্রীগৌরনিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত। কথিত আছে, এই শ্রীপাটের প্রথম মহান্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কর্ত্তৃক এই গৌরনিতাই

মূর্ত্তি দুইটি স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দুইটির আশেপাশে ও কোলের কাছে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাধাকৃষ্ণ, গোপাল ও শালগ্রাম শিলা শোভা পাইতেছে।

রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যু এবং তাঁহার তিরোধানের পর এই স্থানটি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। প্রথম মহান্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, দাস গোস্বামী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুমি আমাদিগের গৃহ-দেবতার স্থান নবাবের কাছ হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক আমার গুরু-পরিবার হইতে বিগ্রহ লইয়া গিয়া সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা কর। স্থান পরিচয়ের জন্য আমি নিদর্শন দেখাইব।'

স্বপ্নানুযায়ী মোহান্ত ঠাকুর নবাব-দরবারে শ্রীপাটের স্থান ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। নবাব কোন প্রকার নিদর্শন ও স্থানটি দেখাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে লোক দিলেন। নবাবের অনুচর সহিত কৃষ্ণকিশোর সরস্বতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব-অনুচর তাঁহাকে স্থান-নির্দ্দেশ করিতে এবং কোন নিদর্শন দেখাইতে বলিলে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে একখানি কর বহির্গত হইল। অনুচর ফিরিয়া গিয়া নবাবকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল। কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরের স্থান এবং কিছু স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। বলরাম আচার্য্যের গৃহ হইতে বিগ্রহ লইয়া আসিয়া একখানি কুটীর বাঁধিলেন এবং তাহাতে সেই বিগ্রহকে সংস্থাপিত করিলেন। সেই সঙ্গে তৎকর্ত্তৃক গৌর-নিতাই এর বিগ্রহও স্থাপিত হইল।

১১০২ সাল (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ) এ ১লা মাঘ উত্তরায়ণের দিন কৃষ্ণকিশোর এক মেলার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তিন নৌকা চাল-ডাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া এই মেলার প্রথম মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। তাই আজিও উৎসবের পূর্ব্বরাত্রে অর্থাৎ অধিবাসের নিশিতে উৎসব-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য

"রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহারাজা,
গোসাই কৃষ্ণকিঙ্কর হে চাল ডাল ভেজো

বলিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণকিশোর মহান্তকে আহ্বান করিতে হয়। ঐ দিন প্রায় ৮।১০ হাজার লোক মেলাস্থলে সমবেত হয়। সরস্বতী নদীর তীরে ও আম্র কাননের মধ্যে উনুন পাতিয়া সকলে রন্ধন করে। কারণ, আট দশ হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। আমরা সম্প্রতি সেই শ্রীপাট দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আম্রকানন মধ্যে ও সরস্বতী নদীর তীরে এখনও উনুনের বহু চিহ্ন রহিয়াছে, দেখিলাম। শ্রীপাটে অনেকগুলি প্রাচীন দলিল, শ্রীপাট সংক্রান্ত উইল এবং বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। উইলগুলি পাঠ করিয়া তাহার মধ্য হইতে মহান্তগণের নিম্নলিখিত ধারাবাহিক তালিকাদি পাইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর গোস্বামী।
শ্রীবিনোদচন্দ্র গোস্বামী।
শ্রীকমললোচন গোস্বামী।
শ্রীস্বরূপদাস গোস্বামী।
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী।
শ্রীনবীনচন্দ্র গোস্বামী।
শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী (বর্ত্তমান মহান্ত)।

তৃতীয় মহান্ত কমললোচনের আমলের এক খানি উইল ও 'খুন্তি' ব্যবহারের অনুমতিপত্র দেখিলাম। পূর্ব্বে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বংশসম্ভূত গোস্বামীগণের অনুমতি ব্যতীত কেহ সংকীর্ত্তনের সহিত 'খুন্তি' ব্যবহার করিতে পারিত না। ব্যবহার করিলে গোস্বামীপাদেরা দণ্ড বিধান করিতেন। খুন্তি ব্যবহারের বা স্বীয় দেবালয়ে খুন্তি রক্ষা করিবার অনুমতি পাইতে হইলে তাঁহাদিগকে কিছু নজরআনা দিতে হইত। মহান্ত কমললোচন ১২২৩ সালের ৭ই ফাল্গুন (১৮১৭ সালের) খড়দহ নিবাসী নবচৈতন্য গোস্বামীর নিকট হইতে খুন্তি রাখিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। ১২০৯ সালে (১৮০৩ খৃঃ) তিনি পূর্ব্বতন মহান্ত বিনোদচন্দ্র গোস্বামীর নিকট হইতে তদীয় উইল-সূত্রে এই শ্রীপাটের মহান্ত-পদ প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় কলুটোলার বিখ্যাত ধনী পরিবারের শীল মহাশয়দিগের কোন ধর্ম্মপ্রাণ মহিলাকর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান 'পাকা' মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। ১২২৫ সালে

২৪শে ভাদ্র (১৮১৯ খৃঃ) কমললোচন স্বরূপ দাসের নামে এই শ্রীপাট উইল করিয়া যান।

বর্ত্তমান মহান্তের পূর্ব্ব মহান্ত নবীনচন্দ্র গোস্বামী বহু দিন এই শ্রীপাটের সেবাইত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ১২৮৩ সালে (১৮৭৭ খৃঃ) শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে শ্রীপাটে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে আহত করিয়া বিগ্রহের সমস্ত অলঙ্কার, টাকাকড়ি ও তৈজসপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। সেই সময় হইতে পাটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি ১২৯০ সালে * (১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই) ৭৫ বৎসর বয়সে এক উইল করেন। সেই উইলের সর্ত্তে বর্ত্তমান মহান্ত এই গদি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীপাটে বহু হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি আছে। পুঁথিগুলির অবস্থা শোচনীয়। অধিকাংশ পুঁথির পাতাগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রণীত একখানি চাটু পুষ্পাঞ্জলি এবং রাধাকৃষ্ণের লক্ষনামামৃত গ্রন্থ এতৎসঙ্গে রহিয়াছে, দেখিলাম।

মন্দিরের পশ্চিমদিকে ক্ষীণকায়া সরস্বতী প্রবাহিতা। ইষ্টকনির্ম্মিত একটি ঘাট আছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, ঘাটটি খুব প্রাচীন। শুনিলাম, মধ্যে একবার সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে। ঘাটের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড বহু প্রাচীন বকুল বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গত ১৩১৩ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্যমে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ সভ্য শ্রীমন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রায় ২৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু তদ্বারা বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। অতিথিশালা ও ঘাটটির সংস্কার বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কায়স্থ-সন্তান হইয়া কায়স্থ-কুলগৌরব শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রেমভক্তির যে অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ গোস্বামীপাদগণের মধ্যেও এক আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার সাধন ভজন ও নিয়মনিষ্ঠার কথা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে বিশেষভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার জন্মে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী সমাজ যে পূত-পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বোপরি বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজ দাস গোস্বামীর আবির্ভাবে যে অপূর্ব্ব গৌরব ও সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। কিন্তু হায়, বাঙ্গালার আধুনিক শিক্ষিত কায়স্থ-সমাজ শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর এই শ্রীপাট ও তাঁহার মেলার বিশেষভাবে উন্নতিবিধান ও স্থায়িত্ববিধানে উদাসীন থাকিয়া এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিটিকে ধ্বংসের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও লজ্জার কথা কি আছে, জানি না।

হুগলী জেলার প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন, এই প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে আপনারা যত্নবান হইয়া শ্রীপাটের সংস্কার কার্য্যে এবং এই মেলাটীর উন্নতিবিধানে অগ্রসর হউন।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

* ১২৯০ সাল ১২৯৮ সাল হইবে না কি? প্র, স,

শাক

সংস্কৃতে শাক শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা যে শাক (নটে, পুঁই ইত্যাদি) খাইয়া থাকি, শাক এ তাহা বুঝায়, এবং আমরা আনাজ বলিলে যাহা বুঝি, তাহাও বুঝায়। 'শাকপার্থিবাদিবৎ' ব্যাকরণের এই সূত্রটা অনেকেই জানেন—এখানে শাকপ্রিয় পার্থিব (রাজা) কেবল নটে শাক, পুঁই শাকই খাইতে ভালবাসিতেন, তাহা নহে; তৎকালের রীত্যনুসারে ক্ষত্রিয়েরা অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এই রাজা মাংসটা তত ভালবাসিতেন না, (vegetables) নিরামিষ আনাজ খাইতে ভালবাসিতেন—ইহাই অর্থ। মহর্ষি চরক 'শাকবর্গ' অধ্যায়ে শাক এবং আনাজ উভয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে 'শাকগুণাঃ' বলিয়া শাক আনাজ উভয়ই বিচার করিয়াছেন।

মহর্ষি চরকপ্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কলিযুগের আরম্ভ মাত্র তাহা রচিত হইয়াছিল, এরূপ আভাষ গ্রন্থমধ্যেই আছে। চরকে তৎকালীন হিন্দুজাতির খাদ্যাখাদ্য ও ব্যবহার-প্রণালীর যে সকল ইঙ্গিত আছে, তাহাতে চরকসংহিতা অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। চরক শাকরন্ধনের যে প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন, এই প্রণালীতে আজও আমাদের দেশে আমরা শাক রাঁধিতেছি। চরক বলেন—

স্বিন্নং নিপীড়িতরসং স্নেহাঢ্যঞ্চ বিশিষ্যতে অর্থাৎ সিদ্ধ করিয়া জল ও রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া তৈল কিম্বা ঘৃতে ভাজিয়া লওয়াই বিশিষ্ট উপায়। আজকালও তাহাই করা হয়। 'বিশিষ্যতে' এই কথা বলায় নিকৃষ্টপ্রণালীও তৎকালে প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। দরিদ্রলোকেরা হয়তঃ তৈল কিম্বা ঘৃত সংগ্রহ করিত পারিত না, অমনিই ভাজিয়া খাইত। চরকে বহুপ্রকার শাক বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক গুলিই বর্ত্তমানকালে অপ্রচলিত অথবা অপরিচিত। পাঠা অর্থাৎ আকণাদি, শুষা অর্থাৎ কালকাসুন্দা, শঠী, মণ্ডুকপর্ণী (থানকুনী), বেত্রাগ্র, কর্কোটক অর্থাৎ কাকরোল, অবল্গুজ (সোমরাজী), পটোল পত্র, শকুলাদনী (কটকী), বাসকপুষ্প, গোজিহ্বা (গোজিয়া) বার্ত্তাকুফল, কুলক (উচ্ছে ?), কর্কশ (কাকুড়), নিম্বপত্র, ক্ষেৎপাপড়া, বামনহাটী, শন, শিমুলফুল, কাঞ্চনফুল, সুবর্চ্চলা শিম, কুমারজীব, কুসুমফল চাকুন্দে, পদ্মমৃণাল, হংসস্পাদ ইহারা এক্ষণে আর শাকরূপে ব্যবহৃত হয় না। কোনকোনটী অন্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কোনটীর কোনও ব্যবহারই নাই। রাজক্ষবক, কালশাক, কুচেলা, বনতিক্তক, শর্ম্মিষ্ঠা, কেবুক, তিলপর্ণিকা, চিল্লিক, কুচিঞ্জক, পত্তুর, আখুপর্ণী, লোট্টাক, বৃকধূমক, লক্ষণা, কুবেবক, যাতুক, শালকাস্তানী, পীলুপর্ণিকা এইসকল শাক বর্ত্তমানে অপরিচিত। পরিচিতের মধ্যে বাস্তুক (বেথো) সুনিষন্নক (শুষণি), কাকমাচি, আমরুল, পুঁইশাক, কাটা নটে, নাড়ী (ডাটা শাক ?) মটর, সূপ্যশাক (কলায়), তুম্বক (লাউশাক) পালক্য (পালং) কলম্ব (কলমী) নালিকা (নালিতা) লোণিকা (নুনিয়া শাক ?) কুষ্মাণ্ডশাক, সর্ষপশাক, ইহাদের নাম চরকে পাওয়া যায়। চরকের মতে—বাস্তুক—ত্রিদোষঘ্ন ও বিষ্ঠাভেদক; সুনিষন্নক—ত্রিদোষনাশক ও সঙ্কোচক; ডাটাশাক ও মটর—কফপিত্তনাশক, তিক্ত, শীতল, পাকে কটু; লাউশাক, পালং, কলমী, নালিতা, নুনিয়া শাক ও কুষ্মাণ্ড শাক—মধুর, শীতবীর্য্য ও বিষ্ঠাভেদক। (কেবল সর্ষপশাক বিষ্ঠামূত্রের রোধক ও ত্রিদোষকারক)। চরক কাকমাচী, আমরুল, পুঁই ও কাটানটের বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন। কাকমাচী—বৃষ্য (বলকারক), ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন (জরাব্যাধিনাশক) ভেদক, কুষ্ঠনাশক, বেশী গরমও নহে, বেশী ঠাণ্ডাও নহে; আমরুল—অগ্নিদীপন, উষ্ণবীর্য্যসংকোচক, রুক্ষরোগ, বায়ুরোগ, গ্রহণী ও অর্শরোগে হিতকর; পুঁই—রসে ও পাকে মধুর, ভেদক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, শীতল, মত্তভানাশক ও কফবর্দ্ধক এবং কাটানটে রুক্ষ, মত্ততানাশক, বিষনাশক, ও রক্তপিত্ত-নাশক, রসে ও পাকে মধুর ও শীতল। দুই একটা শাকের একটু প্রশংসা করিলেও মোটের উপর শাক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শাকংগুরুচ রুক্ষঞ্চ প্রায়ো-বিষ্টভ্যজীর্য্যতি—শাক গুরুপাক, রুক্ষ এবং প্রায়ই জীর্ণ হইতে পেটে স্তব্ধতা ও ভারং বোধ জন্মায়।

দেখা যাইতেছে, চরকের সময়ে বহুপ্রকার শাক লোকে খাইত এবং মহর্ষি চরকের মতে শাক অতি নিন্দনীয় নহে (তাহা হইলে হয়তঃ দুই এক কথা নিন্দাগান করিয়াই ছাড়িয়া দিতেন, অত বিস্তারিত লিখিতে যাইতেন না)। বস্তুতঃ দুই চারিটা প্রশংসনীয়ই বটে।

পরবর্ত্তীকালে শাক অতি হেয় পদার্থের মধ্যে পড়িয়া যায়। পণ্ডিতেরা প্রচার করিলেন—

শাকেষু সর্ব্বে নিবসন্তি রোগা,
রোগ হি দেহস্য বিনাশহেতুঃ
তস্মাৎ বুধৈঃ শাকবিবর্জ্জনঞ্চ কার্য্যং;
তথাম্লেষু ত এব দোষাঃ॥

শাকই সকল রোগের মূল এবং রোগই দেহনাশের কারণ, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন; অম্লেও এই দোষ। কবিরাজেরা সর্ব্বরোগের সাধারণ

বর্জ্জনীয় করিলেন—শাক, অম্ল ও দধি। আর এক পণ্ডিত কথঞ্চিৎ সহৃদয়তা দেখাইয়া পটোল, বেথো, কাকমাচী ও পুনর্ণবা এই চারি শাকের মান রক্ষা করিয়া বাদ বাকী সবগুলিকে অধঃপাতে দিলেন—শাকং সর্ব্বে অচাক্ষুষ্যং অমৈথুন্যমায়েয়ং, ঋতে পটোলবাস্তককাকমাচীপুনর্ণবাঃ— অর্থাৎ পটোল বাস্তুক কাকমাচী ও পুনর্ণবা ব্যতীত সমস্ত শাক চক্ষুর অনিষ্টকারী, রতিশক্তিনাশক ও চলৎশক্তির অহিতকারী।

বাঙ্গালাভাষায়ও শাকের নিন্দা গাহিয়া দুই একটা কবিতা রচিত হইয়া গেল, যথা—

ঘৃতে আয়ু বৃদ্ধি, দুগ্ধে বৃদ্ধি বল,
মাংসে মাংস বৃদ্ধি, শাঁকে বৃদ্ধি মল।

যদিও বাঙ্গালীরা শাকে মল বর্দ্ধন ব্যতীত অন্য গুণ দেখিতে পাইলেন না, শাক ভক্ষণ কিন্তু ছাড়িলেন না। আজও শাক বাঙ্গালীর প্রিয়, প্রাচীনকালেও তাই ছিল। কবিকঙ্কণ কাশীদাস, কৃত্তিবাসের গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন, কিম্বা চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ দেখুন, যেখানেই আহারের বর্ণনা, সেখানেই 'শাকসূপ আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন"। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে আহারের এত উপকরণ বর্ত্তমানেও শাক পরিত্যক্ত হয় নাই। এখনই বা কি? সামাজিক ভোজনে শত ব্যঞ্জন হইলেও শাক (ও সুক্তা) উপস্থিত আছেনই আছেন।

এত নিন্দা সত্ত্বেও শাকের এত ব্যবহার কেন?

প্রচলিত শাকগুলিকে উৎপত্তিভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা পত্রশাক, কাণ্ডশাক ও ক্ষুপশাক।

১। পত্রশাক—যাহার কেবল পত্র শাকরূপে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ শাকেরই কোমল পত্রসহ কোমল কাণ্ডও ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে পত্রশাক না বলিয়া কাণ্ডশাক বলা উচিত। মূলাশাকই বোধহয় পত্রশাকের একমাত্র উদাহরণ।

২। কাণ্ডশাক—পাটুয়া, ডাটা, কচু, মেথি, শুপশাক, কুমড়া, কলমী, সরিষা, ঢেঁকি, বেথো, কাকমাচী, শুষনী, পুনর্ণবা, পুই, নানাজাতীয় নটে ইত্যাদি। ঢেকী ও কচু—এই দুইটীর কাণ্ডই প্রশস্ত ও বিশেষরূপে ব্যবহৃত; সুতরাং এই দুইটীই যথার্থ কাণ্ডশাক।

৩। ক্ষুপশাক—যে শাকের গাছের পত্র কাণ্ড, স্কন্ধ মূল—সর্ব্বাঙ্গ গৃহীত হয়, যথা নটে ও মূলা।

আমরা যাহা খাই, তাহার সার ভাগ জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, অসার ভাগ মলরূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। যে খাদ্যে অসার ভাগ বেশী তাহাতেই মলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে অসার ভাগ কম তাহাতে মল কম হয়। মাংসে অসার ভাগ কম, এই হেতু মাংসভোজী জাতি ও মাংসাশী কুকুর ব্যাঘ্র প্রভৃতির মল ভাগ অতি কম। মাংসযূষে অসার ভাগ মোটেই নাই, এইজন্য কেবল মাংসযূষ পান করিলে মলের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে। আনাজে শাকে অসারভাগ বেশী, তাই শাকান্নভোজী বাঙ্গালী ও তৃণভোজী গো মহিষাদির মল পরিমাণে বহুল। বৃক্ষের কাণ্ডে ও পত্রে সৌত্রিক উপাদানই বেশী; সৌত্রিক উপাদান জীর্ণ করিবার শক্তি মানুষের নাই, এই জন্যই শাক খাইলে মল বৃদ্ধি হয়। পত্রাদির ও বৃক্ষকাণ্ডের সৌত্রিক উপাদান বৃক্ষ যত বড় হয় ততই বাড়িতে থাকে। তরুণাবস্থায় কম থাকে বলিয়া তরুণ পত্র ও তরুণ কাণ্ড শাকে ব্যবহার্য্য। 'শাকের ছা ও মাছের মা' কথাটী বহুদর্শিতারই ফল।

শাকে মলবৃদ্ধি হয় বলিয়া শাক একেবারেই অসার নহে। আমাদের মল মূত্র ঘর্ম্মাদির সহিত রক্তের লবণভাগ অনবরত বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাতে উপাদানহীনতা জন্মিয়া রক্তের যে বিকৃতি জন্মে, তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মে। তাজা আনাজ খাইতে না পাওয়ায় পূর্ব্বকালে দীর্ঘজল-প্রবাসে নাবিকদিগের স্কর্ভি নামক সাংঘাতিক রোগ জন্মিত; তাহাতে প্রতিবৎসর এক ইংলণ্ডেই বহুসহস্রলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শুধু তাহা নহে, লবণের ভাগ কমিয়া গেলে রক্তের অম্লতা জন্মে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহা স্থির হইয়াছে যে, রক্ত বিশেষরূপে ক্ষারধর্ম্মী থাকিলে সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, আক্রমণ করিলেও শীঘ্র ও সহজে রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু রক্ত অম্লধর্ম্মী থাকিলে সংক্রামক

রোগে সহজেই আক্রমণ করে। প্রত্যহ মলমুত্রাদির সহিত রক্তস্থ লবণের যে ক্ষয় হইতেছে, শাক আনাজ ভক্ষণ দ্বারা সেই ক্ষতি পরিপূরিত হয়। শাক ও আনাজ, বিশেষতঃ আনাজের খোসাগুলি-যেগুলি আমরা অবহেলা করিয়া পরিত্যাগ করি, তাহা লবণে পরিপূর্ণ; বিবেচনাপূর্ব্বক পাক করিয়া খাইলে ঐ সমস্ত লবণটুকু আমাদের উদরস্থ হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয় ও রক্তের উপাদানের সমতা রক্ষণ করে এবং গৌণভাবে আমাদিগকে সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করে। গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে জেলখানায় কয়েদীদিগকে এই নিমিত্ত মধ্যে২ শাক খাওয়াইতে হয়। শুধু লবণ নহে, শাকে পুষ্টিকর পদার্থেরও অভাব নাই। বিবেচনা পূর্ব্বক পাক করিয়া খাইলে দেহের পোষণোপযোগী পদার্থ শাকে প্রচুর পাওয়া যায়। সত্য বটে, শাকে বহুল পরিমাণে জল আছে, কিন্তু জল শুকাইয়া পরে শুষ্কশাকের পরীক্ষায় মেদময়, প্রোটীড, (মাংসপাক) কার্ব্বহাড্রেট (তাপজনক) ময় পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়, সঙ্গে ২ প্রচুর লবণ এবং কোনও কোনও শাকে বালুকাও পাওয়া যায়। ডেঙ্গো বা ডাটাশাকে প্রায় ৮০.৯০ ভাগ জল। জলহীন শাকে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ মেদময়, ২৫ ভাগ প্রোটীড্, ৩৫ ভাগ তাপজনক পদার্থ ও প্রায় ২৫ ভাগ লবণ। নটে শাকে প্রায় অর্দ্ধেক জল। জলহীন শাকে ৩ ভাগ মেদময়, ২০ ভাগ প্রোটীড্ ৩৮ ভাগ তাপজনক পদার্থ ও প্রায় ২৫ ভাগ লবণ ইত্যাদি। মোটের উপর, নির্জ্জলা শাকের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পুইশাক, বিটপালং ও পালঙ্কী শাকে মেদোময় পদার্থ খুব বেশী (শতে ৫এর উপর)। পালঙ্কী ও ডেঙ্গো শাকে প্রোটীড খুব বেশী (শতে ২৫এর উপর)। চাপানটে, কাটানটে, বিট-পালং ও বেথো শাকে তাপজনকপদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। লবণ কোনটীতেই ১৭ ভাগের কম নহে, ২৮ ভাগ পর্য্যন্তও আছে (পুইশাক)। মেদোময় পদার্থ বেশী আছে বলিয়া পুই ও পালঙ্কী খাইতে এত সুস্বাদু ও রাঁধিতে এত কম তৈল ঘৃত লাগে। নটেশাক, বেথো ও পালংশাক তাপোৎ-পাদক। প্রাকৃতিক নিয়মে উহারা শীতকালেই ভাল জন্মে এবং শীতকালেই খাইতে ভাল লাগে। পুনর্ণবাশাকে লবণের ভাগ অত্যন্ত বেশী, এইজন্য ইহা মূত্রকারক এবং প্রচুর মূত্র উৎপাদনের জন্য শোথরোগীর পথ্য। ইহার অপর নাম শোথঘ্নী। কুমড়া শাকে চুণের ভাগ বেশী থাকায় রক্তপিত্ত, রক্তস্রাব ও কফরোগে হিতকর। লবণের মধ্যেও একটু বিশেষত্ব আছে। ফস্ফরিক এসিড ঘটিত লবণ খাইলে মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হয়, এরূপ ধারণা অনেক চিকিৎসকেরও আছে। ফস্ফরিক এসিড ঘটিত লবণ লাল ডাটাশাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, চাপানটে ও বেথোশাকে তন্নিম্নে, বিটপালঙ্গে অতিকম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোন ২ শাকে বালু পাওয়া যায়। চাঁপানটে ও পুইশাকে বালু খুব বেশী; এই জন্যই জমি একটু বেলেনা হইলে এই দুইশাক ভাল জন্মে না।

এতদ্ব্যতীত শাকের আরও বহুগুণ আছে। কচু শাক রক্ত পরিষ্কারক বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিখ্যাত; কার্ত্তিক মাসে যে যত কচু শাক খায়, তার গায় নাকি তত বেশী রক্ত জন্মে। কার্ত্তিক মাস গ্রীষ্ম ও শীতের সন্ধিস্থল। ঋতু-সন্ধিকাল দুর্ব্বল লোকের পক্ষে বিপদসঙ্কুল কাল। হঠাৎ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে না পারায় এইকালে যক্ষ্মা রোগীর মুখ দিয়া রক্ত উঠে, সাধারণ লোকের আমাশয়ের পীড়া জন্মে, দুর্ব্বল রোগী ও বৃদ্ধেরা প্রাণত্যাগ করে। এই মাসটা কোনরূপে কাটাইয়া দিবার জন্য চাতুর্ম্মাস্যের সৃষ্টি, বিষ্ণুকে তুলসী দেওয়ার সৃষ্টি। কার্ত্তিক মাসে কচু শাক খাওয়ার বিধির মূলেও এরূপ কিছু থাকিবে। কলমী শাক তিক্ত, বলকারক, হস্ত পদের দাহ-নিবারক। শুষনী শাক খাইলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। ইহা খাইলে ভাল ঘুম হয় বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ইহার একনাম নিদ্রালু; ইহা খাইতে অতি উত্তম। মূলা, সরিষা, কপি প্রভৃতি Cruciferi বর্গীয় আনাজে গন্ধকের অংশ থাকায় মূলা শাক ও সরিষা শাক কোষ্ঠপরিষ্কারক, চর্ম্মরোগ-নাশক ও কফনাশক। আমাদের দেশে কিন্তু সরিষা শাক গ্রাম্য লোকেরই খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। চরক লিখিয়া-ছেন, "সর্ষপশাকং শাকানাং নিকৃষ্টতম ভবতি ইত্যর্থঃ"— শাকের মধ্যে সর্ষপ শাক নিকৃষ্টতম।—

তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানিচ দধীনি
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি॥

ইহা একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক—"নূতন সরিষা-শাক, নূতন চাউলের ভাত ও পিচ্ছল দধি এই সব দ্বারা অল্প পয়সায়, হে সুন্দরি, গ্রাম্য লোকেরা একটু ভাল খাওয়া খাইয়া থাকে"। গ্রাম্য-লোকের উপভোগ্য বলিয়া সর্ষপ-শাককে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, চরক * আমরুল শাকের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন কেন, তাহা আমাদের বোধাতীত। আমরুল শাকে প্রচুর পরিমাণে Oxalic acid থাকে; সেবনে মন্দাগ্নি লোকের Oxaluria রোগ জন্মে এবং নিয়ত সেবিত হইলে পাথুরী রোগও জন্মিতে পারে। ভাগ্যক্রমে শাকরূপে আমরুলের ব্যবহার প্রায় নাই। ছোলা ব্যতীত অন্যান্য সূপ্যশাক অর্থাৎ ডাইলের ডগাশাক মিষ্ট ও মুখরোচক কিন্তু মসূর শাকের প্রতান বা আকুশীগুলি কিছুতেই জীর্ণ বা পাকে কোমল হয় না। ছোলার ডগায় Oxalic acid থাকে সুতরাং ইহার দোষগুণ আমরুলের ন্যায়।

শাক হইতে সার গ্রহণ করিতে বিবেচনা পূর্ব্বক রন্ধন আবশ্যক। চরক লিখিয়াছেন "স্বিন্নং নিপীড়িতরসং স্নেহাঢ্যঞ্চ বিশিষ্যতে" আমরাও তদনুসারে শাক জলে সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া জল ফেলিয়া দেই; সঙ্গে সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় লবণটুকু এবং যে অত্যল্পসারটুকু আছে তাহারও অধিকাংশ ফেলিয়া দেই। অবশিষ্ট নীরস অসার সূত্রময় যে ছিবড়াটুকু থাকে তাহাই গলাধঃকরণ জন্য তৈলে অথবা ঘৃতে ভাজিয়া লই (নতুবা এ শুষ্ক খানবৎ পদার্থ কেহ খাইতে পারিত না)। রন্ধনের দোষে সারভাগ ফেলিয়া অসার ভাগটুকু খাইতেন বলিয়াই প্রাচীনেরা শাকের এত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এক বার জেলখানার শাক রান্ধিয়া শাকের জলটুকু জ্বাল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আধ সের পরিমিত শাক হইতে, মনে হয় যেন ২৮ গ্রেণ (১৪ রতি) লবণ পাওয়া গিয়াছিল। এজন্য জেলখানায় শাক সিদ্ধ জল ফেলিয়া দিবার রীতি নাই, শাক সিদ্ধ লবণময় জলটুকু ডাইলে দিবার নিয়ম। শাকে প্রচুর জল আছে; নিজের জলেই লাউ কুমড়ার মতন শাক সিদ্ধ হইতে পারে। কদাচিৎ একটু জল প্রয়োজন হইতে পারে। শাকের গায়ের জলই হউক কিংবা বাহিরের জলই হউক, শাকের গায়ে শুষাইয়া লইলেই হয়। তারপরে তৈলে ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া যাইতে পারে। হাড়িভরা জল দিয়া সার অংশটুকু বাহির করিয়া সেই জল সারাংশসহ ফেলিয়া দেওয়া অনুচিত। এই নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শাক রাঁধিয়া খাইলে আর অসন্তুষ্ট হইয়া শাকের নিন্দাবাদ করিতে হইবে না।

শ্রীতারকনাথ দেব।

* প্রবন্ধকারের মতে চরক কলিযুগের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে চরক মহারাজ কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। চীনদেশীয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে চরক কনিষ্কের একজন সভাসদ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি ১৯০৯ (সিলভাঁর লেভির প্রবন্ধ), প্র, স।

যথাস্থানে সংস্কার

স্বর্গ হতে ঘুরে এসে বলে বৃষ্টি-জল
ধরা নহে বাসযোগ্য, ধূলাই কেবল।
যাই হোক্ এ যখন জননী আমার
আমারই লইতে হয় সংস্কারের ভার।
পান্থ বলে সাধু কিন্তু মাঠে যাও দাদা।
পথে ধূলো ঘেটে আর করোনাকো কাদা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর বা চন্দ্রসেন

(ঢাকা সাহিত্যপরিষদে পঠিত—ফাল্গুন, ১৩১৯)

দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ভানুগাছ পরগণায় রাজা চন্দ্রসিংহ মতান্তরে চন্দ্রসেনের গড়, দীঘি, যজ্ঞস্থলী এবং ভানুগাছের পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়ে চন্দ্রসিংহের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। নানাদিগদেশ হইতে চন্দ্রসিংহ কর্ত্তৃক আনীত ও স্বরাজ্যে স্থাপিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

বংশধরগণ মধ্যে অনেকে অদ্যাপি ভানুগাছ অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন।

এই স্বনাম-ধন্য নৃপতি কোন্ বংশ সম্ভূত এবং তাঁহার রাজত্বকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থা কিরূপ ছিল এ সকল প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের মনে সতঃই উদিত হইবার কথা; কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের সমাধান কল্পে এখনও যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই।

চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছুই নাই কিন্তু আশার কথা এই যে, তৎসংশ্লিষ্ট জনশ্রুতিগুলি ভানুগাছ অঞ্চলে এখনও বিলীন হয় নাই। কাল-স্রোতে বহু ঘটনাবলীর স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও নানা আকারে রূপান্তরিত চন্দ্রসিংহ-সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীগুলি অদ্যাপি ভানুগাছ অঞ্চলের পল্লীবৃদ্ধগণের মানসপটে উজ্জ্বল।

'নষ্টমুলা জনশ্রুতি' রূপ অবলম্বন যষ্টি ঐতিহাসিকদিগের নিকট সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য নহে। আনুসঙ্গিক ঐতিহাসিক প্রমাণে সমর্থিত হয় না এই রূপ শত শত জনপ্রবাদও প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত আছে। উহাদিগকে সত্যের আসনে স্থান প্রদান করিলে সত্যের মর্য্যাদার লাঘব হয়। সুতরাং চন্দ্রসিংহবিষয়ক অসংলগ্ন জনপ্রবাদ হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ভানুগাছের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চন্দ্রসিংহ ও তৎসমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্মৃতিবিজড়িত কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমান আলোচনায় প্রধান অবলম্বন স্বরূপ সন্দেহ নাই।

এস্থলে লিখিত প্রমাণ বিশেষ কার্য্যকরী হইত কিন্তু চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য লিখিত প্রমাণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। 'বৈদিক সংবাদিনী' গ্রন্থে "চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের" যৎসামান্য বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত লোক পরম্পরায় এই রূপ অবগত হওয়া যায় যে কিছু কাল পূর্ব্বেও দক্ষিণ শ্রীহট্টের স্থান বিশেষে 'চন্দ্রসেন'-নামক একখানা (অধুনা লুপ্ত) পুথি প্রচারিত ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থ বৈদিক সংবাদিনীর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী; কিন্তু এই দুইখানা গ্রন্থেই চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। লুপ্ত গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং বর্ণিত গ্রন্থোক্ত বিবরণ জনশ্রুতিমূলকরূপে নির্দ্দেশ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণগুলিও অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু ব্যক্তি, স্থান অথবা সম্প্রদায় বিশেষের কীর্ত্তি-ঘোষণা-উদ্দেশ্যমূলক এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থের কৃপায় অত্যুক্তিপূর্ণ অথবা কষ্ট কল্পিত অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে ও করিতেছে। যাহা হউক চন্দ্রসিংহ ও তৎসমসাময়িক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ তাহার বিষয়ে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে **পরস্পর বিরুদ্ধবাদী দুইটি মত** প্রচলিত আছে—

(ক) এক মত অনুসারে তিনি বল্লাল সেনের পুত্র শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের জামাতা। তিনি ত্রিপুরা-রাজের এক কন্যাকে অজ্ঞানিতভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত রাণীর প্রকৃত বংশ পরিচয় জ্ঞাত হওয়া মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

(খ) অপর মতে, চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর রাজপরিবার-সংশ্লিষ্ট এক রাজ-কুমার। তিনি ত্রিপুর-রাজের কন্যা বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ এক খণ্ড ভূমি লাভ করিয়া ভানুগাছ-রাজ্য স্থাপন করেন। অতঃপর রাজা গৌরগোবিন্দের এক কন্যাকেও তিনি বিবাহ করেন, এবং কনিষ্ঠা রাণীর মন্ত্রনায় জ্যেষ্ঠা রাণীকে নির্ব্বাসিতা করেন।

প্রত্যেক মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত জনপ্রবাদের অভাব নাই। উহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

প্রথমোক্ত মতের পরিপোষক জনশ্রুতি সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

(ক) 'চন্দ্রসেন' বল্লাল সেনের পুত্র।

(খ) পিতার কোন গর্হিত আচরণে ব্যথিত হইয়া তিনি কতিপয় অনুচর সমভিব্যহারে পূর্ব্বদেশে আগমন করেন।

(গ) বল্লাল সেনের ভয়ে তাঁহার সময়ে শ্রীহট্টে বহু ব্রাহ্মণ-ভদ্রেরও সমাগম হয়।

(ঘ) তিনি তৎকালীন শ্রীহট্টের নৃপতি গৌরগোবিন্দের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করেন।

(ঙ) গৌরগোবিন্দ-প্রদত্ত যৌতুক এক ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

(চ) নিজ পত্নী ভানুমতীর নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম ভানুগাছ নির্দ্ধারিত হয়।

(ছ) সুদীর্ঘ প্রবাসের পর বল্লাল সেন কর্ত্তৃক তিনি বিক্রমপুরে নীত হন।

(জ) তিনি প্রকৃত বংশ পরিচয় অবগত না হইয়াই এক পদ্মিনী কন্যা বিবাহ করেন। কালক্রমে এই রাণী ত্রিপুর-রাজবংশীয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্তা হন।

(ঝ) ব্রহ্মপুত্র-ভয়ে তাঁহার শ্রীহট্টে আগমন সম্বন্ধেও জনশ্রুতি রহিয়াছে।

নিম্নে উপরোক্ত জনশ্রুতি মধ্যে কয়েকটির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইল—

১। বল্লাল সেনের ভয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, বল্লাল সেনের এক পত্নী স্বহস্তে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন পরিবেশনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করার নিমিত্ত স্বপ্নাদিষ্টা হন। বল্লাল সেন পত্নীর এই মনোভিলাষ পূরণার্থে ব্রাহ্মণদিগকে আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। ইহার ফলে জাতিধ্বংশ হওয়ার আশঙ্কায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীহট্টে আগমন করেন। ইঁহাদের আগমন ফলে শ্রীহট্টে এক নব যুগের সূত্রপাত হয়। শ্রীহট্টের অভিজাতবর্গ শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী, অথচ ইঁহাদিগের মধ্যে বল্লালের কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত নাই। বল্লাল সেনের প্রতি ইঁহাদের মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত শ্রীহট্টে সুপরিচিত শ্লোকে ব্যক্ত হইবে—

"মহাপ্রভুশ্চৈতন্য বল্লাল রঘুনন্দন।
লোকানাং ধর্ম্মনাশায় কলেঃপুত্রাঃ চতুষ্টয়ঃ ॥"

২। দীর্ঘ প্রবাসের পর পিতাপুত্রে পুনর্মিলন সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগকালে চন্দ্রসেন স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। একদা এই বিরহ-ক্লান্ত রাজবধূ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার পূর্ব্বক একটি ধান্য সাহায্যে গৃহ-প্রাঙ্গনে "চৌরঃগতেন" ইত্যাদি শ্লোকটি অঙ্কিত করিয়া ভূমি অশ্রুসিক্ত করিতে ছিলেন। দৈব ক্রমে রাজা পুত্রবধূর মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করেন। পুত্র-বৎসল পিতার আগ্রহে এবং দাস জাতির সহায়তায় দীর্ঘ প্রবাসের পর চন্দ্রসেন ভানুগাছ হইতে বঙ্গদেশে নীত হন।

৩। ত্রিপুর-রাজ-কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, একদা মাণিকভাণ্ডার অঞ্চলে ৭ দিন ৭ রাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ফলে দেশ এক রূপ জলপ্লাবিত হয়। এই সময়ে চন্দ্রসিংহ ধলেশ্বরীর (প্রকাশিত ধলাই) স্রোতে কোনও প্লবমান কাষ্ঠপেটিকাভ্যন্তরে একটি পদ্মিনী কন্যা প্রাপ্ত হন। চন্দ্রসিংহ ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কাল ক্রমে এই রাণী সন্তান সম্ভাবিতা হইয়া অনার্য্যগণের মুখরোচক দগ্ধ মৎস্য, লাথাই ধান্যের অন্ন, দগ্ধ মৃত্তিকা ভক্ষণ এবং শৈশবে মাঁচানে প্রতিপালিত হওয়ায় 'টাকর' বা উচ্চ স্থান হইতে পা দোলাইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, রাণী ত্রিপুরা রাজবংশোদ্ভবা, সুতরাং লোকলজ্জাভয়ে চন্দ্রসিংহ কর্ত্তৃক এই রাণী পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন।

৪। চন্দ্রসিংহ সম্বন্ধে প্রচলিত অপর একটি জনশ্রুতি এই যে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মপুত্র-তীরে কোনও এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন তন্মধ্যে ছোট রাণী স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা ছিলেন। তিনি কোনও সন্ন্যাসী হইতে স্বামীর মন পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মন্ত্রপূতঃ বশীকরণৌষধ সংগ্রহ করেন, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্তে উপনীতা হন যে মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটিলে পুরুষের মনোভাব হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং বশীকরণে স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি উক্ত ঔষধ ব্রহ্মপুত্র-

গর্ভে নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মপুত্রের কৃপায় যথাসময়ে এই রাণীর একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তিনি পুত্র সহ নির্ব্বাসিত হন। কাল ক্রমে এই কুমার চন্দ্রসেনের ভগ্নীকে (মতান্তরে পিতৃস্বসাকে) বিবাহ করিবার নিমিত্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। চন্দ্রসেনের পিতা এই প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করায় ব্রহ্মপুত্র নদের ক্রোধে তাঁহার রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় এবং এই ঘটনায় চন্দ্রসেন দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগেও ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত বহু বার পরিবর্ত্তিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছু কাল পূর্ব্বেও ব্রহ্মপুত্র-স্রোত গোয়ালপাড়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহ জিলার বক্ষোভেদ পূর্ব্বক ভৈরব-বাজারের নিকটে মেঘনাদে পতিত হইত। বর্ত্তমানে এই পুরাতন প্রবাহের গৌরব অস্তমিত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত জনশ্রুতি ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের কোনও পরিবর্ত্তন-স্মৃতি জীবিত রাখিয়াছে।

উপরোক্ত জনপ্রবাদ সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ-কল্পে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী জনশ্রুতি সমূহ এবং তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে সত্য নির্দ্ধারণের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে সন্দেহ নাই।

জনশ্রুতি সমূহের আলোচনা—

বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে ৬০৪ ত্রিপুরাব্দে (?) অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ সুধর্ম্মফা (?) কনোজ হইতে আগত নিধিপতি নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অরণ্যে পরিণত 'চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের' রাজ্য সংযুক্ত এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ইহার নিদর্শন স্বরূপ একখানা (অধুনা লুপ্ত) তাম্রফলকের নিম্নোদ্ধৃত প্রতিলিপি স্থান পাইয়াছে—

ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রী শ্রীযুক্ত স্বধর্ম্মপাঃ
সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলায় তপস্বিনে
শ্রীনিধিপতি বিপ্রায় বাৎস্য গোত্রায় ধর্ম্মিণে
প্রাচ্যাং লংলাই কুকি-স্থানং প্রতিচ্যাং গোপলা নদী
চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরস্ত দক্ষিণস্তামরণ্যাবং
ক্রোশিরা নদ্যান্তরস্যাং প্রাগ্দত্ত স্থান মেবহি
এতন্মধ্যা সশস্যা বা মন্নকূল প্রদেশিনী
সোঽপি প্রদত্তা তস্মৈ তৎ বৈদিকায় তপস্বিনে
শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ায়াং দিনে মেষগতে রবৌ
চতুঃষষ্ঠী শতাব্দেতু ত্রৈপুরে দত্ত পত্রিকা॥

বর্ণিত তাম্রলিপি আলোচনায় দৃষ্ট হইবে যে—

১। চন্দ্রসিংহ নামধেয় একটি রাজা পূর্ব্বকালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভানুগাছ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন।

২। কাল ক্রমে তাঁহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়।

৩। তিনি ত্রিপুরবংশীয় ছিলেন।

৪। সুধর্ম্মফা নামে এক রাজা ত্রিপুরায় রাজত্ব করিতেন।

৫। তৎকালে নিধি-পতিনামক এক জন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় আগমণ করেন।

৬। তিনি বাৎস্য গোত্রীয় ছিলেন।

৭। তাঁহার নিবাস কনোজ ছিল।

৮। তাঁহার সময়ে চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের রাজ্য অরণ্যে পরিণত ছিল।

৯। ত্রিপুরা-রাজ নিধিপতিকে এই ভূখণ্ড প্রদান করেন।

১০। এই ঘটনা ৬০৪ ত্রিপুরাব্দ বা ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

১১। ত্রিপুরার কোনও রাজা কর্ত্তৃক উক্ত ভূখণ্ড পূর্ব্বেও এক বার প্রদত্ত হইয়াছিল।

বৈদিক সংবাদিনী প্রদত্ত তাম্র ফলকের প্রতিলিপি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কি না যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে। যাহা হউক শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রধান মুখপত্র যে চন্দ্রসিংহকে ত্রিপুর আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ চন্দ্রসিংহ বল্লাল-তনয় হইলে তাঁহাকে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ-সমাজ অকারণে এ রূপ ভাবে ত্রিপুর আখ্যায় অভিহিত করিতেন না।

বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে কেবল মাত্র তৎসংশ্লিষ্ট সেন উপাধির ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে বল্লাল-তনয় অথবা বৈদ্য-বংশ-সম্ভূত এ রূপ স্থির করিবার কোনও কারণ নাই। 'ভীমসেন কুলোদ্ভব' এই কিংবদন্তীর ফলে ত্রিপুরগণের অপর শাখা, কাছাড়ীগণের রাজমালায়ও সেন উপাধির আধিক্য দৃষ্ট হয়। একাধিক কাছাড়ী রাজকুমারের ত্রিপুর-রাজ-বংশে বিবাহ ক্রমে ত্রিপুরা ভূমে রাজ্য স্থাপনের কিংবদন্তী ও প্রচারিত আছে।

এমত অবস্থায় চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের নাম সংশ্লিষ্ট সেন উপাধি, ত্রিপুরার অধিকার মধ্যে তাঁহার রাজ্য লাভ, ত্রিপুরার রাজকন্যা বিবাহ এবং রাজধানী স্থাপনের উপযুক্ত সমতল স্থান থাকিতেও ভানুগাছের পূর্ব্বের পাহাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করায় তাঁহাকে ত্রিপুর অথবা তদনুরূপ রাজবংশীয় কুমার রূপে নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইবে না।

পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাণী-সংশ্লিষ্ট জল-প্লাবন ও লাঞ্ছনা-কাহিনী, ভানুগাছ রাজ্যের উৎপত্তি ও নামকরণ এবং চন্দ্রসিংহের সহিত বল্লাল সেন ও গৌর-গোবিন্দের উল্লেখ বড়ই সন্দেহ জনক। এই সকল জনশ্রুতির মূলে চন্দ্রসিংহ ও গৌর-গোবিন্দ এতদুভয়কে সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু রূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না অনুধাবন যোগ্য।

অনার্য্য রাজগণ ব্রাহ্মণ ও ভদ্র-পরিবেষ্টিত হইলে আশ্রিতবর্গের কৃপায় তাঁহাদের প্রকৃত বংশ পরিচয়ের বিলোপসাধন এবং সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বংশাবলী প্রণয়ন ইতিহাসে বিরল নহে।

চন্দ্রসিংহ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ-ভদ্র-পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং সযত্নে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিজ রাজ্যে স্থাপিত করিতেন। ইহাদের বংশধরগণ চন্দ্রসিংহকে অনার্য্য রাজা বলিয়া প্রচার করিতে গৌরব অনুভব করিবেন কিনা সন্দেহ স্থল।

চন্দ্রসেনের রাজ্যের অন্তর্গত ভূমি বর্ত্তমানে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ তদ্বংশীয় চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের অধিকৃত ভূমি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্রিটীশ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। সামান্য একখণ্ড ভূমি লাভের নিমিত্ত ত্রিপুরা-রাজ চন্দ্রসিংহকে নিজ বংশীয় রূপে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক অভিযোগ উপস্থাপিত করিবেন এরূপ ভাবিবার কোনও কারণ নাই। যাহা হউক ত্রিপুর-রাজ চন্দ্রসিংহকে ত্রিপুর বংশীয় রূপেই প্রচার করিতেছেন।

বৈদিক সংবাদিনী হইতে নিধিপতি ও স্বধর্ম্মফা বিষয়ক বিবরণ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে নিধিপতির ৫৫৩ বৎসর পূর্ব্বে আদিধর্ম্মফা এবং পঞ্চ বৈদিক সংক্রান্ত ৫১ ত্রিপুরাব্দে (৬৪১ খৃঃ) প্রদত্ত, অপর একখানা তাম্র ফলকের নিম্নোদ্ধৃত পাঠও স্থান পাইয়াছে—

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপাঃ
সমাক্রং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥
বৎস্য ব্যাৎস্য ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষত্তমাঃ॥
প্রতিচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা নদী
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাস্কলা কৌকিকা পুরী॥
এতন্মধ্যাং সশস্যা যা টেঙ্করী কুকি কর্ষিতা
প্রালভ্য দত্তা তদ্ভূমি স্তেষু পঞ্চ তপস্বিষু॥
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে
ত্রিপুরা চন্দ্র বাণাব্দে প্রদত্তা দত্ত পত্রিকা"॥

বৈদিক সংবাদিনী প্রদত্ত উদ্ধৃত পাঠ হইতে অবগত হওয়া যায় যে,

১। ৫১ ত্রিপুরাব্দে বা ৬৪১ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র ভানুগাছ নহে, বরাক ও কুশীয়ারা নদী পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চল ত্রিপুররাজের অধিকৃত ছিল।

২। তাৎকালিক ত্রিপুরারাজ আদিধর্ম্মফা (?) শ্রীনন্দ, আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে মিথিলা হইতে যজ্ঞ-সম্পাদনার্থ নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন। বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক বৈদিক সমাজে প্রচলিত অপর এক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আদিধর্ম্মফা প্রয়াগ তীর্থে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দিগের কৃপায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ

করেন; অতঃপর ত্রিপুর-রাজধানীর অদূরে, জয় পর্ব্বতের পাদদেশে মনু নদীর তীরে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।

৩। যজ্ঞাবসানে ত্রিপুরা-রাজ উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভানুগাছ সহ এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রদান করেন।

৪। তৎকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে ভদ্র লোকের বাসস্থান ছিল না, তথায় এক অনার্য্য জাতির বসবাস ছিল। ইহারা 'কচাক' এই আখ্যায় অভিহিত হইত অন্যত্র এই রূপ অবগত হওয়া যায়।

৫। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মৈথিল আনন্দ এবং ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনৌজ হইতে আগত নিধিপতি ত্রিপুরা-রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমি লাভ করেন।

৬। তদুভয়ের মধ্যে ৫৫৩ বৎসর ব্যবধান রহিয়াছে। বর্ণিত তাম্রফলকের অনুলিপি জনশ্রুতি মূলক এবং আংশিক ভাবে কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটি দেশব্যাপী বিশ্বাসের সমর্থন করিতেছে।

উপরোক্ত ত্রিপুরাধিকৃত স্থানে বৈদিকগণের আগমনের পরে এবং নিধিপতির শ্রীহট্ট আগমনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান রাজবাড়ী (সিলেট-কুলাউরা লাইনে) ষ্টেশনের সন্নিকটে এক অজ্ঞাতকুলশীল রাজবংশের শতাধিক বর্ষব্যাপী রাজত্ব সম্বন্ধে তদঞ্চলে কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত দেখা যায়। তদনুসারে উপরোক্ত রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত নৃপতি ছিলেন। কাল ক্রমে ইঁহারা ত্রিপুরার অধীনতা পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হন। ঘটনা ক্রমে ত্রিপুরা-রাজগণের সহিত ইহাদের বিরোধ ঘনীভূত হইল। বহু যুদ্ধের পর ত্রিপুরা-রাজ অতর্কিত ভাবে রাজপুরী অবরোধ করেন। ত্রিপুরা সৈন্য কর্ত্তৃক ধন-জন সহ রাজপুরী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। এইরূপে কুশীয়ারা নদী পর্য্যন্ত জনপদ পুনরায় ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত হয়। রাজবাড়ী ষ্টেশনের নিকটস্থ ভাটেরা 'টীলায়' প্রাপ্ত তাম্রফলক দ্বয়ে * গগনস্পর্শী শিব এবং বিষ্ণু মন্দির, বিশাল রণপোতের বহর এবং পূর্ব্বভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিবরণ ও ঈশান দেব এবং কেশব দেবের কীর্ত্তি কাহিনী অত্যুক্তি পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত না হইলে ইহারা সমতট রাজবংশীয় রূপে অনুমিত হন যাহা হউক এই রাজবংশীয় গণের ও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে ভানুগাছ অঞ্চল অধিকারের কোনও প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যায় না।

গৌরগোবিন্দের রাজ্য ও কুশীয়ারা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ার কোনও প্রমাণ নাই। কুশীয়ারা নদী ও ভাটেরার বহু উত্তর পশ্চিমে ভানুগাছ অবস্থিত। সুতরাং গৌর গোবিন্দের কন্যা বিবাহ ব্যাপার সম্ভবপর হইলেও এই সূত্রে চন্দ্রসিংহের রাজ্য শাসন বিষয়ক জনশ্রুতিগুলি কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

চন্দ্রসিংহবিষয়ক জনশ্রুতি বিচারে বঙ্গ ইতিহাসের সম্পর্কিত ঘটনাবলীর যৎসামান্য আলোচনা কার্য্যকরী হইবে সন্দেহ নাই। বল্লাল সেন বঙ্গাধিপ বিজয় সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। সমতট বঙ্গে সেন বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পরাক্রান্ত বর্ম্ম বংশ রাজত্ব করিতেন। বল্লালমাতা বিলাস দেবী উক্ত বর্ম্ম-রাজবংশের দুহিতা। কেহ কেহ বলেন বল্লাল সেন বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং ব্রহ্মপুত্র নদের কৃপায়ই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ উক্তি ব্যক্তি বিশেষের বল্লালবিদ্বেষের পরিচায়কও হইতে পারে যাহা হউক চন্দ্রসিংহ সংক্রান্ত জন প্রবাদের গতি অন্যরূপ।

রণ নিপুণ বিজয় সেন নবার্জ্জিত সমতট রাজ্যের রাজধানী রামপাল নগরে এক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সেন বংশের রাজগণ-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আদিশূর এই গৌরব জনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বিক্রমপুরে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত আছে।

প্রথমতঃ বল্লাল সেন মাতামহ রাজ্য এবং কালক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশে নিজ অধিকার বিস্তার করেন। রাজ্যেসুসংস্থাপিত হইয়া তিনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি তান্ত্রিক হিন্দু ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতান্ত্রিকতা এবং হীনজাতীয় স্ত্রী-সাধনা ও

---

(১) ডাক্তার মিত্র ভাটেরা তাম্র ফলকের সময় ১৩শ শতাব্দী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিপিগঠন দৃষ্টে ১০ম শতাব্দী, এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক খৃষ্ট পূর্ব্বার্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন!

এক সময়ে তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই রূপ অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন আভি-জাতবর্গ এবং শৈব প্রজাবৃন্দ বল্লালের তান্ত্রিকতা ও সমাজ সংস্কার ব্যাপারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ রাজসংসর্গ অধর্ম্মকর ভাবিয়া দেশত্যাগী হন। এই উপলক্ষে ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে দত্ত বংশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ময়মনসিংহে বাস নির্ব্বাচন করেন। শ্রীহট্টেও এই কারণে ভদ্র সমাগম হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ১১৪০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৮০ বৎসর বয়ক্রম কালে বল্লাল সেনের মৃত্যু হয়। ১০২৯ খৃঃ তাহার পুত্র লক্ষণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রসিংহ নামক তাঁহার কোন পুত্রের বিবরণ পাওয়া যায় না এবং চন্দ্র সিংহের পক্ষে দীর্ঘ প্রবাসের পর বল্লাল সেনের সহিত মিলন কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে * শ্রীহট্টের রাজা গৌর গোবিন্দ মুসল-মানদিগ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইঁহাদের মধ্যে যে ৩০০ বৎসর কাল ব্যবধান রহিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বল্লাল পুত্রের পক্ষে গৌর গোবিন্দ দুহিতার পাণিগ্রহণ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে চন্দ্রসিংহ বল্লালের বহু পরবর্ত্তী ভিন্ন বংশীয় রাজকুমার রূপে প্রতিপন্ন হইলে এই সুপরিচিত বিবাহ কাহিনী অপকৃত না ও হইতে পারে।

বৈদিক সংবাদিনী, বৈদিক পুরাবৃত্ত ও ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি সমূহ গৌর গোবিন্দকে ব্রাহ্মণ নৃপতিরূপে পরিচিত করিতেছে। চন্দ্রসিংহের বংশ সম্বন্ধে মতভেদ দুষ্ট হইলে কোনও জনশ্রুতি কিম্বা লিখিত প্রমাণও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ নৃপতি রূপে পরিচিত করে না। এমতাবস্থায় হয় তৎকালে বৌদ্ধ প্রভাবে শ্রীহট্টে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল অথবা গৌরগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নৃপতি ছিলেন না এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হইলে গৌর গোবিন্দ ও চন্দ্র সিংহকে কাছাড় রাজ গোবিন্দ নারায়ণের ন্যায় দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ত্রিপুর বা তদনুরূপ বংশীয় কোনও রাজারূপে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না।

চন্দ্রসিংহের বিবাহ—ত্রিপুর রাজ কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতাবলম্বী জনশ্রুতি এই যে—চন্দ্রসিংহ, ত্রিপুর রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট একটী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার এক রাজকন্যা বিবাহক্রমে ত্রিপুরার সীমান্তবর্ত্তী বর্ত্তমান ভানুগাছ অঞ্চলে এক ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। ত্রিপুর রাজকন্যার গর্ভে ভদ্রসেন নামে তাঁহার এক পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে অতঃপর গৌরগোবিন্দের এক কন্যাকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কালক্রমে শেষোক্ত রাণীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পাছে ভদ্রসেন সিংহাসন লাভ করিবে এই ভয়ে কনিষ্ঠা রাণী অধীরা হন। তাঁহার কুপরামর্শে ত্রিপুরারাণী পুত্র কন্যা সহ পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। চন্দ্রসিংহ সমসেরনগর রেল ষ্টেশনের সন্নিহিত 'ভাদাইর দেউল' ও 'সতিন ঝিউর গাঁও' নামে বর্ত্তমানে পরিচিত দুইটী গ্রাম কনিষ্ঠা রাণীর সম্মতি অনুসারে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ও পুত্র কন্যার বসবাসের জন্য নির্দ্ধারণ করেন। এই স্থানেই ত্যাজ্যপুত্র ভদ্রসেন বা ভাদাই বিবিধ মল্লক্রীড়ায় বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এস্থলে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক প্রতিপত্তি স্থাপন প্রয়াসেই ত্রিপুরা রাণীর লাঞ্ছনা কাহিনী রচিত হইয়াছে কিনা অনুধাবন যোগ্য।

ভানুগাছ নামের উৎপত্তি—

"ভানুমতি যৌতুক হেতু ভানুগাছ নাম" এই প্রবাদ বচনের ঐতিহাসীক মূল্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যৎ কিঞ্চিৎ

* গৌর গোবিন্দ এবং সাহজালাল এতদুভয়ের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'তোয়ারিখে জালালী' অনুসারে সাহজালালের শ্রীহট্ট বিজয় ৫৬১ হিজরা বা ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হয়। দত্ত বংশাবলী গ্রন্থে ১১শ শতাব্দীর চক্রপাণি দত্ত গৌরগোবিন্দের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে শ্রীহট্টের সাহজালাল ও গৌরগোবিন্দ কাহিনী, পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। বাবা আদম ও দ্বিতীয় বল্লাল কাহিনীর প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ডাক্তার হাণ্টার ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলে সাহজালালের সময় ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দরূপে নির্দ্ধারিত করিতেছেন। প্রবন্ধ লেখকের মতে ইহাই সাহজালালের প্রকৃত সময়।

আলোচিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য হইতে গৌর গোবিন্দ কর্ত্তৃক ভানুগাছ পূর্ব্বে অধিকৃত না হইলে তাঁহার পক্ষে ভানুগাছ রাজ্যের অন্তর্গত ভূমি যৌতুক দেওয়া অসম্ভব। গৌর গোবিন্দের ভানুগাছ বিজয় সম্বন্ধে জনশ্রুতি পর্য্যন্ত নীরব; বস্তুতঃ তাঁহার রাজ্য কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে ত্রিপুরার অন্তর্গত গৌরগোবিন্দ কর্ত্তৃক বিজীত এক ভূখণ্ডে, চন্দ্রসিংহকে ত্রিপুরারাজ দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত নিরূপদ্রোবে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন এরূপ মনে করাও যুক্তি যুক্ত নহে।

ইদানিক কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন* যে নিধিপতি বংশীয় শুভরাজ খাঁর পুত্র ভানুনারায়ণের নামানুসারে ভানুগাছ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উক্তি ভানুগাছের অতীত ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞাত। ভানু নারায়নের রাজ্য ইটা পরগণায়ই নিবদ্ধ ছিল ইহা দক্ষিণ শ্রীহট্টে একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত।

ভানুগাছ প্রাচীন কাল হইতে "মৈনকুল" অর্থাৎ মনুনদীর তীরবর্ত্তী জনপদ এবং ভানুকচ্ছঃ এই উভয় নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভানুকচ্ছঃ হইতে ইহার নাম ভানুগাছ হইয়াছে। পুরাতন কাগজ পত্রে এবং প্রাচীন লোক মুখে এখনও ভানুকচ্ছঃ নামের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এস্থলে তদ্দেশীয় বড়কাচ, সিঙ্গরকাচ, উত্তরকাচ, দক্ষিণকাচ প্রভৃতি স্থানের নামের সহিত জড়িত "কাচ" প্রত্যয় শ্রীহট্টে কুকি কচাক প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব বসবাস সুচনা করিতেছে কি না অনুধাবন যোগ্য।

একমাত্র দক্ষিণ শ্রীহট্টেই হাঙ্গলা, লংলাই, দলই, কানী ভানাই প্রভৃতি বিভিন্ন কুকী বা কচাক দলপতিগণের অধিকৃত ছিল এবং ইহাদের নামানুসারেই হাকালুকি, লংলা, ডলা, কানীহাটী, ভানুগাছ প্রভৃতি জনপদের নামাকরণ হইয়াছে এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে।

চন্দ্রসিংহের সময় নিরূপণ—

১। চন্দ্রসিংহের নাম গৌর গোবিন্দের নামের সহিত জড়িত।

২। চন্দ্রসিংহ জনশ্রুতি মধ্যে মুসলমানদিগের সামান্য উল্লেখও নাই কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ভানুগাছ অঞ্চলে মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহাতে তিনি গৌর গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হন। বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপনের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

৩। চন্দ্রসিংহের অব্যবহিত পরে ভানুগাছ রাজ্যে বানীপণ্ডিত ও রঘুপণ্ডিত নামে দুইটী ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন। বানী গাউ ও বানীর দীঘি এখনও ভানুগাছের অন্তর্গত মঙ্গলপুরের নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত বানী ঠাকুর ত্রিপুরা রাজ ধর্ম্মমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৪০৭—১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ) নির্দ্দেশে বঙ্গ ভাষায় রচিত ত্রিপুর রাজ মালার অন্যতম রচয়িতা এইরূপ অবগত হওয়া যায়। উপরোক্ত কারণে চন্দ্রসিংহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

চন্দ্রসিংহ সংশ্লিষ্ট বৈদিক সংবাদিনী বিবরণ ও জনশ্রুতি সমুহের ঐতিহাসিক মুল্য :—

১। বৈদিক সংবাদিনী অনুসারে শ্রীনন্দ আনন্দ প্রভৃতি হইতে নিধিপতির সময়ে ৫৫৩ বৎসর ব্যবধান রহিয়াছে।

২। নিধিপতি কনোজ হইতে কিন্তু আনন্দ মিথিলা হইতে ত্রিপুরায় আগমন করেন উক্ত গ্রন্থে এইরূপও বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য গীতি ও নিধিপতিকে কনৌজী ব্রাহ্মণ রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। যথা—

"কনুজ হইতে আইল দ্বিজ নাম নিধিপতি
মুখ হইতে অগ্নি আনি দিলেক আহুতি॥
নিধিপতি মহাশয়ের বংশে নাহি অন্ত
যার বংশে বেরিয়াছে পৃথিবী পর্য্যন্ত॥
কতেক সন্ন্যাসী আর কতেক কাশীবাসী
কতেক গৃহস্থ আর কতেক উদাসী॥" গ্রাম্য গীতি।

৩। উপরোক্ত গ্রন্থের কৃপায় মিথিলা হইতে আনন্দের ত্রিপুরায় আগমনের ৫৫৩ বৎসর পরে কনৌজাগত নিধিপতি আনন্দের বংশোৎপন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। বৈদিক পুরাবৃত্ত নিধিপতিকে আনন্দের অধঃস্তন ৭ম

* শ্রীহট্টের ইতিপূর্ব্বে ৭ম অধ্যায় ১৩৫ পৃষ্ঠা।

পুরুষের মধ্যে নির্দ্দেশ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই!

আনন্দ ও নিধিপতি এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান কাল বিস্মৃত হইয়াই সম্ভবতঃ নিধিপতি বংশীয়গণের উত্থান কালে এইরূপ অপ্রকৃত বিবরণ রচিত হইয়া থাকিবে।

৪। বৈদিক সংবাদিনী ধৃত তাম্রফলক পাঠে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের রাজ্য অরণ্যে পরিণত হওয়ার বিবরণ স্থান পাইয়াছে। চন্দ্রসিংহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভানুগাছে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন ইতি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কথিত তাম্রলিপি প্রচারিত বিবরণ অন্ততঃ আংশিক ভাবে কৃত্রিম। এবং তর্কচ্ছলে মূল তাম্রফলকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও চন্দ্রসিংহের পুত্র ভদ্র সেনের সময়ে ভানুগাছ রাজ্য বিধ্বস্ত ও জন মানবহীন হইবার পর বৈদিক-গ্রন্থে উহার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নকল স্থান লাভ করিয়াছে।

৫। ত্রিপুরা ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পিতার মৃত্যুকালে ত্রিপুররাজ ধর্ম্মমাণিক্য (১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ) বারাণসীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কৌতুক নামে কনৌজবাসী এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অপর কয়েটি ব্রাহ্মণ তৎসহ ত্রিপুরায় আগমন করেন। ধর্ম্মমাণিক্য উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নিধিপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৈদিক গ্রন্থে নিধিপতি ত্রিপুরা-রাজ স্বধর্ম্মফা হইতে এক খণ্ড ভূমি লাভ করিয়াছিলেন এই রূপ উক্ত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজমালায় স্বধর্ম্মফা নামীয় কোন রাজার নামে ল্লেখ নাই। নিধিপতি বংশাবলী আলোচনায় স্বধর্ম্মফা ধর্ম্মমাণিক্য কি না দেখা আবশ্যক। এই আলোচনায় দৃষ্ট হইবে যে, পাঠান বীর খাজে ওসমান কর্ত্তৃক বিজিত রাজা সুবিদনারায়ণ, নিধিপতির পর নবম পুরুষের লোক এবং সুবিদনারায়ণের পর বর্ত্তমানে ১০।১১ পুরুষ চলিতেছে। প্রতি পুরুষে ২৮ বৎসর অর্থাৎ ৩½ পুরুষে শতাব্দী গণনায় (১৯১৩—১৮ × ২৮.= ১৪০৯) নিধিপতি, ধর্ম্মমাণিক্যের সমসাময়িক রূপে, এবং সুবিদনারায়ণ ও খাজে ওসমান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক রূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। "একবাল নামা জাহাঙ্গীরই" গ্রন্থে বর্ণিত ১৬১২ খৃঃ লাঘাটা তীরে, ওসমানের পরাভব কাহিনী, * বর্ত্তমান আলোচনায় উল্লেখ যোগ্য। ইহাতে নিধিপতি ও সুবিদনারায়ণের সময় নির্দ্দেশে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই।

৬। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ নিধিপতির প্রকৃত সময়। এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ নির্ভর যোগ্য নহে। যাহার একাংশ নির্ভর যোগ্য নহে তাহার অপরাংশ সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং বৈদিকদিগের আগমন কাল যে ৬৪১ খৃষ্টাব্দ এবং আদি ধর্ম্মফা নামক কোনও ত্রিপুরার রাজা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।

চন্দ্রসিংহের রাজ্য বিস্তৃতি—চন্দ্রসিংহের রাজ্য বিস্তৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা হইতে উত্তরে মুন্সীবাজারের নিকটস্থ ফরকা নদী এবং কানিহাটী হইতে পশ্চিমে চাউতলী বালিশিরা পাহাড় পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভানুগাছস্থিত আদম পুরের পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়ে বর্ত্তমান কাঠাল কান্দি নামক স্থানে চন্দ্রসেনের রাজধানী ছিল। কথিত আছে চন্দ্রসিংহের পূর্ব্বে তাহার রাজ্যে ভদ্রলোকের বসতি অতি অল্পই ছিল, এবং তাহার সময় ভদ্রপল্লী স্থাপিত হইতে থাকে। তাহার রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রায় উপাধি ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে এই উপাধির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকিবার কথা।

চন্দ্রসিংহের যজ্ঞ—প্রাচীন রাজগণ সুযোগ পাইলেই বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তৎসাহায্যে আত্মপ্রাধান্য ঘোষণা করিতেন। এই প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বকালে সর্ব্বদাই হইত। একদা রাজ্যে অন্ন-ক্লেশ উপস্থিত হইলে

* "দক্ষিণ শ্রীহট্টে পাঠান বীর খাজে ওসমান" নামক অপর প্রবন্ধে এই যুদ্ধ কাহিনী বিবৃত ভাবে আলোচিত হইবে। লিখক।

ভানুগাছ পরগণার মঙ্গলপুর গ্রামে চন্দ্রসিংহ ও অন্নপূর্ণা নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞাবশেষে যজ্ঞ সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট অন্নপূর্ণা বা মহামায়া দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে। এই দীঘির তীর হইতে যজ্ঞের ঘৃত প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত যে নালা খনিত হয় তাহা অদ্যাপি হোমের 'জান' নামে পরিচিত। যজ্ঞাবসানে চন্দ্রসিংহ এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যেন অন্নপূর্ণা সদা বিরাজ করেন। তদবধি শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে "ভানুগাছ অন্নপূর্ণার দেশ" রূপে পরিচিত এবং নিম্নোক্ত প্রবাদের প্রচলন—

"চন্দ্রসেন প্রাসাদাৎ পুণ্যলক্ষ্মী দেশে।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে সুখে প্রজা বৈসে।"

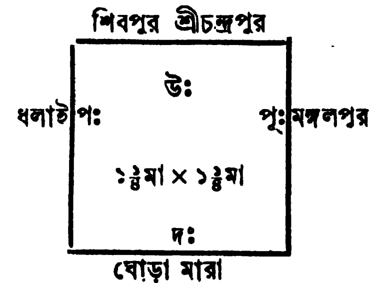
চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চন্দ্রসিংহানুষ্ঠিত মঙ্গলপুরের এই যজ্ঞ কাহিনী ভানুগাছের কৃষকগণ পর্য্যন্ত অবগত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়াই বর্ত্তমানে কেহ কেহ * উপরোক্ত যজ্ঞের সহিত ত্রিপুরা রাজধানীর নিকটে, মনুতীরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কাহিনী জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন।

চন্দ্রসিংহের মন্ত্রী হরিনারায়ণ—চন্দ্রসিংহের মন্ত্রী হরিনারায়ণ কর মঙ্গলপুরে একটি দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দীঘি খননের সহিত এই অঞ্চলের অন্যান্য বড় দীঘির ন্যায় ইহাতেও একটি কালসর্প ও ওঝার কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। হরিনারায়ণের ভগিনীপতি দাম বংশোদ্ভব জনৈক ব্যক্তি নিজ পুত্র সহ ভানুগাছে আগমন করেন। ক্রমে রাজ সভায় তাহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হরিনারায়ণ তাহার বধ সাধনার্থ এক ষড়যন্ত্র করেন। অশ্বপৃষ্ঠে দাম ও তৎপুত্র পলায়নপর হইলে পলায়নকালে দামের অশ্ব যে স্থানে পতিত হয় তাহা বর্ত্তমানে ঘোড়ামারা ও দামপুত্রের অশ্ব যে স্থানে পতিত হয় তাহা ছাও ঘোড়ামারা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৪র্থ অধ্যায় ৫৫ পৃষ্ঠা।

উদয়নারায়ণ ও ভানুনারায়ণ নামে মন্ত্রী হরিনারায়ণের দুই পুত্র জন্মে। ইহারা বর্ত্তমান চিৎলী (রামর জাঙ্গাল) নামক স্থানে বাস করিতেন। উপরোক্ত ভানুনারায়ণ মঙ্গলপুরের গণকদিগকে এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন।

চন্দ্রসিংহের গড়—এই গড় রাণীর বাজার হইতে হরিনারায়ণের দীঘির পূর্ব্বের পাড় হইয়া উত্তর দিকে রামেশ্বরপুর 'শিবপুর' শ্রীনাথপুর ও শ্রীচন্দ্রপুর হইয়া ক্রমে পশ্চিম দিকে বাণীপুর 'শ্রীচন্দ্রপুর' তিলকপুর এবং নরেন্দ্রপুর গ্রাম সমূহের সীমা অতিক্রম করার পর দক্ষিণ দিকে পুনঃ রাণীর বাজার আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যেকে ১¼ সোয়া মাইল এবং উচ্চত ১৪।১৫ হাত। কেহ কেহ বলেন যে, ত্রিপুরার আক্রমণ আশঙ্কায় এই গড় প্রস্তুত হইয়াছিল। অপর জনশ্রুতি এই যে, রাজা দৈবজ্ঞ মুখে ১৪ হস্ত পরিমিত এবং ৭ দিন ব্যাপী একটি জল প্লাবনের সংবাদ অবগত হইয়া প্রজাবর্গের রক্ষণার্থ এই গড় প্রস্তুত করান। বর্ত্তমানে এই গড়ের নানা স্থান কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু গড়ের অধিকাংশ এখনও যথসম্ভব সুরক্ষিত রহিয়াছে।



চন্দ্রসিংহের চরিত্র—রাজা চন্দ্রসিংহ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, উদারচেতা নরপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি লোক তাঁহার রাজ্যে বাসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি স্বধর্ম্মানুযায়ী যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। যাহাতে তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ সুখে বাস করিতে পারে তজ্জন্য তিনি দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য সতত যত্নবান থাকিতেন। তিনি বিদ্যার যথোচিত সমাদর করিতেন। প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ সম্পদে ভানুগাছ এখনও ভাগ্যবান। বাঙ্গালা পয়ারে

রচিত বঙ্গে দুর্লভ বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অল্লাধিক পরিমাণে তথায় এখনও বিস্তর পাওয়া যায়।

পরুমঙ্গল কাহিনী—নিম্নলিখিত জনশ্রুতি হইতে তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়। একদা পরুমঙ্গল নামক নিজ রাজ্যস্থিত কোন বণিকের অশেষ লাবণ্যবতী পত্নীর সৌন্দর্য্য-কাহিনী শ্রবণে তাহার মন বিচলিত হয়। তখন দিবাবসানে অতিথি-বেশে তিনি বণিক-গৃহে উপস্থিত হন। বণিক-গৃহে চিত্রাঙ্গী নাম্নী একটি কুকুরী ছিল। ঐ কুকুরীটি চীৎকার পূর্ব্বক অতিথিকে দংশন করিতে উদ্যত হইলে বণিক-পত্নী কুকুরীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

"মা দংশ দংশ চিত্রাঙ্গী চন্দ্রম্বেনো ন তস্করঃ
অমৃতে বিষমুৎপন্নং যো রক্ষকঃ সঃ ভক্ষকঃ।"

অতঃপর বণিক-পত্নী কুকুরীকে নিরস্ত করিয়া পরম সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক অতিথিকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং একটি রৌপ্য পাত্রে তাম্বুল সজ্জিত করিয়া অতিথির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ঐ পাত্রের এক ধারে উৎসৃষ্ট তাম্বুল ছিল। অতিথি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বণিক-পত্নী একটি শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, লোক উৎসৃষ্টপ্রার্থী হইলে সামান্য উৎসৃষ্ট তাম্বুলে দ্বিধা বোধ করে না। বণিক-পত্নীর বুদ্ধি ও সৌজন্যে প্রীত হইয়া রাজা তাহাকে কন্যা সম্বোধন করতঃ চলিয়া আসিলেন। বণিক গৃহে আসিয়া সন্দেহ বশতঃ নিজ পত্নীকে পিতৃ গৃহে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর বণিকের শ্বশুর রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা চন্দ্রসিংহের নিকটেই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন—

"ক্ষেত্রমেকং ময়া দত্তং বহনার্থং নরাধিপ
অমৃত মণ্ডভং মত্ত্বা বর্জ্জয়েৎ কেন হেতুনা।"
(দোষগুণং ন জানামি মহত্বং পরিবর্জ্জয়েৎ)
কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন।

রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ বণিক রাজ-সমীপে আনীত হইলেন। স্ত্রী-পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বণিক রাজাকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

আগতোহং সরিত্তীরে তৃষ্ণাতুরো নরাধিপ
তত্র সিংহ-পদং দৃষ্ট্বা ন পীতং বারি শীতলং।

রাজা ইহার উত্তর স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

সত্য সিংহ-পদং দৃষ্ট্বা ন পীতং বারি শীতলং
অমৃত-বচসা সিংহঃ কন্যেতি সাচ ভাষিতা
(মধুরামৃত বাক্যেন সিংহঃ কন্যেতি ভাষিতা)

রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বণিক হৃষ্ট মনে স্ত্রীকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। পরুমঙ্গল জাতিতে বণিক ছিলেন। যদিও তাহার বংশ লোপ পাইয়াছে তথাপি তাহার খনিত একটি দীঘি ভানুগাছে বিদ্যমান রহিয়া চন্দ্রসিংহের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

চন্দ্রসিংহের মৃত্যু—ভানুগাছ রাজ্যেই যক্ষ্মারোগে চন্দ্রসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এই রূপ বিবরণ লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নির্ব্বাসিত ভদ্রসেন পিতৃরাজ্য অধিকারের নিমিত্ত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজ্য মধ্যে অশান্তি উপদ্রব চলিতে লাগিল। অতঃপর ভদ্রসেন সিংহাসন লাভ করিয়াই প্রজা-পীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ কাল নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অচিরেই ত্রিপুরার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অরাজকতায় ভদ্রসেনের সময়ে রাজ্য এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রস্থানের পর বন্য জন্তুর উপদ্রবে রাজ্য একপ্রকার অরণ্যে পরিণত হয়। কাল ক্রমে চন্দ্রসিংহের ধনজনপূর্ণ রাজ্য "চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরের অরণ্য" এই আখ্যায় অভিহিত হয়। তৎকালিক বন্য জন্তুর উপদ্রব ও যাদুবিদ্যায় লোকের অসাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে নিম্নোক্ত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—

চন্দ্রসিংহের পরবর্ত্তী সময়ে ভানুগাছে, ভোঙ্গাই কুকী ও করমোজ খাঁ নামক দুইটি ব্যক্তি গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ ছিল। উক্ত কুকী মন্ত্র প্রভাবে বিভিন্ন প্রাণীর আকার ধারণ করিতে পারিত। মুসলমানটি বন্ধুর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ায় উভয়েই পশু-শরীর ধারণ করিতে মনস্থ

করে। পুনঃ মনুষ্য আকারে পরিণত হইবার নিমিত্ত তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট মন্ত্রপূত জল রক্ষিত হইল। ভোজাই এক ভীষণ ব্যাঘ্রে ও করমোজ খাঁ এক মত্ত মাতঙ্গে পরিণত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি ভয়ে মন্ত্রপূত জল ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পলায়ন করে। ইহাদের অত্যাচারে চারি দিকে এক ভীষণ আতঙ্কের আবির্ভাব হয়, এবং ভানুগাছ অঞ্চল এক প্রকার পরিত্যক্ত হয়। ভদ্রসেনের সময়ে শ্রীহট্টে মুসলমানদিগের বিস্তৃতি হইয়াছিল এই জনশ্রুতি হইতে, ইহার একটুকু আভাস পাওয়া যাইতেছে। তৎকালে সাধারণ লোক মন্ত্র তন্ত্র যাদুবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ অলোকিক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করিত না ইহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

চন্দ্রসিংহের সমসাময়িক ধর্ম্মনগর ও শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চল।

চন্দ্রসিংহের ভানুগাছ রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ত্রিপুর-রাজ যাজরফা ধর্ম্মনগর হইতে রাঙ্গামাটী নামক স্থানে ত্রিপুর রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। এই পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মনগর অঞ্চল অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়ে। যাহা হউক চন্দ্রসিংহের সময়েও ধর্ম্মনগর একটি সুসভ্য জনপদরূপে পরিগণিত হইত। ধর্ম্মনগর অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজধানী থাকা কালে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ত্রিপুর রাজগণের আশ্রয়ে রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীহট্টের দক্ষিণ অঞ্চলে আর্য্য সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বিদ্রোহের ফলে ধর্ম্মনগর ধ্বংশ হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীবর্গ কাছাড় ও শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। কাছাড় ও শ্রীহট্টে ধর্ম্মনগর পরিত্যক্ত হওয়ার বহু জনশ্রুতি প্রচলিত দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক দিকে ধর্ম্মনগর হইতে পলায়নপর শাক্ত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ, অপর দিকে মুসলমানদিগের বঙ্গবিজয়ের পর, বঙ্গদেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণ শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে সমাজ গঠন করিতে বিশেষ সহায়তা করে। যদিও বহু পূর্ব্ব হইতে ধীরে ধীরে এই সমাজ গঠনের সূত্রপাত হইয়াছিল তথাপি চন্দ্রসিংহের সময়েই এই সমাজ-গঠন ব্যাপার অতি দ্রুতভাবে চলিতেছিল। ত্রিপুর-রাজগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মনগরে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-ভদ্র স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, হাওর ও অরণ্যময় শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে ত্রিপুরার আশ্রয় ব্যতিরেকে আর্য্যগণের বসবাস একপ্রকার অসম্ভব ছিল। উচ্চ ভূমিতে কচাক তিপরাগণের বসবাস ছিল, নিম্ন ভূমিতে কৃষি ও মৎস্যজীবী বিভিন্ন অনার্য্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। লংলা দৌলতপুর নিবাসী মৌলানা সাদেক আলী বা গৌরসেন কৃত "রদ্ধে কাফুর" গ্রন্থে শ্রীহট্টে মুসলমানদিগের প্রথম আগমনের সময়—

"এক হাতে পুড়া শুস্থ আর হাতে ভাত"

এবং "ইচরেতে পায়খানা না লইতা পানী," এইরূপ রীতিনীতিবিশিষ্ট এক শ্রেণীর লোকের কিংবদন্তীও বর্ণিত আছে। ইহাতেও কুকি, কচাকদিগের পূর্ব্ব বসবাসের আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ চন্দ্রসিংহের সময়ে উক্ত লোকদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ দৃঢ়ীভূত হয় নাই এবং কৌলিক ধর্ম্ম-ভাবের প্রভাবও অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সমাজের কোন স্তরে কিভাবে ইহাদের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছে কে তাহা নিরূপণ করিবে? আর নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের মধ্যে, স্থান বিশেষে মীননাথ, গুম্ফনাথ ও গোরক্ষনাথের সেবা এবং "কলির পূজা পদ্ধতি" অতীত ধর্ম্মজীবনের যে পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে তাহা চন্দ্রসিংহের সমসাময়িক নিম্ন শ্রেণীর সামাজিক অবস্থা আলোচনার উল্লেখ যোগ্য।

উপসংহারে বক্তব্য—আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাহিয়াছি—(১) চন্দ্রসিংহ ত্রিপুর, দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ভানুগাছ অঞ্চলে চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত ও অরণ্যে পরিণত হয়।

(২) প্রজাবৎসল ত্রিপুর জাতীয় চন্দ্রসিংহ, হিন্দু প্রজাবৃন্দের হৃদয় এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, বহু জনশ্রুতি তাঁহাকে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে স্থান দিবার জন্ত চেষ্টা পাইয়াছে।

(৩) কিংবদন্তী সাহায্যে প্রাচীন যুগের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে সন্দেহ নাই কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা কিংবদন্তী সমর্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) ঐতিহাসিক সম্পদে ভানুগাছ শ্রীহট্টের অপরাপর স্থান হইতে ন্যূন নহে। দেশের ইতিহাসে ভানুগাছ বৃত্তান্তের একান্ত অভাব, ইহা পূর্ণতার পরিচায়ক নহে। বর্ত্তমান আলোচনায় সেই অভাবের কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই উপলক্ষে শ্রীহট্টের ইতিহাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও ব্যক্তির নূতন রূপে সময় নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, টি।

শঙ্কু ব্রত*.

জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তিতে শঙ্কুব্রত হইয়া থাকে। পরিবারের প্রধানা মহিলা এই ব্রত করেন। ব্রতিনী চিড়া খায়, এবং পরিবারের সকল লোকেই সেই দিন চিড়া খাইয়া থাকে। শঙ্কু সংক্রান্তির দিন উনোন জ্বালা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে কর্ম্মপুরুষের পূজা হইয়া থাকে।† পূজান্তে পরিবারস্থ প্রত্যেক পুরুষ তেমাথায় শাতু উড়াইয়া থাকে। এক জন পাশে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি উড়াও?" যে শাতু উড়ায় সে উত্তরে বলে "শত্রু উড়াই।" এইরূপে বা হাতে দুই পায়ের মধ্য দিয়া তিন বার শাতু উড়াইয়া থাকে।

ব্রতের কথা

প্রথম অংশ

এক সওদাগরের সাত পুত্র; সাত পুত্রের সাত বৌ। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিন এই সাত বউ ঘর বাড়ী লেপিয়া স্নান করিতে গেল। ছোট বউ 'সিটালে' গোবর ছট্‌কা (ছড়া) দিয়া ও "ফুরিয়া"১ এক হাতে একটি ঘটি ও অপর হাতে একটি "বৌখ্‌না" লইয়া তাহাদের পেছনে পেছনে চলিল।

পুকুরের পথে চষা জমি দিয়া যাইতে যাইতে বৌ দেখিল লাঙ্গলের খাতে দুটি সাপের "বাচ্ছা"। দেখিয়া দুটিকেই একটু জলের সঙ্গে কোষ করিয়া ঘটিতে তুলিয়া লইল। ঘাটে যাইয়া প্রথমে 'বৌখ্‌নাটি' বেশ করিয়া মাজিয়া বাচ্ছা দুটি জল দিয়া 'বৌখ্‌নায়' রাখিল, পরে ঘটিটি মাজিয়া স্নান করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কর্ম্মপুরুষের পূজা হইল। সাত 'জালে' তেল-সিন্দুর পরিয়া "বোন বোনারির" ব্রত করিল ও শাতু বদলাইল। ছোট বৌ বাচ্ছা দুটি একটা 'মুছিতে' রাখিয়াদিল। ছয় 'জাল' দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, তুমি সাপের 'পোনা' কোন খানে পাইলা?" সে সব ঘটনা বলিল; তাহারা উত্তরে বলিল, "এই গুলি তোমারে খাইব —কে কবে হুনছে মানুষে হাপ্‌ পালে!" বৌ কিন্তু সে গুলিকে পুষিবে স্থির করিল। পূজায় দেওয়া নাগের দুধ হইতে একটু দুধ লইয়া সাপগুলিকে খাইতে দিল। সাপ গুলি দুধ খাইয়া দিন দিন বড় হইতে লাগিল। প্রথম বৌ এগুলিকে ছোট হাঁড়িতে রাখিল, তার পরে একটা বড় হাঁড়িতে রাখিল, সর্ব্বশেষে ফরমাস দিয়া একটা বড় গামলা তৈয়ার করাইয়া ইহাতে রাখিল।

এক বৎসরে সাপগুলি বেশ বড় হইল। এগুলি রোজ চলিয়া চাইত, আবার দুধ খাওয়ার সময় ফিরিয়া আসিত।

আবার পর বৎসর শঙ্কু ব্রতের দিন আসিল। ব্রতের আগের দিন আতপ দুধ রাখিতে বৌ-এর মনে ছিল না; সময় মত সাপগুলি ফোঁস ফোঁস্ করিয়া দুধ খাইতে আসিল। বৌ কড়া হইতে গরম দুধ একটা পাথরের বাটীতে নামাইয়া সাপগুলিকে খাইতে দিল। গরম দুধ খাইয়া সাপগুলি অস্থির হইয়া পড়িল, এবং বৌকে কামড়াইতে আসিল। বৌ বলিল, "আমারে কাইল্ খাইবি। কাইল্ হাউন্তাই বর্ত্ত

* চলিত ভাষায় এই ব্রতকে 'সাউন্তাই' বা 'হাউন্তাই' ব্রত বলে। এই ব্রত ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত।

† ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ, সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ, কেয়ূরবান্, কনককুণ্ডলবান, কিরিটী, হারী, হিরণ্ময়বপুঃ, ধৃতশঙ্খচক্রঃ।

১ ঝাট দিয়া।

আছে, হাতু বদল আছে, বইন্ বইনারির বর্ত্ত আছে— বর্ত্তের পরে আমারে খাইছ্।"

পর দিন ব্রতের কাজ কর্ম্ম করিয়া স্নানের পর সাত জা একটা শীতল পাটীর উপর বসিল, তেল-সিন্দুর পরিল, শাতু বদল করিল এবং বোন বোনারির ব্রত করিল। পরে ছোট বউ ছয় জা কে প্রশ্ন করিল—

"বইনারিরা গো উক্কুইরার[১]নি আকার[২]আছে ?"

"আছে না ?"

"যদি না সুয়রে[৩] ?"

"তবে নূনে চূণে ভস্ম অয়।"

"তবে ভস্ম অউক।"

সাপগুলি পাটীর মোড়াতে ছিল—শুনিয়া বুঝিল এই সকল কথা ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বল হইতেছে। তখন ইহাদের মনে অনুতাপ হইল, যে এক বৎসর এত যত্ন করিয়া ইহাদিগকে পুষিয়াছে তাহাকে কেমন করিয়া খাইবে ? এই রূপ চিন্তা করিয়া ইহারা মনসা দেবীর খাটের নীচে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় দুটি সোনার কাঠি রাখিয়া গেল।

সাপগুলি আর আসে না। এক দিন ইহারা মনসা দেবীকে ইহাদের অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা বলিল এবং যে মনুষ্য-কন্যা ইহাদিগকে পুষিয়াছিল তাহাকে দেব-পুরীতে আনিবার জন্য দেবীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর মনসা সম্মত হইলেন এবং দুই জন লোক সঙ্গে দিয়া সওদাগরের বাড়ীতে "সোয়ারি" পাঠাইয়া দিলেন। সাপ দুটিও সঙ্গে গেল।

ছোট বউ বড় খুসী হইল। অন্য ছয় জা বলাবলি করিতে লাগিল, "এইবার হাপ্ পালনের রং বারইব। দেব পুরীত্ লইয়া গিয়া ইডারে হাপে খাইয়া ফালাইব।" ছোট বৌ বলিল, "আমার দুই ভাই আড়াই, বড়াই, আমি দেব-পুরীত্ যায়াম্।"

এক দিন মনসা পূজা খাইতে গেলেন। যাওয়ার সময় কন্যাকে বলিয়া গেলেন, "মাগো, তোমার দুই ভাই আইলে তারারে দুধ ঢালা দিয়।" মানুষের কন্যা দেব-পুরীতে আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন থাকিয়া দুধ জুড়াইতে ভুলিয়া গেল। যখন সাপগুলি আসিল তখন তাড়াতাড়ি সে গরম দুধ ঢালিয়া দিল। অনেক সাপ আসিয়া দুধ খাইতে লাগিল। গরম দুধ খাইয়া সাপগুলি ছটফট করিতে লাগিল, বিষের জ্বালায় মনুষ্যের কন্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মর্ত্ত্যে মনসার কাঠাম নড়িতে লাগিল। মনসা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে পুনর্জীবিত করিলেন, এবং হাড়াই, বড়াইকে ডাকিয়া মনুষ্য-কন্যাকে মর্ত্ত্য-লোকে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। কন্যা এক পায়ে একটি খারু (বালা), এক হাতে একটি শাঁখা, ও একটি বাজু পরিয়া সওদাগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। মনসা দেবী একটি "ঝাইল"ও * সঙ্গে দিয়া দিলেন। সাপ দুটি কন্যাকে রাখিয়া গেল।

ছোট বউ চুল খুলিয়া ধান ঘাটিতে ছিল। ছয় জা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আধ অঙ্গের অলঙ্কার পই-রাই এত, হব্ অঙ্গে অলঙ্কার পিঁধলে না জানি আর অইত কত !"

"আড়াই, বড়াই দুই ভাই বাইচ্যা থাক্‌লে, মনসার মত মা বাইচ্যা থাকলে, দুধরাজের মত বাপ্ বাইচ্যা থাক্‌লে এক বার পিঁধ্‌ছি আধ অঙ্গে আবার পিঁধ্যাম্ হব্ অঙ্গে।"

সাপ দুটা এই কথা শুনিয়া আসিয়া মনসাকে জানাইল, আবার মনুষ্যের কন্যাকে দেব-পুরীতে লইয়া আসিতে মনসার নিকট প্রার্থনা করিল। মনসা আবার কন্যাকে লইয়া আসিলেন।

মনসা আর এক দিন পূজা খাইতে গেলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, "মাগো, তুমি পুরীর হগল্ দিগে যাইও কিন্তু দক্ষিণ দিগে যাইয় না।"

মনসা চলিয়া গেলেন। এই নিষেধ শুনিয়া দক্ষিণ-দিকটা দেখিবার জন্য কন্যার মনে বড় কৌতূহল হইল। সে দক্ষিণ দিকে গেল, দেখে অসংখ্য সাপ। সেখানে বাসুকী সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছিল। এই নিশ্বাস-বিষে মনুষ্য-কন্যা আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মর্ত্ত্যে মনসার খাট আবার নড়িতে লাগিল। মনসা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখেন মনুষ্য-কন্যা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ হাড়াই, বড়াইকে ডাকিয়া কন্যাকে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে পাঠাইয়া দিলেন। এবার আর একটি "খারু", আর একটি শাঁখা ও আর একটা বাজু দিয়া কন্যাকে বিদায় করিলেন। আর একটা ঝাপিও সঙ্গে দিলেন। হাড়াই বড়াই কন্যাকে লইয়া আসিল।

পরে সাত জা মিলিয়া বৎসর বৎসর আমোদ-আহ্লাদে শক্ত ব্রত করিতে লাগিল, তাহাদের সংসার ধন ধান্যে পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় অংশ।

এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের দুটি ছোট মেয়ে। এক দিন মেয়েরা বেড়াইতে গিয়া দেখিল সকলেই শাড়, চিড়া ও খৈ তৈয়ার করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল কর্ম্মপুরুষের ব্রতের জন্য এগুলি তৈয়ার হইতেছে, এবং শুনিল কর্ম্মপুরুষের ব্রত করিলে নির্ধনের ধন হয়, পুত্রহীনের পুত্র হয়, যে যাহা চায় তাহাই পায়। ব্রাহ্মণ রোজ ভিক্ষা করে, যাহা পায় তাহাতে তিন জনের কোন-

১ উপকারী। ২ উপকার। ৩। উপকার স্বীকার।

* ঝাপি।

রূপে দিন পাত হয়। এক দিন কন্যাদের অনুরোধে ব্রাহ্মণ ধান ভিক্ষা করিতে গেল। মেয়ে দুটি ভিক্ষার ধানে কর্ম্ম পুরুষের পূজার জন্য কিছু খৈ, চিড়া করিল।

আজ কর্ম্মপুরুষের পূজার দিন। মেয়েরা ভক্তির সহিত কর্ম্মপুরুষের পূজা দিল। দুই বোনে শাড়ু বদলাইল, তেল-সিন্দুর পরিল ও "বোন বোনারির" ব্রত করিল। ব্রাহ্মণ আজ প্রচুর ভিক্ষা পাইল এবং এক ছালা চাউল লইয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। এদিকে কর্ম্মপুরুষের বরে ব্রাহ্মণের কুড়ে ঘরখানি অট্টালিকা হইয়া গেল, বিস্তর ঐশ্বর্য্য হইল এবং দাস দাসীতে বাড়ী গম্ গম্ করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মন বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখে তাহার কুটীর নাই, প্রকাণ্ড অট্টালিকা। মনে করিল তাহার মেয়ে দুটিকে মারিয়া বুঝি কেহ বাড়ী করিয়াছে, সুতরাং দুঃখিত মনে বাড়ীর দরজায় একটা গাছের তলে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মেয়ে দুটি এখনও খায় নাই পিতার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখে ব্রাহ্মণ গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছে। তখন তাহাকে যত্নের সহিত বাড়ীতে আনিল, স্নান করাইয়া খাওয়াইল এবং বলিল, "কর্ম্মপুরুষের বরে আমরার ঐশ্বর্য্য অইছে ডেরাখান অট্টালিকা অইয়া গেছে।"

এ রূপে তাহারা সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে মেয়ে দুটির ইচ্ছা হইল ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করে, কারণ মেয়েদের বিবাহ হইলে কে তাহার যত্ন করিবে! কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণের সহিত রাজার মেয়ের বিবাহ হইল।

আবার শক্কু ব্রত ফিরিয়া আসিল। মেয়ে দুটি কর্ম্ম-পুরুষের পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহাদের নূতন মা খৈ চিড়া দেখিয়া বলিল, "রাজ রাজরার বাড়ীত্ কেন্ গরীব দুঃখীর কারখানা?" এবং পদাঘাতে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েরা পরে তাহাদের নূতন মা'র অসাক্ষাতে আবার খৈ, চিড়া করিতে লাগিল। ইহাতে ইহাতে তাহাদের মাতা অসন্তুষ্ট হইয়া শুইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রাহ্মণীর কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিল, "সত্য কর আমি যা চাই তা তুমি করবা তা অইলে আমার দুঃখের কথা কয়াম্।" ব্রাহ্মণ সত্য করিল, এবং ব্রাহ্মণী মেয়েদের বনবাস প্রার্থনা করিল।

এক দিন সকালে ব্রাহ্মণ মেয়ে দুটিকে ডাকিয়া বলিল, "আজ তোমরারে তোমরার মাসীর বাড়ীত্ লইয়া যাইমু শীঘ্র খাইয়া লও।" বড় মেয়েটি একটু নির্ব্বোধ ছিল কিন্তু ছোট মেয়েটি ব্যাপারখানা বুঝিয়া লইল। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় তাহারা এক বনে প্রবেশ রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, ব্রাহ্মণ যমুনা, ঝমুনা দুই বোনকে বনে রাখিয়া ক'রে আঙ্গুল হইতে দুই ফোটা রক্ত তাহাদের কাপড়ে ফেলিয়া অতি দুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। দুই বোন জাগিয়া দেখে রাত্রি হইয়াছে, চাঁদের আলো বনভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। দুটি মাটীর ডেগার উপর মাথা রাখিয়া তাহারা শুইয়া আছে। বড় মেয়ে রক্ত দেখিয়া মনে করিল ব্রাহ্মণকে বাঘে খাইয়াছে এবং কাঁদিয়া আকুল হইল। ছোট মেয়ে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল বাঘে খাইলে সকলকেই খাইত; মায়ের পরামর্শে ব্রাহ্মণ তাহা-দিগকে বনবাস দিয়াছে। বিপন্ন হইয়া বালিকাদুটি হিংস্র জন্তু হইতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় দেখিতে লাগিল। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটার কাছে গিয়া তাহারা বলিল, "মা, আইজ্ তুমি আমরার আশ্রয় অভাগিনীরার প্রাণ রইক্ষা কর।" ব্যথিত হইয়া গাছটা নুইয়া পড়িল; মেয়েরা তখনই গাছে উঠিল এবং গাছটা আবার আগের মত ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

এক রাজপুত্র ও এক সওদাগরের পুত্র মৃগয়া করিতে সেই বনে আসিয়াছিল। দুর্য্যোগে পথ হারাইয়া তাহারাও সেই গাছটার নীচে আশ্রয় লয়। রাত্রি প্রভাতে দুই বন্ধু গৃহে ফিরিতে উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একটা চুল সওদাগরের পুত্রের গায়ের উপর পড়িল। সওদাগর পুত্র মাপিয়া দেখিল চুলটা দুই হাত লম্বা। তাহারা এত বড় লম্বা চুল দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং চারি দিকে দেখিতে লাগিল। পরে গাছের দিকে তাকাইয়া দেখিল দুটি সুন্দরী কন্যা আগডালে বসিয়া আছে। প্রথমতঃ ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিল পরে মেয়ে দুটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" ছোট মেয়েটি বলিল, "আমরা মনুষ্য, ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতা বিমাতার মন্ত্রণায় আমরারে বনবাস দিয়া গেছে। এখনও আমরার বিয়া অইছে না; যদি দয়া কৈরা আপনেরা আমরারে বিয়া করেন ত অইলে আমরা আপনেরার লগে যাইতে পারি।" বড় মেয়েটি একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল ছোট বোন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিল। বড় মেয়েটিকে রাজপুত্র লইয়া গেল, এবং ছোট মেয়েটি সওদাগরের পুত্রের সঙ্গে গেল।

এক বৎসর অতীত হইয়াছে, কর্ম্মপুরুষের ব্রতের দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বড় মেয়ে রাজ-বধূ হইয়া কর্ম্মপুরুষের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছোট মেয়েটি কর্ম্ম পুরুষকে ভুলে নাই। সে পূর্ব্বের মত কর্ম্মপুরুষের ব্রত করিল। সওদাগরের ঐশ্বর্য্য বাড়িতে লাগিল রাজার ঐশ্বর্য্য কমিতে লাগিল। রাজা সওদাগরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বনে কইন্তা ঘর (অ) আইন্তা আমার দুর্দ্দশা অইছে; তুমি আবার

বাড়ী ফিরিয়া সকল কথা স্ত্রীর নিকট খুলিয়া বলিল। শুনিয়া তাহার স্ত্রী বলিল, "বেশ কথা, তারে তুমি লইয়া আইয় ; কিন্তু রাজারে কইয় যে, তিনি এই কইন্ঠা আর ফিরতি পাইবেন না।" রাজা স্বীকৃত হইলেন।

ছোট বোন বড় বোনকে ভৎর্সনা করিল। পর বৎসর আবার দুই বোন কর্ম্মপুরুষের ব্রত করিল। এবার রাজার ঐশ্বর্য্য বাড়িতে লাগিল। রাজা আবার সওদাগরকে ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধু বনের কইন্ঠা আইন্ঠা দেও।" সওদাগর স্ত্রীর কাছে আবার রাজার অভিপ্রায় জানাইল। সওদাগরের স্ত্রী বলিল, "আইচ্ছা ভালা কথা, কিন্তু বনের কইন্ঠা ফিরতি পাইতে অইলে রাজাকে সওদাগরের বাড়ী থাক্যা রাজবাড়ী পর্য্যন্ত একটা কৈরা জাঙ্গাল বাঁধাইয়া দিতে অইব, এবং একটা দুধের পুষ্কন্নি কাটাইতে অইব।"

রাজা কড়ির রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন ; এবং ঢেড়া দেওয়াইলেন যে, যাহারা দুই ঝুড়ি মাটী কাটিবে তাহারা এক ঝুড়ি কড়ি পাইবে ; এবং সওদাগরের স্ত্রী সেই সকল লোককে কড়ি দিয়া বিদায় করিবেন।

এদিকে কর্ম্মপুরুষের কোপে ব্রাহ্মণের আবার দুরবস্থা হইয়াছে। আর সেই অট্টালিকা নাই। ভিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে দিন পাত হয়।

ব্রহ্মণের স্ত্রী পুকুর কাটার সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, "তুমি যাও, দুই ওরা মাটী কাটলে এক ওরা করি পাইবা ; তা অইলে কিছু দিন সুখে কাটাইতে পাইরাম।" ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণায় যাইতে স্বীকার করিল।

সমস্ত দিন হাটিয়া ব্রাহ্মণ রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইল—পা আর চলে না ; অতি কষ্টে দুই ঝুড়ি মাটী কাটিয়া কড়ির জন্ম ব্রাহ্মণ সওদাগরের স্ত্রীর নিকট গেল। সওদাগরের স্ত্রী ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিল। বসিতে একখানা চৌকি দিল, পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল, "ইডা আবার কি !" কেহ ব্রাহ্মণের গায়ে তেল মাজিতে লাগিল, কেহ পা ধুইয়া দিল এবং কেহ স্নানের জল লইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ স্নান করিল ও সোনার থালায় ভাত খাইল। পরে তাকে সুবাসিত পান ও সুগন্ধ তামাক দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ সুস্থ হইলে দুই লোন তাহার দুই দিকে বসিয়া বলিল, "বাবা আপনে আপনের রমুনা যমুনাকে চিনতে পারেন না ?" ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা মনে হইল, চক্ষু হইতে দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বলিল, "মা, আমি আর তোমরারে ছাইরা যাইতাম্ না।" সওদাগরের স্ত্রী সওদাগরকে বলিল, "একখান পাল্কী আইন্ঠা দেও ; জন্মভূমিটা এক বার দেইখ্যা আই।"

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দুইটি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে বহু লোক। ব্রাহ্মণী ভয় পাইয়া একখানা খানিতে ঢুকিয়া কিছুই পাইল না—এক কোণে একটা শামুকে একটু নুন ছিল ; সেখান হইতে একটু নুন মুখে দিয়া আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

সওদাগর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাপের বাড়ীতে কি খাইয়া আইলা ?" স্ত্রী উত্তর করিল, "পির্থিমীর মেওয়া খাইয়া আইছি। রাইত্ তোমারেও খাওয়াইয়াম।" সওদাগর পত্নী রাত্রে দুটি ব্যঞ্জন রাঁধিল। একটায় নুন দিল আর একটায় দিল না। সওদাগর যখন খাইতে বসিল তখন প্রথম তাহাকে নুন ছাড়া ব্যঞ্জনটা খাইতে দিল। সওদাগর অসন্তোষ প্রকাশ করিল। পরে নুন দেওয়া ব্যঞ্জন খাইয়া বলিল, "বাঃ ? ইডা ত ভালা অইছে !"

"আমরা এই মেওয়াঅই খাইয়া আইছি।"

ব্রাহ্মণ ছোট মেয়ের বাড়ীতে রহিয়া গেল। রাজা আবার নিজের স্ত্রীকে রাজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এখন হইতে দুই বোন বৎসর বৎসর কর্ম্মপুরুষের ব্রত করিতে লাগিল এবং তাহাদের ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। এই রূপে পৃথিবীতে কর্ম্মপুরুষের ব্রতের প্রচার হইল।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সাধনা—শ্রীবিনয় কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত, ১১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ এক টাকা—ছাপা ও কাগজ উত্তম।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বর্ত্তমান সময়ের কয়েকটি সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা', 'হিন্দু ও মুসলমান', 'বাঙ্গালাসাহিত্য তথা হিন্দুসাহিত্য', 'আমাদের কর্ত্তব্য' প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের স্বাধীন ও সংযত আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার হিন্দুজাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহাই নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, হিন্দুর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ করিলে অমরা কখনও প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। গ্রন্থোক্ত সকল মতগুলিই সর্ব্বসাধারণে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যে চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। গ্রন্থের আর একটি গুণ, গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের (personality) আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি। গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এই কথাই বিশেষ করিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থকার কেবল তর্কের খাতিরে, অথবা পাণ্ডিত্য বিকাশের জন্য কিছুই লেখেন নাই তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য তিনি বিশেষ ভাবে স্বীয় হৃদয়েই উপলব্ধি করিয়াছেন গ্রন্থোক্ত সত্য গুলি তাহার ঐকান্তিকী সাধনার ফল। আলোচ্য পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রতিভা

২য় বর্ষ ফাল্গুন ১৩১৯ ১১শ সংখ্যা

ময়নামতির গান *

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ সাহেব ময়নামতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রবিষয়ক একটি প্রাচীন গাথা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ময়নামতির কথা লইয়া সাধারণ্যে আলোচনার তাহাই প্রথম সূত্রপাত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই গাথাকে বৌদ্ধযুগের বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন এবং তদুপলক্ষে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনাও করেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় ষষ্ঠ বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশিত করেন এবং প্রায় চারি বৎসর হয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ময়নামতির গান সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি রঙ্গপুর জেলার দুইটি বৃদ্ধ যোগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটি বিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ময়নামতির গানের কোন প্রাচীন পুথি পান নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"শুনিয়াছি, ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজা গোপীচাঁদের গাথা প্রচলিত ছিল। এখন আর তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না।"

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাহার রাজমালার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, গোপীচাঁদের গাথা তাঁহারা ছেলেবেলায় বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার প্রবন্ধে ময়নামতির গানে উল্লিখিত স্থান সকলের নির্দ্দেশ রঙ্গপুর জেলায়ই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এদিকে ত্রিপুরা জেলায়ও ময়নামতির টিলা—যাহার নাম হইতে বিখ্যাত ছিটের নাম হইয়াছে,—এবং তাহার অদূরে রাজা মাণিকচন্দ্রের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, ময়নামতি পাহাড়েরই শাখা লালমাই পাহাড়ে অদুনা মুড়া ও পদুনা মুড়া নামে দুই শৃঙ্গ বর্ত্তমান আছে; ময়নামতির পাহাড়ের সংলগ্ন ঘোষনগর গ্রামে যে প্রায় তিন শতাধিক ঘর যোগী (?) আছে তাহাদের এবং নিকটস্থ জনসাধারণের বিশ্বাস যে, ময়নামতি, মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপের স্থল ময়নামতির পাহাড় এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ মেহেরকুল রাজ্য। বিশ্বেশ্বর বাবু না কি ময়নামতির গানের এক সংস্করণ বাহির করিতেছেন। তাহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।

---

* ত্রিপুরা সাহিত্য সভায় পঠিত। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভটশালী এম, এ মহাশয় প্রবন্ধটি দেখিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এবং আমার হিতৈষী শ্রীযুক্ত শোভনগাজি আমাকে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য।—লেখক

ত্রিপুরা জেলায় অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানে ময়নামতির ইতিবৃত্তমূলক একখানা প্রাচীন পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ময়নামতির নিকটস্থ হরিদ্ধরা গ্রামে শোভনগাজি নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট পুস্তকখানা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরার অধিবাসী ও প্রবাসীদের নিকট ময়নামতি সুপরিচিত হইলেও অন্য স্থানের অনেক লোকেই ইহার বিষয় বিশেষ কিছু জানেন না। কুমিল্লা সহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে একটি অনুচ্চ পাহাড় আছে; ইহারই দক্ষিণ অংশকে লালমাইর পাহাড় এবং উত্তর অংশকে ময়নামতির পাহাড় বলিয়া থাকে। আসাম-বঙ্গ রেলওয়ে যাত্রীগণ লালমাই ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে চাহিলেই লালমাইর পাহাড় এবং তাহার চণ্ডীমুড়া নামক শৃঙ্গের উপরিস্থিত চণ্ডীর মন্দির দেখিতে পান। ময়নামতির টিলা লালমাই ষ্টেশন হইতে প্রায় বার মাইল উত্তরে। প্রাচীন কমলাঙ্কের নরপতি মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নার নাম অনুসারে স্থানটি ময়নামতি নামে পরিচিত হইতেছে। ময়নামতির পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। অতি প্রাচীন সময়ে ময়নামতির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া 'ক্ষির' বা ক্ষিরদ নামে আরও একটি নদী প্রবাহিত ছিল। কোন সময় এই নদী ভরট হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। মাত্র স্থলে স্থলে এই নদীর কুর (গভীর জলপূর্ণ খাত) বর্ত্তমান থাকিয়া নদীর অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। ময়নামতির পূর্ব্বাংশে সাগরদীঘি নামে (অপর নাম দেবদীঘি) কুমিল্লাস্থিত ধর্ম্মসাগরের প্রায় পঞ্চগুণ বৃহৎ একটি সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ময়নামতিকে পাহাড় না বলিয়া ঐ দিঘীর পাড় বলিলেই চলে। স্থানটি ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এইরূপই প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। ময়নামতি বর্ত্তমান সময়ে মেহারকুল পরগনার অন্তর্গত এবং ত্রিপুরা মহারাজের স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ময়নামতির প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে লালমতি বা লালমাই পাহাড় অবস্থিত। মাণিকচন্দ্রের কন্যা লালমতির নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম লালমতি হইয়াছে। ইহা জনশ্রুতি মাত্র। মাণিকচন্দ্রের পুত্র-বধূ অদুনা ও পদুনার নামানুসারে এই পাহাড়ের অদুনা মুড়া ও পদুনা মুড়ার নামকরণ হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। ময়নামতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াও ইহা ঠিক বলিয়াই মনে হইতেছে। এই পাহাড়ের অপর এক মুড়ায় চণ্ডী দেবীর মন্দির অবস্থিত আছে বলিয়া লোকে ইহাকে চণ্ডীমুড়া বলিয়া থাকে। ময়নামতি ও লালমতি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১ মাইল। পরিমাণ ফল ৯ কি ১০ বর্গমাইল। উচ্চতা কোন স্থলেই ৫০। ৬০ ফিটের অধিক হইবে না। এই পাহাড়ের প্রায় প্রত্যেক মুড়ায় ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নানা স্থানে বহু ছোটবড় সরোবরাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার ২। ১ টির সঙ্গে ও কোন কোন মুড়ার সঙ্গে দুই একটি রাজার নাম জড়িত আছে। পাহাড়ের প্রান্ত ভাগে অব্যবহার্য্য বহুল সুবৃহৎ দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশপুর বা কালীর বাজার রাস্তার ধারে একটি গিরিদুর্গ অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে ইহাকে "কোটঘর" বলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে এই পাহাড়ে ক্রমান্বয়ে ঊনশত রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পাহাড়ের স্থানে স্থানে বহু ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক মনে হয় না। ময়নামতি টিলার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি সুরঙ্গ ছিল, কিছু দিন হইল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। এই সুরঙ্গ ও সাগরদীঘি সম্বন্ধে অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, ময়না এই সুরঙ্গ মধ্যেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ময়না এখনও জীবিত আছে।

মাণিকচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী ময়না, পুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র এবং পুত্র-বধূ অদুনা-পুদুনার কথা ময়নামতি অঞ্চলে অনেকের মুখেই শুনা যায়। এই পুস্তকখানাও মাণিক চন্দ্রের মৃত্যু ঘটনা ও 'গুপীচান্দের' সন্ন্যাস অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে। মূল পুস্তকখানা বোধ হয়

'গুপীচান্দের' সন্ন্যাসের পরই লিখিত হইয়াছিল। তার পর সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ইহার নকল চলিয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী লেখকদের হস্তে পতিত হইয়া ইহাতে কয়েকটি বৈষ্ণবিক-ঘোষা ও বহু মুসলমানী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন কবির লেখার সহিত অনেক স্থলেই মিশিয়া যাইতে পারে নাই। মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। এই পুস্তকখানার তারিখ না থাকায় কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। অক্ষরাদি দৃষ্টে প্রাচীন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাতে স্থানে স্থানে ভবানী দাস নামক জনৈক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

পুস্তকের মূল বিবরণ।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র (মাণিক চান্দ) প্রজারঞ্জন পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তৎপুত্র গোবিন্দ চন্দ্র (বা গোপীচান্দ) মৃত মহারাজের বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী। মাণিকচন্দ্রের বিধবা মহিষী ময়না (পিতৃদত্ত নাম শিশুমতি, গুরুদত্ত নাম ময়নামতি বা মএনামতি) নব নরপতি গোবিন্দচন্দ্রকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া রাজ-কার্য্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিতেছেন। রাজা "গোবিন্দাই"কে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এবং নারী জাতির অসারতা বুঝাইয়া ময়নামতি যোগী হইতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে নারাজ। তিনি তাঁহার চারি মহিষী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য লইয়া পার্থিব সুখে মত্ত। তিনি প্রজার কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজত্ব-কালে প্রতিকাণী ভূমিতে বার্ষিক কর ৵৩॥৹ দেড় বুড়ি বা দেড় পয়সা ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র সেস্থলে ৵৹ এক আনা কর ধার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিধবা রাণী পুত্রের অবৈধ কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া স্বামীর রাজত্বের প্রশংসাবাদ পূর্ব্বক বলিতেছেন—

বড় পুণ্যের লাগি দিলা দীঘি আর জাঙ্গাল।
সোণা রূপার গড়া গড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হিরামন মাণিক্য লোকে তুলিতে শুকাইত।
কাহার পুষ্কনীর জল কেহ না খাইত॥
সোণার ঢেপুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত।

হাড়াইলে ঢেপুয়া পুনি না চাহিত আর।
এমত গোআইল লোক হরিশ অপার॥
মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলি বাঁশের বেড়া।
গৃহস্তের পরিদান সোণার পাছরা॥

গরীবে চড়িয়া ফিরে খাসা তাজী ঘোড়া।
ফকিরের গাএ দিত খাসা কাপড় জোরা॥
তোমার বাপের কালেরা সব ছিল ধনি।
সোনার কলসী ভরি লোকে খাইত পানী॥
রূপার কলসী ভরি বিধবাএ জল খাইত।
কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না যাইত॥

দুই পহর মজুরি করে গৃহস্তের ঘর।
এক পহর দৌড়ায় ঘোড়া ময়দান পাত্যর॥
যার যেই নিত্য কর্ম্ম এড়ান না যাএ।
অশ্ব আরোহিয়া সেই মজুরির কৌড়ী হএ॥
দেড় বুরি কৌরি ছিল কানী ভুঞির কর।
চৌদ্দ বুরি কৌড়ী ছিল তঙ্কার মোকর॥
দশ তঙ্কার বাড়ী খাইত দেড় বুরি দিত।
বার মাস ভরিয়া বছরের খাজনা নিত॥
তোমার বাপের সৈন্য তুমি লৈলা লাড়ি।
ভুঞি পিছে ধরি লৈলা এক পণ কৌড়ী॥
এহার কারণে রাজা বহু দুঃখ পাইবা।
এসুখ সম্পদ তোক্ষা সব হাড়াইবা॥
কলির প্রবেশ হৈব জানিয়া নিশ্চএ।
এ কারণে স্বর্গে গেলা রাজা মহাশএ॥

উদ্ধৃত কতিপয় চরণ পাঠে বুঝা যায় মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজত্ব-কালে, প্রজার অবস্থা উন্নত ছিল। লোকে

পুণ্যের নিমিত্ত সরোবর ও রাজ-পথ নির্ম্মাণ করিত। দেশে সোনা-রূপার অভাব ছিল না। সাধারণ লোকে সোনার কলসীতে পানীয় জল সঞ্চিত রাখিত।

তৎকালিক নরপতিগণও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। সুতরাং বসন ভূষণে রাজা ও প্রজার বিভিন্নতা লক্ষিত হইত না। মজুরেরা এক বেলা মজুরি করিত। বৈকালে অশ্ব-পৃষ্ঠে ময়দানে ভ্রমণ করিত। প্রতিকাণী ভূমির বার্ষিক কর ৴৷৷ দেড় পয়সা ছিল। তাহাও কিস্তি অনুসারে আদায় হইত। কড়ি দ্বারা কর আদায়ের প্রথা ছিল। মহারাজ মাণিক-চন্দ্রের নামে মুদ্রিত টাকার মূল্য ৶১০ চৌদ্দ পয়সা ছিল।

"কলির প্রবেশ হৈব জানিয়া নিশ্চএ'।
"একারণে স্বর্গে গেলা রাজা মহাশএ" ॥

ইহা কবির অত্যুক্তি। অপেক্ষাকৃত খারাপ সময়, এই অর্থে বোধ হয় কলি শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপর আসন্ন কলির বিভীষিকা দেখাইয়া ময়নামতি পুত্রকে পুনর্ব্বার যোগী হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা এ রকম 'ন ছোড়বন্দ' জননীর পাল্লায় পড়িয়া তাঁহারই নিকট কাতর হইয়া 'আপিল" করিতে লাগি-লেন—"আমার এত সব ধন-সম্পত্তি আমি কাহাকে দিয়া যাইব?"—

অদুনা পদুনা এড়ি যাইমু কার ঘর?
*　　　*　　　*
এহি সব এড়ি যাইমু আপনে জানিয়া।
নব্রহ্মা পাড়ু এড়ি যামু উনশত বাণিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌর সহর।
দাদার মিরাশ যাবেক কমলাক নগর॥
তুঙ্কি মায়ের যত বাড়ি কলিকা নগর।
আঙ্কি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আঙ্কার গোচর।
আমা হইতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥

ময়নামতি কোথায় কি ভাবে কি "এড়িয়া" যাইতে হইবে সেই বিষয়ে পুত্রকে নিশ্চিন্ত করিয়া বলিলেন যে, অসার সংসারের জন্য এত মায়া ভাল নহে। তিনি গম্ভীর ভাবে পুত্রকে এই রোমহর্ষণকারী সংবাদ জানাইলেন যে, রাজা যখন মহিষীদের সঙ্গে 'রঙ্গরসে' মত্ত থাকেন তখন প্রত্যেক দিন যম তাহার খোঁজে আসে! এই পর্য্যন্ত ময়নামতি তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আর বেশী দিন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না!

রাজা 'গুবিচন্দ্র' এই কথা শুনিয়া বিষম ভয় পাইলেন—

রাজাএ বলে শুন মা গো মৈনামতি আই।
এক নিবেদন করি তুঙ্কি মায়ের ঠাঞি॥
বাপের কালের আছে চৌদ্দ রাজার ধন।
তুমি মাএর জোলা আছে হিরামন রতন॥
আঙ্কার কামাই আছে রজত কাঞ্চন।
চারি বধুর জোলা আছে চারি গোলা ধন॥
সর্ব্বধন দিব ভেট যমের গোচরে।
ধন পাইলে যমরাজ এড়ি যাবে মোরে॥

ময়নামতি বলিলেন যে, ধন দিয়াই যদি যমকে ফিরান যায় তবে মহাধনী তাহার পিতা মরিলেন কেন?

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন যে, তবে যমকে সৈন্য লইয়া তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে।

ময়নামতি বলিলেন যে, পৃথিবীতে গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ব্বে অনেক রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল কিন্তু তাহারাও যমের হাতে রক্ষা পায় নাই। যম যখন "য়ন দেখা" হইয়া আসিবে তখন সৈন্যে কি করিবে?—

তোমারে নিবারে যম নিত্য আলাপ করে।
এ কারণে আঙ্কি মাত্র বুঝাই তোমারে।

গোবিন্দচন্দ্র কাঁদিয়া পড়িলেন—

নৃপে বোলে শুন মা গ মৈনামতি আই।
এক নিবেদন করি তুঙ্কি মাএর ঠাই॥
তবে কেন বাল্য কালে বিভা করাইলা॥

কিন্তু ময়নামতি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেহ নহে কার।
পুত্র কৈন্যা সঙ্গে রাজা না যাবে তোঙ্কার॥

ধন জন দেখিয়া আপনা বোল তারে।
এ তনু আপনা নহে লৈয়া ফির যারে॥
কোন কর্ম্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত।
কি বুলি জোওাব দিবা স্বামীর সাক্ষাৎ॥
আসিতে লেংটা রাজা যাইতে যাইবা শৈন্য।
সঙ্গে করি লৈয়া যাইবা পাপ আর পুণ্য॥

রাজকুমার মার মুখে এ সকল বৈরাগ্যের কথা যে কেবল নীরবে শ্রবণ করিয়াছেন তাহা নয় বরং যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল যুক্তি, সকল প্রতিবাদ স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। মার কথায় রাজা সন্ন্যাসী হইতে মনস্থ করিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই, রাজবধূদের কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই মার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজবধূগণ সন্ন্যাসের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ মাত্র, তাঁহারা রাজার চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ স্থানের রচনা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। তাই কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

কান্দএ অদুনা নারী কান্দএ পদুনা।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চা-সোনা॥
অদুনার কান্দনে গাবীর গাব ছারে।
পদুনার কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে॥
রতনমালার কান্দনে প্রাণ নহে স্থির।
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যাএ চির॥
কাঞ্চাসোনা কান্দে রাজার চরণে ধরিয়া।
মৈনামতি বোলে তুহ্মি যাইবা যোগী হৈয়া॥
যে দেশে যাইবা প্রিয়া সে দেশে যাইব।
ধরিয়া যুগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব॥
তুহ্মি সে যুগীয়া রাজা আহ্মিত যুগিনী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনি॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্ধি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোহ্মা শোন প্রাণনাথ॥
এক সৈন্দা রান্ধি ভাত দুই সৈন্দা খাওাইমু।
হাটিতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু॥

রাজা বনের বাঘের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন—

"রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া যাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভএ দেখি ডরাইবা॥"

রাজবধূগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। বাঘের ভয় সামান্য কথা। তাই বলিতেছেন—

খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর।
তোহ্মা আগে মৈলে হৈব সাফল্য মোহর॥
যেদিন আছিন শিশু বাপ মাএর ঘরে।
সে দিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশ-ন্তরে॥
অখন যৌবন হৈল তোহ্মা বিদ্যমান।
তুহ্মি যুগী হৈলে প্রভু তাজিব জীবন॥

* * * *

এ হেন দএয়ার বন্ধু কি দোষে ছারিলা!
হেন প্রিয়া ছারি কেন বিদেশে চলিলা॥
তোহ্মার আহ্মার নষ্ট কৈল যেই জন।
নষ্ট কউরুক তার প্রভু নিরঞ্জন॥
আহে প্রভু গুননিধি কি বলিলা বাণী।
শুনিতে বিদরে বুক না রহে পরাণী॥
বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাড়ী।
প্রেমের কারণে কাকে কেহ না যাএ ছারি॥
সর্ব্ব দিন চরা করে বনের ভিতর।
সন্ধ্যাকালে চলি যাএ আপনা বাসর॥
হরিনা যাএ আগে আগে হরিণী যাএ পাছে।
সর্ব্ব দুঃখ পাশরএ স্বামী থাকে কাছে॥
সেই পশুর বুদ্ধি নাই তুহ্মি রাজার ঠাই
এত করে আমি নারী [illegible] তোহ্মারে বুঝাই
ইত্যাদি—

এস্থলে অদুনা-পদুনা (পদ্মমালা) প্রভৃতির নয়ন-জলে সিক্ত হইয়া কবির কবিতা বিনা অলঙ্কারেও মনোহারিণী হইয়াছে। রাজ-বধূগণের করুণ ক্রন্দনে

রাজার অন্তরও দ্রব হইয়াছে। রাজ-বধূগণ যে কেবল করুণ রোদন ও অশ্রু ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নহে, অদুনার পেটে সাত কাইতের বুদ্ধি।

"সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর"
অদুনা "রাগ লগিয়তে" রাজাকে মিঠাকড়া
বেশ দুই কথা শুনাইয়াছেন।

অদুনা অভিমানের সহিত বলিতেছেন—
"তোমার মাএর কথা নির্ণয় না জানি।
হেটে গাছ কাটীয়া উপরে ঢালে পাণী॥
তোহ্মার আহ্মার নষ্ট করে যেই জন।
নষ্ট কউরুক তারে প্রভু নিরঞ্জন॥
যে বুদ্ধিয়া রাজার কুমার বুদ্ধি নাহি তোর॥
বৃদ্ধ মাএর কথা রাখ ধরের ভিতর॥
এহি মাএর বাক্যে রাজা রাজ্য হাড়াইবা।
হাতে থাল করি ভিক্ষা মাগি খাইবা॥
এহি বাক্য শুনি রাজা বোলে হাএরে হাএ
রহিতে না দিল মোরে মএনামতি মাএ॥
না যাইব না যাইব প্রিয়া দেশ দেশান্তর।
সুখে রাজ্য করিব থাকিয়া নিজ ঘর॥"

অদুনা পদুনা প্রভৃতির করুণ বিলাপে রাজার মন ফিরিয়া গেল। রাজকুমার নিকুঞ্জ মন্দিরেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে মার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—

"রাজাএ বোলে শুন ম।গ মৈনামতী আই
পুণি নিবেদন করি তুহ্মি মাএর ঠাঞি॥
আরের মাএ বেটা চাহে রাখিবারে ঘরে!
তুহ্মি মাএ কহ মোরে যুগী হইবারে॥
আর মাত্র পুত্র দেখি দুগ্ধ ভাত খাওাএ।
নাতি পতি লৈয়া ঘরে আনন্দে গোঁয়াএ॥
তুহ্মি মাএর হিয়া খানী পাত্যরে বান্দিয়া।
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যুগী হৈয়া॥
অন্ন খাইতে তুহ্মি মোকে মানা কৈলা শুন।
পান খাইতে তুহ্মি মোকে মানা কৈলা পুন॥
শয্যাতে শুইতে তুহ্মি যে হেন মানা কৈলা।
মাও মোর প্রাণের বৈরী কি হেতু হৈলা॥"

এই সময় ময়নামতি নিজের 'জ্ঞান'-প্রাপ্তির বিবরণ বলিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে যোগী হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। রাজার সুযোগ হইল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার যদি ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ হইয়াছিল তবে রাজা মাণিকচন্দ্র মরিলেন কেন? ময়নামতি বলিলেন যে, রাজাকে নিজের ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই কিন্তু মাণিকচন্দ্র কিছুতেই স্ত্রীর নিকট জ্ঞান লইতে স্বীকৃত হন নাই।

রাজকুমারের মত পরিবর্ত্তন দর্শনে ময়নার রাগ চতুর্গুণ হইল। ময়না পুত্রের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। রাজকুমারের উভয় সঙ্কট। এক দিকে মায়ের তাড়না, অপর দিকে বধূদের গঞ্জনা। এখন কোন পথ অবলম্বন করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

তাহার পরে ময়নামতি রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর বিবরণ বলিতে লাগিল। মহারাজ মাণিকচন্দ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে গোমতী নদীর তীরে তাঁহার শবদেহ ভস্মীভূত করা হয়। তৎকালে গোমতী নদীকেই এই অঞ্চলে গঙ্গা বলা হইত। আষাঢ় মাসে মহারাজ লোকান্তরিত হন। বর্ষার জলে চতুর্দ্দিক জলময় ছিল। মৃত দেহের সৎকার হইতে পারে এমত স্থান ছিল না। গোমতী নদীতে চর পরায় অবশেষে ঐ চরেই চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। মহারাজের জ্ঞাতিগোত্র, ভাট দামোদর ও দ্বিজ শন্দিহর এবং সাউদ (সাধু বা সদাগর) লক্ষীধর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিল: এস্থলে এরূপ বর্ণনাত্মক আর কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

আষাঢ় মাসেতে মৈল মানিকচান্দ গোশাই
পৃথিবীতে জলমএ পুরিতে স্থল নাই ॥
ত্রৈত্য যুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল।
গোমতীর কুলে বসি কান্দিতে লাগিল ॥
আমার কান্দনে গঙ্গার স্নেহ উপজিল ॥
সমুদ্রের গঙ্গাদেবী ভাসিয়া উঠিল ॥
গঙ্গা বোলে মএনামতি কান্দ কি কারণ।
মোর হস্তে নিবেদিল গঙ্গার সদন ॥
মেহেরকুলের রাজা ছিল মানিকচাঁদ গোশাই
পৃথিবীতে জলমএ পুরিতে স্থল নাই ॥
এত শুনি গঙ্গাদেবী হাসিতে লাগিল।
তিন পহরের পন্থ লই বালু চর দিল ॥
আছিল চন্দন কাষ্ট আনিল কাটিয়া।
তোর বাপেরে এড়িলাম দীগল করিয়া ॥
আমি মৈনা সুতিলাম বা য়ঙ্গ চাপিয়া।
ভারে ভারে লাকরি সব দিলেন তুলিয়া ॥
কাচা হৈয়া পরে তনু করে থর থর।
উনাইয়া পরে রাজা অগ্নির ভিতর ॥
সেই সকল গাছ পুরি গ স্বর্গে উঠে ধুয়া।
সেই অগ্নিতে বহিল মুই যেন কাঞ্চা সোনা ॥
ব্রাহ্মণের* কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘিই।
সেই অগ্নিতে পোরা না গেল তিলকচান্দের ঝি ॥

এই বিবরণ শুনিয়া উপযুক্ত পুত্র "রাজা গোবিন্দাই" মাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—

রাজা বোলে শুন মাও মৈনামতি আই।
বাপ সঙ্গে গেছিলা নি সাক্ষী জানাও চাই ॥

সাক্ষী চাওয়াতে ময়নামতি কিছু বিপদে পড়িলেন—

সত্য যুগে মরি গেছে মানিকচান্দ গোশাই।
এত দিনের সাক্ষী আজ্ঞি কথা গেলে পাই ॥

* বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত গাথার মধ্যে আছে "ব্রহ্মার"; ব্রহ্মা শব্দই ঠিক পাঠ, কারণ ব্রহ্মা অগ্নি অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হেন সাক্ষী দিব হেন নাহি মেহারকুল।
হাসিতে হাসিতে মৈনাএ কহিতে লাগিল ॥
সেই দিনের তিন সাক্ষী আছে হেন জানি।
তাহারে আনিয়া শুন সে সব কাহিনী ॥
এক সাক্ষী আছে মোর ভাট দামোদর।
আর আছে যে ব্রাহ্মন শন্দিহর ॥
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউদ লক্ষীধর।
সাক্ষী আনিবারে শীঘ্র পাঠাএ অনুচর।

সাক্ষ্য প্রমাণে স্থির হইল যে, প্রকৃতই ময়নামতি সহমরণ যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আগুন তাহাকে পোড়াইতে পারে নাই। বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত গাথাতে এ স্থলে ময়নামতির অনেকগুলি পরীক্ষা প্রদানের কথা আছে কিন্তু এই পুস্তকে তাহা নাই।

অতঃপর আর ত আপত্তি টিকে না।

এক দিকে মাতৃভক্তি অপর দিকে পত্নী-প্রেম, যাহা হউক অবশেষে মাতৃ-ভক্তিরই জয় হইল। মাতৃ-আদেশ প্রতিপালন করিতেই সংকল্প করিলেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, ইহাই স্থির হইল।

রাজ-বধূগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিপদ গণিলেন। কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। বিপদে পড়িয়া তাঁহাদেরও সাহস বাড়িয়া গেল। অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তুত হইলেন। দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করা হইল। সন্ন্যাসে বিপত্তির কথা, আপনাদের সর্ব্বনাশের কথা বলিতে লাগিলেন ও রাজকুমার গৃহ ত্যাগ করিলে, তাঁহারাও জলে বা অনলে দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া নারী-বধের পাপের ভয় দেখাইতে লাগিলেন; অপর দিকে বিষ-প্রয়োগে বৃদ্ধ ময়নার প্রাণ নাশের জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ময়নামতিকে মারিবার জন্য বধূগণ নানা উপায় অবলম্বন করিল, কিন্তু এক বারও ময়নামতি মরিল না। রাজা গোবিন্দচন্দ্র বধূদের ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া তরবারি লইয়া তাহাদিগকে কাটিতে গেলেন, কিন্তু ময়নামতি বারণ করিয়া রাখিলেন। বধূদের এই রকম হীন ব্যবহার

দেখিয়া গোবিন্দের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং মাতাকে জানাইলেন যে, তিনি যোগী হইতে রাজি আছেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মায়ের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে চাহেন। নানারূপ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলে গোবিন্দচন্দ্র মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাকে কাহার নিকট জ্ঞান লইতে হইবে। ময়নামতি বলিলেন যে, হাড়িফার নিকট তাহাকে জ্ঞান লইতে হইবে। হাড়িফার নাম শুনিয়া রাজার শ্রদ্ধা হইল না, তাই আবার এক দফা হাড়িফার পরীক্ষা হইয়া গেল। পরীক্ষা শেষ হইলে রাজা যোগী হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং দিন দেখা হইয়া গেল। অদুনা-পদুনা রাজাকে ঘরে রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করিল না এবং কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল, কিন্তু রাজা যোগী হইয়া হাড়িফার পিছনে চলিলেন। ভাঙ্গের কড়ি কম পড়াতে হাড়িফা রাজাকে হীরা নটীর নিকট বিক্রয় করিয়া গেল। হীরা নটী রাজার দুর্দ্দশার একশেষ করিল। হীরা নটীকে অভিশপ্ত করিয়া হাড়িফা শিষ্যকে কিছুদিন পরে মুক্ত করিয়া আনিলেন এবং অবশেষে জ্ঞান লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র সংসারে ফিরিয়া আসিলেন।

পুস্তকের গল্পাংশ সংক্ষেপতঃ এই। বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যাইবে।

পুস্তকে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু ইহার প্রধান মূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ঘাটনে। যে সমাজের চিত্র পুস্তকে পাই, তাহা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজের চিত্র। রাজা মাণিকচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, মৃত মহারাজের জ্ঞাতিগোত্র একত্র হইয়া মৃত্যুর সপ্তম দিবসে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

"মানিকচন্দ্রের জ্ঞাতি গোত্র একত্র হইয়া।
সপ্ত দিন কাষ্ট কৈল লাড়িয়া চাড়িয়া॥"

এই রূপ দুইটি চরণ পুস্তকের দুই অংশেই পাওয়া যাইতেছে। এস্থলে "সপ্ত" শব্দ "সপ্তম" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, একটি মাত্র মৃত দেহ ঘৃত ও কাষ্ঠের অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে কখনই ক্রমান্বয়ে সাত দিন অতিবাহিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, দশ বা দশমের পর বঙ্গভাষায় পূরণবাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দে কোন পার্থক্য নাই। এবং প্রাচীন পুথির আলোচনা করিলে দেখা যায় পূরণবাচক স্থলে সংখ্যাবাচক এবং সংখ্যাবাচক শব্দ স্থলে পূরণবাচক শব্দ প্রয়োগের অভাব নাই। অনেক স্থলে সপ্তম অর্থেই সপ্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় সুতরাং এস্থলে "সপ্ত" শব্দ সপ্তম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মৃত্যুর সপ্তম দিবসে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, ইহা বৈদিক হিন্দুর কথা নহে। বাসী মরা হিন্দু-শাস্ত্রে দোষাবহ। সপ্তম দিবসে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কোন কারণও বর্ত্তমান দেখা যায় না। এই ঘটনায় গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দিনই স্মৃতি পথে উদিত হইতেছে।

"বুদ্ধদেব কুশী নগরের পথে জীবলীলা সংবরণ করিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কুশী নগরের মল্লগণ দলে দলে আসিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প-মাল্য ও গন্ধ প্রভৃতি দ্রব্যে ক্রমাগত সাত দিন তাঁহার দেহ পূজা করিল। অনন্তর তাহা শুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও বিবিধ গন্ধ দ্রব্যে আবৃত হইয়া চন্দন কাষ্ঠের চিতায় দগ্ধ হইল।"

বর্ত্তমান কালেও চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধগণ এ রূপে মৃত দেহ রক্ষা করিয়া কোনও স্থলে ৩।৪ দিন, উন্নত অবস্থা হইলে ৭।৮ দিন বা ততোধিক কাল পর চিতা রচনা করিয়া, তদুপরি শবদেহ স্থাপন পূর্ব্বক, বাতির অগ্নিতে দেহ নষ্ট করিয়া থাকেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত দেহও এরূপে মৃত্যুর সপ্তম দিবসে দগ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাতেও তাহার বৌদ্ধত্বই সপ্রমাণ হয়।

আবার প্রাচীন পুস্তকে যেমন দেব-দেবীর অর্চ্চনা, বন্দনা ও ভজনার কথা থাকে এ পুস্তকে তেমন কোন কথা পাওয়া যায় না। বরং অনাদি ও গঙ্গা ব্যতীত যে স্থলেই হিন্দু দেব দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া

যায়, সে স্থলেই তাঁহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত। ইহাও বৌদ্ধের একেশ্বরবাদ বলিয়া ধরা যায়।

মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়না গোরক্ষনাথের শিষ্যা। গুরু গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ তান্ত্রিক বলিয়াই পরিচিত। সুতরাং ময়নাকে বৌদ্ধ না বলিয়া আর কি বলিব? মৃত্যুর সপ্তম দিবসে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন, একেশ্বরবাদ ও হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দা এবং গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ, এই তিনটি ঘটনা হইতে এই ধারণাই বলবতী হইতেছে যে, ময়না ও তাঁহার স্বামী মাণিকচন্দ্র বৌদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেই সংকল্প করিয়াছিলেন। বধূগণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

গৃহ ত্যাগ করিতে হইলে রাজকুমারকে কি কি বৈভব ত্যাগ করিতে হইবে, কেহ বা তাহা রক্ষা করিবে, মাতা-পুত্রের মধ্যে তাহার আলোচনা হইতেছে। এস্থলে আলোচনার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি —

"এহি সব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া।
নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কমলাক নগর॥
তুন্ধি মাএর যত বাড়ী কনিকা নগর।
আন্ধি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আন্ধার গোচর।
আন্ধা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥"

"চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আন্ধার গোচর"—এই চরণ পাঠে বুঝা যায়, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের অধীনে ৪০ চল্লিশ জন সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহারা মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে কর প্রদান করিতেন। তৎকালীন এক জন রাজার পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কেবল এই কথাটি হইতেই মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ-বৈভবের একটা আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

"আন্ধি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর'

এই চরণ পাঠে বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুল সহরে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্রও মেহারকুল সহরেই রাজধানী নির্ম্মাণ করাইযাছিলেন।

"মেহারকুলের রাজা মৈল মানিকচান্দ গোসাই" এবং এ রূপ আরও ২।১ টি পদের দ্বারাই বুঝা-যাইতেছে যে, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের রাজধানী মেহারকুল সহরেই অবস্থিত ছিল। কুমিল্লা হইতে যে রাস্তা দাউদকান্দি গিয়াছে, সেই রাস্তার অনুমান ১০০ গজ উত্তরে লালমাই পাহাড়ের মধ্যে যে স্থলে লোকে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের বাস-ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি মেহারকুল পরগণারই অন্তর্গত। এখন সে স্থানে একটি সরোবর ও উহার চতুঃপার্শ্বে ভূপ্রোথিত সংখ্যাতীত ইষ্টকরাশি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কমলাক নগর"—

গোবিন্দচন্দ্রের এই উক্তিতে বুঝা যায় "কমলাক নগর" তাহার দাদা অর্থাৎ মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতার রাজধানী ছিল, এবং গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের কালে সে স্থানে আর রাজধানী বর্ত্তমান না থাকায় মিরাশ বলা হইয়াছে। সুতরাং মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতাকে 'কমলাক' নগরের নরপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এস্থলে একটি অতি পুরাতন কথা স্মরণ হইতেছে।

এই 'কমলাক' নগর মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতার রাজধানী; এই কথা প্রাচীন কমলাঙ্কের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে।

"কমলাক" শব্দটিকে কমলাঙ্কের সহজ শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে কি ভাষাতত্ত্ববিদ্, কি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কি ঐতিহাসিক, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তৎকৃত 'রাজমালার' এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন "যে সময় মিঃ ইলিয়ট কুমিল্লাতে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় এই পর্ব্বত-মধ্যে, "রণবঙ্ক মল্ল" রাজার নামীয় একটি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ তাম্রলিপি-

খানি ১১৪১ শকে লিখিত। ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় "রণবঙ্ক মল্ল" নামক জনৈক নরপতি কমলাঙ্ক ও পাটীকারা প্রভৃতি স্থানে রাজ-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।"

এই তাম্রলিপির উপর নির্ভর করিলে এবং "দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক 'কমলাক' নগর' এই চরণের "কমলাক" শব্দটি কমলাঙ্কের সহজ সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পিতাকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন কমলাঙ্কের শেষ নরপতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

"বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর"—গোবিন্দ-চন্দ্রের এই উক্তিতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মাণিক-চন্দ্রের সহিত প্রাচীন গৌড়ের সম্বন্ধ ছিল, এবং গোবিন্দ-চন্দ্রের সময়ও সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

"বৃদ্ধ রাজা পরি মৈল গৌড়র গোসাই"—রাজকুমার গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে 'তিলকচান্দের' কন্যা ময়নামতির এই শোকোক্তি পাঠ করিয়াও এই ধারণাই জন্মিতেছে, এবং ময়নামতির সংলগ্ন "রামপাল" নামে বর্ত্তমান সময়ে একটি গ্রাম আছে দেখিয়া এই ধারণা আরও বলবতী হইতেছে। তবে কি সূত্রে প্রাচীন কমলাঙ্কের সহিত গৌড়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এ পুস্তকে কোনও কথা নাই। ভবিষ্যতে আরও ভাল প্রমাণ না পাইলে এ রহস্য উদ্ধার করাও সহজ হইবে না।

মহারাজ মাণিকচন্দ্রকে পূর্ব্বে বৌদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি কোন সময় রাজত্ব করিতে-ছিলেন তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে যাওয়া সহজ নয়। এই পুস্তকের এবং ২।১ খানা প্রস্তর-লিপির সাহায্যে তাহার কতক আভাষ মাত্র দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিজ শন্দিহর মহারাজ মাণিকচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর বার বৎসর পরে ময়নার সহমরণ সম্বন্ধে দ্বিজ শন্দিহর সাক্ষ্য দিয়াছেন।

"বার বছর হএ মৈল মানিকচান্দ গোসাই"—ইহা দ্বিজ শন্দিহরের উক্তি। ইহারও প্রায় এক বৎসর কাল পরে গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সুতরাং মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বার বৎসর ও কতিপয় মাস অতীত হইলে পর গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করেন। গোবিন্দচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া সরিপু নগরে ছাগল চরাইতেন। ছাগলরক্ষকের কার্য্যে তিনি ১২ বৎসর অতিবাহিত করেন।

"ছাগল রাখএ তেঞি এ বার বছর"—ইহা গোবিন্দ-চন্দ্রের উক্তি। এস্থলে এগার বছর অতীত হইয়া কতিপয় মাস গত এরূপ অনুমান করিলে বার বৎসর কথাটা অর্থ-শূন্য হয় না।

এই দুইটি সময় দ্বারা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ হইতে গোবিন্দচন্দ্রের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মোট সময় মোটামোটী অবগত হওয়া যায়। এই ভাবে সম্পূর্ণ বার বৎসর ও কতিপয় মাস যোগ করিলে মোটামোটী ২৪ বৎসর পাওয়া যায়।

আবার "তীরুমলয়ের" উৎকীর্ণ শিলা-লিপি পাঠে জানা যায়, রাজেন্দ্র চোল ১০২১ খৃঃ অব্দে ময়নামতির রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। ১০২১ খৃঃ অব্দ হইতে তৎপূর্ব্ব সম্পূর্ণ ২৪ বৎসর গণনা করিয়া ৯৯৭ খৃঃ অব্দ পাওয়া যায়।

আবার—"আষার মাসেতে মৈল মানিক চান্দ গোসাই"—এই চরণের অনুসরণ করিয়া ৯৯৭ খৃঃ অব্দের আষাঢ় মাসে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পরলোক গমন ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য-প্রাপ্তি হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়।

ইহার সহিত বার বৎসর কতিপয় মাস যোগ করিয়া ১০০৯ খৃঃ অব্দের শরৎ কি হেমন্ত কাল গোবিন্দ-চন্দ্রের সন্ন্যাসের সময় ধরা যায়। তৎপর আরও সম্পূর্ণ ১১ বৎসর ও কতিপয় মাস যোগ করিয়া ১০২১ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগ গোবিন্দচন্দ্রের গৃহাগমনের সময় নিরূপিত হয়।

এই হিসাবে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই।

এরূপ অবস্থায় রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত।

আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য

প্রথমাংশ

(দেবালয়ে পঠিত)

আলোক ও বায়ুকে আমাদের প্রাণস্বরূপ বলিলে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না। বায়ুর অভাবে আমরা অতি স্বল্প সময়ও জীবন-ধারণ করিতে পারি না। প্রত্যেক বার নিশ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প বা অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়াই আমরা জীবনের ইন্ধন যোগাই। আলোক জগতের তেজস্বরূপ; আলোকের সাহায্যেই সৃষ্টি চলিতেছে।

বায়ু

বায়ু ব্যতীত যখন আমাদের প্রাণ-ধারণ অসম্ভব তখন বায়ু সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। সকল বায়ুই কি জীবনরক্ষক? না, তাহা নহে। কেবল বিশুদ্ধ বায়ুই জীবন রক্ষা করে। বায়ু দূষিত হইলে প্রাণরক্ষা দূরে থাকুক প্রাণ নাশ হয়, বা নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

৭৯·০২
২০·৯৪
·০৪
১০০·০

বায়ু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে ৭৯·০২ ভাগ নাইট্রোজেন, ২০·৯৪ ভাগ অক্সিজেন ও প্রায় ·০৪ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস আছে। তাহা ভিন্ন সামান্য জলীয় বাষ্প ও আর্গন্, ক্রিপটন্, নিওন, মেটার্গন প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থও আছে। সুতরাং ৫ভাগ বাতাসের ৪ ভাগই নাইট্রোজেন।

যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন

যদিও এই নাইট্রোজেনই সর্ব্বাধিক তথাপি উহা আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আসে না; তবে গুণের মধ্যে এই যে, উহা কোন অপকারও করে না। উহা বায়ুমধ্যস্থিত অক্সিজেনকে তরল (Dilute) করিয়া আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের উপযোগী করে এবং উহার দাহিকা শক্তির মৃদুত্ব সম্পাদন করে। কেবল নাইট্রোজেন আমাদের প্রাণ রক্ষণে অসমর্থ। বায়ুতে যদি কেবল নাইট্রোজেনই থাকিত তবে আমাদের শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিত। বক্রী ১ ভাগের প্রায় পৌনে ষোল আনাই অক্সিজেন গ্যাস।

অম্লজান বাষ্প বা অক্সিজেন গ্যাস

বায়ুর মধ্যে যত জিনিস আছে তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। সংসারে যত প্রাণী আছে ইহা ভিন্ন কেহই বাঁচিতে পারে না। জগতে যত জিনিস পোড়ে, যত আলো জ্বলে,এক বৈদ্যুতিক আলো ভিন্ন ইহার অবর্ত্তমানে কিছুই ঘটে না। এই অক্সিজেনের সাহায্যে শুধু যে কাঠ,কয়লা প্রভৃতি নানাবিধ দাহ্য পদার্থ পোড়ে তাহা নহে; আমাদের দেহও উহা দ্বারা নিয়ত দগ্ধ হইতেছে (oxidation). আমাদের শারীরিক উত্তাপ এই দহন-ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। বায়ুতে যদি অক্সিজেন ভিন্ন অপর কোন উপাদান না থাকিত, তবে আমাদের দেহে দহন-ক্রিয়া এত শীঘ্র সম্পন্ন হইত যে, উহা অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত ও আমাদের জীবন-দীপ জ্বলিয়া উঠিতে না উঠিতেই পুড়িয়া শেষ হইত।

ওজোন

এই অক্সিজেন কখনও কখনও ওজোন আকারে বায়ুতে থাকে। ওজোনকে অক্সিজেনের রূপান্তর বলা যাইতে পারে; তিন ভাগ অক্সিজেন মিলিয়া দুই ভাগ ওজোনে পরিণত হয়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র ও ইহার দাহিকা শক্তি অক্সিজেন হইতে অনেক অধিক। ওজোন

প্রধানতঃ বায়ুতে বজ্র-পাতে সৃষ্ট হয়। যে সব স্থানে বায়ু খুব বিশুদ্ধ ইহা সেই সব স্থানে থাকে। ইহা ঘনীভূত আকারে (concentrated form) নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে বা চক্ষে লাগিলে ঐসব স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করে, কখনও বা সর্দ্দি হয়। অত্যন্ত ঘনীভূত আকারে ইহা গ্রহণের অনুপযোগী ও ঐ অবস্থায় গ্রহণ করিলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

শুধু অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া মানুষ কিছু দিন বাঁচিতে পারে, তবে ক্রমে উহার তাপ হরণ করিয়া শীতল করিতে থাকিলে প্রায় ৪৫ ডিগ্রী ফারণহেটে পৌঁছিবার সময়ই মাদকতা (narcotism) ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় এবং ক্রমে মৃত্যু ঘটে।

দ্ব্যম্লাঙ্গারক বা কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস

সর্ব্বস্থানের বায়ুতেই কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস পাওয়া যায়। ১০০০০ ভাগ বায়ুর মধ্যে ইহা ৪ ভাগ মাত্র থাকে। অঙ্গার মাত্রই অক্সিজেনের সাহায্যে দগ্ধ হইয়া কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস সৃষ্টি করে। গাছপালা ও জীব জন্তুর পচনেও ইহার সৃষ্টি হয়।

আমাদের প্রশ্বাসের সহিত ইহা নিয়তই বায়ুতে আসিতেছে। রোগে, শ্রমান্তে, নিদ্রায়, উপবাসে ও আহারান্তে প্রশ্বাসে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। এক জন পূর্ণবয়স্ক লোক প্রতি-ঘণ্টায় প্রায় ২০ লিটার আয়তনের কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করে। ইহা হইতে প্রায় ১৬৩ গ্রেণ কয়লা পাওয়া যায়। সুতরাং প্রতিদিন এক জনের শরীর হইতে প্রশ্বাসের সহিত প্রায় এক পোয়া (।/।) কয়লা বাহির হয়। এতটা কয়লা রোজ আমাদের দেহ-চুল্লীতে অক্সিজেন-সংযোগে দগ্ধ হইতেছে, এবং উহা হইতেই শরীরের যত উত্তাপ, যত তেজ, যত কার্য্যকরী শক্তি—এবং উহা দ্বারাই জীবন চলিতেছে। অধিক মাত্রায় ইহা বায়ুতে থাকিলে বায়ু দূষিত বলিয়া গণ্য হয়।

জলীয় বাষ্প

বায়ুর মধ্যে সর্ব্বদাই কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। সমুদ্র, হ্রদ, নদ-নদী, পুষ্করিণী, খাল-বিল, ডোবা প্রভৃতি সমস্ত জলাশয় হইতেই অলক্ষিত ভাবে জলীয় বাষ্প অনবরত বায়ুতে সঞ্চারিত হইতেছে। ইহা বায়ুতে ১০০ ভাগের মধ্যে ১ কি ১½ ভাগ থাকে। এই জলীয় বাষ্প না থাকিলে বায়ু গ্রহণের উপযোগী হইত না। ইহার অভাবে বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক হয়; এমন কি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী-সমূহের প্রদাহ উৎপাদন করে। ইহার অভাবে জীব-জন্তু, বৃক্ষ প্রভৃতি কিছুই বাঁচে না।

যদি ইহা বায়ুতে বেশী পরিমাণে থাকে তবে বায়ু অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। এবং তাহা হইতে সর্দ্দি, কাশী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

দূষিত পদার্থ

এই ত গেল বিশুদ্ধ বায়ুর কথা। আমরা সর্ব্বদা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহা কি বিশুদ্ধ? প্রায়শঃই না। বাতাসের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ থাকে। তাহাদের মধ্যে এমোনিয়া, নাইট্রাস্ ও নাইট্রিক্ এসিড, দ্ব্যম্লাঙ্গারক বা কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, অম্লঅঙ্গারক বা কার্ব্বণ মনোকসাইড গ্যাস, অঙ্গার-উদজান বা কার্ব্বরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস, সাল্‌ফিউরাস এসিড, শোধক উদজান বা সাল্‌ফুরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস, সিউয়েজ গ্যাস (Sewage Gas), মার্স গ্যাস বা জলাভূমির গ্যাস (Marsh Emanations) এবং নানাবিধ ভাসমান দ্রব্যাদি থাকে (Suspended matters).

দূষিত বায়ু ও স্বাস্থ্য

বায়ুর মধ্যে যে এই সব জিনিস থাকে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কাহার কি প্রভাব তাহা জানিতে হইলে ইহাদের আলোচনা আবশ্যক। সেই জন্যই এই সব কথার একটু অধিক নাড়াচাড়া করিলাম।

এই সকল অতি সামান্য ভাগে বায়ুতে বর্ত্তমান থাকে। এমোনিয়া প্রায় ১০০০০০০০ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগ মাত্র বর্ত্তমান থাকে।

এমোনিয়া, নাইট্রাস ও নাইট্রিক এসিড

যে সব স্থানে নাইট্রোজেন যুক্ত উদ্ভিজ্জ বা জান্তব পদার্থ পচে, সাধারণতঃ সেই সব স্থানে এই সকলের উৎপত্তি হয়। বায়ু হইতে বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া ইহারা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে এবং তথায় গাছপালার খাদ্যরূপে তাহাদের পুষ্টি বর্দ্ধন করে। এই সকলের, বিশেষতঃ এমোনিয়ার গন্ধ অতিশয় তীব্র। অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। অল্প পরিমাণে গৃহীত হইলে শ্বাস-নালী ও ফুস্ফুসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করে। সাধারণতঃ বায়ুতে ইহা এত কম যে, ইহাতে কোন ক্ষতিই হয় না। কর্ম্মকার প্রভৃতি যাহারা সোনা, রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতুঘটিত জিনিসের কাজ করে, তাহারা ঐ সব গলাইবার বা পরিষ্কার করিবার দরুণ নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও নাইট্রিক এসিড বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় অসাবধানতা বশতঃ ইহার উগ্র তেজে শ্বাস-রোধ হইয়া কাহারও বা মৃত্যু ঘটে। ইহা হইতে নির্গত ধূমে শ্বাস-নালী ও ফুস-ফুসের প্রদাহ হইয়া ঐ সকলের ব্যাধিও উৎপন্ন হয়। শিরোবেদনা, সর্দ্দি প্রভৃতি হইলে আমরা শিশির মধ্যে একরূপ সুগন্ধ উগ্র ঔষধের ঘ্রাণ গ্রহণ করি (Smelling salt). উহার প্রধান উপাদানই এমোনিয়া। নানারূপ সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া স্মেলিং সল্ট নামে উহা বাজারে বিক্রীত হয়। নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে এমোনিয়ার উগ্র গন্ধে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস ১০০০০ ভাগের মধ্যে ৪ ভাগেরও কম থাকে। উহা যদি বায়ুতে হাজার করা ৭৫ ভাগ থাকে তবে তাহাতে প্রাণীর ধ্রুব মৃত্যু হয়। হাজার করা যদি ১৫ ভাগ থাকে তবে মাথা ধরা প্রভৃতি নানারূপ শিরঃ-পীড়া হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, এবং দৈহিক অবসাদ আনয়ন করে। খুব বেশীর ভাগ থাকিলে সংজ্ঞা লুপ্ত হয় ও শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস

ইহা যদি হাজার করা ১০ ভাগের নীচে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু হাজার করা ৬ ভাগের উপরে থাকিলেই উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। কোন জনাকীর্ণ স্থানে গেলে কিরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে যেন কষ্ট বোধ হয়, অধিক ক্ষণ থাকিলে মাথা ধরে এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। ঐ স্থানের বায়ু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস হাজার করা ৬ ভাগের বেশী দাঁড়াইয়াছে। এই যে কষ্ট ইহা সম্ভবতঃ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের পরিমাণ অধিক বলিয়া নহে, ইহা অক্সিজেনের অভাব-জনিত ও আমাদের শরীরের চর্ম্মাদি হইতে ঘর্ম্ম ক্লেদ প্রভৃতি যে সব জৈব (organic) পদার্থ বহির্গত হয় তাহার দরুণ। এই জৈব পদার্থ সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় নাই, তবে উহা অতিশয় বিষাক্ত। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল, অলস এবং স্ফূর্ত্তিহীন করে ও মাথাধরা প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার বাস্তব ঘটনা যাহাই হউক, উহা অল্প স্থানে বহু লোক একত্রিত হওয়ায় প্রশ্বাস জনিত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস্ ও শরীর হইতে নির্গত জৈব পদার্থ-সমূহ দ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া সংঘটিত হইবার কথা। লণ্ডনডারী নামক একখানা জাহাজে এক বার অত্যন্ত ঝড়ের সময় প্রায় ২০০ ব্যক্তি ভয়সঙ্কুল হইয়া ১৮ ফিট লম্বা, ১১ ফিট প্রস্থ ও ৭ ফিট উচ্চ একটি কামড়ায় এক রাত্রি যাপন করে। তাহার ফলে পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে, ইহার মধ্যে ৮০ জন লোক মারা গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস অল্প মাত্রায় অর্থাৎ হাজারকরা ৬ ভাগের অল্প অধিক উপরে থাকিলেই যে

কোন ক্ষতি হইবে না তাহা নহে। উহা আস্তে আস্তে জীবনী শক্তি ধ্বংস করিবে। দেহ বলহীন ও মন স্ফূর্ত্তিহীন করিয়া কর্ম্মে অক্ষম করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও নৈতিক অবনতিও ঘটিবে। যদিও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বায়ুতে অধিক পরিমাণে থাকিলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আমাদের প্রাণ বিয়োগ হয়, তথাপি ইহাকে প্রকৃত পক্ষে বিষাক্ত বলা যাইতে পারে না। উহা অক্সিজেনের স্থান অধিকার করে বলিয়াই মৃত্যু ঘটে। যদি অধিক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত অধিক পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া যায় তবে বিশেষ কোন কুফল ঘটে না। এ কথাটা বোঝা একান্ত আবশ্যক; কারণ বায়ু দূষিত কি না, শ্বাস-গ্রহণের যোগ্য কি না তাহা জানিতে হইলে বায়ুতে কি পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস আছে আমরা সচরাচর তাহাই দেখিয়া থাকি। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, উহাই যত অনিষ্টের মূল। কিন্তু তাহা নহে। উহার পরিমাণ সহজে লওয়া যায় বলিয়াই উহার পরীক্ষা করা হয়। উহা স্বাভাবিক হইতে বেশী হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ অত্যন্ত কম হইয়াছে।

কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী। এই জন্য ইহা নিম্ন স্থানসমূহে আবদ্ধ থাকে—পর্ব্বতের গুহায়, খনিতে, পুরাতন কূপ প্রভৃতিতে থাকে, সুতরাং ঐ সকল স্থানে নামিবার পূর্ব্বে সাবধানতার আবশ্যক। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস নিজে দাহ্য নহে বা দহন-ক্রিয়ারও সহায়তা করে না। একটি জ্বলন্ত বাতিকে যদি এই এসিড পরিপূর্ণ স্থানে নামাইয়া দেওয়া যায় তবে উহা তখনই নির্ব্বাপিত হইবে। সুতরাং ঐরূপ স্থান সমূহে যাওয়ার পূর্ব্বে তথায় জ্বলন্ত বাতি নামাইয়া দেখা কর্ত্তব্য উহা জ্বলিতে থাকে কি না। যদি নিবিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তথায় গেলে প্রাণ-বিয়োগ ঘটিবে; আর যদি জ্বলিতে থাকে, তবে জীবননাশের আশঙ্কা অনেকটা কম।

কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস নিশ্বাস গ্রহণের অনুপযুক্ত হইলেও অন্য প্রকারে আমাদের কাজে লাগে। অত্যধিক চাপ-সংযোগে ইহা সোডা ওয়াটার, লিমনেড প্রভৃতি নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য অশেষগুণসম্পন্ন মুখরোচক পানীয় দ্রব্য প্রস্তুতে সহায়তা করে।

অম্ল-অঙ্গারক বা কার্ব্বণ মনোক্সাইড গ্যাস

কয়লা প্রভৃতি অল্প বায়ু-সংযোগে পুড়িলে ইহার সৃষ্টি হয়। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। হাজারকরা ১ ভাগ মাত্র থাকিলেই ইহা প্রাণনাশের কারণ হয়। মাথাধরা, মাথাঘোরা, মস্তকের চতুর্দ্দিকে শক্ত একটা বাঁধনের মত, চিন্তার বিপর্য্যয় ও অন্যবিধ নানা উপসর্গ হয়; বেশীর ভাগ থাকিলে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

শীতকালে অনেক লোকে গৃহে কয়লার আগুন জ্বালাইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। রুদ্ধ গৃহে প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বণ মনোক্সাইড গ্যাস সৃষ্ট হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাসের সহিত গৃহীত হয়, এবং এই রূপে বার বার শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে মৃত্যু ঘটে। সুতরাং গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, বিশেষতঃ ঘরে কয়লা প্রভৃতি জ্বালিয়া, কিছুতেই শয়ন কর্ত্তব্য নহে। আমাদের দেশ অপেক্ষা ইউরোপেই এ সব ঘটনা বেশী হয়, কারণ তদ্দেশে শীতাতিশয্যের দরুণ প্রায় প্রত্যেক গৃহেই অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা হয়। অবশ্য ইহার অধিকাংশ স্থানেই চিমনী প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে আগ্নেয় দূষিত পদার্থের বহির্গমনের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু তথাপি অনেক সময়েই কার্ব্বণ মনোক্সাইডে মৃত্যুর দুর্ঘটনা খবরের কাগজে পড়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার এই রূপে মৃত্যু ঘটে। এ সকলই অসাবধানতার দরুণ ঘটিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও যে এরূপ ঘটনা না ঘটে তাহা নহে। অধিকাংশ সময়ে সূতিকা-গৃহেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। সূতিকাগারে রাত্রে সাধারণতঃ শীতকালে প্রায়ই কাঠ কিংবা কয়লা জ্বালান হয়, এবং প্রসূতি ও নবজাত সন্তানের শরীরে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে যদিও সব সময়ে মৃত্যু না

ঘটুক প্রায়শঃই জননী ও সন্তান উভয়ের স্বাস্থ্য চিরকালের মত নষ্ট হয়—সুতরাং এবিষয়ে সকলেরই বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। আমাদের দেশে শিশুর ও প্রসূতির উভয়েরই মৃত্যুর হার অত্যধিক, সুতরাং যাহাতে সূতিকাগারে ভাল রূপে বায়ু যাতায়াতের বন্দোবস্ত থাকে সে বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

ইহাকে মিথেন বা মার্শ গ্যাসও বলা হইয়া থাকে।

অঙ্গার-উদজান বা কার্ব্বুরেটেড হাইড্রোজন গ্যাস

বায়ুতে ইহা অতি সামান্য পরিমাণে থাকে। ইহা সাধারণতঃ কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতির খনিতে থাকে—জলা স্থানে উদ্ভিজ্জ পচিয়াও ইহার সৃষ্টি হয়। অল্প-স্বল্প থাকিলে ইহাতে কোন অনিষ্ট করে না, তবে যদি হাজার করা ৩০০ ভাগের উপরে থাকে তবে প্রাণ নাশের আশঙ্কা হয়।

সালফিউরাস এসিড্

ইহা বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, যে সব স্থানে অত্যন্ত কয়লা পোড়ান হয় বা আলোর জন্য গ্যাস (coal gas) তৈয়ারি হয় সেই সব স্থানেও পাওয়া যায়। ইহা মানুষের বিশেষ কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু গাছ-পালার অনিষ্ট করে।

শোধক উদজান বা সালফুরেটেড্ হাইড্রোজেন

ইহা অতি দুর্গন্ধ যুক্ত। ডিম পচিলে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়। গ্যাসের কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, ও জলা-ভূমি প্রভৃতির নিকটেও ইহা থাকে। সাধারণতঃ মানুষের কোন অপকার করে না। তবে বেশীর ভাগ থাকিলে নানারূপ পীড়া জন্মে।

সিউয়েজ গ্যাস
Sewage Emanations.

বিলাতের অধিকাংশ স্থানেই জলনিঃসরণের জন্য পয়ঃ-প্রণালী আছে ও পায়খানার মলমূত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য নর্দ্দামা আছে। আমাদের দেশে এ সকলের প্রায়ই সুবন্দোবস্ত নাই। পাকের ঘরের নিকটে ফেন, ভাত, ডাল, তরকারী, ছাই-ভস্ম, গৃহধৌত জল প্রভৃতি কোন জিনিসই বা নিক্ষেপ করা না হয়। ঐ সব পচিয়া যে ভীষণ দুর্গন্ধ হয় তাহা মনে হইলেও গা বমি বমি করে।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ যে সব স্থানে ড্রেইনের পাইখানা নাই সেই সব স্থানে, মল, মূত্র ও জল প্রভৃতি নিক্ষেপের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা নাই। সমস্তই এক এক স্থানে জমা হয় ও তাহা অতি সত্বরে পচিয়া নানারূপ দুর্গন্ধময় দূষিত গ্যাস সৃষ্টি করে। অধিকাংশ মূত্রত্যাগের স্থানগুলি কি দুর্গন্ধময়! আমাদের দেশের অধিকাংশ পাইখানায়ই নাকে কাপড় দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু এ সব বিষয়ের প্রতিবিধান বিষয়ে অধিকাংশ লোকই নিশ্চেষ্ট। শুধু মিউনিসিপালিটি ও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিধান করিতে পারেন না; আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত চেষ্টাও একযোগে প্রয়োজন।

এই সব নর্দ্দামা প্রভৃতি হইতে যে সব গ্যাস উঠে, তাহাদের মধ্যে অক্সিজেনের ভাগ কম ও কার্ব্বনিক এসিডের ভাগ বেশী থাকে। নানারূপ অজৈব ও জৈব পদার্থও থাকে। এই দূষিত বায়ু হইতে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য উদরাময়, শিরঃপীড়া, গলার ভিতরে ঘা প্রভৃতি হয়। অনেক সময়ই এই রূপ স্থানে ডিপথেরিয়া বা গলফাঁস, বিসূচিকা বা কলেরা এবং টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির জীবাণু অতি সহজে জন্মে এবং বাসগৃহের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই সব স্থান হইতে সহজে মানুষকে আক্রমণ করে—সুতরাং এই সব দুর্গন্ধময় পয়খানালাগুলি যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা বলিবার নহে এবং প্রত্যেক কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই ইহার শোধন, উপযুক্তরূপে নির্ম্মাণ ও যথারীতি পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

মার্স গ্যাস সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মার্স গ্যাস বা জলাভূমির গ্যাস।

জলাভূমিতে গাছপালা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও নানারূপ জান্তব পদার্থ পচিয়া মার্স গ্যাস ভিন্ন, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, সালফুরেটেড্ হাইড্রোজেন,

প্রভৃতি আরও নানাবিধ গ্যাস জন্মে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই জলাভূমির গ্যাস হইতে লোকের ম্যালেরিয়া হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ সব স্থান মশা প্রভৃতি জন্মিবার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র (মশক বংশের মধ্যে এনোফেলিস জাতীয় মশা দ্বারাই ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হয়) বলিয়াই লোকের ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐ সব দূষিত গ্যাস হইতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হয় ও ম্যালেরিয়া ভিন্নও নানারূপ জরাদি হয় যাহার তত্ত্ব আজিও সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। সুতরাং বাসগৃহ এবং নগর নির্ম্মাণ করিতে হইলে এই সব জলাস্থান হইতে দূরে করা কর্ত্তব্য।

বায়ুতে ভাসমান দ্রব্যাদি। (Suspended matters)

দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া যদি একটি সূর্য্যরশ্মি ঘরে আসিয়া পড়ে তবে তাহার ভিতর অনেক ছোট ছোট কণিকা ভাসিতে দেখা যায়। প্রায় সর্ব্বস্থানের বায়ুতেই ইহা বর্ত্তমান; তবে পর্ব্বতের শিখরদেশে বা সমুদ্রের দূরতম প্রদেশের বায়ুতে উহা দেখা যায় না। এই ভাসমান পদার্থের কতক অংশ জৈব (organic) এবং কতক অংশ অজৈব, (inorganic) অজৈব পদার্থের মধ্যে ছোট ছোট বালুকণা, ধূলি, কয়লার গুঁড়ি, চুণ, লবণ, তাম্র সীসা, কাঁসা, লৌহ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতব রেণু, প্রস্তর জাতীয় জিনিসের গুঁড়া এবং আরও বিবিধ পদার্থ

ভাসমান দ্রব্যের ব্যাধি উৎপাদনে সহায়তা।

চূর্ণাবস্থায় বায়ুসাগরে সন্তরণ করে। এই সব জিনিস অধিক পরিমাণে বায়ুতে থাকিলে চক্ষু, নাসিকা, কণ্ঠনালী, চর্ম্ম, ফুস্‌ফুস্‌ ও অন্ত্র প্রভৃতির ব্যাধি হয়। উহা ঐ সকল কণিকার ঘর্ষণ হইতে হয় (mechanical irritation). সাধারণতঃ চক্ষু লাল হইয়া জল পড়ে সর্দ্দি হয়, গলার ভিতরে কাটা কাটা বোধ হয় বা ফুস্‌ফুসে কাশী হয়—নানারূপ চর্ম্মরোগ জন্মে ও হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি ফুসফুসের ব্যাধি এবং অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি পেটের ব্যারাম হয়। যাহারা সর্ব্বদা টিন, পিতল, কাঁসা প্রভৃতির কাজ করে—চুণ বা বালুর কাজ করে, সূঁচ নির্ম্মাণ করে, করাত দ্বারা কাঠ চিড়ে, ছুড়ি, কাঁচি শান দেয়, গ্লাস, সিমেণ্ট প্রভৃতি তৈয়ার করে তাহাদের প্রায়ই সর্দ্দি, কাশী, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানী বা যক্ষ্মা হয়। অন্যান্য সূক্ষ্ম চূর্ণিত পদার্থও এই সব ব্যাধি সৃষ্টি করিতে পারে। যাহারা কয়লার খনিতে কাজ করে তাহাদের যে ক্ষয়-কাশ জন্মে তাহাকে কলিয়ার্স থাইসিস (Colliers Phthisis) বলা হইয়া থাকে। উহা ভিন্ন এই সকল কণিকা কণ্ঠনালীর ব্যাধিও সৃষ্টি করে। অনেক সময়ে ইহাই গলার ভিতরে ক্যান্সার (Cancer) নামক ভয়ানক ব্যাধির প্রধান কারণ।

সীসা, তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতির চূর্ণ পেটের ভিতরে গেলে পেটবেদনা, অজীর্ণ ও উদরাময় প্রভৃতি হয়।

সীসা হইতে পেটে যে গুরুতর বেদনা রোগের সৃষ্টি হয় তাহাকে লেড কলিক (Lead Colic) বলে। চুণ কয়লা প্রভৃতির গুঁড়া চক্ষুতে লাগিলে চক্ষুর প্রদাহ উৎপাদন করে।

জৈব ভাসমান পদার্থ দ্বারাও বহু ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং উহা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর। পাট, শণ, কার্পাস, রেশম প্রভৃতি দ্বারা সর্দ্দি, কাশী, যক্ষ্মা প্রভৃতি হয়।

ইংলণ্ডে একজাতীয় গাছের ফুলের রেণু দ্বারা হে ফিবার (Hay Fever) হয়। আমাদের দেশেও নূতন ধান্যের ও আম্র মুকুলের গন্ধ দ্বারা অনেকের হাঁপানি হয়। শাল বৃক্ষের ও গজারী বৃক্ষ সমুদায়ের যখন ফুল হয় তখন সেই সব স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে রোগের মধ্যে জ্বরই প্রধান।

আমাদের দেহ হইতে ক্লেদ, ঘর্ম্ম, চুল, থুথু, মল, মূত্র, বীজাণু প্রভৃতি কত জিনিসই প্রতিনিয়ত বাতাসে যাইতেছে। ঘা প্রভৃতি হইতে পূঁজ বা অপর দূষিত পদার্থ যাইয়া অপরের চক্ষু উঠা, ইরিসিপেলাস (Erysipelas) গ্যাংগ্রিন (Gangrene) প্রভৃতি হইতে

পারে। শরীর হইতে খোসা যাইয়া অপরের বসন্ত, জল-বসন্ত, হাম, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি হইতে পারে—থুথু শুকাইয়া বা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় যক্ষ্মা উৎপাদন করিতে পারে। মলাদি হইতে টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি হইতে পারে। বায়ুতে নানাবিধ বীজাণুও থাকে এবং ইহা হইতে নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

এক লিটার (Litre) বায়ুতে ২০টির বেশী জীবাণু থাকিলেই বায়ুকে দূষিত বলিতে হইবে এবং ব্যাবহারের অযোগ্য মনে করিতে হইবে। বায়ু দ্বারা কত সংক্রামক ব্যাধিই না স্থানে স্থানে নীত হইতেছে!

যে সব স্থানে তামা, ক্ষার এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই সব স্থানে সালফিউরাস, সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফুরেটেড হাইড্রোজেন, এমোনিয়া প্রভৃতি নানাবিধ গ্যাস সৃষ্ট হইয়া সেই সব স্থানের বায়ু দূষিত করে। কল কি কারখানার রাসায়নিক ও অন্য বহুবিধ প্রক্রিয়ায় লোকের নানারূপে স্বাস্থ্য হানি হয়। যে সব স্থানে শব গোড় দেওয়া হয়, শব দাহ করা হয়, নানারূপ আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করা হয়, মল-মূত্র নিক্ষিপ্ত হয় কল-কারখানার দূষিত জিনিস পরিত্যক্ত হয় সেই সব স্থানের বায়ু দূষিত ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হানিকর।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আমন্ত্রণ

আলোয় ভরা আকাশখানি
ছাপিয়ে, শুধু সুধার বাণী
উছ্‌লে পড়ে সারা ভুবন মাঝ;
'ছল্ ছলিয়ে' ভাবের নদী
এম্‌নি করেই বইছে যদি,
ওরে ও মন, আয় রে ধেয়ে আজ।
আয় রে তবে দু'হাত তুলে,'
সব চুকিয়ে, আপন ভুলে,'
বাঁধন খুলে,' ঝাঁপ দিবি তো আয়!
ঢেউগুলি ওই অমন করে'
ডাক্‌ছে কারে পাগল ওরে,—
উদাস স্বরে আখির ইসারায়?
কেমন করে' আপন মনে
ঘুমিয়ে র'বে ঘরের কোণে?
শ্রবণ ভরি' শোন্ রে এখন শোন্—
গগন ছেয়ে, ক্ষণে ক্ষণেই
কাহার লাগি' এই বিজনেই
আস্‌ছে অধীর, আকুল আমন্ত্রণ!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ *

বৌদ্ধগণের নিকট চৈত্য পরম পবিত্র। চৈত্য বলিলে শুধু মন্দিরকে বুঝায় না, বৃক্ষাদি, স্মৃতি-প্রস্তর, মূর্ত্তি, প্রস্তরোৎকীর্ণ ধর্ম্ম-লিপি প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং যে সকল মন্দিরাদির ধর্ম্ম-সংস্রব আছে সে গুলিই চৈত্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, চৈত্য মাত্রই মন্দির নহে।

চৈত্য

পবিত্রতায় ধর্ম্ম-মন্দিরাদির মধ্যে বিহার ও স্তূপই শ্রেষ্ঠ। মঠকেই সাধারণতঃ বিহার বলে। বুদ্ধদেব যে মঠে বাস করিতেন, এবং যে মন্দিরে অনেক মূর্ত্তি থাকিত এই উভয়কেই বিহার বলা হইয়া থাকে। নেপালে ধান্য-স্তূপের আকৃতিবিশিষ্ট আদিবুদ্ধ বা

মঠ

* রিজ ডেভিড্‌স্, কার্ণ, বার্গেস প্রভৃতির গ্রন্থ এবং হুয়েন-সাং ও ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত—লেখক।

ধ্যানী বুদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরকে চৈত্য বলে। কিন্তু শাক্য-মন্দির ও অপর সপ্ত মানবী বুদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরকে বিহার বলে।

নেপালী চৈত্য

নেপালী চৈত্যের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, নেপালে যে গুলিকে চৈত্য বলে সে গুলি প্রকৃতপক্ষে স্তূপ। স্তূপের যে অংশে পবিত্রাবশেষ রক্ষিত হয় সেই অংশের নাম "ডগোব"। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালে সমাধি-স্থানের উপর যে মৃত্তিকা-স্তূপ নির্ম্মিত হইত ইহা হইতেই স্তূপের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতেও এইরূপ স্তূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের অনেক স্থানেই স্তূপ আছে। স্তূপগুলির মূলদেশ বৃত্তাকার, এবং কোন কোন স্তূপের চতুর্দ্দিকে সূচ্যগ্র শিকের বেড়া আছে। মূলদেশ বা ভিত্তির উপর একটি বর্ত্তুল বা "ডোম্‌" এবং ঊর্দ্ধতল ও অধঃশির একটি "পিরামিড্‌" এই বর্ত্তুলের সহিত সংলগ্ন। সংযোগ-স্থানটি মনুষ্যের গ্রীবার ন্যায়। "পিড়ামিড্‌টি" ও বর্ত্তুলটি একটি কিংবা উপর্য্যুপরি অবস্থিত দুইটি ছাতা দ্বারা আবৃত। ছাতাগুলি মালা ও পতাকা দ্বারা ভূষিত। ডগোবগুলিও প্রায় এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট। সিংহল ও নেপালের স্তূপগুলিও এইরূপ, তবে কোন কোন সিংহলী ডগোবের "ডোম"-গুলি জল-বুদ্বুদের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া উচিত এবং উপর্য্যুপরি তিনটি ছাতা দ্বারা ঢাকা থাকা উচিত। এই সকল "ডোমের" উপর দুই, তিন, পাঁচ, সাত, নয় এবং কখন কখন বা তেরটি ছাতা থাকে। এই সকল ছত্রচিহ্নিত পিরামিড়ের বিভিন্ন অংশ ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগ সূচিত করে। বৌদ্ধগণ কোন কোন স্তূপ মেরু পর্ব্বতের অনুকৃতি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে।

সিংহলের মহল প্রাসাদের উপরিভাগে সোপানাবলীর ন্যায় বিভাগ দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রহ্ম দেশের জটিল-গঠন স্তূপগুলি ডগোব এবং প্রাসাদের নির্ম্মাণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

হুয়েন-সাংএর ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে পেশো-য়ারের ২০০ গজ উচ্চ প্রকাণ্ড স্তূপ তিন বার ভাঙ্গিয়া যায়। এই স্তূপটিই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল-গঠন বলিয়া মনে হয়। মহারাজ কণিষ্কের সময় এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। হুয়েন-সাং যখন ভারতে আসেন তখন এদেশে বহুসংখ্যক স্তূপ ও ডগোব বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

পুষ্কলাবতীর নিকটে মহারাজ অশোক দুইটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে সেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্র মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা আরও দুইটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হুয়েন-সাং এই অলৌকিক স্তূপ-দ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহারাজ অশোক ভারতের নানা স্থানে ৮৪০০০ স্তূপ বা বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ বলিয়া থাকেন অশোক ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর প্রথমতঃ যে আটটি স্তূপ নির্ম্মিত হয় তাহার সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও পরে উক্ত ৮৪০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। তিনি এক-মাত্র রামগ্রামের স্তূপটিই ভাঙ্গেন নাই। পরে ইহার সন্নিকটে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বহু স্তূপ ও মঠ নির্ম্মাণ করেন।

স্তূপ সকল যে কেবল ধর্ম্মাত্মার নামে উৎসর্গীকৃত হইত এরূপ নহে; ধর্ম্ম গ্রন্থের নামেও হইত। সারিপুত্র,

স্তূপ

মৌদ্‌গল্যায়ন ও আনন্দের নামে এবং অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্রের নামে অনেক স্তূপ মথুরাতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

কপিলবস্তুতে অনেক স্তূপ ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা; কিন্তু ফা-হিয়ান বা হুয়েন-সাং কেহই সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই। মধ্যযুগে মগধেও বহু স্তূপ বর্ত্তমান ছিল। মহাস্তূপই সিংহলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৫০

গজ উচ্চ এবং অনুরাধাপুরের উত্তরাংশে ভগবান বুদ্ধের চরণ-চিহ্নের উপর নির্ম্মিত। সুবিখ্যাত অভয়গিরি মঠ এই স্তূপের পার্শ্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। থূপারাম, শিলাস্তূপ প্রভৃতিও সিংহলে অতি বিখ্যাত। সিংহলে বহু প্রাসাদ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য কিন্তু ভারতে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে মহাযান পন্থাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সকল স্থানে স্থপতি বিদ্যার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে সিংহলে সেরূপ হয় নাই।

বারাণসীর সমীপবর্ত্তী সারনাথের বিহার-মন্দিরাদি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে গুলি ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

বোধি-বৃক্ষ

মূর্ত্তি-পূজার পূর্ব্বেই বোধি-বৃক্ষের পূজা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে প্রচলিত কোন অনার্য্য প্রথার অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। প্রাচীনকালে বোধিবৃক্ষগুলিকে উদ্দেশক বলিয়া গণ্য করা হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে এগুলিকে পরিভোগ চৈত্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

বর্হাটের প্রস্তরশিল্পে বিপশ্শি, কশ্শপ, কোনগমন, ককুসন্ধ, বেশ্বভু এবং শাক্যমুনি প্রভৃতি বুদ্ধগণ যে যে বোধিবৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেগুলি অঙ্কিত আছে। শাক্যমুনি যে বটবৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধিলাভ করেন সেই বৃক্ষটি এবং ইহার নিম্নস্থ বুদ্ধাসন বা বোধিমণ্ড শিলা-গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই বৃক্ষের উপরে দুইটি ছাতা এবং শাখার অন্তরালে পতাকা দৃষ্ট হয়। বোধিমণ্ডটি বর্গাকার প্রস্তর-বেদিকার ন্যায়। মালা হস্তে দুটি সপক্ষ মূর্ত্তি বেদিকার উপরে দুই কোণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; নিম্নদেশে আরও দুইটি পুরুষ-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে—কিন্তু এ দুইটি মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। এই দুইটি মূর্ত্তির মুখেই বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং একটির পা-ও মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না। বৃক্ষটির কাণ্ডদেশ স্তম্ভবেষ্টিত, মূলদেশে আসন এবং আসনের সম্মুখে নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি করযোড়ে জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের একটির পশ্চাতে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি ও অপরটির পশ্চাতে নাগরাজ-মূর্ত্তি—নাগরাজের বাহুযুগল আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত। একটি বোধিবৃক্ষের নিম্নে চারিটি আসনও দেখিতে পাওয়া যায়—বোধ হয় এই চারিটি আসনই পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের।

শাক্যমুনির মূল আসন গয়ায় পিপুল বৃক্ষের নিম্নে। সেখানেই পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ভবিষ্যতে আর যে সকল বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহারাও এখানেই সিদ্ধিলাভ করিবেন। এই আসনকে বজ্রাসন বলে। হুয়েন-সাংএর সময়ে এই আসনটি ইটের গাঁথুনি করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পিপুল গাছটি ভূপৃষ্ঠের ৩০ ফিট উপরে একটি বেদির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বেদিটির চতুর্দ্দিকেই সিঁড়ি। বোধিমণ্ড বা নরসিংহাসনকে পৃথিবীর কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়। কথিত আছে মহারাজ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা মূল বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখাটি সিংহলে লইয়া গিয়া মহামেঘ বনে রোপন করেন।

পবিত্র পদচিহ্ন

পূর্ব্বেই ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সুমন বা আদম-শৃঙ্গস্থ শ্রীপদের ন্যায় বিখ্যাত পদ-চিহ্ন আর নাই। জনশ্রুতি আছে যে, যখন বুদ্ধ সিংহলে আসেন তখন তিনি এক পা অনুরাধাপুরে ও আর এক পা একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থাপন করেন। এই উভয়ের অন্তর ১৫ যোজন। ফা-হিয়ান সিংহলে আসিয়া এই জনশ্রুতি অবগত হন। এই পদচিহ্নকে শৈবগণ আদিদেব মহেশ্বরের পদচিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে, মুসলমানগণ আদমের পদচিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করে, এবং বৌদ্ধগণ ইহাকেই ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। পদচিহ্নটি দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট ও প্রস্থে ২½ ফিট্।

অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এটি একটি অনতিগভীর পর্ব্বত গহ্বর। সারনাথে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধচতুষ্টয়ের পদচিহ্নই বৃহত্তম। হুয়েন-সাং স্বচক্ষে এই পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা ৫০০ ফিট দীর্ঘ ও ৭ ফিট গভীর। তিনি পাটলিপুত্রের সন্নিধানে ভগবান বুদ্ধের যে পদচিহ্ন দেখেন সেটি ইহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এই পদচিহ্নের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ ফুট ৮ ইঞ্চি ও বিস্তার ৬ ইঞ্চি। সোয়াত নদীর উত্তর কূলে উদ্যান নগরে একটি পদচিহ্ন ছিল। ইহার একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, দর্শকগণের মনোভাবানুসারে ইহা তাহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ভগবান বুদ্ধ ও মঞ্জুশ্রীর পদচিহ্নকে নেপালীগণ পাদুকা বলিয়া থাকে। বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন বৃক্ষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও মঞ্জুশ্রীর পদচিহ্ন অর্দ্ধমুদিত চক্ষুর আকৃতিযুক্ত। এইটি বোধ হয় চন্দ্রের আকৃতি সূচনা করে। বৌদ্ধগণের মতে পৃথিবীতে অবস্থান কালে তথাগত যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন সেগুলিই পবিত্র। ভগবান বুদ্ধ আনন্দের নিকট এইরূপ চারিটি পবিত্র ক্ষেত্রের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। গয়ার নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধ তীর্থগুলির সুন্দর বিবরণ ফা-হিয়ান দিয়া গিয়াছেন—এবং পরে হুয়েন-সাং এই বিবরণ গুলির পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন। বারাণসীও গয়ার ন্যায় একটি বৌদ্ধ তীর্থ। বারাণসীতেই বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে শাক্যমুনিরূপে জন্মগ্রহণ করার দৈববাণী শ্রবণ করেন। আর একটা জনশ্রুতি আছে যে, মৈত্রেয়ও বারাণসীতে এই দৈববাণী শ্রবণ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মৈত্রেয় এখনও ধরাতলে অবতীর্ণ হন নাই, সুতরাং এই জনশ্রুতির মূলে কোনও সত্য নিহিত নাই। আবার কেহ বলেন গৃধ্রকূট পর্ব্বতে শাক্যমুনি ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে মৈত্রেয় স্বর্ণকান্তি শরীর ধারণ করিয়া ধরাতলে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন। পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এই দুইটি জনশ্রুতির বিষয় পড়িয়া মনে হয় যে, চৈনিক পরিব্রাজকগণই ইহাদের সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। ইহাতে যে কি গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আজিও অবগত হওয়া যায় নাই।

পবিত্র ক্ষেত্র

বৌদ্ধগণের মতে কপিলবস্তু, গয়া, সারনাথ ও কুশীনগর এই চারিটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র; ইহা ছাড়া ভগবান বুদ্ধ যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানও বুদ্ধভক্তগণ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে যে রাজায়তন বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৃক্ষ ও সেই আসন পরিভোগ চৈত্যরূপে পূজিত হইয়া থাকে।

পবিত্র চিহ্ন

ধর্ম্মচক্র পবিত্রাবশেষের অন্তর্ভুক্ত নহে—এটি একটি পবিত্র চিহ্ন। বৌদ্ধগণ ইহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পতাকা-শোভিত ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র বর্হাটের প্রস্তর-শিল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে। চক্রটি একটি মন্দিরে রক্ষিত এবং চক্রের উপরে একটি ছাতা। উভয় পার্শ্বে দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি, ইহাদের বাহু আড়াআড়িভাবে রক্ষিত। নিম্নদেশে রথারূঢ় জনৈক রাজার মূর্ত্তি; রথের চারিটি ঘোড়া। এই প্রতিমূর্ত্তির লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ। অন্যান্য স্থানের শিলা-শিল্পে চক্রটি একটি উচ্চ স্তম্ভের উপর স্থিত দেখা যায়। সাঁচি, গয়া, ও শ্রবস্তীতে এইরূপ চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই চক্র পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তীগণের চিহ্ন ছিল, পরে ধর্ম্ম প্রচার কল্পে ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

পর্ব্ব

উপসথ প্রথা বৌদ্ধগণ অন্য সম্প্রদায় হইতে অনুকরণ করিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যা তিথিতে উপসথ পালনের ব্যবস্থা। সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ রাজগণ এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সাপ্তাহিক উপসথ ভিক্ষুগণ ও সাধারণ লোক সকলেই পালন করে। প্রতিমাসের চারিটি পর্ব্বদিনের মধ্যে ভিক্ষুগণ দুই দিন প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি করেন। মাঝে মাঝে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কোনও বিবাদের মীমাংসা হইলে ভিক্ষুগণের একটি অতিরিক্ত উৎসব হইয়া থাকে। প্রতি-

পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যা। সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং নেপালে বৌদ্ধ পর্ব্ব। বোধ হয় ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার তারতম্য বশতঃই এই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভানুশাসনানুসারে প্রত্যেক পক্ষের চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা বা পুর্ণিমাই পর্ব্বদিন। সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ পর্ব্বদিনগুলি ও মনুসংহিতায় উল্লিখিত পর্ব্বদিনগুলি অভিন্ন।

উপসথ উপবাস ও বিশ্রামের দিন। সে দিন বিদ্যালয়, বিচারালয় প্রভৃতি বন্ধ থাকিত। উপসথের দিন পশু ও মৎস্য-শিকার নিষিদ্ধ। পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পবিত্র মনে উপসথ পালন করাই সাধারণ লোকের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্ত আটটি বিধি পালন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ উপসথের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন কালে ভিক্ষুগণ উপসথের দিন প্রতিমোক্ষ হইতে কোন কোন অধ্যায় আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সিংহলে সাধারণ লোকেরাও গৃহে গৃহে যাইয়া মাতৃভাষায় প্রতিমোক্ষের কোন কোন অংশ আবৃত্তি করিয়া থাকে। নেপালে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের লোপ হইয়াছে। সেখানে ধর্ম্মযাজকদিগের নাম বজ্রাচার্য্য। বজ্রাচার্য্যেরা বিবাহিত এবং গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী।

বার্ষিক পর্ব্ব

প্রাচীন কালে ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য বৎসরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত। প্রতি ভাগে ৪ মাস করিয়া পড়িত। প্রথম ভাগের আষাঢ়, দ্বিতীয় ভাগের কার্ত্তিক ও তৃতীয় ভাগের ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে পর্ব্বানুষ্ঠান হইত। এক মাস পরে পরে অর্থাৎ শ্রাবণ, মার্গশীর্ষ এবং চৈত্রের পূর্ণিমাও পর্ব্বরূপে গণ্য হইত। বৎসরের এই তিন পর্ব্ব বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সূচনা করিত। বৌদ্ধগণ ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য অদ্যাপি এরূপ বর্ষ-বিভাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কালের মত পর্ব্বানুষ্ঠানাদি আর আজ কাল দেখা যায় না। সিংহলে প্রচলিত পঞ্জিকার মতে ফাল্গুনের পূর্ণিমায় গ্রীষ্মঋতু আরব্ধ হয়, আষাঢ়ের পূর্ণিমায় বর্ষার সূচনা হয় এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শীতঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আষাঢ়ের পূর্ণিমায় কি শ্রাবণের পূর্ণিমায় বর্ষবাস (বার্ষিক) বা বর্ষোপনায়িকা আরব্ধ হয়। সিংহলে "বর্ষ" তিন মাস মাত্র।

শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা তিথিতে "প্রবারণা" পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দুই দিন উপসথও পালিত হয়। প্রবারণার দিনে ভিক্ষুগণকে দান

প্রবারণা পর্ব্ব

দেওয়া হয়, ভোজন করান হয় এবং শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। মথুরাতে ফা-হিয়ান লিখিত প্রবারণা পর্ব্বানুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রবারণা 'বর্ষ' বা বর্ষোপনায়িকার সমাপ্তি সূচনা করে। প্রবারণান্তে ভিক্ষুগণকে পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়। অন্ততঃ পাঁচ জন সমবেত হইয়া কোন কোন ভিক্ষুর পরিচ্ছদের প্রয়োজন তাহা স্থির করে; পরে অন্যান্য ভিক্ষুগণ সাধারণ লোকের সাহায্যে তুলার কাপড়ে পোষাক প্রস্তুত করিয়া পীতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকে। এই সকল পোষাক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিতে না পারিলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয়।

বর্ষোপনায়িকা ও প্রবারণা ছাড়া বৌদ্ধগণের আরও কয়েকটি পর্ব্ব আছে। সিংহলী বৌদ্ধগণের 'অওয়ারুদ'

অওয়ারুদ

নামে একটা পর্ব্ব আছে। বসন্তের প্রারম্ভে মারের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। শ্যামদেশে এই পর্ব্বের নাম "সংক্রন" (সংক্রান্তি)। এই পর্ব্ব হিন্দুগণের বসন্তোৎসব, কামদহন, বা হোলির নামান্তর মাত্র।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। এই তারিখে শ্যামদেশে বৈশাখী পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সিংহলেও হইত। যখন হুয়েন-সাং ভারতে ছিলেন তখন গয়াতে ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণ তিথি উপলক্ষেও এক বিশেষ পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইত।

আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে সিংহলে এক বিশেষ পর্ব্ব হইত বলিয়া ফা-হিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে ভগবান বুদ্ধের দন্তাবশেষ প্রদর্শিত হইত: বোধ হয় বৈশাখী পূর্ণিমার পর্ব্বই সেই সময়ে অনুষ্ঠিত হইত। এই

বৈশাখী পূর্ণিমাতেই ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ হয় ও পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়।

বৌদ্ধ যুগের গৌরবের দিনে মহাসমারোহে পঞ্চ বার্ষিক বা পঞ্চ বর্ষ-পরিষদের অনুষ্ঠান হইত। ইহার আর এক নাম মহামোক্ষ পরিষদ। দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থে এই উৎসবের বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহা অনেকটা প্রবারণা পর্ব্বের ন্যায়। পঞ্চবার্ষিক উৎসবে দানকার্য্যের বড় বাহুল্য ছিল। কাণ্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য পঞ্চবার্ষিক উৎসব নিয়ম মত মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। তিনি ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণগণকে রাজভাণ্ডারের ধনরত্নাদি সমস্ত দান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষু-বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা অবগত আছেন।

পঞ্চবর্ষ পরিষদ

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

নামিকো

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

শিনুবাশি ষ্টেসনে নামির পীড়ার কথা শুনিয়া চিজিওয়ার অধরে যে হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অমীমাংশিত সমস্যা সমাধানের একটা অভাবিত পথ খুঁজিয়া পাওয়ার যে আনন্দ, তাহাই সূচিত করিতেছিল। কাওয়াশিমা ও কাতাওকা, এই দুইটা ঘৃণ্য পরিবারকে সংযুক্ত করিয়াছে নামি! সেই নামির পীড়া—প্রতিশোধ লইবার এমন সুযোগ আর আসিবে না! পীড়াটা ছোঁয়াচে ও মারাত্মক, তাকেও উপস্থিত নাই—সবই তাহার মতলবের অনুকূলে! বিধবা ও তাঁহার পুত্রবধূর মধ্যে কেবল দুই একটা কথা বলা—ব্যস্! বোমা যদি তৎক্ষণাৎ ফাটে ত সে কেবল লম্ফ দিয়া পার্শ্বে সরিয়া যাইবে ও একটা নিরাপদ স্থান হইতে সমস্ত দুর্ঘটনাটা দেখিয়া লইবে, রক্তাক্ত কলেবরে কেমন তাহারা ছট্‌ফট্ করে! প্রতিহিংসার চিন্তা চিজিওয়ার অবসন্ন চিত্ত উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

সে তাহার মাসীর স্বভাব ভালরূপেই জানিত। তাকেও তাহার উপর যতটা বিরক্ত তিনি যে ততটা নন, এবং তাকেওকে সামান্য বালক জ্ঞানে তিনি যে অবজ্ঞা করেন ও তাহার উপদেশ সংসারাভিজ্ঞ লোকের উপদেশ বলিয়াই গ্রহণ করেন, ইহাও তাহার জানা ছিল। সে আরও বুঝিত মাসীর আত্মীয় কেহ নাই, তরুণ দম্পতির সহিত তাঁহার মত মিলে না, এবং সেই হেতু তাঁহার যতই তেজ থাকুক না, কেহ তাঁহার পক্ষালম্বন করে ইহাই তিনি চাহেন। সেই জন্য মতলবটিকে পাকাইবার জন্য এক পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, সে যে সফলকাম হইবে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না।

সর্ব্বপ্রথমে চিজিওয়া কাওয়াশিমা পরিবারের অবস্থা দেখিবার জন্য ও সে-যে কতটা অনুতপ্ত সেই মিথ্যা সংবাদ রটাইবার জন্য য়্যামাকিকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিত। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এক দিন রাত্রে সে শুনিল যে, দুই মাসের চিকিৎসার পরও নামির অবস্থা কিছুমাত্র ভাল নয় ও তাহার উপর মাসীর অসন্তোষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। তাকেও অনুপস্থিত, কার্য্যগতিকে ভাণ্ডারি তাজাকিও কোথায় গিয়াছিল, এই সুযোগে চিজিওয়া এক দিন কাওয়াশিমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। বহুদিন সে এ বাড়ীতে আসে নাই। দেখিল মাসী তাকেওর একখানি পত্র হাতে লইয়া চিন্তামগ্নভাবে একাকিনী বসিয়া আছেন।

বিধবা কহিলেন, "কোনো ফল হয় নি, ডাক্তার খরচাও ত কম হ'ল না। দু মাসের ওপর হয়ে গেল কিন্তু সারবার নামটি নেই। কি যে কর্‌ব কিছুই ত ভেবে পাই না। এক জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পেলেও হত, কিন্তু তাকেও এখনও যেন ছেলেমানুষ—"

"মাসী-মা আমি তোমার দুঃখে দুঃখী। আমার এখানে আসা উচিত নয় কিন্তু কাওয়াশিমা পরিবারের

এই মহা বিপদের সময় ত আর চুপ করে থাকা যায় না! তুমি, তাকেও-সান্ আর মেশোমশাই আমাকে কত আদর যত্ন করেচ সে সব কথা কি আমি ভুলতে পারি! সেই জন্যেই সাহস করে এসেচি। কি আর বলব মাসী, যক্ষ্মার মত এমন ভয়ানক ব্যারাম ত আর নেই। এমন অনেক শোনা গেছে যে, স্ত্রীর কাছে থেকে স্বামীর ব্যারাম হয়েছে, সমস্ত পরিবার লোপ পেয়েছে। তাকে-সানের জন্যে ভারি ভাবনা হয়েচে, তুমি যদি সাবধান না হও ত এ থেকে একটা বিষম কাণ্ড হবে বলে রাখচি।"

"ঠিক কথা বলেচ। আমারও ত তাই ভয়, তাকেওকে জুশি যেতে বারণ করে দিয়েচি। কিন্তু সে ত আমার কথা শুনবে না। এই দেখ না," (হস্তস্থিত পত্রখানির দিকে দেখাইয়া) "স্ত্রীর কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ডাক্তার কি বল্‌লে, ধাই কি কর্‌লে—খালি এই।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া চিজিওয়া কহিল, "তা আর কি করবে বল মাসী। স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসার কি কোনো সীমা আছে। পীড়িতা স্ত্রীর প্রতি তাকেও-সানের এই যে যত্ন—এ তো খুব ভালো কথা।"

"তা নয় হ'ল। কিন্তু স্ত্রীর অসুখের জন্যে মার অবাধ্য হওয়া এ কোন্ দেশী কথা?"

চিজিওয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

"কত রকমই দেখলুম! এই সে দিন মনে করলুম তাকেওর বিয়ে বেশ ভালোই হল, তুমিও খুসি হয়েছিলে। কিন্তু কাওয়াশিমা পরিবারে এখন এমন একটা সময় এসেচে যে, ভালো হবে কি মন্দ হবে কিছুই বলা যায় না। ওনামিসানের মা বাপ নিশ্চয়ই তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌চেন।"

"হ্যা তা আর করচেন না! দেমাকে গিন্নি একটা সামান্য উপহার নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন! কাতো দু' তিন বার এসেছিল, কিন্তু—"

চিজিওয়া আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল!

"এ সময়ে আমাদের ঝঞ্ঝাটটা তার মা বাপের বোঝা উচিত। এই রকম ব্যারামি মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে চুপ করে থাকেই বা কি করে? দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নেই!"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভাবনা হচ্ছে তাকেও-সানের জন্যে। আমরা যা বেশী ভয় করচি তা যদি হয় তা হলে কাওয়াশিমা পরিবারের দফা রফা! আর তার ত এ অসুখ হলেই হল। কিন্তু তাদের যখন বিয়ে হয়েচে তখন ত আর তাদের আলাদা রাখতে পার না।"

"ঠিক, ঠিক।"

"মা বাপের কাজ হচ্ছে সব সময়ে ছেলেদের ইচ্ছামত কাজ করতে না দেওয়া। তাদের ভালোর জন্যেই মাঝে মাঝে তাদের চাব্‌কানো দরকার। গোড়ায় গোড়ায় হয়ত ছেলে ছোকরারা ভারি বেঁকে বসবে, কিন্তু কিছুদিনের পর মন তাদের আপনিই নরম হয়ে যাবে।"

"তা বটে।"

"সামান্য একটু ভালোবাসা বা দয়ার জন্যে তুমি ত আর কাওয়াশিমা পরিবারের সর্ব্বনাশ কত্তে পার না।"

"নিশ্চয়ই নয়।"

"আর তার পর যদি সে গর্ভবতী হয় তা হলে—"

"ঠিক কথা।"

তাহার যুক্তিগুলি মাসীমাতার অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে বুঝিয়া চিজিওয়ার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ আলোচ্য বিষয়টি বদলাইয়া ফেলিল। সে তাঁহার মনে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা ত অচিরাৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, অধিকন্তু সে দেখিতে পাইয়াছে যে বীজ রোপিত হইয়াছে তাহা তখন আচ্ছাদিত থাকিলেও সময়ে তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মাইয়া ফুল ও ফল ধরিবে। সে সময় আসিতে অধিক বিলম্ব নাই।

তাকেওর মাতা নিজে এমন মন্দ লোক ছিলেন না যে কোনো কারণে নামিকে ঘৃণা করিতে পারেন। তিনি বরং শিক্ষা ও মেজাজের এত পার্থক্য সত্ত্বেও শ্বশ্রূর সহিত একমত হইবার চেষ্টার জন্য নামিকে এত পছন্দ করিতেন; রুচি সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে কখনো তাঁহাদের

মতের মিল হইলে আনন্দিত হইতেন, এমন কি কখনো প্রকাশ না করিলেও হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে এই চিন্তাটি উদিত হইত, তিনি বাল্যকালে কোন প্রকারে নামির সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু এক মাসের পীড়ার পর যখন তিনি স্বচক্ষে অসাধ্য রোগাক্রান্তা নামিকে দেখিলেন ও যথেষ্ট অর্থব্যয়ের পরও যখন তাহার সত্বর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল,—তাহা নৈরাশ্য বা বিরক্তি ঠিক বোঝা গেল না। চিন্তা আসিয়া ভাবটিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল ও অবশেষে ঘৃণার প্রবল বন্যায় তাঁহার সমস্ত সংযম ভাসিয়া গেল !

এদিকে চিজিওয়া দক্ষতার সহিত মাসীমাতার মনের অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করিল। মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাকেওর অনুপস্থিতির সময় মাসীমাতার নিকট চিজিওয়ার ঘন ঘন যাতায়াত যখন কানাঘুষা হইতে আরম্ভ হইল তখন তাহার প্রধান মতলবটি সিদ্ধ হইয়াছে ও য়্যামাকির সহিত সে ভাবী নাটক রচনার সাফল্যের জন্য এক আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মতাপুত্র

তাকেও যে যুদ্ধ-জাহাজে কার্য্য করিতেছিল তাহা মে মাসের প্রারম্ভে দক্ষিণে সাসেবো নামক নৌ-বন্দরে যাইবে এবং তথা হইতে উত্তরে হাকোদাতের নিকটে সংযুক্ত রণপোতবাহিনীর প্রদর্শনীতে যোগদান করিবে এইরূপ স্থির ছিল। মাসাধিক কাল সেখানে থাকিতে হইবে সেই হেতু এক দিন সন্ধ্যায় সে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল।

সম্প্রতি তাকেওর সহিত বিধবার একেবারেই বনিবনাও হইতেছিল না, কানের মধ্যে মক্ষিকা প্রবেশ করিলে লোকের অবস্থা যেমন হয় তাহারও তেমনি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সে অসাধারণ সন্তোষের সহিত স্বহস্তে তাকেওর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ছোট-খাট বিষয় লক্ষ্য না করিলেও মাতার এই অস্বাভাবিক প্রীতি দেখিয়া তাকেও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যত বয়ঃপ্রাপ্ত হউক না কেন, মাতার ভালবাসা পাইলে যে-কোনো বালক সুখী হয়। মাতার সম্প্রতিকার রুক্ষ মেজাজের পর এরূপ ব্যবহারে তাকেও বিশেষ করিয়া সুখী হইল। পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া স্নান করিতে করিতে যখন সে বৃষ্টির টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ শুনিতেছিল তখন তাহার চিন্তা, গৃহে আসিবার পথে জুশিতে যাহা দেখিয়াছে তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া যখন নামি পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে, সেই সুখের সময় পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। স্নান শেষে তৃপ্তচিত্তে একটি ঢিলে পোশাক পরিয়া দক্ষিণ হস্তের তালু দিয়া কপাল ঘষিতে ঘষিতে তাকেও মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গুলী মধ্যে একটি জ্বলন্ত চুরট।

বিধবা তখন দীর্ঘনলে ধূম-পান করিতেছিলেন, পরিচারিকা তাঁহার স্কন্ধদেশ টিপিয়া দিতেছিল। মুখ তুলিয়া তিনি কহিলেন, "এরি মধ্যে শেষ হ'ল ? তোমায় দেখলে তোমার বাবা যখন স্নান করে বেরুতেন সেই কথা মনে পড়ে। ঐ খেনে বস। হয়েচে মাৎসু ; এখন গিয়ে চা নিয়ে এস।"

বিধবা উঠিয়া কুলঙ্গ হইতে পিষ্টকের রেকাবিখানি পাড়িলেন। "আমাকে যে অতিথের মত অভ্যর্থনা করূচ মা।" চুরুট টানিতে টানিতে তাকেও ঈষৎ হাস্য করিল।

"ঠিক সময়েই ফিরেচ, তাকে। তোমার সঙ্গে কথা আছে, দেখা হওয়াটা দরকার হয়েছিল। আসবার সময় তুমি জুশিতে থেমেছিলে ?"

সে সদাসর্ব্বদা জুশিতে যায় মাতা ইহা পছন্দ করিতেন না জানিলেও তাকেও তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পারেনা।

"হ্যাঁ খানিক ক্ষণের জন্যে। সে ভালো হয়ে উঠচে বোধ হ'ল। তোমাকে ঝঞ্চাটে ফেলেচে সেই জন্যে কত দুঃখু করছিল।"

"তাই নাকি ?"

তিনি খুব মনোযোগের সহিত তাকেওর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে চা'র সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিল, বৃদ্ধা সে গুলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আপাতত তোমাকে দরকার নেই মাৎসু। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও।"

নিজের ও তাকেওর জন্য চা ঢালিলেন। এক পেয়ালা শেষ করিয়া দীর্ঘ নলটি তুলিয়া ভর্ত্তি করিতে করিতে বলিলেন—

"আমার শরীরের অবস্থা ভারি খারাপ। এই গত বছরের বাতে ত এক রকম মারা যেতে বসেছিলুম। কাল তোমার বাবার সমাধি দেখতে গিয়েছিলুম, এখনো হাড়গুলো ব্যথা করচে। মনে হয় যেন এক পা কবরে দিয়েচি। খুব সাবধান বাবা তাকে, অসুখ বিসুখ যেন না হয়।

আগুনের বাক্সের মধ্যে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাকেও মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। শরীর খুব মাংসল হইলেও তাঁহার কপালে অনেকগুলি রেখা ফুটিয়াছে।

"আমি প্রায় সব সময়েই বাইরে থাকি আর তুমি ছাড়া সংসার দেখবারও কেউ নেই। নামি যদি ভালো থেকে তোমায় সাহায্য করতে পারতো! সেও সব সময়ে তাই বলে।'

"সে তা ভাবলে কি হবে ? আমি বাপু যক্ষ্মাকে বড় ভয় করি।"

"কিন্তু এখন ত সে অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে। বেশ একটু গরমও পড়ে আসচে, তার বয়সও অল্প, সেরে উঠতে পারে।"

"তা হ'লে কি হয়, আমার কিন্তু মনে হয় না সে শীগ্‌গির সেরে উঠবে। ডাক্তার বলছিলেন যে, তার মাও যক্ষ্মায় মারা গেসলেন।"

"হ্যাঁ সে আমাকে তাও বলেছে কিন্তু—"

"যক্ষ্মা তো মা বাপের হলে ছেলে পুলেরও হয়, নয় কি ?"

"হ্যাঁ তাই শোনা যায় বটে। কিন্তু নামির ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে। সবই সাবধানতার উপর নির্ভর করে। লোকে বলে ছোঁয়াচে রোগ—মা বাপের হলে ছেলে পুলের হয় ইত্যাদি ; কিন্তু বাস্তবিক অন্য কারণ আছে। তুমি ত জান নামির বাবা কেমন জোয়ান, তারপর নামির বোন ও-কোমাসান্—সেও ত যক্ষ্মার কোনো লক্ষণই দেখায় নি।" ডাক্তারেরা আমাদের যতটা দুর্ব্বল ভাবে আমরা ততটা নই।" তাকেও হাসিল।

"হাঁ, কিন্তু এটা হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়।" হাতের উপর ধূমপানের নলটি ঠুকিয়া পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয় এমন ভয়ানক রোগ আর নেই। তোগো পরিবারের কথা জান ত তুমি। যে ছেলেটির সঙ্গে তুমি ঝগড়া করতে তার মা ৫ বছর হ'ল যক্ষ্মায় মারা গেছে। আর তোগো-সান্ নিজে সেই রোগে ছ' মাস হ'ল মারা গেছে। জান ত ? তারপর তার ছেলে—ঐ যে কোথাকার ইঞ্জিনীয়ার ছিল—শুনলুম সেও নাকি সম্প্রতি ঠিক ঐ রোগে মারা গেছে। এক জনের থেকে ত তাদের সবাইয়ের হ'ল। এ রকম ঘটনা আমি তোমায় আরো অনেক বলতে পারি। আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, নইলে ভয়ানক কাণ্ড হবে বলে রাখচি।" নলটি রাখিয়া দিয়া বিধবা সম্মুখে ঝুঁকিলেন। তাকেও নীরবে শুনিতেছিল, আড়চোখে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—"তোমায় কিছু বলতে চাই—"একটু ইতস্তত করিয়া তাকেওর উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। "আমি, বুঝেচ—"

"কি ?" তাকেও মুখ তুলিল।

"নামিকে যদি ডাকিয়ে পাঠান যায় ত কেমন হয় ?"

"ডাকিয়ে পাঠান ? সে আবার কি ?"

বিধবা তাকেওর মুখ হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া কহিলেন "এই তার বাপের বাড়ীতে যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায়।"

"বাপের বাড়ী ? সেখানে তার শুশ্রূষা হোক এই তুমি চাও ?"

"হ্যাঁ, শুশ্রূষা হতে পারে ; সে যাই হোক তুমি তাকে পাঠিয়ে দাও।" "কিন্তু তার পক্ষে জুশিই সব চেয়ে ভালো জায়গা। কাতাওকাদের বাড়ীতে ছেলেপুলে রয়েছে—আর তার তোকিওতে ফেরাই যদি তোমার ইচ্ছে হয় ত তার এখানে থাকাই সব চেয়ে ভালো।"

চা শীতল হইয়া গিয়াছিল। তাহা পান করিয়া বিধবা কহিলেন—তাঁহার স্বর কাঁপিতেছিল—"তাকে তুমি মাতাল হওনি বোধ হয়। আমার কথা না বোঝবার ছল করুচ কেন ?" তাকেওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "আমি বলছিলুম—নামিকে তার বাপের বাড়ীতে ফেরত পাঠাও।"

"ফেরত ? ফেরত পাঠাব ? তুমি বলছো তাকে ত্যাগ করতে ?"

"আস্তে ! তুমি বড় চেঁচিয়ে কথা কইচ তাকে !" কম্পিত পুত্রের দিকে ফিরিয়া তিনি কহিলেন—"ত্যাগ—হ্যাঁ তাই বটে।"

"ত্যাগ ! ত্যাগ ! কেন ?"

"কেন জিজ্ঞেস করচ ? আগেই ত বল্লুম, তার ঐ ভয়ানক রোগের জন্য।"

যক্ষ্মা হয়েছে বলে তুমি নামিকে ত্যাগ করতে বলছ ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই—কি করব বল।"

"ত্যাগ !"

তাকেওর হস্ত হইতে চুরুটটি আগুনের মধ্যে খসিয়া পড়িয়া প্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল, হিস্ হিস্ শব্দে দীপ জ্বলিয়া উঠিল ও নিরাশ বৃষ্টি বাতায়নে ঝাপট মারিতে লাগিল।

ধূমায়মান চুরুটটি ছাইএর মধ্যে প্রোথিত করিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন—

"এ কথা শুনে তুমি যে অবাক হয়ে গেছ তা'তে তোমার দোষ দিই না। কথাটা তোমার কাছে খুবই আকস্মিক, আমি কিন্তু অনেক দিন ধরে ভেবেছি—এই কথা মনে রেখে শুন্‌তে হবে। আমি যতদূর জানি তা'তে নামির এমন কোনো দোষ নেই যাতে আমি বিশেষ করে অসন্তুষ্ট হতে পারি, আর তুমিও তাকে পছন্দ কর। সেই জন্যে এমন কথা বলতে আমি মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু যাই বলি আর যাই কই রোগটা যে ভয়ানক তা'তে—"

তাকেও বাধা দিয়া কহিল, "আরে সেরে ত উঠ্‌ছে সে।" মাতার দিকে স্পর্দ্ধিত ভাবে চাহিল।

"আমি যা বল্‌ছি শোন্। এখন তার অবস্থা তত খারাপ না হতে পারে কিন্তু ডাক্তার বলেছে এখন ভালো দেখালেও ব্যারাম শীগ্‌গিরই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, বায়ুর অবস্থার একটু বদল হলেই এরূপ ঘটবে। যক্ষ্মার ব্যারাম কারুরই একেবারে সারে না—ডাক্তার তাই বলে। নামি এখন খুব পীড়িত না হলেও এর পরে নিশ্চয়ই অবস্থা খারাপ হবে আর তোমাকেও ঐ রোগে ধরবে। তোমার ছেলেপুলে হতে পারে তাদেরও ঐ রোগ হবে। মনে কর সেই ব্যারামে কেবল নামি নয় বাড়ীর মালিক তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারী সকলেই মারা গেলে! কাওয়াশিমা পরিবার একেবারে লোপ পেলে! তোমার বাপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মিকাদোর বিশেষ অনুগ্রহে যে উন্নতি করেছিলেন—যে পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক পুরুষ যেতে না যেতেই তার সব শেষ হয়ে যাবে! নামির সঙ্গে খুব সহানুভূতি করা উচিত, তুমি তার জন্য খুব দুঃখিত, আমি শ্বাশুড়ী হয়ে এমন কথা বলতে একেবারেই অনিচ্ছুক—এ সবই সত্য, কিন্তু ভেবে দেখ তার ব্যামোটা কী। যতই কেন দুখ্যু কর না সে ত আর বাড়ীর মালিক তুমি বা কাওয়াশিমা পরিবারের সমান নয়। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, কথাটা বুঝে কর্ত্তব্য একেবারে ঠিক করে ফেল।"

তাকেও নীরবে শুনিতেছিল। প্রাতঃকালে যাহার

নিকট গিয়াছিল সেই পীড়িতা পত্নীর মুখ তাহার মনের মাঝে দিনের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সে কহিল, "আমার দ্বারা এ কাজ হবেনা, মা!"

"কেন?" তাঁহার স্বর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

"এখন এ রকম করলে নামি মারা যাবে।"

"তা যদি যায় ত যাক্। তোমার জন্যে, কাওয়াশিমা পরিবারের জন্যে আমার ভাবনা বেশী।"

"আমার জন্যে যদি ভাবো তা হলে আমি যেমন ভাবি তেমনি ভাবো। তোমার হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হবে কিন্তু আমি কোনোমতে এ কাজ করতে পারি না। সে ছেলে—মানুষ, সেই জন্যে তোমার সাহায্য করতে পারে না, কিন্তু সে তোমায় আর আমায় দুজনকেই ভালোবাসে, এমন নিরীহ স্ত্রীকে কেবল তার অসুখের জন্যে কেমন করে ত্যাগ করি? যক্ষ্মা সারানো যায় না এমন কোনো কথা থাকতে পারে না। আর সে ত সেরে উঠচে। আর সে যদিই মরে তাহ'লে, মা, তাকে আমার স্ত্রী থেকে মরতে দাও। এ রোগে যদি বিপদ থাকে ত আমি তার কাছে যাব না, খুব সাবধান হবো, তুমি যাই বলবে তাই করবো কিন্তু তাকে ত্যাগ করা—প্রাণ থাকতে তা পারবো না।"

"হ্যাঃ! তুমি কেবল নামির কথা বল্‌ছ কিন্তু নিজের কথা বা কাওয়াশিমা পরিবারের কথা ভাবছো না।"

"তুমি আমার জীবনের কথাই কেবল বলছ কিন্তু নিষ্ঠুর অন্যায় উপায়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? নিষ্ঠুর অন্যায় কাজ করলে কোনো বংশের মঙ্গল হয় না—এতে কাওয়াশিমা বংশের মান বাড়বে না। আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি না—কিছুতেই না।"

কোনো না কোনো প্রকার বাধার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও তাকেওর একগুঁয়েমি দেখিয়া বিধবা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ও উত্তেজনক্ষম তাঁহার মেজাজ সহজেই ভয়ানক রুক্ষ হইয়া উঠিল। কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, দপ দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, যে হস্তে ধূমপানের নল ধরিয়াছিলেন সে হাতটিও কাঁপিতেছিল। ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন কি হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

"আ—হা! রেগো না। স্থির হয়ে ভেবে দেখ। তুমি এখনো ছেলেমানুষ, সংসারের বিষয় কিছুই জান না। জান ত কথায় আছে—ছোট জন্তুকে মেরেও বড় জন্তুকে বাঁচাও। নামি হচ্ছে ছোট জন্তু, আর তুমি—কাওয়াশিমা পরিবার—হলে বড় জন্তু। নামির জন্যে, তার মা বাপের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু রোগে পড়াটা কি ভাল? তারা আমাদের বিষয় যাই ভাবুক, কাওয়াশিমা বংশ লোপ হতে দেওয়া নয়। তুমি অন্যায় কাজের কথা বল্‌চ, নিষ্ঠুরতার কথা বল্‌চ কিন্তু এরকম ব্যাপার সব জায়গাতেই ঘটচে। স্ত্রী যখন পরিবারের সম্মান বাড়ায় না তখন তাকে ত্যাগ করাই উচিত; তার গর্ভে সন্তান না জন্মিলেও তাকে ত্যাগ করা উচিত এবং তার কোন সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাকে ত্যাগ করা উচিত' এইত হ'ল নিয়ম, তা কি তুমি জান না? বিচার বা দয়ার কথা তোলবার দরকার নেই। এরকম সময়ে তাকে ফিরিয়ে নে'যাবার জন্যে তার মা বাপেরই আসা উচিত ছিল কিন্তু তা যখন তারা করবে না, তখন কি করা উচিত তাদের তা বল্‌তে দোষ কি?"

"তুমি কেবল 'উচিত' 'উচিত' বলছ কিন্তু অন্যে অন্যায় করে বলে আমাদেরও অন্যায় করবার কোনো অধিকার নেই। রোগের জন্যে ত্যাগ করা—সে পুরাকালের কথা, এখনো যদি সে নিয়ম থাকে ত তা ভাঙ্গা দরকার, দরকার কেন, আমরা সে নিয়ম ভেঙ্গে দেব। তুমি ভাবছো আমাদের পরিবারের কথা, কিন্তু নামির পরিবার কি ভাববে যখন, যে মেয়ের সে দিন বে' হয়েছে তাকে কেবল রোগের জন্যে ত্যাগ করা হবে? আর নামি—সেও কি ফিরে যেতে অপমান বোধ করবে না? মনে কর আমারই যদি যক্ষ্মা হ'ত, আর ব্যারামটা সংক্রামক বলে তারা নামিকে ফেরত নিতে আস্‌ত! তুমি কি তা পছন্দ করতে? কিন্তু কথা একই।"

"না, সে কথা আলাদা। মেয়ে মানুষ পুরুষের সমান নয়।"

হ্যাঁ, সমান। অন্তত অনুভব করবার শক্তি দু'জনেরই সমান। কাজের কথা ধরলেও নামি সম্প্রতি ভালো আছে—উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখন যদি তুমি এমন কর আবার ব্যারাম বেড়ে যাবে। সে মারা যাবে—নিশ্চয়ই মারা পড়বে। যাকে জানি না তার প্রতিও এমন ব্যাভার কর্‌তে পারি না। নামিকে কি মারতে বল আমাকে?"

তাকেও কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাড়ীর পবিত্র কুলঙ্গি হইতে একখানি "ইহাই" * পাড়িয়া তাকেওর সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

"শোন তাকেও। আমার কথা তুমি তাচ্ছিল্য করচ, কিন্তু তোমার বাবার সামনে বল ত যা বল্‌ছিলে। বল—তোমার পূর্ব্বপুরুষদের আত্মা তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বল আবার। অবাধ্য ছেলে?" তাকেওর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া তিনি আগুনের বাক্সের কানায় ধূমপানের নলটি বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ মাতার প্রতি বিনয়ী হইলেও তাকেওর মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল।

"অবাধ্য হ'লুম কেমন করে?"

"কেমন করে? কেন তুমি জিজ্ঞেস কর্‌চ? স্ত্রীর জন্যে মার কথা অমান্য করা অবাধ্যতা নয়? যে শরীর আমি লালন পালন করলুম তার কথা একটু না ভেবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের বংশ উচ্ছন্ন দেওয়া অবাধ্যতা নয়! তুমি অবাধ্য ছেলে, পুত্রের কর্ত্তব্য তুমি কর না!

"কিন্তু মনুষ্যত্ব—"

"রাখো তোমার ও কথা। তুমি কি তোমার স্ত্রীকে মা বাপের চেয়ে বেশী মনে কর? মুখ্যু কোথাকার! কেবল স্ত্রী-স্ত্রী, মা বাপের কথা কি কখনো ভাবো না? কুলাঙ্গারের মুখে নামি ছাড়া আর কথা নেই! আমরা তোমাকে ত্যাগ কর্‌ব।" তাকেও অধর দংশন করিল, চক্ষু তাহার জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমি ত বড় নিষ্ঠুর, মা!"

"নিষ্ঠুর কেন?"

"তোমার প্রতি এমন মনের ভাব আমার কখনো হয় নি। কিন্তু তুমি আমার মন বোঝ কই?"

"তাহ'লে কেন আমার কথা মত নামিকে ত্যাগ কর না?"

"কিন্তু—"

"না, 'কিন্তু' নেই। দেখ তাকেও তুমি হয় তোমার স্ত্রীকে না হয় তোমার মাকে ভালোবাস। কি? নামি তোমার কাছে বেশী হ'ল? মুখ্যু!"

রাগত ভাবে তিনি ধূমপানের নল দিয়া আগুনের বাক্সের উপর সজোরে আঘাত করিলেন, নলটি টুকরা টুকরা হইয়া গেল ও নলের মাথাটি ঠিকরাইয়া পর্দ্দার উপর গিয়া পড়িল।

এই সময় পর্দ্দার অপর দিকে কে যেন এক অর্দ্ধোচ্চারিত বিস্ময়-ধ্বনি চাপা দিতেছে শুনা গেল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে কে বলিল, "শু—শুনচেন।"

"কে? কি চাও?"

"এই একখানা টেলিগ্রাম"।

পর্দ্দা টানিয়া তাকেওর টেলিগ্রাম দর্শন ও বিধবার ভীষণ দৃষ্টি দেখিয়া ত্রস্ত পরিচারিকার অন্তর্দ্ধান এই দুই ঘটনার মধ্যে মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধান; কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যে তাহাদের ক্রোধের কতকটা উপশম হইয়াছিল। মাতাপুত্র নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল, ঝম্ ঝম্ ঝম্!

অবশেষে বিধবার মুখ ফুটিল। চক্ষু দিয়া তখনো ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, কিন্তু কথা কথঞ্চিৎ কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে।

"তাকে, আমি তোমার মন্দ করবার জন্যে এমন কথা বলছি না। তুমি আমার এক ছেলে। সংসারে তুমি

* বৌদ্ধ নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলক। মৃত ব্যক্তির আত্মার অধিষ্ঠিত।

উন্নতি কর আর একটি মোটা সোটা নাতির মুখ দেখি এই আমার একমাত্র ইচ্ছে।"

তাকেও গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবসন্ন ভাবে মাথা তুলিয়া টেলিগ্রাম খানি দেখাইয়া কহিল, "আমাকে এখনি যেতে হবে, হুকুম এসেচে। খুব দেরি করলেও কালকে যাত্রা করতেই হবে। ফির্‌তে প্রায় মাস খানেক হবে। ফেরা পর্য্যন্ত যেন কখনো এ কথার উল্লেখ কোরো না।"

পরদিন আর একবার মাতার আশ্বাস-বাণী শুনিয়া ও গৃহ চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নামির উপযুক্ত শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বৈকালের গাড়িতে তাকেও জুশি যাত্রা করিল।

যখন সে অবতরণ করিল সূর্য্য তখন অস্তাচলে ডুবিয়াছে। ঈষন্নীল পাণ্ডুরবর্ণ আকাশে কাস্তের মত চাঁদ ঝুলিয়াছিল। ক্ষুদ্র নদীর উপরকার পুল পার হইয়া সে একটি রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তাটি অন্ধকারময়, দেবদারু কুঞ্জের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গেছে। কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া যখন দেখিল কূপ হইতে জল তুলিবার দণ্ডটি সন্ধ্যাকাশের গায়ে কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে তখন সহসা তাহার কর্ণে অপ্রত্যাশিত বীণা-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

সে ভাবিল, সে-ই বাজাইতেছে! বোধ হইল যেন তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাই সে ক্ষণকাল ফটকের নিকটে দাঁড়াইয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। নামি সেদিন বিশেষ সুস্থ ছিল, পতির জন্য হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল তাহাই সে বীণার তারে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল!

নামি মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল যে, তাকেওর মনের মধ্যে কিছু একটা রহিয়াছে। তাহার প্রশ্নের নির্দ্দিষ্ট কোনো উত্তর না দিয়া সে কেবল কহিল গত রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। সে আসিবে বলিয়া বিশেষ ভাবে আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উভয়ে আহার করিতে বসিল, কিন্তু কেহই কিছু খাইতে পারিল না।

ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ পাছে প্রকাশ পায় সেই ভয়ে নামি অধরের কোণে একটু নিরানন্দ হাস্য জাগাইয়া পতির কোটে বোতাম আঁটিতে ও তাঁহার পোষাকগুলি সযত্নে ঝাড়িতে ব্যাপৃত হইল। ক্রমে শেষ ট্রেনের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। যখন আর থাকা সম্ভব নয় তখন তাকেও যাইবার জন্য উঠিল। তাহার বাহু ধরিয়া ঝুলিয়া নামি কহিল, "সত্যিই তুমি চল্লে?"

"শীগ্‌গিরই ফির্‌ব। সাবধানে থেকে সেরে ওঠ।"

উভয়ের হস্ত দৃঢ়বদ্ধ। দ্বারের নিকট বৃদ্ধা ইকু জুতা আগাইয়া দিল, ভৃত্য মোহেই প্রভুর সহিত ষ্টেসনে যাইবার জন্য বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র থলি ও দক্ষিণ হস্তে লণ্ঠন লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

"তা হইলে ইকু তোমার জিম্মেয় নামিকে রেখে যাচ্ছি। নামি-সান্ চল্লুম।"

"শীগ্‌গির ফিরো!"

মাথা নাড়িয়া তাকেও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। লণ্ঠনের আলোকে দশ বার পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখিল। শাদা শাল গায়ে দিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া নামি রুমাল নাড়িতেছিল।

"শীগ্‌গির ফিরে এসো!"

"হাঁ। আস্‌বো। বাইরে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে। ভেতরে যাও নামি-সান্।" কিন্তু যখন সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ফিরিয়া চাহিল তখনো দেখিল একটি অস্পষ্ট শ্বেত মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তার পর পথটা বেঁকিল, আর সে মূর্ত্তি দেখা গেল না। কেবল আর একবার শুনা গেল সেইঅশ্রুসিক্ত প্রার্থনা—"শীগ্‌গির ফিরে এস!"

নিম্নে, বহুনিম্নে চক্রবালের নিকটে দ্রুত-নিমজ্জমান ক্ষীণ চন্দ্র তখন দেবদারু কুঞ্জের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল।

শ্রীহেমনলিনী রায়।

কবি ও ঋষি

১

খুঁজিয়াছি মধু শত ছন্দের খেলে
ভাবের বীণায় গীতি-নিক্বণ মাঝে !
খুঁজিয়াছি মধু চিত্র চরিত তলে !
ছায়া ছায়া যাহা মনের নয়নে বাজে !
খুঁজিয়াছি মধু উদ্দাম রস জলে,
স্রোত উল্লাসে দ্রুতি-দীপ্তির তলে,
আঁচে কটাক্ষে বিজলী-রভসে গলে,
তরঙ্গে ছুটি,' তরলিয়া ছলছলে !

২

ভাবের সূত্রে এসেছি ভুবন ভ্রমি,
জনে জনে কত সাধিয়াছি পায়ে ধরে,—
পীঠ-আস্তানা সর্ব্ব এসেছি নমি,—
করমী মরমী স্থপতি কি ভাস্করে !
নাটকে নবেলে দর্শনে ভারতীরে
ফিরিয়া ঘুরিয়া পরশে এসেছি ঘিরে
জন-অরণ্যে আকুলি-বিকুলি কত !
নির্ঝর সম ঝরিয়াছি অবিরত !

৩

খুঁজিয়াছি মধু শানাই নাকাড়া খোলে
ভৈরবী বেশে বাহারে সে দেশে দেশে !
টপ্পায় মজি, কাঁশরে, বাঁশরে, ঢোলে
সকল তারেতে কোমল-কড়ির রেশে !
সঞ্চারী ভুলি, অস্থায়ী বিকি-'কিনি' ;
ভুলেছি আভোগে অন্তরা নাহি চিনি ;
জন মমতায় নানামত্তি-মন্তরে—
প্রণবে ভুলিয়া ঘূর্ণী সে ভব ঘুরে !

৪

শান্তি কোথায়, নির্বৃতি কোথা অহো !
কিসে হই তাহা, এখনো লভিনি যাহা !
না জানি সে কিসে সকল শেষের শেষে
কল্যাণে হিয়া থামে মূলতানে এসে !
বুঝিয়াছি মধু স্তব্ধ হিয়ারি মাঝে বিজনে
গুপ্ত বিজনে রহস্য হয়ে রাজে !
নাচনী গাহিনী হাসনী ভাবিণী হিয়া
মৌনের মধু ধরিয়াছে সাপটিয়া !

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন।

শিশুর খাদ্যে বিশেষ ব্যবস্থা

বার্লি ওয়াটার চূণের জল প্রভৃতির ব্যবহার--শিশুর দুধের সহিত সময় বিশেষে বার্লি ওয়াটার্ মিশ্রিত করিবার আবশ্যক হইতে পারে। এমন অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায় যে, দুধ যেই শিশুর পেটে পড়ে অমনি বড় বড় চাপে পরিণত হয়। এই সব ছানার চাপ শিশুর পক্ষে জীর্ণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এগুলি অপরিবর্ত্তিত আকারে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এরূপ স্থলে দুধের সহিত বার্লি ওয়াটার মিশাইয়া দিলে পূর্ব্বোক্তরূপ চাপ ধরিতে পারে না, সুতরাং শিশুর কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, বার্লিতে শ্বেতসার আছে। দুগ্ধপায়ী শিশুর পক্ষে শ্বেতসার উপযুক্ত খাদ্য হইতে পারে না। এই কারণে অনেক শিশুই একবারে বার্লি ওয়াটার সহ্য করিতে পারে না। ইহাতে উহাদের পেট ফাঁপে পাৎলা বাহে হয়, গুহ্যের নিকটবর্ত্তী স্থল লালবর্ণ হয়। দুধের সহিত বার্লি-ওয়াটার মিশ্রিত করিলে জল মিশাইবার আর আবশ্যক নাই। দুধে যতখানি জল মিশাইবার কথা ততখানি বার্লি ওয়াটার মিশাইলেই কাজ চলিতে পারে। বার্লি-ওয়াটার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় অনেকেই তাহা জানেন না। বাজারে দুই প্রকার বার্লি পাওয়া যায়—এক চূর্ণ বার্লি আর এক মুক্তার দানার ন্যায় বার্লি, ইহাকে

পার্ল বার্লি কহে। এই শেষোক্ত বার্লিই ভাল এবং ইহাই ব্যবহার করা উচিত। ইহা নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। চা পান করিবার জন্য যে চাম্‌চা ব্যবহার হয় তাহার দুই চামচ পরিমাণ পার্ল বার্লি লইয়া বেশ করিয়া কয়েক বার ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া লইবে। অতঃপর আড়াই পেয়ালা ঠাণ্ডা জলে বার্লিগুলি দিয়া এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে, তাহার পর পরিষ্কার ন্যাকড়ায় করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত এতটা পরিমাণ ঠাণ্ডা জল মিশাইবে যাহাতে ২॥ পোয়া হইতে পারে। পার্ল বার্লি ব্যতীত রবিন্‌ সনের পেটেণ্ট বার্লি-নামক এক প্রকার চূর্ণ বার্লি পাওয়া যায়, ইহা অতি শীঘ্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাকে ২০ মিনিটের অধিক সিদ্ধ করিবার আবশ্যক করে না।

চূণের জল—দুধের সঙ্গে চূণের জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেও পেটের মধ্যে দুধের বড় বড় চাপ হইতে পারে না, কিন্তু চূণের জলের দোষ এই যে, ইহাতে শিশুর পেট কষিয়া যায়, কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। দুধের সঙ্গে চূণের জল মিশাইতে হইলে যতটা জল মিশাইবার আবশ্যক তাহার সিকি বা অর্দ্ধেক পরিমাণ চূণের জল বাকিটি এই জল মিশাইবে। যে সকল শিশুর হাড় মোটা হয় না তাহার পক্ষে চূণের জল উপকারী।

সাইট্রেট্‌ অব্‌ সোডা—যে সব শিশুর কিছুতেই দুধ সহ্য হয় না তাহাদের দুধের সঙ্গে সাইট্রেট্‌ অব্‌ সোডা নামক ঔষধ মিশাইলে অনেক সময় ফল পাইতে দেখা যায়। সাইট্রেট্‌ অব্‌ সোডা মিশ্রিত দুধ পেটে গিয়া মোটেই চাপ বাঁধে না, যদিও বাঁধে তাহা এত সামান্য যে, শিশুর তাহাতে কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। আধ ছটাক দুধে এক গ্রেণ্‌ কি দুই গ্রেণ্‌ সাইট্রেট অব সোডা দিতে হয়। ইহার অধিক দিলে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। সাইট্রেট অব সোডা প্রায় প্রত্যক ডাক্তার খানায় পাওয়া যায় এবং ইহার দামও বেশী নয়। যে সকল শিশুর গরুর দুধ সহ্য হয় না তাহাদের মলে বড় বড় ছানার ডেলা থাকিতে দেখা যায়; কিংবা তাহারা যে দুধ তুলে তাহার মধ্যে বড় বড় দুধের চাপ থাকে। এরূপ স্থলে সাইট্রেট অব সোডা মিশ্রিত দুধ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

শুষ্ক দুগ্ধ—(Dried milk) **গাঢ় দুগ্ধ** (Condensed milk)— শুষ্ক দুগ্ধের ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক বা গাঢ় দুগ্ধ অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুষ্ক দুগ্ধই বল, আর গাঢ় দুগ্ধই বল, কোনটাই টাট্‌কা গরুর দুধের সমকক্ষ নহে। যেখানে টাট্‌কা ভাল দুধ পাওয়া যায় সেখানে ইহাদের ব্যবহার না করাই উচিত। তবে যেখানে ভাল দুধ মিলে না সেখানে ইহাদের অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিশুর জন্য কি করিয়া কন্‌ডেন্সড মিল্ক প্রস্তুত করিতে হয় আমরা এস্থলে তাহারই কথা বলিব। বাজারে দুই প্রকার কনডেন্সড্‌ মিল্ক কিনিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার দুধে খুব বেশী পরিমাণ চিনি দেওয়া থাকে, আর দ্বিতীয় প্রকার কনডেন্সড্‌ মিল্কে তত বেশী চিনি দেওয়া থাকে না। বলা বাহুল্য শিশুর পক্ষে এই শেষোক্ত প্রকার দুধই ভাল। যতটা কনডেন্সড মিল্ক লইবে তাহার চারিগুণ জল লইয়া উহার সহিত উক্ত রূপে মিশ্রিত করিবে। তাহার পর উহাতে দুগ্ধ, শর্করা, ও ক্রীম বা মাখন মিশ্রিত করিবে। মনে কর আধ ছটাক কনডেন্সড্‌ মিল্ক লইয়াছ; তাহা হইলে উহাতে দুই ছটাক জল মিশ্রিত করিবে, এবং চা খাইবার চামচের এক চামচ দুগ্ধ শর্করা ও এক চামচ্‌ ক্রীম বা মাখন মিশ্রিত করিবে। এক একটি শিশু এমন থাকে যে, হয়ত তাহারা টাট্‌কা দুধ সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু কনডেন্সড মিল্ক অবাধে সহ্য করিতে পারে। তথাপি এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, টাট্‌কা দুধ না দিয়া কোন শিশুকে যদি আগা গোড়া কনডেন্সড্‌ মিল্ক খাওয়াইয়া মানুষ করা যায় তাহা হইলে কিন্তু শিশুটির অনেক রকম রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা।

পেটেণ্ট ফুড্—পেটেণ্ট্ ফুড যে কত রকমের আছে তাহা সংখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া অনেকেই পেটেণ্ট ফুড ক্রয় করিয়া শিশুদের খাওয়াইয়া থাকেন বটে, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশুদের পেটেণ্ট ফুড্ কোন মতেই উপযুক্ত খাদ্য হইতে পারে না। পেটেণ্ট্ ফুড দ্বারা লোকের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহা আর কি বলিব। ভাল টাট্‌কা গরুর দুধের ফল খুব ভাল, পেটেণ্ট্ ফুডে তাহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহাদের দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই উপকার দূরে থাকুক্ বিলক্ষণ অপকারই হইতে দেখা যায়। ইহাদের দ্বারা শিশুর অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ হয়। কোন কোন স্থলে পেটেণ্ট্ ফুড খাওয়াইয়া শিশুকে বেশ গোল গাল মোটা সোটা হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু সে মোটা কোন কাজেরই নয়। শরীরের কতক মেদ বৃদ্ধি হয় মাত্র, মাংস কি হাড়ের কিছুই হয় না; তাই বলিয়া পেটেণ্ট্ ফুডের যে কোন আবশ্যক নাই আমরা এমন কথা বলিতেছি না। ৮।৯ মাসের শিশুকে দুধের সঙ্গে কোন একটি পেটেণ্ট্ ফুড খাইতে দিলে অনেক স্থলেই বেশ ফল পাইতে দেখা যায়, কিন্তু শিশুর ৭ মাস বয়সের পূর্ব্বে কদাচ পেটেণ্ট্ ফুড খাওয়াইতে নাই। সে সময় সদ্য টাট্‌কা দুধই তাহার একমাত্র খাদ্য।

জন্ম হইতে ছয় মাস—ভুমিষ্ঠকাল হইতে ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে কিরূপ ভাবে খাওয়ান উচিত, সে বিষয় ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কখন কখন এমন হয় যে, শিশু তাহার মাতার দুগ্ধ ঠিক সহ্য করিতে পারে না। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থা ২।৪ দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। এসময়ে শিশুকে কতকটা রুগ্ন দেখায় এবং তাহার স্বাভাবিক বাড় বন্ধ থাকে। মাতা যদি এমন বুঝিতে পারেন যে, শিশুর তেমন পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কাজ শিশুর দেহের অবস্থাটি কিরূপ তাহা নিরূপণ করা। তাহার বমি হয় কি না, সে কিরূপ মল ত্যাগ করে—পাতলা না কঠিন সবুজে না স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট; ইহার গন্ধ কিরূপ-উহাতে দুধের কুচি আছে কি না—মলের সঙ্গে আম অথবা রক্ত অথবা আম রক্ত উভয়ই মিশ্রিত আছে কি না। এসকল বিষয়ই বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক। অনেক সময় পেট কাঁপিয়া শিশু যারপর নাই কষ্ট পায়। সে সময় তাহার পেটটি ফুলিয়া উঁচু হয়, থাকিয়া থাকিয়া তাহার আঙ্গুল মুখ ও চোক দুটি কুঁচকাইতে থাকে। এরূপ হইতে থাকিলে শিশুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক সময়, এ সকল উপসর্গ তেমন কিছুই নয়—আপনা হইতেই দূর হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু স্থল বিশেষে এগুলিকে কোন একটা ভারী কঠিন রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদি এমন বুঝা যায় যে, শিশু ঠিক মত বাড়িতেছে না, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে শিশু শুধু স্তনে মুখ দিয়া থাকে, না রীতি মত টানিয়া খায়। যদি এমন বুঝা যায় যে, শিশুর দুধ গিলিতে কোনরূপ কষ্ট হইতেছে তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকাইয়া, উহার মুখের মধ্যটা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, মাতার স্তনে যতটা দুগ্ধ জন্মায়, শিশুর পক্ষে হয়ত তাহা যথেষ্ট নয়, কিংবা তাহার গুণ তেমন ভাল নয় সেই কারণে শিশুর দেহ তেমন বর্দ্ধিত হয় না। এরূপ স্থলে ডাক্তার ডাকাইয়া দুধটা পরীক্ষা করা আবশ্যক। ডাক্তার যদি এমন বুঝেন যে প্রসূতির দুগ্ধ তেমন ভাল নয়—তাহা হইলে তিনি প্রসূতিকে এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন যাহা খাইলে দুগ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি হয় এবং তাহার গুণেরও উন্নতি সাধিত হয়। প্রসূতিরা যদি অতিরিক্ত জল পান করে তাহা হইলে তাহাদের দুধ খুব বেশী সেজল হয়। সেই দুধ খাইল, শিশুর দেহের তেমন পরিপোষণ হইতে পারে না; এই কারণে প্রসূতিকে অনেক সময় জল খাওয়া একেবারেই বন্ধ করা আবশ্যক হয়। জলের পরিবর্ত্তে তিনি দুধ খাইয়া পিপাসা মিটাইতে পারেন। সুধু দুধ যদি সহ্য না হয়, তাহা

হইলে, তাহার সহিত ভাত, কি রুটী এইরূপ কোন দ্রব্য খাইতে পারেন। কয়েক দিন এই রূপ ভাবে থাকিতে পারিলেই সমস্ত দোষ সংশোধন হইতে দেখা যায়। কোন প্রসূতি যদি এরূপ ভাবে থাকিতে নিতান্তই অসমর্থ হন অথচ যদি তখন বুঝা যায় যে, তাহার স্তনদুগ্ধ খাইয়া শিশুর দেহের ভালরূপ পরিপোষণ হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে, সুবিধা হইলে, এক জন স্তন্যদায়িনী ধাত্রী নিযুক্ত করা মন্দ নহে। তাহার অভাবে শিশুকে মাই ছাড়াইয়া গাইয়ের দুধ ধরাইলেও চলিতে পারে।

শিশুর মলে যদি ছানার কুঁচি থাকে, কিংবা ইহার বর্ণ যদি সবুজ হয় তাহা হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যে সকল শিশু কেবল মাইয়ের দুধ খায়, গরুর দুধ মোটেই খায় না, তাহাদের মল যদি সামান্য একটু সবজে গাঢ় হয় কিংবা উহার মধ্যে যদি ২।১ টা ছানার ডেলা থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই বটে, কিন্তু যে সকল শিশু মাতৃ-স্তন্যে একেবারে বঞ্চিত তাহাদের বেলায় ইহা কদাচ উপেক্ষা করিতে নাই। এরূপ স্থলে ইহার কারণ অবিলম্বে দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

শিশুর মল যদি খুব কঠিন হয়, তাহা হইলে মলদ্বার দিয়া ২।১ ফোটা রক্ত না পড়িতে পারে এমন নয়। এরূপ স্থলে উহাকে ৩০ ফোটা ক্যাষ্টর অয়েল্ ও ৩০ ফোটা অলিভ্ অয়েল একত্র মিশ্রিত করিয়া, একটু দুধের সহিত খাওয়াইয়া দিবে। মলের সহিত যদি অধিক পরিমাণ আম মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে, চিকিৎসক ডাকা উচিত।

দুধ তোলা শিশুদের একটা খুবই সাধারণ রোগ বলিতে হইবে। আহারের দোষই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া জানিবে। অনেকে শিশুকে এত ঘন ঘন খাওয়ান, অথবা এত বেশী খাওয়ান যে, বমি করিয়া কতকটা তুলিয়া ফেলিয়া তবে তাহার প্রাণ বাঁচে।

শিশুকে যে দুধ খাওয়ান হয়, তাহা যদি, তাহার পক্ষে গুরুপাক হয়—তাহা হইলেও, তাহার বাহ্য হইতে পারে। এ সকল ছাড়া দুধ তোলার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কেমন স্বভাব তাহারা শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া, দোলাইতে আরম্ভ করেন; ভরা পেটে ঝাঁকাইতে থাকিলে, বমি হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

মাতা যদি বিরেচক ঔষধ সেবন করেন, কিংবা এমন সব খাদ্য খান, যাহা সহজে জীর্ণ হয় না—তাহা হইলে, তাহার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া, শিশুরও তরল ভেদ হইতে পারে। এই কারণে মাতার পক্ষে, অধিক পরিমাণে ফলফলারী প্রভৃতি খাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে

কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া, অনেক শিশু বড় কষ্ট পায়; অনেক সময় শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে। শিশুর যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে মাতাকে, বেল, পেঁপে, ডুম্বুর, কলা প্রভৃতি ফলের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শিশুকে প্রতিদিন একটুখানি করিয়া অলিভ্ অয়েল্ সেবন করাইবে। ১০।১৫ দিনের শিশুকে ৩০।৪০ ফোটা অলিভ্ অয়েল্ অবাধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ২।৪ দিন এরূপ করার পর, যদি তাহার কোষ্ঠবদ্ধ দোষ না যায়, তাহা হইলে, ২।১ দিবস ধরিয়া, শিশুকে দিনে এক বার কি দুই বার করিয়া, এক ঝিনুক পরিমাণ ফ্লুইড ম্যাগনেসিয়া (Fluid Magnesia) নামক ঔষধ সেবন করাইয়া, দেখিতে পারা যায়। অনেক সময়, শিশুকে নিয়ম মত মল ত্যাগের অভ্যাস না করানতেই, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ রোগ দেখা দেয়। ৭ দিবস বয়স হইতেই, শিশুকে নিয়ম মত মল ত্যাগ অভ্যাস করাইতে হয়। শিশুর মল যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, তাহার পেটের মধ্যে, অনিষ্টকর কোন পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে। হয় তো তাহার চুষীতে ময়লা ছিল, নয় তো, তাহার মাতার স্তনের বোঁটাটি যথোচিত পরিষ্কার ছিল না। এত করিয়াও যদি শিশুকে তেমন বড় হইতে না দেখা

যায়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, মাতৃ-স্তন্য তাহার ঠিক উপযোগী নয়, এরূপ স্থলে, তাহাকে মাই ছাড়াইয়া গাইয়ের দুধ ধরাইতে চেষ্টা করিবে।

উপরে যে সকল উপসর্গের কথা বলা হইল, সেগুলি গো-দুগ্ধে পালিত শিশুর পক্ষে যতটা ভয়াবহ মাতৃস্তন্যে পালিত শিশুর পক্ষে ততটা নহে। মাতৃ-দুগ্ধই শিশুর যথার্থ খাদ্য। শিশু যেমন বড় হইতে থাকে—মাতার স্তনের দুধেরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুণের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। গো-দুগ্ধে যত বড় বড় ছানার ডেলা হয়, মাতৃ-দুগ্ধে তাহা হইতে পায় না। এই সকল কারণে গো-দুগ্ধ খাওয়াইয়া শিশুকে মানুষ করিয়া তোলা অনেক সময় শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আজকাল শিশু-পালন বিদ্যার এতদুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, মাতৃ-স্তন্য না খাওয়াইয়াও শিশুকে উত্তম রূপে মানুষ করিয়া, তুলিতে পারা যায়। এ বিষয়ে, এ স্থানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। মনে কর, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে শিশুটি দেড় মাস বয়স পর্য্যন্ত ভালই ছিল—কোন রূপ গোলযোগ বা উপসর্গ এক দিনের জন্যও উপস্থিত হয় নাই। পরে এক দিন দেখা গেল, শিশুটির আহারে যেন তেমন রুচি নাই। সে যাহা খায় বমি করিয়া তুলিয়া ফেলে। তার বাহ্যেটাও হয় তো তেমন সুবিধাজনক নয়; তাহাকে হয় তো কতকটা রুগ্নও দেখাইতেছে। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য। একটি কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, দেড় মাস বয়সে প্রায় সকল শিশুরই একটু আধটু পেটের গোলযোগ ঘটিতে দেখা যায়। যে সকল শিশু মাতৃ-দুগ্ধে বঞ্চিত, তাহাদের বেলায় তো কথাই নাই। মাতৃস্তন্যপায়ী কোন শিশুর যদি ঐ রূপ পেটের গোলযোগ ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে মাই চাটিতে না দিয়া, মাই হইতে দুধ গালিয়া লইয়া, সেই দুধের সহিত জল মিশাইয়া খাইতে দিবে; অথবা অপর কোন প্রসূতির দুধ খাওয়াইয়া দেখিবে। সময় বিশেষে মাতৃ-দুগ্ধ বন্ধ রাখিয়া, গো-দুগ্ধের সহিত ৫ গুণ জল মিশাইয়া খাইতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দুগ্ধ নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিবে। দুধের সহিত ৫ গুণ পরিষ্কার জল মিশাইয়া উহাতে ২ গ্রেণ সাইট্রেট্ অব সোডা (Citrate of Soda) দিবে। ইহাতে অনেক স্থলেই সুন্দর ফল পাওয়া যায়। স্থল বিশেষে সাইট্রেট্ অব সোডা দ্বারা কোনই ফল হইতে দেখা যায় না। শিশুর যদি অনবরত বমি হইতে থাকে, তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া, চিকিৎসক ডাকা উচিত। এ অবস্থায় অনেকেই শিশুকে, বার্লি-ওয়াটার (Barley water) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, বার্লি-ওয়াটারে বমি বন্ধ না করিয়া বরঞ্চ বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। সাইট্রেট্ অব সোডা ও জল মিশ্রিত দুগ্ধ যে সকল শিশু সহ্য করিতে পারে না তাহাদিগকে পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ (Peptonised) দুগ্ধ খাওয়াইলে বিশেষ ফল হইতে দেখা যায়। ফেয়ার্ চাইল্‌ড্‌স্ পেপ্‌টোজেনিক্ পাউডার (Fair child's peptogenic powder) নামক ঔষধ দ্বারা দুগ্ধকে পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ (peptonised) করিতে হয়। এ ঔষধটি প্রায় সকল ডাক্তারখানাতেই কিনিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধকে কি করিয়া পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ করিতে হয় তাহা পরে বিবৃত হইবে। এইরূপে প্রস্তুত দুগ্ধ প্রায় সকল শিশুই সহ্য করিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও এ রূপ দুগ্ধও সহ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাকে "রূপান্তরিত দুগ্ধ" (modified milk), কিংবা ছানার জল, কি এল্‌বুমেন্ ওয়াটার (albumen water) ব্যবস্থা করিতে হয়। এল্‌বুমেন্ ওয়াটার নিম্ন বর্ণিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। একটি ডিম্বের শ্বেতাংশটুকু লইয়া এক পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একটি বোতলে রাখিয়া বোতলটি ছিপিবদ্ধ করিবে; অতঃপর কয়েক মিনিট ধরিয়া উত্তম রূপে ঝাঁকাইয়া লইবে। ইহার সহিত একটু চিনি ও দারুচিনির জল মিশাইতে না পারা যায় এমন নয়। পরিবর্ত্তিত দুগ্ধ (modified milk) ঘরেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। এক মাস অথবা দেড় মাসের শিশুর উপযোগী করিতে হইলে, উহাতে শতকরা ১/২ অংশ

কেসিন্ (Casein) অর্থাৎ ছানার ভাগ, শতকরা ৠ অংশ ল্যাক্‌ট্ এলবুমেন্ (lact albumen) ও শতকরা ১½ ভাগ মাখন (fat) এবং শতকরা ৬ ভাগ শর্করা (sugar of milk) থাকা আবশ্যক। বলা বাহুল্য স্বাভাবিক দুগ্ধে ঐ সকল দ্রব্য উপরি উক্ত পরিমাণে থাকে না। স্বাভাবিক দুগ্ধে কোন উপাদানটি কি পরিমাণে আছে, তাহা ইতি-পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক ছটাক পরিবর্ত্তিত (modified) দুগ্ধের সহিত সামান্য একটু চূণের জল মিশাইয়া অগ্নি-তাপে ফুটাইয়া লইলে এক মাস, দেড় মাস বয়সের শিশুর একবারেকার মত খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা শিশু অতি সহজেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ইহা খাইয়া শিশুর পেট যদি বেশ ভাল থাকে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উহাতে মাখন (fat) ও কেসিন্ (casein) এর মাত্রা বাড়াইতে থাকিবে। শিশুকে দিন কয়েক এই দুধ খাওয়াইয়া রাখিলে, তাহার সর্ব্বপ্রকার পেটের দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। ইহার পর গাইয়ের দুধ দিলে সে অবাধে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। মনে কর কোন শিশুর পরিবর্ত্তিত দুগ্ধও (modified milk) সহ্য হইতেছে না, সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য। সেরূপ স্থলে দেড় ঘণ্টা অন্তর তাহাকে আধ ছটাক করিয়া ছানার জল (whey) দিয়া রাখিবে। এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, সুধু ছানার জলে শিশুর দেহের ঠিক পুষ্টি-সাধন হয় না। সুধু ছানার জল খাওয়াইয়া রাখিলে শিশুর দেহের ওজন কতকটা কমিয়া যায়। তা বলিয়া আর উপায় কি আছে? সে যে অন্য কোন খাদ্য মোটেই জীর্ণ করিতে পারে না! তাহার জীবন লইয়া যে টানাটানি পড়িবার মত হইয়াছে।

দুই চার দিন ছানার জল দিয়া রাখিলে তাহার পেট ঠিক হইয়া যায়। তাহার পর একটু একটু করিয়া খাঁটি দুগ্ধ দিলে সহজেই সহ্য হইতে দেখা যায়। ছানার জল খাওয়াইয়া শিশুর পেট ঠিক হইলে, একবারেই খাঁটি দুধ দিতে নাই। ৮।১০ দিন ধরিয়া উহাকে পেপ্‌টোনাইজড্ (peptonised) দুধের উপর রাখিতে হয়। দুধকে কি করিয়া পেপটোনাইজড্ করিতে হয়, সে বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম কয় দিন দুধকে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া পেপটো-নাইজ্‌ড্ করিবে; পরে দিন দিন কমাইতে কমাইতে উহা ৫ মিনিটে দাঁড় করাইবে। তাহার পর খাঁটি দুধ ধরাইবে। দুধকে পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ (peptonise) করিতে হইলে ফেয়ার চাইলড্‌স্ পেপটোজেনিক মিল্‌ক্ পাউডার (Fair child's, peptogenic milk power) নামক ঔষধটি সংগ্রহ করা আবশ্যক। ইহা ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যে দুধকে পেপটো-নাইজ করা আবশ্যক তাহার সহিত সমপরিমাণ জল মিশাইবার আবশ্যক হয়। কিন্তু যে স্থলে শিশুর পেটের অবস্থা খুবই খারাপ, সেখানে এক ভাগ দুধের সহিত ৩।৪ ভাগ জল মিশাইতে হয়। মনে কর ৩ ছটাক দুধকে পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ করিবে, তাহা হইলে ঐ দুধের সহিত অন্ততঃ পক্ষে ৭ ছটাক জল মিশাইবে এবং পেপ্‌টোজেনিক পাউডার (peptogenic powder) মাপ করিবার জন্য যে একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকার বাটি থাকে, সেই বাটিটি পূর্ণ করিয়া এক বাটি ঔষধ চূর্ণ লইবে। এই কয়টি জিনিস একটি পরিষ্কার পাত্রে উত্তম করিয়া মিশাইতে থাকিবে। ইহার পর অগ্নির তাপে ফুটাইতে থাকিবে এবং বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে।

শিশুর পেটের অবস্থা বুঝিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৫ মিনিট কাল ধরিয়া এই ঔষধটি মৃদু তাপে ফুটাইবার আবশ্যক হয়। পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ মিল্‌ক্ বেশী দিন ধরিয়া খাওয়াইতে নাই তাহাতে শিশুর স্কার্ভি (scurvy) নামক রোগ দেখা দিতে পারে।

ছানার জল (whey) নানা উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে। ফুটন্ত দুধে লেবুর রস দিলে ছানা বাঁধিয়া যায়। দুই পুরু ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লইলে, দিব্য ছানার জল প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া রেনেট্ হোয়ে (rennet whey) ও হোয়াইট্ ওয়াইন্ হোয়ে (white wine whey)

নামক আরও দুই প্রকার ছানার জল ডাক্তার মহাশয়গণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। তাহাদেরও প্রস্তুত প্রণালী এস্থলে প্রদত্ত হইল।

রেনেট্ হোয়ে (rennet whey) নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। দশ ছটাক খাঁটি দুধ অগ্নি-তাপে ফুটাইয়া লইয়া একখানি এনামিলের ডিসে, অথবা মাটি কি পাথরের থালায় রাখিয়া, উহাতে এক চামচ রেনেট্ (rennet) নামক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে নাড়া চাড়া করিবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত দুধ চাপ বাঁধিয়া জমিয়া যাইবে। চাপ বাঁধার পর দশ মিনিট কাল রাখিয়া দিবে; তাহার পর রূপার ছুরী অভাবে বাঁশের চটা তুলিয়া, তাহার দ্বারা বরফির আকারে কাটিতে থাকিবে। এই সব বরফির গা হইতে এক রকম পাতলা, হলুদে রঙের রস নির্গত হইতে থাকিবে। এই রসই রেনেট্ হোয়ে নামক ছানার জল। পরিষ্কার নয়ানসুক কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া শিশুকে খাইতে দিবে। ১০ ছটাক দুধ হইতে প্রায় ছয় ছটাক ছানার জল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহা খাইয়া শিশুর পেটের দোষ সংশোধিত হইলে, উহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ মিশাইয়া দেখিতে পারা যায়। ছানার জলের সহিত দুধ মিশাইতে হয়; ইহা না করিলে দুধটা জমাট ধরিয়া ছানা হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার রেনেট (rennet) এর মধ্যে বেন্জার্স্ রেনেট্ (Benger's rennet) নামক রেনেটই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ছানার জল অবশ্য দুধের মত পরিপোষক নহে। ইহাতে ল্যাক্টো এল্বুমেন (lacto albumen) দুগ্ধশর্করা (sugar of milk) এবং অতি সামান্য পরিমাণে কেসিন্ (casein) ও মাখন (fat) বিদ্যমান থাকে। দুধের অধিকাংশ মাখন ও কেসিন ছানার মধ্যে থাকিয়া যায়। অবস্থাবিশেষে শিশুকে দুই কাচ্চা হইতে ২ ছটাক পরিমাণে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে পারা যায়।

হোয়াইট্ ওয়াইন্ হোয়ে (White wine whey) নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুত করিতে হয়। ৫ ছটাক পরিমাণ দুধ একটি এনামেল-পাত্রে করিয়া আগুনে চড়াইয়া দিবে—ফুটিতে আরম্ভ করিলেই নামাইয়া লইয়া, উহাতে এক ছটাক দেড় ছটাক কুকিং শেরী (Cooking sherry) নামক মদ্য মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটাইয়া লইবে। তিন মিনিট রাখিয়া দিলে সমস্ত দুধটা ছানায় পরিণত হইবে। অতঃপর নয়ানসুক কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই ছানার জল পাওয়া যাইবে। নয়ানসুক কাপড়খানি জলে সিদ্ধ করিয়া, শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। এই ছানার জলটিতে কিঞ্চিৎ মদ্য থাকায়, উত্তেজক ঔষধেরও ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা বমি হইয়া উঠিয়া যায় না। দেড় মাসের শিশুকে অবাধে দুই কাচ্চা পরিমাণে আধ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৭।৮ বার দিতে পারা যায়।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুধের মধ্যে কেসিন্ (casein) ও মাখন (fat) কমাইবার জন্য আমাদের এত কষ্ট কেন—আর দুগ্ধ-শর্করা ও ল্যাক্টো এল্বুমেন্ (lacto albumen) কমাইবার জন্য কোনই চেষ্টা নাই কেন? তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, দুধের মধ্যে কেসিন্ ও মাখনই শিশুর সহ্য হয় না। ল্যাক্টো এল্বুমেন্ ও দুগ্ধ-শর্করা সকল অবস্থাতেই সহ্য হয়। ইহাদের দ্বারা কদাপি শিশুর পেটের গোলযোগ উপস্থিত হয় না। দুধকে পেপ্টোনাইজ্ড্ (peptonised) করিলে, উহার মধ্যে ছানার পরিমাণ কমে না বটে, কিন্তু উহার অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় যে, শিশুর দুর্ব্বল পাকাশয়েও উহা অনায়াসে সহ্য হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্চি।

সোনাকান্দার দুর্গ

খিজিরপুরের বিখ্যাত ভূঞা ঈশা খাঁ মসনদ আলি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ব্ববঙ্গে মগ ও আরাকানবাসিদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ শীতললক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর সংযোগ স্থলে সোনাকান্দার দুর্গ (ত্রিবেণী) নির্ম্মাণ করেন। তখন এই দুর্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া শীতললক্ষ্যা নদী প্রবাহিত হইত; কিন্তু এখন উহা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।*

দুর্গ এখন আর বিদ্যমান নাই, শুধু কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ঈশা খাঁর কীর্ত্তি—স্তম্ভের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান আছে। যে সব ইতিহাসে এই দুর্গের উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

এই দুর্গ সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ হইতে জানা যায় যে, ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে † ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী সোনাবিবি (চাঁদ রায়-কেদার রায়ের বিধবা ভগ্নী। ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেন 'ঈশা খাঁ বল প্রয়োগে চাঁদ রায়ের একমাত্র কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া গিয়া বিবাহ করেন।') রাজনৈতিক ব্যাপারে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। ঈশা খাঁর বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত খুব সদ্ভাব ছিল। এক সময়ে ঈশা খাঁ কেদার রায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অশুভ মুহূর্ত্তে ঈশা খাঁ মিত্ররাজের বিধবা ভগ্নী সোনামনিকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যে আত্মহারা হইয়াছিলেন। রূপমুগ্ধ ঈশা খাঁ খিজিরপুরে প্রত্যাগমন করিয়া স্বর্ণময়ীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য মিত্ররাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই অন্যায় প্রস্তাব হিন্দু রাজার নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া কেদার রায় ঈশা খাঁর কলাগাছার দুর্গ আক্রমণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধা না পাইয়া ঈশা খাঁ গুপ্ত উপায়ে সোনামনিকে পাইবার জন্য অগ্রসর হন। কেদার রায়ের অমাত্য বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁয়ের সহায়তায় তিনি সোনামনিকে অপহরণ করেন। অনেক দেশের ইতিহাসই বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ককাহিনীতে পরিপূর্ণ, ভারতবর্ষেও ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না।

সোনামনির সহিত ঈশা খাঁর বিবাহ ব্যাপার জনশ্রুতি মাত্র। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। * ঈশা খাঁর বংশধরেরা এখনও বিদ্যমান আছেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎ নগরের প্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবেরাই ঈশা খাঁর বংশধর বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক ওয়াইজ সাহেবও সোনামনির সহিত ঈশা খাঁর বিবাহ ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে জনশ্রুতি ব্যতীত অধিক কিছুই বলিতে পারেন নাই। স্বর্ণময়ী চাঁদ রায়ের কন্যা ইহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। পূর্ব্ববাংলার সকলেই স্বর্ণময়ীকে প্রসিদ্ধ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের ভগ্নী বলিয়া জানে। এই সমস্ত সমস্যাপূর্ণ ঘটনার সত্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নীরব, উপাদানের অভাবে আজিও কেহ এই সকল সন্দেহ নিরাকরণে সমর্থ হইতে পারেন নাই।

* This fort is situated at the junction of the Lakhya and Dhalleswari rivers. It stands opposite Naraingunje on the east side of the Lakhya river. It is one of the 3 forts built for the purpose of repelling the invasions of the Mughs and Arakanese. It is a level quadrangular space measuring 296′×190′ surrounded by a wall of brick work 10 feet in height with inner and intermediate bastions and a raised out-work on the western face. The wall is loop-holed for 3 feet from the top, the bottom being built solid. It is only 3½ feet thick. P. 208—A list of Ancient Monuments in Bengal.

† আইন আকবরী Vol. I.—পৃঃ ৩৪০।

* বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ওয়াইজ বলেন,—'Isa Khan carried off and forcibly married Sonai (Svarnamayi), the only daughter of Chand Rai.' বার ভূঞা পুস্তিকায় অন্যত্র দেখিতে পাই,—'Isa Khan is said to have married Fatimah Khatun, a cousin of his own, and grand daughter of Hossein Sha of Bengal.'

ঈশা খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বৈরনির্য্যাতন মানসে কেদার রায় ত্রিপুরারাজের সহিত সংমিলিত হইয়া ত্রিবেণীর দুর্গ অবরোধ করেন। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গে ভ্রাতা-ভগ্নীতে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সোনাবিবি মৃত স্বামীর গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি দুর্গ রক্ষা করেন, অবশেষে যখন দেখিলেন সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হইল, তখন তিনি দুর্গে অগ্নি প্রদান করিয়া দুর্গ ধ্বংস করেন, এবং নিজে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন। সোনাবিবির উচ্চ হৃদয় রাজপুত রমণীর বীরত্ব ও আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হইল। আজিও লক্ষ্যার তীরবর্ত্তী লোকেরা সোনাবিবির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আত্মগৌরব বোধ করেন। সম্ভবতঃ সোনাবিবির পুণ্য নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই সেই স্থানের নাম 'সোনাকান্দা' রাখা হইয়াছে। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে। চাউল আমদানির জন্য এই হাট প্রসিদ্ধ।

ত্রিবেণী দুর্গের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণগ্রামের পতন আরম্ভ হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সনাতনী

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত। হিন্দুধর্ম্মের "যেগুলি সার কথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্ত্তনীয়া, সেইগুলিকেই সনাতনী" (৵০) নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অংশ উহার প্রাণ, আর কোন কোন অংশ উহার বহিরবয়ব মাত্র, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা নির্ণয় না করিতে পারিলে, হিন্দুধর্ম্মের সকল অংশকেই সনাতন ধর্ম্ম মনে করিয়া হয় আমরা দত্ত বা সরকারের ধর্ম্মব্যাখ্যাকে অনধিকারচর্চ্চা ও পাপ বলিয়া মনে করি, নয় ত হিন্দু ধর্ম্মের বহিরবয়বে ঘুণ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া উহাকে একেবারে পরিহার করিবার চেষ্টা পাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই একটা না একটা বহিরাবরণ অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রকাশিত করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই কালক্রমে ঐ বহিরাবরণ ধর্ম্মের প্রাণের স্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টার ফলে, যখন ধর্ম্মের প্রাণ ধর্ম্মের বহিরবয়বকে ছাড়ছাড় হইয়াছে, তখনই কোন না কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্মের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল। তখন লোকে বাহ্য ক্রিয়া বা আচার পদ্ধতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরমধার্ম্মিক কুরুবৃদ্ধ পিতামহ দেবব্রত ভীষ্মদেবও ধর্ম্মের বহিরবয়বকে উহার প্রাণ বলিয়া কখন কখন ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাহা না হইলে, তিনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে বাধা দিতেন, তিনি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করিতেন না। "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ" —মানুষ অর্থের দাস, অর্থাৎ "যাঁহার নুন খাইয়াছ, তাঁহার পাপেরও সাহায্য করিতে হইবে।" এইরূপ সাঙ্ঘাতিক ভ্রম আজন্মশুচি দেবব্রতেরও হইয়াছিল। ইহার কারণ "কালধর্ম্ম"। এই কালধর্ম্মকেই বিদেশীয়েরা স্পিরিট্ অব্ দি টাইম্ বা ট্সাইট্গাইষ্ট (Spirit of the time, zeitgeist) আখ্যা দিয়াছেন। এই কালপ্রভাবে লোকে ধর্ম্মের "অপরিবর্ত্তনীয়া" "সারকথা, মজ্জার কথা" ভুলিয়া গিয়াছিল, তাই তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আবার এই রূপেই নবদ্বীপে প্রেমাবতার চৈতন্যের জন্ম। এই রূপ যে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে, তাহা নহে। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে এইরূপে ধর্ম্মের সংস্থাপন বা সংস্কার হইয়াছে: অবশ্য সরকার মহাশয় এ কথা মানিবেন না। কেননা, তাঁহার মতে, "অন্যান্য দেশ ভোগভূমি, কেবল ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি" (৶০)। এ কথার অর্থ কি? কর্ম্ম শব্দের একটি অর্থ মজুরি কর। ভারতের লোক কি কেবল মাত্র মজুরি করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন?

কর্ম্মভূমি হইবে কেন? চীন, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ফরাসি প্রভৃতি দেশের লোকের কি ধর্ম্মকর্ম্ম নাই? তাঁহাদের ইতিহাসে কি পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায় না? ইংলণ্ডের পিউরিটানেরা যদি ধার্ম্মিক না হন, তবে ধার্ম্মিক কাহারা? এইরূপ পরাবজ্ঞাসূচিকা লিখনপ্রণালী সর্ব্বথা হেয়। মানুষ পরকে অবজ্ঞা করিয়া বড় হয় না। ভেদ-বুদ্ধিও মহত্বের সোপান নহে। প্রেম দ্বারা বড় হয়—আত্ম-ত্যাগ দ্বারা বড় হয়। সনাতনীর মুখবন্ধে এই রূপ সনাতন ধর্ম্মবিরুদ্ধ সর্ব্বভূতানুকম্পাবিরুদ্ধ কথার সন্নিবেশ আমাদিগকে ব্যথিত করিয়াছে। মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবচরিত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুলেখক চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গের অনেক কৃতী সন্তান হিন্দুধর্ম্মের "সনাতনী" বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্লেষণে ধর্ম্মসংস্থাপন হয় না। ধর্ম্মসংস্থাপনের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। এই যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্ম্মের একজন প্রকৃত সংস্থাপক বা সংস্কারক। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থকারগণ তাঁহার ও তৎসদৃশ অন্যান্য মহাপুরুষের কর্ম্মের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন এবং এই জন্যই তাঁহারা সমাজের প্রকৃত উপকারক ও বরেণ্য।

অক্ষয়চন্দ্রের সনাতনী বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব এবং চন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত। তিনিও হিন্দুধর্ম্মের সনাতন অংশ পৃথক্ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সাধুবাদার্হ। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে যে, তিনি তাহার বিশাল মুটে এত বহুত জিনিস ধরিয়াছেন যে, তাহার হস্ত যে ধর্ম্মাচারকুম্ভের সরু মুখ অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিবে, এইরূপ সম্ভাবনা নাই।

গ্রন্থকার বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি মূর্খ"। এইরূপ কৃত্রিম বিনয়-প্রদর্শন ধর্ম্মগ্রন্থে শোভা পায় না। উহা আজকাল একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যিনি গ্রন্থ লিখিতে যান, তাঁহার ইহা ভুলা উচিত নহে যে, প্রকাশিত গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্র তাঁহার আর অন্যান্য দেশের লোক কেবল মাত্র ভোগের জন্যই জন্মেন? কর্ম্ম অর্থ যদি ধর্ম্ম হয়, তবে কেবল ভারতবর্ষই দুই চারি ছত্র ব্যাপ্তী বিনয়প্রকাশের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেয়। আমেরিকার তাপস থোরো যথার্থই বলিয়াছেন "We commonly do not remember that it is, after all, always the first person that is speaking."

সনাতনীতে বহু ভাল কথা এবং বহুতর মন্দ কথা আছে। সনাতনীর ভিত্তিস্থ তত্ত্বগুলি প্রায়ই ভ্রান্ত। সনাতনীর ভাষা তত মন্দ নহে। ঐতিহাসিক ভুল, অনুবাদের ভুল গ্রন্থকে দুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীযুত সরকার মহাশয়ের খুব নাম আছে। তাঁহার কাছে এমন গ্রন্থ আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"য়ুদী কোন্ কালে বাস্তুদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর কত উৎপীড়ন উপদ্রব মাথায় বহিয়াছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন? তাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া।"

গ্রন্থকারের মত এই যে যদি আমরা "স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ" হই তবে আমরা য়ুদীদের মতন হইব। গ্রন্থকারের মতে বাঁচিয়া থাকাই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্ম য়ুদীদিগকে রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু য়ুদীদের মত স্বদেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া পরদেশে পরাধীন জীবন কাহারও স্পৃহণীয় হইবে কি? এই উপমার মধ্যে যাঁহারা সত্য দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা তো অচিরাৎ সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিবেন বলিয়া বোধ হয়। সনাতন ধর্ম্মের এমন দিব্য লোভনীয় ভবিষ্যৎ আর কোন কবির কল্পনাপটে চিত্রিত হয় নাই!

গ্রন্থকারের মতে য়ুদী বড় না ইংরাজাদি বড়? ভোগভূমি (!) বাসী ইংরাজাদি কি "সুন্দর, উন্নতদেহ,

দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলানিপুণ" নহেন? খৃষ্টানেরা বলেন, য়ুদীরা যীশুখৃষ্টের প্রচারিত সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা। গ্রন্থকার বলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। পাঠক বিচার করিবেন।

গ্রন্থকার বলেন যে, যবন (Ionians) এবং রোমকেরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (৩ পৃ।১৭৫ পৃ)। ভারতবাসী আজিও দাঁড়াইয়া আছে, কেন না উহাদের ধর্ম্ম ছিল না, আমাদের আছে (১৭৫ পৃ)। প্রথমতঃ ভারতবাসী "দাঁড়াইয়া আছে" না বলিয়া "শুইয়া আছে" বলিলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ যবন ও রোমকেরা যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন এ তত্ত্ব ইতিহাসে লিখে না। উহাদের বংশ এখনও আছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞানকে সুধু সুধু বড় কটূক্তি করিয়াছেন (১৩।১৪ পৃ)। অপর পক্ষের উকিলকে গাল দিয়া মক্কেলের মন পাওয়ার চেষ্টা ব্যবহারক্ষেত্রে দেখা যায়, এইরূপ শুনিয়াছি। কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় তৃতীয় পক্ষের গালি যে ধর্ম্মগ্রন্থে আজিও চলে, তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"এক জন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে। তুমি এক জন পণ্ডিত লোক, নিকটে তীরে দাঁড়াইয়া আছ; কথাটা মনে উঠিল, উহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ। বিজ্ঞান প্রথমেই বলিলেন, অগ্রে দেখ, উহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা কতটা আছে; স্রোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের তুলনা কর; তুমি বলিলে তা'ত এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার করিতে গেলে যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের বল হইতে নদীর স্রোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে কি না; তাহার পর দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে। যদি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, তোমাকে আমি ঐ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইতে বলি না, কেন না তুমি ঐ আসন্ন মৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী।"

ইহার কি প্রতিবাদ করিব? পূর্ব্বযুগের ইংরাজি ধর্ম্মগ্রন্থে এমন কথা সকল থাকিত। তারই প্রতিধ্বনি বাঙ্গলায় পঁহুছিয়াছে। নব্য ইংরাজী ধর্ম্মগ্রন্থে এ সব মিথ্যা কথা লেখার রীতি নাই; কিন্তু নব্য গ্রন্থ পড়েন কে? সেকেলে পুরাণ ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ দিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা আজকাল খুব প্রবল। নদীতে লোক পড়িলে, সেখানে বিজ্ঞানে কিছুই বক্তব্য নাই। বিজ্ঞান তোমাকে নদীতে ঝাঁপ দিতেও বলিবে না, এবং দাঁড়াইয়া অঙ্ক কসিতেও বলিবে না। বিজ্ঞান বিধি-নিষেধের শাস্ত্র নহে। বিজ্ঞান বস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া চরিতার্থ হয়। ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার —'কর' বা 'করিও না' বলা বিজ্ঞানের বিষয় নহে। উহার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যা আছে। আমাদের দেশে উহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র, বিদেশে উহার নাম এথিক্‌স্ এবং রিলিজিয়ন। হয়ত কোন কোন এথিক্‌সের গ্রন্থকার ঐরূপ বলিতে পারেন (বস্তুত কেহ ঐরূপ বলেন না), কিন্তু তজ্জন্য বিজ্ঞান দায়ী নহে।

গ্রন্থকারের মতে "বিবেক কষ্টিপাথর নহে" (২৯-৩০ পৃঃ)। শাস্ত্র ও শিষ্টাচারই কষ্টি পাথর—উহার দ্বারাই ধর্ম্ম নিরূপিত হয়। তবে হিন্দুর হৃদিস্থিত হৃষীকেশ কি? তিনি "নিয়োগকর্ত্তা, ভক্ত সেই নিয়োগমতে কার্য্য করেন; কিন্তু এই হৃদিস্থিত উপগুরু (conscience) নিয়োগ করিতেও যেমন, নিষেধ করিতেও তেমন" (২২ পৃ), অর্থাৎ আমাদের যে হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তিনি একটা মস্ত কিছু। কিন্তু তিনি কি তাহা গ্রন্থকার বুঝাইয়া দেন নাই। আমরাও বুঝি নাই।

২৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ধর্ম্মের মূল, প্রমাণ ও পরিণাম বলিয়া তিনটি বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ একটি বিচার বই তিনটির কোনও নামগন্ধ পাইলাম না। বস্তুতঃ মনুর ২য় অধ্যায়ের ধর্ম্মমূল ও ধর্ম্ম লক্ষণ এবং ধর্ম্মের প্রমাণ একই কথা।

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্
আচারশ্চৈব সাধূনাং আত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ মনু ২৬।

এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া গ্রন্থকার বড় গোলে পড়িয়াছেন। এখানে প্রশ্ন ছিল যে, কি উপায়ে আমরা ধর্ম্ম জানিতে পারি। তাহার উত্তরে মনু বলিতেছেন যে, "সমস্ত বেদ, বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও শীল এবং সাধুদের আচার আর আত্মার তুষ্টি ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ ধর্ম্ম জানিবার উপায়।" "তদ্‌বিদাং স্মৃতিশীলে"—বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও শীল; ইহার অর্থ কি? এখানে বেদবেত্তা অর্থ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার এবং ব্যাস বাল্মীকি তাঁহাদের স্মৃতি অর্থাৎ তাঁহারা যে সকল তত্ত্ব বেদে দেখিয়া তাহা স্মরণ রাখিয়া, পশ্চাৎ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহারাই বেদবিদ্‌দিগের স্মৃতি। মোটের উপর বেদবিদাং স্মৃতিঃ—মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, পরাশর ধর্ম্মশাস্ত্র, আপস্তম্ব সূত্র, বোধায়ন সূত্র প্রভৃতি, ও রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি। এখন "বেদবিদাং শীলম্" কি দেখিতে হইবে। অবশ্য বেদবিদ্ অর্থ এখানেও মনু, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ কেন না, এক শব্দের যুগপৎ দুই অর্থ হয় না। তাহাদের শীল অর্থাৎ আচার ও ধর্ম্ম নিরূপণের উপায়। তাঁহারা আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহারা যাহা করিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় পুরাণেতিহাস। তবেই দাঁড়াইল এই যে, "বেদাবিদাং শীলম্ মন্বাদীনাং আচারঃ পুরাণেতিহাসপ্রতিপাদিতঃ"। অতএব বেদবিদের শীল ও সাধুর আচার এক হইল না; বেদবিদ্ প্রাচীন ঋষিরা এবং সাধু বর্ত্তমান সাধুরা। ইহা না বুঝিয়া, "বেদবিদ্" ও "সাধু" একার্থবাচক মনে করিয়া কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন—শীলং ব্রহ্মণ্যতাদিরূপম্। তদাহ হারীতঃ ব্রহ্মণ্যত দেবপিতৃভক্ততা সৌম্যতা অপরোপতাপিতা অনসূয়তা মৃদুতা অপারুষ্যং মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিশ্চেতি ত্রয়োদশ বিধং শীলম্। এইরূপ ব্যাখায় বড় দোষ হয়। মনু ধর্ম্মনিরূপণের উপায় বলিতে গিয়া বলিলেন—বেদ পড়, স্মৃতি পড়, পুরাণেতিহাস পড়, ধর্ম্ম কি জানিতে পারিবে। বর্ত্তমান সাধুদের আচার কি পর্য্যবেক্ষণ কর ধর্ম্ম কি জানিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, বেদবিদ্‌দিগের শীল কি তাহা অনুসন্ধান কর, ধর্ম কি জানিতে পারিবে। কুল্লূক ও অক্ষয়চন্দ্র বেদবিদাংশীলম্—ইহার অর্থ লিখিতে গিয়া বেদবিদ্ কথাটি একেবারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তার পর কারুণ্য, অনসূয়তা প্রভৃতি তেরটি বেদে স্মৃতিতে ভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সাধুদের আচারেও উহাদের উপলব্ধি হয়। কাজেই পৌনরুক্ত রহিয়াই গেল। অতএব কুল্লূকের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য।

গ্রন্থকার বাঙ্গালীকে প্রবাসে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কেন না "প্রবাসে বংশের অবনতিই হইয়া থাকে" (১৬১ পৃঃ)। কেন এইরূপ হয়? ইংরাজেরা তো আমেরিকায় গিয়া অধঃপতিত হয় নাই। ১৬২পৃষ্ঠায় যে উদাহরণ ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। দেশেও বাঙ্গালীরা অনেকেই তিন পুরুষের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, দুই পুরুষের মধ্যে জ্ঞানে এবং তিন পুরুষের মধ্যে সম্পত্তিতে দাউলিয়া হওয়াটা এখন বঙ্গের নিয়ম। তার পর গ্রন্থাকারের মতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে "এক প্রকার সৌজন্য আছে, কিন্তু সৌহার্দ্দ একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়ত দুইটি রোগা ও রোগী ছেলে, বৃদ্ধ মাতা ও যুবতী ভার্য্যা লইয়া চাকর, বামণ সম্বল করিয়া প্রবাসে পড়িয়া আছ। দেখিবে প্রবাসে বাঙ্গালীর মধ্যে সৌজন্যের অভাব নাই। প্রভাতে পরিক্রমের সময় দেখিবে দলে দলে বাঙ্গালী বাবুরা আসিয়া কেবল (kind enquiry) সৌজন্য সহকারে তত্ত্ব লইতেছেন, জ্বর কত ডিগ্রী উঠিয়াছিল সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু এই যে আপনারা আগন্তুক দম্পতী, রোগের সেবায় ক্রমাগত রাত্র জাগিয়া মারা যাইতে বসিয়াছেন, কোনরূপ সাহায্য করিয়া আপনাদের একটুক "আশান" দিবার প্রস্তাবও কেহ কখন করিবেন

কি ? তাহা করিবেন না। * * * * পরস্পরের সাহায্যে মনুষ্যত্ব। * * * প্রবাসে * * * মনুষ্যত্ব ফুটে না, বরং শুকাইয়া যায়।" (১৬৫ পৃঃ)। প্রবাসে বাঙ্গালীরা রোগের সময়, রাত্রি জাগিয়া, রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া, পরস্পরের সাহায্য করেন না—এটা মিথ্যা অভিযোগ। তবে বাঙ্গালীরা পর্দ্দাতিপ্রিয় বলিয়া অনেক সময় একের অন্তঃপুরে গিয়া অন্যের পরিচর্য্যাদি করিতে একটু সঙ্কুচিত হয় সত্য। ইহার প্রতিকার চাই—এই জন্য প্রবাস বন্ধ করিলে বাঙ্গালীর অন্নাভাব বাড়িয়া যাইবে।

ইয়ুরোপের দান প্রণালীর নিন্দাছলে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তথাকার নিয়ম এই রূপ—আমি মাসে এক টাকাই দিই, আর সহস্র টাকাই দিই,—আমি সেই টাকা পাঠাইয়া দিব, কোন আম্‌হাউসে, কোন পুয়র ফণ্ডে, কোন চ্যারিটি সোসাইটীতে—সেখানে গরীব দুঃখী অন্ন পায়, আচ্ছাদন পায়, আশ্রয় পায়। তা বলিয়া কি তাহারা আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে "হা অন্ন! হা বস্ত্র!" বলিয়া বিরক্ত করিবে? তাহা হইলে ত আমার ভোগে ব্যাঘাত হইল, আমি ভোগজীবন জীব আমার সর্ব্বনাশ হইল! না, তাহা হইবে না; আমি দান করিব সত্য, তাহাতে দরিদ্রের দুঃখ দূর হইবে তাহাও ঠিক, কিন্তু আমার ভোগে যেন তৃণাঙ্করেও ব্যাঘাত না হয়।" (৫৩ পৃঃ)।

গ্রন্থকার কি সত্যই মনে করেন যে, দাতার ভোগে প্রতিবন্ধক না হয় এই উদ্দেশ্যেই সংস্থানবদ্ধ দানের (organized charity) সৃষ্টি? আমরা ত মনে করি যে, উহাতে সমাজের অনেক উপকার আছে—যেমন সমর্থ লোকের ভিক্ষা নিবৃত্তি ইত্যাদি। আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বলে বিলাতি দানকে দানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করাও অসম্ভব নহে। বিলাতের লোকে এই রূপ লিখিতে পারে—"ভারতীয়েরা দুঃখীর দুঃখ নিবারণের জন্য দান করেন না। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য দান করিয়া উপকৃতের নিকট কৃতজ্ঞতা লাভ করা ও তজ্জন্য আনন্দ উপভোগ করা। কাজেই তাঁহারা হাতে হাতে গরীবকে ভিক্ষা দিতে ভাল বাসেন। ইহাতে যে ভিক্ষুকের ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত সময় অনর্থক নষ্ট হয়, তাহা ভারতীয়েরা ভাবেন না। ইত্যাদি" বস্তুতঃ হিন্দুরা ইয়োরোপীয় দিগকে নিন্দা করেন। কেহই পরের মধ্যে যে সত্য মঙ্গল লুকাইয়া থাকিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। কেয়াউ পাদ্রি ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের অযথা শত শত নিন্দাবাদ আছে।

পরলোক গত দার্শনিক ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তথাপি এখনও ঐ পুস্তক হিন্দু সন্তানের পাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুর তরফ হইতে লিখিত কোনও ধর্ম্ম পুস্তক এখন পাঠ্য হয় না। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব বি, এ, পরীক্ষায় দর্শনের পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় স্থান পাইবে কি? সনাতনী নাম দেখিয়া বড় আশান্বিত হইয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িয়া ছিলাম—কিন্তু সনাতনী ধর্ম্মতত্ত্ব, হিন্দুত্ব, বা আচার প্রবন্ধের মত সুচিন্তিত নহে। সনাতনী পড়িয়া লজ্জা হইয়াছে—আমাদের ধর্ম্মের এইরূপ কদর্য্য মূর্ত্তি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়া গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের অনিষ্ট বই ইষ্ট করেন নাই।

৫৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার খৃষ্টানদিগের প্রভুর প্রার্থনারও দোষ ধরিয়াছেন। "ভগবান্ আমার নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন আমাকে দাও অর্থাৎ আমার নিত্যভোগের যেন ব্যাঘাত না হয়"। ছি!! প্রথমতঃ প্রার্থনাটির অনুবাদে ভুল আছে—give us this day our daily bread হে ভগবন্, আমাদিগকে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য দাও। প্রার্থনা হইতেছে আমাদের জন্য কেবল আমার জন্য নহে। বহু বচন—এক বচন নহে। যখন ধনী খাইতে বসিয়া বলে, হে ভগবন্, আমাদিগকে অন্ন দাও, অর্থাৎ আমি তো তোমার প্রসাদে অন্ন পাইলাম—আমার যে সকল ভ্রাতা (হে আমাদের, আমার নহে, স্বর্গীয় পিতঃ—এই সম্বোধনেই মানুষকে ভাই ভাই করিয়া দেয় নাই কি?) অন্নহীন, তাঁহাদিগকেও অন্ন দাও,

তখন কি ভগবানের সিংহাসন টলে না? যিশুখৃষ্ট ধনী হইতে নিষেধ করিয়াছেন। পাপীকে শাস্তি দিতে বারণ করিয়াছেন (resist not evil). এমন স্তর যিশুর প্রদর্শিত প্রার্থনা পদ্ধতিকেও অবজ্ঞাত করা কি সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত? দ্বিতীয়তঃ এইরূপ অন্নের জন্য প্রার্থনা হিন্দুরাও করেন। সরকার মহাশয় শ্রাদ্ধের যে মন্ত্রটি তুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঠিক্ উহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটিতেই আছে অন্নঞ্চ না বহু ভবেৎ—অর্থাৎ আমাদের ঘরে যেন অন্ন বা ভাত বাড়িয়া যায়।

"শিক্ষা বিভ্রাটে স্বভাবের সুখের ভাণ্ডার আমরা দেখিতে পাই না......" (১৩৮ পৃঃ)। এ শিক্ষা বিভ্রাট অনেক দিনের—গ্রন্থকার অবশ্য সে বিষয়ে নির্ব্বাক্। মহাভারতে আছে "সুখাদপ্যধিকং দুঃখম্ জীবতে নাত্র সংশয়ঃ"।

"জগতে কষ্ট-দুঃখ থাকাতে আমাদের কত লাভ হইয়াছে। দুঃখ না থাকিলে সেবার প্রয়োজন হইত না, আমরা পরম ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতাম"। (১৪১ পৃ) আমার এক বন্ধু প্রথমে ছিলেন হিন্দু বৈরাগী, পরে হন ব্রাহ্ম, পরে এখন খৃষ্টান। তিনি এক খৃষ্টান পাদরীর জুয়াচুরিতে ঠকিয়া বলিয়াছিলেন "দেখুন, সব পুরোহিতই সমান—সব জুয়াচোর"। বস্তুতঃ তাই ঠিক্, সব গোঁড়ারাই সরকার মহাশয়ের মত। খৃষ্টান পাদরিরাও বলিতেন জগতে দরিদ্র থাকিয়া ধনীর পুণ্য লাভের উপায় করিয়া দিতেছে! বা! এতএব, হে সরকার বাহাদুর, ম্যালেরিয়া নাশের চেষ্টা করিও না—আমরা রোগীর সেবা করিয়া পুণ্য করিব। হে মতিলাল ঘোষ মহাশয়, আপনি দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন না—করিলে সরকার মহাশয়ের সেবা ধর্ম্মের অনবকাশ হইতে পারে!

১৬৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন "আমরা বলি সন্তোষ সুখের মূল। বিদেশীয়েরা বলেন, সন্তোষ সকল দুঃখের আকর। অতএব আমরা মস্ত ইত্যাদি।" কিন্তু ইহাও বড় মিথ্যা কথা। সন্তোষের প্রশংসা সকল ধর্ম্মেই আছে। এক বার যিশুর পর্ব্বত উপদেশ" (Sermon on the mount) দেখুন। আবার সকল অর্থশাস্ত্রে সন্তোষের নিন্দা আছে। মহাভারতে আছে—অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলম্।

আর লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইতে চাই না। বহু বক্তব্য এগ্রন্থে আছে। এই মাত্র বলিয়া উপসংহার করিব যে, শত দোষ সত্ত্বেও এরূপ গ্রন্থ আমাদিগের শিক্ষিত সমাজের পড়া উচিত। কেন না, একঘেয়ে ইংরাজি পড়িয়া, বিশেষতঃ দর্শনেতিহাসাদিতে বিদেশীয় কৃত হিন্দুর কুৎসা পড়িয়া, আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে কুৎসনীয় মনে করিতে শিখি। কেয়ার্ডের Introduction to Religion, Sethএর Ethics, Hegelএর Philosophy of History, সব স্থানেই এক কথা—তাঁহারা বড়, আমরা ছোট। আবার এত কষ্ট করিয়া এদের গ্রন্থ বুঝিতে হয় যে, এক বার বুঝিলে উহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করা সহজ হয় না। কিন্তু উহারা ভ্রান্ত। ভারতের হিন্দুকে দর্শনেতিহাস পড়াইবার জন্য ভারতের উপযোগী গ্রন্থ কে লিখিবে? না লিখিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সনাতনী পড়িয়া শিক্ষিত সমাজের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, সনাতনী সার্থক হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে—

"জন্মিল যেখানে গর্গ পতঞ্জলি..........................

সে জাতি কখনও ঘৃণিত নহে।"

গ্রন্থের ভাষারও দুই একটি নমুনা দিতেছি।

"এই ধর্ম্মের যাজনা করা সকলেরই সাধ্যমত কর্ত্তব্য" (৵৹)। যাজনা অর্থ কি? বহুস্থলে এইরূপ 'যাজনা' শব্দ আছে। "রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা, শুক্রশোণিতের অপূর্ব্ব তেরিজ" (১১)—এটা ইংরাজির উচ্ছিষ্ট। তার পর এই বাক্যে রক্ত ও শোণিত দুইটি জিনিস বলিয়া ধরা হইয়াছে। শুক্রশোণিতের আর এক অর্থ আছে তাহা এখানে খাটে না। "অনন্ত উৎসে উৎসারিত" (১২) "ভবঘোর চক্রের নীল রঙ্গের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা" (১২)—অর্থ কি? "ক্ষুদ্র শক্তি কেন্দ্রস্থিত করিয়া আমরা......প্রতিবাদ করি"—না

ইংরাজি না সংস্কৃত।" একি খাঁটি স্বদেশী বাঙ্গালা নাকি? "এইরূপে conscience বা সহজ জ্ঞানবাদ ইউরোপে জাহির হয়"—এটা অভদ্র ভাষা হইল। "ভৃগুপ্রথিত মানবধর্ম্ম শাস্ত্র"—প্রথিত অর্থ কি? ছাপার ভুল! "সদাচার ধর্ম্মের জান্"—অর্থ কি? ধর্ম্মের প্রাণ? তাহা হইলে এমন "ঘোরতর সয়তানি মত আর হয় না" (১৬ পৃ)। কোন্ কোন্ মহর্ষির স্মৃতি প্রামাণ্য"—প্রামাণ্য অর্থাৎ প্রামাণিক। "ইহার মধ্যে আবার মনুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণ" (২৬) এখানে প্রমাণ--প্রামাণ্য। "সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে একটি সাধারণ স্তর আছে" (৩১) কি রূপে? প্রথম ত্রিশ পৃষ্ঠার নমুনা দিলাম। এইরূপ বহু অপপ্রয়োগ গ্রন্থকে কলুষিত করিয়াছে। *

শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ,
কাশ্মীর শ্রীপ্রতাপ কালেজের অধ্যক্ষ।

মেঘরাজ্যের সংবাদ

সাত হাজার ফিট্ উঁচায় 'চড়ে' ঘাড়টা কল্লাম খাড়া,
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গোঁফে দিলাম চাড়া,
ঠেক্‌ল নীচ্‌টা যতই নীচু, যতই নাকি দূর,
মনে হ'তে লাগ্‌ল নিজকে ততই বাহাদুর।
বন্ধুর পথে শেষে যখন ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া,
মনে হ'ল সংসারটার পরোয়া রাখি থোড়া,
"দু'দিনের বৈরাগী যেন পের্‌সাদ বলেন ভাতকে,
নূতন পৈতাওয়ালা যেন ভেঙ্গান নিজের জাত্‌কে"
এম্‌নি যা'হয় বল', কিম্বা হাস্‌তে হয় হেস',
তা'র আগে ভাই, এক বার তুমি এই পাহাড়ে এস।

বুঝ্‌লে এইটি শিশুর স্বর্গ, রোগীর সন্ত আরাম,
যুবার যেন কল্প-কুঞ্জ, বৃদ্ধের সান্ধ্য বিরাম।
কথা শুনে' হাস্‌ছ? বল্‌ছ "সেইত দার্জ্জিলিং,
নূতন রূপ ত বেরোয় নি তা'র, গজায় নি ত সিং।"

আমিও ঠিক তোমার মতই গেলাম এবার হেসে,
খেলা করতে গিয়ে প্রথম, কেঁদে এলাম শেষে।
পথের শোভাও কি এক চোখে দেখ্‌লাম যেন এবার,
পুরাণ ছবি নূতন হ'য়ে দেখা দিল আবার।

উঠ্‌ছে ওকি বোঝাই "ট্রেণ" ঘুরে ফিরে ধেয়ে,
মা বাসুকীর বংশধর চড়্‌ছে পাহাড় বেয়ে?
পুরাণ বন্ধু "পাগলা ঝোরা"র সঙ্গে পথে দেখা,
হো হো হাস্যে বিজন স্থানটি মাত কর্চ্ছিলেম একা।
ছেলে পিঠে "নেপালিনী" নামে যেমন সোজা,
ইনিও পড়েন পাহাড় থেকে ল'য়ে জলের বোঝা।
আবার বল্‌ছি, সাত হাজার ফিট্ পাহাড়টিতে চড়ে'
মনটা গেল চুরি—গেলাম বড়র প্রেমে পড়ে'।

উঁচুর দিকে চেয়ে চেয়ে নজরটাও ঠিক কেমন
উঁচু হচ্ছে! নিজকে যেন ঠেক্‌ছে তাজা নূতন!
মেঘের রাজ্যে কল্পনাও ঠিক ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া,
রা'শটা শুধু ছাড়,—বস্—লাগ্‌বে না আর কোড়া!
হঠাৎ দেখ্‌বে সোণার ভাব সব ছাড়া মেঘের প্রায়,
আভের রাজ্যে হাওয়ায় হাওয়ায়, উড়ে উড়ে বেড়ায়।
বল্‌ব কি আর প্রথম দিনেই মায়া-রাজ্যে ঢুকি'
আমার দু'টি খোকা আর একটি মাত্র খুকি।

কি একরকম হ'য়ে গেল, ভাবে আর কি দেখে,
বুঝি তাদের প্রাণটা কেমন নূতনতর ঠেকে।
নীল পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা আভের কাচে ঢাকা
ভাবে—দেশটা ছবি একটি সোণার পটে আঁকা।

একরত্তি সেই মানুষটিও, যিনি সবার ছোট,
শুধু দুটি বসন্তের সে চারা ফোট-ফোট।
মায়ার রাজ্যে পা দিয়েই তার আর এক রকম মূর্ত্তি;
কচি বুকে ধরে না আর যেন নূতন ফূর্ত্তি।

---

* বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তিগতমতপ্রকাশক সমালোচনা-প্রবন্ধের প্রতিবাদ ছাপিতে আমরা প্রস্তুত। তবে প্রতিবাদ সত্বর হস্তগত হওয়া আবশ্যক। প্র. স।

ঠেলা গাড়ী নিজেই ঠেলে' পাহাড়ে পথ ভাঙ্গে,
যেন খুসির বান ডেকেছে, তার সে কচি গাঙ্গে।
ফুটফুটে মুখ লাল, তবু বল্‌বে না সে "থাক্,"
ছোট্টটুকুর বিক্রম দেখে' সবার লাগে তাক্।

বড় খোকাও কম নয়, সে ঘোড়ায় চাপে যখন,
দিদির দিকে গর্ব্বে চেয়ে, মুচ্‌কে হাসে তখন।
ভাব্‌টা—দিদি, দেখ, আমি কেমন মস্ত সোয়ার,
তোমার মত মানুষ-ঘোড়ার ধারি না আর ধার।

দিদি বলেন,—রেখে দাও না, ঘোড়া, না ও 'টয়,'
বড় বড় ঘোড়া চেপেও করি নাই ত ভয়।
নেচে নেচে উঠা নামা, সে 'ডাণ্ডি' যে মা'র,
রিক্‌শ তবু কতক ভাল, ঘোড়াই প্রিয় আমার।
বোন্‌-ভাইদের একটি জায়গায় ভারি কিন্তু মিল,
পাহাড়ের রূপ দেখ্‌তে সবার দিল্লে মিলে দিল্।
পাহাড়ের পায় লুটিয়ে পড়্‌ছে মেঘ সাদা সাদা,
পাহাড় উঁচায়, মেঘ নীচে; মেঘগুলো কি গাধা!

শুন্‌লে ভাব্‌বে-লোকটা খালি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে,
সত্যি বল্‌ছি, ছোট্টটুক যে টলে' টলে' চলে,
সেও যখন আকাশ-সরে কিরণ-কমল ফোটে
নীল শিখরের সাদা মেঘ মাথায় করে ওঠে
কাঞ্চনের এক শৃঙ্গ। তাহারই ঠিক উপর
শুভ্র মেঘের থাকটি গিয়ে ধরে নীলাম্বর।
অম্‌নি সোণা মুখে ফোটে, কত ছড়া গান,
শিশুর কাছে আগে পৌঁছে প্রকৃতির আহ্বান;

নিসর্গের যে নিখুঁত 'ফটো' স্বচ্ছ বুকেই উঠে,
বৃহৎ যা' তা' কচি প্রাণেই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে।
আমরা দেখি সৌন্দর্য্যেরে বিচারকের চোখে,
ভাবের হাটে সওদা কর্ত্তে বিজ্ঞেরা যাই ঠকে'।

মেকি নিয়ে মাতি; সার হয় খুঁটিনাটি ঘাটাই,
আলোচনার চোটে শেষে কলম, গলা, ফাটাই।
শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে কাট্‌ত আমার বেলা,
তা'রা তিনটি, আমি একটি, চার পাগলের মেলা।

এর মধ্যে কত কাণ্ড—নালিশ, ফরেদ, বিচার,
এই সাজি অপরাধী, এই সালিশ আবার।
'ও আমারে চিম্‌টি কাট্‌ল,' 'ও দিল কাণমলা'
'ও আমারে কালো বল্‌লে, নিজে ভারি ধলা!

একরত্তিটি জাঁদরেল, সে ধারে না এর ধার,
তা'র কাছে সব কোর্ট মার্শাল', এক কথাতে বিচার।
ক্ষমা কর পাঠক, কথা বেড়েই শুধু যায়,
পিতা আমি—পিতা যা'রা বুঝবে তা'রা আমায়।

সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, আমার তিনটি ধন,
এদের কথা বল্‌তে বল্‌তে হয়ে যাই যে কেমন।
বুঝি এটা দুর্ব্বলতা, পরের এত কথা,
শুন্‌তে কা'র বা দায় পড়েছে, এতই মাথা ব্যথা।
তবু এটা অতি সত্য, আমার গোলাপ গাছে,
তিনটি কুঁড়ি আলো করে', শোভা করে' আছে।
এদের নিয়ে গর্ব্ব ভরে কাটে আমার দিন,
সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, শুধুই তা'রা তিন।

এদের সাথে বিভোল হ'য়ে খেল্‌ছি সারা বেলা,
প্রকৃতির এই লীলা-কুঞ্জে সাধের হোরি খেলা।
পাহাড় থাকে অবাক্ হয়ে, মোদের পানে চেয়ে,
মেঘেরা সব কাছে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নেপালীদের গান,
ব'য়ে আনে অনেক কালের অনেক অভিজ্ঞান।
ভুটিয়াদের নাচের চোটে পাহাড়টি গুল্‌জার,
হিমালয়ের ছেলে মেয়ের স্নেহের অত্যাচার।

বড় খোকা 'ফিলজফার', চুপ্‌টি করে আছে,
হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—"দিদি, ওই মেঘের পাছে—
আকাশ গিয়ে যেখানটিতে হ'য়ে গেছে শেষ,
হয়ত সেটা এর চেয়েও ঢের ভাল দেশ।"

দিদি একটু বৈজ্ঞানিক, বলে—"বাবা, খোকা,
শুনলে, বল্‌ছে কি? ও আস্ত একটি বোকা!
আরে গাধা, এও জান না, আকাশ যে নয় কিছু,
নাই যাহা, কি আর থাক্‌বে সেই শূন্যের পিছু!"

ছোট্টটুকু চেঁচিয়ে উঠ্ল, "খোকা বোকা" বলে,
'ফিলছফি' ভেসে গেল হাসির মহারোলে।
নভের মাঠে মেঘ-দৌড়, ছুট্ছে সে দিন মেঘ
উপর নীচ মুছে ফেলে' ক'র্লে যেন এক।

বেমালুম লুকিয়ে ফেল্লে, ঘর বাড়ী গাছ পালা,
ঢাক্ল উঁচু পাহাড়ের সেই মস্ত বড় মালা।
অভ্রের আঁধার মনে হল যেন একটি সাগর,
নাই গর্জ্জন, নাই নর্ত্তন, পাটীর মত নিথর।

ক্ষুদ্র গৃহ কোনটি যেন ছোট্ট একটি তরী,
আমরা চারটি চড়নদার যাচ্ছি পাড়ি ধরি।
নাই রে নাই, কূল ত নাই, নিরুদ্দেশে কোথায়,
স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছি ভাসানের এক নেশায়।
একরত্তিটির হাতে যেন আছে তরীর হাল,
কারণ, তারই বেশী জানা ওপারের সব চাল।
উঁচায় আঁধার, নীচে পাথার, হয় ত ভেসে ভেসে,
হঠাৎ গিয়ে উঠ্ব আমরা মেঘমালার দেশে।

সাথে সাথে মনে এল মেঘমালার গান,
'এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, তিন কন্যে খান।'
কবে হল, কেন হল, মেঘমালার দেশ ?
ছেলেবেলার এ জিজ্ঞাসার হয় নি আজও শেষ।
কেমন সে দেশ ? নাই কি সেথা রাত্রি আর দিন ?
চাঁদ নাই, পূর্ণিমা নাই, আকাশ উদাসীন ?
আর মানুষ কি পাষাণ হ'য়ে আছে অভিশাপে!
তাঁদের কি শ্বাস উঠ্ছে জ্বলে' নীরব পরিতাপে!

অভ্রের বালিশ শিথান দিয়ে শু'য়ে প্রবাল খাটে,
কি স্বপনে তিন কন্যার প্রহরগুলি কাটে!
কখন দেয় সুধার ছড়া আঙ্গিনার চার ধারে,
পান্নার প্রদীপ জ্বালে কখন মোতির দীপাধারে!

দুধের সরোবরে এসে কখন নেয়ে যায়,
মণি-বেদীর উপর বসে কেশের রাশি শুকায়!
মুক্তার রেণু দিয়ে কখন্ অঙ্গখানি মাজে,
হীরার মুকুর কাছে রেখে, কেমন বেশে সাজে!

ইন্দ্রধনু রঙের খাসা হাওয়ার শাড়ী পরে'
মেঘের রথে চড়ে' তারা আকাশময় ঘোরে!
বিদ্যুতের চক্‌মকী ঠুকে' জ্বালায় নিভ্‌লে বাতি
কি রূপকথা কয়ে তারা কাটায় দীর্ঘ রাতি!

কখন্ তাদের রাত পোহায় পাখী করে গান,
কেমন করে' সূর্য্য ডোবে, বেলার অবসান!
কিম্বা মেঘমালার দেশে নাই সন্ধ্যা প্রভাত,
আকাশ জোড়া আঁধার শুধু ফেরে সাথ সাথ!

বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কি কোন সুর ?
স্বপ্নে ছাওয়া, মায়ার নাওয়া, নিস্তব্ধতার পুর!
না, সে ঝঞ্ঝা-বজ্র আর করকার ঘোর গহ্বর,
কালো বরণ প্রলয় আছে বেঁধে সেথায় ঘর!
আলেয়ারই আলোর মত বিদ্যুৎ-বাতি তার
অন্ধকারে ঢাকা যেন আরও অন্ধকার!
জোয়ার যখন নেবে মোদের তিন কন্যের দেশে,
ধরার মানুষ দেখে' তারা মিলিয়ে যাবে হেসে!

খাবুইয়ের ঝাঁক উড়ে গেল হি হি ক'রে তখন,
দু'ভাগ করে 'দিয়ে' গেল আমার জমাট স্বপন।
অনেক দিনে পাখী দেখে খোকা বল্লে—'খাসা!'
আমি বল্লাম,—'ওদের চেয়েও খাসা ওদের বাসা।'
খুকী বল্লে,—ওদের বাসা দেখ্ব গিয়ে কাল;'
ছোট্টটুক 'পাখী নেব' ধর্লে এই তাল।
কোথায় গেল তিন কন্যে, মেঘমালার গান,
এ যে আমায় পেয়ে বস্ল ধরার তিনটি প্রাণ!

পাহাড়ের সার উঠ্ল ভেসে; আলো করি আকাশ
জ্বল্লো রবি।—স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য যেন প্রকাশ।
সূর্য্য দেখে পড়ে গেল ভারি কোলাহল,
রোদে বুঝি শিশু-প্রাণের ফোটে শতদল।

সারাটা দিন বাইরে বাইরে হৈ হৈ আর খেলা,
পদ্মের মত প্রাণগুলি, তাই লুটায় সন্ধ্যে বেলা।
বাড়ীর গাছে ফুটে থাকে রং বেরংএর ফুল।
পাড়া নিয়ে তিন ভাই বোন বাধায় হুলস্থুল।

পাহাড়ের ফুল কাণে পরে, গোঁজে পকেটটুকে,
গর্ব্বের হাসি খেলিয়ে যায় তাঁদের চোখে মুখে।
ফুলের মত প্রাণের কাছে ফুলের যত আদর,
লক্ষ টাকার হীরারও নাই বুঝি তত কদর।

ছোট্টটুকও নিজেই ছিঁড়ে ফুল দিয়ে যায় আমার,
স্বর্গের নির্ম্মাল্যটি যেন পড়ে আমার মাথায়;
এম্‌নি স্বপ্নে কাট্‌ছে দিন হিমালয়ের কোলে,
প্রকৃতি মা'র শিশু হ'য়ে বিশ্ব কে না ভোলে?

হিমালয়ের সাজান বাগ, মানুষ বলে আমার,
ঘুর্‌লাম এক দিন অনেকক্ষণ ছায়ায়, মায়ায় তার।
এমন রূপের পাতাবাহার, রুচির ফুল্‌দল,
হিম দেশের এতই রকম লতা পাতা ফল।
"পাইন" একটি দেখ্‌লাম যেন হাজার ডেলে ঝাড়,
আলো করে' দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার পাহাড়।
কত জীবের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌লাম কত সাজে,
হিমালয়ের বার্ত্তা যেন পেলাম তাদের মাঝে।

প্রতিদিনই কাঞ্চন শৃঙ্গ উঠ্‌ত প্রভাত-টিতে,
যেন তিনটি কচি ভক্তের ভোরের প্রণাম নিতে।
কখনও বা বরফ দেখ্‌তে আসত ভোরে উঠি,
রবি শশী একই সঙ্গে, আলোর যমজ দু'টি।
ধবল শোভা অচল হ'য়ে থাকৃত সারা বেলা,
দেখ্‌ত যেন তিনটি প্রাণের সারা দিনের খেলা।
সোণা-রবির সোণার করে সাঁঝে করি স্নান,
জানিয়ে যেত তিনটি প্রাণে বেলার অবসান।

মেঘ সমুদ্রে সোণার পাহাড় লুকিয়ে যেত হঠাৎ,
তিনটি কোমল প্রাণে লাগত যেন একটি আঘাত।
দেখে দেখে জাগত্‌ বক্ষে উদার বিশ্ব প্রীতি,
মনে হ'ত প্রাণটা যেন কবিতা বা গীতি।

শৃঙ্গে শৃঙ্গে উঠ্‌ত বেজে বিশ্ববীণার তান,
মেঘে আলোয় আরোহিয়া উর্দ্ধে ছুটত গান।
মেঘ দিয়ে পাহাড় বেয়ে স্বর্গ আস্‌ত নেমে,
উচ্চ নীচ একাকার যেন পুণ্যে প্রেমে।

প্রাণের প্রাণে উঠ্‌ত ফুটে নিরাকারের রূপ,
পদে পড়ে' কোটী জগৎ আছে যেন চুপ।
আঙ্গিনায় শুনে' এক দিন কলরব আর হাসি,
বাহির হ'তেই খোকা ধর্‌লে,—"বাবা" দেখই আসি'
হাত ধরে সে টেনে এনে দেখায় অসীমে,
আঙ্গুল দিয়ে কি এক নিধি! পাহাড়ের সেই হিমে
দেখ্‌লাম প্রথম চন্দ্রোদয়। দিদির হাতটি ধরে'
কি স্বপন্ দেখ্‌ছে খোকা প্রাণের আঁখি ভরে'!

ভোলা-ভাব তা'র বাড়্‌ছে। দেখ্‌লাম একি শুধু চাঁদ,
কোলে মায়া-মৃগ, এযে রূপের একটি ফাঁদ।
দেখে্‌লেই মনে হয় এরে হিয়ার মাঝে বাঁধি
নিরজনে পরাণ ভ'রে গভীর সুখে কাঁদি।
খুকীও আজ গলে' গেছে খোকার মতই প্রায়,
বিভোল হ'য়ে চেয়ে আছে, আকাশের সেই গোড়ায়
পাহাড়ের সা'র অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে,
মেঘের বহর নেমে গেছে পাহাড়ের ঠিক পিছে।

ছোট ছোট মঠগুলি কি দেখ্‌ছি গিরি চূড়ায়?
না, 'পাইনের' সারি মাখ্‌ছে চাঁদের কিরণ গায়!
খুকী বল্‌লে—"এমন চাঁদটি উঠে না ত নীচে,
খোকা বল্‌লে—"এই খাঁটি চাঁদ, আর যা'দেখ মিছে।"
হিমের ভয়ে এক রত্তিটি দেখ্‌লে না ত চাঁদ,
অমন ভক্ত পেলি নে রে, চাঁদ তুই আজ কাঁদ।
সার্শি দিয়ে জ্যোছ্‌না দেখে' আনন্দ কি তা'র,
বক্‌ছে মেলাই আবোল, তাবোল, ফুরায় কি তা' আর!

বোবা যেমন আবেগ ভরে বুঝায় মনের কথা,
ভাবে—'সবই বল্লাম'—ফোটে শুধুই ব্যাকুলতা।
এ আবার কি! নীল সাগরে রূপার পাহাড় নাকি?
দেখে প্রাণ যে জুড়িয়ে গেল, ফেরে না আর আঁখি।

শত্রু হও, মিত্র হও, এক বার দেখে যাও।
এমন দিনে ভেদাভেদ সবই ভুলে' যাও।
কাঞ্চন শৃঙ্গে আজ যে উদয় মধুর পৌর্ণমাসী,
শুভ্রতায় কি কর্‌ছে স্নান পবিত্রতা রাশি?

শোভায় আভায় কোলাকুলি, পুণ্যে মিশ্‌ছে প্রেম,
তুষার কোলে জ্যোছ্‌না যেন ক্ষমার বুকে ক্ষেম!
ও কি মৌন স্বর্গ আহ্বান ধরার প্রান্তে প্রকাশ?
না ও একটি স্তব্ধ ক্লান্তি, ব্যাপ্ত করে' আকাশ!
কাঞ্চনজঙ্ঘা, জ্যোছ্‌না, আকাশ, মাঝে তিনটি প্রাণ,
এমন সময় হ'ত যদি প্রাণের অবসান!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

গ্রন্থ সমালোচনা

৩৬। **ঢাকার ইতিহাস**, প্রথম খণ্ড—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত; আকার ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত, ৫৬০ পৃষ্ঠা; ৩. কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট্, কমলাপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌এ মুদ্রিত, এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, অতি মনোরম বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থখানি 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদের' গ্রন্থাবলী ভুক্ত। মূল্য সাধারণের পক্ষে ৩॥০ টাকা, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৩৲ টাকা। পুস্তকখানির নাম ঢাকার ইতিহাস। এই খণ্ডে প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নহে, ঢাকার সুবিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকায় ছাড়া এই খণ্ডের কোথায়ও ঢাকার প্রাচীন বা বর্ত্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থখানি ইতিহাস না হইলেও তথ্যপূর্ণ, এবং এই হিসাবে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ঢাকা জেলার খাল, বিল, ঝিল, প্রসিদ্ধ বর্ত্ম, বন, ও লৌহখনির বিবরণ, ঢাকার প্রাচীন কীর্ত্তি, ঐতিহাসিক স্থান প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয় ও তীর্থস্থান এবং প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি ঢাকার ইতিহাসের ভূমিকাংশ। কিন্তু গ্রন্থকার ইহাতেই যেরূপ অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। পুস্তকখানিতে ঢাকা জেলার নূতন ও পুরাতন বিখ্যাত ৪০টি দৃশ্যের ছবি এবং পাঁচখানি মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালার প্রতিগৃহে রক্ষিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। ভবিষ্যতে আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীর—

৩৭। **ফোয়ারা**—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, প্রণীত, কলিকাতা ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট. ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য বার আনা, ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত, উত্তম ছাপা, সুন্দর পুরু কাগজের প্রচ্ছদ পটে রিলিফে নাম লেখা।

ফোয়ারা বাস্তবিকই হাস্য-রসের ফোয়ারা। অনেক স্থলে 'পরিহাস বিজল্পিত' বচনের মধ্যেও 'পরমার্থের' একটা পরোক্ষ সত্য উঁকি দেয় এবং হাস্য-রসটাকে অলক্ষে জমাইয়া তুলে; এটাই ফোয়ারার বিশেষত্ব। যিনি এই ফোয়ারার রসভোগ করিবেন তিনি মেইল গাড়ী চড়ার সুখ পাইবেন এবং গরুর গাড়ী চড়ার আয়াসও বুঝিবেন। আবার তীর্থ দর্শনের আনন্দ ভোগ করিয়া 'শীতলা বিহীন' প্রবাস-বাসের সুখ দুঃখের অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাহিত্য-চাটনী চুটকীর রসে তাহার রসনা টস্ টস্ করিতে থাকিবে এবং ইংরেজ সাহিত্যিকগণের নাম-মাহাত্ম্যের রসাস্বাদে তিনি অতিশয় প্রীত হইবেন। বোধোদয়ের ব্যাখ্যা পড়িলে আড়ষ্ট বোধশক্তি চঞ্চল ও সজাগ হইয়া উঠিবে এবং ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার মুক্ত হইয়া আসিবে। পাঠক শেষ কালে ভাষাতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া গবেষণার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন এবং গৃহে ফিরিয়া পত্নী-তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিবেন—বুঝিবেন রন্ধন-পটুতা না থাকিলে গৃহিণী গৃহ-লক্ষ্মী হইতে পারে না, এবং প্রিয়তমার স্বহস্ত-রচিত পাণ না পাইলে আহারে কদাচ তৃপ্তি লাভ হয় না। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এইই প্রথম।

শ্রীশ্যামশরণ।

খোকা হ'ক *

খোকা হ'ক পাখী যখন প্রতিবেশীর গৃহপ্রান্তস্থিত বৃক্ষোপরি বসিয়া প্রথমে হুলুধ্বনি জুড়িয়া দেয়, তখন সত্য সত্যই ভ্রম জন্মে, বুঝি কোন প্রতিবেশিনী চাঁদপানা সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাই এই আনন্দের হুলুধ্বনির আবির্ভাব! খোকা হ'ক পাখীর প্রারম্ভ সঙ্গীতে আমরা বহু বার প্রতারিত হইয়া থাকি। কোন্ দিকে কোন্ বাড়ীতে 'উলু' দেয়—কাণ পাতিয়া পাতিয়া তাহা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহার উলুধ্বনি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই এই ভ্রান্তির নিবারণ হইয়া যায়। কারণ এই ধ্বনির শেষাংশ শ্রবণ করিলেই উহা মানব কণ্ঠজাত নহে বলিয়া সহজেই প্রতীত হয়। প্রথম ধ্বনির পরে ঐ পাখী ক্রমাগত 'খোকা হ'ক' 'খোকা হ'ক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে থাকে। গৃহস্থ বধূর নিকট এর চেয়ে কল্যাণপ্রদ ও আনন্দের কামনা আর কি হইতে পারে? খোকা হ'ক পাখী যখন নিরালায় বসিয়া এক মনে তাহার কল্যাণ কামনা প্রেরণ করে, তখন না জানি কত পুত্রমুখ-দর্শন-বঞ্চিতা রমণীর হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে এক আশার কিরণ মাখিয়া দিয়া যায়।

খোকা হ'ক পাখী বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জিলার কোনও কোনও অংশে ইহা ভগদত্ত বা ভগ্‌দৎ নামে পরিচিত। 'খোকা হ'ক' ধ্বনিকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা 'ভগ্‌দৎ' বলেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে 'বোকা তোতা'ও বলিয়া থাকে। চেহারা দৃষ্টে 'বোকা তোতা' বলায় মানহানিকর কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগদত্তের সঙ্গে ইহার আদৌ কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কোন ভগদত্ত কবে কি অপরাধে পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন পল্লী-রমণীগণও সে ইতিহাস অবগত নহেন।

খোকা হ'ক পাপিয়ার মতই বড় পাখী। তবে ইহার শরীর আর একটু বেশী মোটা এবং কিঞ্চিৎ নাদুস্ নদুস গোছের। লেজ বেঁটে—এ জন্যও ইহার সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিয়াছে। পালখের বর্ণ শেওলার মত নীল। এই শেওলা রঙ্গের অঙ্গরাগ হইতে মেটে সাদা যেন স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইতে চাহে। পেটের নীচের রঙ্গ মেটে নীল। ডানা দুটি পুরু এবং কম মজবুত। ডানার নীচেকার রংও মেটে নীল। গলা মোটা। মাথার উপর হইতে গলার চারি দিক দিয়া সিংহের কেশরের মত শ্বেতাভ পদ্ম রঙ্গের রোমাবলী বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চক্ষু দুটি ডাগর এবং ইহাদের চতুর্দ্দিকে রক্তাভ বেষ্টনী আছে। ঠোঁট মোটা পুরু এবং প্রায় ১¼ ইঞ্চি লম্বা। ঠোঁটের রংও গলার রঙ্গের মত। ঠোঁট এত নরম যে, টিপ দিলেই চাপিয়া যায়। ঠোঁটের উভয় পার্শ্বে নাসা-রন্ধ্র আছে, ইহারা এক বারে দুইটি ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি নীলাভ সাদা এবং প্রায় জলপাইর মত বড়। খোকা হ'ক বাঁশ-ঝোপে বা বেতস-কুঞ্জে কিংবা দুর্গম জঙ্গলে আপন বাসা নির্ম্মাণ করে। কেহ কেহ বলেন ইহারা কায়দা পাইলে 'ছাতারিয়া' বা 'সাতভাই' পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে।

খোকা হ'ক পাখীর পা দুটি ৩ ইঞ্চি লম্বা। হাটু পর্য্যন্ত পালকে আবৃত। নখ মোটা এবং নরম। পায়ের রঙ্গও গলার রঙ্গেরই মত বলা যাইতে পারে। ইহারা অধিকাংশ সময়ই জোড়া বাঁধিয়া বিচরণ করে না—একাকী থাকে।

শীত কালের মাঝামাঝি খোকা হ'ক পাখী ডাকিতে আরম্ভ করে। মাদী পাখী খো—কা, খো—কা বলিয়া সাড়া দেয়; এই সাড়ার সহিত আসঙ্গ লিপ্সার সম্বন্ধ প্রচুর বিদ্যমান। বসন্তের আগমনের পূর্ব্বেই ইহারা গর্ভ ধারণ করে। তবে কখন কখন চৈত্র মাস পর্য্যন্তও ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে।

এই পাখীরও স্ত্রী-জাতি কোকিলের মত পুরুষগুলিকে একটু হয়রান করিয়া থাকে। পক্ষিণীর ডাক শুনিয়া

* 'গায়ক পাখীর' অন্তর্ভুক্ত

খোকা হ'ক তাহার নিকটে যায়, পক্ষিণী বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া আবার তাহাকে ইঙ্গিত করে।

বর্ষা কাল পর্য্যন্ত খোকা হ'ক পাখীর ডাক শোনা যায়। অতঃপর কদাচিৎ ইহাদের আশীর্ব্বাণী শ্রুত হইয়া থাকে, যেন সে সময় দেশে খোকার আবির্ভাব হইতে নাই।

আমাদের দেশে আপামর সকলেরই একটা সংস্কার আছে "তুলাপাঁইজ,' 'নিহালিয়া' 'আঁটিয়া' 'ভুতিয়া' প্রভৃতি জাতীয় কলা খোকা হ'ক পাখী না খাইলে পাড়িতে নাই। পাড়িলেও তাহা কদাচ পাকিবে না।" ঐ সকল কলা পাকিবার উপযুক্ত হইলেই খোকা হ'ক আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং কেহ সন্ধান না করিলে কাঁদির সমুদয় কলারই সদ্‌গতি বিধান করিয়া থাকে।

খোকা হ'ক ফলাহারী হইলেও সম্পূর্ণরূপে যতি নহে; ইহাদিগকে কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিতেও দেখা যায়।

খোকা হ'ক লোকালয়ের আশেপাশে বিচরণ করিতে ভীত হয় না, তবে কখনও লোকের আশেপাশে পদার্পণ করে না।*

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* এই প্রবন্ধ প্রেরণ সময়ে জনৈক মহিলা বলিলেন আমাদের দেশে সন্তান হওয়ার পর মাস-অশৌচান্তে বন-দেবী বন দুর্গার পূজা করা হয়। খোকা হ'ক পাখী সেই বন দেবীর আদেশ বাণী আশীর্ব্বাদের মত দেশময় বর্ষণ করিয়া থাকে; বন-দেবীর এই আশীর্ব্বাণী শুনিয়া না কি নিঃসন্তানা রমণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া একান্ত চিত্তে বন দুর্গাকে প্রণাম করিয়া সন্তান কামনা করিয়া থাকেন।

লেখক

কবি-কাহিনী

১

শ্রীযুক্ত নকড়ি বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—"মহাশয় কি করেন?" তিনি সোণার বাঁধানো, সরু ছড়িখানা হঠাৎ ঘুরাইয়া, হাসিয়া বলেন, "আমি সাহিত্যিক। মহাশয়, অনুগ্রহ ক'রে আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না।" অর্থাৎ নকড়ি বাবুর বিশ্বাস এই যে, দেশের যে সমুদয় ভদ্র ইতর লোকগুলির আজও এটিকেট্ জ্ঞান হইল না, যে সকল অপদার্থগুলা এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনেও, অপরের "প্রাইবেট্ অকুপেশান" হাতড়াইয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রতি এইরূপ সহজ মুষ্টিযোগই ব্যবস্থেয়।

মোট কথাটা এই—নকড়ি বাবু অবস্থাপন্ন জমিদারের ঘরে একমাত্র উত্তরাধিকারী, সম্প্রতি আইনতঃ নাবালক। মা ষষ্ঠীর কৃপায় জীবনের বিংশ বসন্তে পদার্পণ করিয়াছেন। বাধাহীন আব্দার এবং তাড়না-মুক্ত স্নেহের মাঝে, এ পর্য্যন্ত বিচি-ছাড়ানো সুমধুর বেদানার রস পানেই বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সম্প্রতি ছিপ্‌ছিপে দেহখানি লইয়া সোণার চসমা চোখে, সবে সংসারের পানে হাসিয়া চাহিয়াছেন,—সবুজ সংসারও সবে তাঁর পানে হাসিয়া চাহিয়াছে। এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে কমলার ঐশ্বর্য্য-কল্পতরুর ছায়া-তলে বসিয়া বীণাপাণির পুস্তক-রঞ্জিত মঙ্গল-স্পর্শ-লাভটা ভাল করিয়া তাঁর ঘটিয়া উঠে নাই।

সে যাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা মন্দিরে মা সরস্বতী যখন তাঁহাকে গণিত শাস্ত্রে একটি শ্রীফল হাতে দিয়াই বিদায় করিলেন, তখন এই ভাবিলেন যে, বিমাতার নিকট ইহার অধিক আর কি প্রত্যাশা করা যায়!

গীতায় বারংবার ভগবান বলিয়াছেন যে সুখে অনুদ্বিগ্নমনা, এবং দুঃখে বিগতস্পৃহ সে-ই হিতৈষী; সুতরাং যে বঙ্গ সাহিত্যের জ্ঞান-মন্দিরে, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকিট না লইয়া গেলেও প্রবেশাধিকার পণ্ড হইয়া যায় না, সেই স্থানে, নকড়ি বাবু আপনার তরুণ জীবন সমর্পণ করিলেন! এই প্রকার নিষ্কাম সাধনা-যজ্ঞ কলিতেও সম্ভবপর জানিয়া ত্রিদিব হইতে সুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া ছিলেন কি না, ঠিক জানা যায় নাই—তবে নকড়ি বাবুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী উপগ্রহগুলি একেবারে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

ঠিক কোন খৃষ্টাব্দে নকড়ি বাবু একটিমাত্র শ্রীফল পাথেয় করিয়া সাহিত্যের মহারণ্যে জ্ঞান-বৃক্ষের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন, সাহিত্য-পরিষদ এখনও সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে এ ঘটনা যে তাহার পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের নাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া নকড়ি বাবুকে কিছু দিন পৈত্রিক বাস-ভবনে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ সংসার বড়ই বিচিত্র স্থান! দুঃসময়ে বিপদ কখনও একাকী আসে না। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল—নকড়ি বাবু বলিলেন গ্রাম্য ম্যালেরিয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বাবুর সভাসদগুলির মধ্যে একটা শোকের রোল পড়িয়া গেল,—নকড়ি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে কুমলপুরের বনিয়াদী মজুমদার পরিবারের বংশপ্রদীপ বুঝি বা একেবারেই নিবিয়া যায়! জেলার সাপ্তাহিক পত্র বিশেষ সংবাদ দাতার স্তম্ভে এক আশঙ্কা সূচক সংবাদ প্রকাশ করিয়া, "লিডারে" সে জন্য প্রকাশ্য ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। গ্রামের ফেমিলি ডাক্তারের ডাক পড়িয়া গেল। তিনি অবস্থা শুনিয়া এবং ষ্টেথোস্কোপ দ্বারা বারংবার আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমুদয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন এখনও বাহ্যতঃ কোনও স্পষ্ট লক্ষণ না দেখা গেলেও, অন্তরে অন্তরে বাবুর বিষম ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিয়াছে। রোগ ত দূরের কথা, চতুর ডাক্তার রোগের 'ব্যাসিলি' শুদ্ধ বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, এ সকল ব্যারামে মনকে প্রফুল্ল রাখাই হচ্ছে যথার্থ ঔষধ, সঙ্গে একটা টনিকও চলিবে। নায়েব, দেওয়ান, ডাক্তার, দ্বার পণ্ডিত, এবং ছুকু খানসামার সঙ্গে বহু বাদানুবাদ ও পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির হইল, বায়ু পরিবর্ত্তন ও নষ্ট স্বাস্থ্যের পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে বাবু কিছু কাল গাজীপুরে গিয়া বাস করিবেন।

গাজীপুর! গাজীপুর! নাম করিতেও যে চিন্তার ভিতরে গোলাপের খোসবাই আসিয়া লাগে! গাজীপুরের নামে নকড়ি বাবুর কাব্য শক্তি একেবারে শাণিত হইয়া উঠিল। চারি দিকে শ্যামল প্রকৃতি একেবারে লালে-লাল—যেন সুখের শাখায় শাখায় স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দেশের গোলাপী আনন্দের মধ্যে ভালবাসা যেন পাগল হইয়া ফিরিতেছে! এ কল্পনার উৎসবের শুধু একটি জিনিষ নকড়ি বাবু দেখিতে পাইলেন না, সেটি কণ্টক!

যাহা হউক ভরা উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে যখন গাজীপুরের উদ্দেশে নকড়ি বাবুর গাঁঠরী, ট্রাঙ্ক, ব্যাগ, বিছানা সমুদয় প্যাক্ করা হইয়া গেল, তখন জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া নকড়ি বাবুর চক্ষে জল আসিল! মাইকেল মধুসূদনও বিলাত যাইবার কালে, জন্মভূমির পানে তাকাইয়া এমনি কাঁদিয়া ছিলেন,—তাই নকড়ি বাবুর বিদেশে যাওয়ার সময়ও তেমনি কান্না আসিল! নকড়ি বাবুর দুঃখ যে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন নিম্নে তাহার একটু নমুনা প্রকাশ করা গেল—

"দিও গো চরণে স্থান,
এ মিনতি, হে জন্মদে!
করিতে কবিত্ব যোগ,
ঘটে যদি গোল যোগ,
তোমারে ডাকিব আমি,—দিও স্থান পদ-নদে!
বিদেশে গোলাপ-গন্ধে,
প্রাণে যদি নামে সন্ধ্যে,
খেদ নাই, হায়, গেলে প্রাণ দেহ হ'তে,—
(কারণ) জন্ম-মৃত্যু অবিকল
এক বৃক্ষে (ই) দুই ফল
এক খেলে খাবে আর—অতি সুনিশ্চিতে!"

যাহা হউক নকড়ি বাবু যথা সময়ে গাজীপুরের গোলাপারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা-পাইক, আমলা-মুহুরী গোমস্তা-খানসামা এক দল পঙ্গপালের মত গাজীপুরে আসিয়া পঁহুছিল। নকড়ি বাবুর জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। কমলপুর পরিত্যাগ করিলেও, কমলপুরের উপসর্গগুলা নকড়ি বাবুর স্বল্প গাজীপুরের চারি ধারে মোমের মত লাগিয়া রহিল! তাই গাজীপুর বাহিরে, ভিতরে সেই কমলপুর! নকড়ি বাবুর সঙ্গে তাঁহার মাতা রাজেশ্বরী দেব্যাও গাজীপুরে আসিয়া ছিলেন।

তিনি টের পাইয়াছিলেন ব্যারামটা যেরূপ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ছেলেকে একটু বিশেষ চক্ষে চক্ষে রাখার প্রয়োজন। সুতরাং রাজেশ্বরী দেব্যার গাজীপুরে আসাটা নকড়ি বাবুর নিকট একটা বিঘ্নের মতই ঠেকিল। যাহা হউক, নকড়ি বাবু ভাবিলেন, আর দুটি বৎসর বই ত নয়! তারপর সাবালক হইলে তাঁহার ইচ্ছার মুখে কে লাগাম দিতে আসে, এক বার দেখিয়া লইবেন।

গাজীপুরে আসিয়াও নকড়ি বাবুর কবিত্বের চাষ অতি নিপুণভাবে চলিতে লাগিল। পারিষদ-মণ্ডলী জন্তু বিশেষের ন্যায় তারস্বরে বলিয়া উঠিল, এতই কবিত্বের অভিব্যক্তির চরম কলি! এদিকে কিন্তু ষ্টেট ঋণ-ভারে টল্‌মল্ করিয়া উঠিল। নায়েব-গোমস্তা 'সামাল, সামাল" হাঁক ছাড়িলেন কিছুতেই আর লাটের তারিখে সদর খাজানা গুজরান হয় না; সুদের টাকা না পাইলে মহাজন আর এক পয়সাও ধার দিবে না! তখনও পারিষদ-মণ্ডলী বাবুকে অতি সহজে বুঝাইয়া দিলেন "বরং বনং ব্যাঘ্র গজেন্দ্র সেবিতং" তবুও এমন উন্মুখী প্রতিভাকে অকালে কণ্ঠরোধ করা যায় না! কারণ নকড়ি বাবুর কলা চর্চ্চার সহিত এ পরিষদের সভ্যগণের উদরাগ্নির একটি অতি নিকট সম্পর্ক ছিল; বস্তুতঃ নকড়ি বাবুর কবিত্ব ক্ষেত্রে চাষটা এমন সুনিপুণ এবং গভীরভাবে চলিতে লাগিল যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে লইয়া শাসন সংরক্ষণ করার প্রস্তাব নকড়ি বাবুকে জ্ঞাপন করিলেন।

২

নকড়ি বাবু চারি দিকের কাচের সার্সি দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া তাঁহার দ্বিতল ভবনের দক্ষিণদ্বারি কামরাটিতে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বদিকস্থ সবুজ গাছ পালার শিরে শিরে সোণার মুকুট পরাইয়া দিয়া প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন পথে নকড়ি বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে—কামরাখানি যেন একবারে "তরল স্বর্ণ-পরিস্নাত"! নকড়ি বাবু একখানি ইজি চেয়ারে নিদ্রা-জড়িত চক্ষে শুইয়া আছেন। টেবিলের উপরে রেকাবের উপর অবস্থিত চা পেয়ালাটি—তাহার গায়ে সোণার ডালে, রঙ্গ বেরঙ্গের ফুল-পাতা লেখা রহিয়াছে। প্রভাতের রোদ লাগিয়া পরিকল্পনাটি একেবারে জরির মত ঝিক্ মিক্ করিয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট মাউণ্টের মাঝে দুচারখানি ফটো কলা চর্চ্চার উপকরণ স্বরূপ টেবিলের উপর সাজানো—ইতস্ততঃ কয়েকটি জাপানী শঙ্খ হাল্‌কা শোভা বিস্তার করিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। দেয়ালের উপরে দুইটি র‍্যাকে কতক-গুলি ঝক ঝকে বাঙ্গালা বই; এক পাশে গ্রামোফোণ-বাদ্য যন্ত্র, তাহার শুণ্ড উত্তোলন করিয়া গান গাহিয়া উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; অপর পার্শ্বে পিয়ানোটি সারা রাত্রির আর্ত্তনাদের পর প্রভাতের শীতল স্পর্শে যেন একটু ঘুমাইতেছে। নকড়ি বাবুর হাতে "দর্পণ" নামক একখানি মাসিক পত্র। অলস ভাবে দর্পণের পাতায় চক্ষু বুলাইতে ছিলেন। এমন সময় মা রাজেশ্বরী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। নকড়ি বাবু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, সংসার রসাতলে যায়! এ সম্বন্ধে কথাটা ছেলের কাছে আজ নিশ্চয়ই পাড়িবেন, এই তাঁর মতলব। মা-কে দেখিয়াই নকড়ি বাবু একটু বিরক্তির স্বরেই বলিয়া উঠিলেন—

"এখন সরে যাও মা; মাথায় একটা প্লট্ ঢুকেছে!"

রাজেশ্বরী দেব্যা সেকেলে মানুষ হইলেও বুদ্ধিমতী।

নকড়ি বাবুর কথাটার মধ্যে যেটুকু ফাইন আর্ট ছিল, সেটুকু বাদ দিয়া, নিরেট গন্ধময় অর্থটা চুষাইয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন, "ইংরেজী করে বল্লে কি হবে, বাপু, মাথায় যে ভূত ঢুকেছে তা'ত আমি জানি!" প্রকাশ্যে বলিলেন—

"ও বুলিটা তো মান্ধাতার সময় থেকে শুনে আসছি; তবু যদি হাতে কলমে কিছু বেরুতো, তবে বুঝি বা কাশীতে ভূমিকম্পই হতো!" মা আরো কি বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু সেটা চাপিয়া গেলেন, কারণ হিত বচন তো তত মনোহারি হয় না! এবার কিন্তু নকড়ি বাবুর হাসি সবখানি মুখ ভরিয়া দিয়া দুদিকে আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। আনন্দে মুকুলিত চোখ দুটিতে মায়ের পানে তাকাইয়া তর্কের সুরটা অনেক নীচে নামাইয়া বলিলেন; "এবার পথে এসো মা; দেখ, সব ঠিক্ ঠাক্ করেছি এবার কলিকাতা গিয়েই আমার "নব কঙ্কণ" প্রেসে দোবো!" মা একটু উপহাসের ছলে বলিলেন, "ও রকম তো ঢের দিন থেকে শুনে আসচি, ও বাড়ীর মালতীর মতও যদি তোর ক্ষমতা থাকতো! এসেছিল সে দিন আমার কাছে সে; আমায় তার ছাপানো কবিতার বই দিয়ে গেছে।" মালতী! কবি চণ্ডীদাসের প্রেমের ফুল! মায়ের কথাটার মধ্যে, বিলাতের সাফ্রিগিষ্ট নারীদিগের ঔদ্ধত্যের ন্যায় একটা শল্য নিহিত ছিল বটে কিন্তু তবু কবি চণ্ডীদাসের ফুলের মাদক গন্ধে নকড়ি বাবুর লুপ্ত বিদ্রোহ-ভাব ফণা মেলিতে পারিল না। পাশের বাড়ীর নামের মন্ত্রগুণে, নকড়ি বাবুর কল্পনার উপর ভাবের আর একটা রত্ন শলাকা ঝিলিক দিয়া উঠিল।

কথাটা এখানে একটু খোলসা করিয়া বলা দরকার। নকড়ি বাবু গাজীপুরে যে দ্বিতল বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছেন, তাহার লাগ দক্ষিণ ধারেই ছোট একখানি একতালা দালান। নকড়ি বাবুর কবিত্ব চর্চ্চার জন্য যে কামরাখানি বিবিধ উপকরণে সজ্জিত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের জানালাটি খুলিলে, অথবা খালি কাচের সাসি বন্ধ থাকিলেও—পাশের বাড়ীর ভিতরটা সব দেখা যাইত। সেই ছোট একতালা দালানে, রাস্তার দিকে বড় সাইন-বোর্ড খাটাইয়া শ্রীমতী মালতীবালা বসু বাস করেন। ইনি কলিকাতার ক্যাম্পবেল বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা লেডি-ডাক্তার; 'ধাত্রী' বলিলে চটেন বলিয়া সাইন-বোর্ডেই পদবীটা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। চরিত্র-গুণে এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যে গাজীপুরে ইহার যশ এখন শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে। বয়স বিংশের সেতু পার হয় নাই। লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা, কালো চুলের তরঙ্গের মাঝে কচি চাঁদপানা একখানা মুখ ঐ বাড়ী হইতে, কত দিন হইল, নকড়ি বাবুর বিহ্বল কবি প্রতিভার উপর দিয়া গোপনে দ্রুত যাওয়া আসা করিতেছিল। সে মুখ যাহার, তাহার হৃদয়ে কবিত্বের অমৃত রহিয়াছে, এ নব আবিষ্কারের আনন্দ নকড়ি বাবুর পক্ষে সামলানো দায় হইল। হঠাৎ এ কি আনন্দ! নকড়ি বাবুর মর্ম্মের গোপন কক্ষে, আজ কিসের এ নিবিড় উৎসব। অশরীরী দেবতার ষড়যন্ত্রে আজ অকাল বসন্ত সহসা তার সমুদয় ফুলোৎসব লইয়া নকড়ি বাবুর নিকট যেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাপরাশীর ন্যায় নরম গরম ভাবে বকশিশ্ চাহিতেছে। ঠাকুর হৃদয়ের কোঠা অতি তাড়াতাড়ি পার হইয়া অচিরে নকড়ি বাবুর মস্তিষ্কের উপর তাহার তাঁবু ফেলিয়া, তাঁহার মীনধ্বজাঙ্কিত বিজয় নিশান উড়াইয়া দিলেন। সুতরাং তৎক্ষণে মালতীর আরক্তপ্রান্ত কর্ণ-মূলের হীরকাঙ্কুরজড়িত ক্ষুদ্র ইয়ারিং দুটি উড্ডীয়মান কবির গোপন হর্ষের উপর একেবারে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে! মনের ভাব চাপা দিবার জন্য একটা অতি নিষ্ঠুর চেষ্টার পর, কতকটা সামলাইয়া বলিলেন—"মালতী! বেশ নামটি তো, কে সে, মা?"

মা বলিলেন—"ও পাশের বাড়ীর মেয়েটী; এখানকার হাসপাতালের মেয়ে-ডাক্তার; যেমন, নরম সরম স্বভাব তার, তেম্নি লক্ষ্মীমন্ত তার চেহারা!" বক্ষে ভিতর দিক হইতে যে একটা ভাব উঠিতেছিল,

কণ্ঠনালীর মাংসপেশীর সাহায্যে বহু কষ্টে তাহাকে বস্তা চাপা দিয়া নকড়ি বাবু বলিলেন—"বইখানার নাম কি মা, বল্‌তে পার ?" নামটার মধ্যে একটা বিশ্রী কিড়ি-মিড়ি ছিল। তাই রাজেশ্বরী পুস্তকের নাম বলিতে পারিলেন না। তাহাদের কর্ত্তাদের সময় মেয়েদের লেখাপড়া জানাটা বেহায়াপণার মধ্যে গণ্য হইত। রাজেশ্বরী তাহার কামরা হইতে বইখানি আনিয়া নকড়ি বাবুর হাতে দিয়া এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন। পুস্তক-খানির মলাটের উপরে সোণার জলে লেখা ছিল, "কজ্জল রেখা" শ্রীমতী মালতীবালা বসু রচয়িত্রী। হঠাৎ নকড়ি বাবুর মনে পড়িয়া গেল, এইমাত্র না তিনি "দর্পণে" কজ্জল রেখার সমালোচনা পড়িতেছিলেন ? তাড়াতাড়ি "দর্পণ" খুলিয়া নব কৌতুহলের সহিত দর্পণে কজ্জল রেখার সমালোচনা পুনরায় পড়িতে লাগিলেন—

"কজ্জল রেখা"—শ্রীমতী মালতীবালা বসু রচয়িত্রী। মূল্য সাড়ে দশ আনা, ১৪নং রেইনবো লেন হইতে অরেঞ্জ ব্লসম্ প্রেশে জাপান হইতে আনীত নূতন টাইপে মুদ্রিত।

কয়েকটি উজ্জ্বল খণ্ড কবিতার মধুর সমাবেশ। ভাবের কম্পনে কম্পনে বিরহের অশ্রু হীরার ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখিকার রুচি মার্জ্জিত তবে বিরহটা একেবারে সদ্য বলিয়া, দুই এক স্থলে ভাবের চাপা পড়িয়া ভাষা একটু বেসুরা বাজিয়াছে। হাত পাকিয়া আসি-লেই এটুকু ফলের মুখে শুষ্ক ফুলটির মত, আপনিই খসিয়া যাইবে। মোটের উপর একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা চলে যে, যে কালে নারীর জাতিগত শ্রদ্ধাবশতঃ তাহাদের যা-তা লেখা যেমন তেমন করিয়া কাগজে ছাপা হইলেই সমালোচকগণ আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিতেন—এটি সে শ্রেণীর রচনা নহে। শ্রীখাতির নাদারত।

রাজেশ্বরী গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলে পর, নকড়ি বাবু মন খুলিয়া অন্যমনস্ক হইতে পারিলেন। আজ আর ত মন ডালে বসিতে চায় না! মনের আশে পাশে, বিশেষতঃ দক্ষিণের জানালার পাশে, মালতী ফুলের হালকা খোসবাই হাল্‌কা হাওয়ায় বেজায় মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে নকড়ি বাবু যখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, তাহার কচি দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে অন্য মনে বলিয়া উঠিলেন—"এই তো কবির যোগ্য বটে! তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, শান্ত সুদূর—"তখন শ্রীমতী মালতীবালা বসু, নকড়ি বাবুর চিন্তা-সাম্রাজ্যে নায়িকার বেশে একেবারে খাস দখল লইয়া বসিয়াছেন।

বিনা রক্তপাতে একটা ফরাসী বিপ্লব গাজীপুরে সংঘটিত হইয়া গেল। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনু-সারে এখন কাহার নামে অনধিকার প্রবেশের মামলা চলিবে। কে বাদী, কে প্রতিবাদী! আইনের সূক্ষ্ম বিচারে যাহাই হউক না কেন, সুন্দরকে অন্তরের ভাবের মধ্যে গ্রহণ করিয়া কথার ছন্দে প্রকাশ করার নামই ত কাব্য! তাই যদি হয়, তবে যে কস্তুরী মৃগী আপনি আসিয়া জালে পড়িল, তাহাকে "মরালিটী"র হিসাবে না হউক, অন্ততঃ সূক্ষ্ম ফাইন আর্টের খাতিরে, ভাব ও জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে নকড়ি বাবু ন্যায় ও "ইকুইটী" মধ্যে বাধ্য। বলা বাহুল্য, নকড়ি বাবুকে কখনও "লজিক্" পড়িতে হয় নাই।

১

বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। মালতীবালা তাহার ছোট্ট টেবিলখানার দিকে ঝুঁকিয়া 'নৌকাডুবি' পড়িতে-ছিলেন। গ্রীষ্মের তপ্ত নিশ্বাসে তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতলতা দূর হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে, কাচের রাঙ্গন দরজা দিয়া রৌদ্র আসিয়া মালতীর মুক্ত, ঘন তরঙ্গিত কেশ রাশির উপর একটি বিচিত্র রঙ্গের কিরণ-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। নির্ম্মল কপোলখানি সুন্দর করতলে শিথিলভাবে ন্যস্ত। রৌদ্রের ছটা হাতের লাল বেলোয়ারি চুড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে কপোলের উপর একখানি রাঙ্গা গোলাপী স্বপ্নের আভা ছড়াইয়া দিয়াছে। মধুর প্রভাতে নির্ম্মল রৌদ্র করে বিহঙ্গের কাকলী ভাসিতেছে, আসবাব হীন ছোট্ট ঘরখানিতে রূপের লক্ষ্মীটির মত যখন মালতী বসিয়াছিল, তখন সৌন্দর্য্যের সোণার কাঠীর স্পর্শে সে বুঝি ছবি হইয়া গেছে—এমনি

মনে হইতেছিল। এমন সময় ঝি আসিয়া টেবিলের উপর একখানা চিঠি রাখিয়া গেল। নীল বড় লেপাফা, পীঠে সোণার জলে লেখা মনোগ্রাম। ভিতরে পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

"পরম প্রীতিনিলয়াসু,

ভাবের মিল হইতে ভালবাসার উদ্ভব কেবল সাহিত্যিকদিগেরই সম্ভব। আপনি মা-কে উপলক্ষ করিয়া যে "কজ্জলরেখা" অধমকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আমার বাকী নাই। কজ্জলরেখার নিবিড় প্রান্তে যে গোপন অশ্রুকণা প্রচ্ছন্ন, আমি যদি কবি হইয়া থাকি, তবে তাহা আমি এক দিন প্রেম-রুমালে মুছাইব। আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, কজ্জলরেখার কয়েকটি কবিতার সঙ্গে আমার রচিত কয়েকটি কবিতার অসাধারণ সৌসাদৃশ্য আছে। এমন কি, হঠাৎ পড়িয়া এগুলিকে দুই ব্যক্তির লেখা বলিয়া ঠাওরান কঠিন।

প্রেমের রাজ্যে সাহিত্যিকদিগের প্রবেশ সাহিত্যের ভিতর হইলে বড়ই শোভন হয়।

আমি আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম, জাতি কুল কিছুই জানি না। প্রেমের আবার জাতি কুল কি? আমার এ প্রস্তাবে একটা কঠিন স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য আমি তাহা অনায়াসে করিতে পারিব। কথাটা কিছু নয়—হয়তঃ মা ইহাতে রাজি হইবে না। কাব্যে তার কোনও অধিকার নাই—স্বাভাবিক প্রেমের তার কোনও জ্ঞান নাই। সুতরাং তাহার বাধাকে আমি বাধা বলিয়াই মনে করি না। আজ শুভ দিনে এই পত্রে আমার মর্ম্মের গূঢ় ভালবাসা আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। গ্রহণ করিবেন কি? আপনার নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইলে বিবাহে আমার অমত নাই। তবে আমাদের কাব্য শাস্ত্রে এরূপ স্থলে গান্ধর্ব্ব মতই প্রশস্ত। পত্রের উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিলাম।

আপনার সেই অনুরক্ত—

কবি নকড়ি।"

পত্র পড়িয়া মালতী বালার কপোল হইতে আরম্ভ করিয়া একটা উষ্ণতা কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম করিয়া দিল। সন্ধ্যাবেলা জবাব মিলিবে ঝিকে দিয়া পত্র বাহকের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া মালতীবালা কলে বাহির হইয়া গেল।

৪

শুভ গোধূলি-লগ্নে একটা আশাপ্রদ জবাব মিলিবার মধুর সম্ভাবনায় নকড়ি বাবুর কাব্য প্রতিভা আজ একেবারে শাখায় পত্রে বিকশিত! শেলীর ভাগ্যে যে সফলতা শুধু স্বপ্নের মাঝে পর্য্যবসিত, কীট্‌স্ যাহার পানে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যক্ষ্মারোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কালিদাসের অদৃষ্ট-মেঘকে স্বপ্নরঞ্জিত করিয়া যে সফলতা অলকার পানে ভাসিয়া গিয়াছে সে যেন আজ মটোর গাড়ীতে চাপিয়া নিতান্ত অযাচিত ভাবে উদীয়মান তরুণ কবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, নকড়ি বাবুর কতকটা এমনি মনে হইল। তরুণ নক্ষত্রালোকে অনুকূল অদৃষ্টের একটি ধাক্কার মাত্র অপেক্ষা। মধ্যাহ্নের আহারের পর টনিক-ভোজ টানিয়া যখন নকড়ি বাবু তাঁহার নির্জ্জন কামরাটিতে আসিয়া বসিলেন, তখন "গোলাপে গোলাপময় অন্তর বাহির!" তিনি যেন সত্য সত্যই দেখিতে পাইলেন, নীল আকাশের উপর দিয়া সাতপ মেঘ গোলাপের পাঁপড়িতে লালে লাল হইয়া সন্ধ্যার অভিসারে ছুটিয়াছে; বিহঙ্গের কল-ঝঙ্কারের সহিত গোলাপের সৌরভের মাদক ধাক্কা লাগিয়া জলস্থল যেন শ্যাম্পেনের শোণিত বুদ্‌বুদে ভরিয়া গিয়াছে। যেন কার চরণ-পদ্মের অলক্ত-রাগের চুম্বন-আকাঙ্ক্ষায় আজ পাথরের রাস্তাময় বহুমূল্য পাথীর পালখ বিছানো! ঐ যে পোষ্টাফিসের খোট্টা পিয়নটা চিঠির ব্যাগ লইয়া ঘামিতে ঘামিতে দ্বারে দ্বারে ছুটাছুটি করিতেছে আজ তার মুখ খানিও যেন কমনীয় হইয়া গিয়াছে। নকড়ি বাবুর চক্ষে আজ রাস্তার লেম্প পোষ্টগুলা শুদ্ধ সহসা ফুলে পাতায় সজীব হইয়া উঠিল! কি সুর মিলিল! কিন্তু!—

হায়! এ সুখপূর্ণ কবিত্ব জগতে যদি 'কিন্তু' না থাকিত অন্ততঃ আজকার ব্যাপারে নকড়ি বাবুর জন্য যদি আজ এই কিন্তুর গোলযোগটা একেবারে না থাকিত! নকড়ি

বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথায় ?

ভাবিতে ভাবিতে নকড়ি বাবু তাহার সোণার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে দুরন্ত "কিস্তর" লাগাল পাইয়া সন্ধ্যা আসিতে আসিতে আজ বড় 'লেট' হইয়া গেছে! সূর্য্য ঠাকুর যেন নকড়ি বাবুর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া কিছুতেই যেন আজ তাঁহার সন্ধ্যাকালের জবাকুসুম ধারণ করিতে নারাজ! "পিরীতি কণ্টক" আজ নকড়ি বাবুর "হিয়ায়" অতি নিদ্দয় ভাবে গিয়া বিঁধিয়া গিয়াছে। আজ প্রেমের টানে তিনি একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিলেন। সিদ্ধির মুখের কাছে এতক্ষণ ধরিয়া প্রতীক্ষা করা! ইহার মধ্যে প্রেমের একটা অতি নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্য আছে। গোলাপের রজ্জু দিয়া ফাঁসি দিলে কি মরণের যাতনা ফুলের গন্ধের মধ্যে লোপ পায় ?—কখনো না! ফুলের অন্তরে যে দুঃখের বসতি, তার সন্ধান শুধু প্রেমিকই জানে।

সকালে হউক, আর দেরীতে হউক, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, অবশেষে সন্ধ্যাকে আসিতে হইল! পশ্চিম আকাশে রঙ্গের খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া ধূসর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে দুই নক্ষত্র নয়ন তুলিয়া শরণাগত কবি নকড়ি বাবুর পানে চাহিলেন। নকড়ি বাবু তখন রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগের ৩৪ পৃষ্ঠার সন্ধ্যা কবিতাটির ভাবে নিজকে প্রণোদিত করিয়া, ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা, ওরে মন,
নত কর শির, দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী ; তিমিরের তীরে,
অসংখ্য প্রদীপ জ্বালা এ বিশ্ব-মন্দিরে
এল আরতির বেলা!"

অভ্যাস মত সায়াহ্নের ভোজটি পেটে পড়া মাত্র নকড়ি বাবুর কবিত্বের আবেশটি বেশ ভালো করিয়া জমিয়া উঠিল। কাজল ঢালা আকাশখানিকে তারায় তারায় খচিত করিয়া দিয়া, নকড়ি বাবুর অলক্ষিতে, গোধূলি-লগ্ন যে কখন পার হইয়া গেছে, তখন আর তার খবর কে রাখে! যখন এক দুই করিয়া ৮টা বাজিয়া গেল, তখন নকড়ি বাবুর হৃদয়ের তরল কাব্য-স্রোতে একটা নীরস গদ্য আশঙ্কার দানা দুই একটা করিয়া বাঁধিয়া উঠিল। তবু বক্ষোলগ্ন ভরসাকে একেবারে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। কারণ বিরহের expert কালিদাসের বিরহী যক্ষ নিজেই বলিয়াছেন আশাই "সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।" কিন্তু কিছুতেই ত আর কিস্তর গোলযোগ থামাইয়া রাখা যায় না! এইভাবে চিন্তার গোলযোগের মধ্যে ঢং ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘড়িতে ৯টার বজ্রধ্বনি বাজিয়া গেল তখন আশার শেষ রেখাটি অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

নকড়ি বাবু তখন জ্বলন্ত কেরোসিনের লেম্পটাকে তাঁহার মর্ম্ম বেদনা কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় বলিতে লাগিলেন "ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা, শেজ বিছাইনু ফুলে! সব হইল বাসি—আর কেন সই—ভাসা গো যমুনা-জলে!" এমন সময় কালিন্দীবরণ ভজু সিং নীচের তলা হইতে হাঁকিল, "কোন হায় বাবুকা চিট্টি লে যাও উপর।" তখন সহসা নকড়ি বাবুর দুঃখের রাগিণীর মাঝে বড় মধুর একটা মীর বাজিয়া গেল! নারী! তোমরা কি প্রেম-চক্ষে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাও ? কম্পিত-হস্তে, তাড়াতাড়ি চিঠি খানি লেপাফা হইতে বাহির করিবার সময় পত্রের একাংশ ছিঁড়িয়া গেল।

যাহা হউক জোড়াতালি দিয়া পত্রখানি নকড়ি বাবু পড়িলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

"যথাবিহিত নিবেদনমেতৎ—

শ্রীমতী মালতীবালার পক্ষে আমি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার পত্র যথা সময়ে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। আপনার প্রেরিত "অন্তরের গূঢ় ভালবাসা" নামক কোন পদার্থ লেপাফা খুলিয়া পাওয়া যায় নাই, অতি দুঃখের সহিত এ কথা আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। ভবিষ্যতে এ প্রকার মূল্যবান জিনিষ কোথাও প্রেরণ করিতে হইলে, সাধারণ

লোকের হাতে না পাঠাইয়া পোষ্টাফিস যোগে ইনসিওর করিয়া পাঠাইবেন।

আপনি শেলী, প্লেটো প্রভৃতি মনস্বিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক "গান্ধর্ব্ব" প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মালতীবালার ন্যায় সামান্যা মানুষী তাহার যোগ্যা নয়। বাড়াবাড়ি করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের প্যাঁচে পড়াও অসম্ভব নয়।

আমি শ্রীশান্তিরঞ্জন বসু আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহাকে বিবাহ করিয়াছি; আমি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক। বদলি উপলক্ষে ইঁহাকে "বিশেষ ভাবে বহন" করিয়া বিবাহের ব্যুৎপত্তিগত উদ্দেশ্য মুখ্য ভাবে পালন করিয়া আসিতেছি।

অল্প বেতনভোগী শিক্ষকের পক্ষে বিবাহের শাস্ত্রগত অর্থ সব সময় মানিয়া চলা ব্যয়সাপেক্ষ মনে করিয়া আমি ইহাঁকে গাজীপুরে স্থাপন করিয়াছি। স্থানীয় হাসপাতালে ইনি লেডি-ডাক্তারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

আমি গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী বেড়ৌলি ষ্টেসনের সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করি। মাসে ২।১ বার গাজীপুরে যাইয়া থাকি।

আর একটা কথা বলিয়াই আমার পত্র শেষ করিতে ইচ্ছা করি। প্রেম রাজ্যে-সাধারণ অপেক্ষা কবিদের স্বাধীনতা কিছু বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিরাও সমাজের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিলে, ভবিষ্যতে নিতান্ত নিরঙ্কুশ হইবেন না। তারপর, শ্রীমতী মালতীবালার নিকট এ প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না, এবিষয়ে একটু অনুসন্ধান করাটা কি সুরুচি সঙ্গত হইত না? কাব্য চর্চ্চায় আর্য প্রয়োগের দোহাই দিয়া মস্তিষ্ক নামক পদার্থটাকে একেবারে বাদ দিয়া লইলে বাণী-পন্থা সব সময় একেবারে নিরঙ্কুশ হইবে না, আশা করি, ভবিষ্যতে এ কথাটা একেবারে ভুলিবেন না।

ভবদীয় শুবুদ্ধিকামী,
শ্রীশান্তিরঞ্জন বসু।"

যখন "কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল," তখন নকড়ি বাবুর প্রেমের ব্যারোমেটার বহু দূরে নামিয়া পড়িয়াছে! স্বর্গ হইতে একদম নরকে পতিত হইবার সময় মিলটনের সয়তানও বুঝি এত উঁচু হইতে এত নীচে পতিত হয় নাই!

প্রথমতঃ নকড়ি বাবু মনে করিলেন, "ভাল বাসিলাম যদি তবে মরিলাম না কেন! মরিলাম না যদি, তবে খালি কাঁদিলাম কেন!" শেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন রাতারাতি এ প্রয়োজন-হীন প্রাণ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের ভিতর হইতে পালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা ভয়ঙ্কর কাপুরুষতা তাই ভীত প্রেমিক সম্প্রদায়ের মত অহিফেন বা আর্সেনিকের কথা তাঁহার মনে পড়িল না! এই ক্ষেত্রে বানপ্রস্থের বন্দোবস্তই উত্তম। কিন্তু তাহাতেও দুইটি বিঘ্ন! গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ অশাস্ত্রীয় এবং সংসারের দুঃখ দেখিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করাও ভীরুতারই লক্ষণ। কাজে কাজেই দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে স্থির করিয়া সন্ন্যাসীও হইতে পারিলেন না। এমন বিপাকের মধ্যে নকড়ি বাবুর মনে হইল আহত প্রেমের গোপন-অশ্রু-কণার মধ্যেই কবির স্বর্গ নিহিত—সেই স্বর্গের নিভৃত কোণে নকড়ি বাবু নিজ বাসস্থান স্থির করিয়া লইলেন—এ দুঃখের কাহিনী আমি বীরের মত সহ্য করিব, কাহাকেও আর একথা বলা হইবে না। আর্টকে গোপন করাই আসল আর্ট! রাত্রিতে আহার করার সময় নকড়ি বাবু মাকে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—

"কালই দেশে যাবো মা, এই বেলা সব গোছাও!"

গাজীপুরের ব্যয় বাহুল্য, দেনার বৃদ্ধি, এবং গভর্ণমেণ্টের চিঠির কথা যথা সময়ে রাজেশ্বরী দেব্যাকে নায়েব বলিয়া ছিলেন। এই সমুদয় দুর্ঘটনায় রাজেশ্বরীর মন যখন ভয়ানক উদ্বেগের মাঝে হাবুডুবু খাইতেছিল এখন পুত্রের মুখে এমন অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদ শুনিয়া মা আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিলেন না। পরের দিন

দেখা গেল, কবি সদলবলে কমলপুরের টিকিট করিয়া আটটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে চাপিয়াছেন।

নকড়ি বাবুর স্বাস্থ্য গাজীপুরী চিকিৎসায় আশ্চর্য্য-রকমে শোধরাইয়া গিয়াছে। এ বার তিনি কমলপুরে আসিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ! এখন নিজের জমিদারী তিনি নিজেই দেখিতেছেন।

মায়ের অনুরোধে নিতান্ত গদ্য প্রথায় একটি বিবাহ করিয়াছেন। এ বিবাহ প্রেমের স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হয় নাই। নিতান্ত কর্ত্তব্যের দায়ে ঠেকিয়া করিতে হইয়াছে। তবে কিন্তু সম্প্রতি একটি কন্যা রত্ন লাভ হওয়াতে কর্ত্তব্যটা এখন অনেকটা মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে! সাহিত্যের সঙ্গে পুরাতন খাতিরটা এখন একেবারে লোপ না পাইলেও তাহাতে মর্চ্চে ধরিয়াছে। কারণ সত্য কথা বলিতে কি কাব্য-ঝঙ্কার অপেক্ষা আমদানীর কিস্তিতে রজত-টঙ্কারটাই এখন যেন মধুরতর বোধ হয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ

প্রতিবাদ *

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিত এই প্রবন্ধের আংশিক প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

সাভারের কতিপয় মাহিষ্য জাতীয় ব্যক্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কুর্শিনামা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই কুর্শিনামা শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখা যায় না। শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইলেও কুর্শিনামার উপাদান বহু পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত ছিল। শত বৎসর পূর্ব্বে কেবল সুশৃঙ্খল ভাবে বংশাবলী পুনর্লিখিত হয় মাত্র। যাবৎ ইহার বিরুদ্ধে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ উপস্থিত করা না যাইতেছে তাবৎ এই কুর্শিনামার সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। দীনেশ বাবু উচ্চ অঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিৎ সাহিত্যিক। তিনি বিনা প্রমাণে যে সে কথা শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার লোক নহেন। তাঁহার গবেষণার পরিচয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকে দেদীপ্যমান আছে।

বংশাবলীর প্রথমে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম আছে। তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় দামোদর রায় ডাক নাম দামুরায় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া সিংহাসন লাভ করেন। সেই হইতে ধারাবাহিক বংশাবলী চলিয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পাল উপাধি থাকিয়া তাঁহার ভাগিনেয়ের বংশের ঐশ্বর্য্য বাচক রায় উপাধি থাকা অসম্ভব ও আশ্চর্য্য-জনক কি? বিশেষতঃ আধুনিক কালে কুম্ভকার জাতির সাধারণ উপাধি পাল। এই উপাধি নীচতা-সূচক বলিয়া অনেকে ইহা পছন্দ করেন না। এ কারণেও ঐ উপাধি দৌহিত্র বংশে অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইতে পারে।

"পাল রাজগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিলেন না" কোন্ ইতিহাস পাঠক তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন? বরং পাল রাজগণ যে মাহিষ্য ছিলেন তাহার প্রমাণ সযত্ন রক্ষিত বংশাবলী, জনশ্রুতি ও লৌকিক ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে। পালরাজগণ জাতিতে মাহিষ্য, ধর্ম্মে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম উভয়েই বিশ্বাসবান। মধ্যযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এইরূপ মাখামাখি ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেমন একই বংশে শাক্ত ও বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায় এবং শাক্ত বৈষ্ণবে যৌন-সম্বন্ধ সংস্থাপনে বাধা নাই পূর্ব্বকালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-গণের সেই ভাব ছিল। ইহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আবান্তর ভাবে সেই সকল প্রমাণ উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন।

* প্রতিবাদের গোড়ায় ও শেষে কতকাংশ বাদ দেওয়া হইল, কারণ তাহাতে প্রতিবাদ সম্পর্কীয় কোন তথ্য নাই। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রতিবাদ পত্রস্থ করিতে আমরা অসমর্থ—প্র, স।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লওয়াতেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের সম্মিলনে সুবিধা হইয়াছিল। সুতরাং গৌড়ের পালরাজগণ ধর্ম্মে বৌদ্ধ হইলেও জাতিতে মাহিষ্য থাকার বাধা হয় নাই। সাভারের রাজগণ যে মাহিষ্য তাহা মাহিষ্য জাতির চিরন্তন বংশ মর্য্যাদাতেও জানিতে পারা যায়। মাহিষ্য জাতির চাঁদ প্রতাপ-সমাজ ভাকুর্ত্তার রায়গণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। ভাকুর্ত্তার রায়গণ হরিশ্চন্দ্রের শেষ বংশধর। ইঁহাদেরই কেহ কেহ কোণ্ডা গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহাদিগকে সমাজের লোক রাজবংশীয় বলিয়া চিরকাল উচ্চ আসন দিয়া আসিতেছেন এবং কুলীন বলিয়া মহাসম্মান করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় ইঁহাদিগকে আমরা পৈত্রিক সম্মান হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না।

রামচরিত কাব্য অনুশীলন করিলেও গৌড়ের পালরাজগণ যে মাহিষ্য তাহা প্রতিপন্ন হইবে। রামচরিত কাব্যে লিখিত আছে পালগণ "শ্রীপতি নাভি-সম্ভূতঃ"; গ্রন্থকারই টীকাকার; তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীপতিঃ পার্থিবঃ নাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাৎ সম্ভূতঃ উৎপন্নঃ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যজাত, ক্ষত্রিয় নহে ক্ষত্রিয়-সম্ভূত। ঠিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ক্ষত্র বীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ শ্লোক স্মরণ করায়।

* * * *

আইন আকবরী রচয়িতা পাল রাজগণকে Koyth জাতি বলিয়াছেন। অদ্যাপি দিনাজপুরের উত্তরে আটোয়ারী থানায় এবং পূর্ণিয়া জেলায় কৈবর্ত্ত জাতিকে "কোবৎ" বলে। অন্তস্থ ব-কারের উচ্চারণ "ওয়া"বৎ। সুতরাং Koyth শব্দ ঠিক কোবৎ শব্দের প্রতিরূপ। পক্ষান্তরে কৈবর্ত্ত শব্দের পালী অপভ্রংশে কেবট্ঠ্ হয়। কেবট্ঠ হইতে কেবট বা কেওট্ হয়। কেওত্ বা কেওট্ হইতে Koyth শব্দ নিকটবর্ত্তী, কায়স্থ শব্দ হইতে অধিকতর দুরবর্ত্তী। একারণ কায়স্থ শব্দ হইতে Koyth হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না। বিশেষতঃ আবুল ফজেল আকবরের সভাসদ ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে আইন আকবরী লিখিয়াছেন। তাঁহার বহু পূর্ব্বে পাল রাজগণের রাজ্য নষ্ট হওয়ায় রাজ-বংশধরগণ ঐতিহাসিকের অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তত আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

বীরেন্দ্র বাবুর তৃতীয় যুক্তি হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ হিন্দু হইবার সময় সমাজের নিম্ন স্তরে (মাহিষ্য-স্তরে) যাইতে পারে না। সমাজ বিনা দোষে রাজ-বংশধরদিগকে এই রূপ নিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইতে পারেন না। মাহিষ্য জাতি সমাজের নিম্ন স্তর কিরূপে হইল? ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যার গর্ভে যাহার উৎপত্তি সে কি নিম্ন জাতি? ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, বৈশ্য এই ছয় জাতি দ্বিজধর্ম্মী। দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্য সমাজের নিম্ন স্তর নহে। মেদিনীপুর অঞ্চলে এই জাতিই সমাজের উচ্চতম স্তরের লোক। নদীয়া অঞ্চলে কায়স্থের তুল্য। ঢাকা অঞ্চলে ইহাদের সম্মানের কতকটা হানি সংখ্যার অল্পতা ও কায়স্থ জাতির প্রাবল্য বশতঃ হইয়াছে। এই জাতি সমাজে কিরূপ আসন গ্রহণ করেন, আমরা নিজে তাহা বলিতে চাহি না। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নবদ্বীপ বিবুধজননী সভার সভাপতি স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ স্মার্ত্তশিরোমণি মহাশয়ের "হিন্দু কাষ্টস্ এণ্ড সেক্‌টস্" পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"চাষি-দাসগণ বিশুদ্ধ জলাচার জাতি। ইহারা কৃষিজীবী, গ্রামবাসী লোক মধ্যে একটি গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মেদিনীপুর জেলায় ইহারা স্থানীয় "এরিষ্টক্রেসী," উচ্চতম স্তরের সমাজনেতা সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদি বড়লোক সম্প্রদায় বটে। তদ্ভিন্ন অপরাপর জেলায় যে যে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়, তত্তৎ স্থানে ইহাদের পদ ও মর্য্যাদা কেবল কায়স্থ জাতিরই অব্যবহিত নিম্নে অবস্থিত (অন্য কোন শূদ্র জাতির নিম্নে নহে)। তমলুক এবং কাঁথি অঞ্চলের সমাজে ইহারা উচ্চতম স্তরের সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য। সে স্থানে ইহাদের মধ্যে

বহুতর লোকই জমিদার ও আয়বান্ ভূম্যধিকারী। অল্পকাল পূর্ব্বেই ইহাদের অবস্থা অতি সুখের ছিল।" (১)

শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ

প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রহায়ণ "প্রতিভাতে" প্রকাশিত মল্লিখিত 'পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ পত্র "প্রতিভা" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করায়, নিম্নে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের এবং পাঠকগণের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র কথা নিবেদন করিতেছি।

মদীয় প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম—"বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময় হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ সমাজের নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এই রূপ অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ। এই "নিম্ন স্তরে" শব্দটি পাঠ করিয়াই বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় প্রতিবাদের শেষ চতুর্থাংশে লেখকের উপর অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, প্রবন্ধ লিখিবার সময় কোনও জাতির উপর কটাক্ষ পাত করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির তুলনাতেই আমি ঐ "নিম্ন স্তরে" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাহাতে যদি কেহ দোষ গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে সানন্দচিত্তে আমি ঐ শব্দটি প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছি। জাতিতত্ত্ব আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে, ঐতিহাসিক আলোচনায় আলোচিত নৃপতির জাতি সম্বন্ধেও উল্লেখ থাকা আবশ্যক জ্ঞানে প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়াছি। মাহিষ্য কিংবা অপর কোন জাতির প্রতি নীচ জ্ঞানে অশ্রদ্ধা কিংবা বিদ্বেষের ভাব কোন দিনই আমরা হৃদয়ে পোষণ করি নাই। সুতরাং, আমাদের প্রতি বিশ্বাস মহাশয়ের অযথা দোষারোপে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

প্রতিবাদকারী সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালকে মাহিষ্য বংশীয় প্রমাণিত করিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার একটিও আমাদের নিকট সারবান্ বলিয়া বোধ হইল না।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "প্রবাসীতে" প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধে সাভারের মাহিষ্য জাতীয় জনৈক ব্যক্তিকে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তাহার সপক্ষে কোন রূপ যুক্তি, এমন কি দ্বিতীয় বাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না জানি না। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের প্রতি আমরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেও তাঁহার উক্তি মাত্রই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।

আধুনিক কালে কুম্ভকার এবং তৈলব্যবসায়িগণও পাল উপাধি ধারণ করেন, হয়ত মাহিষ্যগণও পূর্ব্বে পাল ছিলেন, কিন্তু, এখন তাহা "পছন্দ" না করাতে রায় উপাধি ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং, কুম্ভকার পাল, তৈল ব্যবসায়ী পাল, মাহিষ্য পাল প্রভৃতি যে কেহ পাল

---

(১) "The clean agriculturist castes :—

The agriculturist *Kaibartas* of Bengail :—The *chasee Kaibartas* of Bengal form an important section of its rural population. In the District of Midnapore, they may be reckoned among the local aristocracy. In the other districts, where they are found, their position is only next to that of the Kayasthas."

"In the Tumluk and the Contai Subdivi ion of the Midnapore District...........The Kaibartas may be said to form the upper layer of the local population. A great many of them are Zamindars and holders of substantial tenures. They were a very well-to-do class until recently."

J. N. Smarta Seromony M. A., D. L.'S Hindu castes & Sects. P. 270 & 279.

রাজবংশের উত্তর পুরুষ, প্রতিবাদকারীর এই রূপ যুক্তি নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিবাদ করার আবশ্যকতা বোধ করি না। পাঠক মহাশয়গণ ইহার সারবত্তা অনুভব করুন।

মল্লিখিত প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম,—"গৌড়ের পালরাজগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিলেন না।" বিশ্বাস মহাশয় নানাবিধ শ্লেষোক্তির সহিত তাহার অর্থশূন্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে আমি আমার উক্তির বিশেষ কোন প্রমাণ উল্লেখ করি নাই, কারণ, আমার ধারণা ছিল যে, উহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কমৌলিতে প্রাপ্ত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণকে স্পষ্টাক্ষরে "সূর্য্যবংশ সম্ভূত" বলিয়াই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

"এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।" সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত "রাম চরিত" কাব্যে পাল-রাজগণ "সিন্ধুকুলোদ্ভূত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিংহগিরি রচিত "ব্যাস পুরাণে" পালনৃপতিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে নিম্ন স্তরের ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তিনি সেন-রাজগণের আশ্রিত ছিলেন, সুতরাং, তাঁহার প্রভু-বংশের প্রতিযোগী রাজবংশের বিরুদ্ধে ঐরূপ উক্তি করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এতদ্ভিন্ন পালরাজগণ সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয় কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা বহু তাম্র-লিপি প্রভৃতি হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি পরবলের কন্যা রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপাল দেবের তাম্র শাসনে লিখিত আছে,—

"শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূটতিলকস্য।
রন্না দেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন॥"

বিগ্রহ পাল হৈহয় রাজবংশ সম্ভূতা লজ্জা দেবীর সহিত পরিণীত হন। ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পাল-দেবের তাম্র শাসনে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নু কন্যা
পত্নী বভূব কৃত-হৈহয়-বংশ ভূষা।"

রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটপতি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্য-দেবীকে বিবাহ করেন। যথা—

"রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গ মৌলে দুহিতরি তনয়ো ভাগ্য দেব্যাং প্রসূতঃ।"—প্রথম মহীপালদেবের বাণগড় লিপি।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী, চেদীর রাজকন্যা, এবং রাষ্ট্রকূট রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে এই রূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং, ইহা হইতে সুস্পষ্ট রূপেই প্রমাণিত হইতেছে যে, পালনৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন—মাহিষ্য ছিলেন না।

অতঃপর প্রতিবাদকারী যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও ভ্রমাত্মক। "রামচরিত" কাব্য হইতে যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি পালরাজগণকে মাহিষ্য-বংশীয় প্রমাণিত করিতে ইচ্ছুক, দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই পংক্তিটিই তাহার মতের বিরোধী। রামপালকে কবি "শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবির স্বলিখিত টীকা হইতে মাত্র একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার বিকৃত ও কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া প্রতি-বাদকারী তাঁহার স্বমতের পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঠিক তাহার পর পংক্তিটিও তৎসঙ্গে উদ্ধৃত করিলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হইত, এবং তৎকৃত বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইত। ইচ্ছাপূর্ব্বক অসমাপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বাক্যের প্রকৃত অর্থ বিকৃত করিবার চেষ্টা করা সত্যের অপলাপ মাত্র। "শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ" শব্দের টীকায় লিখিত আছে—"শ্রীপতিঃ পার্থিবো যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়স্তস্মাৎ সম্ভূতঃ বিধিরিবেতি শ্লেষোপমা। অত্র শ্রীপতের্বাসুদেবস্য নাভিতোঽম্বয়বাদুদ্ভূতঃ। শেষং সুগমং" টীকা হইতে উদ্ধৃত প্রথম বাক্যটির এই রূপ অর্থ করা হইয়াছে যে শ্রীপতির নাভি হইতে উদ্ভূত ক্ষত্রিয়, এবং সেই ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভূত (মাহিষ্য)। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটির যে সে রূপ অর্থ নহে, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই

বুঝিতে পারিবেন। যদ্যপি প্রথম বাক্যটিতে ঐ রূপ সন্দেহ মনে উঠিতে পারে, তথাপি, তৎপরবর্ত্তী বাক্যটি দ্বারা অতি সহজেই তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। টীকাকার স্বয়ংও বলিয়াছেন—"শেষং সুগমং।" ইহা সত্ত্বেও প্রতিবাদকারী শেষোক্ত বাক্যটি লোপ করিয়া প্রথমটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত রূপ বিকৃত ব্যাখ্যা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আইন্—ই—আক্‌বরী গ্রন্থে পালরাজগণকে "কায়েথ" বলা হইয়াছে। পারস্য গ্রন্থে ঠিক "কায়েথই" লিখিত আছে। সাধারণতঃ কায়স্থগণকে কায়েথ বলা হয়. সুতরাং, ইহার অন্য রূপ অর্থ করা সমীচীন নহে। হয়তঃ আইন-ই-আকবরীর কোনও ইংরেজী অনুবাদে "কায়েথ"কে বিকৃত করিয়া Koyth লেখা হইয়াছে। প্রতিবাদকারী তদবলম্বনে নানা অদ্ভুত তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। তিনি কৈবর্ত্তের সহিত যে কোন প্রকারে হউক এই Koyth শব্দের সাদৃশ্য দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মতে কৈবর্ত্ত হইতে 'কোবৎ', এবং 'কোবৎ' হইতেKoythউৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে, কৈবর্ত্ত শব্দের পালী অপভ্রংশ 'কেবট্ঠ', 'কেবট্ঠ' হইতে 'কেবট্' বা 'কেওট্', 'কেওট্' হইতে 'কেওৎ', এবং 'কেওৎ' হইতে 'Koyth' শব্দের উৎপত্তি। কায়স্থকে সচরাচর কায়েথ বলা হয়, এই শাদা কথাটি ভুলিয়া গিয়া নানা অদ্ভুত আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কৈবর্ত্তকেKoyth অথবা কায়েথ করিবার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না। কৈবর্ত্ত শব্দটির এই দেহান্তর প্রাপ্তি বড়ই আমোদজনক সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, হরিশ্চন্দ্র পাল কোন জাতীয় ছিলেন, তাহা স্থির করিতে নানা রূপ যুক্তি-তর্কের আতারণা করা হইল। ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহা করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু তিনি যে জাতীয়ই হউন, কোন জাতির উপরই সম্মানলাঘবার্থ বিদ্বেষমূলক কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, পরিশেষে পুনরায় ইহা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

পল্লীগ্রামে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি

পৌষ মাসের ৯ই ১০ই তারিখ হইতে দিনমানের বৃদ্ধি আরম্ভ। সেই সময় হইতে উত্তরায়ণ ধরা যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মতে এই সময় হইতে দেব-নিদ্রার অবসান। কাজেই ইহা যাগ যজ্ঞাদির প্রকৃষ্ট সময়। অতএব ইহা অতি পবিত্র সময়। এই সময় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গ-লাভ। গঙ্গাস্নানে একবিংশ কুল উদ্ধার। এই উত্তরায়ণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য কুরুকুলতিলক সত্যব্রত মহামতি ইচ্ছামরণ ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণান্তকর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও উত্তরায়ণের অপেক্ষায় নিজ মুমূর্ষ জীবনকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে অনেক স্থানে উত্তরায়ণ বা পৌষ সংক্রান্তিকে তিলাসংক্রান্তিও বলিয়া থাকে। জানি না. কেন যে এই নাম হইল। তবে তিলার সঙ্গে এই সংক্রান্তির বিশেষ সম্বন্ধ এই যে. এই সময় দেশে প্রচুর পরিমাণ তিলার আমদানী হইয়া থাকে। সাধারণ গৃহস্থগণ এই সংক্রান্তিকে বিশেষ একটা পর্ব্ব মনে করিয়া থাকে এবং এই সংক্রান্তি উপলক্ষেই তাহারা প্রথম তিলা খাইয়া থাকে। বোধ করি এই জন্যই এই বিচিত্র নাম হইয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রভাত না হইতেই পৌষের দারুণ শীতকে উপেক্ষা করিয়া পল্লীবাসি গৃহস্থ বালকগণ দলেদলে খালে, বিলে, পুকুরে, নদীতে স্নান করে। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কৃষকবালকগণের মধ্যেই এই প্রথাটা ষোল আনা রকম এখনও বিদ্যমান। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নানাদি শেষ করিতে হইবে। কারণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যকে পিঠা দিতে হইবে। তৎপর গরুকে পিঠা দিতে হইবে। গরুকে পিঠা দেওয়ার কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে হাসিতে পারেন। কিন্তু যে দেশে গো দেবতা জ্ঞানে পূজিত, যে দেশে গাভী সপ্ত মাতার মধ্যে এক মাতা; সে দেশের পক্ষে গরুকে পিঠা দেওয়া হাস্যজনক নহে। পল্লীগ্রামে আজও এমন অনেক হিন্দু বর্ত্তমান আছেন যে

তাঁহারা স্নানান্তে গোপদে জল দান ও গোকে ঘাস প্রদান না করিয়া জল গ্রহণ করেন না।

সরল প্রাণ পল্লী-বালকগণ স্নানান্তে ঢেঁকিতে কিম্বা মুষল দ্বারা লোটে (উদুখলে) আতপ চাউলের গুঁড়া প্রস্তুত করে। সেই গুঁড়া জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে নূতন কলকির মুখ ভিজাইয়া প্রথমতঃ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে উঠানের মধ্যস্থল লেপিয়া সেই স্থানে ৫ টি কিংবা ৭ টি ছাপ দেয়। তৎপর ঘরের দেওয়ালে ছাপ দিয়া গরুকেও ছাপ দেয়। গর্ভবতী গাভীগুলিকে কলকি দ্বারা ছাপ না দিয়া হাতে ছিটাইয়া দেয়। ইহার কারণ যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, কলকির আঘাতে গর্ভস্থ প্রাণীর কোনও অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় প্রথমতঃ এই প্রকার বিধান প্রচলিত হয়। কালে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাহার গরু কেমন সুন্দর দেখা যায় ইহা নিয়া রাখাল মহালে মহাহুলস্থুল বাঁধিয়া যায়।

পল্লীগ্রামের আর একটি আমোদও সে দিন বিশেষ উৎসবের মধ্যে ধরা যায়। সেইটি বাস্তু পূজা। যাঁহার উপর আমরা প্রতিনিয়ত সুখে অবস্থান করিতেছি হিন্দুর মতে তিনিও মহতী দেবতা। কাজেই বাস্তুভূমিও হিন্দুর অবশ্য পূজনীয়া। ভেড়া এই পূজার একটা বিশেষ উপকরণ। অনেক স্থলে কচ্ছপ বলি হইতেও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে এক জনকে অন্য জন্য গালি দিবার সময় "দুর হ বাস্তু পূজার ভেড়া" বলিয়া থাকে। অনেকে এই পূজা বাড়ীতে করেন। কেহ কেহ নিজ এলাকাধীন মাঠে করিয়া থাকেন। পল্লীবাসী বালকগণ পূজার চরু প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া দলে দলে মাঠে ভ্রমণ করিতে থাকে।

মেয়ে মহলে আর একটি পূজা প্রচলিত আছে। তাহাও এই দিনই হইয়া থাকে। ইহার নাম বুড়া-বুড়ীর পূজা। নামটা নেহাত গ্রাম্য, কিন্তু ইহার বিষয় আলোচনা করিলে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, এই পূজাটা অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। দেবাদিদেব মহাদেব অতি প্রাচীন। তাঁহার বামাঙ্গ-শোভিনী পরমা প্রকৃতি ভগবতী অতি প্রাচীনা। সেই প্রাচীন-প্রাচীনাই গ্রাম্য ভাষায় বুড়াবুড়ী বলিয়া আখ্যাত। এই পূজার উপকরণ হাঁসের ডিম ও শূকর। নীচ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই এই পূজার প্রচলন বেশী। কাজেই তাহাদের খাদ্য দ্রব্য দ্বারা অভীষ্ট দেবকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

এই ত গেল পূজার কথা। তারপর খাদ্যাদিরও সে দিন বিশেষ সমারোহ। যাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করেন তাঁহারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ খাদ্য দ্বারা রসনার পরিতৃপ্তি করেন। তাঁহাদের অনেকেই গ্রাম্য পিঠা পুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে দিন পল্লীগ্রামে পিঠা পুলির বড় ধুম। যে যেমন পারে তাহা দ্বারাই নিজ ও নিজের আত্মীয়স্বজনের মনস্তুষ্টি সাধন করে। পল্লীগ্রামে যতটুকু ধর্ম্মপ্রাণতা আজও রহিয়াছে, যতটুকু সরলতা আজও দেখিতে পাওয়া যায় আর কোথাও সেই প্রকার পরিদৃষ্ট হয় না। বঙ্গের অমর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন—

"ঘোর ঝাঁক বাজে শাঁক যত সব বামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে কত ধামা ধামা॥
উননে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কতই হাঁসিয়া॥"

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী

প্রাপ্তিস্বীকার

সমালোচনার্থ প্রেরিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে—

স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে (প্রেমগাথা) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত, কলিকাতা ২১১।৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত, চট্টগ্রাম সদরঘাট হইতে শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। কাগজের মলাট সহ ১৲ টাকা; বাঁধাই ১।৴০

মনুসংহিতা, শ্রীরামলাল বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন, এম, এ প্রণীত, কলিকাতা ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১।০

অজীর্ণতা, ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ১।০—৮৪,০ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা মৈত্র এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার—কুমার শ্রীসৌরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত, চমৎকার বাঁধাই—মূল্যের উল্লেখ নাই।

পারিজাত—গীতিকাব্য—সেখ হবিবর রহমান প্রণীত যশোহর, খুলনা, সিদ্ধিকিয়া সাহিত্য সমিতি হইতে প্রকাশিত—মূল্য ॥৴০

পুনরাগমন, (সামাজিক উপন্যাস)—শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ, প্রণীত, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—অতি সুন্দর বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা—মূল্য ১॥০

আদ্যের গম্ভীরা (বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়)—শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত, ১৫ কলেজ স্কোয়ার চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং—এজেন্টস্; চমৎকার বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা- মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ফুলশয্যা

আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন।
মধুগন্ধে ভরপূর বায়ু বহে ফুরফুর,
হিয়া দুটি দুরদুর অলস নয়ন;
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন॥
আজি সর্ব্ব বিশ্ব ছাড়া, সর্ব্ব বাধাবন্ধ হারা,
আবেশে মাতাল পারা, এলায়িত তনু,
সংসারের ঝালাপালা, ভুলে সর্ব্বদুখজ্বালা,
সুখরসে পরিপূর কর প্রতি অণু।
কাঁটা যদি রহে ফুলে তার ব্যথা যাও ভুলে,
কাননে কাঙাল করি কর রে চয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুম শয়ন॥
কোটী প্রজাপতি পরে রঙ্গীন পাখার ভরে,
এলাইয়া দাও তনু জ্যোছনার ফেনে,
স্বপনপুরীর দেশে চল সখি চল ভেসে,
লাবণ্য লহরীগুলি নিয়ে যাও টেনে।
পেয়ে অপ্সরীর চুম আসুক মায়ার ঘুম,
পরীর পাখার বায়ু উড়াবে অলক,
নন্দনের গন্ধভারে তিতায়ে চন্দনাসারে
পুলকে দোলনা সম দুলাবে দ্যুলোক।
বকুল মালিকা টুটি', চুলে রবে শির দুটি
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন॥
মরকত তট ছাড়ি, পিয়ে মৃগমদবারি,
আকণ্ঠ ডুবিয়া রবো অমিয়া সায়রে।
কলরবে মাতামাতি করিয়া কাটিবে রাতি
মুখর পাপীয়া পিক উতলা বাসরে।
হেসে হেসে কুটিকুটি পুলকেতে লুটোপুটি
ইন্দ্রধনু গায়ে মোরা পড়িব গড়ায়ে
কাদম্বরী ফেনময় হবে পাত্রবিনিময়,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি দিব মহুয়া ছড়ায়ে।
ত্যজি পৃথিবীর সাজ এস সখি এস আজ
আলোর বসন দিব করিয়া বয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন॥

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রতিভা

২য় বর্ষ | চৈত্র ১৩১৯ | ১২শ সংখ্যা

পৃথিবী ও সৌর রাস

[বিগত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব সত্তর বৎসর বয়সে ধ্যানোপবিষ্ট অবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পরিচিত মহলে কবি, দার্শনিক, এবং পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে। কয়েকটি প্রতিভায় প্রকাশিত হইতেছে, পরে সমস্তই 'স্মৃতি গ্রন্থ' আকারে মুদ্রিত হইবে। কবিতাগুলি অন্ততঃ ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।]

১

দেশ, মহাদেশ, মরু, পর্ব্বত, পাহাড়,
দ্বীপ, উপদ্বীপ, হ্রদ, নদী, পারাবার
পৃষ্ঠদেশে নিয়া তোর
কেন পাড়িয়াছ দৌড়
শূন্যে শূন্যে—মহাশূন্যে, ওরে পাগলিনি!
ক্ষণমাত্র স্থির নাই,
কেবলই ধাওয়া ধাই,
সঙ্গে সঙ্গে ধায় তোর অসংখ্য ভগিনী!
কারো এক, কারো দুই, অষ্ট সহচরী—
অম্বরে অম্বরে কেন মর ঘুরি ঘুরি!

২

কাহার অনন্ত প্রেমে হইয়া মগন
সম বেগে অনিবার করিছ ভ্রমণ!
কাহার হাসিতে হাস,
কেবা সেই স্বপ্রকাশ
অনন্ত হাসিতে ভরা মোহন শ্যামল!
উজ্জ্বল আলোকে যার
ভয়ে ধায় অন্ধকার
গগনের দূরবর্ত্তী গহ্বরে অতল।
জগতের এক চক্ষু কেবা সেই জন,
যাহারে অনন্ত প্রেমে করিছ বেষ্টন?

৩

এই কি সে রাসেশ্বর ব্রজের শ্রীহরি?
প্রেমেতে বিভোর তোরা গোপিকা সুন্দরী?
অক্ষরূপ মঞ্চে চড়ি'
নভোবৃন্দাবন' পরি
অনন্ত রাসেতে সবে হয়েছ মগন।
প্রেমের আলোক-রাশি
পান করি হাসি হাসি
রাসেশ্বরে প্রেমানন্দে করিছ বেষ্টন!
বৃন্দাবন রাসলীলা আজি অবসান—
তোদের এ সৌর রাস নহে সমাধান?

৪

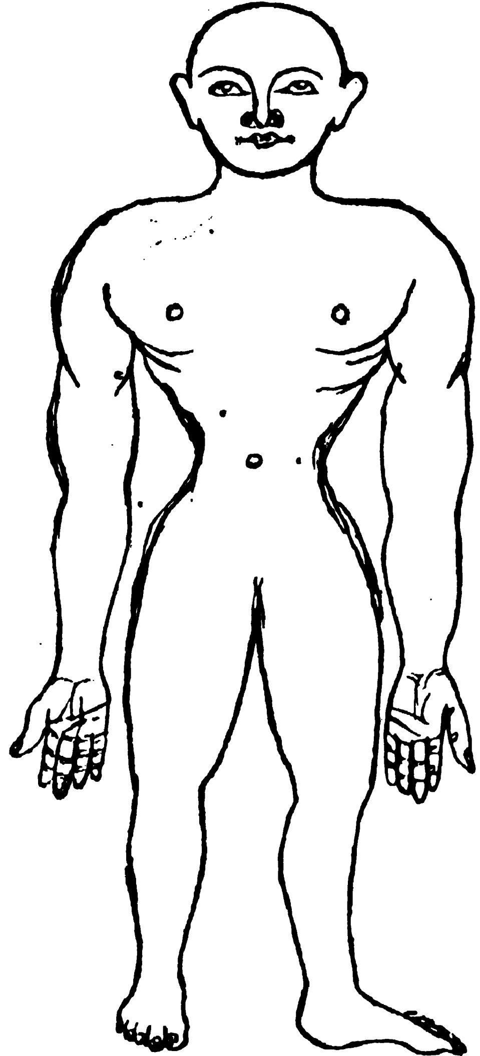
কেন্দ্র-বিপরীত গতি হইলে বারণ
কেন্দ্র-অভিমুখ শক্তি হইলে চালন,
পুনঃ অক্ষ-মঞ্চ ছেড়ে
সবে ছুটাছুটি করে
প্রেমেশ্বর রাসেশ্বরে করিবে রমণ !
পূরণ হইবে আশ –
অর্দ্ধ হাস—পূর্ণ হাস !
প্রেমরাস সাঙ্গে হবে শান্তি সম্মিলন !
এ বিচিত্র এ বহুত্ব হইবে বারণ,
একত্বের পারাবারে হইবে মগন !

৫

আমার সে রাসেশ্বর পূর্ণজ্যোতি হরি
কোথায় রহিল, বল শ্যামাঙ্গী সুন্দরী ?
মায়া মোরে ঘুরাইল
বিপর্য্যয় গতি দিল,
জীবনের কক্ষে মোরে করিল চালন –
জঠরে জঠরে ঘুরি,
হামাগুড়ি—হামাগুড়ি !
চৌরাশী লক্ষেও তার হলো না বারণ !
হায়, কবে অভিমুখ গতিটি পাইব ?
কক্ষ ছেড়ে জীবনের জীবনে পশিব !

৺ব্রজকুমার সেন ।

দীর্ঘায়ুস্তত্ত্ব *



দীর্ঘায়ু মনুষ্যের প্রতিকৃতি ।

পঞ্জিকার মতে কলির আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর। বৈদিক সাহিত্যে "শতায়ুর্বৈ পুরুষ" ইত্যাদি কথা আছে। আয়ুর্বেদীয় নানা গ্রন্থে শতায়ুর প্রশংসাসূচক শ্লোকের সহিত

* চুঁচুড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চমাধিবেশনে পঠিত।

কতকগুলি ঔষধের ফলশ্রুতিতে অমৃতায়ু, অমিতায়ু প্রভৃতির প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা এ সকল কথা গল্পের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। মানুষ রেল গাড়ী, মটর গাড়ী প্রভৃতি চড়িয়া কার্য্য-কালকে যত সংক্ষিপ্ত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়ুষ্কালও তেমনই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। "দশমীং গতঃ" মানুষের অভাব নাই। উহা তাহাদের বয়সের পরিণতিতে নহে, রোগের পরিণতি তাহাদিগকে এই অবস্থায় আনিতেছে।

যত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে মানুষের রোগ তত অধিক ও নূতন আকারে দেখা দিতেছে। দেশে এ অবস্থা নূতন নহে। চরক আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তির ইতিহাসে এই রূপ দুরবস্থার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তখন হিমালয়ের পার্শ্বে ঋষি-সঙ্ঘে (১) এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। আজ সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সর্ব্বরোগহন্ত্রী ও সর্ব্বদুঃখনিবারিণী ভগবতী গঙ্গার পবিত্র তীরে মনীষি-সঙ্ঘে এ বিষয় আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনা—এই একাগ্রতাও যে সেই ঋষি-সঙ্ঘের ধ্যানের ফল প্রসব করিবে তাহা আশা করিতে পারি।

এই দেহকে কেহ গেহ, কেহ পিঞ্জর, কেহ বা বসনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুশ্রুতে ইহার একটি নাম ত্রিস্থূণ। শ্রীমদ্ভাগবতে "ভবাটবীর" "পুরঞ্জনপুর" এই দেহ। ইহা ভাবুকের ভাব হইলেও ইহার উন্নতি ও সংস্কার-সাধনের পরামর্শে অনভিমত ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

দেহ কি রূপ হইলে ভোগবিলাসের অধিকারী হয়, দেহের গঠনোন্নতি দ্বারা কি রূপে মনঃ-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কি রূপ দেহ সুদীর্ঘ সুখায়ুঃ ও হিতায়ুর আধার হইতে পারে, তাহার বর্ণনা আয়ুর্ব্বেদের বহু গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি আজ চরক হইতে একটি অংশ মাত্র দেখাইব।*

(১) চরক প্রথম অধ্যায় সূত্রস্থান।

* প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি অতি বিস্তৃত। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। যাঁহারা এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রবন্ধ-লেখকের এই প্রয়াস। —লেখক।

চরকের মতে দেহের আয়াম অর্থাৎ উচ্চতা স্বীয় অঙ্গুলিমানে চতুরশীতি অঙ্গুল, অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত। (১) এই সার্দ্ধ হস্ত-ত্রয় পরিমিত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ স্ব স্ব প্রমাণ অনুসারে সুগঠিত হইলে, মানব দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। (২)

দেহ ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা—উত্তমাঙ্গ, অন্তরাধি, বাহুদ্বয় ও সক্থিদ্বয়; এইগুলির নাম অঙ্গ এই জন্য দেহের নামান্তর ষড়ঙ্গ।

চরকের মতে অঙ্গাবয়ব-সমূহের স্বাভাবিক প্রমাণ এইরূপ, যথা—

অঙ্গ	উপাঙ্গ	উৎসেধ	আয়াম	বিস্তার	পরিণাহ
সক্থি	পাদ	৪	১৪	৬	—
	জঙ্ঘা	১৮	—	—	১৬
	জানু	৪	—	—	১৬
	উরু	১৬	—	—	৩০
অন্তরাধি	...	...	...	...	...
	বৃষণ	—	৬	—	৮
	শেফঃ	—	৬	—	৫
	ভগ	—	১২	—	—
	কটী	—	—	১৬	—
	বস্তিশিরঃ	১০	—	—	—
	উদর	১২	—	১০	—
	পার্শ্ব	—	১২	১০	—
	স্তনান্তর	—	—	১২	—
	স্তনপর্য্যন্ত	—	—	২	—
	উরঃ	১২	—	২৪	—

(১) (ক) কেবলং পুনঃ শরীরমঙ্গুলি পর্ব্বাণি চতুরশীতিঃ। চরক বিমান ৮

(খ) স্বং স্বং হস্তত্রয়ং সার্দ্ধং বপুঃ। বাভট শারীর ৩

(২) তত্রায়ুর্বলমোজঃ সুখৈশ্বর্য্যং বিত্তমিষ্টাশ্চ পরে ভাবা ভবন্তি আয়ত্তা প্রমাণবতি শরীরে। চরক বিমান ৮

(৩) তত্রায়ং শরীরস্যাঙ্গবিভাগঃ। তদ্ যথা দ্বৌ বাহূ, দ্বে সক্থিনী, শিরোগ্রীবমন্তরাধিরিতি ষড়ঙ্গমঙ্গম্। চরক শরীর ৭ম

অঙ্গ	উপাঙ্গ	উৎসেধ	আয়াম	বিস্তার	পরিণাহ
	হৃদয়	—	—	২	—
	স্কন্ধ	—	৮	—	—
	অংস	—	৬	—	—
	কক্ষ	৮	—	—	—
	ত্রিক	১২	—	—	—
	পৃষ্ঠ	১৮	—	—	—
বাহু	...	...	...	...	...
	প্রবাহু	—	১৬	—	—
	প্রপানি	—	১৫	—	—
	হস্ত	—	১০	—	—
উত্তমাঙ্গ—					
	গ্রীবা	৪	—	—	৩২
	আনন	১২	—	—	২৪
	আস্ত	—	৫	—	—
	চিবুক	৪	—	—	—
	ওষ্ঠ	—	৪	—	—
	কর্ণ	—	৪	—	—
	অক্ষিমধ্য	—	—	৪	—
	নাসিকা	৪	—	—	—
	ললাট	৪	—	—	—
	শিরঃ	১৬	—	—	৩২

(১)

মানব-দেহের যে প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল (২) তাহাতেই দীর্ঘায়ুর পরিচয় পাওয়া গেলেও কখন কখন ইহার গুরু-লাঘব দৃষ্ট হয় এবং এই প্রমাণ গৌরবানুসারে আয়ুষ্কালের পরিমাণেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মস্তক, হনু, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দশন, বদন, স্কন্ধ ও ললাট প্রমাণাতিরিক্ত বড়; অঙ্গুলিপর্ব্ব, সক্‌থি, জিহ্বা, বাহু ও চক্ষু অতিরিক্ত দীর্ঘ; ললাট, কর্ণপীঠ, ভ্রূ, স্তনান্তর ও বক্ষঃস্থল প্রমাণাতিরিক্ত বিস্তীর্ণ; জঙ্ঘা, মেঢ্র ও গ্রীবা হ্রস্ব; নাভি গম্ভীর; স্তনদ্বয় কিঞ্চিদুন্নত ও নিবিড়; কর্ণ মাংসল, বিস্তীর্ণ ও রোমশ; মস্তক পশ্চাদ্‌ভাগে বিস্তীর্ণ; উরুদ্বয়, স্ফিক্‌, কটী, বক্ষঃ, গ্রীবা ও তালু উপচয়সম্পন্ন, এবং পাণি, পাদ, ললাট, কর্ণ ও চুচুক প্রমাণাতিরিক্ত বড় ও উপচয়সম্পন্ন হইলে তাহা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

শরীরে অস্থি-সমূহ সম-সুবিভক্ত, সন্ধি-সমূহ গূঢ় ও সুনিবদ্ধ, পেশী-সমূহ সুনিবিষ্ট, রক্ত সুসংস্থিত, শিরা-স্নায়ু-সমূহ গূঢ় সংস্থিত, এবং ইন্দ্রিয়-সমূহ স্বকার্য্যাকুশল হইলে তাহাও দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীর-ক্ষেত্র উত্তরোত্তর সুগঠিত হইলে তাহা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ। (১).

দীর্ঘায়ুস্তত্ত্ব অতি বিস্তৃত। যাঁহারা এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আমি তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

ভারতীয় সাহিত্যের অধোগতি (২)

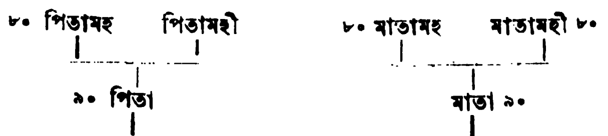
যেই কারণে ভারতীয় সাহিত্য জনসাধারণের শক্তি-পরিচর্য্যা লাভ করে নাই, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাষ দিয়াছি। ব্রাহ্মণাচার বা উন্নত বর্ণের সভ্যতাও সমাজে ব্যাপক হইতে

---

(১) চরক বিমান, ৮ম অধ্যায়।

(২) সুশ্রুতের সহিত এস্থলে বিরোধ দৃষ্ট হয়। বিরোধের মীমাংসা আছে। অতি বিস্তৃত বলিয়া তাহা পরিহার করা হইল। লেখক।

(১) সুশ্রুত সূত্রস্থান। সুশ্রুতের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা কেহ কেহ অন্যরূপ করেন। যে ব্যক্তির ক্ষেত্র (কুল) উত্তরোত্তর দীর্ঘায়ু পুরুষ দ্বারা অলঙ্কৃত তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। এইটি এইরূপ হইতে পারে :-



হরিদাসের আয়ু কি রূপ হইতে পারে এই রূপ বিচারে পুর্ব্বোক্ত মতে হরিদাসের আয়ুষ্কাল ৯০ অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত।

পারে নাই। এই জাতির ধর্ম্ম-আদর্শ তাহার সমাজ-আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে কবলিত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল এবং এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নির্জ্জিত করিয়াছিল। ইতিহাস ভারতীয় সাহিত্য বা সমাজের যাহা কিছু স্মরণযোগ্য বস্তু লিপি করিতেছে তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ প্রভাব এবং বৌদ্ধ-সঙ্ঘর্ষের সম্পত্তি। বৌদ্ধ নিরাসের অব্যবহিত পরকালেই ভারতে মুসলমানের আবির্ভাব: এই জাতি নিশ্বাস ফিরাইতেও পারে নাই। বৌদ্ধ আদর্শকে নিরস্ত বা কবলিত করিতে যাইয়া, তাহার সমাজ-ধর্ম্ম যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দিয়াছিল, উহার অনুধাবন করিলেই দেখিব, তাহার সাহিত্য বা সমাজ উভয়ের অধোগতিটাই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই জাতি-ভেদ এবং স্ত্রী-জাতির অধীনতা; এবং উহাদের হইতেই হিন্দুর অপর সমস্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত! তাহার সমাজ-ধর্ম্মের যাবতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি চিন্তা করিলেই দেখিব, তাহার পক্ষে আটঘাট বন্ধ করিয়া বা স্থিতিবান হইয়া আত্মরক্ষা করা যেমন অনায়াসসাধ্য, তেমন তাহার সাহিত্যের অধোগতি বা রাষ্ট্রশক্তির অধঃপতনও অপরিহার্য্য ছিল। পুরাণাদির স্থানে স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই এই সমাজের প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি তাহার ভবিষ্য ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা নিঃসংশয়ে পাঠ করিতে পারিতেন। এই সমাজ যে ক্রমে সংকর বর্ণে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, জাতি-ভেদের মনু-প্রোক্ত আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং নির্দ্দিষ্ট জাতি-ধর্ম্ম সমস্তই যে (দৃষ্টতঃ এবং অধ্যাত্মতঃ) উৎসন্ন হইয়া যাইবে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য বিশেষ কারিগরীর দরকার ছিল না। গতিশীল জগৎ-তত্ত্ব, অনন্তশক্তিমান্ এবং স্বাতন্ত্র্যবিলাসী মনুষ্য-আত্মা! এই দুই পদার্থের সমক্ষে স্থিতিবান্ সমাজ-আদর্শ মাত্রকেই পদে পদে লঘুতা অনুভব করিতে হয়! মনুসংহিতা, অপিচ সমস্ত সংহিতা-গ্রন্থগুলিই একটা বিশেষ স্থিতি-আদর্শে বিরচিত। এই বিশেষ তন্ত্রের ব্যভিচার নিরস্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ জাতির প্রাণপণ চেষ্টাটাই উহাদের প্রতিপত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে! মনুসংহিতা রচনার সময়েই ভারতীয় সমাজের স্থিতি-সমস্যা দুশ্চিকিৎস্য আকার ধারণ করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, দেখা যায়।

ভারতীয় সমাজের বিশেষ অবস্থার ফলেই তাহার সাহিত্য-ভাষা ক্রমে জনসাধারণের কথিত ভাষা হইতে দূর-দূরবর্ত্তী হইয়া 'পণ্ডিত ভাষায়' পরিণতি লাভ করে—'সংস্কৃত' আখ্যা লাভ করে। এই 'সংস্কৃত' আদর্শ ক্রমে তাহার সাহিত্যেও যে কি অপরূপ ফল প্রসব করিয়াছে, নাট্য-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উহা প্রতীয়মান হইবে। সাধারণ ব্যক্তিগণ, এমন কি সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীগণ এক ভাষায় কথা কহিতেছে, আর উন্নত বর্ণের পুরুষগণ সংস্কৃত ভাষাতেই তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন, এই অপরূপ প্রণালী সমাজের কোন আদর্শে এবং কোন অবস্থায় অভিনন্দিত কিংবা সমর্থিত হইতে পারে? কেবল এই স্থানেই শেষ নহে। উপরিস্থগণ ক্রমে এমন একটা পাতি উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। নাটকের পাত্রগণ কে কোন জাতীয় হইবে, কাহার চরিত্রে কোন লক্ষণ প্রবল করিতে হইবে, প্রকারান্তরে কে কেমন করিয়া চলিবে, বসিবে, খাইবে, ইত্যাদি সমস্তকেই শাস্ত্র-সংহিতার অষ্টপাশবদ্ধ করিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চলিয়াছিল! সমাজ-সমস্যা সাহিত্য-লোকেও প্রসারিত হইয়া মনুষ্যের মনটাকেও ক্রমে সবল স্থিতিআদর্শাপন্ন করিয়াছিল। সাহিত্য শাস্ত্রকারগণের অনুজ্ঞা মানিয়া চলিলে, প্রত্যেক সংস্কৃত নাটকে অন্ততঃ আটটি ভাষার কোলাহল সৃজন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাত্রগণের কেহ মাগধী, কেহ অর্দ্ধমাগধী, কেহ শৌরসেনী ব্যবহার না করিলে রচনাটাকেই জাতিভ্রষ্ট এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। এই রূপে জাতি-ভেদবন্ধনের আদর্শে সাহিত্যরাজ্যও শাসিত হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুবিষয়কে, দর্শন, কর্ম্মশাস্ত্র, শারীর শাস্ত্র, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নিসর্গ-বিজ্ঞান সমস্তকেই এই ভেদ-বাদের আমলে আনিয়াই চিন্তা করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতে মুসলমান

পরিচয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ বিশেষ বিরুদ্ধবাদ বা সংশয়-তর্ক পর্য্যন্ত উপাপিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। সকলে যেন বিনা তর্কেই এই ভেদবাদ গ্রহণ করিয়াছে; অন্ততঃ, সাহিত্যতটে উহার বিরুদ্ধে মনুষ্য-মনের কোন তরঙ্গ আঘাত-রেখা অঙ্কিত করিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ এই রূপে খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বে পাণিনীয় সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে; দশম শতাব্দীর পর হইতে অলংকার শাস্ত্রের নাগপাশ পূর্ণপ্রকট হইয়া মনুষ্য-মনের শেষ স্বাতন্ত্র্য-রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলে। এই শাস্ত্র-দৃষ্টান্ত এবং তাহার ফল সাহিত্য-সংসারে সকল দিকেই তুলনাহীন। ইহার পর কাব্যসাহিত্যের, বিশেষতঃ নাটকের কোন গতি হইতে পারে? ভাষার কি দশা হইতে পারে? ফলে নাট্যকলা পঞ্চত্ব লাভ করে। 'নাছোড় বান্দা' কবিগুলা তবুও কলম ছাড়েন নাই। তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারতের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন। তবে, এই ক্ষেত্রেও সংহিতাকারের হস্তে পরিত্রাণ পান নাই। মহাকাব্য কিরূপ হইবে, তাহার মধ্যে কয়টা সর্গ-সন্ধির আবশ্যক, তাহার নায়ক-নায়িকার কোন জাতি, ব্যবসায়, বা গুণ থাকা শাস্ত্রসঙ্গত? বলা বাহুল্য, এই সমস্ত শাস্ত্রকে তুচ্ছ করা কাহারও ইচ্ছা কিংবা ক্ষমতায় ছিল না। কালিদাস ভবভূতিকে পর্য্যন্ত অলংকার শাস্ত্রের ফাঁফড়ে পড়িয়া নানাদিকে সঙ্কুচিত ভাবে চলিতে হইয়াছে। অশ্বঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, ভারবি,মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি মহাকাব্য রচয়িতার শিল্পপ্রকৃতি চিন্তা করিলেই দেখিবেন, এই শাস্ত্রবন্ধনের সূত্র কিরূপ ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়া অবশেষে কবিগণের গলা টিপিয়া দিয়াছে! কাব্য এবং কবিত্ব কিরূপ বৈচিত্র্যহীন হইয়া মৌলিকতা এবং প্রাণ-শক্তি হারাইয়া, একঘেয়ে এবং অচল হইয়া গিয়াছে? ক্রমে কেবল ভাষার দিকে, ছন্দের দিকে এবং অলংকারের কূটকাটব্যের দিকেই নিরুপায় সরস্বতীপুত্রের হৃদয় আবদ্ধ হইয়া পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য,সমস্তের মধ্যেই ক্রমে যেন একটা অভিশাপ-পরিণতি এবং 'অহল্যা পাষাণী' জাতীয় অচল স্থিতিই লক্ষ্য করিবেন। দেশের প্রকৃত জীবনাবস্থা বা সময়-গতির দিকে ক্রমে সকলের দৃষ্টিই অবরুদ্ধ হইয়া যায়; পূর্ব্ব-পুরুষগণের নেমিবৃত্তিতাই মাহাত্ম্যের একমাত্র লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। প্রকৃতের প্রতি দৃষ্টি কিংবা সহানুভূতি রহিত হইয়া গিয়া কেবল দূরগত অতীতের বিশেষ বিশেষ আদর্শই একান্ত ভাবে পূজা লাভ করিতে থাকে! প্রাচীন নর-সমাজ কিংবা সাহিত্যমাত্রের ইহা একটা সাধারণ দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ভুল হয় না যে, কেহই প্রকৃতের প্রতি সজ্ঞানে আস্থা প্রকাশ করিতে চাহে নাই। 'প্রাকৃত' শব্দটি যেন ঘৃণাবাচক। প্রাকৃতের মধ্যে যে অপরূপ রসালতা বা আধ্যাত্মিকতা আছে, সাধারণ-তার অভ্যন্তরেই যে অসাধারণ মাহাত্ম্য-বীজ সুপ্ত রহিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধির সতর্ক অনুসরণটুকু আধুনিক মনুষ্য-সভ্যতার একটা প্রধান প্রাপ্তি।

মনুষ্য-সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, তাহার বিরাট পুরুষ—তাহার সহস্রশীর্ষা পুরুষ—তাহার সাধারণ। মনুষ্যের সর্ব্বত্র এই 'সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ এবং সহস্র-পাদ' পুরুষের অচিন্ত্য শক্তি-লীলাই উপলব্ধি করিতেছি! উঁহাকে বিশ্ব-মানব, সর্ব্বপুরুষ, পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, যাহা বলিতে হয় বলুন। ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে এই বিরাট পুরুষের শক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং উহা হইতে মহাপ্রাণতা সিদ্ধি করিয়াই, জগতে মহাজাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্রমে এই বিরাট পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের চতুর্ব্বর্ণ আদর্শের উৎপত্তি হইলেও, ভারতবর্ষ এত কাল উহার বিরুদ্ধ-নীতি-সমক্ষেও অন্তর্জ্জাতিক জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। সাধারণের ধমনী-মধ্যে আর্য্য-রক্তের উত্তাপ ছিল বলিয়া, সাধারণের হৃদয়-মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধি চিরকাল প্রবল বলিয়া— উহা চিরকাল 'প্রাক্‌টিকেল' বলিয়াই রক্ষা ছিল! উপরিস্থ-গণের কিংবা বিশেষ আদর্শবাদী পরিচালকগণের শত শত বিরুদ্ধ মত কিংবা বক্তৃতা শুনিয়াও এই সাধারণ সহসা 'গা-নাড়া' দেয় না বলিয়াই রক্ষা! আমরা দেখিব, এই রক্ষা

গতিকেই ভারতবর্ষ প্রচুর জীবন-বিরোধী মতবাদ-সমক্ষেও জীবন রক্ষা করিয়াছে ; অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং পরীক্ষার স্থলেও জয়ী হইয়া আসিয়াছে। আরও দেখিব যে, এই রক্ষা-গতিকেই ভারতবর্ষ তাহার ধর্ম্মাধিকৃত সমাজ-আদর্শ, উহার প্রবল ভেদবাদ, বহুব্যাপক দুঃখবাদ বা বৈরাগ্যবাদ সমক্ষেও প্রকৃত সমাজ-শক্তির কিংবা সাহিত্যের মাহাত্ম্যও অন্ততঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত সজীব রাখিতে পারিয়াছিল। বেদ কিংবা উপনিষদ্ যুগের, পৌরাণিক কিংবা বৌদ্ধ-সংঘর্ষের ভারতবর্ষ এই কারণেই (তাহার বিরাট সাধারণের সজীব সবলতা গতিকেই) জগতে নিজের মাহাত্ম্য-মুদ্রা রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে ; সমস্ত আসিয়া খণ্ডে এবং ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যন্ত নিজের সভ্যতা-অধিকার বিস্তার করিয়াছে। সমাজ বা ধর্ম্ম বিষয়ে কোনরূপ একরোখা মতবাদ, 'থিওরী' কিংবা বিমানচারী দার্শনিকতা এই মাহাত্ম্যের মূলে নাই। ইহার প্রধান কর্ত্তা বিরাট সাধারণের জীবন-শক্তি ; তাহার সবল বলিষ্ঠ এবং জগৎ-গতি বিষয়ে অভ্রান্ত বিশ্বাসী হৃদয় ! দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বিরাট হৃদয়ের এই মাহাত্ম্য অটুট ছিল ! উহার পর হইতেই যেন তাহার হৃদয়-শক্তির অসদ্ব্যয়, এবং প্রবলতর সমাজ-আদর্শ-সমক্ষে তাহার নিজের ভাব এবং পরাজয় ধারণা করিতে হয়। ঐ সময় হইতে তাহার সাহিত্যেও নির্জ্জীবতার সূত্রপাত !

এই অধোগতির কারণ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে স্থির জানিতে হইবে—সেই বিরাট পুরুষের একক সত্তা বা অভগ্ন এবং অবিভক্ত মূর্ত্তিই চিরকাল মনুষ্য-সভ্যতার উপাস্য—তাহার ধর্ম্ম সমাজ বা সাহিত্য আদর্শের প্রধান সাধনীয় ! এই উপাসনা মধ্যেই নর-সমাজের প্রকৃত জীবন-তত্ত্বটুকু নিহিত। মনুষ্যের অধ্যাত্মলোকে শয়তান আছে—জীবিত এবং জাগ্রত মনুষ্যমাত্রকে—জাতিমাত্রকে এই শয়তান মাড়াইয়া চলিতে হয় ! এই শয়তান চিরকাল 'একত্ব' বুদ্ধিকে খণ্ড করিতে—বিচ্ছিন্ন করিতে চায় ; মনুষ্যের অহং-তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং স্বার্থকে উস্কাইয়া দিয়া জীবনের সকল দিকেই চিরকাল ভেদবাদ প্রবল করিতে চায়। এই শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হওয়াটাই জীবন—যেমনই ব্যক্তির, তেমনই জাতির। জগতের সকল সমাজ প্রাচীন কালে এই ভেদ-পরিণতি এবং উহার ফল হইতেই নিজের পাপ এবং আত্ম-যাতনা ভোগ করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্যের অন্তর্জাত এই ভেদ-বিকারের নিরাস বা উহার যথাযথ ব্যবহারই মনুষ্য-সমাজের চিরকালীয় সমস্যা। উহার নিরাসেই একাগ্র না হইয়া, বরঞ্চ সন্ধি স্থাপন করিতে বা উহার পরিপোষণে তৎপর হওয়াতেই ভারতীয় সমাজ কালে সমস্ত খোয়াইয়াছে। সমাজ-দার্শনিকগণ বলেন, মনুষ্য-মাত্রেরই সাধারণ পাপতত্ত্ব এই ভেদ-বাদ ! মানুষ অহং-মুখ বা অহং-ভাবুক বলিয়াই এই ভেদগতি স্বাভাবিক। সমাজকে নিয়ত সচেতন থাকিয়াই উহার বিরুদ্ধ ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় ; সামঞ্জস্যকেই স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। ভেদকে কদাচ স্বীকার করিতে নাই—উহা মনুষ্য-সভ্যতার শয়তান। ক্রিয়া-মূলে এই স্বীকার বা অস্বীকারের মধ্যেই সমস্ত সমাজের প্রধান পাপ-পুণ্য নিদান নিহিত। প্রাচীনগণের সমক্ষে এই তত্ত্ব প্রবল ভাবে প্রকট হইতে পারে নাই। ইসলাম-পরিচয়ের পূর্ব্বে ভারত-জাতির পক্ষে এই দিকে দৃষ্টি করার আবশ্যক বা অবকাশও ঘটে নাই। তাহার সমাজ এই বিরাটকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিল, রোগটাকেই সনাতন তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া বসিল, কেবল মুখটাকেই মুখ্যভাবে লক্ষ্য রাখিল ! 'পুরুষ তত্ত্বের' সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম পদার্থ—তাহার 'একত্বের' দিকে—সাধারণত্বের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চাহে নাই। মুখ, বাহু, উদর, জঙ্ঘা প্রভৃতি সমস্তই দেহ পদার্থের বাহ্যিক অবয়বভেদ ! অধ্যাত্ম ভাবে উহাদের ক্রিয়া কিংবা প্রকৃতি ভেদ থাকিলেও, উহাদিগকে কদাপি 'একত্ব' হইতে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে নাই। এই ভেদকে বাহ্য আকারে নির্দ্দিষ্ট করিতে কিংবা জন্মজাতিগত আদর্শে স্থির পরিচিহ্নিত করিতে চাহিলে যে ভুল হয়, সমাজের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা ভয়াবহ আর কিছুই হইতে পারে না। উহা প্রবল স্রোতের অনুকূলে হাল ছাড়িয়া দেওয়া। একটুকু বিমনস্ক হইলে উহাতেই সমস্ত জাতির রক্তাধার-মধ্যে—প্রাণাধার-মধ্যে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন

করিয়া অনিবার্য্যভাবে মৃত্যু উপস্থিত করিতে পারে। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল সমনস্ক থাকিতে পারে নাই—মনুসংহিতার সময়েই তাহার বিশেষ তন্ত্রীয় সমাজ-বক্ষে যক্ষ্মা-লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অবস্থাচক্রে পড়িয়া তাহাকে চিরকাল ভেদ এবং বিচ্ছিন্নতাকেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া, উহাকেই জীবন-তত্ত্ব রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া আসিতে হইয়াছে। যে ঋষি আদিকালে বিরাট পুরুষের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, জাতীয় শক্তি-আদর্শের 'অর্থবাদ' স্বরূপেই পুরুষ সূক্তের বিখ্যাত ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন, সমাজতন্ত্র মধ্যে ভেদকে পরিপোষণের অথবা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন বলিয়া কোন মতেই মনে হয় না,—'বিরাট পুরুষ' শব্দই তাহার বিপরীত সঙ্কেত করিতেছে। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, ভারতের জাতীয় জীবন যেমন তাহার সমাজ-তন্ত্রের ভেদবাদফলেই ক্রমে অচল এবং নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে, তাহার সাহিত্যেও বিশেষভাবে এই 'একতার' তত্ত্বকে বা সাধারণের মাহাত্ম্যকে লক্ষ্যচ্যুত করিয়াই মৃত হইয়াছে। এই ভেদকে প্রাচীন কাল হইতে অধ্যাত্ম আদর্শে বা 'পারলৌকিক ক্ষেম' আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 'ইহ'-পক্ষীয় যাবতীয় সংশয় জিজ্ঞাসা বা তর্কবিতর্কের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য, অপর সমস্ত বিবেচনা বিচারকে পেষিয়া ফেলিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চলিয়াছিল! ইতিহাস সাক্ষী, এই চেষ্টাই জয়ী হইয়াছে। এখন এই দেশে এই ভেদ-বাদের বিপক্ষে কোন রূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই মহাপাপের ন্যায় নিন্দিত! 'ইহলোক' পক্ষের যাবতীয় অস্বস্তি, অসুবিধা কিংবা দুঃখ, সমাজ-পক্ষের যাবতীয় প্রশ্নতর্ক, সমস্তই এই অধ্যাত্ম-আদর্শ এবং পরলোক আদর্শের বোলচালেই নিষ্পিষ্ট হইতেছে। প্রাকৃত দৃষ্টিটুকু এতদূর বিপরীনত হইয়া গিয়াছে, সাধারণের সহজ বুদ্ধিটাও উক্ত বিশেষ আদর্শে এতদূর নিজ্জিত হইয়া গিয়াছে যে, এই ভেদযন্ত্রে পতিত হইয়া যাহারা সমাজ-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিষ্পেষিত, তাহারাই প্রশ্নকর্ত্তার বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে লাঠি তুলিবে! সাম্যবাদীর মুখে তাহারাই অগ্রগামী হইয়া থুথু প্রদান করিবে! এখন দেখুন, কোন একটা বিশেষ আদর্শের কি পরিমাণ অনুসরণ সমর্থনা এবং প্রবর্ত্তনা হইতে সাধারণ নামক প্রকাণ্ড পদার্থটি তাহার সহজ সাম্য বুদ্ধি বা প্রাকৃত বুদ্ধি বিস্মিত হইয়া অস্তমতি হইয়া পড়িতে পারে! ফলেও, বৌদ্ধ আদর্শের বিপক্ষে পৌরাণিক কিংবা নব-অভ্যুদিত হিন্দু আদর্শের বিরুদ্ধ চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্তভাবে এবং পরিব্যাপ্ত ভাবেই চলিয়াছিল! নগর হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম গোত্র পরিবারে এবং প্রত্যেক জনে জনে প্রভাব বিস্তার করিয়াই এই প্রকার কার্য্যকে জয়ী হইতে হইয়াছে। সমাজের উপরিস্থগণের প্রত্যেকের সামাজিক স্বার্থে ন্যূনাধিক ইন্ধন যোগাইয়াই তাঁহাদের সমর্থনা লাভ করিতে হইয়াছিল। উহার ফলে হিন্দু ভারতবর্ষের নগরাদি হইতে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামেই এক শ্রেণীর বা উচ্চ উচ্চতর শ্রেণীর লোকগণ নিম্ন নিম্নতর শ্রেণীর উপরে সমাজ এবং ধর্ম্ম আচার বিষয়ে স্বতোনিযুক্ত শাসক এবং পাহাড়াদার হইয়া যান। এইরূপেই জাতিভেদ সমাজের উপরিস্থগণ হইতে, হয়ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি হইতেই প্রবল শক্তি-সমর্থনা লাভ করিয়া ক্রমে ভারতের ইতর সাধরণের অন্তর্জগৎ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রাজাধিষ্ঠিত না হইয়াও অথবা সম্পূর্ণরূপে অরাজকতার মধ্যেও উহা আত্মরক্ষা করিয়া বরং আত্মপ্রসার করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজত্বের বা হিন্দু রাজত্বের অবসান হইলেও সেই ভেদবাদই বরং উত্তরোত্তর বলী হইয়া সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকেই মুখ্য জানিয়া চলিয়া আসিয়াছে, উহার গতিকেই, দেখিবেন, অন্ততঃ নয় শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ আদর্শ নির্ব্বাপিত, ধর্ম্মে সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে 'সাধারণ' নামক আদর্শতত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ব্বাসিত! সমস্তই একটা ভেদ আদর্শে কেবল "বিশেষ" আদর্শেই নিয়ন্ত্রিত!

প্রাচীন তন্ত্রের আর্য্য আদর্শের সহিত বৌদ্ধ আদর্শের পার্থক্য স্থানে স্থানে চিন্তা করিয়া আসিয়াছি, এই স্থলে ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল মোটামুটি ধারণা করিব। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘন ফল, ইষ্ট অথবা পৈত্র্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে দেব-পূজা কিংবা যাগযজ্ঞাদির তাবৎ ফলবত্তার অস্বীকার; নীতি কেই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উপায়-সাধন বলিয়া বরণ।

সমাজ তন্ত্র বিষয়ে বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল, উপাসকগণের মধ্যে স্বত্ব স্বার্থ বিষয়ে অভেদবাদ; পৌরোহিত্য সম্পর্কেও জন্মজাতিগত ভেদ আদর্শের সম্পূর্ণ পরিহার; ফলতঃ নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন। এই সমস্তই মূল বৈদিক আদর্শের—উহার সম্প্রদায় তন্ত্রের কিংবা ভেদনীতির পরম-বিপরীতপন্থী বলিয়াই ধারণা হইবে; ফলতঃ, এই দুই আদর্শই প্রবল থাকিয়া হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্য সমাজের মধ্যে উহার স্বাস্থ্য এবং সমতা রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারত-জাতির প্রধান মাহাত্ম্যটাই এই খানে। এই আদর্শদ্বয়ের সজীব সংঘর্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার গতিকেই সে কালের ভারতবর্ষ কোন দিকে অতিরিক্ততার বশবর্ত্তী হইতে অথবা চরমপন্থী হইতে পারে নাই। সমগ্রজাতির আত্মিক শক্তি-সামর্থ্য কিংবা সাধারণের অভিগতি কোন দিকে একরোখা হইতে কিংবা কলুষিত হইতে পারে নাই।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ আদর্শের ঘনফল যে সর্ব্বত্র অতিনৈতিক বা পৌরাণিক আদর্শের পরিহার পূর্ব্বক যথা-সম্ভব 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের অনুসরণেই পরিশিষ্ট হইয়াছিল, ভারতীয় সাহিত্যে অতুলনীয় ভাবে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিল, ভাষার বিষয়েও 'সংস্কৃত' আদর্শের পরিহারে সম্পূর্ণ প্রাকৃতের অনুসরণই দেশের হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছিল পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রসঙ্গে তাহা মোটামুটি চিত্রিত হইয়াছে।

এখন, বৌদ্ধ আদর্শ বলিতে, কেবল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর শাক্যকেশরী কর্ত্তৃক প্রজ্জ্বলিত প্রবল বেদ-দ্রোহ বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। এই বৌদ্ধ আদর্শ ভারতের মৃত্তিকায় বৈদিক আদর্শের মতনই 'অনাদি'। বেদেও যে স্থলে বৌদ্ধের উল্লেখ আছে, যাঁহারা বেদের অপৌরুষেয় মাহাত্ম্য মানিতেন না, প্রাচীন আর্য্যসমাজের দেব-পিতৃ-পূজা কিংবা বেদাচার পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করিতেন না, বরঞ্চ বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক এবং সংশয়ের আশ্রয় করিয়াই চলিতেন, তাহারা তৎকালে বুদ্ধি-বাদী বা বৌদ্ধ বলিয়া নিন্দিত। সুতরাং বৌদ্ধ আদর্শ এক দিকে যেমন প্রাকৃত-বাদ বা সাধারণবাদ বই নহে, তেমনি অন্যদিকে উহাই মনুষ্য-মনে প্রথম 'বিজ্ঞান' আদর্শের সূত্রপাত। ভারতবর্ষের বেদ মনুষ্যগণের এবং তাহার ধর্ম্মভাবে প্রথম জাগরণ হইতে বরণ উপলব্ধির ইতিবৃত্ত পর্য্যন্তই ধারণ করিতেছে। আদিম ভয়বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস হইতে পূজা-প্রার্থনা, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ডের সকল ক্রম-পদবী উহার মধ্যে পরম সতর্কভাবে রক্ষিত। মনুষ্য-হৃদয়ের আদিম বিজ্ঞান জাগরণ হইতেই ভারতে জ্ঞানকাণ্ডের, উপনিষদের তথা বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত। শাক্যসিংহ স্বয়ং এই প্রাচীন বিজ্ঞান-গতির ঘনফল বই নহেন। প্রাচীন বৈদিক আদর্শ এই বৌদ্ধকে নিন্দা না করিয়া পারিত না, তেমন বৌদ্ধেরাও বৈদিক দেব-কৃত কর্ম্মের বিপক্ষবাদী না হইয়া পারেন নাই। সত্যজিজ্ঞাসু প্রাকৃত-পিপাসু মনুষ্য-হৃদয় ক্রমবিকাশে জাগরিত হইয়াই পূর্ব্ব-পরম্পর, প্রাচীনতম সেই ইষ্ট তন্ত্রের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ আদর্শের বিরোধ উত্থাপিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ আদর্শের মূলভিত্তি নিতান্ত প্রাকৃত, নিতান্ত লোকায়ত, উহার মধ্যে হয়ত কিছুমাত্র ভাবুকতা নাই; উহা হয়ত নিতান্ত জড়বাদী, স্থূলমতি, উহা অত্যন্ত সাধারণ; অন্যদিকে উহা হইতেই ভারতীয় মৃত্তিকায় যাবতীয় বিজ্ঞান দর্শনের উন্নতি। আবার, উহার বিকাশ হইতেই যে ভারতে মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ, দুঃখবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি প্রবল সমর্থনা লাভ করিয়াছে, প্রাচীন চতুরাশ্রম আদর্শকে অবসন্ন করিয়া একান্ত সন্ন্যাস আরণ্যকজীবনী এবং জ্ঞান-মার্গের আদর্শই সাধারণের চক্ষে পূজ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই বৌদ্ধ আদর্শের বিজয় বা নিরসন হইতে বা উহার সহিত বেমালুম রফারফি হইতেই ভারতের ধর্ম্মে, সমাজে যাবতীয় বিশেষতন্ত্রতা জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা এবং নানা 'বিরুদ্ধ' সেবা অত্যাহিত হইয়া পরকালে 'সাধারণ' শক্তির বা জাতীয় শক্তির মর্ম্মান্তিক অধঃপাত সাধনে মুসলমান বিজয়টা পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছে; এই সিদ্ধান্ত জোরের সহিত নির্দ্দেশ করিলেও ভুল হইবে না।

যাহা হউক, এই বৌদ্ধ-নামক আদর্শের প্রবল প্রাকৃত ভাব এবং সংশয় পরিচালিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি হইতেই

ভারতীয় সাহিত্যের, সমাজের এবং বিজ্ঞান দর্শনের যাবতীয় উন্নতি! স্মরণাতীত কালের কুক্ষি-গহ্বর হইতেই এই উন্নতিসূত্র অনুসরণ করিতে পারি। বলা বাহুল্য, 'বৌদ্ধ' বলিতে প্রাচীন ঋষি উপাধির অনেকানেক ব্যক্তিও আসিয়া পড়েন ; উপনিষদ্ বা আরণ্যকতন্ত্রের অনেক নামনির্দ্দেশহীন ঋষি বেদের কর্ম্মকাণ্ড বিরোধী ঋষি (১) এবং স্বয়ং কপিল, কণাদ এবং গৌতম প্রভৃতি নানাদিক হইতে এই শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারেন। বৃহস্পতি বা চার্ব্বাকের ত কথাই নাই (২)। মহাভারতে চার্ব্বাক রাক্ষস বলিয়া নিন্দিত ; এবং চার্ব্বাক মতাবলম্বী কোন সাহসী পুরুষ যুধিষ্ঠিরের সভায় ব্রাহ্মণগণের নেত্রানলে দগ্ধ হইয়াছেন। প্রকৃত চার্ব্বাক-দর্শন লুপ্ত ; ব্রাহ্মণ্য আদর্শ বঙ্গীয় পক্ষ হইতে চার্ব্বাক দর্শনের যে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম আমাদের হাতে আসিয়াছে, উহার সাহায্যে চার্ব্বাককে কেবল প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদী বলিয়াই বুঝিতে পারি। চার্ব্বাককে একরূপ দুর্নীতিপরায়ণ করিয়াই উপস্থিত করা হইয়াছে ; অধিকন্তু, এই চার্ব্বাক-মতই সবিশেষে লোকায়ত মত বলিয়া নিন্দিত। 'লোকায়ত' কথার দ্বারাই বুঝিতে পারি, এক কালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের মধ্যে, তাহার সাধারণের মধ্যে এই মত পরিব্যাপ্ত ভাবেই প্রচলিত ছিল। হওয়ারই কথা ; উহা প্রাকৃত মত কেবল "প্রাকৃটি-কেল।" উহার মধ্যে কোন বিশেষতন্ত্রীয় অধ্যাত্ম আদর্শ নাই ; উহা বৈদিক আদর্শের ঋষিত্ব, পৌরোহিত্য, দেব-পিতৃ-পূজা কিংবা আচার অনুষ্ঠানের প্রবল বিরোধী পক্ষ! এই সাধারণকে পথে আনিতে গিয়া চিরকাল বেদ-বাদীগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে! শিক্ষা, দীক্ষা, প্রচার যুক্তি-প্রয়োগ এবং বল-প্রয়োগ, কোনটাই উপেক্ষিত হয় নাই! যজ্ঞ-হিংসকগণের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা বেদের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে! এই শ্রেণীর মধ্যে যেমন আদিম 'আব্র', অনার্য্য বা দ্রাবিড় জাতি, তেমন বৌদ্ধগণও আছেন! এমন কি শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব পুরাণের অনেক 'দেব-যুদ্ধ' পরিচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধগণকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া ধারণা হইতে থাকে! বেদের এই পৌরোহিত্য-নিষ্ঠ 'কর্ম্ম'-ধর্ম্ম পদ্ধতি আদিম আর্য্য জাতির বিশেষ আদর্শীয় পৈত্র্যতন্ত্র গোত্র-প্রথা এবং গ্রাম-সমাজের প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছিল! ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উহা একদিকে যেমন অনার্য্য-সংঘ হইতে অন্যদিকে তেমনই 'ঘরের ঢেঁকি' হইতেও চিরকাল উদ্বেগ ভোগ করিয়া আসিয়াছে। উহার প্রতি আস্থাবান হইতে গেলে একটা বিশেষ শিক্ষা-সভ্যতা, ভাবুকতা এবং নির্ভরের আবশ্যক ছিল।

এই প্রাচীন বৌদ্ধ-সন্ততি সূত্রেই ক্ষত্রিয় ঋষি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ; এবং এই আবির্ভাবের প্রকট ফলই আমরা ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদিম বৌদ্ধ আদর্শের এই প্রাকৃত বুদ্ধিকে দেশ, কাল, পরিবেশের বিচার পূর্ব্বক দুর্নীতি হইতে সংযত করিয়া উন্নত অধ্যাত্ম আদর্শে পরিচালিত করাই দেশে দেশে মনুষ্যসভ্যতার ভিত্তি। বলিতে গেলে, মনুষ্যের পক্ষে কোন দিকে দীর্ঘকাল সমুচিত ভাবে রাশ টানাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ; উহাই আত্মকাণ্ডারী মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। কারণ অধ্যাত্ম আদর্শ অতিরিক্ত হইয়াও গর্হিত হইতে পারে ; মানুষ উহার ফেরে পড়িয়া চরমপন্থিতার বশে মানব-জীবনের সাচ্চা জড়-ভিত্তিটুকুই বিস্মৃত হইয়া 'অত্যাচারী' হইতে পারে ; পদে পদে আত্ম-বঞ্চক এবং মিথ্যাচার হইয়া,ভণ্ডতা বকধর্ম্মিতা এবং "লেফাপা দুরস্ত" রাখার আদর্শেই অতর্কিতে মজিতে পারে। অন্যদিকে প্রাকৃত আদর্শও অতিরিক্ত হইয়া মনুষ্যকে পশুত্বে বিপরিণত করিতে পারে ; আদ্য, বর্ব্বর কিংবা ফিলিষ্টাইন করিয়াও তুলিতে পারে। "সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং" ইহা দার্শনিকের উক্তি। অতিপ্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের মধ্যপথে প্রকৃত নামক পদার্থটাকে আগলাইয়া ধরাটাই শক্ত। বৌদ্ধ মত যেমন ভারতের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছিল ; তেমন এই বৌদ্ধ ধর্ম্মই ক্রমে বৌদ্ধসংঘের শত সতর্কতা সত্ত্বেও—পৌরাণিকতা এবং তান্ত্রিকতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মহারা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। গুপ্তধর্ম্মা, গুপ্ত আদর্শবাদী এবং গুপ্তআচারী হইয়া অসামাজিক এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া

(১) যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডকে 'অপরা' বিদ্যা বলিয়া খ্যাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

(২) অনেকের মত সুরগুরু বৃহস্পতিই চার্ব্বাক দর্শনের প্রণেতা।

পড়িয়াছিল; মায়াবাদ এবং শূন্যবাদ প্রভৃতির বাধা হইয়া ক্রমে মুক্তির উদ্দেশ্যে নানারূপ কৌশলের আশ্রয় করিতেছিল। বলা বাহুল্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড কিংবা আরণ্যকাদির জ্ঞানকাণ্ড, উভয় পক্ষই অধিকাংশ স্থলে একটা বিশেষ-তন্ত্রীয় অধ্যাত্ম আদর্শে পরিচালিত; উভয়ের মূলেই দুঃখ বাদ বা জাগতিক অশুভবাদ এবং অবিদ্যার ধ্রুবপদই প্রবল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সহজ জ্ঞানবাদী হইলেও বোধ হয় ভারতীয় দার্শনিক হাওয়ার বশবর্ত্তী হইয়া—উহার মূলেও এই দুঃখবাদ। প্রকৃত ভাগবত আদর্শ, নারদ—শাণ্ডিল্যাদির ঈশ্বর-নির্ভর ভক্তিনিষ্ঠা, গীতার ভগবদুদ্দিষ্ট সুদৃঢ় কর্ত্তব্যবাদ, প্রজাপতি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র, নাচিকেতাঙ্গ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং বাদরায়ণ প্রভৃতির মহান্ ব্রহ্মবাদ, এই সমস্ত প্রাচীন ইষ্টপৈত্রাতন্ত্রীয় এবং যুক্তি-কৌশলপ্রিয় আর্য্য সমাজে সবিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।' বরঞ্চ পরবর্ত্তী কালের বুদ্ধপূজার দৃষ্টান্ত হইতে, এমন কি বৌদ্ধতন্ত্রীয় মায়াবাদ শূন্যবাদ এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরীশ্বর মুক্তি-আদর্শের সহিত সংগ্রাম হইতেই ভারতে ব্যক্তিগত ঈশ্বর উপাসনার প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছে; শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত পূজা-পদ্ধতি ও 'মহাযান' বৌদ্ধ তন্ত্র হইতে পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করিয়াছে। বলিতে কি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের চরমপন্থী 'অহিংসা' আদর্শের পরম প্রতিবাদ স্বরূপেই ভারতের মৃত্তিকায় মদ্য-মাংসের অহিংসক শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষের সৃষ্টি বলিয়া ধারণা হইবে। ভারতীয় আর্য্য সমাজের আদিম পরিবার এবং সম্প্রদায় আদর্শ গতিকে এই দেশে ধর্ম্মমত মাত্রই ক্রমে একগুঁয়ে হইয়া পড়া নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। হীনযান মার্গই প্রকৃত এবং আদিম বৌদ্ধ পন্থা। এই বৌদ্ধ আদর্শও ক্রমে পৌরাণিকতার বশবর্ত্তী হইয়া উহার সহিত একাকার এবং একাচার হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং উন্মুখ হইয়া নিজের মস্তকটি হিন্দু আদর্শ কর্ত্তৃক কবলিত হইবার জন্য অগ্রগামী করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য প্রাকৃত ব্যক্তি অপেক্ষা বরং অধ্যাত্মবাদীগণের পক্ষেই একগুঁয়ে হইবার সম্ভাবনাটা বেশী। এই অধ্যাত্মবাদীগণই ক্রমে আলোচনা-ভীত এবং আলোক-ভীত হইয়া, তর্ক-যুক্তি এবং সংশয়-প্রশ্ন বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া, একেবারে আলোক-দ্রোহী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন; সমগ্র সমাজকে অপরিহার্য্য অধঃপাতের দিকেই বেগবান্ করিতে পারেন। সাধারণের ভুল-ভ্রান্তি, পাপ কিংবা বিদ্রোহ সহজেই ধরা পড়ে, এবং চিরকাল ঘৃণা লাভ করিতে থাকে; কিন্তু অধ্যাত্ম-বাদীর সুপরিচ্ছন্ন পাপমতি লোক-লোচন সমক্ষে পরম পূজ্য আকারে উপস্থিত থাকিয়া সমগ্র সমাজের মনোবৃত্তিকে, সুতরাং তাহার মানস-পুত্র সাহিত্যকেও অপ্রতিবিধেয় মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে।

এই বৌদ্ধ মত ভারতে প্রাচীনতম কাল হইতেই ছিল বলিয়াই তাহার অর্থ এই যে, আর্য্যসমাজ মধ্যে তখনও অনেকে সম্প্রদায়গত বেদাচার মাত্রকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নাই। বেদ এত প্রাচীন যে, উহা রামায়ণ, মহাভারতের সময়েই শ্রুতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অধিকন্তু উপনয়নাদি বেদাচার সম্বন্ধেও প্রাচীন আর্য্য সমাজের অনেকেই 'ব্রাত্য' ছিলেন। মহাভারতে বৃষ্ণি এবং অন্ধক প্রভৃতির কুল-ব্রাত্য থাকার উল্লেখ আছে। মহাভারতের সময়েই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র আর্য্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণও যে বেদাচার সকল দিকে মানিয়া চলেন নাই, তাহা প্রতীয়মান। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী স্বল্প পরিমাণ স্থানই প্রকৃত ব্রহ্মাবর্ত্ত বা আর্য্যস্থান। এই দেশীয় ব্রাহ্মণের আচার ধর্ম্মই অন্য তাবৎ দেশের আর্য্যগণ অনুসরণ করিবেন! এই নির্দ্দেশ যে সে কালেও সবিশেষ অনুসৃত হইতে পারে নাই, অধিকাংশ লোকে যে বৌদ্ধ আদর্শে প্রাচীন কার্য্য কর্ম্ম এবং আচার আদর্শ পরিহার পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ হয় না। এই বৌদ্ধ আদর্শের ফলেই দেশে বেদের বহুদেব পূজা, ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় এবং কৌশল মূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অপ্রতিষ্ঠ হইয়া যায়। বরং নানাসম্প্রদায় স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ঈশ্বর উপাসনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকেন; সকল কার্য্য-ক্রমে একের পূজাই বরং প্রচলিত হইয়া পড়ে। এখন এই

একের প্রতি ভক্তি বা পূজা, ইহা বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের এবং পৌরোহিত্যতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী; নিরীশ্বর 'মুক্তি'-আদর্শ, অবিদ্যা-বাদ কিংবা সোহংবাদেরও বিরোধী। এই একেশ্বর পূজাই ভাগবত আদর্শ, উহার ফলে যেমন পৈত্র্যতন্ত্র, তেমন ইন্দ্রাদি দেবতার পূজাও ক্রমে সাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। উহার প্রভাবে, বৌদ্ধ ব্যতিরিক্ত আর্য্য সমাজের মধ্যেও বেদের মূল প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ঈশ্বর-পূজক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া যায়। বৌদ্ধযুগের হিন্দু-সমাজ-ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সত্য সর্ব্বাগ্রে হৃদয় অধিকার করে। 'শঙ্কর-বিজয়' গ্রন্থ-প্রণেতা সে কালের আর্য্য-সমাজের যে প্রতিকৃতি ধরিয়াছেন উহা অত্যন্ত কুতূহলজনক। উহার মধ্যে কাব্য-অধিকারের অতিশয়োক্তি অনেক আছে, সন্দেহ নাই! কিন্তু তখন যে ব্যাপকভাবে বৈদিক স্বাহা-স্বধা (বা ইষ্ট-পৈত্র্যতন্ত্র) অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ হয় না। সমাজের লোক তখন আর দেব-পিতৃ উদ্দেশে স্বাহা-স্বধা অর্পণ করিত না, কাম উদ্দেশ্যে বাজপেয়াদি যাগযজ্ঞ করিত না। কেহ বলিত "আমি বিষ্ণু-দাস" কেহ বলিত আমি ঈশানোপাসক ইত্যাদি। সমাজের এই আদর্শ যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্য প্রমুখের চক্ষে নিতান্ত ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, সন্দেহ কি? উহা লৌকিক ভাবেও কত ভয়াবহ! সমস্ত সমাজ অগণ্য স্বেচ্ছানুসারী সম্প্রদায় মধ্যে বিশ্লিষ্ট এবং ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, উহার মধ্যে কোনরূপ সাধারণতা বা জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না! সুতরাং, কেবল তাঁহারা কেন, অন্ততঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সকল ব্রাহ্মণ্য আদর্শবাদী ধর্ম্মবক্তা স্মার্ত্ত এবং টীকাটিপ্পনীকারের চক্ষেও দুইটি শক্ত সমস্যা উপস্থিত ছিল। প্রথম, বৌদ্ধ আদর্শের বা বেদবিদ্রোহী আদর্শের নিরাস বা সমন্বয়; বৌদ্ধ মায়াবাদ, শূন্যবাদ, একান্ত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস আদর্শকে অদ্বৈতবাদের কুক্ষিগত করা; প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ড এবং দার্শনিক আদর্শীয় জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় অসম্ভব হইলেও, অন্ততঃ একটা জোড়া-তাড়া গোছের এবং চোখ বুঝিয়া চলা গোছের সম্মিলন ঘটনা। দ্বিতীয়, সমস্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা সাধারণ আচার আদর্শের বা "ধর্ম্ম-কর্ম্মের" প্রবর্ত্তন।

এখন, বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার প্রমাণ যে, উক্ত উভয়দিকেই নব্য উত্থানকারীগণের চেষ্টা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ আদর্শ স্বয়ং কবলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হিন্দু রাজত্বের প্রাধান্য লাভেই হউক, কিংবা ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব প্রজ্বলিত করিয়াই হউক, এই সমুত্থান জয়ী হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সকল কথার শেষ কথা এই যে, এই বিজয়-ব্যাপারে প্রধান অস্ত্র ছিল সাহিত্য—সারস্বত-যন্ত্র! ভারতের ব্রাহ্মণ্য অনন্ত পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতার সৃষ্টি করিয়া অথবা প্রাচীন আর্ষ-গ্রন্থাদির সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন করিয়া উহাদের অর্থ-মর্ম্ম সমস্ত সমাজের মধ্যে পরিচালিত করিয়াই এই ব্যাপার সমাধা করিয়াছে। উহার ফলে, দশনামী সন্ন্যাসীর মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাস কবলিত; শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন আচ্ছাদিত! 'নিরঞ্জনী' এবং নির্ব্বাণীগণও 'হিন্দু' গণ্ডীর ভিতরে আসিয়া গিয়াছে; বুদ্ধদেব স্বয়ং অবতারত্ব লাভ করিয়া নিজের উপাসকগণকে শৈব বৈষ্ণব এবং শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যে 'হারাইয়া' ফেলিয়াছে। সকল ঋষি-বাক্যই শাস্ত্র, সকল মুনি-মতই পূজ্য, সকল সাম্প্রদায়িকতা এবং ভেদ মাত্রেই রঞ্জনীয়, সকল দেব-দেবতাই পূজনীয়! যে যত দেবদেবতা, পূজাবিধি এবং মুনির রচনা আবিষ্কার করিতে পারেন আমরা সমস্তই বিনা তর্কে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত! বেদের তেত্রিশ দেবতার স্থলে তেত্রিশ কোটী দেবতা হইলেও ক্ষতি নাই, পুরোহিতগণ যজমানের হিতার্থে সমস্তের পূজা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত! এইরূপ একটা আগ্রহ এবং গ্রাসের ভাবই এ কালের সারস্বত চেষ্টার প্রধান লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হইবে! এইরূপে সকল পৃথক পৃথক সম্প্রদায়, স্বয়ং-পূজকগণ, বিষ্ণুদাস এবং ঈশানোপাসকগণ কারে প্রকারে প্রাচীন মধ্যবর্ত্তী-তন্ত্র এবং পৌরোহিত্যের অধিকার-ভুক্ত হইল! বলা বাহুল্য, এই নব-অভ্যুত্থান প্রাচীন ধর্ম্মতন্ত্রের (Theocracy) মূল প্রকৃতি পরিহার করে নাই। প্রাচীন সমাজে বহু-পূজা, হোতৃত্ব,

এবং মন্ত্র-মুদ্রার প্রভুত্ব পূর্ণ মাত্রায় ছিল ; নানাদিকে উহার সংখ্যা মাত্র বৃদ্ধি পাইল বই নহে। নব আবিষ্কৃত দেব পূজার মধ্যেও যন্ত্র-তন্ত্র প্রবেশ লাভ করিয়া পৌরোহিত্যকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিল। এইরূপে সমাজের সকল দেব পূজার মধ্যেই বিশেষ বিশেষ মন্ত্র মাহাত্ম্য স্বীকারিত হইয়া সমস্তের ব্রাহ্মণ্য অধীনতা প্রবর্ত্তিত করিল, এই আদিম বৈদিক প্রকৃতিটুকুই—পৌরোহিত্যই একদিকে সমস্তের অন্তর্গত সাধারণতন্ত্র। অন্যদিকে, প্রাচীন স্বাহা-স্বধার পুনঃপ্রবর্ত্তন পূর্ব্বক সকল বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়কে শ্রুতিগত আদর্শের আমলে আনিয়া 'হিন্দু'-সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হইল, স্বাহা-স্বধার মাহাত্ম্য দেশের অন্তর্ম্মর্ম্মে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলেও, উহাই প্রাচীন পৌরোহিত্য তন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের অনন্ত ভেদবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও যৎকিঞ্চিৎ উপাধি-সাম্য আনয়ন করিয়াছে। ঈশ্বরবাদী হউক বা না হউক, যাহা কিছু পূজা করুক বা না করুক, স্বাহা-স্বধা এবং ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য মানিয়া চলিলে সকলেই হিন্দু!

ইহাই বৌদ্ধবিজয়া এবং নব-প্রতিষ্ঠাপিত হিন্দু-আদর্শের প্রধান লক্ষণ ; এবং এই আদর্শ এখন যাবৎ চলিতেছে।

এখন, গৃহ্যসূত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুসংহিতা এবং যাবতীয় সংহিতা গ্রন্থগুলি 'হিন্দু'-আচারমূলক সভ্যতার বিরোধ নির্দ্দেশ করিতেছে। সমস্তই একটা বিশেষ তন্ত্রীয় ধর্ম্ম এবং সমাজের ওতপ্রোত আদর্শই বিজ্ঞাপিত করে। বেদের দেব-পিতৃ পূজার পদ্ধতি সমস্তের মূলে রহিয়াছে ; বেদের সাম্প্রদায়িকতা অনন্ত ভেদ-বাদের জনক হইয়া দার্শনিক তর্ক যুক্তির উপস্থাপনে নিজের সমর্থন করিয়াছে, দুঃখবাদ মূলক দার্শনিক আদর্শে পার্থিব জীবনটাকে মহা দুঃখাবহ মোহ এবং অধঃপাত জনিত মনে করিয়াছে ; উহার মধ্যে প্রতিনিয়ত নিজকে সঙ্কুচিত করিয়া তিতিক্ষামাত্র সার করিয়া চলাটাই আদর্শ স্থির করিয়াছে। এই লক্ষণ এত ব্যাপক যে, উহাকে প্রাচীন কালের অগ্নি-প্রবেশ, রামায়ণ মহাভারতের সরযূ-নিমজ্জন এবং মহাপ্রস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার ধর্ম্ম এবং সমাজ-তন্ত্রের প্রধান বর্ণ বলিয়া অনুসরণ করিতে পারা যায়। উহা না হওয়াটাই যেন অসম্ভব ছিল! অন্যদিকে, ভেদ-বাদের চক্ষে প্রসার বলিয়া কথাটা কখনও আমল পাইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি প্রসার-আদর্শের অর্থই অনুশীলন ; এবং উহাই প্রকারান্তরে 'প্রবৃত্তি'-আদর্শ বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই নিন্দিত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রণেতার 'ধর্ম্ম'(১) আদর্শ পরম-গরিষ্ঠ এবং মহীয়ান্ বলিয়া মনে করি। উহা সকল ধর্ম্মের অন্তস্তত্ত্বের খ্যাপন করিতেছে—উহা মনুষ্যাত্মার নিরোধের—ঊর্দ্ধ প্রয়াণের পন্থা! ধর্ম্মের উহা নীতিমূলক আদর্শ! সুতরাং উহার মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ আদর্শের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে। এই নীতিমূলক আদর্শই মানব-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বকে সকল সাম্প্রদায়িক মতবাদ (Dogma ও doctrine) হইতে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। উহা সম্মুখে রাখিয়া যে-কোন জাতির যে-কোন ধর্ম্মের এবং যে-কোন সমাজসীমার লোকেই স্বাধীন অধ্যাত্ম-পন্থায় নিজের 'পরমা গতি' লাভ করিতে পারেন! কিন্তু, এই মূল সূত্র সত্ত্বেও মনুকে কার্য্যতঃ ধর্ম্মের নীতি-আদর্শ পরিহার করিতে হইয়াছে। সমাজাধিকৃত ধর্ম্ম-আদর্শের বাধ্য হইয়া, প্রাচীন কর্ম্ম-ধর্ম্ম এবং আচার-আদর্শের বাধ্য হইয়াই, সংহিতাকারকে কেবল নির্দিষ্ট-'আচারের' মধ্যেই ঐ মহান্ আদর্শকে নিরূপিত এবং সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ভেদকেই সনাতন তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লইয়া উহার সহিত নির্ব্বিচারে আপোষ করিয়া, প্রত্যেক বিভিন্নের জন্য দেশকালের প্রত্যেক বিভিন্নতা এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্যই যেন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল! উহার গতিকে সমাজের সংহিতা বা 'ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি' কেবল কতকগুলা আচার কার্য্য-বিধির বিস্তারিত সংগ্রহ-পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই নহে! ধর্ম্মের মূলসূত্র দুই কথায় সারা হইয়া আচার নিরূপণের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে ; এইরূপে হিন্দুর ধর্ম্ম এবং সমাজ আদর্শ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার আচার-পদ্ধতি এবং সমাজনীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া

(১) ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

গিয়াছে; মনুষ্যজাতির অন্ত তাবৎ ধর্মপদ্ধতি হইতে নানাদিকে বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে; অতীত দেশ-কালের সীমা-নিয়ত নিরূপণগুলিই 'সনাতন' সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অবিচল এবং অনুল্লঙ্ঘ্য হইয়া, ব্রাহ্মণ-মুখ্য বা পুরোহিতের অধিনায়কতায় এই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ফলতঃ, এই সমাজের মনোগতি এবং বিশ্বাস বুদ্ধি পর্য্যন্ত এই আদর্শে আকারিত না হইয়া পারে নাই। আমরা অন্যত্র ভগবান মনুকে ভারতীয় সমাজতন্ত্রে এক জন সংস্কারেচ্ছু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি প্রাচীন আর্য্য-সমাজের স্বভাবগত অনন্ত সাম্প্রদায়িকতা এবং ভেদপ্রবণতাকে চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শও নামমাত্রে পর্য্যবসিত। হিন্দু সমাজের লোকসকল পরস্পর স্পর্শে বিদ্বেষী থাকিয়া অনন্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত রহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দের অভ্যন্তরে যেটুকু সাধারণ লক্ষণ বা সাম্যভাব নিহিত আছে, উহা কদাপি গোষ্ঠী-গোত্র এবং সম্প্রদায়গত বিভিন্নতার অন্দর স্পর্শ করিতে পারে নাই; প্রকৃত একত্ব-ঘটনা কিংবা জাতীয়তার ক্রিয়াশক্তি হইতে বিচ্যুত থাকিয়া বহির্ভাগে কেবল ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া, জ্যামিতি শাস্ত্রের দেহবিস্তারবিহীন বৃত্ত-রেখার মতনই অবস্থান করিতেছে। ইহার ফল কিরূপে ভারবর্ষের সাহিত্যে সমাজে ধর্ম্মে সকল দিকে কার্য্য করিয়া চিরকাল উহার ভাগ্যনেমি আবর্ত্তিত করিয়াছে, এক কথায়, ভারতীয় মনুষ্য সমাজকে জাগতিক মনুষ্য সমাজের সাধারণ নিয়তি হইতে কত দিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, এই চিন্তা হইতে এ-দেশের কোন বিভাগের আলোচনাই স্বাধীন হইতে পারিতেছে না। সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষে ত গত্যন্তরই নাই! কেন না সাহিত্য, সমাজবদ্ধ মনুষ্যের মানস পুত্র বই নহে।

বিপ্রের পৌরোহিত্য এবং দশ-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানই ভারতীয় সমাজে যৎকিঞ্চিৎ সাধারণতার ভিত্তি—অনন্ত ভেদবাদের মধ্যে উহাই যৎকিঞ্চিৎ একতা! এই বিশেষত্বের সমস্ত গুণ-দোষ, এই মূল লক্ষণের সমস্ত উদ্বর-ফল, বর্ত্তমান মনুষ্য সভ্যতা এবং সমাজের গতিমধ্যে উহার সাহিত্যের অভিব্যক্তি-মধ্যে হিন্দুজাতিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, উহা আলোচনায় প্রতিপদে অনুভব করিতে থাকিব!

সমাজের সমস্ত স্বত্ব বা বড় বড় স্বার্থগুলি সকলের চেষ্টা-অধিকারের মধ্যে থাকাটাই সমাজের সর্ব্বপ্রধান শক্তি—উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণতন্ত্র। যে সমাজের প্রত্যেক স্বত্বে সাধারণ যতই সমতা অনুভব করিতে পারে, তাহার শক্তিও ততই বর্দ্ধিত হয়; সমাজ-বিষয়ে তাহা গোড়ার কথা; উহা হইতেই আধুনিক 'জাতীয়তা' কিংবা 'রাষ্ট্রীয়তার' প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই 'সাধারণ' পদার্থকে জন্মজাতিগত আদর্শে খণ্ড খণ্ড করিয়া সীমাবদ্ধ করাই সাম্প্রদায়িকতার প্রধান লক্ষণ। আমরা দেখিতেছি, 'হিন্দু' আদর্শ যেমন চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার দিকে টানিতেছিল, বৌদ্ধ আদর্শ তেমন চিরকাল সাধারণতার দিকেই টানিয়াছে। দেশমধ্যে উভয়ের প্রাবল্য থাকার গতিকেই বৌদ্ধ প্রভাবের ভারতবর্ষ মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্জ্জিত করার অর্থই হইতেছে সাম্প্রদায়িকতার জন্মগত পৌরোহিত্য এবং ভেদপ্রবণতার প্রসার, এবং 'সাধারণবাদের' অবনতি! নির্ব্বাচন প্রথা, যাহার মধ্যে মনুষ্যসভ্যতার সকল উন্নতির মূল, তাহার নামগন্ধও ক্রমে অন্তর্হিত! উহার ফলে, এই সমাজ সাহিত্যশিল্প প্রভৃতিকে সাধারণের চেষ্টা-লক্ষ্য হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া বিশেষ বিশেষ জন-সংঘে আবদ্ধ করিয়াছিল; অন্য দিকে সমাজস্থ মনুষ্যের শিক্ষা-দীক্ষা চেষ্টা-চরিত্র এবং চিন্তা পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকারান্তরে মনুষ্যের প্রধান স্বত্ব—তাহার মনের স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছিল! এই 'হিন্দু' আদর্শে (কেবল হিন্দু কেন সকল প্রাচীন আদর্শেই) স্বাধীনতা, গতি, উন্নতি বা বৈচিত্র্য প্রভৃতি কথা নিদারুণ ঘৃণাবহ না হইয়া পারে না! উহার আধিপত্য প্রবল হইলে, মনুষ্যের মানস-পুত্র সাহিত্য কিংবা শিল্পের কি দশা হইতে পারে? উহার প্রভাবে মনুষ্যের সমগ্র জীবন ক্রমে সকল বিভাগেই স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, একঘেয়ে এবং অবিচল নিরাকৃষ্ট হইয়া, মৃত্যুর

দিকে অগ্রসর হইতে পারে। উহার গতিকে ভারতের মনুষ্য-জীবনটাই এককালে জরাগ্রস্থ হইয়া, মধ্য এসিয়া হইতে ক্ষুদ্র গিরিরন্ধ্রপথে প্রবাহিত হিম বায়ু সমক্ষে জীর্ণ বটপত্রের ন্যায় কাঁপিয়াছিল। নিজের অধ্যাত্ম-নিয়তি বশেই ধূলি বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল! আমরা জানি এইরূপ অবস্থা সত্বেও ভারতের মনুষ্যগণ নানাদিকে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। কিন্তু, কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত এবং প্রতিভানিষ্ঠ উন্নতি; একক মনুষ্যের কোন প্রাপ্তিই সমাজে ব্যাপক হইতে পারে নাই। সমস্ত সমাজ কেবল একটা বিশেষ আচার আদর্শেই ন্যূনাধিক স্থির থাকিতে পারিয়াছে; এক একটা আচার কালবশে নিজের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা হারাইয়া ফেলিলেও হাজার-হাজার বৎসর প্রবল আছে! এই সমাজের শাস্তাগণ এই জাতিভেদ এবং আচার বিশিষ্টতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মনুষ্যের হৃদয়-রক্ত এবং প্রত্যেক অস্থি-তন্তু মধ্যেই জন্মান্তরীয় অদৃষ্টবাদ সংক্রামিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; উহার গতিকে হিতোপদেশ প্রভৃতির 'পুরুষকার' এবং এই জাতীয় অর্ব্বাচীন কথা-প্রবন্ধ এই সমাজের মর্ম্মদেশে চিরকাল নিদারুণভাবে নিষ্ফল হইয়া আসিয়াছে। উহার গতিকে এই সমাজ জগতের গতি-প্রবাহে বিশেষভাবে স্থিতিশীল শান্তিপ্রিয় এবং 'সোয়াস্তিপ্রিয়' হইয়া অবস্থান করিতেছে সত্য; আচার-মূলক আদর্শগতিকে একটা শান্তিশীল সভ্যতার আদর্শও সিদ্ধি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন বিষয়েই ব্যষ্টি-র উপার্জ্জনের প্রকৃত অমৃতটুকু সমষ্টিদেহে পরিচালিত করিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পরিস্ফুট সূর্য্যালোক এবং অমা-রজনীর ঘন অন্ধকার পাশাপাশি থাকিয়া আসিয়াছে; সমস্ত প্রাপ্তিই নিদ্দেন-পক্ষে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় মধ্যে শিলীভূত হইয়া অবস্থান করিয়াছে; এবং ঘটনাগতিকে, বিশিষ্টের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তের অধঃপাত অনিবার্য্য হইয়াছে। এই বিশিষ্টের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া গিয়াছে। ক্রমে এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষ বিশেষ বিশেষ বিভাগে এত উন্নতি কি করিয়া সম্পন্ন করিল, প্রকৃত অবস্থা-নভিজ্ঞ বিচারকের চক্ষে তাহাই সর্ব্ব-প্রধান সমস্যা-আকারে উপস্থিত হয়! কিন্তু উহার সমস্ত দোষগুণ বিশেষ-তন্ত্রের মধ্যে, ভেদতন্ত্রের মধ্যে প্রবল সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এবং সাধারণতার অভাবের মধ্যেই লুক্কায়িত! দেশ-বিদেশের সকল প্রাচীন সমাজ-মধ্যেই এই লক্ষণ ন্যূনাধিক লক্ষ্য করিব। এই 'সাধারণবাদ' আধুনিক মনুষ্য সভ্যতার এবং ইতিহাস-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার সম্পত্তি। উহা বহুতর কষ্টকৃচ্ছ্র, দুর্দ্দৈব দুর্দ্দশা এবং বিপত্তি-সম্পাতের শেষ-উপার্জ্জনরূপে মনুষ্য সমাজের নেত্র সমক্ষে প্রকটিত হইয়া ক্রমে মূর্ত্তিমান হইতেছে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

পাহাড়িয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় গৃহের কুঞ্জে, তোমার
কি দিয়ে তুষিব হিয়া?
কোথায় তমাল পিয়াল, সর্জ্জ
অশোক বকুল নীপ?
মহুল গাছের ললাটের পরে
কোথা সে চাঁদের টিপ?
শিরীষ ফুলের কেশর শিহরি
পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতাল হইয়া
মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈল সোপানে
এলায় না তার বেণী।
কোথা দিগন্তে কাজল বরণ
গিরি'পর গিরি-শ্রেণী।
পাষাণ বক্ষ বিদারি হেথায়

বহে না বিমল বারি।
সিকতা হৃদয় চিরিয়া হেথায়
ভরে নাকো কেহ ঝারি।
কোথায় উদার মুক্ত জীবন
শৈলের পাদ-মূলে?
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি
গিরি নদী-কূলে কূলে?
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় গৃহের কুঞ্জে, তোমার
কি দিয়ে তুষিব হিয়া?

ওগো পাহাড়িয়া বালা,
লয়ে এস করে লতার বলয়
গলে বন-ফুল-মালা।
প্রকৃতি হেথায় কল্যাণীরূপে
বেঁধেছে কুটীরখানি,
আলিপনা ভরা আঙিনার তলে
এস এস বন রাণি।
হেথায় জড়ায়ে শতেক বন্ধ
গৃহ-কাজ হেথা শত।
মানবের পূত হৃদি ছায়াতলে
তৃপ্তি লভিবে কত?
ফুল-পল্লব- ভূষণ তেয়াগি
গৃহের ভূষণ পর।
লহ সীমন্তে সিঁদুর বিন্দু
শঙ্খ-বলয় ধর।
টানো শির 'পরে লাজ গুণ্ঠন
বাঁধ কুন্তল রাশি,
হোক অচপল চরণ যুগল,
সংযত হোক হাসি।
পিঞ্জরে আজি পড়িয়াছে বাঁধা,
মুক্ত স্বাধীন পাখী।
হরিণ নয়নে ঘেরিয়া দাঁড়াল
শতেক মানব আঁখি।
ওগো পাহাড়িয়া বধূ,
তার মাঝে আলো প্রকৃতি ফুল্ল
অন্তর-ফুল-মধু॥

শ্রীকালিদাস রায়।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর গৌরব। কাব্য ও সাহিত্য যেমন ভাষার পরিপুষ্টি ও সৌষ্ঠব সংসাধনের উপাদান, সঙ্গীতও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভাষার অঙ্গরাগে সহায়তা করিয়া থাকে। কাব্য ও সাহিত্যের প্রভাব সুশিক্ষিতের উপরই বিস্তৃতি লাভ করে। সঙ্গীত রাজাধিরাজের বিলাস-ভবনে, বাণীর কুঞ্জ কাননে, রাখালের গোচারণের মাঠে, কৃষকের ক্ষেত্রে, মাঝিমাল্লার নৌকায় এবং অবগুণ্ঠনবতী রমণীর অবরোধে পর্য্যন্ত অবাধে আপন অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে; সুতরাং সাহিত্যের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অস্বীকার করিলে চলিবে না।

রামপ্রসাদের প্রেম-বিগলিত হৃদয়ের মন্দাকিনী ধারারূপে যে সঙ্গীত-তরঙ্গিনী বঙ্গদেশে প্রবাহিতা হইয়াছিল, তাহাতে কত হৃদয় আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? রামপ্রসাদের পদাবলী শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সঙ্গীত-সুধার ধারা শারদ-জ্যোৎস্নার ন্যায় সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত।

কলিকাতায় ইংরেজ রাজের রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে জ্ঞান বিস্তারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। তাহার ফলে তত্রত্য বহু লুপ্তপ্রায় রত্ন আবিষ্কৃত হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। সাধক কবি রামপ্রসাদের গান, কবিতা ও জীবনী সংগ্রহও সেই জ্ঞানের একতম অমৃত ফল। রামপ্রসাদের শিব-সঙ্গীত, কৃষ্ণবিষয়ক

গীত বা বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বাঙ্গালীর সমাজে অপরিচিত বলিলেও অন্যায় হয় না। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—

"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।"

তাঁহার গান আশীর্ব্বাদের মত সমুদয় বঙ্গদেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং বঙ্গবাসী আফিস রামপ্রসাদের সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এ কার্য্যে দয়াল বাবুই অগ্রণী। তিনি প্রভূত পরিশ্রম, অতুল অধ্যবসায় ও যত্নে প্রসাদের সঙ্গীত, জীবনী, জন্মস্থান প্রভৃতির বিবরণী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের পদাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, ইহাতে একাধিক ব্যক্তির রচনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে যাহা সংগৃহীত হয়, তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু লোকমুখে শ্রুত অতীত কাহিনীর মধ্যে একই ব্যক্তির রচনা নির্ভুলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। প্রসাদ-পদাবলীও এই সত্যের সীমা-রেখা অতিক্রম করিতে পারে নাই। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে স্পষ্টরূপে পরিচয় করিয়া লওয়ার এক উপায় আছে। তাঁহার পরিচয়ে দেখা যায়

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম
তত্র মধ্যে সিদ্ধ পিঠ রামকৃষ্ণ-ধাম।"

এই কুমারহট্টই হালিসহরের "কুমারহাটী গ্রাম," দয়াল বাবু এরূপ স্থির করিয়াছেন। অপর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কেহ এ পর্য্যন্ত কোনও উচ্চ বাচ্য করে নাই। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা দ্বিতীয় রামপ্রসাদের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব।

"প্রসাদ-লেখক" দয়াল বাবু লিখিয়াছেন—

"যদিও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালায় সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ববাঙ্গালায় এক জন 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ছিলেন, আমার এই সংস্কার দূর হইল না।"

দ্বিজ রামপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গবাসী এই সংস্কার দয়াল বাবুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার প্রধান কারণ, প্রসাদী সঙ্গীতের মধ্যে কোনও কোনও পদে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা অত্যন্ত পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়, এবং রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কালেও তিনি পূর্ব্ববঙ্গে এক রামপ্রসাদের প্রমাণ পাইয়াছিলেন। প্রসাদী সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গের গৃহে গৃহে বহুকাল হইতেই প্রচলিত। যে সকল গ্রাম শিক্ষিত সমাজ হইতে পূর্ব্বাবধিই দূরে রহিয়াছে, সেই সকল গ্রামেও প্রসাদী সঙ্গীত স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে জনৈক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব প্রমাণের পক্ষে এই যুক্তিও নিতান্তই উপেক্ষনীয় নহে। দয়াল বাবু কুমারহট্টের সন্ধান করিতে ঐ স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদের জন্য একটুও শ্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। ১৮৮২ সনের ২৫শে বৈশাখ তাঁহার "প্রসাদ প্রসঙ্গ" প্রচারিত হয়। ইহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যদি দয়াল বাবু পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদের অনুসন্ধান করিতেন, তবে তাঁহার সফলতা আজ আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিত। দুর্ভাগ্য বশতঃ দয়াল বাবুর হৃদয় সে দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি কুমারহট্টের সন্ধানে গমন করিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধমূল সংস্কার লইয়াও তিনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রসাদের দিকে নেত্রপাত করেন নাই। রামপ্রসাদ ১৬৮০-৮৬ শকাব্দার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান ১৩০—৪০ বৎসর পূর্ব্বে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, রামপ্রসাদের মৃত্যুর এক শতাব্দীর পরে দয়াল বাবু অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলেন।

তাৎকালিক ইংরেজী শিক্ষিত পশ্চিম বঙ্গ সে অঞ্চলের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে সে চেষ্টার যে ক্ষীণালোক আমরা বর্ত্তমানে দেখিতেছি, ইহা আরও কিছুকাল পূর্ব্বে দেখিতে পাইলে পূর্ব্ববঙ্গের বহু গৌরব-মণ্ডিত রত্ন এত কালে আপন প্রভাব বিস্তার করিত।

দয়াল বাবুর দৃঢ় ধারণা ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে এক রামপ্রসাদ ছিলেন। আমরা দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই 'রামপ্রসাদের' কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। কোনও কোনও পূর্ব্ববঙ্গবাসী অনুসন্ধানের কষ্ট স্বীকার না করিয়া গোলে হরিবোল দিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকেই দ্বিজত্ব প্রদান করিয়াছেন। দয়াল বাবু নিজ বদ্ধমূল সংস্কারের উপরেও একটা সন্দেহের ছায়া পাত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"পূর্ব্ববাঙ্গালায় অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ দ্বিজ ছিলেন। কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ইহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। দ্বিজ শব্দের রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া মূল অর্থে কবিরঞ্জনকেও অবশ্য দ্বিজ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মুক্তির পূর্ব্বে দ্বিজ হইতে হইবে। মানবাত্মা সেই পর্য্যন্ত মৃত, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরেতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া 'দ্বিজ' হয়। এই মূল অর্থে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই কোন কোন সঙ্গীতে দ্বিজ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন কি না, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। কারণ যে সকল সঙ্গীতে 'দ্বিজ' ভণিতা আছে, সে সকল অপেক্ষাকৃত লঘুভাবাত্মক। কিন্তু কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল অতীব গভীর ভাবাত্মক। * * * * বৈশ্যেরও উপনয়ন ও গায়ত্রীতে অধিকার আছে। কবিরঞ্জন তাহা হইতেই আপনাকে 'দ্বিজ' বলিয়াছেন। তরুণ যৌবনের ঔদ্ধত্য বশে হয়ত প্রসাদ এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন।"

দয়াল বাবুর এই সকল যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত নহে। যদি দয়াল বাবুর মতে "মানবাত্মাকে মুক্তির পূর্ব্বে দ্বিজ" হইতে হয়, তবে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, 'দ্বিজ' ভণিতা যুক্ত সঙ্গীতগুলি প্রসাদের সিদ্ধ অবস্থায়—সুতরাং জীবনের শেষ ভাগে রচিত। মানবাত্মা মুক্তির পূর্ব্বে দ্বিজ হয়, দয়াল বাবু কোন্ শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তির উপর এই কথা লিখিয়াছেন? তিনি আবার লিখিয়াছেন, "দ্বিজভণিতাযুক্ত সঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত লঘুভাবাত্মক", এ স্থলেও তাঁহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। প্রথম রচিত সঙ্গীত অপেক্ষা পরবর্ত্তী সঙ্গীত লঘুভাবাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? অবশেষে 'দ্বিজ' ভণিতাকে 'তরুণ যৌবনের ঔদ্ধত্য' বলিয়া তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ করতঃ এই ভাবে দয়াল বাবু তাঁহার নিজের প্রতিবাদ নিজেই করিয়াছেন। এই সকল পঙ্গু যুক্তির অত্যন্ত স্পষ্ট অসামঞ্জস্য দুই রামপ্রসাদের ব্যবধান সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

১৩০২ সনের শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারতের ১৭২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় রামপ্রসাদের কায়স্থত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"কোন কোন গানের ভণিতায় দ্বিজ রামপ্রসাদ থাকাতে রামপ্রসাদকে ব্রাহ্মণ মনে করা যাইতে পারে। তৎসম্বন্ধে কথা এই যে, রাম প্রসাদ দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ না করিলেও শ্রী, কবি, তারা, মা গো, ও মা, ঐ যে, এইরূপ অসংখ্য শব্দের পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী গায়কগণ দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ করিয়া লইতে পারেন। অনেক গানে তাহাই হইয়াছে। আর কতকগুলিতে বোধ হয় রামপ্রসাদই দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, জগজ্জননীর সহিত তাঁহার মাতা-পুত্র সম্বন্ধ একেবারে পাকা হইয়া গিয়াছে,.........তখন যে রামপ্রসাদ আপনাকে দ্বিজ বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ...সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অভিমানী রামপ্রসাদ যে সে সময়ে আপনাকে দ্বিজ বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই।............পূর্ব্ববাঙ্গলায় দ্বিজ রামপ্রসাদ কথার যে কোনও মূল্য আছে, মনে করি না।" রসিক বাবু রামপ্রসাদকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। ভাবের মুখে কায়স্থকেই দ্বিজত্ব প্রদান করিতেও তাঁহার আটকায় নাই। রসিক বাবুর কল্পনা অতি-সহজেই শ্রী, কবি, তারা, মা গো প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী গায়কগণকে "দ্বিজ" শব্দ সন্নিবেশ-কারক বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, এবং "অনেক গানে তাহাই হইয়াছে" বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। রসিক বাবু "বোধ হয়" বলিয়া যাহার আরম্ভ এবং "সন্দেহ নাই" বলিয়া যাহার

মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহা কেবল স্বকীয় মতের সমর্থন মাত্র। রসিক বাবুর উদ্ধৃত কয়েকটি কথাতে তাঁহার দৌর্ব্বল্যের পরিচয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহাকে উপহাস করিতেছে। তিনি রামপ্রসাদকে "সিদ্ধ পুরুষ" বলিয়া "পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অভিমানী" বলাতে অপরাধী হইয়াছেন। কেবল কল্পনার লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া রসিক বাবু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়াছেন এবং প্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া আপন সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। ঐ সনের পৌষ সংখ্যায় নব্যভারতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত রসিক বাবুর এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

"প্রসাদপদাবলী"-লেখক আর এক ডিগ্রি প্রমোশন দিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদকে একেবারে নীলুর পাঁচালীর দলে নামাইয়া ছাড়িয়াছেন। তিনি তাঁহাকে

"তেমনি আজ নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্" বলিয়া সাফ্ ইংরেজ রাজত্বের মাঝামাঝি লইয়া আসিয়াছেন। উধাও কল্পনার তাড়নে লেখকগণ সুধু রামপ্রসাদ কেন অনেক মহাত্মাকেই এই ভাবে নাস্তনাবুদ করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করেন।

রামপ্রসাদ বাঙ্গালায় আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত এবং প্রিয়। সর্ব্বত্র রামপ্রসাদের অপ্রতিহত প্রভাব। এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষদ্বয়কে পৃথক করিলে সম্ভবতঃ কবিরঞ্জনের গৌরব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না। যদি দ্বিজ রামপ্রসাদের গৌরবের যোগ্য কিছু পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। কবিরঞ্জন আপন অধিকারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন—তাঁহার সীমানার বাহিরে আর এক জনের অন্ততঃ একটা পর্ণ-কুটীর নির্ম্মিত হওয়ায় দোষের বিষয় কি আছে?

শৈশবে পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট প্রায়ই একটি রামপ্রসাদী গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। দূরাগত বংশীধ্বনি যেমন সমীর-তরঙ্গে রহিয়া রহিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, সেই মধুর সঙ্গীতের দুই একটি পদ তেমন ভাবে আমার স্মৃতির কুহেলী-অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই সঙ্গীতটির জন্য এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি—কোথাও তাহার উদ্ধার সাধনের সূত্র পাওয়া গেল না। সে কালের নারীগণ ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া প্রসাদ পদাবলী গাইতেন; কিন্তু প্রসাদের সেই মধুর সঙ্গীতটি বর্ত্তমান সময়ে 'খনির তিমির-গর্ভ' হইতে উদ্ধার করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ঐ গানটার মধ্যে আছে,

"জংলার মধ্যে ভাঙ্গা ঘরে, একলা গো মা থাকি পড়ে",
অন্যত্র—"চমকে উঠি বাঘের ডাকে।"
অন্যত্র—"তুমি যা কর মা তারা।"

ঠিক একটি গানের মধ্যেই এই পদগুলি ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না। কতকাংশে ঐ রূপ আর একটি সঙ্গীত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

এই পদ হইতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু প্রাপ্ত হই যে, রামপ্রসাদ কোনও অরণ্যে বা অরণ্যপ্রান্তে ভগ্ন কুটীরে একাকী বাস করিতেন। সেখানে বাঘের ভয় ছিল। তথাপি মায়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রসাদ সেই ভাঙ্গা ঘরে পড়িয়া থাকিতেন।

তাঁহার নিবাস যে পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ দুই একটি গান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে"—

কে বা বুকের কে বা পিঠের, বদ্‌নিয়তিয়া কালীর কালী।
কেহ সারা দিনে পায় না খাইতে হে দে গো করুণাময়ী॥
কেহ দুধে খায় সাচি চিনি——
কেহ শুতে তেতালাতে, পালঙ্গেতে মশৈর টানি,
আমরা মরি 'পুড়্‌পুড়ায়ে' (হে দে গো করুণাময়ী)
ভাঙ্গা ঘরে নাই কো ছানি॥
কেহ পরে শাল দুশালা, কেহ পায় না ভাঙ্গা ছালা
অনুভাবে বুঝি তারা (হে দে গো করুণাময়ী)
তেলা মাথায় তেল ঢালানী॥

বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের বৈষম্যে অনেক শব্দের উপর অবাধ অত্যাচার হয় বটে, কিন্তু উক্ত সঙ্গীতে সে আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। বদ্‌নিয়তিয়া অর্থাৎ যাহার

উদ্দেশ্য খারাপ, কাণী অর্থে এক চোখা, যে পক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখে ; অনুভাবে (অনুমান করিয়া) ; শুতে (শোয়, শয়ন করে) ; মশৈর (মশারী) ; পুড়পুড়ায়ে (জ্বলে পুড়ে' বা ছটফটায়ে) ; মশারীর পরে 'পুড়পুড়ায়ে' ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় রামপ্রসাদ মশকদংশন-যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছেন। ভাঙ্গা ছালা (ছেঁড়া ছালা, ছেঁড়া ছালাকে ভাঙ্গা ছালা বলিতে অনেক সময় শোনা যায়), এই গানের ভাষা পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব।

আর একটি সঙ্গীতে আছে—

"থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে,
ভয় 'পাইয়া' মা ডাকি তোরে,
ইঁয়লে হালিয়া পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
রাত্রে আইসা ছয়টা চোরে, ভাঙ্গা বেড়া ডেঁইয়া পড়ে।
চমকি উঠি বাঘের ডাকে, পাকি (মায়ের) নামটি ভরসা করে।"

এই সঙ্গীতের ইঁয়ল শব্দের অর্থ শিশির-পাত। সম্ভবতঃ হিম হইতে ইম্ এবং শেষ ইঁয়ল হইয়াছে। ইঁয়ল ব্যবহার এখনও শোনা যায়। এই গানটির 'ইঁয়লে' স্থলে দয়াল বাবুর সংগ্রহে আছে 'হিল্লোলে'। ডেঁইয়া অর্থাৎ ডিঙ্গাইয়া। সাধক রামপ্রসাদ জঙ্গলের বাঘকে ভয় করুন আর নাই করুন তিনি ভাঙ্গা ঘরে থাকিয়া ষড় রিপুর ভয় করিতেন এবং মায়ের নামে তাহাদিগকে দমন করিতেন।

আর একটি গান—

"দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাঁকি দিয়া কেড়ে খাবা॥
এমন "ছাপান ছাপাইব" (মাগো) খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন তেম্নি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে "ফাঁকি ঝুঁকি" (মাগো) দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা শিব হবে তোমার বাবা॥"

যাবা, খাবা, পাবা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। "এমন ছাপান ছাপাইব" ছাপান অর্থ লুকাইয়া থাকা। পলাইয়া আত্ম গোপন করা।

আর অধিকসংখ্যক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্য আক্রান্ত করা সঙ্গত মনে করি না। কয়েকটি গানের দুই একটি পদ মাত্র উপস্থিত করিব। তাহাতেও পূর্ব্ববঙ্গের পরিচয় প্রকাশিত।

"প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও খানিক জিরাই।

জিরাই—বিশ্রাম করি।

"চুরিদারী করলে পরে উচিত মত সাজা পাব।"

'চুরিদারী', 'ফাঁকিঝুঁকি' পূর্ব্ববঙ্গেরই কথা।

"খাই পড়াই তা পড় মন, পড়লে শুনলে দুধিভাতি,
জান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥

এই প্রবচনটি আমরা শৈশবাবধি শুনিয়া আসিতেছি। 'ঠেঙ্গার গুঁতি' পূর্ব্ববঙ্গের একচেটিয়া কি পশ্চিমবঙ্গেও ব্যবহার আছে জানি না।

"কেহ গায় দেয় শাল দুশালা কেহ পায় না ছিঁড়া তেনা"

তেনা অর্থ ন্যাকড়া। পশ্চিমবঙ্গে 'তেনা' বলে কি না বলিতে পারি না, এ দেশের বহু লোক তেনা পরিয়া দিন গুজরান করে। পশ্চিম বাঙ্গালায় ন্যাকড়া বলে।

"সে যে সময়সির নাড়িতে নারে।"

'সময়সির' (সময় মত) ইহাও সম্ভবতঃ আমাদের সম্পত্তি। এই সকল সঙ্গীতের রচয়িতাকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিতে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই।

দ্বিজ রামপ্রসাদের সঙ্গীত ক্রমে উন্নত ভাব ও ভাষায় রচিত হইয়াছিল, যথা—

মন কেন রে ভাবিস্ এত ; যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাব্‌ছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এযে বড় অদ্ভুত,
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত।
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ওরে মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।
মিছা কেন ভাব দুঃখ, দুর্গা বল অবিরত।

যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি' হবে রে তোর তেম্নি মত।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি করিবে রবি-সুত ॥

এই আত্মনির্ভরতাপূর্ণ সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবাত্মক। তাহার পরে—

"মা হওয়া কি মুখের কথা,
কেবল প্রসব কর্লে হয় না মাতা।"

এই সঙ্গীতটিও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা। ইনি সরল ভাষায় সরল ভাবে প্রাণের কথা মায়ের নিকট নিবেদন করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ প্রথমেই "দে মা আমায় তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী" বলিয়া তবিলদারীর আরজী পেশ করিয়াছেন। ফলে তিনি মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিক চিন্তার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মিতব্যয়ী বাঙ্গালীর পক্ষে মাসিক ৩০৲ টাকা যথেষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে তিনি ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। "গর আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক" বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকেএক সনন্দ প্রদান করেন। রাজকিশোর নামক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোসকতা করিতেন। "শ্রীনাথ" নামক কোনও ব্যক্তি প্রসাদের চিকিৎসক ও অন্তরঙ্গ ছিলেন এ রূপ সন্দেহ হয়। এই রূপে রামপ্রসাদ পরম নিশ্চিন্ত মনে সংসারে থাকিয়া মায়ের নামে বিভোর থাকিতেন। "ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব" বলিয়া তিনি আপন গৃহের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি তাহার সংসারবাসের নিদর্শন।

"যত ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে" ইহাতে বোধ হয় তিনি অর্থোপার্জ্জন জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং আজু গোঁসাই "তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটি" বলিয়া প্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। 'প্রসাদ প্রসঙ্গ'-কার বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার উপর সংসারের ভার ন্যস্ত হয়।"

"রামপ্রসাদ রিপুরূপ কুম্ভীরাদির ভয়ে' বিবেক হলদী গায় মাখিয়া' রাজর্ষি জনকের অনুকরণে সংসারে বাস করিতেন। রামপ্রসাদ দানশীল ও দয়াবন্তের বংশধর। কিন্তু রামপ্রসাদের পিতা বড় সম্পত্তিশালী ছিলেন এমন বোধ হয় না" (প্রসাদ-প্রসঙ্গ)

আবার একটি সঙ্গীতে আছে—

"শিশু-কালে পিতা মৈল, রাজ্য নিল চোরে।"

এই রামপ্রসাদ তবে কে? এই ব্যক্তি কি তবে দ্বিজ রাম প্রসাদ। তিনি গৃহী ছিলেন, পরে মায়ের নামে পাগল হইয়া গৃহত্যাগী হয়েন। তাঁহার জমিদারী ছিল কি না, কে বলিবে? তিনি শুধু আপন গৃহের সংবাদ দিয়াছেন—

মা মা বলে আর ডাকৃব না।
ওমা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব
মা ম'লে কি তার ছেলে বাঁচে না।

অন্যত্র—

"আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী আমায়
সন্ন্যাসী করেছে।"

কবিরঞ্জনকে কখনও গৃহত্যাগী হইতে হয় নাই; দ্বিজ রামপ্রসাদ কালীর নামে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন; কে জানে তিনি ধনীর সন্তান কি না? তিনি মায়ের নিকট বলিতেছেন

"কারো দুগ্ধেতে বাতাসা,
আমার শাকে অন্ন মিলে কৈ?"

কবিরঞ্জনের এ অভাব ছিল না। কবিরঞ্জন "কাজ কি মন যেয়ে কাশী" বলিয়া ঘরে বসিয়া মায়ের নাম গান করিলেও অবশেষে তিনি কাশীধামে গিয়া অন্নপূর্ণা দর্শন করতঃ বৃন্দাবনে গেলেন।

সেখানে গিয়া গায়িলেন—

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে
কালী হলি রাসবিহারী।"

আর দ্বিজ রামপ্রসাদ

"তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।"

অন্যত্র --

"এ ভব সংসারে আমি না করিলাম গয়া-কাশী,
যখন শমন ধরবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে"।

কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ডিক্রীজারী" হইতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে "লাখ উকিল খাড়া" করিয়াছেন; তিনি হিসাব নিকাশ, দরবার প্রভৃতির কায়দা কানুন জানেন; তিনি "সংসারী" বলিয়া মায়ের নিকট "অভিমান"-বশে "অর্থ" প্রার্থনা করিতেছেন; অর্থে তাহার প্রয়োজন আছে, কারণ তিনি "জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা লইয়া ঘর গৃহস্থী পত্তন করিয়াছেন। আর দ্বিজ রাম প্রসাদ,

মায়ের নাম ভরসা করিয়া একখানা ভাঙ্গা ঘরে পড়িয়া থাকেন। তিনি উচ্চ গ্রামে হৃদয়ের তার বাঁধিয়া গাইয়া উঠিলেন—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ্ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষখোর প্রাণ রাখি সদাই
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।"

এ ভাবের মূল্য কে কত বলিবে? দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াও দ্বিজ রামপ্রসাদ সুখী।

কবিরঞ্জন বলিতেছেন,

"দেখরে সব মাগীর মেলা!"

অন্যত্র—

"রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী—
আগে ইচ্ছা সুখে পান করিয়ে, বিষের জ্বালায় ছটফটি।"

তথাপি তিনি সংসারে মায়ের নামে বিভোর। পুত্র-কন্যার মায়া এড়াইতে না পাড়িয়া তিনি "ধোকার টাটী সংসারে" রহিলেন। দ্বিজ রামপ্রসাদের উপদেশ এই—

"মিছে কেন দারা-সুতের বেগার খেটে মর"

তাঁহার হৃদয়ের বল আছে, তিনি

"ভক্তিতে কিনিতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"

বলিয়া সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়াছেন। তিনি

"দুঃখের নীরে স্রোতের শেওলার মত"

ভাসিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অন্তরে দুঃখী নহেন। এই দুঃখ দূর করিবার কোনও প্রয়াস তাঁহার দেখা যায় না, তিনি সগর্ব্বে বলিতেছেন—

"আমি কি দুঃখকে ডরাই?
সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই"।

এমন কথা কয় জন বলিতে পারে? তাঁহার হৃদয়ে "ব্রহ্মময়ীর জমিদারী কিনিবার মত" ভরসা রহিয়াছে। দুঃখ তাঁহাকে কি করিবে? তিনি চিদানন্দময়ীকে আত্ম-নিবেদন করিয়া নির্বেদ অবলম্বন করিয়াছেন। "মা একবার দ্বিজ-মন্দিরে দাঁড়াও—তোমায় দেখে লই"—এই পর্য্যন্ত।

উভয় রাম প্রসাদের মধ্যে এই প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও দ্বিজ রামপ্রসাদের কোন খোঁজ খবর নাই কেন? কবিরঞ্জনের এত নাম ডাক কেন? তাহার কারণ আছে। কবিরঞ্জনের আংশিক পরিচয় তাঁহার কবিতাবলিতে আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজকিশোর প্রভৃতির সহিত তাঁহার নাম-যুক্ত। তাঁহার বাসস্থান কুমারহট্ট। সুতরাং খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য নহে। তিনি রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা রাজরার অনুগৃহীত ব্যক্তি জন-সমাজে অপরিচিত থাকেন না; বিশেষতঃ প্রসাদ মহাসাধক—তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল—সর্ব্বোপরি তাঁহার ভক্তি-প্রেম-ধারায় অভিসিক্ত মধুর পদাবলী সকলকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তিনি দেশ বিদেশে কিছু কিছু ভ্রমণও করিয়াছেন; এই সমুদয় কারণে তাঁহার সঙ্গীত বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। আর দ্বিজ রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। এক অপরিচিত দূর বনগ্রামের প্রান্তে, ব্যাঘ্রাদি

শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের সমীপে 'ছেড়া তেনা' সম্বল করিয়া 'ছানি'-বিহীন 'ভাঙ্গা ঘরে' পড়িয়া মায়ের নাম গান করিয়াছেন ; এবং "অনায়াসে রণ-জয় জীবনে মরণে রণে" বলিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। পরের জন্য তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, এমন বুঝা যায় না। তিনি 'কাশী, গয়া' পর্য্যন্ত যাইতে চাহেন না, তাঁহার ভাঙ্গা কুটীরই সর্ব্বস্ব।

'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, "যে সকল সঙ্গীত রামপ্রসাদের বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। এমন কি কবিরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, সেই কয়েকটিই দ্বিজ রাম-প্রসাদের জীবনের ঘটনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।" যিনি তিন বৎসরের চেষ্টায় কবিরঞ্জনের সঙ্গীত এবং জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার সংগৃহীত মন্তব্যে আমরা অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না। আমরা দ্বিজ রামপ্রসাদের দুই একটি অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি ; সময়ান্তরে অন্য সুবিধায় সে সকলের পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণায় "চিনিষপুর" গ্রামে বাস করিতেন। ইনি এতদ্দেশে ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নামে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট পর্য্যন্ত পরিচিত। 'চিনিষ-পুর' ঢাকা সহর হইতে অনধিক ২২ মাইল পূর্ব্বদিকে অব-স্থিত। 'ডাঙ্গা' বা 'নরসিংহদী' ষ্টীমার ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া চিনিষপুর যাওয়া যায়। ঐ সকল ষ্টেশন হইতে চিনিষপুর ৪।৫ মাইল ব্যবধান। ঐ রাস্তা পদব্রজে যাইতে হয়। ঢাকা অপেক্ষা বহুদূরবর্ত্তী না হইলেও চিনিষপুরে যাতায়াত তত সহজসাধ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, চিনিষপুর শিক্ষা-দীক্ষায় বা ধনাঢ্যের কীর্ত্তিমালায় সুশোভিত নহে। সেখানে এখন আর উল্লেখ যোগ্য কি আছে ? তবে চিনিষপুরের কালীবাড়ী এখনও মহেশ্বরদী পরগণায় এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ ময়মনসিংহে অত্যন্ত পরিচিত। ঢাকা জেলার অন্যান্য স্থানে, কুমিল্লায় এবং ময়মনসিংহেও চিনিষপুর নিতান্ত অপরিচিত নহে। তাহার কারণ কেবলমাত্র দ্বিজ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এই স্থানে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। তারপর ঐ স্থান যে তিমিরে সে তিমিরে আবৃত হইয়াছে। তাঁহারও পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। কাল প্রভাবে রামপ্রসাদের কীর্ত্তি মলিন হইয়া পড়িতেছে। আজিও "রামপ্রসাদের মালসী" বলিলে প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ চিনিষপুরকে লক্ষ্য করেন, এবং ঐ পরম পবিত্র তীর্থস্থান লক্ষ্য করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া থাকেন।

দ্বিজ রামপ্রসাদ সাধক নামে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতেন না এবং শিষ্য সংগ্রহ করিয়া সাধন-পীঠের নির্জ্জনতা ভঙ্গের প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল মাত্র মায়ের কৃপাকণা লাভই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

চিনিষপুরের কালীবাড়ী বা রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ কত কালের তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। মেহারের কালীবাড়ী সম্বন্ধে যেমন অনেক অসাধারণ ঘটনা শোনা যায়, চিনিষপুর সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কাহিনী প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। চিনিষপুর বঙ্গের অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবময় মহাতীর্থ। ঢাকার সাহিত্য পরিষদ এই তীর্থ সংস্কারে মনোযোগী হইলে যে অক্ষয়কীর্ত্তি ও পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, তাহার তুলনা নাই। চিনিষপুরের কালীবাড়ী এবং দ্বিজ রামপ্রসাদ আমাদের গৌরবের বস্তু। ইহা কল্পনার কথাও নহে বা অতিরঞ্জিত ঘটনাও নহে। রামপ্রসাদের সঙ্গীত পৃথক করিয়া কবিরঞ্জন বা দ্বিজ রামপ্রসাদকে বাঁটিয়া দেওয়া সহজসাধ্য সালিসী নহে। উপযুক্ত সময়ে যোগ্যতর ব্যক্তি রামপ্রসাদের ধ্বংসপ্রায় কীর্ত্তি-সৌধের পুনর্গঠন করিবেন, আমি আশার কুহকে এই স্বপ্ন দেখিয়াছি।

প্রসাদপ্রসঙ্গকারও রামপ্রসাদের অনুসন্ধান সময়ে কাহারও নিকট রামপ্রসাদের সিদ্ধি স্থান মহেশ্বরদী পরগণায়, কাহারও নিকট পদ্মার পাড়ে ও কাহারও নিকট তিনি ব্রাহ্মণ, কাহারও নিকট বৈদ্য বলিয়া জানিয়া ছিলেন। কেহ বলিয়াছে প্রসাদ কর্ম্ম মাত্রই করেন না, কেবল মায়ের

নামে বিভোর, কেহ বলিয়াছেন তিনি মোক্তারী করেন ইত্যাদি। এ সকল কথার মধ্যেও আমাদের পরিপোষকতার স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।

উপসংহারে আমি দ্বিজ রামপ্রসাদের একটি মধুর সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

"গিরি, এ বার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ
কারো কথা শুন্‌ব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া ;
জামা'ই বলে মান্‌ব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কে তুমি ?

কে তুমি,
মোহস্ব-পনের ঘোরে ছিনু ঘুমাইয়া ;
সহসা পরশ করি
ঘুমটুকু নিলে হরি
নবীন আশায় চিত্ত উঠিল জাগিয়া।
কি অজ্ঞাত ভাবে হৃদি উঠিল শিহরি,
প্রাণ ভরা ভালবাসা
ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, আশা
জীবনের তরে দিনু নিবেদন করি।
কে তুমি,
সকলি কাড়িয়া নিয়া তবু কি তোমার
হাসাবার কাঁদাবার
সাধ পুরিল না আর ?
কে তুমি আরাধ্য দেব প্রাণে বলিকার ?
বুঝিলে না বুঝিবে না বালিকার প্রাণ ;
কি গভীর ভালবাসা,
কি বিশ্বাস কত আশা,
তোমার চরণ-তলে করিয়াছে দান !
বুঝিলে না তার দুটি পিপাসিত আঁখি,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে
চেয়ে থাকে তোমা পানে
কি যে করে প্রাণ তার তুমি বুঝিবে কি ?
বুঝিলে না এই ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণ ;
তোমার মঙ্গল তরে
এই ক্ষণে অকাতরে
হাসিতে হাসিতে পারে করিবারে দান।
বুঝিলে না একটুকু ভালবাসা তরে
ক্ষুদ্র সে হৃদয়খানি
লালায়িত দিবা যামী
আকুল পরাণ তার কি আকাঙ্ক্ষা ভরে।
বুঝিবার বুঝাবার ভাষা নাহি তার
নীরবেতে নিতি নিতি
ঢালিয়া দিতেছে প্রীতি
নীরব এ ভালবাসা নহে বুঝাবার।
কি আছে শকতি তার বুঝাতে তোমায়,
কেন এই ব্যাকুলতা
এ উন্মত্ত অধীরতা
কেন সে বিভোর সদা তোমার চিন্তায় !
ক্ষুদ্র হৃদি মাঝে একি বিপ্লব তুলিলে ?
ছিল না চিন্তার চিন্,
ছিনু মুক্ত বাধা হীন
মুহূর্ত্তে কি বাঁধে তুমি বাঁধিয়া ফেলিলে ?
সোনার শিকল এ যে ছিঁড়িবার নয়
যত দিন দেহ মন
রহিবেক সচেতন
কি সাধ্য ভুলিব তোমা মুহূর্ত্ত সময় !
এ সুখ-স্বপন মোর ভাঙ্গিবে যখন
রবি কাল-সন্ধি-নীরে
ডুবে যাবে ধীরে ধীরে,
স্মরিয়া বাঞ্ছিত মূর্ত্তি মুদিব নয়ন।

শ্রীচারুবালা গুপ্ত।

দামোদর নদের কিছু দক্ষিণ দিকে ওঝত নদী প্রবাহিত; দামোদরের উত্তর দিকে সোনারেখ নদী ও এতদুভয়ের মধ্যস্থলে ত্রিবেণী নদী প্রবাহিত। সোনারেখ, দামোদর ও ত্রিবেণী জুনাগড়ের সন্নিকটে সম্মিলিত হইয়া ত্রিবেণী তীর্থ হইয়াছে। এই ত্রিবেণী অঙ্গমা নদী কিয়দ্দূরে ওঝত নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রে যাইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে।

শৈলে পরি আম্বাজী মন্দির। আম্বাজী এ দেশে ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি বা রণচণ্ডী মা।

এই স্থান হইতে সোপানাবলী পরিমণ্ডিত ও সেতু আকারের একটি পথ গোরক্ষনাথ পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ঐ পর্ব্বতে পৌছিলেই প্রথমে গোরক্ষনাথের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত একটি প্রস্তর দৃষ্টি গোচর হয়। গোরক্ষ-নাথ পর্ব্বতের শৃঙ্গ-দেশ ও আম্বাজী শিখরের ন্যায় স্বল্প পরিমিত।

দত্তাত্রেয়ের স্বল্প পরিমিত শৃঙ্গ দেশে দত্তাত্রেয় ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

বর্ষ বিদায়

কবে এসেছিলে—
তরুণী উষার সাথে অরুণ-অলোক রথে
ওগো পুরাতন!
সময় ফুরায়ে এল এসেছে আহ্বান তব
বিদায় এখন।
কত কিছু এনেছিলে, কত সাধ কত আশা,
কত না উৎসাহ,
প্রসন্ন প্রভাত কত, শ্রান্তি ভরা কর্ম্মতপ্ত
মধ্যাহ্নের দাহ।
স্তব্ধ, শান্ত, মৌন সন্ধ্যা, কত না নির্ম্মল
পূর্ণিমার নিশি,
আজি এ বিদায়-ক্ষণে প্রাণে ওঠে জেগে
এক সাথে মিশি।
উত্তপ্ত নিদাঘ শেষে স্নিগ্ধ বারি-ধারা
ম্লান বরষার,
শরতের মেঘমুক্ত গগনে দিয়েছ খুলে
আনন্দের দ্বার।
শিশির মুকুতাজালে হেমন্তের পূর্ণ শোভা
দেখায়েছ আনি,
কুয়াশা-ধূসর-বাসে হিমানীর শুভ্র মুখে
আবরণ টানি।
সব শোভা, সব আলো, সকল সঙ্গীত আজি
নিঃশেষিত করে,
সাজায়ে দিয়েছ শেষ বসন্তের পরিপূর্ণ
তনুখানি ভরে।
সকল সৌন্দর্য্য আজি ফুটায়ে তুলেছ
বিদায়ের ক্ষণে,
আনন্দ আলোক ওঠে দিকে দিকে অভিনব
সঙ্গীতের সনে।
কত তৃপ্তি, কত দুঃখ, কত স্বপ্নময়
বিরহ মিলন,
অজানা কত না প্রীতি এনেছিলে তুমি
করিয়া বহন।
অনন্ত কালের স্রোতে চির তরে তুমি
যেতেছ চলিয়া,
অনপেক্ষ উদাসীন এসেছ যেতেছ
আদেশ পালিয়া।
শেষ বিদায়ের ক্ষণে লহ তুমি ওগো
শেষ নমস্কার,
জীবন জড়ায়ে যেন থাকে তুমি গেলে
স্মৃতিটি তোমার।

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

জুনাগড় হইতে পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সুপ্রসিদ্ধ অশোক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়; শিলালিপিটি প্রায় গোলাকার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০´×২০´ ফিট। এই সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর তুলিয়া একটি কক্ষ জুনাগড়ের বর্ত্তমান নবাব নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সে স্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দামোদর নদের পোল পার হইয়া দামোদর কুণ্ড ও ভবনাথের মন্দির তীর্থযাত্রীদের দর্শনীয়।

গিরনার পর্ব্বত-পাদমূলস্থ ফটক হইতে সমস্ত চড়াইর পথ কয়েক সহস্র সোপানাবলী দ্বারা পরিবদ্ধ। ফটকে নবাবের এক জন কর্ম্মচারী বাস করে; সে প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে কিছু শুল্ক আদায় করে।

সোপানাবলী দ্বারা পর্ব্বতে উঠিতেই প্রথমে পথ-পার্শ্বে 'পঞ্চ পাণ্ডবের ডেরী' নামক পাঁচটি ভগ্ন প্রস্তর-গৃহ পরিদৃষ্ট হয়। প্রবাদ যে, পঞ্চ পাণ্ডব তাহাদের বনবাস কালে এই স্থানে অবস্থান করিতেন।

প্রায় এক মাইল উঠিলে ভর্ত্তৃহরি গুহায় পৌঁছান যায়; পথের পার্শ্বেই ইহা অবস্থিত। বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ভর্ত্তৃহরি রাজা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। গুহাটি বিস্তৃত ও দুই খণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে ভর্ত্তৃহরি রাজার ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি আছে।

জৈনগণের বিশাল মন্দির প্রাঙ্গনের কিছু নিম্নভাগে পঞ্চেশ্বর মহাদেব ও ঝরনা দর্শনীয়।

জৈন মন্দির-বহুল স্থানটির নাম দেবকোঠা, ইহার দক্ষিণ দিকে ভোজরাজের মন্দির ও মান মন্দির। মান মন্দিরে পূর্ব্বতন জ্যোতিষ গণনার যন্ত্রাদি কিছুই নাই; কেবল মাত্র জ্যোতিষ যন্ত্র পরিস্থাপনের চক্র, বৃত্ত, কক্ষাদির পীট অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

দেবকোঠায় ১৬টি জৈন মন্দির আছে; সর্ব্ব-প্রধানটি নমিনাথের মন্দির, ইহার দুইটি মণ্ডপ আছে; স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত নমিনাথের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বিগ্রহটি মনোরম। এতদ্ব্যতীত জৈনরাজ কুমার পালের মন্দির ও তেজপাল, বস্তুপাল ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্র সংলগ্ন মন্দির ত্রয় দেখিতে অতি সুন্দর; মন্দিরের ভিত্তিতল শ্বেত-কৃষ্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত। ইহার উত্তরে অশোকের পৌত্র সম্পতি রাজার মন্দির।

সম্পতি রাজার মন্দির, ভোজরাজ নির্ম্মিত মন্দির ও মান মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য অতি চমৎকার।

এই সকল মন্দিরের উত্তর পূর্ব্বভাগে সৌরাষ্ট্ররাজ 'রাখেঙ্গারের' প্রাসাদ; ইহার সম্মুখবর্ত্তী নিম্নাভিমুখী রাস্তা দিয়া নিম্ন প্রকোষ্ঠে গেলে ভীম কুণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। ভীম কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পুরাতন দুর্গ প্রাচীরের বেষ্টন। ভীমকুণ্ডে যাইবার পথে বাম পার্শ্বে পুরাতন দুর্গ-ফটক। এই দ্বার পথে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব বিশ্বাসঘাতক দেশলের সহায়তায় দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। সিদ্ধরাজ যখন রাণীক দেবীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, তখন যুদ্ধে আহত ও মৃত স্বামীকে দেখিয়া রাণীক দেবী উৎসাহ বাক্যে বলিয়াছিলেন—

স্বামী উঠো সৈন্য লই, ধরো খড়্গ খেঙ্গার
ছত্র পতিএ ছাইও গড় জুনো গিরনার।

ভীমকুণ্ডের একপার্শ্বে পুরাতন বাউ বা ইন্দিরা। তাহার সন্নিকটে ভূতলগামী একটি পুরাতন সুরঙ্গ দৃষ্ট হয়।

এই সকল মন্দির হইতে ২০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলে গোমুখীতে পৌছান যায়; এখানে একটি সুনির্ম্মল ঝরণার জল একটি কুণ্ডে সঞ্চিত হয়।

গোমুখী হইতে উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে 'ভৈরব ঝম্পে' পৌছান যায়। পূর্ব্বে এই স্থান হইতে যাত্রীরা ঝম্প প্রদান করিয়া বিচূর্ণ অস্থি পঞ্জর পর্ব্বত শিলাতলে বিসর্জন করিত।

সেই স্থান হইতে উত্তরদিকে পর্ব্বত-প্রান্ত-সীমায় বিস্তৃত অঙ্গনযুক্ত একটি মন্দির আছে। তথা হইতে একটু নিম্নদিকে পূর্ব্বাভিমুখে গেলে পর্ব্বত-প্রান্তে-পাথর চটি নামক আশ্রমে উপনীত হওয়া যায়।

পাথরচটি গিরনার পর্ব্বতের শেষ উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। পর্ব্বত-পাদমূলে দামোদর নদ প্রবাহিত;

তখন স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়া গেছে! আর মঞ্জুলা মর্ম্মর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া অরুণের দিকে স্থির অচঞ্চল পলকবিহীন চোখে চাহিয়াছিল! অরুণের স্নেহময় দীর্ঘ দৃষ্টি তখন নীরব বেদনার ভাবভরা কথায় তার চিত্রের নায়িকার নিকট শেষ বিদায় চাহিতে চাহিতে যেন মুহুর্মুহু ম্লান হইয়া যাইতেছিল। মঞ্জুলা অস্ফুট চীৎকার করিয়া চিত্রের পদতলে ছিন্ন লতিকার মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!

চীৎকার শুনিয়া সতীশ পাশের কামরা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দেখে—মঞ্জুলা তারই ছবির পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে।

সতীশ যখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, ছবির উপরকার স্থানে স্থানে তুলির কাঁচা রং তখনো ভাল করিয়া শুকায় নাই!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহশর্ম্মা।

রৈবতক পর্ব্বত

রৈবতকের বর্ত্তমান নাম গিরনার পর্ব্বত, সোমনাথ পাটনের সমুদ্র উপকূল হইতে ইহা ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত; বর্ত্তমান জুনাগড় হইতে ইহার ব্যবধান মাত্র ৩ মাইল। রাজকোট হইতে জুনাগড় রেলে ৪ ঘণ্টার পথ। জুনাগড়ে এক জন নবাব আছেন, তিনিই এই সুন্দর সমতল প্রদেশ শাসন করেন।

রৈবতক পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম লীলার একটি প্রধান অঙ্গন; মহাভারতের বিরাট ঐশী শক্তির করাঙ্গুলী-সঞ্চালন এই স্থান হইতেই হইয়াছিল। কথিত আছে জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ দেব এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এই স্থানে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন! গিরনার বহু ঋষিজন সেবিত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার দুইটি শৃঙ্গে ঋষি গোরক্ষনাথ ও ঋষি অম্বায়ের আশ্রম ও পদচিহ্ন আছে।

জুনাগড় যে খুব পুরাতন দুর্গ আপারকোটে গেলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। আপারকোট জুনাগড় সহরের প্রান্তবর্ত্তী অনুচ্চ শৈল স্থানের উপর একটি অতি পুরাতন দুর্গ। বহু পূর্ব্বে জুনাগড় বলিতে আপারকোটকেই বুঝাইত, আপারকোট ধ্বংস হইবার পর তন্নিম্নেই জুনাগড় নামে নূতন সহর বসিয়াছে, এবং পূর্ব্বের জুনাগড়ের আপারকোট নামকরণ হইয়াছে।

অনহিলবার পাটনের সিংহ পরাক্রমী সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব আপারকোট ধ্বংস করেন। আপারকোটের নরপতি বীর্য্যবান 'রাখেঙ্গার' গিরনার গিরি দুর্গে অবস্থান করেন, তথায় বিশ্বাসঘাতক দেশল ও বিশলের সাহায্যে সিদ্ধরাজ গিরিদুর্গে আরোহণ পূর্ব্বক রাখেঙ্গারকে বিনাশ করিয়া রাণীক দেবীকে অপহরণ করেন।

রাখেঙ্গারের বীরত্ব ও রাণীক দেবীর সতীত্ব মহিমার করুণ কাহিনী ভাটের বহু গানে, বৃক্ষতলে বা মন্দির-প্রাঙ্গনে, গ্রাম্য লোকের সভামণ্ডপে শ্রুত হয়।

আপারকোটে প্রবেশের দুর্ভেদ্য বাগেশ্বরী ফটক নানা কারুকার্য্য সমন্বিত। আপারকোটের মধ্যে 'রাণীক দেবীর মেল' নামক একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, এই স্থানে রাণীক দেবী অবস্থান করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি প্রকাণ্ড বাউ (বাপী বা ইন্দিরা) পরিদৃষ্ট হয়। পাহাড় খুঁদিয়া এই প্রকাণ্ড কূপটি দুর্গ মধ্যে জল সংস্থানের জন্য রাখেঙ্গারের পিতা রাজা নবঘন নির্ম্মাণ করান।

গুজরাতি সাহিত্যের আদি কবি নরসিংহ মেহেতার বাসস্থান জুনাগড়ে ছিল। গুজরাতি নরনারী এই স্থানের প্রতি অতি ভক্তিমান।

মন্দিরে নরসিংহ মেহেতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। ভক্ত কবির শিষ্যেরা নরসিংহ মেহেতারও একটি মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছে।

নরসিংহ মেহেতা আমাদের জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত শ্রীকৃষ্ণ রস প্রেমিক ছিলেন।

অতৃপ্ত আগ্রহে তার স্বামীর মাথার ক্ষীণ সৌরভ উথলিত ঝালর দেওয়া বালিশটি বুকে আঁকড়াইয়া সহকার-ছিন্ন মাধবী লতাটির মত লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। কোনও কথা কহিল না। সতীশ আর দ্বিতীয় বার সে কথা তুলিতে ভরসা পাইল না! সে পাশের কামরায় গিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া মাটির উপর শুইয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের অনন্ত শূন্যের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িল!

মঞ্জুলা মূর্চ্ছা ও চৈতন্যের সীমান্ত দেশে শোকদগ্ধ অবশ হৃদয় লইয়া পড়িয়া রহিল! তন্দ্রায়, জাগরণে, স্বপ্নে বার বার করিয়া অরুণের বিদায়ের শেষ পালাখানি তার চোখের উপর অভিনীত হইতেছিল। কি জানি কি ভাবিয়া মঞ্জুলা গভীর রাত্রে আলুলায়িতকুন্তলা বনতপস্বিনীর মত সহসা ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল! সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিল,—কে যেন তাকে ডাকিতেছে। সে ডাকে তার মনে হইল যেন সে সুর তার জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত—তার ইহকাল পরকালের একান্ত আপনার জিনিষ! তাই সে উঠিল—উঠিয়া ধীরে ধীরে মোম বাতিটি ধরাইয়া লইল। তার পর কে যেন তাকে ঘরের বাহিরের দিকে অতি মধুর স্পর্শে পরম স্নেহে আকর্ষণ করিল! যে স্নেহের স্পর্শে পূর্ণিমার রাতে নীল জলধি আকাশের পানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এ স্পর্শ যেন তারই অমিয়, শীকর মাখানো! কোথায় যাইতে হইবে তা সে ভাল করিয়া বুঝিল না—শুধু বুঝিল তাকে যাইতে হইবে—তাই যেন সে চলিল!

তারপর কম্পিত হাতে চঞ্চল দীপটি লইয়া সে ধীরে ধীরে অরুণের নীরব চিত্রশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল! সে চিত্রশালা-আজও অরুণের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য রাশি বুকে লইয়া তেমনি যেন হাসিতেছিল!

অরুণের অসুখের বাড়াবাড়ি হইলে মঞ্জুলাই তাকে হাত ধরিয়া চিত্রশালা হইতে টানিয়া লইয়া বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়াছিল—সে বিছানা হইতে অরুণ আর উঠে নাই! তারপর আর মঞ্জুলা এ ঘরের দিকে আসে নাই। মঞ্জুলার চিত্রপটখানি তেমনি ভাবে কাষ্ঠ-ফলকের উপর রাখা—রংএর বাটিগুলি, সরু মোটা তুলি গুলি তেমনি ভাবে ছবির চারি ধারে ছড়ানো! ছবির উপরকার রেশমী পরদাখানি এই যেন তুলিয়া রাখিয়া অরুণ কোথাও গিয়াছে,—এখনি আবার আসিবে—কে বলিবে সে মরিয়াছে!

মঞ্জুলা একবার সেই ছবির কাছে আসিয়া নিজের ছবিখানির মুখের পানে চাহিল! ছবির হাস্যমুখী মঞ্জুলা যে তার স্বামীর হাত ধরিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে! যে মঞ্জুলা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, সে তার দাসী হইবারও যোগ্য নয়! মঞ্জুলা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখিল যে একটা উজ্জ্বল কুজ্ঝটিকা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অরুণের অবিকল মূর্ত্তি আপনা আপনি গঠিত হইয়া গেল! সে ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে একটি তুলি আলগোছে তুলিয়া লইয়া চিত্রের সম্মুখে বসিয়া অতি তদ্গতচিত্তে নিপুণভাবে ছবির উপর বুলাইতে লাগিল। মঞ্জুলার মনে হইল অরুণ যেন সত্য সত্যই মরে নাই—তাই সে পূর্ব্বের মত তার স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, যেন আসিবার সময় তার সাড়ির আঁচলখানি অরুণকে ছুঁইয়া গেল।

অরুণ তুলির মুখে তার হৃদয়ের বিচিত্র স্বর্ণরাগ মাখাইয়া তুলিকার প্রতি রেখায় রেখায় ধীরে ধীরে মঞ্জুলাকে অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে লাগিল। মুখে চিত্র শিল্পীর সরস নিপুণতা, চোখে রূপমুগ্ধের তরুণ বিস্ময়, আর হৃদয়ে প্রেমমুগ্ধের মদির ভাবোচ্ছ্বাস! ছবি যেন তার তুলির মোহন স্পর্শে স্পর্শে প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিতেছিল—আর জীবন্ত মঞ্জুলা যেন চিত্রকরের বামে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ছবি হইয়া যাইতেছিল!

অবশেষে যখন প্রদোষের আলো চিত্রশালায় ফুটিয়া উঠিল, তখন অরুণের ছবির কাজ শেষ হইয়া গেছে। দিনের অস্ফুট আলোর রেখা পড়িয়া অরুণের ছায়াদেহ

তারপর মঞ্জুলাকে কাঁদিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল— "এখন শুধু কাঁদ্‌লে চলবে না বৌদিদি, এক হাতে চোখ মুচবে, আর এক হাতে সেবা করবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ ভরসা। তারপর তারা দুই জনে অরুণের সেবায় লাগিয়া গেল। রাত্রি অনেক হইলে পরে মঞ্জুলা চামচে দিয়া অরুণকে বেদানার রস খাওয়াইতেছিল। সতীশ বার বার তার তপ্ত কপালখানি লেবেণ্ডার জলে ভিজানো ন্যাকড়া দিয়া সিক্ত করিয়া দিতেছিল! তখন অরুণ অতি ক্ষীণ ভাবে সতীশকে বলিল, "বড্ডো কাহিল ঠেক্‌চে সতীশ! নৈলে এখনি উঠে ছবিটা শেষ করে ফেলতুম!"

সতীশ ভালবাসার সুধা রসে তিরস্কারটি মধুর করিয়া লইয়া বলিল—"ছবি ছবি করেই তো ব্যারাম এদ্দূর বাড়িয়ে তুলেছ অরুণ! ছবি তো আর শরীরের চাইতে বেশী নয়!

অরুণ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"ওটা তোমার বৌদির একটা মনের ভুল মাত্র!" তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চোখের আরক্ত পল্লব দুটি আবার ধীরে ধীরে মুদিত করিয়া শিশুর ঘুম পাড়ানো মুগ্ধস্বরে অরুণ বলিল—"সে হচ্চে না ভাই, ছবি শেষ না করে বসে থাকা হবে না। সেরে উঠেই আমার সকল কাজের আগের কাজ ছবিটি শেষ করা! সতীশ মেজার গ্লাসে করিয়া অরুণকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল—

"আগে সেরে উঠে নাও—তারপরে সে সব বন্দোবস্ত হবে এখন।"

ছায়ালোকের বুকের উপর দিয়া যে রহস্যের রাজপথখানি বরাবর সমুখের দিক দিয়া অনন্তের পানে চলিয়া গিয়াছে অরুণ আজ ভোরবেলা সে পথে রিক্ত হস্তে অদৃশ্য হইয়া গেছে। সে নির্ম্মম ক্ষণে মঞ্জুলা যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, সেটা তার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ সে অনন্ত বিচ্ছেদের সদ্য শোক-বেগ সে সহ্য করিতে পারিত কিঁ না সন্দেহ!

৪

দুর্ঘটনার পরে যখন মঞ্জুলা প্রথম সংজ্ঞা লাভ করিল, তখন সন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়াছে। এক পশলা বৃষ্টির পর, পৃথিবীর নীলায়মান ভিজা বুকের উপর জ্যোৎস্না যেন আজ ছল ছল চোখে নীরবে কাঁদিতেছিল!

সংজ্ঞা লাভ করিবার পর মঞ্জুলা ভিজা মুখে একবার বাহিরের পানে চাহিল। বাহিরে সেই তরুলতা পূর্ণ আমাদের সুখ দুঃখের পুরাতন পৃথিবী; ভিতরে সেই নব যৌবনের ফুল ফুটানো প্রেমের জগৎ—তবু যেন আজ শুধু একটা অব্যক্ত অভাব একটা নিবিড় কালিমার ছায়া মঞ্জুলার চোখে দুই জগতেরই আলো নিভাইয়া দিয়াছে। যে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে তার কথা এলোমেলো মনে ভাবিতে চেষ্টা করিল কিন্তু না! সদ্য বিরহের মুখে যাহা কিছুতেই বুঝিবার নয়, তা বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ছিন্ন স্মৃতির মধ্যে মঞ্জুলার ক্ষীণ চেষ্টা শিশুর মত বার বার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল!

সতীশ অরুণের অবস্থা দেখিয়াই মঞ্জুলার পিতাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনি এলাহাবাদ হইতে তখনো আসিয়া পঁহুছান নাই। সুতরাং সে ভয়ঙ্কর রাত্রে মঞ্জুলাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াটা সে ভাল মনে করে নাই। মঞ্জুলা অরুণের ছোট বড় সমুদয় সখের সরঞ্জামগুলি আপনার চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া মেঝের ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিল! সে ছোট খাট খুঁটি নাটি স্নেহের জিনিষগুলির সঙ্গে আজ কত মধুর স্মৃতি, কত সুন্দর কার্য্য কাহিনী, মঞ্জুলার মনে পড়িতে লাগিল, যা এত দিন তার নিজের নিকটেও কত তুচ্ছ ঠেকিয়াছিল! সতীশ আর তার কাছে আসিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বলে নাই। বলিবার মত কথাই সতীশের বা কি ছিল! এমন শোকের মুখে যারা মানুষকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তারা শোকের গাম্ভীর্য্যকে উপহাস করে! সে শুধু এক বার মঞ্জুলাকে তাদের বাড়ীতে তার মার কাছে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, মঞ্জুলা তখনও তেমনি

রেখার পানে তাকায় তেমনি ভাবে মঞ্জুলা সতীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে লজ্জা ছিল না, তার মাথায় এলান চুলের উপরকার কাপড় তখন খসিয়া গিয়াছিল। সে দিন সতীশকে দেখিয়া যার দেহলতাখানি লাজের সঙ্কোচের মাঝে লজ্জাবতী লতাটির মত জড়াইয়া গিয়াছিল আজ সেই বালিকা বাণবিদ্ধ বনের হরিণীর মত আকুল ব্যথা পূর্ণ চোখে সতীশের পানে চাহিয়া থাকিল। তেমন সকরুণ অথচ স্থির, তেমন বিষণ্ণ অথচ সুন্দর মুখ সতীশ জীবনে আর কখনো দেখে নাই। সে মুখের ছবি দেখিয়া আজ সতীশ বুঝিতে পারিল এত দিনে বুঝি অরুণের অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণ হইয়া গেছে—আজ বুঝি মঞ্জুলার ব্যাথিত মুখে চোখে আলো-ছায়ার কোমল রেখা-পাতের সমন্বয় ঘটিয়াছে—নচেৎ মানুষের লেখা ছবিতে তার আভাস দেওয়া অসম্ভব! সতীশ অনেকক্ষণ মূঢ়ের মত চুপ করিয়া থাকিয়া পরে মঞ্জুলাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"অবস্থা এখন কেমন মনে হচ্চে? ডাক্তারেরা কি বলেচে?"

সতীসের স্নেহভরা কথায় আজ যেন মঞ্জুলার রুদ্ধ ব্যথা কূলপ্লাবিনী নদীর মত হৃদয়তটে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছিল! বড় কষ্টে সে তাকে আজ থামাইল। কেবল একখানি জলভরা ব্যথার ছবি সদ্য অপরাজিতার মত তার নীল বঙ্কু দুটির উপর ছল ছল টল্ মল্ করিয়া উঠিল! কিন্তু তবু সে আজ কাঁদিল না! কারণ তখনো তার দুঃখের উপর ধৈর্য্য ছিল, বেদনার উপর সংযম ছিল, প্রেমের অখণ্ড ধ্রুব শক্তির উপর তখনো আস্থা ছিল!

মঞ্জুলা তার অশ্রুবীণায় একটা কোমল ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল—"ও! ডাক্তারদের কথা! তারা কত কি বলে! তাদের কথা একটুকুও বিশ্বাস করি না আমি! আপনি এক বার দেখুন—সতীশ বাবু এক বার ভাল করে দেখে বলুন।"

সতীশ ধীরে ধীরে অরুণের কাছে আসিয়া বসিল, তার সারা অঙ্গের উপর তার স্নেহের পরশ খানি বুলাইয়া দিয়া অরুণের দেহ হইতে রোগের সমুদয় জ্বালা জুড়াইয়া দিতে চাহিল। টাইফয়েড্ জ্বরের সমুদয় লক্ষণ! ডাক্তারের বেশী রোগের সে কি বুঝিবে! তবু সে বার বার অরুণের মুখ চোখ ভাল করিয়া দেখিল। শেষ কালে অরুণের মাথায় গোলাপ জল দিতে দিতে মঞ্জুলাকে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ আজ ক'দিন থেকে বৌদিদি?"

"আজ তেরো দিন।"

"আজ তেরো দিন!"

"তেরো দিন হলো বাড়াবাড়ি হয়েছে। তারো আগে ঘুষঘুষি জ্বর হচ্ছিলই, তবু ঐ পোড়া ছবিটা নিয়ে দিন রাত খাটছিল!"

"তবে আমায় এতদিন খবর দাওনি কেন বৌদিদি। আমি আগে জানলে ওকে কখনো অমন পাগলামি কত্তে দিতাম না!"

মঞ্জুলা কতকটা অপরাধিনীর মত বলিল—"আমি কত বারণ করেছি সে সব কথা হেসেই উড়িয়ে দিত! আপনাকে ডেকে পাঠাই বল্লে হেসে বলতো ওকে এখন ডেকে পাঠিও না, ও এলে আমার মন আর কাজে থাকে না। তবু আমার ডাকা উচিত ছিল। কপাল মন্দ তাই আমারো ভুল হয়ে গেছে; এত বাড়াবাড়ি যে হবে তা আগে বুঝতে ত পারি নি আমি!"

এমন সময় অরুণ একবার সতীশের মুখপানে চোখ তুলিয়া চাহিল! সে চোখে যেন অশ্রু-হাসির মায়া এক সঙ্গে মাখানো! সতীশ গাঢ় স্নেহের কণ্ঠে বলিল—

"শরীরটা আগের চাইতে এখন একটু ভাল লাগচে অরুণ!"

অরুণ খালি তার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে ম্লান ভাবে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল বরং কাঁদা সহ্য হয় তবু সে হাসি সহ্য করা যায় না, এমনি মর্ম্মান্তিক সে হাসি! সে হাসি দেখিয়া অরুণ আর পুনরায় প্রশ্ন করিতে সাহস পাইল না. চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল!

যখন দুই বন্ধু বহুদিন পরে হাত ধরাধরি করিয়া আবার হাসিতে হাসিতে তাদের মিলন স্মৃতি জড়ানো ছবিঘেরা চিত্রশালায় প্রবেশ করিল তখন ধূসর সন্ধ্যা মিলাইয়া গিয়াছে। সাটিনের ঢাকনি পরানো ঝুলানো ল্যাম্পের আলো-ছায়া পড়িয়া ঘরের চারি ধারটা যেন বিচিত্র স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। মন্দ হাওয়ায় আলোটি জ্বলিতেছিল আর তার স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণগুলি যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার দেয়ালে ঝুলানো সুন্দর ছবিগুলিকে স্বস্নেহে চুম্বন করিয়া ফিরিতেছিল।

অরুণ যেখানে সতীশকে ঝড়ের মত টানিয়া লইয়া আসিল সেখানে ঘরের মেঝেতে কয়েকটি টবের উপর এক টুকরা ফুল পাতার বাগান সাজানো! নিকটে একটি চিত্রাঙ্কনের কাষ্ঠফলকের উপর একখানি ক্যানভাস্‌, তার উপর একখানি আসমান্‌ রঙের মিহি রেশমের পরদা। সেই কাষ্ঠফলকের কাছে আসিয়া অরুণ স্বপ্নাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে সতীশের হাতখানি ছাড়িয়া দিল। চোখে মুখে তার রূপমুগ্ধের তরুণ বিস্ময়। তার-পর ধীরে ধীরে—অতি ধীরে যেমন করিয়া পুত্রের জননী নববধূদের মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দেন—যেমন করিয়া বসন্তের হাওয়া বাঁকা চাঁদের উপর হইতে লঘু মেঘের শ্যামল ছায়াখানি সরাইয়া দেয়, তেমনি ধীরে, বিস্ময়ে, ভাবমুগ্ধ অরুণ সতীশের কৌতুহলোজ্জ্বল চোখের সম্মুখে, তার অসম্পূর্ণ চিত্র হইতে রহস্যের যবনিকা তুলিয়া ধরিল। সতীশ দেখিল ছবির ভিতরে মঞ্জুলার রূপ চিত্রকরের হৃদয়ের নানা রঙের আলো লাগিয়া আরো অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সতীশ কবির চক্ষু লইয়া এমন ভাবের পদ্মাসনে বসাইয়া মঞ্জুলাকে আগে কখনো দেখে নাই। আজ ছবির জগতে আনন্দ রাজ্যের মুক্তাবনে তাকে নাগাল পাইয়া মঞ্জুলাকে আর সতীশের চোখে নারী বলিয়া মনে হইল না। তার মনে হইল এ যেন বিশ্ব কবিতার মন্থন করা ভাবখানি, যেন আনন্দ-শ্যামল সৌন্দর্য্য-জগতের প্রাণটুকু। আজ চিত্রকরের হৃদয় রাজ্যের ভিতরকার মঞ্জুলাকে নূতন করিয়া দেখিয়া তার সম্বন্ধে সতীশের নিজের মতামত অনেকটা শোধরাইয়া লইল।

সতীশ যখন তন্ময়ভাবে ছবিখানা দেখিতেছিল তখন অরুণ তার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—

"চুপ করে রইলে যে! বড় পছন্দ হলো না বুঝি?" সতীশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"চমৎকার! বল কি অরুণ! খালি ছবির হিসাবে নয় ভাবের হিসাবেও এমন ছবি অনেক দিন আমার চোখে পরে নি।"

অরুণ সতীশকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—"আর বকো না যাও।" সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"খোসামুদী নয় অরুণ। এতো ছবি নয়, যেন ছবির ভিতরে বৌদি মানুষ হয়ে উঠচে, নয় তো বৌদি আস্তে আস্তে ছবি হয়ে যাচ্চে।"

(৩)

হঠাৎ দুপুরবেলা মঞ্জুলার নিজের হাতে লেখা জরুরী চিঠি পাইয়া সতীশ বাইসাইকেলে চড়িয়া নক্ষত্রবেগে অরুণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তার স্নেহের অরুণ বৃন্তছিন্ন পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় মুহুর্মুহু শুকাইয়া উঠিয়া যেন বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে। মুখখানি কাগজের মত শাদা ও রক্তহীন। সে মঞ্জুলার কোলে জ্বরতপ্ত মাথাখানি রাখিয়া দিয়া নিরুপায় শিশুর মত চোখদুটি মুদিয়া নীরবে রোগের যাতনা সহিতেছিল। আর মঞ্জুলা? সে একাকিনী তার সমুদয় স্নেহ, মমতা, আগ্রহ, ব্যাকুলতা তার ক্লিষ্ট স্বামীর রোগ পাণ্ডুর মুখ-খানির উপর কল্যাণের সহস্র ধারা প্রস্রবনের মত উৎ-সারিত করিয়া দিয়া র‍্যাফেলের চিত্রার্পিত মাতৃ-মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিল। সে বার বার যেন ব্যাকুল হইয়া স্বামীর মুখে, জনশূন্য গৃহে সুবিশাল পৃথিবীতে একটু অভয় খুঁজিয়া সারা হইতেছিল কিন্তু কোথাও একটি আশার ক্ষীণতম আলোর রেখাও দেখা যাইতে ছিল না। এমন সময় সতীশ যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে ঢুকিল, তখন মঞ্জুলা যেন একটু ভরসা পাইল। তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সাগরের জলে নিমজ্জনশীল মানুষ যে চোখে দূরের শ্যামল তট-

তাকে দুটো কুইনিনের পিল ধার দিয়াও তো সাহায্য করিতে পারিবে না। তারপর অরুণের মত গরীবের বিবাহ করাটাই একটা মস্ত গ্রহ; তার উপর ছেলে মেয়ের বেশে অনেকগুলি ছোট বড় উপগ্রহ জুটিয়া অতি শীঘ্রই যে অরুণের অনাটন সংসার আরো অসচ্ছল করিয়া তুলিবে তাতে কি আর সন্দেহ আছে! তারপর মঞ্জুলা! সে তো হাল ফ্যাশনের কাপড় পরাণো একখানি ছবি! অরুণের চিত্রশালায় তো কাচ ঢাকা ছবির অপ্রতুল ছিল না—বিবাহ করিয়া এমন একখানি ছবি ঘরে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল! খালি নীলোৎপলের মত চক্ষু, পদ্মের নালের মত ক্ষীণ ভঙ্গুর দেহ-লতা, কাজল-কালো ঘন কেশরাশি,—এ সব নিয়া কাব্য লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিন্তু ঘর করা সহজ নয়। যদি তাই সম্ভব হইত তবে এত দিন বাঙ্গালী স্কুলবাবুরা মানুষ ছাড়িয়া দিয়া রবিবর্ম্মার ছবি বিবাহ করিয়া উজার করিয়া দিত! বিশেষতঃ এমন একটা গুরুতর কাজ করিয়া ফেলিল, অরুণ একবার সতীশকে জিজ্ঞাসাও করিল না, ভালবাসা এমনি অন্ধ! তাই সতীশ এই না-বুঝ দম্পতীকে বিবাহের পর আশীর্ব্বাদ করিয়াই একদম পালাইয়াছিল, আর এদিকে ভিঁড়ে নাই। তার পর দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভালবাসার নিকট দান করা চলে, মান করা চলে, হাসি কান্নার অভিনয় করা চলে, কিন্তু তার সঙ্গে জোর করা চলে না। তাই কে যেন সতীশকে আজ চাবুক মারিয়া এমন অসময়ে অরুণের কাছে পলাতক আসামীর মত ধরিয়া হাজির করিয়া দিয়াছে। সতীশ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অরুণের কথার জবাব দিয়া বলিল—"যাত্রার ফলাফল পাঁজি দেখে ঠিক করে নেবো এখন! সে চুলোয় যাক, তোমার কাজ চলচে কেমন আগে তাই বল শুনি।"

অরুণ হাসিয়া বলিল—'না ভাই কাজ আর তেমন এগুচ্ছে কই। বিয়ে করে ভারি ছেলে মানুষ হয়ে গেচি সতীশ। কথাটা বলিয়া নিতান্ত ছেলে মানুষের মত অরুণ হাসিয়া উঠিল। মঞ্জুলা কিছুতে হাসিটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাদের ছোঁয়াচে হাসির ঢেউ লাগাতে সতীশকেও হাসিয়া উঠিতে হইল। চারিদিক হইতে হাসির রূপালি আলো লাগিয়া সতীশের মনের মেঘটাও অনেকটা কাটিয়া গেল। সে মনে মনে খুসী হইয়া ভাবিল—"আমি এমনি দুটি ছেলে মানুষের উপর রাগ করেছিলাম! অতি ছেলে মানুষ এরা যে! ভবিষৎটাকে শুধু হাসির জোরে পেছনে ঠেলে রাখতে চায়!" সতীশ যখন এমনি ভাবে ক্ষমা, স্নেহ ও অভি-মানের মধ্যে নিতান্তই নাকাল হইয়া ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছিল তখন অরুণ হঠাৎ চেয়ার হইতে এক লাফে উঠিয়া পড়িয়া সতীশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"ভাল কথা সতীশ আসল ছবিখানাই তোমায় দেখাতে ভুলে গেছি দেখবে—এসো!" এই বলিয়া অরুণ সতীশের আর কোনও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তাকে এক রকম জবরদস্তি করিয়াই চিত্র শালার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। চলিতে চলিতে সতীশকে অরুণ বলিল—এখনো ছবিটি শেষ কত্তে পারি নি কিন্তু! আলো-ছায়াটা ভাল করে মুখে ফুটিয়ে তুলতে যদি পারি তবে ছবিটি যে কি চমৎকারই হবে, সে আর তোমায় কি বলবো।" সতীশ দেখিল অরুণ ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিষয়টাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল— "কার ছবি ভাই?"

"তোমার বৌদির!" সতীশ বুঝিয়াও না বুঝার ভাণ করিয়া বলিল— "আমার বৌদির?"

আহা মঞ্জুলার আর কি! বৌদি বল্লুম আগে বিয়ে করার সম্পর্কে। সেটাও তুমি মানতে চাও না না কি?

সম্বন্ধটা অগত্যা মানিয়া লইয়া সতীশ বলিল— ছবি দেখে বৌদির অভিসম্পাতের ভাগী হবো না তো?"

অরুণ মধুর উত্তেজনার সহিত বলিল—"আসলটার উপর না হয়, তার সাড়ে ষোল আনা দাবী থাকতে পারে সে সম্বন্ধেও শাস্ত্র মতে সন্দেহের তর্ক যথেষ্ট। কিন্তু নকল ছবিটা সম্পূর্ণ আমারই! তার কপিরাইটের ভাগ কাউকে দেই নি আমি।"

তাকে খানিকটা শক্ত সমর্থ না হইলে চলিবে কেন? দৃষ্টি তার উজ্জ্বল প্রভাময়, যেন সে চোখ হতে দুনিয়ার ছোট বড় কিছুরই সহজে এড়াইয়া যাইবার যো ছিল না।

(২)

সে দিন বিকাল বেলা অরুণ তাদের বাড়ীর ভিতর দিককার বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ার টানিয়া লইয়া শুইয়াছিল। আর তার কাঁধের উপর হাত দুখানি রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল তার নবপরিণীতা স্ত্রী মঞ্জুলা। লতার ফাঁকে ফাঁকে রাঙ্গা কুঁড়ির অস্ফুট মাধুরী জড়ানো গোলাপের শাখা লতার মত তার হাত দুখানি। আর সেই হাত দুখানির উপর আসিয়া মুক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে তার যৌবন-প্রস্ফুটিত দেহলতার সমুদয় লাবণ্য-রাশি! তখন দিনের শেষ আলো ঘরের শাসিতে শাসিতে ধূসর শুভ্র পাণ্ডুর শোভাটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তটিকে অতি সকরুণ করিয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার ফিকে গোলাপী আকাশে এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, সেগুলিকে এক সারি কৃষ্ণ বিন্দুর মত দেখাইতেছিল। যে দু চারিটি তারা তখন উকিঝুঁকি দিতেছিল তাদের মধ্যে যেন ভারি একটা চোখাচোখির ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। মঞ্জুলা মুগ্ধ ভাবে একদৃষ্টে তাই যেন দেখিতেছিল! কখন যে তার মাথার উপর হইতে সাড়ির আঁচল খানি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল সে খবর সে নিজেই বড় একটা রাখে নাই। এমন সময় সে মুগ্ধ দম্পতীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া মটোর গাড়ীর মত হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল সতীশ! তখন সহসা মঞ্জুলার ভাবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তার হাতের সোণার চুড়িগুলি ও আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা একতালে বাজিয়া উঠিয়া কাব্যের দেশ হইতে তার লাজের দেশে ফিরিয়া আসার সূচনাটিকে মধুর করিয়া তুলিল। সে মাথার উপর সাড়ির প্রান্তখানি টানিয়া দিতে দিতে দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অরুণ যেন ধরাপড়ার লজ্জটা তাড়াতাড়ি সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাঃ সতীশ যে! হঠাৎ কোথেকে? পথ ভুলে নয় তো?" সতীশ হাসিয়া বলিল—"না হে ভায়া, তা মনে করো না। এদ্দিন যে আস্‌তে পারি নি তার কারণ হচ্চে, নিজের বিয়ের মতলবে একটা কন্‌টিনেনট্যাল্ টুর দিয়ে আসতে হলো কি না!" অরুণের মুখ আরো লাল হইয়া উঠিল, রাঙ্গা গোলাপের উপর যেন আবির জলের পিচ্‌কারী! তার সে সলজ্জ মুখের হাসির ভিতর দিয়া তার প্রেম জগতের জয়পরাজয় লজ্জা ও সুখ দুইই রৌদ-বৃষ্টির মত পাশাপাশি হইয়া একসঙ্গে অতি মধুর ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল! তারপর বার কয়েক কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া অরুণ বলিল—"None but the brave deserves the fair!" এক যাত্রায় সব সময় সমান ফল ফলে না, তা জান সতীশ!"

দুই বন্ধুর মধ্যে এই রহস্য পরিহাসটুকু মঞ্জুলা বেচারীকে লইয়া। এ কথাটা এখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। অরুণ মাস দেড়েক হয় এক বার এক সপ্তাহের জন্য এলাহাবাদ গিয়াছিল। এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে সব পোষ্ট মাষ্টার সদানন্দ বাবুর স্নানার্থিনী কন্যা মঞ্জুলাকে প্রথম দর্শন করিয়াই কবিকুলের চিরন্তন প্রথা মতে সে প্রেম-বিদ্ধ হয়। তারপর মঞ্জুলাকে একেবারে বিবাহ করিয়া তবে সস্ত্রীক ঘরে ফিরিয়া আসে। সতীশ অরুণের এই নভেলী ধরণের বিবাহ ব্যাপার লইয়াই পরিহাস করিতেছিল। সতীশের বিশ্বাস অরুণ এ বিবাহ ব্যাপারে ভারি একটা ছেলেমি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। বিবাহ জিনিষটা এমন একটা ছেলে খেলা নয় যে, এমন চট্ করিয়া রাতারাতি সারিয়া ফেলিতে হয়। একটু দেখিতে শুনিতে হয়, একটু ভাবিতে চিন্তিতে হয়, তা নয়, প্রথম মদের মুখেই "উঠ ছুঁড়ি তোর বে!"

চিত্রশালার কলা-লক্ষ্মী অরুণকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন সেই জন্যই বোধ হয় ধন দৌলতের লক্ষ্মী তাকে অতিরিক্ত স্নেহ দেখানটা কখনই আবশ্যক বোধ করেন নাই। এমন অবস্থায় তার পক্ষে গরীব পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে বিবাহ করাটা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ বিপদের সময় তার শ্বশুর

চন্দ্রে রেখেছ চরণ-নখে ছন্দে রেখেছ পায়,
কটাক্ষে তব বিজলী জলে নিশ্বাসে মলয় ধায়।
উষারে দিলে সীঁথির ভূষা শিশিরে আঁখির জল,
নিশীথে শিখালে নীরব ভাষা কোকিলে কাকলী কল।
তব অন্তরতলে উছলে ফল্গু শান্তি শীতল ঝরা
অব গুণ্ঠন মাঝে শ্রীমুখ রাজে ক্লান্তিকলুষ হরা!
সুধীরে কুটীরে ফুটিছ নিত্য শুভ্র রজনীগন্ধা,
আর্ত্ত-শিয়রে অমিয় ভাণ্ড মর্ত্তে অলকনন্দা!
স্বর্ণ-তনিমা শীর্ণ মা তোর অন্ধ আতুরে সেবি
তুমি যে রমণী জগত ধাত্রী মাতৃরূপিণী দেবী।

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

চিত্রার্পিতা

(১)

অরুণ সতীশের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আজকালকার বহির্মুখী সভ্যতার দিনে 'বন্ধু' বলিতে আমাদের যে অবয়বহীন শিষ্টাচারের লৌকিক সম্পর্কটা মনে পড়ে অরুণ সতীশের তেমনতর বন্ধু নয়। সে তার সত্য সত্যই অত্যাগ-সহনো বন্ধু, সমপ্রাণ সখা! যে বন্ধুত্ব তরুলতা ঘেরা পল্লীর শিশিরশিক্ত প্রান্তরের মুক্ত আনন্দরাশির মাঝে অঙ্কুরিত, কৈশোরের অকপট প্রীতি-রসে পল্লবিত হইয়া এত দিনে নব যৌবনের বসন্ত পবনে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তেমন বন্ধু, কারো কারো জীবনে ক্বচিৎ এক আধটি মিলে অনেকের ভাগ্যে একেবারেই মিলে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া অরুণ গেল ডাক্তারী পড়িতে। আর সতীশ ঢুকিল কলেজে। কিন্তু মনুষ্য-কঙ্কালদের নীরব সভাগৃহে কিছুতেই অরুণের মন টিকিতে চাহিল না, এবং শবব্যবচ্ছেদ গৃহের বিকট দুর্গন্ধে তার সমুদয় উৎসাহ দূর হইয়া যাইতেও বড় বেশী সময় লাগিল না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমান সতীশচন্দ্র অঙ্কশাস্ত্ররূপ 'দুস্তর বারিরাশি' দর্শন করিয়া মনে করিল তার চেয়ে বাকি জীবনটা নেহাৎ অজ্ঞাত বনবাসে যাপন করাও অনেক পরিমাণে সুখকর।

তারপর তাদের পল্লীগ্রামের বনমালতীর ফুল ছড়ানো ছায়াতলে, পাহাড়তলীর উপল-গড়া ঝড়না তলায় পল্লীগ্রামের মন ভুলানো রাঙ্গা মাটীর সরু পথে বেড়াইতে বেড়াইতে তারা দুজনে ভবিষ্যতের দিক নির্ণয় করিবার জন্য অনেক আলোচনা আন্দোলন, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া কাটাইয়াছে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর শেষে তারা ঠিক করিয়াছে বাকী জীবনটা সৌন্দর্য্যের ধ্যানে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। আনন্দের গভীর নীল জলে যাঁর পদ্মাসন, রসের মাধুরী লাগিয়া যাঁর স্বর্ণ পদ্মের রাঙ্গা পাপড়িগুলি আপনা আপনি খুলিয়া যায় তারা সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর, সেই আনন্দ-দেবতার জন্ম জন্মান্তরের পূজারী। অরুণ বলিল, আমার হৃদয়ের আলো লাগিয়া আকাশের তারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আমার ভাবের স্বপ্ন লাগিয়া প্রান্তরের বনফুল নীহারশিক্ত হইয়া উঠিবে। আমার তুলিকায় সত্য স্বপ্ন হইবে, স্বপ্ন সত্য হইবে, ফুল ফুটিয়া ঝরিবে, ঝরিয়া ফুটিবে। আর সতীশ বলিল, আমাকে পাষাণের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দিয়া ভাবময়ী কল্যাণ স্বরূপাকে শাপমুক্ত করিয়া দিতে হইবে। কঠিনের ভিতরে যে কৃচ্ছ-সাধন তাপস-মূর্ত্তি বিরাজমান তার তপ ভঙ্গ করিয়া দিয়া কোমলের তরল ছন্দখানি তার চারি দিকে মর্ম্মরিত করিয়া দিতে হইবে। তবে তো আমার সাধনা সফল হইবে। তাই অরুণ হইল চিত্রকর, আর সতীশ হইল ভাস্কর শিল্পী।

অরুণের চেহারাটা যেমন দুর্ব্বল মনটা ততোধিক ভঙ্গপ্রবণ; লম্বা ছিপছিপে দেহখানি। ডাগর ডাগর চোখদুটি সুন্দর—অতি নিরুপমভাবে সুন্দর। তবু যেন কেন সে হাসি হাসি মুখ দেখিয়া চোখের জলের কথাই মনে পড়ে। সতীশ কিন্তু অন্য ধরণের মানুষ। সে অনেকটা চটপটে কাজের লোক। শাণিত যন্ত্রে পাথর কাটিয়া তবে তাতে তা'র ভা'ব ফুটাইতে হয়,

যায়। পেট যদি অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে তাহা হইলে পিচ্‌কারী করিয়া কতকটা অল্প গরম জল, ইহার গুহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে কতকটা বায়ু নির্গত হইয়া যায়, তাহার জন্য শিশুর কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়। শিশুর যদি প্রতিদিন পেট ফাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার খাওয়া দাওয়ার গোলমাল হইতেছে ; এরূপ স্থলে ৩ গ্রেণ বাই কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা (bi-carbanate of soda) একটু ডিল ওয়াটার (dill Water) এর সঙ্গে দিবসে ৩। ৪ বার খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার সহিত ৩ ফোঁটা ব্রাণ্ডি (brandy) ও আবশ্যক বুঝিয়া যোগ করা যাইতে পারে। যদি এমন দেখা যায় যে, শিশু চোখ ঘুরাইতেছে আর তাহার চোখ মুখের চামরা কুঁচ্‌কাইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহার পাকস্থলীতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ হইলে এক ঝিনুক ডিল্ ওয়াটার্ (dill water) কি মহুরী ভিজার জল খাওয়াইয়া দিলে ফল পাওয়া যায়।

বমি—নানা কারণে শিশুর বমি হইতে পারে। বমি জরের একটা বিশেষ উপসর্গ। অধিক ভোজন হইলেও বমি হইতে পারে। দুষিত খাদ্য দ্রব্য দ্বারাও বমি হয়। দুধ খাওয়াইয়া শিশুকে ঝাঁকা দিলে, কিংবা দুলাইতে থাকিলেও বমি হইতে দেখা যায়। খাওয়ার দোষে হইলে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দুধের সঙ্গে জলের ভাগ বাড়াইয়া দিবে। খুব ঘন ঘন, না খাওয়াইয়া দেরী করিয়া খাওয়াইতে থাকিবে। দুধ খাওয়ার বোতলটি অপরিষ্কার থাকিলে, তাহাকে উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া লইবে। বমি যদি সহজে না বন্ধ হয়, তাহা হইলে ডাক্তার ডাকা উচিত।

হিক্কা—প্রায় সব শিশুই অনেক সময় হিক্কা তুলিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। এক ঝিনুক মহুরী ভিজা জল খাওয়াইলে অনেক সময় তৎক্ষণাৎ ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

শিশুর ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা—কেহ কেহ শিশু কিছুতেই কোল ছাড়া করে না, সর্ব্বদা দাই ক্রোড়ে করিয়া রাখে। ইহা ভাল নহে। এরূপ করিলে, শিশু আপনার হাত পা নাড়িতে পারে না। ইহার জন্য তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও সুপরিণত হইতে পারে না। শিশু যত হাত পা ছুড়িবে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল জানিবে। শিশুর চোখের সম্মুখে কোন একটা জিনিস ধরিলে, সে হাত বাড়াইয়া তাহা ধরিতে চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার মাংসপেশীর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। স্নানের পূর্ব্বে যখন তাহাকে তেল মাখান হয় সে সময় সে আপন মনে হাত ছুড়িতে থাকে, ইহাতে বাধা দিতে নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চি।

মাতৃমূর্ত্তি

দেবি !

নাহিক আমার পূজার অর্ঘ্য, এযে শুধু মরুভূমি !
বিশ্বভাণ্ডার উজার করিয়া সকলি নিয়াছ তুমি !
দন্তে রেখেছ কুন্দ-কলিকা গণ্ডে গোলাপ গুল্-
অধরে ধরেছ পক্ক বিম্ব আঙুলে চম্পক ফুল ;
শ্রীপদে কত রক্ত কমল আস্যে বিমল বিভা,
হাস্যে ফুটাও কাশ কুসুমে পরশে জাগাও দিবা !
খঞ্জনে শিখাও চটুল নৃত্য ভ্রমরে গুঞ্জন গীতি,
কুরঙ্গে দিলে নয়ন-ভঙ্গী মাতঙ্গে মন্থর গতি।
পুণ্য বক্ষে শুক্তনিঝর কক্ষে কুমারে বহ
সিক্ত লোচনে শোচনা হর যত্নে যাতনা সহ।
বাহুতে বেঁধেছ ললিত বল্লী কটিতে কেশরীরাজ
কিশোর কণ্ঠে কঠিন কম্বু কোমলে কড়ির সাজ !
চারু ভ্রূ-ভঙ্গে গগন-অঙ্গে রাঙিলে মোহন ধনু,
উজল আঁখি কাজলে আঁকি সাজালে জলদ-তনু।

সাবধানে রাখিতে হয়। সেখানে যাহাতে জল স্পর্শ না করে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। টীকা দেওয়ার পর ৫ দিন হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত শিশুর মেজাজটা বড় খিট্‌খিটে হয়। তিন দিনের দিন হইতে টীকা উঠিতে আরম্ভ করে। ৫ দিনে ফোস্কায় পরিণত হয়। তাহার পর ফোস্কাটি পাকিতে আরম্ভ করে এবং ঘা হয় এবং চটা পড়ে, ১৫ দিন হইতে ২১ দিনের মধ্যে চটাটা শুকাইয়া উঠিয়া যায়। সেখানে একটা লাল দাগ থাকে, কালক্রমে দাগটা সাদা হইয়া যায়। টীকা দেওয়ার তৃতীয় দিনে শিশুকে একটু ক্যাষ্টর্ অইল্ (Castor Oil) খাওয়ান ভাল। প্রথম সপ্তাহের শেষাশেষি সময়ে, যে স্থানটিতে টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার চারি পার্শ্বে খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া খুবই লাল হয়। ইহাতে ভয় পাইবার কি ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা আপনা হইতেই সারিয়া যায়।

মুখের মারি লাল হওয়া—শিশুর পেটের গোলযোগ ঘটিলে, এবং তাহার দাঁত উঠিবার সময় হইলে, তাহার সর্ব্বগাত্রে বিশেষতঃ মুখের মধ্যে একরূপ লাল লাল দাগ নির্গত হয়। ইহাতে ব্যস্ত হইবার কোন আবশ্যক নাই। ৬০ ফোটা ফ্লুইড্ ম্যাগনেসিয়া (Fluid Megnesia) সকালে এক বার সন্ধ্যায় এক বার খাওয়াইয়া দিলেই সকল ঠিক হইয়া যায়।

শিশুর মুখের মধ্যকার ঘা—শিশুর মুখের মধ্যে সাদা সাদা এক রকম দাগ বাহির হইতে দেখা যায়। মাতার স্তনের বোঁটা, কিংবা তাহাকে যে বোতলে করিয়া গরুর দুধ খাওয়ান যায়, সেই বোতল অথবা দুধটা অপরিষ্কার হইলে এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া এক টুক্‌রা পরিষ্কার নরম ন্যাকড়া গরম জলে ভিজাইয়া তাহার দ্বারা উহার মুখের মধ্যটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর গ্লাসিরিন্ অব বোরাক্স্ (Glycerine of borax) নামক ঔষধ অথবা সোহাগার খই মধুতে মাড়িয়া মুখের মধ্যে লাগাইয়া দিবে। এই ন্যাকড়া দ্বিতীয় বারে ব্যবহার করা উচিত নয়। দ্বিতীয় বার দুধ খাওয়ানের সময় নূতন ন্যাকড়া ব্যবহার করা উচিত। শিশুর মুখে ঘা হইলে তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহার পেটটি যাহাতে ভাল থাকে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তাহাকে প্রশস্ত ঘরে রাখা উচিত। তাহাকে যে দুধ খাওয়াইবে, তাহা যেন টাট্‌কা হয় এবং তাহার যেন কোন দোষ না থাকে।

শিশুর মাথার কাউর ঘা (eczema of the scalp) শিশুর মাথায় চটা বিশিষ্ট একরূপ ঘা হয়। এই ঘা মাথা হইতে কান, কান হইতে সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। এ ঘা অতি সহজেই আরোগ্য করিতে পারা যায়। এরূপ হইলে, শিশুর মাথায় সাবান জল দিতে নাই। নারিকেল তৈল কিংবা অলিভ অইল্ (olive oil) গরম করিয়া তাহার দ্বারা মাথাটা ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর নরম ন্যাকড়া দিয়া তৈলগুলি মুছিয়া ফেলিয়া নিম্নের মলমটি লাগাইয়া দিবে—প্রেসিপিটেটেড সালফর্ (precipitated sulphur) ১০ গ্রেণ; অকসাইড অব্ জিনক (oxide of zinc) ২০ গ্রেণ; অলিভ্ অইল্ (olive oil) অৰ্দ্ধ আউন্স্; ভেসেলিন্ (vaseline) অৰ্দ্ধ আউন্স মিশ্রিত কর।

শিশুর পেট ফাঁপা—শিশুর পেটে হাওয়া জমিয়া বিশেষ কষ্ট দিতে পারে। পেটে হাওয়া জমিলে, শিশুর বমি হইতে পারে এবং পেট কামড়াইতে পারে। শিশুর পেট কামড়াইতে থাকিলে, সে কাঁদিতে থাকে এবং পা দুখানি পেটের দিকে জড় করিয়া রাখে। পেট কামড়ানি যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে তাহার চোখ মুখ প্রভৃতি নীলবর্ণ ধারণ করিতে পারে। এক টুক্‌রা ফ্ল্যানেল্ গরম জলে ডুবাইয়া বেশ করিয়া নিঙ্গড়াইয়া লইয়া, তাহার দ্বারা উহার পেটে স্বেদ দিবে। একটুখানি ক্যাষ্টর্ অইল (castor oil) খাওয়াইয়া দিবে। উহার মলে খুব অসম্ভব সবুজ বর্ণের ডেলা সমূহ দৃষ্ট হইবে। গরম জলে স্নান করাইলে অনেক সময় পেট কামড়ানি কমিতে দেখা

৭।৮ মাসে গর্ভে থাকিয়া যে সকল শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, চেষ্টা করিলে তাহাদের যে না বাঁচাইতে পারা যায় এমন নহে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে হইলে কিছুতেই বাঁচাইতে পারা যায় না। অকালজাত শিশুকে বাঁচাইতে হইলে বিশেষ যত্নের আবশ্যক করে। ইহাদিগকে সাধারণ শিশুর মত রাখিলে চলিবে না। জন্ম গ্রহণের পর প্রায় ২।১ মাস ইহাদিগকে ইন্‌কিউবেটার্ (incubator) নামক বিশেষ এক প্রকার খাটের মধ্যে রাখিতে হয়। ইহাদের হাত পা তুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা উচিত। ইন্‌কিউবেটার (incubator) এর মধ্যে রাখার সুবিধা না ঘটিলে, শিশুটিকে তুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। অকালজাত শিশুকে যত অল্প নাড়াচাড়া করা যায়, ততই ভাল। ইহাকে প্রতিদিন স্নান করাইবার আবশ্যক নাই। সপ্তাহে একবার করাইলেই চলিতে পারে। স্নানটা শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিবে। ইহার গা বেশীক্ষণ আর্দ্র রাখিতে নাই। অকালজাত শিশুদিগকে স্তন্য দেওয়া মাতার পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে ইহাদিগকে পেপটোনাইজ্‌ড্ দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করিবার আবশ্যক হয়। দুধ এক ভাগ; পরিষ্কার জল ৩ ভাগ; ফেয়ারচাইল্‌ড্‌স্ পেপটোজেনিক পাউডার (fairchild's peptogenic powder) অর্দ্ধেক মাত্রা ১৫।২০ মিনিট ধরিয়া অগ্নি-তাপে ফুটাইয়া গালাইয়া ফেলিবে। ইহাদিগকে অন্য শিশুদের তুলনায় অল্প খাদ্য দিতে হইবে। ধীরতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে যত্ন গ্রহণ করিলে, তবেই এসব শিশুর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, অন্যথা মৃত্যু স্থির নিশ্চয় বলিয়া মনে করিবে। এই সকল শিশু সাধারণতঃ এমন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে যে, মাতার স্তন হইতে দুধটুকু চুষিয়া খাওয়ারও তাহাদের শক্তি থাকে না। এরূপ স্থলে মাতার স্তন হইতে কতকটা দুধ গালিয়া ফেলিয়া, পরে স্তন্য দিলে, কি হয় না হয়, ঠিক বলা যায় না। ইহাদের দাঁত কিছু বিলম্বে উঠিতে দেখা যায়। ইহারা হাটিতে ও কিছু বিলম্বে শিক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের যে সাধারণতঃ কম বুদ্ধি হয় এমন মনে করার কোন কারণ নাই। সার্ আইজ্যাক্ (Sir Isaac Newton) ও ৭ মাসের ছেলে; তাঁর মত বুদ্ধি ক'জনের হয়?

যমজ সন্তান—যমজ সন্তানদের মধ্যে সাধারণতঃ দুটিকেই ঠিক সমান হইতে দেখা যায় না। একটি কিছু বড় ও বলবান দেখায় অপরটিকে কিছু ছোট ও দুর্ব্বল দেখায়। ইহাদেরও বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। দুটি শিশুর উপযোগী দুগ্ধ অনেক মাতার স্তনেই জন্মাইতে দেখা যায় না। এরূপ স্থলে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুটিকে মাতৃস্তন্য দ্বারা ও অপরটিকে পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ দুধ (Peptonized Milk) দ্বারা মানুষ করাই যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বিবেচনা হয়। যে সকল শিশু স্তন টানিতে পারে না, তাহাদিগকে স্তনী হইতে দুধ লইয়া, ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে। অতটুকু শিশুকে ঝিনুক কি চাম্‌চে করিয়া দুধ খাওয়ান খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তা বলিয়া আর উপায় কি আছে?

টীকা দেওয়া—অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন সকল শিশুকেই কি টীকা দেওয়া আবশ্যক? উত্তর—নিশ্চয়। যদি সকলকেই ৩ মাস বয়সে আর ১২ ও ২৪ বৎসর বয়সে এক বার করিয়া টীকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বসন্ত রোগ বোধ হয়, দুদিনেই পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের মধ্যে যত বসন্ত রোগ হয়, যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন নয়। হইলেও তেমন মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় না। শিশুর ৩ মাস বয়স হইলে, টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। টীকা দেওয়ার পূর্ব্বে, তাহার স্বাস্থ্য কেমন, আহারে রুচি কেমন, পেটের কোন গোলযোগ আছে কি না—এ সকল বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক। রুগ্ন শিশুকে অথবা যাহার পেটের গোলযোগ আছে, তাহাকে তখন টীকা দিতে নাই। হাতের যেখানে টীকা দেওয়া হয়, সে স্থানটিকে খুব

দিয়া আসিল। পূজার পর চুপে চুপে জুমের চাউলের ভাত আলাদা করিয়া রাঁধিয়া রাখিল। সওদাগরের খাওয়া হইলে পর বৌকে ডাকিয়া বলিল, "মা, তুমি আম্মার পাত(অ) খাও।" বৌ থালাটি লইয়া গিয়া রাখিয়া দিল, এবং জুমের চাউলের ভাত ও কচুর শাক খাইয়া রহিল।

বৈকালে সওদাগরের পুত্র বিবাহের দ্রব্যাদি আনিল, এবং ভোজের আয়োজন করিল। সন্ধ্যা বেলা বৌ ঘরের কোণে ও নানা গুপ্ত স্থানে আলো দিল, কেহই দেখিতে পাইল না।

ভোজের রান্না হইতেছে। বৌ মাছ ভাজিতেছে। এদিকে অলক্ষ্মী কন্যাটা মাছের গন্ধে আর তেঁতুল গাছে থাকিতে না পারিয়া সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বৌ'র কাছে এক টুকরা ভাজা মাছ চাহিল। বৌ ব্যাপারটা বুঝিল এবং অলক্ষ্মী কন্যাটাকে বলিল, "একটু খাড়ও, তোমারে আগে মাছ দিলে কে কি কইব; আমি চুপে চুপে তোমারে দেম্।" বলিয়া বৌ একটা হাতা খুব লাল করিয়া পোড়াইল এবং অলক্ষ্মী কন্যাটাকে বলিল, "অখন তুমি আক্ কর আমি মাছটা তোমার নার্(অ) ফালাইয়া দেই।" কন্যাটা তাহাই করিল। বৌ সেই অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত হাতাটা কন্যাটার মুখে চাপিয়া ধরিল। অলক্ষ্মী কন্যাটা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া তে-মাথায় পড়িয়া হাত পা ছড়াইয়া মরিয়া গেল।

রাত্রে লোকজন আসিল, বাদ্যকর আসিল, পাল্কী আসিল। কন্যাকে আনিতে যাইতে হইবে। সওদাগর বলিল, "আমি নিজে যাইয়াম্।" তেঁতুল গাছের নীচে গিয়া দেখিল কন্যা সেখানে নাই। ফিরিয়া আসিয়া বৌকে বলিল, "মা, যাইয়া পাইলাম্ না।" বৌ শ্বশুরকে তে-মাথায় লইয়া গিয়া অলক্ষ্মী কন্যাকে দেখাইল, এবং সকল কথা তাহাকে বলিল, বাড়ীর সমস্ত লোকজন রাস্তায় জড় হইল। সওদাগর সকলের সম্মুখে পুত্রবধূকে প্রশংসা করিয়া বলিল, "আমার সংসারে অলক্ষ্মী আইত(অ) লইছিল্; লক্ষ্মী বৌ আমার সংসার রইক্ষা করছে। আমি আর কোন দিন বিয়ার কথা মুখ(অ) আনতাম না। বৌ আমার সংসারের লক্ষ্মী।"

সওদাগরের সংসার আরও সুখের হইল, এবং এইরূপে গাড়ৈ ব্রত সংসারে প্রচারিত হইল।

গাড়ৈ সংক্রান্তির পরদিন আকাশে প্রথম প্রদীপ দেওয়া হয় এবং এক মাস এইরূপ আকাশে দীপ দেওয়া হইয়া থাকে। দীপান্বিতার মত গাড়ৈ দিন সন্ধ্যা বেলায়ও ঘর বাড়ী আলোকিত করার নিয়ম আছে। তুলা রাশিতে রবি প্রবেশ করা পর্য্যন্ত আকাশে দীপ দান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়—

দীপ দানেন বিপ্রেন্দ্র, ন পুনর্জায়তে ভুবি।
রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে,
তৎফলং কোটিগুণিতং দীপ-দানেন কার্ত্তিকে।
ঘৃতেন দীপকো যস্য তিল-তৈলেন বা পুনঃ
জ্বলতে মুনি-শার্দ্দূল, অশ্বমেধেন তস্য কিম্?
উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
বিষ্ণু কেশবমুদ্দিশ্য দীপং দদ্যাত্তু কার্ত্তিকে;
আকাশস্থং জলস্থঞ্চ শৃণু তস্যাপি যৎ ফল—
ধনধান্য সমৃদ্ধশ্চ পুত্রবানীশ্বরো গৃহে
লোচনে চ শুভে তস্য বিদ্বানপি চ জায়তে।

নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আকাশে দীপ দিতে হয়—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

শিশু চিকিৎসা

অকালজাত শিশু (Premature children)—

সাধারণতঃ শিশু পূর্ণ নয় মাস মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়। যে সকল শিশু সময় হইবার পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অকালজাত শিশু কহে।

হইবে। স্থানে স্থানে উন্মুক্ত জায়গা রাখিতে হইবে (Parks)। সমস্ত সহরটিকে একটি বাগানের আকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যখন সেদিন আসিবে তখন ব্যাধি অধিক থাকিবে না। সকলের হাস্য মুখরিত দীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিবে। জগতে আবার প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

গাড়ৈ ব্রত

যে সকল স্ত্রীলোকের খাশুড়ী নাই তাহারাই আশ্বিনের সংক্রান্তি দিন এই ব্রত করিয়া থাকে। ব্রতিনীগণ ব্রতের দিন হালের উৎপন্ন দ্রব্য, জালের মাছ ও গরুর দুধ খাইতে পারে না; মাথায় তেল ব্যবহার করিতে পারে না, ও ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া সম্বরা দেয় না। সে দিনের একমাত্র খাদ্য কচুর শাক, নারিকেল ও কলা; বিধবাগণ বীচি কলা, শিমের সাতু ও নারিকেল প্রভৃতি খাইয়া থাকেন। জাল ছাড়া অন্য রকমে ধরা মাছ সধবাগণ খাইতে পারে।

ব্রতের দিন সকাল বেলা পুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট একটি অগভীর ছোট গর্ত্ত করা হয় এবং ইহার পাড়ে কুল গাছ, আম, কাঁঠাল, আদা, হলুদ, মানকচু ও কলা গাছ বুনিয়া দেয়, এবং পুকুরটার একটা 'জান' বা জল নিকাশের বন্দোবস্ত রাখে। পাশে মানকচু পাতার উপর মাটি দিয়া শোয়া অবস্থায় একটা স্ত্রী-মূর্ত্তি তৈয়ার করে এবং ইহার নিকটে ব্রতের পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার উপকরণ অন্যান্য পূজার উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 'জুমের' উৎপন্ন চাউল, বীচি কলা, সাপ্‌লা, ভেটু, কাঁচা তেঁতুল, খেসারি ডাল ও নারিকেল দিয়া পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, হালের উৎপন্ন দ্রব্যাদি পূজায় দেওয়া হয় না। এই ব্রতে যমের পূজা হয়, * এবং পুকুরটাকে যম পুকুর বলে। পূজার অন্তে ব্রতিনীগণ আপন আপন খাশুড়ীর তৃপ্তির জন্য ঘটিতে করিয়া যম পুকুরে জল ঢালিয়া দেয়। সে সময় পুকুরটাতে দুই একটা পানা ও ছাড়িয়া দিয়া থাকে। জল ঢালা শেষ হইলে কচু পাতার উপর যে মূর্ত্তিটা তৈয়ার করা হয় সেইটার দিকে পেছন ফিরিয়া এক জন স্ত্রীলোক বা হাতে দুই পায়ের মধ্য দিয়া দা'য়ের তিন আঘাতে মূর্ত্তিটাকে কাটিয়া ফেলে।

ব্রতের কথা।

এক সওদাগরের এক পুত্র। অনেক দিন সওদাগরের স্ত্রী মারা গিয়াছে। পুত্র-বধূ গাড়ৈ ব্রত করে। ব্রতের দিন ঘর বাড়ী ধোয়, পরিস্কার করে, সমস্ত বাড়ীতে গোবর ছড়া দেয়, নিয়ম মত ব্রতের পূজা দেয়, হালের কোন জিনিষ ও জালের ধরা মাছ খায় না।

এক দিন একটা তেঁতুল গাছের উপর হইতে নানা অলঙ্কার পরা একটা সুন্দরী কন্যা সওদাগরকে ডাকিয়া বলিল, "সওদাগর তুমি আমারে বিয়া কর।"

বাড়ী আসিয়া সওদাগর পুত্র-বধূকে বলিল, "আমি কাইল অই বিয়া কইরাম। যাইয়া আমি নিজে দেখছি। কাইল আশ্বিন মাসের সংক্রান্ত্য। কিন্তু তোমার একটা কাজ করতে অইব। কাইল তুমি ঘর বাড়ী ফোর্‌তা পার্ত্তা না, গোবর ছিডা দিতা পার্ত্তা না, আলের জিনিষ ও জালের মাছ খাইবা।" পুত্রবধূ বুঝিল অলক্ষী কন্যারই এই কাজ, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "আইচ্ছা।"

পরদিন সওদাগর জালে ধরা একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ আনিয়া বলিল, "মা, তোমার কিন্তু আমার পাত্ (অ) বৈয়া খাইতে অইব।" এদিকে বৌ খুব সকালে উঠিয়া ঘর বাড়ী পরিস্কার করিল, গোবর ছড়া দিল, ঘরের এক কোণে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালাইল। পরে সময় মত অন্য এক বাড়ীতে গাড়ৈ ব্রতের পূজার দ্রব্যাদি

---

* যমং কৃষ্ণবর্ণং দ্বিভুজং মহিষোপরি সংস্থিতং চর্ম্ম-চাপ-দণ্ডধরং অভয়ং ভক্তবৎসলং।

অধিক সাবধানতার আবশ্যক। এই সব সময়ে মস্তকে ঠাণ্ডা লাগাইলে ভাল হয়। সূর্য্যের আলোক ব্যতীত বৈদ্যুতিক আলোও উহারই প্রকার ভেদে রঞ্জন আলো প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ ব্যাধিতে নানারূপ প্রয়োগে বিবিধ চিকিৎসা হইয়া থাকে। উহার বিস্তৃত আলোচনার সময় আজ হইবে না।

সূর্য্যকিরণ স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, এবং ইহা স্নায়ুর বলকারক। সৌরস্নান স্নায়বিক ব্যাধিতে উপকার করে। যে সমুদায় স্থানে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করে, সে সব স্থানে মশার উপদ্রব অতিশয় কম, সুতরাং আজকালকার ধারণা অনুসারে ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

উপরোক্ত সমুদায় কারণ হইতে দেখা যাইতেছে, বায়ু ও আলোক আমাদের কিরূপ উপকারী! যাহাতে আমরা উহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাই, সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করা উচিত। রাত্রে কখনও সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করা উচিত নহে; অন্ততঃ পক্ষে ২।১টিও খোলা রাখা সঙ্গত।

যে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহির না হওয়া যায়, সে দিনটা কি বিশ্রী লাগে, সন্ধ্যা কালে এক বার বায়ু সেবন করিয়া আসিলে মনটা কি প্রফুল্ল হয়, প্রভাত ও সান্ধ্য সমীরণ অতি পবিত্র। সব স্থানের সব হাওয়া সব সময়ে ভাল নহে কলিকাতায় বসন্ত কালের দক্ষিণা হাওয়া অতি মধুর ও সুখস্পর্শ, কিন্তু শীতকালের উত্তুরে হাওয়া কি কনকনে ও ব্যাধি-উৎপাদক। মধুপুর, গিরিধি, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানের পশ্চিমে হাওয়া ফাল্গুন মাসে অতি স্বাস্থ্যকর। অনেক স্থানের প্রবল হাওয়া খারাপ। এইরূপ স্থান-বিশেষে ও ঋতুভেদে বায়ুর গুণের প্রভেদ হয়। খুব বেশী জোরে যে হাওয়া দেয়, তাহা ভাল নয়, জোয়ারে হাওয়াগুলি অত্যন্ত খারাপ,—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গরমের সময়ে 'লু' নামে অত্যন্ত গরম হাওয়া দেয়, তাহাতে নানারূপ ব্যাধি উৎপাদিত হয়। এই সব বিষয়ে আমাদের দেশে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই। নানা স্থানের বায়ুর অবস্থা ঋতুভেদে ও গতিভেদে তাহাদের গুণাগুণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক। কোথায় নিকটে গজারী ফুল ফুটিয়া বায়ু দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর করে, কোথায় চন্দনের গন্ধে দিক সকল আমোদিত হয়, কোথায় "জাইন" গাছের হাওয়ায় ক্ষয় রোগীকে নবজীবন দেয়, কোথায় ইউক্যালিপ্টাস (Eucalyptus) গাছ সকল ম্যালেরিয়া বারণে সাহায্য করে (By improving drainage), এ সব বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আপনারা সকলেই ক্ষয়রোগে স্যানাটোরিয়াম (Sanatorium) বা বায়ু সহযোগে চিকিৎসার (Open air treatment) কথা শুনিয়াছেন; বায়ু কি আসাধ্যই সাধন করিতেছে। কত মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ দান করিতেছে। ডাক্তারেরা নানাপ্রকার ব্যাধিতেই বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন। সহরের বাহিরের বায়ু কি নির্ম্মল! যাহারা গ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে অভ্যস্ত তাহারা সহরে আসিলে হাঁপাইয়া পড়েন। এখানকার বায়ু তাহাদের নিকট যেন বিষতুল্য। আমরা সহরে জড় হইয়া শুধু সহরের রোগ বৃদ্ধি করিতেছি। বায়ু চলাচলের পথ নাই। বাড়ীর গায়ে বাড়ী, রৌদ্র আগমনের পথ নাই। স্যাতস্যাতে ঘরের মধ্যে দিন রাত বাস; লোকে যে একবার প্রকৃতির উন্মুক্ত বক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার মোহন ছবি দেখিয়া সর্ব্বজ্বালা বাথা দূর করিবে তাহার উপায় নাই। ইহার ফলে কি হইতেছে? আমরা ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইতেছি না। সমস্ত জাতি শুদ্ধ দুর্ব্বল হইতেছি ও দিন দিন কর্ম্মে অক্ষম হইতেছি। দরিদ্রতা জাতির মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিতেছে।

এখনও সাবধান হইলে উপায় আছে। সহরকে গ্রামের মত করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে যাহাতে আলোক ও বায়ু আসিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক বাড়ীতে খানিকটা খালি জায়গা রাখিতে হইবে। যাহাতে বাড়ীর গায়ে বাড়ী না উঠে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাস্তা-ঘাটগুলিকে সোজা ও প্রশস্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিতে

চক্ষুর মধ্যে রেটিনা নামক একটি স্নায়ুর আবরণ আছে। উহার উপর আলোক পতিত হইলে দর্শনশক্তির উদ্ভব হয়। সুতরাং আলোকের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না।

আলোকের তিনটি প্রধান গুণ—ইহা (১) আলো দান করে (২) উত্তাপ দেয় ও (৩) ইহার প্রভাবে নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

আলোক জগতের আঁধার দূর করে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি দেয় এবং প্রাণের সকল ভয় দূর করিয়া জীবকে অভয় দান করে। এই তাপ দ্বারা সৃষ্টি পালিত হয়, এই তাপের অভাব হইলে আমরা বাঁচি না, তাপই আমাদের জীবনীশক্তি। গাছ-পালাগুলি যেমন আলোক না পাইলে নির্জীব হয়, ফ্যাকাসে হয়, বর্দ্ধিত হয় না, আস্তে আস্তে শুকাইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, আমাদের অবস্থাও তাহাই। আলোক বিহনে আমরা স্ফুর্ত্তি-হীন, হীনবল ও নির্জ্জীব হই, একটা অবসাদের ভাব আসে, দেহের পুষ্টি হয় না এবং ক্রমে রক্তশূন্য হইয়া প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়। গাছগুলি রৌদ্রের অভাবে বাঁচে না, কিন্তু অত্যন্ত প্রখর রৌদ্র হইলে আবার শুকাইয়া যায়। মানুষের পক্ষেও প্রখর আলো অহিতকর। সূর্য্যের আলোক ও বৈদ্যুতিক আলোক প্রায় একই উপাদানে গঠিত। দুটা রঙ্গ মিলিয়া সূর্য্যের আলো শাদা হইয়াছে। হলুদের কাছা-কাছিগুলিতে আলো দেয়, বেগুণীর কাছাকাছি গুলিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটায়, আর লালের কাছাকাছি গুলিতে উত্তাপ দেয়।

সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে ও বেশী সময় রৌদ্রে থাকিলে মানুষের শরীরে অনেক সময়ে লাল চাকা দাগ উঠে (Erythematous rash), কখনও কখনও অনাবৃত স্থানগুলি পুড়িয়া লাল হয় (sun-burnt), যদি অত্যন্ত বেশী পোড়ে তবে কালোও হয়।

অধিক ক্ষণ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে সহসা চোখে দেখা যায় না, চোখে ঘোলা দেখা যায়। চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও চক্ষুর প্রদাহ হয়। কখনও কখনও সূর্য্যতেজের আধিক্যে লোক অন্ধ হয়। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোক সম্বন্ধেও এইরূপ। অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে শিরঃপীড়া হয়, সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়া কখনও বা কেহ মারাও যায় (sun-stroke).

আলোক বর্ত্তমানে শরীরের দহন-ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলে প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস অধিক নির্গত হয়। এই আলোক দ্বারাই জগতের যত রসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। কাঠ কয়লা প্রভৃতি জগতের যত কিছু পদার্থ, এমন কি আমাদের এই নবনীতকোমল দেহখানিও এই আলোকের দ্বারা পোড়া হইতেছে এবং ইহাই আলোকের রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

সূর্য্যের আলোক দেহের চর্ম্মকে কার্য্যে উত্তেজিত করে। কিছুক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, লোমকূপের ছিদ্র-সমূহ প্রসারিত হয় এবং শরীর হইতে বহুবিধ দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।

আলোক একটি প্রধান পচননিবারক (antiseptic) ইহা প্লেগ, যক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ লোকক্ষয়কারী ভীষণ রোগের জীবাণু সমূহকে ধ্বংস করে। ইহা অনেক প্রকার দূষিত পদার্থকে দহন করিয়া (oxidation) বিশুদ্ধ অব-স্থায় আনয়ন করে। বায়ুর মধ্যে যে বহুবিধ জান্তব পদার্থ থাকে, আলোক এই উপায়েই তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া বায়ুকে পবিত্র ও নির্ম্মল করে।

সুতরাং যাহাতে বাড়ীর প্রত্যেক স্থানে সূর্য্যকিরণ যায়, সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। সূর্য্যালোক যে আমাদিগকে কত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দেয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সৌর স্নান (Sun-bath) —আজকাল অনেক প্রকার ব্যাধিতে সৌরস্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। চর্ম্ম-রোগে, দুর্ব্বলতায়, রক্তশূন্যতায়, ক্ষয়ে এবং অন্যান্য অনেক রোগে ইহাতে বেশ উপকার দর্শে। তবে, সাবধানতার একান্ত আবশ্যক। কোন রোগেই রোগীকে বেশীক্ষণ রৌদ্রে রাখা সঙ্গত নহে। সকাল বেলা ও অস্তগামী সূর্য্যের কিরণই ভাল। দু'প্রহরের প্রখর রৌদ্রের সময় গাছের ছায়ায় থাকিলেই চলে। হৃদ্‌রোগের রোগীকে সৌরস্নান দিতে

নানারূপে প্রত্যাগত হয়। গৃহে, বাটীতে, বৃক্ষে, পর্ব্বতে, গহ্বরে, বায়ু নানা স্থানে বদ্ধ হইয়া সহজ ভাবে চলিতে পারে না, কিন্তু উপরে কোনও প্রতিবন্ধক নাই, কাজেই সেখানে অব্যাহত গতি। ঠাণ্ডা ও বাতাস লাগিয়া নিউমোনিয়া,ব্রঙ্কাইটীস্ প্রভৃতি হইবার অত্যন্ত ভয়, সুতরাং গরম কাপড় জামা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। যে সকল প্রাণী দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃত হয়, তাহাদের অধিকাংশই অতি উচ্চে প্রাণ ধারণে অক্ষম,সুতরাং উচ্চ স্থানে ব্যাধি অত্যন্ত কম।

যে সকল লোক অত্যধিক বায়ুর চাপে থাকে, তাহারা হঠাৎ কম চাপের বায়ুতে আসিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

সমুদ্রের তলদেশে বা খনি প্রভৃতিতে কার্য্য করিবার জন্য যাহাদিগকে নিম্নে যাইতে হয়, তাহাদিগকে অধিকক্ষণ নীচে থাকিতে হইবে বলিয়া তাহারা যাহাতে তথায় বায়ু পাইতে পারে সেই জন্য বায়ুকে অধিক চাপে লোহার চোঙ্গে (cylinder) ভরিয়া তাহাদের সহিত নামাইয়া দেওয়া হয় তাহারা উহার ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করে। উহার ভিতরে চারি দিকে সমান চাপ থাকাতে চাপ অধিক হওয়ায়ও কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু যেই উপরে আসিয়া বাহিরে আসে, অমনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। বার বার এইরূপ অধিক চাপ হইতে অল্প চাপের বায়ুতে যাতায়াত করিতে করিতে তাহাদের এক ব্যাধি হয়, যাহার লক্ষণ পেটে বেদনা, বমি, শ্বাসরোধ ভ'পা অবশ হইয়া যাওয়া (Paraplegia) মাথা ঘোরা ও হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া মৃত্যু। ইহাকে ডাইভারস্ পলসি (Diver's Palsy or Caisson's Disease) বলে।

বায়ুকে গরম করিয়া অনেক ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় এবং সময় সময় ইহাতে বেশ উপকারও দেখা যায়। ব্যাধি বিশেষে কখনও সর্ব্বাঙ্গে, কখনও অংশবিশেষে, বায়ু কখনও বেশী গরম কখনও অল্প গরম ভাবে ব্যবহৃত হয়। বায়ুকে ১৪৮° সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত গরম করিয়া ব্যবহৃত করা হইয়াছে এবং তাহাতেও কোন কুফল হয় নাই। এইরূপ চিকিৎসার সময়ে মাথায় ঠাণ্ডা দিতে হয়। স্নায়বিক ব্যাধিতেই ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আলোক

জার্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক গেঠে (Goethe) মৃত্যুর সময়েও বলিয়াছিলেন, "more light," ইহাই তাঁহার শেষ কথা, বাস্তবিক আলোক আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

আলোক মনকে অতিশয় প্রফুল্ল করে। ঘোর অন্ধকার রজনী কি ভয়ানক ; ভয়ে শরীর কাঁপিয়া উঠে, মনে স্ফুর্ত্তি নাই, আর প্রভাত হইলে কি পরিবর্ত্তন, সূর্য্য কিরণের সাথে সাথে সমস্ত হৃদয় নাচিয়া উঠে,সমস্ত প্রকৃতি নব বসন পরিয়া সূর্য্যের স্তুতি আরম্ভ করে। আঁধার রজনীতে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ প্রদীপও কি সুখের, হৃদয়ে কত বল আনে—প্রিয় জনের মুখখানি দেখিয়া কত সুখী হইতে দেয়। চন্দ্রকরদীপ্ত রজনী কি সুন্দর! আকাশে শত শত তারা ফুটিয়া রহিয়াছে—যেন রাশি রাশি মুকুতার হার, চন্দ্রের কি স্নিগ্ধ হাসি—কি ভুবনমোহন রূপ,—কে এমন হতভাগা আছে, পূর্ণিমা নিশিথে নিশারাজের অপরূপ রূপ দেখিয়া যে মোহিত হয় না—তাহার নয়ন মন তৃপ্ত হয় না, সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটে না! দিবা দু'প্রহরে যদি কচিৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সমস্ত হৃদয়ে কে যেন বিষাদ-কালিমা ঢালিয়া দেয়, মনে একটু স্ফূর্ত্তি নাই—কোথা হইতে যেন একটা অবসাদ নামিয়া আসে—আবার সেই মেঘখানা সরিয়া যায়, আনন্দ ফিরিয়া আসে, প্রাণে নবস্ফূর্ত্তি জাগরিত হয়—সত্য সত্যই আলোক জগতের আনন্দ ও তেজস্বরূপ, আলোক ভিন্ন সৃষ্টি চলে না—আলোক হইতেই আমাদের এই জগতের বিকাশ। আমরা আলোক সচরাচর সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে পাই। ইহা ভিন্ন তড়িৎ সাহায্যেও আলোক উৎপন্ন হয়,রাসায়নিক সম্মিলনেও আলোক উৎপন্ন হয়,—যথা, কাঠ, কয়লা, বাতি ইত্যাদির আলো। জিনিস অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলেও আলো বিকীরণ করে, যেমন লোহাকে অধিক উত্তাপ দিলে আলো দেয়। ঘর্ষণ দ্বারাও আলোক উৎপন্ন হয়, যথা দুইখানি প্রস্তরের ঘর্ষণে। ইহা ভিন্ন কতকগুলি জীব ও উদ্ভিদ স্বভাবতঃই তাহাদের শরীর হইতে আলো দেয়, যথা খদ্যোৎ, সমুদ্রজাত কোনও কোনও কীটাণু ও কোন কোন গাছ ইত্যাদি।

সঞ্চালিত হয় উহাকে কৃত্রিম উপায় বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আজ বিস্তারিত বলার সময় হইবে না।

বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা

লোকের স্বাভাবিক অবস্থায়ই যখন বায়ুর এত প্রয়োজন, তখন রোগীর পক্ষে যে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মধ্যে ভুল নাই। বিশুদ্ধ বায়ুতে ধূলিকণা থাকে না, জীবাণু থাকে না ও কোনরূপ দূষিত পদার্থও থাকে না। পবিত্র বায়ু কি সুখকর! শীতল ও মধুর স্পর্শে অতি যে মুমূর্ষু ব্যক্তি, সেও যেন প্রাণ পায়। ইহা শরীরের সর্ব্ব জ্বালা দূর করে, স্নায়বিক উত্তেজনা বারণ করে, সমস্ত শরীরে একটা শীতল মোহকর শান্তি ঢালিয়া দেয়। এমন বায়ুতে কাহার না বাহির হইতে ইচ্ছা হয়—এমন বায়ু সেবনে কাহার জীবন না দীর্ঘায়ু হয়! কবি সত্যই বলিয়াছেন—

> 'Air, Air, fresh life blood, thin and searching air,
> The clear dear breath of God that loveth us.'

পবিত্র বায়ু সত্যই ঈশ্বরের একটি শ্রেষ্ঠ দান তাই বাইবেলেও দেখিতে পাই,—

> And the Lord God breathed into his nostrils the breath of life Genes. ii 7.

আমাদের দেশের মুনি ঋষিরাও তাই বায়ুকে ঈশ্বররূপে পূজা করিতেন এবং উহাকে প্রাণরূপে সন্ধান করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। আজকাল বিশুদ্ধ বায়ুর উপকার উপলব্ধি হইতেছে, এবং কি সুস্থ অবস্থায় কি ব্যারামে, ইহার বহুল পরিমাণ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ক্ষয় (phthisis) বলিয়া যে সাংঘাতিক ব্যাধি আছে—যাহার কবলে পড়িলে মানুষ বাঁচে না বলিয়া এতদিন ধারণা ছিল, আজ এই বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে অনেকেই তাহা হইতে মুক্তি পাইতেছেন। যে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি ব্যারামে পূর্ব্বে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কখনও দরজা খোলা হইত না, আজ সেই সব রোগী পূর্ণমাত্রায় বায়ু ভোগ করিয়া রোগমুক্ত হইতেছে।

বায়ু আমাদের এই ঘরের ভিতর হইতেই গৃহীত বা ১০০০০ হাজার ফিট উচ্চ স্থান হইতেই নেওয়া হউক বা মহাসমুদ্রের মধ্যপ্রদেশ হইতেই নেওয়া যাউক, সর্ব্বস্থানেই উহার একইরূপ সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণে প্রায় একই প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ মাত্র। বায়ু বর্ণহীন ও গন্ধহীন। বায়ুর ওজন আছে। এই ওজনের জন্য যে চাপ, (Pressure), পৃথিবীর নিম্নদেশে ও পর্ব্বতের শিখরদেশে তাহার কিছু তারতম্য দেখা যায়। উপরের চাপ কম। আমাদের এই স্থান হইতে হঠাৎ যদি কোন লোক ১০০০০ ফিট উপরে যায় তবে তাহার অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হইবে—ক্ষুধা কম হইবে ও নাক মুখ হইতে রক্ত বাহির হইবে; ক্রমে মাথা ঘুরিতে থাকিবে মাংসপেশীসমূহ কার্য্যে অক্ষম হইবে। সুতরাং কাহাকেও নিম্নভূমি হইতে খুব উচ্চ ভূমিতে পাঠাইতে বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠান সঙ্গত। যদি অল্প অল্প করিয়া ক্রমে সহ্য করিয়া উপরে উঠা যায়, তবে কোন কষ্ট হয় না। যাহাদের ফুস্‌ফুস্ ও হৃদ্‌পিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহারা হঠাৎ এরূপ উচ্চ স্থানে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

উপরের ও নিম্নের বায়ুর প্রভেদ

বায়ুর উচ্চ স্তরে অক্সিজেনের ভাগ একটু কম দেখা যায় এবং সেই কারণে নিশ্বাস ঘন ঘন টানিতে হয়। নিশ্বাস ঘন ঘন টানিতে হইলেই বলবান ফুস্‌ফুসের প্রয়োজন। হৃদ্‌পিণ্ডও অত্যন্ত সবল থাকা প্রয়োজন। কারণ, নিশ্বাস ঘন ঘন টানার দরুণ হৃদপিণ্ডেরও ফুসফুসে ঘন ঘন রক্ত যোগাইতে হয়। এই একই কারণ হইতেই হিসাব করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ ভূমিতে অধিরোহণ করিলে দুর্ব্বল হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুস ক্রমে সবল হইতে পারে। অধিক উচ্চ ভূমিতে গেলে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়—ফুসফুসের ক্রিয়াও বেশী হওয়াতে ভাল চলে। বায়ুর উচ্চ স্তর অত্যন্ত শীতল, সুতরাং রক্তহীন বা অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির হঠাৎ সে স্থানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বায়ুর গতিও নিম্নদেশ হইতে উচ্চে অধিক। নিম্নে বায়ু

জানো! তুমি হৃদয়তত্ত্বানভিজ্ঞ বলেই আমার সন্দেহ ছিল, এখন বুঝিলাম তা না! এই ব্যাপার যেন তোমায় আমায় বেশী নিকটস্থ করে দিল এমনি আমার মনে হচ্চে—আমি চিনেছি। এখন তোমায় ভালবাসা আমার পক্ষে খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে; আমি তোমায় এখন ভালবাস্‌তে পারি এবং আমার সে ভালবাসাকে তুমিও কিছুদিন পরে একটু শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখতে পারবে না! আমায় ভাল না বাসলেও আমার সে ভালবাসাকে—বলিতে বলিতে অস্‌রা আবার দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। প্রিন্স লাডউইক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি তোমায় আজীবন চির বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করব এবং পর জগৎ ছাড়া এ জগতের যাবতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে তুমিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং প্রিয়তমা হ'য়ে থাকবে।"

অনেকক্ষণ পরে অস্‌রা মৃদু স্বরে বলিলেন; "এইই তবে আমার যথেষ্ট।" বলার সঙ্গে সঙ্গে সনিশ্বাসে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রিন্সের হাত ধরিয়া মৃতার কক্ষে গিয়া দেখিলেন লর্ড বিশপ তাহার মস্তকের নিকটে বসিয়া তখনো প্রার্থনা করিতেছেন। অস্‌রা ধীরে ধীরে সেই মৃত মুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "হাঁ তুমি চিরদিনই আমাদের মধ্যে এই রকম ভাবে শুয়ে থাকবে।"

লাড্‌উইক আবার সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মৃতার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অস্‌রা সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বারের উপর শরীরের ভর রাখিয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

বাড়ব কুণ্ড *

এ নহে পর্ব্বত গুহা—হৃদয়-কন্দর।
উৎসারিত বারি তা'র অমৃত নির্ঝর!
সেই সুধা—সেই জল আবরিয়া হায়,
জ্বলিছে প্রবল বহ্নি প্রচণ্ড শিখায়!
নিয়ত অনল লিপ্ত উদ্বেল, অস্থির
তবু অনুপম, দিব্য, স্নিগ্ধ সেই নীর!
——নিভৃত এ মহাতীর্থে করি' শুভ স্নান
সমাহিত কর চিত্ত ওহে পুণ্যবান!

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

* চট্টগ্রামের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কুণ্ড।

আলোক ও বায়ু এবং স্বাস্থ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের প্রশ্বাসের দরুণ, প্রত্যেক বার অগ্নি প্রজ্বলিত করার দরুণ, ঘরে আলো জ্বালার দরুণ, শত শত কল কারখানার দ্বারা, গাছ ও নানাবিধ জীব জন্তু পচিয়া বায়ু বহু প্রকারে সর্ব্বদাই দূষিত হইতেছে। বায়ু যদি ক্রমেই এবংবিধ প্রকারে দূষিত হইতে থাকে তবে প্রশ্ন এই যে, আমাদের উপায় কি? বায়ুর একটি ধর্ম্ম এই যে, ঠাণ্ডা ও গরমে উহার আয়তন হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

বায়ুর ধর্ম্ম

বায়ুকে যদি উত্তপ্ত করা যায় তবে উহা ক্রমেই আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া লঘু হয় ও উপরি ভাগে উঠিয়া যায় এবং যে স্থানে ঐ উত্তপ্ত বায়ু ছিল তথায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে স্বাভাবিক বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। বায়ুকে ঠাণ্ডা করিয়া ও অত্যধিক চাপ দিয়া আয়তনে সঙ্কুচিত করা যায়, এমন কি উহাকে তরল অবস্থায় পর্য্যন্ত আনা যায়। এই যে বায়ুর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন, ইহাকে বায়ু সঞ্চালন (ventilation) বলা যাইতে পারে। এই ধরুন ঘরে

বায়ু সঞ্চালন

আমরা অনেকটি লোক আছি আমাদের প্রশ্বাসে বায়ু যেমন দূষিত হইতেছে উহার উষ্ণতার দরুণ সেইরূপ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া লঘু হইয়া পড়িতেছে এবং উপরে উঠিতেছে এবং উপরের ফাঁক প্রভৃতি দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এবং ঐ স্থান পূরণের জন্য নিম্নদেশ দিয়া পুনরায় বিশুদ্ধ বায়ু আসিতেছে ও আমাদের জীবন রক্ষার সহায়তা করিতেছে। বায়ুর এই সংমিশ্রণ ও গমনাগমন

বা বেগ যদি না থাকিত তবে আমাদের কি দুর্দ্দশাই না ঘটিত! এই গমনাগমন বন্ধ করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রশ্বাস জনিত দূষিত পদার্থে ঘর পরিপূর্ণ হইবে। এই বদ্ধ বায়ু হইতে আমরা সকলেই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অক্সিজেন, নিতে থাকিব এবং আমাদের প্রাণ স্বরূপ যে অক্সিজেন তাহা ক্রমেই লোপ পাইতে থাকিবে। ওদিকে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বায়ুতে জমিতে থাকিবে এবং নিশ্বাসের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া অক্সিজেন গ্রহণে অক্ষমতা জন্মাইবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইবে—ঘন ঘন শ্বাস লইতে হইবে, শিরঃপীড়া হইবে, মাথা ঘুরিতে থাকিবে এবং জীবন-সংগ্রামে যাঁহারা দুর্ব্বল; তাঁহারা ক্রমেই নিস্তেজ হইতে থাকিবেন, ক্রমে সংজ্ঞা লোপ হইবে ও অবশেষে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিবে। যাহারা বলবান অর্থাৎ যাহাদের ফুসফুসের বল অধিক—যাহাদের বায়ুগ্রহণের ক্ষমতা অধিক—তাহারা আরও কিছুকাল প্রাণ লইয়া টানাটানি করিবেন, কিন্তু উপায় নাই, তাহাদিগকেও দুর্ব্বলদিগের অবস্থায়ই পড়িতে হইবে, সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য্য।

বায়ুসঞ্চালনের আবশ্যকতা

বায়ু এই মৃত্যু হইতে আমাদের জীবন রক্ষা করে এবং সেই জন্যই গৃহে, স্কুলে, আফিসে, কারখানাসমূহে খনিতে, বক্তৃতা গৃহে, রঙ্গালয়ে এবং যে সকল স্থানে বহুলোক একত্রিত হয়, তথায় বায়ু চলাচলের এত আবশ্যকতা। এই জন্যই দরজা জানালা প্রভৃতি রাখা হয় ও নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু গমনাগমনের পথ নির্ম্মিত হয়। আমাদের স্কুল, কলেজগুলিতে, শিল্পশালায়, কারখানাসমূহে, আফিসে, রঙ্গালয়ে—সর্ব্ববিষয়েই এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা জাতি ক্রমে হীনবল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে।

বায়ু ভিন্ন স্থানের দূষিত পদার্থ বহন করিয়া আনিয়া যে নানারূপ ব্যাধি জন্মায়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং যে সব স্থানে সংক্রামক ব্যাধি হয়; সে সব স্থানে অত্যন্ত সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

বায়ু দূষিত পদার্থ দ্বারা যে অপকার করে তাহা হইতে দূষিত পদার্থকে তরল করিয়া (dilution) অধিক উপকার করে। এই মনে করুন, ঘরে একটা পচা দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আর নাই, সত্য সত্যই উহা উড়িয়া গিয়াছে—বায়ু তাহার সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া ইহাকে তাহার বিপুল বক্ষে লইয়াছে এবং এখন কোথায় যে তাহাকে লুকাইয়াছে তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজন অত্যধিক। আমরা যে প্রতিবার শ্বাস লই ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি (আমরা মিনিটে প্রায় ১৮।২০ বার নিশ্বাস লইয়া থাকি) ইহাতে কতখানি বায়ু এবং কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করি এবং কি কি পদার্থ ত্যাগ করি, সে সমস্ত হিসাব করা হইয়াছে। ঘরে যে আলো জ্বলে তাহাতে যে বায়ু দূষিত হয় (ইলেক্‌ট্রিক আলো ভিন্ন) তাহারও হিসাব করা হইয়াছে এবং সমস্ত ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ঘণ্টায় ১০০০ কিউবিক ফিট বায়ুর আবশ্যক, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য এত স্থান পাওয়া সহজ কথা নহে। ৩৫০ কিউবিক ফিট বায়ু ঘণ্টায় তিন বার পরিবর্ত্তিত হইলে চলিতে পারে। ৩৫০ কিউবিক ফিট বায়ুর জন্য একটা ৫′×৭′×১০′ ফিট স্থানের আবশ্যক। সুতরাং স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হইবে বায়ুও ততই বেশী বার পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে। প্রতি সৈন্যের জন্য প্রায় ৬০০ কিউবিক ফিট বায়ু দেওয়া হয়। কারখানা সমূহে জন প্রতি সাধারণতঃ ২৫০ কিউবিক ফিট্ করিয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালে রোগীর প্রশ্বাসজনিত দূষিত পদার্থে ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি চর্ম্মজ ও যান্ত্রিক দূষিত পদার্থে বায়ু স্বভাবতঃই অধিক দূষিত; সুতরাং তথায় প্রত্যেকের জন্য প্রায় ১৫০০ কিউবিক ফিট দেওয়া হয়। যে সব স্থান সঙ্কীর্ণ তথায় স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত করা হয়। বাতাসের স্বতঃই একটা বেগ আছে—দরজা খোলা থাকিলে বায়ু স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়—আর বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে যে বায়ু

"কুমারি, এঁর নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না! জীবনে যে দিন প্রথম ভালবাসা নাম কানে শুনেছিলাম এবং ভালবাসা কি বুঝিতে শিখেছিলাম সেই দিন হতেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি। এঁকে পাবার জন্ত আমি জীবনের সমস্ত সম্পদ সম্মান সিংহাসন সমস্তই ত্যাগ কর্‌তে পারতাম, কিন্তু তবুও এঁকে পাবার উপায় ছিল না! যে দিন আমাদের দুজনের প্রথম পরিচয় প্রথম সাক্ষাৎ হয় 'প্রাণাধিকা আমার সে কথা তোমার মনে পড়ে কি এখনো?' লাড্‌উইক বালিকার হস্তটি কোমল ভাবে এক বার নাড়িয়া-দিলেন—"সেই দিন হতেই আমি জান্‌লাম সে আমার এবং আমার সমস্ত অন্তরাত্মা তার--কিন্তু তার বেশী আর কিছু পাবনা আমরা। কুমারি, আপনি আমায় এক দিন প্রশ্ন করেছিলেন ভালবাসা কাকে বলে? আজ আমি আপনার সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্চি—এরই নাম ভালবাসা। তবুও আমায় পিতৃ-নিদেশে বদ্ধ হ'য়ে ষ্ট্রেলসয় আস্‌তে হ'য়েছে এবং এ-ও সেই হতে ভগবানের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ কর্‌তে প্রস্তত হ'য়েছে।"

অস্‌রা কৌচের উপর বাহু রক্ষা করিয়া বালিকার দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া বসিলেন, মৃদু স্বরে আবার প্রশ্ন করিলেন, "এখানে এ আজ কি করে এসেছিল তবে?"—

"সে আজ এখানে"—কিন্তু সহসা প্রিন্স সবিস্ময়ে নিজের বক্তব্য অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া বালিকার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেস্‌ও তাহার মস্তকের উপরে মুখ লইয়া গেলেন। যাহাকে মৃত্যুর ক্রোড়গত বলিয়াই এতক্ষণ সকলের সন্দেহ হইতেছিল সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই বিশুষ্ক নীল অধরোষ্ঠ মৃদু মৃদু কম্পিত করিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

"উনি রাজকুমার, রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমি ওর পদস্পর্শেরও উপযুক্তা নই; তাই ভগবান ওঁকে আমায় দিলেন না! উনি এখানে চলে এলে আমি ভগবানের কাজে আত্মসমর্পন করবার জন্ত প্রস্তত হতে লাগলাম; কিন্তু হায়,তবুও আমি তাঁর অদর্শন সহ্য করতে পারলাম না; পীড়িত হয়ে পড়লাম। আমি বরাবরই রুগ্নও দুর্ব্বল ছিলাম। আস্‌ছে সপ্তাহে আমি কুমারী ব্রত নিয়ে কন্‌ভেণ্টে যাব স্থির ছিল কিন্তু আর একবার কুমারকে না দেখে আমি পারলাম না; সেই শেষ দেখা দেখবার জন্ত আজ আমি এসেছিলাম। আমি আর এক বারও এসে দেখে-গিয়াছি, ভগবান আমার এ অপরাধ মর্জ্জনা করুন। কিন্তু জেনে স্বেচ্ছায় আমি এ পাপ করি নি! এই মৃত্যুর চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছি, কিছুতেই কোন মতেই একে না দেখে থাক্‌তে পারি নি, তাই আমি এসেছি। রাজকুমারি, আজ আপনাকে ও আপনার এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখলাম। আপনি ভালবাসা কাকে বলে জানেন নিশ্চয়?"

অস্‌রা মুখ নত করিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "না" তাঁহার হস্তখানি তাঁহার অজ্ঞাতেই বালিকার হস্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বালিকা আবার মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—

"ইনি আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে প্রকৃতিস্থ করছিলেন। যদিও আমি অর্দ্ধমৃতই হয়ে এসেছি তবু ফিরে যাবার জন্ত প্রস্তত হয়েছিলাম। আমাদের চিরবিদায়ের ঠিক শেষ মুহূর্ত্তেই আপনি এসে পড়লেন! হায়, কেন? কেন আমি এসেছিলাম।" বালিকা আবার চক্রণাসূচক মৃদু শব্দ করিল। নিজের ক্ষীণ অঙ্গুলীর দ্বারা অস্‌রার হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আমি যাচ্ছি! আমার একটি প্রার্থনা তোমার কাছে, কুমারকে বিয়ে ক'রো।"

"না-না-না" অস্‌রা আর্ত্ত কণ্ঠে প্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া বালিকার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন, "না,তুমি বাঁচে, তোমার বাঁচতেই হবে। বেঁচে কুমারকে বিয়ে ক'রে সুখী হবে।"

অস্‌রা সেই মৃত্যু-আনীল ওষ্ঠে দু তিনটি চুম্বন করিলেন। বালিকার ক্ষীণ বাহুযুগল অতি ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া অস্‌রার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। অস্‌রা তাহার শীতল নীল কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া বসিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠের কষ্টোচ্চারিত অস্পষ্ট মৃদু ভাষা নীরবে শুনিতে লাগিলেন। লাডউইক ও বিশপ নীরবে নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে বালিকার হস্ত দুইটি অস্‌রার কণ্ঠ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। চক্ষু দুইটি ঘুরিয়া লাডউইকের পানে নিবদ্ধ হইল; প্রিন্স ত্রস্তে বালিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বিশপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্‌রা ধীরে ধীরে আর এক বার তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিশপের দিকে হাত বাড়াইলেন। বিশপ তাঁহার হস্ত ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন এবং একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিশপ আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন "ভগবান সেই দুঃখী আত্মাটিকে চিরবিশ্রাম দিতে মৃত্যুর যাতনাময় দীর্ঘ পথের কষ্ট আর বেশী অনুভব করালেন না। তিনি তাকে শান্তি দিয়েছেন। অস্‌রা দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। সব কথা যেন তিনি ভাল রূপে বুঝিতেও পারিলেন না। কতক্ষণ যে এই রূপে কাটিয়া গেল তাহাও তিনি জানেন না। সহসা এক সময়ে চাহিয়া দেখিলেন প্রিন্স লাডউইক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যদিও তাঁহার মুখ অত্যন্ত শান্ত গম্ভীর কিন্তু তথাপি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি যেন অর্দ্ধেক বয়স অতিক্রম করিয়াছেন এই রূপ দেখাইতেছিল। অস্‌রা উঠিয়া দাঁড়াইলেন কম্পিত দেহে সহসা লাডউইকের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। "ক্ষমা-কর, আমায় ক্ষমা কর।"

"দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি কেন তোমার উদার চরিত্রের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারি নি। কেন তোমায় আমি নিজের জীবনের সব কথা বিশ্বাস করে বল্‌তে পারি নি! দোষ আমারই সব—লাডউইক অস্‌রাকে ধরিয়া তুলিতে গেলে অসরা নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন; একটু থাকিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "সে চলে গেছে সত্যই ?"

"হ্যাঁ, সে চলে গেছে!" অস্‌রা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "তার কাছেও আমি চিরবিদায় গ্রহণ করেছি এবং কুমারি! আপনার কাছেও চির বিদায় নিতে এসেছি। আপনি আমায় চক্ষু হীন, হৃদয় হীন, অন্ধ, মূঢ় বলেই জানতেন এত দিন, কেন না আপনার হৃদয়ের ও সৌন্দর্য্যের মূল্য আমি বুঝি না আপদি এত দিন এই রকমই জেনে এসেছেন। আশা করি আমার আর বেশী কৈফিয়ৎ কিছু দিতে হবে না। আপনি সৌন্দর্য্যে তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাও আমি বেশ জানি; কিন্তু যথার্থ প্রেম সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে না, বরং সৌন্দর্য্যই প্রেমের উপর নির্ভর রাখে। প্রেমে যে সৌন্দর্য্য দান করে সে সৌন্দর্য্য-শৃঙ্খল জগতের লৌহদৃঢ় বাহুরও অচ্ছেদ্য! কুমারি! বিদায়!"

অস্‌রা নির্নিমিষ চক্ষে লাড্‌উইকের মুখের পানে চাহিয়া-ছিলেন! আজ যেন প্রিন্সকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন দেখিতে-ছিলেন। তাঁহার বিশাল চক্ষে বিশাদের সঙ্গে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য জ্বলিতেছিল যাহা বেদনার অনুশোচনার অতীত বস্তুকেই প্রকাশ করিতেছিল। বিবর্ণ পাণ্ডু মুখের উপরেও যেন কোন্ অজানিত আনন্দের আভাষ তাহার মুখ-রক্তিমার তুলি বুলাইতেছিল! মুখে চক্ষে দৃঢ়তার বীরত্ব-ব্যঞ্জক দীপ্তি! জগতের কোন বস্তুতে যেন আর তার লক্ষ্য নাই! অস্‌রা বিহ্বল ভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন "এরই নাম ভালবাসা!" প্রিন্স হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। অস্‌রার হস্ত গ্রহণ করিয়া ধীর ভাবে চুম্বন করিয়া বলিলেন "কুমারি! আমি তবে বিদায় হই! আমার প্রিয়তমার দেহ আমি নিজের বাড়ী নিয়ে যাব এবং সেইখানেই তার সমাধি দিয়ে চির জীবন তার জন্য বিলাপ কর্‌ব! ষ্ট্রেলসম্ হতেও আমি চির বিদায় নিচ্ছি!"

অস্‌রা আবার তাঁহার পানে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "সে শেষ সময়ে আমায় কি অঙ্গীকার করিয়েছে তুমি কি শোন নি? তার শেষ ইচ্ছা তুমি জান না!"

লাড্‌উইক শান্ত স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ শুনেছি জানি!"

"তবে, তুমি কি তা পারবে না?"

"কুমারি! আমার বল ধৈর্য্য তার সঙ্গে সঙ্গে সবই গিয়েছে এখন! বিশেষ আপনি তো জান্‌লেন আমি আপনাকে ভালবাসি না!"

মৃদু হাসিয়া অস্‌রা বলিলেন, "তা আমি অনেক দিনই জানি!" আবার তখনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তবুও দেখ্‌লেম তুমি ভালবাসা কি তা জান, এবং ভালবাস্‌তেও

হইতে ছিল! দ্বার খোলার শব্দে প্রিন্স সচকিত হইয়া জগতের বিরূপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন বালিকাকে আরও নিবিড় ভাবে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথা তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি লজ্জা বা আতঙ্কের চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত। গভীর বেদনা এবং অনেকটা বিস্ময়ান্বিত ভাবে তিনি অস্‌রা ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী বিশপের পানে চাহিলেন এবং পর মুহূর্ত্তে একটা হস্ত মুক্ত করিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাদের স্থির হইতে বলিলেন।

অস্‌রা আরও দুই পদ অগ্রসর হইয়া প্রিন্সের পানে তীব্রোজ্জ্বল চক্ষে চাহিলেন,—বিশপ তাঁহার হস্ত ধরিয়া নিবৃত্ত করিতে গেলে অস্‌রা বিরক্তি-ভরে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিলেন।

বালিকার অনিমেষ দৃষ্টি লাডউইকের পানেই নিবদ্ধ ছিল, সহসা তাঁহার ভাবান্তরে সেও মুখ ফিরাইয়া গৃহমধ্যে চাহিয়াই তীব্র ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া প্রিন্সের বক্ষে মুখ লুকাইল, এবং তাহার ক্ষীণ দেহ এমনি কম্পিত হইতে লাগিল যে লাড্‌উইক দুই হস্তে অতি যত্নেও তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি তখন ধীরে ধীরে বালিকার অবশ সংজ্ঞাহীন দেহ একটা কৌচের উপরে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র অস্‌রা তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কে এ স্ত্রীলোকটি রাজকুমার?—নাম বলতে পারবে কি এর?—কিংবা ভদ্র সমাজে যাদের নাম মুখে আনতে পারা যায় না এ কি তাদের মধ্যেই এক জন?"—মুহূর্ত্তে লাডউইকের মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিত হইয়া উঠিল। তিনি সবেগে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া অসরার ওষ্ঠোচ্চারিত শব্দকে যেন তর্জ্জনীর আঘাতে তাঁহার ওষ্ঠের উপরেই স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু অস্‌রা অপ্রতিহত তেজে গ্রীবা বাঁকাইয়া হস্তেঙ্গিতে প্রিন্সকে লক্ষ্য করিয়া বিশপকে আদেশ করিলেন—"মার এখনি ওকে,—ওকে এখনি হত্যা কর"—তাঁহার তীব্র কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে সঙ্গেই বিশপের তরবারী কোষ হইতে অর্দ্ধ মুক্ত হইল।

"মহাশয়," লাডউইকের স্থির ধীর অথচ বিষাদপূর্ণ কণ্ঠস্বর সেই উত্তেজিত গৃহের বায়ু-মণ্ডলের উপরে শ্মশানের বাতাসের মত ভাসিয়া চলিল—"ভগবান করুন যেন আপনার হাতেই আমার মৃত্যু হয়, এবং সে মৃত্যু আমি যেন সচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আপনার ও আমার দুজনার পক্ষেরই সেই ন্যায় বিগর্হিত মৃত্যু দেওয়া এবং নেওয়ার পূর্ব্বে আমার একটু সময় পাওয়ার দরকার; কেন না রাজকুমারীকে আমার কিছু বলবার আছে। বিশপ তখনো তরবারী হইতে হস্ত সরাইতে পারেন নাই; কেন না প্রিন্সেসের উত্থিত হস্ত তখনো শান্ত হইয়া স্বস্থানে নামে নাই কিন্তু সহসা মুমূর্ষুর অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সসংজ্ঞ করিয়া তুলিল। সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন সেই সংজ্ঞাশূন্যা বালিকার মস্তক এবং এক খানা হস্ত কৌচের বাহিরে আসিয়া ঝুলিতেছে। আবার সে সেইরূপ শব্দ করিবা মাত্র বিশপ লাফাইয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে মৃত্যু যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ! ভগবান ক্ষমা কর—আমার প্রভু" বলিতে বলিতে তিনি তরবারী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বালিকার নিকটে গিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। বক্ষের চেন হইতে পবিত্র ক্রুশ চিহ্নটি ছিঁড়িয়া লইয়া এক হস্তে তাহার চক্ষের নিকটে ধরিলেন এবং অন্য হস্তে তাহার মস্তকটি তুলিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে চক্ষুরুন্মিলন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তিকে মনুষ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত জানিয়া তাহার বিচারের জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন সহসা তাহাকে জগতের অপর পারে ন্যায় অন্যায় বিচার প্রার্থনার জন্য গমনোদ্যত দেখিয়া তাহারই আত্মার মঙ্গলের জন্য বিশপকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিতে হইল।

প্রিন্সেস অস্‌রা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "কে এ স্ত্রীলোকটি?"—কেবল প্রিন্স লাডউইক বালিকার পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন নিজ মনে বলিলেন—

"ভগবান!—এ আঘাত সত্যই কি তবে সহ্য করতে

পারলে না?—তাকে সত্যই মেরে ফেললে এতে?"—প্রিন্সেস মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এ দৃশ্যে তখনো তাঁহার মনে করুণা সঞ্চার করিতে পারে নাই নিজের ক্রোধাগ্নি তখনো তাঁহার মনে জ্বলিতেছিল। রোগিণীর যন্ত্রণাসূচক মৃদু গোঙানি শব্দ এবং বিশপের প্রার্থনা-মন্ত্র কেবল মধ্যে মধ্যে গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। বালিকা সহসা তাহার সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন চক্ষু উন্মিলন করিয়া প্রিন্সের পানে চাহিয়া নীরবে তাহাকে নিকটে আসিতে ঈঙ্গিত করিলে লাডউইক কৌচের নিকটে নতজানু হইয়া বসিলেন। উভয় হস্তে বালিকার শীতল ক্ষীণ হস্তখানি গ্রহণ করিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া মস্তক অবনত করিলেন।

বিশপ কহিলেন, "মহাশয়! কিছুক্ষণের জন্য একে আমার কাছে একলা রেখে যান, আমার কর্ত্তব্য করতে দেন।" প্রিন্স উঠিয়া গিয়া গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইলেন। অস্‌রা এক ভাবেই গৃহ মধ্যে দাঁড়াইয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিলেন, সেই অন্ধকার পথ দিয়া মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে সে গৃহের নিকটস্থ হইতেছে এমনি বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার গৃহ-মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন লাড্‌উইক পুনর্ব্বার বালিকার নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়াছেন এবং বালিকা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে প্রিন্সের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে; তাহার মুখ এখন সম্পূর্ণ শান্ত এবং বিগতব্যথ হইয়া কোমল ফুলটির মত ফুটিয়া রহিয়াছে। বিশপ ধীরে ধীরে অন্তিম সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতেছেন। অস্‌রা একবার বলিলেন, "এখানে কি ডাক্তার পাওয়া যাবে না?" "না," লাড্‌উইক উত্তর দিলেন।

বিশপ ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। আগত জীবনের শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা ও আশার কথা শুনিতে শুনিতে সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখেও সুখের হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে শান্ত এবং নিশ্চিন্ত ভাবে লাডউইকের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া তাঁহার হস্তে হস্ত দিয়া মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল। অস্‌রা নির্নিমেষ চক্ষে তাহাদের চাহিয়া দেখিতেছিলেন। নিজেকে এবং নিজের ক্রোধ অপমানের কথা ক্রমশঃ যেন তিনি ভুলিয়া যাইতেছিলেন। সহসা বিশপকে তাঁহার নিকটস্থ দেখিয়া ঈষৎ সসংজ্ঞ হইয়া ক্ষীণ হাস্যে বলিলেন, "এ তোমার কর্ত্তব্য! আমার এক্ষেত্রে কোন কর্ত্তব্য নেই ত?" বিশপ মৃদু স্বরে বলিলেন বালিকাটি বোধ হয় আর এক ঘণ্টার বেশী জীবিত থাকবে না। তার শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। বোধ হয় তার বুকের ব্যারাম ছিল, এই অতর্কিত আঘাত তাই সহ্য করতে পারলে না। যদিও আমার বিশ্বাস যে নিজের দুঃখেই অর্দ্ধ মৃত হ'য়ে মৃত্যুর পথে এগিয়েই ছিল এবং বেশী দিন বাঁচতও না।"

"কে সে?" মৃদু স্বরে অস্‌রা প্রশ্ন করিলেন। "এসে দেখুন তাকে; শুনুন।" অনিচ্ছার সহিত অস্‌রা কোচের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলে বালিকা তাঁহার পানে চাহিল। সেই আধিক্লিষ্ট চক্ষেও অতিমাত্র বিস্ময় এবং বিমুগ্ধ ভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। মূর্চ্ছাতুর মুখে সুখের মৃদু হাসি খেলিয়া গেল, লাড্‌উইকের হস্ত যুগল ঈষৎ আবেগের সহিত স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "এত সুন্দর! এত সুন্দর উনি! তবুও আমায় ভালবাস?" সেই পাণ্ডুর মুখে প্রগাঢ় সুখের ছায়া অমনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল যে,কে বলিতে পারে এ ব্যক্তি এখনি মরিবে। ছয়টি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি সেই মুখে সংবদ্ধ হইয়া রহিল। "ভগবান নিশ্চয় এর অপরাধ ক্ষমা করেছেন, নিশ্চয় এখন এর আর কোন পাপ নেই" সহসা এই কথা উচ্চারণ করিয়া প্রিন্সস্‌ অস্‌রা কোচের নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিশপ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "পাপ একে কোন দিনই স্পর্শ করিতে পারে নি। এর যা অপরাধ সে দোষ থেকে জগতের অতি পবিত্রতম ব্যক্তিও মুক্ত নয়। ভালবাসাই এর জীবনের একমাত্র অপরাধ। নিজের সব কথাই এ আমাকে জানিয়েছে"।

অস্‌রা কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার জিজ্ঞাসু চক্ষু লাড্‌উইকের পানে নিবদ্ধ হইল। লাড্‌উইক প্রশ্ন বুঝিয়া ধীর নম্র স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্ত দুই-খানি তখনো বালিকার হস্তের সহিত দৃঢ় সম্বদ্ধ!

ফেলিয়া নিজ মনেই বলিলেন, "আমিই যাব তবে! গিয়ে জান্‌ব কেন? কি এ? কিন্তু কে আমার সঙ্গে যাবে? কা-কে নিয়ে যাই? খ্রিষ্টান হানজের নাম মনে আসিতেই অস্‌রার মুখ ভ্রূকুটী-বদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই ধূর্ত্ত পরছিদ্রান্বেষীকে! কখনই না! তবে!" সহসা অস্‌রার মুখের অন্ধকার অনেকটা তরল হইয়া আসিল—"হাঁ—সে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং উদার-হৃদয় মহৎ লোক! তাকেই নিয়ে যাব!" তখনি ত্বরিত হস্তে বিশপ অব্‌ মডেনষ্টিনকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন যেন তিনি অশ্বারোহণের উপযোগী বেশে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ অশ্বে আরোহণ করিয়া এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যত শীঘ্র পারেন প্রিন্সেসের নিকটে উপস্থিত হন।

বিশপ অব্‌ মডেনষ্টিন্‌ অতিমাত্রায় বিস্মিত ভাবে অস্‌রার আদেশ মত বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে অস্‌রা সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। যুবক বিশপ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "রাজাকে জানিয়ে তবে এ কাজ করা উচিত।" অস্‌রা অধীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আর এক ঘণ্টাও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না।"

"তা হলে আমি একা গিয়ে ব্যাপারটা জেনে আসি; আপনি যেতে পাবেন না।"

"তবে আমি একাই যাব। তোমার আমার সঙ্গী হয়ে কাজ নেই।"

অগত্যা বিশপ খ্রিষ্টান হান্‌জকে রাজকুমারীর ও তাঁহার অশ্ব রাজ-প্রাসাদের গোপন দ্বারের নিকট রাখিতে আদেশ করিলেন, এবং একটা সুকৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে প্রিন্সেসকে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া উভয়ে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা যখন সহরের গেট অতিক্রম করিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাজকীয় আদেশসূচক অস্‌রার অঙ্গুরী দেখাইয়া বিশপ সহরের দ্বার মুক্ত করাইলেন। অশ্ব যুগল সবেগে ছুটিয়া চলিল। অস্‌রা নীরবে অশ্বের উপর বসিয়া ছিলেন। বেদনা, আশঙ্কা, ক্রোধ প্রভৃতি বহুপ্রকার বিরোধী ভাবের উত্তেজনায় তাঁহার হৃদয় তখন ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত হইতেছিল। অশ্বের গতিও ক্রমশঃ শ্লথ হইয়া আসিতেছিল! অস্‌রা এক বার মৃদু স্বরে বলিলেন, "জানি সে আমায় ভালবাসে না! তবু বলেছিল যে, তার সমস্ত জীবনই আমার! কিন্তু এতটুকু বিশ্বাসও ত আমায় দিতে পারে নি! তা হলে এ কথাটাও তার মিথ্যা! ভাল ত বাসেই না তা ছাড়া অন্য কিছুও না, সব মিথ্যা তার!" অস্‌রার মুখের আবরণটা সরিয়া যাওয়ায় তাহার উপরে চন্দ্রের আলোক পতিত হইয়া তাহার দীন চক্ষু এবং ব্যথাবিবর্ণ মুখকে একটা নূতন শোভায় শোভিত করিয়া তুলিতে ছিল। বিশপ সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতে কুমারীর পানে চাহিলেন।

আবার তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। যাহার মুখের একটি কথা—একটি দৃষ্টির জন্য রাজন্যবর্গ লালায়িত সেই কুমারী অস্‌রার এত অপমান! তাহার চাতুরীতে আবদ্ধা হইয়া আজ কি না তাঁহাকে লোকের চক্ষে এই ভাবে লজ্জা পাইতে হইতেছে, এই রাত্রের অন্ধকারে পদোচিত মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া এই ভাবে ছুটিতে হইতেছে। অস্‌রার হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

"যদি তার ছলনার সত্যতার প্রমাণ পাই"--

"মৃত্যুই এ অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ।"

বিশপ আবার কুমারীর মুখের পানে চাহিলেন। বিশপ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "রাজাকে না জানিয়ে আমি এ বিষয়ে কিছু বল্‌তে পারি না।" অস্‌রা তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "রাজা যখন এখানে উপস্থিত নেই তখন আমার আজ্ঞাই তাঁর বলে জানবে!" বিশপ নীরবে রহিলেন। অস্‌রা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কি আমার বন্ধু নও?" বিশপ সসম্মানে মস্তক নত করিয়া বলিলেন, "কুমারীই তা বিশেষ রূপে জানেন।"

"জানি আমি, সেই জন্যই বল্‌ছি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ তোমায় নিতেই হবে।" বিশপ মৃদু স্বরে বলিলেন, "কুমারি! সেই জন্যই আমি আরও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমায় তিনি আমার পদে প্রকৃতিস্থ রাখেন। আপনার জন্য ব্যথিত হচ্ছি এবং আপনার

অপমানে আমার রক্তও উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ছে বলেই আরও আমি চাচ্চি যেন সন্দেহটা ভগবান এই মিথ্যা বলেই প্রমাণ করে দেন্।"

"তবে তুমি আমার বন্ধু নও!" বলিয়া অস্‌রা অশ্বকে পুনর্ব্বার সবেগে চালিত করিলেন।

অবশেষে তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র গৃহের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। বৃক্ষান্তরালস্থিত গৃহের গবাক্ষ হইতে কয়েকটি আলোক-রশ্মি বহির্গত হইতেছিল। অস্‌রা হস্তের চাবুকের অগ্রভাগ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহা বিশপকে দেখাইলেন। গেটের নিকটে আসিয়া উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে বিশপ অশ্বদ্বয়কে গেটের থামে বাঁধিয়া রাখিলেন। অস্‌রা ভেল্‌টা আবার মুখের উপরে টানিয়া দিলেন। বিশপ মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "দয়া করে আমায় আগে এক বার দেখে আস্‌তে দেন্।" "তোমার অস্ত্রটা আমাও দাও ত, আমিই একা যেতে পারব!"

বিশপ অগত্যা নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রিন্সের বিশ্বস্ত অনুচর দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাঁহাদের দেখিয়া সে সচকিতে তরবারীর কোষে হস্ত স্পর্শ করিবা মাত্র প্রিন্সেস অস্‌রা নিজের অবগুণ্ঠন টানিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বিশপ অব্‌ মডেনষ্টিন্‌ও ক্ষিপ্র বেগে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এ ব্যাপারে তোমার মত লোকের হস্তক্ষেপ চলে না, এক পাশে সরে দাঁড়াও।" অস্‌রা মুহূর্ত্ত মাত্র আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তড়িৎ বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বিশপ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

স্তিমিত আলোকে একটা সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে একটা সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এক জন পরিচারক দাঁড়াইয়াছিল; খৃষ্টান হান্‌জের উৎকোচে বশীভূত সেই ব্যক্তি স্তিমিত আলোকেও অস্‌রাকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিয়া নিঃশব্দে ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া এক দিকে সরিয়া গেল। বিশপ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া অস্‌রা লম্ফে লম্ফে কয়েকটা সোপান অতিক্রম করিয়াই সহসা থামিয়া গেলেন। খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "শোন—ওপরে কারা কথা কচ্চে।" বিশপ কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন এক জন পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোকের ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বর মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। প্রিন্সেস মৃদু মৃদু বলিলেন, "এ কণ্ঠ তারই! তা হ'লে—তা হ'লে সত্যি?"

ক্ষীণ স্ত্রী-কণ্ঠ কি বলিল তাহা বোঝা গেল না; কিন্তু তথাপি পুরুষোচিত গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল যেখানে যে অবস্থায় থাকি আমি তোমারই! কাছে বা দূরে একত্র বা বিচ্ছিন্ন যাই হই জীবনে মরণে আমি তোমারই!" স্ত্রী-কণ্ঠের আর কোন বাক্য উচ্চারিত হইতে শোনা গেল না, কেবল একটা গভীর ক্রন্দন—বাণবিদ্ধ জীবের একটা অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক শব্দমাত্র উভয়ের কর্ণে আসিতে লাগিল। অস্‌রা গম্ভীর মুখে বিশপের পানে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার চক্ষে করুণার সজল রেখা দেখা দিতেছে, অস্‌রার মুখ কঠিন হইতে কঠিনতর কান্তি ধারণ করিল। তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া বলিলেন, "এ ব্যাপারের শেষ করে ফেলাই উচিত।" বাকী সোপান কয়টা অতিক্রম করিয়া একটা দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র আবার গৃহ মধ্য হইতে তাহার নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অস্‌রা অধীর হইয়া উঠিলেন। মৃদু অথচ তীব্র কণ্ঠে বলিলেন "এই যে দ্বার—খোল শীঘ্র খোল।" বিশপ তাহার দক্ষিণ হস্ত তরবারী-পিধানের মুষ্টির উপর রাখিয়া বাম হস্তে দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া টানিবা মাত্র অস্‌রা বিদ্যুৎ লেখার মত তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন, ত্রস্তে বিশপও তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল।

গৃহের মধ্যে প্রিন্স গ্রোটেনবার্গ দাঁড়াইয়া আছেন এবং একটি অতি ক্ষীণকায়া তন্বী বালিকা তাঁহার নিবিড় বাহু-বেষ্টনে আবদ্ধা হইয়া তাঁহার বক্ষের উপরে মস্তক রাখিয়া ফোঁপাইতেছে। তাহার ক্ষীণ চন্দ্রকর-লেখার মত সুন্দর সুকুমার অথচ অনতিদীর্ঘ শরীর প্রিন্সের শরীরের উপরে ভার রাখিয়া ও অবিরত ক্রন্দনে কম্পিত

কি স্থানে স্থানে সে নাকি তাহারও অপেক্ষা না করিয়া শুধু নাম স্মরণ মাত্রেই প্রেমিকের অন্তরে সহসা আবির্ভূত হইয়া থাকে?—হায় প্রেম। হায় জগতের জন্মের সম-সাময়িক অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত প্রেম-কাহিনী! তোমরা এতই মিথ্যার উপরে তোমাদের রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছ!

যখন অস্‌রা লাড্‌উইকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন তখন অতর্কিতে তাঁহার অর্দ্ধস্ফুট বসরা গোলাপ সদৃশ কপোল যুগল দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া উঠিল এবং সদ্যস্ফুট নীলাভ লিলির ন্যায় নয়নদ্বয় ঈষৎ মুকুলিত হইয়া আসিল, কিন্তু যখন লাড্‌উইক নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার গোলাপনিন্দিত করতলে সকৃতজ্ঞ চুম্বনের সহিত নিজের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহার এই দয়ার জন্য প্রিন্স যে নিজের চিরজীবনের পূজার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবেন সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন তখন ধীরে ধীরে অস্‌রার মুখের সে অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা যেন নিভিয়া আসিতে লাগিল। প্রিন্স যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া তাঁহার গণ্ড চুম্বন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তখন অস্‌রার মুখ এবং চক্ষু একেবারে মৃতের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। প্রিন্সের শীতল ওষ্ঠস্পর্শে অস্‌রার গণ্ডের শীতলতা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

প্রিন্স লাড্‌উইক্ এই বিবাহে তাহার পিতার আনন্দ এবং নিজের সম্মান সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন এবং পরদিনও এই সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আনন্দ লাভ করিবেন তাহা জানাইয়া গেলেন। অস্‌রা গবাক্ষ-পথে যতক্ষণ অশ্বোপবিষ্ট সুঠাম, সুন্দর, সুললিত দীর্ঘদেহ এবং চিন্তাভরে কুঞ্চিত প্রসস্ত ললাট ও নত বিষন্ন চক্ষু সহ অবনমিত সুগঠিত মস্তক দেখা গেল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অনিচ্ছাতেও অনাহূত ভাবে কোথা হইতে একরাশি অশ্রু আসিয়া তাঁহার সুনীল চক্ষু ভরিয়া দিল, কিন্তু ত্রস্ত হস্তে তিনি তখন তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রিন্স গ্রোটেনবার্গের এক জন অনুচর আসিয়া অস্‌রার হস্তে একখানি পত্র দিলে অস্‌রা তাহা পাঠ করিলেন। প্রিন্স নিজের কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং প্রচুর সম্মান জ্ঞাপনের পর জানাইয়াছেন যে, অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনে তাঁহাকে সে দিন প্রেসস'র অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এবং অস্‌রার সঙ্গ-লাভের আনন্দও সে দিন তিনি লাভ করিতে পারিবেন না; এজন্য রাজকুমারী যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। পরদিন তিনি যথাকালে কুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্মানিত হইবেন।

প্রিন্সের গুরুতর কার্য্য-ব্যপদেশে অনুপস্থিতি সম্মতি জানাইয়া অস্‌রা অনুচরের হস্তে লাড্‌উইক্‌কে একটি পত্র লিখিয়া দিলেন। রাজা ও রাণী তখন জেন্দার অরণ্যে শীকারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। অস্‌রাকে সমস্ত দিন একাকিনী থাকিতে হইবে দেখিয়া উভয়ে তাঁহাকে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে অন্ততঃ কিছু দূর যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অস্‌রাও ভাবিয়া দেখিলেন এরূপ অবসাদকর ভাব লইয়া সমস্ত দিন প্রাসাদের কক্ষে রুদ্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা অন্য কোন উপায়ে দিনটা কাটাইয়া ফেলাই ভাল।

প্রায় পনের মাইল তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া অস্‌রা প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত গার্ড খ্রীষ্টান হানজও তাঁহার অনুসরণ করিল।

অস্‌রার ভুবন ললাম সৌন্দর্য্যের অগণ্য নীরব ভক্তের মধ্যে বীর খৃষ্টান হান্‌জও এক জন। সেই বিখ্যাত দুর্দান্ত বন্য দস্যুও সেই অপরূপ রূপরাশির নিকটে মস্তক নত করিয়া স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁহার অনুচরের পদ গ্রহণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিত। প্রিন্স লাড্‌উইকের উপরে সে প্রথম হইতেই ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরে অস্‌রার প্রতি তাঁহার ঔদাসিন্য দেখিয়া সে বিদ্বেষ গভীর ক্রোধে পরিণত হইয়াছে।

কিছু দূর নীরবে কুমারীর অনুসরণ করিয়া খৃষ্টান হান্‌জ সহসা তাহার অশ্বকে একটু বেগের সহিত চালিত করিয়া রাজকুমারীর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অস্‌রা শ্লথ হস্তে অশ্বরশ্মি ধরিয়া আপন মনে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে ছিলেন। হান্‌জের চাঞ্চল্যে একটু সসংজ্ঞ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে কি একটা নীরব ভাষা তাহার মুখে চক্ষে খেলিয়া যাইতেছে কিন্তু সাহস করিয়া ওষ্ঠে আসিতে পারিতেছে না! কুমারী বলিলেন, "খ্রিষ্টান্! তুমি কি আমায় কিছু বল্‌তে ইচ্ছা কর!" "হ্যাঁ কুমারী! অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি কিন্তু সাহস পাই না।" সবিস্ময়ে অস্‌রা বলিলেন, "কেন! তুমি ত অনেক সময়ই আমার পাশে পাশে থাক।"

"হ্যাঁ, তা থাকি বটে, কিন্তু প্রিন্স গ্রোটেনবার্গও সেইরকম থাকেন। তাঁরই সম্বন্ধে কোন কথা।" বক্তার মুখ-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অস্‌রা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, "খ্রীষ্টান! সে কথায় একমাত্র তাঁরই অধিকার! তুমি ত প্রিন্স গ্রোটেনবার্গ নও।"

"ভগবান করুন যেন আমি এই খ্রিষ্টান্ হান্‌জ নামে যেখানে আছি এই খানেই চিরদিন থাকি তবু যেন প্রিন্স গ্রোটেনবার্গের নামে আমার লোভ না থাকে এবং তাঁর মত মাঝে মাঝে লুকিয়ে ওখানে বাসও না করতে হয়।" বলার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টান বৃক্ষান্তরাল স্থিত একটি ক্ষুদ্র আবাসের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল।

অস্‌রার সেই ক্রোধ রক্ত চক্ষের পানে চাহিয়া অন্য কেহ হইলে সে সময়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিত না কিন্তু খ্রিষ্টান এজন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, অস্‌রার মুখের দিকে না চাহিয়া কেবল সসম্মানে সম্মুখে অবনত হইয়া বলিতে লাগিল, "আপনি প্রশ্ন কর্‌তে পারেন যে প্রিন্স যে ওখানে আছেন তুমি কেমন করে জান্‌লে! কুমারি, আপনার ত অনুচরের অর্থের অভাব নেই, এবং আপনি জানেন জগতে যার অর্থ আছে সে সব খবরই জানতে পারে। তিনি যে আজ এইখানে বাস কর্‌ছেন এ খবর আমি তাঁর একটা চাকরের কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের বদলে সংগ্রহ করেছি।"

অস্‌রার মুখ দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি সক্রোধে "তোমার ও শেয়ালের মত ধূর্ত্ততার গল্প আমার শুন্‌বার অবসর নেই এবং প্রিন্স যেখানেই থাকুন সে খবরেরও দরকার নেই" এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সবেগে অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করিলেন। অশ্ব তীরবেগে প্রাসাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। খ্রিষ্টান হান্‌জ যদিও অনেকটা বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল কিন্তু তথাপি সব ব্যাপারটা বলার অপেক্ষা এই সন্দেহাত্মক আভাবই যে বেশী কাজ করিবে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

কয়েক মাইল এই রূপে অতিবাহিত করিয়া প্রিন্সেস্ অশ্বের গতি শ্লথ করিলেন এবং খ্রিষ্টানের পানে না চাহিয়াই বলিলেন, যে খ্রিষ্টানের এ রূপে প্রিন্সের সন্ধান লওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং অসম্মানজনক কার্য্য হইয়াছে। প্রিন্স যে গুরুতর কার্য্যের জন্য সেখানে গিয়াছেন তাহা তিনি জানেন কিন্তু খ্রিষ্টান যেন তাহার এ শৃগালোচিত সন্ধানের কথা বা প্রিন্সের নাম আর কাহারো সাক্ষাতে মুখেও না আনে। কুমারীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবার ভঙ্গীতে খ্রিষ্টান মস্তক নত করিল বটে কিন্তু তাহার ওষ্ঠের বিদ্রূপ ও সন্দেহসূচক তীক্ষ্ণ হাস্যটি অস্‌রার দৃষ্টি এড়াইল না।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অস্‌রা সবেগে নিজ কক্ষের দিকে ছুটিলেন এবং নিজের ক্লান্ত দেহ ও ব্যথিত হৃদয়কে শয্যায় পাতিত করিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে সেই ব্যথিত প্রশ্ন হইতে নিষ্কৃতি দিল না। কেন! এ লুকাচুরীর কারণ কি? প্রিন্স যে তাঁহাকে ভালবাসেন না তাহা জানিলেও তাঁহার বিশ্বস্ত চরিত্রের প্রতি অস্‌রার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, আজ এ ব্যাপারে যে সেখানেও আঘাত পড়িতেছে। তাঁহার ভ্রাতা এ কথা জানিতে পারিলে আজ নিশ্চয়ই এ বিষয়ের সন্ধান না লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না; কিন্তু হায়! তিনি আজ অনেক দূরে রহিয়াছেন। অস্‌রার আজ তাঁহার কাছে উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব; কিন্তু এ ভাবে এ চিন্তা লইয়া তিনি আর এক ঘণ্টাও কাটাইতে পারিবেন না বুঝিতে পারিলেন। অস্‌রা ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। উত্তপ্ত ললাটের উপর হইতে লুণ্ঠিত বিশৃঙ্খল কেশগুলা পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া

হাতখানি নিজ হস্তে লইয়া চুম্বন করিবা মাত্র অস্‌রা অধীর ভাবে নিজের হাত টানিয়া লইলেন। লাড্‌উইক নত মুখেই রহিলেন।

যথাসময়ে লাড্‌উইক্ নিজ নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে চলিয়া গেলে অস্‌রা নিজ কক্ষে বসিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, "এই কি ভালবাসা?" সহসা কুমারীর চক্ষে জল আসিল। "না-না! সে ভালবাসা কাকে বলে বোধ হয় জানেই না!" ভিত্তি-গাত্রস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজের অলৌকিক সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তিনি নিজের মুখকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সে যেন জানে না, কিন্তু তুমি কেন তাকে শিখাচ্চোনা? তুমি ও ভালবাসার দ্বার খুলে দিচ্চ না কেন? তুমি শেখালে সেও নিশ্চয় শিখ্‌ত! ত্রুটি তোমারও আছে।"

আবার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। লাড্‌উইক্ যথানিয়মে রাজকুমারী অস্‌রার সঙ্গ লাভের জন্য প্রতিদিনই আসিতেন। প্রেমের উন্মাদনাহীন এ রূপ বশ্যতা এ রূপ সঙ্গ অস্‌রাকে ক্রমশঃ যেন ক্লান্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রিন্সের দিক্ হইতে কিম্বা নিজের মধ্যে যে কোন দিক হইতেই হোক্, প্রেমের সেই সর্ব্বজন অনুভাব্য উত্তাপকে অনুভব করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াই উঠিতেছিলেন! কিন্তু তাহা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তো এরূপ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাওয়াই ভাল। এরূপ শান্ত বিচারের সহিত, তর্ক বিতর্কের সহিত, ভালবাসিবার চেষ্টা করা, এ যেন একটা বিড়ম্বনা মাত্র! অস্‌রা লাড্‌উইকের কায়দা-দুরস্ত চালচলন, নিয়মিত বিধিবদ্ধ কথা, সর্ব্ববিষয়ে অধিকন্তু হীন গাম্ভীর্য্যের জন্য তীক্ষ্ণ ভাবের বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। কিন্তু তাহাতেও প্রিন্স অবিচলিত ভাবে তাঁহার কৈফিয়ৎ দাখিল করিতেন যে, তাঁহার প্রকৃতিই তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সহিত এরূপ অসমতা দান করিয়াছে। তাঁহার নিজের এ বিষয়ে কোন হাত নাই, তাঁহার স্বভাবই এই রূপ কিন্তু এই কথাগুলার মধ্যেও অস্‌রার প্রতি তাঁহার অগাধ সম্মান এবং শ্রদ্ধা অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত! অস্‌রার সময়ে সময়ে মনে হইত, "আমি যদি রাজকন্যা না হতাম! এ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা হ'লে আমার কোন সম্বন্ধই থাক্‌ত না!"

লাড্‌উইকের দিক্ হইতে কোন কিছু সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহার নিজের দিক্ হইতে একটা যাহোক কিছু স্থির করিয়া ফেলার ক্রমে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল, কেন না, রাজারাণীও এ জন্য তাহাকে তাগাদা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের এরূপ দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া তাঁহারা যেন বিব্রত এবং কিছু বিরক্তও হইয়া পড়িতে ছিলেন। প্রিন্স গ্লোটেনবার্গের মধ্যে এমন কোন যৎসামান্য ত্রুটীও নাই, যাহার জন্য অস্‌রা তাঁহাকে বিবাহের অনুপযুক্ত বলিতে পারেন, বরং প্রিন্সের হৃদয়ের মহত্ব যে সাধারণের অপেক্ষাও অনেক বেশী, ইহা অস্‌রাকেও মানিতে হইত। শুধু নিজের মনের একটা খেয়ালের জন্য (খেয়াল ভিন্ন এরূপ স্থলে সাধারণে কি বলিতে পারে?) এরূপ সর্ব্বজন-ঈপ্সিত বিবাহে সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করায় চারি দিক হইতে একটু বিদ্রূপের বাতাসও যেন ক্রমে বহিয়া উঠিতে ছিল। অগত্যা শেষে একদিন অস্‌রা তাঁহার ভ্রাতাকে জানাইলেন যে, তিনি প্রিন্স লাড্‌উইককে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন।

রাজা এ সংবাদে এতই সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন যে, তখনি তিনি নিজেই লাড্‌উইককে সংবাদ দিবার জন্য একাকী শ্বেত প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লাড্‌উইকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সহর্ষে বলিলেন, "ভাই! সৌন্দর্য্যে যে পৃথিবীর রাণী, তার ওপরে তোমার স্বত্ব সাব্যস্ত করে' দেবার জন্য সুসংবাদ নিয়েই আজ আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি"।

প্রিন্স এ সংবাদ শুনিয়া সসম্মানে অবনত হইয়া রাজার হস্ত ধারণ করিলেন এবং এ বিষয়ে রাজার সম্মতি ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি এই অসীম অনুগ্রহের জন্য রাজকুমারীকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

রাজা বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তুমি কি এখন আমার সঙ্গে যাবে না?" প্রিন্স নত মুখে বলিলেন,

"আমার একটা বড্ড দরকারী কাজ রয়েছে! কুমারীর কাছে আমার জন্য ক্ষমা চাইবেন, আমি বৈকালে গিয়া তাঁর দর্শন লাভ ক'রে সম্মানিত হব এবং তাঁকে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাব।"

রাজা কিয়ৎ ক্ষণ লাড্ উইকের পানে দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পৃথিবীতে বোধ হয় এমন লোক আর দুটি নেই যে, অস্রা তার জন্য অপেক্ষা করেছে শুনেও—কৃতজ্ঞতা, দরকারী কাজ, বৈকাল—এই সব কথা মুখে আনে!"

লাড্উইক্ রাজার বাহু ধারণ করিয়া বন্ধুর যোগ্য সানুনয় নির্ব্বন্ধের সহিত বলিলেন, "আমায় অকৃতজ্ঞ এবং অভদ্র ভাব্বেন না! ভাই, সত্যই আমি এ সংবাদে নিজকে অত্যন্ত সম্মানিত এবং আনন্দিত বোধ কর্ছি, কিন্তু তবু এই দরকারী কাজটা এখন কোন রকমেই ফেলে রাখবার উপায় নেই।"

রাজা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ঈষৎ গম্ভীর মুখে নিজের প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং এ সংবাদে লাড্উইক যে কিরূপ সুখী এবং কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সালঙ্কারে অস্রার নিকটে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জানাইলেন, লাড্উইকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যটা সারিয়াই বৈকালে সে অস্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। অস্রাও এ সংবাদে বিচলিত হইলেন না, কেন না তিনি যখন বিবাহের জন্য মনকে সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন সে ব্যক্তির কোন ত্রুটি আর ইচ্ছা সত্ত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এ বিবাহে ভ্রাতার আন্তরিক যত্নের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া নীরব হইলেন।

রাজা ভগ্নীর নিকটে বসিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "বোন! জগতে প্রণয়ী অনেকই পাওয়া যায়, কিন্তু স্বামী হবার উপযুক্ত গুণ সকলের থাকে না। সে গুণ লাড্উইকে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে স্বামীত্বেরই উপযুক্ত লোক নয় কি?"

ভ্রাতার এই সস্নেহ আদরে অস্রার অন্তরের গুপ্ত বেদনা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি যেন কতকটা ফুঁপাইয়া কান্নার স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তিনি স্বামীত্বেরই উপযুক্ত লোক! আর কিছু না।"

রাজা একটু চিন্তিত ভাবে ক্ষণেক অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে অস্পষ্ট ভাবে বাহির হইল, "পৃথিবীতে বেশীর ভাগ এই রকম মিলনই ঘটে থাকে।"

ক্ষণপরে অস্রা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু যেন আপনার মনে বলিলেন, "আমার ভয় কর্ছে। ভয় কর্ছে যদি আমি তাকে ভাল না বাস্তে পারি?" রাজাও সে কথার প্রতিধ্বনির মত বলিলেন, "আমারও সেই ভয়! কিন্তু না এ রকম ভয় করা ভাল নয়, লাড্উইক অত্যন্ত ভাল লোক, তার মত স্বামী স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রার্থনীয়! সাহস ধর, এ রকম ভয় হওয়া ঠিক্ নয়।" রাজা তার পরে শুভানুধ্যায়ী ভ্রাতার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদের মত ভগ্নীর মস্তক চুম্বন করিলেন এবং গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তার স্বভাবটাই এই রকম ঠাণ্ডা ধরণের। কোন বিষয়েই সে বেশী উত্তেজিত হয় না।"

কিন্তু অস্রা এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না! প্রেমের উত্তাপহীন এ মিলনকে তিনি মনের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি উৎকণ্ঠার সহিত প্রিন্সের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কেন না বুঝিতে পারিতেছিলেন এই সাক্ষৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষে সমস্ত প্রশ্নের শেষ মীংমাসা করিয়া দিবে। অস্রা নিজের অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যকে বেশ-ভূষার দ্বারা যত্নের সহিত সজ্জিত করিয়া এবং নিজকে যেন ভালবাসিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেও বুঝিতে পারিতে ছিলেন যে, যদি সে তাহাকে ভালবাসে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও তাহাকে ভালবাসা কিছুমাত্র কঠিন হইবে না; কিন্তু হায়, সে ভালবাসে না, বুঝি ভালবাসার নামও কখনো সে শোনে নাই—ভালবাসিতে সে জানেই না, অতএব এ আয়োজন সবই বৃথা—বৃথা! এত ভাবিয়া চিন্তিয়া এত পাত্রাপাত্র বোধের নিক্তি হাতে লইয়া চেষ্টা করিয়া ভালবাসা? শোনা যায় প্রেম না কি একবার মাত্র সাক্ষাৎ, একটি কথা, একটি স্পর্শ এমন

রাজকুমার ও রাজকুমারী

তখন বসন্তের সব ফুলগুলিই একে একে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেরি, জেস্মিন, ভায়োলেট, লিলি, রোজ প্রভৃতি পুষ্পের সদ্যপ্রস্ফুটিত গন্ধে ষ্ট্রেলসর রাজোদ্যান আমোদিত, মত্ত মধুমাছি ও প্রজাপতির আনাগোনার বিরাম নাই। প্রস্ফুটিত গোল্ডেনকাপ্ ফুলগুলায় মাঠটা স্বর্ণময় এবং তাহার বক্ষস্থিত মর্ম্মর রচিত শ্বেত-প্রাসাদ বসন্ত-সূর্য্যের স্বুবর্ণ কিরণে হীরক-খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। ষ্ট্রেলসর আদিম রাজ প্রাসাদে বসিয়া রাজকুমারী অস্রা দূরস্থিত শ্বেত প্রাসাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া একটি মৃদু অথচ দীর্ঘকালবাহী নিশ্বাস ফেলিলেন। তাহার ভ্রাতা ষ্ট্রেলসর নবীন রাজা রুডল্ফ নিকটে বসিয়া যদৃচ্ছামত সিগার টানিতেছিলেন, ভগিনীকে নিশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া সহসা বলিলেন, "কই, লাড্উইক্ এখনো আসেনি?" "না!" রাজা এক বার আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাই ত! অন্য দিন ত এত ক্ষণ আসে। শ্বেত প্রাসাদ বেশী দূরে নয় ব'লেই তাকে আরও এখানে বাস করতে অনুরোধ করেছি। ছোক্‌রা এখনো এল না কেন আজ।" অস্রা কোন উত্তর দিলেন না।

লাড্উইক গ্লোটেনবার্গের রাজকুমার। কুমারী অস্রার সৌন্দর্য্য খ্যাতিতে তখন ইউরোপের সমস্ত রাজবংশ তাহাকে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইচ্ছুক। গ্লোটেনবার্গের রাজা নিজ পুত্র লাড্উইক্‌কে সেই উদ্দেশ্যেই ষ্ট্রেলসর অতিথি স্বরূপে পাঠাইয়াছেন। লাড্উইকও যে তখনকার রাজকুমারদের মধ্যে রূপ-গুণ, চরিত্র-মাধুর্য্য, বিদ্যাবত্তা এবং অমায়িক স্বভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ষ্ট্রেলসর রাজসভার সভাসদদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। এই যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলনের জন্য রাজারাণী হইতে ষ্ট্রেলসর আপামর সাধারণ পর্য্যন্ত সমুৎসুক। গ্লোটেনবার্গের রাজবংশও প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত। এ বিবাহ সকলের একান্ত প্রার্থনীয় হইলেও যাহাদের আগ্রহই এ বিষয়ে বেশী দরকারী, তাহাদিগকে অনেকটা উদাসীন দেখিয়া রাজারাণী পর্য্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতে ছিলেন।

রুডল্ফ ভগ্নীর মনটি একটু কোমল করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "প্রিন্স গ্লোটেনবার্গের মত শিক্ষিত, সদালাপী, সহৃদয়—এক কথায়,সকলের মনোরঞ্জন করবার মত ক্ষমতাপন্ন লোক আমি খুব কম দেখেছি। তোমার উপর তার অত্যন্ত শ্রদ্ধা, সে তোমার অত্যন্ত অনুগত।" "কিন্তু এই কি ভালবাসা? স্বীকার করি, সে আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই কি ভালবাসা? সে যখন নতজানু হয়ে বসে, আমার হাত ধরে, আমার হাতখানা সে যেন ঠিক পাথরের পুতুলের হাত বলেই মনে করে এবং আমিও তার চেয়ে আর বেশী কিছু ত অনুভব করি না! ভাই জিজ্ঞাসা করি, এরই নাম কি ভালবাসা?"

রুডল্ফ একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভালবাসার অনেক রকম-ভেদ আছে বোন্, এ জাতীয় ভালবাসা কেবল রাজকুমার ও রাজকুমারীদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট!" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অস্রা বলিলেন, "তার তবে ভালবাসা নাম দিও না।"

প্রতিদিনের নিয়ম মত যখন প্রিন্স লাডউইক আসিয়া বিনীত মুখে রাজকুমারীকে জানাইল যে, তার কোন সামান্য ইচ্ছা পূরণ করতে পেলেও সে অতুল আনন্দ ভোগ করবে তখন অস্রা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। অতর্কিতে তাঁহার ওষ্ঠাধর হইতে নির্গত হইল, "আমার আজ্ঞা পালন করে' আনন্দ পাওয়ার চেয়ে আমায় কেবল দেখে' যদি তুমি সেই আনন্দ পেতে, সে-ই আমি যথেষ্ট জ্ঞান করতাম।" কথার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় কুমারীর মুখ ও গণ্ড লোহিত হইয়া উঠিল। ত্রস্তে তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। অস্রার এ কথায় লাড্উইক্ যেন কিঞ্চিৎ আহত হইলেন। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "তোমার ক্ষণেকের আনন্দের জন্য আমার সমস্ত জীবনও আমি দিতে প্রস্তুত!"

অস্রা তাহার সেই রক্তিম মুখ রাজকুমারের দিকে ফিরাইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে আনন্দটা যদি আমার কাছ থেকে তুমি পেতে, তা হ'লেই আমি বেশী সুখী হতাম।"

লাড্উইক্ চক্ষু অবনত করিলেন, ক্ষণপরে কুমারী